শীর্ষেন্দু। বিন্দু থেকে সিন্ধু
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু। বিন্দু থেকে সিন্ধু

শীষে...

বিন্দু থেকে সিন্ধু

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু

বিন্দু থেকে সিন্ধু

পত্র ভারতী

''রা-স্বা''

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

কল্যাণীয় শ্রীমান সম্রাট মুখোপাধ্যায়
এবং
কল্যাণীয়া শ্রীমতী সীমন্তিনী মুখোপাধ্যায়
করকমলেষু

লেখালেখির পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গিয়ে মনে হয়, কত কী লিখলাম! কিন্তু তাতে হলটা কী? কী যে হল ভেবে পাই না। সেইসব নানারকম লেখা থেকে ভেবেচিন্তে ত্রিদিব আর শ্যামলকান্তি এইরকম একটা বই বের করতে চেয়েছিল, যা থেকে আমাকে একটু চেনা যায়। চেনা যাবে কিনা সেটা অন্য কথা, কিন্তু চেনানোর এই চেষ্টাটুকুই এই বইখানা।

১৫ জানুয়ারি, ২০১২

কলকাতা

পত্র ভারতী প্রকাশিত বই লেখকের অন্যান্য বই

শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১

পাঁচটি উপন্যাস

ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত

রূপ মারীচ রহস্য

ভৌতিক গল্পসমগ্র

বি. ু থেকে সিন্ধু

উপন্যাস

ফেরা

জীবন পাত্র

বাসস্টপে কেউ নেই

ভুল সত্য

একটি স্বপ্নের আড়ালে

কাচের মানুষ

নভেলেট

রূপ

মারীচ

ধূসর সময়

বেশি দূরে নয়

সম্পত্তি

আলো-অন্ধকার

পিপুল

জীবনী

কাছের ঠাকুর

গল্প

আত্ম-কথা

নানা বিষয়ক রম্য রচনা

উপন্যাস

ফেরা

বন্ধুগণ, হাওয়া ঘুরছে। বাতাস এখন ওলট পালট। সামলে। ভয় নেই, সঙ্কট মানেই পরিত্রাণ। বাতাস ঘুরছে। ঘোরার মুখটাই যা একটু গোলমাল। ঘরের চাল উড়ে যায়, মাথার ওপর আকাশ বেরিয়ে পড়ে। মড় মড় করে ভেঙে পড়ে গাছের ডাল। মেঘ চমকায়, কড়াৎ করে বাজ পড়ে। তবু মনে রাখবেন, হাওয়া ঘুরছে। হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে। হাত বদল হচ্ছে পৃথিবীর অধিকার। দেরি নেই।

প্রিয় বন্ধুগণ, হে চলাচলকারী জনসাধারণ, একদিন আমি বিপ্লবের অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থেকেছি। ওপরের ব্যালকনি থেকে উৎসাহ করে দেখেছি কত না মিছিল। মিছিলে আমি হেঁটেওছি কতবার, পতাকা বহন করেছি। চেঁচিয়ে বলেছি, আমাকে এটা দাও, সেটা দাও। কিংবা বলেছি—তুমি নিপাত যাও, অমুক নিপাত যাক। পুলিশের কালো গাড়ির ভিতরে বসে জালে আবদ্ধ কলকাতাকে দেখতে দেখতে গেছি জেলে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—এই কথা চেঁচিয়ে বলেছি, বলেছি মনে মনে।

সন্ত্রাসবাদের আমলে আমার বয়স হয়নি, আমার বাবার হয়েছিল। কিন্তু তিনি সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, অসহযোগীও না। তিনি ছিলেন খুবই সফল এক রেল-কেরানি। বড় ইংরেজি-ভীরু লোক, আবার স্বদেশিদেরও সম্মান করেছেন বরাবর। কাজে ফাঁকি দেননি, তাঁর ক্যাজুয়্যাল লিভ বছর বছর পচে যেত। জ্ঞান-বয়সে একমাত্র দাদুর শ্রাদ্ধের সময়ে, আর দিদির বিয়ের জন্য দু'টি দিন তিনি স্বেচ্ছায় ছুটি নিয়েছিলেন। একেবারে চাকরির শেষ দিকটায় তাঁর প্রমোশন হয়েছিল। শেষ একটা বছর তিনি স্বাধীন ভারতীয় রেলে কমার্শিয়াল ইনসপেকটর ছিলেন। তাঁর সেই উজ্জ্বল সাফল্যের কথা তিনি এখনও লোককে ডেকে শোনান। এখনও তিনি ইংরেজদের গুণগান করেন। লক্ষ করে দেখেছি, ভারতের স্বাধীনতা কিংবা তজ্জনিত আন্দোলন, কিংবা গান্ধী বা ওই রকম নেতারা, তাঁর মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি যতটা পেরেছিল তৎকালীন ইংরেজ ডি.টি.এস. কিংবা ওপরওয়ালা অন্য কোনও সাহেব।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা এই বাবাটির জন্যই আমি বরাবর মনে মনে বিপ্লবী। দিনশেষে বাবা বাসায় ফিরে রুটি খেতেন, তখন আমরা ছয় ভাইবোন তাঁকে ঘিরে ধরতাম। বাবা ভাগ দিতেন। মা আমাদের তাড়া দিলে তিনি দুই বাহু বাড়িয়ে বলতেন—আহা, থাক, থাক! রাতে পড়া করার সময়ে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে হঠাৎ শুনতে পেতাম, রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বাবা মাকে বলতেন—এবারও হল না, বুঝলে! সান্যাল

আমার কত জুনিয়ার, অথচ ও বেরিয়ে গেল প্রমোশন পেয়ে। শুনতাম, মা ঝেঁঝে উঠে বলছেন—তা তুমি করো কী? বাবা উত্তর দিতেন না। ভাবতেন। কখনো বা পড়ার ঘরে এসে বলতেন—ইংরেজিটা ভালো করে শেখো। চাকরিতে কাজে লাগবে। একবার রেলের এক ফুটবল ফাইনাল দেখতে গেছি। সুন্দর তাঁবুর নীচে ভালো ভালো চেয়ারে সাহেবরা বসে, পাশে মেম, সামনের টেবিলে কাচের গেলাস, অ্যাশ-ট্রে, বেয়ারারা ছোটাছুটি করছে। সেই তাঁবুর পাশে বাবা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে খেলা ছেড়ে, চার-চোখে, সেইসব সাহেবসুবো দেখছিলেন। আমি বাবাকে দেখছিলাম। সেই বোধহয় প্রথম আমি বাবার তুচ্ছতা বুঝতে পারি। সেই দৃশ্যটা, বাবার সেই মুখ, একটা বিষ-বিছের কামড়ের মতো লেগে আছে আমার বুকে। খেলার শেষে সাহেবসুবো, খেলোয়াড়দের জন্য লেমনেডের ক্রেট এসে পৌঁছলো। বাড়তি বোতলগুলোর জন্য শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। সেই ভিড়ের মধ্যে আমি আমার অসহায় অক্ষম বাবাকে আর একবার লক্ষ করি। ঠেলা-ধাক্কায় তাঁর চশমা পিছলে যাচ্ছে নাক থেকে, কোঁচা খুলে পড়ছে, অতি কষ্টে তিনি, যে লোকটা লেমনেডের বোতল বিলি করছে তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন—তারকদা, আমাকে একটা। এই যে আমি —আমাকে—। অবশেষে একটা বোতল তিনি অতিকষ্টে পেয়েছিলেন। অর্ধেক খেয়ে আমার দিকে বোতলটা বাড়িয়ে বললেন, খা। খুব মিষ্টি। তাঁর মুখখানায় তখন সেই মিষ্টি স্বাদ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু লেমনেডের বোতলে মুখ দিয়ে সেই প্রথম আমি জীবনের তিক্ততার স্বাদ পাই।

তেতো স্বাদের সেই শুরু। তারপর মাঝে মাঝে আমি ক্রমান্বয়ে সেই তিক্ত স্বাদ পান করেছি। আমাদের ছেলেবেলা খুব সুখের হওয়ার কথা নয়। সুখের ছিলও না। কাটিহারে যে রেল কোয়ার্টারে আমার শৈশবের অনেকটা সময় কাটে, সেটা ছিল খুপড়ি, অন্ধকার। লালারাম ইনস্টিটিউটের উলটোদিকে রেল ইয়ার্ডের গা ঘেঁষে সেই মোটা দেওয়াল, ছোট্ট ছোট্ট জানালার ঘর। সারাদিন শান্টিং ইঞ্জিনের ধোঁয়া আমাদের বাড়িটার ভিতরে জমে থাকত। সেই কাঁচা ময়লার ধোঁয়ার আবছায়ায় আমরা দীনভাবে প্রতিপালিত হতাম। ময়লা মশারি, ময়লা বিছানা, রংচটা আয়না, তুচ্ছ আসবাব, অতি নিম্ন মধ্যবিত্তদের ঘরে যেমনটা দেখা যায়। সারা বাড়িতে ঝুল ঝুল অন্ধকার বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ। অবশ্য আমাদের বেশিরভাগ সময় কাটত বাজারের রাস্তায়, প্ল্যাটফর্মে, খালাসিটোলায়, ল্যাংড়াবাগানে। বাইরে থেকে কখনো বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করত না। যতক্ষণ বাইরে থাকা যায় ততক্ষণ আমরা থাকতাম। পড়তে বসেছি, মা হয়তো মশলা আনতে পাঠাল। মশলা আনতে গিয়ে কতবার রাস্তায় বাজিকরের খেলা, কুষ্ঠরোগীর ভিক্ষে চাওয়া, বাঁদরনাচ, খালাসির ছেলেদের মারামারি, নিদেন পক্ষে ইঞ্জিনের শান্টিং দেখে খামোখা খানিকটা সময় কাটিয়ে আসতাম। আমার দুই দিদি সারাদিন ঘুরেফিরে ছোট্ট জানালার মোটা মোটা গরাদ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে থাকত। তাদের বাইরে বেরোনোর

নিয়ম ছিল না। মনে পড়ে, সে সময়ে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন পেলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না।

এ. টি. এস. সাহেবের ছেলেকে বাবা দশ টাকা মাইনেয় পড়াতেন। সেই বাড়িতে একবার আমি বাবার সঙ্গে জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে যাই। সেটা ছিল গার্ডেন পার্টি। বিশাল লনে ফুলের কেয়ারি ছিল, কুঞ্জবন ছিল, পাথরে বাঁধানো চাতাল ছিল। তখন শীতকাল, পপি ফুলের বাগানে প্রজাপতির মতো ক্ষীণজীবী ফুলেরা আলগোছে ফুটে আছে। ক্রিসেনথিমাম, সূর্যমুখী, মোরগ ফুল, আর গোলাপের ফাঁকে ফাঁকে রঙিন আলোর ডুম জ্বলছে। দুধের মতো সাদা ঢাকনায় ছোট ছোট টেবিল ঘিরে দুটো-চারটে করে চেয়ার। টেবিলের ওপর গেলাসে, পাকানো শাদা তোয়ালে, কী সুন্দর সব ছেলে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সে যেন পৃথিবীর দৃশ্য নয়। সেই সব সুন্দর সুগন্ধী শিশুরা যেন বড় হবে বলে পৃথিবীতে আসেনি, তাদের নেই জীবনযাপন। তারা স্বপ্নরাজ্য থেকে নিমন্ত্রণে এসেছে, আবার ফিরে যাবে। কালো প্যান্ট, বুট আর সাটিনের কোট পরা একটা ছেলে এগিয়ে এসে বাবাকে বলল, মাস্টারমশাই! বাবা তাকে রিবনে বাঁধা একখানা গল্পের বই উপহার দেবেন বলে সঙ্গে করে এনেছিলেন। বইটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—এই হচ্ছে হিমাদ্রি, সাহেবের ছেলে। ওর জন্মদিন, বইটা ওকে দাও অতনু। আমি দেখেছিলাম জন্মদিনে ও এয়ারগান থেকে শুরু করে অনেক দামি উপহার পেয়েছে, এক সেট ক্রিকেটের সরঞ্জামও। তুচ্ছ বইটা সুন্দর ছেলেটির হাতে দেওয়ার সময়ে আর একবার আমার মনে হল, আধ-খাওয়া মিষ্টি একটা লেমনেডের বোতলে মুখ দিয়ে আমার সমস্ত শরীর তেতো স্বাদে ভরে গেল। সেই সুন্দর বাগানের চারপাশে চেয়ে মনে হয়েছিল—এখানে কোথাও আমাকে মানায় না। খবরের কাগজের জামা পরে বসে পশ্চিমা নাপিতের কাছে মাসে একবার খুব ছোটো করে ছুট ছাঁটতে হয় আমাদের, পুজোর সময়ে কেনা বছরের বরাদ্দ একজোড়া জুতো কদাচিৎ কালি করা হয়। আমার সবচেয়ে ভালো জামাটি সস্তা রামধনু মার্কা জাপানি সিল্ক থেকে তৈরি, পরনে সাদা মোটা জিন-এর হাফপ্যান্ট। গায়ে কালো মোটা কুটকুটে কোট—গতবার আমার পিসতুতো দাদার ছোট হয়েছিল বলে অমি পেয়ে যাই। তার ওপর আমরা উপহার এনেছি মাত্র আট আনা কি বারো আনা দামের গল্পের বই। চারদিকের বিস্ময়ের মাঝখানে আমি দিশেহারা। লজ্জায় নিজের ভিতর ডুবে যাচ্ছি। সেই সময়ে হিমাদ্রির মা এসে বাবাকে বললেন—ওমা, মাস্টারমশাই, আপনি এখানে কেন? আপনি তো বাইরের লোক নন। আমাদের ঘরের লোক। যান, ভিতরে গিয়ে বসুন গে। এইটি ছেলে বুঝি। বড্ড রোগা তো—

শ্রেণিবৈষম্যের সেটা হয়তো প্রাথমিক বোধ। একটা স্বপ্নের বাগানে পৃথিবীর ধুলোমাখা পায়ে দুটি লোক ঢুকে পড়েছে—আমার শৈশবের শ্রেণিচেতনা ওই দৃশ্যটি থেকে জন্মলাভ করেছিল হয়তো। সেই বাড়িতে আমাদের কোনও অনাদর হয়নি—কেবল সেই বাগানের

দৃশ্যটি নিখুঁত রাখার জন্য আমাদের খুবই ভদ্র এবং বিনীতভাবে হিমাদ্রির পড়ার ঘরে সরিয়ে নিয়ে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সে ঘরটিও সুন্দর। এবং সেখানে হিমাদ্রির দিদির গানের মাস্টারমশাই, হিমাদ্রির বাবার অফিসের বড়বাবু, এরকম দু'চারজন লোক ছিলেন। ছিল তাঁদের ছেলেমেয়েরা। সেখানে আমাদের আদর করে প্রচুর খাবার দেওয়া হয়েছিল। সেই খাবার থেকে আমি গোপনে কোটের পকেটে সন্দেশ আর চানাচুর প্লেট থেকে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে, মা আর ভাই বোনের জন্য নিয়েছিলাম। কত কী যে খেয়েছিলাম তা আর খেয়াল নেই। তবু তারপর অনেকদিন ধরে আমার কেবলই মনে হত—অত খাবার, অত আপনকরা আদরের চেয়েও যেন ওই স্বপ্নের বাগানটির একটি টেবিল ঘেরা চেয়ারে একবার বসতে পাওয়া অনেক বেশি সৌভাগ্যের ছিল। ওই সুন্দর দৃশ্যটি থেকে কেন যে আমাদের বাদ দেওয়া হল! স্কুলের ফুটবল টিমের গ্রুপ ছবি উঠছে একবার, কালো কাপড়ে ঢাকা সেই রহস্যময় ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড়াতে খুব একটা ইচ্ছা ছিল ছেলেবেলায়। তাই অনাহূত আমি সেই ফুটবল টিম-এর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। বড় ছেলেরা তখন আমাকে বার করে দেয়। সেই দুঃখ ও লজ্জার সঙ্গে কোথাও যেন এই ঘটনার মিল ছিল। যদিও আমাদের বের করে দেওয়া হয়নি, অপমানও করা হয়নি। কেবলমাত্র বাইরের সুন্দর বাগানটির দৃশ্যকে নিখুঁত রাখা হয়েছিল। এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপমান আমার বাবা হয়তো বুঝতে পারতেন না। আমি পারতাম। পারতাম বলেই আমার জীবন ঠিক আমার বাবার মতো হয়নি।

আমার দশ-বারো বছর বয়সে এক বন্ধু জুটেছিল। খুবই রোগা সে। তার কানে পুঁজ, দাঁতে পোকা, হাঁটু আর কনুইয়ে দীর্ঘস্থায়ী ঘা, পেছনের বেঞ্চে বসা ছেলে। সে পড়া পারত না, মিথ্যে কথা বলত। তার নাম ছিল প্রকাশ। টিফিনের পর প্রায় দিনই সে স্কুল পালাত। কিন্তু বাড়ি ফিরত না। তার বাবা ছিল খালাসি। ঘরে-বাইরে এবং ইস্কুলে সে বেদম মার খেত রোজ। কিন্তু তবু তার স্বভাব পালটাত না। স্কুল পালিয়ে সে প্রায়দিনই গিয়ে স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে রেল-ওয়ার্ডে গাড়ির শান্টিং দেখত অনেকক্ষণ। রাস্তায় রাস্তায় মার্বেল খেলত, কিংবা ডাংগুলি। বাজারের মোড়ে যে চোখে-ছানিওলা বুড়ো ঢ্যাপের মোয়া বিক্রি করত, তাকে ফাঁকি দিয়ে ঢ্যাপের মোয়া চুরি করত সে। সে স্কুলের ছেলেদের পেনসিল, রবার, পয়সা চুরি করত প্রায়ই। সবাই জানত প্রকাশ চোর। তার পাশে কেউ বসতে চাইত না। টিফিনের সময়ে বা ছুটির পর স্কুলের ছেলেদের খেলাই ছিল প্রকাশকে খ্যাপানো। তার নাম বলতে গিয়ে কেউই শুধু নামটা বলত না। বলত—চোট্টা প্রকাশ, ঘেয়ো প্রকাশ, গান্ধা প্রকাশ। সমস্ত স্কুলটা, নিজের বাড়িটা, বাইরের জগৎটা, সবই ছিল প্রকাশের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রকাশের একটা অদ্ভুত গুণ ছিল এই যে, সে কখনো কাউকে ভয় পেত না। যখন স্কুলের রাস্তায় দশ-বিশজন ছেলে তার পিছনে লাগত, তখন রেগে গিয়ে প্রকাশ বরাবর ঘুরে দাঁড়িয়েছে। একা রোগা প্রকাশ প্রায়দিনই দশ-বিশজনের

সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে প্রচুর কিল-চড়-লাথি খেত। কাঁদত। কিন্তু পরদিনও আবার মারপিট করত। খালাসিটোলায়, ল্যাংড়া বাগানে, বাজারে এ রকম ঘটনা ঘটত হামেশাই। কেউ গাল দিলে, খ্যাপালে, মারলে প্রকাশ ঘুরে দাঁড়াত, মারপিট করত। মার খেত রোজ, তবু মারপিট করতে ছাড়ত না। খালাসিটোলার ছেলেরা তাকে রাস্তায় ধুলোয় পিষে দিয়েছিল প্রায়, তবু সে আবার লাগত তাদের সঙ্গে।

প্রকাশের ওই একটিই গুণ ছিল। তার সাহস। বড় দুর্লভ গুণ। মারকুটে, গুন্ডা বদমাস অনেক ছেলে থাকে, কিন্তু প্রকৃত সাহসী ছেলে কম থাকে। প্রকাশের ওই গুণ আমাকে তার দিকে টানত। আমি গান্ধা, ঘেয়ো, চোর প্রকাশের পাশাপাশি বসতাম। একসঙ্গে স্কুল পালাতাম। ল্যাংড়া বাগানে, সাহেব পাড়ায়, খালাসিটোলায় রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়াতাম। প্রকাশের সঙ্গে থাকার ফলে প্রায়ই আমাকে হাঙ্গামায় পড়তে হত। প্রথম প্রথম কিছুদিন মারপিট লাগলে প্রকাশকে একা ফেলে পালিয়ে যেতাম। প্রকাশ তার জন্য কখনো আমাকে দোষ দিত না। সে জানত, তার লড়াই তার একার। একাই সে দশ-বিশটা ছেলের মার হজম করত। তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মারপিট দেখলেই আমার বুক কাঁপতে থাকত, হাত পা যেত অবশ হয়ে, দিশেহারা বোধ করতাম। প্রকাশ সেটা বুঝত। মারপিটের সম্ভাবনা দেখলেই সে চেঁচিয়ে বলত—অতনু, তুই পালা—

আর কোনও বন্ধু ছিল না বলেই প্রকাশ আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। ল্যাংড়া বাগানে গ্রীষ্মের প্রথম সময়ে, দুপুরবেলায়, ছুরিতে কাঁচা আম ছাড়াতে ছাড়াতে প্রকাশ বলত—তোর গায়ে যদি কখনো কেউ হাত দেয় তো তাকে আমি দেখে নেবো।

আমি ভেবে পেতাম না, কেউ কখনো কেন আমার গায়ে হাত দেবে। আমি মারকুটে নই, কেউ আমাকে খ্যাপায় না। তাই আমি বলতাম—আমাকে কেউ মারবেই না।

—তবু যদি মারে—

আমি তখনই বড়াই করে বলতাম—সাহসই হবে না কারও।

প্রকাশ আমার সেই বৃথা অহংকার দেখে একটুও হাসত না। গম্ভীরভাবে বলত—তা অবশ্য ঠিক।

এক একদিন সে গভীরভাবে চিন্তা-টিন্তা করে আমাকে বলত—অতনু, তোর সঙ্গে আমার কখনো আড়ি হবে না।

—কেন?

—হবে না—দেখিস। আমাদের জন্মের মতো ভাব।

বুঝতাম, তার মন চাইছে আমার সঙ্গে তার জন্মের মতো ভাব থাক। আমি তার একমাত্র বন্ধু, আর কেউ নই। সে বলত—আমার দিদি রেণুদির সঙ্গে সই পাতিয়েছে। তাদের জন্মের মতো ভাব হয়ে গেল, আর কখনো আড়ি হবে না।

তারপর খুব লজ্জার সঙ্গে প্রকাশ বলত—অতনু, সই পাতাবি?

—দূর। পুরুষেরা কি সই পাতায়?

—তবে? অসহায়ভাবে প্রশ্ন করত প্রকাশ। তার বন্ধুকে বাঁধবার আর কোনও কৌশল তার মাথায় আসত না।

আমি বরাবর তার বন্ধু থাকব কিনা এ বিষয়ে সে নিশ্চিত হতে পারত না বলেই, ঘুরে ঘুরে আমার কাছে আসত। সকালবেলায় পড়তে বসেছি, হঠাৎ জানালায় প্রকাশের হাসি মুখখানি উঁকি মারত—পড়ছিস?

—হুঁ।

—পড়। এবার দেবীকে হারিয়ে ফার্স্ট হওয়া চাই।

আসলে দেবীকে হারিয়ে ফার্স্ট হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। আমি লেখাপড়ায় নিতান্তই সাধারণ, ফার্স্ট সেকেন্ডদের ধারে কাছেই নই। তবু প্রকাশ ওই কথা বলত, আমাকে খুশি করার জন্য। আমি হাসতাম।

প্রকাশ গম্ভীর হয়ে বলত—তুই খেটে পড়লে ওরা পারবে নাকি?

প্রকাশ আমার জানালার বাইরে থেকে রোজই কথা বলে যেত। কিন্তু বাড়ির ভিতরে আসত খুবই কম। সে এলে আমার দিদিরা, ভাই বোনেরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। সে লজ্জা পেত খুব।

আবার বোকার মতো সে আমার দিদিদের ফাই-ফরমাশও খেটে দিত।

সারাদিন শহরময় ঘুরে বেড়াত প্রকাশ। খালি পায়ে হাঁটত বলে পায়ের নীচে কড়া পড়েছিল, পায়ের পাতাটা পুরো ফেলতে পারত না প্রকাশ। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই সারা শহরে ঘুরত সে। কোথায় কী চুরি করত, কাকে গাল দিত, কার সঙ্গে লাগত কে জানে। একবার তার সঙ্গে বাজারের ওধারে বেল পাড়তে গেছি, ভুঁইয়াদের দশ-বারোটা ছেলে এসে প্রকাশকে ধরল—তুই শালা আমাদের খেতি থেকে শালগম উপড়ে নিয়ে গেছিস।

প্রকাশ উদাস গলায় বলল—আমি না।

আমি পালাব বলে পা বাড়িয়েছি, একটা ছেলে এসে আমার কোমর পেঁচিয়ে ধরল—এ শ্যালা ভি চোট্টা, এই গান্ধাটার সঙ্গে এটাও ঘোরে।

—মার শালাকে—

ভুঁইয়াদের মারকুটে স্বভাব আমার জানা ছিল। ভয় পেয়ে আমি হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে বলছি—আমি না। ওই প্রকাশ চোর। ও চুরি করেছে।

কিন্তু ছেলেগুলো ছাড়বে না কিছুতেই। প্রকাশকে দু'জনে ধরে রেখেছে, একজন তার পিছন থেকে বগলের নীচে দিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘাড়ের ওপর ধরে কুঁজো করে রেখেছে, অন্যজন ধরেছে চুলের মুঠি, চারপাশ থেকে আর সবাই গাল দিচ্ছে আর কিল চড় মারছে। সেই মারের দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে অবশ হয়ে গেলাম, সারা শরীরে ঘাম, তিন-চারজন আমাকে ঘিরে ধরেছে তখন। গাল দিচ্ছে। আমি বোবা হয়ে, বোকার মতো চেয়ে আছি।

মারবে! এরা আমাকে মারবে! আমি জীবনে কখনো বাড়ি কিংবা স্কুলের বাইরে এরকম হাটুরে মার খাইনি। কিন্তু তারা মারবার আগেই কী কৌশলে প্রকাশ পাঁচ সাতটা ছেলের হাত ছটকে ছাড়িয়ে এল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এসে রোগা কনুয়ের ধাক্কায় আমার চারপাশের ছেলেগুলোকে দু'হাতে হটিয়ে দিয়ে বলল—খবর্দার, ওর গায়ে হাত দিবি না, আমি চুরি করেছি তো আমার সঙ্গে লড়। বলেই সে দুই হাত আর পা চালাতে লাগল কাঁকড়ার মতো। ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। ওই অবস্থাতেই দৃশ্যটা দেখলাম আমি। পায়ের তলায় কড়া বলে একটু খোঁড়া প্রকাশ, মাথায় আ-ছাঁটা চুলের জন্য তার প্রকাণ্ড মাথাটা রোগা শরীরের ওপর ঝুল-ঝাড়ুনির মতো দেখাচ্ছে, হাতে-পায়ে ঘা, চিট ময়লা নোংরা জামা-কাপড়। তাকে দেখলে এমনিতে হাসি পায়। তবু হাস্যকর চেহারার সেই ছেলেটির তীব্র রাগ আর লড়িয়ে তেজ আমার ভিতরটায় উপর্যুপরি কয়েকটা ছ্যাঁকা দিয়ে দিল। আমি লাফিয়ে উঠলাম। মারধরের কিছুই জানি না। তবু হাতে-পায়ে-দাঁতে নখে আমি সেই দশ-বারোটা ছেলেকে এলোপাথাড়ি মারতে লাগলাম। মুহূর্ত পরেই আমার মারগুলো ফিরে আসতে লাগল। ঠোঁটে, নাকে, মাথায়, পিঠে। ঠোঁট কেটে রক্তের নোমতা স্বাদ পাচ্ছি, চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে আসছে, টানের চোটে পটাপট ছিঁড়ে যাচ্ছে মাথার চুল। তবু লড়ে যাচ্ছি। আমার দুর্বল হাত দিয়ে, পা দিয়ে যতদূর সম্ভব মারছি। ক্রমে শিথিল অবশ হয়ে আসছে সারা শরীর, ঘাম দিচ্ছে। পড়ে যাচ্ছি। সেই সময়ে বাজারের দিক থেকে লোকজন ছুটে এসে আমাদের আলাদা করল।

আমার তখন দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অসম্ভব কাঁপছে হাত-পা। রী-রী করে শরীর কাঁপছে। ঘামে ভেজা শরীরে বাতাস লাগতেই শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছি। একটা দোকানের বারান্দায় বসে মুখে চোখে জলচেপে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। পাশে প্রকাশ। সে আমার তিনগুণ মার খেয়েছে। কপালে বিরাট কালশিটে, ঠোঁট কাটা, চুল খাড়া হয়ে আছে, কনুই, হাঁটু ছড়ে গেছে। তবু হাসছে সে। অনাবিল আনন্দের হাসি। আমিও টের পাচ্ছি, আমার ভেতরে কোনও দুঃখ নেই! বড় ঝরঝরে লাগছে ভিতরটা। মার খাওয়ার ভয় এতকাল রোগ জীবাণুর মতো আমার ভিতরে ভিতরে ক্ষয় ধরাচ্ছিল। প্রকৃত মার খাওয়ার পর হঠাৎ সেরে গেছে। ফাটা, কাটা, ব্যথার শরীর জুড়ে কোথায় যেন একটা টলটলে জ্বর-সেরে যাওয়ার আনন্দ জমে উঠছে। আমি প্রকাশের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। প্রকাশ ফিস ফিস করে বলল—মার খেতে খেতে আমার হাড্ডিগুড্ডি পেকে গেছে—এখন আর লাগে না। তোর বড্ড লেগেছে—না রে?

আমি মাথা নাড়ালাম—ও কিছু না! আমারও আর লাগবে না—দেখিস।

এইভাবে আমার আর একটা জীবনের শুরু। প্রায় সময়েই আমরা মারপিট করতাম। বেশিরভাগ সময়েই মার খেতাম। তবু একটা নেশার মতো ছিল সেটা, ছিল রোমহর্ষক আনন্দ।

স্কুলে, পাড়ায় ক্রমশ মারকুটে ছেলে বলে সবাই চিনতে লাগল আমাকে। আমি আর প্রকাশ গোপনে মারপিটের নানা কৌশল আয়ত্ত করতাম! দেয়ালে ঘুষি মারা, দৌড়, নানা রকম প্যাঁচ, হঠাৎ লেঙ্গি মেরে ফেলে দেওয়া—এইসব নানা ছেলেমানুষী কায়দা-কানুন। পকেটে গুলতি থাকত, পাথর থাকত, থাকত পেনসিল-কাটা ছুরি। কার্যকালে অবশ্য কেবল হাত-পাই চলত। তাতেই আনন্দ ছিল বেশি। আদিম মানুষের হিংস্রতার যেটুকু আমাদের ভিতরে আজও আছে, দাঁতে-নখে লড়াইতেই তার সর্বাধিক তৃপ্তি।

আমার দশ-বারো বছরের জীবনে সেই প্রথম আমি আমার বাবার অসফল হীন জীবনের জন্য পৃথিবীর ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করি। কথাটা হয়তো এভাবে বলা ঠিক হল না। কারণ আমার ওই বয়সে প্রতিশোধের কথাটা অমন স্পষ্ট ভাবে আমিও বুঝতাম না। তবে নিজেদের সংসারে হীনতা, দারিদ্র্য, বছরের পর বছর কেরানি থেকে যাওয়া এবং তার জন্য আক্ষেপ, উপরন্তু সেই ফুটবল মাঠে লেমনেডের বোতলের স্বাদ, এ. টি. এস. সাহেবের ছেলের জন্মদিনে সেই স্বপ্নের বাগান থেকে নির্বাসিত—এ সব কিছুই আমার ভিতরে একটা রাগের ধোঁয়াকে পুঞ্জীভূত করে তুলত। মনে হত, আমাদের চারিদিকে যা কিছু আছে সবই আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি।

এ কথা সত্য, আমার ভিতরে সেই বয়সেই মান-অপমানের বোধ বড় প্রবল ছিল, প্রবল ছিল জেদ। এই জেদের বসেই আমি কিছু কিছু অঘটন ঘটিয়েছি। প্রকাশের সঙ্গে মিশে মারপিট করে তখন আমার বদনাম হয়ে গেছে। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় তিন বিষয়ে ফেল। রাগী মাস্টার ছোটনাগবাবু প্রায়দিনই কান মলে বেত মেরে বলে যেতেন—তোরা যদি পাস করিস তা আমার হাতের তেলোয় চুল গজাবে। কথাটা আমার হীনমান্যতায় গুলির মতো সেঁধিয়ে গিয়েছিল। জেদের বসে আমি পড়াশুনো শুরু করলাম। পড়া দেখিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। তবু এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে মাস্টারমশাইদের বাড়ি গিয়ে পড়া বুঝে আসতাম। অ্যানুয়েল পরীক্ষার তখনও মাস চারেক বাকি। প্রথম মারমিট করার উত্তেজনার মতোই এক উত্তেজনা আমাকে রাতে জাগিয়ে রাখত, ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে দিত। খুব পড়তাম। জলের মতো মুখস্থ হয়ে যেত পড়া। তবু ইচ্ছে করেই ক্লাসে পড়া বলতাম না। মাস্টারমশাইরা গাল দিতেন; মারতেন! আমি মনে মনে হাসতাম। সকেলর ওপর গোপনে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আড়ালে তৈরি হতাম। দেবীপ্রসাদ চৌবে নামে যে ছেলেটি আমাদের ক্লাসে ফার্স্ট হত, যে যথার্থ ভালো ছেলে ছিল। অ্যানুয়াল পরীক্ষায় তাকে মারতে পারলাম না বটে, কিন্তু অনেকগুলো ছেলেকে ডিঙিয়ে হয়ে গেলাম সেকেন্ড। সমস্ত স্কুলে, পাড়ায়, বাড়িতে হইচই পড়ে গিয়েছিল। ছোটনাগবাবু ভ্রূ তুলে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিলেন—টুকিসনি তো! সবচেয়ে খুশি প্রকাশ। সে নিজে সেকেন্ড হলেও এত খুশি হত না। সে তখন প্রায়ই আমাকে বলত—এবার থেকে তুই ফার্স্ট বেঞ্চে বসবি—না রে? কিন্তু বাইরে আমরা একসঙ্গে ঘুরব তো? ওদিকে আমি সেকেন্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

পরিবারে একটা প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল। বাবা প্রায়ই মাকে বলতেন—গরিবকে ভগবান দেখেন, বুঝলে? ছেলেটা দেখো, ঠিক মানুষ হবে।

আমাদের গরিবের সংসারে সেই প্রথম একটা গৌরবের ঘটনা ঘটেছিল। সেই গৌরবের স্বাদ পেয়ে আমি পরের বছরও সেকেন্ড হই। হয়ে মাইনর স্কুল ছেড়ে যাই হাই স্কুলে। প্রকাশ সে বছর পাস করতে পারল না। হাই স্কুলে আমি তখন হিমাদ্রির সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ি। অনেক নতুন বন্ধু আমার। রাস্তায় ঘাটে প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়, সে মুখ গোঁজ করে থাকে। কথা বলতে চায় না। কিন্তু আবার বাসায় আসে, জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলে। সে সবই অভিমানের কথা। বলে—তুই আমাকে ভুলে গেছিস।

প্রকাশকে সেই বয়সে তখন মাঝে মাঝে আমার ভয় হত। আমার প্রতি তীব্র এক অধিকারবোধ ছিল তার। সেটা সে কখনো ভুলতে পারত না। আমি ভালো ছেলে হয়ে গেছি, চলে গেছি অন্য স্কুলে, আমার অনেক বন্ধু—এইসব দেখেই বোধহয় তার চোখে মুখে এক তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠত। সে ডাকলে তখনও আমি তার সঙ্গে গেছি ল্যাংড়াবাগানে, খালাসিটোলায়, কুশী নদীর ধারে। কখনও-সখনও এক-আধটা মারপিটেও অংশ নিয়েছি। কিন্তু কোথায় যেন দু'জনের মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি হচ্ছিল। ব্যবধানটা বোধহয় এইখানেই যে প্রকাশ তখনও বন্ধুহীন, সঙ্গীহীন, একা। আর, আমার অনেক বন্ধু। মাঝে মাঝে দেখি, প্রকাশ আমার স্কুলের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনও কথা নেই, কেবল একটু সতৃষ্ণ চোখে দাঁড়িয়ে থাকা। আমি জিগ্যেস করলে লজ্জা পেয়ে, মাথা নেড়ে চলে যেত। কখনও বা এক-আধটা অদ্ভুত কথা বলত। তার কোনও মানে হয় না।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি, সে দাঁড়িয়ে আছে। উড়ো খুড়ো চুল, খুব বিষণ্ণ মুখ।

—কী রে প্রকাশ, কিছু বলবি?

প্রকাশ একটু অপ্রস্তুত হাসল। বলল—অতনু, মা কাল মারা গেছে।

সেই বয়সে মা ছাড়া কিছু ভাবা যায় না। আমি দুঃখ পেয়ে ওকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, ও একটু রাগের স্বরে বলল—ভালোই হয়েছে। মা আমাকে ভীষণ মারত, খুব মারত। মরে গিয়ে ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, মারত কেন?

বলতে বলতে প্রকাশের চোখে জল এসে গেল। তবু শব্দ করে কাঁদল না সে। যেন বা মায়ের ওপর কোনও প্রতিশোধ নেওয়া যায়নি বলেই আক্রোশে সে দাঁতে দাঁতে চেপে বলল—রোজ মারত আমাকে, জলখাবার কম দিত। বাবার কাছে নালিশ করত রোজ। কেন মারবে? আমার লাগে না? মরে গিয়ে ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে—কেন মারত আমাকে?

অনেকক্ষণ ধরে আমরা রাস্তায় রাস্তায় হাঁটলাম, আর প্রকাশ অনর্গল তার মায়ের ওপর সেই সব আক্রোশের কথা অসংলগ্নভাবে বলে গেল। কিন্তু বার বার তার চোখে জল

আসছিল। রাস্তায়-ঘাটে রোজ অবিরল মার খেয়ে যার হাড় পেকে গেছে সেই প্রকাশ তার কনুই তুলে আমাকে খুব অস্পষ্ট একটা দাগ দেখিয়ে বলল—এইখানে একবার পাখার ডাঁট দিয়ে মেরেছিল, জানিস? কী ভীষণ লেগেছিল আমার! আজও দাগ রয়ে গেছে, দ্যাখ। কখনও আদর করত না—কক্ষনো না।

এইসব কথা বলতে বলতে প্রায় প্রলাপ বকছিল প্রকাশ। ক্রমশ অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছিল তার কথা। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে আমি তার হাত ধরে বাসার দরজায় যখন পৌঁছে দিলাম সে তখন বলল—জানিস, বাবা মাকে বড্ড মারত। খালাসির রাগ বড় ভীষণ। আমার মনে হয়, মারের চোটেই মা মরে গেছে। তিন-চারদিন আগে ভীষণ মেরেছিল বাবা—

বলতে বলতে একটু থমকে গেল সে। একটু ভাবল। তারপর বলল—কিন্তু বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে, খুব ভালো। কেন মারত—কেন মারত আমাকে?

বলতে বলতে আবার কাঁদতে লাগল প্রকাশ।

তিন-চার মাস বাদে আবার একদিন স্কুলের রাস্তায় আমাকে ধরল প্রকাশ—অতনু।

—কী রে? সস্নেহে বলি।

প্রকাশ খুব লাজুক হাসি হেসে বলল—আমার নতুন মা এসেছে।

শুনে চুপ করে থাকি। সৎমায়েরা ভালোবাসে না, এইরকমই জানা ছিল।

প্রকাশ পায়ের আঙুলে মাটি খুঁটতে খুঁটতে মুখ নীচু করে বলল—নতুন মা খুব সুন্দর। আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

আমার বিশ্বাস হল না। মনে হল, প্রকাশ মিথ্যে কথা বলছে।

তবু প্রকাশ বলল—বাবা বলেছিল, তোর তো লেখাপড়া হবে না, সাহেবকে বলে তোকে পোর্টারের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিই। নতুন মা তাতে রাজি হয়নি। বলেছে, আমি যদি পরীক্ষায় সেকেন্ড হতে পারি তো একটা হাওয়া বন্দুক কিনে দেবে। নতুন মা আমাকে খুব ভালোবাসে।

প্রকাশ আবার লজ্জা-টজ্জা পেয়ে বলল—আমি নতুন মাকে বলেছি, এবার আমি সেকেন্ড হবোই।

আমি অবাক হয়ে বলি—সেকেন্ড কেন প্রকাশ! হলে তুই ফার্স্ট হবি। লোকে তো ফার্স্ট হতেই চেষ্টা করে, সেকেন্ড হয়ে যায়।

প্রকাশ মাথা নেড়ে বলে—না। ফার্স্ট না। ফার্স্ট হয়ে কী হবে! আমি সেকেন্ড হবো। তোর মতো।

খুব অবাক হয়েছিলাম। সেই অবাক হওয়ার ঘোর কাটতে না কাটতেই আমাদের বদলির অর্ডার এসে গেল। প্রকাশ সেকেন্ড হতে পেরেছিল কিনা, তা আর আমার জানা হয়নি। আমাদের চলে যাওয়ার আগে পুরনো বন্ধুরা সবাই দেখা করল। প্রকাশ এল না।

দু'দিন তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করলাম, সে নেই। প্রকাশের সঙ্গে দেখা হল না বলে খুব মন খারাপ লাগছিল।

বিকেলের গাড়িতে আমরা কাটিহার ছেড়ে যাচ্ছি। তখন ম্লান আলোয় চরাচর জুড়ে এক অপরূপ ছবি ফুটে উঠেছে। জানালার ধারে বসে এক পুরনো জগতের হারিয়ে-যাওয়া দেখছি। সরে যাচ্ছে চেনা প্লাটফর্ম, সাহেবপাড়ার রাস্তায় দেবদারুর সারি, ল্যাংড়া আমের বাগান। ক্রমে অচেনা এক জগতের দিকে রেলগাড়ি ঘুরে যাচ্ছে! ইটখোলার মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছি, সেইসময় হঠাৎ আমার জানালার ধারে ঠং করে জোর একটা ঢিল এসে লাগল। পলকে মাথা সরিয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলাম। তাকিয়ে দেখি, খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে ছুটছে প্রকাশ। ছুটে রেলগাড়ি থেকে, আমার কাছ থেকে দূরে—আরও দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রকাশ ওইভাবে আমাকে বিদায় জানিয়েছিল।

লিচু গাছে ছাওয়া দোমোহানী একটা ঘুমন্ত গঞ্জ। সারাদিন রাস্তায় বাতাস ধুলো ওড়ায়, লোক চলাচল দেখাই যায় না। একটা স্টেশন, একটু বাজার, রেলের অফিস, আর কোয়ার্টার—এইটুকুতেই দোমোহানী ফুরিয়ে যায়। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের ওধার থেকে ঘন বন শুরু হয়ে গেছে। সেইখানে, কাছে গৃহস্থের গোয়ালে মাঝে মাঝে হানা দেয় চিতাবাঘ। একটা নিঃঝুম ভাব ঘিরে থাকে চারধারে। পলহোয়েল সাহেবের স্কুলে তখনও ম্যাট্রিকের সিট পড়ে না।

ছুটির দিনে ডি.টি.এস. হুদা সাহেব বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোন। সঙ্গে থাকে আরও দু'চারজন বন্দুক হাতে মানুষ, কুকুর, আর্দালি। আমরা পিছু নিই। বেশি দূর যেতে হয় না। দোমোহানীর উপকণ্ঠে গাছগাছালি জুড়ে পাখিদের মেলা। হুদা সাহেব ঘুঘু মারেন, বেলেহাঁস নামিয়ে আনেন, মারেন বন-মুরগি। বন্দুক হাতে মানুষদের পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিমান বলে মনে হয় তখন।

নিজেকে লাগে তেমনি অসহায়। নিরস্ত্র। নির্জীব। একটা খেলা-বন্দুকের জন্য কত বায়না করেছি। বাবার কিনে দেওয়ার সাধ্য ছিল না। ভারতবর্ষ জুড়ে তখন যে অর্ধনগ্ন ফকির এক অস্ত্রহীন আন্দোলন গড়ে তুলছেন, বাবা আমাকে সেই গল্প বলতেন। বলতেন —ব্রিটিশের কত কামান-বন্দুক-সৈন্য, গান্ধীর তো কিছু নেই। যাদের চরিত্র আছে, তাদের অস্ত্র লাগে না।

বাবা মুখে গল্প বলতেন বটে, কিন্তু কার্যত তিনি ছিলেন রাজভক্ত। ব্রিটিশের গুণমুগ্ধ, তাঁর কাজেকর্মে তাই বিন্দুমাত্র অসহযোগ থাকত না। রেলের ইউনিয়নকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন বাঙালিদের সহিংস আন্দোলনকে। সন্ত্রাস তাঁর দু'চোখের বিষ ছিল। ব্রিটিশরা চলে যাবে—এ ছিল তাঁর কল্পনার অতীত।

আমি গুলতি তৈরি করে নিতাম, বানাতাম টিনের তলোয়ার। বাখারির ধনুক আর তীর। পশু-পক্ষীর ওপর আমার শত্রুতা ছিল না। ছেলেবেলাতেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম আমাদের শত্রু এক ধরনের মানুষ। তারা দেখতে শুনতে অনেকটা আমাদের মতোই, আবার পুরোপুরি আমাদের মতো নয়। আমার অদৃশ্য লড়াই ছিল তাদের সঙ্গে। কল্পনায়। তাই আমার তীর ছুটত না। গুলতির পাথর পকেটেই থেকে যেত।

আমার বাবা তখন স্টোরের বাবু। স্টোরের বাবুদের কিছু আয় থাকে। আমার বাবারও হয়তো ছিল। কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। ওই আয়টুকুর জন্য বাবা বড় ভয়ে ভয়ে থাকতেন। রেলের গুদামে একধরনের লোহার রিং পাওয়া যেত। সেই রিংয়ে চাকা চালানো ছিল মজার খেলা। চাকা চালানো আমাদের ছেলেবেলায় যত প্রিয় ছিল, এখন আর তত নেই। সেই রিং কতদিন বাবার কাছে চেয়েছি। বাবা ভয়ে দেননি, পাছে লোকে সন্দেহ করে। আবার হয়তো দিয়েছেন, খুব চুপেচাপে। সাবধান করে দিয়েছেন—খুব সাবধান বাবা, চালাতে হয় তো নির্জন নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে চালাবে।

বলতে গেলে এই ভীরুতাই তার উন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল। সৎ বা অসৎ—মানুষ যা-ই হোক না কেন, জোরের সঙ্গে না হলে তার কোনও মূল্য নেই। আমার বাবাকে দেখে তা আমি বুঝেছি।

অপরদিকে, ছেলেবেলায় প্রকাশের সঙ্গে মিশে আর তার সঙ্গে নানা জায়গায় মারপিট করে আমার ভীরুতা ঝরে গিয়েছিল। সাহসী ছেলে বলে আমার খ্যাতি ছিল। সেই ছেলেবেলাতেও আমার অনুকারী সঙ্গীর অভাব ছিল না। আমি ছিলাম স্কুলের মনিটর।

ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করার পর আমার পড়াশুনোর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কাছাকাছি কলেজ নেই! হোস্টেলে থাকবার সামর্থ্য নেই। বাবা দরখাস্ত করলেন, এমন জায়গায় তাঁকে বদলি করা হোক যেখানে কলেজ আছে। অনেক দরবার করলেন বাবা, সাহেবদের টাকা খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে তাঁকে শিলিগুড়িতে বদলি করা হল। জলপাইগুড়ির কলেজে আমি ভরতি হলাম।

জলপাইগুড়িতে আমি আমার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের স্বাদ পাই। তখন সদ্য দেশ ভাগ হয়েছে। পশ্চিমবাংলা, আসাম জুড়ে পিঁপড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে মানুষ। আমরা ভলান্টিয়ার হয়ে খাটি, আশ্রয়শিবিরে গিয়ে শরণার্থীদের তদারক করি। প্রায়দিনই বাসায় থাকি না। লেখাপড়া চুলোয় যাচ্ছে। নিজের বাসা, স্কুল বা কলেজের সীমাবদ্ধতা থেকে হঠাৎ এক বৃহৎ মানব পরিবারের ভিতরে গিয়ে পড়েছি তখন। মানুষকে দেখার একটা নেশা আছে, সহজে তা ছাড়া যায় না। আমার ভিতরে তখন সবসময়ে এক উত্তেজনা, একটা আক্ষেপ ফেটে বেরোতে চায়। রেল স্টেশনে একটা বউকে দেখেছিলাম যে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। অনেক সাধ্যসাধনা করে তাকে খাওয়াতে হত। তার সঙ্গীরা বলত, বউটা বাঁচবে না। গ্রামে যখন লুঠেরারা আগুন দেয় বউটার ছেলে তখন বিছানায়

ঘুমোচ্ছে। ঘরে আগুন লাগতেই বউটা ঘরে ঢুকে ছেলে কোলে নিয়ে দৌড়োতে থাকে। প্রায় মাইলখানেক দূরের রেলস্টেশনে এসে দেখে খুব অবাক হয়ে যায়—কোলে ছেলে তো নেই। ছেলের কোলবালিশটা বুকে করে নিয়ে এসেছে সে। দিশেহারা হয়ে ছেলের বদলে...। বউটি কথা বলত না, খেতে চাইত না, বিরক্ত হয়ে তার স্বামী তাকে মারত। আমরা গিয়ে লোকটাকে ধকম-টমক করলে লোকটা হাউ মাউ করে বলত—বাবু, ছেলে গেছে, এখন বউটাও যদি যায় তবে আমার থাকে কী? আপনারা ওকে একটু কাঁদান। নইলে ও বাঁচবে না।

মনে পড়ে, বীথি নামে একটি মেয়েকে দেখতাম, যে ছিল ধর্ষিতা। অল্পবয়সেই সে তাই বড় উদাসীন আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। জল-কাদার মধ্যে অতি নড়বড়ে বাঁশের ঘরে যেসব অসুবিধার জন্য উদবাস্তুরা থাকত, তার মধ্যেই সে ছিল। যখন রিলিফের জিনিস আমরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে যেতাম সে কখনও এসে হাত পাতেনি। যেন বা এ জন্মের তো তার খাওয়া পরার সাধ খুচে গেছে। একদিন সে লজ্জায় আমাকে ডেকে গোপনে জিগ্যেস করেছিল—এখানে খারাপ মেয়েছেলেরা কোথায় থাকে। আমার বয়স তখন কম, একটি যুবতি মেয়েরে এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলাম—তা দিয়ে কী হবে? মেয়েটা হেসে বলল—এদের সঙ্গে থাকা ভালো দেখায় না। আমি তো নষ্ট হয়ে গেছি, খারাপ মেয়েদের সঙ্গেই থাকা ভালো।

উদবাস্তু শিবিরগুলি ছিল সরাইখানার মতো। সেখনে কেউ দু'চার-ছ'মাসের বেশি থাকত না। পাকাপাকি আস্তানার সন্ধান পেলেই চলে যেত কাছাড়ে, উত্তর-বাংলা, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার কোথাও, কিংবা উত্তর বা পূর্ব আসামে। কিন্তু শিবিরগুলো খালি থাকত না বড় একটা। কাতার দিয়ে মানুষ আসত। সেই অল্প বয়সেই তাই আমি আকণ্ঠ মানুষের বহমান এক ধারাতে নিমজ্জিত ছিলাম। প্রাণপণ খাটতাম আমরা। কিন্তু মানুষের তুলনায় রিলিফ নেহাত অল্প পাওয়া যেত। এমনও হয়েছে, নিজেদের বাড়ি থেকে পুরনো কাপড়, চাল ডাল, পয়সা এনে দিয়েছি। কিন্তু তাতে কিছুই হত না। মানুষের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার সামনে অসহায় লাগত নিজেকে। দেখতাম, আড়াকাঠিরা মেয়ে ধরার জন্য ঘুরছে, উত্তর আসামের চা-বাগানের জন্য নিয়ে যাচ্ছে মজুর, ডোলের চাল বেশি দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে মহাজন। সোনাদানার সন্ধানে আসে লোক, ঘটিবাটির জন্য আসে চোর। আর সবার অলক্ষ্যে মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে আসে কলেরা। এ সবের মধ্যেও একধরনের লোক এসে উদবাস্তুদের জড়ো করে বক্তৃতা দিয়ে বলত—সরকার অনেক টাকা দিচ্ছে, চাল ডাল কাপড় দিচ্ছে তোমাদের। কিন্তু ভাইসব, দালাল আর আমলাদের জন্য তোমরা তা পাচ্ছো না। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তোমরা সজাগ হও, কেড়ে নাও—ইত্যাদি। এ সবের ফলে মাঝে মাঝে রিলিফ বিলি করতে গিয়ে আমরা মুশকিলে পড়ে যেতাম। উদবাস্তুরা দল বেঁধে আসত—জোচ্চোর, তোমরাই সব মেরে দিচ্ছো। আমরা পাচ্ছি না।

মাঝে মাঝে মনে হত এইবার রিলিফের কাজ ছেড়ে আবার কলেজের ক্লাসঘরে পালিয়ে যাই। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় জীবনের তিক্তস্বাদ পেতাম। কিন্তু নেশা। মানুষের নেশা বড় মারাত্মক। রিলিফের কাজে আমার তখন বেশ নাম-ডাক। কংগ্রেস নেতারা পরিদর্শনে এসে আমার খোঁজ করেন। সভা হলে আমাকেও মঞ্চে ডাকা হয়। রিলিফের রিপোর্ট তৈরি করি, টাকাপয়সার হিসেব রাখি। কেউ কেউ চোর বলে মনে করে, কেউ কেউ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যায়, খাতির রাখে। এমন কিছু খারাপ লাগে না। রিলিফের অফিস ঘরেই মাঝে মাঝে রাতে শুয়ে থাকি। বাসায় মা ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে জেগে উঠে হয়তো অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করেন—অনু, এলি নাকি! বাবা বিরক্ত হন। ভাইবোনেরা হতাশ। বাসার ভালো ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক নষ্ট বলা যায় না, তবে কি রকম যেন!

বাবা একদিন আমাকে ডেকে বললেন—অনু, মানুষের জন্য তুমি করো, এ ভালোই। কিন্তু মানুষের ওই দুঃখ-দুর্দশা যেন তোমার বা তোমার পরিবারের ভাগ্যে না ঘটে, তোমাকে বা তোমার পরিবারকে যেন পরের দয়ায় বা সাহায্যে বেঁচে থাকতে না হয়—এ তুমি নিশ্চয়ই চাও। আমি গরিব, তোমাদের ভালোভাবে মানুষ করতে পারছি না, কিন্তু যেটুকু সুযোগ আছে তা কাজে না লাগালে একদিন তোমাদেরও পরের দয়ার জন্য বসে থাকতে হবে। সে বড় ভয়ানক। আজ তুমি পরিত্রাতা হয়েছো—ভালোই, কিন্তু একদিন যখন তুমি নিজেই আর্ত হবে তখন?

আমি বাবার মুখের দিকে চেয়ে সেই পুরনো ভয় এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা দেখলাম। কী জানি কেন নিজেকে নিয়ে আমার কোনও ভয় বা ভবিষ্যৎ চিন্তা ছিল না। বাসার সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভিতরে ভিতরে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া-শোওয়ার কোনও ঠিক ছিল না। দীন-দরিদ্র ভিখিরিদের সঙ্গেই তখন আমার সারাদিন ওঠাবসা। তাদের দেখে নিজের ভবিষ্যতের ভয় আমার কখন কেটে গিয়েছিল। প্রবহমান এক মনুষ্যধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারতাম না। স্কুলবাড়ির একটা ঘরে বেঞ্চ জোড়া দিয়ে আমরা কয়েকজন ভলান্টিয়ার শুয়ে থাকতাম। ছারপোকা কামড়াত, মশার জ্বালায় ঘুম হত না। বাইরে এসে নিঝুম চরাচরের দিকে চেয়ে বসে থাকতাম। স্নিগ্ধ রাত্রিটি ঘিরে ধরত আমাকে। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অনুভব করার সেই ছিল সবচেয়ে সুন্দর সময়। বহু লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে প্রাচীন নক্ষত্রের আলো এসে স্পর্শ করত আমাকে, শীতল চাঁদের আলোয় ছিল স্বপ্নময় অবগাহন। আকাশের হিম অন্ধকারের দিকে চেয়ে এক শব্দহীন মহাসমুদ্রের অন্তহীনতাকে অনুভব করতাম। কখন আমার আমি হারিয়ে যেত। মনে হত কে আমাকে ডেকে বলছে—শোন মতি, শোন সন্ন্যাসী, পৃথিবীতে তোমার শয়ন হবে ভূমিশয্যা, তোমার গৃহের ছাদ হবে ওই আকাশ, তোমার আহার ভিক্ষালব্ধ অন্ন। তোমাকে আমি দেবো না কিছুই, তুমি চলো দেখি। এক-একদিন সেই

নিঃঝুম মহাশূন্যের মাঝখানটিতে বসে রাত গভীর হয়ে যেত। আমার মনে হত, আমার জীবন, মাটি ও আকাশের মাঝখানে যে সহজ প্রসার সেইখানে গড়ে উঠবে। সহজ মানুষের মধ্যে। আমি আর কিছুই চাই না।

আমার বাবা তাঁর গৃহকে ভালোবেসেছিলেন, গৃহস্থালি ছিল তাঁর প্রিয়, তিনি ঘরের বাইরে মানুষের প্রবাহমানতায় কখনও গা ভাসাননি। তাই তাঁর সুখ-দুঃখের পরিমাপও ছিল ছোট, সীমাবদ্ধ। আমার প্রতিজ্ঞা, আমি কিছুতেই তাঁর মতো হবো না। কী জানি কেন, ঘরের চেয়ে বাইরেটাই ক্রমে আমার প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সারাদিন কাজের অবধি ছিল না। কাজ চাইলেই কাজ এসে ঘাড়ে পড়ে। জমি দখল করে উদবাস্তু বসতি গড়ে তুলতে চলে যাই ডুয়ার্সের কোনও গর্ভে, কোথায় কোথায় যে। ডাবগ্রাম, মাটিগাড়া, বীরপাড়া, আমবাড়ি। যেখানেই যাই, চেনা মানুষেরা ছেঁকে ধরে। জঙ্গল কেটে বসত হচ্ছে মাত্র, কিন্তু চাষের জমি নেই, খাবার নেই, রুজি নেই, ব্যবসার মূলধন নেই, সমস্যা বিশাল এবং ব্যাপক। লোকেরা আমাকে উদবাস্তু শিবিরে কাজ করতে দেখেছে, তারা দেখেছে আমাকে নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে, বক্তৃতা দিতে। তাদের ধারণা আমি সরকারের লোক। কাজেই তারা রাজ্যের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আসে। সমাধান চায়। আমার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু চেষ্টা ছিল। অবিরল সেই চেষ্টা। লড়াই। কিন্তু মানুষের অসহায়তা বরাবর তার কাছে ফিরে আসে। এইসব কাজে ডুবে থাকতে থাকতেই খবর আসে, বড়দির বিয়ে হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে আমার যাওয়া হল না। জামাইবাবুকে দেখলামই না।

আলিপুরদুয়ারে তখন সদ্য এক রেলওয়ে জংশন গড়ে উঠছে। আসাম লিঙ্কের নতুন রেল-লাইনের কাজ প্রায় শেষ। কোর্টে একটা মামলার সাক্ষী হয়ে ফিরছিলাম। তখন হঠাৎ ইচ্ছে হল, রেল কলোনিটা দেখে যাই। একটা জনপদ তৈরি হচ্ছে, কত লোকের বসত হবে। দেখে যাই।

সন্ধে হয় হয়। নির্জন রেল কলোনির অনেক বাড়ি খালি পড়ে আছে, রাস্তায় চাঙর-চাঙর পাথর সাজানো হয়েছে মাত্র। যে রাস্তায় চলা যায় না, পাশের মেঠো পথ দিয়ে চলতে হয়। চারিদিকে জল-কাদা। বাজারের দিকে কিছু লোক চোখে পড়ে মাত্র, আর সব নিরালা, নিঝুম। বাজারের পাশে ছোট্ট একটা মাঠ। তখন ঝুঁঝকো আঁধার নেমে আসছে। দেখি, সেই মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটা সভা বসেছে। কুড়ি-পঁচিশজন কুলি-কামারি গোছের লোক, দু-চারজন বিড়ি-বাঁধিয়ে। কিছু পিওন-আর্দালি খালাসি বসে আছে। মঞ্চ নেই, একটা ন্যাংটো টেবিলের পাশে দুটি লোহার চেয়ার। বাঁশের উপর একটা লাল ঝান্ডা উড়ছে। একটা চেয়ারে একজন চশমা পরা লোক বসে আছে। একজন রোগা লম্বা কালো লোক খুব চেঁচিয়ে মেঠো গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে। হ্যাজাক নেই, কোনো আলো নেই, দিনের আলো মরে আসছে, সেই মরা আলোয় বক্তার মুখখানা আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। কয়েক পলক সেই হাস্যকর সভাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাস্তা ছেড়ে নেমে গেলাম

সভাস্থলীতে। শুনি, লম্বা রোগা কালো মানুষটা তার শ্রোতৃবৃন্দকে একটা সংগ্রামে নামতে আহ্বান জানাচ্ছে। তখন তার বক্তৃতার শেষ পর্যায়, খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিল সে। বুঝতে পারছিলাম, হ্যাজাক জ্বালার সংস্থান তাদের নেই। দিনের আলো ফুরোবার আগেই তাই সভা শেষ করতে হবে। সভা ঘেঁষে আমি ঘাসে বসে পড়লাম। বক্তার মুখখানা শেষবেলার আলোতে তখনও সামান্য দেখা যাচ্ছে। কুয়াশায় আবছা হয়ে গেছে স্মৃতি, তবু অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে হঠাৎ মনে হল, মুখখানা প্রকাশের। লোকটা ঘাসের ওপর থেকে একটা চোঙা তুলে নিয়ে সভাশেষে শ্লোগান দিচ্ছে তখন, বলছে—কহিয়ে আপলোক, ইনকিলাব—

সবাই বলল—জিন্দাবাদ।

সভা শেষ হল! লোকদুটো তাড়াতাড়ি টেবিল, চেয়ার, চোঙা, ঝান্ডা গোছাতে লাগল। ধরাধরি করে তুলল পাশের দর্জির দোকানে। শ্রোতৃবৃন্দ নির্বিকার বসে রইল, কেউ কেউ বিষয়কর্মে উঠে গেল, কেউ গিয়ে বসল মাঠের ধারে পেচ্ছাপ করতে।

আমি গিয়ে লোকটাকে ধরলাম—প্রকাশ না তুই?

বড় চমকে গেল লোকটা।

রেলের চাকরির এই এক সুবিধে। কোনও মানুষই হারিয়ে যায় না। ঘুরে-ফিরে দেখা হয়ে যায়। পুরনো মানুষ ফিরে আসে, পুরনো জায়গায় ফিরে যাওয়া যায়।

দেখি ঝগড়াটে, ঘেয়ো, গান্ধা প্রকাশ আর নেই। ছিপছিপে, টান চেহারার ছেলেটির মুখে-চোখে বাড়ন্ত বয়সের কাঁচা লাবণ্য। যদিও সে রোগা তবু একটা সতেজ দীপ্তি গোটা মানুষটা থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে। প্রকাশ দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরল—অতনু, তোকে আমি একটুও ভুলিনি। একটুও না।

একসঙ্গে হুড়মুড় করে সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। কাটিহারের পাড়ায় পাড়ায় আমাদের দু'জনের কীর্তি, কত মারপিট, প্রকাশের সেকেন্ড হওয়ার ইচ্ছে, এ.টি.এস. সাহেবের বাগানে সেই জন্মদিনের বিকেল, প্রকাশের অদ্ভুত বিদায় জানানো—সব একসঙ্গে ঠেলে উঠছিল বুকের ভিতরে। যন্ত্রণাময় একটা আবেগ টের পেয়ে আমি প্রকাশের দুই হাত জোরে চেপে ধরলাম। আমার হারানো পৃথিবী, আমার শৈশব ঝড়ের মতো ফিরে আসছিল। বললাম—প্রকাশ মনে পড়ে? সব মনে পড়ে?

প্রকাশ মাথা নাড়ে—সব। আমি কিছুই ভুলিনি।

—তুই এখানে কী করছিস?

—চল, বলছি।

প্রকাশ তার লোকজনদের কাছে বিদায় নিয়ে এল।

আলিপুরদুয়ার জংশনের নিঝুম রেল-কলোনিতে অন্ধকার নেমে আসছে। ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে অনেক। বালি, ইট, সুরকি আর লোহালক্কড় স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। গোধূলির

কুয়াশা ঝুলে আছে মাঠ ঘাটে। রাস্তার পাথরে, গর্তে হোঁচট খেতে খেতে দু'জনে হাঁটছি। প্রকাশ বলছে—বাবা মারা গেল। তাড়াতাড়িই মরার কথা ছিল তার। অত মদ খেলে লোকে বেশিদিন বাঁচে না। তার ওপর ওই খাটনি, খেতেও পেত না তেমন। আমার মা মরে যাওয়াতে বাবা খুব খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। নতুন মাকেও ভীষণ মারত, আমাকেও। সৎমা সম্পর্কে কত কথা শোনা যায়! কিন্তু আমার সৎমা খারাপ হওয়ার সুযোগই পায়নি। তার ছেলেপুলে হয়নি বলে আমাকে ভালোবাসত খুব। তার ওপর বাবার ওই অত্যাচার আমাদের দু'জনকে আরও এক করে তুলেছিল। বাবা আমাকে মারলে নতুন মা এসে বুক দিয়ে পড়ত, নতুন মাকে মারলে আমি গিয়ে ঠেকাতাম! অতনু, অত্যাচার এবং দুঃখকষ্ট চিরকাল মানুষকে একতাবদ্ধ করেছে—আমার ঘরে সেটা আমি নিত্য দেখতাম। তারপর যথারীতি বাবা মারা গেলে আমরা হাঁফ ছাড়লাম। তখন দেখি আমার নিম্পর, রক্তের সম্পর্কহীন নতুন মা কবে আমার আসল মা হয়ে গেছে। আমাদের দু'জনের আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। তখন আমাদের অবস্থা বড় খারাপ। বাবার প্রভিডেন্ড ফান্ডের সামান্য টাকা পেতে কী যে কষ্ট গেছে। তার ওপর রেল থেকে তখন বার বার তাগাদা দিচ্ছে কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে। আমরা মাহাতোদের বস্তিতে উঠে গেলাম, মার দু'একটা গয়না বেচে কিছুদিন চলল। তারপর মাকে নিয়ে অফিসে অফিসে ঘুরে সাহায্য চাইলাম। এমনকি স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছেও গিয়ে কতবার চেয়েছি। স্কুলের ছেলেরা চাঁদা তুলে সাহায্য করত। ক্রমে ক্রমে আমরা একেবারে সমাজের নীচু তলায় নেমে যাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমরা এইভাবে ভিখারি হয়ে যাবো। এক-একদিন মাকে লুকিয়ে পূর্নিয়ার শাটল ট্রেনে উঠে, অচেনা লোকজনের কাছে ভিক্ষে করেও এসেছি। মা ঘোমটায় মুখ ঢেকে আমাকে নিয়ে সাহেবদের বাড়ি বাড়ি যেত, বলত—আমার এই ছেলেকে চাকরি দিন, নইলে আমরা মরে যাবো। অতি কষ্টে একটা ক্লিনারের চাকরি পেলাম। কয়েক বছর পর এখন ফায়ারম্যান হয়ে এসেছি। মা আর আমি—আমরা বেঁচে গেলাম।

বলে হাসল প্রকাশ। বলল—অনু, এখনও বেঁচে আছি রে। মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। আমার ছেলেবেলাটা বড় অন্ধকার। ছেলেবেলার কথা ভাবলে এখনও শিউরি উঠি। মাতাল বাবা সন্ধেবেলা ফিরে কত কাণ্ড করত। ভাতের হাঁড়িতে পেচ্ছাপ করত, বিছানায় বমি, মাকে ভীষণ মারত! আমার মা ওই মার সইতে না পেরেই মরে যায়। বেঁচে থাকতে কত কষ্ট পেত। তার ওপর আমি ছিলাম ওইরকম—সারাদিন বাইরে বাইরে ঝগড়া করে বেড়াতাম, মারধর খেতাম, চুরি করতাম। ঘরে ফিরলে মা মারত, মারত মাতাল বাবা, খেতে পেতাম না। এখনও কী করে বেঁচে আছি—ভাবলে অবাক লাগে। নতুন মাকে নিয়ে আমার সংসার, চাকুরি করে পয়সা হাতে পাই, খাই পরি নিজের মনের মতো থাকি—এ যেন আমার জীবনই নয়। এই জীবনযাপন করতে করতে মাঝে মাঝে যখন সেইসব দিনের কথা ভাবি তখন বড় অস্থির লাগে। আমার শিশুকালটা কেন অমন অন্ধকার,

ভয়ঙ্কর ছিল? কেন শৈশবের কোনও সুখস্মৃতি আমার নেই—যা সকলের থাকে! কেন কেড়ে নেওয়া হয়েছে আমার জীবন থেকে আমার সবচেয়ে ভালো সময়টা! ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারি, এ জগতে অভাবের দুঃখ নেই। জটিল কার্যকারণসূত্রে সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের আচার-ব্যবহার, চরিত্র, মনুষ্যত্ব। এখন আমি এইসব নিয়ে খুব ভাবি। আমার ছেলেবেলা, দেশের অর্থনীতি, মানুষের ভবিষ্যৎ—এই সবকিছুর সম্পর্ক আবছাভাবে বুঝতে পারি। ভিতরে ভিতরে অস্থির হই, কখনও রাগে ফেটে পড়ি, কখনও শান্তভাবে সমাধানের উপায় ভাবি। একদিন রেলেন ইউনিয়নের সুপ্রিয় গুপ্তের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমাকে ট্রেড-ইউনিয়ন বোঝালেন, বোঝালেন মানুষের মৌলিক অধিকার, শ্রেণিচেতনা এবং শ্রেণিযুদ্ধ, দাবি আদায়, স্বার্থ-সচেনতা। আমার এলোমেলো চিন্তাগুলি সাজিয়ে দিলেন তিনি। এখন বুঝতে পারি—কেন নীচুতলার পরিবারে মানুষে মানুষে ভালোবাসার গিঁট আলগা হয়ে যায়, ভাগ্যনির্ভর মানুষ সুদিনের অপেক্ষা করতে করতে কী করে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, কী করে অদেখা শ্রেণির লড়াইয়ে উঁচুতলার মানুষ গরিবের সংগ্রাম করার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। অতনু, আমি ইউনিয়নে নেমেছি। চোঙ ফুঁকে মিটিং করি। মিটিঙে লোক হয় না! কিন্তু দেখিস, আমি এটুকু করেই ছাড়ব না, আমি মানুষের জন্য বিরাট লড়াই করব। মার খাব, মরে যাব, তবু লড়বই।

রেল-লাইন পেরিয়ে প্রকাশের বাসা। সেইখানে ছোট্ট হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে প্রকাশের নতুন মা প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে বসে আছেন। প্রকাশ বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে বলল—মা, দ্যাখো, কাকে এনেছি।

শান্তচোখে তিনি আমাকে দেখলেন। চিনতে পারলেন না। কিন্তু ছেলের মতোই আদরে নিলেন ঘরে। একখানাই ঘর, ভিতরে বারান্দা আছে, সেই বারান্দাটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে প্রকাশ তার স্টাডি বানিয়েছে। সেখানে ছোট্ট তক্তাপোশে সে শোয়। কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের ওপর রাজ্যের রাজনীতির বই, ইশতেহার, ইউনিয়নের সার্কুলারের খসড়া, প্রকাশের লেখা কিছু পাণ্ডুলিপি, ডায়েরি।

দু'দিন আমি প্রকাশের কাছে রইলাম। দুটো দিন আমার কাটল প্রকাশের রাজনৈতিক বই আর ইশতেহার পড়ে। প্রকাশের সঙ্গে পুরনো কথা যত না হল তার চেয়ে ঢের বেশি হল ট্রেড-ইউনিয়ন এবং রাজনীতির কথা। এতকাল মানুষ নিয়ে আমি যত ভেবেছি, মানুষের জন্য আমার আবেগ বা ভালোবাসা, মানুষের প্রতি আমার রাগ বা ঘৃণা, অভিমান বা উপেক্ষা—সবকিছুই ওই দু'দিনে অন্যরকম চেহারা নিয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, রাজনীতি নামে এক বিশাল রহস্যময় জগৎ আছে। প্রকাশের জীবনে একটা বিশাল পরিবর্তন এসেছে। সে আর তার নিজের পরিবারে আটকে নেই। সে ক্রমে মানুষের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে। আমার বড় লোভ হল।

দু'দিন পর যখন চলে আসব তখন খেতে বসিয়ে প্রকাশের নতুন মা বললেন—বাবা, পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্কের কেউ নেই আমার, যা কিছু আমার সব নিজের হাতে গড়ে নেওয়া সম্পর্ক। ওই যে প্রকাশ—ও আমার ছেলে—ভালোবাসাই ওকে আমার ছেলে করেছে, নইলে কেউ না। তুমি আমার প্রকাশের চেয়ে পর নও—তাই আপন বলে আমার কাছে এসো।

দেখলাম, প্রকাশ যা করে তার সব তাতেই তার মায়ের সায় আছে। বুঝলাম, প্রকাশের হবে। ওর নতুন মা ওর কমরেড। ওর বাসা, ওর সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়।

সে-বয়সটা আশা-ভরসা করার পক্ষে সুন্দর বয়স। আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথটা আমি গভীর চিন্তায় ডুবে রইলাম। মানুষের বৃহৎ পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমার ছিল না কেবল দুটি সুবিন্যস্ত, অস্তিবাচক চিন্তাশক্তি। প্রকাশ আমাকে এইটে ধরিয়ে দিয়েছে। বড় নেশার মতো লাগছিল।

ফিরে এসে শুনি, আমার বাবা প্রমোশন পেয়েছেন। শিগগিরই তিনি পাণ্ডুতে বদলি হয়ে যাবেন। বাড়িতে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

কেন জানি না, এই পারিবারিক আনন্দে আমি নির্বিকার রইলাম। আমার মন বলছিল, ছোট 'পাওয়া' মানুষকে তার বৃহৎ 'পাওয়া'র সংগ্রাম থেকে দূরে নিয়ে যায়।

বিপ্লব, লড়াই, অধিকারের জন্য সংগ্রাম, মৌলিক অধিকার, রাজনৈতিক মুক্তি, সাম্য—এইসব শব্দ সেই বয়সে কী ভীষণ মাদকতাময় ছিল! আমাদের বুকের ভিতরের বাতাস এইসব শব্দে বাঙ্ময় হয়ে উঠত। শরীর মনকে মুচড়ে বেজে উঠত বৃহৎ পৃথিবীর ডাক। মন হত, আমিই লেনিন।

সুপ্রিয় গুপ্ত আমাদের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম গুরু। কিন্তু তিনি নিজে ট্রেড-ইউনিয়নের বাইরে আসতে চাইতেন না। বাইরের রাজনীতি তোমরা কর—এই কথা বলতেন প্রায়ই। প্রকাশও ট্রেড-ইউনিয়নে আটকে ছিল। আমার সেরকম কোনও বাধা ছিল না। আমার দুটি চমৎকার গুণ ছিল। আমি যা নিজে বুঝতাম তা সহজেই অন্য সবাইকে বোঝাতে পারতাম, আর আমি সহজেই অন্যের মাথায় আশা আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। রাজনৈতিক নেতারা আমার কার্যকলাপে মনোযোগী হতে শুরু করলেন। উত্তরবাংলা এবং আসামে আমি দ্রুত সংগঠন শুরু করি। সুপ্রিয় গুপ্তর দল আমাকে তাদের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটে বাবা যে বাসা পেয়েছিলেন আমি সেখানে মাঝে মাঝে যেতাম। দুই-একদিন থেকে আবার বেরিয়ে পড়তাম। তখন আমার অল্প-স্বল্প নাম-ডাক হয়েছে, এম-পি, এম-এল-এ, মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার মেলামেশা অবাধ, বড় অফিসাররাও আমাকে একটু আধটু খাতির করে। এইসব দেখেই বোধহয় বাবা বুক বেঁধেছিলেন।

আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আর আমাকে ভর্ৎসনা করতেন না। কেবল মা আমাকে বাসায় গেলেই চেপে ধরতেন—অনু, তুই যে পার্টি করিস, এসব কিন্তু ভালো না। লোকে নানা কথা বলে।

—কী বলে?

—বলে ওসব বিয়ে করার পার্টি। যেসব ছেলেদের চাকরি হয় না, আর যেসব মেয়েদের বিয়ে হয় না তারাই নাকি পার্টি করে। একসঙ্গে ওঠে বসে, তারপর হুট-হাট নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে ফেলে। আজকাল নাকি যেসব কুচ্ছিৎ মেয়ের বিয়ে হয় না তাদের বাবারা তাদের পার্টিতে ভিড়িয়ে দেয়। পার্টি করতে করতে তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

শুনে আমি মায়ের ওপর ভীষণ রাগ করি।

কিন্তু মা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। সন্তানের স্বার্থরক্ষায় কোন মা কবে পিছ-পা হয়েছে। আমি রাগ করলে মাও শাসিয়ে বলে—যদি কোনওদিন তুমি পার্টির মেয়ে বিয়ে করে আনো, তবে আমি গলায় দড়ি দেবো—মনে রেখো।

অমি তখন মাকে খ্যাপানোর জন্য বলি—পার্টির মেয়ে খারাপ হবে কেন! আমাদের সঙ্গে অনেক মেয়ে কাজ করে, তারা বেশ সুন্দর লেখাপড়া জানা মেয়ে, কেমন বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে!

শুনে মার চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলে—ও, এইসব হচ্ছে! তাই বলি, অনু আমার এত বাউন্ডুলে হয়ে গেল কেন! দাঁড়াও, তোমার বাবাকে বলছি।

মাকে ওইরকম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রেখে আমি আবার বেরিয়ে পড়তাম।

লামডিং-এর কালি মিত্র ছিলেন আমাদের দলের একজন বড় ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট। তিনি চাকরি করতেন না, ছিলেন পার্টির হোল-টাইমার। তাঁর কাজ ছিল, প্রায়দিনই থানার মাঠে ঝান্ডা পুঁতে একটা টেবিল, একজোড়া চেয়ার পেতে চোঙা ফুঁকে বক্তৃতা করা। রেল-কর্মচারীদের স্বার্থ-সচেতন করে তুলতেন, অফিসারদের দুর্নীতির বিবিধ উদাহরণ দিতেন তথ্য সহযোগে। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন। পার্টিতে তাঁর সুনাম ছিল না। শোনা যেত, ক্লাস থ্রী এবং ক্লাস ফোর কর্মচারীদের বদলী রদ করা, সাসপেনসন অর্ডারের প্রত্যাহার, বিশেষ জায়গায় বদলি করা, ইত্যাদি কাজের জন্য তিনি টাকা খেতেন। উপরন্তু বুকিং ক্লার্ক, স্টেশন মাস্টারদের ঘুষ এবং হ্যান্ডলিং থেকে তাঁর নিয়মিত রোজগার ছিল। কিন্তু তাঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি নিপুণ গোয়েন্দার মতো রেলের দপ্তর থেকে সব গোপন তথ্য জোগাড় করতে পারতেন। এইটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। প্রতিটি কর্মচারী থেকে অফিসাররাও তাঁকে ভয় পেতেন। কালি মিত্রের কোপ কখন কার ওপর পড়ে তার ঠিক ছিল না। কিন্তু যার ওপর পড়ত তার দুর্গতি হতই। কারণ, কালি মিত্র সঠিক তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে প্রকাশ্য সভায় সব ফাঁস কতেন। হই চই পড়ে যেত। অন্তত তিনজন জেলা অফিসারকে তিনি লামডিং থেকে তাড়িয়েছিলেন। ফলে অফিসাররাও তাঁকে খাতির করতেন। পার্টিও তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করত না।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কালি মিত্র আমাদের ইউনিয়ন ছেড়ে সরকারি ইউনিয়নে যোগ দিয়েছেন। আমি রেলের ইউনিয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না। আমার কাজ ছিল চা-বাগানের শ্রমিক, চাষি, স্কুল শিক্ষক, উদবাস্তুদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করা। তবু সুপ্রিয় গুপ্ত আমাকে ডেকে বললেন, অতনু, কালিদার মতো ওয়ার্কার চলে গেলে ক্ষতি হবে। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, তিনি থাকতে চাইছেন না। তোমার আইডিয়াগুলো খুব ফ্রেশ, বলতে কইতেও জানো, তোমার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও আছে। দ্যাখো তো কালিদাকে ফেরাতে পারো কিনা! কিন্তু মনে রেখো, লোকটা ঝুনো ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট, পলিটিক্যাল থিয়োরির ধার ধারেন না। যতদূর সম্ভব নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে লোকটাকে পটাতে চেষ্টা করবে, আদর্শের কথা বেশি বলো না।

লামডিং সুন্দর টিলার শহর। রেল লাইনের পশ্চিম ধারে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। সেই মাঠে ক্রিকেট খেলা হয়, ফুটবল, বেসবল নামে, সাহেব সুবোরা একসময়ে এটাকে গলফ লিঙ্ক বানিয়েছিলেন। লেভেলক্রসিং পার হলেই দেখা যায়, একটা চওড়া সুরকির রাস্তা মাঠকে ডাইনে ফেলে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে। টিলার পর টিলা, ঝাউ আর শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্নের মতো বাংলোবাড়ি সব। সেখানে নীলাভ আলো জ্বলে, অর্গ্যান্ডির পরদা ওড়ে হাওয়ায়, অফিসার্স ক্লাব থেকে ইংরেজি বাজনা ভেসে আসে, হুল্লোড়ের শব্দ শোনা যায়। সেই রাস্তায় হাঁটলে মনে হবে এ যেন বিদেশ। এখানে যেসব সুখী মানুষ বাস করে তারা কেউ ভারতের অর্থনীতির শরিক নন, তাঁরা বিদেশি, তাঁরা অন্য পৃথিবীর মানুষ।

অন্যদিকে রেল-লাইনের পুবধারে কয়েকটা টিলার ওপর বাবুদের বাস। আরও এগোলে ক্রমে শহরটা ছোট ঘিঞ্জি আর নোংরা হয়ে এসেছে। কাঁচা ড্রেনের গন্ধ, ইট-ওঠা সরু রাস্তা, বস্তির মতো বাড়ি, মাতালের এলোমেলো পদক্ষেপ, রাস্তায় ন্যাংটা ছেলেমেয়ে। এদিকে এলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, এই শহরের অন্য দিকটাই এক অবিশ্বাস্য সুন্দর বিদেশ, যেখানে বিদেশি সুখী মানুষেরা বাস করে। প্রতিটি শহরেরই আলাদা চরিত্র থাকে।

এক ঘিঞ্জি এলাকায় একটা ছোট্ট কাঠের বাড়িতে পা দিয়ে দেখি, সামনের বারান্দায় একটা ময়লা তেলচিটে ইজিচেয়ারে একজন একা মানুষ আধশোয়া হয়ে আছে। হাড়-বের করা রুক্ষ চেহারা, গালে গর্ত, চোখে চশমা। অনেক লড়াইয়ের চিহ্ন তার শরীরে ফুটে আছে। কঠিন বাস্তব তাঁর রক্তরস নিংড়ে একটা ছিবড়ে মানুষকে ফেলে রেখে গেছে। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে দেখি লোকটা বড় অন্যমনস্ক, হাতে সিগারেট জ্বলে যাচ্ছ, লম্বা হয়ে ঝুলে আছে সিগারেটের পতনোন্মুখ ছাই। দেখি লোকটা পশ্চিমদিকের সেই স্বপ্নের সুন্দর শহরটার দিকে চেয়ে আছে যেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো আমার মনে হল, লোকটা স্বপ্ন দেখছে। ওই যে পশ্চিমের সুন্দর শহর, ওইখানে কোনওদিন তার যাওয়া হয়নি, সুখী মানুষদের একজন সে হয়নি কখনও, তার ঘরে ওড়নি অর্গ্যান্ডির পরদা। অভিশপ্ত কিছু মানুষের একজন সে হয়ে রইল চিরকাল, লড়াই করেছে অনেক—কিন্তু

স্বপ্নের শহর রয়ে গেল দূরে। যাওয়া হল না! ক্রমে বয়স বেড়ে গেল, পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যায় বিশাল হাহাকারের গহ্বরে ভরা একটা জীবন তার, মুঠো খুললে দেখা যায় প্রাপ্তি—শূন্য। তাই এই ভর সন্ধ্যায় একা নির্জন মানুষটি স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখছে, সে পশ্চিমের ওই শহরটিতে চলে যাবে।

কালি মিত্র মুখ তুলে দেখলেন। সিগারেটের ছাই খসে পড়ল। আমাকে চিনতে পেরে হাসলেন—এসো অতনু।

নির্দেশ ছিল, যেন রাজনৈতিক আদর্শের কথা না তুলি। যেন ব্যক্তিগত প্রভাব দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু তার কিছুই দরকার হল না। দলত্যাগী কালি মিত্র যেন তাঁর সব কথা কাউকে বলার জন্য তৈরিই ছিলেন। আমাকে পেয়ে বেঁচে গেলেন।

পরিপাটি কথায় যিনি ওস্তাদ সেই কালি মিত্র সেই সন্ধ্যায় খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। তাঁর কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। যেমন, প্রথমেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন—অতনু, বিয়ে করেছ?

আমি মাথা নাড়লাম।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন—তোমার আর বয়স কী! বিয়ে করার অনেক সময় পাবে। কিন্তু আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ। আমি এখনও বিয়ে করিনি। অতনু, তুমি কাউকে ভালোবাসো?

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

তিনি বললেন—আমি একজনকে ভালোবাসি। বিশ বছর ধরে বাসি। তার বয়স এখন ঊনচল্লিশ। বিশ বছর আগে সে যেমন সুন্দর দেখতে ছিল, এখন আর তেমন নেই। মোটা হয়ে গেছে, মুখে মেচেতা পড়েছে, চামড়া ঝুলে গেছে। খুব এক ঢাল চুল ছিল তার, এখন সেসব কিছুই নেই। গত বিশ বছরে আমরা আমাদের সুন্দর বয়সটা হারিয়েছি। কিন্তু আর না। অতনু, তোমার বাবা এখনও চাকরি করেন, বোধহয় কমার্শিয়াল ইনসপেকটর। না?

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি বললেন—তা হলে তোমাকে কখনও তোমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তেমন চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু সেই ষোলো সতেরো বছর বয়স থেকে আমাকে সংসার টানতে হয়েছে। কী করে টেনেছি তা ভগবান জানেন। বিড়ি বেঁধেছি, বোকাজানে গুড়ের কারবার করেছি, কাপড়ের গাঁট ফিরি করেছি। আমার পড়াশুনো বেশি না। মার্ক্স-লেনিন-গান্ধী—আমি কিছুই বুঝি না। যারা বোঝে তারা আমার চেয়ে বেশি কাজ করেনি। আমি হার্ডেনড পলিটিশিয়ান। বিশ বছর আগে ছিলাম ফার্স্ট ফায়ারম্যান। আর ক'দিন পরেই ড্রাইভার হওয়ার কথা। সেই সময়ে রেল ইঞ্জিনের বড়ো টানাটানি, মালগাড়ির বগির খুব চাহিদা। আসামের এই অঞ্চলে তখন রাস্তাঘাট হয়নি, একমাত্র রেলওয়েই ভরসা। এই চাহিদার সুযোগে মার্চেন্টদের কাছ থেকে সাহেবরা দু'হাতে পয়সা লুটত। একটা পুরো

মালগাড়ির জন্য কয়েক হাজার টাকার লেনদেন হত। সেইসময়ে আমাদের ইঞ্জিনের স্টিম ব্রেকটা গড়বড় করছিল। ইঞ্জিন 'শেড'-এ দেওয়া হয়েছে, মেরামতি তখনও হয়নি—সেই সময়ে ইয়ার্ডে একটা গাড়ির অর্ডার হয়েছে। গাড়ি তৈরি, ইঞ্জিন নেই। খবর পেয়ে সাহেবদের মাথায় হাত। তক্ষুনি সাহেবরা লোকোশেডে ফোন করে সেই ডিফেকটিভ ইঞ্জিন বের করতে বললেন। আমরা আপত্তি করলাম, সাহেব ধমক দিলেন—ওইটুকু ডিফেকট কিছুই না। আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমার চেয়ে তোমরা বেশি জানো? আমাদের উপায় ছিল না, ইঞ্জিন বের করলাম। তিনসুকিয়ার কাছে সিগন্যাল না পেয়ে গাড়ি থামাতে গিয়ে টের পেলাম স্টিম ব্রেক কাজ করছে না, ওদিকে গাড়িটাতে ভ্যাকুয়ামও দেওয়া হয়নি। গাড়ি সিগন্যাল পেরিয়ে দুটো পয়েন্ট ফাটিয়ে ডিরেল হল, পাঁচ-ছ'খানা বগি উলটে গিয়ে মালপত্র সব নষ্ট। ইনসপেকশন হল, ইঞ্জিনের গলদ ধরা পড়ল, রিপোর্ট গেল। আমরা সাসপেনশন অর্ডার পেলাম। সাহেব যে ওই ইঞ্জিন নিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য করেছিলেন তা আমরা লিখিতভাবে জানালাম। কাজ হল না। সাহেব স্বীকার করলেন না। আমরা আন্দোলন শুরু করলাম, অ্যাকসিডেন্টের জন্য চিরকাল ড্রাইভার-ফায়ারম্যান কিংবা পয়েন্টসম্যানদের চাকরি যায়, এবার থেকে অ্যাকসিডেন্টের জন্য সাহেবদেরও কৈফিয়ত তলব করা হোক। সেই আন্দোলনে কেউ গুরুত্ব দিল না। জীবনের শুরুতেই ওইরকম ঘা খেয়ে কেমন হয়ে গেলাম। একদিন রাতে সোজা চলে গেলাম সাহেবের বাংলোয়। বললাম, দেখা করতে চাই। সাহেব বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমার হাতে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ ছিল, সেইটে দিয়ে মাথায় মারলাম। অফিসার মানুষ—ভালো খায় দায়, জীবনীশক্তি বেশি, কিছু হল না। আমার জেল হল, চাকরি গেল। জেল থেকে বেরিয়ে আমি ইউনিয়ন করা শুরু করি। অতনু, আসামের এই অঞ্চলে আমি প্রায় একা রেলের ইউনিয়নকে জোরদার করে তুলি। তুমি জানো?

অমি মাথা নাড়লাম।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন—ইউনিয়ন করতাম, বিড়ি বাঁধতাম, গুড় বেচতাম, কাপড়ের গাঁট ফিরি করতাম। আমার পরিবার প্রতিপালন এবং আন্দোলন—দুই-ই এই দুই হাতে করেছি। বিশ বছর প্রতিশোধের নেশা ছিল, আন্দোলনের নেশা ছিল। বিশ বছর আমি বিয়ে করিনি, বিশ বছর একটি সুন্দর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে। অপেক্ষা করতে করতে তার যৌবন কেটে গেল, ঝরে গেল রূপ, এক ঢাল চুল পাতলা হয়ে গেল। বিশ বছর ধরে আমি কী আন্দোলন করেছি—হিসেব করতে গিয়ে দেখি—বিশ বছরে আমি কিছু স্বার্থপর লোভী লোকের বদলি আটকেছি, সাসপেনশন রদ করেছি, ঘুষ ধরেছি কিংবা আরও অনেক কিছু করেছি—কিন্তু তাতে কী হয়েছে? কিছু না, অভাবে অভাবে আমার চরিত্র নষ্ট হয়েছে, টাকা খেয়েছি, বদনাম কিনেছি। এর বেশি আর কিছু হওয়ার নেই আমার। বলেছি তো, অমি মার্কস-লেনিন-গান্ধী বুঝি না। আমি সহজ হিসেব-নিকেশ করে

দেখেছি—আমরা যা পাওয়া উচিত ছিল আমি তা পাইনি। কিন্তু অন্যেরা আমাকে ভাঙিয়ে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। অতনু, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এখন হঠাৎ আমার নিজেকে বড় বোকা-বোকা লাগছে। অতনু, সুপ্রিয়দাকে বোলো, আমার লড়াই আমি করেছি। আর আমার কিছু করার নেই। এখন জীবন থেকে আমি কিছু পেতে চাই। মরবার আগে যেন অন্তত একবার মনে হয়—জীবনটা সুন্দর ছিল।

নিমেষে আমি ছোবল তুললাম। দেখলাম ব্যক্তিগত স্বার্থের দুর্বলতম স্বপ্নে নুয়ে পড়েছে একটি শক্ত-সমর্থ লোক। কাঠ-জোয়ান, লড়াকু একটা মানুষ—মানুষের বৃহৎ লড়াই, সামগ্রিক সংগ্রাম, যৌথ স্বার্থ ভুলে পশ্চিম লামডিঙের টিলার সুন্দর শহরের স্বপ্ন দেখছে। এমন একটা মানুষ যদি এইভাবে সকলের চোখের সামনে ভেঙে পড়ে তবে বহু ছেলেই আত্মবিশ্বাস হারাবে। আমি কালি মিত্রকে বললাম—দাদা, আমিও এই কাজে নেমেছি। আমারও সুখের সংসার নয়...ইত্যাদি।

কালি মিত্র কেবল মিটিমিনিট হাসলেন, বললেন—আমি জানি অতনু, তোমার মত সৎ কর্মী পার্টিতে বেশি নেই। তুমি অনেক দূরে উঠবে। কিন্তু সকলেই এরকম ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। আমি যা করেছি একটা প্রতিশোধের জন্য তা পূর্ণ হয়েছে। এখন আমাকে ছেড়ে দাও। বিপ্লবের অর্থ প্রতি বছর পালটে যাচ্ছে, পার্টি কেবলই তার সংগ্রামের দিক পালটাচ্ছে! বড় দামাল সময় এখন। এত ওলট-পালটের মধ্যে আমি বড় বেমানান। আমি তো কবে থেমে গেছি। আমার সাধ্য নেই তোমাদের সঙ্গে চলি। কাজেই আমাকে ছুটি দাও। চাকরিতে রিটায়ারমেন্ট আছে, রিটায়ার করার পর মানুষ তার নিজস্ব জীবনযাপন করে। তেমনি আমাকে রিটায়ার করতে দাও। আমাকে ভুলে যাও।

আমি যতবার ছোবল তুলি, তিনি ততবার মিষ্টি হেসে ধুলোপড়া মন্ত্র দিয়ে দেন। তারপর একসময় হঠাৎ উঠে বললেন—চলো, আমার সঙ্গে এক জায়গায়।

বেশি দূর না। ঘিঞ্জি পাড়ার আর একটু ভিতরে একটা দরিদ্র বাড়িতে তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে। বাইরে থেকে ডাক দিলেন—বিভা বিভা—

বিভা এসে সামনে দাঁড়ালেন! ময়লা শাড়ি, দেহে গার্হস্থ্যের নির্ভুল ছাপ। এককালে সুন্দরী ছিলেন—বোঝা যায়। আমাদের ঘরে নিয়ে বসালেন। হ্যারিকেনের আলোটা উস্কে দিয়েই বিভা আমার দিকে তীব্র চোখে তাকালেন। সেই চোখে অনেক প্রশ্ন ছিল এবং সংশয় আর ভয়। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করলেন না। কালি মিত্র বললেন—পার্টির ছেলে। খুব চোখা। ওর নাম শুনেছো বোধহয়, অতনু সেন। চারটে চা-বাগানে একনাগাড়ে পনেরো দিন ধর্মঘট করিয়েছিল একা। খুব হইচই হয়েছিল।

বিভা বললেন—শুনেছি।

কালি মিত্র বললেন—ও আমাকে ফেরাতে এসেছে।

বলে হাসলেন। বিভা কথা বললেন না, কিন্তু অনেকক্ষণ সংশয়ের চোখে দেখলেন আমাকে। বুঝলাম, তিনি খুব ভয় পেয়েছেন।

কালি মিত্র বললেন—তুমি চা করে আনো, আমরা বসছি।

বিভা চলে গেলে কালি মিত্র বললেন—এটা ওর দাদার সংসার। বিশ বছর ও এই সংসারে পড়ে আছে। দাদারা সামান্য দোকানদার। সংসারে অনটন, বউদিরা ভালো ব্যবহার করে না। অনেক ভালো বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু সব ও ভেঙে দিয়েছে বলে কেউ ওকে ভালো চোখে দেখে না। আমার সঙ্গে মেশে বলে পাড়াতেও যথেষ্ট নিন্দে আছে ওর নামে। এই সংসারে ও কাপড় কাচে, বাসন মাজে, ছেলে মানুষ করে, খেতে-পরতে পায় না, আদর-ভালোবাসা নেই। বিশ বছর ধরে ও এই জীবন যাপন করছে। অতনু, এটা কতবড় স্বার্থত্যাগ তা বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল।

আমি বললাম—আপনি পার্টিতে থেকেও তো বিয়ে করতে পারেন—

কালি মিত্র হাসলেন—শুধু বিয়ের জন্য পার্টি ছাড়ছি—কে বলেছে! ওকে এতকাল ইচ্ছে করেই কষ্ট দিয়েছি। বিয়ে করবার কথা মনেই হত না। কথা উঠলে বলতাম—অপেক্ষা করো, এখন অনেক কাজ। কাজে কাজে বেলা বয়ে গেল। কত কাজ করেছি এতকাল! তারপর হঠাৎ মনে হল, পুরোটাই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকির হাত থেকে বাঁচতে হলে দুটো কাজই একসঙ্গে করব। পার্টি ছাড়ব, বিয়ে করব। রেল থেকে অনেকদিন ধরে আমাকে অফার দিয়েছে। সরকারি ইউনিয়নে গেলে আমাকে ওরা বড় চাকরি দেবে। আমি হবো ওয়েলফেয়ার অফিসার, ইচ্ছেমতো জায়গায় পোস্টিং পাবো, আমার বাংলো হবে। আমি ওদের বড় জ্বালাচ্ছি, তাই আমাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা ওদের খুব দরকার।

আমি কিছু বলার জন্য মাথা তুলেছিলাম। তুলে দেখি, কালি মিত্র ছোট চোখে আমাকে তীক্ষ্ণভাবে দেখছেন। আমি মুখ তুলতেই প্রসন্ন, শান্তি হাসি হাসলেন, বললেন—রাগ কোরো না। আমি বিস্তর মানুষ দেখেছি। একটু প্রমোশন, একটা বদলি, একটু অপরাধের মার্জনা—এ সবের জন্য মানুষ কী প্রচণ্ড ছোটাছুটি ধরাধরি করে। তোমার বাবাকে জিগ্যেস কোরো, বুড়ো বয়সে কমার্শিয়াল ইনসপেকটর হতে তাঁর কী রকম ধকল গেছে। সব মানুষই সুখে থাকার জন্য এসব করছে—আমার অপরাধ কোথায়? তাছাড়া ভেবে দেখ, অ্যাকসিডেন্ট করে অন্যায়ভাবে চাকরি না গেলে আজ আমার ফোরম্যান কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা। চাকরি না গেলে আমি পার্টিতে কিংবা ট্রেড-ইউনিয়নে আসতাম না, ফোরম্যান বা অফিসার হতাম। হলে কি কেউ আমার দোষ দেখত? তা হলে এখন ওয়েলফেয়ার অফিসার হলেই বা তোমরা আমার দোষ দেখবে কেন?

বিভা চা নিয়ে এলেন। তারপর চুপচাপ ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কালি মিত্র বললেন—বিভা, তুমি অতনুকে কিছু বলো।

বিভাগ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ আমাকে জিগ্যেস করলেন—আপনি কেন এসেছেন?

বললাম—এমনিই। দেখা করতে।

বিভা মাথা নাড়লেন—না। পার্টি থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

আমি ইতস্তত করে বললাম—না, ঠিক তা নয়।

বিভা হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে বললেন—আমি জানি। আপনি-আপনি এসেছেন ওকে—

কালি মিত্র হেসে উঠলেন। বিভা ওঁর দিকে চেয়ে ধমক দিলেন—তুমি হেসো না। তারপর আমার দিকে ফিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন—আপনি ওকে খুন করতে এসেছেন।

ভীষণ চমকে উঠে বললাম—সে কী?

কালি মিত্র হাসছিলেন। বললেন—ওর ওই এক ভয়। ও কেবলই ভাবে, দলকে বিট্রে করছি বলে আমাকে খুন করা হবে। এর আগে পার্টি থেকে যারা এসেছে তাদেরও ও এই কথা বলেছে।

কালি মিত্র একটু শ্বাস ছেড়ে বললেন—না বিভা, আমাকে কেউ খুন করবে না। এখন কেউ আর আদর্শের জন্য খুন করার রিস্ক নেয় না, স্বদেশি আমলে যেমন নিত। এখনকার রাজনীতি আলাদা। তোমার ভয় নেই, অতনু খুন করতে আসেনি।

বিভা নতমুখ হলেন। মুখ তুলে সজল চোখে বললেন—আমার এক দাদা স্বদেশি করতে করতে সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। স্বদেশিরা তাঁকে সন্দেহ করে খুন করেছিল। সেই থেকে আমার ভয়।

আমার ভিতরটা রাগে, ঘেন্নায় ফেটে যাচ্ছিল। চায়ের কাপ রেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—আমি খুন করতে আসিনি। খুন করার দরকারই বা কী? মানুষটাকে তো মরতেই দেখে গেলাম।

কালি মিত্র হাসছিলেন। অবিরল হাসছিলেন।

বেরিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। বললেন—অতনু, তোমাকে দু'একটা ইনফর্মেশন দিয়ে রাখি। আমরা সবাই ক্যারিয়ারিস্ট। একটা বয়সের পর আমরা কেউ খামোখা রাজনীতি করি না। সুপ্রিয় গুপ্ত বড় ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট। তাঁর ত্যাগও অনেক। আমি খবর রাখি, তিনি অফিস করেন না. বলে মাসের শেষে মাত্র বাইশ টাকা মাইনে পান। সার্ভিস রুল অনুযায়ী খুব শিগগিরই তাঁর চাকরি যাবে। তখন কী হবে জানো? একদিকে রেলের কর্মচারীরা চাঁদা তুলে তাঁর হয়ে মামলা লড়বে, অন্যদিকে পার্টি তাঁকে খুব ভালো কনস্টিটুয়েন্সি থেকে পার্লামেন্টারি সিটের জন্য দেবে নমিনেশন। তিনি রিটার্নড হবেন। সব ঠিক হয়ে আছে। এম-পি হওয়াটা একটা মস্ত ক্যারিয়ার অতনু, সারা

ভারতবর্ষে মাত্র শ'পাঁচেক লোক হতে পারে। সেই তুলনায় একটা সামান্য ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরি কিছুই না।

বলে তিনি হাসতে লাগলেন।

আমি জ্বলতে লাগলাম।

ছ'মাসের মধ্যেই কালি মিত্র ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে গোরক্ষপুরে চলে গেলেন। বিয়ে করেছেন, তাও শুনলাম। লামডিঙের রেলের ইউনিয়ন বেশ একটা ঘা খেল।

বছরখানেক পর। একদিন মাল জংশনে একটা চা বাগানে মিটিং করে ফিরছি! স্টেশনে প্রকাশের সঙ্গে দেখা। বিমর্ষ মুখে সে বলল—অতনু, সুপ্রিয়দার চাকরি গেছে।

অবাক হলাম না। কালি মিত্র ঝানু লোক। ঠিক খবর রাখত।

স্টেশনের স্টলে দাঁড়িয়ে দু'জনে চা খাচ্ছিলাম। প্রকাশ বলল—আমরা চাঁদা তুলছি, মামলা করব।

আমি হাসলাম, বললাম—চাকরি গেলেই বা কী! পার্টি তাকে পার্লামেন্টারি সিটে নমিনেশন দেবে।

প্রকাশ অবাক হয়ে বলল—কী করে জানলি?

—এক বছর আগে থেকেই জানি।

প্রকাশ অবিশ্বাসে বলল—যাঃ। মোটে দু'দিন আগে পার্টির মিটিঙে এরকম একটা কথা উঠেছিল। এখনও কথাটা পাকা নয়। এক বছর আগে কেউ জানতই না যে এমন হঠাৎ সুপ্রিয়দার চাকরি যাবে।

আমি বললাম—প্রকাশ, আমরা অনেক কিছুই জানি না। আমাদের জানানো হয় না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই ছক-বাঁধা হয়ে আছে এক দেড় বছর আগে। কালি মিত্র ঠিক এইটাই আমাকে বলেছিল।

প্রকাশ ঠোঁট উলটে বলল—কালি মিত্র। ও নিজেই তো আসামের অ্যাসেম্বলির সিটে নমিনেশন চেয়েছিল। জোচ্চোর লোক, ওকে নমিনেশন দিলে পার্টির বদনাম হবে বলে দেয়নি। সেই জ্বালায় আজে-বাজে বলত।

আমি হেসে বললাম—তোর কথাই হয়তো ঠিক। তবু, সুপ্রিয়দার যে চাকরি যাবে, আর পার্টি তাঁকে পার্লামেন্টে পাঠানোর চেষ্টা করবে। এটা কালি মিত্র খুব আন্দাজে বলেনি। একটা কিছু আঁচ করেছিল। আমরা যারা ফিল্ড ওয়ার্কার বা সাধারণ ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট তারা অনেক কিছুই জানি না, প্রকাশ।

প্রকাশ কথাটা মানতে চাইছিল না। কিন্তু তাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম—তোরা খামোখা মামলা করছিস কেন! যদি সুপ্রিয়দা পার্লামেন্টে যায়, তা হলে আর মামলা করে কী হবে? তোরা জিতলে সুপ্রিয়দা আবার চাকরিতে ফিরে আসবেন?

প্রকাশ মাথা নাড়ে—তা কেন? তাঁর সংগ্রামের ক্ষেত্র অনেক দূর বিস্তৃত হল। আমাদের দাবি-দাওয়া তিনি সরাসরি পার্লামেন্টে তুলতে পারবেন। তিনি ফিরবেন না, কিন্তু তাঁকে যে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে সেটা আমরা সবাইকে বুঝিয়ে দেবো।

আমি বললাম—খামোখা। সার্ভিস রুল অনুযায়ী তাঁর চাকরি গেছে। লড়ে জিতলেও তিনি ফিরবেন না। তবে কেন গরিব কর্মচারীদের টাকার অপব্যবহার করব!

শুনে প্রকাশ রেগে গেল, বলল—তুই এসব কী বলছিস? সুপ্রিয়দার জন্য আমরা লড়ব না! তিনি সারাজীবন আমাদের জন্য লড়েছেন!

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। কিন্তু বার বার দুশ্চরিত্র, দলত্যাগী কালি মিত্রর কথাটা আমার মনে পড়েছিল—একটা বয়সের পর আমরা কেউ আর খামোখা রাজনীতি করি না। আমরা সবাই ক্যারিয়ারিস্ট। সুপ্রিয়দার ব্যাপারটা এমনিতে দেখতে গেলে খুবই সাধারণ। কোন অন্যায় নেই এর মধ্যে, চুরি নেই, চরিত্রহীনতা নেই। কিন্তু আমার মন কেবলই বলছিল, বাপারটা যেন গোপনে ছক বাঁধা হয়েছিল! তবে কি পার্টি কাউকে কাউকে গোপনে লোভ দেখিয়ে জীইয়ে রাখে! প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমার চাকরি গেলে তোমাকে এম-পি বা এম-এল-এ বানাবো? যদি তাই হয় তবে আমরা সুপ্রিয়দা বা কালি মিত্রর মতো লোককে চিরকাল হারাবো। প্রকাশের চোখে হয়তো কালি মিত্রর অফিসার হওয়া আর সুপ্রিয় গুপ্তর এম-পি হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আমার কাছে আবছাভাবে দু'টিই এক কার্যকারণসূত্রে বাঁধা বলে মনে হচ্ছিল।

প্রকাশের সঙ্গে আর খুব বেশি কথা হল না। আসাম লিঙ্ক এসে পড়ল। সে চলে গেল আলিপুরদুয়ারের দিকে। আমি রাতের গাড়িতে শিলিগুড়ি রওনা হলাম। আমার ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন ছোট্ট পোকার কামড়ের মতো যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, মানুষের জন্য আমরা যেসব সংগ্রাম এতকাল ধরে করেছি—সব বৃথা যাবে। গৃহসুখ, অর্থসুখ, ভবিষ্যৎ—এই সব ভেবে যোদ্ধারা যুদ্ধ শেষ না করেই রণক্ষেত্র ছেড়ে যাচ্ছেন, মানুষের সংগ্রাম পড়ে থাকছে। বিপ্লবের পথ বেঁকে যাচ্ছে গার্হস্থ্যের দিকে। বনের সন্ন্যাসী ফিরে যাচ্ছে বনে।

সেবার সুপ্রিয় গুপ্ত বিহারের একটা বাই-ইলেকশনে জিতে পার্লামেন্টে গেলেন। প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়। দু'জন রাত জেগে গল্প করি। কত গল্প হয়। সে তার ট্রেড ইউনিয়নের কথা বলে, আমি বলি ফিল্ডওয়ার্কের কথা। বলতে বলতে কখন অলক্ষ্যে আমাদের কথাবার্তায় একটা বিষণ্ণতা আর হতাশার সুর চলে আসে। তার রাজনীতির গুরু সুপ্রিয়দা চলে যাওয়াতে একটু ভেঙে পড়েছিল প্রকাশ। আবার সামলে গেছে। এখন তার দায়িত্ব অনেক। তার পিছনে গোয়েন্দা ঘোরে, গুন্ডা পিছু নেয়, কর্তৃপক্ষ শত্রুতা দেখায় প্রকাশ্যে! তবু তার গুরুত্ব বেড়েছে অনেক। কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে বয়স আর অভিজ্ঞতা। ফলে, আশা করার, স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা গেছে কমে।

ক্রমে আমার ভিতরেও আসছে হতাশা। মনে হচ্ছে পৃথিবী জোড়া মানুষের বিপুল সমস্যার ভার আমরা কি করে ঠেলবো! প্রতি বছর বিপ্লবের অর্থ পালটে যাচ্ছে, পালটাচ্ছে সংগ্রামের স্ট্র্যাটেজি। তবু বছরের ছয়মাস অবসাদে কাটে, বাকি ছয়মাস, বুনো মোষ তাড়িয়ে ফিরি। তখনই মনে হচ্ছিল, যে বিশেষ দলটিতে আমি আছি তাতে থেকে খুব একটা লাভ নেই। এই দল সত্যিকারের বিপ্লব চায় না, চায় সমঝোতা, কিংবা মীমাংসা, কিংবা দাবি-আদায়।

প্রকাশকে বলি—প্রকাশ, ট্রেড ইউনিয়ন করে কিছু হবে না।

—কেন?

ট্রেড ইউনিয়ন কেবল লোকের অসৎ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিচ্ছে। মানুষের দাবি আদায় করে দেওয়াই কেন আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাজ হবে? দাবি আদায় বরং মানুষগুলোকে আরও নষ্ট করে দিচ্ছে, ওরা লড়াইয়ের শরিক হচ্ছে না, ইউনিয়ন বলতে ওরা বোঝে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার উপায় মাত্র। ওরা খারাপ জায়গায় বদলি হতে চায় না, বা ভালো জায়গায় পোস্টিং চায়, অন্যায় করে শাস্তি এড়াতে চায়, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ চায়—এইসব বিচিত্র চাওয়াকে পূরণ করে গেলে কিন্তু মানুষগুলো কেবলই পিছলে যাবে। ওদের মূল স্বভাব পালটাবে না। ওরা কাজ কম করবে, ফাঁকি দেবে, চুরি করবে, নিজেরটা গুছিয়ে নেবে, কখনোই বৃহত্তর স্বার্থের লড়াইতে নামবে না। এইসব লোভী, নীচ, স্বার্থপর মানুষদের শুদ্ধ করবে কে?

প্রকাশ গম্ভীরভাবে বলে—অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে ওরাও পালটাবে।

আমি বলি—দূর। তা হলে অফিসারেরা চুরি করত না, মন্ত্রীরা সৎ হত, ক্যাপিট্যালিস্টরা আয়কর ফাঁকি দিত না। অভাব নষ্ট করলে স্বভাব যায় না। তুইও জানিস।

প্রকাশ ভাবে। কথা বলে না। হয়তো দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সেও বুঝতে পারছিল বাইরে থেকে মানুষের অবস্থা পালটে দিয়ে কোনও লাভ নেই। মানুষের ভিতরে পচন। সেই পচন নালি ঘায়ের মতো সমাজের শরীরে ফুটে উঠছে। আমার মন বলত, দল নয় মানুষ, মানুষই মূল কথা। মানুষের জন্য হাজারবার দল পালটানো যায়, হাজারবার দল গড়া যায়। কিন্তু কথাটা যেন মনে থাকে—মানুষের জন্য, মানুষের জন্য, মানুষের জন্য।

এইসব কথা আমি কিছু কিছু প্রকাশ্যেও বলতাম। দলের কাজের প্রকাশ্য প্রতিবাদও করি কয়েকবার। কর্মী হিসেবে আমার নাম ডাক ছিল। ডুয়ার্সকে আমি চিনতাম আমার হাতের নখের মতো। আমার অনুগত ছিল দলের সবচেয়ে ভালো কর্মীরা। কাজেই আমার সমালোচনা পার্টি মুখ বুজে সয়ে গেল। আর সাধারণ নির্বাচনে আমাকে বিধানসভায় দিল নমিনেশন।

পুরোনো কায়দা। অবাধ্য কর্মীকে বশে রাখার চেষ্টা। যে কনস্টিটুয়েন্সি আমাকে দেওয়া হল তা ছিল নিশ্চিত হারের জায়গা। আমার প্রতিপক্ষ একজন উপমন্ত্রী। সেই

কনস্টিটুয়েন্সিতে কেউ আমাকে তেমন চেনেই না।

তবু লড়াইটা আমি লড়েছিলাম খুব। পার্টি আমাকে যে চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেটা লুফে নিয়ে আমি নির্বাচনে প্রচণ্ড খাটি। আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশ এসে আমার পাশে দাঁড়াল। বহু জায়গায় আমাদের সভায় ইটপাটকেল পড়েছিল, ভাড়াটে গুন্ডা করেছিল তাড়া। প্রকাশ আমাকে বলল—পার্টি তোকে এ কী কনস্টিটুয়েন্সি দিয়েছে! এখানে জেতার কোনও আশা নেই। তোর মতো কর্মীকে অনেক ভালো জায়গা দেওয়া যেত। তুই কেন রিফিউজ করিসনি!

আমি ম্লান হেসে বললাম—প্রকাশ, ছেলেবেলায় তুই আর আমি যখন মারপিট করতাম তখনকার কথা মনে আছে? তখন আমরা লোক বেছে মারপিট করিনি। যার সঙ্গে লাগত লড়ে যেতাম। কত মার খেয়েছি, পিছিয়ে যাইনি। আমি সে লড়াই আজও ভুলিনি।

শুনে প্রকাশ গুম হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল—ঠিক আছে। আমিও ভুলিনি। অতনু, আমি চিরকাল তোর রইলাম! আমি আছি, মনে রাখিস।

নির্বাচনে আমি হাজার দুয়েক ভোটে হেরে গেলাম। কিন্তু খাটুনীর এত ধকল গেল যে নির্বাচনের পরদিনই আমার একশো চার ডিগ্রি জ্বর উঠে গেল। জ্বর আর নামে না। খবর পেয়ে বাবা আর মা এসে আমাকে পাণ্ডুতে নিয়ে যান।

মাসখানেক টাইফয়েডে ভুগে উঠলাম। তখনো ভালো চলতে পারি না। চিন্তাশক্তি যেন কমে গেছে। বারান্দায় মা ইজিচেয়ার পেতে দেন। একটা বই হাতে সারাদিন সেখানে বসে থাকি। সামনে পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটে গাদাবোট নোঙর ফেলে দাঁড়ায়, মালগাড়ি লোড হয়। আর তার পিছনে বিপুল গৈরিক জলরাশি নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নিরন্তর বয়ে যায়। ওপারে আমিনগাঁওয়ের টিলাগুলো দেখা যায়, দূরে নীলাভ ধূসর পাহাড়। ডাইনে নীল পর্বতে কামাখ্যার মন্দির, নদীর ওপর ওঁ বাবার আশ্রম। নির্জন চারদিকে সবকিছু সারাদিন স্থির থাকে। শুধু অবিরল নদী চলে। তার নিরন্তর চলা সারাদিন দেখি, তবু দেখা ফুরোয় না। একটা জীবন আমি এরকম অবসর ভোগ করিনি। বসে থেকে থেকে চিন্তারাশি মাথায় মেঘ করে আসে। মনে হয়, রাজনীতি না করলেও পারতাম। মানুষের প্রতি আমার স্বাভাবিক ভালোবাসা ছিল—সেটাই ছিল ভালো। মানুষের মুক্তির সংগ্রাম করতে গিয়ে আমি এক সংকীর্ণ অন্ধ রাস্তায় চলে এসেছি। ওই নদীর মতোই আমি একদিন বহমান ছিলাম, আজ আর নেই। নিজেকে স্থবিরের মতো লাগে। নদীর বয়ে যাওয়ার দিকে তাই মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি। ফেরি স্টিমারের ভোঁ বাজে, ইঞ্জিন শিস দেয়, চমকে উঠি—মনে পড়ে—বয়স হল। ঢের বয়স হয়ে গেল। কতমুখ ভিড় করে আসে মনে। অসহায় দুঃখী মুখ সব। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে—বেশ্যা হতে চেয়েছিল। একটি বউয়ের মুখ মনে পড়ে—লুঠেরাদের তাড়া খেয়ে যে আগুনের ঘর থেকে ছেলে কোলে নিয়ে এক মাইল দৌড়ে গিয়ে দেখেছিল—তার কোলে ছেলের বদলে ছেলের পাশবালিশ। একটা দুঃখী মেয়ে

কবে যেন একটা ভাঙা পুতুলের একটি হাত মাত্র কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার অন্য খেলনা ছিল না বলে সারাদিন সেই হাতখানা রাখত বুকে করে। এরকম মুখ আসে যায়। মনে হয়, মানুষের বৃহৎ সমাজে বিচিত্র ধারাকে রাজনীতি খুব সামান্যই দিতে পারে। নদীর দিকে চেয়ে থাকি, মনে মনে পথ হাতড়াই। মানুষ দেখে আমার এই বিশ্বাস স্থির হয়েছে যে, মানুষের ভিতরে অনন্ত শক্তির আকর হয়েছে। তাকে গতি দিলে, তাকে শক্তি দিলে সে অনায়াসে নিজের দুই কূলের সীমা উপচে প্লাবিত হতে পারে। মানুষ দুঃসহতম ক্লেশ অক্লেশে করতে পারে বহন। রাজনীতি সেই শক্তিকে উপেক্ষা করে কেবলই তার জন্য দাবি-আদায় করার চেষ্টা করছে, খুশি রাখার চেষ্টা করছে তাকে। মরে যাচ্ছে তার ভিতরকার শক্তি। সে আর্ত হয়ে পড়ে থাকছে চিরকাল, অথচ তার ভিতরে ছিল মানুষকে ত্রাণ করার অমোঘ ক্ষমতা।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙলে আবার চেয়ে থাকি। আবার ঘুমোই। সারাটা দিন কেটে যায়। ধর্ম-বিষয়ে লেনিনের গ্রন্থখানা অপঠিত থেকে যায়, কিংবা কোন দিন আমার কোলের ওপর খোলা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বইখানার পাতাগুলি হাওয়ায় উলটে যায় কেবল। বই ভালো লাগে না। বরং ইচ্ছে করে তীর্থযাত্রীর মতো বেড়িয়ে পড়ি মানুষের মেলায়। সে মেলায় বড় ধুম। সে মেলায় একশো মজা।

সামনের রাস্তাটা দিয়ে একটা মেয়ে মাঝে মাঝে হেঁটে যায়। বড় কমনীয় তার মুখশ্রী। গায়ের রং শ্যামলা। ছিপছিপে শরীর। সদ্য কৈশোর পার হয়ে সে শাড়ি ধরেছে। যেতে যেতে কখনো বা একপলক আমাকে দেখে যায়। রোগা এক পুরুষ সারাদিন শুয়ে শুয়ে কী করে—তাই দেখে বোধহয়। তার চোখে সরল কৌতূহল লক্ষ করি। মাঝে মাঝে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে যায়, মাঝে মাঝে একা একা। তাকে রোজ লক্ষ করি। ক্রমে লক্ষ করতে ভালো লাগে। আমার দীর্ঘ অবসর সহজে কাটতে চায় না। মাথা অলস লাগে। সেই আলস্যের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটি ক্রমে আমার শূন্য মাথায় বাসা নেয়। বড় সুন্দর তো মেয়েটা!

অল্প অল্প করে হাঁটাহাঁটি শুরু করি। প্রথমে বাগানের গেট পর্যন্ত। কিছুদিন সামনের রাস্তায়। এ অঞ্চলটা খুব নির্জন। কয়েকটা বাংলো বাড়ির পরই নদীর ঢাল, শান্টিং লাইন। হাঁটতে হাঁটতে পাড়ার শেষ সীমা পর্যন্ত চলে যাই। দেখি, শেষ বাড়িটার লনে বিকেলবেলা নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছে কারা। খেলা দেখতে এগিয়ে গিয়ে বাগানের বেড়া ঘেঁথে দাঁড়াই। দেখি, সেই মেয়েটা, তার ভাই, আরও দু'টি ওই বয়সের মেয়ে নিতান্ত অপটু হাতে খেলছে। আমাকে দেখে তারা লজ্জা পায়। র‍্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি সরে আসি! অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধার পর্যন্ত চলে যাই। জলে পা দিয়ে দাঁড়াই। বড় অন্যমনস্ক লাগে, চিন্তাগুলি এলোমেলো হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের শব্দ হঠাৎ পালটা যাচ্ছে। শুনতে পাই।

মায়ের কেবল এক কথা। বিয়ে কর। আগে কথাটা শুনলে বড় রেগে যেতাম। আজকাল রাগি না। কিন্তু বড় অসহায় লাগে। তাই মাকে ঝেঁঝে উঠে বলি—যাও তো মা, আমাকে একা থাকতে দাও।

মা কাকুতি মিনতি করে। বলে—এখন বয়সের জোরে ওইসব বলিস। কিন্তু বয়স হবে তখন তোকে দেখবে কে? যে নিজেকে নিয়ে ভাবে না, তার জন্য ভাবনা করার একজন লোক চাই।

আমি চুপ করে থাকি। মা অনর্গল বকে যায়।

এক একদিন মা চুপি চুপি বলে—যদি পার্টির কোনও মেয়েকে তোর পছন্দ তো বল স্বজাত স্বঘর হলে আমার আপত্তি নেই।

বিরক্ত হয়ে বলি—বিয়ে করে আমি খাওয়াবো কী?

অমনি শুনি বাবা ভেতরের ঘর থেকে গম্ভীর গলায় বলেন—যে দেশশুদ্ধ লোকের খাওয়া পরার ভার নিয়েছে তার নিজের বউকে খাওয়াবার প্রব্লেম থাকা উচিত নয়।

শরীরটা সারলে কিছুদিনের জন্য আবার বেরিয়ে পড়ি। আসাম আর উত্তর বাংলার মাঠ-ঘাট জঙ্গল ভেঙে কিছুদিন পর আবার ফিরে আসি।

এসে দেখি সেই মেয়েটা আমার বোনের বন্ধু হয়ে গেছে। দু'জনে দুপুরবেলা একসাথে উল বোনে, সন্ধেবেলা হারমোনিয়াম বাজিয়ে একে অন্যের কাছ থেকে গান তুলে নেয়। দেখা হলে মেয়েটি হরিণীর মতো ভীতু চোখে আমার দিকে তাকায়। মেয়েটা সম্ভবত শুনেছে, অমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অল্প ভোটে হেরে গেছি, আমি পার্টির একজন স্তম্ভ, আমি নেতা। আর কিছু না থাক এইসব গ্ল্যামার তো আমার আছেই। মেয়েটি তাই ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকায়।

আমার চিন্তার রাজ্য খুবই ব্যাপক। সেখানে একটি মেয়ের স্থান কতটুকুই বা! হাজার মুখের ছবির মধ্যে হাজার সমস্যার চিন্তার মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তবু হারায় না।

পাঁচ নম্বর ফেরি ঘাট জায়গাটা বোধহয় ভালো না। এই জায়গা মানুষের মনকে নরম করে ফেলে। চারিদিকে আকাশ আর নীলাভ পাহাড়ের মায়া, রেলের মন্থর শান্টিঙের শব্দ, স্টিমারের বিষণ্ণ ভোঁ আর সব কিছুর ভিতর দিয়ে অবিরল জলের শব্দ তুলে ব্রহ্মপুত্রের বয়ে যাওয়া—এইসবের ভিতর কী যেন রয়েছে। মন এলিয়ে পড়ে। দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। অবসর ভোগ করতে বাসনা জাগে। ভাবতে ভালো লাগে একটি কমনীয় মুখশ্রীকে।

সেবার বাড়িতে আসতে একদিন মা মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন—ওই মেয়েটা, ওর নাম দুলু। ওকে আমার বড় পছন্দ। স্কুল ফাইনাল পাস করে এবার কলেজে পড়ছে—

না শোনার ভান করেই উঠে যাই। তবু বুকের মধ্যে একটা চমক খিচ ব্যথার মতো চেপে ধরে থাকে। আবার পালাই। চা বাগানের শ্রমিক, উত্তর বাংলার চাষিদের নিয়ে মেতে থাকি, মিটিং করি, রাত জেগে বই পড়ি, ডুয়ার্সের মাঠ-জঙ্গল ভেঙে অবিরল ঘুরতে থাকি। রোদে জলে পোড় খেয়ে শরীরটা রুক্ষ কঠিন হয়ে আসে। কিন্তু যখনই একটু অবসর পাই, যখনই কর্মহীন একটু সময় যাপন করি, তখনই পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটের মায়াবী প্রকৃতি মনে পড়ে, মনে পড়ে শান্টিঙের শব্দ, স্টিমারের ভোঁ, নদীর বয়ে চলা। শুনতে পাই, আমার হৃৎপিণ্ডটা শব্দ আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছে।

এই সময়ে একদিন প্রকাশ এসে আমাকে ধরল—অতনু, মা কিছুতেই ছাড়ছে না। তুই মাকে একটু বুঝিয়ে বল, আমি কিছুতেই এখন বিয়ে করতে পারব না।

আমি বললাম—কেন?

প্রকাশ গম্ভীর হয়ে বলে—বিয়ে করা আমার ঠিক হবে না অতনু। নতুন মা আমার সৎমা তা আমি ভুলেই গেছি। অনেক দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে, অনেক মারধর খেয়ে আমরা দু'জন—মা আর ছেলে হয়েছি। আমার আর বেশি কিছু চাওয়ার নেই। অন্যের মেয়ে এসেই আমাদের সম্পর্কের ভিতর ফাটলটা খুঁজে বের করবে। সে আমাকে দখল করতে চাইবে মা'র কাছ থেকে। এইভাবে আমার মা আস্তে আস্তে সৎমা হয়ে যাবে। না অতনু, যতদিন মা আছে ততদিন বিয়েতে আমার কাজ নেই।

শুনে ভারি অবাক হলাম। আমি ভেবেছিলাম, প্রকাশ বিয়েতে আপত্তি করবে অন্য কারণে। সে বলবে রাজনীতিই তার প্রতিক্ষণের শ্বাসপ্রশ্বাস, ট্রেড-ইউনিয়ন করে বলে তার উন্নতি বন্ধ, তাছাড়া সে হয়তো পার্টির হোলটাইমার হয়ে একদিন বৃহত্তর রাজনীতিতে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তাই বাঁধা পড়তে চায় না। তার বদলে প্রকাশ এ কী বলছে! আমার নিজের মাকে, কই এত ভালোবাসতে পারিনি তো!

কিন্তু প্রকাশের বিয়ে ঠেকানো গেল না। মাসিমা জেদি বাচ্চামেয়ের মতো মুখের ভাব করে বললেন—আমি মরে গেলে প্রকাশের আর কেউ থাকবে না। পরের মেয়ে ওর বউ হয়ে আসবে বলে ও ভয় পায়। কিন্তু একজন পরের মেয়ে যে ওর মা হয়ে এসেছে তার বেলা?

খুব সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে প্রকাশের বিয়ে হয়ে গেল। সে বিয়েতে প্রকাশ দানসামগ্রী প্রায় কিছুই নিল না। না ঘড়ি-আংটি-বোতাম না খাটপালঙ্ক। নিজের খরচে দীনভাবে বউ-ভাত সারল। বরকর্তা হয়ে আমি খুব ছুটোছুটি করলাম। নেমন্তন্ন মিটতে খুবই রাত হয়ে গেল। তারপর একা আমি সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে সামনের মাঠটায় গিয়ে বসলাম। অমনি মহাশূন্যের একটি নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ আমার চারধারে নেমে এল। তখন আমার ভরা যৌবন। টলটল ছলছল এক নদীর মতো আমার কুল ছাপিয়ে যাচ্ছে

বানের জল। বড় একা লাগল। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো বসে বসে শুনতে লাগলাম আমার অবাধ হৃৎপিণ্ডের শব্দ পালটে যাচ্ছে।

পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটে আমাদের বাসায় যাওয়া হয়নি বহুকাল। মা চিঠি লিখছে বারবার, লোক পাঠাচ্ছে, মাঝে আঝে টিফিন ক্যারিয়ারে চেনা গার্ড সাহেবের সঙ্গে পিঠেপায়েস তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়! আমার যাওয়া হয় না। ইচ্ছে করেই যাই না। বুকে একটা খিচ ধরে মাঝে মাঝে। সব চেপেচুপে দাঁত টিপে নিজেকে সামলাই। কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়ি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেছিলাম। তারপর থেকেই ইচ্ছে ছিল, আইন পড়ব। উত্তর বাংলার কৃষি-আইন নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাতে হয়, জানতে হয় লেবার রেগুলেশনস। ইচ্ছে ছিল, কলকাতায় গিয়ে পড়ব। সেটা হয়ে ওঠেনি। কয়েকটা ভূমি-সংক্রান্ত আইনের বই জোগাড় ছিল। সেগুলো দিনরাত পড়তাম, যেন কালই আমার পরীক্ষা। বস্তুত কিছুই পড়া হত না। একা লাগত। একা একা দম বন্ধ হয়ে আসত মাঝে মাঝে। বারবার ঘর ছেড়ে মাঠে-ঘাটে বেরিয়ে পড়তাম। চিরকাল বাইরের টান আমার। মাঠ-ঘাট-জঙ্গলেই ভালো থাকতাম বেশি।

সেবার শীতকালে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বীরপাড়ার কাছে এক ধানকলের মাঠে কৃষকদের সভা ছিল। যখন বীরপাড়ায় বাস থেকে নামলাম তখন শীতের বেলা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। মাঠ-ঘাট থেকে দ্রুত রোদের চাদর গুটিয়ে নিচ্ছে আকাশ। বীরপাড়া থেকে মাইলখানেক দূরে সেই ধানকল। বাসস্ট্যান্ডের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে, মেঠো পথে নেমে পড়লাম। চারদিকে খেত। খেতে ধানের গোড়া পড়ে আছে, শুকনো খড়ের গন্ধ। রবিশস্যের চাষ দিয়েছে কেউ কেউ। গাঢ় সবুজ হয়ে আছে খেত। মাঠ থেকে ভাপ উঠে আসছে, কুয়াশা জমছে। নীচু মেঘের মতো ধোঁয়া জমে আছে এখনে সেখানে। চারদিকে অপার্থিব নির্জনতা। একা একা হেঁটে যেতে বড় ভালো লাগছিল। রাঙামাটির রাস্তা। গরুর খুরের ধুলো তখনও উড়ছে। কিন্তু কী এক কার্যকারণসূত্রে কোথাও কোনও লোক নেই, গরুবাছুর নেই, রাস্তায় নেই শিশুরা। শুধু মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে গাছে গাছে তীব্র হুলুধ্বনির মতো তাদের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চরাচরে কুয়াশার মেঘ, গাছাগাছালিতে ঘনায়মান অন্ধকার, আর মাটির গন্ধ, শুকনো খড়ের গন্ধ। দূরে কোথাও পাতা জ্বেলে আগুন করেছে কেউ—সেই ঝাঁঝালো গন্ধ। অন্যমনে আমি হাঁটছিলাম।

সামনেই একটা ঘন ঝোপ, ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা মোড় নিয়েছে। পড়ন্ত বেলায় সেই ঝোপটা তার দীর্ঘ ও গাঢ় ছায়া ফেলেছে রাস্তার ওপর। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ সেই গাঢ় ছায়াময় জায়গাটিতে পা দিতেই ধুলো থেকে ধুলোটে রঙের একটা সাপ পলকে ফণা তুলে দাঁড়াল। এত কাছে যে হয়তো বা তার ছায়া আমার গায়ে পড়েছিল, তার শ্বাস স্পর্শ করেছিল আমার শরীর। দু'টি পুঁতির দানার মতো চোখ আমার ওপর স্থির, তার

শরীরে একটা মৃদুমন্দ দোল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার শরীরে বর্ম নেই, হাতে নেই অস্ত্র। উদোম আকাশের নীচে, খোলা জায়গায় তার আর আমার মধ্যে একটুমাত্র শূন্যতার ব্যবধান।

ডুয়ার্সের মাঠে-জঙ্গলে সাপ আমি অনেক দেখছি। কিন্তু এমন মুখোমুখি উদ্যতফণা প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো কখনও দেখা হয়নি। তখন আমার চারপাশে ঘনায়মান পড়ন্ত বেলার কুয়াশা, ফসল-কেটে-নেওয়া মাঠ, কুয়াশার মেঘ ঝুলে আছে এখানে ওখানে। এক নির্জনতার ছায়াচ্ছন্ন কোণে সকলের অগোচরে সে আর আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, পিছু ফেরার উপায় নেই, চোখ সরাতে পারছি না। অপলক চোখে তার দুই চোখে চেয়ে আছি। কেবল চারপাশে পাখিরা চিৎকার করছে, ঝোপে-ঝাড়ে মাঠে তাদের ঝগড়ার শব্দ, আমাদের চারপাশে কেবল পাখির ডানার আওয়াজ। একটু আগেই এই রাস্তা দিয়ে মানুষ হেঁটে গেছে, ফিরেছে গরুর পাল, রাখাল ফিরেছে, হাটুরেরা গেছে দল বেঁধে। তখন সাপটা কোথায় ছিল যে জানে! কে জানে, কী করে আমাদের এরকম দেখা হয়ে গেল। নইলে আমি আর সে—আমরা দু'জন দুই আলাদা পৃথিবীর বাসিন্দা। কোথায় ছিলাম আমি! কত দূরে। ডুয়ার্সের চাষিদের সাথে, আমাদের জঙ্গলে, চা বাগানে। কত মিছিল মিটিং, আন্দোলন, ধর্মঘট শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে পথ হাঁটা। বহুদূরে বিস্তৃত এক কর্মক্ষেত্র জুড়ে ছিল আমার ছড়িয়ে থাকা। আর সে তখন ঘাস ও তৃণভূমি ছেড়ে জলায়, কখনও ফসলশূন্য খেত পার হয়ে নাবালে তার সুন্দর পিছল শরীর গুটিয়ে ঘুমিয়েছে গাছে›› ছায়ায়, ইঁদুরের সন্ধানে সতর্ক চোখে ফসলের খেতের ভিতরে গর্ত খুঁজে ফিরেছে, লাফ দেওয়া ব্যাঙকে শূন্য থেকে মুখে লুফে নিয়েছে। তার একরকমের জীবন, আমার অন্যরকমের। কোথাও আমাদের দেখা হওয়ার কথা ছিল না। এই তো একটু আগে বাস থেকে নেমে কত নিশ্চিন্তে চায়ের দোকানে বসে এই শীতে আরামে এক কাপ গরম চা খেয়েছি। তার স্বাদ এখনও জিভ আর ঠোঁটে জড়িয়ে আছে। তখন এই পথে হাটুরেরা হেঁটে গেছে, গেছে রাখাল, চাষি, গ্রামের শিশুরা ফিরেছে দূরের ইস্কুল থেকে। তখন কোথায় ছিল সে! এই গভীর শীতের শেষ বেলায় সে হয়তো তার গর্তের উষ্ণ আরামে শুয়ে ছিল। তবে কে আনল তাকে এই পথের ওপর। এই ঝোপের ছায়ায়, ধুলোয় সে কেন অপেক্ষা করেছিল? আমারই জন্য কি?

আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়েছে। কপালে ঘাম ফুটছে চিন চিন। হাত-পা খিল শক্ত হয়ে আছে। বুঝতে পারি, একটা জীবন মানুষের জন্য আমার সব সংগ্রাম বৃথা গেছে। বৃথা হয়ে গেছে যৌবনের কূলে কূলে পরিপূর্ণ ঢল। বৃথা জন্ম, বৃথা ভালোবাসা। হঠাৎ নেমে এল শূন্য মুহূর্ত। মূল্যবান—মহামূল্যবান কয়েকটি ক্ষণ মাত্র আছে আর—তাও বয়ে যাচ্ছে। এত সহজে মানুষ মরে যায়? এমন অগোচরে, অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে? প্রতিবাদহীন এ আমার কেমন মৃত্যু হচ্ছে? এই গভীর শীতে কোথা থেকে এল সাপটা! কেনই বা?

মাথা থেকে সমস্ত স্মৃতি মুছে যায়, মুছে যায় স্বপ্ন। ভাষা ভুলে যাই, প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে না। শুধু সবিস্ময়ে দেখি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটুমাত্র শূন্যতার ব্যবধান। আলো আঁধারময় সেই শূন্যতাটুকুই মাত্র আমার জীবন। অতি তুচ্ছ তা, মূল্যহীন। সতেজ সাপটি তার বুকের সাদাটুকু তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পথ বন্ধ, সমস্ত সঞ্চিত বিষ সে তুলে আনছে মুখে, শিকড়ের মতো তার জিভ লোভী অগ্রহে চেটে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে তার ও আমার মাঝখানের শূন্যতাটুকুকে। সে দুলছে, সে আসছে।

আমার শরীর হাহাকার করে ওঠে। কত রহস্য অজানা রয়ে গেল পৃথিবীতে, জীবন ও মৃত্যুর অর্থ বোঝা গেল না, পথের মাঝখানেই ফুরিয়ে গেল পথ। কেন জন্মেছিলেন, কেনই বা মরে যাচ্ছি?

সাপটা দুলছে। শূন্যতাটুকু পার হয়ে আসছে সে।

হঠাৎ টের পাই, আমার জিভ নড়ছে, আমার ঠোঁট নড়ছে। চারদিকে শীতার্ত নির্জনতা। তার ভিতর হঠাৎ শুনতে পাই অন্য মানুষের অচেনা কণ্ঠস্বর। কে যেন বলছে—দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো...

আস্তে আস্তে বুঝতে পারি, এ আমারই গলা। আমার দুই হাত বুকের ওপর জড়ো হয়েছে কখন। জলে ভেসে যাচ্ছে আমার চোখ, গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা খসে যাচ্ছে পথের ধুলোয়। জলে আবছা চোখে অদ্ভুত দেখাচ্ছে চরাচর। আস্তে আস্তে আমি ধুলোয় পথের ওপর হাঁটু ভেঙে বসি। আমার কপালের সমান্তরাল সেই সাপটার সাদা বুক, তার ফণা, তার মিটমিটে চোখ। আস্তে আস্তে সেই ফণার সামনে নত হয়ে যাই আমি। অচেনা মানুষের গলায় বিকারগ্রস্তের মতো বলে যাই—দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো—

সাপটা স্থির হয়ে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। তার তীব্র শ্বাসের শব্দ ধীরে ধীরে কমে আসে। শ্লথ হয়ে যায় শরীর। ধীরে ধীরে সে মাথা নীচু করে আনে। আবার ধুলোয় মিশিয়ে দেয় মাথা। শেষ বেলার আলো মরে গেছে। ঝোপের ছায়াটা আরও গাঢ় হয়েছে। সে অবহেলায় আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তার রহস্যময় আলাদা জীবনের অন্ধকারে চলে যায়।

চারদিকে এক বিপুল মহাপৃথিবীর শূন্যতার মাঝখানে আমি বসে থাকি। পথের ধুলোয়। অনেকক্ষণ আমার কোনও চেতনা থাকে না। তখনও আমি বিড় বিড় করে কেবলই বলছি —দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো...

কিছুক্ষণ পরে চাষিদের সেই মিটিঙের কয়েকজন সভা ভেঙে ফেরার পথে আমাকে এই অবস্থায় দেখতে পায়। সাপের কথা শুনে আমার শরীরে তারা দাঁতের দাগ খুঁজল। এক চাষির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গরম লোহা দিয়ে নুন পুড়িয়ে খাওয়াল। টর্চ জ্বেলে পৌঁছে দিল বাসের রাস্তায়। বলল—শীতকাল সাপ বড় একটা দেখি না আমরা। ওই শালা যে কোথা থেকে এল!

কোথা থেকে এল তা আমিও জানি না। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে আমি ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে যাই। মাঝে মাঝে অকারণে গা শিরশির করে, খেয়ে উঠে বমি পায়, ঘুমে দুঃস্বপ্ন দেখি। কেবলই মনে হয়, সাপটার কাছ থেকে পাওয়া ভিক্ষালব্ধ আমার এই জীবনটা যেন বা ঠিক আমার নয়। অতনু সেন নামে একজন বীরপাড়ার রাস্তায় সেই সন্ধ্যাবেলায় পথের ধুলোর সর্পদষ্ট হয়ে পড়ে আছে। তার পরের এই যে আমি—এই আমি অন্য একটা লোক—ভিক্ষালব্ধ আয়ু পেয়ে বেঁচে আছি। আমি ঠিক অতনু নই।

চিন্তার স্রোত মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায়। একা থাকতে ভয় পাই। রাতে যথার্থ ঘুম হয় না। কেবলই মৃত্যুর কথা ভাবি। এইভাবে আমার মেলাঙ্কলিয়ার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষের যে স্বার্থের সংগ্রাম চলেছে পৃথিবী জুড়ে, তার বাইরে পড়ে আছে এক রহস্যময় অচেনা জগৎ। তার খোঁজ আমি কখনও করিনি। মৃত্যুর অর্থ আমার অজানা রয়ে গেছে, কেন মানুষের জন্ম—তাও জানি না। ভিক্ষালব্ধ এই যে আমার দ্বিতীয় জীবন—এই জীবনটায় আমি সেইসব রহস্য মোচন করে যাব।

বহুকাল বাদে পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটের বাসায় ফিরে আসি। সেই ব্রহ্মপুত্র বয়ে যাচ্ছে, ডাইনে নীলপর্বত, ওপারে অমিনগাঁওয়ের টিলার সৌন্দর্য, মালগাড়ি শান্টিঙের শব্দ, স্টিমারের ভোঁ। কিন্তু তবু ঠিক আগের মতো লাগে না। মনে হয়, সব অন্যরকম। ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে নিরালা তীরে বসে থাকি। বীরপাড়ার সেই সন্ধ্যার দৃশ্যটি কত অসংখ্যবার ভেবেছি, তবু আবার ভাবি। কোন কার্যকারণসূত্রে সাপটা আমার পথের ওপর অপেক্ষা করেছিল! কী করে আমার দয়াভিক্ষার ভাষা সে বুঝতে পেরেছিল! সে সময়ে কে আমার মুখে ওই কথা সঞ্চার করেছিল—দয়া করো!

সমাধান পাওয়া যায় না। অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসতে থাকি। শেষ বাংলো বাড়িটার লনে আগের মতো 'নেট' টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা হচ্ছে। খেলছে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে। সেই মেয়েটি নেই। তারা দু'মাস আগে বদলি হয়ে গেছে বদরপুরে। দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে খেলা দেখি। একটা শূন্যতা ভর করে মনের ভিতর। আর হয়তো দেখা হবে না। বাবা এক্সটেনশনে আছেন, সামনের বছর তাঁর রিটায়ারমেন্ট। কলকাতার বেহালায় জমি কিনে রেখেছেন। রিটায়ার করার পর বাড়ি তুলে চলে যাবেন।

দুপুরে মা ঘুমোতে পারে না। আমার পাশটিতে এসে বসে। বলে—অনু, তুই কী করবি? আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবি না?

অন্যমনে বলি—দেখি।

মা শ্বাস ছেড়ে বলে—একটা জীবন তোকে কাছেই পেলাম না। আমার কোলছাড়া হয়ে কত দূরে চলে গেছিস! আমার যে একটা বড়সড় ছেলে আছে তা বুঝলামই না।

আমার ছোট এক বোন, আর দুই ভাই। তাদের সঙ্গে বস্তুত আমার তেমন পরিচয়ই নেই। দাদা বাড়ি এলে তারা কৌতূহলী হয়ে দেখে। কিন্তু বড় একটা কাছে ঘেঁষে না। ভয়

পায়, সমীহ করে। আমার দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। একজন দিল্লিতে, অন্যজন কলকাতায়। বহুকাল দেখা হয়নি। ছোট বোনটার বিয়ের চেষ্টা চলছে।

বাবা ডেকে বললেন—অনু, পাত্রটি কেমন বুঝছো! অ্যাসিস্ট্যান্ট আই-ও-ডব্লিউ, বেশ স্মার্ট। বাড়ির অবস্থা...

শুনে যাই মাত্র। বাবা বিরক্ত হয়ে বলেন—কোনও বিষয়েই তোমার গা নেই। আমি এখন বুড়ো হয়েছি, বিয়ের খাটাখাটনি কি আমার পোষাবে! তুমি বড় ছেলে, সংসারের দায়িত্ব একটুও নিলে না। তোমার দুই দিদির বিয়েতে একবার উপস্থিতও থাকলে না। এসব কেমন দেখায় পাঁচজনের চোখে!

অপরাধী মুখ করে বসে থাকি।

বাবা বলেন—এই বিয়েটা আর ফাঁকি দিও না। অনুষ্ঠানে অনেক কাজ। এবারটা থেকো।

বললাম—থাকবো।

বিয়ের তিন দিন আগে আমার কলকাতার দিদি এল। সঙ্গে তার প্রফেসর বর। লাজুক, অন্যমনস্ক মানুষটি। মেজদি তার বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়ে বলল—এই আমার ভাই, একজন হতে পারত এম-এল-এ। দেশোদ্ধারে ব্যস্ত ছিল বলে আমার বিয়েতে আসেনি।

জামাইবাবু মিষ্টি হাসলেন। বিয়ের সময়ে তিনি ছিলেন স্কুল মাস্টার, বিয়ের পর দিদির তাড়নায় এম পাস করে প্রফেসর হয়েছেন। দিদির সেইজন্য খুব অহঙ্কার, জামাইবাবুরও দেখি দিদির ওপর খুব টান।

আমার দিল্লির দিদি আসতে পারল না। তবু বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন এল। বাড়ি গম গম করে সবসময়ে। সারাদিন হাসি-ঠাট্টা চলে। আমাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি। মেজদি, মা সবাই ঠাট্টা করে বলে—অঞ্জুর বড় ভাগ্য। একমাত্র ওর বিয়েতেই অনু বাড়িতে আছে।

পারিবারিক আবহাওয়া আমার ঠিক সহ্য হয় না। তবু কী কারণে যেন এই পারিবারিক সম্মেলনটি আমার বড় ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, অঞ্জুর বিয়ের পর এবার আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বোধহয় একটু কষ্ট হবে।

বিয়ের আগের দিন। সোনার দোকানে তাগাদা দিয়ে, গৌহাটি পার্টি অফিসে আড্ডা দিয়ে, মালিগাঁওয়ে রেল হেড কোয়ার্টার্সে দু-চার জন দলের লোকের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। ফিরে অবাক হয়ে দেখলাম, সামনের বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে অঞ্জু আর দুলু বসে আছে। সামনেই একটা সুটকেস আর বেডিং, তখনও তোলা হয়নি ঘরে। আমাকে দেখে দুলু উঠ দাঁড়াল তটস্থ হয়ে।

এক একটা সময় আসে যখন নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। নির্ভুলভাবে টের পেলাম, আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ পালটে যাচ্ছে, বুকে একটা খিচ ধরছে হঠাৎ, কান মুখ ঝাঁ

ঝাঁ করছে।

সম্ভবত দুলুর এইসব দুর্বলতা নেই। তার বন্ধুর দাদা, আর রাজনীতিতে নামডাকওলা লোকটির প্রতি হয়তো তার সহজাত শ্রদ্ধা ছিল। আমি বারান্দায় উঠতেই সে আমাকে প্রণাম করল। পায়ে সামান্য স্পর্শ। সেই স্পর্শটুকু যেন আমাকে হাজার মাইল আনন্দে দৌড় করাতে পারে।

বন্ধুর বিয়েতে এসে সে চারদিন রইল আমার বাসায়। সেই চারদিন আমি তার কাছে ঘেঁষবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম। নিইনি। কিন্তু আমার মন কাঁটার মতো ঘুরে ঘুরে একটা সিদ্ধান্তে স্থির হয়েছিল।

প্রায়দিনই মার আর মেজদি আমাকে বিয়ের কথা বলত। বিয়ের পরের পরদিন বাসা যখন অনেক ফাঁকা, এক দুপুরে আবার সেই কথা উঠল। মেজদিকে আড়ালে ডেকে বললাম—বিয়ে করব। দুলুকে বল, ও যদি রাজি থাকে—

মেজদি একটা লাফ দিল আনন্দে। চেঁচিয়ে ডাকল—মা!

দৃশ্যটা আমি দেখেছিলাম। পরদিন বউভাত, বউভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে তার পরের দিন দুলু চলে যাবে। বউভাতের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা একটা লুডো খেলার আসর বসেছিল। মা, দুলু, মেজদি ও আমার এক পিসিমা। আমি বারান্দায় অন্ধকারে বসে আছি। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। বাগানে ফুলের গাছগুলি ইকড়ি মিকড়ি ছায়া ফেলেছে। লুডোর আসর ভেঙে উঠবার সময়ে মেজদি দুলুর হাত ধরে টেনে বলল—চলো দুলু, বাইরে চাঁদ উঠেছে, একটু বাগান ঘুরে আসি।

ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। বারান্দা পার হয়ে ওরা দু'জন বাগানে নেমে গেল। গেট-এর কাছে দাঁড়াল। হাসি আর কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর একসময়ে মেজদি বলে—তোমার সঙ্গে কিন্তু একটা সিরিয়াস কথা আছে।

এই কথা বলে মেজদি ঝুঁকে কী একটু গোপনে বলল দুলুর কানে। হঠাৎ দেখি, দুলুর মাথা নুড়ে পড়েছে বুকের ওপর। একটু পরে আবার মুখখানা ধীরে ধীরে তুলল সে। জ্যোৎস্নায় ভালো দেখা যায় না, কিন্তু মনে হল বোধহয় একটু হাসল।

বউভাতের পর দুলু চলে গেল।

দিন সাতেক বাদে বাবা আমাকে ডেকে বললেন—বাসুবাবু আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাঁর খুব ইচ্ছে তাঁর মেয়ে দুলুর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করেন। আমি মত দিয়েছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন—বাসুবাবুর ধারণা, তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, একদিন তুমি দেশের গণ্যমান্য মানুষ হবে। চিঠিতেও সেই কথা লিখেছেন। আর আমাদের সকলেরই দুলুকে পছন্দ।

আমি চুপ।

বাবা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে কিছু বুঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন—বিয়ের পর কী করবে ভেবেছো?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—না।

বাবা বললেন—ভাববার অবশ্য কিছু নেই। বিয়ে করতে আজকালকার ছেলেরা যত ভয় পায়, আসলে তত ভয়ংকর নয়। তোমার কথা অবশ্য আলাদা। বিয়ে করা তোমার কাছে কোনও সমস্যাই হওয়া উচিত নয়। তুমি রাজি থাকলে যখন যে-কোনও ফার্মে চাকরি পেতে পারো। এমনকি আমাদের রেলেই তোমার ভালো চাকরি হতে পারে। তুমি একটু রাজি হলেই হয়।

বাবার ধ্যানধারণা খুব সাধারণ মানুষের মতোই। সুযোগ মতো গুছিয়ে নাও। আর দেরি কেন! পলিটিক্স অনেক করেছো, এইবার কিছু ঘরে আনো।

বাবা অবশ্য অন্য কথা বললেন। একটু ভেবেচিন্তে বললেন—সামনের বছর আমি রিটায়ার করছি। তুমিও আমাদের সঙ্গেই কলকাতায় চল। তোমার ল' পড়ার ইচ্ছে ছিল, সেটা পড়ে নাও। তোমার পার্টির কাজকর্ম ওখানেও হতে পারবে। তারপর ওখানেই গুছিয়ে বোসো। তুমি কাছে থাকলে আমার একটু বল-ভরসা হয়। তোমার ছোট ভাই দুটি এখনও বলতে গেলে নাবালক। একটা জীবন তোমার জন্য দুশ্চিন্তা করে আমরা কাটিয়েছি। এই শেষ বয়সটা তুমি না হয় কাছেই থাকলে!

বললাম—ভেবে দেখি।

মনে মনে কেন যেন বুঝতে পারছিলাম, আমার জীবনে একটা পরিবর্তন আসছে। সেটা ভালো কি মন্দ কে জানে। ডুয়ার্স আমরা এত চেনা, এত বেশি জানা, এত প্রিয়—তবু কেন যেন আর এখানে ভালো লাগছিল না। সমস্ত আসাম, উত্তরবাংলা, বিহারের কিছু অংশ, সিকিম, ভুটান, নেপাল জুড়ে আমি ঘুরেছি কম নয়, কাজও করেছি। তবু মনে হচ্ছিল, এখানে থাকলে ক্রমে আমি ঝিমিয়ে পড়ব। নতুন জায়গায় নতুন মানুষদের মধ্যে গেলে বোধহয় আবার নতুন করে প্রাণ পাওয়া যাবে।

ছয় মাস পরে দুলুর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

আমার নিজের বিশ্বাস, রাজনীতিতে আমি ইচ্ছে করে আসিনি। আমার ছিল বাউন্ডুলের মতো বাইরের টান, আর মানুষ দেখার নেশা। ওই দুই থেকে আমি রাজনীতিতে চলে এসেছি। প্রত্যক্ষভাবে দলের কাজে আমাকে টেনে নামিয়েছিল প্রকাশ। ফলে আমার স্বাধীন ইচ্ছেয় বাইরের জগতে ঘুরবার সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল মানুষ দেখার নেশা। ভিতের ভিতরে তৈরি হয়েছিল ক্ষমতার লোভ।

বিয়ের কিছুদিন পরেই উত্তরবাংলায় দুটো বাই-ইলেকশন হল। তার একটাতে পার্টি আবার নমিনেশন দিল আমাকে। আমি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলাম। প্রকাশ আগের মতো

সব কাজ ছেড়ে চলে আসতে পারল না, কিন্তু তবু এল। মিটিং করল, ঘরোয়া সভায় বসল। কলকাতা থেকে দলের প্রাদেশিক সেক্রেটারি এসে ঘুরে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাকে ডেকে বললেন—যদি আপার-হাউসে যেতে আপত্তি না থাকে তো বলুম। নেক্সট টাইমে—

আমি মাথা নাড়লাম। না। জেতার স্বাদ আলাদা। আমি জিততে চাই। এ নেশাটা ক্রমে ক্রমে আমার ভিতরে তৈরি হয়েছিল।

আমার প্রতিপক্ষ এবারেও শক্ত। লোকটার বিস্তর দান-ধ্যান আছে। একটা এলাকার উদবাস্তুদের জন্য সে করেছেও খুব। প্রতিপক্ষ আরও দুজন ছিল। তারা ভোট ভাঙাতে দাঁড়িয়েছিল। দেখেশুনে এবারও প্রকাশ বলল—অতনু, তুই জিতবি না। পার্টি তোকে হারাতেই দাঁড় করিয়েছে।

—কেন?

—এমনি, মনে হল।

বুকটা দমে গেল খুব। পার্টির ওপরমহলের সঙ্গে আমার মাখামাখি নেই। আমি চিরকাল তাদের মাঠ-ঘাটের কর্মী। কিছুটা অবাধ্য। কিন্তু একটা অংশের ওপর আমার প্রভাব বেশি। তারা আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। নমিনেশনও দেয়।

প্রকাশ বলল—অতনু, সময় থাকতে তুই নাম উইথড্র করে নে।

—কেন?

—পার্টিতে তোকে বেইজ্জত করার জন্যই নমিনেশন দিয়েছে।

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রকাশ বলল—এর পর দু-বার হেরে গেলে পাবলিক ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। এর পরের বার তোকে নমিনেশন না দিলে কারও কিছু বলার থাকবে না। তোর রাইভ্যাল রাঙাবাবু কত টাকা ঢালছে দ্যাখ। কুস্তি বস্তিতে হাঁড়িয়ার বান বয়ে যাচ্ছে, রিফিউজি কলোনিতে ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য দেড়শো খুঁটির দাম দিচ্ছে রাঙাবাবু। রাস্তা মেরামত হচ্ছে, রাঙাবাবুর তিনটে লরি ফেলছে মাটি আর কাঁকর। আর তুই কেবলই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা নিয়ে আছিস, মিটিং করে বলছিস আদর্শের কথা। পার্টি টাকা ঢালছে না কিছুই, তোর টাকা নেই। উত্তর বাংলার মানুষ এখনও বড় গরিব, তার টাকাটা চেনে।

আমি যে জানি না তা নয়। তবু কেন জানি না, কবে থেকে যেন বুকের ভিতরে আমার অলক্ষ্যে জমে উঠেছে লোভ।

সেই রাত্রে একা একা অনেকক্ষণ বিছানায় জেগে শুয়ে রইলাম। দলছুট যখন ছিলাম তখন আমার অকারণ আনন্দ ছিল, ছিল মানুষের প্রতি পক্ষপাতহীন ভালোবাসা। আমি মাঠে-ঘাটে মুক্তির আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন আমার প্রতিপক্ষ ছিল না কোনও মানুষ, কোনও দল, কোনও মতবাদ। আমি তখন কত ভালো ছিলাম। ক্রমে রাজনৈতিক শিক্ষা,

মতাদর্শ আমার বাহুল্য আবেগগুলো ছেঁটে কেটে ফেলে দিল, হরণ করল আমার নিরপেক্ষ ভালোবাসা। তৈরি করল প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষের প্রবহমান ধারাটি আমার চোখে কবে যেন খণ্ডিত হয়ে গেছে।

গভীর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুললাম। বাইরে অন্ধকার। অদূরে চা-বাগানের ভেজা তীব্র মাদকতাময় গন্ধ নাকে এল। আমার অনেককালের চেনা গন্ধ। গাছগাছালিতে বাতাসের শব্দ। মনে হল, চলে যাই। আর একবার পুরনো অতনু সেন হয়ে চলে যাই মানুষের কাছাকাছি।

আবার ফিরে এসে শুই। বহুদূরে, পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটের বাসায় দুলু অপেক্ষা করে আছে। বড় আশা তার স্বামী এম-এল-এ হবে। একদিন হয়তো বা হবে মন্ত্রী, দেশের অন্যতম প্রধান। সেই আশায় সে আজ বিছানার শূন্য অংশটিতে তার হাতখানা বাড়িয়ে রেখেছে। ওই হাতে সে আমাকে জড়িয়ে রাখেনি। রাখলে ভালো করত।

নির্বাচনের শেষ ক'টা দিন আমি আর তেমন ঘুরলাম না। যেটুকু না হলে নয় সেটুকুমাত্র কাজ করলাম। সেই কবে ছেলেবেলায় ফুটবল মাঠে বাবার আধখাওয়া লেমনেডের বোতল মুখে দিয়ে জীবনের তিক্ত স্বাদ পেয়েছিলাম, টের পেলাম—আবার সেই তিক্তস্বাদে আমার শরীর ভরে গেছে।

ভোট হয়ে গেল। আমি অনেক ভোটে হেরে গেলাম।

আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই হতাশ হন। আমার বউ দুলু একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

আমি পার্টির মেম্বারশিপ ছেড়ে দিলাম।

বেহালায় আমাদের বাড়িটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই বাড়িতে চলে গেলাম।

বন্ধুগণ, বিপ্লবের অর্থ প্রতি বছর একবার করে পালটায়। তবু নেশা যায় না। কারও কারও রক্তে রাজনীতির নেশা থেকে যায়। পোকার মতো কেটে কেটে ক্ষয় করে মানুষটাকে।

উত্তরবাংলার এক চা বাগানের মালিক বিপদ বুঝে আমাকে খুশি করার চেষ্টায় ছিলেন। কলকাতায় তাঁর অন্য কারবার ছিল। আমি পার্টি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসছি শুনে তিনি আমাকে ডেকে তাঁর কলকাতার কারবারে আমাকে লেবার অফিসারের চাকরি দিতে চাইলেন। আমি স্বভাবতই সে চাকরি প্রত্যাখান করি।

শুনে বাবা খুব রেগে গেলেন। বললেন—তুমি পার্টি ছেড়েছো, এখন কে তোমাকে মূল্য দেবে? যেটুকু সুযোগ ছিল তা কাজে লাগালে না, তোমার মতো এমন বোকা কেউ আছে? পার্টি না ছাড়লে কোন দিন হয়তো বা অ্যাসেম্বলিতে যেতেও পারতে—

আমার বউ দুলু বাইরে কখনও রাগ দেখায় না। এখনও তার মুখ তেমনই লাবণ্যে ঢল ঢল করে। কৈশোর ছেড়ে সে ক্রমে যৌবনের ভর-ভরাট চেহারা নিয়েছে। তবে তার মুখের হাসি কমে এসেছে। সারাদিন সে ঘরের কাজ করে, কথা বলে কম। ক'দিন আগেও

শ্রমিক, চাষি, শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং করে, রাত জেগে বই পড়ে, বহু দূরে দূরে সংগঠন করে ফিরেও তার মুখে হাসি আর অভিমান দুই-ই দেখেছি। এখন সে হাসে কম, অভিমান করেই না। নীরবে শরীর দেয়। কলকাতায় এসেই সে কলেজে ভরতি হল। সকাল-বিকেল দুটো অল্প টাকার টিউশনি শুরু করল। সে বুঝতে পেরেছিল অকর্মণ্য লোকের স্ত্রী হয়ে থাকতে গেলে সংসারে তার আদর হবে না। সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

আমিও দুটো টিউশনি করি। সকালের ল' কলেজ করি। সারাদিন ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেদের সঙ্গে বসে থাকি। দু'চার দিনের মধ্যেই আমার নাম ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়ে। ল'কলেজে তখন ছাত্রদের দুটো দল। একটা দলের খুব রবরবা, অন্যটা টিম টিম করে চলছে। দুটো দলকে যাচাই করে আমি দ্বিতীয় দলে যোগ দিই। তারপর ভূতের মতো খাটতে থাকি ইউনিয়ন ইলেকশনে। রাত জেগে পোস্টারের বয়ান লিখি, বক্তৃতার খসড়া তৈরি করি, দিনে বক্তৃতা দিই, ঘরোয়া সভা করি, অন্য দলের ছাত্র ভাঙাই। এসব কাজ আমার কাছে ছেলেখেলার মতো লাগে। তবু সেই ছেলেখেলার মধ্যেও মৌতাত জমতে থাকে। তার ওপর আমার গ্ল্যামার তো ছিলই। আমি রাজনীতি করা লোক, বিধানসভার নির্বাচনে দু'বার নমিনেশন-পাওয়া। ছাত্র-ছাত্রীরা আমার পিছনে ঘোরে।

ইলেকশনে সেবার দ্বিতীয় দলটা রই রই করে জিতল। আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেনারেল সেক্রেটারি হলাম। ফলে ছাত্রদের এই দলের পিছনে যে রাজনৈতিক দলটি ছিল তার সঙ্গে আমার অনায়াসে যোগাযোগ হয়ে গেল। আমি বছর দু'য়েকের মধ্যে মেম্বারশিপ পেয়ে গেলাম।

তারপর আবার নেশা। আইন পাস করে আমি সম্পূর্ণভাবে পার্টির কাজে নেমে গেলাম। এ দল আমার আগের দলের চাইতে অনেক বড়। প্রায় একটি সর্বভারতীয় দল। আন্তর্জাতিক দলের শরিক। ফলে কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি, ভালো কর্মীর অভাব নেই। এই দলে প্রাধান্য পাওয়া শক্ত। তবু কলকাতা এবং চব্বিশ পরগনায় ধীরে ধীরে আমার আন্তরিক কাজ স্বীকৃতি পেতে লাগল, প্রায় সারাদিন পার্টি-অফিসে পড়ে থাকি। কল-কারখানায় ট্রেড-ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করি। ছোট-বড় সভায় বক্তৃতা করার সুযোগ জুটে যায়। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে নাম বেরোয়। পুলিশের খাতায় নাম ওঠে। রাজভবনের সামনে কর্ডন ভেঙে একবার গ্রেপ্তার হই। আর একবার খাদ্য আন্দোলনে।

বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ভাই দু'জনের একজন বি.এ. অন্যজন বি-কম পাস করে বসে আছে। কিংবা ঠিক বসেও নেই। একজন একটা ক্ষীয়মান পাবলিসিটি ফার্মে কপি লিখে আশি টাকায় রোজগার করে, অন্যজন একটা সিনেমার কাগজে বিজ্ঞাপন জোগাড় করে সামান্য কমিশন পায়। দুলু বি-এ পাস করে বি-টি দিল, নিজের চেষ্টায় পাস করে স্কুলের একটা চাকরির জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল। আমাদের

তখন দুটো বাচ্চা হয়েছে। বড়টা মেয়ে, ছোটটা ছেলে। তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে দুলুর চোখে ঘুম নেই। একটা চাকরি তাকে পেতেই হবে। আমার টাকা ছিল না, কিন্তু প্রভাব ছিল বেশ। সেই জোরে বেহালার একটা স্কুলে দুলু চাকরি পেল। রাত জেগে, খেটে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম.এ. দিল। পাসও করল। সকাল-বিকেল ছাত্রী পড়াতে লাগল। জেদের বশবর্তী হয়ে সে আর একবার এম.এ. দিল অর্থনীতিতে এবং ভালো সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে গেল। তিন-চার বছরের মধ্যেই সে হল অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস। শিখল অঙ্ক, মৌখিক ইংরেজি, সাধারণ বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার জোরে বাড়ির বারান্দায় একটা টিউটোরিয়ালও খুলল। পরের বছর সেই টিউটোরিয়ালের ছাত্রী-সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেল। প্রতিজন মাথা পিছু কুড়ি টাকা—এই হিসেবে দু'বেলার টিউটোরিয়াল থেকে দুলুর মাসিক আয় দাঁড়াল হাজার টাকা। অবশ্য এর জন্য তাকে খাটতে হয় প্রচুর। আমার অবসর থাকলে আমি, বাবা এবং আমার ছোট ভাই দুলুকে সাহায্য করতাম। সেই টিউটোরিয়াল এবং দুলু-ই তখন আমাদের পরিবারে একমাত্র ভরসাস্থল। আমরা সবাই এই দু'টিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। আমার দল আর একবার আমাকে নমিনেশন দেওয়ার কথা ভাবছে তখন। দুলু যখন ধীরে ধীরে দুই পায়ে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড় করিয়ে রাখছে সংসার, তখন অন্যদিকে আমি ডুবছি। দল বদল করার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত আমাকে নমিনেশন দেওয়া হল না। আমি ঝিমিয়ে পড়লাম।

দুলু আর অমি তখন এক ঘরে দুই খাটে শুই। অনেক রাত জেগে দুলু পরীক্ষার খাতা দেখে, শক্ত অঙ্ক কষে, প্রশ্নের উত্তর লিখে রাখে, প্রকাশকদের নির্বন্ধে নোটবই লিখে দেয়। শুয়ে থেকে দেখি টেবিল ল্যাম্পের আলো ওর ভারী চশমায় ঝিকিয়ে উঠছে। বড় ভয় করত দুলুকে। কতকাল ওর শরীর ছোঁয়া হয়নি! ও যে আমার বউ তা প্রায় ভুলে গেছি। দেখতাম, দুলু তখনও শ্রীময়ী আছে, বরং বয়সের সাথে সাথে ওর চরিত্রের দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য আর জেদ ওকে আরও সুন্দর করেছে। আত্মপ্রত্যয় মানুষকে সুন্দর করে। অন্যদিকে নিজের মুখখানা কল্পনা করি, মাথায় অল্প টাক, ভাঙা মুখ, অগভীর, চিন্তাকুটিল চোখ। হীনমান্যতার দরুন দুলুর কাছাকাছি যাওয়ার সময় হত না। দুলু কত রাত কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছে। আর এখন রাজনৈতিক হতাশায় ক্লান্ত আমি দুলুর দিকে চেয়ে থাকি। আমার ভিতরে এক পুরুষ জেগে ওঠে। কিন্তু বড় ভয় করে দুলুকে। অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করে ও ওর ছেলে মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ে। একবারও আমার বিছানার দিকে চেয়ে দেখে না। দিনের পর দিন কথা বলে না দুলু, সময় হয় না। আমি চেয়ে দেখি, সেই মধ্যযৌবনে আমার ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে সেই যে গাম্ভীর্যের ছাই মেখেছিল দুলু আজও সেই ছাই তাকে সন্ন্যাসিনী করে রেখেছে। বাড়ির সবাই তাকে ভয় পায়। বাচ্চারা তার সামনে কাঠ হয়ে থাকে। ছাত্রীরা টুঁ শব্দ করতে সাহস পায় না। বুঝতে পারি, ব্যক্তিত্বময়ী মধ্যযৌবনা দুলুকে আমিও ভয় পাই।

অভ্যাসবশত আমি তখনও সকালে বেরিয়ে যাই। বিভিন্ন আড্ডায় ঘুরি, পার্টি অফিসে সময় কাটাই, এক বন্ধুর দোকানে বসে থাকি। দুপুরে এসে খেয়ে আবার বেরোই। কখনও-সখনও ঘরোয়া মিটিং কি জনসভা হয়, সেই পুরনো বিপ্লবের কথা বলি—যার অর্থ তখনও আবছা। কাগজে ছোট্ট করে কখনও-সখনও নাম বেরোয়। কিছু ছেলে-ছোকরা তখনও আশে-পাশে ঘুর ঘুর করে। তাদের তালিম দিই, পথসভা করাই, কিন্তু বুঝতে পারি একটা জীবন শেষ হয়ে এল, বিপ্লবের অর্থ বোঝা গেল না। না যাক, ক্ষতি নেই। এবার অন্তত একবার নিজের কাছে ফিরি। বাবার দুঃখ দেখে পৃথিবীর দুঃখমোচন করতে গিয়েছিলাম। সেই দুঃখের পাহাড় আমাকে ঠেলে দিয়েছে এবার। একটা জীবন আমি কম খাটিনি। কিন্তু বয়স এবং হতাশার ভার আছে, আছে গৃহপালিতের মতো ব্যক্তিগত দুঃখগুলি। একবার খোলামেলা মন নিয়ে নিজের কাছে বসা ভালো। নিজের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা আর আমি কবে করব! দুলু আর আমার দিকে ফিরেও চায় না। বাবা-মা এক-আধবার চেয়ে দেখে। ছোট ভাই সমীহ করে বরাবর দূরত্ব রেখে চলে। আমি রাতের ঢেকে-রাখা খাবার একা বসে খাই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ফলে শরীরে ঢক ঢক করে অম্বল। খেতে পারি না, অর্ধেকের বেশি ভাত পাতে পড়ে থাকে। কেউ লক্ষ করে না। রাতে শুয়ে থেকে দূর থেকে দুলুকে দেখি, শরীরে পুরুষ জেগে ওঠে। নিপুণ সাপুড়ের মতো সেই উদ্যত পুরুষকে ঝাঁপিতে ভরে রাখি। তারপর ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে মশার শব্দের মতো আমার নানা ব্যর্থতার চিন্তা বিন বিন করে সারা মাথায় ঘোরে। এক একদিন পেটে একটা উৎকট ব্যথা হয়, মাঝে মাঝে বমি পায়। মাথা ঘোরে, শরীর দুর্বল লাগে। অভ্যাসবশত কাউকে কিছু বলি না। কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে উৎকট ব্যথায় ককিয়ে ককিয়ে উঠতাম, তারপর বালিশে মুখ গুঁজে চাপা দিতাম শব্দটা। দুলু টের পেত কিনা জানি না। টের পেলেও উঠে আসত না। আমার সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপন করে স্বভাবতই সে একটু নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেজন্যে আমার অভিমান ছিল না। কারণ রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থতার তীব্রতর অভিমান এইসব ছোটখাটো ভাবপ্রবণতাকে ঠেকিয়ে রাখত। দুলু উঠে আসত না, আমি ব্যথা চেপে শুয়ে থাকতাম। হয়তো দুলুরও ঘুম হত নিঃসাড়ে। সারাদিনে তারও তো খাটা-খাটনি কম ছিল না।

রবিবার রান্নাঘরের ভার নিত দুলু। ওই তার একটা শখ। ছুটির দিন সে তার পছন্দমতো খাবার রান্না করত। কখনও শুঁটকি মাছ, কখনও তেল-কই, কি পোস্ত-চচ্চড়ি। জলখাবারও করত সে-ই। সেদিন রান্নাঘরে কেউ বড় একটা যেতে সাহস পেত না। আমি বরাবর দেরিতে উঠি, আমি উঠলে আমাকে আমার চা দেওয়া হয়। কিন্তু রবিবার দুলু তার নিয়মে সংসার চালায়। সকালে চায়ের পাট চুকে যায়। রবিবারে আর চা হয় না। তাই আমাকে লুঙ্গির ওপর শার্ট চাপিয়ে ঝন্টুর দোকানে যেতে হয়।

সবদিন সমান যায় না। একটা রবিবার সকালে উঠে আমার শরীর খুব দুর্বল লাগছিল। সারারাত জেগে থেকে সকালের দিকে ঘুমিয়েছিলাম। সেই শরীরে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছিল না আমার। ঘরে বসে এককাপ চা খেতে ইচ্ছে করছিল। দুলুর সঙ্গে বহুদিন হল কথা নেই। সেই সকালে ইচ্ছে হচ্ছিল একটু কথা বলি। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম—এক কাপ চা দেবে?

দুলু তার গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে আমাকে একবার দেখল। আমি মুষড়ে পড়লাম। দুলু আস্তে করে বলল—চায়ের দোকানের অভাব নেই। আমি ভাত চাপিয়েছি, নামালে নষ্ট হয়ে যাবে।

চলে এলাম। মাথা ধরেছিল খুব। সকালে চা না পেলে এরকম হয়। জামাটা গায়ে চড়িয়ে বেরোতে যাচ্ছি, দেখি আমার দুটি ছেলেমেয়ে সিঁড়ির কাছে মুড়ির বাটি হাতে বসে আছে। আমার মেয়ে ঝিমলির বয়স বছর সাতেক, ছেলে তিতুর বয়স সাড়ে চার। সংসারে তখনও এদুটি প্রাণীর কাছে আমার কিছু মূল্য ছিল। খুব সাবধানে, মায়ের চোখের আড়ালে, তারা আমার কাছে আসত। তাদের প্রিয় ছিল তাদের ব্যর্থ বাবা। আমি তাদের কতবার উত্তর বাংলার জঙ্গলে বাঘ দেখার গল্প বলেছি, বলেছি সিকিমের পাহাড়ের গল্প, চা-বাগানের কুলি-কামিনদের গল্প। সেইসব গল্প আর কেউ কখনও শুনতে চায়নি, আমিও কাউকে বলিনি। নইলে উত্তর বাংলার পাহাড়ে-জঙ্গলে যে-সব দিন আমি কাটিয়েছি, তার কিছু বলার মতো গল্প ছিল। একবার জিপ উলটে আমি প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে গড়িয়ে যাই, আর একবার ঝড়ে গাছ পড়েছিল আমার মাথার ওপর। আমার এই দুয়ে প্রায়-নিশ্চিত অপঘাতের কথা কখনও কাউকে বলা হয়নি। জিগ্যেসও করেনি কেউ। সে-সব গল্প জানে কেবল ঝিমলি আর তিতু। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় বন্ধুর। বাচ্চা তিতু আমাকে দেখলেই উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতখানা পিছনে নিয়ে গম্ভীরভাবে আমার বক্তৃতা নকল করতে থাকে, বন্ধুগণ, আজ এই সভায়...ইত্যাদি। ঝিমলি তাকে ধমকায়—'অ্যাই, বাবা গুরুজন না!' আমি তাদের সামলাই। আমাকে নিয়ে কেউ একটু-আধটু ঠাট্টা করলে তখন আমার খারাপ লাগে না। বস্তুত কেউ আমার দিকে করুণ চোখে চেয়ে থাকে, আমি চাই না। তার চেয়ে ঠাট্টা বরং ভালো। কিন্তু মায়ের সামনে তারা আমার দিকে তাকায়ও না। মায়ের বারণ আছে বোধহয়।

সেই রবিবার সকালে হতাশ মন আর ক্লান্ত শরীরে চায়ের দোকানে বেরোবার মুখে দুই শিশুমুখ দেখে থমকে দাঁড়ালাম। সকালের রোদে তারা মুখ তুলে ঝকমকে দাঁত দেখিয়ে নীরবে হাসল। বাবাকে তারা ভালোবাসে। তারপর সতর্ক চোখে চারদিকে দেখে নিল। আমিও হাসলাম। তারপর অবসন্ন শরীরে বসলাম তাদের কাছে। সিঁড়ির শেষ ধাপটায়। তিতু উঠে দাঁড়াল। হুবহু আমায় নকল করে বলতে লাগল—বন্ধুগণ, আজকের এই সভায় —

চিড়িক করে মাথায় একটা বদ মতলব খেলে গেল।

তিতুকে দু'হাতে জড়িয়ে বুক টেনে নিয়ে বললাম—বাবা আজ একটা নতুন খেলা খেলবে?

—কী খেলা?

—চল, একটা মিছিল বের করি।

তারা দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে হাসল।

ঝিমলি তার চুলের ঝাপটা সরিয়ে বলল—কিসের মিছিল বাবা?

আমি হাসলাম—ভুখখা মিছিল। তোমার মা আমাকে আজও চা দেয়নি।

কয়েকটা পুরনো জুতোর বাক্সের পিচবোর্ড কাটা হল, তাতে লেখা হল স্লোগান—বাবাকে চা দিতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে। নইলে গদি ছাড়ো! ইত্যাদি। কাঠিতে সেই প্ল্যাকার্ড উঁচু করে ধরে আমাদের তিনজনের ছোট্ট মিছিল ধ্বনি দিতে দিতে রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছিল। মা বেরিয়ে এসে বললেন—এ কী?

তারপর সবাই হেসে খুন।

রান্নাঘরে দুলু তখন গনগনে আঁচের মতো লাল হয়ে ভাতের ফেন গালছে। উনুনে চেপেছে মাংসের হাঁড়ি, আওয়াজ শুনে মুখ তুল অকেক্ষণ হাঁ করে রইল! আমরা নীরবে তিনজন দরজা জুড়ে দাঁড়ালাম। হাতে প্ল্যাকার্ড। বহুকাল দুলুর সঙ্গে এরকম ঠাট্টা করা হয়নি। তাই ঠাট্টাটা ধরতে দুলুর সময় লাগল।

বুঝে খুব ক্ষীণ একটু হাসল সে। ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল—এসব শিখতে হবে না। বরং কাজ করতে শেখো। নিষ্কর্মারাই মিছিল মিটিং করে।

তারপর একটু ভেবে বলল—আচ্ছা যাও, তোমাদের দাবি আমি মেনে নিলাম।

নিজের ঘরে এসে একা বসলাম। একটু পরেই দুলু নিজেই চা নিয়ে এল। চা দিয়েই চলে গেল না। একটু দাঁড়িয়ে থাকল। বলল—লিকার পাতলা করেছি।

বললাম—ঠিক আছে।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলল—নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমার লজ্জা করে না?

—ঠাট্টা কীসের?

—ঠাট্টা নয়! মিছিল তো তোমার প্রাণ। তুমি তো কেবল বোঝ মানুষের মুক্তি-যুদ্ধ মানেই মিছিল করা, বিপ্লবের পথও ওই মিছিল। তবে সেই মিছিলকে নিয়ে ঠাট্টা কেন?

চুপ করে রইলাম।

চলে যাওয়ার আগে দুলু বলল—ছেলেমেয়েদের ওসব শিখিও না। ওরা যখন বড় হবে, তখনকার সময়ে তোমাদের এই মিছিলের ধাপ্পা আর চলবে না।

বলে, চলে গেল দুলু।

আমি একটুও রাগ করলাম না। মিছিলের ভাবপ্রবণ দিকটা নিয়ে তখন আমি ভাবি। সারাজীবন মিছিল মিটিং ছাড়া লোকশিক্ষার জন্য আমার তো আর তেমন কিছু করিনি। সত্যিকারের কর্মঠ লোকের ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হয় না। দুলু নিজেই তার প্রমাণ আর আমার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে যে, আমি ভুল পথে চলেছি এতকাল।

দুলুর ওপর তাই রাগ করার কিছু নেই। বরং দীর্ঘকাল পর দুলুর নিজের হাতে করা চা-টুকু আমি বেশ উপভোগ করছিলাম।

সেদিন যথারীতি দুপুরের খাবার হজম হয়নি। অনেক রাত পর্যন্ত মাংসের ঢেকুর উঠল। পেটের উৎকট ব্যথাটা উঠল চাগিয়ে। বালিশে মুখ চেপে ধরে অস্ফুট আর্তনাদ করছি, হঠাৎ টের পেলাম ওপাশের বিছানা থেকে মশারি তুলে দুলু বেরিয়ে এল। পরমুহূর্তে চুড়ি আর শাড়ির শব্দ করে, একঝলক মারকোলাইজড ওয়াক্স-এর সুগন্ধ ছড়িয়ে দুলু আমার বিছানায় ঢুকে এল। হাত বাড়িয়ে আমার মাথা ছুঁয়ে বলল—কী হয়েছে?

—কিছু না।

—কিছু না? বলে দুলু আমার চুলের মুঠি আলতো চেপে ধরে মাথাটা ঘুরিয়ে মুখোমুখি তাকাল। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না আবছায়ায়। কিন্তু দুলুর মুখখানা আমার মুখস্থ, যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, অভিমানে তার নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে, কাঁপছে ঠোঁট, চোখ নিষ্পলক হয়ে আছে। এরকম দেখতে দেখতে আমি ব্যথা ভুলে দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার ভিতরকার পুরুষটি জেগে উঠল। দুলুও বাধা দিল না। কিংবা দিয়েছিল হয়তো, আমি বুঝতে পারিনি।

দীর্ঘকাল পরে আমি দুলুর স্বাদ নিলাম। আমাদের মাঝখানের বাঁধ ভেঙে গেল। পর পর কয়েকদিন দুলু আদর করতে করতেও আমাকে গাল দিত—অপদার্থ বাউন্ডুলে, ছোটলোক—

কিন্তু সেই গালাগালের মধ্যেও তীব্র আশ্লেষ ছিল। তখন যৌবনের শেষ ঢল ভাঁটিতে নেমে যাচ্ছে। পিছল মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পর টাল সামনে নিচ্ছিলাম। দুলু বলত—এটা কীরকম দাবি আদায়?

কয়েকদিন পর দুলু তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ফিরে পেল আবার। তবে সম্পর্ক তেমন শুকনো রইল না। মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে দেখত। কখনও বলত—চুলগুলো বড় হয়েছে। ছেঁটে এসো। কখনও ঝিমলিকে বলত—সন্না দিয়ে তোর বাবার সামনের পাকা চুলগুলো তুলে দে তো। সপ্তাহে এক-দুই দিন অন্ধকার আবছায়ায় আমার বিছানায় আমরা পরস্পরকে কাছে থেকে দেখতাম!

মাস দুই পর এরকম এক আবছায়ায় আমাদের দেখা হলে দুলু খুব গম্ভীর তেতো গলায় বলল—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

চমকে উঠে বলি—কীরকম?

সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—বোঝ না? সর্বনাশ তো তুমিই করেছ?

আমি বুঝলাম। বললাম—তুমি তো ছেলেমানুষ নও। জেনেশুনেই যা করার করেছ। এতে সর্বনাশের কী? আর একটা বাচ্চা কি হতে নেই?

দুলু ঝেঁঝে উঠল—না, হতে নেই।

—কেন?

—এই বুড়ো বয়সে লোকে কী বলবে!

—তোমার কি খুব বয়স হয়ে গেছে?

—হয়েছেই তো! আমার সারাদিনে দম ফেলার সময় নেই, দেখছ না? এতসব সামলে এসব ঝামেলা কে পোয়ায়! আমি পারব না।

আমি চুপ করে ওর মেরুদণ্ডের ওপর হাত বুলিয়ে দিলাম।

ও একটু চুপ করে থেকে বলল—তাছাড়া, ছাত্রীদের সামনে বেঢপ পেট নিয়ে ঘোরা—মাগো, সে আমি পারব না। লজ্জায় মরে যাব।

—কেন, মিস্ট্রেসদের বাচ্চা হয় না?

—হোক গে। আমি পারব না। তোমার কী, হওয়ার যে কী কষ্ট তা তুমি কী বুঝবে! আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল কাল সকালেই। আমি এটা নষ্ট করে ফেলব।

অবাক হলাম না। এরকমটা আশা করেছিলাম। বললাম—ঠিক আছে।

ডাক্তার দেখানো হল। অনেক ওষুধ খেল দুলু। কিন্তু বাচ্চাটার প্রাণশক্তি ছিল বটে। সে-সব ওষুধ হজম করল সে। পাঁচ মাসের মাথায় মাতৃগর্ভে সে প্রথম নড়াচড়াও শুরু করল। আতঙ্কে দুলু এক রাত্রে ছুটে এল আমার বিছানায়—ওগো, ওটা এখনও বেঁছে আছে মরেনি।

—তা হলে, বেঁচে থাকতে দাও।

দুলু রাগ করল—তুমি তো বলবেই! তোমার আর কী?

যথাসময়ে আমার দ্বিতীয় পুত্র জন্মলাভ করে। তার নাম ছোটন। ওষুধপত্রের জন্যেই কিনা জানি না, ছেলেটা খুব রোগা হল, তার মাথায় ছিল জন্মাবধি দীর্ঘস্থায়ী ঘা। বালিশে মাথা রাখলে ব্যথায় কেঁদে কেঁদে উঠত। তাকে নিয়ে দুলুর কষ্টের শেষ ছিল না। সারাদিন সে অবশ্য পিসি আর ঠাকুরমার কাছে থাকত, কেবল রাত্রে থাকত মায়ের কাছে। কিন্তু ঘায়ের ব্যথায় তার ঘুম হত না বলে মাঝে মাঝে জেগে উঠে কাঁদত, সারাদিন খাটুনির পর দুলু ঘুমোতে পারত না। গাল দিত আমাকে। ডেকে তুলে বলত—তোমার ছেলে তুমি গিয়ে দেখ। আমার না ঘুমোলে চলবে না।

আমার পেটের ব্যথাটা তখন ক্রনিকে দাঁড়িয়ে গেছে। গোপনে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাই। ব্যথাটা কমে যায়। আবার বাড়ে। রাত্রে কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। তবু আমি কষ্ট চেপে দুলুর বিছানায় গিয়ে তারা জায়গা নিতাম। দুলু শুতো একা, আমার বিছানায়।

শিশুরা মায়ের গন্ধ চেনে। ছোটন আমার কাছে থাকতে চাইত না। ঝিমলি একটু বড় হয়েছে তখন। মাঝরাতে উঠে সে-ও আমার সঙ্গে ছোটনকে সামলাত।

ছোটন আর একটু বড় হল। যখন তার আড়াই বছর বয়স, তখন দেখা গেল, সবাইকে ছেড়ে সে তার মায়েরই ভক্ত হয়ে উঠেছে। সে পেটে থাকতে মা ছিল তার বড় শত্রু। ছোটন তা জানত। সে তার গম্ভীর এবং কাজের মানুষ মাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। মায়ের মতোই সে ছিল গম্ভীর।

ছোটন হাওয়ার পর থেকেই দুলু নানারকম অসুখে ভুগছিল। তবু খাটত খুব।

রাজনৈতিক জীবনে আর আমার কিছুই করার ছিল না। চেষ্টা করছিলাম কী করে সব গন্ধ ঝেড়ে ফেলা যায়। একটা ব্যবসার কথা প্রায়ই ভাবতাম। লরির পারমিটের জন্য ঘোরাঘুরিও করলাম কিছুদিন।

চশমার পাওয়ার পালটাতে হল। কষের দুটো দাঁত উপড়ে ফেললাম। বয়স হচ্ছে। কিংবা সঠিক বয়স হওয়া এ নয়। এ হচ্ছে বুড়িয়ে যাওয়া।

কিছুকাল আগে আমার দলটি একটি জাতীয় সংকট উপলক্ষ্য করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আমার মেম্বারশিপের চাঁদা বাকি পড়েছিল অনেক। সে চাঁদা আর দিতে ইচ্ছে করছিল না। পুথিপত্র ঘেঁটে তখনও বিপ্লবের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি। বোঝা যায় না। মাথা ধরে যায়। চোখে জল চলে আসে।

আমার বন্ধু দীপ্তিনাথ দল ছেড়ে একটা ছোট্ট দলে চলে গিয়েছিল। তার বুদ্ধি ছিল না, কিন্তু খাটত খুব। সে এসে একদিন আমাকে বলে—অতনু, তোমার দল কি তোমাকে নমিনেশন দিচ্ছে এবার?

আমি মাথা নাড়ি—আমার চাঁদা বাকি পড়েছে। মেম্বারশিপ রিনিউ করা হয়নি।

দীপ্তিনাথ বলে—ওই দল তোমাকে নমিনেশন দেবে না কোনওদিন। দল ছাড়ো। তোমার মতো এফিসিয়েন্ট ওয়ার্কার পড়ে থাকবে কেন? ইলেকশনে আমার দল তোমাকে নমিনেশান দেবে। আমরা প্রাণ দিয়ে খাটবো। তোমাকে আমি চিনি—বিধানসভায় তোমাকে পাঠাবোই।

বুকটা কেঁপে ওঠে হঠাৎ। প্রত্যাশা জাগে তবু ইতস্তত করতে থাকি।

দীপ্তিনাথ হেসে বলে—বয়স হল না অতনু? আর কবে আমরা অ্যাসেম্বলিতে যাবো?

আমার বাবা-মা ভাইরা বহুকাল আমার দিকে চেয়ে আছে। কবে আমি এম.এল.এ বা এম.পি. হই, কবে হয়ে উঠি নেতা, অপেক্ষা করতে করতে তারা ঝিমিয়ে পড়েছে, তারা আমার কাছ থেকে কিছু আশা করতে ভরসা পায় না। তাদের জন্য একবার অন্তত আমার কিছু হয়ে ওঠা দরকার।

কয়েকটা দিন ভেবেচিন্তে আমি দল বদল করলাম। দলটা নতুন, একটা বড় দল ভেঙে কয়েকজন নেতা বেরিয়ে এসে এটা তৈরি করেছেন। উৎসাহী কর্মী আছে। আমাকে তারা

সাদরে নিল। খবরের কাগজে আমার দল বদলের খবর বেরোলো। বাবা খবরের কাগজ হাতে সকালেই আমার ঘরে এসে বললেন—আবার দল পালটালে? বরং এবার জীবনটা পালটাও, বউমা মুখে রক্ত তুলে রোজগার করছেন, আমরা খাচ্ছি—ছিঃ ছিঃ—।

নতুন দলটা আমাকে বাই-ইলেকশনে নামিয়ে দিল। কিন্তু দক্ষিণ-পরগনার প্রত্যন্ত প্রদেশে কেউ আমাকে তেমন চিনত না। উপরন্তু দলত্যাগীর ওপর মানুষের বিশ্বাস নেই। হারলাম।

বাড়িতে একটু হাসাহাসি হল। দুলুর মুখ থম থম করতে লাগল। পুরনো দলের কর্মীরা এসে আমাকে ধরল—দাদা, এখন দল ভাঙার সময় না। আমার বিরাট পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। আপনার মতো কর্মী চলে গেলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো? আপনি চলে আসুন। আমরা আপনার মেম্বারশিপ রিনিউ করে দিচ্ছি।

বার বার তিন বার হেরে গেছি আমি। তবু বুঝতে পারি, আমার পাবলিক ইমেজ না থাক, দলে আমার কাজের সুখ্যাতি আছে এখনও। আমায় তারা বলল—দাদা, পোলারাইজেশন হবেই, তখন ওই সব ছোটো দল হয়ে ভেসে যাবে, নয়তো বড় দলের সঙ্গে জোট বাঁধবে, ওদের আলাদা এনটিটি থাকবেই না। আপনি কেন পরগাছা দলে পড়ে থাকবেন? আমাদের নেতারা জানেন, আপনি ভুল করেছেন। তাঁরা এখনও আপনাকে চান।

ভাবি। ভাবতে থাকি। বিপ্লবের অর্থ বোঝা গেল না এখনও। অথচ বুঝতেই হবে। দিশেহারা বোধ করি। নির্বাচনে হারলেই দলের মধ্যে প্রভাব একটু কমে যায়ই। নতুন দলেও আমার আদর কমেছিল! তারা জানত, আমি কাজ করার জন্য তাদের দলে আসিনি, এসেছি নমিনেশনের জন্য। তারা আমাকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

কিছুদিন পর আবার আমি পুরনো দলে ফিরলাম। আবার খবরের কাগজে খবর বেরোল। বাবা কেবল বললেন—হুঁ!

সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। খুব খাটছিলাম। এবার নমিনেশন পাইনি ঠিকই, তবু নিভে যাওয়ার আগে শেষ জ্বলে ওঠার মতো আমি মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করছিলাম। দল ভেঙে দু'ভাগ হয়েছে। পুরনো সহকর্মীরা এখন প্রতিপক্ষ। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাংঘাতিক। কোন দল থাকবে কোন দল প্রাধান্য পাবে—এই নিয়ে অস্তিত্বের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সেই চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেই একদিন কাগজে উত্তর বাংলার প্রার্থীদের নাম বেরিয়েছে দেখলাম। দেখি, উত্তর বাংলায় আমার পুরনো দল প্রকাশকে নমিনেশন দিয়েছে। যে জায়গায় আমি দ্বিতীয়বার হেরে যাই সেই জায়গায়। এবারও প্রকাশের প্রতিপক্ষ রাঙাবাবু।

হঠাৎ আবেগে আমার চোখে জল আসছিল। প্রকাশ! সেই প্রকাশ ছেলেবেলায় যে প্রথম আমার সব ভয় হরণ করে লড়াই করতে শিখিয়েছিল। সেই প্রকাশ, যে আমার নির্বাচনে খেটেছিল বুক দিয়ে। বলেছিল, অতনু, আমি তোর আছি। চিরকাল তোর পক্ষে রইলাম।

চোখে জল নিয়েও হাসি আসে। প্রকাশ আমার সারা জীবনের বন্ধু হতে চেয়েছিল একদিন। বলেছিল, আয়, আমরা একটা কিছু পাতাই। ভালোবাসার আক্রোশে আর অভিমানে সে ঢিল ছুঁড়ে মেরেছিল আমাদের রেলগাড়ি লক্ষ করে। পৃথিবী তার অতনুকে কেড়ে নিচ্ছে কেন? সেই আক্রোশেই সে একদিন সেকেন্ড হওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছিল।

যাবো! গিয়ে প্রকাশের নির্বাচনী এলাকায় প্রাণ ঢেলে কাজ করে আসবো? প্রকাশ তো আমার জন্য করেছিল! খুশি হবে প্রকাশ। বড় অবাক হবে। যাবো?

কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না। প্রকাশ এক দলের, আমি অন্য দলের। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ। বহুকাল দেখা হয় না প্রকাশের সঙ্গে। প্রথম প্রথম কিছুদিন চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছিল, তারপর কবে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রকাশের সঙ্গে দেখা হলে কী করবে?

নির্বাচনের ফল বেরিয়ে গেল। প্রবল উত্তেজনায় দেখি, কাগজে উত্তর বাংলার ফলে রাঙাবাবুকে চার হাজার ভোটে হারিয়ে প্রকাশ জিতেছে।

বিধানসভার অধিবেশন বসল। আমি .গলাম। গ্যালারি থেকে দেখলাম প্রকাশকে। পিছন হেলে বসে আছে। চোখে চশমা, একটু রোগা হয়ে গেছে বুঝি! তবু সেই অকপট মুখ, আন্তরিকতা মাখানো চেয়ে থাকা, রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্ক হচ্ছিল। প্রকাশও বলল। থেমে থেমে ভেবেচিন্তে বলার ভঙ্গি। আগের মতো আবেগতপ্ত ঝোড়ো বক্তৃতা নয়। যেন দ্বিধা এসে গেছে, সংশয় এসেছে। একটু বলেই বসে পড়ল।

বেরিয়ে এসে লবিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নতুন এম-এল-এ-রাও ঘোরাফেরা করছে, চা-সিঙাড়া কিনে খাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার চেনা। একটু দাঁড়াতেই আমার চারধারে জনাকয় জড়ো হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে কথা বলি কিছুক্ষণ। আবার লবিতে ঘুরি, প্রকাশকে খুঁজি।

অনেকক্ষণ বাদে প্রকাশ বেরিয়ে এল। সেই প্রকাশ—গান্ধা, চোর, মারকুটে। এখন দেখা যায়—চিন্তায় ভারাক্রান্ত মুখ, অন্যমনস্ক চোখ, চোয়ালে ধারাল ভাব। মুখোমুখি হতেই দু'হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল—এই শালা।

দু'পক্ষের দু'জন। চারদিকে কৌতূহলীদের ভিড় জমে গেল! কী ব্যাপার সবাই জানতে চায়। সেই ভিড় থেকে প্রকাশকে টেনে আনলাম—এখানে না। বাসায় চল।

কাটিহারের সেই ছোট্ট ছেলেটি এত উন্নতি করেছে দেখে বাবা বড় খুশি হলেন। উন্নতিশীল মানুষ দেখলেই তিনি খুশি হন। প্রকাশকে সামনে বসিয়ে সব জেনে নিলেন। বললেন—তোমারও আগে অনু তিনবার নমিনেশন পেয়ে জিততে পারল না। কপাল। এখন তোমরা দেখ, ওর জন্য কিছু করে দিতে পারো কিনা! বুড়ো হতে চলল—কিছুই হল না। আমরা কত আশা করেছিলাম—ও কিছু একটা হবে! এখন দেখ, দুলু রোজগার করে বলে খেয়েপরে আছি। তোমরা ওকে একটু দেখ—

আমি মনে মনে হাসি। বাবা বোঝেন না, আমার বন্ধু হলেও দু'জনের দু'দলের। এখন আমাদের জীবন যার যার নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা আর একে অন্যের জন্য কিছু করতে পারি না।

কথায় কথায় প্রকাশ বলল—চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে। রেলের কোয়ার্টার এখনো ছাড়িনি কিন্তু শীগগিরই ছাড়তে হবে। মাকে নিয়ে যে কোথায় উঠবো ভেবে পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয়, নমিনেশন না নিলেই ভালো হত। বাঁধা চাকরিটাই ভালো ছিল। এখন এই এম-এল-এ হয়ে থাকাটা বড় অনিশ্চয়ের কাজ। বড় ভয় করে রে। এই বয়সে নতুন কিছু করতে ভরসা পাই না।

জিগ্যেস করি—প্রকাশ, তুই কী করে জিতলি? রাঙাবাবু এবার টাকা ঢালেনি?

প্রকাশ হাসল, বলল—ঢেলেছিল। কিন্তু সব মানুষেরই ওঠাপড়া আছে। রাঙাবাবু পড়তির দিকে এখন। তা ছাড়া, মানুষের রাজনৈতিক চেতনার চোখ খুলছে। অতনু, এই কাজ তুই-ই করে এসেছিস। তুই কী করেছিস তা তোর জানা নেই। জমি চষার শক্ত

কাজটা তোরই করা। লোকে তোকে ভোট দেয়নি ঠিকই, কিন্তু তোর তারিফ করেছে বারবার। এখনও পার্টিতে তোর কথা হয়। আমরা তোর কথা বলি। লোকেও বলে। কাগজে তোর দল ছাড়ার খবর পেয়ে সবাই দুঃখ করে।

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। উত্তর বাংলার মাঠ-ঘাট-জঙ্গলের ছবি ফুটে ওঠে। অজস্র মানুষের মুখ ভেসে যায় চোখের ওপর দিয়ে।

প্রকাশ একটু ভেবে বলে—কেউ কেউ আছে বাউল-বৈরাগীর মতো, দলে তারা বেমানান। তোকে দেখে আমার মনে হয় তোর সব কাজ বৃথা যায়নি—তুই যতটা ভাবিস ততটা নয়, দলীয় রাজনীতি আলাদা ব্যাপার—সেটা তোর হয়নি বলে আমার দুঃখ নেই। তুই মানুষের জন্য অনেক করেছিস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকি। প্রকাশের সব কথা বিশ্বাস হয় না। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

প্রকাশ বলে—অতনু, মানুষ তোকে ভোলেনি। বিশ্বাস কর, ভোলেনি। তুই দেখিস।

বিধানসভার প্রথম সেসন শেষ হয়ে প্রকাশ উত্তর বাংলায় ফিরে গেল। পরের সেসন এল আবার। দেখা হল। কত কথা হয় দু'জনে। কথায় কথায় রাজনীতির কথা এসে পড়ে। তর্ক হয়। দলীয় আদর্শের তফাত নিয়ে ঝগড়া করি দু'জনে। এক এক সময়ে প্রকাশ আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে মিটিমিটি হাসে, বলে—অতনু, আমার বিশ্বাসই হয় না যে তোর ব্রেনওয়াশ হয়েছে। তোর তা হতে পারে না। আমার মনে হয় তুই কোনওদিনই কোনও দলকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসিসনি।

আমি চুপ করে থাকি। ভাবি। হয়তো প্রকাশ ঠিকই বলছে। কিন্তু আমি কিছু ভেবে পাই না।

প্রকাশ আবার বলে—কোনও কোনও মানুষ আছে, মানুষের ভালো করতে গিয়ে পলিটিক্স করে, কেউ কেউ বা সাধু-সন্ন্যাষী-সন্ত হয়। তুই দ্বিতীয় দলের। আমরা জোর করে তোকে পলিটিশিয়ান বানিয়েছি।

হেসে উঠি।

আবার প্রকাশ চলে যায়। আবার আসে। বিধানসভায় কতগুলো বিল-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তার বক্তৃতা বেশ সুখ্যাতি পেল। একটু নাম করল প্রকাশ।

পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া পালটে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতাসীন দল চাল মাত হয়ে বসে আছে। নতুন কিছু করার নেই। পুরনো আদ্যিকালের কাঠামো রয়ে গেছে সমাজের চেহারায়। সেই ঘুণধরা কাঠামোর ওপরে মাটি চাপিয়ে প্রতিমা গড়ার চেষ্টা। বার বার ভেঙে যাচ্ছে মূর্তি। কারিগর বুঝতে পারছে না কী করতে হবে।

মিহির নামে একটা ছেলেকে চিনতাম। বাঁকুড়ার গ্রামে তার বাড়ি, কলকাতায় থেকে চাকরি করত। মিহিরের বড় ইচ্ছে ছিল, তাঁর গাঁয়ে একটা পোস্ট-অফিস হয়। সে সেইজন্যই অনেক ঘোরাঘুরি করেছে। বহু দরখাস্ত পাঠিয়েছে পি-এম-জি-র কাছে। সেইসব দরখাস্ত যাতে গুরুত্ব পায় সেইজন্য যে যথাবিহিত নামের পাশে এম-এ কথাটা উল্লেখ করে দিত। কখনও বা গ্রাম থেকে গণ-দরখাস্ত পাঠাত। পত্রিকায় অন্তত তার 'পোস্ট-অফিস চাই' শিরোনামায় চারটে ছিঠি বেরিয়েছিল। কিছুই হয়নি। তখন সে এক অদ্ভুত পন্থা নেয়। গাদা গাদা খাম পোর্স্টকার্ড কিনে সে তার গ্রামের বিভিন্ন লোকের নামে চিঠি দিতে শুরু করে। তার বিশ্বাস ছিল, যদি তার গ্রামের বহুসংখ্যক চিঠি যেতে শুরু করে তবে সরকার বাধ্য হয়ে পোস্ট-অফিস খুলবে সেখানে। এত চিঠি একা লেখা সম্ভব ছিল না বলে সে চেনা জানা যাকে পেত তাকেই একখানা ঠিকানা লেখা পোস্ট কার্ড দিয়ে বলত—কয়েক লাইন লিখে দাও। যা খুশি।

—সে কী! অচেনা লোককে কী লেখা যায়?

—অন্তত একটু শুভেচ্ছা জানিয়ে দাও। চিঠি যার কাছে যাবে সেও জানে—এ চিঠি নয়, এ আসলে হচ্ছে লড়াই। যেমন করেই হোক পোস্ট-অফিস আমাদের চাই।

মিহিরের গ্রামে ওরকম চিঠি আমিও পাঠিয়েছি।

বেশ কয়েকমাস গাঁটের কড়ি খরচ করে চিঠি লিখেও যখন পোস্ট-অফিস হল না তখন সে ভারি মুষড়ে পড়ে। তার গ্রাম থেকে একজন বুড়ো-সুড়ো মোড়ল গোছের লোক প্রায়ই মিহিরের কাছে আসতেন। তাঁর সঙ্গে গভীর পরামর্শ করত সে। কলকাতায় মিহির আমাদের দলের হয়ে খাটত। কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে সে ক্যাম্পেন করত সরকারের পক্ষে। আমার কাছে স্বীকার করত সব, বলত—দাদা, এখনও গাঁয়ের মেইন রাস্তাটা পাকা হয়নি। তিনটে টিউবয়েল বসানোর কথা চলছে, ইলেকট্রিক আসার কথা, আর ওই পোস্ট-অফিসটা...বিরাট একটা ফিরিস্তি দিয়ে যেত সে। তারপর বলত—এগুলো আগে আগে আমরা গুছিয়ে নিই, তারপর দেখবেন রাজনীতি পালটে যাবে।

আমি তার কাণ্ড দেখে খুব হাসতাম।

অবশেষে একদিন মিহির সেই বুড়ো মানুষ ভদ্রলোককে নিয়ে আমার কাছে এসে বলে —দাদা, হল না। অনেক করে দেখলাম। এবার আমরা উলটো পার্টির লোক দাঁড় করাবো। আপনি চলুন আমাদের গাঁয়ে, মিটিং করবেন।

এই কথা শুনে হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটা পরদা সরে যায়। রাজনীতির চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষেরা ডিপ্লোম্যাট হয়ে যাচ্ছে! চালছে উলটো কূটনৈতিক চাল! ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোতে মানুষের স্বার্থই কি একটা পরিবর্তন আনবে!

মিহিরের গ্রামে গিয়ে আমি মিটিং করলাম। পরে নির্বাচনের সময়টা ধীরে ধীরে এসে গেল।

সেই নির্বাচনে সরকার পালটাল। স্টেটসম্যান লিখল—এ ভোট অব অ্যাংগার। ঠিক কথা। এ হচ্ছে রাগের ভোট। মিহিরের গাঁয়ের লোকেরা বড় আশায় ছিল। পাকা রাস্তা, টিউবয়েল, বিজলি বাতি, একটা পোস্ট-অফিস—কিছুই হয়নি। মিহির কলকাতায় একটা দল করত আন্তরিকভাবে, গাঁয়ের স্বার্থে সেখানে গিয়ে করত অন্য দল। এই ছোট্ট বাঁকুড়ার গ্রামখানিই বাংলাদেশের ছবি, ভারতবর্ষের চেহারা। রাগের ভোট! ঠিকই তো! আমিও জানি, বাংলাদেশের বামপন্থীরা কিছু গঠনমূলক কাজ করেনি।

ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ করেছে মাত্র। তাতে কিছু যায় আসে না। পার্টি পার্টির কাজ করে গেছে। তাতেও জনগণের আস্থা বাড়েনি। বিশ্বাস আসেনি। তবু তারা যে দান উল্টে দিল তার কারণ তাদের সরকারের উপর রাগ। সেই নেতিবাচক ভোট পেয়ে বাম দলগুলি লাফাতে থাকে। কলকাতায় সেই সন্ধ্যাবেলা বাসে ট্রামে টিকিট কাটেনি কেউ, কন্ডাকটর পয়সা চায়নি। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আমি শহর দেখলাম। কিন্তু কেমন যেন নিস্পৃহতা এসে গেছে আমার। আমি আর সেরকম আনন্দ পাই না।

প্রকাশ আবার জিতে এল। জড়িয়ে ধরল। তার দল আর আমার দল এবার মিলেমিশে সরকার তৈরি করছে। খুশি হয়ে বলল—অতনু, যদি সত্যিই আমরা এরকম মিলতে পারি, যদি মিশে যাই, তা হলে কী ভীষণ কাণ্ড হবে!

তেমন উৎসাহ বোধ করি না। কেমন যেন লাগে! প্রকাশ যে বলেছিল—তুই দলের জন্য নয়—সেই কথাটা মনে পড়ে। কেবলই মনে হয়, গণ্ডী ভেঙে বেরোনো দরকার। খুঁজে দেখা দরকার সব দলকে গ্রাস করে নেওয়ার মতো কোনও আদর্শ কোথাও জন্ম নিয়েছে কিনা। মানুষ পালটাল না, কেবল রাজনীতি পালটে গেল—এ কেমন কথা?

প্রকাশ বড় আশাবাদী। তর্ক করে। ঝগড়া হয়। বলে—মানুষ পালটাচ্ছে অতনু।

আমি উত্তর দিই—কে তাদের পালটাল? কবে? হাজারটা দল হাজার রকমের কথা বলছে, করছে নীতির লড়াই, আমাদের বক্তৃতার অধিকাংশ জুড়ে থাকে এর ওর তার নিন্দে, গালাগালা, অভিশাপ। আমাদের মিছিলের স্লোগানে থাকে আক্রোশ। মানুষকে আমরা ওইসব শেখাচ্ছি। তার মুখে বসিয়ে দিচ্ছি দলের কথা, চিন্তায় ঢুকিয়ে দিচ্ছি দলের স্বার্থ। আমরা মানুষকে শেখাচ্ছি দাবি আদায় করতে—এর বেশি কিছু না। প্রকাশ, এ ভাবে মানুষ পালটায় না। মানুষের ভিতর কবে আমরা সততা, দয়া, কর্মনিষ্ঠা জাগাবার চেষ্টা করেছি? ক'জন মানুষকে শিখিয়েছি আলস্য ত্যাগ করতে? ক'জনকে মদ ছাড়িয়েছি, সচ্চরিত্র করেছি ক'জনকে? যখন রিফিউজি কলোনিতে ভলান্টিয়ার হয়ে প্রাণপণে খাটতাম, ঘরের চালডাল পয়সা কাপড় এনে দিতাম, তখন থেকেই রাজনীতির লোকেরা এসে রিফিউজিদের স্বার্থচেতন করত, বলত সরকারি সাহায্য দালালরা মেরে দিচ্ছে,

তোমরা পাচ্ছো না...ইত্যাদি। রিফিউজিরা ক্ষেপে গিয়ে আমাদের মারতে আসত। অথচ ওই রিফিউজি ক্যাম্প থেকে কয়েকটা মেয়ে বেশ্যা হয়ে যায়—তাদের কেউ ঠেকাতে পারেনি। কত ছেলে চোর, পকেটমার হয়ে গেল, কত মানুষ দুঃখ ভুলতে ঘটিবাটি বেচে মদ্যপ হল—কেউ তখন তাদের সচেতন করেনি। মানুষের চরিত্র যখন অন্ধকারের দিকে বেঁকে যায় তখন কে আমাদের মধ্যে গিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছি। প্রকাশ, মানুষের ভাত-কাপড়ের অভাব আমি মানি—তার জন্য লড়াই আমিও করি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের সবচেয়ে বড় লড়াইটা ছিল মানুষের ধর্মের চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ার নেই। ধর্ম আর চরিত্র পেলে মানুষ আপনি দাঁড়ায়। এত হাঁকডাকের দরকার হয় না। মানুষ আমাদের আদর্শকে বিশ্বাস করে এবার ভোট দেয়নি, দিয়েছে রাগের ভোট—ক্ষমতাসীন দলকে তারা অবিশ্বাস করে। আমরা সেই অবিশ্বাসের ভোট পেয়েছি।

প্রকাশ হাসে। গুরুত্ব দেয় না।

আমি তবু বলি—দ্যাখ, সে-বার দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরে মানুষের কী ভীষণ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। একদিন রেলের কম্পার্টমেন্টে উঠে এক চেকার প্রথমেই হাতজোড় করে বলল—ভাইরা, দিন পালটে গেছে। আমি টিকিট চাইবার আগে বলে নিই—যারা টিকিট কাটেননি, তাঁরা জরিমানা দেবেন, এবং প্রতিজ্ঞা করবেন যে, আর বিনা টিকিটে কখনো যাবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, আর ঘুষ নেবো না। শুনে আমরা ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়লাম। কোন চেকারের মুখে এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি। কামরায় অনকের টিকিট ছিল না, তারা কেউ কেউ জরিমানা দিল, প্রতিজ্ঞাও করল অনেকে। দু'একজন আবেগে চোখের জল ফেলল। সেই চেকার ভদ্রলোক কাঁদছিলেন। জনে জনে হাতজোড় করে বলছিলেন—ভাইসব, আমি অনেক ঘুষ নিয়েছি। মহাপাপ করেছি। কিন্তু আর না। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করবেন। শুনে সকলে মূক হয়ে গেল। কেউ কেউ বিড় বিড় করে আশীর্বাদ করল। এক বুড়ো তাঁকে বুকে চেপে ধরে আর ছাড়তেই চান না, কেবল বলছেন—তুই আমার পোলা। তুই আমার সোনার গোপাল—। সেই কামরাটায় কয়েক মুহূর্তের জন্য সে এক স্বর্গীয় আবহাওয়া। আমার বুক ঠেলে উদবেল আবেগ উঠে আসছিল। সেই চেকার ভদ্রলোককে কী যে মহান মনে হয়েছিল! ভেবেছিলাম এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জনগণের প্রতীক। সেই কামরাটা যেন ভারতবর্ষেরই একটা ছোট্ট ছবি।

প্রকাশ চুপ করে ভাবে।

আমি বলি সেইদিনও আমার মনে হয়েছিল, জনগণ পালটে যাচ্ছে। সুদিন এল বুঝি। কিন্তু মানুষের আবেগ—তাকে বিশ্বাস নেই। আবেগ দু দণ্ড থাকে অতিথির মতো। তারপর চলে যায়। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। একবছরের মধ্যেই সেই চেকারকে আমি নিজের চোখে ঘুষ নিতে দেখেছি। মানুষ সহজে পালটায় না প্রকাশ, তাকে পালটানোর জন্য দীর্ঘ

সংগ্রাম পড়ে আছে। কেউ সেই লড়াই লড়ছে না। কেবল দাবি আদায় করে দিয়ে সন্তুষ্ট রাখছে তাকে, তপ্ত করে তুলছে স্বার্থের লড়াইতে, জোরদার করছে দলের শক্তি। মানুষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উদভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কেবল। তাদের ঘরের দরজায়-জানালায় কেবল চোর-গুন্ডার উঁকিঝুঁকি, আড়কাঠিদের ছায়া, তার বিপদের রাস্তায় পুলিশের বাড়ানো হাত, চারিদিকে লুট অরাজকতা, তার বেঁচে থাকা মানেই আত্মরক্ষা। ট্রেনের কামরায় দেখা সেই দৃশ্যটা স্বপ্নের মতো মনে হয়।

উত্তর বাংলায় একটা বড় রকমের গণ্ডগোল হয়ে গেল। কৃষক বিদ্রোহ। চারিদিকে হইচই পড়ে গেল খুব। চাষিদের সশস্ত্র সংগ্রামের বৃত্তান্ত কাগজের হেডিং।

প্রথমটায় চমকে উঠলাম। উত্তর বাংলার মাটিতে আমি মিশে আছি। সেই স্নিগ্ধ মাটি থেকে এই অগ্ন্যুৎপাত!

দৌড়ে গেলাম প্রকাশের কাছে। প্রকাশ খুশি নয়, বিমর্ষও নয়। চিন্তিত। আমাকে বলল —অতনু, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না।

আমি বললাম—আমারও না। এটা গণতন্ত্রের পথ নয় ঠিক। কিন্তু আমি জানতে চাই, এটা বিপ্লবের পথ কিনা! এদেশে মানুষ দীর্ঘকাল বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করছে। এটা কি তারই পূর্বাভাস?

প্রকাশ ম্লান হেসে বলে—সেটা তোরই ভালো জানার কথা। তোর দল বিপ্লবের কথা সবচেয়ে বেশি বলে।

একটু চুপ করে থেকে প্রকাশ আবার বলে—মানুষ এত সহজে পালটায় না—এ তো তোরই কথা!

দীর্ঘকাল রাজনৈতিক ব্যর্থতার রোগে ভুগে আমি খিটখিটে হয়ে গেছি। মনে হয়, সমস্ত শরীরে আমার জ্বালা, দাঁতে-মুখে বিষ। হাত-পা নিশপিশ করে। আমি প্রকাশকে বললাম—ভালো হোক মন্দ হোক, তবু একটা কিছু হয়ে যাক। একটা চূড়ান্ত কিছু হওয়া বড় দরকার। একটা বড় ঝাঁকুনি, ওলটপালট বড় দরকার।

কথাটা স্বস্তির মুখে পড়ল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঝড় এসে গেল হঠাৎ। বার বার বিধানসভা ভেঙে যায়। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃক্ষপতনের মতো লাশ পড়তে শুরু করল। প্রথমটায় খুব চমকে গেলাম! কিন্তু খুনের সেই শুরু। খুনের পর দেওয়ালে লেখা হয় অমুক খতম তমুক খতম। নতুন রাজনৈতিক মতবাদ লেখা হতে লাগল চারিদিকে। এর আগে বেলেঘাটায় একজন পলাতক নেতা রাস্তার ওপর পুলিশের তাড়া খেয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালাবার সময়ে জনতার হাতে মারা পড়েছিলেন। আমার আর প্রকাশের খুব চেনা লোক। আমরা দু'জনেই খবর পেয়ে মুষড়ে পড়লাম। এমনটা না হলেও পারত। এতটা যেন এদেশের মাটিতে মানায় না।

বিপ্লবের ডাক কারা লিখে যায় দেওয়ালে। স্কুল-কলেজ ছেড়ে চলে আসার আহ্বান করে ছাত্রদের। লেখে—শ্রেণিশত্রুর রক্তে যার হাত রঞ্জিত হয়নি সে কমিউনিস্টই নয়। আরও কত কথা! পড়তে অবাক লাগে। বিপ্লব! এই কি তবে বিপ্লব!

আবার পুথিপত্র খুলে বসি। মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করি। কিছু মেলে, কিছু মেলে না। বরাবর এই এক ব্যাপার দেখে আসছি। পুথিপত্রে যা লেখা অছে তার কিছু মেলে, কিছু মেলে না।

তবু সশব্দে চারদিকে লাশ পড়তে থাকে।

খুব অবাক হয়ে ভাবি, উত্তর বাংলার গ্রামে যে বিপ্লবের শুরু তা গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে না পড়ে কেন শহরে এসে বাসা নিয়েছে! গ্রাম দিয়ে তবে এরা কী করে শহর ঘিরবে! বড় অবাক লাগে।

রাত-বিরেতে একা একা ফিরতে গা ছম-ছম করে। বারবার পিছু ফিরে দেখে নিই। বাতাসকে বিশ্বাস হয় না, গাছটাকেও সন্দেহ করি। যদিও রাজনীতিতে আমি মরা ঘোড়া হয়ে গেছি, তবুও গায়ের গন্ধ বহুদূর। আমাদের রাস্তার চৌমাথায় পাড়ার ছেলার আড্ডা মারে। চেনা ছেলে, তবু তাদের সেই দঙ্গল দূর থেকে দেখে হঠাৎ ভয় লাগে। চেনা ছেলে বটে, কিন্তু যদি ভিতরে ভিতরে রং বদলে থাকে! নীচের তলার ঘরে শুই, শিয়রের জানালা খোলা থাকে। রাতে ভালো ঘুম হয় না। দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসি। তারপর মাঝরাতে সিগারেট জ্বেলে জানালায় দাঁড়িয়ে নির্জন চরাচর দেখি। দূরে গাঢ় নীল হিম আকাশের দিকে অপলক চেয়ে থাকি। মৃত্যুর কথা ভাবি। পরকালে আমার কি বিশ্বাস আছে? কে জানে! তবে চিরকাল আমি বস্তুবাদী। নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতে গেলেই বীরপাড়ার রাস্তায় ঝোপের গাঢ় ছায়া থেকে আজও ধূসর রঙের একটা সতেজ সাপ উঠে তার বুকের সাদা রং আমাকে দেখায়। শরীর শিউরে ওঠে, ভয় করে।

কিন্তু বস্তুত মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমার, আমার পারিবারিক সম্পর্ক আলগা, বাইরের জগৎ থেকে কিছু পাওয়ার নেই। বেঁচে থাকার আর কী অর্থ? মরলেই বা ক্ষতি কী? নিছক বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে থাকাটা কোনও কাজের নয়। কেঁচো, কীট পশুরাই ওরকম বাঁচে। এসব কথা নিজেকে বলেছিও কতবার। যখন রাজনীতিতে প্রথম নেমেছিলাম, তখন অন্তত মৃত্যুভয় আমার ছিল না, সেইসব দিনে কতবার ভাড়াটে গুন্ডা, গোয়েন্দা পুলিশ, অন্য দলের মারমুখো সমর্থকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি অনায়াসে। তবে কি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ে? আয়ুর প্রতি ভালোবাসা? যদি আমি রোজগেরে মানুষ হতাম, যদি আমার ওপর নির্ভর করত আমার ছেলে মেয়ে-বউয়ের ভবিষ্যৎ, তবে হয়তো বেঁচে থাকার প্রতি ভালোবাসা স্বাভাবিক হত। কিন্তু তাও তো নয়।

সেই আন্দোলনের প্রকাশ্য নিন্দে করল প্রকাশ। কাগজে ওর লেখা বেরোলো। গিয়ে প্রকাশকে সাবধান করে দিলাম—দিনকাল ভালো না প্রকাশ। সাবধান।

প্রকাশ মুখ গম্ভীর করে আমাদের সেই চেনা নিহত পলাতক রাজনৈতিক নেতার কথা উল্লেখ করে বলে—ও মারা যাওয়ার পর থেকে আমার মন চারদিকটার ওপর বিষিয়ে গেছে। ওর আর আমার দল আলাদা ছিল, তবু আমাদের কাজ আসলে তো আলাদা নয়। এখন এইসব যা ইচ্ছে এই-ই বা কী অতনু? বাচ্চা ছেলে সব—এরা কী বোঝে? কেন এসব—! প্রটেস্ট করে রাখলাম অতনু, ভবিষ্যতের মানুষ যখন এই অন্যায়ের নিন্দা করবে তখন তারা খুঁজে দেখবে, কেউ সাহস করে এর প্রতিবাদ করেছিল কিনা, আমি সেটা করে রাখছি—

সুখের বিষয়, আমার অভিজ্ঞতা প্রকাশের চেয়ে বেশি। আমি এখন ভবিষ্যতের ভাবনা কম ভাবি। আমার চিন্তা বর্তমানকে নিয়ে। এইসব ঝোড়ো দিনগুলো মাথা নুইয়ে কাটিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সুযোগ যদি আসে আসবেই—তখন দেখা যাবে। প্রকাশ তা বোঝে না। তর্ক করে। ঝগড়া হয়।

রাশি রাশি ছেলে ধরা পড়েছে। তবু খুন কমছে না। অবাক হয়ে দেখি বাংলাদেশের নরম মাটি থেকে এ কারা জন্মাল! তিনটি-চারটে ছেলে গিয়ে স্কুল জ্বালায়, পুলিশ ব্যারাকে আক্রমণ করে, সশস্ত্র এস-আইকে খুন করে। দিনের বেলায় হাজার লোকের চোখের সামনে ট্রাফিক পুলিশ মারে। এক-আধজন এম.এল.এ-ও খুন হয়।

থানার ও-সি চেনা লোক। একটু খাতির করেন। কেস মারাত্মক না হলে আমার ক্যাডারদের অযথা আটকে রাখেন না। আমি গেলে ছেড়ে দেন। হেসে বলেন—আমাদেরও জায়গা নেই। দেশ শুদ্ধ ছোকরারা ক্রিমিন্যাল হয়ে গেলে আমরা রাখি কোথায়। মাঝে মাঝে থানায় যাই। আড্ডা মারার জন্য নয়। পরিস্থিতি বুঝবার জন্য। থানার খবর সবচেয়ে পাকা। ও.সি বসান, চা খাওয়ান, অল্পস্বল্প ইনফর্মেশন দেন। আর বারবার বলে দেন—সাবধানে চলাফেরা করবেন। আমাদের দেশে একরকম কাঁঠাল হত। মাটির নীচে ফলত। পেকে গন্ধ ছড়ালে আমরা টের পেতাম। আপনারা হচ্ছেন সে কাঁঠালের মতো। লুকিয়ে থাকলেও গন্ধে লোকে টের পাবে ঠিক।

আগেই বলেছি, জীবনের প্রতি আমার তেমন গাঢ় অনুরাগ থাকার কথা নয়। তবু দেখি এত হেলাফেলা করে যে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, যে আমি সংসারে কারও কাজে লাগলাম না, যে আমাকে এই সংসার বড় বেশি হেলাফেলা করেছে, তারও রয়েছে মৃত্যু-চিন্তায় প্রগাঢ় কাপুরুষতা।

নাকি এ স্বাভাবিক বাঁচার আকুতি!

সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। বীরপাড়ার রাস্তায় ধুলোর হাঁটু গেড়ে বসে একদা আমি প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলাম একটা সাপের কাছে। সে অবহেলা ভরে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল আমার আয়ু। সেই কথা মনে পড়ে।

আমাদের বাড়ির পিছনের দিকে একটু উঠোন, একটু বাগান। দেওয়াল ঘেরা। সারা দুপুর সেইখানে খেলা করে তিতু আর ঝিমলি। আমি আজকাল একটু বেশি ঘরে থাকি। দুলু স্কুলে চলে যায়, ভাইরা বেরোয়, বাবা আর মা ঘরে শুয়ে বসে থাকে। আমি একা বারান্দায় বসে থাকি। একা আমি চিরকালই। ঘরের প্রবাস আমার। দুলু কয়েকটা দিন শুধু আমার কাছে এসেছিল। খানিকটা ভালোবাসায়, খানিকটা আক্রোশে। ঘৃণা আর ভালোবাসার দূরত্ব বুঝি বেশি নয়। মানুষের মনে তারা পাশাপাশি দু'টি পাখির মতো বাস করে। একজন ডাক দিলে অন্যজন্যও ডেকে ওঠে। দুলুর সঙ্গে বাস করে আমার এমন এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। দুলুর উদাসীনতায় আমি বাস করি। এক এক সময় দুলু সচেতন হয়ে আমাকে ভালোবাসে কিছু, কিছু ঘৃণা করে।

ওই যে তিতু আর ঝিমলি—ওরা কি ঘৃণার ফসল, নাকি ভালোবাসার তা আমি বুঝি না। চেয়ে থাকি। বুঝতে চেষ্টা করি। সারাটা দুপুর ওরা উঠান আর বাগানময় খেলাঘর তৈরি করে, আর ভাঙে। এক এক সময়ে আমাকেও ডাকে। আমি তাদের পুতুলের কাপড় পরিয়ে দিই, পাহাড় বানাই, মিছিমিছির নেমন্তন্ন খাই। ছোটন সাধারণত এইসব খেলায় থাকে না, ছয় বছর বয়স তার, তবু বাড় নেই। তিন কি চার বছরের শরীর তার, কথা আধো-আধো, মুখ দিয়ে লালা পড়ে, মাথার ঘা, সারাটা দিন দাদু আর ঠাকুমার মাঝখানে শুয়ে থাকে। কোনও কোনওদিন সেও উঠে এসে খেলা করে। খেলা শেষ হয় একসময়ে। তখন গল্প বলার পালা। বারান্দায় তারা আমাকে ঘিরে বসে। আমি জঙ্গল আর পাহাড়ের গল্প বলি। বলতে বলতে একসময়ে তাদের কথা আর খেয়াল থাকে না। আমি গল্প বলে চলি নিজেকেই। সাপ, বাঘ, পাহাড়, জঙ্গল, আর মানুষ—উত্তর বাংলার সেই জীবনের বিচিত্র আলো-আঁধারিতে কখন হারিয়ে যাই। তিতু, ঝিমলি আর ছোটন হাঁ করে শোনে। শিউরে উঠে আমার গা ঘেঁষে আসে।

বিকেলে দুলু ফিরে এসেই তাদের সরিয়ে নেয়। আমাকে চাপা ধমকের সুরে বলে—ছেলেমেয়েদের নষ্ট কোরো না, ওদের ভিতরে তোমার মাট-ঘাট-পাহাড় আর রাজনীতির বাউন্ডুলেপনা ঢুকিও না।

বুকের ভেতরটা এখনো খিচ ধরে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ পালটে যায়। রাগে, হতাশায়। বড় নিষ্ঠুর তুমি দুলু। তোমার মায়া নেই।

চারিদিকে প্রতিদিন লাশ পড়ছে। তবু কেউ আমাকে সাবধান করে না। কারও উদবেগ নেই আমার জন্য। মনে হয়, তারা সবাই আমাকে চোখের সামনে দেখেও প্রতিদিন ভুলে যাচ্ছে। এর চেয়ে মৃত্যু খুব বেশি মর্মান্তিক নয়। দুলু নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলে—তুমি কেন বেরোও না? তুমি বেরোলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

মর্মান্তিক! তবু ঘটনাটা ঘটে যায়।

মধ্য কলকাতার পার্টি অফিসের ঘরে থাকত প্রকাশ। বিধানসভার অধিবেশন শেষ হলে উত্তর বাংলায় ফিরে যেত। এবারও যাওয়ার কথা। যাওয়ার অগের দিন ঘুরে ঘুরে কিছু বাজার করছিল। বাচ্চাদের জন্য খেলনা, বড়বাজার থেকে ডালের বড়ি, হাওড়া হাট থেকে ছিটকাপড়। ফিরতে বিকেল হয়েছিল। পার্টি অফিসের সামনের গলিতে চারজন তাকে ঘিরে ধরে।

প্রকাশের হার্ট ভালো ছিল না, সম্ভবত ডায়াবেটিসও ছিল। খুব মিষ্টি খেত প্রকাশ। উত্তেজিত হলে ইদানীং থর থর করে কাঁপত। বলতাম—ডাক্তার দেখা, একটা জীবন শরীরের দিকে তাকাসনি, এখনও সময় থাকতে—

প্রকাশ বলত—বাদ দে। শরীরটা পুষে রাখার জন্য নয়, কাজে লাগাবার জন্য। যতদিন কাজে লাগবে লাগুক, তারপর ফেলে দেবো।

কখনও বা বলত—ডাক্তারের কাছে যেতে মাইরি ভয় করে। ফায়ারম্যান ছিলাম, কত ধকল গেছে। পার্টি করতে গিয়ে শরীরের ওপর কত অত্যাচার করেছি। কোথায় কী হয়ে আছে শরীরের ভিতর কে জানে! হয়তো ক্যানসার, যক্ষ্মা, প্রেসার, ডায়াবেটিস কি হার্টের ব্যামো। ডাক্তার দেখালেই সব ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে না জেনে এই বেশ আছি—

প্রকাশের বউ দুলুর মতো সুন্দর ছিল না। ছিল না দুলুর মতো নিষ্ঠুরও। সে প্রকাশকে ভালোবাসত খুব। বউয়ের কথা বলতে প্রকাশ বলত—যা ভয় করেছিলাম, বউটা সেরকম হয়নি! আমার নতুন মাকে কেড়ে নেয়নি। বরং আমি বারমুখো বলে তারা শাশুড়ি বউ জোট বেঁধে থাকে। মা বাচ্চাগুলোকে সামলায়, বউ ঘরদোর দেখে। ভারি লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রেখেছে ঘরে—গরিবের ঘরে যতটা ফোটানো যায়। কিন্তু আমি কেমন লক্ষ্মীছাড়া দ্যাখ, সেই ঘরে আমার থাকাই হয় না। এত দূর পার্টি অফিসে পড়ে আছি, টেবিল পেতে শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে থাকি, পাউরুটি আর জল খেয়ে কত দিন কেটে যায়।

আমাদের বাড়িতে কতবার প্রকাশকে থাকতে বলেছি, থাকেনি। বলেছে—দূর! লোকে কী বলবে! আমাদের দল আলাদা—সেটা ভুলিস না।

বড় একটা চমক লাগত। প্রকাশের দল আলাদা! হায় ঈশ্বর কাটিহারের রাস্তায় রাস্তায় আমরা যে একসঙ্গে কতবার মার খেয়েছি!

যতদূর জানি, প্রকাশ শব্দটিও করতে পারেনি। চারজন তাকে ঘিরে ধরেছিল। খোলা রাস্তায় তার পার্টি অফিসের সামনেই। খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, খুব ভিড়। পুলিশ সদ্য এসেছে। মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সিতে প্রকাশের দেহটা শোয়ানো।

কিন্তু এ কে? একে তো কখনও চিনতাম না আমি। এই কি প্রকাশের চেহারা! তার মাথাটা প্রায়ই নেই-ই। আকারহীন, ফাটা ভাঙা একটা মাথা, চোয়াল ভেঙেছে। সমস্ত শরীর ছোরায় ছোরায় লন্ডভন্ড। একটা বয়স্ক, দুর্বল দেহের ওপর এ কেমন আক্রোশ ওদের!

এতটার দরকার ছিল না। প্রকাশের হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে, পেটের ভিতর থেকে একটা নাড়ি বেরিয়ে এসে ঝুলছে। আমি চোখ ফেরাতে পারি না, তাকাতেও চোখ ফেটে যাচ্ছে।

পুলিশ আমার কাছে একটা বিবৃতি চেয়েছিল। কিছুই বলতে পারি না। কথা এলোমেলো হয়ে যায়। আবোল-তাবোল কী সব বলি। মাঝে মাঝে শরীরে কাঁপুনি উঠে যায়। হিক্কা ওঠে। অনেকক্ষণ শূন্য লাগে মাথা, পুলিশের সাব ইন্সপেকটরটি আমাকে বললেন—আপনার শরীর বোধহয় ভালো নেই। যাক গে, পরে হলেও চলবে।

পত্রিকার লোক দু'একজন আমাকে ধরে। আমি ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, তারা সরে যায় অবশেষে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উবু হয়ে বসে এক কোশ জল বমি করি।

দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হল—প্রকাশ খতম।

মাসখানেক ভালো করে খেতে পারি না। বরাবর মন অস্থির হলে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে ঘুরে মন ঠিক হয়ে যা। এখন আর তেমন বাইরেও যাওয়া হয়ে ওঠে না। ঘরেই বেশির ভাগ থাকি। অবিরাম পায়চারি করি। মাথার ভিতরে চিন্তার ঘূর্ণীঝড় ওঠে। মাঝে মাঝে বসে থাকি, বসেই থাকি।

পৃথিবীতে সুখকর বিস্মৃতি আছে। মানুষের দুঃসময়ে যা সবচেয়ে বড় বন্ধু। একটু দেরিতে আসে ঠিকই। আস্তে আস্তে ক্রমশ বিস্মৃতির প্রলেপ পড়তে থাকে।

একদিন রাত দুটো নাগাদ দরজার কড়া নড়ল। ঘুমের মধ্যে সেই শব্দ তীরের মতো বিঁধে কাঁপতে লাগল। জেগে উঠেও বুকের দুরদুর আর থামে না। দুলুও তাঁর বিছানায় উঠে বসেছে, টের পেলাম। কিন্তু কিছু বলল না, জানালা দিয়ে জিগ্যেস করলাম কে?

কয়েকটা ছেলে জানালার সামনে এগিয়ে বসে বলল—অতনুদা, আমরা।

চিনলাম। পাড়ারই ছেলে, যারা চৌরাস্তার মোড়ে আড্ডা মারে। দেখে ভয়ও পেলাম একটু।

তাদের মধ্যে একজন জানালার কাছে এসে বলল—আমাদের মণিকে আজ পুলিশে তুলে নিয়ে গেছে। ওর কোনও দোষ নেই। ও-সি আপনার চেনা, যদি একটু বলে দেন।

একাজে আমি অভ্যস্ত। অতীতে বহুবার বহুজনকে ছাড়িয়ে এনেছি। কিন্তু এবার একটু ইতস্তত করতে থাকি। বলি—এত রাতে?

বলেই মনে মনে হাসলাম। কোনওকালেই আমার কাছে দিনরাতের কোনও ভেদ ছিল না। এখন এইসব গৃহস্থের সংস্কার আমার আসছে। ভয় খামচে ধরেছে বুক। এইসব ছেলেরা চেনা হয়েও আমার অচেনা। কোন অছিলায় বার করে নিয়ে গিয়ে যদি মারে। মেরে ফেলে?

সামনের ছেলেটা বলল—এত রাতে আসতাম না। কিন্তু ওকে যদি মারধোর করে। একটা নির্দোষ ছেলে সারারাত মার খাবে!

হঠাৎ সাহস এল। ভাবলাম, এদের নিয়ে বাস। যদি এরা আমাকে পেতে চায়, তবে পাবেই কোনও না কোনও দিন। তাই তর্ক করলাম না। বুঝলাম, যদি পিছিয়ে যাই তবে এরা হয়তো বা চিরকালের মতো আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এগোলে যদি বিপদ থাকে তো পিছোলেও বিপদ আছে। তাই বললাম—চলো, দেখা যাক।

গায়ে চামা চড়াতে চড়াতে অন্ধকারেই দুলুকে লক্ষ করে বললাম—সদরটা দিয়ে দিও। আমি ঘুরে আসছি।

অতীতে দুলু বহুবার রাতবিরেতে উঠে ঘুম-চোখে সদর দিয়েছে কিংবা খুলেছে, একটিও কথা বলেনি, এবার বলল—ওরা কারা?

—পাড়ার ছেলে।

—চেনো তো?

—চিনি।

একটু চুপ করে থেকে বলল—কীরকম চেনো? ভালো করে?

চাপা গলায় বললাম—ওরা জানালার কাছেই আছে। শুনতে পাবে।

দুলু উদাস গলায় বলল—দেখতে পাচ্ছি।

তারপর উঠে এসে আমার পিছু পিছু সদর পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে বলল—ওদের জন্য আমার ছাত্রীরা আসতে ভয় পায়। রাস্তার মোড়েই ওরা থাকে। এদের কাউকে যদি পুলিশ ধরে থাকে তো বেশ করেছে, তুমি ছাড়িয়ে এনো না।

উত্তর না দিয়ে দরজার হুড়কো খুললাম। ছেলেগুলো গম্ভীর নিস্তব্ধ মুখে দাঁড়িয়েছিল। বললাম—চল।

—আপনাকে কষ্ট দিলাম অতনুদা, বউদি হয়তো রাগ করছেন।

একটু কেঁপে উঠে বললাম—না না, রাগের কী। মানুষের বিপদে-আপদে দেখতে হয় না।

ওরা আর কিছু বলল না। কয়েকজন আমার আগে, কয়েক জন পিছনে হাঁটতে লাগল। বড় অদ্ভুত অবস্থা হল আমার। আগের দলকেও বিশ্বাস হচ্ছে না, পিছনের দলকেও না। রাস্তার মোড়ে একটা তেঁতুলগাছ, তার ঝুপসি ছায়া। ছায়াটা পেরোবার সময়ে চোখ বুজে বিড় বিড় করে বললাম—বোধহয় এইবার—এইখানে—।

কিন্তু ছেলেগুলো আমার দিকে তাকালও না। পিছনে কয়েকজন একটু দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, দেশলাইয়ের শব্দ পেলাম। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। সারাটা রাস্তায় আমি হাঁটতে হাঁটতে ভয়ে ঘেমে গেলাম। অদূরে থানার আলো যখন দেখা যাচ্ছিল তখনও আমার ভয় কাটে না।

থানার দেউড়ির একটু দূরে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে বলল—আপনি যান। আমরা এখানে রইলাম।

বললাম—তোমরাও এসো না।

একজন একটু হেসে বলল—আমাদের অনেকের নামেই ওয়ারেন্ট আছে। ঝামেলায় কাজ কী? এসব ব্যাপারে আপনি একাই একশো।

খুবই বিপন্ন বোধ করলাম এই ভেবে যে, এদের সঙ্গেই হয়তো এতটা পথ আবার আমাকে একা ফিরতে হবে। আজকাল পথ আর আমার ফুরোয় না।

চেনা ও-সি মুখ তুলে ভ্রূ তুললেন—আপনি!

আমি হাসলাম—ওই যে মণি নামে ছেলেটা—

ও-সি অবাক হয়ে বললেন—সে তো আপনার দলের ছেলে নয়। বরং বোধহয় উলটো পার্টির।

আমি উদাস গলায় বললাম—না। আমার পাড়ার ছেলে, আমি চিনি।

ও-সি মাথা নাড়লেন—এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে আমার খবর বেশি পাকা। বরং আপনি ছেলেটিকে একবার দেখুন ভালো করে, আপনার ভুল হতে পারে—।

আমি ইতস্তত করছি দেখে ও-সি হাসলেন—দেখলেই বুঝতে পারবেন, এ আপনার দলের নয়। আসুন—

ও-সির সঙ্গে সঙ্গে উঠে লক-আপে গেলাম। ভিতরে একটি ছেলে মেঝের ওপর বসে আছে। ঘাড় পর্যন্ত তার লম্বা রুক্ষ চুল, গালে না-কামানো দাড়ি, বেশ লম্বা ছেলেটা, কাঁধের হাড় চওড়া। গায়ে মাংস নেই, কিন্তু হাড়গুলো মজবুত। দুটো চোখ লালচে। আমাকে দেখে সেই লাল চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তাকে আমি আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।

শান্ত গলায় সে বললে কী চাই?

আমি ও-সির দিকে তাকালাম, তাঁর মুখে সন্দেহের ছায়া।

মুখ ফিরিয়ে ছেলেটার সঙ্গে নকল পরিচিতের সুরে বললাম—কী হয়েছিল মণি? কী করেছিলে?

ছেলেটি একুট চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল—আপনি কেন দালাল মশাই?

একটু থেমে গেলাম। বুঝলাম, ছেলেটা আমাকে চেনে। 'দালাল' কথাটা প্রমাণ করে যে, ছেলেটি আমার দলের নয়। বরং ও-সির কথাই ঠিক। ছেলেটা উলটো পার্টির।

তবু মুখ বাঁচানোর জন্য চাপা স্বরে বললাম—মণি, কী হচ্ছে। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভারি অবাক হল ছেলেটা। তারপর ধীরে ধীরে তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, মুখে দেখা দেয় রাগের রক্তিমাভা। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—কে চায় ছাড়া পেতে? আপনি কোন পার্টির দালালি করেন আমি কি তা জানি না।

তার গলায় হঠাৎ খ্যাপা কুকুরের চিৎকারের মতো তুঙ্গে উঠে যায়। সে চেঁচিয়ে বলতে থাকে—যাদের দালালি করে এসেছেন এতদিন, তাদের জন্য দারোগার কাছে নাকে কাঁদুন গে। সাচ্চা বিপ্লবী চোখ দেখেছেন একটাও? আমি যখন বেরোব, এই থানার দেওয়াল ভেঙে বেরোব, আপনার মতো দালাল কুত্তার হাত ধরে নয়। এই দারোগা এটাকে বের করে দিন, আমার ঘেন্না করছে।

রাজনীতি করার একটা শিক্ষা হচ্ছে এই যে, নিজে রাগ অনুভূতি, ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ আসে, অপমান সহ্য করার মতো সহনশীলতা জন্মায়। আমি রাগলাম না। ও-সি কে একটু তফাত হতে বললাম। তিনি একটু হেসে সরে গেলেন।

আমি সেল-এর কাছে গিয়ে ছেলেটিকে বললাম—তোমার বন্ধুরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে তারা নিয়ে যেতে চায়।

ছেলেটার চোখ আবার ঝিকিয়ে উঠল। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল—কারা আমার বন্ধু? তাদের নাম কী?

সকলের নাম আমার জানা ছিল না। দু'একজনের ডাক নাম জানতাম! বললাম—ভুলু মণ্ডল, শচী, এরা সব।

ছেলেটা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে সন্দেহে কুটিল হয়ে গেল তার মুখ, গরাদের শিখ ধরে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে হঠাৎ আমার গায়ে এক ঝলক থুতু ছুঁড়ে দিল সে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল—ওরা আমার বন্ধু? কুকুরের বাচ্চা, আমি তোমার মতলব বুঝি না?

থুথুর ভয়ে আমি পিছিয়ে এসেছিলাম। তাছাড়া ছেলেটার রাগের তাপও আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার ভয় করছিল। আমি অবাক হয়ে বললাম—ওরা তোমার বন্ধু নয়?

ছেলেটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল—ওরা আমার কীরকম বন্ধু আপনি জানেন না? না জেনেই এত কষ্ট করে মাঝরাতে বউয়ের কোল ছেড়ে উঠে এসেছেন?

হঠাৎ আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছিল কোথাও একটা ভুল হয়ে গিয়ে থাকতে পারি। তবু আমি ঐকান্তিকভাবে বলার চেষ্টা করলাম। ওরা তোমার বন্ধু কিনা জানি না। তবে ওরা ভয় পাচ্ছে পাছে তোমাকে পুলিশে মারধোর করে, তাই আমাকে ডেকে এনেছে।

ছেলেটা দুই শক্ত হাতে এত জোরে গরাদ চেপে ধরল যে তার আঙুলের মাথাগুলো সাদা হয়ে গেল। তেমনি ঠান্ডা রাগের গলায় বলল—আমাকে মারধোর করার সাহস এদের নেই। যদি করে, তবে নির্বংশ করে দেব। কিন্তু ওই যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কেন দাঁড়িয়ে আছে, আমি জানি। আপনি ওদের হয়ে কেন এসেছেন তাও জানি। দালাল আর কুত্তার দল কেউ থাকবে না। আপনার দিন শেষ হয়ে এসেছে—ওদেরও।

এই বলে হঠাৎ সেল-এর দরজাটা ঝনাত করে খুব জোরে নাড়া দিয়ে ছেলেটা ডাকল —এই দারোগা—

ও-সি ধীরে সুস্থে এলেন। আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে চোখে ইঙ্গিত করলেন। আস্তে বললেন—বলেছিলাম কিনা!

ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল—এ লোকটা এখানে কেন এসেছে জানেন?

ও-সি বললেন—অতনুবাবুকে আমি চিনি।

ছেলেটা শিকের ওপর জোর একটা ঘুঁষি মেরে বলল—ছাই চেনেন! বাইরে কতগুলো কুত্তা দাড়িয়ে আছে, আর এটা হচ্ছে সেই কুত্তাদের এজেন্ট। আমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে, বাইরে নিয়ে গিয়ে—হিসহিস—বলে ছেলেটা হাত তুলে নিজের গলায় নলিটার ওপর চালিয়ে দেখাল। তারপর হাসল। বলল—গলাটা কেটে ফেলবে।

ও-সি তাকিয়েছিলেন।

ছেলেটা গনগনে মুখে বলল—একে আপনি কিছুই চেনেন না।

ও-সি আমার দিকে ফিরে বললেন—বাইরে কারা দাঁড়িয়ে আছে?

আমার ভয়ঙ্কর বুক কাঁপল। আমার বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্রই আমি ধরতে পারিনি। মনে হচ্ছিল বেশিরভাগ মানুষই আমার চেয়ে চালাক। আমি বড় বোকা রয়ে গেছি।

নামগুলো ও-সি কে বললাম।

তিনি রুদ্ধশ্বাসে বললেন—এতক্ষণ বলেন কি কেন? ওদের আমরা খুঁজছি—

বলতে বলতে তিনি হাতে স্বয়ংক্রিয় রিভলবার টেনে বের করে ব্যস্তভাবে চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে বলে গেলেন—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি। ওরা কোথায় আছে?

—বাদামতলায়।

মুহূর্তের মধ্যে বুটের শব্দ ঝড়ের মতো ছোটাছুটি করল। একটা জিপের শব্দ পেলাম। ব্যস্ততা।

শরীরের ভয়ঙ্কর অবসাদ টের পেয়ে আমার পা ভেঙে আসছিল। আমি অজান্তে আস্তে আস্তে দেওয়াল ঘরে মেঝেতে বসে পড়লাম।

মুখোমুখি সেল-এর ভিতরে শিকের ফাঁক দিয়ে ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে আছে। তেমনি জ্বলজ্বলে চোখ। আমাকে বসে পড়তে দেখে একটু হাসল। বলল—খুব খারাপ লাগছে? লাগবেই—প্ল্যানটা ভেস্তে গেল।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম—আমি কিছুই জানি না!

ছেলেটা ব্যাঙ্গের হাসি হাসল—জানেন না।

—না।

ছেলেটা মুখে জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল—আমার দলের ছেলেরা যখন আপনার পাত্তা নেবে তখন একথা বলবেন।

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে টের পেলাম, আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক অদ্ভূত অসহনীয় ভয়। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। অমি সম্মোহিতের মতো ছেলেটার দিকে চেয়ে রইলাম। এরকম রাগ আর তীব্রতা আমি আর কোন মানুষের মধ্যে দেখিনি। ছেলেটার রাগ, ব্যঙ্গ, ঠাট্টা, শান্তভাব—সব যেন এক সুরে বাধা। একটা চরম বা শেষ কিছু করার জন্যই যেন জন্মেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, এর আয়ু বেশি না। খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এর তার হাতে খুন হয়ে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ ও বেঁচে আছে, ততক্ষণ ওর বেঁচে থাকার তীব্র স্পন্দন চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওকে ভয় না পেয়ে উপায় নেই।

আমার গলার স্বর অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল, কাঁপছিল বুক, হাত, পা। মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে বোধবুদ্ধি। আমি বললাম—আমি তোমাকে চিনতাম না মণি।

ঠান্ডা গলায় সে বলল—চিনবেন! সময় যায়নি।

বুঝলাম, ওর কোনও মায়া দয়া নেই।

আমি মিনমিন স্বরে বললাম—আমাকে ওরা ভুল বুঝিয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি যে, তুমি ওদের দলে নও।

ছেলেটা শরীর ঝাঁকি দিয়ে বলল—আমি কুত্তাদের দলে কেন যাব। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের শিস দেওয়া কী কাজ? সাচ্চা বিপ্লবীরা ওসব ঘেন্না করে—বলে ছেলেটা সেল-এর মধ্যে থুথু ফেলল।

তারপর আবার হাসল—আপনি চিরকাল এর-ওর পা চেটে এসেছেন, বিধানসভার নমিনেশনের জন্য। আজ এবার এদের পা চাটছেন—কীসের জন্য? আমি আপনাকে এবং আপনাদের চিনি, এবার আপনারা একটু আমাদের চিনুন। আমার নাম মণি বোস—ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলাম। ভালো ছাত্র—পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট ক্লাস পেতাম। মাদ্রাজে আমার বাবা আমার জন্য ভালো চাকরি ঠিক করে রেখেছিল। আমাকে বিয়ে করার জন্যে ছেলেবেলা থেকে একটি খুব সুন্দর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে। সব কিছুই ছিল আমার ফেভারে। সে-সব ছেড়ে আমি বিপ্লবে নেমেছি কেন?

আমি ভীতমুখে তাকিয়েছিলাম। প্রশ্ন করলাম—কেন?

ছেলেটা হাসল, বলল—কারণ বিপ্লব মানে আমি মিছিল-মিটিং বুঝি না। বিপ্লবের মানে ক্যাডারদের লক-আপ থেকে ছাড়িয়ে আনাও নয়। বিপ্লব মানে বিধান সভার সিট পাওয়াও নয়। আর বিপ্লবী বলেই আমি বউয়ের পয়সায় বসে খাব—এত হয় না। লরির পারমিটের জন্য ঘুরব তাও হয় না।

এই পরিণত বয়সে আমি এই প্রথম একটি বাচ্চা ছেলের কাছে বিপ্লবের মানে শুনছিলাম। বেশ উৎকর্ণ হয়েই শুনছিলাম।

ছেলেটি লক আপের ভিতর থেকে এমনভাবে আমাকে দেখছিল, যেন আমিই লক আপে আছি, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

বলল—সত্যিকারের বিপ্লব এ সব কিছুকেই ধুয়ে-মুছে দিয়ে যাবে। আমি সব ছেড়েছি কাজেই সব কিছুর শেষ দেখে যাব।

বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

জিপের শব্দটা ফিরে এল।

ছেলেটা উৎকর্ণ হয়ে শব্দ শুনল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল—পুলিশ আপনার কুত্তাদের কয়েকজনকে বোধহয় ধরে এনেছে। এবার যান, দারোগার পা চেটে খালাস করুন গে।

আমি উঠলাম। দুর্বল লাগছিল খুব।

বাইরে থানার হাতায় তখন জিপটা থেমেছে! ও-সি নামলেন। গম্ভীর মুখ। জীপের পিছন থেকে সিপাইরা ধরাধরি করে একজনকে নামাচ্ছিল। তার শরীর থেকে রক্ত পড়ছে টপটপ করে। ছেলেটার মুখ আমি দেখলাম না। চোখ ফিরিয়ে বাইরের রাস্তায় ম্লান ল্যাম্পপোস্টের আলো ঝুপসী গাছের ছায়া, এবং দূরবর্তী বিরাট, ব্যাপক অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম।

ও-সি আমাকে ডাকলেন—অতনুবাবু, ভিতরে আসুন। কথা আছে।

টেবিলে মুখোমুখী বসে আমি ও-সিকে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলাম। যেমন বরাবর দিই। উনি সিগারেট নিলেন না। হাতটা নেড়ে বললেন—একজনকে ধরেছি, কিন্তু আনহার্ট নয়। এক্ষুনি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। তবে আগে আপনি একটু দেখুন। আইডেন্টিফাই হওয়া দরকার।

আমি চুপ করে রইলাম।

সিপাইরা ছেলেটাকে বারান্দায় শুইয়ে প্রাথমিক ওষুধপত্র লাগাচ্ছিল। আমি উঠে গিয়ে দেখলাম। মাথার একটা দিক থেঁতলে গেছে প্রায়, পায়ের দিকটা গুরুতর জখম। মুখটা দেখে চিনলাম, যে ছেলেটা সবার আগে-ভাগে ছিল সে-ই, নাম জানি না।

ও-সিকে বললাম—নাম জানি না। তবে ওই দলে ছিল।

ও-সি আবার হাত নাড়লেন—ঠিক আছে। নাম-ধাম আমরা পেয়ে যাব। দলে ছিল কিনা সেটাই বড় কথা।

তিনি আবার আমাকে ঘরে এনে বসালেন। কিছু একটা লিখলেন ডায়েরিতে, তারপর পেনসিলটা তুলে মুখের সামনে আড়াআড়ি ধরে বললেন—মনে হচ্ছে, আপনি ওদের ভালো করে চেনেন না।

আমি মাথা নাড়লাম—না। তবে পাড়ার ছেলে, চিনি।

ও-সি শ্বাস ছেড়ে বললেন—সেই মুখচেনার ওপর নির্ভর করে এত রাত্রে ওদের সঙ্গে আসা আপনার ঠিক হয়নি। ওরা আপনাকে কাজে লাগিয়েছিল। আপনার কথায় আমি বোসকে ছেড়ে দিলে আজ রাত্রেই মণি মার্ডার হত ওদের হাতে। তখন আপনি কী করতেন।

আমি নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলাম।

উনি আবার বললেন—কতখানি ঝুঁকি নিয়েছিলেন, বুঝতে পারছেন?

আমি মাথা নাড়লাম—পারছি।

উনি হাসলেন—আপনাদের আমলে রাজনীতি একরকম ছিল। এখন অন্যরকম। একটু বুঝে চলবেন।

আমি মাথা নাড়লাম!

উনি শ্বাস ছেড়ে বললেন—এখন আপনি একটু বিপদের মধ্যে আছেন কিন্তু! ওই দলের যারা পালিয়েছে, তারা পাড়ার রাস্তাতেই বোধহয় অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

আমি শীতলতা অনুভব করলাম শরীরে।

উনি বললেন—আমাদের প্রিজন ভ্যান ছেলেটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। আপনি ওই ভ্যানে চলে যান। হাসপাতালে ঘুরে আপনার বাড়িতে দিয়ে আসবে।

কথা বলতে পারছিলাম না। কেবল আবার মাথা নাড়লাম।

দুলু জেগে অন্ধকার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থামতেই আস্তে দরজা খুলল। আমি ঢুকতে সাবধানে আবার দরজা দিয়ে বলল—তুমি পুলিশের গাড়িতে এলে?

—হুঁ।

—কেন?

—ওরাই পৌঁছে দিল।

দুলু শ্বাস ছেড়ে বলল—একটু আগে দুটো ছেলে এসে খোঁজ করে গেছে তুমি ফিরেছ কিনা।

আমি অন্ধকারে কেঁপে উঠলাম। বললাম—কেন?

—কেন তা তো আমিই জানতে চাইছি। তুমি তো ওদের সঙ্গেই গিয়েছিলে, তবে ওরা তোমার খোঁজ করছিল কেন?

—তুমি ওদের জিগ্যেস করোনি?

—করেছিলাম। ওরা কেবল বলল—কাজ আছে!

ঘরে ঢুকে দুলু বাতি জ্বালতে হাত বাড়িয়েছিল। আমি নিষেধ করলাম—বাতি জ্বেলো না।

কেন?

—দরকার কী! আলো জ্বাললে ছোটনটা হয়তো জেগে যাবে। অন্ধকারে জামাটা ছেড়ে শুয়ে পড়ব এক্ষুনি।

দুলু আলো জ্বালল না। একটু চুপ করে হঠাৎ বলল—জানালাটা বন্ধ করে দেব?

আমি থমকে গেলাম। দুলু বোধহয় বুঝতে পেরেছে কিছু।

একটু ইতস্তত করে বললাম—দাও।

জানালাটা শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ে খোলা থাকে। আবছা একটু রাস্তার আলোর আভা ঘরে আসে। দুলু জানালাটা বন্ধ করতেই নিবিড় অন্ধকার আর গুমোটে ঘর ভরে গেল। তবু নিশ্চিন্ত। এখন আর বাইরে থেকে আমাকে দেখা যাবে না।

শোওয়ার কোনও মানে হয় না। ঘুম অসম্ভব। একটা সিগারেট জ্বেলে বিছানায় বসলাম মশারি সরিয়ে। দুলু তখনও শোয়নি। অন্ধকারেই জল খেল। তারপর তার হাই তোলার শব্দ পেলাম।

—তুমি কতক্ষণ জেগে থাকবে? দুলু জিগ্যেস করে।

—বেশিক্ষণ না! সিগারেটটা শেষ করেই শোব। তুমি শুয়ে পড়ো।

অন্ধকারে ওকে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু টের পেলাম, ও আমার কাছে আসছে! শাড়ির শব্দ, চুড়ির শব্দ, মারকোলাইজড ওয়াক্স-এর গন্ধ। আমার গা ঘেঁষে বসল এসে। তারপর হাত বাড়িয়ে আমার সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে বলল—আমি একুট খাই।

অন্ধকারেই দেখলাম, ও সিগারেট টানছে। আগুনের আভায় মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মুখ। বাধা দিলাম না। অনেকক্ষণ সিগারেটটা খেল দুলু, শেষ ধোঁয়া মুখ থেকে বের করে বলল—মাথা ধরেছিল খুব। সিগারেটে সেরে গেল। বেশ জিনিস তো! এবার থেকে মাঝে মাঝে খাবো।

—খেও।

—বলবে না?

হাসলাম। দুলুকে তো কখনও আমি বকি না।

নিবিড় অন্ধকারে দুলুর একখানা নরম ভারি হাত আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল, পরমুহূর্তে আর একখানা হাত জড়াল আমার পিঠ। ওর উষ্ণ দুই ভেজা ঠোঁট চুম্বকের মতো লাগল এসে আমার ঠোঁটে। আমি ওকে দুই হাতে ধরে বললাম—আস্তে, মশারি ছিঁড়বে।

—ছিঁড়ুক।

দুলুকে আমি ঠিক বুঝি না। মুহূর্তে মুহূর্তে ও পালটে যায়। কখনো আমাকে চেনেই না, কখনো বা এত বেশি চেনে যে, আমার হাঁফ ধরে যায়।

ঠাট্টা করার মতো মন নেই। তবু বললাম—হয়তো আবার ছোটনের মতো কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

ও ঘন শ্বাসের সঙ্গে বলল—ঘটুক।

আমি মশারি তুলে দুলুকে বিছানার ভিতরে আনলাম। দুলু আমাকে আর আদর সোহাগ দিয়ে যছেষ্ট আক্রমণ করছিল। খুবই সুখের ঘটনা সেটা। কালেভদ্রে আমি দুলুর স্বাদ পাই। কিন্তু এই মুহূর্তে দুলুকে শরীরে জড়িয়েও আমি ওর স্বাদ পাচ্ছিলাম না। অন্ধকারে আমার চোখের সামনে তখন সেল-এর গরাদের ফাঁক দিয়ে তীব্র একখানা তাম্রাভ মুখ ধক ধক করে জ্বলছে। কেবলই টের পাচ্ছি, শিয়রের বন্ধ জানালার ওপাশে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে।

আমার অনিচ্ছা বোধহয় বুঝতে পারল দুলু। হঠাৎ আদর থামিয়ে বলল—কোন দিন তোমাকে কিছু জিগ্যেস করিনি, আজ করছি—ওই ছেলেদুটো তোমার খোঁজ করছিল কেন?

—কি জানি!

—তুমি কেন পুলিশের গাড়িতে ফিরলে?

হাসলাম। —বললাম তো ওরা এদিকেই আসছিল, আমাকে পৌঁছে দিল। একটু চুপ করে থেকে দুলু আবার জিগ্যেস করে—আমার আদর তোমার ভালো লাগছে না কেন?

—লাগছে তো!

—না। তুমি অন্যমনস্ক। সেই ছেলেটা ছাড়া পায়নি বুঝি?

আমি অবসন্ন গলায় বললাম—না।

—কেন? ও-সি তোমার কথা শুনলেন না?

—তা নয়। ছেলেটা ছাড়া পেতে চাইল না।

—জামিনেও না?

—না।

—কেন?

—এখনকার ছেলেদের ধাত আলাদা। ওরা কষ্ট পেতে ভালোবাসে। কষ্ট দিতেও।

দুলু আমার কাছেই শুয়ে রইল। অন্য বিছানায় গেল না। আমি তাকে মাঝে মাঝে আদর করছিলাম, যান্ত্রিকভাবে। আদর না করলে পাছে ও কিছু মনে করে। ওদিকে আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি কখন আমার শিয়রের জানালায় টোকা পড়ে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য টোকা পড়ল না। বোধহয় আমাকে পুলিশের গাড়িতে ফিরতে ওরা দেখেছে। হয়তো পুলিশের গন্ধেই ওরা আসছে না। কিন্তু আসবে। আজ না হয় কাল। দেখা হয়ে যাবে। হয় এ দলের সঙ্গে, নয়তো ও দলের। কোথায় পালাবে বাবা—হুঁ! হুঁ!

আমার কোলের কাছেই দুলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরের আবছা আলোয় তার ঢলঢলে মুখখানা মন দিয়ে দেখলাম। দুলু আমাকে ভালোবাসে? কেউ কি ভালোবাসে? কারও কাছে কি এখনও আমার কোনও মূল্য আছে? ভাবতে ভাবতে ভোর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বেলায় ঘুম ভাঙল। টের পেলাম, ঘুমের মধ্যে আমি অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখছি। সারা শরীরে জ্বরের অবসাদ। মুখ তেতো। সবচেয়ে ক্লান্ত মন। কিছু ভাবতে পারছি না। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা গুলিয়ে যাচ্ছে। সে দিনটা আর বেরোলাম না। শুয়ে রইলাম। ঝিমলি মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে এসে আমার মাথা টিপে দিল। অনেকক্ষণ ছোটনকে বুকে নিয়ে তার শরীরের গন্ধ নিলাম। ভালো লাগছিল।

বিকেলের দিকে দুলু স্কুল থেকে ফিরল। ওর মুখ-চোখ সাদা দেখাচ্ছিল। স্কুল থেকে ফিরে ও রোজ দুটো ভাত খায়। আজ খেল না। শাড়ি-টাড়ি পালটে, বাথরুম ঘুরে এসে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়াল। আমি অপেক্ষা করছিলাম, হয়তো ও আমাকে কালকের ব্যাপারে আর কিছু জিগ্যেস করবে।

কিন্তু সে ব্যাপারে কোনও কথা না বলে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বলল—তুমি আজ বেরোওনি?

—না।

—সে কী। সূর্য আজ কোন দিকে উঠেছিল?

হাসলাম, বললাম—শরীরটা ভালো নেই। বয়সও হচ্ছে।

—সেটা বুঝতে এত সময় লাগল।

চুপ করে রইলাম।

ও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—শরীরটা আমারও ভালো যাচ্ছে না। ভাবছি কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়! যাবে?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—তুমি যেতে চাও? কিন্তু তোমার স্কুল আর টিউটোরিয়াল?

—তারা পালাবে না। ছুটি নিচ্ছি।

একটু ভেবে বললাম—আমার তো অনন্ত ছুটি। কবে যাবে?

—কালই চল।

অবাক হয়ে বলি—এত তাড়াতাড়ি?

ও আয়নার দিকে তাকিয়ে সিঁথিতে সিঁদূর দিতে দিতে বলল—তাড়াতাড়িই ভালো! দেরি করলে উৎসাহ নিভে যায়। তাছাড়া আবার কোনও বাধা আসে ঠিক কী!

ইতস্তত করে বললাম—কিন্তু যাওয়ার তো একটা প্রস্তুতি আছে। রিজার্ভেশন নেই, কোথায় যাওয়া ঠিক নেই, তাছাড়া পার্টি-অফিসে আর দুচার জায়গায় খবরও দিয়ে যেতে হবে—

ও দৃঢ় গলায় বলল—না। কোথাও খবর দিতে পারবে না। আমরা চুপ করে চলে যাব, বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানবে না, কোথায় যাচ্ছি তা বাড়ির লোককেও বলে যাব না।

অবাক হয়ে বললাম—কেন?

—আমার ইচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে আমার একটা শখ ছিল কারও সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার। যাওয়া হয়নি। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, তাই শখটা মিটিয়ে নিই। তোমার সঙ্গে কাল আমি পালাব।

ক্লিষ্ট হাসলাম। বললাম—ছেলেমেয়েরা?

—ওরাও যাবে।

—কোথায় যাওয়া হবে?

—এখন বলব না। স্কুলের বেয়ারাকে টিকিট কাটতে পাঠিয়েছি, সন্ধ্যে নাগাদ এসে দিয়ে যাবে।

—কিন্তু থাকার জায়গা?

ও হাসল, ব্যাগ থেকে একটা চিঠি বের করে দেখিয়ে বলল—যেখানে যাচ্ছি সেখানে সারাবছর অনেক বড়লোকের বাড়ি খালি পড়ে থাকে। তাদের একজনকে পাঠিয়ে এই চিঠি এনেছি। ওখানে মালি থাকে। চিঠি দেখালেই সে বাড়ি খুলে দেবে।

এত অল্প সময়ে এত ব্যবস্থা দুলু করেছে দেখে খুবই অবাক হলাম। কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। উত্তরবাংলা ছাড়ার পর দশ বছর হয়ে গেছে কোথাও যাওয়া হয়নি। গাছপালা, পাহাড়-জঙ্গলের জন্য মন কাঁদে। তাই হঠাৎ এ অবস্থায় ভালোই লাগছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। দুলু কি টের পেয়েছে আমার খুব বিপদ!

আমার বাবা এই বুড়ো বয়সেও মেরুদণ্ড সোজা রেখে রোজ বিকেলে অনেকটা হেঁটে আসেন। সেদিনও এলেন। এসেই উত্তেজিতবাবে বাইরের ঘরে মাকে জিগ্যেস করলেন—অনু কই? বাইরে-টাইরে যায়নি তো?

মা বললেন—না বোধহয়। বিকেলেও ঘরে শুয়ে ছিল। শরীরটা বোধহয় ভালো নেই।

—না বেরিয়ে ভালো করেছে! দিনকাল বড় খারাপ।

—কেন?

—বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল দেওয়ালে কারা ওর নামে কী সব লিখছে। অনেকগুলো দেওয়ালেই লেখা।

—কী লিখেছে?

—চোখে ভালো দেখি না, ঠিকমতো পড়তে পারি না। তবে মনে হল লিখেছে—বিশ্বাসঘাতক, মুণ্ডু চাই, আরও কী কী যেন। দাঁড়িয়ে পড়তে ঠিক সাহস হল না।

ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছিল। মশার জন্য টেকা যাচ্ছিল না। আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। দুলু কেন কালকেই আমাকে নিয়ে পালাতে চাইছে তা খানিকটা বোঝা গেল।

মা তখনও ব্যগ্রকণ্ঠে বাবাকে জিগ্যেস করছে—ওর নামে লিখবে কেন? ও তো কিছু করেনি।

বাবা তেতো গলায় বললেন—আর কিছু না করুক পলিটিক্স তো করেছে।

—কিন্তু কার ক্ষতি করেনি। আমি ওকে জানি।

—আরও কারও না করুক, নিজেক ক্ষতি যথেষ্ট করেছে। কাল রাতে যারা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের একজন ধরা পড়েছে, শুনছিলাম।

—তাকে কি ও ধরিয়ে দিয়েছে?

—কী জানি!

মা চুপ করে রইল।

অন্ধকারে বসে নিঃশব্দে আমি এইসব শুনলাম। মনটা বিস্বাদে ভরে গেল। কারা বিশ্বাসঘাতক তা আমি জানি না। তবে এটুকু জানি, কাল রাতে নিজের অজান্তে আমি একটি ফাঁদে পা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাবা কী মনে করেন, বিশ্বাসঘাতক আমিই! আর দুলু? সে কী ভাবছে? আমার ওপর কী এদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! এতক্ষণ আমি এদিকটা ভাবিনি। ভেবে মন বড় খারাপ হয়ে গেল!

কাউকে কিছু জানানো হল না। পরদিন সন্ধের পর ট্যাক্সি ডাকা হল। স্তব্ধতা, ভয়, সন্দেহের মাঝখানে আমি, দুলু আর আমার তিন ছেলেমেয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে গাড়ি ধরলাম।

রওনা হওয়ার সময়ে বাবাকে বলেছিলাম—সাবধানে থেকো।

বাবা গম্ভীর চিন্তিত গলায় বললেন—আমরা বুড়ো হয়েছি! আমাদের জন্য আর চিন্তা কী! তোমাদের এখনও বয়স আছে, সাবধানে তোমরা থেকো। বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলো না। চারদিকে বিপদ।

'বিপদ' কথাটা সারারাত গাড়ির শব্দের সঙ্গে নূপুরের মতো বাজল। সারারাত দুলু আর ছেলেমেয়েরা থার্ডক্লাশের ভিড়ে শুয়ে বসে ঝিমোলো, আমিই কেবল অপলক চোখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম।

ভোর-রাত্রে যশিডি জংশনে গাড়ি থামল। আমরা নামলাম।

আবছা অন্ধকারে টাঙা চড়াই-উৎরাই ভেঙে চলেছে। ঘোড়ার পায়ের কপ কপ শব্দ। আমার গা ঘেঁষে দুলু। দুলুর কোলে ছোটন ঘুমোচ্ছে। তিতু টাঙাওয়ালার পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে ভোরবেলার দেওঘর দেখছে। ঝিমলি টাঙার ছইয়ের তলায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে। ওর মুখে চোখে ভয়। যেতে যেতে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। স্তব্ধ, হিম আকাশ! মনটা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। আজকাল দেখছি আকাশের দিকে তাকাতে ভালো লাগে।

দুলুকে সে কথা বললাম।

সে হাসল—আকাশ সংসারের বাইরের জিনিস, তাই তোমার ভালো লাগে। সংসারের কিছু তো কোন দিন ভালো লাগল না তোমার।

এই কথা শুনে দুলুর দিকে তাকালাম। আবছায়ায় দেখলাম, সেই মুখে প্রশান্ত ভাব। কলকাতা থেকে হঠাৎ বাইরে এলে বিশাল প্রকৃতির মধ্যে মানুষের খুব অবাক লাগে। সেই বিস্ময় ওর মুখে ফুটে আছে।

বললাম—সংসারের বাইরে এসে তোমার খারাপ লাগছে?

—না। ও মাথা নাড়ল, তারপর হেসে বলল—আমিও আকাশ দেখছি। বুড়ো বয়সে বোধহয় এইসব ভালো লাগে। আমরা বুড়ো হলাম।

হঠাৎ আমার বুক মুচড়ে উঠল একটা দুঃখে। আচমকা বললাম—দুলু, তুমি আমাকে সন্দেহ করো না তো?

ও অবাক হয়ে বলল—কেন?

আমি বললাম—ওই ছেলেটাকে কিন্তু আমি ধরিয়ে দিইনি!

দুলু চুপ করে রইল।

খানিকটা ভেবে আমি আস্তে আস্তে শ্বাস ছেড়ে আবার বললাম—দুলু, আসলে ওকে বোধহয় আমি ধরিয়ে দিয়েছি।

দুলু একটু শিউলে উঠল। তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল—তুমি পরশু থেকে ঘরের বার হওনি। তাই কোনও খবর জান না। ছেলেটা কাল হাসপাতালে মারা গেছে। আজ সকালে শোক-মিছিল বেরোনোর কথা। দেওয়ালে তোমার নামে পোস্টার পড়েছে।

একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম—জানি।

দুলু তাড়াতাড়ি বলল—কিন্তু আমি জানি, ওরা বাজে ছেলে। তুমি কিছু অন্যায় করোনি।

আমি চুপ করে আকাশের দিকে তাকালাম। ওখানে বড় শান্তি মনে হল।

এখানে আমি আগে আর কখনও আসিনি। ভোরের আলোয় প্রথম দেখে জায়গাটি বড় ভালো লাগল। ছোট টিলা, পাহাড়, ছোট্ট নদী ধারোয়া, নানা চড়াই-উৎরাই জুড়ে নির্জন শহরের প্রসার। ক্যাস্টর টাউন খুবই নির্জন জায়গা। ইউক্যালিপটাস গাছ, আর বোগেনভেলিয়ার লতানে রঙিন ফুলের ভিতরে বাগানঘেরা বিরাট বাড়িগুলো ঝিমিয়ে আছে। বেশিরভাগ বাড়িতেই কেউ থাকে না। কালে-ভদ্রে লোকজন আসে। আমাদের বাড়িটা পুরনো, বাগানে খুব আগাছা জন্মেছে।

গেটের কাছে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে। আমাদের টাঙা থামতেই দু'এক পা এগিয়ে এল। লক্ষ করলাম, খোঁড়া। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ডান পায়ের পাতাটা অর্ধেক নেই। তার উঁচু দাঁত পুরু দুই ঠোঁটে ঢাকা পড়ে না। তার ওপর সে আবার সব সময়েই হাসে।

জিগ্যেস করলাম—মালি নেই?

সে ঘাড় নাড়ল—আছে।

—ডাকো তো।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে ভিতরে গেল। একটু পরেই বুড়ো মতো একটা লোককে নিয়ে এল। অবাক হয়ে দেখি খালি গা আর ময়রা হেঁটো ধুতি পরা লোকটার চোখে ভারী একটা চশমা। একটা কাচ আবার ঘষা। বুঝলাম, হয় ও চোখটা নেই, নয়তো ছানি আছে।

আমাদের চিঠিটা সে হাত বাড়িয়ে নিল। তারপর ভাঙা বাংলায় বলল—আমার চোখ কমজোরি। এ কী দাশবাবুর চিঠি?

—হ্যাঁ। ঘরদোর খুলে দাও!

—জি।

তারপর সেই খাঁড়া ছেলেটাকে বলল—সামান উতরো।

টাঙাওয়ালা আর সেই খোঁড়া ছেলেটাতে মিলে আমাদের মালপত্র ধরাধরি করে বারান্দায় তুলতে লাগল।

কাঠের জাফরি দেওয়া বারান্দা, তারপর বিশাল ঘরগুলি। প্রকাণ্ড দরজা খুলতেই পুরনো বাতাস বেরিয়ে এল।

বারান্দায় পা দিয়েই বললাম—দুলু, এ বাড়ি একপুরুষের নয়। ক্ষুধিত পাষাণ।

দুলু উত্তর দিল—হুঁ।

তারপর মালিকে বলল—ঘরদোর ভালো করে পরিষ্কার করে দাও। কত পোকামাকড় বাসা বেঁধে আছে কে জানে।

বন্ধুগণ, ওই যে দেখুন, একটা গুবরে পোকা দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ল। যেমন বোকা স্বভাব, তেমনি বেঢপ শরীর। হাত-পা নেড়ে প্রবল চি-র-র শব্দে চিৎ হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, চেষ্টা করছে উপুড় হতে। ওকে লক্ষ করুন। উপুড় হয়ে ও করবে কি? আবার সেই ওড়া, উড়ে উড়ে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আবার উপুড় হওয়ার চেষ্টা। নিরন্তর, অর্থহীন, একঘেয়ে এই চেষ্টা থেকে ওকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই পোকাটির ওপর স্প্রে গান-এর মুখটা ধরলাম আমি। নাক পর্যন্ত আমার মুখের অর্ধেক রুমাল বাঁধা। রুমালের আড়ালে আমি সামান্য একটু হাসলাম। বন্ধুগণ, পোকাটার জন্য আমার একটু মায়াও হচ্ছে। আমার হাতে নতুন কেনা স্প্রে-গান, তার মধ্যে তীব্র কীটানুনাশক বিষ। যন্ত্রণার হাতল টেনে আমার হাত একটু থেমে আছে। বস্তুত এই পোকাটা মরতে চায় না। যতই অর্থহীন হোক তার বাঁচা, তবু সে বাঁচতেই চায়। বন্ধুগণ, স্প্রে-গান-এর ওপরে আমার হাত থেমে আছে, মুখ রুমালে ঢাকা, আমি এখন কী করতে পারি?

সামান্য একটু সময়। দ্বিধা বা মনুষ্যত্ব—যা বলুন। ওইটুকু সময় পোকাটা বেঁচে রইল। তারপর আস্তে হাতলটায় চাপ দিই। চিড়বিড় করে ওঠে পোকাটা, লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেতে থাকে। এবার দ্বিধাহীনভাবে জোরে স্প্রে করি আমি। তীব্র ঝাঁঝালো কীটনাশকের গন্ধে ভরে গেল ঘর। ধোঁয়ার মতো তা ঢেকে ফেলল পোকাটাকে। শুনতে পাচ্ছি, পোকাটা চিৎকার করছে। ভাষাটা বোঝা যায় না। কিন্তু একসময়ে সকলেরই ভাষা এক আমি তা

বুঝতে পারি, কিন্তু তা বলে থামি না। তীব্র ঝাঁঝ বিষে ভিজিয়ে দিই তাকে। হঠাৎ পোকাটা উলটে গেল। উড়ল। ভাবলাম, পালাবে বুঝি। পারল না। এক চক্কর ঘুরল ঘরের ভিতরে, তারপর দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ল। শেষ কয়েকটা চির-শব্দ তারপর চুপ।

হাতের উলটো পিঠে কপালের চুল সরিয়ে রুমালের আড়ালে একটু হাসি। নতুন কেনা পোকাদের বিষ, তার প্রথম শহিদ একটা গুবরে পোকা। হত্যাকারী অতনু সেন, একজন হতে পারত এম.এল.এ.।

পা দিয়ে পোকাটাকে জোর একটা লাথি কষাই। খাটের দু'পায়ার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সেটা। গো-ও-ল! গোলদাতা অতনু সেন—দুলুর স্বামী, তিতু-ঝিমলি ছোটনের বাবা।

রুমালের আড়ালে আমি হাসি। হত্যাকাণ্ডের সবে তো শুরু। এখনও অনেক বাকি। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকি খাটের নীচে। বহুকাল ধরে বন্ধ পড়েছিল ঘর। যদিও সকালেই আজ ভালো ঝাড়পোঁচ হয়েছে, জলের দাগ এখনও মুছে যায়নি, তবু বন্ধ ঘরের একটা গন্ধ আছেই। আর কে জানে, ফাটা মেঝে কিংবা দেওয়ালে, কোন ঘুপচিতে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কাঁকড়া তেঁতুল বিছে। আরশোলাই কি কম! আর ছারপোকা! সবচেয়ে বেশি অবশ্যই মশা। কাজেই হত্যা-হাহাকারের সবে শুরু। রুমালের আড়ালে আমি হাসি। পিঁচ পিঁচ করে বিষের ঝরণা ছড়াই। ধুন্ধুমার লেগে যায় কীটের জগতে। চোঁ-ও-ও, চিড়িক, পিড়পিড়—রকতরম সর্বনাশের শব্দ ওঠে তাদের জগৎ থেকে! রুমালের উপর আমার দু'টি চোখ উগ্র কৌতূহলে তাদের লক্ষ করে। বিষে ভিজিয়ে দিই বাতাস। মশা আর শ্যামাপোকা, কয়েকটা বাচ্চা মথ দেওয়ালে উড়ে উড়ে বসে, বিন বিন করে পাগলের মতো ঘোরে। আমি স্প্রে-গান তুলে ধরি। মেঘের মতো বিষ উড়ে যায় পোকাদের কাছে। নম্র স্পর্শ করে তাদের শরীরে। দেওয়াল থেকে একটি একটি করে খসে পড়ে মশা, শ্যামাপোকা, মথ। দরজা-জানালা বন্ধ, কোথাও পালানোর উপায় নেই। বড় জোর চেষ্টা করে সিলিং পর্যন্ত উঠতে পারে। তবে তাই ওঠো। তাতে পড়াটা হবে আরও চমৎকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কীটানুনাশকের কণায় তেলতেলে হয়ে গেল ঘরের মেঝে। মেঝের ওপর মরা-আধমরা পোকা গিজ গিজ করছে। একটা লালচে ফড়িং বোধহয় উত্তরের ঘাসফুলের জঙ্গল থেকে এসে বেভুলে ঢুকে পড়েছিল। সে এখনও মরেনি। চিৎ হয়ে পড়ে থেকে শরীরের সরু নিম্নাংশ আমার দিকে আঙুলের মতো একবার তুলল। হাঁটু গেড়ে ফড়িংটাকে একটু দেখি। ভারি সুন্দর তো! এমন লাল ফড়িং কখনো দেখিনি। আগে দেখলে জানালা খুলে তাড়িয়ে দিতাম। এখন আর কিছু করার নেই। সুন্দর ফড়িংটার দিকে চেয়ে বললাম—গিলটি মিলর্ড। সুন্দর ফড়িংটা তার শরীর নামিয়ে নিয়ে মারা গেল। যতদূর দেখা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র শান্ত। একটি পোকারও ওড়া-উড়ি নেই। বিষের ঝাঁঝে চোখে জল আসছে, সুড়সুড় করছে নাক। বাতি নিভিয়ে ঘর বন্ধ করি আমি।

বাইরের ঘরটায় সোফা, টেবিল, চেয়ার, ফুলদানি, একটা ক্যাম্প-খাট। এই ঘরেও স্প্রেটা ভালোই ছড়ালাম আমি। অভ্যাসে মানুষের লক্ষ্য স্থির হয়। প্রায় পঞ্চাশটা আরশোলা মরল আমার হাতে, একটা বাচ্চা ইঁদুর পালাল বটে কিন্তু একঝাঁক বিষ খেল সে-ও। একটা টিকটিকির বুকেও ঢুকে গেল খানিকটা বিষ। একটা উড়ন্ত বোলতাকে কয়েক ঝাঁক বিষ খাওয়ালাম আমি। সেটা মরল। ক্রমে বাইরের ঘরটাও স্তব্ধ, বিষপূর্ণ হয়ে গেল।

এতক্ষণ প্রবল এক উত্তেজনা বোধ করছিলাম আমি। সেটা এবার থিতিয়ে এল। স্প্রে-গানটা রাখলাম উদোম টেবিলের ওপর। টসটসে ঘাম জমেছে কপালে। রুমালের আড়ালে ভারী শ্বাস। ওষুধের গন্ধে গুলোচ্ছে পেট। শরীর ক্লান্ত।

বাতি নিভিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় পা দিতেই একঝলক পরিষ্কার ঠান্ডা বাতাসে শীত করে উঠল। রুমালটা খুলে ফেলতেই পরিষ্কার বাতাসে ভরে গেল বুক।

বারান্দার সিঁড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছে দুলু। বসে আকাশপাতাল ভাবছে। ঝিমলি বসে আছে সিঁড়ির শেষ ধাপটায়, ওর পায়ের কাছে বুড়ো মালির ছেলে বুধিয়া। বুধবারে জন্ম হয়েছিল বলে ওর এ নাম। দুপুরবেলা আমার ঘুম হয় না। খাওয়া-দাওয়ার পর দুলু যখন ছেলেময়ে নিয়ে ভিতরের ঘরে ঘুমোচ্ছিল, তখন বাইরের ঘরে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে আমি বুধিয়ার গল্প শুনছিলাম। গত বছর রেল ইয়ার্ডে কয়লা কুড়োতে গিয়েছিল, সে সময়ে খালাসিদের বড় বড় ছেলেরা তাড়া করে। পালাবার সময়ে লাইন ডিঙোতে গিয়ে আই বাপ—এক শান্টিং ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটা ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল। পায়ের জন্য ওর খুব একটা দুঃখ নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে হাত-পা চোখ সব সবসময়ে ঠিকঠাক থাকবেই তার কোনও মানে নেই। ওর বাবার একটা চোখে ছানি বেশি পেকে গিয়েছিল, ডাক্তাররা ছুরি চালাতেই খানিকটা পুঁজ বেরোল—ব্যস, চোখটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। আর একটা চোখে ছানি আসছে, ওটা কাটলেও যদি পুঁজ বেরোয় তো পুরো দুটো চোখ অন্ধকার হয়ে যাবে—তা বলে কি বাবা কাঁদতে বসবে? ভিখমাঙা সুরদাসেরা কি বেঁচে নেই? তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে বুধিয়ার এই হল জীবন-দর্শন।

এখন ঝিমলির পায়ের কাছে বসে সে ভূতের গল্প বলছে। দক্ষিণের ওই শিমূল গাছের ডাল বেয়ে দু-একটা পরি এসে নামে পিছনের গোলাপ-বাগানে। সুযোগ পেলে তারা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাদের রাজ্যে। দু-চারদিন খুব তোয়াজ করে, নানা সুখাদ্য খাওয়ায়, গোলাপ জলে স্নান করায়। সুন্দর ফুলের বিছানায় শুতে দেয়। তারপর আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু যাকে পরিতে নেয় সে ফিরে এলেও তার আর পৃথিবীর কিছুই ভালো লাগে না। না খাবার, না বিছানা, না ঘর-সংসার। সে তখন কেবলই পরির রাজ্যের কথা বলতে থাকে। বলতে বলতে আর ভাবতে ভাবতে হয়ে যায় পাগল। খাবার খেতে পারে না. বলে, না খেয়ে খেয়ে হয়ে যায় কাঠির মতো রোগা। তারপর একদিন মরে যায়।

কতদিন বুধিয়ার বাপ রাতবিরেতে গোলাপবাগানে জ্যোৎস্নার মতো গায়ের রংওয়ালা পরিদের দেখেছে।

দুলুর দিকে চেয়ে বললাম—আর আধঘণ্টা। তারপর দেখো, আর একটাও পোকামাকড় নেই।

দুলু অন্যমনস্কভাবে গেট-এর দিকে চেয়েছিল। আমার কথায় চমকে উঠে মুখ ফেরাল। একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—কয়েকটা ছেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল। এইমাত্র।

—তাতে কী হয়েছে।

দুলুর মুখ গম্ভীর। বলল—এদিকে খুব তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল।

ভিতরে ভিতরে একটু চমকে উঠলাম। অজান্তে আমার মুখের রক্ত সরে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে হাসলাম—কত ছেলে আছে। এখানকার লোকাল ছেলেই হবে হয়তো।

—তাহলে তাকাবে কেন?

—বাঃ! খালি বাড়িতে নতুন লোক এলে তাকায় না?

দুলু তবু স্বস্তি পেল না। ওর কোলে ছোটন ছটফট করছে। তবু আঁকড়ে ধরে আছে দুলু। সে অন্যমনস্ক।

আমি ছোটনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম—আয় বাবা, চল বেড়িয়ে আসি।

ছোটন হাত বাড়িয়ে আসছিল। দুলু তাকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে থমকে বলল —হাত ধুয়েছ?

—না তো!

—পোকামারার ওষুধ বিষ—জান না?

—খেয়াল ছিল না।

—খেয়াল রাখতে হয়। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—

ছোটন হওয়ার আগে একরাতে বিছানায় শুয়ে জেগে থেকে দেখছিলাম, দুলু ভ্রূণ নষ্ট করবার বড়ি জল দিয়ে গিলে খাচ্ছে। মুখে জল হাঁ করে ঊর্ধ্বমুখ দুলু যখন বড়িটা মুখে ফেলতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। কী নির্দয় দেখিয়েছিল দুলুকে! আজ দুলু ভাবতেও পারে না সেই সব দৃশ্য। অথচ এখনও ছোটন বয়সের অনুপাতে রোগা, তার মাথায় দীর্ঘস্থায়ী ঘা।

আমি বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এলাম।

—সাবধানে যেও। বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই। বেরোবার আগে দুলু সাবধান করে দিল।

কোলে ছোটন, দুধারে ঝিমলি আর তিতু, আগে আগে খোঁড়া বুধিয়া, তার হাতে একটা বেতের লাঠি। আমরা ক্যাস্টর টাউনের নির্জন রাস্তায় বিকেলের পড়ন্ত রোদে ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় পা দিই। সুগন্ধী নির্জনতা, লাল কাঁকরের পথ, বহুদূর পর্যন্ত

কাউকে চোখে পড়ে না। শেষ বর্ষার এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে দুপুরে, তাই বহু দূরে কুয়াশার মতো ভাপ উঠছে। মৃদু বাতাস বইছে। ঘরে ফেরা পাখি ডাকছে খুব। ঝিমলি আর তিতু এই সৌন্দর্যে মূক হয়ে যায়। জন্মাবধি তারা কলকাতার বাইরের জগৎ দেখেনি। আমার গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকে তারা। ছোটন আমার কোল থেকে বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে।

একটা ঢালু বেয়ে পথটা নেমেছে, আবার চড়াই বেয়ে উঠেছে অনেকটা ওপরে। ঢালু বেয়ে নামতেই একটা কালভার্ট। কয়েকটা হনুমান বাচ্চা বুকে নিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে। ভয়ে ঝিমলি আর তিতু আমাকে জড়িয়ে ধরে। হেসে গড়ায় বুধিয়া।

হাঁটতে হাঁটতে একসাথে তিতু আর ঝিমলি এগিয়ে গিয়ে বুধিয়ার সঙ্গে হাঁটে। রাজ্যের গল্প করে বুধিয়া। আমার কোলে ছোটন তার হাত তুলে এটা ওটা দেখায়। প্রশ্ন করে। অন্যমনস্কভাবে আমি হাঁটি।

চৌরাস্তার মোড়ে কয়েকটা দোকানপাট। তিন-চারটে রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। লোকজনের চলাচল দেখা যায়। চার প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য দাঁড়াই। ততক্ষণে বুধিয়া, ঝিমলি আর তিতুকে নিয়ে কোন রাস্তায় চলে গেল খেয়াল করিনি। সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ভরে ফেরত পয়সার জন্য হাত বাড়াতেই হঠাৎ খেয়াল হয়, ওরা কোন রাস্তায় গেল লক্ষ করিনি তো।

চিন্তার কিছু নেই। সঙ্গে বুধিয়া আছে, জায়গাটাও নিরিবিলি, ওরা হারাবে না। তবু একটা খুঁজে দেখা দরকার। যে পথটা সোজা গেছে, সে পথটাতেই যাওয়া সম্ভব। এই ভেবে আমি চৌরাস্তা পার হয়ে সোজা হাঁটি। কিন্তু রাস্তাটা সোজা হয়ে গেছে, বহু দূর পর্যন্ত কাউকে দেখা যায় না। আমি আবার ফিরে আসি চৌরাস্তায়।

পান-সিগারেটের দোকানদারকে জিগ্যেস করি—দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর একটা খোঁড়া ছেলেকে যেতে দেখেছ?

লোকটা মাথা নাড়ে—খেয়াল করিনি।

একটা ছোকরা রিকশাওয়ালা তার রিকশার সিট থেকে টপ করে নেমে বলল—লেংড়া বুধিয়ার সঙ্গে দুটো খোকাখুকি তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—

—এই তো এই রাস্তায় গেছে। চলুন না নিয়ে যাচ্ছি।

—না, রিকশার দরকার নেই।

ডানদিকের রাস্তাটাই দেখাল রিকশাওয়ালা। পথটা একটা চড়াই ভেঙে বেঁকে গেছে। আমি আস্তে আস্ত এগোই। ছোটনকে কোল বদলে নিই। ছেলেটাকে ক্রমশ ভারী লাগছে, ঘেমে যাচ্ছে আমার গা।

বাঁক পেরোতেই আবার উৎরাই, আবার একটা বাঁক। ওদের দেখা গেল না। দিনের আলো আস্তে আস্তে মরে আসছে। একটা ধোঁয়াটে মেঘ ঢাকা দিয়েছে পশ্চিম আকাশ। বাড়ি থেকে বহুদূর চলে এসেছি। অন্ধকার হয়ে আসছে। আমার ভালো লাগছে না।

বাতাসে তীব্র ফুলের গন্ধ। ভেজা মাটির গন্ধ। সিগারেটের জন্য আনচান করছে শরীর। কোলে ছোটনকে ক্রমশ ভারী লাগছে।

ছোটনকে বললাম—একটু নামবে বাবা?

সে মাথা নেড়ে আমাকে জোরে আকড়ে ধরল।

—নিজেকে একটু হালকা করো বাবা, অত জোরে আঁকড়ে ধরো না।

ছোটন গম্ভীরভাবে আমাকে ধরেই রইল।

ডানদিকে প্রচণ্ড একটা ভুতুড়ে বাড়ির বাগান পেরিয়ে একটা ছোট্ট পরিষ্কার মাঠ। সেইখানে ছায়াহীন স্পষ্ট দিনের আলো পড়ে আছে।

একটু জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। সিগারেটের জন্য আনচান করছে শরীর। ছোটনকে মাঠের ওপর ছেড়ে দিয়ে বললাম—একটু হেঁটে এসো তো বাবা!

ছোটন হাঁটল না! আমার হাঁটু খামচে দাঁড়িয়ে রইল। আমাকে বসতে দেখেই কাঁদতে লাগল—মা-র কাছে যাব।

বিরক্তিতে একটা থাপ্পড় তুলেছিলাম। অমনি সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল—ঊর্ধ্বমুখে দুলু জল নিয়ে বড়ি গিলছে। আর মারা হল না। কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসিয়ে বললাম—কাঁদে না, এক্ষুনি দাদা আর দিদি আসবে এই রাস্তা দিয়ে দেখো।

গোটা দুই সিগারেট শেষ হয়ে গেল, সামনের রাস্তাটা দিয়ে কেউ ফিরল না। মাঠের ওপর আলো নিস্তেজ হয়ে এল। ভেজা মাটির ভাপ উঠে কুয়াশার মতো ঢেকে দিয়েছে চারধার। মাটি ভিজে উঠছে। বাতাসে হিমভাব! বার বার বিরক্তিতে কেঁদে উঠছে ছোটন—বাড়ি যাব, মা-র কাছে যাব।

তিতু আর ঝিমলির জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে উঠলাম। কোলে ছোটন। রাস্তায় ভালো আলো নেই। দুধারে অন্ধকার সব বাগান। বাগানের মধ্যে নিঝুম বড় বড় বাড়ি। কদাচিৎ কোন বাড়িতে আলো চোখে পড়ে। দুশ্চিন্তা নিয়ে হাঁটলাম। চড়াইটা ভাঙছি, হঠাৎ ওপর দিকে চেয়ে দেখি চড়াইয়ের মাথায় চারটে ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ওদের মাথার ওপর একটা ল্যাম্প-পোস্ট। তার ম্লান আলোতে দেখা যাচ্ছে, পরনে সরু প্যান্ট, গায়ে চেক শার্ট, কিংবা গেঞ্জি। স্থির দাঁড়িয়ে চারজন আমাকে দেখছে। সিগারেট জ্বলছে তাদের হাত এবং মুখে।

আমার পাঁজরে দ্রুত হাতে ধাক্কা মারল হৃৎপিণ্ড। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এত তাড়াতাড়ি ওরা খবর পাবে, আমি জানতাম না। কত সহজেই ওরা পেয়ে গেল আমাকে। আমার বন্ধু প্রকাশ মরার সময় টুঁ শব্দটিও করতে পারেনি। তার সমস্ত শরীর ছোরায় ছোরায় লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল, উপর্যুপরি রডের আঘাতে সমস্ত মাথাটা দুমড়ে

গিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল! অতটা করার দরকার ছিল না। একটা রডের ঘা, দু'চারটে ছোরার আঘাতই যথেষ্ট। প্রকাশ দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিল ডায়বেটিসে, হার্ট ও তার ভালো ছিল না। তবু যে অতটা করা হয়েছিল তার শরীর নিয়ে—আমার মনে হয়—তার কারণ দুটো। এক, ঘৃণাকে যতখানি সম্ভব প্রকাশ করা। দুই, লোকের মনে ওই বীভৎসতার দ্বারা প্রচণ্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করা। দুটো উদ্দেশ্যই সফল। প্রকাশের মৃতদেহে আমি কাঁধ দিয়েছিলাম। তার ফল আজও সেই ভাঙা চৌচির মাথা আর ছোরার ঘায়ে হাঁ হয়ে থাকা তার এলানো শরীর যতবার ভাবি ততবার আমার ভিতরে কী একটা রী-রী করে ওঠে। মৃগী রুগীর মতো আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরি হাত মুঠো হয়ে যায়! চিন্তা-ভাবনা গুলিয়ে যায়।

ঢালুর ওপর চারটে ছেলে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। জ্বলছে সিগারেট। অপেক্ষা করছে হয় আমি তাদের কাছে উঠে যাব, নয়তো তারাই আমার কাছে নেমে আসবে। আমি তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তারা আমার দিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার কোলে যে ছোটন রয়েছে সে কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতার মধ্যে ছোটন আমাকে পায়ের ধাক্কা দিয়ে বলল, চল বাবা বাড়ি যাব।

—হ্যাঁ চল।

তারপর আমি ফিস ফিস করে নিজেকে বললাম—ঠিক আছে। কেন বললাম, তা জানি না। ছোটনকে আমি আর একটু জোরে চেপে ধরলাম বুকে। একবার পিছন ফিরে দেখলাম—অন্ধকার সর্পিল রাস্তা। নির্জন। আমার দুটো ছেলেমেয়ে আর বুধিয়া গেছে এই পথে। ফেরেনি। কোথায় গেল ওরা, শেষবারের মতো ওদের মুখ যদি দেখতে পেতাম!

প্রকাশের কথা মনে না করার চেষ্টা করছিলাম। তবু মনে এল। অমনি সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল আমার শীত করল। ঘাম দিল। অবশ লাগল। মাথার মধ্যে ঘূর্ণীঝড়ে ওড়া খড়কুটোর মতো চিন্তারাশি এলোমেলো উড়তে লাগল। মাথা নীচু করে আমি আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম। ছোটন বাড়ি যাবে। যতটা পথ সম্ভব তাকে এগিয়ে দিই।

ল্যাম্প-পোস্টের কাছাকাছি উঠে এলাম। মুখ তুলে দেখি চারটে ছেলে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। আমাক দেখছে। তাদের জুলপি বড়। মাথায় লম্বা চুল! লম্বাটে তাদের চেহারা। তাদের স্থির-নিশ্চিত ভঙ্গি দেখে আমার আর কিছুই বোঝবার বাকি রইল না। কী জানি কেন আমি তাদের দিকে চেয়ে একটু কাঠ হাসি হাসলাম। তারা হাসল না। তাকিয়ে রইল।

ঢালুটা সম্পূর্ণ উঠে তাদের মুখোমুখি হতেই আমার ভুল ভাঙল। দলে তারা চারজন নয়। ছয়জন। অদূরে রাস্তার পাশে এক বাগানবাড়ির বাগানের দেওয়ালে পেচ্ছাপ করে

বাকি দুজন প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে আসছে। তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল—বুঝলি পরিতোষ, এদের বাগানে যা জল দিয়ে গেলাম না, দারুণ ফলন হবে—

এরা চারজন হাসল। এরা ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ।

আমি ছোটনকে কোলে নিয়ে তাদের পেরিয়ে গেলাম। তারা ঢাল বেয়ে নামতে লাগল।

বেঁচে থাকা কী রকম ভালো। মানুষ কত বন্ধুর মতো একে অন্যকে পেরিয়ে যায়, আক্রমণ করে না।

ঢালুর ওপর দাঁড়িয়ে আমি একবার পিছু ফিরে চাইলাম। নেমে যেতে যেতে ছয়জনের একজন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

ছোটন বাড়ি যাবে। আমি দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। সামনেই চৌরাস্তা। কয়েকটা রিকশা দাঁড়িয়ে, আলো, লোকজন। আমি ডাকলাম—এই রিকশা—

গেট-এর কাছে দুলু দাঁড়িয়ে, তার পাশে ঝিমলি, তিতু। রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় অন্ধ মালিটা। রিকশা থামতেই তিতু আর ঝিমলি চেঁচিয়ে উঠল—এই তো বাবা—ছোটন সোনা—

দুলু গেট খুলে এগিয়ে এল, বলল—এর চেয়ে আমাকে মেরে ফেল।

—কেন?

—উঃ, চিন্তায় চিন্তায় আমার মধ্যে আমি নেই। রোগা ছেলেটাকে নিয়ে গেছ—ইস—কখন থেকে না খেয়ে আছে ছেলেটা—

—ওরা কখন এল?

—অনেকক্ষণ, ওরা একটা শর্টকাট ধরে এসেছে। এসে বলল, তুমি ওদের পেছন পেছন আসছ। তারপর অনেকক্ষণ আসছ না দেখে, একটু আগে, বুধিয়াকে পাঠালাম আবার—দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে—

তিতু আর ঝিমলি আমার দুহাত ধরে ঝুলে পড়ে—বাবা আমরা কী রকম শালজঙ্গলের ভিতর দিয়ে এলাম! আমরা তো ভেবেছি তুমি পিছনেই আসছ, জানতাম না তো যে তুমি হারিয়ে গেছ!

সন্ধে পার করে চাঁদ উঠল। আমি বাইরের সিঁড়িতে একা বসে। সামনে চরাচর, জ্যোৎস্না। বড় বেশি নির্জনতা এখানে। এই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না ও দূরের বিশাল প্রসার, তার একাকীত্ব আমি সহ্য করতে পারছি না। একসময়ে মাঠ-ঘাট আমার প্রিয় ছিল, ভালোবাসতাম অরণ্য, পাহাড়। কী জানি, নিজের অজান্তে কবে কলকাতার বুক-চাপা ভিড়, ভালো লেগে গেছে। ভিতরে এক বাঘের আস্তানা। সেই বাঘের নাম ভয়, নিঃসঙ্গতা, দুশ্চিন্তা। একা হলেই সেই রঙিন বাঘ লাফ দিয়ে ধরে এসে। ছিঁড়ে খায় অস্তিত্ব। এখন আর গাছের ছায়া ভালো লাগে না, ভালো লাগে না বিশাল ফাঁকা বাড়ি, জনহীন রাস্তাঘাট, কিংবা অন্ধকার।

ওই যে ছয়জন, ওদের একজন আমাকে পিছন ফিরে দেখেছিল। দুবার। ও কি চিনেছিল আমাকে? হবেও বা। আমি যে জীবনযাপন করেছি, তাতে অনেকেই চিনে রেখেছে আমাকে, চিহ্নিত করে রেখেছে। অথচ, তাদের অধিকাংশকেই আমি চিনে রাখিনি। চিনে রেখে তারা মনে মনে ভাবছে —কোথায় পালাবে বাবা! হুঁ-হুঁ!

দুলু নিঃশব্দে এসে ভরা জ্যোৎস্নায় দাঁড়াল সিঁড়ির মাঝের ধাপে! কয়েক পলক মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখল চাঁদ। শ্বাস ফেলল একটা।

জিগ্যেস করলাম—ছেলেমেয়েরা খেয়েছে?

—হুঁ। ঘুম পাড়িয়ে এলাম।

—তাহলে এবার বোসো এখানে।

দুলু বসল। বলে বলল—বাড়িটা বড্ড পুরনো। একটু আগে একটা বিছে মারলাম রান্নাঘরে। বড় বিছে। বাচ্চাদের যদি কামড়ায় তো শেষ হয়ে যাবে।

—সাবধানে থেকো। ওসব প্রকৃতির জীব, সব জায়গায় আছে। খামোখা কামড়ায় না।

—তবু, ভয় করে।

ভয় করে—কথাটা শোনামাত্র আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেল। স্নায়ুমজ্জায় সেতারের ঝঙ্কারের মতো বাজতে লাগল! ভয় করে, আমাদের বড় ভয় করে।

দুলু বাইরের দিকে চেয়ে থেকে অন্যমনস্কভাবে আস্তে আস্তে বলল, তুমি পোকামারা ওষুধ দিয়েছিলে ঘরে। আধঘণ্টা পর যখন ঘর ঝাঁট দিলাম তখন—মাগো—কত পোকা যে বেরোলো। ওজন করলে কয়েক সের হবে। তার মধ্যে কয়েকটা আবার বেঁচে ছিল। অত পোকা একসঙ্গে দেখে গা শির শির করছিল!

—এখন আর পোকা নেই। হলে, আবার ওষুধ দেব।

দুলু আমার দিকে তাকিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো লাজুক হাসি হেসে বলল—সে কথা না। ভাবছিলাম, আমরা অত পোকা মারলাম, পোকারা যদি কখনও তোর শোধ নেয়।

আমি হো হো করে হেসে বললাম—দুলু, ভয় পেতে পেতে ভয় তোমার বিকারে দাঁড়িয়ে গেছে!

দুলু মাথ নীচু করে বলল—বুধিয়া পোকাগুলো কাগজে করে নিয়ে বাইরে ফেলতে যাচ্ছিল। বাচ্চা ছেলে তো! বোধহয় কষ্ট হয়ে থাকবে। বলল, এতগুলো জীব মেরে ফেললেন। এমনভাবে বুকটা কেঁপে উঠল।

আমার আর হাসি পেল না! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—দুলু তোমার ছুটি ক'দিনের?

—একমাস।

—একমাস পর কি আমরা ফিরব?

—দেখি। কলকাতার চিঠি আসুক। অবস্থা বুঝে ফিরব।

—যদি অবস্থার উন্নতি না হয়?

—ছুটি বাড়াব।

—এভাবে কতদিন চলবে?

দুলু অনেকক্ষণ ঝিম মেরে থেকে খুব হতাশার গলায় বলল, কী জানি। আমি অত ভাবতে পারি না।

আমি আস্তে করে বললাম—তোমার জমানো টাকা খরচ হয়ে যাবে। সোর্স অফ ইনকাম বন্ধ। এভাবে চলে না। এখানকার নির্জনতাও আমার খুব একটা সহ্য হচ্ছে না। তার চেয়ে চল ফিরে যাই—

দুলু চকিত মুখ তুলে বলল—কী বলছ। কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—দুলু বাকিটুকু বলল না। থেমে গেল।

—সঙ্গে সঙ্গে কী? আমি জিগ্যেস করি।

—কেন তুমি জান না?

আমি চুপ করে রইলাম। সামনে এক ভয়াবহ বন্য জ্যোৎস্না, নিস্তব্ধ চরাচর। ছয়জনের মধ্যে একজন আমাকে মুখ ফিরিয়ে দুবার দেখেছে। ও কী চেনে আমাকে। আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম।

তিতু একটি ফড়িং ধরে দুহাতে তার পাখনা ছিঁড়ছে! তার মুখ নির্বিকার। এই সাঙঘাতিক দৃশ্য আমি এক আশ্চর্য প্রকাণ্ড জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তিতু বাগানে, খেজুরগাছের মতো, কিন্তু আরও সুন্দর এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। যে ফড়িংটার পাখনা সে ছিঁড়ছে সেটা একটা সুন্দর লাল ফড়িং। আমি তার মুখের নিষ্ঠুরতা দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে বলছি—তিতু—তিতু—তোর মায়া-দয়া নেই! ও তুই কী করছিস!

তিতু নিষ্ঠুর চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো বের করে আনল। মুঠো খুলতেই দেখলাম, এক মুঠো মরা মশা, মথ, একটা বোলতা। মুঠোর সেই পোকাদের বাগানের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল তিতু, চেঁচিয়ে বলল—বাবা, পোকাদের গাছ হবে। দেখ।

একটা গাঢ় লাল আলো এসে পড়ল বাগানে। সূর্যের আলো অত লাল হয়, জানতাম না। সেই লাল আলো এসে পড়তেই দেখি ঘাসের ফল থেকে বীজের মতো জন্ম নিচ্ছে পোকামাকড়, বোলতা। উড়ে আসছে—উড়ে আসছে—আমাদের ঘরের দিকে।

দূলুর ডাক শুনে আমার ঘুম ভাঙল। ঘুম ভেঙে দেখি বাইরের ঘরে ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছি। গায়ে ঘাম।

ওঘর থেকে দুলু বলল—জেগেছ?

—হ্যাঁ।

—ইস তোমাকে বোবায় ধরেছিল। ঠিক হয়ে শোও।

—ঠিক আছে।

—এমন ভয় পাইয়ে দাও না! খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি?

দুলু ঘুম গলায় বলল। তারপর আমার উত্তর না পেয়ে ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল, টের পেলাম।

এ বাড়ির বেশিরভাগই কাচের শার্সিওলা পাল্লা। কাঠের পাল্লা প্রায় নেই। তাকিয়ে দেবি, কাচের শার্সি দিয়ে বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নায় বাগান দেখা যাচ্ছে। রাতে আবার কখন এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে বুঝি। বাইরে জ্যোৎস্নায় একটা সাদা ধোঁয়াটে ভাব মিশে আছে।

অস্বস্তিকর ঘুমহীনতা নিয়ে সেইদিকে চেয়ে রইলাম। যতবার চোখ ফিরিয়ে নিতে চাই, যতবার চোখ বুজি, ততবার আপনার থেকে চোখ খুরে যায়। সম্মোহিতের মতো শার্সিটার দিকে চেয়ে থাকি। বাইরে বন্য, ভয়ঙ্কর, রহস্যময় জ্যোৎস্না। বিশাল নিস্তব্ধ চরাচর। ভয় করে। বড় ভয় করে।

চেয়ে আছি। চেয়ে থাকাই আমার নিয়তি। হঠাৎ একটা ছায়া লাফ দিয়ে উঠল শার্সির গায়ে। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও করলাম না। একাট বেড়াল। একটু দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ভাঙা শার্শির ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে ঘরে এল। অন্ধকারে সে একপলক তাকাল মশারির দিকে। সবুজ ফসফরাস জ্বলজ্বল করে উঠল। নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম। একটু পরে আমাদের এঁটো বাসন কোসনের কাছে তার চপ চপ খাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

কখনও ঘুম, কখনো জাগরণের মধ্যে রাত কেটে গেল। ভোর-রাতে যখন মুর্গী ডাকছে, তখন শার্সির রং উজ্জ্বল। নিশ্চিন্ত হয়ে অমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

আউট-হাউসের দিকে বুধিয়াদের একটা ছোট্ট ভুট্টার খেত। সকালে বাজারে বেরোবার সময় চোখে পড়ল, ভুট্টার খেতে লুকোচুরি খেলছে ঝিমলি, তিতু আর বুধিয়া। ঘাসের জঙ্গলে উদাসভাবে বসে বিড়ি খাচ্ছে বুড়ো মালি, হাতে ঘাস নিড়োবার হেঁসো। তার চশমার কাচে রোদ ঝিকিয়ে উঠেছে। চারিদিকে আলোয় আলো।

মনটা আবার হঠাৎ ভালো হয়ে গেল।

ভুট্টা-খেত থেকে মুখ বার করে তিতু চেঁচিয়ে বলল—বাবা, প্যাঁড়া এনো—

ঝিমলি দৌড়ে আসে—বাবা, দু'গজ লাল রিবন। আমার রিবন আনতে মা ভুলে গেছে।

তিতু ঝিমলির এইসব আনন্দিত চিৎকার আমার মনের মধ্যে রিন রিন করে বাজতে থাকে। অনেক বেলা হয়েছে, তবু একটা কুয়াশার মতো ভাব চারিদিকে। ছায়াহীন রোদ পড়ে আছে। আমি হাঁটতে থাকি।

বাজারের মুখে পুরনো একটি মিনার। মিনারের তলায় দোকান। দোকানের সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সেদিকে একপলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল সেই জটলা থেকে লম্বা মতো একজন—তার চোখে কালো চশমা—ঘাড়

ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। গতকালের সেই ছয়জনের একজন কি? কে জানে! আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

বাজারে ঢুকতেই বুড়ো এক পাণ্ডা সঙ্গ ধরল—চল, বৈদ্যনাথজি দর্শন করিয়ে দিই।

আমি মাথা নাড়ি—আমার ভগবানে বিশ্বাস নেই বাপু।

লোকটা অবাক মানে—বিশ্বাস নেই। সাক্ষাৎ বৈদ্যনাথজিকে বিশ্বাস নেই। তুমি কি ম্লেচ্ছ?

—হবে তাই।

—তুমি হিন্দু না?

—উঁহু। আমার বাবা হিন্দু, আমি নই।

লোকটা অবাক হয়—তুমি কি তবে ধর্মত্যাগী?

—তাও না। আমি মোটে ধর্মে বিশ্বাস করি না। আমি ম্লেচ্ছ।

সে হাসে—তোমার বাপ যখন হিন্দু তুমিও হিন্দুই। ম্লেচ্ছ কী করে হবে?

আমি তর্কের মধ্যে না গিয়ে পাশ কাটাই। মেছোবাজার পর্যন্ত লোকটা আমার পিছু পিছু আসে। তারপর হতাশ হয়ে চলে যায়।

দিন কেটে যায়। একই ভাবে। সাতটা দিন।

মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে স্টেশনে যাই। একটা খবরের কাগজ কিনি। একটা চায়ের স্টলে বসে একভাঁড় চা নিয়ে তন্ন তন্ন করে কাগজটা খুঁজি। বেহালার খবর খুব একটা নেই। তবে লাশ পড়েছে নানা জায়গায়। মৃতদের নাম দেখি, চেনা নাম চোখে পড়ে না।

এখানকার ঠিকানা জানিয়ে বাবাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তার কোনও উত্তর নেই। সাতদিন হয়ে গেল, আমাদের বাড়িতে কী হচ্ছে কে জানে। এখানকার ঠিকানা বাবাকে জানানোর ইচ্ছে দুলুর ছিল না। বাবা বুড়ো মানুষ, যদি কেউ বাবাকে ভয় দেখিয়ে ঠিকানাটা জেনে নেয়।

মাঝে মাঝে লক-আপে গরাদের ওপারে একখানা ধারালো উগ্র মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকি।

বিকেলের দিকে যশিডি থেকে একাট শাটল ট্রেন আসে। অমনি খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে চোখ জ্বালিয়ে যাত্রীদের লক্ষ করি। দেহাতীরা নামে, নামে বৈদ্যনাথধামের তীর্থ যাত্রীরা। অল্প কয়েকজন যাত্রী, কিছুক্ষণের মধ্যে স্টেশন আবার ফাঁকা হয়ে যায়। সন্ধের ঘোর লাগবার আগেই আস্তে আস্তে হেঁটে ক্যাস্টর টাউনের ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় পা দিই। একটা চড়াই ভেঙে উঠলেই দেখা যায় দূরে মাতৃকুটিরের বাগানের গেট। তখন নিশ্চিন্ত লাগে।

শুক্লপক্ষ শেষ হয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যার পর চাঁদ ওঠে না। ঘোর এক অন্ধকার কালো বেড়ালের মতো লাফ মেরে নামে বাইরের বাগানে। সিঁড়িতে আমরা বসি। আমি, দুলু, ঝিমলি আর তিতু, দুলুর কোলে ছোটন। সিঁড়িতে শেষ ধাপে বসে বুধিয়া বলে—ওই যে আকাশের তারা—ওগুলো হচ্ছে ভগবানের চোখ। যতগুলো মানুষ পৃথিবীতে আছে ততগুলো চোখ আছে ভগবানের। এক এক চোখে ভগবান এক একজনকে নজরে রাখেন। যেই পৃথিবীতে একটা মানুষ মরে যায়, অমনি নিভে যায় আকাশের একটা তারা, আবার যখনই কেউ জন্মায়, তখনই নতুন একটা তারা ফুটে ওঠে।

ঝিমরি আর তিতু অবাক হয়ে শোনে।

—সত্যি বাবা? ঝিমলি জিগ্যেস করে।

অন্যমনস্কভাবে বলি—হুঁ।

একটু রাত হলে ওরা খেয়ে ঘুমোতে যায়, আমি তখনও বাইরে বসে, ভগবানের অলীক চোখে ভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। জল বয়ে যাওয়ার শব্দের মতো অবিকল শালবনে বাতাস লাগবার শব্দ ভেসে আসে।

বাচ্চারা ঘুমোলে দুলু বাইরে আসে। বলে—আজও কলকাতার চিঠি এল না।

—হুঁ।

—কী যে হচ্ছে ওখানে!

আমি চুপ করে থাকি।

দুলু হঠাৎ বলে—আজ তুমি যখন বিকেলে বেরিয়েছিলে তখন একটা ছেলে এসেছিল।

একটু চমকে উঠি।

—কী রকম ছেলে?

—ফর্সা, লম্বা, ছিপছিপে, খেলোয়াড়ের মতো দেখতে, বাইশ-তেইশ বছর বয়স। কথাবার্তায় খুব ভদ্র। জিগ্যেস করল, এ বাড়িতে অতনু বলে কেউ থাকে কিনা।

—তুমি কি বললে?

—বললাম না! এখানে এনামে কেউ নেই।

—শুনে চলে গেল?

—না। একটু হেসে ক্ষমা টমা চেয়ে বলল, রাস্তায় ঠিক অতনু সেনের মতো একজনকে সে দেখেছে। একটু খোঁজ নিতেই একজন রিকশাওয়ালা এই বাড়ি দেখিয়ে দেয়।

—কেন খোঁজ করছে জিগ্যেস করলে না?

—করলাম। তখন ও আমাকে জিগ্যেস করল, আমি অতনু সেনের নাম শুনেছি কিনা। আমি বললাম, শুনিনি। ও বলল অতনু সেন খুব বড় লিডার হতে পারতেন। এত পড়াশুনা ছিল তাঁর। বাংলাদেশে অনেকেই অতনু সেনকে তাঁর রাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মান করে। অতনু একবার বিধানসভায় দাঁড়িয়েছিলেন। যে কনস্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়িয়েছিলেন,

সেখানের এক চা-বাগানের ডাক্তার হচ্ছে ছেলেটির বাবা। একবার সে-বাগানে মিটিং করতে গিয়ে ঝড়ের রাতে অতনু সেন ফিরতে না পেরে ওদের বাসায় ছিলেন। আর তখন, সেই রাতে অতনুর সঙ্গে ছেলেটির খুব ভাব হয়ে যায়। অতনু তাকে অনেক গল্প বলেছিলেন। তারপর আর অতনুর সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কাগজে অবশ্য মাঝে মাঝে নাম দেখেছে।

আমার আবছা মনে পড়ছিল, এক ঝড়ের রাতে আমি হায়পাথাড় চা-বাগানে আটকে পড়েছিলাম। ডা আশুতোষ রায়ের বাড়িতে ছিলাম একরাত্রি। তার একটি ফুটফুটে ছেলে ছিল। খুব ভালো লেগেছিল আমার।

আমি আস্তে বললাম—ছেলেটা বোধহয় সত্যি কথাই বলে গেছে।

দুলু বলল—আমারও সেটা মনে হচ্ছিল। তবু আমি কিছুই স্বীকার করিনি। বলেছি, অতনু সেন না, আমার স্বামীর নাম মিহির দাশগুপ্ত। বেসরকারি অফিসের কেরানি। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এসেছি। অবশ্য আমি ছেলেটিকে আবার আসতে বলেছি। যদি আসে তবে তুমি ছেলেটিকে ভালো করে দেখে নিও। সাবধানের মার নেই। স্বীকার করো না যে তুমিই অতনু সেন।

আমি ঠাট্টা করে বললাম—কেন দুলু, আমি কি নেই?

দুলু গম্ভীর গলায় বলল—না, আমরা নেই। আমরা আমাদের কথা ভুলে যাব।

—আমরা নেই আমরা নেই, ভাবতে ভাবতে সেই রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বুড়ো মালি ঘাস-জঙ্গলের অনেকটা নিড়িয়ে দিয়েছে। ছাতিমতলা এখন পরিষ্কার। দুপুরে আমি জাফরি-ঢাকা বারান্দায় বসে বইপত্র পড়ি। চেয়ে দেখি, ছাতিমতলায় ছোট একটা জনসভা বসেছে। শ্রোতা দু'জন—ঝিমলি আর বুধিয়া। বক্তা তিতু। অবিকল আমার মতো বাঁ হাতখানা পিছনে নিয়ে সামনে ঝুঁকে তিতু বলছে—বন্ধুগণ, আজ এই সভায়...

অপলক তাকিয়ে থাকি। একসময়ে হঠাৎ চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তিতু যেন কখনও রাজনীতি না করে। বরং চিরকাল ও আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করুক।

এখানে এসে ক্রমে ক্রমে আমি গৃহী হয়ে যাচ্ছি। রোজ বাজার করি। স্নানের সময় নিজের গেঞ্জি রুমাল কেচে দিই। ঘরের কাজে দুলুকে সাহায্য করি। অনেক সময়ে রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বলি—দুলু, মা যে পোস্ত বাটা দিয়ে ডাঁটার চচ্চড়ি রাঁধে—ওরকম একবার রেঁধে খাওয়াবে?

শুনে দুলু খুশি হয়। চিরকাল আমি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে উদাসীন। যা পাই খাই। পাঁউরুটি আর জল খেয়ে কতদিন কেটে গেছে। আমার যে কোনও কিছু ইচ্ছে হয় তা জানতামই না। এখন নিজের পছন্দমতো অনেকক্ষণ ধরে বাজার করি। পুঁইশাক কিনলে কুমড়ো কিনতে ভুলি না। খেতে বসে নুন কম, কিংবা ঝাল বেশি—এইসব মতামতই দিই। এখন জানি, ঝোল শুষলে ডালনার স্বাদ হয়।

দুলুর মুখে চিরকাল আমার প্রতি এক নিরক্ত নিষ্ঠুরতা দেখে এসেছি। এখন আমি ওর কাছাকাছি থাকলে ওর মুখে লাজুক রক্তাভা দেখা যায়। আমি মাঝে মাঝে ভাবি—এখনও বোধহয় আমাদের খুব বেশি বয়স হয়ে যায়নি। বোধ হয় খুব বেশি সময় আমি নষ্ট করিনি জীবনের।

আয়নায় দেখি, অবিরল দুশ্চিন্তার মধ্যে বাস করেও আমার গালে মাংস লেগেছে, ঢেকে গেছে কণ্ঠার হাড়। পুরোনো গেঞ্জিগুলো শরীরে আঁট হয়ে বসে। দুলুর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়, ওই রক্তাভাটুকু কেবল লজ্জার নয়, ওতে স্বাস্থ্য আছে। ব্লাউজের হাতার নীচে ওর হাতের ডৌল ফেটে পড়েছে। ছোটন আর তেমন ঘ্যানঘ্যান করে না তো; একা বসে বারান্দায় রাজ্যের খেলনা নিয়ে খেলে। মাথার ঘা শুকিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। এখন মামড়ি খসছে। তিতু বহুদূর দম ধরে দৌড়োয়, অবিরাম স্কিপিং করে ঝিমলি। কেউই সহজে হাঁফায় না। কখনও বা তিতু আর ঝিমলির সঙ্গে চোর-চোর খেলি। ফাঁকা, প্রকাণ্ড বাড়ি, একটা টু দিলে দশটা ফিরে আসে।

আমাকে চমকে অবাক করে দিয়ে প্রায় রাত্রেই দুলু বাইরের ঘরে চলে আসত। ওঘরে বড় বিছানায় ছেলেমেয়েরা ঘুমোয়। রাত গভীর হয়। তখন দুলু আসে। অন্ধকারে তার কলপ দেওয়া শাড়ির খসখস শব্দ পাই, চুড়ির শব্দ হয়, তার শরীরের সুগন্ধে ভরে যায় ঘর। মশারি তুলে সে বিছানায় চলে আসে। ক্যাম্বিসের ছোট খাটে শব্দ হয়। দুধার থেকে ক্যাম্বিসের ঢালু নেমে এসে ঝুলে থাকে, মাঝখানটায় অপরিসর একটা গর্তের মতো। দুলু সেই চাপা জায়গায় আমার সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকে। ঘন শ্বাস ফেলে আমার মাথার চুল মুঠো করে ধরে চাপা গলায় বলে—বুড়ো, বুড়ো। মাথায় টাক পড়ছে, দাঁত নেই—বুড়ো বর। এই বর নিয়ে আমি কী করব! কী করব!

মাথার ভিতরে মেঘ করে আসে স্মৃতি। পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটে বিয়ের পর কয়েকটা দিন মনে পড়ে। দুলু আমাকে দু'হাতে আঁকড়ে জিগ্যেস করত—তুমি কে? তুমি কে গো? চিনি না তো! অচেনা মানুষের এ কেমন ব্যবহার একটা মেয়ের সঙ্গে! আমার কিছুই রাখলে না তুমি? সব নিয়ে নিলে?

অন্ধকারে দুলু হাসত। সেই হাসি তার বুকের গভীর থেকে উঠে আসত। মাঝখানে খরা গেছে বহু কাল। আজকাল আবার দুলু সেরকম হাসে! কিন্তু আমি যে হাতে তাকে জড়িয়ে ধরি সেই হাত শিথিল হয়ে গেছে অনেক। তেমন শক্ত হাতে ধরতে পারি না। যেন বা আমার দাবিদাওয়ার সাহস নেই আর। ভিখিরির হাত বাড়িয়ে যতটুকু পাই নিই! তাই জোর আসে না। বরং আবার উলটে বলতে ইচ্ছে করে—তুমি কে? তুমি কে গো! চিনি না তো! অচেনা পুরুষের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার?

দুলু ঠাট্টা করে—তুমি ধরতেও শেখোনি আমাকে!

আমি হাসি—অভ্যেস নেই কিনা!

দুলু পায়ে পা ঘষে বলে—অভ্যেস নেই কেন! কে অভ্যেস করতে বারণ করেছিল? তুমিই তো ছেড়ে দিলে আমাকে, ফিরেও তাকাওনি!

আমি মৃদু কণ্ঠে বলি—জীবনে আমি নিজের জন্য খুব বেশি কিছু চাইনি দুলু। যে দু'একটা জিনিস মুখে ফুটে চেয়েছিলাম তার মধ্যে তুমি একটা।

দুলু গভীর গলায় বলে—চেয়েছিলে ঠিকই, কিন্তু নাওনি।

আমি চুপ করে থাকি ভয়ে। পাছে পুরোনো কথা উঠে পড়ে।

কিন্তু দুলু ছাড়ে না, বলে—নিলে আমার দিন এত দুঃখে কাটত না। কতদিন দুধ জোটেনি বলে তিতু আর ঝিমলিকে শটিফুড খাইয়েছি, কিংবা বার্লির জল। সে-সব কি পেটে থাকে, সারাদিন খিদেয় কাঁদত না। পাড়া-প্রতিবেশীরা ঠাট্টা করে বলত—হবু এম-এল-এর-র বউ। কী লজ্জা! রাত জেগে পড়ে, টিউশানি করে আমার শরীর গেল কর্কশ হয়ে, বয়স গেল বয়ে। কারও আদর পাইনি কখনও, কি দিয়েছো তুমি আমাকে, বলো তো?

উত্তর দিই না। দুলু আক্ষেপে আমার বুকে তার হাতে ঘন ঘন চাপড় দিয়ে বলে—নষ্ট করেছ। নষ্ট করেছো আমাকে। কিছুই দাওনি।

বলতে বলতে সে আমাকে আবার আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে। প্রবল চুমু খায়! আবার চুমু খেতে খেতে কাঁদত থাকে—কেন একটা জীবন আমাদের বয়ে গেল। তোমার লজ্জা করে না? কোন লজ্জায় তুমি আমার মুখোমুখি হও?

অনেকক্ষণ কাঁদে দুলু, তারপর হঠাৎ বলে—আমাকে আদর করো। শীগগির।

আদর খেতে খেতে বলে—শত্রু। মহাশত্রু তুমি আমার।

বুঝতে পারি, এইসব আবেগ আর আদরের পিছনে পরোক্ষে প্রকাশের মৃত্যু কাজ করছে। দুলু হঠাৎ সচেতন হয়ে বুঝতে পেরেছে, তার স্বামীর আয়ু বড় অনিশ্চিত। কোথায়, কোন লুকানো জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আমার অপ্রত্যাশিত ঘাতক তা কেউ জানে না। কেন মারবে—তার কারণ স্পষ্ট নয়। জীবনযাপন করতে করতে আমরা কেবলই ভুলে যাই যে মানুষ মরণশীল। ভুলে যাই বলেই এই দুর্লভ জীবন আমরা হেলাফেলায় যাপন করি। অবহেলা করি কাছের মানুষকে, চোখের সামনে দেখেও ভুলে যাই। নিষ্ঠুর উদাসীন আমাদের মুখ ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু যখন হঠাৎ মৃত্যুর ছায়া এসে পড়ে মরণশীলতা অমোঘ হয়ে দেখা দেয়, তখনই বোধহয় এইরকম ক্ষতি পূরণ করে নিতে চেষ্টা করি। কেড়ে নিতে চাই শেষ সময়টুকু।

আজকাল রোজ সকালে স্নান করে দুলু। লালপেড়ে গরদ পরে বাগানের ফুল তোলে মন দিয়ে। বুধিয়া কোথা থেকে বেলপাতা আর কাঁচা দুধ নিয়ে আসে। রিকশাওয়ালার সঙ্গে বাঁধা বন্দোবস্ত করেছে দুলু। সকালে আটটার মধ্যে রিকশা এসে ভেপুঁ বাজাতে থাকে।

দুলু যায় বৈদ্যনাথের মন্দিরে পুজো দিতে! রোজ। অনেকক্ষণ ধরে পুজো দেয়। ফিরতে দুপুর হয়ে যায়। যাওয়ার সময় বলে যায়—উনুনে ডাল চড়িয়ে গেলাম। সম্ভার দিও। চার কৌটো চালের ভাত চাপিয়ে দিও। চাল ধুয়ে নিও ভালো করে। আমার ফিরতে দেরি হবে।

আমি হাসি। দুলুর কথামতো ডালে সম্ভার দিই। ভাত চাপাই। তারপর ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করতে থাকি।

দুলু ফিরে আসে। রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ। ক্লান্ত দেখাচ্ছে উপোস করে থাকে বলে ঠোঁট শুকিয়ে থাকে, চোখ বসে যায়। সকলের হাতে প্রসাদী সন্দেশের টুকরো দেয়, প্রসাদী ফুল মাথায় ঠেকায়। আমাকে প্রণাম করে।

খেতে বসে প্রায়দিনই বলে—বরটা বুড়ো হলে কী হবে, ভারি কাজের তো! ডালে কী সুদর সম্ভারের গন্ধ হয়েছে! ওমা! আবার শুকনো লঙ্কা ভেজে দেওয়া হয়েছে! বুদ্ধি দেখ।

শুনে তিতু আর ঝিমলি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কখনও কখনও প্রকাশকে দেখি।

দুপুরে দুলু তার ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরে ঘুমোয়। আমি দুপুরের হা-হা বাতাসে বারান্দায় এসে বসি। কী নির্জন চারধার। লোক চলাচল নেই কোথাও। একটু কুকুরও হাঁটে না। কেবল বাতাস খেলা করে, রোদ ভেসে দায়। হঠাৎ দেখতে পাই প্রকাশ গেট-এর ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে হাসি, অবিন্যস্ত চুল। ডানহাতের মুঠি ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ করে বলে—লড়াই অতনু। লড়াই!

বাড়িটা বিশাল। বহু ঘর বন্ধ পড়ে থাকে। এক-একদিন একা ভূতের মতো সময় কাটাতে এ-ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়াই। একা একা কথা বলি। মাঝে মাঝে এমন হয়, একটা ঘরের দরজা খুলতেই দেখি, মেঝের ওপর প্রকাশ বসে আছে উবু হয়ে। আমাকে দেখে মুখ তুলে বলে—অতনু, আমার মা-বউ-বাচ্চাদের খোঁজ নিলি না? কেমন আছে ওরা সব? কী করে চলছে ওদের? দ্যাখ, একদিন হঠাৎ বাবা মারা গিয়েছিল বলে আমি আর মা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভিখিরি হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। আমার ছেলেমেয়েগুলোরও ওরকম হয়নি তো? বড় ভয় করে। তোরা দেখিস।

আমার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। বুক চেপে ধরে স্মৃতি। আমি সেই ফাঁকা ঘরে একা দাঁড়িয়ে গোপনে বাঁধ ভাঙা কান্না কাঁদি। প্রকাশ, যার খুন করে তারা জানে না, একটা মানুষ মানে একটা জগৎ। কত সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে একটা মানুষ—বউ-বাচ্চা-মা-বাবা-ভাই-বোন-বন্ধু—ওরা তা ভুলে যায়। ওরা মানে বিচ্ছিন্ন একটা মানুষকে। সেই মার সেই লোকটাকে ছাড়িয়েও ছড়িয়ে যায়। একজন মানুষের সঙ্গে আরও কত মানুষ শেষ হয়। যারা খুন করে তারা কি তা জানে?

সারা বাড়িময় আমি উদ্দেশ্যহীন স্মৃতিতাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়াই আর বলি—আমি নিরপরাধ ফেরারি প্রকাশ। এই অজ্ঞাতবাসে আমি এরকম সুখেই আছি। সারাটা

যৌবনকাল দুলু ফিরেও তাকায়নি। এখন দ্যাখ, মৃত্যুর ছায়া পড়েছে বলে সে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। পৃথিবীতে আর কতদিন আয়ু তা কে বলতে পারে। পৃথিবীর অধিকার কার হাতে যাবে তার মীমাংসার সংগ্রামে কত লোক চলে যাবে! সময় তাই আমাদের বড় কম। বড় মূল্যবান। আমাকে এই সময়টুকু ভোগ করতে দে প্রকাশ। আমরা যারা লড়াই করেছিলাম তাদের পরিবার বরাবর ভেসে গেছে। তাদের ভাগ্যই দেখেছে তাদের। আমাকে তোর পরিবারের কথা ভাবতে বলিস না। আমি পারবো না। আমাকে ছেড়ে দে। নতুন উদবেগ নতুন দায়িত্ব—এত বড় ভয়ের ব্যাপার এখন। আমাকে ক্ষমা কর আমাদের ভালোবাসার সময় সকলের আগে শেষ হয়।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হলে নিঃঝুম হয়ে কোনও গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। বনস্থলীতে বিচিত্র ছায়া পড়ে। পাখি ডাকে, উড়ে যায়। আস্ত আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি কখন। স্বপ্ন দেখি, পাখি হয়ে মানুষের অস্ত্রাঘাত থেকে উড়ে যাচ্ছি অনায়াসে। বন্দুকের শব্দ এড়িয়ে শরতের আকাশ লক্ষ করে তীরের মতো ছুটে যাচ্ছি। আকাশ নিরবধি, অনন্ত। কোনও ভয় নেই। পালাবার পথ সেখানে শেষ হয়ে যায় না।

সন্ধে হয়ে এলে দুলু আর ছেলেমেয়েরা ডাকতে ডাকতে আমাকে খোঁজে। তাদের গলার স্বরে উদবেগ। খুঁজে পেয়ে দুলু বড় বড় চোখে আমাকে দেখে—তুমি কী গো! জানো না, ভয়ে বুক শুকিয়ে থাকে আমার! একটা সময়ও নিশ্চিন্ত থাকি না।

ঝিমলি দুলে দুলে একটা ছড়া বলে প্রায়ই—পাটের শাড়ি বের করো মা, দখিন যাব গো। তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো।

ছড়াটা শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে যায়। এক একটা সময়ে তখন গভীর অন্যমনস্কতা আছে, তখন আপনমনে আমি ওই ছাড়াটার একটা লাইন বিড় বিড় করে বলি—তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো...তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো।

বলতে বলতে দেখতে পাই, কাটিহারে খালাসিটোলার নোংরা ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে রোগশয্যায় শুয়ে আছে। ধূম জ্বর উঠছে তার। বিকারের ঘোরে ঘোর লাগা চোখে চেয়ে আছে। তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে মায়ের মুখ। সে বলছে—তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো...তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো...

আমার শরীরে রোমকূপ শিউরে উঠে। আমার কোলের ওপর ছায়া ফেলে প্রকাশ সামনে দাঁড়ায়। বলে—অতনু, শোধ নিবি না?

মুখ ফিরিয়ে নিই।

সংসার আমার ভালো লাগে আজকাল। ভালো লাগে দুলু, ঝিমলি, তিতু, আর ছোটনের সঙ্গে মেখে-জুখে থাকতে। বাগানের একদিকে খানিকটা জমি বেছে নিয়ে আমি মাটি কোপাই। দুলু ফুলের চারা লাগাতে চায়। আমি চাই রাইশাক হোক। কিন্তু সে জন্য নয়,

আসল কথা মাটি কোপান আমার ব্যায়াম। শরীরটাকে ঠিক করে নিতে হবে। অম্বলের ব্যথাটা আর টের পাই না। বর্ষা শেষ হয়ে এল। শরতের সাদা মেঘখণ্ড আকাশে ভেসে বেড়ায়। সকালে গেট-এর পাশে শিউলি ফুল ঝরে থাকে।

বুড়ো মালিটা নির্বিকার বাগানে বসে থাকে। সে কথা বলে কম, উদাসভাবে বসে থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু তার মুখে কোনও দুঃখের ছায়া নেই। মাঝে মাঝে আগাছা নিড়োয়, তারপর গাছপালা মাটির সঙ্গে মিশে ঝিম মেরে এই প্রকৃতির বৈরাগ্যকে নিজের ভিতরে অনুভব করে। নিজের চোখের কথা ওর বোধহয় বেশি মনে পড়ে না। বেঁচে থাকার কিছু কিছু মূল্য দিতে হয়—এরকমই সে জানে! ওর কাছ থেকে ওই বৈরাগ্যটুকু সারাদিন ধরে অল্প করে শিখে নিই। আমার একটা জীবনে বহু উচ্চাকাঙক্ষা নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা ভুলতে ওই বুড়ো মালির বৈরাগ্যটুকু আমার বড় দরকার।

শিমূলগাছের তলায় একটা মসৃণ পাথর পড়ে আছে! নির্জনে সেখানে গিয়ে বসি। ডানদিকে ঢালু মসৃণ সবুজ, চারদিকে ভাঙের জঙ্গল, ভাটফুল কণ্টিকারী। পাখি-পাখালির অবিরল তীব্র ডাক। নিস্পন্দ বসে থাকি। হঠাৎ মনে হয় পৃথিবীর অধিকার হাতবদল হচ্ছে। বিনা বিপ্লবে, নিঃশব্দে। পুরনো বাড়িটার মাথায় ফাটা দেওয়ালে ওই যে অশ্বত্থের গাছ উঠছে নিশানের মতো। ওই নিশান বলছে, একদিন পৃথিবীর মানুষের সব সংগ্রাম শেষ হলে তারা আসবে। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে আসবে উদ্ভিদ জগৎ। অধিকার করে নেবে সবকিছু। তারাই ভেঙে ফেলবে বাড়ি-ঘর, ঢেকে ফেলবে রাস্তাঘাট, কলকারখানা চাপা দেবে মাটিতে। এইভাবে নিঃশব্দে হাতবদল হচ্ছে পৃথিবীর। শিমূলগাছের তলায় পাথরে বসে মাঝে মাঝে আমি এই বোধ করি। নিস্তব্ধতার মধ্যে অনুভব করি উদ্ভিদের পদসঞ্চার আমার গায়ে রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। কাঁটা দেয়।

দু-একদিন পর পর আবার ঘর ভরে যায় পোকামাকড়ে। তীব্র কীটানুনাশক ছড়িয়ে দিই ঘর বন্ধ করে। অবিকল হত্যাকারীর মতো দেখায় আমাকে। মুখে রুমাল ঢাকা, তার আড়ালে আমি হাসি। পোকাদের ডেকে বলি—বন্ধুগণ, আমি জানি, মানুষের হাত থেকে একদিন পৃথিবীর অধিকার যাবে তোমাদের হাতে। আমার এ সংগ্রাম বৃথা। চিন্তাশূন্য আমার এই আক্রমণ, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সুন্দর প্রতিশোধ।

লক্ষ করি পরিশ্রমী পিঁপড়েদের সারিবদ্ধ চলাচল। মুগ্ধচোখে দেখি। পৃথিবীর অধিকার কার হাতে যাবে? পিঁপড়েদের? তবে তাই হোক। আমেন। মানুষ হিসেবে আমাদের আর কিছু করণীয় নেই।

রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে। ক্যাম্প-খাটের পাশে টেবিলে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস তুলে খাই। বাথরুম সেরে আসি। বাইরের জ্যোৎস্না দেখি নির্ভয়ে। সিগারেট ধরাই। কাশি।

অনেকক্ষণ চুপ করে জেগে বসে থাকি। তখন কখনও চারপাশে অদৃশ্য কীটানুজগৎ অনুভব করি, বাতাসে জীবাণুদের যাতায়াত। আমার গা শিউরে ওঠে।

বন্ধুগণ, পৃথিবীর অধিকার হচ্ছে হাতবদল। নিঃশব্দে, বিনা বিপ্লবে।

টের পাচ্ছি, ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসছে আমার মাথা। চিন্তাভাবনা হয়ে আসছে সীমাবদ্ধ। টের পেয়ে আমি অনন্দিত হই।

আনন্দিত মনে সকালের রোদে খালি গায়ে, খালি পায়ে, আমি মাটি কোপাচ্ছিলাম। মাটির ঢেলা ভেঙে চৌরস করছিলাম জমি। সেই সময়ের তির্যক-রোদে একটা লম্বা ছায়া পড়ল সামনের জমিতে। চোখ তুলে দেখি, একজন বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে! লম্বাটে, ফর্সা চেহারা। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে কৌতূহল।

আমি মুখ তুলতেই হাতজোড় করে বলল, আমার নাম শচীন রায়। একদিন ভুল করে এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম। সেদিন বউদির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল! আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

কোদাল ফেলে আমি বললাম—আসুন।

মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার যে নকল নামটা দুলু একে বলেছিল সেটা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

বারান্দায় তাকে বসিয়ে হাত-পা ধুয়ে আসার ছল করে আমি প্রথমেই গেলাম রান্নাঘরে দুলু-র কাছে।

—সেই ছেলেটা এসেছে।

—কোন ছেলেটা?

—ওই যে অতনু সেনের ভক্ত, যে আর একদিন এসেছিল।

—ও।

—কিন্তু আমি তো অতনু সেন নই।

দুলু ঠোঁট টিপে হেসে বলল—ঠিকই তো।

—কিন্তু তা হলে আমি কে! যে নামটা বলেছিলে তা মনে আছে?

খুব মুশকিলে পড়ে গেল দুলু। ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ ভাবল তারপর জিভ কেটে বলল—যাঃ, ভুলে গেছি।

চিন্তিতভাবে বললাম—তাহলে বরং ছেলেটিকেই জিগ্যেস করি।

দুলু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল—আহা! ঢং!

তারপর একটু ভেবে বলল—তুমি এত লোকজনের সঙ্গে মিশেছ, আর এই একটুখানি ব্যাপার সামলে নিতে পারবে না?

হেসে বললাম—পারব বোধহয়।

বাথরুমে ছোট্ট হাত-আয়নাটা পেরেকে টাঙানো। হাত-মুখ ধুতে গিয়ে নিজের মুখে প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে হাসলাম। বললাম—তুমি আর তুমি নও। সাবধান! মনে রেখো। তুমি তুমি নও।

বাইরে এসে ছেলেটির মুখোমুখি বসলাম। বললাম—আমার স্ত্রী না জানলেও আমি কিন্তু অতনু সেনের নাম জানি।

ছেলেটি হাসল। বলল—আপনার সঙ্গে তার চেহারার আশ্চর্য মিল। আমি আপনাকে কয়েকদিন রাস্তায় দেখেছি। চেহারাটা চেনা। ভাবতে ভাবতে অতনু সেনের কথা মনে পড়ল।

আমি নিস্পৃহভাবে বললাম—অতনু সেন কোথায় আছে জানেন?

ছেলেটি মাথা নাড়ল—না।

আমি একটু চিন্তিতমুখে বললাম—বোধহয় ওঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেছে।

ছেলেটি চুপ করে থেকে বলল—হতে পারে। রাজনীতিতে সকলে টেঁকে না। কিন্তু আমার মনে হয় উনি থেমে নেই। কাজ করছেন।

—এরকম কেন মনে হয় আপনার?

—রাজনীতিতে একটা ক্যারিয়ার আছে। সেখানে তিনি আন-সাকসেসফুল হতেও পারেন। সেটা বড় কথা নয়। বড় হচ্ছে অতনু সেন মানুষটা। আমি তাঁকে একরাত্রির জন্য দেখেছিলাম। তাতে আমার চোখ খুলে যায়।

—কী রকম? আমি সাগ্রহে জিগ্যেস করি।

—আমি তখন ছোট। উনি তখন নাম-করা নেতা। তবু মিটিংয়ের পর অনেক রাত পর্যন্ত তিনি আমাকে নানা গল্প বলেছিলেন। সেগুলো সবই ছিল মানুষের দুঃখের গল্প। তিনি একটা শাকওয়ালা বুড়ির গল্প বলেছিলেন, তার অনেক বয়স, ঘরে উপোসি কয়েকটা নাতি-নাতনি রেখে সে হাটে এসেছে শাক বেচতে। দু'পয়সা আঁটির শাক। সে বয়ে আনতে পেরেছে মাত্র বিশ-ত্রিশ আঁটি। শাক বেচে চল্লিশ কি ষাট পয়সা নিয়ে চাল কিনতে গিয়ে দেখে চালের সের এক টাকা, তখন সেই বুড়িটা ভাঙা হাটে পয়সা ক'টা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। তিনি আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন—বুড়িটা কী ভাবছে বলতে পার? আমি পারিনি। তিনি বলেছিলেন, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুতেই বুড়ির সেই ভাবনাচিন্তার নাগাল পাবে না। এই গল্প বলতে বলতে তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি একটি চাষি পরিবারকে দেখেছিলেন একবার, বোলপুর স্টেশনে সেই চাষি পরিবার ডাউন দার্জিলিং মেলে উঠতে এসেছিল, যাবে বর্ধমানের এক মেলায়। চাষা, চাষার বউ, আর বাচ্চা একটা মেয়ে। তারা যথাসাধ্য নতুন রঙিন জামাকাপড় পরে এসেছে, মেলায় যাওয়ার আনন্দ উত্তেজনায় মেয়েটি অধির, বউটি ঘোমটা সরিয়ে চারদিক দেখছে। সেই ট্রেনে অসম্ভব ভিড় ছিল, দরজার হাতলে ঝুলছিল লোক। চাষা তার বউ আর মেয়ের হাত ধরে এক দরজা থেকে

আর এক দরজায় ছোটাছুটি করছে, কেউ তাদের উঠতে দিচ্ছে না। বাচ্চা মেয়েটা তার প্রথম ট্রেনে চড়ার আনন্দে দু'হাত বুকের কাছে জড় করে ক্লিষ্ট একটু হাসি মুখে নিয়ে অধীর আগ্রহে কাঁপছিল। তারা উঠতে পারছিল না। উগ্র আগ্রহে একটা দরজায় ওঠবার জন্য তারা তখন প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, তখন একটা লোক যে ঘাট থেকে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছিল—ভীষণ বিরক্ত হয়ে চাষা লোকটাকে একটা লাথি মেরেছিল। অমনি চাষা পরিবার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অসহায় অপমানে, নিরুপায় দুঃখে চাষা তাকিয়ে আছে, চাষি-বউ লজ্জায় আবার ঘোমটায় ঢেকেছে মুখ, মেয়েটা তখন কাঁপছে—তার হাসিটা বদলে আস্তে আস্তে কান্না হয়ে যাচ্ছে—এই দৃশ্যটুকুর ওপর দিয়ে ডাউন দার্জিলিং মেল সরে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। ওই শিশু মেয়েটিকে মানুষের সভ্যতা কি দিল?

অতনু সেন না হয়ে অন্য কেউ হলে আমি নিশ্চয়ই এই গল্প শুনে হেসে উঠতাম। কিন্তু বস্তুত মুশকিল এই যে, আমি অতনু সেন। এই সব ঘটনা আমার বুকে লেগে আছে, যেমন লেগে আছে ছেলেবেলায় খেলার মাঠে দেখা আমার বাবার অসহায় মুখখানা।

আমি হাসলাম না।

ছেলেটি বলল—অতনু সেন জানতেন কি করে গল্প বলতে হয়। মানুষকে ভালো না বাসলে ওই সব তুচ্ছ গল্প ওইভাবে কেউ বলতে পারে না, যাতে চোখে জল আসে, বুকে কান্না জমে ওঠে, সেই শিশু বয়সেও যা শুনে আমার রাতে ঘুম হয়নি। সেই প্রথম আমি মানুষের কথা ভাবতে শুরু করি। আজও অতনু সেনের সেইসব গল্প স্পষ্ট মনে আছে। এখনও চোখ বুজলেই ভাঙা হাটে সামান্য পয়সা হাতে এক বুড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, দেখি বোলপুরের প্ল্যাটফর্মে অপমানিত বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে এক শিশু মেয়ে। তাই, এখনো মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার মতো জোর আমি পাই। অতনু সেন আমার জন্য অনেক করেছেন, কতখানি করেছেন তা তিনিও জানেন না। আমার বিশ্বাস তিনি থেমে নেই। সেই বুড়ি বা সেই চাষি মেয়ের জন্য, বা ওরকম আরও অনেকের জন্য পৃথিবী তোলপাড় না করে ছাড়বেন না।

আমি কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে, আস্তে আস্তে ধরা গলায় বললাম—অতনু সেন অনেকবার দল বদল করেছিল।

—তাতে কী? আমাদের কোনও দলই উপযুক্ত নয়। একদিন মানুষ আপনা থেকেই তাঁর চারদিকে দলবদ্ধ হবে। আমি নিজে তাঁর সন্ধানে আছি।

চমকে উঠলাম। চুপ করে রইলাম। দুলুর সতর্কবাণী মনে পড়ল। আমরা আর আমরা নই। আমি নই আমি। আমি আমাকে ভুলে যাব। যেতেই হবে।

পৃথিবীর অধিকার হয়ে যাচ্ছে হাতবদল। বৃথা মানুষের সংগ্রাম। আসছে উদ্ভিদ কীট, আসছে জীবাণুরা। হুররে!

দুলু চা নিয়ে এল। ছেলেটির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল—ভুল ভেঙেছে তো? ছেলেটি হেসে মাথা নাড়ল কেবল। অন্যমনস্ক ছিল বলে উত্তর দিল না। তেমনি অন্যমনস্কভাবেই বসে বসে আস্তে আস্তে চা-টুকুও শেষ করল। ততক্ষণ আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর এক সময়ে শচীন বলল—আপনাকে প্রথম দেখে ঠিক যেন মনে হয়েছিল এই অতনু সেন। তারপর জানলাম আপনি অতনু সেন নন। কী যেন আপনার নামটা বউদি বলেছিলেন কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না—

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—হিরন্ময় চৌধুরী।

ছেলেটা হাসল—ঠিক।

তারপর উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ দেখি সকালের তীব্র আলোয় তার চোখ দুটো হঠাৎ ঝলসে উঠল, একটু হেসে সে বলল—অতনু সেনের আর একটা গল্প আপনাকে শুনিয়ে যাই। এটা ভৌতিক গল্প। একটা লোক তার নিজের ছায়াকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছিল। ছায়াটা ঘড়ি ঘড়ি বদলে যায়। কখনও দেখে তার ছায়াটা একটা বাঘের ছায়া কখনও বা দেখে একটা বেড়ালের। কখনও বা দেখে ফণাতোলা একটা সাপের চেহারা নিয়েছে আবার কখনও বা একটা ঝুপসি গাছের মতো হয়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে। লোকটা ওইসব দেখে আর ভাবে তাই তো। তবে কি আমি মাঝে মাঝে হয়ে যাই বাঘ, কিংবা বেড়াল। হয়ে যাই সাপ কিংবা গাছ? লোকটা ভাবত আর দিন-রাত ছায়া দেখত। দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে সে ক্রমে ক্রমে ছায়ার মতোই হয়ে যেতে লাগল। বাঘের ছায়া দেখলে সে বাঘের মতো গর্জন করত, সাপের ছায়া দেখলে করত ফোঁস ফোঁস, আবার গাছের ছায়া দেখলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুবহু এক গাছের মতো বাতাসে দোল খেত। শেষ জীবন পর্যন্ত লোকটা বুঝতেই পারল না, সে আসলে কী।

আস্তে আস্তে তার মুখ থেকে [illegible] হয়ে আমার চোখ নীচে নেমে এল। নুয়ে এল মাথা।

সে বলল—চলি।

আমি উত্তর দিলাম না।

সে চলে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে তাদের খেলা সেরে রাঙা মুখে তিতু আর ঝিমলি এসে আমাকে একই ভাবে বসে থাকতে দেখল। তারা চিৎকার করে আমাকে হনুমান আর কাঠবেড়ালি দেখার গল্প বলল!

তারপর ঝিমলি বলল—কে একটা লোক এসেছিল না বাবা। ওই লোকটা ঢুকবার সময়ে আমাদের ডেকে অনেক কথা জিগ্যেস করছিল।

—কী জিগ্যেস করেছিল?

—তোমার নাম কী, তুমি কী কর।

—তোমরা বললে?

—বললাম। আমার বাবার নাম অতনু সেন। আমার বাবা নেতা। ঠিক বলিনি বাবা?

—আমি কষ্টে হাসলাম।

রাত অনেক। ছেলেমেয়েরা ঘুমোতে গেছে। শোওয়ার আগে দুলু তার শরীরের পাউডার ছড়াচ্ছিল।

আমি সেই সুন্দর দৃশ্য দেখছিলাম। দুই বাহু ঊর্ধ্বে তোলা। আধখালা বুক উন্নত হয়ে পাতলা শাড়ি ভেদ করে আসছে। পিছল মসৃণ শরীর। লাবণ্যময়। একটু দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার মাথার মধ্যে আবার ঝড় উঠেছে। স্মৃতি আর স্মৃতি। অনন্ত দুঃখের স্মৃতিগুলি শূন্য থেকে উড়ে আসে। মানুষের জন্য—মানুষের জন্য—মানুষের জন্য এখনও সংগ্রাম বাকি রয়ে গেছে। কে করবে? কে আছ কোথায়? কে করবে?

আমি বিড় বিড় করে বললাম—দুলু, আমরা উদ্ভিদের হাতে পৃথিবীকে ছেড়ে দেব না!

দুলু চমকে ঘুরে বলল—কী?

আমি বিভোর হয়ে বললাম—কীট-পতঙ্গের হাতেও না।

—কী বলছ? কী ছেড়ে দেবে না?

—পৃথিবীর অধিকার। দুলু, আমাকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আমি ছাড়া আর কে করবে?

জীবন পা.

প্রভাসরঞ্জন

নরেনবাবু লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছিল না। লোকটা জ্যোতিষবিদ্যা জানুক, আর না-ই জানুক তার মধ্যে বেশ একটা নিরীহ ভাব আছে। আর খুব একটা ব্যবসাবুদ্ধি নেই।

আমার কোষ্ঠীর ছকটা গত পনেরো বছর ধরে আমার মুখস্ত আছে। কেউ জ্যোতিষ জানে শুনলেই সট সট করে কাগজে ছকটা এঁকে সামনে এগিয়ে দিই। বহুলোক আমাকে বহু রকম কথা বলেছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক সময়ে আমি আশার আলো দেখেছি, কখনও বা নিভে গেছি। দীর্ঘদিন পর আবার জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়ে আমি সামান্য কিছু উত্তেজনা বোধ করেছিলাম।

নরেনবাবু একটু আগে অফিস থেকে ফিরছেন। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে মাঝে-মাঝে বৃষ্টি পড়ছে আজকাল। বাইরে এখন মেঘের হাক-ডাঁক শোনা যাচ্ছে। ঘরে গুমোট। বাতাস থম ধরা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেন-এর ভিতরদিকে গলির ধাঁধার মধ্যে একটা অদ্ভুত আলো-বাতাসহীন ঘর। জানালা দরজা সবই আছে তবু আলো বা বাতাস কিছুই আসে না। একটা হলদে বালবের আলো বোধহয় সারাদিনই জ্বলে। বহু আদ্যিকালের একটা পাখা ঘুরছে ওপরে। তার বিষণ্ণ শব্দ হচ্ছে ঘটাং ঘটাং। দেওয়ালে পোঁতা গজালের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা কয়েকটা কাঠের তক্তায় বিস্তর পুরোনো পঞ্জিকা জমা হয়ে আছে, বেশ কিছু সংস্কৃত আর বাংলা জ্যোতিষের বই, কয়েকখানা ইংরেজি বইও। পুরোনো একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে অসম্পূর্ণ একটা কোষ্ঠীপত্র পড়ে আছে, দোয়াতদান, কলম, ডটপেন, লাল, নীল আর কালো কালির দোয়াত, চশমার খাপ, কোষ্ঠীর তুলোট কাগজ, নোট বই, চিঠি গেঁথে রাখবার কাঠের তলাওলা শিক, তাতে বিস্তর পুরোনো চিঠি। এ সবের মধ্যে নরেনবাবু বেশ মানানসই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোলগাল চেহারা, চোখেমুখে একটু বেশি লেখাপড়া করলে যেমন অন্যমনস্কতার দাগ পড়ে, তেমন আছে। খুব একটা হাসেন না, তবে মুখে একটু স্মিতভাব। আমার কোষ্ঠীর ছক আঁকা কাগজটা দেখছিলেন বাইফোকাল চশমা দিয়ে। মাথাটা নীচু, টাকের ওপর কয়েকটা চুল পাখার হাওয়ায় ঢেউ দিচ্ছে।

একটা বছর আট নয়েকের ছেলে বুঝি টেবিল থেকে নরেনবাবুর অজান্তে একটা ডট পেন নিয়ে গিয়েছিল, সেটা ফেরত দিতে এসে সুট করে টেবিলের ওপর পেনটা ফেলে

দিয়েই দেখি না দেখি না ভাব করে চলে যাচ্ছিল। নরেনবাবু গম্ভীর মুখটা তুলে বললেন—এই শোন। ছেলেটা একটু ভয়ে ভয়ে কাছে আসতেই বাঁ হাতটা দিয়ে কষিয়ে একটা চড় দিলেন গালে। বললেন—কতদিন বারণ করেছি, আমার টেবিলে জরুরি সব জিনিস থাকে, হাত দিবি না। অ্যাঁ, কতদিন বারণ করেছি?

চড় খেয়ে ছেলেটার বোধহয় মগজ নড়ে গিয়েছিল, কথা বলতে পারল না! ভ্যাবলার মতো কিছুক্ষণ চেয়ে হাত মুঠো করে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ভিতর দিকের দরজার কেলোকিষ্টি নোংরা পরদাটি সরিয়ে চলে গেল! নরেনবাবু নির্বিকারভাবে আবার আমার ছক দেখতে লাগলেন, না, খুব নির্বিকারভাবে নয়, মাঝেমাঝে দেখছিলাম তিনি আড়চোখে ভিতর বাড়ির দরজাটার দিকে তাকাচ্ছেন। ওদিক থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করছিলেন বোধ হয়। ছেলেকে চড় মারাটা বোধহয় তাঁর ভুলই হয়েছে!

ভুল যে হয়েছে সেটা বোঝা গেল কয়েক সেকেন্ড বাদেই। পরদার ওপাশ থেকে আচমকা এক বিদ্রোহী গলা অত্যন্ত থমথমে স্বরে বলে উঠল—ব্যাপার কি, দাসুকে মেরেছো কেন? গালে গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে।

নরেনবাবুর বাইফোকাল ঝলসে উঠল, গম্ভীর গলায় বললেন—শাসন করার দরকার ছিল, করেছি। তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে নাকি। যাও, ভিতরে যাও।

—ইঃ শাসন! সংসারে কুটোগাছটি নাড়ো না, ছেলেপুলে কোনটা পড়ল, কোনটা কাঁদল তার হদিস জানো না, শাসনের সময় যত বাপগিরি!

বাইফোকালটা পরদার দিকেই ফোকাস করে মন মিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন নরেনবাবু। আমি বাইরের লোক, তবু আমার সামনেই ঘটনাটা ঘটছে বলেও তিনি খুব একটা সঙ্কোচ বোধ করছেন, এমন মনে হল না। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—আমার টেবিলের জিনিস তোমাদের কতদিন হাত দিতে বারণ করেছি। এর একটা কাগজপত্র হারালে কি ক্ষতি হবে তা মুখ্যুরা বোঝে না। ফের যদি কখনও কেউ হাত দেয় তো হাত ভেঙে দেব।

—ইঃ, মুরোদ কত। গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখো ফের, ও সব ভণ্ডামির জিনিস নুড়ো জ্বেলে পোড়াবো। হাবাগোবা সব লোক ধরে এনে দিনমান ধরে কুষ্ঠী না কপাল দেখে ঝুড়ি ঝুড়ি বানানো কথা বলে যাচ্ছে। জ্যোতিষ! ক'পয়সা আসে শুনি। বেশিরভাগ লোকই তো ছোলাগাছি দেখিয়ে সরে পড়ে। কবে থেকে বলছি, মহিন্দির বুড়ো হয়ে দেশে চলে যাচ্ছে, তার কয়লার দোকানটা ধরে নাও, কানু পানু বসে আছে, তারা দেখবে'খন। তা সংসারের যাতে সুসার হয় তাতে আবার কবে উনি গা করলেন। আছেন কেবল তেজ দেখাতে।

বাইফোকালটা খুব হতাশভাবে নেমে পড়ল টেবিলে। নরেনবাবু শুধু বললেন—মেয়েমানুষ যদি সব বুঝত তাহলে দুনিয়াটা অনেক সুস্থ থাকত। বোকা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করার মতো অভিশাপ আর হয় না, যাও তুমি ভিতরে যাও।

—আর তুমি বুঝি বুদ্ধির পাইকিরি নিয়ে বসে আছো! সংসারে মাসান্তে ক'টা টাকা ফেলে দিয়ে অমন ফুল-ফুল বাবুগিরি করে বেড়াতে পারলেই খুব বুদ্ধি হল, না! বোকা মেয়েছেলে! বোকা বলেই তোমার মতো আহম্মকের ঘর করতে হয়। বুদ্ধিমতী হলে তিন লাথি মেরে সংসার ভেঙে চলে যেত।

বাইফোকালটা আরও নত হয়ে যেত পড়ে। নরেনবাবুর এই বিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হই।

পরদার ওপাশ থেকে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর সরে গেল। গৃহকর্ম রয়েছে। নরেনবাবু ছক থেকে মাথা তুলে আমাকে বললেন—রবিটা নীচস্থ রয়েছে। মঙ্গলটা পড়ল তৃতীয়ে। একমাত্র শনিটাই যা স্বক্ষেত্রে পঞ্চমে।

বলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এ সবই আমার জানা কথা। রবি নীচস্থ, শনি পঞ্চমে।

নরেনবাবু বললেন—কেতুটাই ডোবাচ্ছে। বাঁদিকের ঘরে পড়ল কিনা! বাঁদিকে কেতু ভালো নয়।

আমি হতাশ বোধ করতে থাকি।

উনি মাথা নেড়ে বললেন—কার্তিক মাসে জন্ম হলে বড় মুশকিল। আমারও তাই। রবিটা নীচে পড়ে থাকলে কি করে কি হবে!

—কিছু হবে না?

নরেনবাবু গম্ভীর মুখে বলেন—এখনই সব বলা যাবে না। আগে নবাংশটা দেখি। সময় লাগবে। আপনি বরং ও হপ্তায় আসুন। ততদিনে করে রাখবো। তবে বিদেশ যাত্রার একটা যোগ আছে। নবাংশটা না করলে বোঝা যাবে না। পাঁচুবাবু আপনার কে হন?

—খুব দূর সম্পর্কের দাদা।

নরেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—অনেককাল দেখি না পাঁচুবাবুকে। আগে খুব আসতেন। উনি আমার প্রথম দিককার ক্লায়েন্ট।

—উনিই আপনার কথা বলেছিলেন আমাকে। বলতে গেলে উনিই পাঠিয়েছেন আমাকে।

নরেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন—বরাবর উনি লোক ধরে নিয়ে আসতেন আমার কাছে। ওঁর ধারণা ছিল, আমি খুব বড় জ্যোতিষী হবো। জ্যোতিষীর যে ধৈর্য স্থৈর্য দরকার, আর হিসেবের মাথা, সে সব আমার ছিলও! কিন্তু নিজের কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছিলাম, আমার দাম্পত্য জীবনটা ভালো হবে না। হলও না। পুরুষ মানুষের বউ যদি ঠিক না হয় তো তার সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। এই যে রাস্তায় ঘাটে অতি সাধারণ সব মানুষকে দেখেন তাদের মধ্যে অনেকের ছক বিচার করলে দেখবেন, অনেকেরই বড় বড় সব মানুষ হওয়ার কথা। কেউ নেতা, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক। বেশিরভাগেরই হয় না

কেবল ওই বউয়ের জন্যই। বউ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। পাঁচুবাবুরও খুব আশা ছিল আমার ওপর। এই সংসারের জন্যই হল না। তা পাঁচুবাবু আজকাল আর আসেন না কেন?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি—তার আর ভবিষ্যৎ কিছু নেই। হাসপাতালে পড়ে আছেন। মৃত্যুশয্যা।

নরেনবাবু বাইফোকাল খুলে রেখে চোখ দুটো ধুতির খুঁটে মুছলেন। আবার বাইফোকাল পরে নিয়ে বললেন—বয়স হল। সত্তর পঁচাত্তর তো হবেই।

—তা হবে।

—কোন হাসপাতালে?

—কবিরাজি হাসপাতাল, শ্যামবাজারে।

নরেনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—চিনি।

আমি বলি—যাবেন নাকি একদিন দেখতে? খুব খুশি হবেন তাহলে। ওঁর তো কেউ নেই। চেনা লোক কেউ গেলে খুব খুশি হন।

নরেনবাবু উদাস হয়ে বলেন—আমার সময় কোথায়!

বলে একটু চুপ করে থাকেন উনি। তারপর টেবিলের ওপর সেই অসম্পূর্ণ কোষ্ঠীপত্রটা পেতে ঝুঁকে পড়ে বললেন—গিয়েই বা হবে কি? মরুণে মানুষকে দেখতে আমার ভালো লাগে না, মন খারাপ হয়। অনেককাল দেখিনি, ওঁকে খামোখা এখন দেখে মন খারাপ করার মানে হয় না। তার চেয়ে চোখের আড়ালে যা হয় হোক। সেই ভালো। হয়েছে কি?

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম—বুড়ো বয়সের নানা রোগ। ভীষণ খেতে ভালোবাসতেন, সেই থেকে ডায়াবেটিস হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, ক্যানসারও দেখা দিয়েছে। বাঁচবেন না, তবে এখনো বেশ হাসিখুশি আছেন।

নরেনবাবু এই প্রথম একটু হাসলেন—পাঁচুবাবু বরাবরই সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। ভাগ্যবান। মরাটা নিয়েই আমি ভাবি। কবে, কোথায়, খাবি খেতে খেতে মরব। পাঁচুবাবুর মতো আমি তো আর সদানন্দ পুরুষ নই। একবার এই গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেন থেকে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন শোভাবাজার অবধি নিখুঁতি খাওয়াবেন বলে। অমনি নিখুঁতি নাকি কোথাও হয় না। চাচার হোটেলে বহুবার মাংস খাইয়েছেন। নানান শখ-শৌখিনতা ছিল তাঁর যা দেখে বোঝা যেত ভিতরটা সব সময়ে রসে ডগমগ। প্রায়ই বলতেন, আশি বছর বয়সের পর ধর্মকর্মে মন দেব। খুব বাঁচার ইচ্ছে ছিল, আবার মরতেও খুব পরোয়া ছিল না। প্রায়ই কেওড়াতলা নিমতলা সব ঘুরে বেড়াতেন। কত সাধুসঙ্গ করেছেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে টাকা খরচ করতেন। সেই পাঁচুবাবু মৃত্যুশয্যায়! এ কি ভাবা যায়?

পাঁচুদার কথায় আমিও দুঃখিত হয়ে পড়ি। বলতে কি কলকাতার শহরটা পাঁচুদাই আমাকে চিনিয়েছিলেন। সদানন্দ মানুষ, সংসারে কারও পরোয়া ছিল না। রাইটার্স বিল্ডিংসের ল্যান্ড রেভিনিউতে ভালো চাকরি করতেন। তাঁর যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে বাজার

ছিল সস্তাগণ্ডা। পয়সা তাঁর ছড়াছড়ি যেত। মনে পড়ল গতকালও পাঁচুদা একটু তেলমুড়ি খাওয়ার বায়না করেছিলেন। সেটা যে খাওয়া বারণ তা নয়। তাঁর স্টেজে কিছুই বারণ নয় আর। যা খুশি খেতে পারেন। ডাক্তাররা অবস্থা বুঝে সব বারণ তুলে দেয়। কিন্তু পাঁচুদার তেলমুড়ি খাওয়ার পয়সা নেই এখন আর।

নরেনবাবু ফের বাইফোকালটা খুলে চোখ মুছে বললেন—নবাংশটা করে রাখব'খন। কিন্তু আমি বলি কি, আপনি বরং এখন থেকেই বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা দেখুন। এক ঝলক বিচার করে যা দেখছি, হয়ে যাবে।

একটু শিউরে উঠে বলি—বলছেন?

—বলছি।

একটু ছোট শ্বাস ফেলে উঠে আসি।

বস্তুত সদ্য সদ্য জীবনের দশ দশটা বছর কষ্ট করে আমি এই সেদিন সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরেছি। কিন্তু সে কথা নরেনবাবুকে বলার কোনো মানে হয় না। বিদেশে যাওয়াটাই যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমি তাদের দলে নই।

খুব অল্প বয়সেই আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটেছিল। ভিখিরির ছেলে অল্প বয়সেই নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে শেখে। কারণ তাকে কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করে না। লক্ষ করে দেখেছি, শীতে বর্ষায় কাঙাল গরিরের শিশু জল নিয়ে খেলা করে, ধুলো বালিতে গড়ায়, অখাদ্য খায়, অসম্ভব নিষ্ঠুরতায় মারপিট করে। সেসবের প্রতিরোধশক্তি ওদের মধ্যে আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। নিদারুণ অভাব ওদের চরপাশের রুক্ষতাকে প্রেমহীন ভালোবাসাহীনভাবে গ্রহণ করতে শিখিয়ে দেয়, অল্প বয়সেই তারা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ধুলো-খেলা করতে করতে উঠে গিয়ে ভিক্ষের হাত পাতে, বিয়েবাড়ির ফুটপাতে রাস্তার কুকুর তাড়িয়ে খাবার খুঁটে আনে, দুধের শিশু মাকে ছেড়ে সারাদিন একা পড়ে থাকে, কাঁদে ন। ওই তাদের খেলা ও জীবন। মা-বাবা মরলে ছেলেমেয়ে কদাচিৎ কাঁদে, সন্তান মারা গেলে মায়ের শোক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অকারণ মায়া তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে না কখনও।

ভিখিরিদের সম্বন্ধে এত কথা বললাম, তার মানে এই যে আমাদের জীবনযাপন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তৈরি করে দেয়। শৈশবে আমার চেতনা হওয়ার পর থেকেই আমি স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিলাম যে খিদে পেলেই খাবর এসে হাজির হয় না। এও জানতাম, ছোটখাটো ব্যথা বেদনা, খিদে বা মারধরে কাঁদতে নেই। কান্না বৃথা, কেউ সেই কান্না ভোলাতে আসে না। এও জানতাম, আমার বাবার থাপ্পড়ের জোর খুব বেশি, মার নিস্পৃহতা ছিল পাহাড়ের মতো অটল।

উনিশশো সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরই ঢাকা থেকে উদবাস্তু হয়ে আসা আমাদের পরিবারের জনসংখ্যা খুব কম ছিল না। ওই অত লোকের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের

আত্মসচেতনতাও অনেক কমে গিয়েছিল। রানাঘাটের কাছে এক ক্যাম্পে তখন থাকি, অনেক উদভ্রান্ত লোক চারিদিকে, খাওয়া পরার কোনো ঠিক নেই। মচ্ছবের মতো দুবেলা কারা যেন খিচুড়ি খাওয়াতে আসে। খাওয়া বলতে ওইটুকুই। সারাদিনে বহুবার খিদে পেত খিদে মরে যেত। প্রথমে কাঁদতাম খুব কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বুঝতে পারতাম কান্নার মূল্য দেওয়ার কেউ নেই। বাবার এক খুড়ি ছিল দলে। খুনখুনে বুড়ি, সেই ঠাকুমা মাঝেমাঝে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, কাঁপা কাঁপা স্বরে কিছু বলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর চোখের কোল ছিল ফোলা, চোখ ঘোলাটে, চোখের দোষেই সব সময়ে অশ্রুপাত করতেন, সেটা কান্না ছিল না। সেই ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ বড় একটা পাত্তা দিত না।

দরমার বেড়া দেওয়া দমবন্ধ সেই ঘরে আমরা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকতামও না। অনেক আমাদের বয়সি ছেলেমেয়ে জুটেছিলাম সেইখানে। ক্রমে খিদে ভুলে খেলায় মেতে থাকতে শিখেছিলাম। মার্বেল নেই, লাট্টু নেই, ঘুড়ি লাটাই জোটে না, তবু কত রকম তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেলা আমরা তৈরি করে নিতাম। মাটির চাড়া ছুড়ে সিগারেটের খালি প্যাকেট জিতে নেওয়ার খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, দড়ি পাকিয়ে বল তৈরি করে তাই দিয়ে ফুটবল। দেশের বাড়িতে আমরা নাকি তিনবার ভাত খেতাম, তা ছাড়া সারাদিন ধরে মুড়িমুড়কি, আমটা জামটা তো ছিলই।

সেই সব ভুলতে শিশুদের দেরি হয়নি। আবার খুব চট করে জীবনের রুক্ষতাকে টের পেয়ে তা গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। রানাঘাটে আমরা অবশ্য খুব বেশিদিন থাকিনি। সেখান থেকে হাবড়া, ব্যান্ডেল, গোসাবা হয়ে আমরা অবশেষে কলকাতায় আসি। বাবা পূর্ববঙ্গে জমির আয় থেকে সংসার নির্বাহ করতেন, খুব বেশি লেখাপড়া বা বৃত্তিগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। চাকরি-বাকরি পাওয়ার প্রশ্ন ছিল না, উদ্যোগের অভাব, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং উদবেগে তিনি আরও অপদার্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। সহ-উদবাস্তুদের সঙ্গে সারাদিন কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতেন, আর বাড়ি ফিরে কেবলই ফিসফাস করে পরামর্শ করতেন সকলের সঙ্গে। পরামর্শের শেষ ছিল না। কার্যকর কিছুই হত না।

আমরা কাছাকাছি বয়সের চার ভাই, আর তিন বোন মিলে সাতজন, মা বাবা ঠাকুমা, এক কাকা কাকিমা আর তাদের তিন ছেলেমেয়ে, আবার এক ছোট কাকা—এই বিশাল পরিবার বিনা টিকিটে ট্রেনে, হাঁটাপথে, কিংবা যেমন তেমন ভাবে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে হয়রান। কলকাতায় আমরা দমদমের কাছে এক খোলা মাঠে জড়ো হয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাবা-কাকাদের মধ্যে খুব ভালোবাসা ছিল, ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু বোঝা গিয়েছিল, ওইভাবে যৌথ পরিবার রক্ষার চেষ্টা করলে আরও মুশকিলে পড়তে হবে।

মেজোকাকা তার পরিবার নিয়ে একদিন ভিন্ন হয়ে গেলেন। শোনা গেল, আদি সপ্তগ্রামে তাঁর এক খুড়শ্বশুরের জমিজমা আর কলাবাগান আছে, তদুপরি তিনি একটি মাত্র

সন্তানকে হারিয়ে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। কাকাকে তিনি জমি বাগান তদারকির কাজ দিয়েছেন। কাকা সপরিবারে চলে গেলে পরিবারে লোকের চাপ কিছু কমল। যেখানে যাই সেখানেই আমাদের বয়সি কাঙাল ছেলেপুলে জুটে যায়। আমরা খুব খেলি। বলতে কি, সেই সময়ে একটা বড়সড় ছেলে আমাদের ভিক্ষে চাইতে শিখিয়েছিল।

ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে আমরা বড় রাস্তায়, বাজারে এবং রেল স্টেশনে বহুবার ভিক্ষে করেছি। তবে কারও বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করত। আমরা বড়জোর পথচলতি মানুষের কাছে হাত পেতে বলতে পারতাম-দুটো পয়সা দেবেন? পয়সা পেলে নানা কুপথ্য কিনে খেতাম। ছোটখাটো চুরি করতাম কখনও-সখনও। লাউটা, মুলোটা, ঘটি কি বাটি পেলে বেচে দিতাম। রেলের কামরায় উঠে খুঁজতাম যাত্রীদের ফেলে যাওয়া জিনিস।

আমাদের বখে যাওয়ার ব্যাপারটা-মা-বাবা কদাচিৎ লক্ষ করেছেন। মা দু'দুটো কোলের মেয়েকে সামলাতে ব্যস্ত, বাবা অভাবে পাগল, ছোট কাকা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিষণ্ণ। তিনি মানুষটা ছিলেন বড় ভালো, বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। নীরবে তিনি তাঁর সঙ্গে আনা কিছু পুরোনো পড়ার বই বারবার পড়তেন। তাঁর তাড়া খেয়ে আমরা চার ভাই কিছু কিছু লেখা-পড়া শিখেছিলাম। লেখাপড়া আমার খুব খারাপ লাগত না, অক্ষর চেনা রিডিং পড়া যোগ বিয়োগ ইত্যাদির মধ্যে আমি কিছু নতুন রকম খেলার রহস্য টের পেয়েছিলাম।

ছোটকাকার বিষণ্ণতার গভীরতা আমরা টের পাইনি, যখন পেলাম, তখন সেই আত্মহননকারীর দেহটি এক শীতের ভোরে দমদম জংশনের কাছে রেল লাইনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে ছিল। ছোটকাকার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারে জনসংখ্যা কমল, আরও কমল যখন আমার বড় দুই ভাই পরপর টাইফয়েড আর উদুরিতে মারা যায়।

এইসব মৃত্যু খুবই শোকাবহ বটে কিন্তু তবু বলি স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত জীবনে এই রকম শোক যতখানি ধাক্কা দিতে পারত ততটা হয়নি। ক্যাম্পে মৃত্যু দেখে আমরা অভ্যস্ত। শুধু খুনখুনে বুড়িঠাকুমা চোখের দোষেই হোক আর শোকেই হোক অবিরল অশ্রুপাত করে বিলাপ করতেন। মা বাবা অচিরে সামলে উঠলেন। শোকের সময় কই?

শুনতে পেলাম, বাবা কন্ট্রোলের কাপড়ের একটা ব্যবসা পেয়েছেন। সেটা ভালো না খারাপ এসব বিচার তখন মাথায় আসে না। একটা কিছু পাওয়া গেছে, একমাত্র সংবাদ। কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকপদ রান্না হয়, একটু নতুন জামাকাপড়ের মুখ দেখি। বাবা একটা হাতঘড়ি পর্যন্ত কিনে ফেললেন। অতিলোভে বোধহয় তাঁতি নষ্ট হল। সে ব্যবসা বাবার চেয়ে বিচক্ষণন লোকেরা হাতিয়ে নেয়। একটা রেশনের দোকানে বাবা কিছুকাল চাকরি করলেন। অভিজ্ঞতা বাড়ছিল। এর পরই বাবা এক বড় উকিলের মুহুরি হলেন। তার পরের পর্যায়ে বাবা স্বাধীনভাবে শিয়ালদা কোর্টে

বসে কোর্ট ফি পেতে লাগলেন, দলিল তৈরি, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির দালালি করে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত স্বার্থকতায় পৌঁছে গেলেন। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত দীন দরিদ্রের মতো, খুবই সামান্য খাওয়া-পরার মধ্যে একরকমের নিশ্চয়তা পেয়ে গেলাম। এক সেই বুড়ি-ঠাকুমার অনুল্লেখ্য মৃত্যু ছাড়া আর তেমন অঘটন কিছু ঘটেনি। আমি ছোটকাকার কাছে শেখা-সামান্য লেখাপড়ার ব্যাপারটি ভুলিনি। তিনি মারা গেলে তাঁর বইগুলো আমার দখলে আসে। সেগুলে নিয়েই আমার অনেক সময় কাটত। বাবা কোর্টের কাজ পাওয়ার পর, প্রায় দশ বছর বয়সে আমি দমদমের একটা ওঁছা ইস্কুলে ভরতি হয়ে যাই। সেই স্কুলে যে যায় তাকেই ভরতি করা হয়, যে ক্লাসে যার খুশি। নামকেবাস্তে একটা ভরতির পরীক্ষা নেওয়া হয় মাত্র।

আমি যেতেই তাঁরা জিগ্যেস করেন, আমি কোন ক্লাসে ভরতি হতে চাই।

আমি বললাম—সিকসে। তাঁরা কয়েকটা ট্রানশ্লেসন জিগ্যেস করলে আমি চটপট বলে দিই।

একজন মাস্টারমশাই বললেন—বাঃ, ভেরি ইন্টেলিজেন্ট।

আমি ভরতি হয়ে গেলাম। পরের পরীক্ষা থেকেই আমি প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকি। স্কুলটা যথার্থ খারাপ বলেই আমার মতো মাঝারি ছাত্রের পক্ষে ফার্স্ট হওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতে একটা সুবিধে হয়েছিল, এভাবে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকে। প্রায় দিনই টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যেত। ক্লাস প্রায় ফাঁকা পড়ে থাকত মাস্টারমশাইয়ের অভাবে। পড়ানো ছিল খুবই দায়সারা গোছের। আমি তাই বাড়িতে পড়তাম। দমদমের কাছে আমাদের কলোনির পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। চুরি, গুন্ডামি, মারপিট, জবর দখল, চরিত্রহীনতা, অশ্লীল ঝগড়া এ সব ছিল আমাদের জলভাত। এই পরিবেশ সহ্য করতে পারতেন না আমার ছোটকাকা। তা ছাড়া জীবনের হতাশার দিকটাও তাঁর সহ্য হয়নি, তাই তাঁকে মরতে হয়েছিল। আশ্চর্য এই, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁকে আমার বড় বেশি মনে পড়তে থাকে এবং আমার জীবনে তিনিই সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন।

সেই উদবাস্তু পল্লির সবচেয়ে অশ্লীল-গালিগালাজ আমার একসময় ঠোঁটস্থ ছিল, বখামির চূড়ান্ত একসময়ে আমি করেছি। কিন্তু ক্রমে আমার এই পল্লির কুশ্রীতা থেকে মানসিক মুক্তি ঘটে। আমি আমার আর তিন ভাইবোনকেও প্রাণপণে এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করতাম। বাবাকে বলতাম—চলুন, আমরা অন্য কোথাও বাস করি। বাবা খুব বিরক্ত হয়ে বলতেন—তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে লেখাপড়া করে। আর কিছুদিনের মধ্যেই জমির স্বত্ব আমরা পেয়ে যাবো। মাগনা জায়গা ছেড়ে আহাম্মক ছাড়া কেউ যেতে চায়?

আমি বাবার মতো করে বুঝতে শিখিনি। জমির জন্য তো মানুষ নয়। মানুষের জন্যই জমি। সেই মানুষই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, মানুষকেই যদি নীতিহীনতায় পশুত্বে নেমে যেতে হয় তো জমিটুকু আমাদের কতটুকু অস্তিত্বের আশ্রয় হতে পারে? অবশ্য বাবা একটা যুক্তিসিদ্ধ কথাও বলতেন—দেখ, পরিবেশ থেকে পালানোর চেষ্টা কোরো না। সর্বত্রই পরিবেশ একই রকম। যদি পারো, যদি সাধ্য থাকে তো পরিবেশকে শুদ্ধ করে নাও।

আমি তখন ছেলেমানুষ, আদর্শের কথা ভিতরে সাঁ করে ঢুকে তীরের মতো গেঁথে যেত। তার থরথরানি থাকত অনেকক্ষণ। বুঝতাম, সত্যিই কোথায় যাব? বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে এর চেয়ে ভালো বা সুস্থ পরিবেশ খুব একটা নজরে আসেনি তো? আমাদের কলোনিতে দুচারজন ভালো লোক ছিলেন ঠিকই। তাঁরা দশের ভালো করতেন, উপকার করে বেড়াতেন, ঝগড়া কাজিয়া মেটাতেন, তা সত্ত্বেও বলতে পারি তাঁরা আমাদের মধ্যে এমন কিছুর সঞ্চার করতে পারেননি যার দ্বারা আমরা উদবুদ্ধ হই, সংবর্ধিত হই। এ বাড়ির মেয়ে পালিয়ে যায়, ও বাড়ির ছেলে কালোবাজারি করে, অমুকের বউ পরপুরুষের সঙ্গ করে—এই ছিল আমাদের নিত্যকার ঘটনা।

প্রচণ্ড অভাবের চাপে মানুষ কত কি করে! এই সব মরিয়া ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে-যাওয়া মানুষের কাছে ধরবার ছোঁবার মতো কোনও বাস্তব আদর্শ কেউ দিতে প্যারেনি। ভালো কথা সবাই বলছে, দেশ জুড়ে বক্তৃতার অভাব নেই, কিন্তু কেউ জানে না কোন পথে, কোন আদর্শে মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তার ওপর নানা বিরুদ্ধ মতেরও জন্ম হচ্ছে রোজ। সেই মতামতের ঝড়ে আমরা আরও উদভ্রান্ত। কোন দিকে গেলে ঠিক হয় তা বুঝতে পারি না। তবু দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে যাই। এর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই, ওর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই। কে কেমন বলল সেইটে নিয়ে মাথা ঘামাই না। এদিকে দরমার বেড়া বা চালের টিন পালটাতে আমাদের জেরবার হয়ে যায়, পুজোর জামাকাপড়ের জন্য বাবাকে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখি। পুজো উপলক্ষ্যে জামাকাপড় কেনা হয় বটে, কিন্তু বছরে ওই একবারই আমাদের যা কিছু কেনা হয়। সেটা না হলে লজ্জা নিবারণের সমস্যা। আমরা এ সব নিয়ে ব্যস্ত; এর চেয়ে দূরের বস্তু, অর্থাৎ পুরো দেশ কিংবা মানুষের ভবিষ্যৎ—এ সব আমাদের ভাববার সময় নেই।

প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পাস করা গেল। আমাদের পরিবারে এ নিয়ে খুব একটা হইচই করার অবস্থা আমাদের নয়। বাতাসা লুট দেওয়া হল মাত্র। বাবা কিছু বেসামাল রইলেন কয়েকদিন। তাঁর মেজো ছেলে মানুষ হচ্ছে, এরকম একটা বিশ্বাস তাঁর হয়ে থাকবে। তখন তিনি প্রায়ই আমায় ছোটকাকার সঙ্গে তুলনা করে বলতেন—প্রভাসটা ঠিক ছানুর মতো হয়েছে। ছানুও বেঁচে থাকলে আজ কত বড় মানুষ হত। এই তুলনায় কেন জানি না আমি অত্যন্ত আল্হাদবোধ করতাম। কৈশোরোত্তীর্ণ ছোটকাকা কবে মরে গেছেন,

তবু আমার ভিতরে ওই মানুষটি এক বিগ্রহের মতো স্থির হয়ে থাকে। ওই সৎ, নিরীহ, মেধাবী মানুষটিকে ভালোবাসা আমার শেষ হয়নি।

আমার হতভাগ্য পরিবেশে যত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কোমল। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, একটা জীর্ণ হলুদ চাদরে খালি গা ঢেকে খুপরির মধ্যে জানালার ফুটোর ধারে একমনে গণিতের বই খুলে বসে আছেন। মেয়েদের দিকে তাকাতেন না, খিদের কথা বলতেন না, কখনও কোনে অসুবিধে বা অভাবের অভিযোগ ছিল না। অল্প কথা বলতেন। কখনও কখনও আমাদের পড়ানোর পর গল্প শোনাতেন, কিংবা চুপ করে আমাদের নিয়ে বসে থাকতেন। শুনতে এইটুকু। কিন্তু আমার জীবনে কোনও মানুষই তাঁর মতো অত অল্প আচরণের ভিতর দিয়ে অত বেশি শেখাতে পারেনি।

বি এসসি পর্যন্ত পাস করতে আমার খুব একটা কষ্ট হয়নি। ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছিলাম, পরীক্ষার আগে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। তার কারণ আমরা ভাইবোনেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাহিদা বাড়ছে, বাবার রোজগার বাড়ছে না। ফলে আমাকে বেশ কয়েকটা টিউশনি নিতে হয়। অপুষ্টির ফলে আমার শরীর ভালো ছিল না, চোখের দোষে মাথা ধরত, লোপ্রেশার ছিল, বেশি রাত জেগে পড়াশুনো করতে গিয়ে স্নায়ুর দোষেই বুঝি খুব খিটখিটে আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। মাসান্তে আমার রোজগারের টাকা তখন সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। কম বয়সে এসব দায়িত্ব নিয়ে বেশ বুড়িয়ে গেছি অল্প বয়সেই। সে এক রাহুগ্রস্ত যৌবন। ছোটভাইটা বড় হতেই বুঝলাম তার লেখাপড়ার মাথা নেই! বোন দুটোরও প্রায় একই দশা। টেনেটুনে স্কুল ফাইন্যালটাও যদি পাস করানো যায় এই ভরসায় আমি ছোট ভাইটার পিছনে খুব খাটতাম। সে বখাটে ছেলে ছিল না, আমাকে ভয়ও পেত। কিন্তু তার মাথা পড়াশুনো নিতে পারত না। অবোধ শিশুর মতো সে চেয়ে থাকত আমার দিকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারতাম তাকে। মনে হত, এই নির্বোধদের ভরণপোষণ করাই বুঝি হবে আমার একমাত্র কাজ সারাজীবন। তাই ওই রাগ ও বিরক্তি। মন ভালো থাকত না। আই এসসি-র রেজাল্ট খারাপ ছিল না আমার। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টের লিস্টে নাম উঠেছিল। কিন্তু সেই ব্যয়সাপেক্ষ পড়াশুনোর অবস্থা নয় বলে পড়িনি। বি. এসসি-র অনার্সটাই ছিল আশা ভরসা। কিন্তু ফাইন্যালের আগে বুঝতে পারলাম, হবে না। আমার মনঃসংযোগ নেই, ধৈর্য নেই, শরীরেও সায় না। অনার্স ছেড়ে বিষণ্ণ চিত্তে পরীক্ষা দিয়ে দেদার নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশনে পাস করলাম। এম এস-সি পড়া হল না! একটা চাকরি পেয়ে গেলাম ডবলিউ বি এস পরীক্ষা দিয়ে। তুমুল আনন্দিত হল আমার পরিবার। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, ফিজিক্সের অনার্সটাও হল না, জীবনের অনেক বড় সার্থকতা আমার হাতের নাগাল দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই তুলনায় সরকারি চাকরিটুকু আমাকে কি আর দিতে পারে? তাই তখন আমার উচ্চাকাঙক্ষা বড় বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল। নিজের পরিবারের প্রতি এক প্রচণ্ড

আক্রোশও তখন থেকে জন্ম নেয়। এরা আমাকে এদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আটকে রেখেছে। আমাকে বড় হতে দিচ্ছে না, আমার অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশ ঘটতে দিচ্ছে না।

এই নির্মম আক্রোশ থেকেই তলায় তলায় আমি গোপনে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। জানতাম, আমি চলে গেলে এদের সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটবে, সরকারী চাকরির নিশ্চিত আয় এদের আশ্রয় দেবে না। তবু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে বড় বেশি নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। জার্মানিতে প্রথম একটা চাকরি পেয়ে যাই, তারা যেতে লিখল। গোপনে পাসপোর্ট করলাম, ভিসার আবেদন জমা দিলাম। বাড়ির কেউ জানল না। কিছু টাকা জমানো ছিল দু'বছর চাকরির। সেই টাকা দিয়ে জাহাজের টিকিট কেটে বাড়িতে খবর দিলাম। এক নিস্তব্ধতা নেমে এল বাড়িতে। সকলেই এক অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখেছিল আমাকে। তারা যতদূর সাফল্যের কথা ভাবতে পারে, আমি তো ততদূর সফলতা অর্জন করেছি। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে অফিসারের সরকারি চাকরি করি। গেজেটে নাম ওঠে, আমার জন্য সচ্ছল পরিবার থেকে পাত্রীর খবর আসছে। মা-বাবাও উদ্যোগ করছেন। এর মধ্যে এ কি! তারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি এতদূর হৃদয়হীন হতে পারি তাদের ধারণা ছিল না। অবশ্য কেউ কোনো জোরালো আপত্তি তুলল না। আমি অবশ্য তাদের বোঝালাম, আমার এবং সকলের ভবিষ্যতের জন্য এটা দরকার। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। মা তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করে। বোনেরাও খুশি হয়নি। কেবল ভাইটা খুব খুশি হয়েছিল, দাদা না থাকলে তাকে আর ওরকম প্রচণ্ড মারধর বকুনি সহ্য করতে হবে না।

জার্মানিতে চলে গিয়েছিলাম দশ বছর আগে। তারা আমাকে শ্রমিকের চাকরি করাত। বহু কষ্টে অনেক চেষ্টায় আমি গেলাম অ্যামেরিকায়। মোটামুটি ভালো খেতাম, পরতাম, মাঝারি চাকরি জুটেছিল। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা? তার কি হবে? কেবল ভালো খাওয়া-পরার জন্য তো আমি এতদূর আসিনি। কিছু একটা শিখে, জেনে যেতে হবে যা আমাকে অনেক উঁচুতে তুলে দেবে। অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়েই আমার সময় ফুরিয়ে যেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হল না। কমপ্রেসর মেশিন সম্পর্কে শিখবার জন্য অবশেষে আমি চলে আসি সুইজ্যারল্যান্ডে। ব্যল শহরে দীর্ঘকাল লেগে থাকলাম একটা কারখানায়। বেতনের প্রচণ্ড অসাম্য। জার্মান, ইটালিয়ান শ্রমিকেরা বেশি অঙ্কের পেপ্যাকেট পায়, আমরা অনেক কম। তবু প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম। কিন্তু অতবড় কম্প্রেসর তৈরির কারখানার কাজ আমি একা শিখব কি করে। আমার মৌলিক কারিগরিবিদ্যা নেই, পরিকল্পিতভাবে আমি আসিওনি। কেবল ভসভসে আবেগ সম্বল করে এসে চাকরিতে ঢুকেছি। বুঝেছি কেবল চাকরিই সার হল। এই হতাশা কাটাতে আমি এক জার্মান মেয়েকে দু'বছর বাদে বিয়ে করি। তার দেড় বছর বাদে সে ছেড়ে চলে যায়। আর

ততদিনে দশ-দশটা বছর পার হয়ে গেল। খবর পেয়েছি, বাবা-মা এখনও কোনওক্রমে বেঁচে আছে, ভাই রেলের পোর্টার, বোনেরা যে-যার রাস্তা দেখেছে। হতাশায় ভরে আমি একদিন ফেরবার প্লেনে চাপলাম।

অলকা

ভোরের প্রথম আলোটি পুবের জানালা দিয়ে এসে আমার জয়পুরী ফুলদানিটার ওপর পড়েছে। ফুলদানিতে কাল সন্ধ্যের রজনীগন্ধা একগোছা। ফুল এখনও সতেজ। কালকের কয়েকটা কুঁড়ি আজ ফুটেছে। সাদা ফুলের ওপর ভোরের রাঙা আলো এসে পড়েছে, জয়পুরী ফুলদানিটার গায়ে চিকমিক করে আলো। ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই ফুলদানি, তাই আয়না থেকেও আলোর আভা এসে ওকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেছে। তিন আয়নার ড্রেসিং টেবিল ফুলদানি আর ফুলের তিনটে প্রতিবিম্ব বুকে ধরে আছে। একগোছা রজনীগন্ধা চারগোছা হয়ে কি যে সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমার বদ অভ্যাস, খুব ভোরে আমি উঠতে পারি না। আমার বাপের বাড়ির দিকে সকলেরই এই এক অভ্যাস। কেউ ভোরে ওঠে না। আমাদের বাপের বাড়িতে সবার আগে উঠত আমার বুড়ি ঠাকুমা। ভোরে চারটেয় উঠে খুটুর-খাটুর করত, জপতপ করত। আর তারপর সাড়ে সাতটা বা আটটা নাগাদ আর সবাই। এ আমাদের ছেলেবেলার অভ্যাস। বিয়ে হওয়ার পর এই বদ অভ্যাস নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আমাকে। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সব রাত থাকতে উঠে ঘর-গেরস্থালির কাজ শুরু করে দিত। প্রথম প্রথম নতুন বউ-পনা দেখিয়ে আমিও ভোরে উঠতাম, কিন্তু তাতে শরীর বড় খারাপ হত। সারাদিন গা ম্যাজম্যাজ, ঘুম-ঘুম, অস্বস্তি। কপালক্রমে আমার বিয়ে হয়েছিল এক ধার্মিক পরিবারে। ধর্ম ব্যাপারটা আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। আমার বাপের বাড়িতে অবশ্য একটু লক্ষ্মীর পট, কালীর ছবি, বালগোপাল বা শিবলিঙ্গ দিয়ে একটা কাঠের ছোট্ট ঠাকুরের সিংহাসন ছিল, এবং তার সামনে ঠাকুমা একটু ফুল জল বাতাসাও দিত। কিন্তু ওইটুকুই। আমাদের আর কারও ধর্মীয় ব্যাপারে কেনো উৎসাহ ছিল না। বড়জোর বৃহস্পতিবার পাঁচালি পড়ত মা, শনিবারে কোনও কোনওদিন লুট দেওয়া হত। কিন্তু এ সবই ছিল দায়সারা। আমাদের ঠাকুরঘরটাই ছিল শোওয়ার ঘর। সেই ঘরে সবাই জুতো পরেই ঢুকতো আর ঠাকুরের সিংহাসনের বাঁ দিকে যে আলনা ছিল তার নীচের তাকে জুতো রাখত সবাই। বাবার গলায় পৈতা বলে কোনও বস্তু ছিল না, আমার দাদা বা ভাইদের কারোই পৈতে বলে কোনও বস্তু ছিল না, আমার দাদা বা ভাইদের কারোই পৈতেটৈতে হয়নি। আমাদের কুলগুরু বংশের শেষ গুরু ছিল কেশব ভট্টাচার্য। আমার বয়স যখন তেরো তখন কেশবের বয়স হবে বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। সে লোকটা ছিল

ডাকপিওন। মাঝে মধ্যে সে আমাদের বাড়ি এলে আমরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। সে কুলগুরুর তোলা আদায় করতে বেরোতো। যদিও তার শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, তার কাছে ঠাকুমার পর আর কেউ মন্ত্র নেয়নি। কিন্তু ঠাকুমা তাকে ভীষণ শ্রদ্ধাভক্তি করত, ওই পুঁচকে কেশবের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ ধরে পায়ের ধুলো নিত, নিজে উপোস থেকে সারাদিন রান্নাবান্না করে কেশবকে খাওয়াত, মোটা দক্ষিণা দিত, পালা পার্বণে ধুতি চাদর দেওয়া তো ছিলই। বলতে কি, কেশব বেশ সুপুরুষ ছিল। নাদুস-নুদুস চেহারা, ফরসা রং, চোখদুটো খুব বড় বড়। কিন্তু সে সাজতে জানত না, সাদামাটা ধুতি, ময়লা পিরান, খোঁচা দাড়ি নিয়ে আসত। সে এসে খুব তাকিয়ে দেখত আমাকে। আমরা যদিও তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম, সে কিছু মনে করত না। মান-অপমান বোধ তার খুবই কম ছিল। বরং সে মাঝেমাঝে ভ্যাবলার মতো হাসত। ধর্মের কথা সে জানতও না, বলতও না। সে এলেই আমার দাদা অভিজিৎ চেঁচিয়ে বলত—ওই কেশবশালা এসেছে মাসকাবারি নিতে। ও কেশব, আজ আমাদের জামাকাপড় কেচে দিয়ে যাবি, বাসন মেজে দিয়ে যাবি। শুনলে ঠাকুমা রাগারাগি করত, কিন্তু কেশব নির্বিকার। সে বরং কখনও সখনও এমন কথাও বলত—দূর শালা, গুরুগিরির বড় ঝামেলা। সব জায়গায় লোক হুড়ো দেয়।

আমি বাসি কাপড় ছাড়তাম না, পায়খানার কাপড় পালটাতাম না, এঁটোর বিচার ছিল না। ভাত খেতে বসে আমরা সবাই বরাবর বাঁ হাতে জল খেয়েছি। বাবা শুয়োর গরুর মাংস খেতেন, হুইস্কি টুইস্কি তো ছিলই। আমরা এই পরিবেশে মানুষ হয়েছি। শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে আমাদের আদি বনেদি বাড়ি। সেইখানে জন্মে আমরা বড় হয়েছি! কোনোদিন অভাব টের পাইনি। যদিও আমাদের বংশগৌরব আর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু আমাদের অসুবিধে ছিল না। বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, অনেক টাকা সাধু ও অসাধু উপায়ে আয় করতেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ মানতেন না।

আমাদের পুরোনো বাড়িটার নাম আমরা দিয়েছিলাম 'বার্ডস হাউস'। প্রকাণ্ড এজমালি বাড়িটায় যে আমাদের কত দূর ও নিকট সম্পর্কের শরিকেরা বাস করতেন তার আদমসুমারি হয়নি। সারাদিন অত লোকের আর মেয়েছেলের চেঁচামেচিতে বাড়ি থাকত সরগরম। শরিকের ঝগড়া তো ছিলই। কার ভেজা কাপড় কার গায়ে লাগল, কে তার সামনের বারান্দায় টিন দিয়ে ঘিরে নতুন ঘর তুলবার চেষ্টা করছে, কে তার ভাগের জায়গায় বাচ্চাকে হিসি করিয়েছে—এই সব সমস্যা অহরহ সকলের মাথা গরম করে রাখত।

শোনা যায়, আমার বাবা যৌবন বয়সে খ্রিস্টান হয়েছিল। কিন্তু গোটা ধর্মের প্রতি তাঁর এমন বিরাগ ছিল যে শেষ পর্যন্ত খ্রিস্ট ভজনাও তাঁর হয়ে ওঠেনি। আমাদের সেই বিশাল

এজমালি বাড়িতে আমরা মোটামুটি একঘরে হয়েই ছিলাম, অন্য সবাই আমাদের ম্লেচ্ছ বলে এড়িয়ে চলত।

আমার একুশ বছর বয়সের সময় বিয়ে হয়। বিয়ে হল এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁরা শ্রীহট্ট জেলার লোক, চৈতন্যদেবের ভক্ত। আমার স্বামী যদিও বড় চাকরি করতেন না, তবু তাঁদের পরিবারটি বেশ সচ্ছল ছিল। আমার স্বামী জয়দেব চক্রবর্তী স্মল স্কেল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রির অফিসার ছিলেন। ছোটখাটো চেহারা, বেজায় ভালোমানুষ, তবে কখনও কখনও তাঁকে বদরাগী বলে মনে হত। স্বামী সম্পর্কে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে বলছি, সেটা খুব ভালো লাগছে না, বরং বলি জয়দেব লোকটা ভালোই ছিল। কিন্তু সে যতখানি সুপাত্র ছিল, তার চেয়ে বোধহয় তুলনামূলকভাবে আমি আরও ভালো পাত্রী ছিলাম! চেহারার জন্য আমার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। লোরেটা স্কুলে আমি কিছুকাল পড়েছি। কিন্তু আমার চরিত্রের সুনাম ছিল না বলে সেই স্কুল ছাড়তে হয়। পরে আমি একটা সাদামাটা স্কুল থেকে পাস করি। তাহলেও আমি গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারতাম, নাচেগানে ছিলাম চমৎকার, অভিনয়ে সুনাম ছিল। সোজা কথায়, গৃহকর্ম করে জীবন কাটানোর জন্য তৈরি হইনি। তেরো চৌদ্দো বছর বয়স থেকেই আমার নানারকম লঘু যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এবং লোরেটোতে পড়বার সময়ে আমি যখন ক্রিক রো-তে এক মামির বাড়িতে থাকতাম তখনই আমার কয়েকবার সম্পূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে যায়। আর, এজন্য কখনোই আমার কোন অনুশোচনা বা প্রতিক্রিয়া হয়নি, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারের ঢিলেঢালা নৈতিক পরিবেশে আমি মানুষ। আমার মা খুব উঁচু সমাজের মেয়ে, বাবাও উচ্চাভিলাষী এবং নৈতিক আদর্শবোধ থেকে মুক্ত ছিলেন। কাজেই আমরা শরীরকে শরীর ভাবতেই শিখেছি, তার সঙ্গে মন বা বিবেককে মেশাইনি। এমনকী আমার যৌবন প্রাপ্তির পর বাবাও অনেক সময় আমাকে ফচকেমি করে জিগ্যেস করেছেন —কি রে মেয়ে, কটা ছেলের বুকে ছুরি মেরেছিস? অর্থাৎ আমরা খুবই উদার পরিবেশে বড় হয়েছি। আমার বড় দাদা, বাবা এবং মা'র সামনেই সিগারেট খেত। সে কিছু রোগা ছিল বলে বাবা প্রায়ই তাকে বলতেন—তুই মাঝে-মাঝে বিয়ার খাস, তাতে শরীরটা অনেক ফিট থাকবে। উত্তরে আমার দাদা অভিজিৎ বলত—দূর, বিয়ার আমার পোষায় না, আমার প্রিয় ড্রিঙ্কস হচ্ছে হুইস্কি।

আমি সুন্দরী ছিলাম, নইলে ওই গোঁড়া পরিবারে আমার বিয়ে হত না। কিন্তু বিয়েটা যে কেন হয়েছিল সেটা আমি ভেবে পাই না। প্রথম কথা, ওর চেয়ে ঢের ভালো বিয়ে আমার হওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত আমাদের দুই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির এত পার্থক্য যে বিয়ের প্রস্তাবই উঠতে পারে না। তবু হয়েছিল। একদিন কলকাতা থেকে বোধহয় কিছু মার্কেটিং করে দাদার সঙ্গে লোকাল ট্রেনে ফিরছিলাম, তখন বেলা এগারোটা হবে। ট্রেন ফাঁকা, আর একটা ফাঁকা কামরায় জয়দেবের বাড়ির লোকজন—মা, পিসি, জ্যাঠা গোছের সবাই যাচ্ছে

তারকেশ্বরে! আমি তাদের পাশেই বসেছিলাম। বিধবা পিসি আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—আহা মা, বড় সুন্দর দেখতে গো তুমি? কোথায় থাকো বাছা?

এইভাবে পরিচয়। তারপর বলতে কি তাদের বাড়ি থেকেই লোকজন এসে খোঁজখবর করল, বিয়ের প্রস্তাব দিল। ভাংচি দেওয়ার লোকও ছিল এজমালি বাড়ির শরিকদের মধ্যে। তারা গিয়ে পাত্রপক্ষকে গোপনে জানিয়ে এল যে বাবা খ্রিস্টান, আচার বিচার মানে না, আমাদের চরিত্র খারাপ। কিন্তু তাতে আটকাল না। আমাকে তাদের বড় বেশি পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিয়েটা ভেঙে গেলে অবশ্য ভালোই হত। আমার মায়ের অনিচ্ছা ছিল, শুনেছি জয়দেবের বাবারও আপত্তি ছিল! জয়দেবের বাবা গুজবগুলিকে উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর বোন, অর্থাৎ জয়দেবের পিসিই তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। অন্য দিকে আমার বাবা হঠাৎ তাঁর হিসেবিবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে নীতিহীনতা ও অনাদর্শ দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েকে মানুষ করেছেন সেগুলি মেয়ের বিয়ের সময়ে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষতঃ আমাদের তো শত্রুর অভাব নেই। তাই বাবা হঠৎ বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর থেকেই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধভাবে আমাকে বিয়েতে রাজি করালেন, দীর্ঘ আলোচনার পর। মায়েরও মত হল। এবং সে সময়েই মা আমাকে গোপনে জিগ্যেস করে জেনে নেন যে আমি সত্যিকারের কুমারি আছি কিনা। তাঁর কোনও কারণে সন্দেহ হয়ে থাকবে। আমি অবশ্য স্পষ্ট জবাব দিইনি। কিন্তু মায়েরা তো বোঝে।

জয়দেবকে আমি খুব নিরাসক্তভাবে বিয়ে করি। পাত্র আমার পছন্দ ছিল না। ছোটখাটো চেহারার পুরুষ এমনিতেই আমি দেখতে পারি না, তার ওপর তার আবার নানারকম নৈতিক গোঁড়ামি ছিল। সেগুলি আরও অসহ্য। যেমন, বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যে সে শারীরিক দিক দিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি। যেদিন হল, সেদিন মিলনের আগে সে আমার কুমারীত্ব পরীক্ষার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য কীভাবে পরীক্ষাটা করেছিল তা আমি বুঝতে পারিনি তখন, পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু এটা কোন মেয়ে আজকাল সহ্য করবে?

পরীক্ষা করে অবশ্য সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি কুমারী নই। আর আমিও তার বাতিক দেখে বুঝতে পারছিলাম যে এ লোকটা স্বামী হওয়ার উপযুক্ত নয়। কি করে যে ও আমার সঙ্গে আর আমি ওর সঙ্গে ঘর করব সেটা বিয়ের পরেই আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বশুরবাড়িতে আমার নতুন নামকরণ হল, লতিকা। এটা ওদের বাড়ির নিয়ম, নতুন বউ এলেই ওরা তার নাম পালটে নতুন নাম রাখে। এতে আমার আপত্তি ছিল। হুট বলতে কেন যে কেউ আমার জন্মাবধি নিজস্ব নামটা বাতিল করে দেবে। আমি যে নিজেকে বরাবর অলকা বলে জানি। অচেনা লতিকা আমি হতে যাব কোন দুঃখে? আমি খুব লাজুক মেয়ে নই, ভীতুও নই, তাই শ্বশুরবাড়ির নিয়মকানুনগুলোর বিরুদ্ধে কিছু মতামত প্রকাশ

করেছিলাম। এটা ওরা ভালো চোখে দেখেনি। জয়দেবকে নাম বদলানোর ব্যাপারটা বলতেও ও খুব বিরস মুখে বলল—তোমার নামধাম বদলে ফেলাই ভালো।

—কেন? আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম।

—তোমার অতীতটা খুব ভালো নয় তো, তাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে জিগ্যেস করলাম—আমার অতীত কি খারাপ?

—খুব।

—কি করে বুঝলে?

জয়দেব তার বোকা এবং ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে বলল—যারা বোঝে তারা ঠিক বোঝে।

আমি কি বলব ওকে, কি বললে ওর চূড়ান্ত অপমান হয় তাই ভাবছিলাম। ও আমাকে বলল—কেন, তুমি কি জানো না?

—কি জানার কথা বলছ?

—তুমি যে খারাপ!

সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মতো আমার হুট করে চোখের জল আসে না। বরং সে সব পরিস্থিতিতে আমার একরকমের পুরুষের রাগের মতো রাগ হয়, থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছা করে।

অবশ্য জয়দেবকে আমি থাপ্পড় কষাইনি, শুধু বলেছি—না, আমি খারাপ বলে নিজেকে জানি না। বরং মানুষকে যারা সাদা মনে গ্রহণ করতে পারে না তাদেরই খারাপ বলে জানি।

জয়দেব গম্ভীর হয়ে বলল—মানুষকে সাদা মনে গ্রহণ করব! কেন?

—কেন করবে না?

—কেন করব? মানুষ নিজের সম্পর্কে যা বলে তা কি সব সময়ে সত্যি হয়?

—নাই হল। ভালোমন্দ মিশিয়েই মানুষ, মানুষ হওয়াটাই তার যোগ্যতা।

জয়দেব একটু হাসল। কিন্তু সে ঠিক হাসি নয়। বরং হাসির মুখোশে ঢাকা নিষ্ঠুরতা।

সে বলল—এই যে তুমি, তোমার কথাই যদি ধরা যায় নিজের সম্পর্কে বলছ যে তুমি খারাপ নও! কিন্তু তোমার শরীর বলছে যে তা নয়।

—আমার শরীর কি বলেছে তোমার কানে কানে?

—বলেছে যে বিয়ের সময় তুমি কুমারি ছিলে না।

এই প্রথম, বিয়ের এক মাসের মধ্যেই ও স্বীকার করল যে ও আমাকে পরীক্ষা করেছে। শুনে আমি তো ভীষণ অবাক। এসব যে বোঝা যায় তা আমার জানা ছিল না।

বললাম—গাধার মতো কথা বলো না, তোমার মতো সন্দেহবাতিক যাদের তারা বিয়ে করে কোন মুখে?

জয়দেব মুখ কঠিন করে বলে—যাদের বাতিক নেই তারাই বোকা, যারা মানুষকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে তারাই অবিবেচক।

—তুমি কি করে বুঝলে যে আমি কুমারি ছিলাম না! তুমি কি ডাক্তার না হঠযোগী?

জয়দেব বলে—ডাক্তার বা হঠযোগী হওয়ার দরকার হয় না। একটু সন্ধিৎসু হলেই চলে, আর একটু বুদ্ধিমান হলেই হয়। কেন, তুমি কি অস্বীকার করতে চাও?

—নিশ্চয়ই। তুমি পিশাচের মতো কথা বলছ।

—না। শোনো, শরীর পরীক্ষা করে সবই বোঝা যায়। তুমি হয়তো জানো না, আমি জানি।

—তুমি ছাই জানো। তুমি পাগল, তোমার বাড়িসুদ্ধ পাগল। আমার খুব ভুল বিয়ে হয়েছে, বুঝতে পারছি।

জয়দেব রেগে গেল না। খুব রাগী মানুষ জয়দেব ছিলও না। ওর রাগ খুব ঠান্ডা আর দৃঢ়।

ও বলল—বিয়ে যে ভুল হয়েছে তাতে সন্দেহ কি। পিসিমার জন্যই হল। কিন্তু হয়ে যখন গেছেই তখন এটাকে যতদূর সাকসেসফুল করা যায় সেটা দেখাই আমার লক্ষ্য।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না, সন্দেহ দিয়ে শুরু হলে বিয়ে সাকসেসফুল হয় না। তার চেয়ে সম্পর্ক ভেঙে ফেলাই ভালো।

জয়দেব এই প্রথম একটু ভয় পেল যেন, একটু চঞ্চল হয়ে বলল—এ তো সাহেব রাজত্ব নয় যে যখন তখন বিয়ে ভাঙা যাবে!

—সে তোমরা বুঝবে না।

জয়দেব আমার দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে বলল—শোনো, সাহেবদের দেশে একটা মানুষের সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের বিয়ে হয়, বিয়েটা সেখানে ব্যক্তিগত ঘটনা, তার সঙ্গে পরিবার বা সমাজের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশে তো তা নয়।

—তত্বকথা শুনতে আমার ভালো লাগে না। তুমি যদি অত বড় অপমানটা আমাকে না করতে তাও না হয় হত। আমি ওসব বুঝি না, বুঝবোও না।

—তোমাকে একটু বুঝতেই হবে যে। বলতে গিয়ে জয়দেবের স্বর যথেষ্ট নরম হয়ে এল। তার মুখচোখে ভীতু-ভাবও একটু ফুটে উঠল কি?

অমি শুনতে চাইছিলাম না। উঠে চলে আসছি, জয়দেব তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে ফেলল। ঝনাত করে নতুন চুড়ি শাঁখায় ভরা হাতট শব্দ করে উঠল। আমি হাত টেনে বললাম—ছেড়ে দাও।

সেও হাত ধরে রেখে বলল—একটু শোনো, দুটো কথা...

ও ছোটখাটো মানুষ, আমার হাত ধরে আটকে রাখার মতো যথেষ্ট গায়ের জোরই ওর নেই। নেচে কুঁদে বরং আমার গায়েই জোর বেশি। সেই আধা পুরুষটা দু'হাতে আমার

কোমর জাপটে ঝুলে পড়ল, বলল—যেও না! শুনে যাও।

ওর পা থেকে কোমর অবধি মেঝেয় লুটোচ্ছে, ঊর্ধ্ব অঙ্গ ঝুলছে আমার কোমর ধরে, হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু আমার হাসি পায়নি। ওর ওই সর্বস্ব দিয়ে ঝুলে থাকা টানে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে যেতে আমি ওর মুখে থাবড়া দিলাম কয়েকটা। ও তবু ছাড়ল ন। আমি টাল সামলতে না পেরে থপ করে বসে পড়লাম মেঝেতে। দরজ অবশ্য বন্ধ ছিল, তখন ছুটির দিনের দুপুরবেলায় বাড়ির বেশিরভাগ লোকই ঘুমোচ্ছে, তাও কথাবার্তা শুনে কেউ কৌতূহলী হতে পারে তো! বিশেষ করে জয়দেব এসব ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিল। দিনের বেলায় সকলের সামনে আমার সঙ্গে কখনো কথা বলত না। বিয়ের একমাসের মধ্যেও দুপুরবেলা কখনও শারীরিক ভাবে মিলিত হয়নি। সে নাকি শাস্ত্রে বারণ আছে। অসহ্য। অবশ্য মিলিত হয়েও সে যে আমাকে সুখী করতে পারত এমন নয়।

যাই হোক, দুজনে এক অস্বাভাবিক কুস্তির প্যাঁচ কষে যখন বসে বা শুয়ে আছি তখন জয়দেব আমাকে এইভাবে ধরে থেকে বলল—রাগ করে বুদ্ধি হারিও না। বিয়ে ব্যাপারটাকে আমরা সামাজিক কর্তব্য হিসেবে মনে করি, তাতে দুই পরিবারের মান মর্যাদাও জড়িত। তাই বলি হঠাৎ ডিভোর্সের কথা চিন্তা করে সব ভন্ডুল কোরো না।

—আমাকে চিন্তা করতেই হবে। আর চিন্তাই বা কি, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

জয়দেব কোমর ধরে পড়ে আছে। সুযোগ বুঝে সে হঠাৎ আমার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে বলল—তাতে তোমার আমার কারও সম্মান বাড়বে না। লোকে ছি ছি করবে।

সেই মুহূর্তে জয়দেবকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম। লোকটার কিছু দুর্জয় কুসংস্কার আর লোকলজ্জা আছে, যার জন্য ও আমার সব কলঙ্ককেও হজম করে যাবে। এটা বুঝে আমি আর একটু চাপ সৃষ্টি করার জন্য বললাম—তাহলে বলো, কি করে বুঝলে যে আমি কুমারি নই।

জয়দেব ভীত চোখে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থেকেই হঠাৎ চোখ বুজে বলল—আমার ভুল হতে পারে অলকা।

—তার মানে?

—তার মানে কুমারীত্ব পরীক্ষার কোনো নিশ্চিত উপায় নেই।

—তবে বললে কেন?

—দেখলাম, তুমি স্বীকার করো কিনা।

আমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের জন্মগত কিছু বুদ্ধি তো থাকেই। এই বোকাটা কি করে ভাবল যে আমি স্বীকার করব? আমি বললাম—কী স্বীকার করব?

জয়দেব হঠাৎ খুব বদলে গিয়ে বলল—আমাকে ক্ষমা করো।

বলতে নেই, সেই ক্ষমা প্রার্থনার কারণটা ছিল প্রবল কামেচ্ছা। হঠাৎ ওই রাগারাগি থেকে শারীরিক টানাটানির ফলে পরস্পরের নৈকট্য, ঘন শ্বাস, দেহগন্ধ, স্পর্শবিদ্যুৎ—সব

মিলেমিশে এক প্রবল চুম্বকের ক্ষেত্র তৈরি করে দিল। দেহ অভিজ্ঞতা তো তখনও আমাদের নতুন, তাই সামলাতে পারল না জয়দেব। ঝগড়াটা শরীরের মিলন দিয়ে শেষ হল।

আবার হলও না।

প্রভাসরঞ্জন

সুইস এয়ারের যে উড়োজাহাজে আমি ফিরছিলাম তাতে খুব একটা ভিড় ছিল না। জানালার ধারে এক জার্মান বুড়ি, তার পাশে এক বুড়ো, পরের সিটটায় আমি। বুড়োর হাতে আর্থরাইটিসের ব্যথা, তাই বুড়ি বুড়োকে কফি কাপ ধরে ধরে খাইয়ে দিচ্ছিল, খাবার মুখে তুলে দিচ্ছিল। বুড়োর মুখেও বোধহয় প্যারালাইসিসের ছোঁয়া আছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সুপ গড়িয়ে পড়ে, মাংসের টুকরো হঠাৎ করে কোলের ওপর পড়ে যায়। ন্যাপকিন তুলে বুড়ি বার বার মুখ মুছিয়ে দেয়, আর আমার দিকে অপ্রতিভ হাসি হেসে কেবলই ক্ষমা চায়। বুড়োর কাঠামোটা বিশাল, এক সময়ে যৌবনকালে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত বোধহয়। এখন বয়সে বড় জব্দ। কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, খুব জোরে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে শ্বাস ছাড়ে। অনবরত সেই শব্দে প্রেসারাইজড আবহাওয়ার উড়োজাহাজের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও আমি জেগে উঠি। বিরক্ত হই। বুড়ো আমার দিকে একটু একটু অপরাধবোধ নিয়ে তাকায়। বুড়ো বুড়িকে আমার খারাপ লাগছিল না। বেশ ভালোবাসা দুজনের। আমার জার্মান বউ সিসি আমাকে খুব ভালোবাসত, যদি বিয়েটা টিঁকত আর আমরা এরকম বুড়ো হতাম, তবে কি তখনও আমার জন্য এতটা করত সে?

সিসির কথা একটু একটু ভাবছিলাম। ফ্রাঙ্কফর্টে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জার্মান মেয়েদের মতো গায়ে গতরে বিশাল ছিল না, বেশ একটু নরম-সরম ছোটো মাপের চেহারা। রোগাটে, সাদাটে, ভাবালু। খুব ভুলো মন ছিল তার। সেই সব দেখে আমি ঝপাং করে তার প্রেমে পড়ে গেলাম। সে তো পড়লই, যৌবন কালে ওরা বড় বেশি প্রেমে পড়ে। পরিচয়ের পর প্রেম হওয়ারও আগে আমরা এক বিছানায় বিস্তর শুয়েছি। যাকে ফুর্তিবাজ বলে আমি ঠিক তা নই। বিদেশে মেয়েদের গা-দেখানো এবং গায়ে পড়ার প্রবণতা এত বেশি ছিল যে সেখানে তাদের জলের মতো ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমারও এরকম অভিজ্ঞতা কিছু ঘটেছিল। সিসি তাদের মধ্যেই একজন। একসঙ্গে কিছুদিন থাকার জন্য ভূমিকা-টুমিকা করতে হয়নি। এবং কিছুকাল থেকে সরে পড়াতেও বাধা ছিল না। ফ্রাঙ্কফর্টে আমার পনেরো দিনের ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফেরবার আগের দিন অবধি আমি সিসির এক ঘরের ছোট্ট বাসায় ছিলাম। থাকার খরচটা আমার বেঁচে যাচ্ছিল। ওকে আমার পছন্দও হচ্ছিল খুব। আসার দিন সকালে ঘুম থেকে ভালো করে ওঠার আগে

বিছানাতেই ওকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিই। ও খুব হোসে বলল—ঠিক এরকম ভঙ্গিতে আর কেউ কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে বলে আমি জানি না। সিসি কিন্তু প্রস্তাব পেয়ে ভীষণ খুশি। ওর জীবনে সেটাই প্রথম প্রস্তাব। সেই দিনই রেজিস্ট্রি করে আমি ব্যলে চলে আসি। দেড় মাস পর সিসিও এল, আমরা দুজনে বেশ এটু কষ্ট করে থাকতাম। কারণ, ও এসে প্রথম প্রথম চাকরি পায়নি। তার ওপর গর্ভবতী। চাকরি পেলেও করতে পারত না। ও তখন রক্তাল্পতায় ভুগছে, সঙ্গে আনুসঙ্গিক নানা অসুস্থতা, আমার বেতন খুব বেশি ছিল না, সিসির চিকিৎসা আর যত্নের জন্য পুরো টাকাটা বেরিয়ে যেত। মাস চারেক পর একটু সুস্থ হয়ে সে ফিরে গেল ফ্রাঙ্কফর্টে, আবার কদিন পর এল। আমিও যেতাম। ব্যলেই অবশেষে সে চাকরি পায় আমার কোম্পানিতেই। যথাসময়ে আমাদের এক পুত্রসন্তান হয়। তার গায়ের রংটা আমার রং ঘেঁষা বটে কিন্তু দুরন্ত ইউরোপীয় রক্ত শরীরে বইছে, বিশাল ছেলেটা জন্মেই জার্মানদের মতো গাঁক গাঁক চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

ছেলেটা যখন মাস চার পাঁচেকের হল তখন সে আমার অতি আদরের ধন। বড়সড় চেহারা, কান্নাকাটি নেই, আমার কোলে উঠলে খুব চেঁচাত আনন্দে। অবিকল কাকাতুয়ার মতো শব্দ করত সে উত্তেজনার সময়ে। টিভি দেখতে খুব পছন্দ করত, কি কারণে জানি না লাইটার বা দেশলাই জ্বাললে খুব ভয় পেত। এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনলেই কাঁদো কাঁদো মুখ হয়ে যেত। তার চার মাস বয়সে রঙ অনেক ময়লা হয়ে গেল, দাঁত উঠবার সময়ে বেশ রোগাও হয়ে গেল সে। তার প্রিয় খাবার ছিল মিষ্টি, চকোলেট বা ক্যান্ডি পেলে মুখের নাল দিয়ে মাখামাখি করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চুষতে ভালোবাসত। সে বেশ বড়সড় বাচ্চা ছিল, তবু তাকে দেখলেই বোঝা যেত যে সে ভারতীয়ের সন্তান, মুখে সিসির আদল থাকা সত্ত্বেও।

তার যখন পাঁচ মাস বয়স তখনই সিসি আর আমি আলাদা হওয়ার মনস্থ করি। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা ছিল মর্মান্তিত, বাচ্চাটাকে ছেড়ে কি করে থাকব! সিসিও জার্মানিতে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং ভিন্ন জীবনের জন্য খুবই উদগ্রীব। আমার মতো নিস্পৃহ এবং কম আমুদে লোককে সে সহ্য করতে পারত না। যেমন আমি পারতাম না তার অতি উচ্ছল ও খানিকটা নীতিবিগহিত চলা ফেরা। আমার ভিতরে এক তেমাথাওলা ভারতীয় গেঁয়ো বুড়োর বাস। সে কেবলই সতী-অসতী, ভালো-মন্দ, নীতি-অনীতি বিচার করে যায়। কতবার তার মুখে হাতচাপা দিতে গেছি, থামাতে পারিনি। অশান্তির শুরু সেখানেই। এক সময়ে আমার এও মনে হয়েছিল, সিসি চলে গেলেই বাঁচি, দেশে ফিরে একজন বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে সুখে থাকব।

কিন্তু ছেলেটাই মস্ত বাধা।

আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, আগেই বলেছি। সেটাও এই বিচ্ছেদের আর একটা কারণ। উপরন্তু সিসির বাবা মা বার্লিন থেকে তাকে ক্রমাগত চিঠি দিচ্ছিল ফিরে

যাওয়ার জন্য। সিসি একটা মস্ত ভুল করেছে, তাদের ধারণা। সব মিলিয়ে একটা ঘোঁট পাকাল।

তারপর বিচ্ছেদ। ছেলের নাম রেখেছিলাম নীলাদ্রি। পরে সেই নাম সিসি বদলে দিয়েছিল কিনা জানি না। নীলুর জন্য আজও আমার মন বড় কেমন করে।

নীলু তার মার সঙ্গে জার্মানিতে ফিরে গেছে, আর আমার সঙ্গে তার দেখা হবে না! দেখলে চিনবেও না তেমন করে। এত কাল ইউরোপে তবু তার কাছাকাছি ছিলাম। উড়োজাহাজ যখন উড়িয়ে আনছিল আমাকে পুবের দিকে তখন কেবল মনে হচ্ছিল, নীলুর কাছ থেকে কত দূরে সরে যাচ্ছি।

পাশের বুড়োটা আমার হাঁটুতে হাত রাখল হঠাৎ। তন্দ্রা ভেঙে চমকে উঠি। তাকাতেই বুড়ো নাকের বাঁশি বাজিয়ে জড়ানো গলায় কি যেন বলে। আমি অস্পষ্ট শুনতে পাই—হাইজ্যাক!

ততক্ষণে বুড়িও সটান উঠে বসেছে। বুড়িও বলল—হাইজ্যাকারস!

আন্তর্জাতিক বিমানে আজকাল সবসময়েই হাইজ্যাকের ভয়। বিমানের দুর্ঘটনার ভয়ের চেয়ে এই ভয় কিছুমাত্র কম নয়। কোথায় কোন গেরিলা বা লিবারেশন আন্দোলনের বিপ্লবী পিস্তল বোমা নিয়ে উঠে বসে আছে কে জানে! মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় সর্বত্রই গভীর অসন্তোষ। দেশপ্রেমিক বা ভাড়াটে গেরিলা সর্বত্রই বিরাজ করছে। কখন কোন বিমানকে ভয় দেখিয়ে তারা অজানা ঠিকানায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, মুক্তিপণ হিসেবে কতকজনকে আটকে রাখে বা হত্যা করে তার কোনও ঠিক নেই। তাই আজকাল আন্তর্জাতিক বিমানে উঠলে অনেকেরই বুক একটু ধুকপুক করে।

তাই বুড়ো বুড়ির চাপা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে তাকিয়ে সামনের তিন সারি দূরত্বে একজন আরবকে দেখতে পাই। অবশ্য সে আরব কিনা তা বলা খুবই মুশকিল, তবে সে যে মধ্যপ্রাচ্যের লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গাল ও থুতনি জুড়ে চাপা দাড়ি। চমৎকার মোটা গোঁফ। বাচ্চা একটা হাতির মতো তার বিশাল চেহারা। তাকে কয়েকবারই টয়লেটের দিকে যেতে দেখেছি উড়োজাহাজ ওঠার পর থেকে। পেটের রোগ, বহুমূত্র বা বাতিক না থাকলে অতবার কেউ বাথরুমে যায় না। কিন্তু তখন তাকে সন্দেহ হয়নি। এখন দেখি, কাঁধে একটা এয়ার ব্যাগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে এক দিকে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে এয়ার ব্যাগটা ঝুলছে, ব্যাগের চেন খোলা, তার বাঁ-হাতটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো। খুবই সম্ভব, সে ব্যাগের মধ্যে গুপ্ত গ্রেনেড বা পিস্তল ছুঁয়ে আছে, এবং পিছনের দিকে তার কোনও সহ-গেরিলার দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে—সব প্রস্তুত কিনা।

একটু আগেই নীলুর কথা ভেবে আমার চোখে জল আসছিল। ছেলেকে ইউরোপে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, আমার পরিচয় তার জীবন

থেকে মুছে যাবে, আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে যাবো পরস্পরের কাছে। অথচ সে আমারই বীজ, আমার শরীর থেকে তার অস্তিত্বের জন্ম। এতখানি আমাদের আত্মিক সম্পর্ক, তবু সে আজ আমার কেউ না। খুবই শিশু অবস্থায় সে আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, সেই বয়স পর্যন্ত তার হাবভাব, হাসা-কাঁদা, অবোধ শব্দ সবই আমার ভিতরে টেপ রেকর্ড করা আছে। স্মৃতির বোতাম টিপে দিলেই টেপ রেকর্ড বাজতে থাকে। সবই মনে পড়ে। আমার মাথার ভিতর থেকে একটা প্রোজেকটার মেশিন চোখের পরদার ওপরে তার সব চলচ্চিত্র ফেলতে থাকে। ছেলেটাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না, অধিকারবোধ ছাড়তে চায় না। নীলু আমার ছেলে—এই বাক্যটা ধ্রুবপদের মতো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা অসহায় ভালোবাসা বাৎসল্য আমাকে খুবই উত্তেজিত এবং অবসন্ন করে দেয়। দেশে ফিরে যাচ্ছি, সেখানেও আমার জন্য কোল পেতে কেউ বসে নেই। আদরে আল্হাদে আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারে ভালোবাসার চাষ কম দেখেছি। দুঃখে দারিদ্র্যে হতাশায় আধমরা মানুষ ছিলাম আমরা, পেটের ভাতই ছিল তখন ভালোবাসার চরম নিদর্শন।

বাবা মা বুড়ো হয়েছেন। সংসার প্রায় অচল। প্রথম প্রথম আমি টাকা পাঠিয়েছি। বিয়ে করার পর তাও পাঠাতে পারিনি। কীভাবে সংসার চলে তা আমার জানা নেই, জানতেও চাইনি। ওসব জানতে গেলে মন ভারাক্রান্ত হয়। তাই না জানারই চেষ্টা করেছি। বাবার চিঠিতে যে অংশে সংসারের দুঃখের বিবরণ থাকত সেই অংশ আমি বাদ দিয়ে পড়তাম। জানতাম, তাদের জন্য আমার আর কিছু করার নেই, খামোখা তবে তাদের দুঃখের কথা জেনে কি হবে!

এরোপ্লেনে বসে আমি সারাক্ষণ আমার দুটো জীবনের কথা ভাবছিলাম। স্বদেশে আমার দারিদ্র্যপীড়িত জীবন, বিদেশে আমার নানা আকাঙক্ষার ব্যর্থতা। এর ওপর নীলুর স্মৃতি! বিদেশির মধ্যে এত বেশি সন্তানস্নেহ বোধহয় নেই। অন্তত আমার মতো পিপাসার্ত পিতৃহৃদয় আমি কারও দেখিনি। নিজের বাপ মায়ের মধ্যেও পুত্রস্নেহের কোনও বাহুল্য প্রকাশ পেত না। তাহলে আমার এই প্রবল স্নেহ এল কোত্থেকে?

পরে আমি অনেক ভেবে এর একটা উত্তর খুঁজে পাই। আসলে স্বদেশে যারা আমার আপনজন তাদের কোনোদিনই আপন বলে মনে হয়নি। একমাত্র ছোটকাকাকে মনে হত। কেন মনে হত তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কিন্তু যেই তাকে সত্যিকারের ভালোবাসতে শুরু করি সেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আবার বিদেশেও তাই। আমার ছেলেটিকে বুকে চেপে যখনই ভাবতে শুরু করি এই আমার নিজস্ব সন্তান, তখনই তার ছেড়ে যাওয়ার সময় হল।

আশ্চর্য এই, নীলাদ্রির মুখে আমার ছোটকাকার মুখের ছাপ ছিল। এও হতে পারে, স্নেহের দুর্বলতা থেকেই আমি তার মুখে কাকার আদল দেখতাম। পৃথিবীতে আমার

প্রিয়জনের সংখ্যা খুব কম। বাবা মার প্রতি আমার দুর্বলতা বা শ্রদ্ধা খুব বেশি থাকার কথা নয়। শিশুকাল থেকে অভাব, আর সংসারের ভার কাঁধে বয়ে তাঁদের ওপর আমার বীতশ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল। মনে হত, আমার কোমরে শেকল দিয়ে সংসারটা কে যেন বেঁধে দিয়েছে, যার জন্য আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, অনার্স ছাড়তে হয়েছিল, জীবনের অনেক সার্থকতা আমাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু লগ্ন পার হয়ে গেল। তাই নিজের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আমার এক বিরূপ মনোভাবের জন্ম হয়। যখন বিদেশে সিসিকে বিয়ে করলাম তখন সাময়িকভাবে মনে হয়েছিল, এই বুঝি ভালোবাসার আশ্রয় পেলাম। ভুল, খুবই ভুল সেটা। যে ভালোবাসার শুরু দেহের প্রেম দিয়ে তার বিয়ে কতদূর নিয়ে যেতে পারে আমাদের! শরীর জুড়োলো তো ভালবাসা ফুরোলো। আমরা কেবল শরীর দিয়ে পরস্পরকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছি। পরস্পরের সান্নিধ্য রাখা ছিল সমাজিক কর্তব্যের মতো। সেখানে বিশাল ও ব্যপ্ত কর্মময় জীবনে সিসিও যেমন ব্যস্ত, আমিও তেমন, তাই আমাদের পরস্পরের ওপর নির্ভরতা কমে গিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কারবশত আমি তার স্বাধীন চলাফেরা বা বহির্মুখীনতা খুব বেশি পছন্দ করতে পারতাম না। তাই সিসি নয়, কিন্তু নীলুই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। তার মুখের দিকে তাকালে আমার বুক ঠান্ডা হয়ে যেত। তাই নীলু চলে গেলে সারা পৃথিবীতে আমার আর কেউ রইল না।

না বিদেশে, না স্বদেশে, কোথাও আমার কেউ নেই—এরকম একটা বোধ আমার বুকে পাথরের মতো জমে আছে। বিদেশে থাকার আনন্দ নেই, স্বদেশে ফেরার আনন্দ নেই। আমার মতো এমন উদবাস্তু কে আছে কোথায়! এরকম মনের অবস্থায় মাঝে মাঝে আমার মরতে ইচ্ছে করত। কিন্তু মরাটা জীবনে একবার ঘটে, তাই সেই নিশ্চিত অভিজ্ঞতাটিকে আমি কিছু বিলম্বিত করছিলাম। দেখা যাক, মরবার আগে কোথাও কোনো ভালোবাস বা প্রিয়ত্বের আলো চিড়িক দেয় কিনা। তারপর আমার হাতের মুঠোয় মৃত্যু তো আছেই। এরকম মানসিকতা থেকে আমার মৃত্যুভয় কেটে গিয়েছিল। অন্ততঃ কেটে গেছে বলেই ধারণা ছিল আমার।

আরব লোকটা যখন ওইরকম একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ঘুরে তার সঙ্গিকে দেখছে আর আমার পাশের বুড়োটার একটা প্রকাণ্ড কাঁপা-কাঁপা ঘামে ভেজা হাত এসে আমার কবজি পাকড়ে ধরল, আর বাঁশির মতো শ্বাস ফেলতে ফেলতে যখন সে বারবার বলতে থাকল—'অ্যাইজ্যাক, অ্যাইজ্যাক', তখন অন্য অনেক যাত্রীও তন্দ্রা ভেঙে সচকিত হয়ে বসে পরিস্থিতি লক্ষ করেছে, তাদের অনেকের মুখেই ভয়ের পাঁসুটে ভাব, তখন আমিও হঠাৎ টের পেলাম, বাস্তবিক আমি আন্তরিক ভাবে কোনদিন মরতে চাইনি। মনে হল, জীবন কত সুন্দর ও বিশাল ছিল আমার। বয়স পড়ে আছে। অঢেল। এখনও চেষ্টা করলে জীবনে কত কি করতে পারি।

আরব লোকটা তার প্রচণ্ড ঘন ভ্রূ দিয়ে ভ্রূকুটি করে 'আলিজা' কিংবা অনুরূপ একটা চাপা ধ্বনি করল। সম্ভবত কারও নাম। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। একটু আগেই ডিনার হয়ে গেছে, সেই অতি সুস্বাদু খাবারের স্বাদে এখনও জড়িয়ে আছে জিভে। সামান্য একটু মদ খেয়েছিলাম, তাই রিমঝিম নেশা এখনও মাথায় রয়ে গেছে। সুন্দর একটা শারীরিক তৃপ্তির পর একটু আগে কফি শেষ করে সিগারেট খেয়েছি। সেইটাই কি জীবনের শেষ পানভোজন? কে জানে, কে বলবে?

ও পাশের বুড়িট একটা ফোঁপানির শব্দ করল। সাহেব মেমরা কম কাঁদে। প্রকাশ্যে তো কখনোই কাউকে কাঁদতে দেখিনি। কিন্তু বয়সের দোষে এবং ভয়বশত বুড়ি কাঁদছিল। কথাপ্রসঙ্গে জেনেছিলাম, তাদের ছেলেপুলে নেই, দুজনেরই আগে একবার করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাদের পরস্পরের এই বিয়েটা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছে, মৃত্যুর আগে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—বলেছিল বুড়ি। বুড়োর গা একটা কম্বলে ভালো করে ঢেকে-ঢুকে দিচ্ছিল। একটু আগে তাতে অমিও সাহায্য করেছি। আমার জীবনে ভালোবাসা নেই বলেই বোধহয় তাদের ওই ভালোবাসা আমার খুব ভালো লেগেছিল। এই তো এরা দুনিয়ার আর কারও পরোয়া করে না, পরস্পরকে নিয়ে কেমন মেতে আছে। প্রিয়জনের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুতেই তো এই পৃথিবী আর জীবনকে উপভোগ করা সম্ভব নয়। জীবনের একেবারে শেষভাগেও এই দুই অথর্ব স্বামী-স্ত্রী নিজেদের বেঁচে থাকাকে একরকম করে উপভোগ করছে দেখে আমার একটু ঈর্ষা মেশানো আনন্দ হচ্ছিল।

আরব লোকটা কাকে ডাকল কে জানে। কিন্তু পেছন থেকে কোনও উত্তর এল না। আরবটা তখন তার সিট থেকে বেরিয়ে মাঝখানের প্যাসেজটায় দাঁড়াল, তখন ব্যাগের মধ্যে হাত। খুব সম্ভবত সেই লুকোনো হাতটা গ্রেনেডের সেফটি ফিউজ আলগা করছে আস্তে আস্তে। প্যাসেজে দাঁড়াতেই তার বিশাল চেহারাটা আরও বিশাল নজরে পড়ল। তার বাহুর ঘের বোধ হয় আমার বুকের সমান হবে। বুকটা মাঠের মতো ধু ধু করা বিরাট। ইচ্ছে করলে ও বোধহয় ঘুষি মেরেই পলকা প্লেনটাকে তুবড়ে দিতে পারে। কিন্তু আপাতত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চোখে ভ্রূকুটি। ডান হাতটা মুঠো পাকিয়ে খানিকটা আছে। যাত্রীরা সবাই দৃশ্যটা দেখছে, কিন্তু কেউ নড়ছে না। কিন্তু অস্ফুট 'হাইজ্যাক' শব্দটা চরপাশ থেকে শুনতে পাচ্ছি। ফিসফাস শব্দ হচ্ছে। একটা বছর ছয়েকের বাচ্চা প্লেনের পিছন দিকে রয়েছে, তার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, পরিষ্কার ইতালিয়ান ভাষায় সে তার মাকে জিজ্ঞেস করছে—মরে গেলে আমাদের কি রোমে ফিরতে দেরি হবে?

আমাদের দমদমের বাড়িতে একদিন একটা কাক ডানা ভেঙে পড়ে গিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যায়, আর তাকে ঘিরে সারাদিন হাজারটা কাক চেঁচামেচি করেছিল। আমার ছোটো ভাই দৃশ্যটা খুব করুণ চোখে দেখেছিল। পরদিন যখন আবার এঁটো কাঁটা কাক

খেতে এসে উঠোনে নামছে তখন সে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা কাককে দেখিয়ে বলল—দাদা, ওই কাকটা কাল মরে গিয়েছিল না রে?

সেই স্মৃতিটা মনে আসতেই এক ঘোর মায়ায় আমার বুক ভরে গেল। শিশুরা তো মৃত্যুকে জানে না! ওই মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমাকে যেন চাবুক মারল। নীলুর কথা মনে এল, ছোটো ভাইটার কথা মনে এল। স্নেহ মায়ায় বুক ভরে গেল। আর ওই তীব্র চেহারার আরব লোকটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আমার ভিতরে মৃত্যুভয় একটা বিস্ফোরণ ঘটালো যেন।

আরবটা এক পা, এক পা করে কয়েক পা এগিয়ে এল। দাঁড়ালো। আবার এগোলো। দাঁড়ালো। সেই একই ভঙ্গিতে তার ডান হাত মুঠো পাকানো। বাঁ হাত ব্যাগের মধ্যে ভরা। একটু বাদেই কিছু একটা ঘটবে। লোকটার মুখে চোখে এক কঠিন আত্মপ্রত্যয়। মৃত্যুর প্রতি সে নির্মমভাবে উদাসীন। সব রকম বিপদকে নিয়েই সে বেঁচে আছে।

আর তখন হঠাৎ আমার মানসিক একটা বিকলতা ঘটে গেল। হঠাৎ যেন এরোপ্লেনের মৃদু চাপা শব্দ, আর অতি ক্ষীণ থরথরানি থেমে গেল। আর আমি এক স্বপ্নময় দৃশ্যের মধ্যে ঢলে পড়লাম।

সেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাবর্জিত।

দেখি একটা বিচিত্র দেশে আমি পৌঁছে গেছি। এখানে মাটির রং নীল, তার ওপর হলুদ সবুজ লাল গোলাপি, হরেক রকমের ঘন ঘাস গজিয়ে চারধারে যেন এক বিভিন্ন রঙের দাবার ছক তৈরি করে রেখেছে। এইসব রঙিন ঘাসের নিখুঁত চৌখুপির ধারে ধারে নাতিদীর্ঘ গাছে সম্পূর্ণ খোলা রামধনু। ছবিতে যেমন সব কাল্পনিক পাখি দেখা যায়, তেমনই সব পাখি উড়ছে চারধারে। আকাশের রং উজ্জ্বল নীল, তাতে গোল গোল সুন্দর নানাবর্ণের মেঘ। তারাগুলো অনেক কাছে কাছে ফুটে আছে। আর প্রতিটি তারার মধ্যেই নাক মুখ চোখ আঁকা। আকাশের একধারে এত বড় একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে যে মনে হয় দিগন্তের প্রায় বারো আনা অংশ জুড়ে আছে। চারধারে ছোট ছোট টিলা, রঙিন কাচ আর কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি। রাস্তা দিয়ে পুতুলেরা হেঁটে যাচ্ছে। দুটো কুকুর বিকল মানুষের ভাষায় কথা বলছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। গ্রসারি শপ-এর সামনে একটা টেকো পুতুল একটা পাখির সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। তিনজন পরি উড়ে উড়ে রামধনুগুলোয় আরো ভালো করে রং দিয়ে দিচ্ছে। একটা খেলনা মোটরগাড়ি মোরগের ডাকের মতো ভেঁপু বাজিয়ে চলে গেল। চারধারে কি এক অপরিসীম শান্তি, এক মৃত্যুহীন নিরাপদ শাশ্বত জগৎ।

পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, নীলুর জন্য যে সব ছবির বই কিনে দিয়েছিলাম আমি, তারই কোনটার মধ্যে এই ছবিটা ছিল। আমি সেই রকমই একটা ছবির মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

আমি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলাম—নীলু!

আরব লোকটা সেই মুহূর্তেই আবার ডাকল—আলিজা!

এবার পিছন থেকে একটা শব্দ এল। তারপর একটা লম্বা, সুন্দরপানা মেয়ে উঠে এল কোথা থেকে। তারও অবিকল মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা। সে এসে এই বিশাল লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। এই মেয়েটাই কি ওর সহ-গেরিলা?

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অলকা

এই সকালবেলা আমার ঘরখানা চমৎকার দেখাচ্ছে। সারা দিনের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের সময় হল সকালবেলা। আমি খুব ভোরে উঠতে পারি না বলে আমারা একরকম দুঃখ আছে। তবে মাঝে মাঝে বেশ ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ঘরময় সকালের রোদ দেখি। কি সুন্দর যে লাগে ভোরের একটা আলাদা গন্ধ। লক্ষ করে দেখেছি, সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মানুষকে সবচেয়ে ভালো দেখায়।

পার্ক সার্কাসের এই ফ্ল্যাটটা প্রথমে ভাড়া করেছিল আমার এক মাসতুতো দাদা। আমার বিয়ের ছ'মাস পর আমি আর জয়দেব হানিমুন করতে যাই শিলঙে। বুদ্ধিটা কার ছিল কে জানে। জয়দেবের পরিবারে হানিমুনের চল ছিল না। কিন্তু আজকাল বাঙালি সমাজে হানিমুনের চল হয়েছে। আমার মনে হয় জয়দেবই আমার সঙ্গে বোঝাপড়ার করার জন্য পরিবার থেকে কিছুদিন আমাকে নিয়ে আলাদা হতে চেয়েছিল। সেইটেই হল কাল।

শিলঙে আমরা একটি হোটেলের ঘরে দুটো ঝগড়াটে বেড়ালের মতো দিনরাত ফোঁসফাঁস করতাম। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না।

জয়দেব হয়তো বলল—এক গ্লাস জল দাও তো!

আমার প্রেস্টিজে লাগল, বললাম—গড়িয়ে খাও, নয়তো বেয়ারাকে বলো।

—তুমি তো আমার বউ, এটুকু করলে তো দোষ হয় না।

—বউ মানে তো ঝি নয়।

একদিন একটা মেয়েকে দেখে জয়দেব বলল—দেখ, মেয়েটি কি সুন্দর!

স্বামী কোনো যুবতিকে সুন্দর দেখলে স্ত্রীর একটু হিংসে হওয়ার কথা, আমার হল না। বললাম—বেশ সুন্দর!

—আলাপ করব?

—করো না! তবে তুমি তো তেমন স্মার্ট নও, ভালো করে ভেবে-চিন্তে কথা বলো।

জয়দেব অবশ্য গেল না কথা বলতে। চেরাপুঞ্জি দেখতে গিয়েও খুব তুচ্ছ কারণে একচোট ঝগড়া হল। জয়দেব বলল—চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় এটা

কিন্তু সত্যি নয়। আমি রিসেন্টলি একটা বিদেশি ম্যাগাজিনে পড়েছি আর একটা কোন জায়গায় যেন এর চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়।

চেরাপুঞ্জিতে না হয় অন্য কোথাও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলেই বা আমার ক্ষতি কি? কিন্তু যেহেতু জয়দেব বলছে সেই হেতু আমার কথাটা ভালো লাগেনি, মনে হয়েছিল ও একটু পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করছে।

আমি বললাম—আন্দাজে বলো না।

—না অলকা, আমি পড়েছি।

—মিথ্যে কথা। চেরাপুঞ্জিতেই বেশি বৃষ্টি হয়।

জয়দেব রেগে বলে—আমি বলছি আমি পড়েছি।

—পড়লেও ভুল পড়েছ। আমরা ছেলেবেলা থেকেই চেরাপুঞ্জিকে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির জায়গা বলে জানি।

—ভুল জানো।

—তুমি ভুল পড়েছ।

এইভাবেও আমাদের ঝগড়া হত।

শিলঙ বা চেরাপুঞ্জির দোষ নেই, ভূগোল বই বা বিদেশি ম্যাগাজিনও দায়ী নয়। আমরা দুজনেই টেলিফোনে দুটো-রং নাম্বার পেয়ে অচেনা লোককে চেনা ঠাওরাবার অভিনয় করছি।

শিলঙ থেকে দুজনেই কিছু রোগা হয়ে ফিরে এলাম। শ্বশুরবাড়িতে কিছুকাল থেকে শরীর আরও খারাপ হল। লোকে ভাবলো বোধহয় মা হতে চলেছি। ডাক্তার দেখে বলল—না, পেটে ফাংগাস হয়েছে।

শরীর সারাতে বাপের বাড়ি গেলাম। মাসখানেক পর জয়দেব নিতে এল! গেলাম না। জয়দেব তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে কটেজ আর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জন্য কি সব কাজ করে বেড়ায়। বাড়িতে খুব একটা থাকে না। শুনলাম, প্রাচীন মন্দিরের ওপর থিসিস লিখছে ডক্টরেট করার জন্য। আমি শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই না শুনে রাগ করে বলল—আমি কুড়ি দিন বাইরে বাইরে ঘুরে ফিরলাম, তুমি এ সময়ে যাবে না আমার কাছে?

আমি প্লেটে করে আচার খাচ্ছিলাম, জিভে টকাস টকাস শব্দ করে বললাম—আমাকে দিয়ে তোমার কি হবে? বউ-গিরি করতে আমার ভালো লাগে না।

জয়দেব আমার আচার খাওয়া দেখছিল। ওই সিরিয়াস অবস্থাতেও ওর মুখ রসস্থ হয়ে গিয়েছিল, মুখের ঝোল টেনে বলল—বউ-গিরি কথাটা কি ভাল?

আমি হেসে ফেললাম। বললাম—ভালো না মন্দ কে জানে! আমার তো তাই মনে হয়।

জয়দেব হাল না ছেড়ে বলল—তুমি কি আমাকে একটুও সহ্য করতে পারো না?

—পারতে পারি। যদি তুমি আলাদা থাকো।

—আলাদা থাকলে কি হবে?

—আমি আলাদা বাসায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। তোমাদের বাড়ির অত লোকের মধ্যে থাকতে আমার ভালো লাগে না। তুমি আলাদা বাসা করে খবর দিও। যাবো।

—এই কি শেষ কথা?

—হ্যাঁ।

—আমার বাড়ির লোক তোমার কি ক্ষতি করেছে?

—তা জানি না। তবে যদি আমাকে চাও তো বাড়ি ছাড়তে হবে।

জয়দেব ভাবল। ফিরে গেল। মনে হল, কথাটা সে ভেবে দেখবে।

কিন্তু জয়দেবকে আমি তখনও ঠিক চিনতে পারিনি। বাড়ি ছাড়বার ছেলে জয়দেব ছিল না। কদিন পর তার একটা পরিষ্কার চিঠি এল। বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে লিখে পাঠিয়েছে —অলকা, বিয়ে ভাঙার জন্য যা করতে হয় তা তুমি করতে পারো। আমি ইনিসিয়েটিভ নেবো না। বিয়ে ভাঙা আমি পাপ বলে মনে করি। কিন্তু তুমি যদি চাও তো দাবি ছেড়ে দেবো।

চিঠিটা পেয়ে যে খুব উল্লসিত হয়েছিলাম তা নয়। কোথায় যেন আমার মেয়েমানুষী অহংকারে একটু ঘা লাগল। যত যাই হোক, একবার বিয়ে হয়ে গেলেই তো মেয়েরা আর কুমারী রইল না। এই বাংলাদেশে কুমারী যে নয়, সে একা হলে বড় মুশকিল!

এই চিঠি এলে আমাদের পরিবারেও হুলুস্থূল পড়ে গেল। বাবা যত প্রগতিপন্থী হোন, মা যত আধুনিকা হোন, মেয়ে বিয়ে ভেঙে স্বামী ছেড়ে চলে আসবে এটা তাঁরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি।

বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন—চল অলকা, আজই তোকে তোর শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসি।

মাও বাবার সঙ্গে একমত। আমার ঠাকুমা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করলেন। দাদাও খুশি নয়।

অথচ আমিই বা কেন শ্বশুরবাড়ি যাব?

বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া লাগল। আমি স্পষ্ট বললাম, যদি জয়দেব বাড়ি থেকে আলাদা হয় একমাত্র তবেই আমি ফিরে যেতে পারি।

বাড়ির লোকজন আমার মতে মত দিল না। জোর করতে লাগল। আমি প্রায় একবস্ত্রে মাসির বাড়ি চলে এলাম।

মাসিও বাঙালি হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমাকে চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিয়েছে এক সময়ে! সব রকম আধুনিকতায় শিক্ষিত করেছে, তবু দেখা গেল আমার এই বিয়ে-ভাঙার ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখছে না। বলল-দূর মুখপুড়ি, স্বামীর সঙ্গে যত ঝগড়াই করিস, বিয়ে

ভাঙতে যাস না। এ দেশে যারা বিয়ে ভাঙে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়। হুট করে এই কম বয়সে ও সব করিস না।

মাসির সঙ্গে বনল না। অথচ কেন জানি না মনটা বড্ড আড় হয়ে আছে, জয়দেব বা তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না।

আমার আর এক মাসির ছেলে অসীমদা তখন বিলেত যাচ্ছে। বউ-বাচ্চা নিয়েই চলে যাবে। পাঁচ-সাত বছর ফিরবে না। তার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ থাকবে এমন কথা হচ্ছিল। কলকাতায় বাসা পাওয়া প্রচণ্ড সমস্যা বলে তারা ফ্ল্যাটটা ছাড়তে চাইছিল না। তখন আমি অসীমদাকে বললাম—ফ্ল্যাটটায় আমাকে থাকতে দাও।

অসীমদা খুশি হয়ে বলল—তবে তো ভালোই হল। কতগুলো দামি ফার্নিচার রয়েছে, তুই আর জয়দেব থাকলে ভালোই হবে।

জয়দেব থাকবে না, আমি একা থাকব—এটা আর অসীমদার কাছে ভাঙলাম না। ওরা যেদিন রওনা হয়ে গেল সেদিন বিকেলে গিয়ে ফ্ল্যাটটা দখল করলাম। জীবনে এই প্রথম একা থাকা। একদম একা। একটু ভয়-ভয় করছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আনন্দও হচ্ছিল। একা আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কি যে আনন্দ।

বাড়ি থেকে মা বাবা আত্মীয়স্বজনরা এসে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক জ্বালাতন করল, আমি জেদবশত গেলাম না। বাড়িতে ফিরে গেলেই ক্রমাগত আমার ওপর নানাদিক থেকে চাপ সৃষ্টি হবে। অনেক ঠেস-দেওয়া বাঁকা কথা, অনেক চোরা-চাউনি আর মুচকি হাসি সইতে হবে। তার চেয়ে বেশ আছি। ফিরে গেলাম না বলে সকলেরই রাগ, মা তো মুখের ওপর বলেই গেল—তুমি বদমাশ হয়ে গেছ। নষ্টামি করার জন্যই একা ফ্ল্যাটে থাকবার অত শখ।

ব্যাপারটা তা নয়। বিয়ের আগে যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আমার মনের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষদের প্রতি আমার এক ধরনের অনাগ্রহ, উদাসীনতা, কেন জানি না, জন্মেছে।

একা ফ্ল্যাটে থাকতে হলে চাকরি চাই। কলকাতায় চাকরির বাজার তো তেমন সুখের নয়। তবু চেষ্টা-চরিত্র করে এক চেনা সূত্র ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক অধ্যাপকের বাচ্চা রাখার কাজ পেলাম! ইংরেজিতে বলে বেবি সিটার। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে। স্ত্রী ডাক্তার। তারা মানুষ বেশ ভালো! বালিগঞ্জ প্লেসে তাদের বাড়িতে সকাল আটটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত সাত আর তিন বছরের দুটো ছেলেমেয়েকে সামলে রাখতাম। দুপুরের খাবার দিত আর দুশো টাকা মাইনে। সাত বছরের ছেলেটা কনভেন্টে পড়তে যেত। তাই তাকে বেশি আগলাবার দরকার পড়ত না। তিন বছরের মেয়েটাকে সারাদিন ঘড়ি ধরে সাজাতাম, খাওয়াতাম, গল্প বলে ঘুম পাড়াতাম। বেশ লাগত। অসম্ভব মিষ্টি আর

দুষ্টু মেয়েটা, সাত দিনেই সে আমার বড় বেশি ন্যাওটা হয়ে গেল। তার কচি মুখের দিকে চেয়ে বুকের মধ্যে ঢেউ দিত একটা কথা—আমর যদি এ রকম একটা মেয়ে থাকত!

সে সব বাচ্চার মা চাকরি করে তাদের যে কী দুরবস্থা হয় তা এই দুটো বাচ্চাকে দেখেই বুঝতাম। দুজনেই কিছু অস্বাভাবিক রকমের চঞ্চল, অভিমানী, আর কিছু নিষ্ঠুরও ছিল। প্রথমে গিয়েই আমি বাচ্চাদুটোর মধ্যে কেমন ভয়-মেশানো, সন্দেহ-মেশানো এক রকমের দৃষ্টি দেখেছিলাম চোখে। সারাদিন ওরা মায়ের জন্য অপেক্ষা করত মনে মনে। ডাক্তার মায়ের ফিরতে রাত হত। তখন মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েও জেগে জেগে 'মা' বলে ডেকে ফের ঘুমোতো। অন্য কোনো বাচ্চা দেখলেই মেয়েটা তাকে মারত, খিমচে দিত, চোখে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করত। সব সময়ে সে যেন তার প্রতি এক অজানা অন্যায়ের শোধ নেওয়ার চেষ্টা করত। বড় কষ্ট হত আমার।

মাস তিনেকের মধ্যেই আমি বাচ্চা দুটোর আসল মা হয়ে উঠলাম। সারাদিন আমি তাদের নিয়ে থাকি। আমার নিজের ছেলেমেয়ে হলে তাদের নিয়ে কী করতাম সেই ভেবে মায়ের মতো সব হাবভাব করি, বায়না রাখি, শাসন করি। ওরা তাই আমার মধ্যে হারানো মা কিংবা নতুন মা খুঁজে পেল। নিজেদের মার জন্য খুব বেশি অস্থির হত না। বরং আমি সন্ধ্যেবেলা চলে আসবার জন্য তৈরি হলে মেয়েটা ভয়ঙ্কর কান্নাকাটি করত। তাকে ঘুম না পাড়িয়ে আসা মুশকিল হয়ে উঠল। এইভাবেই জড়িয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু বাচ্চাদের বাবা রোহিতাশ্ব চৌধুরি একদিন আমাকে বললেন—অলকা, আপনি তো খুবই শিক্ষিতা এবং ভদ্রঘরের মেয়ে, এ কাজ আপনার উপযুক্ত নয়। যদি বলেন তো আপনার জন্য একটা ভদ্রগোছের চাকরি দেখি।

তাই হল। এ কথার মাস দুয়েকের মধ্যে আমি একটা বাঙালি বড় ফার্মে টাইপিস্ট-ক্লার্কের চাকরি পেলাম। বাচ্চাদের জন্য মনটা খুব ফাঁকা লাগত। ওরা আর একজন বেবি সিটার রেখেছে জেনে মনটাও খারাপ হয়ে গেল। মাঝেমাঝে গিয়ে দেখে আসি ওদের, এটা সেটা কিনে দিই। কিন্তু মাতৃত্বের এক অসম্ভব ক্ষুধা বুকের মধ্যে কেবলই ছটফট করে।

জয়দেবের সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদের কোনো সক্রিয় চেষ্টা আমি করিনি। সে বড় হাঙ্গামা। উকিলের কাছে যাও, সাক্ষী জোগাড় কর। তা ছাড়া আমার অভিযোগ বা কি হবে জয়দেবের বিরুদ্ধে? তাই ও সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আলাদা আছি বেশ চলে যাচ্ছে, আর কেন মামলার হাঙ্গামায় যাওয়া? জয়দেব তো আমাকে চিমটি দিচ্ছে না!

যুবতি মেয়ে। একা থাকি। আমার কি কোনো বিপদ হয়নি?

হয়েছিল। কিন্তু সে তেমন কিছু নয়! অসীমদার ফ্ল্যাটে একটা ফোন ছিল, তাতে প্রথম কিছুদিন একটি ভীতু ছোকরা আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করার চেষ্টা করে। আমি ফোন তুলে গলা চিনেই ফোন ছেড়ে দিতাম। তিন মাস পর সে হাল ছেড়ে দেয়। ওপরতলার এক

মহিলার ফ্ল্যাটে মদ আর জুয়ার আড্ডা বসত। একবার সেখানকার এক মাতাল আমার ঘরের কড়া নেড়েছিল, আমি দরজা খুললে সে আমাকে ধরবারও চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা মাতলামি। পরে সে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল।

এরকম দু'একটি ছোটখাটো ঘটনা বাদ দিলে আমার জীবন ছিল বেশ নিরাপদ। আমি একা থাকি না দোকা থাকি সেটাও তো সবাই জানত না। কলকাতায় কে কাকে চেনে!

তবে আমি যে ফার্মে চাকরি করতাম সেই ফার্মের একটি উজ্জ্বল সুপুরুষ আর স্মার্ট ছেলে আমার প্রতি কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে দু একবার রেস্টুরেন্টে গেছি, বেড়িয়েছি এদিক ওদিক। কিন্তু কি জানি তার প্রতি আমার কখনও কেন আগ্রহ জাগল না।

তবে সে একবার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

প্রভাসরঞ্জন

আমার জীবন শুরু হয়েছে কয়েকবার। শৈশবে যে জীবন শুরু করেছিলাম দেশভাগের পর তা শেষ হয়ে যায়। নতুন এক রুক্ষ ভিখিরির স্নেহহীন জীবন শুরু করেছিলাম। মধ্যে যৌবনে বিদেশে গেলাম নতুন আর একরকম জীবন শুরু করতে। কতবার কতভাবে শুরু হল, আবার শেষও হয়ে গেল। এখনও আয়ু অনেকটা পড়ে আছে, কতবার আরও নিজের জন্ম ও মৃত্যু দেখতে হবে কে জানে?

ফেরার সময়ে সেই এরোপ্লেনেই যেমন, গেরিলারা যদি প্লেন হাইজ্যাক করে নিয়ে যেত, যদি মুক্তিপণ হিসেবে বন্দি করত আমাদের এবং যদি প্রতি ছ'ঘণ্টা অন্তর এক একজন যাত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলত তাদের দাবির বিজ্ঞপ্তি হিসেবে? না, সেসব কিছুই হয়নি। না হলেও সেই কয়েকটা মুহূর্তের আকণ্ঠ মৃত্যুভয় আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলল।

সেই রূপসী তরুণীটি দৈত্যাকার লোকটির সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে কি বলছিল তা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না। চোখের পলক না ফেলে হা করে চেয়ে দেখছি দৃশ্যটা, আমার পাশে বসা বুড়োর নাকে বাঁশির শব্দ হচ্ছে, বুড়ি অস্পষ্ট স্বরে কেঁদে কি যেন বলছে বুড়োকে। প্লেনসুদ্ধ যাত্রীরা আতঙ্কে চেয়ে আছে দৃশ্যটার দিকে।

মেয়েটা কথা বলতে বলতে একপা-দু'পা করে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে! লোকটা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দু'খানায় বাদামি আগুন ঝলসাচ্ছে। তারা দুজন চারদিকের যাত্রীদের চোখকে গ্রাহ্য করছে না, যেন আর কেউ যে উপস্থিত আছে এ তারা জানেই না।

মেয়েটা খুব কাছাকাছি এগিয়ে গেলে দৈত্য লোকটার চোখ মুখ হঠাৎ খুব নরম হয়ে গেল। দুটো প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির মতো হাতে লোকটা সেই পলকা মেয়েটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তারপর চকাস চকাস করে চুমু খেতে লাগল।

ঠিক এরকমটার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ডানদিকে একটা লোক হেসে উঠল। পাশের বুড়ি বুড়োকে বলছে—ও গড, হি উইল ব্রেক দ্য গার্লস ব্যাক। পিছন থেকে একটা হাততালির শব্দ আসছে। একজন বলে ওঠে—হ্যাপি এন্ডিং। পিছনের ইটালিয়ান বাচ্চাটা বিস্মিত স্বরে বলে ওঠে—ওরা কখন মারবে? চুম খাওয়ার পর?

দুজন সুন্দরী হোসটেস এতক্ষণ সামনের দিকে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল এদিকে চেয়ে। এবার তারা প্রাণ পেয়ে হাসিমুখে হঠাৎ এগিয়ে আসে। দৈত্যটির পিঠে টোকা দিয়ে একজন জার্মান ভাষায় বলে—ইচ্ছে হলে আপনি আপনার বান্ধবীকে নিয়ে আলাদা বসতে পারেন। সামনের দিকে এটা টুইন সিট আছে।

লোকটা মেয়েটাকে খানিক নিস্পিষ্ট করে মুখ তুলে বলে—ড্রিঙ্ক আনো, আমার তেষ্টা পেয়েছে।

পিছনে যেখানে আলিজা বসেছিল তার পাশের সিটে একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের তরুণ ছিল। তাকে কেউ লক্ষ করিনি এতক্ষণ। সবাই ঘাড় ঘোরাচ্ছে দেখে আমিও পিছু ফিরে ছেলেটাকে দেখতে পাই। একটা বাদামি শার্ট গায়ে, গলার টাইটা আলগা, মুখটা অসম্ভব লাল, দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, সে এই প্রেমের দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না, অসম্ভব রেগে গেছে এবং এক্ষুনি সে একটা কিছু করবে।

কি সে করত জানি না, তবে দৈত্যকায় লোকটির বুকে সেঁটে থেকেই মেয়েটা একবার পিছু ফিরে চেয়ে চোখের একটা ইশারা করল তাকে। সে বসে পড়ল ধীরে ধীরে।

দৈত্য লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে আরও সামনের দিকে কোথাও গিয়ে বসল।

আমি হোসটেসকে ডেকে একটু ড্রিঙ্কস চাইলাম। আর সেটি পরিবেশনের সময়ে জিগ্যেস করতেই, সুন্দরী হোসটেসটি মৃদু স্বরে বলল—লাভ ট্রাংগল।

কিন্তু একটু বাদে পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে নীচু স্বরে কি যেন বলল অনেকটা সময় ধরে। তারপর দেখি, তরুণী হোসটেস ছাইরঙা এক আতঙ্কিত মুখে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে বেতার ঘরের দিকে। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হোসটেসের মুখের ভাব অনেকেই লক্ষ করিনি। তাই বেশিরভাগ লোক নিশ্চিন্তে বসে আছে! আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

বেইরুটে প্লেন থামতে দরজা খুলে কয়েকজন বিশালদেহী যাত্রী উঠল। তাদের চেহারা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। উঠে মুহূর্তের মধ্যে তারা প্লেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। চোখের পলকে দেখি তাদের হাতে হাতে উঠে এসেছে এল এম জি, কারাবাইন, থমপসন অটোমেটিক।

চারজন সেই দৈত্যের মতো লোকটা আর তার বিস্মিত বান্ধবীকে ঘিরে ফেলল। দুজন গিয়ে ধরল পিছনের ছেলেটিকে।

বাচ্চা হাতির মতো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে চাইল। রাগে তার মুখ টকটকে লাল। চেঁচিয়ে সে তার দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন গালাগাল করছিল পিছনের ছেলেটিকে। আর সেই ছেলেটিও কি যেন জবাব দিচ্ছে বেপরোয়া মুখে।

ছদ্মবেশী আর্মড গার্ড, তিনজনকেই নামিয়ে নিয়ে গেল মেশিনগান আর অটোমেটিকের নল গায়ে ঠেকিয়ে। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে সার্চ করা হল প্লেন। গুঞ্জন শোনা গেল, ওই তিনজনই ছিল গেরিলা। বেইরুটের পর তারা প্লেন হাইজ্যাক করত। প্রেমের ত্রিকোণ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে কি হত বলা মুশকিল। প্রেমে ব্যর্থ পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে তাদের সব গুপ্তকথা বলে দিয়েছিল।

গেরিলাদের ক্ষেত্রে এরকম বড় একটা হয় না, আমি জানি। সর্বত্রই আমি মৃত্যুপণ গেরিলাদের লক্ষ্য করে দেখেছি। প্রেম তাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। আমার এখনও মনে হয়, ওরা গেরিলা ছিল না। পিছনের ছেলেটি নিজেদের গেরিলা বলে পরিচয় দিয়ে ইচ্ছে করেই গণ্ডগোল পাকিয়েছিল। কিন্তু সত্যিকারের ঘটনা কি তা আমি আজ জানি না। কিন্তু প্লেন বেইরুট থেকে উড়লে মনে হয়েছিল, আমরা আবার জীবন ফিরে পেলাম। আমি যে জীবন ফিরে পেলাম সেটা কেমন? সে জীবন শেষ হলেই বা কি ক্ষতি ছিল?

দমদমের দরিদ্র বাড়িটিতে এসে যখন পৌঁছোলাম তখন অমার বাবা, মা যথাসাধ্য আনন্দ প্রকাশ করলেন। ইতিমধ্যে আমার ছোট ভাই একটা বিয়ে করেছে। আমার ভাই, ভ্রাতৃবধূও যথাসাধ্য খুশির ভাব দেখাল। ভাইয়ের সদ্য একটি ছেলে হয়েছে। আমি বিদেশ থেকে কিছু লোভনীয় জিনিস এনেছিলাম। সেগুলো বাড়ির লোকদের বিলিয়ে দিলাম। সবাই অসম্ভব খুশি হল তাতে। একেই তারা ভালো জিনিস চোখে দেখেছে কম, তার উপর এত সব হরেক রকম মহার্ঘ দ্রব্য দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

এই উত্তেজনা বাড়াতে আমার বোনেরা তাদের বাচ্চাকাচ্চা আর স্বামী নিয়ে চলে এল বেড়াতে। খুবই হতাশ হই তাদের দেখে। দুই ভগ্নীপতির মধ্যে একজনকে দেখলেই মনে হয় লোফার। অন্যজন কিছুটা ভদ্রলোক আর সুপুরুষ হলেও নির্বোধ। কারোরই সংসারের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। মা আমাকে চুপি চুপি জানাল, ছোট জামাই নাকি গুন্ডামি, চুরি, ছিনতাই করে। বড়জন একটা প্রাইভেট ফার্মে কেয়ারটেকার।

এরা সব এক জায়গায় জুটতে খুব হট্টগোল হল। ঝগড়াঝাঁটিও প্রায়ই লেগে যায় দেখলাম। একদিন বাবা খুব গম্ভীরভাবে আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে বললেন—শোনো বাবা প্রভাস, তোমার ছোট ভাই আর তার বউ এখন চায় আমি আর তোমার মা আলাদা হয়ে অন্যত্র গিয়ে থাকি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—আপনি আর মা যাবেন কেন? এ বাড়ি তো আপনার, দরকার হলে ওরা চলে যাবে।

—সে সব আইনের কথা শুনছে কে? আমাদের বুড়ো বয়সে আর তেমন তেজ নেই যে গলাবাজি করে গায়ের জোরে দখল রাখবো। তার উপর নিজের সন্তান যদি শত্রুতা করে, তবে আর কি করার আছে? ওরা দুজনে মিলে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলছে দিন রাত। তোমার মা অবশ্য ওদের দিকে টেনে চলেন, কিন্তু তাতেও সুরাহা হবার নয়। যদিও বা তোমার মাকে ওরা আশ্রয় দেয় আমাকে থাকতে দেবে না।

কথাটা শুনে আমি ভয়ংকর রেগে যেতে পারি না। হঠাৎ কেন যেন নিজের ছেলেবেলার কথা আদ্যন্ত মনে পড়ে! ভাবি, আমাদের নিষ্ঠুর ছেলেবেলা আমাদের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি শেখাবে! আমার ভাই তার নিজের জীবন ও পরিবেশ থেকে সেই শিক্ষাটাই নিয়েছে। ওর বউও উঁচু পরিবারের মেয়ে নয়। কথায় কথায় মা একদিন বলে ফেলেছিলেন। বউমার মা নাকি ঝিগিরি করত। তবে আগে ওরা ভদ্রলোক ছিল, অবস্থার ফেরে এই দশা। সে যাই হোক, আমার ভাইয়ের বউ নিমি খুব খোঁপায় চোপায় মেয়ে। টকাটক কথা বলে, মেজাজ দেখাতে ভয় পায় না, কাউকে তোয়াক্কার ভাব নেই। এ ধরনের মেয়েরা সহজেই স্বামীকে বশ করতে পারে। মা বাবাকে আলাদা করার প্রস্তাবটি হয়তো তার মাথাতেই প্রথম এসে থাকবে। যথাসময়ে আমার ভাই সেই ভাবনায় ভাবিত হয়েছে।

বাবাকে বললাম—বোঝাপড়া করে নিন। আমিও বলবখ'ন।

বাবা বললেন—এ বাড়ির অর্ধেক স্বত্ব তোমারও। আমি বলি কি, তুমি যখন এসেই গেছ ভালো সময়ে, তখন বাড়িটা ভাগ করে নাও। আমি তোমার ভাগে থাকব, তোমার মা না হয় তার ছোট ছেলের কাছে ইচ্ছে হলে থাকবেন।

শুনেই আমার গা রি-রি করে ওঠে। এই ঘিঞ্জি কলোনির তিন কাঠা জায়গায় দীনদরিদ্র একটুখানি দরমার বাড়ি—এর আবার ভাগ-বাঁটোয়ারা। তার উপর এখানে স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছেও আমার কখনোই হয়নি, নিজের আত্মীয়স্বজন আমার এখন আর সহ্য হয় না।

আমি বললাম—ভাগ-বাঁটোয়ারা করার ইচ্ছে হয় না। এইটুকু জায়গা ভাগ করলে থাকবে কি?

বাবা বলেন—তবে বাবা, তুমি আলাদা কোথাও বাড়ি কর, বুড়ো বয়সে আমি গিয়ে তোমার কাছে শান্তিতে মরি।

আমি সামান্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলি—বরাবরই কি আপনাদের বোঝা আমাকে বইতে হবে নাকি? একটা জীবন সংসারের পিছনে অপচয় করেছি। এখনও কি আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না?

বাবা খুব অবাক হয়ে বললেন—তোমাকে কোন কাজে কবে বাধা দিলাম বলো তো! ঠিক কথা তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, কিন্তু অত ভালো সরকারি চাকরি ছেড়ে বিদেশে গেলে, আমরা তো বাধা দিইনি। এত বছর তো আমরা তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকিনি। এই বুড়ো বয়সে এখন আর তোমরা ছাড়া আমাদের অভিভাবক কে আছে।

আমার নিষ্ঠুর মন এখন আর সহজে গলে না। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম—আচ্ছা, সুহাসের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ভাগ করে দেবো, আপনারা আমার ভাগেই থাকবেন। কিন্তু আমি এ বাড়িতে থাকবো না।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

বাসায় খুব একটা ভালো লাগে না, কারণ, এখানে আমার আপনজন বলতে কেউ নেই, সারা পৃথিবীতে কেউ নেই, একমাত্র নীলু ছাড়া। বোন ভগ্নীপতিরা চলে গেল, তবু বাড়িতে গণ্ডগোল থামে না। প্রায় সারাদিনই সুহাসের বউ নিমি মা বাবাকে বকাবকি করে। মা খুব একটা পালটা ঝগড়া করে না, কিন্তু ছেড়েও দেয় না। বাবা মাঝেমাঝে লাঠি হাতে তেড়ে ছেলের বউকে মারতে যায়। অমনি নিমি বেরিয়ে এসে কোমরে হাত রেখে—ই-ইঃ মারবে! মারুক তো দেখি! বাবা ভয়ে পিছিয়ে আসে, আর নিমি তখন এক নাগাড়ে যাচ্ছেতাই বলে যায়। আমি যে বিদেশ-ফেরতা ভাসুর বাড়িতে আছি তা গ্রাহ্য করে না। ঝিয়ের মেয়েই বটে। সুহাস কোথায় কাজ করে তা আমি এখনও ভালো জানি না, তবে যা-ই করে, তা যে খুব উঁচু ধরনের কাজ নয় তা ওর আচার-আচরণ থেকেই বোঝা যায়। ওর সহকর্মীরা যে নীচুতলার লোক তা সুহাসের কথা শুনলেও টের পাই। কথায় কথায় মুখ খারাপ করে ফেলে। একটু আড়াল হয়ে বিড়ি টানে দেখি। বউকে নিয়ে সপ্তাহে দুবার নাইট শো দেখতে যায়।

বাড়ির খাওয়া-দাওয়া অত্যন্ত নীচু মানের। আমি এসে অবধি বাড়িতে বেশ কিছু সংসার খরচ দিয়েছি, তবু খাওয়ার মান ওঠেনি তেমন। তবে মাঝেমাঝে আমার মুখরক্ষা করতে মুরগি রান্না হয়। প্রথম দিন আমাকে খাওয়ার সময়ে কাঁটা চামচ দেওয়া হয়েছিল দেখে হেসে ফেলেছিলাম।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। বাইরে বাইরে খামোখা ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কোথাও যাওয়ার ঠিক থাকে না। চাকরি-বাকরি করব না ব্যবসা করব, তা নিয়ে ভাবি না। বেশ একটা ছুটি-ছুটি মনের ভাব নিয়ে আছি।

বিদেশে আমার যে টাকা জমেছিল তা নেহাত কম নয়। এ দেশের মুদ্রামানে প্রায় হাজার চল্লিশ টাকা। তাই এখনই চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

পাঁচুদার সঙ্গে খুব খাতির ছিল। তার খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম ভদ্রলোক মরতে চলেছেন।

অলকা

উঠে পড়লাম।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। ঝি সরস্বতী আজ আসবে কিনা বুঝতে পারছি না। এত বেলা তো সে কখনও করে না। আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। এক রিকশওয়ালার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমার কাছে একশোটা টাকা চেয়েছিল। দেবো কোত্থেকে? আমার বাড়িতে টাকা যা আছে তা বড় অল্পে অল্পে জমানো। দিই কি করে?

দাঁত মেজে এক কাপ চা করে খেলাম। বিছানা তুলতে ইচ্ছে করছে না। থাকগে, কে-ই বা আসছে দেখতে! সরস্বতী যদি আসে তো তুলবে'খন। সকালের চা করা, বিছানা তোলা এসব ও-ই করে।

আমি খবরের কাগজ রাখি না। ছোট্ট একটুখানি একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো আছে। সেটাই আমার সঙ্গী। অবশ্য এ ফ্ল্যাটে মস্ত একটা রেডিয়োগ্রাম আছে অসীমদার, কিন্তু সেটার যন্ত্রপাতিতে মর্চে ধরেছে, চলে না। আমার ট্রানজিস্টার সেটটারও ব্যাটারি ডাউন। চেরা আওয়াজ আসে। রেডিয়োটা চালিয়ে একটা ফ্যাসফেসে কথিকা হচ্ছে, শুনে বন্ধ করে দিলাম।

আজ ছুটি। কিন্তু ছুটির দিনগুলোই আমার অসহ্য। সময় কাটতে চায় না। শ্রীরামপুরের বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছে হয়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু গেলেই অশান্তি। মাসির বাড়িতেও যাওয়া হয় না। রোহিতাশ্ব চৌধুরির বাড়িতে যেতে কেমন যেন লজ্জা করে আজকাল, ওদের বাড়িতে বেবি সিটারের চাকরি করেছি বলেই বুঝি এক হীনমন্যতা কাজ করে।

মুশকিল হল আমার বাসাতেও কেউ আসে না। আজ রোববারে কেউ কি আসবে? আসবে না, তার কারণ আমাকে কেউ ভালো চোখে দেখে না। আমার তেমন বন্ধু-বান্ধবও নেই। মাঝেমাঝে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে।

এখনও বর্ষা নামেনি এ বছর। গরম কালটা বড় বেশি দিন চলছে। এইসব ভয়ংকর রোদের দিনে ঘরের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেও হতে চায় না। একা ঘরে সারাদিনটা কাটাবোই বা কি করে?

জানলা দরজা খোলা। আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। আমি বাথরুমে ঘুরে এসে আয়নার সামনে বসে একটু ফিটফাট করে নিই নিজেকে। চুল আঁচড়াই, মুখে অল্প একটু পাউডার মাখি, কপালের একটা ব্রণ টিপে শাঁস বের করি। বেশ চেহারাটা আমার। লম্বা টান সতেজ শরীর, গায়ে চর্বি খুব সামান্য, মুখখানা লম্বা ধাঁচের, পুরু কিন্তু ভরন্ত ঠোঁট, দীর্ঘ চোখ। নাকটা একটু ছোটো কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। গায়ের রঙে জেল্লা আছে।

অনেককাল নাচি না। আজ একটু ইচ্ছে হল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটু পা কাঁপিয়ে নিলাম। তারপর কয়েকটা সহজ মুদ্রা করে নিয়ে ধীরে ধীরে নাচতে থাকি। কিন্তু বুঝতে পারি শরীর আর আগের মতো হালকা নয়। বেশ কষ্ট হয় শরীর ভাঙতে, দমও চট করে ফুরিয়ে গেল। হাঁপিয়ে বসে পড়লাম। তাতেও হল না। পাখা চালিয়ে শুয়ে রইলাম মেঝেয়। ঠান্ডা, মেঝে, বুক জুড়িয়ে গেল। শুয়ে থেকে হঠাৎ মনে হল —আজ কেউ আসবে। অনেককাল কেউ আসে না। আজ আসবে। ভাবতে ভাবতে ঝিমধরা মাথায় কখন যে তন্দ্রা এল। সরস্বতী আসেনি, হরিণঘাটার ডিপো থেকে দুধের বোতল আনা হল না। সকালের জলখাবার বলতে কিছু খাইনি এখনও, খিদে পেয়েছে! এ সব ভাবতে ভাবতেও তন্দ্রা এল। কি আলিস্যি আর অবসাদ যে শরীরটার মধ্যে! বয়স হচ্ছে নাকি! মাগো!

খুব বেশিক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাকা হল না। পিয়ানোর হালকা শব্দ তুলে কলিং বেল পিং আওয়াজ করল। সদর দরজাটা ভেজানো আছে, সরস্বতী হলে বেল না বাজিয়ে হুড়ুম হুড়ুম করে ঢুকে পড়ত। এ সরস্বতী নয়, অন্য কেউ।

দরজা খুলে একটু খুশিই হই। আমার অফিসের সেই স্মার্ট ও সুপুরুষ যুবক সুকুমার দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। যদিও সুকুমারকে আমি সেই অর্থে ভালোবাসি না, তবু ওর সঙ্গ তো খারাপ নয়। জানি না বাপু আমাদের মনের মধ্যে কি পাপ আছে। পাপ একটু আধটু আছে নিশ্চয়ই। নইলে সুকুমারের ওই দুর্দান্ত বিশাল জোয়ান চেহারা আর হাসির জবাব রঙ্গ রসিকতায় ভরা কথাবার্তা আমার এত ভালো লাগে কেন। আমরা পরস্পরকে 'তুমি' করে বলি, সেটাও পাঁচজনের সামনে নয়, দুজনে একা হলে তবেই। তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটু পাপ-টাপের গন্ধ পাওয়া যাবে।

বাইরের ঘরে বসে ও তেমনি হাসি মুখে বলল—তোমাকে একটু বিরহী বিরহী দেখাচ্ছেঅলি।

ওর হাসিটা যেন একটু কেমন। মানুষ খুব নার্ভাস হয়ে পড়লে মাঝেমাঝে ওরকম হাসি হাসে। ওর মতো চটপটে বুদ্ধিমান ছেলের নার্ভাস হওয়ার কথা নয়।

আমি বললাম—বিরহ নয় বিরাগ। বোসো, আজ আমার ঝি আসেনি, নিজেকেই চা করতে হবে।

ও বিরস মুখ করে বলে—ও, আমি ভেবেছিলাম তোমার বাসায় আজ ভাত খাবো দুপুরে। কিন্তু ঝি যখন আসেনি—

কথাটা আমার কানে ভালো শোনাল না। ভাত খাবে কেন? এ প্রস্তাবটা কি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

আমি বললাম—আমি নিজে কতদিন না রেঁধে শুকনো খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিই। আজও অরন্ধন।

সুকুমার নড়েচড়ে বসে বলল—এসে তোমায় ডিসটার্ব করছি না তো!

—মোটেই নয়। আজ আমার খুব একা লাগছিল।

—আমারও।

—মনে হচ্ছিল কেউ আসবে।

সুকুমারের মুখ হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও বলে—কে আসবে বলে ভেবেছিল? আমি?

—না। বিশেষ কারও কথা নয়। যে কেউ।

—আমার কথা তুমি ভাবো না অলি?

পুরুষমানুষদের এই এক দোষ। তারা চায় মেয়েরা সব সময় তাদের কথা ভাবুক। বড় জ্বালা। জয়দেবও বোধহয় তাই চাইত।

আমি একটু হেসে বললাম—ভাবব না কেন? তবে আমার ভাবনা খুব ভাসা ভাসা। গভীর নয়।

সুকুমারের স্মার্টনেস আজ যে কোথায় গেল? সে আজ একদম বেকুব বনে গেছে। মুখের রং অন্যরকম। আমি বাতাসে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

আজ সুকুমার খুব ভালো পোশাক পরে এসেছে। সাদা রঙের ওপর নীল রঙের নকশা করা পাতলা টেরিভয়েলের ছ্যাঁদাওয়ালা জামা, খুব সুন্দর ধূসর রঙের প্যান্ট পরা, পায়ে ঝকঝকে মোকাসিন। হাতে এই ছুটির দিনেও একটা পাতলা ভি আই পি স্যুটকেশ। রুমালে মুখ মুছে বলল—অলি, হঠাৎ এলাম বলে কিছু মনে করো না।

আমি হেসে বললাম—তুমি এর আগেও একবার এসেছিলে, তখনও কিছু মনে করার ছিল না। মনে করব কেন?

সুকুমার ভালো করে কথা বলতে পারছে না আজ। আমার দিকে ভালো করে তাকাচ্ছেও না। বলল—ভীষণ খারাপ সময় যাচ্ছে আমার।

—কেন, খারাপের কি? সদ্য একটা লিফট পেয়েছো?

সুকুমার ব্যথিত হয়ে বলে—সবসময়ে টাকার পয়েন্টে লোকের ভালোমন্দ বিচার করা যায় না। সেসব নয়। আমার মনটা ভালো নেই।

—কেন?

—তোমার সেটা বোঝা উচিত।

আমি এ ব্যাপারে খানিকটা নিষ্ঠুর। সুকুমার কি বলতে চায় তা আমার বুঝতে দেরি হয়নি। কিন্তু এ সব প্রস্তাবকে গ্রহণ বা গ্রাহ্য করা আমার সম্ভব নয়। বললাম—তোমার প্রবলেম নিয়ে আমি চিন্তা করব কেন? আমার ভাববার মতো নিজস্ব প্রবলেম অনেক আছে?

—অলি, তুমি কিন্তু সেলফ সেন্টার্ড।

—সবাই তাই। তুমিও কি নিজের স্বার্থ থেকেই সব বিচার কর না?

সুকুমার সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। ওর হাত বশে নেই। বলল—সেটা ঠিকই। কিন্তু তুমি যে হ্যাপি নও এটা নিয়েও আমি ভাবি।

আমি হেসে বললাম—সেটা ভাবতে না যদি আমার ওপর তোমার লোভ না থাকতো।

—লোভ! বলে আঁতকে উঠল সুকুমার। বলল—লোভ অলি? লোভ কথাটা কত অশ্লীল জান? লোভের কথা বললে কেন?

—তবে কি বলব, প্রেম? ভালোবাসা?

সুকুমার অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে—আমি তো তাই ভাবতাম।

মাথা নেড়ে বললাম—পুরুষমানুষ আমি কম দেখিনি। লোভ কথাটাই তাদের সম্বন্ধে ঠিক কথা। পুরুষেরা মেয়েদের চায় বটে, কিন্তু সে চাওয়া খিদের খাবার বা নেশার সিগারেটের মতো।

তুমি বড্ড ঠোঁটকাটা। বলে সুকুমার হাসে একটু। বলে—সে থাকবে, তর্ক করে কি কিছু প্রমাণ করা যায়? বরং যদি আমাকে একটা চানস দিতে অলি, দেখতে মিথ্যে বলিনি —

—চা করে আনব?

—আনো।

চা খেয়ে সুকুমার নিজের হাতের তেলোর দিকে নতমুখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আমার একটু মায়া হল। ও আমাকে ভয় পাচ্ছে। এত বড় চেহারা, এত ভালো দেখতে, তবু একটা মেয়েকে অত ভয় কেন পুরুষমানুষের?

নরম গলায় বললাম—কি বলবে বল।

—কি বলব, বলার নেই।

—শুধু বসে থাকবে?

—না, উঠে যাব এক্ষুনি।

—সে তো যাবেই জানি। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আজ তুমি কি একটা বলতে এসেছিলে।

সুকুমার হঠাৎ তার যাবতীয় নার্ভাসনেস ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে মরীয়া হয়ে খাড়া হয়ে বসল। আমার দিকে সোজা অপকট চোখে চেয়ে বলল—শোন অলি, তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। অনেক চেষ্টা করেছি মনে মনে, পারিনি।

এসব কথা শুনলে আমার হাই ওঠে। অবাস্তব কথা সব, একবিন্দু বিষয়বুদ্ধি নেই এসব আবেগের মধ্যে। আমি এঁটো কাপ তুলে নিয়ে চলে আসি। বেসিনে রেখে ট্যাপ খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম একা, ভালো লাগে না।

হঠাৎ সুকুমার ঘরের বাইরে থেকে ভিতরে চলে এল, খুব কাছে পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে আমার দু'কাঁধ আলতো হাতে ধরে অল্প কাঁপা গলায় আর গরম শ্বাসের সঙ্গে বলল

—অলি, এর চেয়ে সত্যি কথা জীবনে বলিনি কাউকে। গত তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। কিছুই ভালো লাগছে না, তাই আজ দিঘা যাওয়ার টিকিট কেটে এনেছি।

—যাও ঘুরে এসো। সমুদ্রের হাওয়ায় অনেক রোগ সেরে যায় এটাও হয়তো যাবে।

—রোগ! কিসের রোগ! আমার কোন রোগ নেই।

কলের জল পড়ে যাচ্ছে হিলহিল করে। সেই দিকে চেয়ে থেকে বললাম—কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নাও, তোমার হাত ভীষণ গরম।

এসব সময় যা হয়, তাই হল। অপমানিত পুরুষ যেমন জোর খাটায়, তেমনি সুকুমারও আমাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ। একটা বিরক্তিকর অবস্থা।

হঠাৎ সরস্বতীর ভৌতিক গলা চেঁচিয়ে উঠল—উরেব্বাস, এ কি গো!

সুকুমার প্রায় স্ট্রোকের মুরগির মতো অবশ হয়ে টলতে টলতে সরে গেল। সরস্বতী দরজায় দাঁড়িয়ে!

লজ্জায় মরে গিয়ে বললাম—এই হচ্ছে তোমার দাদাবাবু। ফেরাতে এসেছে।

জয়দেব আর আমার বিয়ে ভাঙার ব্যাপারটা সরস্বতী জানে। তাই সে বুঝল সুকুমারই জয়দেব। খুব হাসি মুখে বলল—তাহলে এতদিনে বাবুর মতি ফিরেছে, ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে!

আমি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম—দেরি করলে যে বড়। সারা সকাল আমি কিছু খাইনি জানো!

—কি করব দিদি, টাকার জোগাড় করতে সেই মোমিনপুর গিয়েছিলাম কুসমির কাকার কাছে। সে পানের দোকান করে। পয়সা আচে। দয়া-ভিক্ষে করতে পাঁচশোটা টাকা দেবে বলেছে।

আমি বললাম—কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সারো তো। বোকো না।

—দাদাবাবুর জন্য মিষ্টি-টিষ্টি এনে দেবো নাকি? দাও তাহলে পয়সা। চায়ের জল চড়িয়ে দোকান থেকে আসি।

কঠিন গলায় বললাম—না।

বসবার ঘরের ঠিক মাঝখানটায় সম্পূর্ণ গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সুকুমার। ভালো পোশাক, চমৎকার চেহারা তবু কি অসহায় আর বোকা যে দেখাচ্ছে!

আমি হেসেই বললাম—মাথা ঠান্ডা রেখো, বুঝলে! আমরাও তো কিছু নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে।

—সে জানি।

—ছাই জানো। আমার স্বামী লোকটা খুব খারাপ নয়। অন্তত লোকে তাকে খারাপ বলে না। তবু তাকে আমার পছন্দ হয়নি বলেই তার সঙ্গে থাকিনি। তুমি কি ভাবো আমি একা থাকি বলে সহজে বশ করে নেওয়া যাবে আমাকে?

—তুমি কখনোই আমাকে বুঝলে না অলি। বোধহয় ভালোবাসা তুমি বুঝতেই পারো না। থাকগে, যা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দিও।

সুকুমার চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম—এখন কি সোজা দিঘায় যাবে?

সুকুমার হতাশ গলায় বলল—দিঘায় একা যাওয়ার প্রোগ্রাম তো ছিল না।

—তাহলে?

—ইচ্ছে ছিল তোমাকেও নিয়ে যাবো। দুটো কটেজ বুক করে রেখেছি, বম্বে একসপ্রেসে দুটো ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে রেখেছি। কিন্তু সেসব ক্যানসেল করতে হবে।

ওর দুঃসাহস দেখে আমি হতবাক। বলে কি! আমাকে নিয়ে দিঘা যেতে চেয়েছিল?

কিন্তু এ বিস্ময়টা আমার বেশিক্ষণ থাকলো না। ওরকম পাগলামির অবস্থায় মানুষ অনেক বেহিসেবি কাজ করে। বললাম, আমাকে দিঘায় নিয়ে কি করতে তুমি?

সুকুমার মনোরুগির মতো হাসল একটু। বলল—আমাকে বিশ্বাস কোরো না অলি, আমার মাথার ঠিক নেই। কত কি ভেবে রেখেছি কত কি করতে পারি এখনও।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—এ সব ভালো নয়। তুমি আমার ক্ষতি ছাড়া কিছু করতে পারো না আর।

—বোধহয় তুমি ঠিকই বলেছ। আমি নিজেও আর বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম—দাঁড়াও, এক্ষুনি চলে যেও না।

—কেন?

—মনে হচ্ছে, তুমি একটা বিপদ করবে। বসে একটু বিশ্রাম করো। আজ বরং দুপুরে এখানেই খেয়ে যাও।

সুকুমার বসল।

সুকুমার প্রায়ই এর ওর হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে। আসলে ও হাত দেখার কিছুই জানে না, কেবল ব্লাফ মারে। কিন্তু ভবিষ্যৎবাণীগুলো বানায় বেশ চমৎকার। নতুন ধরনের কথা বলে। কাউকে হয়তো বলে শীতকালটায় আপনি খুব বিষণ্ণ থাকেন। আমাদের অফিসের বড় কর্তাকে একবার বলেছিল—সামনের মাসে আপনাকে চশমার পাওয়ার পালটাতে হবে, একটা দাঁত তোলাবেন ফেব্রুয়ারি ম্যাসে। এই রকম সব। অফিসের মেয়েদের হাত দেখে এমন সব কথা বলে যে মেয়েরা পালাতে পারলে বাঁচে। একবার আমার হাত দেখে সুকুমার বলেছিল—শুনুন মহিলা, আপনার একটা মুশকিল হল আপনি সকলের সঙ্গে বেশ সহৃদয় ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। স্নেহ-মায়া আপনার কিছু বেশি। কিন্তু তার ফলে লোকের সব সময়ে মনে হয় যে আপনি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন বা প্রেমে পড়েছেন। একটু রূঢ় ব্যবহার করতে শিখুন ভালো থাকবেন।

কি ভীষণ মিথ্যা কথা, আবার কি ভীষণ সত্যিও। সুকুমারের ওই ভুয়ো ভবিষ্যৎবাণী তার নিজের সম্পর্কেই খেটে গেল।

স্নেহবশে মায়ায় ওকে আমি দুপুরে খেয়ে যেতে বললাম। আসলে ওই ছুতোয় ওকে একটুক্ষণ আটকে রাখার জন্যই। নইলে ওর যে রকম মনের অবস্থা দেখছি, হয়তো রাস্তায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়বে। আর সেই আটকে রাখাটাই বুঝি ভুল হল। সুকুমার ভাবল, আমার মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে, আমি ওকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছি।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সুকুমার বাইরের ঘরে বসে সিগারেট ধরাল। সরস্বতী চলে গেছে, কাল সকালে ফের আসবে। যাওয়ার আগে সে সুকুমারের সঙ্গে কিছু তরল রসিকতাও করে গেল আমাকে নিয়ে।

আমি মনে মনে চাইছিলাম সুকুমার এখন চলে যাক। সুকুমার গেল না। সারা বেলা আমাদের খুব একটা কথা হয়নি। আমি রান্নাঘরে রেঁধেছি, সুকুমার বাইরের ঘরে বসে বইপত্র পড়েছে।

দুপুরে রোদ আর গরমের ঝাঁঝ আসে বলে দরজা জানলা সরস্বতী যাওয়ার আগেই বন্ধ করে দিয়ে যায়। বেশ অন্ধকার আবছায়ায় সুকুমারের সিগারেট জ্বলছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ছুটির দিনে আত্মীয়স্বজন কেউ যদি হুট করে চলে আসে, তো আমার কোনো সাফাই কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সুকুমারকে কি করে চলে যেতে বলি?

মুখোমুখি বসেছিলাম। বললাম—তুমি কি বিশ্রাম করবে, না যাবে এক্ষুনি?

সুকুমার আয়েসের স্বরে বলল—এই গরমে বের করে দেবে নাকি?

—তা বলিনি—বলে অস্বস্তিতে চুপ করে থাকি। ভেবে চিন্তে বললাম—তাহলে এ ঘরে বিশ্রাম নাও। আমি ওঘরে যাই!

শোওয়ার ঘরে এসে কাঁটা হয়ে একটু শুতে না শুতেই আবছা একটা মূর্তি এসে হঠাৎ জাপটে ধরল আমাকে। সুকুমার। আমি প্রতিমুহূর্তে এই ভয় পাচ্ছিলাম। ওর শ্বাস গরম, গা গরম, উন্মাদের মতো আশ্লেষ। ও খুনে গলায় বলল—তোমাকে মেরে ফেলব অলি, যদি রাজি না হও আমাকে বিয়ে করতে।

আমার কোনও কথাই ও শুনতে পাচ্ছে না। গ্রাহ্য করছে না আমার কিল, ঘুষি, আঁচড়, কামড়।

হঠাৎ বহুকাল নিস্তব্ধতার পর বিপদসঙ্কেতের মতো টেলিফোনটা বেজে উঠল। সেই শব্দে চমকে সুকুমার একটু থমকাল। আমি নিজেকে সামলে গিয়ে টেলিফোন তুলে বললাম—হ্যালো।

একটা গম্ভীর গলা বলল—আপনার ঘরে কে রয়েছে?

এত ভয় পেয়েছিলাম যে রিসিভার হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, ফিসফিস করে জিগ্যেস করলাম—আপনি কে বলছেন?

উত্তর এল—ওই লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দিন।

টেলিফোনটা কেটে গেল আচমকা!

প্রভাসরঞ্জন

সকাল থেকেই আজ মেজাজে আছি। কোনও খুশখবর নেই, মন ভালো থাকার কোনও কারণ দেখছি না, তবু কেন মনটা নবাবি করছে?

ওই রকম হয় মাঝেমাঝে। বেঁচে থাকাটাকে যখন শবদেহ বহনের মতো কষ্টকর লাগে সব সময়ে তখন মাঝেমধ্যে বুঝি প্রাকৃতিক নিয়মে মরবার আগে হঠাৎ সুস্থ হয়ে ওঠার ছদ্ম লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর করুণাপরবশ হয়ে এক বিন্দু খুশি মিশিয়ে দেন জীবনে। তখন বুঝতে হয় যে কঠিন দিন আসছে।

সে যাকগে। অতীতের চিন্তা আর ভবিষ্যতের ভাবনা দিয়ে এখানকার খুশির মেজাজটাকে নষ্ট করার মানেই হয় না। দীর্ঘদিন ইউরোপ থেকে শিখেছি, বর্তমানটাকে যতদূর সম্ভব উপভোগ করাটাই আসল। যে সময় চলে গেছে বা যে সময় আসেনি তার কথা চিন্তা করা এক মস্ত অসুখের কারণ! যদি আমুদে হতে চাও তো সে চিন্তা ছাড়ো।

প্রায় এক মাস হয়ে গেল দমদমের বাড়ি ছেড়ে পার্ক সার্কাসে চলে এসেছি। স্থায়ীভাবে এসেছি এ কথা বলা যায় না। মা-বাবাকে সে রকম কিছু বলে আসিনি। তবে দমদমের বাড়িতে আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। সেখানে বড্ড বেশি অশান্তি। আমার ভাদ্রবধূটি বাড়িটাকে নরক করে তুলেছে।

একদিন বীভৎস ঝগড়ার পর আমি ভাইকে ডেকে বললাম—পাড়ার পাঁচজনকে ডাকো, বাড়ি ভাগ হোক।

তাতে সুহাসের আপত্তি। সে বলে—ভাগাভাগি কিসের!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—বাবা চাইছেন তোমার আমার মধ্যে ভাগ করে দিতে।

সে বলল—তুমি তো আর এখানে থাকবে না! চলেই যাবে অন্য কোথাও তবে ভাগ করব কেন?

সুহাসের বউ তেড়ে এল—আপনার কোনও দাবি নেই। আপনি তো বাইরের লোক হয়ে গেছেন। আমরা থাকি, বাড়িতে আমাদের স্বত্ব বেশি।

কথাটা অযৌক্তিক, কিন্তু এত জোর দিয়ে বলল যে আমি খুব অসহায় বোধ করতে লাগলাম। আমার মাও, কেন জানি না, বাড়ি ভাগাভাগির বিরুদ্ধে। কেবল বাবা ভাগাভাগি চাইছেন এবং খুব মরীয়া হয়ে চাইছেন। কাজেই ফের ঝগড়া লেগে গেল।

নিমি আমাকে স্পষ্ট বলল—আপনার তো চরিত্র খারাপ। বিদেশে কি সব করে বেড়িয়েছেন তা কি আমরা টের পাইনি।

সুহাস নিমির পক্ষ নিয়ে বলে—তোমাকে তো ওদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই এসে ঘাড়ে পড়েছ। বেশি স্বত্ব-টত্ব দেখিও না, খারাপ হয়ে যাবে। এ পাড়ায় এখনও আমার এক

ডাকে দুশো লোক চলে আসবে।

সুহাসের কথা শুনে খুব অবাক হই না। এরকমটাই আশা করছিলাম এতদিন। আর কথাটাও ঠিক, এ পাড়ায় ওর বেশ হাঁক-ডাক আছে।

এরকম কুৎসিত পরিস্থিতিতেই ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি। ঝগড়া, মারামারি, পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা গালাগালি এ সবই আমাকে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করেছে বহুবার।

ভয়টয়ও বড় একটা হল না। শুধু ঠান্ডা গলায় সুহাসকে বললাম—বাড়ি ভাগ ঠেকাতে পারবে না। দরকার হলে আমি পুলিশকে খবর দেবো, বলবো যে তুমি আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছো।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! সুহাস আর তার বউ ঝগড়ার চোটে প্রায় নাচতে লাগল! সুহাস তড়পায়, পেছন থেকে নিমি তাতে সাহস দেয়। শক্তিদায়িনী নারী কাকে বলে জানলাম। দুজনেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, কাপড়-চোপড় গা থেকে খসে পড়ছে প্রায়।

এ বাড়ি ভাগ করা যে আমার কর্ম নয় তা বুঝলাম। ভীমরুল চাক বেঁধেছে, ঢিল মারলে রক্ষে নেই। বাবাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললাম—দেখছেন তো ওদের অ্যাটিচুড। বাড়ি ভাগ কি করে হবে?

বাবা অসহায়ভাবে বললেন—তুমি আলাদা বাসা করো।

সেই পুরানো কথা। বিরক্ত হয়ে বলি—সেটা সম্ভব নয়। আলাদা বাসা করলেও আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আমার একা থাকা দরকার।

বাবা চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন—বাবা প্রভাস, আমি সারা জীবন কখনও সুখে থাকিনি। গত জন্মের দোষ ছিল বোধহয়। তা এখন কি করতে বলো আমাকে? গলায় দড়ি দেবো?

আমি কিছু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকি।

বাবা বললেন—তুমি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছো দেখে বড় আশায় বুক বেঁধেছিলাম। বিশ্বাস ছিল তুমি আমাকে ফেলবে না। কিন্তু এখন—

আমি বললাম—তার চেয়ে কোনও হস্টেলে গিয়ে—

বলতে বলতে বুঝতে পারি, বিদেশের মতো তো আর এখানে বুড়ো-বুড়ির জন্য হোস্টেল নেই। বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—কোনও আশ্রমটাশ্রমে যদি বন্দোবস্ত হয় তাহলে?

বাবা মাথা নাড়লেন। চোখে বুঝি জল এসেছিল, সেটা মুছে নিয়ে বললেন—বুঝেছি। আপত্তি কি? তাই না হয় দেখ।

বাবাকে ভরসা দিয়ে বললাম—টাকা যা লাগে আমি কষ্ট করে হলেও দেবো'খন।

—সে জানি। দিও। তোমরা না দিলে গতি কি?

যোগাযোগ করে নানা মুরব্বি ধরে বাবার জন্য কাশীতে একটা বন্দোবস্ত হল। মাসখানেক আগে বাবা একখানা তোরঙ্গ আর শতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানা নিয়ে ট্রেনে চাপলেন।

মার জন্য খুব চিন্তা নেই। মা যেন কি ভাবে এই সংসারে প্রোথিত বৃক্ষের মতো রয়েই গেল। সাধারণত শাশুড়ির সঙ্গে বউদের অবনিবনা দেখা যায়। আমাদোর বাড়িতে উলটো নিয়ম দেখি। তার মানে এই নয় যে নিমিতে আর মাতে ঝগড়া হয় না। বরং খুবই হয়। কিন্তু সুহাসের বুঝি মায়ের প্রতি একটা টান আছে। বাড়িতে ঢুকে বিকট একটা 'মা' ডাক দেয় রোজ। আর একটা ব্যাপার হল, এ সংসারে হাজারো কাজে জান বেটে দেয়। বিনি মাগনা কেবল খোরাকি দিয়ে এমন বিশ্বস্ত ঝি-ই বা নিমি কোথায় পাবে। তাই ঝগড়াঝাটি হলে, মাকে ফেলতে চায় না। মায়েরও আবার সুহাসের ওপর টান বেশি। এ সব টানের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। সবচেয়ে অপদার্থ ছেলেটাকেই মা কেন ভালোবাসে তা বিশ্লেষণ করা বৃথা।

বাড়ির এই পরিস্থিতিতে যখন আমি বাড়ি ছাড়বো-ছাড়বো ভাবছি, সেই সময়ে মুমূর্ষু, পাঁচুদা একদিন আমাকে বললেন—তোর যখন বনছে না তখন আমার বাসাটায় গিয়ে থাক না কদিন। তালাবন্ধ পড়ে আছে।

বাঁচলাম হাঁফ ছেড়ে। শোনার পর আর অপেক্ষা করিনি। সে রাতটা ভালো করে ভোর হওয়ার আগেই পাঁচুদার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি।

ব্যাচেলার মানুষ পাঁচুদা। ঘরে রান্নাবান্নার সব বন্দোবস্ত রয়েছে। আসবাবপত্রও কিছু কম নেই। সারাজীবন নিজের শখ শৌখিনতার পিছনে অজস্র টাকা পয়সা ঢেলে গেছেন। টাকা পয়সা জমাননি বড় একটা। ঠকবাজেরাও লুটেপুটে নিয়েছে। ফ্ল্যাটে এসে শুনলাম ছ-মাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে। অথচ বাথরুমে গিজার, ঘরের মেঝেয় কার্পেট, রান্নাঘরে মিনি রেফ্রিজারেটার—কি নেই?

হাসপাতলে দেখা করতে গেলে পাঁচুদা বললেন—যদি আমি বেঁচে যাই তো আলাদা কথা, নইলে ওই ফ্ল্যাট তোকেই দিয়ে গেলাম। সব জিনিসপত্র শুদ্ধু।

আমি বললাম—অত কিছু বলার দরকার নেই পাঁচুদা। আপনি মরছেন না শিগগির। আপাতত কিছুদিন থাকার জায়গা পেলেই আমার যথেষ্ট।

বাড়িওয়ালাকে ছ'মাসের ভাড়া আমাকে শোধ করতে হল। লোকটা গণ্ডগোল শুরু করেছিল। টাকা পয়সা খরচ হল বটে, কিন্তু মোটামুটি একটা থাকার জায়গা পেয়ে বড় খুশি লাগল। দমদমের নরক থেকে তো দূরে আছি।

জ্যোতিষ নরেনবাবু কিন্তু মাস দুয়েক আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মাসখানেকের মধ্যে বাসস্থানের পরিবর্তন।

লোকটার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

সারাদিন প্রায়ই কাজ থাকে না। রান্নাবান্না করি, খাই। দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলের দিকে নরেনবাবু কিংবা পাঁচুদার ওখানে যাই। বন্ধু বান্ধব কেউ নেই। নিরালা, নির্জন সময় কাটে। বেঁচে থাকার অর্থ নেই।

এ বাড়ির দোতলা থেকে প্রায়ই একটা মেয়েকে নামতে উঠতে দেখি। চেহারাটা বেশ। বিয়ের বয়স হয়েছে তো বটেই, একটু বেশিই হয়েছে বুঝি। মাথায় সিঁদুর দেখি না। খুব সাজগোজ করে অফিসে যায়। তার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনও কেউ আসে না বড় একটা। মেয়েটা আমার মতোই একা কি?

ভেবে ভেবে একটু কেমন হয়ে গেল মনটা, দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে আমার মেয়েদের সম্পর্কে বাঙালিসুলভ লজ্জা সংকোচ হয় না। আবার কাউকে দুদিন দেখলেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্বলতাও নেই আমার। বরং মেয়েদের ব্যাপারে আমি এখন অতিশয় হিসেবি।

নীচের তলায় পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বড় একটা ইংরেজি কাগজের রিপোর্টার। অল্প ক-দিনেই আমার সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গেছে। তাঁর বউকে বউদি বলে ডাকি। মাঝে মধ্যে মাংস বা মাছ পাঠিয়ে দেন, কফি করে ডেকে নিয়ে খাওয়ান। দুজনেরই বয়স চল্লিশের ওপরে। রিপোর্টার ভদ্রলোকের নাম মধু মল্লিক। নিজের কাজে তাঁর বেশ সুনাম আছে। ইউরোপ, জাপান অনেকবার ঘুরে এসেছেন। নিজের কাজকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন। আর সেই কারণেই তাঁকে অনবরত বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়। গত কয়েকমাসে দেখলাম, মধু মল্লিক একবার দিল্লি-বম্বে, একবার অরুণাচল প্রদেশ, একবার ওড়িশা ঘুরে এলেন। তা ছাড়া দিন রাত অফিসের গাড়িতে শহর চক্কর মারা তো আছেই। বলেন—ভাই, এই চাকরি করতে করতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে দুদিন ঘরে থাকতে হলে হাঁপিয়ে পড়ি। তাই ভয় হয়, রিটায়ার করলে এক হপ্তাও বাঁচব না।

বউদি সারাদিনই প্রায় একা। তিনটে ছেলেমেয়ে আছে যথাক্রমে চৌদ্দো, বারো আর তিন বছরের। ছোটোটি ছেলে, বড় দুটি মেয়ে। মেয়ে দুজন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে মডার্ন স্কুলে। নাচ গান শেখে, একজন ওরিগামি শেখে, অন্যজন ল্যাংগুয়েজ ক্লাস করতে রামকৃষ্ণ মিশনে যায়। বেশ ব্যস্ত তারা। ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বউদি খানিকটা নিঃসঙ্গ। আমাকে ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসেন। বেশ একটা মা-মা ভাব তার মধ্যে। মোটাসোটা গিন্নিবান্নি চেহারা। মুখে সর্বদা পান আর হাসি।

সে যাকগে। বউদির একটা সময় কাটানোর শখ আছে। স্বামী খবরের কাগজের রিপোর্টার, বউ পাড়ার যাবতীয় খবরের সংবাদ সংস্থা। পরিচয় হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমি এ পাড়ার যাবতীয় খবর জেনে গেছি। তার মধ্যে একটা খবরই কেবল বউদি ভালো করে জানেন না। সে হল ওপর তলার ওই মেয়েটির খবর।

দুঃখ করে বললেন—অলকার বড্ড ডাঁট, বুঝলেন। অসীমবাবুরা যেমন সোশ্যাল মানুষ ছিলেন, বোনটি ঠিক তেমন আনসোশ্যাল। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, নিজেকে নিয়ে ও রকম থাকে কি করে?

আমি বললাম—নিশ্চয়ই একা থাকতে ভালোবাসে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

বউদি হেসে বলেন—আপনি বিদেশে ছিলেন বলেই মেয়েদের একা থাকায় দোষ দেখেন না।

সে অবশ্য ঠিক। আমাকে স্বীকার করতেই হয়!

বউদি বললেন—একা কি আর সাধ করে আছে! স্বামী নেয় না, সে এক কথা। আবার শুনি মা বাপের সঙ্গেও বনিবনা নেই।

—দেখতে কিন্তু বেশ।

—হ্যাঁ। কিন্তু নাকটা চাপা। রঙও এমন কিছু ফর্সা নয়।

হাসলাম। মেয়েদের ওই এক দোষ। কাউকে সুন্দর দেখতে চায় না। একটু না একটু খুঁত বের করবেই।

বউদি বললেন—ওকে যে কেন সবাই এত সুন্দর দেখে বুঝি না। আমাদের কর্তাটিও প্রথম প্রথম ওকে দেখে মূর্ছা যেতেন।

আমি জিগ্যেস করলাম—মেয়েটি কেমন?

বউদি ভ্রূ কুঁচকে বলেন—ভালো আর কি! এ সব মেয়েরা আর কত ভালো হবে? তবু মিথ্যে কথা বলব না। এ বাড়িতে তেমন কিছু দেখিনি ওর। একা একা চুপচাপ থাকে। কারও দিকে লক্ষ করে না। বরং তিনতলার অবাঙালি পরিবারটা ভীষণ বাজে।

তবু অলকা সম্পর্কে খুব বেশি জানা গেল না। ওর স্বামী কে, কেন তার সঙ্গে ওর বনিবনা নেই, সে সব জানা থাকলে বেশ হত।

মধু মল্লিক একদিন জিগেস করেন—ও মশাই, চাকরি-বাকরি চান নাকি কিছু? আপনার তো বিদেশের টেকনোলজি জানা আছে।

আমি বললাম—কলকারখানার চাকরি করা আর পোষাবে না। ব্যবসা কিছু করতে পারি।

উনি তখন বললেন—জার্নালিজম করবেন? আপাতত একটা ফিচার লেখার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

রাজি হলাম। টাকার জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্য। গোটা দুই ফিচার লেখার বরাত পেয়ে ক-দিন বেশ ছোটাছুটি আর ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। প্রথম ফিচারটা ছিল কলকাতার হোটেলের ব্যবসার ওপর, দ্বিতীয় ফিচার ছিল যে সব ইন্ডাস্ট্রি এদেশে নেই সেগুলোর ওপর।

প্রথম ফিচারটির মাল মশলা সংগ্রহ করতে সারা কলকাতা চার-পাঁচদিন দাবড়ে বেড়াতে হল। তারপর একদিন বসে মধু মল্লিকের টাইপরাইটার নিয়ে এসে লেখা শুরু করলাম। গরম পড়েছে বড্ড। পাখা চালিয়ে ঘরের দরজা খুলে হাট করে বসে কাজ করছি, এমন সময়ে একজন লম্বা চওড়া লোককে ওপরতলায় উঠতে দেখলাম। প্রথমটায় কিছু সন্দেহ হয়নি, কিন্তু একটু বাদেই বউদি এসে এক কাপ চা রেখে বললেন—ভাই প্রভাসবাবু, একটু আগে একটা লোক—বেশ সুন্দর চেহারা অলকার ঘরে ঢুকেছে।

আমি বললাম—ভাই-টাই কেউ হবে।

—না মশাই, ভাই-টাই নয়।

—তবে?

—সেইটেই রহস্য।

—ওর স্বামী নয় তো!

—না, না। স্বামীদের হাবভাব অন্যরকম। এ লোকটাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। প্রেমে পড়েছে এমন চেহারা।

—যে খুশি হোক গে। আমি অবহেলাভরে বললাম।

বউদি বিরসমুখে বললেন—ভাবসাব ভালো নয়। একা অসহায় পেয়ে মেয়েটাকে যদি কিছু করে! আমাদের কর্তা থাকলে ঠিক ইন্টারফিয়ার করত। ওর খুব সাহস।

আমি পাত্তা দিলাম না। বউদি চলে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে লেখাটা তৈরি করছিলাম। প্রথম ফিচার বেরোবে খবরের কাগজে, একটু যত্ন নিয়ে কাজ করাই ভালো।

দুপুরবেলা যখন খাচ্ছি, তখন বউদি এসে শেষতম বুলেটিন দিলেন—লোকটা এখনও নীচে নামেনি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—তাতে কি?

বউদি হঠাৎ লাজুক স্বরে বললেন—ওপরতলায় একটু হুটোপাটির আওয়াজও পাচ্ছি।

আমি টেলিফোন তুলে নম্বরটা ডায়াল করলাম। বউদি অবাক হয়ে দেখছিলেন। তারপর হেসে কুটিপাটি।

অলকা

লন্ড্রিওয়ালা আমার একটি শাড়ি হারিয়েছে। মনটা ভীষণ খারাপ। লন্ড্রিওয়ালা অবশ্য বলেছে—পাওয়া যাবে, ভাববেন না। কিন্তু আমার ভরসা নেই। আজ সকালে গিয়ে লোকটাকে খুব বকাবকি করেছিলাম। প্রথমটা তেমন রা করেনি। তারপর হঠাৎ কথার পিঠে কথা বলতে শুরু করল। বলল—সব লন্ড্রিতেই ওরকম হয়। আমাদের নিয়ম যা আছে ওয়াশিং চার্যের দশগুণ ক্ষতিপূরণ নিয়ে যেতে পারেন।

আমি অবাক, বলে কি? ধোলাই তো মোটে তিন টাকার, তার দশগুণ হয় ত্রিশ টাকা। কিন্তু আমার চান্দেরি শাড়িটার দাম পড়েছিল একশো নব্বই, জয়দেব একটা একজিবিশন থেকে কিনে দেয়। খুব বেশি শাড়িটাড়ি জয়দেব আমাকে কিনে দেয়নি ঠিকই, কিন্তু যে ক-খানা কিনে দিয়েছিল তার কোনওটাই খেলো ছিল না। এসব ব্যাপারে ওর রুচিবোধ ছিল দারুণ ভালো।

শাড়িটার জন্য রাগে-দুঃখে আমি পাগল পাগল। বললাম—ইয়ার্কি করছেন নাকি? দুশো টাকার শাড়ি ক্ষতিপূরণ তিরিশ টাকা? আমি ক্ষতিপূরণ চাই না, শাড়ি খুঁজে দিন।

লন্ড্রিওয়ালাও মেজাজ দেখাল—হারানো শাড়ির দাম সবাই বাড়িয়ে বলে। ওসব আমাদের জানা আছে। যা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন, শাড়ি পাওয়া যাবে না। যা করবার করতে পারেন, যান।

শেষের ওই 'যান' কথাটাই আমাকে ভীষণ অবাক আর কাহিল করে দিল। লন্ড্রিওয়ালা লোকটার চেহারা ভীষণ লম্বা, কালো, গুন্ডার মতো, বয়সেও ছোকরা। কয়েকদিন কাচিয়েছি এ দোকানে, খুব একটা খারাপ ব্যবহার করেনি। আজ হঠাৎ মনে হল, এই ইতর লোকটাই বুঝি দুনিয়ার সেরা শয়তান। আমারই বা কি করার আছে? কি অসহায় আমরা! 'যান' বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

রাগে-দুঃখে ফেটে পড়ে আমি বললাম—যান মানে? কেন যাবো? আপনি যে কাপড়টা চুরি করে নেননি তার প্রমাণ কি? ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিলেই যদি অমন দামি একখানা কাপড় হাতিয়ে নেওয়া যায়—!

লোকটা বুক চিতিয়ে বলল—অ্যাঃ দামি কাপড়! আমরা ভদ্রলোকের ছেলে বুঝলেন! দামি জিনিস অনেক দেখেছি, ফালতু পার্টি নই।

দোকানের দু-একজন কর্মচারী মালিকের পক্ষে সায় দিয়ে কথা বলছে। খুব অসহায় লাগছিল আমার। এ সময় একজন জোরালো পুরুষ সঙ্গীর বড় দরকার হয় মেয়েদের।

একথা ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ যেন দৈববলে একজন ভদ্রলোক রাস্তা থেকে উঠে এলেন দোকানে। বেশ ভদ্র চেহারা, তবে কিছু রোগাভোগা। চোখেমুখেও বেশ দুঃখী বিনয়ী

ভাব!

লোকটা দোকানে ঢুকে কয়েক পলক আমাকে দেখে নিয়ে মাথা নীচু করে বলল—ট্রাবলটা কি?

শোনাবার লোক পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম। অবিরল ধারায় কথা বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে।

লোকটা শুনল। কথার মাঝখানে মাথাও নাড়ল! দোকানদার বাধা দিয়ে নিজের কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু লোকটা তাকে পাত্তা দিল না। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে টুনে একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল—হুঁঃ।

লোকটাকে আমার চেনা-চেনা ঠেকছিল প্রথম থেকেই। কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু তখন শাড়ি হারানোর দুঃখ আর লন্ড্রিওয়ালার অপমানে মাথাটা গুলিয়ে ছিল বলে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

লোকটা লন্ড্রিওয়ালার দিকে একটু ঝুঁকে খুব আস্তে, প্রায় ফিসফিস করে কি যেন বলল। লন্ড্রিওয়ালা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, দেখলাম।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছি। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছিল লোকটা যেন লন্ড্রিওয়ালার বন্ধু, আবার আমারও শুভানুধ্যায়ী।

খানিকক্ষণ ওইসব ফিসফাস কথাবার্তার পর হঠাৎ লন্ড্রিওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে বলল —দিদি, একটা শেষ কথা বলে দেব? আমি একশো টাকা দিতে পারি খুব জোর।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। যদিও আমার শাড়িটার দাম অনেক বেশি, তাহলেও সেটা তো অনেকদিন পরেছি। তা ছাড়া তিরিশ টাকার জায়গায় একশো টাকা শুনে একটা চমক লেগে গেল। তবু বেজার মুখ করে বললাম—তাও অনেক কম। তবু ঠিক আছে।

লন্ড্রিওয়ালা টাকা নিয়ে কোন গোলমান করল না, সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্রয়ার টেনে টাকা বের করে দিল। রসিদ সই করে দিলে লন্ড্রিওয়ালা লোকটিকে বলল—প্রভাসবাবু, আপনি সাক্ষী হিসেবে একটা সই করে দিন।

লোকটা সই করলে আমি নামটা দেখলাম। প্রভাসরঞ্জন। কোনও পদবি লিখল না।

বেরিয়ে আসার সময় প্রভাসরঞ্জনও এল সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তায় কাঠফাটা রোদ। এই সকালের দিকেই সারা দিনের অসহনীয় গরমের আন্দাজ দিচ্ছে। আমি ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে পরে নিলাম। এখন অফিস যাবো, তাই ট্রাম রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার আগে প্রভাসবাবুকে বললাম—আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি না এলে লোকটা টাকাটা দিত না।

প্রভাসবাবু মৃদু হেসে বললেন—আপনি কি টাকাটা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন?

আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। প্রশ্নটার মধ্যে একটু যেন খোঁচা আছে। বললাম—না। কেন বলুন তো!

—একটা শাড়ির সঙ্গে কত কি স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। শাড়ির দামটা তো বড় নয়।

আমি মৃদু হেসে বললাম—তাই। তা ছাড়া শাড়িটাও বড় ভালো ছিল।

প্রভাস মাথা নেড়ে বলেন—বুঝেছি। ও টাকা দিয়ে কি আর একটা ওরকম শাড়ি কিনবেন?

—কিনতে পারি। কিন্তু একরকম শাড়ি তো আর পাওয়া যায় না। দেখা যাক।

প্রভাসরঞ্জন আমার সঙ্গে ট্রাম রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন—শাড়িটা আপনাকে কে দিয়েছিল।

এবার আমি একটু বিরক্ত হই। গায়েপড়া লোক আমার দু-চোখের বিষ। বললাম—ওটা আমার খুব পারসোনাল ব্যাপার।

প্রভাসরঞ্জন আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে বললেন—আমি অবশ্য আন্দাজ করতে পারি।

করেছিস না হয় একটু উপকার, তা বলে কিছু নেওয়ার কি? পুরুষগুলো এমন বোকা হয়, কি বলব। তবু ভদ্রতা তো আর আমাদের ছাড়ে না। আমার আবার ওই এক দোষ, সকলের সঙ্গে প্রশ্রয়ের সুরে একটু কথা বলে ফেলি! তা ছাড়া, লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর আন্দাজটা সত্যিই হতে পারে বা।

বললাম—কি আন্দাজ করলেন?

প্রভাসরঞ্জন মৃদু স্বরে বললেন—আপনার স্বামী।

আমি একটু কেঁপে উঠলাম মনে মনে। কপালে বা সিঁথিতে আমি সিঁদুর দিই না। সম্পূর্ণ কুমারী চেহারা আমার। তা ছাড়া যে এলাকায় আছি সেখানকার কেউ আমাকে চেনে না। এ লোকটা জানল কি করে যে আমার একজন স্বামী আছে?

এবার একটু কঠিন স্বরে কথা বলাটা একান্ত দরকার। লোকটা বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলছে।

বললাম—আমার স্বামীর খবর আপনাকে কে দিল? আমার স্বামীটামি কেউ নেই।

লোকটা অবাক হয়ে বলে—নেই। তাহলে তো আমার আন্দাজ ভুল হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ! এরকম অকারণ আন্দাজ করে করে আর সময় নষ্ট করবেন না। পুরুষমানুষদের কত কাজ থাকে। পরের ব্যাপার নিয়ে মেয়েরা মাথা ঘামায়!

প্রভাসরঞ্জন কিন্তু অপমান বোধ করলেন না। বড্ড গরম আর রোদে ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন। একটা টার্কিশ রুমালে ঘাড় গলা মুছলেন। পরনে একটা পাজামা আর নীল শার্ট। শার্টের কাটছাঁট বিদেশি। বাঁ হাতে বড়সড় দামি ঘড়ি। চেহারা দেখে স্বচ্ছল মনে হয়।

অপমান গায়ে না মেখে প্রভাসরঞ্জন বললেন—আমি আপনার ফ্ল্যাটের নীচের তলায় থাকি। আপনি তো ঠিক চিনবেন না আমাকে। পাঁচুবাবু নামে যে বুড়ো ভদ্রলোক

হাসপাতালে গেছেন আমি তাঁরই ফ্ল্যাটে—

আমি হাসলাম। বললাম—ও, ভালোই তো। আমি অবশ্য ও বাড়ির কারও সঙ্গে বড় একটা মিশি না।

—ভুল করেন।

—কেন?

—মেশেন না বলেই আপনাকে নিয়ে লোক চিন্তা ভাবনা করে নানা গুজব রটায়।

আমি তা জানি। রটাবেই, বাঙালির স্বভাব যাবে কোথায়? বললাম—আমি ভুল করি না, ঠিকই করি। ওদের সঙ্গে মিশতে আমার রুচিতে বাধে।

প্রভাসরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন—সেটা হয়তো ঠিকই। তবে আমি অন্য ধাতুতে গড়া, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

উনি কার সঙ্গে মিশেছেন, কেন মিশেছেন সে সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। পার্ক সার্কাসের ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে আমি সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে পার্কের দিকে চেয়ে থাকি। একটা কাক বুঝি ডানা ভেঙে কোন খন্দে পড়েছে, তাকে ঘিরে হাজারটা কাকের চেঁচামেচি। কান ঝালাপালা করে দিল। তবু কাকের মতো এত সামাজিক পাখি আমি আর দেখিনি। ওদের একজনের কিছু হলে সবাই দল বেঁধে দুঃখ জানাতে আসে। মানুষের মধ্যে কাকের এই ভালোটুকুও নেই।

ট্রামের কোনও শব্দ পাচ্ছি না। বললাম—তাই নাকি?

এই 'তাই নাকি' কথাটা এত দেরি করে বললাম যে প্রভাসরঞ্জন একটু অবাক হয়ে বললেন—কিছু বললেন?

আমি বললাম—কিছু না।

প্রভাসরঞ্জন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। রোদ গরম, সব উপেক্ষা করে। আজকাল প্রায়ই পুরুষেরা আমার প্রেমে পড়ে যায়। এঁর সম্পর্কেও আমার সেই ভয় হচ্ছে। বেচারা।

একটু ভদ্রতা করে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম—লন্ড্রিওয়ালা কি আপনার চেনা?

—না তো! বলে ফের বিস্ময় দেখালেন উনি।

আমি বলি—আপনার কথায় লোকটা তাহলে মাজিকের মতো পালটে গেল কেন?

—ওঃ! সেও এক মজা। ওর দোকানে আমিও কাচাতে-টাচাতে দিই, সেই সুবাদে একটু চেনা। একবার একটি প্যান্টের পকেটে ভুলে আমার পাসপোর্টটা চলে গিয়েছিল। সেইটে দেখে ও হঠাৎ আমাকে সমীহ করতে শুরু করে।

—পাসপোর্ট! আপনি বিদেশে ছিলেন নাকি?

—এখনও কি নেই? গোটা পৃথিবীটাই আমার বিদেশ।

ট্রাম কেন এখনও আসছে না এই ভেবে আমি কিছু অস্থির হয়ে পড়লাম। কারণ, আমার মনে হচ্ছিল, এ লোকটা পাগল। এর সঙ্গে আমি এক বাড়িতে থাকি ভাবতেও খুব স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

প্রভাসরঞ্জন হাতের মস্ত ঘড়িটা দেখে কিছু উদবিগ্ন হয়ে বললেন—আপনার ট্রাম তো এখনও এল না। অফিস ক-টায়?

আমি বললাম—দশটায়। তবে দশ-পনেরো মিনিট দেরি করলে কিছু হবে না।

ব্যথিত হয়ে প্রভাসরঞ্জন বলল—ওটা ঠিক নয়। দশ পনেরো মিনিট দেরি যে কী ভীষণ হতে পারে।

আমি হেসে বললাম—কী আর হবে! সকলেরই একটু দেরি হয়। ট্রাম বাসে সময়মতো ওঠাও তো মুশকিল।

—হুঁ! প্রভাসরঞ্জন বললেন,—তার মানে কোথাও কেউ একজন দেরি করছে, সেই থেকেই দেরিটা সকলের মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে। ধরুন একজন স্টার্টার বাস ছাড়তে দেরি করল, ড্রাইভারও একটা পান খেতে গিয়ে দু মিনিট পিছোলো, বাস দেরি করে ছাড়ল, সেই বাস ভরতি অফিসের লোকেরও হয়ে গেল দেরি। এই রকম আর কি। একজনের দেরি দেখেই অন্যেরা দেরি করা শিখে নেয়।

আমি হাসছিলাম।

উনি বললেন—কি করে অবস্থাটা পালটে দেওয়া যায় বলুন তো!

—পালটানো যায় না। ওই বুঝি আমার ট্রাম এল—

—হ্যাঁ। কিন্তু খুব ভিড়, উঠতে পারবেন না।

ভিড় ঠিকই। ট্রাম বাসের একটু দেরি হলেই প্রচণ্ড ভিড় হয়। তবে আমার অভ্যাস আছে।

—চলি। বলেই ট্রামের দিকে এগোই।

প্রভাসরঞ্জন হঠাৎ আমার পিছন থেকে অনুচ্চস্বরে বললেন—সেদিন দুপুরে কে একটা লোক আপনার ঘরে ঢুকেছিল বলুন তো, আপনার স্বামী?

কথাটা শুনে আমি আর ঘাড় ফেরালাম না; শুনিনি ভান করে ভিড়ের ট্রামে ধাক্কাধাক্কি করে উঠে গেলাম ঠিক।

আমার কোনওদিনই তেমন ঘাম হয় না, ইসিনোফিলিয়া আছে বলে প্রায় সময়ই বরং আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ শীত করে ওঠে। কিন্তু আজ আমি অবিরল ঘামছিলাম। সারাদিন বড় বেশি অন্যমনস্কও রইলাম আমি। মনে হচ্ছে, লন্ড্রিতেও ওই লোকটার আসা, গায়ে পড়ে উপকার করা আর তার পরের এত সব সংলাপ এ সবই আগে থেকে প্ল্যান করে করা। এতদিন আমার জীবনটা যত নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন ছিল

এখন যে আর ততটা নয় তা বুঝতে পেরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এরা বা এই লোকটা অন্তত আমার বিয়ের খবর রাখে।

সাত দিন কেটে গেছে, প্রভাসরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় বা নামবার মুখে পাঁচুবাবুর বাইরের ঘর থেকে খুব টাইপ রাইটারের আওয়াজ পাই। দরজা ভেজানো থাকে, কাউকে দেখা যায় না। আমিও তো আবার সিঁড়ির গোড়ায় বেশিক্ষণ থাকি না। বরং ভূতের ভয়ে কোনও জায়গা দিয়ে যেতে যেমন গা ছমছম করে, তেমনি একটা ভাব টের পাই। তাই সিঁড়ির মুখটা খুব হালকা দ্রুত পায়ে পেরিয়ে পক্ষিণীর মতো উড়ে যাই।

আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি আজকাল। বাইরের দরজাটায় সব সময় ল্যাচকি তে চাবি দিয়ে রাখি। স্পাই হোল দিয়ে না দেখে আর নাম ধাম জিগ্যেস না করে বড় একটা দরজা খুলি না। অবশ্য আমার ঘরে আসবেই বা কে? শুধু ঝি আসে।

একদিন আমার দাদা অভিজিৎ এল। সে বরাবর রোগা দুর্বল যুবক, শীত গ্রীষ্মে গলায় একটা সুতির কম্ফর্টার থাকবেই। ঠান্ডা জলে স্নান করতে পারে না, সারাবছর তার সর্দি থাকে। ডাক্তার বলেছে এ রোগ সারার নয়।

সকালবেলায় দাদা এসে ঘরে পা দিয়েই ঝগড়া শুরু করল—এ তুই শুরু করেছিস কি বল তো! আমাদের পরিবারটা মডার্ন বটে কিন্তু তুই যে সব লিমিট ছাড়িয়ে গেলি!

রাগ করে বললাম—ও কথা বলছিস কেন? একা থাকি বলে যত খারাপ সন্দেহ, না?

—বটেই তো। জয়দেবের সঙ্গে না থাকিস আমরা তো রয়েছি। এ দেশের সমাজে একা থাকে কোন মেয়ে?

—আমি থাকব।

—না, থাকবি না। তোর ঝাটিপাটি যা আছে গুছিয়ে নে, আমি ট্যাকসি ডাকি।

নিজের বাড়ির কোনও লোককেই আজকাল আমার সহ্য হয় না। ওরা আমাকে স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করতে শেখায়নি। সেটা আজকাল আমি বড় টের পাই। চারিদিকে যখন স্বামী-স্ত্রীর বসবাস দেখি তখনই আমার মনে হয়, আমারই যেন কি একটা ছিল না, হয়তো সইবার শক্তি বহনের ক্ষমতা, যা না থাকলে বিবাহিত জীবন বলে কিছু হয় না।

আমি দাদার জন্য চা করতে গিয়ে মনটাকে শক্ত করলাম খুব।

ফিরে এসে বললাম—জয়দেব বা আর কারও সঙ্গে আমি থাকবো না।

—জয়দেবেরই বা দোষটা কি?

—যাই হোক। সব কি তোকে বলতে হবে নাকি?

কথায় কথায় ঝগড়া লেগে গেল। দাদা খুব জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। এই সময় ফোনটা আবার বাজল। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার কানে তুলতেই সেই ধীর গম্ভীর গলা বলল —আপনার ঘরে লোকটা কে?

আমি ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললাম—আসুন না প্রভাসবাবু একটু হেলপ করবেন। এ লোকটা আমার দাদা, বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

টেলিফোনে গলাটা শুনেই আজ আমি লোকটাকে চিনে ফেলেছি। কথা কটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশে হাসি শোনা গেল। প্রভাসরঞ্জন বললেন—বড্ড মুশকিল হল দেখছি। চিনে ফেললেন! দাদা কি বলছেন?

—ফিরে যেতে।

—তাই যান না।

—আমি যাবো না।

—জয়দেববাবুর তো কোনও দোষ নেই।

—আপনি সেটা জানলেন কি করে?

—খোঁজ নিয়েছি! ইন ফ্যাকট আমি জয়দেববাবুর সঙ্গে দেখাও করেছি ক-দিন আগে।

—মিথ্যে কথা।

—না, মিথ্যে নয়। আমি এখন একটা ডেইলি নিউজ পেপারের স্পেশাল রিপোর্টার। মধু মল্লিক যে কাগজে কাজ করেন।

—তাতে কি?

—সেই কাগজের তরফ থেকে স্মল স্কেল আর কটেজ ইন্ডাস্ট্রির একটা সারভে করেছিলাম। জয়দেববাবু ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক।

—আমার কথা উঠল কি করে?

—উঠে পড়ল কথায় কথায়।

দাদা এসে এ ঘরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ফোনের কথা শুনছে! একবার চোখের ইশারা করে জিজ্ঞেস করল—কে?

আমি হাত তুলে ওকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে ফোনে বললাম না, আপনিই আমার কথা তুলেছিলেন।

—তাই না হয় হল, ক্ষতি কি?

—ক্ষতি অনেক। তার আগে বলুন, আপনার এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট কেন?

প্রভাসরঞ্জন কিছু গাঢ় গলায় ইংরেজিতে বললেন—বিকজ আই হ্যাভ অলসো লস্ট সাম অফ মাই হিউম্যান পজেসনস।

ফোন কেটে গেল।

দাদা বলল—কে রে?

—একজন চেনা লোক।

দাদা গম্ভীর হয়ে বলল—চেনা লোক! বাঃ বেশ। চেনার পরিধি এখন পুরুষ মহলে বাড়ছে তাহলে।

আমি ছোট্ট করে বললাম—বাড়লে তোর কি?

—আমার অনেক কিছু। সে থাকগে, এ লোকটা তোকে কি বলছিল?

আমি হঠাৎ আক্রোশে রাগে প্রায় ফেটে পড়ে বললাম—তোরা কেউ কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবি না!

দরজার কাছ থেকে প্রভাসরঞ্জন বললেন—শান্তিতে কি এখনই আছেন? যান তো, একটু চা করে এনে খাওয়ান।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম লোকটার সাহস দেখে।

প্রভাসরঞ্জন

পাঁচুদাকে দেখেই বুঝি যে লোকটার হয়ে গেছে। ব্যাচেলার মানুষ আত্মীয়স্বজন বলতেও কাছের জন কেউ নেই, মরলে কেউ বুক চাপড়াবে না, অনাথা বা অনাথ হবে না কেউ। সেই একটা সান্ত্বনা। তবু একটা মানুষ ছিল, আর থাকবে না, এটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। বলতে কি পাঁচুদার জন্য বেশ দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম।

ব্যাচেলারদের বেশি বয়সে কিছু না কিছু বাতিক হয়ই। সম্ভবত কামের অচরিতার্থতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি মিলেমিশে তাদের বায়ুগ্রস্ত করে তোলে। পাঁচুদারও তাই হয়েছিল। চিরকাল তাঁর দূর সম্পর্কের যত আত্মীয়স্বজন তাঁর কাছ থেকে পয়সাকড়ি বা জিনিসপত্র হাতিয়েছে। ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসী জ্যোতিষেরাও কাজ গুছিয়েছে কম নয়। পাঁচুদা কয়েকবারই জোচ্চারদের পাল্লায় পড়ে ব্যবসাতে নেমে ঠকে এসেছেন। তাঁর বাপের কিছু টাকাও তিনি পেয়েছিলেন, চাকরির বেতন তো ছিলই, সব মিলেই বেশ শাঁসালো খদ্দের। লোকে ঠকাবে না কেন? প্রতি বছর মাসখানেক ধরে তীর্থ ভ্রমণ করতেন। ভারতবর্ষের এমন জায়গা নেই যেখানে যাননি। শেষ বয়সটায় বেশ কষ্ট পেলেন।

আমার মধ্যে একটা পাপবোধ ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় যখন প্রচণ্ড অভাবের সময় চলছিল তখন এই পাঁচুদা বেশ কয়েকবার আমাদের অনাহার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের একটা মতলববাজ মনোভাব জন্মায়। পাঁচুদা মানেই হচ্ছে আদরের জায়গা। তাই পাঁচুদা আমাদের বাড়িতে এলেই আমরা খুশি হতাম, যখন তখন তাঁর বাসা বা অফিসে গিয়ে নানা কাঁদুনি গেয়ে পয়সা আদায় করেছি। আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফি তিনিই দেন। আর, আমি তাঁর একটা সোনার বোতাম চুরি করেছিলাম।

এ সব কথা তাঁকে আর বলার মানে হয় না। তবু যখন শ্যামবাজারের আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে এক কঙ্কালসার চেহারাকে দেখি তখনই সেইসব পাপের

কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। নিজেকেই বলি—প্রভাসরঞ্জন পাপের কথা স্বীকার করে নাও, খ্রিস্টানরা যেমন যাজকদের কাছে করে।

আমার কথা শুনে পাঁচুদা হেসে বললেন—যা যা জ্যাঠা ছেলে, চুরি করেছিস বেশ করেছিস। সেই চুরির বোতাম আজ তোকে দান করে দিলাম, যা।

ক্যানসারের কষ্ট তো কম নয়। শরীর শুষে ছিবড়ে করে ফেলেছে প্রতিনিয়ত। কিছু খেতে পারেন না। যা খান তা উঠে আসে ভেতর থেকে। ক্রমশ শরীর ছেড়ে যাচ্ছে তাঁর সব শক্তি। এখন কঙ্কালসার হাতখানা তুলতেও তাঁর বড় কষ্ট। মাঝে-মাঝে দেখি বুকের কম্বলটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদেন। সে কান্নাও অতি ক্ষীণ। যেমন পাঁজরের খাঁচা থেকে এক বন্দি ভোমরার গুঞ্জনধ্বনি উঠে আসে।

পত্রিকা অফিস থেকে আজকাল প্রায়ই নানা জায়গায় পাঠায়। আর দু-এক মাসের মধ্যেই আমাকে পাকা চাকরিতে নেওয়া হবে। সাংবাদিকের এই চাকরি আমার খুব খারাপ লাগছে না। কিন্তু সব সময়ে একটা এই দুঃখ, আমি নানা দেশ ঘুরে যে প্রযুক্তি শিখেছি তা কোনও কাজে লাগল না। জীবনের দশ-দশটা বছর আমি বৃথা অন্বেষণে কাটিয়ে এসেছি। আয়ুক্ষয়।

সুইজারল্যান্ডে আমাদের কারখানা দেখতে সেবার এক জাপানি প্রতিনিধি দল এল। বেঁটে বেঁটে চেহারার হাস্যমুখ, বুদ্ধির আলোজ্বলা ছোট ছোট চোখের মানুষ। প্রত্যেকেই বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তাদের দেশে। কারখানা দেখার অনুমতি চাইল। ওপরওয়ালা আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে ডেকে ওদের কারখানা দেখাতে বলে দিলেন। অনুমতি পেয়ে জাপানিদের চেহারা ধাঁ করে পালটে গেল। পরনের স্যুট খুলে ওভারঅল পরে নিল সবাই, খাতা-পেনসিল-পেন-কম্পাস সাজিয়ে নিল। তারপর প্রতিটি যন্ত্র আর যন্ত্রাংশের মধ্যে ওরা কালিঝুলি মেখে ঢুকে যেতে লাগল। ভালো করে লাঞ্চ পর্যন্ত করল না। ভূতের মতো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের সমস্ত রহস্য জেনে নিতে লাগল। পর পর সাত দিন এক নাগাড়ে তারা কারখানাটিকে জরিপ করতে লাগল। শেষ দিকে ওদের চলাফেরা যন্ত্রের ব্যবহার এবং কথাবার্তায় হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি এ কারখানায় এতকাল থেকেও যে সব রহস্য জানি না ওরা অল্প দিনেই তা সব জেনে গেছে।

জাপানিরা দেশে ফিরে যাওয়ার দু বছরের মধ্যে জাপান থেকেই বিশ্বের বাজারে কম্প্রেসর মেশিন ছাড়া হল। সুইস কম্প্রেসরের চেয়ে তা কোনও অংশে খারাপ তো নয়ই, বরং দামে অনেক সস্তা। এমনকী ওরা সুইস-যন্ত্রের নকল করেছে বলেও মনে করবার কারণ নেই। যন্ত্রের মৌল রহস্যটা জেনে গিয়ে ওরা ওদের মতো যন্ত্র বানিয়েছে।

এ ঘটনার বছর খানেকের মধ্যেই একটি ভারতীয় প্রযুক্তিবিদের দল সুইজারল্যান্ডে যায়। ব্যল-এ এসে তারা আমাদের কারখানাতেও হানা দিয়েছিল। স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকদের তুমিই এসকর্ট করে নিয়ে কারখানা দেখাও।

ভারতের লোক এসেছে শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করি। দলে একজন বাঙালিও ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে তিনি একটু অবাক হলেন। কিন্তু তিনি দেশে খুব বড় চাকরি করেন, আর আমি এ কারখানার একজন স্কিলড লেবার মাত্র। তাই তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি করলেন না, একটু আলগা আলগা ভালোবাসা দেখালেন।

মোট ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাঁরা অত বড় কারখানাটার হাজারো যন্ত্রপাতি দেখে ফেললেন। যাই দেখাই তাই দেখেই বলেন—ওঃ, ভেরি গুড। হাউ নাইস! ইজ ইট! যন্ত্রপাতি তাঁরা ছুঁয়েও দেখলেন না। তারপর ম্যানেজারের ঘরে বসে কফি খেয়ে চলে গেলেন। পরে স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকেরা এত অল্প সময়ে এতবড় প্রোজেক্টের সব বুঝে ফেলল?

তখন আমি ঠিক করেছিলাম এরা যা করেনি তা আমাকেই করতে হবে। তারপর কিছুদিন আমি একা একা পুরো যন্ত্রপাতির নকশা কপি করতে শুরু করি। এমনিতেই ভূতের মতো খাটুনি ছিল, তার ওপর বাড়তি খাটুনি যোগ হল। হয়তো পেরেও যেতাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার ভিতরকার সব উৎসাহ নিভে যায়। তবু যা শিখেছিলাম, যা কপি করেছিলাম তাও বড় কম নয়। যে কোনও ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে আমার প্রযুক্তির ধারণা অনেক প্রাঞ্জল এবং বাস্তব। আমি হাতে-কলমে যন্ত্র চালিয়েছি। যন্ত্রের সব চরিত্রই আমার জানা। এখনও ভারী কম্প্রেসর মেশিনের যে কোনও কারখানায় আমার অভিজ্ঞতা অসম্ভব রকমের কার্যকরী হতে পারে।

কিন্তু তা হল না। আমি এখন নানা চটুল বা রাশভারী বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে ফিচার লিখছি। লিখতে আমার খারাপ লাগে না ঠিকই, কিন্তু সব সময়েই আমার অধীত বিদ্যার অপচয়ের জন্য কষ্ট হয়। যা কষ্ট করে শিখে এসেছি তা এ দেশে কাজে লাগল না। অবশ্য আমি এখানকার কলকারখানায় চাকরি করতে আর উৎসাহীও নই। আমি চেয়েছিলাম নিজেই একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করব।

এখন টাইপ রাইটারের খটখটানির মধ্যে এক রকমের নতুন জীবনের খবর পেয়ে যাচ্ছি। মধু মল্লিক এসে প্রায়ই খবর দেন, আমার ফিচারগুলো কাজের হচ্ছে।

মধু মল্লিক একদিন এসে বললেন—কস্ট অফ প্রোডাকশন কমিয়ে আনার ব্যাপারে আপনার ফিচারটা সাঙঘাতিক হয়েছে। কিন্তু প্রভাসবাবু, আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার কটেজ আর স্মল স্কেল। শুধু হেভি ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে এদেশের ইনকাম স্টেবল করা যাবে না। আপনি কি এ কথা মানেন?

আমি মানি। মধু মল্লিকও মানেন দেখে খুব খুশি হলাম। বললাম—কটেজ বা স্মল স্কেল না থাকলে দেশের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। এ আমি স্বীকার করি তা ছাড়া এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক ওই সব নিয়ে আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওটার খুবই দরকার।

—লিখুন না এবার স্মল আর কটেজ নিয়ে। মধু মল্লিক বললেন, কাজ সহজ নয় তবে আমার অফিস থেকে প্রচুর সাহায্য করা হল এ ব্যাপারে! কুটিরে এবং ছোট ছোট শিল্পের ওপর পত্রিকা চারটে সিরিয়াল ছাপাবে। আমাকে সে জন্য গোটা পশ্চিমবাংলার গাঁয়ে-গঞ্জে চলে যেতে হল। সরকারি লোকদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা সাক্ষাৎও করতে হল মেলা।

এই করতে গিয়েই জয়দেবের সঙ্গে দেখা বাঁকুড়ায়। ভারি দুঃখী চেহারার লোক এবং খুবই ভালোমানুষ! ডক্টরেট হয়েছেন সম্প্রতি, জানেনও বিস্তর। একখানা নতুন বই লিখেছেন ফোক আর্ট সম্পর্কে। কথায় কথায় বিয়ের কথা উঠতে আমি বলেছিলাম—আমার বউ-ছেলে সব পর হয়ে গেছে। সেই ভ্যাকুয়ামটা পূর্ণ করতে এখন আমার অনেক কাজ চাই। নইলে একা হলেই ভূতে পায়।

জয়দেব আমার হাত চেপে ধরে বললেন—আমার কেসও আপনার মতো। আমার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু বউ ছিল। প্রায় বিনা কারণে সে আমাকে ছেড়ে গেছে।

যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত। অলকার স্বামীকে যে এত সহজে দুম করে খুঁজে পাবো কখনও ভাবিনি। পরিচয় বেরিয়ে পড়তে যখন অলকার খবর দিলাম তখন জয়দেব হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করল—ও কি আবার বিয়ে করবে?

—না, না।

—ওকে বলবেন, মেয়েদের দুবার বিয়ে হতে নেই। সেটা খুব খারাপ। ও আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমাদের পরিবারে মস্ত ঝড়ের ধাক্কা গেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো কখনও সমাজ বা পরিবারের পারসপেকটিভে দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবে না। যদি ভাবত তাহলে অলকা অত সহজে ছেড়ে যেতে পারত না। অপছন্দের স্বামীকেও মানিয়ে নিত। আর এও তো সত্যি যে, আজকের অপছন্দের লোক কালই প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারে, যেমন আজকের প্রিয়জন হয়ে যায় কাল দু-চোখের বিষ!

সত্যি কথা। সহ্য করা বা বহন করা আজকের মানুষের ধাতে নেই। অপছন্দের জিনিস তারা খুব তাড়াতাড়ি বাতিল করে দেয়। নতুন জিনিস নিয়ে আসে। আর এইভাবে তাদের স্বভাব হয়ে উঠেছে পিছল ও বিপজ্জনক।

আমি বললাম—আপনি কি এখনও অলকাকে ভালোবাসেন?

কেমন একরকম লোভী শিশুর মতো তাকাল জয়দেব। অনেকক্ষণ বাদে মাথা নেড়ে বলল—তাতে কি যায় আসে! ও তো আমাকে ভালোবাসে না!

আমি চিন্তা করে বললাম—দেখুন, ভালোবাসাটা সব সময়েই তো আর হুস করে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মতো বেরোয় না। ওটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। ভালোবাসার চেষ্টা থেকেই ভালোবাসা আসে।

—সে হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টারও অভাব রয়েছে। তিলমাত্র মমতা থাকলে তাকে বাড়িয়ে বিরাট ভালোবাসা জন্মাতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই তিলমাত্রও

নেই।

আমি ভাবিত হয়ে পড়ি। এবং ফিরে আসি।

কলকাতায় এসেই একটু ঝামেলায় পড়ে গেলাম।

একদিন অনেক রাত অবধি টাইপ মেশিন চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি। ভোর রাতে ঘুম ভাঙাল সুহাস।

দরজা খুলে তাকে দেখে খুব খুশি হই না, বললাম—কি রে, কি চাস?

—মার খুব অসুখ। এখন-তখন। কি করব?

শরীরে একটা ধনুকের টংকার বেজে উঠল। মা!

কথা আসছিল না মুখে। অবশ হয়ে চেয়েছিলাম, সুহাস বলল—কিছু টাকা দাও।

—টাকা দেবো? অবাক হয়ে বলি—টাকা দেবো সেটা বড় কথা কি! আগে গিয়ে মাকে একটু দেখি! তুই ট্যাক্সি ডাক তো—

বলে আমি ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পরছিলাম। সুহাস ট্যাক্সি আনতে যায়নি, দরজার কাছে দোনো মোনো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়তে বলল—তুমি বিশ্রাম নাও না। এক্ষুনি যাওয়ার দরকার নেই খুব একটা। অবস্থা যতটা খারাপ হয়েছিল ততটা এখন নয়। তুমি দু-চারদিন পরে যেও।

ওর কথা বুঝতে পারছিলাম না একদম। কি আবোল-তাবোল বলছে? এই বলল খারাপ অবস্থা, আবার বলছে তত খারাপ নন। কেমন একটু সন্দেহ হল মনে। বললাম—তোর মুখে সত্যি কথা-টথা আসে তো ঠিক?

—বাঃ, মিথ্যে বলছি নাকি?

—মার অসুখ, তা আমাকে যেতে বারণ করছিস কেন?

—তোমার অসুবিধের কথা ভেবেই বলেছি। যাবে তো চলো।

—ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়, আমি যাবো।

দমদমের বাসার কাছে এসে যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছি তখন সুহাস 'এই একটু আসছি' বলে কোথায় কেটে পড়ল। বাড়িতে ঢুকে দেখি মা পিছনের বারান্দায় বসে কুলোয় রেশনের চাল বাছছে।

আমি গিয়ে মার কাছে বসতেই মা কুলো ফেলে আমাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বলল—ওরা বলে তুই নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছিস! কোন এক বিধবা না সধবার সঙ্গে নাকি তোর বিয়ে সব ঠিক?

আমি স্তম্ভিত হয়ে মাকে দেখি। অনেকক্ষণ বাদে বলি—তোমার কি হয়েছে? শুনলাম তোমার খুব অসুখ।

:—হলে বাঁচি বাবা। সে অসুখ যেন আর ভালো না হয়। কিন্তু গতরে তো অসুখও একটা ধরে না তেমন।

—সুহাস আজ সকালে গিয়ে তোমার অসুখের নাম করে টাকা চেয়েছিল।

মা হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলে—ওর অবস্থা খুব খারাপ বাবা, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তাই বোধহয় একটি ফিকির করেছিল।

রান্নাঘর থেকে নিমি খুব হাসিমুখে এককাপ চা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল—দাদাকে কতদিন বাদে দেখলাম! খুব ব্যস্ত শুনি!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—সুহাস কোথায় গেল বউমা?

—এসে পড়বে এক্ষুনি। বসুন না।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—ও আসবে না, আমি জানি। বউমা তুমি মার কাপড় চোপড় যা আছে গুছিয়ে দাও। আমি মাকে নিয়ে যাবো।

মা শুনে কেমন ধারা হয়ে গিয়ে বলল—সে কি কথা বলিস! এখন আমি কোথায় যাবো?

আমি চড়া গলায় বললাম—যেতেই হবে। এখানে তোমার গুণের ছেলে তোমাকে ভাঙিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চলেছে যে! কত বড় সাহস দেখেছো!

অমনি নিমি ঘর থেকে তেড়ে এসে বলল—বেশি বড় বড় কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি। আপনার কীর্তি অনেক জানি!

দুচার কথায় প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে গেল। পাড়ার লোক এসে জুটতে লাগল চারদিকে।

আমি মাকে বললাম—মা, তোমাকে যেতেই হবে। এ নরকে আর নয়।

বোধহয় আমাকে ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাতেই মা উঠে গিয়ে একটা টিনের তোরঙ্গ গুছিয়ে নিল। আমি মাকে নিয়ে চলে এলাম।

কয়েকদিন মন্দ গেল না। মা রান্না-বান্না করে, আমি কাজে যাই। মধু মল্লিকেরা সবাই মার দেখাশুনা করে। এমনকী অলকা পর্যন্ত খোঁজ-খবর নিয়ে যায়। কিন্তু এতসব ভদ্রলোক এবং লেখাপড়া জানা পরিবেশে থাকা মার অভ্যাস নেই। সব সময় তটস্থ ভাব, মাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অবশ্য আমার ছিল না, দিনরাত ঘুরি, রাত জেগে ফিচার টাইপ করি।

দিন পনেরো পরে মা একদিন মিনমিন করে বলল—প্রভাস, একবার বরং দমদম থেকে ঘুরে আসি।

গম্ভীর হয়ে বলি—কেন?

মা ভয় খেয়ে বলে—সুহাস আর নিমি যেমনই হোক ওদের ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না।

আমি বললাম—মা, সুহাস আর নিমি তোমার ওপর কেমন নির্যাতন করে বল তো! মারে না কি?

মা শ্বাস ফেলে বলে—অমানুষের সব দোষ থাকে বাবা। মাকে মারবে সে আর বেশি কথা কি?

—তবু যেতে চাও?

—ওদের কাছে যেতে চাইছি নাকি! ওই যে ছেলেমেয়েগুলো, ওরা যে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে আমার জন্য কাঁদে।

—কাঁদবে না, অভ্যাস হয়ে যাবে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তুই একটা বিয়ে কর। তখন এসে পাকাপাকিভাবে তোর কাছে থাকব।

আমি বললাম—বাবার কাছে যাবে মা? চাও তো বন্দোবস্ত করে দিই!

—যাবো বই কি! যাবোখন। শীতটা আসুক।

বুঝলাম এ জন্মের মতো সুহাসের হাত থেকে মার মুক্তি নেই। সুহাস যেমনই হোক, তার বংশধরেরা মার রক্তের স্রোত নিজের দিকে টেনে নিয়েছে? আর ফেরানো যাবে না।

মাকে একদিন ফের গিয়ে দমদমের বাড়িতে রেখে এলাম।

এই ঝামেলায় আর জয়দেবের কথা তেমন মনে ছিল না, কাজের চাপও ক্রমশ বাড়ছে।

হঠাৎ একদিন সাত সকালে জয়দেব নিজেই এসে হাজির।

অলকা

মেঘৈর্মেদূরম্বরম। কাল রাত থেকে বৃষ্টি ছাড়েনি। যেমন ভয়ংকর তেজে কাল রাত ন-টায় বৃষ্টি এল প্রায় ঠিক তেমনি তেজে সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়লো। ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, কলকাতা ভেসে যাবে।

একটা গোটা ফ্ল্যাটে সম্পূর্ণ একা থাকতে আমার যে ভয় ভয় করে তা মিথ্যে নয়। শোয়ার আগে বার বার দরজা জানালার ছিটকিনি দেখি, খাটের তলা, আলমারির পেছনে এবং আর যে সব জায়গায় চোর বদমাশ লুকিয়ে থাকতে পারে তা ভালো করে না দেখে শুই না। ভূতের ভয় ছেলেবেলা থেকেই ছিল না, তবে বড় হওয়ার পর কখনও কখনও কি যেন একটা ভূত ভূত ভয়ের ভাব হয়। বিশেষ করে যেদিন বৃষ্টি নামে। কাল সারা রাতের অঝোর বৃষ্টিতে বার বার জানালার শার্শিতে টোকা পড়েছে বৃষ্টির আঙুলে, দরজা ঠেলেছে উন্মত্ত বাতাস। ঝোড়ো বৃষ্টিতে কলকাতার ট্রামবাস ডুবে গেল বুঝি! শহরটা বোধহয় একতলা সমান জলের তলায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এমন বাদলা বহুকাল দেখিনি।

ঘুম ভেঙে একবার উঠে দেখি রাত দুটো। শীত-শীত করছিল। বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ কেন গা ছমছম করল! একটু শিউরে উঠে প্রায় দৌড়ে এসে বাতি না নিভিয়ে চাদর মুড়ি

দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতি জ্বালানো থাকায় ভয় ভয় ভাবটা কমল বটে, কিন্তু ঘুম আসে না। কোনওখানে মানুষের জেগে থাকার কোনও শব্দ হচ্ছে না। কুকুরের ডাক, বেড়ালের আওয়াজ কিছু নেই। ঘনঘোর মেঘ ডেকে ওঠে কেবল, বৃষ্টির জোর বেড়ে যায়, চারিদিক লন্ডভন্ড হতে থাকে। শুয়ে থেকে বুঝতে পারছিলাম, পৃথিবীতে একা হওয়ার মধ্যে কোনও সুখ নেই। একা মানুষ বড় নিস্তেজ, মিয়োনো।

নরম বালিশ বার বার মাথায় তাপে গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি বালিশ উলটে দিচ্ছি বার বার। বর্ষাকালের সোঁদা সোঁদা এক গন্ধ উঠছে বিছানা থেকে। কিছুতেই রাত কাটছে না।

এইভাবে রাত আড়াইটেয় বড় অসহ্য হয়ে উঠে বসলাম। বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল কারও সঙ্গে একটু কথা বলতে, কারও কথা শুনতে। কিন্তু আমার তো তেমন কেউ নেই।

জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। ব্যালকনির দিকে জানালায় শার্শির পাল্লা আছে, অন্যগুলোয় কাঠের পাল্লা। শার্শিতে চোখ রেখে দেখি ভূতের দেশের মতো অন্ধকার চারদিক। নীচের রাস্তায় পর পর আলোগুলোর মধ্যে দুটো মাত্র জ্বলছে এখনও। সেই আলোয় দেখা গেল, রাস্তায় হাঁটুজল। জলে প্রবল বৃষ্টির টগবগানি। আকাশ একবার দুবার চমকায়, গম্ভীর মেঘধ্বনি হয়। বড় একা লাগে।

আমার পরনে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত পোশাক। গায়ে কেবল ব্লাউজ, পরনে সায়া। রাতে এত বেশি গায়ে রাখতে পারি না। ঘরের বাতি জ্বালা রেখে এ পোশাকে জানালায় দাঁড়ানো বিপজ্জনক। কিন্তু ওই নিশুত রাতে কে আর দেখবে। আর মনটাও বড় অস্থির তখন। ঠান্ডা শার্শিতে গাল চেপে ধরে বিবশার মতো বাইরে তাকিয়ে থেকে থেকে আস্তে আস্তে জগৎসংসারের ওপর এক গভীর অভিমান জেগে উঠল। কেবল মনে হতে লাগল—তোমাদের কাছে আমার আদর পাওনা ছিল। কেন তোমরা কেউ কখনও আমাকে ভালোবাসলে না? বলো কেন...?

কখন কেঁদেছি আপনভোলা হয়ে। কাঁদছি আর কাঁদছি। আর কাকে উদ্দেশ্য করে যেন বিড়বিড় করে বলছি—এবার একদিন বিষ খেয়ে মরব, দেখো।

এ কথা বিশেষ কারও উদ্দেশ্যে বলা নয়। কাকে উদ্দেশ্য করে বলা তা সঠিক আমিও জানি না। তবে এই প্রচণ্ড বৃষ্টির রাতে যখন চারদিকের সব নাগরিকতা মুছে গিয়ে অভ্যন্তরের বন্যতা বেরিয়ে আসে, যখন মনে হয় এইসব ঝড় বৃষ্টির মতো কোনও অঘটনের ভিতর দিয়ে আমাকে সৃষ্টি করেছিল কেউ, তখন আর কাউকে নয় কেবল এই জন্মের ওপরেই বড় অভিমান হয়।

একা, বড় একা।

শার্শির কাছ থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে আসি। সাজানো ঘরদোর ফেলে অসীমদা কোন বিদেশে চলে গেছে তার পরিবার নিয়ে। হয়তো ফিরবে, হয়তো কোনওদিনই ফিরবে না।

এই যে আলমারি, খাটপালঙ্ক, রেডিয়োগ্রাম, নষ্ট ফ্রিজ, টেলিফোন, এরা কারও অপেক্ষায় নেই, এরা কারও নয়। তবু মানুষ কত যত্নে এইসব জমিয়ে তোলে। কান্না পাচ্ছিল। টেলিফোনের সামনে বসে বিড় বিড় করে বললাম—কোনও মানুষকে জাগানো দরকার, আমাকে ভূতে পেয়েছে আজ রাতে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, আমি বড় একা।

টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে থাকি। কোন বিশেষ নম্বর ধরে নয়, এমনি আবোল-তাবোল যে নম্বর মনে আসছে সেই ঘরে আঙুল দিয়ে ডিস্ক ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম।

প্রথমবার অনেকক্ষণ ধরে রিং হল, কেউ ধরল না। আমার ভয় করছিল শেষ পর্যন্ত কেউ কি ফোন ধরবে না।

তৃতীয়বার রিং হতে দু মিনিট বাদে একটি মেয়ের ঘুম গলা ভেসে এল—

—আমি অলকা।

—অলকা! কোন অলকা? এটা ফোর সিক্স ডবল থ্রি...

আমি বললাম—শুনুন, রং নাম্বার হয়নি, আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই!

অবাক, মেয়েটি বলল—কি কথা?

আমি বললাম—আপনার কে কে আছে? স্বামী?

—আমার বিয়ে হয়নি!

—মা! বাবা? ভাই বোন?

—বাবা আছেন। এক ভাই। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো। এত রাতে এ সব কি প্রশ্ন?

—আমার বড় একা লাগছে। ভয় করছে। আপনার নাম কি?

ওপাশের মেয়েট অবশ্যই খুব ভালো স্বভাবের মেয়ে। অন্য কেউ হলে ফোন রেখে দিত। এ কিন্তু জবাব দিল। বলল—আমার নাম মায়া দাস।

—কি করেন?

—কলেজে পড়াই। কিন্তু আমার এখন খুব টায়ার্ড লাগছে। আপনি কে বলুন তো!

—আমি অলকা। আমি একটা ফ্ল্যাটে একা থাকি। আজ রাতে বড় ঝড় বাদল, আমার ভাল লাগছে না।

—সেই জন্য? আমার ফোন নম্বর আপনি জানলেন কি করে?

—জানি না তো! এখনও জানি না। আন্দাজে ছটা নম্বর ডায়াল করেছিলাম, নম্বরগুলো মনেও নেই এখন। আপনি রাগ করলেন?

—না, রাগ নয়। আমাকে এখন অনেক খাতা দেখতে হচ্ছে। ভীষণ টায়ার্ড।

—তাহলে ঘুমোন।

—শুনুন, আপনি আমার চেনা কেউ নন, ফোনে মজা করার জন্য পরিচয় গোপন রেখে...

—না না। সে সব নয়। আমি আসলে চাইছি, কিছু লোক আমার মতোই জেগে থাকুক আজকের রাতে। আমার কেবল মনে হচ্ছে আমি ছাড়া সারা কলকাতায় বুঝি আর কেউ জেগে নেই।

ওপাশে বোধহয় মেয়েটির বাবা জেগে গেছেন। এক গম্ভীর পুরুষের স্বর শুনতে পেলাম—কে রে মায়া? কোনও অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

মায়া বোধহয় মাউথপিসে হাত চাপা দিল। কিছুক্ষণ সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তারপর মায়া বলল—আপনার নাম ঠিকানা কিছু বলবেন।

—কেন?

—বাবা বলছেন, আপনার কোন বিপদ ঘটে থাকলে আমরা হেল্প করার চেষ্টা করতে পারি।

—অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বিপদ কিছু নেই। শুধু ভয় আছে। ঘুম ভাঙালাম বলে কিছু মনে করবেন না।

—আমার বাবা ডি.এস.পি.। কোনও ভয় করবেন না।

ঠিক এই সময়ে মায়ার বাবা ফোন তুলে নিয়ে বললেন—হ্যালো আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

—পার্ক সার্কাস। খুব অসহায় গলায় বললাম।

—বাড়িতে একা আছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন বাড়ির লোকজন কোথায় গেল?

একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমি একাই থাকি।

মায়ার বাবা একটু গলা ঝেড়ে বললেন—ও। বয়স কত?

—বেশি নয়। একুশ বাইশ।

—কি করেন?

—একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি।

—ঠিকানাটা বলুন।

একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। নার্ভাসও লাগছে খুব। এতটা নাটক না করলেও হত। ঠিকানা দিলে ডি.এস.পি. সাহেব হয়তো থানায় ফোন করে দেবেন, পুলিশ খোঁজ নিতে আসবে। কত কি হতে পারে!

ঝুঁকি না নিয়ে বললাম—কাকাবাবু, মাপ করবেন। অনেক বিরক্ত করেছি।

উনি বললেন—শুনুন, আমার মনে হচ্ছে আপনি কোন বিপদে পড়েছেন, কিন্তু বলতে সংকোচ করছেন। আমি অ্যাকটিভ পুলিশের লোক, নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন। আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি।

ওঁর এই সহৃদয়তা আমার ভালো লাগছিল। কিন্তু কি করব, আমার যে পুলিশের কোনও দরকার নেই! এই বৃষ্টি বাদলার রাতে আমি কেবল মানুষের জেগে-থাকার শব্দ শুনতে চেয়েছিলাম মাত্র। হয়তো এটা ভীষণ ছেলেমানুষী। এইভাবে ফোন করে লোককে উদবিগ্ন ও বিরক্ত করা ঠিক হয়নি। তবু আর তো কোনও উপায় ছিল না।

ভদ্রলোক বার বার 'হ্যালো, হ্যালো' করছেন সাড়া না পেয়ে। আমার কানের পরদা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। আস্তে করে বলতে হল—না কাকাবাবু, কোনও বিপদ নয়। কেবল ভয়। এখন ভয়টা কেটে গেছে। তারপর ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

বাকি রাতটা আধো-জাগা আধো-ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দিতে দিতে বার বার ডি.এস.পি. ভদ্রলোকের সাহায্য করা, প্রোটেক্ট করার কথাটা মনে পড়ছিল। আমাকে কেউ রক্ষা করুক, ত্রাণ করুক এ আমার অসহ্য। আমি কি অসহায়, অবলা?

ঠিক এই কারণেই প্রভাসরঞ্জনবাবুকে আমি পছন্দ করতে পারি না। যেমন অপছন্দ আমার সুকুমারকে। এমনকী উপরওয়ালার ভূমিকা নেওয়ার একটা অস্পষ্ট চেষ্টা করেছিল বলেই বোধহয় জয়দেবকেও আমি নিতে পারিনি স্বামী হিসেবে। জয়দেবের অবশ্য আরও অনেকগুলো খাঁকতি ছিল।

সকালেও বৃষ্টি ছাড়েনি! এ বৃষ্টিতে ঝি আসবে না জানি। কাজেই সকালে উঠে ঘরদোর সারতে হল নিজেকেই। এক অসম্ভব একটানা প্রবল বৃষ্টি পড়েছে তো পড়ছেই। আমার ফ্ল্যাট থেকে রাস্তার কোনও গাড়ি ঘোড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, নীচের হাঁটুজলে কিছু গরিব ঘরের ছেলে চেঁচাচ্ছে আর জল খেলছে। কয়েকবার রিকশার ঘণ্টির শব্দ হল। কাদের ঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া আসছে ঘরে।

চালে জলে খিচুড়ি চাপিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে জানালার ধারে বসি। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে আসছে। বৃষ্টির তেজ এইমাত্র খানিকটা কমে গেল। ধরবে। অফিসে যাওয়াটা কি আজ ঠিক হবে! না গেলেও ভালো লাগে না। একা ঘরে সারাদিন। কি করি?

বেলা নটায় উঠে স্নান সেরে নিলাম। ভেজা চুল আজ আর শুকোবে না। কিন্তু রাতে ঘুম হয়েনি, স্নান না করলে সারাদিন ঘুমঘুম ভাব থাকত। কিন্তু স্নান করেই বুঝলাম, হুট করে ঠান্ডা লেগে গেল। গলাটা ভার, চোখে জল আসছে, নাকে সুড়সুড়, তালুটা শুকনো-শুকনো। ছাতা হাতে অফিসে বেরোলাম তবু শেষ পর্যন্ত।

সিঁড়ির নীচেই প্রভাসরঞ্জন দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার জল দেখছিলেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—যাবেন কি করে? যা জল!

—যেতে হবে যেমন করে হোক।

—ট্রাম বাসও পাবেন না। দুটো একটা যা চলছে তাতে অসম্ভব ভিড়। আমি একটু আগে বেরিয়ে দেখে এসেছি।

একটু ইতস্তত করছিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে যদি ফিরে আসতে হয় তো যাওয়াও হল না, জল ভেঙে ঠান্ডাও লেগে গেল হয়তো।

প্রভাসরঞ্জন বললেন—খুব জরুরি কাজ নাকি?

—জরুরিই। একটা ফাইল ক্যাবিনেটের চাবি আমার কাছে রয়ে গেছে।

—রেনি ডে-তে কি আর অফিসের কাজকর্ম হবে?

—হবে?

এই বলে রাস্তাঘাট একটু দেখে নিয়ে সত্যিই বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় পা দিতে না দিতেই একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ কাটিয়ে রোদ দেখা দিল। কি মিষ্টি রোদ! গোড়ালিডুবু জল ভেঙে, শাড়ি সামলে কষ্টে এগোতে থাকি। ঠান্ডা জলে পা দিতেই শরীরে একটা শীতের কাঁপুনি দিচ্ছে। দিক। গোটা দুই ট্যাবলেট খেয়ে নেব। ট্যাবলেট ক্যাপসুলের যুগে অত ভয়ের কিছু নেই।

ভাগ্য ভালো, ডিপোর কাছ বরাবর যেতে না যেতেই লেডিজ স্পেশাল পেয়ে গেলাম।

অফিসে এসেই বেয়ারাকে দিয়ে গোটা দশেক ট্যাবলেট আনিয়ে দুটো খেয়ে ফেললাম। তারপর চা। শরীরটা খারাপই লাগছে। সর্দি হবে।

গামবুট আর বর্ষাতিতে সেজে সুকুমার আজ বেশ দেরিতে অফিসে এল। ও আবার ম্যানেজমেন্টকে বড় একটা তোয়াক্কা করে না। অফিসে ঢুকেই ধরাচূড়া ছেড়ে সোজা আমার টেবিলের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল—দুটো সিনেমার টিকিট আছে। যাবে? ইংরেজি ছবি।

আমি ওর বিশাল স্বাস্থ্যের চেহারাটা দেখলাম খানিক। এর আগে ওর সঙ্গে কয়েকবারই সিনেমায় গেছি। তখন সঙ্কোচ ছিল না। সেদিন আমার ফ্ল্যাটে সেই কাণ্ড ঘটানোর পর থেকে ও আর বড় একটা কাছে ঘেঁষেনি এতদিন। লজ্জায় লজ্জায় দূরে দূরে থাকত। আজ আবার মুখোমুখি হল।

বললাম—আজ শরীর ভালো নেই।

—কি হয়েছে?

—সর্দি।

—ওতে কিছু হবে না। চলো, ঠেসে মাংস খেয়ে নেবে। মাংস খেলে সর্দি জব্দ হয়ে যায়।

হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেললাম—আর সুকুমার জব্দ হবে কিসে?

সুকুমার দু পলক আমাকে দেখে নিয়ে অত্যন্ত নির্লজ্জ গলায় বলল—মাংসে। যদি সেই সঙ্গে হৃদয় পাওয়া যায় তো আরও ভালো।

একবার আক্রান্ত হওয়ার পর আমার সাহস কিছু বেড়েছে। বললাম—এত দাবিদাওয়া কিসের বলো তো! বেশ তো আছি। তুমি তোমার মতো, আমি আমার মতো।

—আমি আমার মতো নেই।

এটা অফিস, এসব কথাও বিপদজ্জনক। তাই মুখ নীচু করে বললাম—এ সব কথা থাক সুকুমার।

—থাক। তবে এ সব কথা আবার উঠবে, মনে রেখো।

আমি ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। পুরুষেরা অসম্ভব দখলদার এক জাত।

দুটো সিনেমার লাল টিকিট বের করে সুকুমার আমার সামনেই ছিঁড়ল কুচিকুচি করে। আমার টেবিলের ওপর ছেঁড়া টিকিটের টুকরো কাগজ জড়ো করে রেখে বলল—জানতাম তুমি যেতে চাইবে না। কিন্তু আমারও তো একটা সুযোগ দরকার।

অফিসে আজ কাজকর্মের মন্দা। লোকজন বেশি আসেনি। বেশ বেলা করে দু'চারজন এসেছে বটে, তবু বড্ড ফাঁকা ঠেকছে অফিস। নিরিবিলিতে বসে কথা বলতে বাধা নেই। সত্যি বলতে কি, আমার কথা বলতে ইচ্ছেও করছিল।

বললাম—সুযোগ মানে কিন্তু দখল করা নয়। আমি কারও সম্পত্তি হতে পারিনি, কোনওদিন পারবও না।

—তা হলে আমাকেই তোমার সম্পত্তি করে নাও না! চিরকাল তোমার হুকুম মতো চললেই তো হল!

হাসলাম। ছেলেমানুষ।

বললাম—ও রকম নেতানো নির্জীব পুরুষও মেয়েদের পছন্দ নয়।

—তাহলে কি হবে?

—কিছু হবে না।

—কিসের বাধা অলকা? তোমার স্বামীর কথা ভাবছো?

মাথা নেড়ে বললাম—না। তবে সেটাও ভাবা উচিত। এখনও তার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়নি।

—করে নাও।

বড় করে একটা শ্বাস ফেলে বললাম—সে অনেক ঝামেলা, দরকারও দেখি না। কিছুদিন গেলেই সে নিজেই মামলা করবে। আমি কোর্টে যাবো না, এক্সপার্টি হয়ে ওকে ডিক্রি করে দেবো।

—সেটা অনিশ্চিত ব্যবস্থা অলকা। উনি যদি মামলা না করেন?

—বয়ে গেল।

সুকুমার মাথা নেড়ে বলে—তুমি অতো আলগা থেকো না। কেন নিজেকে নষ্ট করছো? আমি যে শেষ হয়ে যাচ্ছি!

কি থেকে কি হয়ে গেল মনের মধ্যে।

মেঘভাঙা অপরূপ রোদের ঝরনা বয়ে যাচ্ছে চারদিকে। অফিস ঘরে গনগন করছে আলোর আভা। দুদিন মনমরা বৃষ্টির পর কি ভালো এই রোদ্দুর! কাল রাতের সেই একা থাকা ভয়ংকর ছবি মিথ্যে মনে হয়। আবার সেই বাসায় আজকেও আমাকে একা ফিরে যেতে হবে। যদি রাতে বৃষ্টি আসে ফের, তবে আবার ঘুম ভেঙে ভূতে পাওয়া মাথা নিয়ে বসে থাকবে।

হ্যাঁ ঠিক। প্রোটেক্টার না হোক, আমার একজন সঙ্গী চাই। কাউকে না হলে বাঁচব কি করে?

সুকুমার দেখতে বেশ। তাছাড়া বড় সরল, সোজা ছেলে! কখনও ওকে খারাপ লাগেনি। আজ অপরাহ্ণের আলোয় অফিস ঘরে বসে মুখোমুখি ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ কি হয়ে গেল। ভাবলাম—কি হবে এত বাছবিচার করে! নিজেকে নিয়ে আর কত বেঁচে থাকা!

বললাম—শোন সুকুমার, আমি ডিভোর্স চাই।

—চাও? ও লাফিয়ে ওঠে।

—চাই। আমার স্বামীও চায়! হয়তো ডিভোর্স পেতে কিছু সময় লাগবে।

—তারপর কি করবে অলকা?

—তারপর করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে সুকুমার। এক দুরন্ত অধৈর্য অনুভব করে বলি।

—অলকা, যদি আমরা এক্ষুনি বিয়ে করি তাহলে?

আমি ক্ষণকাল চুপ করে থাকি। বুকের মধ্যে নানা ভয়, দ্বিধা, সংস্কার ছায়া ফেলে যায়।

তারপর বলি—কয়েকটা দিন সময় দাও।

—দিলাম। ক-দিন বলো তো!

—দেখি।

একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেল সুকুমারকে! একটু হয়তো কিন্তু রইল, দ্বিধা রইল, তবু ওটুকু কিছু নয়। সে সব দ্বিধা, ভয় ভেঙে সুকুমার ঠিক সাঁতরে আসবে কাছে।

রাতটা মাসির বাড়িতে গিয়ে কাটালাম। জ্বর এল রাতে। তিনটে দিন বাড়ির বার হওয়া গেল না। অল্প জ্বরেই কত যে ভুল বকলাম ঘোরের মধ্যে।

চার দিনের দিন ফের ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম। মাসি আজকাল আর আটকে রাখে না, যেতে চাইলে এক কথায় ছেড়ে দেয়। ঢিলে বলগা মেয়েকে সকলেরই ভয়।

দোতালার ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা জানালা হাট করে খুলে বন্ধ বাতাস তাড়াই। ধুলোময়লা পরিষ্কার করি। রবিবার। তাড়া নেই!

চায়ের জল চাপিয়ে এলোচুলের জট ছাড়াতে একটু ব্যালকনিতে দাঁড়াই।

কলিং বেল বাজল। এ সময়ে কেউ আসে না। একমাত্র সুকুমার আসতে পারে। তার তর সইছে না।

কাঁপা বুক নিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই সাপ দেখে পিছিয়ে আসার অবস্থা। চৌকাঠের ওপারে জয়দেব দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণ কথা ফোটে না কারও মুখে। জয়দেবের চেহারা রোদে পোড়া, তামাটে, কিছু রোগা হয়েছে। মাথার চুল এত ছোট যেন মনে হয় কদিন আগে ন্যাড়া হয়েছে। পরনে ধুতি আর ক্রিম রঙা সুতির শার্ট। কিন্তু ধুতিটা এমনভাবে পরেছে যে মনে হয় পাশের ফ্ল্যাট থেকে এল। বাইরে বেরোবার পোশাক নয়।

চৌকাঠের বাইরে থেকে জয়দেব এক পাও ভিতরে আসার চেষ্টা করল না।

দাঁড়িয়ে থেকে বলল—তুমি এখানে থাকো সে খবর সদ্য পেয়েছি।

—কি চাও?

খুব সাধারণ আলাপচারির গলায় জয়দেব বলল—কিছু চাই না অলকা। তোমার কাছে ডিভোর্সে মত দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তার কোনও উত্তর দাওনি। তোমার কি মত আছে?

একটু গম্ভীর হয়ে বলি—দরজার বাইরে থেকে অত জোরে ও সব কথা বলছ কেন? ভিতরে এসো।

জয়দেব এলো। কোনওদিকে তাকাল না, ঘরের আসবাবপত্র লক্ষ করল না। খুবই কুণ্ঠিত পায়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বলল—আমি নীচের তলায় প্রভাসবাবুর বাসায় উঠেছি কাল এসে।

প্রভাসের সঙ্গে জয়দেবের চেনা আছে জানতাম। তাই চমকালাম না। দরজা বন্ধ করে এসে জয়দেবের মুখোমুখি বসে বললাম—আমি খুব তাড়াতাড়ি ডিভোর্স চাই।

জয়দেব মুখখানা করুণ করে বলল—তাড়াতাড়ি চাইলেই তো হয় না। কোর্ট থেকে এ সব কেসে বড় দেরি করে। তাড়াতাড়ি চাইলে আরও আগে জানালে না কেন? কবে কেস ফাইল করা যেতো!

আমি মাথা নীচু করে বলি—শোনো, ডিভোর্স পেতে দেরি হোক বা না হোক আমরা তো একটা অ্যাগ্রিমেন্টে আসতে পারি!

—কি অ্যাগ্রিমেন্ট?

—ধরো, আমরা কেউ কাউকে কোনও অবস্থাতেই দাবি করবো না! পরস্পরের কোনও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবো না!

—তার জন্য অ্যাগ্রিমেন্ট লাগে না অলকা। জয়দেব বলল—আমরা সেই রকমই আছি।

কথার স্বর শুনেই বোঝা যায়, জয়দেবের মন এখন অনেক গভীর হয়েছে। জীবনে কোনও একটা সত্য বস্তুর সন্ধান না পেলে মানুষ এত গভীর থেকে কথা বলতে পারে না।

তাই আমি ওর মুখের দিকে কয়েকবার তাকালাম। ও আমাকে দেখছিল না। চোখ তুলে দেওয়ালের মাঝারি উচ্চতায় চেয়েছিল। সেই অবস্থায় চেয়ে থেকেই বলল—তুমি একটি ছেলেকে পছন্দ কর শুনেছি। তাকে বিয়ে করার জন্যই কি এত তাড়া?

সত্যিকারের অবাক হয়ে বলি—না তো! আমি কাউকেই পছন্দ করি না।

—সুকুমার না কি যেন নাম, শুনছিলাম। তোমার অফিসের!

—ওঃ! বাস্তবিক আমার সুকুমারের মুখটা এখন মনে পড়ল। বললাম—পছন্দ নয়। তবে ওই এক রকম।

—ভালো।

—তুমি ডিভোর্স চাইছ কেন বিয়ে করবে? বললাম।

ও অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল—বিয়ে আর না। মুক্ত হতে চাইছি, নইলে বড় কষ্ট হয়।

—কষ্ট কিসের?

—ওই একটা অধিকারবোধ থাকে তো পুরুষের। সেইটে মাঝেমাঝে চাড়া দেয়। ডিভোর্স হয়ে গেলে এক রকম শান্তি।

—ও।

—আচ্ছা—বলে জয়দেব কুণ্ঠিত পায়ে উঠল। বলল—উকিলের চিঠি দেবো। তুমি কি অ্যালিমনি চাও?

—সেটা কি?

—খোরপোষ।

—না, না। চমকে উঠে বলি।

—আচ্ছা তাহলে—

—আচ্ছা। বললাম।

দরজা খুলে জয়দেব চলে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে ওর পায়ের শব্দ যখন নামছে তখন আমি ঘরের মধ্যে চুলের জটে আঙুল ডুবিয়ে বসে আছি। ভাবছি। কত ভাবনা! সে যেন এক আলো-আঁধারের মধ্যে ডুবে বসে থাকা। উঠলাম না, রাঁধলাম না, খেলাম না। শুধু বসে রইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ের আঙুল হৃৎপিণ্ডে টোকা মারল। নড়ে উঠল বুকের বাতাস। সচেতন ভীতগ্রস্ততায় টের পাই—আমি কাউকেই ভালোবাসি না। কাউকে নয়। কেবলমাত্র নিজেকে। আমি কোন দিন কাউকে ভালোবাসতে পারবও না।

কি করে বেঁচে থাকব আমি?

পৃথিবীতে কত দুর্যোগের বর্ষা নামবে কতবার! কত একা কাটবে দিন! কাউকে ভালো না বেসে আমি থাকব কি করে!

বিকেল কাটল। নীচের তলা থেকে অহংকারী জয়দেব একবারও এল না খোঁজ করতে। সুকুমার টেলিফোনও করল না। বড় অভিমানে ভরে গেল বুক। সারাদিন খাইনি, স্নান করিনি, কে তার খোঁজ রাখে!

সন্ধে হল, রাতে গড়িয়ে গেল গভীরের দিকে।

শরীর দুর্বল। মাথা ফাঁকা। মনটায় তদগত একটা আচ্ছন্নতা। ভূতে পেয়েছে আমাকে। উঠে গিয়ে ছারপোকা মারবার অমোঘ ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে টেবিলে বসলাম। চিরকুটে লিখে রাখলাম—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

লিখে বিছানায় শুয়ে আস্তে শিশির মুখ খুলে ঠোঁটের কাছে এনে পৃথিবীকে বললাম—ভালোবাসা ছাড়া কি করে বাঁচি বলো! বাঁচা যায়! ক্ষমা করো।

ঠিক এ সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল মৃদু সেতারের মতো। উঠলাম না। শিশিটা উপুড় করে দিলাম গলার মধ্যে।

হায়! ফাঁকা শিশি প্রেমহীন হৃদয়ের মতো চেয়ে রইল আমার শূন্য হৃদয়ের দিকে। এক ফোঁটা বিষও ঢালতে পারল না সে। অমৃতও না।

উঠে টেলিফোনটা যখন ধরছি তখন কেন যেন খুব ইচ্ছে করছিল টেলিফোনে যেন জয়দেবের গলার স্বর শুনতে পাই।

বাস. পে কেউ নেই

ঘুমচোখে নিজের ঘর থেকে বেরোবার মুখে পাশের ঘরের পরদাটা সাবধানে সরিয়ে রবি তার বাবাকে দেখতে পায়। খোলা স্টেটসম্যানের আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে, আর সামনে একটা খুদে টেবিলের ওপর এক জোড়া পা, পায়ের পাশে একটা গরম কফির কাপ। ওই স্টেটসম্যান, পা আর কফির কাপ—ওই তার বাবা। রবি প্যান্টের পকেটে হাত ভরে রিভলভারটা বের করে আনল। সেটা তুলল, এক চোখ ছোট করে লক্ষ্যস্থির করল। তারপর টিপল ট্রিগার।

ঠিসুং...ঠিসুং...ঠিসুং...তিনটে বুলেট ছুটে গেল চোখের নিমেষে। স্টেটসম্যানটা খসে পড়ে যায় প্রথমে, দামি স্প্রিংয়ের ওপর দুর্ধর্ষ নরম ফোম রবারের গদির ওপর ঢলে পড়ে যায় বাবা, গদির ওপর দুলতে থাকে শরীর। বাবা চমৎকার একটা মৃত্যু চিৎকার দেয়—আঃ আ-আ-আ-...

রবি হাসে একটু। রিভলভারটা আবার পকেটে ভরে দু'পা এগোয়, তার বাবা দেবাশিস শুয়ে থেকেই তার দিকে চেয়ে বলে—শট! শট!

রবির ঘুমমাখা কচি মুখে চাপা রহস্যময় হাসি। বলে—নাইস অব ইউ টেলিং দ্যাট।

দেবাশিস উঠে বসে। জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠোঁটে নেয়। স্টেটস ম্যানটা দিয়ে মুখ ঢাকার আগে বলে—প্রসিড টুয়ার্ডস দ্য বাথরুম ম্যান।

—ইঁয়া। বলে রবি হাই তোলে। ডাকে—দিদি!

অমনি অন্য পাশের ঘরের পরদা সরিয়ে আধবুড়ি ঝি চাঁপার হাসিমুখ উঁকি দেয়—সোনা!

দুহাত বাড়িয়ে রবি ঘুমন্ত গলায় বলে—কোল।

চাঁপা তাকে কোলে নেয়। এই সকালের প্রথম বাথরুমে যাওয়াটা বড় অপছন্দ রবির। একটু সময় সে দিদির কোলে উঠে থাকে রোজ সকালে। কাঁধে মাথা রেখে হাই তোলে।

চাঁপা কানে কানে বলে—আজ রবিবার।

—হুঁ।

—ছুটি।

ইঁয়া।

—সোনাবাবু আজ কোথায় কোথায় যাবে বাবার সঙ্গে?

কচি মুখখানা একরকম সুস্বাদু হাসিতে ভরে যায় রবির। প্রকাণ্ড শার্শিওলা চওড়া জানালার কাছে এসে চাঁপা পরদা সরিয়ে দেয়। সাততলার ওপর থেকে বিশাল কলকাতার দৃশ্য ছবির মতো জেগে ওঠে। নীচে একটা মস্ত পার্ক। পার্কের মাঝখানে পুকুর। চারধারে বাঁধানো রাস্তায় লোকজন হাঁটছে।

ও ঘরে টেলিফোন বাজে, রিসিভার তুলে নেওয়ার 'কিট' শব্দ হয়। তারপর দেবাশিসের স্বর—হ্যালো।

রবি বলে—ফোন।

চাঁপা বলে—হুঁ।

—কার ফোন বলো তো?

—বাবার বন্ধু কেউ!

—না, মণিমার। রবি বলে!

চাঁপার মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—এবার চলো, মুখখানা ধুয়ে নেবে!

রবি হাই তুলে বলে—কাল রাতের গল্পটা শেষ করোনি।

চাঁপা হাসে—বলব। দাঁত মাজতে মাজতে।

ও ঘর থেকে দেবাশিসের হাসির শব্দ আসে। বলে—আজই? ...হুঁ...হুঁ...না, না, রবিবার শুধু রবির দিন। এ দিনটা ওর সঙ্গে কাটাই।...আচ্ছা...

রবি উৎকর্ণ হয়ে শোনে। বলে—ঠিক মণিমা।

—এখন চলো তো। চাঁপা বলে।

বাথরুমে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে হাই তোলে রবি। চাঁপা তার ছোট্ট ব্রাশে পেস্ট লাগাতে যাচ্ছিল, রবি রাগের স্বরে বলে—না, না পেস্ট না!

—তবে কি দিয়ে মাজবে?

—তোমার কালো মাজন দিয়ে।

—ও তো ঝাল মাজন! পেস্ট মিষ্টি।

—না, পেস্ট বিচ্ছিরি। ফেনা হলে আমার বমি পায়।

—বাবা যদি টের পায় আমার মাজন দিয়ে দাঁত মেজেছো তাহলে রাগ করবে কিন্তু।

—টের পাবে কি করে! চুপ চুপ করে মেজে দাও! আঙুল দিয়ে কিন্তু। ব্রাশ বিচ্ছিরি।

চাঁপার বুড়ো মুখখানা মায়ার হাসিতে ভরে ওঠে। সে রান্নাঘর থেকে তার সস্তা কালো মাজনের শিশি নিয়ে এসে দাঁত মেজে দিতে থাকে!

রবি ভ্রূ কুঁচকে বলে—গল্পটা বলবে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর...কতটা যেন বলেছিলাম সোনাবাবু?

—তোমার কিছু মনে থাকে না। শিবুচরণ এক রাত্তির বেলা মাছ ধরতে গিয়েছিল নৌকোয়। জাল টেনে তুলতেই দেখে মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, লালটেমের আলোয় জাল খুলতেই মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ বেরিয়ে এল। ছোট্ট নৌকা, চার হাতখানেক হবে। তার এধারে শিবুচরণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে লালটেম জ্বলছে ওধারে ফণা তুলে কালকেউটে। আর খোলের মধ্যে জ্যান্ত মাছগুলো তখনও দাপাচ্ছে। চারধারে কালিঢালা অন্ধকার নিশুত নিঃঝুম। মাঝগাঙে শিবুচরণের সে কী বিপদ! নড়তে চড়তে পারে না, ভয়ে বুদ্ধিভ্রংশ, হাতে পায়ে সাড় নেই।

রবি প্রথম কুলকুচোটা সেরে নিয়েই বলে—জলে ঝাঁপ দিল না কেন?

চাঁপা একটু থতিয়ে গিয়ে বড় বড় চোখ করে চায়—ঠিক তো সোনাবাবু! কী বুদ্ধি বাবা তোমার ওইটুকুন মাথায়! উঃ!

বলে চাঁপা রবির মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে কোলে তুলে নেয়। মাথাটা কাঁধে চেপে রেখে বলে—সোনাবাবুর মাথার মধ্যে বুদ্ধির বাসা। এমনটি আর দেখিনি।

রবি মুখ টিপে অহংকারের হাসি হেসে মুখ লুকিয়ে বলে—উঃ! তারপর বলো না!

—হ্যাঁ তা শিবুচরণের হাতে পায়ে তো খিল ধরে গেছে তখন। কাঁপুনি উঠছে। ভাবছে এই মলুম, এই গেলুম আর বাপভাই ছানাপোনার মুখগুলো দেখতে পাবো না। কালসাপে খেলে আমাকে গো! কে কোথায় আছো মানুষজন, এসে পরাণটা রাখো। কিন্তু কোথায় কে! শীতে মাঝরাতে মাঝগাঙে জনমনিষ্যি নেই। শিবুচরণ বুঝল যে মানুষজনকে ডাকা বৃথা। কেউ তার ডাক শুনতে পাবে না। তখন ভয়ের চোটে শিবু রামনাম করতে থাকে, কিন্তু সাপটা নড়ে না। শিবুর মনে হল, তাইতো রামনাম তো ভূতের মন্ত্র। তখন সে মা মনসাকে ডাকতে থাকল। তাতে যেন আরও জোর পেয়ে সাপটা এধার ওধার গোটা দুই ছোবল মারল। লালটেমটা মাঝখানে থাকাতে রক্ষে! কিন্তু সে আর কতক্ষণ। শিবু বুঝে গেল মা মনসা কুপিত আছেন কোনও কারণে তার ওপর। ডেকে কাজ হবে না। হিতে বিপরীত হয় যদি! তখন শিবুচরণ মনে করল গায়ের পুরুতমশাই বলেন বটে বাপ পিতেমোর আত্মা... সোনাবাবু বোসো।

চাঁপা ডাইনিং রুমে এনে চেয়ার টেবিলে বসায় রবিকে। রবি বিরক্ত হয়ে চাঁপাকে আঁকড়ে ধরে বলে—উঃ! তুমি আগে বোসো, আমি তোমার কোলে বসব।

চাঁপা চারধারে চেয়ে কানে কানে বলে—আমি কি চেয়ারে বসতে পারি? বাবা দেখলে যে রাগ করবে!

—একটুও রাগ করবে না। উঃ বোসো! কথা শোনো না কেন!

—বসছি বসছি। বলে চাঁপা তাকে কোলে নিয়ে বসে। প্লেটে সেঁকা রুটি মাখন, দুধের গেলাস রেখে যায় প্রীতম চাকর। রেখে সে বলে—রবিবাবু, কাল যখন সন্ধেবেলা আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখন কে আমার কানে জল ঢেলে পালিয়ে গেল শুনি!

—তুই ঘুমোস সন্ধেবেলা? বাবা রাগ করে না?

—ওঃ ঘুম নয়। চোখ বুঝে তোমার জন্য একটা গল্প ভাবছিলাম আর তুমি জল ঢেলে পালিয়ে গেলে। কানের মধ্যে এখনও জলটা ফচ ফচ করছে। আজ বাবাকে যদি বলে না দিই!

পকেট থেকে গম্ভীর ভাবে রিভলভারটা বের করে রবি তুলেই ট্রিগার টেপে।

ঠিসুং...ঠিসুং...ঠিসুং...আঃ আ আ, বলে প্রীতম টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দুধের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রবি বলে—তারপর বলো।

চাঁপা অসহায় ভাবে বলে—কী যেন বলছিলাম!

—বড্ড ভুলে যাও তুমি।

—বুড়ো হচ্ছি না!

—বুড়ো হলে কি ভুলে যেতে হয়?

চাঁপা তার গালে গালটা ছুঁইয়েই সরিয়ে নেয় মুখ, বলে—বুড়ো পুরুতমশাই বলেন বাপপিতেমোর আত্মারা সব সময়ে আমাদের নাকি চোখে চোখে রাখেন। এমনিতেই কিছু করতে পারেন না, কিন্তু প্রাণ ভয়ে তারা এসে আপদ বিপদের আসান করে দিয়ে যান। শিবুচরণ তখন ডাকতে থাকে—ও মোর বাপপিতেমো, তোমরা কে কোথায় আছো, দ্যাখো এসে তোমাদের আদরে শিবের দশখানা। নিশুত রাতে কে বা জানবে শিবেকে দংশেছে নিঘিন্নে জীব, কে ডাকবে ওঝা-বদ্যি শিবে যে যায়...এইসব বিড়বিড় করে বলছে যখন, তখনই সাপটা হঠাৎ ঠিক মানুষের গলায় বলে—ওহে শিবুচরণ—

ও-ঘর থেকে পরদাটা সরিয়ে দরজায় দাঁড়ায় দেবাশিস। একটু ভারী গলায় বলে—মানে হারি আপ, হারি আপ—

—গী—মুখ ফিরিয়ে হাসে রবি। চাঁপা জড়োসড়ো হয়ে উঠে দাঁড়ায়, কোলে রবি!

দৃশ্যটা দেখে একটু হাসে দেবাশিস। পরদাটা ফেলে দেয়। ও ঘর থেকে তার গলা পাওয়া যায়—ড্রেস আপ ম্যান ড্রেস আপ।

—হঁ্যা। উত্তর দেয় রবি। তারপর দুটো টোস্ট দু কামড় করে খেয়ে ফেলে দিয়ে বলে—দিদি, তাড়াতাড়ি করো।

—কিছু খেলে না সোনাবাবু!

—আঃ খেতে ইচ্ছে করছে না যে।

—দুধটুকু তবে দু চুমুক, দাদা আমার!

—ইস কী যে যন্ত্রণা করো না!

বলে রবি ঢকঢক করে দুধটা খায়। হাতের উলটো পিঠে মুখ মুছে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে ডাকে—দিদি তাড়াতাড়ি।

দেবাশিস ভিতর দিকের দরজা ভেজিয়ে দিল সাবধানে। রবি ওঘরে পোশাক পরছে। ঘড়িতে আটটা বাজে। তৃণা এখন নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে। ও একটু দেরিতে ওঠে। ওদের বাড়ির এখনকার দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখে নিল দেবাশিস। তৃণার বর শচীন এখন বাগানে। এমন ফুল-পাগল, গাছ-উন্মাদ লোক কদাচিৎ দেখা যায়। কেবল মাত্র ওই গাছের জন্য ফুলের জন্য হাজরা রোডের ওপর সাতকাঠার মতো জমি সোনার দাম পেয়েও বেচবে না। ওই সাতকাঠার কোনও দরকারই হয় না ওদের, বাড়ির চারধারে বিস্তর জমি। বাড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা ও পাশে ওই ফালতু জমিটায় তার বাগান। এতক্ষণে সেখানে গাছপালার মধ্যে জমে গেছে শচীন। তৃণার এক ছেলে, এক মেয়ে মনু আর রেবা। মনু টেনিস শিখতে যায় রবিবারে, রেবা নাচগানের ক্লাস থাকে। আটটা থেকে সোয়া আটটার মধ্যে তৃণার চারধারে চাকর-বাকর ছাড়া কেউ বড় একটা থাকে না। অবশ্য থাকলেও ক্ষতি নেই। সবাই জানে, দেবাশিস আর তৃণার মধ্যে একটা প্লাস চিহ্ন আছে। এমনকী দেবাশিসের বউ চন্দনা আত্মহত্যা করেছিল না খুন হয়েছিল এ বিষয়ে সকলের সন্দেহ কাটেনি এখনো। পুলিশ অবশ্য কেস দিয়েছিল কোর্টে খুনের দায়ে দেবাশিসকে জড়িয়ে, কিন্তু দুর্বল কেসটা টেকেনি। কিন্তু জনগণের মধ্যে এখনও ধারণা সম্ভবত দেবাশিস আসামি।

ডায়াল করার পর নির্ভুল রিং-এর শব্দ হতে থাকে আর দেবাশিসের একটা দুটো হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায়। শ্বাসের কেমন একটা কষ্ট হতে থাকে।

—হেল্লো। তৃণা বলে।

—দেব।

—বুঝেছি।

—কথা বলার অসুবিধে নেই তো!

—একটু আছে।

—ঘরে কেউ আছে নাকি?

—হুঁ।

—তাহলে দশ মিনিট পরে ফোন করব।

তৃণা একটু হাসে। বলে—না, না, ভয় নেই এসময়ে কেউ থাকে নাকি! একে রোববার, তার ওপর বাদলা ছেড়ে কেমন শরতের রোদ উঠেছে! কেবল আমিই পড়ে আছি একা, কেউ নেই।

—কী করছিলে?

—টেলিফোনটা পাশে নিয়ে বসেছিলাম, হাতে খোলা জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমির; কিন্তু একটা কবিতাও পড়া হচ্ছিল না।

দেবাশিস গলাটা সাফ করে নিয়ে বলে—কী করবে আজ?

—কী আর! বসে থাকব। তুমি?

—আজকাল রবি ছুটির দিনগুলোয় চাঁপার কাছে থাকতে চায় না।

—বড় হচ্ছে তো, রক্তের টান টের পায়। শত হলেও তুমি বাপ।

—তুমি বেরোচ্ছো না?

তৃণা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—জানোই তো চারদিকে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া, একা বেরোলেই শচীন এমন একরকম কুটিল চোখে তাকায়! আজকাল বুড়ো বয়সে বড্ড সাসপিসিয়াস হয়েছে। ছেলেমেয়েরাও পছন্দ করে না। তাই আটকে থাকি ঘরে।

—দূর! ওটা কোন কথা হল নাকি?

—তবে কথাটা কি রকম হলে মশাইয়ের পছন্দ?

—আমি বলি, তুমিও বেরিয়ে পড়ো, আমিও বেরিয়ে পড়ি।

—তারপর?

—কোথাও মিট করব।

তৃণা একটু চুপ করে থেকে বলে,—দেব, রবি কিন্তু বড় হচ্ছে।

—কী করব?

—সাবধান হওয়া ভালো। যা করো ছেলেকে সাক্ষী রেখে করো না।

—তিনু, তুমি কিন্তু এতটা গেরস্ত মেয়ে ছিলে না, দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছো?

—বয়স হচ্ছে।

—ওসব আমি বুঝি না। গত সাতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—মিথ্যুক।

—কী বলছ?

—বলছি তুমি মিথ্যুক। তৃণা হাসে।

—কেন?

—পরশুদিনও তুমি সন্ধের পর গাড়ি পার্ক করে রেখেছিলে রাস্তায়, সেখান থেকে আমার শোয়ার ঘরের জানালা দেখা যায়।

বাঁ হাতে বুক চেপে ধরে দেবাশিস, শ্বাসকষ্ট। হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায় একটা...দুটো...গভীর একটা শ্বাস টানে সে। বুকে বাতাসের তুফান টেনে নেয়।

দেবাশিস আস্তে করে বলে—কী করে বুঝলে যে আমি।

—তোমাকে যে আমি সবচেয়ে বেশি টের পাই।

—গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখেছো।

—না। আবছা গাড়িটা দেখেছি। আর দেখেছি ড্রাইভিং সিটে একটা সিগারেট আর দুটো চোখ জ্বলছে।

—যাঃ।

—আমি জানি দেব, সে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

দেবাশিস দাঁত টিপে চোখ বুজে লজ্জাটাকে চেপে ধরে মনের মধ্যে। গলার স্বর কেমন অন্য মানুষের মতো হয়ে যায়, সে বলে—তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

জানবে কী করে! তৃণা হাসে—তোমাকে যে না চেনে সে কী করে জানবে রাস্তায় কার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে বসে আছে ড্রাইভিং সিটে একা ভূতের মতো! আমি ছাড়া এত মাথা ব্যথা আর কার?

—তুমি অনেকক্ষণ বড় জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে, পিছনে ঘরের আলো, তাই তোমার মুখ দেখতে পাইনি। যদি জানতাম যে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো!

—তাহলে কী করতে?

—তাহলে তক্ষুনি রাস্তায় নেমে ছক্করবাজি নাচ নেচে নিতাম।

—দেব, বয়স বাড়ছে।

দেবাশিস তৎক্ষণাৎ বলে—পাগলামিও।

—বুঝলাম। কিন্তু কেন? ওরকম কাঙালের মতো আমার বাড়ির পাশে বসে থাকবার মতো কী আছে? নতুন তো নয়।

দেবাশিস ঠিক উত্তরটা খুঁজে পায় না। রক্ত কলরোল তোলে। বুকে আছড়ে পড়ে বন্ধ জলোচ্ছ্বাস। সে বলে, তিনু, আমি বড় কাঙাল।

তৃণা একটা শ্বাস ফেলে। কিছু বলে না।

দেবাশিস বলে—শুনছো?

—কী?

আমি বড় কাঙাল।

—কাঙাল কী না জানি না তবে বাঙাল বটে।

—তার মানে?

—বাঙাল মানে বোকা। বুঝেছো?

—তাই বা কেন?

—রবি কোথায়? তোমার এসব পাগলামির কথা তার কানে যাচ্ছে না তো?

—কানে গেলেই কী। ও বাচ্চা ছেলে, বুঝবে না।

তৃণা একটা মৃদু হাসি হেসে বলে—তুমি বাচ্চাদের কিছু জানো না। ওরা আজকাল পাকা বিচ্ছু হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বাচ্চারা কিন্তু সব টের পায়।

দেবাশিস একটু হতাশার গলায় বলে—শোনো, রবির জন্য চিন্তার কিছু নেই। যদি টের পায় তো পাক। আগে বলো, তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না।

তৃণা মৃদুস্বরে বলে—কোথায়?

—তুমি যেখানে বলবে।

—আমার লজ্জা করে। তোমার সঙ্গে যে তোমার ছেলে থাকবে!

—ও তোমায় চেনে নাকি! এসব নতুন ডেভেলাপমেন্ট তোমার কবে থেকে মনে হচ্ছে?

—রবি বড় হচ্ছে তাই ভয় পাই। বুঝতে শিখছে।

—ভয় পেয়ো না। গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছি। ঘণ্টা খানেক চিড়িয়াখানা আর রেস্টুরেন্টে কাটাবো। দুপুরে আমার বোনের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ। অবশ্য একা রবিরই নিমন্ত্রণ, ওদের বাড়িতে যে আমি খুব জনপ্রিয় নই তা তো জানোই। রবিকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আমি ফ্রি।

—তার মানে এগারোটা কী বারোটা হবে বেলা। আমি কি তোমার মতো স্বাধীন দেব? দুপুরে সকলের খাওয়ার সময়ে বাইরে থাকলে লোকে বলবে কী?

—তাহলে চিড়িয়াখানা বা রেস্টুরেন্টে এসো।

—তাহলে রবিকে চোখ এড়ানো যাবে না।

—উঃ! তুমি যে কী গোলমাল পাকাও না।

তৃণা হেসে বলল—আচ্ছা, না হয় দুপুরের প্রোগ্রামই থাকল। কোথায় দেখা হবে?

—তুমি ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে থেকো।

দেবাশিস চোখের কোণ দিয়ে দেখে রবি এসে দাঁড়িয়েছে পরর্দা সরিয়ে দরজার চৌকাঠে। স্ট্রেচলনের একটা হালকা নীল রঙের প্যান্ট আর দুধ-সাদা একটি টি-শার্ট পরনে, বুকের কাছে বাঁ ধারে মনোগ্রাম করা ওর নামের আদ্য অক্ষর। মাথায় থোপা থোপা চুলের ঘুরলি। একটু হাসি ছিল মুখে। সেটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে এখন।

—তাহলে? দেবাশিস ফোনে বলে।

—আচ্ছা ছাড়লাম।

—সো লং।

ফোনটা রেখে দেয় সে।

হাসিটা আর রবির মুখে নেই, মিলিয়ে গেছে, চেয়ে আছে বাবার দিকে, চোখে চোখ পড়তেই মুখটা সরিয়ে নিল।

দেবাশিস ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ঝড় থেমেছে, ঢেউ কমে এল, শুধু অবসাদ। টেনশনের পর এমনটা হয়, মুখে একটু সহজ হাসি ফুটিয়ে তোলা এখন বেশ শক্ত, টানাপোড়েন এখনও তো শেষ হয়নি। তৃণার সঙ্গে দুপুরে দেখা হবে, ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। তার স্নায়ুর ভিতরে এখনও একটা তৃষ্ণার্ত উচাটন ভাব। দেখা হবে, পিপাসা বাড়বে, তবু এক সমুদ্রের তফাত থেকে যাবে সারা জীবন তৃণার সঙ্গে তার।

রবি মুখ তুলতে দেবাশিস ক্লিষ্ট একরকম হাসি হাসে। রবি কি সব বোঝে! বুকের মধ্যে একটা ভয় আচমকা হৃদযন্ত্রকে চেপে ধরে তার।

চতুর ভঙ্গিতে দেবাশিস এক পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বলে—দিস ইজ নবীন দাশগুপ্ত প্লিজড টু মিট ইউ।

রবির পিছনে চাঁপা দাঁড়িয়ে। শাড়ি পরেছে চুল আঁচড়েছে। দেবাশিসের চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে ভারি নরম সুরে বলে—বাবা আমি কি সোনাবাবুর সঙ্গে যাবো?

দেবাশিস অবাক হয়ে বলে—কোথায়?

চাঁপা লাজুক গলায় বলে—সোনাবাবু ছাড়ছে না, কেবল সঙ্গে যেতে বলছে!

রবি করুণ মুখভাব করে বলে—দিদি যাবে বাবা?

দেবাশিস একটু ক্ষীণ হাসি হাসে, বলে—তোমার ইচ্ছে হলে যাবে কিন্তু খাবে কোথায়! ওর তো নেমন্তন্ন নেই।

চাঁপার মুখ একটা হাসির ছটায় আলো হয়ে যায়, বলে—আমি কিছু খাবো না, সকালে পান্তা খেয়ে নিয়েছি, সোনাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকব, সেই আমার খাওয়া।

দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দরজা খুলে লিফটের দিকে এগোয়।

প্রেম একরকম, পাপ আর একরকম, কোনটা প্রেম, কোনটা পাপ তা বোঝা যদিও মুশকিল, তবু কতকগুলো লক্ষণ তৃণা জেনে গেছে। মনে মনে যখন সে দেবাশিসের কথা ভাবে তখন তার শচীনের দিকে তাকাতে লজ্জা করে, ছেলেমেয়ের দিকে চাইতে পারে না আর বুকের মধ্যে একরকম তীব্র শুষ্ক বাতাস বয়, গলা শুকোয়, জিভ শুকোয়, বিনা কারণে চারিদিকে চোরাচোখে তাকিয়ে দেখে। নিজের ছায়াটাকেও কেমন ভয়-ভয় করে।

বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোতে গিয়েই তৃণা ভারি চমকে ওঠে। কিছু না, বাইরের বেসিনে শচীন খুবই নিবিষ্টভাবে তার বাগানের মাটিমাখা হাত ধুচ্ছে। বেঁটেখাটো মানুষ, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, চোখে মুখে একটা কঠোর পুরুষালি সৌন্দর্য আছে। শচীন তার দিকে তাকিয়েও দেখেনি, তবু তৃণা বাথরুমের দরজার পাল্লাটা ধরে নিজেকে সামলে নিল। খোলা শরীরের ওপর কেবল শাড়িটা কোনও রকমে জড়ানো। কেমন লজ্জা হল তার, তাড়াতাড়ি ডানদিকের আঁচল টেনে শরীরের উদোম অংশটুকু ঢেকে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত ঘরে চলে এল।

ঘরটা তার একার, সম্পূর্ণ একার। একধারে মস্ত খাট, বইয়ের সেলফ খাটের নাগালের মধ্যেই, অন্যধারে ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়ার্ডরোব, একটা আলমারি, সবই দামি আসবাব, মস্ত বড় বড় দুটো জানালা দিয়ে সকালের শারদীয় রোদ এসে মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে, উজ্জ্বলতা প্রখর। সাধারণ সায়া ব্লাউজ পরে নিল সে, শাড়িটা ঠিক করে পরল, ওয়ার্ডরোব খুলে বাইরে বেরোনোর পোশাকি শাড়ি আর ম্যাচ করা ব্লাউজ বের করে পেতে রাখল বিছানায়। দূর থেকে একটু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সেগুলো, তারপর আয়নার সামনে গিয়ে বসে। তার চেহারা ছিপছিপে, ফর্সা, মুখশ্রী হয়তো ভালোই, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক তার মুখের সজীবতা! চোখ কথা কয়, চোখ হাসে, নাকের পাটা কেঁপে ওঠে অল্প আবেগে। ঠোঁট ভারী, গাল ভারী, সব মিলিয়ে তার বয়স সত্যিকারের তুলনায় অনেক কম দেখায়। আবার

বয়সের ঢলে তার কোথাও যে কোনও খাঁকতি নেই সেটাও বোঝা যায়। নিজেকে ভালোবাসে তৃণা, ভালোবাসার মতো বলেই। মাঝে মাঝে সে নিজের প্রেমে পড়ে যায়।

পাশের ঘরে শচীনের সাড়া পাওয়া যায়! সুরহীন একরকম গুনগুন শব্দ করে শচীন। গান নয়, অনেকটা গানের মতো। শচীনের ওই এক মুদ্রাদোষ। ওই সুরহীন গুনগুন শব্দ কি ওর একাকিত্বের?

যদি তাই হয়, তবু ওই একাকিত্বের জন্য তৃণা দায়ী নয়। দেবাশিসও নয়। একদা শচীনই ছিল তৃণার সর্বস্ব। কিন্তু শচীনের কে ছিল তৃণা? তৃণা তাই ওই স্বরটা শোনে উৎকর্ণ হয়ে। দু ঘরের মাঝখানের দরজা রাতে বন্ধ থাকে, দিনে মস্ত ভারী সাটিনের পর্দা ঝুলে থাকে। শচীন অবশ্য বেশিক্ষণ ঘরে থাকে না, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওই পর্দা থাকে অনড় হয়ে। কেউ কারও ঘরে যায় না। এ বাড়ির আর এক কোণে থাকে ছেলেমেয়েরা। তাদের সঙ্গেও হুটহাট দেখা হয় না। হলেও কথাবার্তা হয় বড্ড কম। একমাত্র খাওয়ার সময়ে তৃণা সামনে থাকে। সেও এক নীরব শোকসভার মতো। সবাই চুপচাপ খেয়ে যায়। তৃণার চোখে জল আসে, কিন্তু তাতে লাভ কি? চোখের জলের মতো শক্তিশালী অস্ত্র যখন ব্যর্থ হয় তখন মানুষের আর কিছু নেই। সে তখন থাকে না। যেমন তৃণা এ বাড়িতে নেই, এ সংসারে নেই। মৃত্যুর পর বাঁধানো ফটো যেমন ঘরের দেয়ালে স্রেফ তেমনি। তাই তৃণা দায়ী নয়।

তৃণা ঘাড়ে গলায় পাউডারে নরম পাফ ছুঁয়ে দেয়। সিঁদুর দেয়। সামান্য ক্রিম দু'হাতের তেলোয় মেখে মুখে ঘষে। এখন আর কিছু করার নেই। সারাদিন তার করার কিছু থাকেও না বড় একটা। যে লোকটা রান্না করে সে একশো টাকা মাইনে পায়। তার অর্থ, লোকটাকে শেখানোর কিছু নেই। যে সব চাকর বা ঝি ঘরদোর গুছিয়ে রাখে তারাও নিজেদের কাজ বোঝে। তৃণা শুধু ঘুরে ঘুরে একটু তদারক করে। কখনও নিজের হাতে কিছু রাঁধে। সে কারও মুখে তেমন রোচে না, তৃণাও রান্নাবান্না ভুলে গেছে। শুধু কবে কী কী রান্না হবে সেটা বলে দিয়ে আসে। তাই হয়। কেবল নিজের ঘরটাতে সে নিজে বইপত্র গোছায়, বিছানায় ঢাকনা দেয়, ওয়ার্ডরোব সাজায়, ড্রেসিং টেবিলে রূপটানের জিনিস মনের মতো করে রাখে। কাগজ ভিজিয়ে তা দিয়ে আয়না মোছে। এ ঘরে কেউ বড় একটা আসে না। এ তার নিজের ঘর, বড্ড ফাঁকা বড্ড বড়। রাস্তার দিকে একটা ব্যালকনি আছে সেখানে একা ভূতের মতন কখনও দাঁড়ায়। কবিতার বই, পত্র-পত্রিকা গল্প-উপন্যাস আর ছবি আঁকার জলরং, মোটা কাগজ, তুলি—এইসবই তার সারা দিনের সঙ্গী। ইদানীং সে কবিতা লেখে, দু'একটা কাগজে পাঠায়। সে সব কবিতা দুঃখভারাক্রান্ত, নিঃসঙ্গতাবোধ, মন্থর, ব্যক্তিগত, হা-হুতাশে ভরা ভাবপ্রবণতা—এখনও ছাপা হয়নি। এক আধটা কবিতা ছাপা হলে মন্দ লাগত না তার। যে সব ছবি সে এঁকেছে তার অধিকাংশই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। নারকোল গাছ, চাঁদ আর নদীতে নৌকো—এ ছবি আঁকা সবচেয়ে

সোজা। তারপরই পাহাড়ের দৃশ্য। তৃণা আঁকতে তেমন শেখেনি, তুলি রঙের ব্যবহারও জানে না। ছবি জ্যাবড়া হয়ে যায়, তবু আঁকে। ভাবে একটা এগজিবিশন করবে নাকি অ্যাকাডেমী বা বিড়লা মিউজিয়ামে। করে লাভ নেই অবশ্য, কেউ পাত্তা দেবে না। ছবি আঁকার মাথা মুণ্ডুই সে জানে না। তৃণা কলেজে ভালো ক্যারাম খেলতো। বাড়িতে, বিশাল দুটো বোর্ড আছে। একা একা মাঝেমধ্যে গুটি সাজিয়ে টুকটাক স্ট্রাইকার টোকা দিয়ে গুটি ফেলে সে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বলে খেলার কোনও টেনশন থাকে না, ক্লান্তি লাগে। নিজের প্রতিপক্ষ হয়ে একবার কালো, আবার উলটোদিকে গিয়ে নিজের হয়ে সাদা গুটি ফেলে কতক্ষণ পারা যায়?

শচীন একটানা গুনগুন শব্দে কথাহীন সুরহীন একটা গান গেয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে। বনেদি বড়লোক তাই নিজের হাতে প্রায় কিছুই করতে হয়নি তাকে, বাবাই করে গিয়েছিলেন। বাবার বিশাল সম্পত্তি চার ভাই ভাগ করে নিয়েও বড়লোকই আছে। বাড়িটা শচীনের ভাগে পড়েছে। সিমেন্টের কারবার নিয়েছে বড় ভাই, ছোট দু'ভাই নিয়েছে একজন ওষুধের দোকান অন্যজন ভালো কয়েকটা শেয়ার। শচীনরা চার ভাই-ই শিক্ষিত। সে নিজে ইঞ্জিনিয়ার, ভালো চাকরি করে বড় ফার্মে। একবার নিজের পয়সায় অন্যবার কোম্পানির খরচায় বিলেত ঘুরে এসেছে! পৃথিবীর সব দেশেও গেছে সে, চীন আর রাশিয়া ছাড়া। এমন মানুষ আর এমন ঘর পেলে কোন মেয়ে না বর্তে যায়! শক্তসমর্থ এবং কিছুটা নিরাশক্ত শচীন ভালোবাসে ফুল, সুন্দর রং, ভালোবাসে চিন্তাভাবনা, মানুষের প্রতি তার আগ্রহ আছে। তবু এইসব ছুটির দিনে বা অবসরে সে যখন বাগান করে, মন্থরভাবে নিজের ঘরে জার্নাল নাড়াচাড়া করে, যখন গুনগুন করে তখন তাকে বড় নিষ্কর্মা মনে হয়।

ছুটির দিনে তাই তৃণারও অসহ্য লাগে। একা একরকম আর একজন থাকা সত্বেও একা আর একরকম।

বড় অদ্ভুত বাড়ি। সারাদিনেও একটা কিছু পড়ে না, ভাঙে না, দুধ উথলে পড়ে না, ডাল ধরে যায় না। সুশৃঙ্খলভাবে সব চলে! তৃণাকে কোনও প্রয়োজনই হয় না কোথাও। একটা অ্যালসেশিয়ান আর একটা বুলডগ বক্সার কুকুর আছে। সে দুটোরও কোনও ডাকখোঁজ নেই। কেবল শচীনের বুড়ো কাকাতুয়াটা কথা বলে পাকা পাকা। কিন্তু সে হচ্ছে শেখানো বুলি, প্রাণ নেই। অর্থ না বুঝে পাখি বলে—তৃণা কাছে এসো...তৃণা কাছে এসো...

পাখিটা বুড়ো হয়েছে। একদিন মরে যাবে। তখন তৃণাকে কাছে ডাকার কেউ থাকবে না।

না, থাকবে। দেবাশিস। ও একটা পাগল। এমনভাবে ডাকে যে দেশসুদ্ধ, সমাজসুদ্ধ লোক জেনে যায়। শচীন জানে, ছেলেমেয়েরা জেনে গেছে। তৃণার বুকের ভিতরটা সব সময় কাঁপে। কখনও নিষিদ্ধ সম্পর্কের উত্তেজনায়। কখনও ভয়ে। শচীন কিংবা

ছেলেমেয়েরা তাকে বেশ্যার অধিক মনে করে না। আর দেবাশিস? সেও কি তাকে নষ্ট মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবে?

কাকাতুয়াটা ডাকছে, কাছে গিয়ে একটু আদর করতে ইচ্ছে করে পাখিটাকে। মস্ত দাঁড়টা ঝোলানো কাছে শচীনের ঘরের বারান্দায়। যেতে হলে ও ঘর দিয়ে যেতে হবে। শচীন না থাকলে যাওয়া যেত। কিন্তু ওঘর থেকে সমানে সুরহীন গুনগুন শব্দটা আসছে। শচীনের চোখের সামনে নিজেকে নিয়ে গেলেই তার নষ্ট মেয়েমানুষ বলে মনে হয় নিজেকে। এ বড় জ্বালা। ভদ্রলোক বলেই শচীন তাকে কিছু বলে না আজকাল। মাস ছয়েক আগে ধৈর্যহারা হয়ে একদিন চড়চাপড় আর ছড়ির ঘা দিয়েছিল কয়েকটা। তারপর থেকেই হয়তো অনুতাপ এসে থাকবে। কিন্তু তৃণা ওকে জানাবে কি করে যে ওর হাতের সেই মার বড় সুখের স্মৃতি হয়ে আছে তৃণার কাছে আজও! কারণ, তার বিবেক ও হৃদয় একটা শাস্তি সবসময়ে প্রত্যাশা করে।

তৃণা তার পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে উপুড় করা বইটা তুলে পড়তে বসল। কবিতার বই, বহুবার পড়া, মুখস্ত হয়ে গেছে। তবে খোলা সনেটটার দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু মন দিতে পারে না, বইটা রেখে প্যাড আর কলম টেনে নেয়। কলম খুলে ঝুঁকে পড়ে, ধৈর্যহীন চঞ্চলতায় কলম উদ্যত করে নাড়ে। কিন্তু লিখতে পারে না। কয়েকটা রোগা লম্বা লোকের চেহারা এঁকে ফেলে। তারপর সারা কাগজটা জুড়ে হিজিবিজি আঁকতে আর লিখতে থাকে। কাগজটা নষ্ট করে দলা পাকিয়ে ফেলে দেয়। আবার হিজিবিজি করে পরের কাগজটাতে।

কাকাতুয়াটা শচীনকে ডাকছে—শচীন, চোর এসেছে...শচীন, চোর এসেছে...

শচীনের ঘর এখন নিস্তব্ধ। কেউ নেই। তৃণা উঠে শচীনের ঘরে উঁকি দেয়। গোছানো ঘর। বাপের আমলের বাড়িটা শচীন আবার নতুন করে একটু ভেঙে গড়ে নিয়েছে। নতুন করে তৈরি করার জন্যই ডাক পড়েছিল দেবাশিসের! সিভিল ড্রাফটসম্যান আর ইন্টিরিয়র ডেকরেটর 'ইনডেক'-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কথাটা বড্ড ভারী, ইনডেক এমন কিছু বড় কোম্পানি নয়। কলকাতায় ওরকম কোম্পানি শতাধিক আছে। তবু ইনডেক-এর কিছু সুনাম আছে। ইন্টিরিওর ডেকরেশন ছাড়াও ওরা ছোটখাটো কনস্ট্রাকশন কিংবা রিনোভেশন করে। বাড়ির প্ল্যান করে দেয়। এত কিছু একসঙ্গে করে বলেই কাজ পায়। দেবাশিস দাশগুপ্ত এক সময়ে আর্টিস্ট ছিল। কমার্শিয়াল লাইনে চমৎকার নাম করেছিল সে। কিন্তু উচ্চাশা বলবতী হওয়ায় সে কিছুদিন সিনেমার পরিচালনায় হাত লাগাল। সবশেষে ইন্টিরিয়র ডেকরেশনে এসে মন লাগাতে পারল। আর্টিস্ট ছিল বলে, এবং রং ও ডিজাইনের নিজস্ব চোখ আছে বলে, আর পূর্বতন গুডউইলের জন্যও ওর দাঁড়াতে দেরি হয়নি। এখন চৌরঙ্গিতে অফিস করেছে। একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, দুজন ড্রাফটসম্যান এবং আরও কয়েকজনকে মাইনে দিয়ে রেখেছে,

একটি মেয়ে রিসেপশনিস্ট আছে। নিজস্ব চেম্বারটা এয়ারকন্ডিশন করা, নিজের কেনা ফ্ল্যাটে থাকে। একটা মরিস অক্সফোর্ড গাড়ি হাঁকড়ায়।

কিন্তু এ হচ্ছে আজকের দেবাশিস, পুরান দেবাশিসকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।

এ বাড়ি রিনোভেট করতে দেবাশিস যেদিন এল, বাইরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে চতুর পায়ে শচীনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাড়িটা। চোখে উগ্র স্পৃহা, চলাফেরায় কেজো লোকের তাড়া। শচীন বাড়িটা ঘুরে দেখাচ্ছিল। কোথায় দেওয়াল ভেঙে ব্যালকনি হবে, কোথায় মেঝের টালি পালটাতে হবে। কোথায় নতুন ঘর তুলতে হবে, আর কেমনভাবে সাজাতে হবে, পুরনো বাড়িটাকে আধুনিক করে তুলতে। শচীনের সঙ্গে এই লম্বাপানা সুগঠন লোকটাকে অহংকারী তৃণা খুব হেলাভরে এক-আধপলক দেখেছে, লক্ষ করেনি। শচীনই তাকে ডাকে, তৃণা, তোমার যে কী সব প্ল্যান আছে তা দাশগুপ্তকে সব বুঝিয়ে দাও...

চায়ের টেবিলে ওরা তখন বসেছে। মুখোমুখি দেবাশিস। তৃণা তার দিকে একপলক তাকিয়েই মুখ নীচু করে প্যাডে একটা স্টাডি রুমের ছবি এঁকে দেখাতে যাচ্ছিল, দেবাশিস একটু ভোম্বলের মতো তাকিয়ে থেকে বলে—তৃণা না?

তৃণা চমকে উঠেছিল। তাকিয়ে একটু কষ্টে চিনতে পেরেছিল দেবাশিসকে। ছেলেবেলার কথা, চিনতে তো কষ্ট হবেই।

শচীন বলে—চেনেন নাকি?

দেবাশিস বড় চোখে চেয়ে বলে—চেনা কঠিন বটে, তৃণার তো এতকাল বেঁচে থাকার কথাই নয়। যা ভুগত, ভেবেছিলাম মরেটরে গেছে বুঝি এতদিনে।

—বটে! বলে শচীন হাসে।

—বটেই তো! দেবাশিস অবাক হয়ে বলে—আমাদের মফসসল শহরে পাশাপাশি বাস ছিল। ওর সব কিছু আমি জানি। ছেলেবেলায় দেখতুম, ও হয় বিছানায় পড়ে আছে, নাহলে বড়োজোর বারান্দা কি উঠোন পর্যন্ত এসে হাঁ করে অন্য খেলুড়েদের খেলা দেখছে। কখনও আমাশা, কখনও টাইফয়েড, কখনও নিউমোনিয়ায় যায়-যায় হয়ে যেত, আবার বেঁচেও থাকত টিকটিক করে। আমরা যখন ও শহর ছেড়ে চলে আসি তখন ও বোধহয় ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। আমার মা প্রায়ই দুঃখ করে বলত মদনবাবুর মেজ মেয়েটা বাঁচলে হয়!

তৃণা ভারি লজ্জা পেয়েছিল। সত্যিই সে ভুগত। বলল—আহা, সে তো ছেলেবেলায়।

—তারপর তো আর তোমাকে দেখিনি। আমাকে চিনতে পারছো তো!

—পারছি!

—বলো তো কে!

—রাজেন জ্যাঠার ছেলে।

দেবাশিস হঠাৎ হা হা করে হেসে বলে—রাজেন জ্যাঠা আবার কি! আমার বাবাকে ওই নামে কেউ চিনতই না। হাড়কেপ্পন ছিল বলে বাবার নাম সবাই দিয়েছিল কেপ্পন দাশগুপ্ত। সেটা সংক্ষেপ হয়ে হয়ে লোকে বলত কেপুবাবু। আমাদেরও ছেলেবেলায় কেউ কোন বাড়ির ছেলে জিজ্ঞেস করলে বলতুম—আমি কেপুবাবুর ছেলে।

তৃণার সবটাই মনে আছে। যারা রোগে ভোগে তাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়! কেপুবাবুর ছেলে দেবাশিসকে সবাই চিনত ডানপিটে বলে। অমন হারামজাদা পাজি ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। যত ছেলেবেলার কথা বলে উল্লেখ করেছিল দেবাশিস তত ছেলেমানুষ ছিল না। তখন রোগেভোগা তৃণার বয়স বছর তের দেবাশিসের উনিশ কুড়ি। পাড়ার সব মেয়েকেই চিঠি দিত দেবাশিস, একমাত্র রোগজীর্ণ তৃণাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি বলে চিঠি লেখেনি। বহুকাল পরে সেই উপেক্ষিত মেয়েটিকে পরিপূর্ণ ঘরসংসারের চালচিত্রের মধ্যে দেখে তার বিস্ময় আর শেষ হয় না।

বলল—মেয়েদের মুখ আমার ভীষণ মনে থাকে। নইলে তোমাকে চেনবার কথা নয়। বেঁচে আছো, তাই বিশ্বাস হতে চায় না। শচীনবাবুর ভাগ্যেই বোধহয় বেঁচে আছো। ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন। তুমি না বেঁচে থাকলে শচীনবাবুকে আজও ব্যাচেলার থাকতে হত।

ঘটনাটা এরকম নিরীহভাবেই শুরু হয়েছিল। ইনডেক তাদের বাড়িটা ভেঙে মেরামত করছে, সাজিয়ে দিচ্ছে, ব্যালকনি বানাচ্ছে, জানালা বসাচ্ছে—সেইসব তদারক করতে সপ্তাহে এক-আধবার আসত দেবাশিস। ভারি ব্যস্ত ভাবসাব, চটপটে কেজো মানুষের মতো বিদ্যুৎগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেত। গম্ভীর, পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন দেবাশিস কোনওদিকে তাকাত না। দেখাশোনা শেষ করে কোনওদিন তৃণাকে ডেকে বলত—চলি। কোনওদিন বা দূরত্বসূচক হালকা গলায় বলত চা খাওয়াবে নাকি কাদম্বিনী?

ও নামটা সে নিয়েছিল রবি ঠাকুরের 'জীবিত ও মৃত' গল্প থেকে। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।' একদিন লাইনটা উদ্ধৃত করে দেবাশিস বলেছিল—তুমি হচ্ছ সেই মানুষ, মরোনি প্রমাণ করার জন্যই বেঁচে আছো, কিন্তু কি জানি, বিশ্বাস হতে চায় না।

উলটে তৃণা এলিয়েটের লাইন বলেছে—আই অ্যাম ল্যাজারাস, কাম ফ্রম দি ডেড কাম টু টেল ইউ অল, আই শ্যাল টেল ইউ অল...

শচীন সবসময় বাড়ি থাকে না। রেবা আর মনু বড়লোকের ছেলেমেয়ে যেমন হয় তেমনি নিজেদের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে! তৃণা সারাদিন একা। সে ক্যারাম খেলতে পারে, টেবিল-টেনিস খেলতে পারে, একটু আধটু ছবি আঁকে, কবিতা লেখে। কিন্তু কোনওটাই তার সঙ্গী নয়! এবং কবিতার বই খুলে বসলে একরকম দূরের অবগাহন হয়

তার। দেবাশিস নামকরা আর্টিস্ট, দুটো ফ্লপ ছবির পরিচালক, বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী মহলে তার গভীর যোগাযোগ। তৃণার সেইটেই অবাক লাগত। ওই ফাজিল, মেয়েবাজ, এঁচোড়েপাকা ছেলেটির মধ্যে এসব এল কোত্থেকে।

কখনও চা বা কফি খেতে বসে দেবাশিস বলত—তৃণা তোমার সত্যিই কিছু বলার আছে?

তৃণা অবাক হয়ে বলেছে—কী বলার থাকবে?

—ওই যে বলো, আই শ্যাল টেল ইউ অল।

—যাঃ, ও তো কোটেশন।

—মানুষ যখন কিছু উদ্ধৃত করে তখন তার সাবকনশাসে একটা উদ্দেশ্য থাকে।

—আমার কিছু নেই।

দেবাশিস গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবত।

রেবার জন্মদিনে সেবার দেবাশিসকে সস্ত্রীক নেমন্তন্ন করেছিল তৃণা। দেবাশিসের বৌ এল তার সঙ্গে। মানানসই বউ। ভালো গড়ন, লম্বাটে চেহারা। রং কালো, মুখশ্রী খারাপ নয়। কিন্তু সারাক্ষণ কেবল টাকা আর গয়না আর গাড়ি আর বাড়ির গল্প করল। বুদ্ধি কম, নইলে বোঝা উচিত ছিল, যে বাড়িতে বসে বড়লোকি গল্প করছে সে বাড়ি তাদের তিনগুণ ধনী। হঠাৎ যারা বড়লোক হয় তারা টাকা দিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না, হা-ঘরের মতো বাজার ঘুরে রাজ্যের জিনিস কিনে ঘরে জঙ্গল বানায়, বনেদি বড়লোকেরা ওরকমভাবে টাকা ছিটোয় না, গরম দেখায় না। দেবাশিসের বউ চন্দনা টাকায় অন্ধ হয়ে চোখের সামনে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। মুখে বেড়ালের মতো একটা আল্হাদী ভাব, চোখে সম্মোহন, বারবার স্বামীকে ধমক দিচ্ছিল। অনেক অতিথি ছিল বাড়িতে। ওদের সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে পারেনি তৃণা। অল্প যেটুকু সময় কাটিয়েছিল তাতে বড় লজ্জা করেছিল। দেবাশিসের বউ বস্তুজগৎ ছাড়া আর নিজের সুখদুঃখ ছাড়া কোনও কিছুর খবর রাখে না!

এসব বছর-দুই আগেকার ঘটনা। বাড়ি রিনোভেট করা সদ্য শেষ হয়েছে তখন। নতুন হয়ে ওঠা বাড়ি ঝলমল করছে। তৃণা নিজের ঘরটা বেশি সাজায়নি। বেশি সাজানো ঘর তার পছন্দ নয়। তাতে তার মনের ধূসরতা নষ্ট হয়ে যায়। একটা সাদাসিধে নরম রং, আর আলো-হাওয়ার ঘরই তার ভালো লাগে। ভালো লাগে বিষণ্ণতা, একা থাকা, কবিতা।

দেবাশিস বলেছিল—তৃণা, ইনডেক তোমার কিছু করতে পারল না, একটা ব্যালকনি ছাড়া।

—আমার জন্য ইনডেকের কিছু করার নেই যে, আমি ডেকরেশন ভালোবাসি না।

—জানি। তুমি ক্লায়েন্ট হিসেবে যাচ্ছেতাই!

তৃণা হেসেছিল একটু।

বিপজ্জনক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলল—কিন্তু মেয়ে হিসেব ইউনিক। ঠিক বয়সটিকে ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা হলে বড় ভাল হত।

তৃণা ভয় পেয়ে বলে—ইস!

দুঃখের মুখ করে দেবাশিস বলে—আমার বউকে তো দেখেছো!

—দেখলাম।

—কেমন?

—সুন্দর।

—সুন্দর কিনা তা কে জিজ্ঞেস করেছে?

—তবে?

স্বভাবের কথা বলছি।

—বাঃ! তা কী করে বলব! একবার তো মোটে দেখেছি, বেশি কথাবার্তা হয়নি। তবে স্বভাব খারাপ নয় তো।

—ও টাকা আর স্ট্যাটাস ছাড়া কিছু বোঝে না, কোন অনুভূতি নেই।

—তাতে কী! সব মেয়েই ওরকম।

—তুমি তো নও?

তৃণা বিষণ্ণ হয়ে বলেছে—আমার কথা ছেড়ে দাও, বহুদিন রোগে ভুগে আমি একটু অ্যাবনরমাল। আমি যে বেশি ভাবি, বেশি চুপ করে অন্যমনস্ক থাকি, কবিতা লিখি—এসব আমার অস্বাভাবিক মন থেকে তৈরি হয়েছে। এ বাড়ির কেউ আমাকে তাই পছন্দ করে না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ইন্টেলেকচুয়াল মা বলে খ্যাপায়।

—হবে।

—শোনো, নিজের বউয়ের নিন্দে বাইরে কোরো না। ওটা রুচির পরিচয় নয়। যেমনটি পেয়েছো তেমনটির সঙ্গেই মানিয়ে চলো। তুমি বড় ছটফটে, চঞ্চল, বহু মেয়েকে চিঠি দিতে। অত মন তুলে নাও কী করে? তোমার যাকে-তাকে হুট করে ভালো লাগে, আবার হুট করে অপছন্দ হয়ে যায়। মনটা কোথাও একটু স্থির না করলে সারাজীবন ছুটে বেরাতে হবে।

দেবাশিস মৃদু হেসে বলে—তুমি এত কথা জানলে কি করে। আমি তো এখনও তেমন করে বউয়ের নিন্দে তোমার কাছে করিইনি। কী একটা বলতে শুরু করেছিলাম তুমি আগে বাড়িয়ে এককাঁড়ি কথা বললে।

ভারি লজ্জা পেয়ে গেল তৃণা। আসলে তার মন বড় বেশি কল্পনাপ্রবণ, একটু কিছু ঘটলেই তার পিছনে একটা বিশাল কার্যকারণ ভেবে নেওয়া তার স্বভাব। একবার আলমারি আর বাক্সের এক থোকা চাবি হারিয়ে ফেলেছিল সে, তার আগের দিন বাড়ির একটা দোখনে চাকর বিদেয় হয়েছে। চাবিটা চেনা জায়গায় খুঁজে না পেয়েই তৃণা ভাবতে

বসল, এ নিশ্চয়ই সেই চাকরটার কাজ। জিনিসপত্র কিছু হাতাতে না পেরে চাবিটা নিয়ে পালিয়েছে। এরপর গাঁয়ের লোক জুটিয়ে একদিন ফাঁক বুঝে হাজির হবে। তৃণাকে মেরে রেখে ডাকাতি করে নিয়ে যাবে। কাল্পনিক ব্যাপারটাকে এতদূর গুরুত্ব দিয়ে সে প্রচার করেছিল যে শচীন বাধ্য হয়ে থানা-পুলিশ করে! চাকরটার গাঁয়ে পর্যন্ত পুলিশকে সজাগ করা হয়। কিন্তু তিনদিনের মাথায় বাথরুমে সাবানের খোপে চাবিটা তৃণাই খুঁজে পায়।

তার মন ওইরকমই, দেবাশিসকে সে প্রায় অকারণে বউয়ের ব্যাপারে দায়ী করেছে, দেবাশিস তার প্রেমে পড়ে গেছে গোছের চাপা একটা আশঙ্কাও প্রকাশ করে ফেলেছে! লজ্জা পেয়ে সে বলে—আমার কেমন যেন মনে হয় তোমাকে। সাধারণ জীবনে তুমি খুশি নও।

দেবাশিস শ্বাস ফেলে বলেছে—তা ঠিকই। তবে খুব ভয়ের কিছু নেই।

যাই বলুক, ব্যাপারটা অত নিরাপদ ছিল না। এটা বোঝা যেতই, দেবাশিস তার বউকে ভালোবাসে না। অন্য দিকে তৃণাকে ভালোবাসে না শচীন। কিংবা তৃণার কল্পনাপ্রবণ মন যেন সেইটাই ভেবে নেয়। মিথ্যে নয় যে, তৃণার একথা ভাবতে ভালোই লাগত যে শচীন তাকে ভালোবাসে না, রেবা ভালোবাসে না, মনু ভালবাসে না। সংসারে কেউ তাকে ভালোবাসে না। সে একা, সে বড় দুঃখী। তার এই দুঃখের কোনও ভিত্তি থাক বা না থাক, একথা ভাবতে তার ভালো লাগত। এই দুঃখই তাকে সবচেয়ে বড় রোমান্টিক সুখটা দিত। দুঃখের চিন্তা বা চিন্তার দুঃখ কারও কারও কাছে বড় সুস্বাদু।

দেবাশিস সেই রন্ধ্রপথের সন্ধান পেয়েছিল। এ বাড়ির অনেক ফাটা ভাঙা দুর্বল স্থান সে যেমন খুঁজে বের করে মেরামত করে ঢেকে সাজিয়ে দিয়ে গেছে, তেমনি তৃণার সঠিক দুর্বলতাটুকু জেনে নিল সে, অনায়াসে। কিন্তু সারিয়ে দিয়ে গেল না, বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

তৃণার মন এমনই একটা কিছু চেয়েছিল। কোনও অঘটন, একটু পতন, একটু পাপ সামান্য অপরাধবোধ উজ্জ্বলতম রঙের মতো স্পষ্ট করে দেয় জীবনকে। তার সেই দুর্বলতা দেবাশিস ফুলের মতো চয়ন করে নিজের বাটনহোলে সাজাল লাল গোলাপের মতো। গোলাপটা লাল কেন? তৃণা ভেবে দেখেছে। লোকলজ্জার রাঙা আভায় তা লাল! কিছু পাপ কালো, কিছু পাপ রাঙা।

রাঙা শাড়িটা পরে নিল তৃণা। সাজল। ঘড়িতে এখনও বেশি বাজেনি, সময় আছে। থাকগে। তৃণা একটু ঘুরবে। তারপর বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াবে।

পেট্রল পাম্পে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নেমে দেবাশিস আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। হাই তুলতে তুলতেই বলল—বিশ লিটার। বলে পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা বের করে দিল।

রবি নেমে আইসক্রিমের স্টলটার কাছে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলে—বাবা, বন্ধ যে!

—কী আর করা যাবে!

রবি বুটের শব্দ তুলে ছুটে আসে—আজ কেন বন্ধ?

—একটু পরে খোলে। চলো, তোমাকে ক্যান্ডি কিনে দেবো!

গাড়ির ভিতর থেকে চাঁপা ডেকে বলে—সোনাবাবু, তোমার জন্য আমি তো খাবার এনেছি, বাইরের জিনিস তবে কেন খাবে?

রবি তার বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোট চোখে বাবাকে একটু দেখল। প্যান্ট শার্ট পরা দীর্ঘকায় বাবা, গলায় একটা সিল্কের ছাপা সাদা-কালো স্কার্ফ। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাবা জুতোর আগাটা তুলছে নামাচ্ছে, পকেটে হাত, ভ্রূ কোঁচকানো।

রবি ডান পা বাড়িয়ে, ডান হাত মুঠো করে তুলে মুখ আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর বাঁ হাত বাড়িয়ে বক্সিংয়ের স্ট্যান্স তৈরি করে এগিয়ে এসে বাঁ হাতটা বাবার পেটে চালিয়ে দিয়ে শব্দ করে—হোয়্যাম!

দেবাশিস কোলকুঁজে হয়ে সরে যায়। তারপর সেও ফিরে দাঁড়ায়। অবিকল রবির মতো স্ট্যান্স নিয়ে এগিয়ে ভুয়ো ঘুঁষি মারে তার মুখে, রবি চট করে মুখটা সরিয়ে নিয়ে ঘুরে এগিয়ে আসে। নিঃশব্দে দুজন দুজনের দিকে চোখ রেখে চক্কর খায়, ঘুঁষি চালায়। চাঁপা গাড়ি থেকে মুখ বের করে স্মিত চোখে চেয়ে থাকে। পেট্রল ভরতে ভরতে পাম্পের অ্যাটেনডেন্ট খুব হাসে।

দেবাশিস পেটে একটা ঘুঁষি খেয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে। সামনে তেজি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রবি রেফারির মতো গুনতে থাকে ওয়ান...টু...থ্রি...নাইন আউট! বলে শূন্যে আঙুল তোলে রবি।

দেবাশিস উঠে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে বলে কংগ্র্যাচুলেশনস ফর জাস্ট বিয়িং দা নিউ হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন অব দা ওয়ার্ল্ড।

থ্যাংকস। রবি হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়। মৃদু হাসে। তারপর আস্তে করে বলে—মে আই পুট থ্রু এ টেলিফোন কল?

—টু হুম?

—মাই ফ্রেন্ড রঞ্জন।

—গো এহেড।

দ্বিধাহীন গটমটে পায়ে রবি কাচের দরজা ঠেলে গিয়ে অফিস ঘরে ঢোকে। ফোন তুলে নেয় চালাক চতুর ভঙ্গিতে। দেবাশিস কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। শুনতে পায় রবি বলছে—হেল্লো, ইজ রঞ্জন অ্যারাউন্ড?...ইয়েস, রঞ্জন, দিস ইজ রবি—আউট ফর ফান...ফার্স্ট টু জু, দেন টু মণিমা অ্যাট মানিকতলা...ইয়েস। ওঃ নো, নট মহেশতলা, মানিকতলা...এম ফর..এম ফর..

দরজার কাছ থেকে দেবাশিস প্রম্পট করে—মিরাট।

চোখের কোণ দিয়ে দেবাশিসকে একবার দেখে নিয়ে মাথা নাড়ে রবি। ফোনে বলে—এম ফর মাদার। এ ফর—

—এলাহাবাদ। রবি প্রতিধ্বনি করে—অ্যান্ড এন ফর নিউ দিল্লী, আই ফর ইন্ডিয়া।

দেবাশিস আস্তে সরে আসে। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে বসে! অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরায়। কথাটা কানে বিঁধে থাকে। এম ফর মাদার।

রবি যখন গাড়িতে এসে উঠল দেবাশিস একটু গম্ভীর। গাড়ি ছেড়ে চালাতে চালাতে বলে—তুমি ওভাবে স্পেলিং করছিলে কেন? ফোনে স্পেলিং করতে জায়গার নাম বলাই সুবিধে। মাদার কি কোনো জায়গা?

রবি একটু শিশু হাসি হাসে। বলে—জায়গাই তো?

—জায়গা? মাদার আবার কি রকম জায়গা?

—যেমন মাদারল্যান্ড!

দেবাশিস হাসে। তারপর শ্বাস ছেড়ে বলে—কিন্তু তুমি তো শুধু মাদার বললে, ল্যান্ড তো বলোনি।

লজ্জায় দু হাতে চোখ ঢেকে একটু হাসে রবি! বলে—ভুল হয়েছিল।

গভীর একটা শ্বাস ফেলে দেবাশিস। রবি এখনও ভোলেনি শুধু চেপে আছে। ওর ভিতরে হয়তো কষ্ট হয় মায়ের জন্য। কে জানে!

রবি সিটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসেছে, মুখে আঙুল, দুলছে সিটের ওপর। চাঁপা সতর্ক গলায় বলে—পড়ে যাবে সোনাবাবু।

—তোমার কেবল ভয়। বলে রবি ইচ্ছামতো দোল খায়, বলে—বাবা, আমি পিছনের সিটে বসব, দিদির কাছে?

—যাও। দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে বলে।

চাঁপা হাত বাড়িয়ে সিটের ওপর দিয়ে পিছনে টেনে নেয় রবিকে।

সারাক্ষণ এরকমই করে রবি। একবার পিছনে যায়, একবার সামনে আসে। দুষ্টু হয়েছে খুব! কিন্তু দেবাশিস ওকে বকে না। মায়া হয়। ওর কি বড় মায়ের কথা মনে পড়ে?

দেবাশিস চন্দনাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। একটা সময় অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল তার। কাকে বিয়ে করবে তার কিছু ঠিক ছিল না। চন্দনা ছিল সেসব মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী আর কৌশলী। কুমারী অবস্থায় সে গর্ভে দেবাশিসের সন্তান নেয়। সেই অবস্থায় তাকে ফেলতে পারার সাধ্য দেবাশিসের হয়নি। চন্দনা সন্তান নষ্ট করতে দেয়নি। বলেছে—তুমি যদি বিয়ে না করো না করবে, ও আসুক কুমারী মায়ের কোলে।

সেটাই ছিল ওর কৌশল। দেবাশিস দু-মাসের গর্ভবতী চন্দনাকে বিয়ে করে আনল। যথাসময়ে রবি হল। ওর চার বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল চন্দনা।

বড় রাগী ছিল, ভেবেচিন্তে কিছু করত না।

তৃণার সঙ্গে দেবাশিসের সম্পর্কটা তখনও তৈরি হয়নি। তৃণা মাঝেমধ্যে তাকে ডাকত ছবি আঁকার সুলুকসন্ধান জানতে। ওটা তখন তার বাই। জলরঙা ছবি আঁকতে গিয়ে তুলির জ্যাবড়া দাগ আর অসহিষ্ণু টান দিয়ে হয়রান হত। দেবাশিস তাকে তুলি চালাতে শিখিয়েছিল। দুটো রঙের মাঝখানে কি ভাবে একটা রঙের সঙ্গে আর একটাকে মেলাতে হয় তার কৌশল অভ্যাস করাত। কিন্তু তাতে সময়টা নিত বড্ড বেশি। ব্যস্ত দেবাশিস তার অর্থকরী সময়টা যে নষ্ট করছে তা খেয়াল করত না। বড় ভালো লাগত।

তৃণা দেখতে খুব সুন্দর তা তো নয়, উপরন্তু বিবাহিতা, দুটি বড় বড় সন্তানের মা, এমন মেয়ের প্রতি আকর্ষণবোধ বড় অদ্ভুত দেবাশিসের পক্ষে। সে তো মেয়ে কিছু কম দেখেনি। তৃণার প্রতি এই দুর্বলতার তবে কারণ কি?

কারণ একটাই, কৈশোরকাল। সেই বয়সটার যাবতীয় স্মৃতিই বড় মারাত্মক। তৃণার মধ্যে আর কিছু না থাক, ছিল সেই স্মৃতির সৌরভ তাকে ঘিরে। রোগা দুঃখী সেই কিশোরী মেয়েটাকে সে কবে ভুলে গিয়েছিল। দুরন্ত সময় তাকে নতুন করে ফিরিয়ে এনেছে তার কাছে। আর একটা কারণ চন্দনা নিজে।

তৃণার সুখের ঘর কেন ভাঙতে যাবে দেবাশিস? সে ভালো লোক ছিল না কোনওদিনই। তবু তার তো রুচি ছিল। সুযোগ পেলে সে যে-কোনও মেয়েকেই উপভোগ করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পাগল হয় না তো কারও জন্য! আর তৃণা পাগল করা মেয়েও নয়। যদিও তৃণার বয়স গড়িয়ে যায়নি, তবু তো ছেলেমেয়ের মা, গিন্নিবান্নি! এখন কি আর চোখে রং ছুঁড়ে দেয়ালা করে কেউ? ছবি-আঁকার ছলে তারা পরস্পরের দীর্ঘশ্বাস শুনেছিল। একজনের ছিল শচীন, অন্যজনের ছিল চন্দনা। তবু এও ঠিক, পৃথিবীতে কেউ কারও নয়।

দেবাশিস একটা জীবন যদি মেয়েবাজি না করত তবে তার চরিত্রে রাশ টানার অভ্যাস হত। কিংবা যদি চন্দনা হত মনের মতো বউ, তবে রাশ টানতে পারত চন্দনাই।

তা হল না। চন্দনা তাকে ঘরে টিকতে দিত না। কেবলই বলত—কোথায় ছবি আঁকা হচ্ছে, সব আমি জানি। তুমি মরো।

তখন সুন্দর ফ্ল্যাটটায় বাস করে তারা। লিফটে ওঠে নামে। গ্যারেজে গাড়ি। রবি তখন অজস্র কথা বলে। সংসারটা সবে জমে উঠেছে।

একদিন ছুটির সকালে চন্দনা দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। রবি ঘুমন্ত মাকে জ্বালাচ্ছিল খুব। উঠেই ঘা কতক দিল রবির পিঠে। যখন মারত তখন বড় নির্মমভাবে মারত, মায়া করত না, আবার একটু পরেই থামলে আদর করত। চন্দনার মাথায় একটু ছিট তো ছিলই।

সেদিন সকাল থেকেই চন্দনা বিগড়ে গেল।

দেবাশিস রোজকার মতো বসেছিল তার বাইরের ঘরে। সামনে খোলা স্টেটসম্যান, টুলের ওপর রাখা পা, পায়ের পাশে কফির কাপ। চন্দনা এসে স্টেটসম্যানটা কেড়ে নিল হাত থেকে। বলল—কী ভেবেছো তুমি?

—কী ভাববো। ক্লান্ত দেবাশিস জবাব দেয়।

—কত লোক অন্যায় করে ধরা পড়ে। তুমি কেন পড়ো না?

দেবাশিসের মনে পড়ে, সে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল। মনে মনে প্রার্থনা করেছিল—হে ঈশ্বর, চন্দনা কেন বেঁচে আছে? মুখে বলেছিল—চুপ করো।

চন্দনা চুপ করল না। অসম্ভব রেগে গেল। উলটোপালটা বকতে লাগল দেবাশিসকে। গালাগাল দিল অজস্র। অবশেষে কাঁদল এবং কাঁদতে কাঁদতেই অসংলগ্ন বকতে লাগল একা—তুমি আমার বাবাকে ঠকিয়েছো—আমার ছেলেকে ঠকিয়েছো—তুমি আমাকে লুকিয়ে টাকা জমাও—

এসব কথা বাস্তব সত্য নয়। কোনও মানেও হয় না। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার মত দিল—অজস্র মাথাধরার বড়ি, ঘুমের পিল, তার ওপর নিজের নির্ধারিত অসুখের জন্য নিজস্ব প্রেসক্রিপশনে খাওয়া ওষুধ, দুশ্চিন্তা উদবেগ—সব মিলেমিশে একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে।

সেই মানসিক ভারসাম্যহীনতা আর স্নায়ুর বিকার থেকে কোনওদিনই সুস্থ হতে পারেনি চন্দনা। একদিন মরল। সাততলা থেকে সোজা লাফিয়ে পড়ল। তখন খুব ভোর। দেবাশিস আর রবি তখনও ওঠেনি।

দেবাশিস অবশ্য ছাড়া পেয়ে গেল কোর্ট থেকে। কিন্তু বেঁচে চন্দনা যতটা না ছিল, মরে তার চেয়ে ঢের বেশি ফিরে এল জীবনে। তাকে ভুলতেই তখন তৃণার পিপাসা ইচ্ছে করে খুঁচিয়ে তোলে দেবাশিস। যা অবৈধ তার মতো মাদক আর কি আছে!

—বাবা! রবি ডাকে।

—উঁ। দেবাশিস অন্যমনস্ক উত্তর দেয়।

—চিড়িয়াখানায় আমরা কেন যাচ্ছি?

—যাবে না?

—অনেকবার গেছি তো! ভালো লাগে না।

বিস্মিত দেবাশিস প্রশ্ন করে—তবে কোথায় যাবে?

রবি লজ্জার সঙ্গে বলে—বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

—তবে?

—মণিমার কাছে চলো।

—ও! দেবাশিস গাড়ি ধীর করে একটু হাসে। তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে—ঠিকই তো! সব ছুটির দিনে চিড়িয়াখানা কি আর ভালো লাগে!

—ফিরে যাই চলো।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে—পার্ক স্ট্রিটের কোন রেস্টুরেন্টে কী যেন খাবে বলেছিলে। খাবে না?

রবি তার চালাক হাসিটা হেসে বলে—পিপিং।

দেবাশিস বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে—যাবে না?

—যাবো। বুড়োদা, নিনকু, পলটু, বাপি, ঝুমু আর নানির জন্য নিয়ে যাব। ওদের বলেছিলাম এই রবিবারে পিপিঙের খাবার খাওয়াবো।

—হ্যাঁ?

—হ্যাঁ। রবি হাসে।

স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে দেবাশিস। গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

—বাবা।

—উঁ।

—মণিমা আমাকে খুব ভালোবাসে।

—জানি তো।

—বুড়োদা, নিনকু, পলটু সবাই।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ খুব ভালোবাসে। গেলে ছাড়তেই চায় না। বলে—তুই আমাদের কাছে থাক।

—ও।

—আমি কেন ওদের কাছেই থাকি না বাবা? মণিমা সকলের চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসে।

দেবাশিস সামান্য গম্ভীর হয়ে যায়। প্রথমটায় কথা বলতে পারে না। অনেকক্ষণ রবি নিঃশব্দে বাবার মুখখানা চেয়ে দেখে। মুখ দেখে বোধ হয় বুঝতে পারে, বাবা খুশি হয়নি।

পিছন থেকে চাঁপা বলে—তুমি বাড়িতে না থাকলে আমরা কার কাছে থাকবো সোনাবাবু? বাবার যে তোমাকে ছাড়া ভীষণ মন খারাপ হয়।

—অল্প কদিন থাকবো। রবি উত্তর দেয়।

—তারপর চলে আসবে? চাঁপা প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। আমিও তো বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারি না।

ময়দানের ভিতর দিয়ে গাড়ি উড়িয়ে দেয় দেবাশিস। এম ফর মাদার—কথাটা ভুলতে পারে না সে। তার ফ্ল্যাটবাড়িতে চন্দনার কোন ফটো নেই। ইচ্ছে করেই চন্দনার সব ফটো সে তার লকারে চাবি দিয়ে রেখেছে, যাতে রবির চোখে না পড়ে। এই বয়সে

মাতৃহীনের মায়ের কথা বেশি মনে পড়া কষ্টকর। চন্দনার শাড়ি পোশাক, রূপটানের সব জিনিসপত্র, তার হাতের লেখা কাগজ কিংবা যত চিহ্ন ছিল সবই সরিয়ে দিয়েছে দেবাশিস, শাড়িগুলি বিলিয়ে দিয়েছে একে ওকে। মানিকতলার বোন ফুলিকে কয়েকটা দামি শাড়ি দিয়েছিল, ও নিতে চায়নি তবু জোর করে দিয়েছিল দেবাশিস—পড়ে থেকে নষ্ট হবে, তুই পর।

একদিন মনের ভুলে ফুলি একটা জয়পুরী ছাপওলা সিল্কের শাড়ি পরেছিল রবির সামনে। রবি হাঁ করে কিছুক্ষণ দেখল শাড়িটা, তারপর মুখখানায় হাসি-কান্না মেশানো একরকম অদ্ভুত ভাব করে বলল—মণিমা, আমার মায়ের ঠিক এরকম একটা শাড়ি ছিল।

শিশুদের মনের খবর রাখা খুবই শক্ত। ওদের স্মৃতি কত দূরগামী, কত ছবির মতো স্পষ্ট ও নিখুঁত তা বুঝতে পেরে একরকম অদ্ভুত যন্ত্রণা পেয়েছিল দেবাশিস। পারতপক্ষে সে তার মায়ের কথা বলে না। জানে, সে মায়ের কথা বললে তার বাবা খুশি হয় না। এতটা বুদ্ধি ওই শিশুমাথায়!

বুকের ভিতরটা চলকে ওঠে দেবাশিসের। ছেলের প্রতি হঠাৎ ভালোবাসায় ছটফট করে। পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামিয়ে রবিকে নিয়ে নামে। রেস্টুরেন্টে বসে মেনুটা রবির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—তোমার যা ইচ্ছে হয় অর্ডার দাও। যা খুশি।

বলে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

রবি অবাক হয়ে বাবার দিকে চায়। মিটমিটে চোখে বাবার মুখখানা দেখে বলে—আমার তো খিদে নেই।

দেবাশিস হতাশ হয়ে বলে—সে কী?

রবি মাথা নেড়ে বলে—দিদি সকালে কত খাইয়েছে! বলতে বলতে গেঞ্জিটা ওপর দিকে তুলে পেটটা দেখিয়ে বলে—পেট দ্যাখো কেমন ভরতি।

দিনের মধ্যে একশোবার রবির গায়ে হাত দিয়ে দেখত চন্দনা, টেম্পারেচার আছে কিনা! রবির গায়ে হাত দিয়ে আবার নিজের গা দেখত, কখনও বা দেবাশিসকে ডেকে বলত—দেখি তোমার গা, রবির চেয়ে ঠান্ডা না গরম।

সব মায়েরই এই বাতিক থাকে। তার নিজের মায়েরও ছিল। আরও, দিনে একশোবার রবিকে খাওয়ানোর জন্য মাথা কুটত চন্দনা, খাইয়ে পেট দেখত। খেতে না চাইলে অনুনয়-বিনয়, খোশামোদ, তারপর কিলচড় কষাত। বলতে—না খেয়ে একদিন শেষ হয়ে যাবি। আমি মরলে আর কেউ তোর খাওয়া নিয়ে ভাববে ভেবেছিস?

খাওয়ার ব্যাপার হলেই ছোট্ট রবি মাকে পেট দেখাত।

গেঞ্জিটা নামিয়ে করুণ চোখে চেয়ে রবি বলে—খাবো না বাবা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে আচ্ছা!

—বাবা।

—উঁ।

—মণিমা তো মুরগি খায় না।

—দেবাশিস খেয়াল করল। বলল—তাই তো কিন্তু অর্ডার দিয়ে দিলাম যে।

—মণিমার জন্য কী দেবে?

—তুমিই বলো।

—সন্দেশ আর দই, হ্যাঁ বাবা?

—আচ্ছা।

রবি খুশি হয়ে হাসল। দেবাশিস রবির কথা শোনে। রবি যা চায় তাই দেয়। রবির যা ইচ্ছে তাই হয়। চন্দনার সময়ে তা হত না। রবি কিছু বায়না ধরলেই খেপে যেত চন্দনা। বকত! মারত। তবু সারাদিন চন্দনার পায়ে পায়ে ঘুরত রবি। বকা খেত, মার সহ্য করত, তবু আঁটালির মতো লেগেও থাকত।

ওই রাগী আহাম্মক মেয়েটার মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু কি ছিল? ভেবেই পায় না দেবাশিস। যে অবস্থায় চন্দনার বিয়ে হয়েছিল তাতে তার বাপের বাড়ির দিকের কেউ খুশি হয়নি। চন্দনার বাবা তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে বেঁধে রেখেছিলেন, মা কাঁদতে কাঁদতে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হন। সেই গোলমাল হাঙ্গামার ভিতর থেকে চন্দনাকে খুব শালীনতার সঙ্গে বিয়ে করে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। দেবাশিস কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে একদিন ওদের বাড়ি চড়াও হয়। পাড়ার ছেলেদের আগে থাকতেই মোটা পুজোর চাঁদা দেওয়া ছিল। দেবাশিস চন্দনার বাবাকে শাসিয়ে এল—ফের যদি ওর গায়ে হাত তুলবেন তো মুশকিল আছে।

চন্দনার বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। আজকাল ভদ্রলোক মানেই ভেড়ুয়া। এরপর থেকে চন্দনার ওপর অত্যাচার কমে গেল বটে, কিন্তু বাড়ির লোক তার সঙ্গে কথা বলত না। দেবাশিস তখন মানিকতলার বোনের বাড়িতে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। একজন গর্ভবতী মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে তোলা ভগ্নীপতি ভালো চোখে দেখেনি। বোনও রাজি ছিল না। চন্দনা প্রায়ই টেলিফোন করে বলত—বেশি কিছু তো চাইনি, কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দাও। তাহলেই হবে।

দেবাশিস বলত—তা হবে না। সেটা তো পরাজয় মেনে নেওয়া। আমি তোমাকে ফুল ফ্লেজেড বিয়ে করে নিজের বাসায় তুলব।

তাই করেছিল সে। পাগলের মতো ঘুরে যাদবপুরে বাসা ঠিক করে ফেলল। হাতে টাকার অভাব ছিল না। প্রচুর গয়না শাড়ি দিয়ে সাজিয়ে বিয়েবাড়ি ভাড়া করে পুরুত ডেকে বিয়ে করল। চন্দনার এক দাদা সম্প্রদান করে যান।

চন্দনার মতো একটা অপদার্থ মেয়ের জন্য অত পরিশ্রম আর হাঙ্গামা কেন করেছিল দেবাশিস, তা ভাবলে অবাক লাগে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই চন্দনার তাগাদায় অভিজাত পাড়ায় অনেক টাকা দিয়ে পূর্ব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট কিনল। এই বিপুল উদ্যোগ বৃথা গেছে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই দেবাশিস বুঝতে পারে, বিয়ে কোনও স্বর্গীয় বিধি নয়। চন্দনা তার বউ হওয়ার উপযুক্তই নয়। এত অগভীর মন, এত রাগ, অধৈর্য, এমন অর্থকেন্দ্রিক মন-সম্পন্ন মেয়ের সঙ্গে কী করে থাকবে সে। নিজে চরিত্রহীন হলেও তার কিছু শিল্পীসুলভ নিস্পৃহতা আছে, সামান্য কিছু ব্যবসায়িক সততা, কর্মনিষ্ঠা। তার মনে হত সারাদিন কাজের পর পুরুষ যখন বাসায় ফেরে তখন দগ্ধদিনে ছায়ার মতো স্ত্রী তাকে আশ্রয় দেয়। স্ত্রী হচ্ছে বিশ্রামের জায়গা।

দেবাশিস প্রায়দিনই বাসায় ফিরে চন্দনাকে দেখতে পেত না। হয় মার্কেটিং, নয় সিনেমা-থিয়েটার, নয়তো বাপের বাড়ি চলে যেত চন্দনা। বিয়ের পর বাপের বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে যেন নিদারুণ ভালো হয়ে গিয়েছিল।

ওই সময়ে নিঃসঙ্গ তৃণা এক নিভৃত জলস্রোতে নৌকোর মতো তার কাছাকাছি এসে গেল। উতরোল স্রোত। কিন্তু নিশ্চিত। দেবাশিস কোনওদিনই কারও প্রেমে পড়েনি এতকাল। এবার পড়ল। এক অসহনীয় অবস্থায়। অসম্ভব এক প্রেম।

রবি এখন তার মুখোমুখি বসে আছে। কী চোখে রবি চন্দনাকে দেখেছিল তা ওকে ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে। ওই রাগী অপদার্থ, অগভীর মাকে কেন অত ভালবাসত রবি? রবির কাছে তা জেনে নিতে ইচ্ছা হয়! জানতে ইচ্ছা করে, কোনওভাবে না কোনওভাবে ভালোবাসার কোনও উপায় ছিল কিনা!

বেয়ারা মস্ত একটা বাদামি কাগজের প্যাকেটে মোড়া বাক্স নিয়ে এল ট্রেতে। সঙ্গে বিল। দাম আর টিপস মিটিয়ে উঠে পড়ে দেবাশিস। ঘড়ি দেখল। এখনও অনেক সময় আছে। চিড়িয়াখানার সময়টা বেঁচে গেল।

পোশাক যতই পরুক, আর যতই সাজুক, তৃণার মুখের দুঃখী ভাবটা কখনও যায় না। একটা অপরাধবোধে মাখা মুখখানায় করুণ হাসিহীন, শুকনো ভাব ফুটে থাকেই। চোখে ভীরু চঞ্চল ভাব!

বেরোবার মুখে দেখল, হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকে এল মনু। চমৎকার লালরঙা স্পোর্টস সাইকেল। মনুর চেহারা বেশ বড়সড়। পরনে সাদা শর্টস, সাদা গেঞ্জি, কাঁধে একটা টার্কিশ তোয়ালে, পায়ে কেডস আর মোজা। হাত পায়ের গড়ন সুন্দর, বুকের পাটা বড়। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। মাটিতে পা ঠেকিয়ে সাইকেলটা গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড় করাল। চোখ তুলে মৌন মুখে মাকে দেখল একবার।

ভারী পাল্লার কাচের দরজার সঙ্গে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল তৃণা। বুকের ভিতরটা কেমন চমকে ওঠে। ছেলের চোখে চোখ পড়তেই, হাত পায়ে সাড় থাকে না। মনু আজকাল কদাচিৎ

কথা বলে। দিনের পর দিন একনাগাড়ে উপেক্ষা করে যায়।

কাচের দরজার কাছ থেকে একটু নড়তে পারল না তৃণা। মনু সাইকেলে বসে থেকেই সাইকেলে ঠেস দেওয়ার কাঠিটা পা দিয়ে নামাল। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে লঘু পায়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। তৃণার দিকে এক পলক দেখল আবার। চোদ্দোবছরের ছেলের আন্দাজে মনুকে বড় দেখায়। চেহারাটা তো বড়ই, চোখের দৃষ্টিতেও পাকা গাম্ভীর্য, এটা বোধহয় ওর বাপের ধারা। বয়স আন্দাজে ওর বাপও গম্ভীর, বয়স্কজনোচিত হাবভাব।

সামনেই মস্তো কয়ারের পাপোষ পাতা। মনু তার কেডসটা ঘষে নিচ্ছিল, দরজার চৌকাঠে হাত রেখে। ওর শরীরের স্বেদগন্ধ, রোদের গন্ধ তৃণার নাকে এল। সে যে এই বড়সড় সুন্দর চৌখস ছেলেটির মা তা কে বিশ্বাস করবে! চেহারায় অমিল, স্বভাব অমিল, তার ওপর মনু আজকাল ডাক খোঁজ করেই না। কতকাল 'মা' ডাক শোনেনি তৃণা।

তাকে কাচের দরজায় অমন সিঁটিয়ে থাকতে দেখে মনু আবার একবার তাকাল। ভ্রূ কোঁচকাল। মনে মনে বোধহয় কী একটু শুঁকে নিল বাতাসে। হঠাৎ চূড়ান্ত তরল গলায় বলল—চ্যানেল নাম্বার সিক্স! না?

তৃণা ভারি চমকে ওঠে। সত্যি কথা। সে যে সেন্টটা আনিয়েছে তা চ্যানেল নাম্বার সিক্স। কিন্তু এত ঘাবড়ে গিয়েছিল তৃণা যে উত্তর দিতে পারল না। কেবল বিশাল দুটি চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল ছেলের দিকে ভূতগ্রস্তের মতো। কারণ, ছেলের চোখে চোখ রাখতে আজকাল তার মেরুদণ্ড ভেঙে নুয়ে যায়।

মনু অবশ্য তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করে না। চটপটে পায়ে ভিতরবাগে চলে যায়, লবি পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে। ও এখন ঠান্ডা জলে স্নান করবে, পোশাক পরবে, তারপর বেরোবে কোথাও।

ওর চলে যাওয়ার রাস্তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে তৃণা। তক্ষুনি বেরোতে পারে না। আস্তে আস্তে ঘুরে আসে। অনেক খানি মেঝে পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে দোতলায়। একটু বিশ্রাম করে যাবে।

মনু আর রেবার ঘর বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে। মাঝখানে হল, হলে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকের ঘর থেকে সে মৃদু একটা শিসের শব্দ শোনে। এক পা এক পা করে এগোয় দক্ষিণের দিকে। এদিকে সে আজকাল একদম আসে না। এলে ছেলেমেয়েরা বিরক্ত হয়, ভ্রূ কোঁচকায়, সামনে থেকে সরে যেতে চেষ্টা করে। এবাড়িতে সে এক পক্ষ, আর ছেলে মেয়ে বাপ মিলে আর এক পক্ষ। মাঝখানে অদৃশ্য কুরুক্ষেত্রে বিচিত্র সব চোখের বাণ ছোটাছুটি করে, আর মৌনতার অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় পরস্পরের দিকে।

মনুর ঘরে মনু আছে। দরজা আধখোলা, পরদা ঝুলছে। অন্যপাশে রেবার ঘর। ঘরটা নিস্তব্ধ, তৃণা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। না, ভিতরে কোনও শব্দ নেই।

খুব দুঃসাহসে ভর করে সে কাঁপা, ঠান্ডা, দুর্বল হাতে পরদা সরিয়ে ভিতরে পা দেয়। ফাঁকা ঘর। একধারে বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবিল, ওয়ার্ডরোব, আলমারি, মাঝখানে দামি চেয়ার কয়েকটা। নীচু সেন্টার টেবিলে তাজা ফুল রাখা।

ঘরভরতি মৃদু ধূপকাঠির সৌরভ। রেবার বয়স বারো, কিন্তু সে একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার মতোই থাকে। তৃণা ফোম রবারের গদিওলা বিছানাটায় একটু বসে। বুকজোড়া ভয়। পড়ার টেবিলের ওপর স্ট্যান্ডে রেবার ছবি। পাতলা গড়নের ধারাল চেহারা। নাক খানা পাতলা ফিনফিনে, উদ্ধত, টানা চোখ। গাল ভাঙা, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে। সে তুলনায় মনুর চেহারাটা একটু ভোঁতা, রেবার মতো বুদ্ধি মনু রাখে না। রেবা মডার্ন স্কুলের ফার্স্ট গার্ল। সম্ভবত হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করবে। মনু অত তীক্ষ্ণ নয়, সে কেবল টেনিস কিংবা অন্য কোনও খেলায় ভারতের এক নম্বর হতে চায়। হাসিখুশি আল্হাদী ছেলে, মনটা সাদা। সেই কারণেই বোধহয় কখনও সখনও মনু এক আধটা কথা মার সঙ্গে বলে ফেলে।

কিন্তু রেবার গাম্ভীর্য একদম নীরেট আর আপোসহীন। যেমন তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তেমনই তার উপেক্ষার ভঙ্গি। যতরকমভাবে অপমান এবং উপেক্ষা করা যায় ততরকমই করে রেবা। মার প্রতি মেয়ের এমন আক্রোশ কদাচিৎ কোনও মেয়ের মধ্যে দেখা যায়। মনুকে যতটা ভয় করে তৃণা, কিংবা শচীনকে, তার শতগুণ ভয় তার রেবাকে। মেয়েদের চোখ আর মন সব দেখে, সব ভাবে। ফ্রক পরা রোগা মেয়েটাকে তৃণা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ মানুষ বলে জানে।

ঘরে ধূপকাঠির গন্ধ স্নো ক্রিম ফাউন্ডেশনের গন্ধ, ঘরসুগন্ধির মৃদু সুবাস। দেওয়ালের রং হালকা নীল, আর সবুজ। বিপরীত দেওয়ালগুলি একরঙা। নানারকম আলোর ফিটিংস লাগানো, জানালা দরজায় পরদা, পেলমেটে কেষ্টনগরের পুতুল সারি সারি সাজানো। বুককেসের ওপর একটা রেডিয়ো, টেপরেকর্ডার, একধারে রেকর্ডপ্লেয়ার আর রাশীকৃত রেকর্ডের অ্যালবাম। সমস্ত বাড়িটাই দেবাশিস সাজিয়েছিল। আসবাবপত্রগুলি সবই সাপ্লাই দিয়েছিল তার কোম্পানি।

ফটো-স্ট্যান্ডে রেবার ছবিটার দিকে ভীত চোখে চেয়েছিল তৃণা। তার মনে হচ্ছিল, সে রেবার মুখোমুখি বসে আছে। রেবা তাকে দেখছে। ফটোতে রেবার সুন্দর হাসিটা যেন আস্তে আস্তে পালটে শ্লেষ আর ঘৃণার হাসি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণার বুক কেঁপে কান্নার গন্ধ মেখে একটা শ্বাস বেরিয়ে আসে। দূরে বৃষ্টি হলে যেমন জলের গন্ধ আনে বাতাস তেমনি কান্নাটা ঘনিয়ে উঠছে। গন্ধ পায় তৃণা। কিন্তু বৃথা। কত তো কেঁদেছে তৃণা, কেউ পাত্তা দেয়নি।

তৃণা বহুকাল এই বাড়ির এদিকে আসেনি। রেবার ঘরে ঢোকেনি। এখন একা চোরের মতো ঢুকে তার বড় ভালো লাগছিল। বারো বছর বয়সে মেয়েরা মায়ের বন্ধু হয়ে ওঠে।

এই বয়ঃসন্ধির সময়ে কত গোপন মেয়েলি তথ্যের লেনদেন হয় মা আর মেয়ের মধ্যে, এই বয়সেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় পাকা। মেয়ে আর মেয়ে থাকে না, সখী হয়ে ওঠে।

কিন্তু, হায়, রেবার সঙ্গে তৃণার কোনওদিনই আর সখীত্ব হবে না। ভীতু তৃণাকে মানসিক ভারসাম্যের শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে দেবে রেবা। বুদ্ধিমতী এবং নিষ্ঠুর ওই মেয়েটা।

তৃণা উঠল, রেবা গানের স্কুলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে, কিন্তু নিঃশব্দে ফিরবে না। ওর ছটফটে দৌড়-পায়ের আওয়াজ অনেক দূর থেকেই পাওয়া যায়। তাই সাহস করে তৃণা উঠে ঘুরে ঘুরে ওর ঘরটা দেখে। বুককেস খুলে বই হাতড়ায়। ওয়ার্ডরোবের ভিতর ওর হরেক রকম ফ্রক, ঘাগরা, প্যারালেলস আর শাড়িতে হাত বুলিয়ে দেয়। বিছানার ওপর একটা নাইটি পড়ে আছে। ভীষণ পাতলা একটা বিদেশি কাপড়ের তৈরি। সেটা গুছিয়ে ভাঁজ করে রেখে দেয়। বেডকভারটা টান করে একটু। পড়ার টেবিলটা সাজানো আছে। তবু একটু নেড়েচেড়ে রেখে দেয়, খুঁজতে খুঁজতে কয়েকটা ড্রইং খাতা পায় তৃণা, তাতে জলরঙা সব ছবি আঁকা। বুকের ভিতরটা ধুপধুপ করে ওঠে। রেবা কি ছবি আঁকে?

বুককেসের মাথায় রঙের বাক্স আর তুলির বান্ডিল খুঁজে পায় তৃণা। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, রেবা ছবি আঁকে। দরজার পাশে একটা নীচু শেলফে তবলা ডুগি, হারমোনিয়ম, তানপুরা সব সাজানো।

হারমোনিয়মের বাক্সের ওপর একটা কবিতার বইও পেয়ে যায় সে। বুকে একটা আনন্দ সদ্যোজাত পাখির ছানার মতো শব্দ করে। রেবা কি কবিতা পড়ে?

আবার গিয়ে বুককেসটা খোলে তৃণা! বইগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে রাখা নেই তাই অসুবিধে হয়। তবু একটু খুঁজতেই তার মধ্যে কিছু কবিতার বই খুঁজে পায় তৃণা। অবাক হয়ে উলটেপালটে বইগুলো দেখে, সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যায়।

অন্যমনস্কতাবশত সে পায়ের শব্দটা শুনতে পায়নি, যখন শুনল তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

পরদা সরিয়ে রেবা ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। রোগা তীক্ষ্ণ মুখখানা হঠাৎ সন্দিগ্ধ আর কুটিল হয়ে উঠল। ভ্রূ কোঁচকানো, রেবা তার দিকে একপলক চাইল, তারপর চোখ ফিরিয়ে পা নেড়ে চটিদুটো ঘরের কোণে ছুড়ে দিল। ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। একপলক সে তাকিয়েছিল তৃণার দিকে, তাতে চোখে একটু বুঝি বিস্ময়, আর একটু ঘৃণা। বাদবাকি ব্যবহারটা উপেক্ষার।

পরনে একটা কমলারঙের হালফ্যাশনের ফ্রক। রোগা হলেও রেবা বেশ লম্বা। গায়ে মাংস লাগলে একদিন ফিগারটা ভালোই দেখাবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের একটা ব্রণ টিপল।

বলল—কি বলতে এসেছ?

একটু চমকে উঠল তৃণা। এ ঘরে সে যে অনধিকারী তা মনে পড়ল। বিপদ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, সে তো আর পালাতে পারে না এখন। আস্তে করে বলল—তোর আজ দাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে।

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে রেবা উত্তর দেয়—এ সময়েই ছুটি হয় তাড়াতাড়ি আবার কী?

বলে আয়নায় মুখ দেখতে থাকে। আয়নার ভিতর দিয়েই বোধহয় তৃণাকে এক-আধ পলক দেখে নিল, কিন্তু তৃণার সেদিকে তাকাতে সাহসই হল না। অপরাধীর মতো মুখ নীচু রেখে বলে—তুই কি ছবি আঁকিস রেবু?

রেবা একটু অবাক হয়ে বোধহয়। বলে—হ্যাঁ আঁকি।

—জানতাম না তো!

—ক্লাসে আমাদের ড্রইং শেখায়। এ সবাই জানে।

—কবিতা পড়িস?

—পড়ি।

তৃণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

রেবা একটু ঝাঁজ দিয়ে বলে—আর কী বলবে?

—কিছু না।

—আমার এখন অনেক কাজ আছে। পোশাক ছাড়ব। তুমি যাও।

—যাচ্ছি। তৃণা উঠে দাঁড়ায়। কোনও বয়সের মেয়েই মায়ের সামনে পোশাক ছাড়তে লজ্জা পায় না। তবু তৃণা সঙ্কোচে উঠে দাঁড়াল। এই ঘরে তার উপস্থিতির কোনও জরুরি অজুহাত খুঁজে না পেয়ে দুর্বল গলায় বলে—তুই নতুন কী রেকর্ড কিনলি দেখতে এসেছিলাম।

রেবা উত্তর দিল না। আয়নার মুখ দেখতে থাকল!

তৃণা একটু শুকনো গলায় বলে—ওয়ার্ডরোবে শাড়ি দেখছিলাম। পরিস না কি?

—ইচ্ছে হলে পরি। তুমি যাও!

—যাচ্ছি। আমার তো অনেক শাড়ি। তুই নিবি?

—না।

—কেন?

—আমার অনেক আছে। দরকার হলে বাপি আরও কিনে দেবে।

তৃণা শ্বাস ছেড়ে আপন মনে ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়ে। এ সত্য তার জানা। প্রয়োজন হলে শচীন রেবাকে বাজারসুদ্ধু শাড়ি কিনে এনে দেবে। রেবা নিজে গিয়েও কিনে আনতে পারে বাজার ঘুরে, পছন্দ মতো। তবু বাঙালি ঘরের রেওয়াজ, বয়স হলে মেয়েরা মায়ের শাড়ি পরে। সেটা শাড়ির অভাবের জন্য নয়। নিজের শাড়ি পরিয়ে মা মেয়েকে দেখে। মুখ

টিপে মনে মনে হাসে। মায়েরা ওই ভাবেই আবার জন্মায় মেয়ের মধ্যে! কিন্তু রেবার তা দরকার নেই।

মুখশোষ টের পায় তৃণা। হাতে পায়ে শীত, মাথা গরম, শ্বাস গরম। দু-পা হেঁটে যায় দরজার দিকে। একটু দাঁড়ায়। ফিরে তাকায় একবার। তার ভ্রূ কোঁচকানো, চোখে বিশুদ্ধ কান্না। ওই গুয়ের গ্যাংলা মেয়েটা কত সহজে তার মা-পনা ঘুচিয়ে দেয়।

এ বাড়িতে দুটো ভাগ আছে। একদিকে তৃণা একা, অন্যদিকে শচীন, মনু আর রেবা। সিন্ডিকেট ঘরগুলোর মাঝখানে যোজন-যোজন ব্যবধান পড়ে থাকে সারাদিন। তার পক্ষে কেউ নয়। তবু ওর মধ্যে কি মনু একটু মায়ের টান টের পায়? অনেকদিন ভেবেছে তৃণা। ঠিক বুঝতে পারে না। ন-মাসে ছ-মাসে এক-আধবার মা বলে ডেকে ফেলে মনু। হয়তো কোনও কথা বলে ফেলে। খেতে বসে হয়তো এটা-ওটা চায়। তড়িঘড়ি এগিয়ে দেয় তৃণা। মনু কখনও কিছু বললে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করে, তাই দেয়। কিন্তু বুকে এত কাঙালপনা নিয়েও তৃণা জানে, মনুর আসলে টান নেই। ও সোজা সরল ছেলে, দিনরাত খেলার কথা ভাবে, মাকে নিরন্তর ঘৃণা করার কথা মনে রাখতে পারে না। অন্যমনস্কতাবশত ভুলে যায়। একটু আগে কেমন স্মিতমুখে বলেছিল—চ্যালেন সিক্স না?

রেবার কখনও ভুল হয় না। নিরন্তর বুকে সাপের মতো পুষে রাখে উপেক্ষা আর ঘেন্না। কখনও তা থেকে অন্যমনস্ক হয় না রেবা। বয়স মোটে বারো বছর, এখনও ঋতুমতী নয় বোধহয়, তবু কেমন সব গোপন করে রেখেছে মায়ের কাছে। কেমন স্বাধীন, ডাকাবুকো।

তৃণা যাই যাই করেও খানিক দাঁড়ায়, বলে—আমার লকারে গাদা গয়না পড়ে আছে। পাঠিয়ে দেবোখন, পরিস।

—কে চেয়েছে?

—চাইতে হবে কেন? ও তো তোর পাওনা!

—আমি গয়না পরি না? তার ওপর সোনার গয়না! মাগো! বলে ঠোঁট মুখের একটা উৎকট ভঙ্গি করে রেবা।

তৃণা হ্যাংলার মতো হাসে। বলে—তা অবিশ্যি ঠিক। সলিড সোনার গয়না তোদের বয়সিরা আজকাল কেউ পরে না। বরং ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে নিস।

—আমি পরব না। তুমি পরো।

—তুই তো একরত্তি মেয়ে, ওই রোগা শরীরে আর ক'খানা গয়নাই বা ধরবে! আমার অনেক আছে। তোকে দিয়েও থাকবে। তোরই তো সব।

—তোমার কিছুই আমার নয়। না পরলে বিলিয়ে দিও।

—কেন, পরবি না কেন?

—ইচ্ছে। শাড়ি গয়নার কথা শুনলে আমার মাথা ধরে। তুমি এখন যাও।

ভুল অস্ত্র। কিন্তু এ ঠিক তৃণার দিক থেকে লোভ দেখানো নয়! কিছুক্ষণ রেবার ঘরে থাকার জন্য এ হচ্ছে এলোপাথাড়ি কথা কওয়া, নইলে সে জানে, রেবার কিছু অভাব নেই। এখনকার মেয়েরা শাড়ি গয়নার নামে ঢলে পড়ে না।

রেবা খাটের অন্যধারে বসে পা দোলায়। পায়ের আঙুলের রুপোর চুটকিতে ঝুনঝুন শব্দ হয় একটু। খুব অবহেলার অনায়াস ভঙ্গি। তৃণার বারো বছর বয়সটা কেটেছে বিছানায়। ওই সময়ে এত সতেজ, প্রাপ্তবয়স্কতার ভাবভঙ্গি তার ছিল না। ওই বয়সে ছিল কত ভয়, সংশয়, কত আত্ম-অবিশ্বাস! তবু তৃণা মনে মনে একরকম খুশিই হয়। মেয়েটা তার মতো হবে বোধ হচ্ছে। ছবি আঁকে, কবিতা পড়ে, শাড়ি গয়নার দিকে মন নেই।

ও ঘরের বাথরুম থেকে মনুর সুরহীন হিন্দি গান শোনা যায়। তার সঙ্গে জলের প্রবল শব্দ। সেই জলের শব্দে তেষ্টা পায় তৃণার। আসলে বুকটা কাঠ হয়েই ছিল। জলের কথা খেয়াল হচ্ছিল না তার।

ভিখিরির মতো তৃণা বলে—একটু জল খাওয়াবি রেবু।

রেবা ভীষণ বিরক্ত হয়। তার রোগা, তিরতিরে বুদ্ধির মুখখানার কোন মুখোশ নেই। সহজেই রাগ, বিরক্তি, অভিমান বোঝা যায়। ভ্রূ, নাক, চোখ কুঁচকে উঠল। তবু পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দেওয়ালে পিয়ানো রিডের মতো একটা সুইচ টিপে ধরল।

ঠিন ঠিন করে গোটা দুই সুরেলা আওয়াজ হল ভিতরে। অমনি ঝি দুর্গার মা এসে দাঁড়ায় দরজায়, নীরবে।

রেবা বলে—এক গ্লাস জল।

এরকমই হওয়ার কথা। রেবা নিজের হাতে জল গড়িয়ে দেবে না, এ কি জানত না তৃণা?

দুর্গার মা হলঘরের কুলার থেকে ঠান্ডা জল এনে দিল। ট্রের ওপর স্বচ্ছ কাট-গ্লাসের পাত্র, ওপরে একটা কাঁচের ঢাকনা। জলটা হিরের মতো জ্বলছে। তৃণা সবটুকু খেয়ে নিল।

রেবা বলে—এবার হয়েছে? এখন যাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণা ভালো মেয়ের মতো বলে—এই খাড়া দুপুরে আবার বেরোবি নাকি?

—বেরোলেই বা!

—কোথায় যাবি?

—কাজ আছে।

—তুই যে কবিতার বইগুলো কিনেছিস ওগুলোর সব আমার নেই। এক আধখানা দিস তো, পড়ব।

রেবা উত্তর দিল না। ওয়ার্ডরোব থেকে পছন্দমতো পোশাক বের করতে লাগল। একটা লুঙ্গি আর কামিজ বের করে সাজাল বিছানার ওপর। বিশুদ্ধ সিল্কের হালকা জামরঙের লুঙ্গি। সোনালি সিল্কের ওপর ছুচের কাজ করা কামিজ।

—বাঃ ভারি সুন্দর তো!

—কী সুন্দর? ঝামরে ওঠে রেবা।

—পোশাকটা। কবে করালি?

রেবা তার পাতলা ধারাল মুখখানা তুলে তৃণাকে এক পলকের কিছু বেশি লক্ষ করল। তৃণা চোখ সরিয়ে নেয়।

রেবা বলে—তুমি যেখানে যাচ্ছো যাও।

তৃণা হ্যাংলার মতো তবু বলে—বড্ড রোদ উঠেছে আজ। ছাতা নিবি না?

—সে আমি বুঝব।

—রেবু, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

—ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

—তুই অমন করছিস কেন?

রেবা উত্তর না দিয়ে তার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে চলে গেল। সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

ফাঁকা ঘরে একা তৃণা দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যিই তার শরীর খারাপ লাগছিল। খুব খারাপ, যেন বা গা ভরে জ্বর এসেছে। চোখে জ্বালা, হাত পা কিছুই যেন তার বশে নেই। আর মাথারমধ্যে চিন্তার রাজ্যে একটা বিশৃঙ্খলা টের পায় সে। পূর্বাপর কোনও কথাই সাজিয়ে ভাবতে পারে না।

শরীরটা কাঁপছিল, খুব ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে তৃণা। হলঘরে হালকা অন্ধকার। ঠান্ডা। একটু দাঁড়ায়, তারপর অবশ হয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগানো নরম কোচটায় বসে পড়ে। কোচের পাশে মস্ত রঙিন কাঠের বাক্সে লাগানো পাতাবাহারের গাছের পাতা তার গাল স্পর্শ করে।

ঝিম মেরে একটুক্ষণ বসে থাকে তৃণা। কতকাল সে তার শরীরের কোনও খোঁজ রাখে না, ভিতরে ভিতরে কী অসুখ তৈরি হয়েছে কে জানে! মাথাটা ঠিক রাখতে পারছে না সে। [illegible] হয়ে যাচ্ছে স্মৃতি, পারম্পর্যহীন সব এলোমেলো কথা ভেসে আসছে মনে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে খুব।

একটা তীব্র শিসের শব্দে সে মুখ তোলে। গায়ে ব্যানলনের দুধসাদা গেঞ্জি, পরনে পাতিলেবুর রঙের স্ট্রেচলনের বেলবটম পরা মনু নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ডান হাতের ব্রেসলেটে ঢিলা করে পরা ঘড়িটা দেখল। সময়টা বিশ্বাস হল না বুঝি। গড়িটা কানের কাছে তুলে শব্দ শুনলে। তারপর তৃণাকে লক্ষ না করেই আবার চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে।

পাতাবাহারের আড়াল থেকে মনুর সুন্দর চেহারাটা দেখে তৃণা। এই বয়সেই মনু মোটর চালায়, টেনিস খেলে, বিদেশি নাচ শেখে। তৃণার জগৎ থেকে অনেকদূরে ওর

বসবাস। বড়সড় স্বাস্থ্যবান ওই ছেলেটা যে তার গর্ভজ সন্তান তা তৃণার বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হলেও এক এক সময়ে বড় ভয় করে, এক এক সময়ে অহংকার হয়। কিন্তু এও সত্যি কথা, মনুর জগতে তৃণা বলে কেউ নেই।

সিঁড়ির মাথায় চলে গিয়েছিল মনু। এক্ষুনি নেমে যাবে।

তৃণার গলায় একটুও জোর ফুটল না। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল—মনু!

ডাকটা মনুর শোনার কথা নয়। মস্ত হলঘরটার অন্য প্রান্তে চলে গেছে সে। তার ওপর শিসে একটা গরম হিন্দি টিউন তুলছে। তা ছাড়া যৌবন বয়েসের চিন্তা আছে, আর আছে ঘরের বাইরে জগতের আনন্দময় ডাক। মায়ের ক্ষীণকণ্ঠ তার শোনার কথা নয়। তবু দ্রুত দু ধাপ সিঁড়ি চঞ্চল পায়ে নেমে গিয়েও দাঁড়াল সে! একটু এপাশ ওপাশ তাকাল। হয়তো ক্ষীণ সন্দেহ হয়ে থাকবে যে কেউ ডেকেছে।

পাতাবাহারের আড়ালে মুখখানা ঢেকে তৃণা তেমনি ক্ষীণ গলায় বলে—মনু, আমি এখানে।

এবার মনু শুনতে পায়। ফিরে তাকায়। মুখে একটু ভ্যাবলা অবাক ভাব। শরীরটা যতই বড়ই হোক, ওর বয়সে এখনও ছেলেরা মায়ের আঁচলধরা থাকে।

মনু তাকে দূর থেকে দেখল। রাঙা শাড়ি পরেছে তৃণা, মেখেছে দামি বিদেশি সুগন্ধ, আর নানা রূপটান। নষ্ট মেয়ের সাজ। একটু আগে বাড়িতে ঢোকার সময়ে তাই কি ঠাট্টা করে মনু বলেছিল—চ্যানেল নাম্বার সিক্স, না? নষ্টামিটা কি তৃণার শরীরে খুব অস্পষ্ট হয়ে আছে?

মনু সিঁড়ির দুধাপ উঠে আসে। হলঘরটা লম্বা পদক্ষেপে পার হয়ে সামনে দাঁড়ায়। মুখে একটা গা-জ্বালানো ঠাট্টার হাসি। হালকা গলায় বলে—আরে! তুমি তো বেরিয়ে গেলে দেখলাম!

তৃণা তৃষিত মুখখানা তুলে ওকে দেখে। কী বিরাট, কী প্রকাণ্ড সব মানুষ এরা।

মাথা নেড়ে তৃণা বলে—যাইনি।

—যাওনি তো দেখতেই পাচ্ছি। কী ব্যাপার?

—তুই কোথায় যাচ্ছিস?

—বেরোচ্ছি।

আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

শুনে মনুর মুখে খুব সামান্য, হালকা জলের মতো একটু উদবেগ।

মনুর মুখখানা অবিকল তৃণার মতো। মাতৃমুখী ছেলে! ওর চোখে একটা মেয়েলি নম্রতা আছে। এই সবই তৃণার চিহ্ন। মনুর মুখে চোখে তৃণার চিহ্ন ছড়ানো আছে। অনেকদিন বাদে একটু লক্ষ করে তৃণা খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে।

মনু একটু ঝুঁকে তাকে দেখে নিয়ে বলে—খুব সেজেছো দেখছি! তবু তোমাকে খুব পেল দেখাচ্ছে। চোখও লাল। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

—আমাকে একটু ধরে নিয়ে যাবি?

—এসো। বলে মনু সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ায়।

ভারি অবাক মানে তৃণা, ও কি তাকে ছোঁবে? ঘেন্না করবে না ওর? তৃণা সঙ্কুচিত হয়ে বলে—তোর দেরি হচ্ছে না তো!

—হচ্ছে তো কি? এসো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই ঘরে।

তৃণা উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে চমকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মনু তাকে এক ঝটকায় পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে হেসে বলে—আরে! তুমি তো ভীষণ হালকা!

তৃণার মাথা ঘুরে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। সে ককিয়ে কান্না গলায় বলে—ছেড়ে দে,ওরে!

—তুমি কি ভাবছ তোমাকে নিতে পারব না?

—ফেলে দিবি! ক্ষীণ কণ্ঠে বলে তৃণা।

—দূর! আমি ওয়েটলিফটার, জানো না? তুমি তো মশার মতো হালকা। বলে দুহাতে তৃণার শরীরটা ওপরে নীচে একবার দুলিয়ে দেখায় মনু! তৃণা তখন ছেলের শরীরের সুঘ্রাণটি পায়। মৃদু সাবান পাউডার, আর জামাকাপড় ওয়ার্ডরোবের পোকা তাড়ানো ওষুধের গন্ধ। এসব ভেদ করে মনুর গায়ের রক্তমাংসের একটা গন্ধ, একটা স্পন্দন পায় না কি সে?

অনায়াসে মনু হলঘরটা পার হয়ে যায় তৃণাকে পাঁজাকোলে করে। তৃণা ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে ছিল, মুঠো হাতে খামচে ধরে ছিল মনুর গেঞ্জির বুকের কাছটা।

নরম বিছানায় মনু তৃণাকে ঝুপ করে নামিয়ে দিয়ে হাসে—দেখলে তো?

তৃণা একটু ক্ষীণ হেসে বলে—নিজের শরীরে অত নজর দিস না, নিজের নজর সবচেয়ে বেশি লাগে।

—সবাই আমাকে নজর দেয়। বন্ধুরা আমাকে স্যামসন বলে ডাকে!

—বালাই ষাট।

মনু ঠাট্টার হালকা এবং বোকাহাসি হাসে। বলে—চলি?

—কোথায় যাবি?

—যাওয়ার অনেক জায়গা আছে।

মনু মাথা ঝাঁকায়। দরজার কাছ থেকে একবার সাহেবি কায়দায় হাতটা তোলে। চলে যায়।

মনুর শরীরের সুঘ্রান এখনও ভরে আছে তৃণার শ্বাসপ্রশ্বাসে। ছোট থেকেই মনু মোটাসোটা ভারী ছেলে, টেনে ওকে কোলে তুলতে কষ্ট হত। তখন থেকে সবাই

ছেলেটাকে নজর দেয়। এখন দেখনসই চেহারা হচ্ছে। পাঁচজনে তাকাবেই তো। ভাবতে এক রকম ভালোই লাগে তৃণার। দুঃখ এই যে, ছেলে তার হয়েও তার নয়। একটু বুঝি বা কখনও মনের ভুলে মাকে মা বলে মনে করে। তারপরই আবার আলগা দেয়। দূরের লোক হয়ে যায় সব। তৃণা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। কত রকম যে ভয় তার! সে চুপ করে শুয়ে মনুর কথা ভাবতে থাকে।

শচীন কোথায় গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরে এল। পাশের ঘর থেকে তার সুরহীন গুনগুন ধ্বনি আসে। হলঘরে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। ঘরের মধ্যে শুয়ে থেকে এই ঘণ্টাধ্বনি শোনে তৃণা। শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠে বলল, এগারোটা না?

বুকের মধ্যে ধুপ ধুপ করে। উত্তেজনায় নয়। হঠাৎ উঠে বসায় বুকে একটা চাপ লেগেছে। বাসস্টপটা খুব দূরে নয়। দেবাশিস এসে অপেক্ষা করবে। নিজের মানুষ-জনের কাছে বড্ড পুরনো হয়ে গেছে তৃণা, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে এমন কাউকে চায় যার কাছে প্রতিদিন তৃণার জন্ম হয়।

সে উঠল। শরীর ভাল নেই। মন ভালো নেই। এই ভরদুপুরে সে যদি বেরিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ফিরে না আসে তবু কারও কোনও উদ্বেগ থাকবে না। কেউ একফোঁটা চিন্তা করবে না তৃণার জন্য।

হলঘর থেকে রেবার উচ্চকিত স্বর পাওয়া গেল—বাপি!

শচীন গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়—হুঁ!

—আমি বেরোচ্ছি।

—আচ্ছা।

শচীন তার দাঁড়ে সব পাখিকে শেকল পরাতে পেরেছে। এ সংসারে তৃণার মতো পরাজিত কেউ না। শচীন একই সঙ্গে ছেলেমেয়ের মা ও বাবা, ওরা কোথায় যায় কী করে তা তৃণার জানা নেই। যেমন, আজ দুপুরে কে কে বাড়িতে খাবে, বা কার বাইরে নিমন্ত্রণ আছে, তা সে জানে না। কেউ বলে না কিছু। যা বলে তা শচীনকে। একা, অভিমানে তৃণার ঠোঁট ফোলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার কোঁচকানো শাড়িটা ঠিকঠাক করে নেয়, বেরোবে।

বেরোবার মুখে সে হলঘর পেরোতে গিয়ে দেখে শচীন টবের গাছগুলি ঝুঁকে দেখছে। তৃণার দিকে পিছন ফেরানো। চল্লিশের কিছু ওপরে ওর বয়স, স্বাস্থ্য ভালো। তবু ওর দাঁড়োনোর ভঙ্গির মধ্যে একজন বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি লক্ষ করা যায়। কিছু ধীরস্থির, চিন্তামগ্ন বিবেচকের মতো দেখতে, পাকা সংসারী ছাপ চেহারায়।

তৃণা নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল। শচীনের টের পাওয়ার কথা নয়। তবু শচীন টের পেল। হঠাৎ ঝুঁকে কী একটা তুলে নিয়ে ফিরে সোজা তার দিকে তাকাল। হাতে একটা ছোট্ট রুমাল। তৃণার।

শচীন জিজ্ঞেস করে—এটা তোমার?

খুব সূক্ষ্ম কাপড় আর লেস দিয়ে তৈরি রুমালটা তারই। সোফায় বসে থাকার সময়ে পড়ে গিয়ে থাকবে।

তৃণা মাথা নাড়ল।

—এখানে গাছের গোড়ায় পড়েছিল। বলে শচীন রুমালটা সোফার ওপর আলতোভাবে রেখে দিয়ে আবার গাছ দেখতে লাগল। জাপান থেকে বেঁটে গাছ আনাচ্ছে, শুনেছে তৃণা। সে গাছ কাচের বাক্সে হলঘরে রাখা হবে। বোধহয় সে ব্যাপারেই কোন প্ল্যান করছে।

রুমালটা তুলে নিতে গিয়ে তৃণাকে শচীনের খুব কাছে চলে যেতে হল। তার শ্বাসপ্রশ্বাস গায়ের গন্ধ ও উত্তাপের পরিমণ্ডলটির ভিতরেই বোধহয় চলে যেতে হল তাকে। তৃণা নিজের শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ টের পায়। অবশ্য শচীন খুবই অন্যমনস্ক। সে মোটে লক্ষই করল না তাকে!

তৃণা রুমালটা তুলে নিল! চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ দাঁড়াল, তার কিছু হারাবার ভয় নেই, কিছু পাওয়ার আশাও নেই। তাহলে রেবা আর মনুর পর এ লোকটাকে একটু পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? কিছুদিন আগে শচীন তাকে মেরেছিল। জীবনে ওই একবারই বোধহয় [illegible] হয়ে থাকবে লোকটার। তা ছাড়া আর কখনও তৃণার জন্য বোধহয় কোনও আবেগ বোধ হয়নি। শচীনের ওই মারটা একটা সুখস্মৃতির মতো কেন যে!

তৃণা আচমকা বলে—আমি যাচ্ছি!

শচীন শুনতে পেল না।

তৃণা মরিয়া হয়ে বলে—শুনছো!

অন্যমনস্ক শচীন দীর্ঘ উত্তর দেয়—উঁ...উঁ!

তারপর ধীরে ফিরে তাকায়। সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে লগ্ন চোখ!

—আমি একটু বেরোচ্ছি। তৃণা হাঁফধরা গলায় বলে।

শচীন বড় অবাক হয় বুঝি! বিস্ফারিত চোখে তার রাঙা পোশাকপরা চেহারাটা দেখে। অনেকক্ষণ পরে বলে—ওঃ!

শচীনের উত্তেজনা কম, রাগ কম। কিন্তু একরকমের কঠিন কর্তব্যনিষ্ঠার বর্ম পরে থাকে। স্ত্রী বিপথগামিনী বলে তার মনে নিশ্চয়ই কিছু প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু তা প্রকাশ করা তার রেওয়াজ নয়, এমনকী তৃণাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারলেও দেয়নি, চমৎকার সুখ-সুবিধের মধ্যে রেখে দিয়েছে। লোকলজ্জাকেও গায়ে মাখে না। এ কেমনতর লোক? এমন হতে পারে, তৃণাকে ভালোবাসে না, কখনও বাসেনি। কিন্তু ভালোবাসুক চাই না বাসুক, পুরুষের অধিকারবোধও কি থাকতে নেই? কিংবা আত্মসম্মানবোধ? তৃণার শরীর ভালো নয়, মাথার ভিতরটাও আজ গোলমেলে। নইলে সে এমন কাণ্ড করতে সাহসই পেত না।

সে তো জানে, শচীনের তাকে নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে কোথায় যায় বা না যায় তার খোঁজ কখনও রাখে না।

তৃণা খুব অসম্ভব একটা চেষ্টায় শচীনের ওপর নিজের চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। শচীন খুব গম্ভীর। অন্যমনস্কতা কেটে গেছে। একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে মাত্র।

শচীন মাথাটা নেড়ে বলল—যাবে যাও। বলার কী?

এই উত্তরই আশা করেছিল তৃণা। কিন্তু আজ তার একটা মরিয়া ভাব এসেছে। কেবলই মনে হয়েছে টান বাঁধা উদবেগ ও শঙ্কায় ভরা এইসব সম্পর্কের ভিতরের সত্যটা তার জেনে নেওয়া দরকার। যেন আর খুব বেশি সময় নেই।

তাই তৃণা বলে—এ ছাড়া তোমার আর কিছু বলার নেই?

শচীন অবাক হয়ে বলে—কি থাকবে? এখন বলা-কওয়ার স্টেজ পার হয়ে গেছে।

তৃণা তার শুকনো ঠোঁট বিশুষ্ক দাঁতে চেপে ধরল। মুখে জল নেই, পাপোষের মতো খসখসে লাগছে জিভটা। কিন্তু আশ্চর্য যে বহুদিন পরে শচীনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বুক কাঁপছে না ভয়ও হচ্ছে না তেমন।

তৃণা বলে—আমি যদি একেবারে চলে যাই তাহলেও কিছু বলার নেই?

—বলার অনেক কিছু মনে হয়। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে না।

—কেন?

—বলা মানে কাউকে শোনানো, আমার তো শোনানোর কেউ নেই।

তৃণা চুপ করে থাকে। কান্না আসে, কিন্তু কাঁদে না। তার কান্নার মূল্যই বা কী?

শচীন টেবিল থেকে জলের জগটা তুলে নিয়ে আলগা করে একটু জল খেল। তারপর তৃণার দিকে তাকিয়ে তেমনি চিন্তিত গলায় বলে—তুমি কি একেবারেই যাচ্ছো?

তৃণা কিছু বলল না। দুঃসাহসভরে তাকিয়ে থাকল।

শচীন বলে—এ সিদ্ধান্তটা আরও আগেই নিতে পারতে।

—তাহলে কী হত?

—তাহলে অন্তত উদবেগ আর মানসিক কষ্ট হত না। দেবাশিসবাবুও নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

তৃণা অধৈর্য হয়ে বলে—আমি সে-যাওয়ার কথা বলিনি।

—তবে?

—আমার মনে হচ্ছে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না।

—ও। শচীন একটু চুপ করে থাকে। তারপর, যেন বুঝেছে, এমনভাবে মাথা নাড়ল। বলল—তাও মনে হওয়া সম্ভব। বহুকাল ধরেই তোমার নার্ভের ওপর চাপ যাচ্ছে। তার ওপর আছে নিজেকে ক্রমাগত অপরাধী ভেবে যাওয়ার হীনমন্যতা! এ অবস্থায় মরতে অনেকেই চাইবে।

—তুমি কি সিমপ্যাথি দেখাচ্ছ?

—না। কিন্তু তোমাকে সাহসী হতে বলছি। চোরের মতো বেঁচে আছো কেন? যা করেছো তা আরও সাহস আর স্পষ্টতার সঙ্গে করা উচিত ছিল?

—কী বলতে চাও তা আরও স্পষ্ট করে বলো।

শচীন তার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইল, যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না তৃণার এই ব্যবহার। তারপর বলে—এ ঘরটা কথা বলার ঠিক জায়গা নয়। এসো।

বলে শচীন হলঘরের সামনের দিকের ঘরটায় ঢোকে। এই ঘরে পাতা রয়েছে সবুজ রঙের পিঙপঙ টেবিল, ক্যারাম, দাবা, দেওয়ালে সাজানো টেনিস আর ব্যাডমিন্টনের র্যাকেট। কাঠের ফ্রেমে গলফ কিট। একাধারে জুতোর র্যাক, দেওয়াল আলমারিতে সাজানো কয়েকটা বন্দুক, কয়েকটা ভালো সোফা দেওয়ালের সঙ্গে পাতা রয়েছে।

তৃণার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, শচীন তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে একটুও আগ্রহ দেখাবে। ঘটনাটা যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটেছে। কিন্তু এও জানে তৃণা, কথা বলে এ সমস্যার কোনও সুরাহা হওয়ার নয়!

ঘরটা একটু আবছাওয়া। শচীন ঢুকে তৃণার ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। পিঙপঙ খেলার জন্য এ ঘরে কয়েকটা খুব বেশি পাওয়ারের আলো লাগানো আছে। শচীন আলো জ্বালে। চোখ ধাঁধানো আলো।

তৃণার মাথার মধ্যে একটা বিকারের ভাব। বন্ধ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার মনে হয়, এ ঘরে একটা মিলনাত্মক নাটক করার জন্যই শচীন তাকে ডেকে এনেছে। শেষমেশ জড়িয়ে টড়িয়ে ধরবে না তো! না, না, তাহলে সহ্য করতে পারবে না। বড় বিতৃষ্ণা হবে তাহলে।

শচীন পিঙপঙ টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ার টেনে বসল, টেবিলের ওপরে সাবধানে নিজের হাত দু-খানায় ভর রেখে তৃণার দিকে চেয়ে বলল—এবার বলো।

—তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে—আমি কী বলব?

—বলাটা তুমিই শুরু করেছো।

তৃণা একটু থমকে থাকে। সময় চলে যাচ্ছে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে দেবাশিস তার গাড়ি নিয়ে এসে বসে থাকবে। সেটা ভাবতেই তার শরীরে অসুস্থতাকে ভাসিয়ে দিয়ে একটা জোয়ার আসে তীব্র, তীক্ষ্ণ আনন্দের। শচীনের দিকে তাকিয়ে তার এ লোকটার সঙ্গ করতে অনিচ্ছা হতে থাকে।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে—আমি বোধহয় বেশিদিন বাঁচব না।

—সেটা হঠাৎ আজ বলছ কেন?

—আজ বলছি, আজই মনে হচ্ছে বলে!

শচীন মাথা নেড়ে ধীর স্বরে বলে—যদি মনে হয় তাহলে তার জন্যে আমরা কী করতেপারি?

তৃণা অধৈর্যের গলায় বলে—আমি কিছু করতে বলিনি।

—তবে?

—তৃণা একটু ভাবে! ঠিকঠাক কথা মনে পড়ে না। হঠাৎ বলে —আমি এ বাড়িতে কি রকমভাবে আছি তা কি তুমি জানো?

শচীন চুপ করে চেয়ে রইল খানিক। তৃণার আজকের সাহসটা বোধহয় তারিফ করল মনে মনে। তারপর বলল—বাইরে থেকে কেমন আছো তা জানি। কিন্তু মনের ভিতরে কেমন আছো তা কি করে জানব? প্রত্যেক মানুষই দুটো মানুষ।

—সে কেমন?

—বাইরেরটা আচার আচরণ করে, সহবৎ রক্ষা করে, হাসে বা কাঁদে, ভালোবাসে বা ঘেন্না করে। আর ভিতরের মানুষটা এক পাগল। বাইরের জনের সঙ্গে তার মিলমিশ নেই, বনিবনা নেই, একটা আপস-রফা হয়তো আছে। সেই ভিতরের মানুষটাকে জেনুইন অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানতে পারে না!

—আমি তত্বকথা শুনতে চাই না।

শচীনকে খুব শান্ত ও নিরুদ্বেগ দেখাচ্ছে। এ মানুষটার এই শান্তভাবটা তৃণা কখনও ভালো মনে নিতে পারে না। শচীন শান্ত মুখে বলে—তত্বকথা মানেই তো আর পুথিপত্রের কথা নয়। জীবন থেকেই তত্ব কিংবা দর্শন আসে। আমি তো স্পষ্ট করেই বলছি যে, তোমার জন্য আমরা কিছু আর করতে পারি না।

—তা জানি। আমি তবু একটা কথা জানতে চাই। তোমার চোখে এখন আমি কী রকম?

শচীন হাসল না। তবু একটু দুর্বোধ্য কৌতুক চিকমিক করে গেল তার চোখে। বলল—অ্যাপারেন্টলি তুমি তো এখনও বেশ সুন্দরীই। ফিগার ভালো, ছেলেমেয়ের মা বলে বোঝা যায়না।

তৃণা রেগে লাল হয়ে গেল। বলল—সে কথা জিজ্ঞেস করিনি।

—তবে?

—আমি জানতে চাইছি, তুমি আমাকে কী চোখে দেখ!

—ও বলে শচীন তেমনি চুপ করে চেয়ে থাকে তার দিকে। চোখে কোনও ভাষা নেই, নীরব কৌতুক ছাড়া। বলে—তোমাকে আসলে আমি দেখিই না। অনেক চেষ্টা করে তবে এই না-দেখার অভ্যাস করেছি।

তৃণার এ সবই জানা। তবু বলল—এই যেমন এখন দেখছ! এখন কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না?

—হচ্ছে।

—সেটা কেমন?

রাস্তার ভিখিরিদের আমরা লক্ষ করি না। আবার তাদের মধ্যে কেউ যখন সাহসী হয়ে, কিংবা মরিয়া হয়ে কাছে এসে তাদের দুঃখের কথা বলে তখন তাকে দেখি, মায়া হয়, করুণা বোধ করি। এও ঠিক তেমনি, তোমার জন্য মায়া এবং করুণা হচ্ছে। আবার যখন ভিখিরিটা দঙ্গলে মিশে যাবে, তখন আবার তাকে লক্ষ করব না। আমরা কেউ কাউকে কনস্ট্যান্ট মনে রাখতে পারি না, সে যত ভালোবাসার বা ঘেন্নার লোক হোক না কেন। কখনও মনে রাখি আবার ভুলে যাই, ফের মনে করি—এমনিভাবেই সম্পর্ক রাখি। মানুষ দুভাবে থাকে।

—সে কেমন?

—এক, কেবলমাত্র শারীরিকভাবে থাকে। দুই, মানুষের মনের মধ্যে থাকে। আমার কাছে, তুমি কেবল শারীরিকভাবে আছ, আমার মনের মধ্যে নেই।

তৃণা ভ্রূ কোঁচকায়। বিরক্তিতে নয়, যখন সে খুব অসহায় হয়ে পড়ে তখন ভ্রূ কোঁচকানো তার স্বভাব।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে—এটা সত্যি কথা নয়।

—তাহলে কোনটা সত্যি কথা? তুমি কি আমার মনের মধ্যে আছো?

তৃণা মাথা নেড়ে বলে—আমি সে কথা বলিনি। আমি জানতে চাই আমাকে—আমার প্রতি তোমার প্রতিক্রিয়া কী?

শচীন মাথাটা নামিয়ে সবুজ টেবিলের ওপর তার দুহাতের আঙুল দেখল। তারপর মুখ না তুলেই বলল—আমি খুব সিমপ্যাথেটিক! তোমার সমস্যাটা আমি বুঝি, তাই তোমাকে সাহসী হতে বলেছিলাম।

—আমাকে চলে যেতে বলছো?

শচীন মাথা নেড়ে বলল—না, তুমি এ বাড়িতে থেকেও যা খুশি করতে পারো। তাতে আমাদের যে কিছু আসে যায় না তা তো তুমি বোঝোই, কিন্তু তোমার তাতে আসে যায়। তুমি কেবলই পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছো, আমরা তোমাকে নিয়ে নানা জল্পনা করছি বলে সন্দেহ করছ। হয়তো একথাও ভাবো যে, দেবাশিসবাবুর স্ত্রী তোমার জন্যই আত্মহত্যা করেন। এসব তোমার ভিতর ক্ষয় ধরাচ্ছে। আমি তোমাকে চলে যেতে বলছি না, কিন্তু গেলে তোমার দিক থেকেই ভালো হবে।

—আমি থাকি বা যাই, তাতে কি তোমাদের কিছু যায় আসে না?

—না।

—আর যদি মরে যাই?

—সেটা স্বতন্ত্র কথা! অন্য মানুষকে মরতে দেখলে আমাদের নিজেদের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, তাই মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মরবে কেন?

—আমি ইচ্ছে করে মরব, এমন কথা বলিনি। কিন্তু মনে হয়, আমি আর বেশিদিন বাঁচবও না।

—তাহলে সেটা দুঃখের ব্যাপার হবে। যাতে মরতে না হয় এমন কিছু করাই ভালো। শরীর খারাপ হয়ে থাকলে ডাক্তার দেখাও।

তৃণা ঘুরে দরজার দিকে এগোয়। ছিটকিনি খুলতে হাত বাড়িয়ে বলে—দেখব। কিন্তু দয়া করে মনে কোরো না যে, আমি তোমার বা তোমাদের করুণা পাওয়ার জন্য মরার কথা বলেছিলাম।

শচীন চেয়ার ঠেলে উঠল। কথা বলল না।

তৃণা আর একবার ফিরে তাকাল না। দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল হলঘরে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে বাগানের রাস্তা ধরে চলে আসে ফুটপাথে। খুব জোরে হাঁটতে থাকে।

আপন মনেই বিড়বিড় করে কথা বলছিল তৃণা—যাবে না কেন? আমি তো তোমাদের কেউ না।

কোনও লক্ষ্য স্থির ছিল না বলে তৃণা ভুল রাস্তায় এসে পড়ল। ঘড়িতে খুব বেশি সময় নেই। দেবাশিস আসবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে তাদের দেখা হবে। দেখা হলেই পৃথিবীর মরা রঙে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠবে।

তৃণা ঠিক করে ফেলল, আজ সে দেবাশিসকে বলবে, বরাবরের মতো চলে যাবে তৃণা, ওর কাছে।

সামনেই একটা থেমে থাকা মোটর সাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে অল্পবয়সি একটা ছেলে। স্টার্টারে লাথি মারছে লাফিয়ে উঠে। স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়িটা দু-একবার গরগর করে থেমে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ রাস্তায় শব্দটা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি হয়ে মস্ত বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই শব্দটায় যেন তৃণা সংবিৎ ফিরে পেল। সে চারধারে তাকিয়ে দেখল এ তার রাস্তা নয়। ফাঁড়ি আরও উত্তরে।

সে ঘুরে হাঁটতে থাকে। পিছনে মোটর সাইকেলটা স্টার্ট নেয়। ভয়ঙ্কর একটা শব্দ তুলে মুখ ঘুরিয়ে তেড়ে আসে। ফুটপাথে উঠে যায় তৃণা। মোটর সাইকেলটা ঝোড়ো শব্দ তুলে তাকে পেরিয়ে চলে যায়।

গাড়ির শব্দ পেয়েই ফুলি হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে আসে, অল্প বয়সেই ফুলি বড় মোটা হয়ে গেছে। একদল ছেলেপুলের মা। তবু বোধহয় সন্তানের তেষ্টা ওর মেটেনি। রবির জন্য একবুক ভালোবাসা বয়ে বেড়ায়।

ফুলির আদর সোহাগ সবই সেকেলে ধাঁচের। রবি গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই ফুলি হাত বাড়িয়ে রাস্তাতেই ওকে বুকে টেনে নেয়। মৃদু সুখের ঘুনঘুনে শব্দ করতে

করতে বলে—ধন আমার মানিক আমার গোপাল আমার...বলে মুখে বুকে মুখ ডুবিয়ে দেয়। রবি প্রথমটায় লজ্জা পায়। হাত-পা দিয়ে আদর ঠেকায়। কিন্তু তারও দুর্বলতা আছে! সারা সপ্তাহ ধরে সে এই অদ্ভুত গ্রাম্য আদরটুকুর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই দেখা যায়, রবি দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে তার মণিমাকে, কাঁধে মাথা রেখেছে। বলছে—রোজ রাতে আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখি মণিমা!

ফুলির বুকে বোধহয় এই কথায় একটা ঢেউ ওঠে নতুন করে। সেই ঘুনঘুনে আদরের শব্দটা করতে করতে পিষে ফেলে রবিকে। আর রবি এবার নির্লজ্জের মতো আদর খায়।

ফুলির ছেলেপুলেরা সাড়া পেয়ে হইহই করে এসে ঘিরে ধরে রবিকে। রবি ওদের কাছে একটা বিরাট বিস্ময়! সে সাহেবদের মতো চমৎকার ইংরেজী বলে, অদ্ভুত সব দামি পোশাক পরে, নিখুঁত সহবৎ মেনে চলে! ফুলির ছেলেমেয়েরা এসব দেখে ভারি মজা পায়।

ফুলির তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে রবিকে ছেড়ে দিয়ে মুগ্ধচোখে একটু চেয়ে রইল, আপন মনেই বলল—রোগা হয়ে গেছে।

চাঁপা হটবক্স ফ্লাস্ক আর দই-মিষ্টির ভাঁড় নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে—কিছু খেতে চায় না।

ফুলি মাথা নেড়ে বলে—খাবে কি? ওর ভিতরটা যে খাক হয়ে যায়। সে আমি বুঝি।

ফুলিদের আলাদা বসবার ঘর নেই। ঢুকতেই একটা লম্বাটে ঘর দালানের মতো আছে, সেখানে কয়েকখানা চেয়ার পাতা। ফুলির বর শিশির বি এন-আর-এ চাকরি করে। বয়স বেশি নয়, কিন্তু ভারি প্রাচীনপন্থী। বছর বছর ছেলেপুলে হয় বলে দেবাশিস ওকে একবার বলেছিল—ভায়া বউটাকে তো মেরে ফেলবে, ছেলেপুলেগুলোও মানুষ হবে না।

শিশির একটু ঘাড় তেড়া করে বলল—তা কী করব বলুন?

তখন দেবাশিস বলে—কন্ট্রাসেপেটিভ ব্যবহার করো না কেন?

শুনে বড় রেগে গিয়েছিল শিশির, বলল—কেন, আমি কি নষ্ট মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছি নাকি যে ওসব ব্যবহার করব?

এই হচ্ছে শিশির। আধুনিক জগতের কোনও খোঁজই সে রাখে না, তার ধারণা চাঁদে মানুষ যাওয়ার ঘটনাটা স্রেফ কারসাজি আর পাবলিসিটি। আজও সে বিশ্বাস করে না যে চাঁদে মানুষ গেছে। কথা উঠলেই বিজ্ঞের মতো একটু 'হু' দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে! দেবাশিসকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দেবাশিসের অর্থকরী সাফল্যকে সে হয়তো ঈর্ষা করে, কিংবা তার আধুনিক ফ্যাশান দূরস্ত হাবভাব, চালাক চতুর কথাবার্তা অপছন্দ করে।

দেবাশিস ঘরদালানের চেয়ারে বসল একটু। ভিতরের ঘরে রবিকে ঘিরে ধরে পিসতুতো ভাইবোন হল্লা করছে। মুর্গ মুসল্লমের প্যাকেট হটবক্স বের করা হয়েছে বোধহয়। তাই দেখে চেঁচাচ্ছে ফুলির আনন্দিত ছেলেমেয়েরা। বাথরুমের দিক থেকে

গামছাপরা শিশির বের হয়ে এল। দেবাশিসকে দেখে একটু হাসল। বলল—কী খবর? হাসিটা তেমন খুলল না।

—এই তো, চলে যাচ্ছে।

—রবিকে এনেছেন?

—হ্যাঁ, আওয়াজ পাচ্ছো না?

শিশির এবার সত্যিকারের হাসি হাসল। দেবাশিসকে যতই অপছন্দ করুক শিশির, রবির ওপর তারও ভয়ংকর টান আছে। রবি এলে সে রসগোল্লা কিনে আনে, টফি আনে, খেলনা। ডাকে রবিরাজ বলে।

ফুলি এক কাপ চা হাতে এল। শিশিরকে দেখে ঘোমটা দিল মাথায়। ওর চালচলনে এখনই কেমন গিন্নিবান্নির ঠাট ঠমক পাকা হয়ে গেছে। একগাল পান মুখে।

চা-টা একটা ছোট্ট টুলে দেবাশিসের সামনে রেখে হাঁসফাঁস করতে করতে বলে—সুজি করেছি, খাবে?

—না।

পানের পিক ফেলতে বাথরুমে মুখ বাড়িয়ে আবার ফিরে এল ফুলি। চাঁপার দিকে চেয়ে বলল—তুই দিনমান থাকবি তো চাঁপা, না কি দাদার সঙ্গে চলে যাবি? আমি একাহাতে আজকের দিনটা সামলাতে পারি না। খুদে ডাকাতরা সারা বাড়ি তছনছ করে, তার ওপর আজ আবার ওদের বাপ শনিঠাকুরটি বাড়িতে আছেন। আমি বলি বরং তুই থেকে যা।

চাঁপা ঘাড় নাড়ল! —বলে—সোনাবাবুর কাছছাড়া হতে ভালো লাগে না।

মুখটা খুশিতে ভরে ওঠে ফুলির, বলে—আহা রোগা হয়ে গেছে।

দেবাশিস ভদ্রতাবশত চায়ে চুমুক দেয়! আসলে ফুলির বাসার চা সে খেতে পারে না। চায়ের সুঘ্রাণ নেই, আছে কেবল লিকার আর গুচ্ছের দুধ-চিনি। দুধ বেশি পড়ে গেছে ফলে চা সাদা দেখাচ্ছে। ছেলেবেলায় বেশি দুধের চাকে তারা বলত সাহেব চা। সাহেবদের রং ফরসা বলেই বোধহয় উপমাটা দিয়ে থাকবে।

—ফুলি, এ যে সাহেব চা! দেবাশিস বলে।

ফুলি প্রথমটায় বুঝতে পারে না। তারপর বুঝে লজ্জা পেয়ে বলে—তোমার তো, আবার সব সাহেবি ব্যাপার—পাতলা লিকার অল্প দুধ-চিনি ওসব কি আর মনে থাকে! আমাদের বাঙালি বাড়িতে যেমনটি হয়ে তেমনটি করে দিয়েছি। আবার করে দিই।

—থাকগে। খারাপ লাগছে না। দেবাশিস বলে।

ফুলি সামনে মোড়া পেতে বসল। গায়ে মোটা মোটা গয়না, আঁচলে চাবি সব মিলিয়ে ওর নড়াচড়ায় এক ঝনৎকার শব্দ হয়। জোরে শ্বাস ফেলে, শ্বাসের সঙ্গে একটা শারীরিক কষ্টে ওঃ বা আঃ শব্দ করে। সম্ভবত কোনও মেয়েলি রোগ আছে। শরীরের নানা আধি-

ব্যাধির কথা বলে। কিন্তু বসে শুয়ে থাকে না কখনও। সারাদিন কাজকর্ম করছে স্টিম-রোলারের মতো।

বসে ফুলি বলল—দাদা, এবার রবির ব্যাপারে একটা কিছু ঠিক করো।

—কী ঠিক করব?

—ওকে আর তোমার ফাঁকা ভুতুড়ে ফ্ল্যাটে রেখে লাভ কী? সারাদিন ওর মনের মধ্যে নানা ভয়-ভীতি খোঁড়ে। দেখছো না, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে! খাওয়ায় অরুচি, সারাদিন নাকি মুখ গোমড়া করে থাকে। সঙ্গী-সাথিও নেই।

—সব সয়ে যাবে।

—সইছে কোথায়! প্রায় সময়েই আমার কাছে এসে মায়ের কথা বলে। দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে রাখি, ঘুমের মধ্যে দেখি খুব চমকে চমকে ওঠে। এ সব ভালো লক্ষণ নয়। মুখে কিছু বলে না, লজ্জায়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁদে।

দেবাশিস একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে বলল—আমি তো ও যা চায় দিই।

—আহা! বাচ্চাদের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে মা আর সঙ্গী। তা ও পায় কোথায়! আমি বলি, আমার কাছে থাক। মণিমা-মণিমা করে কেমন অস্থির হয় দেখনি?

দেবাশিস একটু হেসে বলে—তোরই তো অনেক ক-জন, তার ওপর আবার রবি এসে জুটলে—

ফুলি ধমকে ওঠে—ও সব অলক্ষুনে কথা বলো না! ছেলেমেয়ে আবার বেশি হয় নাকি?

দেবাশিস হাসে, বলে—তোর তাহলে এখনও ছেলেমেয়ের সাধ মেটেনি?

ফুলি কড়া গলায় বলে—না। মিটবেও না। আমি বাপু ছেলেপুলে কখনও বাড়তি দেখি না। যত হবে তত চাইব। মা হয়েছি কিসের জন্য?

যদিও এটা কোনও যুক্তি নয়, তবু এর প্রতিবাদও হয় না। কারণ এ যুক্তির চেয়ে অনেক জোরালো জিনিস। এ হচ্ছে বিশ্বাস। শিশিরের সঙ্গে থেকেই বোধহয় এইসব গ্রাম্যতা ওর মনে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির লড়াই বোকামি তাই দেবাশিস একটু চুপ করে থাকে। একটা সিগারেট ধরায়। বলে—দেখি।

—দেখবে আবার কী! রবিকে আমার কাছে দিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

—ওখান থেকে ওর ইস্কুলটা কাছে হয়, তাছাড়া একভাবে থেকে থেকে সেট হয়ে গেছে, এখন তোর এখানে এসে থাকলে দেখবি ওর মন বসছে না।

—কী কথা! এ বাড়িতে এলে ও কখনও যেতে চায় দেখেছো?

—সে এক-দু-দিনের জন্য, পাকাপাকিভাবে থাকতে হলেই গোলমাল করবে।

—সে আমি বুঝব! তুমি বাপু ছেলেকে সাহেব করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছো। আজকাল আমার সঙ্গেও ইংরিজি বলে ফেলে, কথায় কথায় 'সরি' আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে।

শিশির গামছা ছেড়ে লুঙ্গি পরেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—আসলে গরিবের বাড়িতে রাখতে দাদার ভয়। এখানে সব খারাপ সহবৎ শিখবে। খানা-পিনাও তেমন সায়েন্টিফিক হবে না।

দেবাশিস মনের মধ্যে এসব কথাই ভাবে। এখানে দঙ্গলের মধ্যে পড়ে রবি তার আচার-আচরণ ভুলে যাবে, স্মার্টনেস হারাবে। চিৎকার করতে শিখবে, খারাপ কথা বলতে শিখবে। এবং হয়তো বা দেবাশিসকে একটু একটু করে বিস্মৃত হবে।

দেবাশিস মৃদু গলায় বলে—না, সে সব নয়। আসলেও আছে বলেই ফ্ল্যাটটায় ফিরতে ইচ্ছে করে।

ফুলি বলে—তুমি আর কতক্ষণের জন্যই বা ফেরো। রাতটুকু কেটে গেলেই তো আবার টো-টো কোম্পানি। ও যে একা সেই একা!

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে—ভেবে দেখি।

—দাদা, আমি রবিকে বুক দিয়ে আগলে রাখব। একটুও চিন্তা কোরো না।

—সে আমি জানি। তবু একটু ভেবে দেখতে দে।

—ভাবতে ভাবতেই ওকে শেষ করে ফেলো না। এখানে থাকলেও সব ভুলে থাকতে পারবে। ফাঁকা ঘরে থাকে বলেই ওর সব মনে পড়ে। আমার কাছে কত কথা এসে বলে!

দেবাশিস ফুলির দিকে একটু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখছিল। ছেলেপুলের কী অপরিসীম সাধ ওর। গর্ভযন্ত্রণার কথা ভাবে না, ঝামেলার কথা ভাবে না। দুবার ওর পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে আজও দুঃখ করে। এই অভাব, দারিদ্র্য, দুঃসময়—এগুলো ওর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। দুটি বা তিনটি সন্তানের সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও কখনও বোধহয় চোখ তুলে দেখে না। শুনলে বলে—ওসব শোনাও পাপ।

দেবাশিস একটু হেসে বলে—পারিসও তুই।

ভিখিরির মতো ফুলি বলে—রবিকে দেবে দাদা?

দেবাশিস মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—আজ উঠি রে।

সে উঠে দাঁড়ায়। চাঁপা দৌড়ে গিয়ে রবিকে বলে—সোনাবাবু এসো! বাবা চলে যাচ্ছে। দেখা করে যাও।

কিন্তু রবি সহজে আসে না। দেবাশিস সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। চাঁপা রবিকে হাত ধরে নিয়ে আসে। দেবাশিস দেখতে পায়, ইতিমধ্যেই রবির চুল ঝাঁকরা হয়ে গেছে। ব্যানলনের গেঞ্জি বুক পর্যন্ত গুটিয়ে তোলা। মুখে চোখে একটা আনন্দের বিভ্রান্তি। দেবাশিসের দিকে চেয়েই রবি দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল—বাবা তুমি যাও।

দেবাশিস ক্লিষ্ট একটু হাসে। বলে—আচ্ছা।

ফুলি সিঁড়ি পর্যন্ত আসে। কয়েক ধাপ নামে দেবাশিসের সঙ্গে। গলা নীচু করে বলে—শোনো দাদা।

দেবাশিস অন্যমনস্ক ভাবে বলে—উঁ।

—রবি তোমার কাছে থাকলে ক্ষতি হবে। ও বড় দুঃখী ছেলে। তুমি কেন বুঝতে পারছো না?

দেবাশিস হাসল। মড়ার মুখের মতো হাসি। তারপর ফুলিকে পিছনে ফেলে নেমে এল রাস্তায়।

গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে একটা কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ ওপরে তাকাল। চমকে উঠল ভীষণ। দোতলার রেলিঙের ওপর দিয়ে আধখানা মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে রবি। আশেপাশে পিসতুতো ভাইবোনেরা। খুব উত্তেজিতভাবে কী যেন দেখছে দূরে। হাত তুলে আঙুল দিয়ে পরস্পরকে দেখাচ্ছে। হয়তো কাটা ঘুড়ি। কিংবা হেলিকপ্টার।

দেবাশিসের বুকের ভিতরটায় প্রবল একটা ঝাঁকুনি লাগে। গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলে যেমন হয়।

—রবি! বলে একটা চিৎকার দেয় সে।

মস্ত ভুল হয়ে গেল চিৎকারটা দিয়ে। এমন অবস্থায় কাউকে ডাকতে নেই। রবির মা সাততলা ফ্ল্যাট থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়।

শরীরের আধখানা বাইরে ঝুলন্ত অবস্থায় রবি ডাকটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। দুলে উঠল শিশু শরীর। শূন্যে হাত বাড়িয়ে একটা অবলম্বনের জন্য অসহায় ভাবে হাত মুঠো করল। টালমাটাল ভয়ঙ্কর কয়েকটি মুহূর্তের সন্ধি সময়। দেবাশিসের প্রায় সংজ্ঞাহীন শরীরটা টাল খেয়ে গাড়ির গায়ে ধাক্কা খায়। চোখ বুজে ফেলে সে। দাঁতে দাঁত চাপে।

রবি সামলে গেল। ওর ভাইবোনেরা ওকে ধরেছে। টেনে নামিয়ে নিচ্ছে রেলিং থেকে। ফুলি এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

দেবাশিস অবিশ্বাসভরে চেয়ে থাকে। রবি রেলিঙের ফাঁক দিয়ে বাবার দিকে চেয়ে হাসে। তারপর হঠাৎ প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে আনে। বাপের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়তে থাকে—ঠিসুং...ঠিসুং...

দেবাশিস একবার ভাবল ফিরে যাবে ফুলির বাসায়। তারপর ভাবল—থাক। ওরও তো ছেলেমেয়ে আছে। কেউ তো পড়ে মরেনি কখনও!

রবির দিকে চেয়ে দেবাশিস একটু হাসে। তার বুকে কোথায় যেন রবির খেলনা রিভলভারের মিথ্যে গুলি এসে লাগে। সে গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে কোনওক্রমে হুইলের পিছনে বসে পড়ে। তারপর গভীরভাবে কয়েকটা শ্বাস নেয়।

গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে কেবলই দোতলার রেলিং থেকে ঝুঁকে থাকা রবির চেহারাটাকে দেখতে পায়। চমকে চমকে ওঠে। দাঁতে দাঁত চাপে। হুইলে তার মুঠো করা হাত প্রবল চাপে সাদা হয়ে যায়। পদে পদে ভুলভাবে গাড়ি চালাতে থাকে সে!...রবির মা চন্দনা লাফিয়ে পড়েছিল সাততলা থেকে, কথাটা ভুলতে পারে না।।

রবিও কি কিছু ভোলেনি? সব মনে রেখেছে।

তৃণার সঙ্গে দেখা হবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। দেবাশিস খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে থাকে।

দুপুরের ফাঁকা রা. ায় তৃণা একটু বেশি তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। পিছনে কে যেন আসছে! ফিরে দেখল। কেউ না! কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে, পিছনে কে আসছে। কে যেন চুপি চুপি আসছে। কার চোখ তীব্র ভাবে, গোয়েন্দার মতো নজর করছে তাকে। কেউ নয়। তবু তৃণা প্রাণপণে হাঁটে। বড় রাস্তায় তুখোড় রোদ। দোকান বাজার বন্ধ। রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা, তৃণা কি আজ খুন হবে? গোপন থেকে কোন আততায়ী কেবলই আসে তৃণার দিকে?

তৃণা চারধারে তাকায়। কেউ নয়। উলটোবাগে চলে এসেছে অনেকখানি। বাসস্টপটা এখনও বেশ দূরে। তৃণা বেশি হাঁটতে পারে না। হাঁটা জিনিসটা বড্ড ক্লান্তিকর। রিকশাতেও সে কখনও ওঠে না। বড্ড মায়া হয়। দুপুরের পিচ-গলা রাস্তায়, এই চাবুক রোদে রোগা মানুষগুলো রিকশা টানে, তাতে সওয়ার হতে একদম ভালো লাগে না তার।

ল্যান্সডাউনের মোড়ে পেট্রল-পাম্পের কাছ ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিওলা হাঁটু তুলে বসে ছোট্ট একটা বই পড়ছে। সম্ভবত রেসের বই, কিংবা গীতাও হতে পারে। একা ট্যাক্সিতে তৃণা ওঠে না। ভয় করে। কিন্তু শরীরটা কেমন যেন কাঁপছে। ভয় করছে। উৎকণ্ঠা।

সাহস করে দু'পা এগোলো তৃণা।

—ভাই, ট্যাক্সি কি যাবে?

—যাবে। ট্যাক্সিওলা গম্ভীরভাবে বলে।

ট্যাক্সিটা দক্ষিণদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। তৃণা উঠতেই ট্যাক্সিটা ওই দিকেই চলতে থাকে, তৃণা কিছু বলেনি। তখন সে সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, রেবার ঘরে সে বসে আছে, আর রেবা, হৃদয়হীনা রেবা, তার দিকে স্বচ্ছ শীতল চোখে তাকিয়ে আছে, পরমুহূর্তেই সে তার ছেলেকে দেখতে পায়। মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান মনু তাকে কোলে করে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। কি সুন্দর মনুর গায়ের গন্ধটুকু। আবার দেখে শচীন পিংপং টেবিলের ওপাশে বসে আছে, বলছে—তোমাকে আজকাল আমি লক্ষ করি না...

ভ্রূ কোঁচকায় তৃণা। তার সংসারে সে আজকাল আর নেই। কেউ তাকে লক্ষ করে না। এ কেমন? সে ও-বাড়ির কারও মা, কারও গৃহকর্ত্রী। তার অতবড় পতন, ওই কলঙ্ক, পরকীয়া ভালোবাসা, এসব ওদের একেবারেই কেন উত্তেজিত ও দুঃখিত করে না? কেন ওদের শান্তি ও স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ আছে? এ কি শচীনের ষড়যন্ত্র। শচীন কি ওদের শিখিয়ে রেখেছে—ওর দিকে তাকিও না, কথা বোলো না, ওকে উপেক্ষা কর। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই!

ট্যাক্সিওলা আয়না দিয়ে তাকে দেখছিল। ছোটো আয়না, তাতে শুধু মধ্যবয়স্ক ও জোয়ান চেহারার ট্যাক্সিওলার ক্রুর চোখ দুটো দেখা যায়। ফট করে চোখ পড়তেই চমকে উঠল তৃণা! আতঙ্কিত একটা শব্দ উঠে এসেছিল গলায়। অস্ফুট শব্দটা মুখে হাতচাপা দিয়ে আটকালো। বলল—থামুন।

—এইখানে নামবেন? বলে ট্যাক্সিওলা গাড়ি আস্তে করল।

—এইখানেই। বলে তৃণা অবাক হয়ে দেখে, সে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসেছে, এদিকে তার আসার কথা নয়। সে যাবে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে। বার বার সে কেন তবে সে জায়গা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অন্যমনস্কতায়, বিভ্রমে? তৃণা আস্তে করে বলল—এটা কোন জায়গা। দেশপ্রিয় পার্ক?

হ্যাঁ, এখানেই নামবেন? বলে মধ্যবয়স্ক জোয়ান লোকটা তার দিকে পরিপূর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। লোকটার মুখে ঘাম, অশিক্ষার ছাপ! বন্যজন্তুর মতো একটা কামস্পৃহা লক্ষ করে তৃণা। বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। গাড়ির দরজার হাতলটা কিছুতেই খুলতে পারছিল না তৃণা। খুব তাড়াহুড়ো করছিল। একবার মনে হল, লোকটা কোন কৌশলে দরজাটা আটকে দেয়নি তো! যাতে তৃণা খুলতে না পারে। লোকটাই হঠাৎ তার প্রকাণ্ড ঘেমো হাতটা বাড়িয়ে তৃণার হাতটা ঠেলে লকটা খুলে দিল।

তৃণা নেমে যাচ্ছিল। খুব তাড়া। লোকটা পিছন থেকে খুব একটা ব্যঙ্গের গলায় বলল—ভাড়াটা কে দেবে?

তাড়াতাড়িতে আর ভয়ে কত ভুল হয়। তৃণা ব্যাগ খুলে ভাড়া দিয়ে দিল! লজ্জায় কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ট্যাক্সিওলার চোখের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি পালানোর জন্যই তৃণা এলোপাথারি খানিক হাঁটল উদভ্রান্তের মতো, চলে এল রাসবিহারী অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। কিছুতেই তার মনে পড়ছিল না এখান থেকে কোন রুটের বাস ফাঁড়ি পর্যন্ত যায়! মনটা বড় অশান্ত, বুকের মধ্যে কেবলই একটা পাখা ঝটপটানোর শব্দ, কাকাতুয়াটা ডাকছে...তৃণা...তৃণা...তৃণা...

আজ দুপুরের কলকাতাকে নিঝুমপুর নাম দেওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা হু হু, মন কেমন করা রাস্তা, রোদ গড়াচ্ছে, তৃণা ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে যাবে, কিন্তু সে অনেক দূর রাস্তা বলে মনে হয়। সে বড় অফুরান পথ। কোনওদিনই বুঝি পাওয়া যাবে না। বেলা একটা বেজে গেছে। তৃণার গায়ের চ্যানেল নাম্বার সিক্সের গন্ধটা অল্প অল্প করে উবে যাচ্ছে হাওয়ায়, বাতাসে চুল এলোমেলো।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল তৃণা। কি করে যাবে! সেই বারোটায় যাওয়ার কথা ছিল। দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতেই আবার অস্বস্তি বোধ করে পিছু ফিরে চাইল তৃণা। কে তার পিছনে আসছে? কে তাকে লক্ষ করছে নিবিষ্টভাবে?

আতঙ্কিত তৃণা হঠাৎ দেখল, একটা বিয়াল্লিশ নম্বর বাস মোড় নিচ্ছে, মনে পড়ল, এই বাসটা ফাঁড়ি হয়ে যায়। চলন্ত বাসটার সামনে দিয়ে হরিণ-দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল তৃণা। বিপন্নার মতো চিৎকার করে বলল—বেঁধে ভাই, বেঁধে...

প্রাইভেট বাস, যেখানে সেখানে থামে। এটাও থামল। তৃণা ভরতি বাসটায় একটু কষ্ট করে উঠে পড়ে।

দেবাশিস যে উন্নতি করেছে তা এমনি নয়। কতগুলো অদ্ভুত গুণ আছে তার। একটা হল ধৈর্য। তৃণা বাস থেকে নামতে নামতেই দেখল, বাসস্টপে দেবাশিসের গাড়ি থেমে আছে। আর সামনের জানালা দিয়ে অবিরল সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত তৃণা হাতের তেলোয় চেপে চুল ঠিক করতে করতে এগিয়ে গেল। খুব ফ্যাকাশে একটু হাসল!

দেবাশিস কিন্তু গম্ভীর। দরজাটা খুলে দিয়ে বলল—উঠে পড়ো।

তৃণা ঝুপ করে সিটে বসে বলল—অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছো। আজ আমার বড় দেরি হয়ে গেল।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলল—ঠিক উলটো।

—মানে?

—দেরিটা আমারই হয়েছে! তুমি আসার দুমিনিট আগে আমি এলাম। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, তুমি এসে ফিরে গেল। আমিও চলে যাবো যাবো করছিলাম, হঠাৎ দেখি তুমি বাস থেকে নামলে। তোমার দেরি হল কেন?

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলে—ঠিক বেরোবার মুখে কতগুলো ইনসিডেন্ট হয়ে গেল। রেবার ঘরে গিয়েছিলাম, ও ছিল না। হঠাৎ এসে বিশ্রী ব্যবহার করল। আর শচীনবাবুর সঙ্গেও একটু কথা কাটাকাটি, সেই থেকে মনটা এমন বিচ্ছিরি, আর অন্যমনস্ক, রাস্তা ভুল করে অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। তোমার দেরি হল কেন?

দেবাশিস গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—তোমার সঙ্গে মিল আছে। ফুলির বাসায় রবিকে পৌঁছে দিয়ে বেরোবার সময়ে দেখি দোতলার রেলিং ধরে রবি...উঃ! মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখে একবার শিউরে ওঠে দেবাশিস। তারপর আস্তে করে বলে, রবিকে ফুলি কেড়ে রাখতে চাইছে। রবিও আর আমার সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না!

তৃণা চুপ করে থাকে। একটা গভীর শ্বাস চাপতে গিয়ে বুকের ভিতরটা কুয়োর মতো গভীর গর্ত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ বাদে সে বলল—কি ঠিক করলে, রবিকে ওখানেই রাখবে?

—রাখতে চাইনি। তবু রয়েই গেল বোধহয়। ওকে রেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ভীষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। দুটো ট্র্যাফিক সিগন্যাল ভায়োলেট করেছি, পুলিশ নাম্বার নিয়েছে। পার্ক সার্কাসে একটা বুড়ো লোককে ধাক্কাও দিয়েছি, তবে সে মরেনি। কিছুক্ষণ ওইরকম র‍্যাশ ড্রাইভ করে দেখলাম, আর গাড়ি চালানো উচিত হবে না। আস্তে আস্তে গাড়িটা নিয়ে অফিসে গেলাম। বন্ধ অফিস খুলে অনেকক্ষণ ফাঁকা ঘরে বসে রইলাম। ঠিক নরমাল ছিলাম না! সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিল। রবি কেন আমাকে আর তেমন পছন্দ করে না

বলো তো! আমি তো ওকে সব দিই। তবু কেন! বুঝলে তৃণা, আজ ফাঁকা অফিস ঘরে বসে আমার মতো কেজো মানুষেরও চোখে জল এল।

—আস্তে চালাও, তুমি বড় অন্যমনস্ক। গাড়ি টাল খাচ্ছে।

দেবাশিস সামলে গেল! গাড়ি চালাতে চালাতে বসে—অফিসে বসেই একটা ডিসিশন নিলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে গেলাম ফুলির বাড়িতে। তখন গাড়ি চালানোর মতো মনের অবস্থা নয়। গিয়ে বললাম—ফুলি আজ থেকেই রবি তোর কাছে থাকল। ফুলির সে কি আনন্দ! ওই মোটা শরীর নিয়েও লাফ ঝাঁপ দৌড়ো-দৌড়ি লাগিয়ে দিল। রবি ঘুমোচ্ছিল, আমি আর ওকে ডাকিনি। ঘুমন্ত কপালে একটা চুমু রেখে চলে এসেছি! ছেলেটা বুঝি পর হয়ে গেল। যাকগে।

তৃণা কাঁদছিল। নীরবে একটু ফোঁপানির শব্দ হচ্ছিল কেবল! দেবাশিস হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বলল—কেঁদো না। সব কিছু কি একসঙ্গে পাওয়া যায়?

তৃণা মুখ না তুলে কান্নায় যতিচিহ্ন দিয়ে দিয়ে বলে—আমিও চলে এসেছি। চিরকালের মতো, আর ফিরব না।

দেবাশিস একটু গম্ভীর হল। শান্ত গলায় বলে—ভালোই করেছো। শচীন কিছু বলল না?

—অনেক কথা বলল। তত্বকথা। আমাকে সাহসের সঙ্গে তোমার কাছে চলে আসতে উপদেশ দিল।

দেবাশিস একটু ভ্রূ কুঁচকে বিষয়টা ভেবে দেখে। তারপর বলে —শচীন ভেবেছে ও আমাকে চান্স দিচ্ছে। আই অ্যাম রেডি ফর দি ক্যাচ তৃণা। শচীন ইজ আউট।

তৃণা ঝুঁকে বসে কাঁদতে লাগল।

দেবাশিস কাঁদতে দিল তৃণাকে। একবার কেবল বলল—তোমার খিদে পায়নি তৃণা? আমার কিন্তু পেয়েছে।

তৃণা সে কথার উত্তর দিল না। কেবল নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

কান্নাটা বড়ই বিরক্তিকর। একটা মেয়ে সামনের সিটে উপুড় হয়ে বসে কাঁদছে—এ একটা সিন। গাড়ির কাচ দিয়ে বাইরে থেকেই দেখা যায়। অনেকে দেখছেও। দেবাশিস একটু অস্বস্তি বোধ করছিলে। বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। ইচ্ছে ছিল রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেবে। কিন্তু তৃণার এই বেসামাল অবস্থায় রেস্টুরেন্টে যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়িতেই যেতে হয়। আজ সকাল পর্যন্ত কী তীব্র পিপাসা ছিল তৃণার জন্য। এখনও কি নেই? কিন্তু কেবলই রবির কথা মনে পড়ছে, রবিকে ফুলির কাছে রেখে এল দেবাশিস। বদলে কি তৃণাকে পেল চিরকালের মতো? দু জনকে দুদিকের পাল্লায় বসিয়ে দেখবে নাকি কোনদিকটা ভারী?

কিছুতেই কিন্তু ভাবা যাচ্ছে না যে তৃণা চলে এসেছে চিরকালের মতো। হাতের নাগালে বসে আছে। একই ফ্ল্যাটে এরপর থেকে তারা থাকবে। দেবাশিস ভেবেছিল, এ এক অসম্ভব প্রেম। দুটো নৌকা, স্রোত আরও কি কি যেন।

তৃণা বাথরুমে স্নান করছে। দেবাশিস বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করে। বিকেল চারটে বাজে মোটে। প্রীতম একবার চা দিয়ে গেছে। তারপর দোকানে গেছে খাবার আনতে। তৃণা এলে তারা খাবে।

দেবাশিস সিগারেট ধরিয়ে তার ফ্ল্যাটের বিশাল জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। বহু নীচে ফুটপাথ। এই সেই খুনি জানালা। অত নীচে কী করে, কোন সাহসে লাফিয়ে পড়েছিল চন্দনা? হাত পা হঠাৎ নিসপিসিয়ে ওঠে তার।

ভালো করে পরদা সরিয়ে পাল্লা খুলে ঝুঁকে দেখল দেবাশিস। ঝিমঝিম করে ওঠে মাথা। অবলম্বনহীন শূন্যতা তাকে দুহাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে, এসো এসো। সাততলার ওপর সারাদিন, সব ঋতুতেই প্রচণ্ড হাওয়া খেলা করে, কী বাতাস। মার মার করে ছুটে আসছে ঠান্ডা, বুক জড়ানো বাতাস। তবু অত হাওয়াতেও দেবাশিসের মুখে ঘাম ফুটে ওঠে। কত নীচে ফুটপাথ! কী তীব্র আকর্ষণ অধঃপাতের! সবসময়েই, অবিরল পৃথিবী তার বুকের কাছে সবাইকে টানছে। যখন জানালার চৌকাঠের অবলম্বন জীবনে শেষবারের মতো ছেড়ে দিয়েছিল চন্দনা, ফুটপাথ স্পর্শ করবার আগে এই যে অবলম্বনহীন দীর্ঘ শূন্যতা বেয়ে নেমে গিয়েছিল তার শরীর, এই শূন্যতাটুকু কিভাবে অতিক্রম করেছিল ও? বাঁচতে ইচ্ছে করেনি ফের? পোকার মতো মানুষ হাঁটছে, গাড়ি যাচ্ছে, একটা দুটো গাছ, কালো মিশমিশে রাস্তা। কী ভয়ঙ্কর! মুখের সিগারেটটা বাতাসে পুড়ে গেল দ্রুত। শেষ অংশটা ছুঁড়ে দিল দেবাশিস। বাতাসে খানিকটা ভেসে গেল, তারপর অনেক অনেকক্ষণ ধরে পড়তে লাগল নীচে...নীচে...নীচে।

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ। তৃণা বেরিয়ে এল।

দেবাশিস শরীরটা তুলে আনল ভিতরে। বাতাস লেগে চোখে জল এসে গেছে।

তৃণার কান্না আর বিষণ্ণতা স্নানের পর ধুয়ে গেছে। কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। শোওয়ার ঘরে দুটো খাট, বিছানা পাতা। তার পাশে একটা পরদা ঘেরা সাজবার ঘর। জানালার পাশেই লম্বা আয়না লাগানো সাজবার টেবিল। তৃণা সেখানে গিয়ে বসল। চন্দনা এখানে বসে সাজত।

তৃণা নিজেকে আয়নায় দেখল। কিন্তু তেমন দেখবার নেই। একটু সামান্য সাজগোজ করল। চুলটা ফেরাল। কোনওদিনই সে খুব একটা সাজে না।

আয়নায় দেবাশিসের ছায়া পড়ল। পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে একটু হাসি। চুলগুলো খুব এলোমেলো।

বলল—কেমন লাগছে তৃণা?

তৃণা বিষণ্ণ হেসে বলল—ভালোই।

—আজ থেকে...বলে চুপ করে দেবাশিস। কী বলবে?

তৃণা কথাটা পূরণ করে নিল মনে মনে। লজ্জায় মাথা নোয়াল। বলল—তুমি যাও দেব। স্নান করে ফিরো এসো।

দেবাশিস আঙুলে ধরা সিগারেটটা তুলে দেখাল, বলল—যাচ্ছি। সিগারেটটা শেষ করে নিই।

—অন্ততঃ ও ঘরে যাও। পুরুষের সামনে আমি সাজতে পারি না।

—ও। বলে দেবাশিস পরদার ওপারে গেল। ওখান থেকেই বলল—শোনো তৃণা, তোমার যা যা দরকার প্রীতমকে দিয়ে আনিয়ে নাও। আজ রোববার, দোকান অবশ্য সবই বন্ধ।

—কী আনবো? আমার কিছু দরকার নেই।

—এক কাপড়ে তো বেরিয়ে এসেছো।

—চন্দনার শাড়ি টাড়ি কিছু নেই?

—না। সব বিলিয়ে দিয়েছি।

—কেন দিলে?

—রবির জন্য। ওসব থাকলেই তো ওর মায়ের কথা মনে পড়ত।

তৃণা বেশ ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একথায় বুকে একটা ধাক্কা খেল। তবু হেসে বলে—তবু কি মনে পড়ে না?

—পড়ে। সেটা চেপে রাখে। আমার ফ্ল্যাটটা কিন্তু আমি সাজাইনি, চন্দনা সাজিয়েছিল। সেইভাবেই সব আছে। এক একবার ভাবতাম সাজনোর প্যাটার্ন পালটে দিই। কিন্তু সময় পাইনি, এত কাজ। সেই সাজানো ঘরে চন্দনার কথা ওর মনে তো পড়বেই। এবার তুমি সাজাও।

—দূর বোকা। মনে পড়া কি ওভাবে হয়! তুমি জানো না।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলল—আর রবির জন্যে আমার ভাবনা নেই। ফুলির বাড়ির দঙ্গলে মিশে গেলে আর কিছু ওর মনে থাকবে না।

—সিগারেটটা শেষ হয়েছে?

—হয়েছে।

—এবার যাও। আমার এখন খুব খিদে পাচ্ছে।

—তোমার কি কি দরকার বললে না?

—অনেক কিছুই দরকার। কিছু তো আনিনি। সে পরে হলেও চলবে।

—লজ্জা কোরো না। এ তো আর পরের বাড়ি নয়। তোমার নিজের।

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে বলল—তাই বুঝি?

—নয়?

তৃণা একটু হেসে বলে—এত সহজে কি নিজের হয়? অনেক সময় লাগবে। আমাকে একটু সময় দিও, তাড়া দিও না।

দেবাশিস একটু উষ্মাভরে পরদার ওপাশ থেকে বলে—কেন? সময় লাগবে কেন?

—লাগবে না! গাছ উপড়ে দেখো তার শিকড়ের সবটা কি একেবারে উঠে আসে? কত শিকড়বাকড়ের ছেঁড়া সুতো কিছু কিছু মাটির মধ্যে থেকে যায়।

—তৃণা।

—উ!

—গাছ তো একটানে ওপড়ানো হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে তার শিকড়ের মাটি ক্ষয় হয়েছিল না কি!

—আবার বলছি, তুমি বোকা।

—কেন?

—উপমা দিয়ে কি সব বোঝানো যায়? গাছের সঙ্গে মানুষের কিছু তফাত আছেই।

পরদা সরিয়ে উত্তেজিত দেবাশিস এ ঘরে চলে এল হঠাৎ। মেঝেতে তৃণার কাছে বসে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বলল—তৃণা, আমি বড় কাঙাল।

—জানি তো।

—আজ আমার কেউ নেই।

তৃণা তাকিয়ে রইল।

দেবাশিস বলল—আর আমাকে এখন ওসব ভয়ের কথা বোলো না। তোমারও যদি ছেঁড়া শেকড় অন্য জায়গায় থেকে থাকে তবে আমার কি হবে? আজ থেকে রবিও পর হয়ে গেল।

তৃণা স্নিগ্ধস্বরে বললে—রবির জন্য তোমার বুকের ভিতরটা কেমন করে দেব, তা বোঝো না!

—ভীষণ বুঝি।

—ওটুকু কি আমার হতে নেই?

দেবাশিস চুপ করে গেল। জোব্বা জামার পকেট থেকে ফের সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনল। ধরাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল—বুঝেছি।

তৃণা তেমনি স্নিগ্ধস্বরে বলল—আমরা তো আর ঠিক সকলের মতো হতে পারি না।

দেবাশিস বলল—তাও ঠিক। তবে আমরা কীরকম হবো তৃণা?

—খুব সুখী হব না। একটু কি যেন থেকে যাবে দুজনের মধ্যে!

—তুমি কি ভীষণ স্পষ্ট কথা বলছ আজ তৃণা!

—আজই বলে নেওয়া ভালো।

—কেন? আজই কেন?

তৃণা চোখ মুছে হাসিমুখে বলে—আজ সপ্তাহের ছুটির দিন। তোমার সময় আছে। কাল থেকেই তো তুমি আবার ব্যস্ত মানুষ। তোমার কি আর সময় হবে?

—তুমি কথাটা ঘোরালে তৃণা।

—তুমি বাথরুমে যাও। আমার খিদে পেয়েছে।

দেবাশিস তবু বসে রইল। চুপচাপ। অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে বলে তৃণা—বলো।

—মানুষকে তার সব সম্পর্ক থেকে ছিঁড়ে আনা যায় না। একজনকে ভালো না বাসলেই যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল এমন নয়। আবার কাউকে ভালোবাসলেই যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল এও নয়। তবে ভালোবাসা দিয়ে আমরা কী করব?

তৃণা কপালটা টিপে ধরে বলল—ও, আবার সেই তত্বকথা! জানো না মেয়েরা তত্বকথা ভালোবাসে না। মাথা ধরেছে, তুমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে প্রীতম। বড় রেস্টুরেন্টের দামি সব খাবার। প্রীতমের মুখে খুব একটা হাসি নেই। কেবল বিনয় আছে।

দেবাশিস যখন খাওয়ার টেবিলের ধারে এসে বসল তখনও তৃণা নিজের কপাল টিপে বসে আছে, বলল—তোমার চাকরকে পাঠিয়ে একটা মাথা ধরার বড়ি আনিয়ে দাও।

দেবাশিস মৃদুস্বরে বলে—ও তোমার চাকর। অবশ্য পাঠানোর দরকার নেই। মাথাধরার বড়িটড়ি আছে বোধহয়। খুঁজতে হবে।

—খিদে চেপে রাখলে, বা কাঁদলে আমার মাথা ধরে।

দেবাশিস চোখ তুলে ইঙ্গিতে প্রীতমকে সরিয়ে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে তৃণার একখানা হাত ধরে বলল—তুমি প্রস্তুত হয়ে আসোনি জানি। হুট করে চলে এসেছো। তাই কাঁদছো। আমি মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম তোমার জন্য।

তৃণা হেসে বলে—খুব প্রস্তুত! একখানা শাড়িও যদি কিনে রাখতে। কাল আমাকে বাসি কাপড়ে সকালবেলাটা কাটাতে হবে, যতক্ষণ শাড়ি কেনা না হয়।

—একটা দিন সময় দাও! প্লিজ। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ দোকান বন্ধ।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল—সময়! সময়! দাঁড়াও। সময় নিয়ে কি একটা কবিতার লাইন মনে আসছে—

এল না। মাথাটা ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়!

দেবাশিস বলে—খেয়ে একটু রেস্ট নাও। শোওয়ার ঘরের পরদাগুলো টেনে দিচ্ছি, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকো একটু।

—তুমি কোথায় যাবে?

—কোথাও না। তোমার কাছেই বসে থাকব। বকবক করব। দেবাশিস সস্নেহে হাসল।

পাঁচটা প্রায় বাজে। সাততলা ফ্ল্যাটের শার্শির গায় অত্যন্ত উজ্জ্বল সোনালি রোদ এসে পড়েছে। এখনও অনেক বেলা আছে। অন্ধকার হতে এখনও অনেক বাকি। পরদায় ঢাকা শোওয়ায় ঘরে শুয়ে আছে তৃণা। গায়ে খয়েরি পরদার আলোর আভা। দুটো বড়ি খাওয়ার পর আস্তে আস্তে মাথাধরাটা সেরে যাচ্ছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। তবু কি ঘুম আসে! দেবাশিস অনেকক্ষণ মাথা টিপে দিল। ঝিম মেরে শুয়ে ছিল তৃণা, ঘুমের ভান করে। সে ঘুমিয়েছে মনে করে দেবাশিস উঠে গেছে পা টিপে টিপে।

ঘরটা ঠিক অন্ধকার হয়নি। আবার আলোও নেই। সাততলার ওপর খুবই নিরাপদ আশ্রয়। একা শুয়ে আছে তৃণা। মাথা ধরা সেরে গেছে। নরম বিছানায় এলিয়ে আছে ক্লান্ত শরীর। এ একরকমের আলস্য। সুন্দর আলসেমি। কিন্তু ঘুম হবে না। আরও কতকাল ঘুম হবে না তৃণার।

সে চোখ চেয়ে দেখল ছাদের মসৃণ রং, চৌকো দেওয়াল। দেওয়ালে রহস্যময় আলো। চেয়ে থাকতে সেই সুরসুরির মতো একটা অনুভব। কে যেন দেখছে। খুব নিবিষ্টভাবে দেখছে তাকে।

চমকে উঠল তৃণা। মাথাটা একবার তুলে চারদিকে তাকাল। আবার মাথাটা বালিশে রেখে চোখ বোজে! কিন্তু অবিরল তার ওই অনুভূতি হয়, কে যেন দেখছে। ভীষণ দেখছে। চন্দনার ভূত? নাকি তার মনেরই প্রক্ষেপ? সে নিজেই হয়তো। ভাবতে ভাবতে মুখটা আস্তে ফেরাল তৃণা। চোখটা আপনা থেকেই খুলে গেল। আর ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠে বসে সে—কে? কে?

খাওয়ার ঘরের দিকটার দরজার পরদার ওপাশে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে পরদাটা আস্তে সরিয়ে মুখ বাড়াল ভিতরে! ভার গলায় বলে—আমি প্রীতম।

তৃণা অবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ে থেকে বলে—কী চাও?

চাকরটা একটু ভয়ের হাসি হেসে বলে—সাহেব বলে গেলেন আপনি ঘুম থেকে উঠলে খবর দিতে, উনি একটু কোথায় বেরোলেন। এক্ষুনি আসবেন।

—কোথায় গেছেন?

—বলে যাননি। গাড়ি নিয়ে গেলেন দেখেছি।

—ও।

তৃণার বুকের ভিতরটা এখনো ঠকঠক করছে। শ্লথ আঁচল টেনে নিয়ে সে উঠল। বলল —দাঁড়াও। তোমাদের ঘরটরগুলো আমাকে একটু দেখিয়ে দাও। চিনে রাখি।

চাকরটা উত্তর করল না, খুশিও হয়নি। তবু এক রকম বিরক্তি বা ঘেন্না চেপে রাখা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। ও হয়তো ভাবছে, সাহেব রাস্তার মেয়েছেলে ধরে এনেছে, রাখবে। দেবাশিস তো ওকে বলেনি যে তৃণা আসলে কে! বললেও বুঝবে না। এমন

অবস্থার দুটি মানুষের ভিতরকার প্রেমের সত্য কে কবে বুঝেছে! সবাই একটা কিছু ধরে নেয়।

শোওয়ার ঘর দুটো। একটা খাওয়ার ঘর। একটা বসবার। অনেকটা জায়গা নিয়ে খোলামেলা ফ্ল্যাট। দ্বিতীয় শোয়ার ঘরটা রবির। সেখানে অনেক খেলনা, ট্রাইসাইকেল, ছবির বই, ছোট্ট ওয়ার্ডরোব। এই ঘরটায় একটু বেশিক্ষণ থাকল তৃণা। চাকরটাকে বলল —এককাপ কফি করে আনো।

ফোনটা বাজছে বসবার ঘরে। বাজছেই। চাকরটা রান্নাঘরে। ওখান থেকে শুনতে পাবে না। তৃণা ইতস্তত করছিল ফোনটা কি সে ধরবে? পরমুহূর্তেই ভাবল অমূলক ভয়। এ বাড়িতে তাকে যদি থাকতেই হয় তবে এসব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলাই উচিত। সে উঠে এল বসবার ঘরে। ফোন হাতে নিয়ে অলস গলায় বলে—হ্যালো।

একটা কচি গলা শোনা গেল—বাপি? ওঃ...থেমে গেল স্বরটা। তারপর নম্বরটা বলে জিজ্ঞেস করল—এটা কি ওই নম্বর?

তৃণা বুঝে নিল, রবি। ফোনের গায়ে লেখা নম্বরটা তৃণারও তো মুখস্ত। বলল—কে বলছ?

—তুমি কে? বলে কচি গলাটা অপেক্ষা করল। হঠাৎ ভয়ার্ত গলায় বলল—মা?

তৃণা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ফোনটা কানে চেপে দাঁড়িয়ে রইল। রবি ফোন করছে। যদি তৃণা রং নাম্বার বলে ফোন ছেড়ে দেয় তো রবি আবার ফোন করবে, শুধু আজ নয়, কালও করবে। হয়তো প্রায়ই বাবার সঙ্গে দরকার পড়বে তার, তৃণা কোথায় পালাবে? পালাবেই বা কেন? তবু প্রথম ধাক্কাটা সামলানোর জন্য একটু সময় দরকার। সে চোখ বুজে বলল—রং নাম্বার।

ফোন রেখে দিল। ভেবে পেল না, রবি কেন মা কিনা জিজ্ঞেস করল।

প্রীতম কফি করে এনেছে। সেই সময়েই ফোনটা আবার বাজে। প্রীতম তার দিকে তাকায়। তৃণা ঘাড় হেলিয়ে বলে—রবি ফোন করছে। ওকে আমার কথা বোলো না।

প্রীতম ফোন তুলে নিয়ে বলে—হ্যালো। রবিবাবু?

—না তো। ফোন বাজেনি।

—সাহেব বাইরে গেছেন।

—না। আমি একা। তুমি আর আসবে না?

—চাঁপাদি আসবে না? আচ্ছা বলে দেব। তোমার সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দেবো।

—আচ্ছা তুমি আসবে না কেন?

—এলে বলব। ছাড়ছি।

ফোন রেখে প্রীতম একবার আড়চোখে তৃণার দিকে চেয়ে বাইরে চলে গেল।

সাড়ে পাঁচটা। দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

তৃণা ভেবেছিল দেবাশিস এসেছে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অপ্রস্তুত। দেবাশিস নয়। টেরিলিন পরা দিব্যি ঝকমকে একজন যুবা পুরুষ। সেও একটু অপ্রস্তুত। বলল দেবাশিস—নেই?

—না। বেরিয়েছে।

—ও। বলে খুব কৌতূহলভরে চেয়ে দেখল তৃণাকে।

তৃণা কি ওকে বসতে বলবে?

লোকটা নিজেই বলে—রবি নেই?

—না।

লোকটার চোখে স্পষ্টই একটা প্রশ্ন আপনি কে? কিন্তু লোকটা সে প্রশ্ন করে না, ভদ্রতায় বাঁধে। তাই বলল—আমি রবির মামা।

—ও? আসুন।

—বসে আর কি হবে! কেউ নেই যখন! বলতে বলতেও যুবকটি কিন্তু ঘরে আসে। একটু ইতস্তত করে বসে। একটা শ্বাস ফেলে হাতে হাত ঘষে বলে—আপনি ওর রিলেটিভ বোধ হয়?

তৃণা মৃদু হেসে বলে—হ্যাঁ।

—চন্দনা আমার দিদি ছিল।

তৃণা তার এলো চুলের জট আঙুলে ছাড়াতে ছাড়াতে বলে—বুঝেছি বুঝেছি। বসুন ও এসে পড়বে।

যুবকটি ঘড়ি দেখে বলে—একটু বসতে পারি। আমি ভাবলাম—বলে একটু কথা সাজিয়ে নিয়ে বলে—আসলে কাল আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। বলছিলাম কি দেবাশিসদা তো যাবেনই, সেইসঙ্গে আপনিও...যদি ঠিক আচমকা এভাবে—

তৃণার ছেলেটির জন্য মায়া হয়। বুঝতে পারছে না, বুঝতে চাইছে বলল—কফি খান। ও এসে পড়বে।

ছেলেটি প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে তাকে দেখতে থাকে! চোখে চোখ পড়তেই সরিয়ে নেয়। কিন্তু দেখে। তৃণা কফি বানাতে বলবার ছল করে উঠে এল। রান্নাঘরে প্রীতমকে খবর দিয়ে শোয়ার ঘরে গিয়ে বসে রইল চুপচাপ। শুনল ওঘরে প্রীতমের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা! চাপা স্বর। এরকমই হবে এর পর থেকে। তৃণার জায়গাটা স্থির হতে অনেক সময় লাগবে। অনেক সময়। তৃণা শুষ্কমুখে বসে থাকে। চুলের জট ছাড়ায় অন্যমনে।

দেবাশিসের ফিরতে ছ'টা বেজে গেল। তখনও ছেলেটা বসে আছে সামনের ঘরে। আর দেবাশিসের হাতে কয়েকটা শাড়ির প্যাকেট, রজনীগন্ধার ডাঁটি, কসমেটিকসের বাক্স, খাবারের বাক্স। চন্দনার ভাই সে সব দেখে অবাক। পরদার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটা দেখল তৃণা।

না, দেবাশিস খুব একটা ঘাবড়াল না। চালাক লোকেরা এরকম বিপদে পড়লে খুব গম্ভীর হয়ে যায়। দেবাশিসও হল। দু'চারটি কী কথা হল ওদের। ছেলেটা চলে গেল।

দেবাশিস বেশ হাঁক ছেড়ে ডাকল—তৃণা।

তৃণা ঘরের মাঝখানটায় না গিয়ে পরদা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে—কি?

দেবাশিস একগাল হাসি হেসে বলল—সব এনেছি।

—কোত্থেকে?

—তোমাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হঠাৎ মনে পড়ল যাদবপুরে যখন থাকতাম তখন দেখেছি ওই অঞ্চলে রবিবারে দোকান খোলা থাকে। গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম, দেখ তো সব!

সব দেখে তৃণা হেসে কুটিপাটি। বলল—কী এনেছো এসব?

—কেন?

—এ রংচঙে শাড়ি আমি পরি নাকি?

—পরো না?

—এসব তো রেবা পরে। আর অত কসমেটিক্স! হায় রে আমি কবে আবার ওসব আলট্রা মডার্ন লিপস্টিক মাখি, কিংবা কাজল!

দেবাশিস হেসে বলে—এবার মেখো। বুড়ি সাজা তোমার কবে ঘুচবে বলো তো?

—মেয়ে বড় হয়েছে দেব, কদিন পরেই প্রেম করবে। এখনই করছে কিনা কে জানে!

দেবাশিস হেসে বলে—বাঙালি মেয়েদের ওই হচ্ছে রোগ। তুমি সাজবে না কেন তৃণা?

তৃণা শুধু হাসল। স্নিগ্ধ হাসি। বলল—রবি ফোন করেছিলর্।

দেবাশিসের মুখের হাসিটা মরে গেল, বলল—কী বলল?

—আমি ধরেছিলাম। রং নাম্বার বলে ছেড়ে দিয়েছি। পরে আবার ফোন করেছিল, তখন প্রীতম ধরে।

দেবাশিস একটু ভেবে বলল—থাকগে।

উঠে পোশাক পালটে এল দেবাশিস। চা খেল ফের।

ডাকল—তৃণা।

—উঁ!

—কিভাবে শুরু করা যায় বলো তো!

—কী? কীসের কথা বলছো?

—বুঝতে পারছো না?

—না তো।

—তোমার আর আমার এই জীবনটা।

—শুরু আবার করবে কীভাবে?

—ধরো বিয়ে হলে পুরুতের মন্ত্র, ফুলশয্যা-টয্যা দিয়ে একটা শুরু করা যায়। রেজিস্ট্রি করলে তারও সরকারি মন্ত্র আছে। আমরা কি দিয়ে শুরু করব?

তৃণা লজ্জা পেয়ে বলে—ওসব বোলো না। কানে লাগে। আমরা কিছু শুরু করলাম, নাকি শেষ করে এলাম?

—তোমার কি তাই মনে হয়? তার উত্তরে বলা যায় যে একটা শেষ না করলে অন্যটা শুরু করা যায় না তৃণা।

—ফের তত্বকথা!

—তুমি যে শুরুটাকে শেষ বলছ!

—শোনো দেব, আমি কিছু শেষ করে আসিনি। শুরুর কথাও ভাবিনি। আমি বাড়িতে ভূতের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমি কি করছি আমি নিজেও জানি না। মাথার ভিতরটায় বড় গণ্ডগোল। আজ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। শুধু একটা জিনিস জানি।

—কী তৃণা? আগ্রহে দেবাশিস ঝুঁকে বসে।

—তোমাকে আমার ভীষণ দরকার এ সময়ে। আর কিছু না।

—তৃণা, তবে আমরা সেই আদিমভাবে শুরু করবো! যখন কোন অনুষ্ঠান ছিল না, কেবল শরীর ছিল!

—ছিঃ। ওভাবে বলো না।

দেবাশিস হেলান দিয়ে বসে বলে—ছেলেবেলায় আমি ছিলাম বদমাস। মেয়েদের হাতে চিঠি গুঁজে দিতাম। বসন্তবাবুর বাড়ির ছাদে প্রত্যেকদিন ঘুড়ি গোঁত্তা মেরে নামিয়ে দিতাম তাতে লেখা থাকত আই লাভ ইউ। বসন্তবাবুর মেয়ে রানিকে উদ্দেশ্য করে। তখন শুরু করার কোনও প্রবলেম ছিল না। ভাবতে শিখিনি, রচনা করতে শিখিনি, সাজাতে শিখিনি, ওই ভাবেই শুরু করতাম। চন্দনার সঙ্গেও হুট করে শুরু। প্রথমে শরীর, তারপর ভালোবাসার চেষ্টা, দেন ফ্রাস্টেশন অ্যান্ড দি এন্ড, তোমাকে নিয়ে তো সেভাবে শুরু করা যায় না। আজ আমার মস্ত প্রবলেম।

—আজকের দিনটা অত ভেবো না। মাথা ঠান্ডা করো।

দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলে—আজকের দিনটা অদ্ভুত। বুঝলে? আজ রবিকে পার্মানেন্টলি ওর পিসির বাড়িতে দিয়ে এলাম। আর তারপরই শুনলাম তুমি চলে আসছ। শচীন কিছু বললনা?

—কী বলবে?

—অধিকার ছেড়ে দিল এক কথায়? তুমিই বা কী বলে এলে? তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে—কী বলব? আমি কিছু বলে আসিনি। দেবাশিস চমকে উঠে বলে—বলে আসনি?

—না। আমি প্রায়ই যেমন বেরোই তেমনি বেরিয়ে এসেছি।

—আমার কাছে এসেছো সে কথা কেউ জানে না?

—না।

—কাউকে বলোনি?

—না।

—বোকা।

—কেন?

—তুমি না ফিরলে ওরা তো থানা পুলিশ করবে। হাসপাতালে খোঁজ নেবে।

—নেবে! বলছো?

—নেবে না?

—আমার তো মনে হয় না। ওরা কি জানে যে আমি আছি?

—তুমি। বোকা তৃণা। বলে আসলেই হত। শচীনবাবু কি তোমাকে কামড়াত?

—তা নয়। ওরা আমাকে নিয়ে বহুকাল ভাবে না। আজ একটু ভাবুক।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে—তা হয় না।

বলেই উঠে গেল দেবাশিস। ডায়াল করতে লাগল। তৃণা ওর কাছে গিয়ে বলল ফোন কোরো না। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নিরুদ্দেশ থাকতে দাও। ওরা ভাবুক।

—তা হয় না। মাথা নাড়ল দেবাশিস। ফোন কানে তুলে শুনে বলল—এনগেজড।

তৃণা একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলল।

দেবাশিস ঘুরে বলল—আমি যা করব তা পাকাপাকি। কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে না, দ্বিধা থাকবে না।

পৌনে সাতটা বাজেনি তখনও। বাজছে প্রায়। সাততলার ঘরের শার্শি দিয়ে দেখা যায় কলকাতার ওপরকার আকাশটা মস্ত বড়। আকাশে তারা ফুটছে। শহরটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আলোয় তিলোত্তমা।

বসবার ঘরটা অন্ধকার। কিংবা ঠিক অন্ধকার নয়। একটা রঙিন কাচের ঢাকনার ভিতরে শূন্য শক্তির আলো জ্বলছে। জানালার পরদা সরানো। বাইরে চাঁদ। ঘরের ভিতরে জ্যোৎস্নার চৌকো চাঁপা রঙের আলো পড়ে আছে। আর ঝড়ের মতো বাতাস।

দেবাশিস একা ভূতের মতো বসে আছে। তার পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। সামনে দুটো ঠ্যাঙ ছড়ানো, সোফার কাঁধে হেলানো মাথা। ছাদের দিকে মুখ। দুটো হাত অসহায় ভাবে পড়ে আছে। সে তৃণার কথা ভাবছে। জলস্রোত উলটোপালটা, পালে পাগলা বাতাস, তবু বিপরীতগামী দুটি নৌকো একটা অন্যটার সঙ্গে জুড়ে গেল। বাঃ। বেশ।

তৃণা ওঘরে সাজছে। তারা বেড়াতে যাবে। তৃণা যেতে চায়নি। শরীরটা আজ ভালো নেই। দেবাশিস বলেছে—বেড়ালে মনটা একটু হালকা হয়। তোমার তো শেকড়ের প্রবলেম আছে।

তৃণা বেড়াতে ভালোবাসে না। তার প্রিয় অভ্যাস ঘরের কোণে একা থাকা। ছবি আঁকবে, কবিতা লিখবে, বই পড়বে, গান শুনবে। কেউ কথা-টথা বলতে এলে বিরক্ত হয়। রোগে ভুগে ভুগে ছেলেবেলা থেকে ওর ওই অভ্যাস হয়ে গেছে।

ফোনটা বাজছে। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নিল।

—হ্যালো।

মহিলাকণ্ঠে কে বলল—দেবাশিস দাশগুপ্ত আছেন?

—বলছি।

—ওঃ। দাদা...

ফুলি, ফুলির গলা টেলিফোনে কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। ভীষণ ভয় খেয়ে গেল। শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠল বিদ্যুৎ স্পর্শে। রবির কোনও কিছু হয়নি তো!

—ফুলি! কী হয়েছে?

—তুমি ফিরেছো! বাঁচা গেল। রবি সেই থেকে বাবা-বাবা করছে। দুবার ফোন করেছিল।

—কী হয়েছে?

—কিছু না। কী হবে? অত ভেবো না তো। রবি আছে আমার কাছে আর আমি অনেক ছেলেপুলের মা।

দেবাশিস বিরক্ত হয়ে বলে—কী ব্যাপার বলবি তো!

—রবি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বলছে বাবা কেন দেরি করছে ফিরতে।

—মন খারাপ নাকি!

—না না। দস্যিপনা করছে সব সময়ে। বেশ আছে।

—ওকে ফোনটা দে।

একটু পরেই রবির গলা শোনা গেল—বাবা।

—বলো। ভারি স্নিগ্ধ হয়ে গেল দেবাশিসের গলা।

—আমরা বেড়াচ্ছি।

—কোথায়?

—ট্যাক্সি করে বেরিয়েছি। এখন আছি শ্যামবাজারে!

—সঙ্গে কে আছে?

—মণিমা, পিসেমশাই, নিনকু...

—এনজয় ম্যান।

—বাবা, আমার বই, জামা প্যান্ট খেলনা, সব কবে পাঠাবে?

—কাল প্রীতম দিয়ে আসবে।

—এখান থেকেই স্কুলে যাবো তো?

—যেও।

—আর দিদি আমার কাছেই থাকবে তো বাবা? দিদি গল্প না বললে আমার খাওয়া হয় না। মণিমা বলেছে চাঁপা থাকুক।

—থাকুক।

—তুমি রাগ করোনি তো বাবা?

—রাগ? না রাগ করব কেন?

—আমি যে মণিমার কাছে চলে এলাম!

—তা বলে রাগ করব কেন?

—তুমি যে আমাকে ছাড়া থাকতে পারো না।

দেবাশিস একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—পারি বাবা। পারতে তো হবেই।

—নিনকু বলছিল—তোর বাবা তোকে ছাড়া একা ভয় পাবে দেখিস। আমাদের বাড়িতে কি ভূত আছে বাবা?

—ভূত? কে তোমাকে ভূতের কথা শেখাচ্ছে। ভূতটুত আবার কি?

—বাপি বলছিল।

—কী বলছিল?

—রবি বোধ হয় একটু লজ্জা পায়। একটু থেমে বলে—বাবা মানুষ মরে গেলে তো ভূত হয়। তাই—

—তাই কি?

—বাপি বলেছে। আমি না।

—কি বলেছে?

—বলেছে, মা মরে গিয়ে নাকি ভূত হয়ে আছে ও বাড়িতে।

—ওসব বাজে কথা রবি। ওসব বিশ্বাস করতে নেই।

—বুড়োদাও বলেছে—ও বাড়িতে আর যাসনে রবি। গেলে তোর মা ঠিক তোর ঘাড় মটকে দেবে। ভূতেরা নাকি যাদের ভালোবাসে তাদের মেরে নিজের কাছে নিয়ে যায়।

—ছিঃ রবি। এসব কথা শিখলে তোমাকে আমি ওখান থেকে নিয়ে আসবো।

—দিদিও আমাকে কত ভূতের গল্প বলে।

—আমি চাঁপাকে বারণ করে দেবো। ওসব গল্প শুনো না!

—আচ্ছা। কিন্তু বাবা—

—বলো। দেবাশিসের গলাটা গম্ভীর।

—আমি যখন আফটারনুনে ফোন করেছিলাম তখন—

—তখন কি?

—আমার মনে হয়েছিল আমাদের বাড়িতে মা ফোন ধরেছে।

—কি যা তা বলছ?

—না না, ওটা রং নাম্বার ছিল। কিন্তু যে লেডি ফোনটা ধরেছিলেন তার গলা শুনে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মার ভূত ঠিক ফোন ধরেছে।

—এ রকম ভাবতে নেই। আর ভেবো না!

—বাবা কাল আমি ইস্কুলে যাবো না।

—কেন?

—আমি তো স্কুল-ড্রেস আনিনি, বই খাতাও নয়।

দেবাশিস একটু ভেবে বলল—ঠিক আছে। পরশু থেকে যেও। স্কুলে চিঠি লিখে দেবো বাস এবার ওখানে যাবে।

—-কাল তাহলে ছুটি বাবা?

—ছুটি।

—কাল তাহলে কোথায় বেড়াতে যাবো বলো তো!

—কোথায়?

—রবি ফোনে হাসল। কী স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি। বলল—মণিমা বলেছে কাল আমরা ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাব।

দেবাশিস উদবিগ্ন হয়ে বলে—এখানে! এখানে কাল এসে কী করবে? আমি তো থাকব না।

—মণিমা বলছে কাল নিজে আমাকে নিয়ে যাবে, আমার সব জিনিস গুছিয়ে আনবে আর আমাদের ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে দিয়ে আসবে!

—না না, তার দরকার নেই।

—যাবো না?

—দরকার কি রবি? আমিই পাঠিয়ে দেব।

—দাঁড়াও তাহলে মণিমাকে বলি।

ফোনের মাউথপিসে হাতচাপা দিয়ে রবি ফুলির সঙ্গে পরামর্শ করছে দৃশ্যটা স্পষ্টই দেখতে পায় দেবাশিস। খুবই উদবিগ্ন বোধ করে। আর সেটুকু সময়ের মধ্যেই সে ভেবে দেখল তার মহিলা ভাগ্য ভালো নয়, প্রথমবার বিয়ে করেছিল চন্দনাকে। পেটে বাচ্চা সমেত। দ্বিতীয়বার যাকে আনছে তারও বড় বড় ছেলেমেয়ে স্বামী, সংসার সব থেকে ছিঁড়ে আনতে হবে। কোনবারই তার সহজ সরল বিয়ে হল না। যেন চুপি চুপি পাপ কাজ সারছে।

রবি বলল—হ্যালো?

—বলো।

—আমরা কাল যাবো না।

—আচ্ছা।

—রবিবারে যাবো।

দেবাশিস হেসে বলে—রবিবারে আমিই যাবো।

—তাহলে?

—তাহলে কি রবি?

—আমি আমাদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাবো কবে?

—আসবে। বেড়াতে আসবে কেন, এ তো তোমার নিজেরই ফ্ল্যাট। যখন খুশি আসতে পারবে। তবে এ সপ্তাহে নয়।

—কাল তাহলে আমরা ট্যাক্সিতে করে দক্ষিণেশ্বরে যাবো।

—যেও।

—ছাড়ছি বাবা। গুডনাইট।

—নাইট।

ফোন রেখে দিল দেবাশিস। ভ্রূ কোঁচকালো। মুখটায় চিন্তার রেখা।

অন্ধকার ঘরে, পাশের ঘর থেকে আলো এসে লম্বা হয়ে পড়েছে। সেই আলো পিছনে নিয়ে ছায়ামূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে তৃণা।

দেবাশিস অস্ফুট একটা যন্ত্রণার শব্দ করল। যন্ত্রণাটা কোথায় তা বুঝতে পারছিল না। বলল—রেডি তৃণা?

—হুঁ। কিন্তু আমার শরীরটা ভালো নেই!

—কী হয়েছে?

—কি করে বলব! আজ বড্ড টায়ার্ড।

—গাড়িতে তো বসেই থাকবে। খোলা হাওয়ায় দেখো, ভালো লাগবে।

—তোমরা ফ্ল্যাটে খোলা বাতাসের অভাব নেই।

—না, না। চলো প্লিজ। এই ফ্ল্যাটটায় আমার একদম ভালো লাগে না।

—কেন, বেশ সুন্দর তো?

—কি জানি কেন। বেশিক্ষণ ভালো লাগে না।

তৃণা একটু হাসির শব্দ করে বলে, আমারও কি খারাপ লাগবে দেব?

—না। তোমার লাগবে না। আমার তো কতকগুলো রিফ্লেক্স আছে। সবই তো তুমি জানো। দেয়ার আর বিটার মেমোরিজ, লোনালিনেস...সব মিলিয়ে একটা সাফোকেসনের মতো হয় মাঝেমাঝে। রবিটারও হত।

—রবি ফোনে তোমাকে ভূতের কথা কী বলছিল দেব?

—ছেলেমানুষ তো। কে যেন ভয় দেখিয়েছে ওর মা নাকি ভূত হয়ে আছে এখানে।

তৃণা একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল—যখন দুপুরের পরে ফোন করেছিল তখন রবি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কে? মা?

—তুমি কী বললে?

—কি বলব! মিথ্যে করে বললাম—রং নাম্বার।

—ঠিকই করেছো!

—ও কি ভেবেছিল ওর মায়ের ভূত কথা বলছে?

শব্দ করে হাসল দেবাশিস। বলল—হ্যাঁ। আচ্ছা পাগল আমার ছেলেটা।

—শোনো।

—কি?

—আর একটু পরে বেরোও। আমি একটু বসি। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম করে উঠল।

দেবাশিস এগিয়ে তৃণার হাত ধরে এনে সোফায় বসায় যত্ন করে। নিজে তার পাশে বসে। হাতখানা ধরে থেকে বলে—তোমার নাড়ি বেশ দুর্বল।

তৃণা ঘাড় এলিয়ে রেখে বলল—আজকের দিনটা কেমন যেন ভালো নয়। বিশ্রী দিন।

উদবেগে দেবাশিস ঝুঁকে বলে—কেন তৃণা?

দেবাশিসের কাছে আসা মুখখানা হাত তুলে আটকায় তৃণা। বলে—এক একটা দিন আসে সকাল থেকেই কেবল সব কাজ ভুল হতে থাকে। যেন ভূতে পায় মানুষটাকে।

—কী রকম?

—দেখ না, কোনও দিনই তো আজকাল রেবার বা মনুর ঘরে যাই না! আজ যেন ভূতে পেল। গেলাম। রেবা হঠাৎ এসে পড়ল, চোরের মতো ধরা পড়ে গেলাম; কি রকম বিশ্রী ব্যবহার যে করল ও!

—তুমি রেবাকে বড্ড ভালোবাসো তৃণা।

—ভীষণ ভালোবাসি। সেইজন্যেই তো আমার বুক ভেঙে দেয়।

—সাতটা কিন্তু বেজে গেছে তৃণা।

—দাঁড়াও না। আজ কি একটা সাধারণ দিন! সকাল থেকেই সব অনিয়ম চলছে। অদ্ভুত দিনটি আজ। ঘড়িটড়ি দেখো না।

—দেখব না। বলো।

—তারপর মনু। ওকে বলেছিলাম, ঘরে পৌঁছে দে, শরীরটা ভালো না। তো ছেলে আমাকে জাপটে কোলে তুলে নিল। এমনিতে কথাও বলে না। তবে কেন আজ...? তারপর শচীনবাবু। সেও আজ অন্যরকম। রুমাল কুড়িয়ে নিল...অনেক কথা বলল...

—শোনো তৃণা শচীনকে ফোনটা কিন্তু করা হয়নি।

—পরে কোরো।

—এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা তোমার খোঁজ করছে। ওদের কেন অযথা ভাবতে দিচ্ছ?

—ভাবুক। একটু ভাবুক। কোনওদিন তো ভাবে না।

—না তৃণা। তুমি ভুল করছ! যা করছ তা আরও বলিষ্ঠ ভাবে করো। চুরি তো করোনি।

তৃণা দেবাশিসের হাতটা ধরে বলল—আঃ! তোমার কেবল ভয়। শোনো না।

দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলল—বলো।

—ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে আজ ভূতে পেল।

—সে কি রকম?

—ভুল রাস্তায় চলে গেলাম। ঠিক যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো। একটা ছেলে মোটরসাইকেল চালিয়ে গেল, সেই শব্দে চেতনা হয়। তারপরও ফের ভুল। একটা ট্যাক্সিওলা নিয়ে গেল দেশপ্রিয় পার্কে। তাকে ডিরেকশন দিতে মনে ছিল না, রাস্তাটাও খেয়াল করিনি। তাই মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা খুব অদ্ভুত।

—কী বলতে চাও তৃণা?

তৃণা অন্ধকারেই মুখ ফেরাল তার দিকে। বলল—এক একটা দিন আসে, ভুল দিয়ে শুরু হয়। ভুলে শেষ হয়। ভুতুড়ে দিন।

—না তৃণা, ভুল দিয়ে শেষ হচ্ছে না। তুমি বড্ড সেকেলে।

—না দেব। শোনো, আমি শুধু একটাই ঠিক কাজ করেছি আজ।

—কি?

—শচীনকে বলে আসিনি।

—বলে আসা উচিত ছিল। এটাই ভুল করেছো।

তৃণা মাথা নেড়ে বলে—না। বলে আসলেই ভুল করতাম।

দেবাশিস অধৈর্যের গলায় বলে—আমি এক্ষুনি ফের শচীনকে ফোন করছি।

বলেই বাধা না মেনে উঠে গেল দেবাশিস। ফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ে অল্প আলোয় ঠাহর করে করে আস্তে আস্তে ডায়াল ঘোরাতে থাকে।

ফোনটা কানে তুলে অপেক্ষা করছে। তৃণা উঠে এল কাছে। ফোনটা নিয়ে নিল হাত থেকে। রেখে দিতে যাচ্ছিল, শুনল ওপাশ থেকে একটা মেয়ের স্বর বলে উঠল—হ্যালো।

রেবা বোধ হয়! তৃণা তাই ফোনটা কানে লাগায়।

ওপাশে চঞ্চল ও ধৈর্যহীন গলায় রেবা বলছে—কে? হ্যালো কে?

উত্তর দিতে সাহস হল না তৃণার। কেবল খানিকক্ষণ শুনল!

রেবা চেঁচিয়ে তার বাবাকে ডাকছে—বাপি, দেখ, ফোনটা বাজল, কেউ সাড়া দিচ্ছে না এখন।

পরমুহূর্তেই শচীনের গলা—হ্যালো।

তৃণা মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে রাখল।

শচীন রেবাকে ডেকে বলল—ঘোস্ট কল। আজকাল টেলিফোনে যত গোলমাল।

বলেই আবার, শেষবারের মতো বলল—হ্যালো! কে?

কেউ না। আমি কেউ না। একথা মনে মনে বলে তৃণা।

দেবাশিস কানের কাছে মুখ নামিয়ে নরম গলায় বলে—তৃণা বলতে পারলে না?

শচীন ফোন রেখে দিল।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল—না। আজকের দিনটা থাক। দিনটা ভালো নয় দেব।

—খুব ভালো দিন তৃণা।

—না দেব, আজ কোনও ডিসিশন নেওয়া ঠিক হবে না।

—তাহলে কি করবে তৃণা?

—তাহলে...

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে ভাবে।

দেবাশিস অপেক্ষা করে উগ্র আগ্রহে।

গাড়ি থামল। গাড়ি চলে গেল।

নিজের বাড়ির সামনে একা দাঁড়িয়ে তৃণা। বুকে একটা খাঁ খাঁ আকাশ। সেই আকাশে নানা ভয়ের শকুন উড়ছে।

রাত আটটা বেজে গেছে। তবু তেমন রাত হয়নি। এখনও স্বচ্ছন্দে বাড়িতে ঢোকা যায়। কেউ ফিরেও তাকাবে না সে জন্য। দেবাশিসের গাড়িটা গড়িয়াহাটা রোডের মুখে গিয়ে বাঁ ধারে মোড় নিল।

তৃণা বাড়ির গেট দিয়ে ধীর পায়ে ঢোকে। মস্ত আলো জ্বলছে বাইরে। ছোট বাগানটার গাছপালার ওপর আলো পড়ছে। হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ উঠছে। ফুলের গন্ধ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছে বাতাস।

আজকের দিনটা দেবাশিসের কাছে ভিক্ষে নিল তৃণা। আজ দিনটা ভালো নয়। এই ভুতুড়ে দিনে এতবড় সাহসের কাজ করতে তার ইচ্ছে করল না। আজকের দিনটি কেটে গেলে এরপর যে কোনওদিন সে চলে যাবে। কেন থাকবে এখানে? কেন থাকবে!

আস্তে ধীরে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। বাঁ ধারের ঘরটায় টেবিল-টেনিস খেলছে রেবা আর তার এক মাদ্রাজি মেয়ে-বন্ধু সরস্বতী। ছোটাছুটি করছে। হাসছে। কেউ তাকে দেখল না।

শচীনের কাকাতুয়াটা চেঁচিয়ে বলল—চোর এসেছে। চোর এসেছে। শচীন! শচীন!

তৃণা ধীরে তার ঘরে এসে দাঁড়ায়। আলো জ্বালে না। চুপ করে বিছানায় বসে থাকে কিছুক্ষণ, এবং বসে থাকতে থাকতেই টের পায়, বুকে আকাশ, আকাশে শকুন।

মনটা ভালো থাকলে এই নিয়ে একটা কবিতা লিখত সে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তৃণা। অলক্ষ্যে এবং নিজের অজান্তে চাকর এসে ডাকল—মা, খাবেন না? সবাই বসে আছে।

তৃণা উঠল। চাকরের মুখের মা ডাকটা কানে বাজতে থাকে।

বাথরুম সেরে এসে খাওয়ার টেবিলে চলে গেল সে। রাতের খাওয়ার সময়টা সে প্রায়ই থাকে। নিয়ম। না থাকলেও ক্ষতি নেই, তবু নিয়ম।

খাওয়ার টেবিলে আজ সবাই হাসিখুশি।

শচীন ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলছে। কথামৃতের গল্প। সবাই শুনছে। এসব গল্পের মধ্যে অবশ্য তৃণাকে ওরা রাখে না। টেবিলের একধারে তৃণা চুপ করে বসে থাকে। টেবিলে সাজানো খাবার। যে যার প্লেটে তুলে নিয়ে খায়!

শচীন গল্পের শেষে বলল—জাপানের চালানটা এলে দেখবি। বামন গাছের এমন একটা বাগান করব।

—আমাদের স্কুলে ইকেবানা শেখায়। রেবা বলে।

মনু বলল—সে আবার কি?

—ফুলদানি সাজানো। খুব মজার। জাপানিরা স্বর্গ, মানুষ আর পৃথিবী এই প্যাটার্নে সাজায়! অদ্ভুত।

মনু বলে—জাপানিরা খুব প্রগ্রেসিভ। না বাবা?

—প্রগ্রেসিভ! শচীন বলে—তাছাড়া ওদের মতো মাথা কারও নেই। দোষের মধ্যে বড্ড সেন্টিমেন্টাল, একটুতেই সুইসাইড করে।

—হারিকিরি। রেবা বলে।

—হারিকিরি নয়। মনু বলে হারাকিরি।

এইরকম সব কথা।

রান্নার লোকটা নিঃশব্দে ঘরের একধারে দাঁড়িয়েছিল। রোজই থাকে। চমৎকার রাঁধে সে। কোনও ভুল হয় না।

আজ হঠাৎ চাইনিজ চপ সুয়ের এক চামচ মুখে তুলেই রেবা চেঁচিয়ে বলে—চিত্ত আজ এটাতে নুন দাওনি!

চিত্ত শশব্যস্তে বলে—দিয়েছিলাম তো!

—দাওনি! রেবা জোর গলায় বলে।

মনু একটু মুখে দিয়ে—দিয়েছে। তবে কম হয়েছে।

শচীন বললে—টেস্ট কিন্তু দারুণ।

রেবা বিরক্ত হয়ে তার বাবার দিকে নুনের কৌটো এগিয়ে দেয়। কী ভেবে নিজেই নুন ছড়িয়ে দেয়। মনুর প্লেটেও দেয়।

তারপরই হঠাৎ তৃণার দিকে ফিরে বলে—মা তোমাকে...ওঃ তুমি তো এখনও খাওয়া শুরুই করোনি!

তৃণা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে রেবা তাকে মা বলে ডাকছে। গত একবছর একবারও ডাকেনি। তার কানমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে রক্তের জোয়ারে। বুক ভেসে যায় হৃদয় ক্ষরিত হয়। বহুকাল বাদে স্তনের ভিতরে যেন ঠেলে আসে দুধ। অস্থির তৃণা চেয়ারের হাতল চেপে ধরে। আনন্দ! আনন্দ! এত আনন্দ সে বুঝি জীবনে একবারও আর ভোগ করেনি।

কেউ তার অবস্থা লক্ষ করছে না। ভাগ্যিস শচীন ওদের বিদেশের একটা অভিজ্ঞতার গল্প করছে। ওরা কি জানে তৃণার ভিতরে একটা ট্যাপ কে যেন খুলে দিয়েছে! অবিরল নির্ঝরিণী বয়ে চলেছে তার শরীর দিয়ে। সেই স্রোত তার চারধারে সব কিছুকেই অবগাহন করাচ্ছে। শব্দটা কান পেতে শোনে তৃণা, স্রোতের শব্দ।

পরদিন সকালে কবিতার খাতা নিয়ে বসল।

আজও দেবাশিস আসবে। বিকেলবেলায়। বাসস্টপে।

সারা বাড়িতে আজ চন্দনার ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে!

দেবাশিস একটা সিগারেট খেল অনেকক্ষণ। আবার উঠল। জানালাটা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল রাস্তার ওপর। বহু নীচে ফুটপাথ! মাঝখানে নিরালম্ব শূন্যতা! চন্দনা কি করে অত সাহস পেল?

দেবাশিস তো পারে না। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। ঘর সাজাবে বলে, ফুলশয্যা বলে ফুল এনেছিল সে। এখন এই নিশুত রাতে সেই ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছে। কী গভীর সুগন্ধ! সুগন্ধটা টেনে রাখে তাকে।

দেবাশিস প্রেতের মতো একা এসে বসে সোফায়। মাথার চুল মুঠো করে ধরে! রবি নেই। রবি এখন মণিমার বুক ঘেঁষে অঘোরে ঘুমোচ্ছে!

একবার রবির ঘরে এল দেবাশিস। রোজ রাতেই আসে। ছোট ছোট শ্বাস ফেলে রবি ঘুমোয়। চেয়ে দেখে। পাশ ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আজ রবির ছোট্ট বিছানাটা ফাঁকা পড়ে আছে।

আজকের দিনটা ভালো নয়। তৃণা বলেছিল। সত্যি। আজকের দিনটা কেমন যেন! হাতের মুঠো থেকে পয়সা হারিয়ে গেলে শিশু যেমন অবাক হয় তেমনি লাগছিল দেবাশিসের।

রবি নেই! তৃণা নেই।

ভালোই। এ একরকমের ভালোই।

প্রেতের মতো ভয়ঙ্কর শুকনো একটা হাসি হাসল দেবাশিস।

বুকের এখনও যেন রবির খেলনা পিস্তলের মিথ্যে গুলি বিঁধে আছে। বড় যন্ত্রণা।

অস্ফুট শব্দ করল দেবাশিস; যন্ত্রণাটার অর্থ বুঝতে পারল না।

কালই ইনডেক-এর একটা মস্ত কন্ট্রাক্ট শুরু হচ্ছে আসানসোলে। সকালের গাড়িতেই চলে যেতে হবে।

দেবাশিস শুল। ঘুম আসছে ভারি ক্লান্তির মতো। ঘুমচোখে মনে পড়ল, ভুল করে কাল বিকেলে বাসস্টপে আসতে বলেছে তৃণাকে। এসে ফিরে যাবে।

ফোন করবে? থাকগে! আজ একটা ভুলের দিন গেল। আজ আর ভুলগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করবে না। থাক। ভুলের দিনটা কেটে যাক।

ভুল সত.

দিগিন বসে আছেন ইজিচেয়ারে। সামনে উঁচু টুলের ওপর পা দুখানা তোলা। দুপায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে শরৎকালীন পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙঘা দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙঘার কোলে একটু মেঘ। দিগিন দুপায়ের ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙঘার দিকে একটু বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বাঁ-হাতের কাছে ছোট টেবিলের ওপর একটা দামি ট্রানজিস্টার রেডিয়ো। রেডিয়োর সামনে চায়ের খালি কাপ, কাপের পাশে মাদ্রাজি চুরুটের বাক্স দেশলাই। কাঞ্চনজঙঘা থেকে রোদের ঠিকরে আসা আলো চোখে কট কট করে লাগে। পায়ের পাতা জড়ো করো কাঞ্চনজঙঘাকে ঢেকে দেন তিনি।

একটু আগে খবর হচ্ছিল রেডিয়োতে। তিনি খবরটায় মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। সংবাদ-পাঠক বলে যাচ্ছিল, গতকাল ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, উভয় পক্ষই একটি করে গোল দেওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। আজ আবার বৈঠক বসবে। ইত্যাদি। দিগিন তখন থেকেই নিজের ওপর এবং কাঞ্চনজঙঘার ওপর একটু বিরক্ত হয়ে আছেন। রেডিয়োটা বন্ধ করে দিলেন। অমনি নীচের তলা থেকে সরোজিনীর গান ভেসে আসে—এ প্রকাণ্ড জগতের মাঝে যত মিষ্টি যেথা আছে, সব দিলাম মা, তোমার ভোগে, রোগ সারা মা, রোগ সারা...সরোজিনী, দিগিনের বোন। এসব গান সরোজিনী নিজেই বানায়, সুর দেয় আর গায়। সরোজিনীর স্বামী আজ বছর দুই বিছানায় শোয়া। তার রাজ্যের অসুখ, মাঝে মাঝে ওঠা-হাঁটা করে, আবার বিছানা নেয় দুদিন পর। সারোজিনী একটু পাগলি আছে। রামপ্রসাদি সুরে সারাদিনই গান গায়। ওর স্বামী হরিপদ মাঝেমধ্যে বিরক্ত হয়ে ধমকায়, চড়-চাপড়াও দেয়। কিন্তু তাতে সরোজিনীর কিছু পরিবর্তন হয় না।

দিগিন উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার রহস্যটা চোখ বুজে মনে মনে ভেদ করার চেষ্টা করেছিলেন। কাল রাতে ভালোই ঘুম হয়েছে তাঁর। মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙেছিল কুকুরের কান্না শুনে। মোদকের নেশায় ঘুম, সহজে ভাঙার নয়, তবু ভেঙেছিল, উঠে বাথরুম সেরে আবার শুতে যাওয়ার আগে কয়েক মিনিট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাঠের খুঁটির ওপর টংগি ঘর। বারান্দা থেকে অনেকদূর দেখা যায়। খুব বেশি গাছপালা থাকায় কুকুরটাকে দেখা গেল না। আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের। মাঝরাতে এইসব চাঁদ-ফাঁদ দেখলে কুকুর-বিড়াল কাঁদবেই। এই সময়টায় ওদের বোধহয় পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। আবার শুলে শেষ রাতে তেমন ভালো ঘুম হবে না মনে করে

দিগিন একটা ঘুমের বড়ি খানিকটা বিয়ার দিয়ে গিলে ফেলেন। বিয়ারের বোতলটা খুলে ফেলেছেন—তাই কী আর করেন, পুরো বোতলটাই সাফ করে শুয়ে পড়েন আবার। ঘুমের বড়িটা বেশ কড়া ধাতের, তার ওপর বিয়ার থাকায় কী একটা গোলমাল হয়ে গেল শরীরের মধ্যে। আজ সকাল পর্যন্ত মাঝেমধ্যে এই গোলমালটা টের পাচ্ছেন, 'কান' শুনতে 'ধান' শুনছেন। ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে তো ফুটবল খেলা হয়নি যে গোল হবে।

কাঠের সিঁড়িতে ঝোড়ো বেগে পায়ের শব্দ তুলে কে উঠে আসছে। শানু। শানু ছাড়া কারও এত তাড়া থাকে না। দিগিন ভারী বিরক্ত বোধ করে চোখ বুজে ঘুমের ভান করলেন। চুরুটটা জ্বলে জ্বলে ছোট হয়ে এসেছে, আঙুলে তাপ লাগছে।

শানু ঘরে ঢুকেই ডাকে—ছোটকাকা।

দিগিন উত্তর দেন না।

শানু কাছে আসে, ইজিচেয়ারের ওপর ঝুঁকে বলে—ও কাকা।

দিগিন চুরুটটা মুখে তুলে চোখ না খুলেই বলেন—হুঁ।

—ঘুমোচ্ছ?

—শরীরটা ভালো নেই।

—কেন?

—সোপস্টোনের সেই ডিপোজিটটা ভুটান গভর্নমেন্ট আমাদের ইজারা দিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু অনেক টাকা চাইছে।

—কত?

—পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। শান্তি আজ আবার যাবে কথাবার্তা বলতে।

দিগিন চোখ খোলেন না। বলেন—খামোখা।

—এত খরচা করলাম, এখন পিছিয়ে যাবো?

—গেলেই ভালো। নইলে আরও টাকা ক্ষতি হবে। মোট কত খরচ হয়েছে?

—হিসেবে তো এখনও শেষ করিনি। খরচ তো এখনও হচ্ছে। তবে হাজার তিরিশেক বেরিয়ে গেছে।

—আরও যাবে।

—লস হবে বলছ?

—হবে।

—কেন?

—ডিপোজিট কতটা আছে পরীক্ষা করিয়েছ?

—করিয়েছি।

—কী বলে সার্ভেয়াররা?

—কিছু বলতে পারছে না, ওপরের দিকের পাথরের কোয়ালিটি ভালো নয়। নীচের দিকে ভালো জিনিস থাকতে পারে। ঠিক কতটা ডিপোজিট আছে বলতে পারল না, বলা নাকি সম্ভব নয়।

—হুঁ। দিগিন বলেন।

—কী করব?

—যা বলবার তা তো বহুকাল আগেই বলে দিয়েছি। এখনও অল্প ক্ষতির ওপর ছেড়ে দাও।

—কিন্তু কলকাতায় যে নমুনা পাঠিয়েছিলাম তাতে অনেক ভালো খদ্দের ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে। দরও ভালোই পাব।

দিগিন চোখ খুললেন। পায়ের পাতা সরে গেছে, কাঞ্চনজঙঘার গা থেকে ঠিকরে আসা রোদ আবার চোখে কটাশ করে লাগে। চোখটা বুজে ফেলে বলেন—যা ভালো বোঝো করো।

শানু অধৈর্য হয়ে কাঠের পাটাতনে জুতো ঠুকে বলে—তুমি একদম এডভাইস দিচ্ছ না। গত দু-বছর চারটে লোককে দৈনিক চুক্তিতে লাগিয়ে রেখেছি। তারা দিনরাত খুঁজে খুঁজে বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত যাও বা ডিপোজিটটা খুঁজে পেল তাও এখন যদি কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমার মনের অবস্থাটা কী হয় একবার ভেবে দেখেছ? কত টাকা জলে যাবে।

—সোপস্টোন তো আর হিরে জহরত নয়। ওর পিছনে দু-বছর অত টাকা ঢালা বোকামি হয়েছে। আগেই তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

শানু রেগে গিয়ে বলে—কিন্তু ভুটান গভর্নমেন্ট অত টাকা চাইবে কেন? ডিপোজিটটার খোঁজও তো ওরা রাখে না, আমরা খুঁজে পেয়েছি। সুতরাং রাইট তো আমাদের। ওদের উচিত নমিনাল একটা টাকা নিয়ে খনিটা ছেড়ে দেওয়া।

দিগিন হাসলেন। বললেন—তা তো দেবেই না, বরং ওরা তোমাদের হটিয়ে নিজেরাই সোপস্টোনটা তুলে ব্যবসা করবে।

—কিন্তু আমরা যে ওটা খুঁজতে বিস্তর টাকা ঢাললাম, সেটা কে দেবে? ওরা দেবে?

—খোঁজার সময়ে তো ওদের পরামর্শ নাওনি। ঘরের টাকা ঢেলে বরং ওদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছ। ওরা দেবে কেন?

—কিন্তু দেওয়া তো উচিত।

—ওদের সেটা বোঝাও গিয়ে।

শানু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমি লাভ চাইছি না। খরচটাও যদি উঠে আসত।

—উঠবে না। বরং আরও টাকা বেরিয়ে যাবে। কোথায় কোন জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে একটা সোপস্টোনের টুকরো খুঁজে পেয়ে কে একজন এসে তোমাকে খবর দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তধন পাওয়ার মতো নেচে উঠলে। দুনিয়ায় যদি এত সহজেই সব পাওয়া যেত!

কাঠের মেঝেয় শানু পায়চারি করতে থাকে। দিগিন চোখ দুটো অল্প একটু খুলে ভাইপোকে দেখেন। বংশটাতেই পাগলের বীজ আছে। জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে সোপস্টোনটা খুঁজে পেয়েছিল শান্তি পাল নামে একজন ভবঘুরে। সে কেমন করে শানুকে বশ করে বুঝিয়েছিল—কাছে-পিঠেই সোপস্টোনের মস্ত কোনও খনি আছে। শানুও নিশ্চিত হয়ে লোকটাকে খোঁজার কাজে লাগায়। লোকটা দিনে বারো টাকা নিত, সঙ্গে আরও তিনজন হা-ঘরেকে জুটিয়ে নিল, তারা পেত দিনে আট টাকা। এ ছাড়া ছিল আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা, তিরিশ হাজারের বেশিই বেরিয়ে গেছে। পায়ের পাতায় আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢাকা দেন দিগিন। চোখ বোজেন এবং উভয় পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার বিষয়টা ভাবতে থাকেন।

শানু আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। ধৈর্যহীন, চঞ্চল, ক্ষুব্ধ।

—ছোটকাকা।

—হুঁ।

—অনেক লস হয়ে গেল।

—বুঝতে তো পারছি।

—বুঝতে পেরে চুপচাপ বসে আছ কী করে।

—কী করব?

—কিছু একটা করা তো দরকার।

—দু'বছর ধরে চারটে লোকের কর্মসংস্থান করেছ—এত ভালোই। তোমার লাভ যদি লবডংকাও হয়, তবু ওই চারটি লোকের অনেক আশীর্বাদ তোমার পক্ষে জমা হয়েছে। সেইটাই স্যাটিসফ্যাকশন।

শানু কোমরে হাত দিয়ে ঋজু দাঁড়িয়ে তার অকৃতদার, বিচক্ষণ এবং দার্শনিক কাকাটিকে ভ্রূ কুঁচকে দেখে বলে—তুমি একদম ফিলজফার হয়ে যাচ্ছ।

—যাচ্ছি না। গেছি। বলে আর একটা সরু মাদ্রাজি চুরুট সযত্নে ধরিয়ে নেন দিগিন। সোয়া আটটা বাজে, এক্ষুনি তাঁর তৃতীয় কাপ চা আসবে। তিরিশ টাকা কিলোর চা, গন্ধে ঘর মাত হয়ে যায়। সম্ভাব্য চায়ের কথা ভাবতে তিনি স্ফূর্তিযুক্ত হয়ে বলেন—যা গেছে। ছেড়ে দাও। ওইটাই শেষপর্যন্ত টিকবে।

—যে টাকাটা লস হল তাতে তোমারও শেয়ার আছে, ভুলে যেও না।

—ভুলিনি বলেই তো বলছি। আরও যা লস হবে তাতেও আমার শেয়ার থাকবে। বিপদে পণ্ডিতরা অর্ধেক ত্যাগ করেন।

শানু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সে যেতে না যেতেই পুন্নি চা নিয়ে আসে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—চা।

—হুঁ।

ঠক করে চা টেবিলে রেখে পুন্নি বলে—কারা যেন আসছে আজকে আবার।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন—কারা?

—কী জানি! পুন্নি ঠোঁট উলটে বলে—শুনছি কারা যেন আসবে।

—কত কে আসে। দিগিন দার্শনিকের মতো বলেন—কার কথা বলছিস?

—তুমি বুঝি জানো না? কে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা আসবে, সবাই বলছে।

—ও। বলে দিগিন সুগন্ধী চায়ের চুমুক দেন। আগুন গরম চা। গরম ছাড়া খেতে পারেন না দিগিন। দোতলায় উঠতে উঠতে ঠান্ডা মেরে যায় বলে দোতলায় পাশের ঘরেই চায়ের সরঞ্জাম রাখেন দিগিন। পুন্নি ঠিক সময়ে আসে, নিঃশব্দে চা করে দিয়ে যায়। ওর হাতে চামচ নাড়ার বা কেটলির হাতলের কোনও শব্দ হয় না। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।

—তা কী করবে? পুন্নি জিগ্যেস করে।

—কী করব? এলে আসবে।

—আমি সামনে যাব না।

—সামনে যাওয়ার জন্য যাবি কেন? চা-টা দিয়ে আসবি। কিছু জিগ্যেস করলে জবাবটা দিবি। তার বেশি কিছু করতে হবে না।

—আমি সামনেই যাব না।

—কেন?

—আমার ভালো লাগে না।

—ও। বলে দিগিন হাত বাড়িয়ে রেডিয়োটা চালিয়ে দেন। লোকগীতি হচ্ছে। লোকগীতি মানেই দমের খেলা। দিগিন রেডিয়ো বন্ধ করে দেন। পায়ের পাতার ওপাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘে ঢাকা পড়েছে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—আমি যা বলেছি শুনেছ তো।

—শুনলাম।

—আমি সামনে যাব না।

—আচ্ছা।

—আচ্ছা বললে হবে না। তখন মা চেঁচাবে, বাবা বকবে, বড়মামা আর মেজমামা তম্বি করবে, তা হবে না। আমি তোমাকে বলে রাখলাম, তোমাকে সামলাতে হবে সব দিক।

—দিগিন 'হু' দেন।

—ঠিক তো? পুন্নি সন্দেহে জিগ্যেস করে।

—হুঁ।

—কী করবে?

—তোর বদলে দকলিকে দেখিয়ে দেব।

—টের পাবে না?

—টের পাবে কেন? এত বড় সংসারে কত মেয়ে, কারটা দেখে যাচ্ছে তার ঠিক কী? দকলিও তো আমাদেরই ভাগনীই। তোর চিন্তা নেই।

পুন্নি মুখ বেঁকায়। বলে—আহা।

দিগিন বলেন—কী হল?

—পুন্নি শ্বাস ফেলে বলে—দকলি ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

—ধরা পড়ার কী? চুরি করছে নাকি। তুই বিকেলের দিকটায় বরং বাড়িতে থাকিস না।

পুন্নি উত্তর না দিয়ে জোরে পা ফেলে হেঁটে যায়।

বহুকাল আগে দিগিন একবার একটা কাণ্ড করেছিলেন। কয়েকজন ডাকসাইটে মাতালকে নেমন্তন্ন করেছিলেন সেবার। তার আগের দিন একটা প্রকাণ্ড তরমুজ কিনে এনে তার একদিকে ফুটো করে সব শাঁস বের করে ফেলেন, তারপর সেটাতে ধেনো, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি, রাম, জিন ইত্যাদি ভরে ফুটোটা বন্ধ করে দেন। একটা ছোট ভাইপোকে ডেকে এনে ঘরের একধারে তাকে বসিয়ে অন্যধারে নিজে বসেন। তরমুজটাকে একবার ভাইপোর দিকে গড়িয়ে দেন, ভাইপো আবার তাঁর দিকে গড়িয়ে দেয়। এইভাবে ঘণ্টাখানেক গড়াগড়ি খেয়ে তরমুজটা কী মারাত্মক অ্যাটম বোম তৈরি করে রেখেছিল পেটের মধ্যে, তার কোনও ধারণা ছিল না দিগিনের। পরের দিন বন্ধুরা এসে পৌছনোর আগেই তিনি জিনিসটা একটু গেলাসে ঢেলে চাখতে গিয়ে সেই যে দুনিয়ার বার হয়ে গেলেন, ফিরে আসতে পরদিন সকাল। বন্ধুরা যথাসময়ে এসেছিল। কিন্তু মাতাল হলেও তারা মৃত্যুশীল এবং সকলেরই কিছু প্রাণের মায়া কম নয়। দিগিনের অবস্থা দেখে ওই তরমুজের ধারেকাছেও তারা ঘেঁষেনি। দিগিনের আজও মনে পড়ে সেই মারাত্মক নেশার পর শরীরের মধ্যে যে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কাল রাতে বিয়ার দিয়ে ঘুমের বড়ি খাওয়াতেও তেমনি কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তবে জীবনটাকে নানা এক্সপেরিমেন্টের

মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আদতে জীবন। আলো যেমন প্রতিহত না হলে আলো বলে মনে হয় না, জীবনটাও কি তাই নয়?

ব্রিটিশ আমলের শেষদিকে দিগিন যখন ভাগ্যান্বেষণে এই শিলিগুড়িতে আসেন তখন শিলিগুড়ি ছিল ছোট গঞ্জ শহর। একমাত্র স্টেশনটাই ছিল রমরমা। দার্জিলিংয়ের যাত্রীরা ব্রডগেজ থেকে নেমে ন্যারোগেজের খেলনা গাড়িতে ওঠার আগে এখানে ব্রেকফাস্ট সারত। যাত্রীদের মধ্যে তখন অধিকাংশ দাপুটে লালমুখো সাহেব। এ ছাড়া শহরটা ছিল ঘুমন্ত জনবিরল। তখনই এখানে কিছু ঠিকাদারির কাজ পেলেন দিগিন, কাঠের কারবারে নামলেন, কমলালেবু আর চায়ের ব্যবসাতেও হাত দিয়েছিলেন। সেই সময়ে কাঠের টংগি ঘরসমেত হাকিমপাড়ার এই জমিটা তাঁর হাতে আসে। একা থাকতেন, রান্নাবান্নার একটা লোক ছিল। দিব্যি জমে গেলেন এইখানে। তখন থেকেই বারান্দায় বা ঘরে বসে টেবিলে ঠ্যাং তুলে মেঘহীন দিনে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা তাঁর অভ্যাস। আর একা-বোকা থেকে থেকেই তাঁর নানা নেশার পত্তন হয়। পচাই দিয়ে শুরু, গাঁজা, গুলি, মোদক কিছুই বাদ রাখেননি। এখনও তাঁর নেশার কিছু ঠিক নেই। যখন যেটা ইচ্ছে হয় খান। বাঁধা-ধরা জীবন ভালো লাগে না।

দেশ-ভাগের পর হুড়মুড় করে বড় দুই ভাই, তাদের বউ, দুই বোন, স্বামী, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বিশাল এক দঙ্গল এসে পড়ল। একাকীত্বটা চলে গেল দেশছাড়া হয়ে। টংগি ঘরটার আশেপাশে আরও দুখানা বাড়ি উঠল। অবশ্য একান্নবর্তিতা তাঁদের ভাঙেনি। বড় পাকশালে সকলের রান্না হয়। বড়দা উকিল, মেজজনের ওষুধের স্টেশনারি, বড় ভগ্নপতি কয়লার ব্যবসা করে, ছোট ভগ্নপতি অসুখে ভোগে বলে শালাদের ঘাড়ে পড়ে আছে। চাকরি তাকে করতেও দেওয়া হয় না।

সকালে সেবক রোডের মোড়ে কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা। কাঞ্চনকুমার লালোয়ানি। মোটরসাইকেলটা থামিয়ে দিগিন ডাকলেন—কাঞ্চন।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগান থামিয়ে পান খেতে নেমেছিল মোড়ের দোকানটায়। পরনে খুব দামি একটি বিলিতি সিন্থেটিক ফেব্রিকের লাল গেঞ্জি, সাদা প্যারালেল ছাঁটের প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, চোখে বড় মাপের রোদ-চশমা! জুলফি চুল সব হালফ্যাশনের। পিছু ফিরে দিগিনকে দেখেই দুখিলি পান তাড়াহুড়ো করে মুখে পুরে এগিয়ে আসে।

—আরে দিগিনদাদা।

—যাচ্ছিস কোথায়?

—কাল রাতে জোর ধস নেমেছে তিনধারিয়ার কাছে। বাবাজি তো খাশাংয়ে আটকা পড়ে আছেন। আজ সুবায় ফিরবার কথা। যাচ্ছি ধসের সাইটে, যদি পায়দল এপারে আসতে পারে তো নিয়ে আসবো।

দিগিন বলল—ধস? কই আমি তো শুনিনি।

—শুনবেন কী করে? আজকাল তো ঘরের বাইরে আসেনই না। দুনিয়ায় কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলেন নাকি?

সাজগোজ যাই করুক কাঞ্চনের বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। হিলকার্ট রোডে একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকান দিয়েছে সম্প্রতি। আর আছে মদের দোকান, মোটর পার্টসের বিশাল প্রতিষ্ঠান। এক সময়ে ওর মোটর পার্টসের কারবারে কিছু টাকা লগ্নী করেছিলেন দিগিন। কিন্তু সংসারের চাপে, দুঃসময়ে টাকাটা তুলে নিতে হয়েছিল। রাখতে পারলে আজ ভালো আয় হত।

দিগিন বলেন—বের হয়ে হবে কী? কাজ কারবার কিছু নেই।

—কাজ নিই কে বলে? অনেক কাজ পড়ে আছে। আসেন না একদিন গরিবের বাড়িতে। ডিসকাস করা যাবে।

দিগিন লক্ষ করেন, কাঞ্চনের জুলপির চুলে কলপ দেওয়া। কয়েকটা সাদা দেখা যেত আগে, এখন নেই। দিগিন বলেন—আসব'খন। শানুটার জন্য বড় চিন্তা হয়। সোপস্টোনের পিছনে বহুত গচ্চা দিয়েছে।

কাঞ্চন হাসে, বলে—শানুর মাথায় পোকা। সোপস্টোনের কারবার কিছু প্রফিটেবল হলে শিলিগুড়ির মার্চেন্ট আর ঠিকাদাররা বসে আছে কেন? আমি তো আগেই জানি, টাকা জলে যাচ্ছে। দেখা হলে আমি তো বলি শানুকে, শানু রেগে যায়।

ঝকঝকে সবুজ ভোকসওয়াগনটার দিকে চেয়ে দিগিন বলেন—বেশ আছিস কাঞ্চন।

—হ্যাঁ দাদা, ভালো আছি। তবে ভালো আর থাকা যাবে না।

—ও কথা সবাই বলে।

—জোর কম্পিটিশন। এখন সকলের হাতে টাকা, বাজার স্যাচুরেটেড।

গিমিক। দিগিন জানেন। গত সাতাশ বছরে শিলিগুড়ির বাতাসে টাকা কম ওড়েনি। তাঁর চোখের সামনেই শিলিগুড়ি উত্তর বাংলার সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে উঠল, কিন্তু তাঁদের পরিবার পুরোনো ঠিকাদারির ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ধরতে পারল না। বড়দা অবশ্য ব্যবসাতে নেই, ওকালতি করে তার একরকম চলে যায়। মেজ জন পুরোনো বাজারে একটা স্টেশনারি দোকান দিয়ে বসে আছে বহুকাল। তেমন কিছু লাভ হয় না। শানু আর দুজন ভাইপোকে নিজের ঠিকাদারিতে নামাতে পেরেছেন দিগিন। ওরা যত লোভী তত চালাক নয়। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় ওরা বিচিত্র সব কারবারে নাক গলাতে যায়। চোট হয়ে অবশ্য ফিরে আসে। দিগিনের অবশ্য এখন আর তাতে কিছু যায় আসে না। আটান্ন বছর বয়স, কিছু থোক টাকা আছে—চলে যাবে। কিন্তু ভাইপোদের জন্য একরকম দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। কাঞ্চনকে তাই একটু ভালো করে দেখে নেন দিগিন। ছোকরা বেশ দাঁড়িয়েছে।

দিগিন বলেন—শানুটাকে ব্যবসাতে নামিয়ে নিবি কাঞ্চন?

কাঞ্চন জর্দা-পানের পিক ফেলে বলে—শানু নামবে না।

দিগিন সেটা জানেন। একটু শ্বাস ফেলে মোটরসাইকেলের স্টার্টারে একটা লাথি মেরে বলেন—তোর সঙ্গে একদিন বসব।

—আচ্ছা।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগনে উঠল। দিগিন হিলকার্ট রোড ধরে ব্যাঙ্কে এলেন।

সোমবার। বড্ড ভিড়। চেকটা জমা দিয়ে এজেন্টের ঘরে ঢুকে গেলেন। এজেন্ট ভটচায বুড়ো হয়ে এসেছেন। মাস দুয়ের মধ্যেই রিটায়ার করে চলে যাবেন। ভটচাযের বুড়োটে ভাবটা অবশ্য বয়সের জন্য নয়। দিগিনেরও ওইরকমই বয়স। ভটচায বুড়িয়ে গেছেন পেটের অসুখে আর হাঁপানিতে। শিলিগুড়ির ওয়েদারকে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়।

—কী খবর দিগিনবাবু?

কাঞ্চনের সাফল্যের ছবিটা চোখের সামনে জ্বলছে, দিগিন তাই বিষণ্ণ গলায় বলেন—এই তো।

ভটচায দিগিনের অন্যমনস্কতা লক্ষ করলেন। কিন্তু বেশি কথার মধ্যে গেলেন না। তিনজন লোক ঘরে বসে আছে, কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে আসছে কাগজপত্র সই করাতে। ব্যস্ত ভটচায বললেন—এবার পুজোয় চলে যাচ্ছি, বুঝলেন?

—হুঁ।

—আপনাদের শিলিগুড়ি ছাড়ছি শেষ পর্যন্ত।

বলে ভটচায ব্যস্ত রইলেন কিছুক্ষণ। মিনিট কুড়ি পর একটু ফাঁক পেলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—একটা খান। চুরুট খেয়ে বুক তো পুড়িয়ে ফেলেছেন।

দিগিন মাথা নাড়লেন নিজের সরু মাদ্রাজি চুরুট ছাড়া অন্য কিছু তেমন ভালো লাগে না। ফসফসে ধোঁয়ায় ভারী বিরক্তি আসে। ভটচায বলেন—নেশাটেশা করেন বটে, কিন্তু চেহারাটা এখনও কিন্তু ঠিক রেখেছেন। এখানকার জল-হাওয়ায় কী করে ফিট থাকেন মশাই।

—ফিট থাকি নেশা করি বলেই।

—সব নেশাখোরই ও কথা বলে।

—মাইরি। মদ শরীরের সব জীবাণু নষ্ট করে দেয়।

—কিন্তু মদটা তো থাকে পেটে।

—হ্যাঁ। লিভারের বারোটা বাজায় আস্তে আস্তে। তবে মদ খেলে মদের এফেক্ট ছাড়া অন্য কোনও রোগ বড় একটা হয় না।

ভটচায একটু আগ্রহ দেখিয়ে বলেন—সত্যি?

দিগিন চুরুটটা আরামে টেনে হেসে বলেন—কোনও মাতালের ছোটখাটো অসুখ দেখেছেন কখনও? জেনুইন মাতালের ওসব হয় না। মদ খুব বড় জীবাণুনাশক।

—দূর।

—মদে ভিজিয়ে রাখলে কোনও জিনিস সহজে নষ্ট হয় না জানেন? তাই ওষুধে অ্যালকোহল থাকে প্রিজারভার হিসেবে।

ভটচায চিন্তিত মুখে বলেন—তা বটে।

—তবেই দেখুন। স্টমাকটাকে মদে ডুবিয়ে রাখলে তার প্রিজারভেশনের ক্ষমতা বাড়ে কিনা।

—আফিং খেলে পেটের রোগ সারে শুনেছি।

—তাও খেতে পারেন। তবে ও হচ্ছে ঝিমুনি নেশা।

—না না, নেশার জন্য নয়। ওষুধ হিসেবে।

দিগিন মৃদু হেসে বলে—অ্যালকোহল আরও ভালো। আজ রাতে আসুন আমার ওখানে, একটা মজার জিনিস খাওয়াব। দেশি জিনিস, সঙ্গে একটা পাতার রস মিশিয়ে দেবো। দেখবেন, কাল সকালে কেমন ফাইন হাগা হয়।

দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না ভটচায। সন্দেহের চোখে চেয়ে থাকেন। বলেন—আমাকে গিনিপিগ বানিয়ে কোনও এক্সপেরিমেন্ট করবেন না তো?

—গিনিপিগ। বলে হা হা করে হাসেন দিগিন। মাথা নেড়ে বলেন—আরে না না।

ঘরে আবার লোকজন ঢুকে পড়ে। ভটচায ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দিগিন আপন মনে হাত দুখানা টিপেটুপে পরীক্ষা করে দেখেন। হাওয়াই শার্টের হাতা গুটিয়ে বাইসেপটা টেপেন একটু। না, আটান্নতেও তার মাংসপেশি বেশ শক্ত আছে। ঝুলে যায়নি। বুড়ো বয়সটা একটা ধারণা মাত্র। অত্যাচার এই বয়সেও তিনি কিছু কম করেন না। তবু শরীরটা টানটান, হাঁটা-চলা-পরিশ্রম কোনও যুবকের চেয়ে কিছু কম পারেন না।

ভটচায এবার একটু ফাঁক পেয়ে বলেন—শেষ পর্যন্ত আমাকে বুড়ো বয়সে নেশাভাঙ ধরাবেন না তো মশাই।

দিগিন ভটচাযের সন্দেহকুটিল মুখখানা একটুক্ষণ দেখে নিয়ে বলেন—জীবনের একটা দিক একেবারে না জানা থাকা কি ভালো? নেশার চোখে দুনিয়াটা কেমন দেখায় তা দেখে রাখা ভালো। নইলে যখন ওপরে যাবেন, যখন যম জিগ্যেস করবে, বাপু হে, দুনিয়াটায় কি কি রকম সব অভিজ্ঞতা হল—তখন তো ব্যাঙ্কিং ছাড়া আর কিছু বলার থাকবে না।

ভটচায মুখখানা স্মিতহাসিতে ভরিয়ে তুলে বলেন—বয়সকালে রোজগারপাতির সময়টায় নেশাভাঙের পয়সা একরকম জোটানো যায়। আমার তো তা নয়। এই তো পারমানেন্টলি বসে যাচ্ছি, রিটায়ারের পর নেশার পয়সা জোগাবে কে?

—ভূতে, নেশারু লোকের ও ঠিক জুটে যায়।

—না মশাই, আমার ওসব দরকার নেই।

—আচ্ছা, না হয় নেশা নাই করলেন, একদিন একটু চাখলেই কি আর নেশা হয়ে যায়? নেশা করারও একটা প্রসেস আছে। চলে আসবেন আজকে, অন্তত একদিনের জন্য আপনার পেটের গোলমাল মেরামত করে দেব। ওইসঙ্গে রাতের খাওয়াটাও সেরে যাবেন, নেমন্তন্ন রইল।

বলে দিগিন ওঠেন।

—আচ্ছা যাব, ভটচায হাসলেন।

ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে দিগিন আবার মোটরসাইকেলে ওঠেন। আজকাল আর তার একাউন্টে টাকা বড় একটা জমা পড়ে না। বরং প্রতিমাসেই চার-পাঁচটা উইথড্রয়াল হয় কমপক্ষে, তাঁর নিজস্ব সংসার নয়, দাদারাও রোজগেরে, তবু কি কারণে যেন সংসারের খরচের সিংহভাগ তাঁকেই দিয়ে আসতে হচ্ছে বরাবর।

মোটরসাইকেলটা নিয়ে ইতস্তত একটু ঘুরে বেড়ান তিনি, এম-ই-এস-এর একটা কনস্ট্রাকশন চলছে বাগডোগরায়, ভাবলেন, সাইটটা দেখে আসবেন। কিন্তু মহানন্দা ব্রিজ পেরিয়েই তাঁর দীর্ঘ রাস্তাটা ভেবে ক্লান্তি লাগল। থাকগে, ঠিকাদারিটা যখন শানুই দেখছে তখন আর তাঁর মাথা ঘামানোর কী আছে। সারাটা জীবন তো এই কর্মই করলেন।

বাইকটা ঘুরিয়ে নিলেন, শিলিগুড়ি যদিও তাঁর হাতের তেলোটার মতোই চেনা, তবু মাঝে তিনি কোথাও যাওয়ার জায়গা খুঁজে পান না। ভালোও লাগে না। তাই খানিকক্ষণ এলোমেলো বাইকটা চালান দিগিন, শিলিগুড়ির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই তাঁর চেনা। বাইক থামিয়ে দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলেন, কয়েকটা চেনা জায়গায় উঁকি দিয়ে ফেরেন, কয়েকটা দোকান থেকে টুকটাক কেনাকাটা করে নিলেন। তবু সময় ফুরোলো না। বেলা এগারোটাই পেরোতে চায় না সহজে। শরৎকালটা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। সেবক রোড ধরে একটু এগোলে মহানন্দার অববাহিকায় উপত্যকার মতো বিশাল নীচু মাঠ আর বালিয়াড়ি দেখা যায়। বাইক থামিয়ে চেয়ে রইলেন সেই দিকে। মুঠোভর একটা মেঘ সকাল থেকে চেষ্টা করে করে এতক্ষণে কাঞ্চনজঙঘাকে ঢেকে ফেলেছে। উজ্জ্বল রোদে তিনধারিয়ার বিন্দু বিন্দু বাড়িঘর নজরে আসে।

বহুকাল শালুগাড়ার বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে যাওয়া হয় না। রেডিও স্টেশন পেরিয়ে খানিকদূর এগিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে ঢালুতে নামিয়ে বাইকটা রাখেন দিগিন। তারপর সরু পথ ধরে বাঁ-ধারে নেমে যান। বড় রাস্তায় এক আধটা মিলিটারি জিপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে মিলিটারির লোক এসেছে। ভিড় অবশ্য সারাদিনই থাকে।

আধমাইলটাক হেঁটে গাছপালায় আচ্ছন্ন শান্ত জায়গায় পৌঁছে যান তিনি! অনেককাল আসা হয়নি। অবাক হয়ে দেখেন, এদের বাড়ি-ঘরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সচ্ছলতার

চিহ্নগুলি দেখলেই বোঝা যায়। কেবলমাত্র লোকের ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে উইদাউট ক্যাপিট্যালে বেশ দাঁড়িয়েছে এরা।

বাইরে খোলা একটা ঘর। আনাড়ি মিস্তির তৈরি দু'চারখানা বেঞ্চি পাতা। মিলিটারি, মেয়েছেলে, বুড়ো, বাচ্চা, জনা পঁচিশ লোক বসে আছে। অল্পবয়সি বাকসিদ্ধাই মেয়েটি হাতে সেই পুরোনো একটা শিবলিঙ্গের মতো পাথরের দিকে চেয়ে কথা বলছে। দিগিনের কানে এরকম একটু সংলাপ ভেসে আসে—

মহিলাকণ্ঠ—সে কেমন দেখতে?

বাকসিদ্ধাই—রোগা, ফরসা, চোখে চশমা।

মহিলাকণ্ঠ—আমার ছেলের সঙ্গে মানায়?

বাকসিদ্ধাই—মানায়।

—জাত?

—স্বঘর।

মহিলাকণ্ঠ স্বনিশ্বাসে বলে, বিয়েটা হবে?

—হবে।

দিগিন ঘরটায় না ঢুকে এগিয়ে যান। উত্তর দিকে বাঁশঝাড়ে আচ্ছন্ন ছায়ায় ঢাকা পথে কতকগুলো বাচ্চাছেলে খেলছে। উত্তরপ্রান্তে খেত। উদাস মাঠ, তার ওপাশে কালো মেঘের মতো হিমালয় ঘনিয়ে উঠেছে উত্তরের আকাশে। গত সাতাশ বছর ধরে দেখছেন দিগিন। দাঁড়িয়ে একটা মাদ্রাজি চুরুট শেষ করেন তিনি।

আবার যখন এসে খোলা ঘরখানায় উঁকি দিলেন তখন ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। অবাঙালি কাঠখোট্টা এক মিলিটারি সওয়াল জবাব করছে। তার ঘর থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অসুখ। সিদ্ধাই মাথা নেড়ে জানায়, সেরে যাবে। চিনিপড়া নিয়ে যায় যেন।

পিছনের একটা বেঞ্চে একা বসে দিগিন চুরুট টানেন। সিদ্ধাই তাঁকে চেনে। একবার মুখ তুলে দেখে হাসল।

ভিড় পাতলা হলে সিদ্ধাই মুখ তুলে বলে—ভালো তো?

দিগিন মাথা নেড়ে জানালেন—না।

—কী হয়েছে?

—আমার ভাইপো—বলতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করে থেমে যান দিগিন। এসব প্রশ্নের কোনও মানে নেই। সোপস্টোন চুলোয় যাক, পুন্নির বিয়ে নিয়েও প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি হয় না তাঁর।

চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে দিগিন চোখ বুজে বলেন—মা, আমার মরণ কবে?

সিদ্ধাই হাতের পাথরটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে—সে দেরি আছে।

—কত দেরি?

—অনেক দেরি, তবে একটা ডাঙর মেয়েছেলে ক্ষতি করবে।

—ডাঙর মেয়েছেলে? সে কে?

—ফরসা, লম্বা মেয়েছেলে একজন, পাহাড়ি মেয়েছেলে।

দিগিন হাসেন, ময়নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা কে না জানে। ময়না এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। সবাই তার চেহারাটা জানে। দিগিন একটু শ্বাস ফেলে বলেন—কীরকম ক্ষতি?

—পয়সাকড়ি আর নাম-যশের ক্ষতি।

—বিষ-টিষ খাওয়াবে না তো?

সিদ্ধাই ইতস্তত করে বলেন—সাবধানে থাকবেন; তবে আপনার এখনও অনেক আয়ু আছে।

দিগিনের ক্লান্তি লাগে। একটা পাঁচটাকার নোট এগিয়ে দেন। সিদ্ধাইয়ের বুড়ো বাপ বসে আছে পিছনে, টাকাটা সে নেয়। বলে—আর কিছু জানবেন না?

—না। আটান্ন বছর বয়সে আর কী জানবার আছে, আমার তো কোনও ভবিষ্যৎ নেই!

বুড়ে মাথা নাড়ে।

সিদ্ধাই মেয়েটি তার কমনীয় মুখশ্রী তুলে বলে—শরীরে একরকম জ্বালা রোগ হবে। জল পড়ে দেব, নিয়ে যাবেন।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়েন। জ্বালা রোগ হওয়ার বাধা কি? যত অ্যালকোহল রক্তে জমা হয়েছে তাতে অনেক কিছু হতে পারে।

দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পুন্নি এসে যখন ডেকে তুলল তখন সাড়ে তিনটে। চারটের আগে তিনি ওঠেন না বড় একটা, ঘড়িটা দেখে বিরক্ত হলেন। বললেন—কী রে?

—ওঠো, তোমার চা হয়ে গেছে।

—চা, তার এত তাড়া কী?

—বাঃ, আজ কে সব আসবে বিকেলে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে চলবে কী করে।

দিগিন হাসলেন। তিরিশ টাকা কিলোর চায়ের গন্ধে ঘর ম-ম করে! বলেন—যার আসবার আসবে। তোর অত মাথাব্যথার কী? আমি তো দকলিকে বলে রেখেছি, সে রাজিও হয়েছে।

পুন্নি বলে—ঠিক আছে।

কিন্তু পুন্নির মুখে রাগ।

দিগিন কিছু বলেন না, পুন্নিই গজগজ করে—রোজ সং সেজে অচেনা মানুষের সামনে গিয়ে বসা কার ভালো লাগে।

—তোকে বসতে কেউ বলেছে?

—না বসলে তোমাদের প্রেস্টিজ থাকবে নাকি?

—ও। তা সেই কথা ভেবেই বুঝি হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিস?

—হুড়োহুড়ি আবার কী! পুন্নি ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলে—চা-টা খেয়ে নাও, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পুন্নি চলে গেলে উত্তরমুখো ইজিচেয়ারটায় আবার বসেন দিগিন। টুলের ওপর পা তুলে দেন। হিমালয় সারাদিন লুকোচুরি খেলে এই শরৎকালে। বরফে ঢাকা দূরের পাহাড়গুলি ঢেকে গেছে কুয়াশার মতো ভাপে। দেখা যায় শুধু নীল পাহাড়ের সারি। দিগিন দেখেন, দেখতে কখনও ক্লান্তি লাগে না। অবসরপ্রাপ্তের মতো বসে থেকে সময় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সময় ঠিক হিমালয়ের মতো পাথর হয়ে জমে আছে। এভাবে কর্মহীন এবং অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার কথা তাঁর নয়। বয়স মাত্র আটান্ন, শরীরটাও যথেষ্ট মজবুত; তবু মনে মনে একরকম কর্মত্যাগ এবং বৈরাগ্য এসে গেছে।

শিলিগুড়িতে যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন তখন এটা ছিল গঞ্জমতো জায়গা। বাগরাকোটে কয়লাখনির সন্ধান, সিকিমের কমলালেবুর চালান, কাঠের ব্যবসা, চা-বাগানের মালিকানা কোনও চেষ্টাই তাঁর কম ছিল না। অবশেষে বংশগত পাগলামির খেয়ালবশে একবার মধ্যপ্রদেশও চলে যান হিরের সন্ধান পেয়ে। সে ভীষণ কষ্ট গেছে। তাঁবুতে থাকতেন, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, হাতখানেক দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেল, তবু হিরের নেশায় পাগল ছিলেন কিছুকাল। হিরে পাননি তা নয়। ছোট ছোট কমদামি কয়েকটা পেয়েছিলেন, তাতে খরচটা কোনওক্রমেও উঠেছিল হয়তো কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়ে গেল শরীরের। জন্ডিস ধরল, মাসছয়েক সেই রোগে শয্যাশায়ী রইলেন প্রায়। লিভারটা সেই থেকে খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তাররা তাঁর নেশাভাঙ একদম বারণ করে দিলেন। কিছুকাল সব ছেড়েছুড়ে দিয়েওছিলেন। কিন্তু তারপর একদিন মনে হল—একা মানুষ, শরীর বাঁচিয়ে রেখে কী হবে! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গভীর একাকীত্ব একটা কালো কম্বলের মতো যেন চেপে ধরে। লিভারটা জখম আছে আজও—তবু দিগিন কিছু মানেন না।

ঘুম স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন হরেন বোস। সে লোকটা বড় ভালোবাসতেন দিগিনকে। প্রায়ই বলতেন—বিয়ে না করে একরকম ভালোই আছ হে দিগিন, কিন্তু চল্লিশের পর ভুগবে। সাহেবরা চল্লিশ পর্যন্ত একা থাকে, ফুর্তি লোটে, ফুর্তির অভাবও ওদেশে নেই, কিন্তু চল্লিশের পর ঠিক টুক করে বিয়েটি করে ফেলে। কারণ মানুষ ওই বয়স থেকেই লোনলি হতে শুরু করে।

অক্টোবর বা নভেম্বরের শীতে ঘুম একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গা। দিগিন কার্যব্যাপদেশে পাহাড় লাইনে গিয়ে ঘুমে একটা দুটো দিন কাটাতেন। চারধারে জন-মনিষ্যি নেই, পাতলা বরফের আস্তরণ পড়ত কোনও কোনও বছর শীতকালে। ওয়েটিংরুমে আগুন জ্বেলে বোতল নিয়ে বসতেন দুজনে। কথা হত।

হরেন বোস একদিন তাঁর শালির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুশকিল হল হরেন বোসের বউ ছিল নেপালি। যখন প্রথম ব্যাচেলার হরেন বোস ঘুমে আসেন তখন বয়স-টয়স কম। নেপালি ঝি ঘরের কাজকর্ম করত। দীর্ঘ শীতকালে, একাকীত্বে যখন মানুষকে কর্মনাশা ভূতে পায়, তেমনি একটা দুর্বল সময়ে তিনি সেই মেয়েটিকে উপভোগ করেন। মেয়েটা অরাজি ছিল না। কিন্তু তারপর তার বাড়ির লোকজন এসে হরেনকে ধরে, বিয়ে করতে হবে। করতে হল। গোটা দুই ছেলেমেয়েও হল তাদের। সেই বউয়ের একটা বোন ছিল। মনাস্টারিতে যাওয়ার রাস্তাটা হিলকার্ট রোডের যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছে সেই মোড়ে একটা খুপরিতে পারিবারিক সবজির দোকানে বসত মেয়েটি। পনেরো-ষোলোর বেশি বয়স নয়-দীনদরিদ্র পোশাক পরে দু'গালে রক্তিমাভা আর সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে বসে থাকত। সামনে সবুজ স্কোয়াস, বাঁধাকপি, বিন, শুঁটি, ফুলকপি সাজানো। তার মাঝখানে তাকে বেশ দেখাত। সেই দোকানের সামনে ছোকরা নেপালি কয়েকজন গ্যাঁদা ফুল পায়ের আঘাতে শূন্যে তুলে তুলে চুঙ্গি খেলত খুব। মেয়েটি সব বুঝে হাসত। হরেন বোস প্রস্তাব দিয়ে বলেন—আত্মীয় যখন হয়ে গেছে তখন ফেলতে পারি না। ওদের সম্প্রদায়ে উপযুক্ত ছেলে বড় কম, বিয়ে যদি করেও তো রোজগার করাবে। বিয়ে না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। পয়সার লালচ তো বড় কম নয়। দোকানে বসে থাকে বলে লোকে নীচু নজরে দেখে, কুপ্রস্তাব দেয়, পয়সা দেখায়। তোমারও উদ্যোগ করে বিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। মেয়েটা কচি আছে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারবে।

দিগিন রাজি হলেন।

সেই মেয়েটিই ময়না।

দিগিন সেবার পুজোর পর এক ভোররাতে টাইগার হিলে গেলেন সূর্যোদয় দেখতে। বহুবার দেখেছেন, তবু গেলেন। সঙ্গে ময়না ছিল। টাইগার হিলে ওঠবার একটা খাড়া এবং শর্টকাট রাস্তা আছে। সেটা দিগিন চিনতেন না, ময়না চিনত। সেই রাস্তা ধরে উঠতে দিগিনের হাঁপ ধরে যায়। মাঝে মাঝে বসেন, ময়নার সঙ্গে কথা বলেন, মাতৃভাষার মতো নেপালি ভাষা বলতে পারেন দিগিন, ময়না জানে ভালো বাংলা কথা। কথাবার্তার কোনও অসুবিধে হয়নি। আকাশে তখন ময়ূরকণ্ঠী রং ধরেছে। পালটে যাচ্ছে রং। শেষরাতে সূর্য ওঠার অনেক আগেই আকাশের ওই বর্ণালী দেখা যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য বড় একটা খেয়াল না করে দিগিন বলেন—থাকতে পারবে তো আমার সঙ্গে?

দিগিনের বয়স তখন বত্রিশ, ময়নার মেরেকেটে ষোলো, রাজি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘুমের শীতের দেশে নিরন্তর দারিদ্র্য আর স্থবিরতা ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছে তখন মেয়েটির। সে বলল—যদি আমাকে কলকাতা শহর দেখাবে বলো, তাহলে থাকব।

—থাকা মানে কী জানো তো?

মেয়েটি চেয়ে থাকল।

দিগিন অবশ্য ব্যাখ্যা করলেন না। তিনি জানতেন, বিয়ে করার কোনও পদ্ধতি না মানলে ক্ষতি নেই। যে-কোনও রকম একটু অনুষ্ঠান করলেই চলবে। এবং সেটাই নিরাপদ। তাঁর সন্দেহ ছিল, এই নিতান্ত অশিক্ষিত অভিজ্ঞতাহীন মেয়েটির সঙ্গে তাঁদের বংশগত যেটুকু আভিজাত্য আছে তা শেষ পর্যন্ত মিলবে কিনা। দিগিনের একটা সুবিধে, তিনিও লেখাপড়া বিশেষ করেননি। ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। পড়াশুনো সেইখানেই শেষ হয়। অতঃপর ব্যাপক জীবনযাপন থেকেই তিনি তাঁর স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভেবে দেখেছিলেন, মেয়েটির কাছ থেকে একমাত্র শরীর আর কিছু সেবা তিনি পেতে পারেন। তার বেশি কিছু দেওয়ার সাধ্য মেয়েটির নেই।

দিগিন টাইগার হিলে ওঠার মাঝপথে মেয়েটিকে সেই গভীর শীতার্ত পরিবেশে একটি চুমু খান। বলেন—তোমাকে কলকাতা দেখাব।

সেই যে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখতে গেলেন, সেখান থেকে আর ঘুমে ফিরে এলেন না দিগিন। এক ছোকরার জিপে ফিরলেন দার্জিলিং। সেখান থেকে আবার জিপ ভাড়া করে ময়নাকে নিয়ে টানা নেমে এলেন শিলিগুড়িতে। বত্রিশ বছর বয়সে বিয়ের ঝামেলায় যেতে তাঁর ভরসা হল না। ময়নার বয়স তখন নিতান্ত কম। তাকে যা-তা বুঝিয়েছিলেন। ময়না তখন ঘুম ছাড়ার জন্য ব্যগ্র। তা ছাড়া সে জানত যে এই লোকটাই তার হবু স্বামী, তাই আপত্তি করেনি।

টংগি ঘরটায় ময়নাকে নিয়ে থাকার বিপদ ছিল। আস্তানাটা সবাই চেনে, হরেন বোস মেয়েটির আত্মীয়স্বজন সেখানে যে-কোনও সময়ে হাজির হতে পারে। পুলিশ লেলিয়ে দিতে পারে। তবু দিগিন ময়নাকে নিয়ে উঠলেন সেখানেই।

তিনদিন পর হরেন বোস হাজির হলেন এসে।

—কী খবর ভায়া?

—ভালোই।

—ময়না?

—আছে।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন—জানতাম। বলে একটু শ্বাস ছাড়লেন।

ময়নাকে অবশ্য তখন চেনার উপায় নেই। নেপালি পোশাক ছেড়ে সে তখন চমৎকার সব ছাপা শাড়ি পরে। সাবান দিয়ে স্নানের পর গা ঝকঝকে পরিষ্কার। সিঁথেয় সিঁদুর, একবেণিতে বাঁধা চুল, খুশিতে ফেটে পড়ছে। হরেন বোস দেখে খুশি হলেন। বললেন—ভয় নেই, ওর পরিবার থেকে ঝামেলা হবে না, তবে কাজটা পাকা করলেই পারতে।

দিগিন বত্রিশ বছরে মাথা তখন কম পাকাননি। বলেন—তা হয় না। আপনার মতো বাঁধা পড়ে যেতে আমি রাজি নই।

—কিন্তু বদনাম? সিকিউরিটি?

—ওসব ছাড়ুন! ওর পরিবারকে আমি হাজার টাকা দিচ্ছি কন্যাপক্ষ হিসেবে।

—ময়না এরকম সম্পর্ক মানবে?

—মানবে আবার কি। মেনে তো নিয়েছে।

—না, মানেনি। বয়স কম বলে বুঝতে পারছে না যে তুমি ওকে রেখেছ মাত্র, বিয়ে করোনি। বয়স হলে বুঝবে।

—ও একরকম বিয়েই, কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ের সিঁদুর ছুঁইয়ে দিয়েছি।

বিচক্ষণ হরেন বোস গম্ভীরভাবে বললেন—ঠিক আছে। বিয়ে তো আসলে পরস্পরকে স্বামী বা স্ত্রী বলে স্বীকার করা। ও হলেই হল। টাকাটা দিয়ে এসো।

—দিয়ে দিচ্ছি!

বলে দিগিন নগদ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন।

হরেন বোস মুখটা গম্ভীর করে রাখলেও মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন দিগিনের বিচক্ষণতায়, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে দিগিনের সিকিমি 'রাম'-এর বোতল খালি করলেন। বললেন—তাহলে টাইগার হিল থেকেই তোমার অধঃপতন শুরু হল?

দিগিন হাসলেন, উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস বললেন—হঠাৎ এরকম ধারা করতে গেলে কেন?

দিগিন একটু ভেবে বলেন—আসলে কী জানেন দাদা, যখন টাইগার হিলে উঠছিলাম তখনও ঠিক করিনি যে, মেয়েটাকে নিয়ে পালাব। ভেবেছিলাম আমার বাউন্ডুলে জীবন, দায়দায়িত্ব নেই, মেয়েটাকে পাকাপাকি বিয়েই করে ফেলি। কিন্তু টাইগার হিলেই গোলমালটা হয়ে গেল, একদম শেষ চড়াইটা বেয়ে যখন পাহাড়ের ছাদে চড়েছি, তখন দেখি সামনে অন্ধকারের এক মহাসমুদ্র। নীচে গভীর উপত্যকায় যেন কত হাজার বছরের অন্ধকার জমেছে। বাঁদিকে উত্তরে ব্রোঞ্জের মতো কাঞ্চনজঙঘার আবছা চেহারা, পাশে পাশে সব ব্রোঞ্জের পাহাড়। এ তো কতবার দেখেছি, নতুন কিছু নয়। সূর্য উঠবার আগেই প্রথম সূর্যের আলো এভারেস্টের ডগা ছুঁতেই যেন আগুন জ্বলে গেল বরফে, আশেপাশে আবছায়ায় বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। ওই রকম খোলা জায়গায়, ওই অন্ধকারের গভীর বিশাল অন্ধকারের সমুদ্র আর পাহাড়-টাহাড় দেখে মনে হল, জগতে বাঁধা পড়ার মতো বোকামি আর নেই। যার একটা শেকড় গজায় সে বাকি দুনিয়া থেকে উৎখাত হয়ে যায়। টাইগার হিলে সানইজ দেখতে দেখতেই ঠিক করলাম যে হাওয়া বাতাসের মতো একটা সম্পর্ক থাকাই ভালো।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন—বুঝেছি। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ নেশা করে বললেন—আমি তোমার চেয়ে অনেক বোকা।

দিগিন উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস ময়নার ভেজে আনা ফুলুরিতে কামড় বসিয়ে বললেন—তুমি সুখী হবে।

ময়না ঘরে আসতে জিগ্যেস করলেন—কেমন লাগছে রে? রামরও?

ময়না লজ্জার হাসি হাসে। মাথা নামায়।

হরেন বোস সস্নেহে একটু চেয়ে থেকে বলেন—মেয়েটা ভালো, দেখো দিগিন।

—চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে।

কিন্তু তবু সব ঠিক থাকেনি।

বছর দুই বাদে সমস্যা দেখা দিতে থাকে। বুদ্ধিমান দিগিন তার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। তবে দু-চারখানা চিঠিপত্র বছরে দিতে হত, দায়ে দফায় টাকা-পয়সা পাঠিয়েছেন, কিন্তু ময়নার খবর তিনি কখনও দেননি। তখন প্রাচীনপন্থী মা বাপ বেঁচে, পুরোনো প্রথাও মরে যায়নি পরিবারে। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারবেন।

কিন্তু দেশভাগের পর পরই চিঠি এল, বাড়ির সবাই চলে আসছে, তাদের থাকার বন্দোবস্ত যেন করা হয়। দিগিন মুশকিলে পড়লেন। ময়না খুব বোকা ছিল না, দু-বছরে তার বয়স আর অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। দিগিনের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও ছিল অদ্ভুত। দিগিন ময়নাকে বিয়ে করা বউ বলে কখনও মনে করেননি। তাই মনে মনে নিজেকে ব্যাচেলার ভেবে যেমন খুশি নিজস্ব জীবন- যাপন করতেন। পাহাড়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন ব্যবসার ধান্দায়। ঘরে একটা মেয়েছেলে আছে—সে ঝি বা রক্ষিতা, এর বেশি কিছু ভাবতেন না, ময়না সেটা বুঝতে পারত। উপায় নেই বলে মেনে নিত দিগিনকে। ঝগড়াঝাটি কিছু করত না তা নয়, তবে করেও লাভ ছিল না।

বাড়ির লোক আসছে, বহুকাল বাদে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। মা-বাপ তখনও বেঁচে আছেন। দিগিন তাই গুরুং বস্তিতে ময়নার জন্য ভালো ঘর ভাড়া করলেন। খুব বেশি বোঝাতে হল না ময়নাকে। দু-এক কথাতে সে রাজি হয়ে গেল। ময়নাকে গুরুংদের বস্তিতে পাঠিয়ে ঘরদোর সাফ করলেন দিগিন। তাঁর কিছু মনে হল না, কোনও অভাব টের পেলেন না।

অবশ্য সম্পর্কটা ছিঁড়েও ফেললেন না। বাড়ির লোকজনকে এড়িয়ে রোজই যেতেন ময়নার কাছে। মাসোহারা তো দিতেনই, সব খরচ বহন করতেন ময়নার। ময়নাও অখুশি ছিল না । বাড়ির লোক ব্যাপারটা টের পেলেও কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। বয়সের ছেলের রোজগার যদি ভালো হয় তো তার দু-একটা স্বভাবদোষ মানতে কারও আপত্তি হয় না। ছেলে হল সোনার আংটি, বাঁকা হলেও দাম কমে না।

সেই ময়না এখনও দিগিনেরই আছে, তবে পুরোটা নয়। দিগিনের আটান্ন হলে ময়নার না হোক বিয়াল্লিশ বছর বয়স তো হলই। গুরুং বস্তি ছেড়ে বর্ধমান রোডে ছোট একটু বাড়িতে উঠে গেছে ময়না। বাড়ি করে দিয়েছেন নিজেই। ময়না যৌবনকালটা বড় চঞ্চলতা করেছে। গুরুং বস্তিতে উঠে যাওয়ার পর থেকেই সে দিগিনকে পছন্দ করতে পারত না। বার দুই পালিয়েও গেছে একটা অপদার্থ জাত-ভাইয়ের সঙ্গে। পোষায়নি বলে ফিরে

এসেছে। লটঘট করেছিল নির্মল সিংয়ের ছোটছেলে অবতার সিংয়ের সঙ্গে। দিগিন শাসন করেছেন, বিয়ে করা বউ নয় বলে ক্ষমাও করে দিয়েছেন।

ছেলেমেয়ে হয়নি, বাঁজা ময়না এখনও নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে ছোট বাড়িটায়। ঘুম থেকে তার এক ভাইঝি আসে, কিছুদিন থেকে যায়। হরেন বোস রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলেন দার্জিলিঙে। কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তার বউ বা ছেলেপুলেরাও আসে মাঝে মাঝে, ময়নাও যায়। কিন্তু তবু ময়না একা। বড় একা।

পুন্নিকে দেখতে এলেন একজন। রিকশা থেকে বুড়ো মানুষটি যখন নামছিলেন তখনই তাঁর ফরসা টুকটুকে নাদুসনুদুস চেহারাটা দেখে সকলের ভালো লেগে গেল। পুন্নির বাপ আবেগে দিগিনকে বলে ফেললেন—দেখেন, যেন ঠিক পাকনা শসা।

তা পাকা শসার মতোই চেহারা বটে। মুখে অবশ্য হাসি নেই। গম্ভীর হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ এসে বসলেন। চারধারে একটু চেয়ে দেখলেন। কথা কম হলেও বেরসিক নন। জলখাবারের প্লেটটা আসতে দেখে বললেন—সেই লৌকিকতা।

—না না, কিছু নয়। বলে পুন্নির বাপ—একটু মিষ্টি মুখ আর কি।

—রক্তে চিনি একশো কুড়ি। আপনার মেয়ের মুখশ্রী যদি মিষ্টি হয় তাহলেই হবে, আলাদা মিষ্টির দরকার নেই।

ভারী ম্লান হয়ে গেল পুন্নির বাপ। পুন্নির মুখশ্রী তেমন মিষ্টি হয়, সবাই জানে। তবু পুন্নিকে আনা হল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ অবশ্য পুন্নির দিকে একপলকের বেশি চেয়ে দেখলেন না। চিনি ছাড়া চা তৈরি করে দিতে হয়েছিল নতুন করে, সেইটে চুমুক দিতে দিতে বললেন—যেতে পারো মা। তোমার গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলি বরং।

পুন্নি চলে যেতেই দিগিনের উকিল দাদা জিগ্যেস করেন—কেমন দেখলেন? চলবে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন—রং তো কালোই, মুখশ্রী ওই চলনসই।

পুন্নির বাবা বলতে গেল—কিন্তু কাজকর্ম—

ভদ্রলোক হাত তুলে বলেন—ও তো সবাই জানে। ঘরের কাজকর্ম তো আর জজিয়তি ব্যারিস্টারি নয়।

দিগিনের দিকে চাইলেন ভদ্রলোক। বললেন—কী দেবেন আপনারা?

—যা চান। দিগিন গম্ভীর হয়ে বলেন।

—চাওয়ার কী। আপনাদের বাজেটটা না জেনে বলি কী করে?

—যা সবাই দেয়। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ফার্নিচার, খাট, গয়না, ছেলের আংটি, ঘড়ি।

—হুঁ। বলে গম্ভীরভাবে আবার চা খেলেন, বললেন—আলমারি তো গোদরেজের?

—তাই হবে।

—গয়না।

—চোদ্দো-পনেরো ভরি।

—ঘড়িটা?

—রোলেক্স।

ভদ্রলোক শ্বাস ফেললেন। তারপর বলেন—আমি কি পাব?

—মানে?

—ছেলে আর ছেলের বউ তো এসব পাবে। আমার পাওনা কী?

—কী চান?

—নগদ।

—বলুন কত?

—আমি বলব না। শুনব!

তখন সবাই পীড়াপীড়ি করতে থাকে ভদ্রলোককে কিছু একটা বলার জন্য। ভদ্রলোক কেবলই হাতজোড় করে বলেন—আমি কিছু বলব না, আরও চার জায়গায় মেয়ে দেখেছি। সকলেরই টাকার অঙ্ক পেয়েছি। সব লিখে জামসেদপুরে জানাব আমার স্ত্রীকে। তিনি সব বিচার করে যেখানে মত দেন সেখানেই হবে। আমি দূত মাত্র, আপনারা সবাই বরং পাশের ঘর থেকে টাকার ব্যাপারটা পরামর্শ করে ঠিক করে আসুন।

বোঝা গেল, লোকটা স্বাভাবিকভাবেই একজন ডিকটেটার। সব জায়গায় কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। দিগিনের দাদারা আর দুই ভগ্নিপতি পাশের ঘরে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। বড়দা ডেকে গেলেন—দিগিন।

দিগিন গেলেন না। মাদ্রাজি চুরুট ধরিয়ে ঠায় বসে রইলেন লোকটার দিকে চেয়ে।

একটু পরে ওঁরা ফিরে এলে বড়দা বললেন—আমরা দুই হাজার নগদ দেব।

—দুই! ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করেন।

দিগিন লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন মাদ্রাজি চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে।

তারপর হঠাৎ বললেন—দশ।

—অ্যাঁ। ভদ্রলোক তাকালেন।

—দশ হাজার দেব। নগদ।

ভদ্রলোক হাঁ করে চেয়ে থাকেন। বাক্যহারা দুই দাদা আর দুই ভগ্নীপতি সন্দেহের চোখে দেখেন। কিছু বুঝতে পারেন না।

ভদ্রলোক একটা শ্বাস ফেলে বলেন—আচ্ছা।

—আচ্ছা নয়, দশ হাজার দেব। বিয়ের পাকা কথা দয়া করে আজই বলে যান। নইলে আমরা অন্য পাত্র দেখি।

ভদ্রলোক ইতস্তত করতে থাকেন। দিগিন গিনিপিগ দেখার মতো করে কৌতূহলী চোখে ভদ্রলোককে দেখেন। মানুষ গিনিপিগের মধ্যে কোন কথায় বা কোন অবস্থায়

কীরকম প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ করা দিগিনের এক প্রিয় অভ্যাস।

ভদ্রলোকের নির্লিপ্ত ভাবটা ঝরে যায়। ফরসা মুখখানায় একটু লাল আভা ফুটে ওঠে।

দিগিন মৃদুস্বরে বলেন—আমার বড় আদরের ভাগনি। মনে মনে বহুদিনের ইচ্ছে ওর একটা ভালো বিয়ে দিই। কাজেই পুন্নির জন্য আমি আলাদা খরচ করব। আপনি চিন্তা করবেন না।

—কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ—কথাটা শেষ করতে পারেন না ভদ্রলোক।

দিগিন বলেন—সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা দেরি করতে পারব না। আমার দাদাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরির ছেলে পছন্দ নইলে একটি ব্রিলিয়ান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছেলে আমার হাতেই ছিল। আপনি যদি আজ স্পষ্ট মতামত না দেন তাহলে আমরা তো দেরি করতে পারি না।

ভদ্রলোকের কঠিন ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের ভাবটা খসে গেছে, লাল মুখখানা রুমালে ঘষে আর একটু লাল করে তুললেন। আধখাওয়া জলের গ্লাসটায় একবার চুমুক দিলেন।

তারপর বললেন—আলমারিটা গোদরেজের তো?

—নিশ্চয়ই।

—সোনা যদি আর একটু বাড়াতেন।

দিগিন চুরুট মুখে নিয়ে বলেন—পনেরো ভরি তো দেওয়াই হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি থেকে। আমি নিজে একটা পাঁচ ভরির নেকলেস দেব। আর প্রত্যেকটা এক ভরি ওজনের ছ গাছা চুড়ি।

—আমার ছেলে কী পাবে? এত মেয়ের কথা হল, ভালোই—

—একটা স্কুটার দেব, একটা ফ্রিজ।

ভদ্রলোক ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। দিগিনের দিকে সন্দেহের চোখে তাকান আবার অবিশ্বাসও করতে পারেন না। দিগিন শিলিগুলির নামজাদা লোকদের একজন। তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও কথার দাম আছে। কিন্তু এত লোভানী কেন, মেয়ের কোনও গুপ্ত খুঁত আছে কিনা এই নিয়েই বোধহয় দ্বিধায় পড়েন ভদ্রলোক।

সেটা দিগিন আন্দাজ করে বলেন—আমাদের মেয়ে যা পাচ্ছেন তেমন স্বভাবের মেয়ে পাওয়া যায় না। আপনি পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে খোঁজ নিতে পারেন।

—না, না, তার কী দরকার?

—খোঁজ নেওয়া ভালো, সন্দেহের দরকার কী?

বড়দা ভ্রূ কুঁচকে দিগিনের চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখখানা দেখছিলেন। তিনি স্বভাবতই বিরক্ত। তাঁর বড় দুই মেয়ের বিয়েতে দিগিন এত খরচ করেননি। মেজদাও খুশি নন। পুন্নির বাপ একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি দিগিনের একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে

বলে—তাহলে পাকা কথা আজই হয়ে যাক। বলে সমর্থনের জন্য চারদিকে তাকাল। তাঁর দুই সম্বন্ধী শ্বাস ফেলেন।

বড়দা বললেন—সব তো শুনলেন। সন্তুষ্ট তো?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন—মন্দ কী?

—তাহলে? দিগেন জিগ্যেস করেন।

ভদ্রলোক একটু করুণ সুরে বলেন—ছেলে একবার নিজের চোখে দেখবে না?

কেউ কিছু বলার আগেই দিগিন দৃঢ়স্বরে বলেন—না। আমাদের পরিবারে পাত্রকে মেয়ে দেখানোর নিয়ম নেই।

কথাটা ডাহা মিথ্যে। সবাই দিগিনের দিকে চেয়ে থাকেন। এই ঘরে যেসব ঘটনা ঘটছে তার কর্তৃত্ব নিশ্চিতভাবে এখন দিগিনের হাতে। তাই কেউ কিছু বলতে সাহস পান না।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন—মেয়েটিকে আর একবার ডাকুন।

পুন্নি আবার আসে। তার চোখে-মুখে একটা ভয়ার্ত ভাব। বহু টাকায় ছোটমামা তার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিনছে, এ কথা ভিতরবাড়িতে ছড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সে এতটা কল্পনাও করেনি। তাই তার মুখে ভয়, লজ্জা, সংকোচ।

ভদ্রলোক পুন্নির দিকে চেয়ে বলেন—মা, এই বুড়ো ছেলেটার বায়না-টায়না একটু রাখতে পারবে তো? আমার বড় বউমা হবে তুমি, তা রান্না টান্না কি বুড়োর একটু সেবা-টেবা—এসব পারবে তো?

পুন্নি মৃদু হেসে মাথানত করে নিয়ম মাফিক। স্নেহভরে চেয়ে থাকেন দিগিন। এর আগে তিনবার পুন্নিকে নাকচ করে গেছে তিনটি ছেলেপক্ষ। তাই ও আর পাত্রপক্ষের সামনে বেরোতে চায় না, সে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন দিগিন। বিয়েটা যে হবে, বোঝাই যাচ্ছে।

ভদ্রলোক দিগিনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলেন—মেয়ে তো অপছন্দের নয়। আমার পছন্দই হয়েছে।

—কথা দিচ্ছেন তাহলে?

ভদ্রলোক একরকম হাঁফধরা হাসি হেসে বললেন—ওই দেওয়াই হল।

—আমরা খুব বেশি দেরি করতে পারব না।

—দেরি করে আমাদেরই বা লাভ কী?

—তাহলে অগ্রহায়ণে দিন ঠিক করি?

—করুন। আমি এ সপ্তাহেই আবার আসব। আমার স্ত্রীকে একটু খবর দেওয়া নিতান্ত দরকার। আমার একার কথায় কিছু হবে না।

—স্ত্রীকে সব টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন জানিয়ে দিন। ছেলেরও মত নিন। কিন্তু সেগুলো সেকেন্ডারি ব্যাপার। আপনার মত থাকলে কেউই আপত্তি করবে না।

মানি-সেন্ট্রিক লোকটি মাথা নাড়েন। সম্বন্ধটা হাতছাড়া যে তিনি নিজের স্বার্থেই করবেন না তা বোঝাই যাচ্ছিল। বললেন—তাহলে কথাটা ফাইনাল বলেই ধরে নিন।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—ধরে নিচ্ছি। আমরা আর সেই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটির গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলব না।

ভদ্রলোক হাঁফ ছাড়লেন।

মনে মনে হাঁফ ছাড়লেন দিগিনও। পুন্নির একসময়ে বোধহয় ধারণা ছিল, যেহেতু তারা মামাবাড়িতে আশ্রিত সেইজন্যই তার ভালো বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেখতেও সে তেমন কিছু নয়, মামারাও খরচ করবেন না। হয়তো আদপে বিয়েই হবে না তার। সেই কারণেই বোধহয় পুন্নি শান্ত এবং ভালো মেয়ে হয়েও একদা একটি ছেলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা পাড়ার বখাটেদের একজন। লেখাপড়া করেনি, জাতে নীচু, গুণের মধ্যে ভালো গোলকিপার ছিল। কবে কখন প্রেম হয়েছিল কে জানে। কিন্তু বাড়িতে কথাটা জানাজানি যখন হয় তখন ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। সাররাত্রি ধরে একটা ফাংশন হয়েছিল তিলক ময়দানে, সেখানে যাওয়ার নাম করে একবার গিয়েছিল পুন্নি। সকালে ফিরেও এল। কিন্তু ওর বন্ধুদের মধ্যে কে যেন বাড়িতে বলে দিয়েছিল যে পুন্নি ফাংশানে একটুক্ষণ থেকেই শান্তনুর সঙ্গে কেটে পড়েছিল। শিলিগুড়ি কলকাতার মতো বড় জায়গা নয়, এখানে সবাই সকলের খোঁজখবর রাখে। পুন্নির ব্যাপারটাও অনেকেই জেনে গেল। কিন্তু পুন্নির মা-বাবা মেয়েকে শাসন করেননি। বড়দার কানে যেতেই উনি মত দিলেন—ওসব জাত-ফাত, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে কী হবে। বিয়ে দিয়ে দাও। মেজদারও তাই মত ছিল। এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগও চলছিল। ব্যাপারটা দিগিন জানতে পারেন সবার শেষে।

দিগিন জাত-টাত বড় একটা মানতেন না, তাঁর নিজের শিক্ষাও বেশিদূর নয়! বিয়েটাতে মতও তিনি হয়তো দিতেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, পুন্নির ভালোবাসাটা খাঁটি নয় এবং বাড়ির লোকে বোঝা নামাতে চাইছে। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপে সংসারটার নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। পুন্নিকে ডেকে নিভৃতে প্রশ্ন করতেই সে কেঁদে ফেলল। প্রথমে বলল যে সে সত্যিই ছেলেটাকে ভালোবাসে। ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তারপর দিগিন তার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সব খবরই বের করে নেন। পুন্নি ছেলেটার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, পিকনিকে গেছে, চিঠি লিখেছে পরস্পরকে। পুন্নি যে ফাঁদে পড়ে গেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। রাত কাটানোর ব্যাপারটা ছেলেটাই রটায়। এবং এমনই তার সাহস যে পুন্নির লেখা চিঠি সে এসে বড়দা আর পুন্নির বাবাকে দেখিয়েও যায়। ওসব দেখে ভয় পেয়ে সবাই বিয়ের উদ্যোগ করে।

দিগিন বুঝতে পারেন, ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে বা পুন্নিকে চোখ রাঙিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু অত সহজে তিনি বাড়ির লোকের মতে মত দিতে পারলেন না। ছেলেটার দুঃসাহস এবং দুষ্টুবুদ্ধি তাঁর ভিতরটাকে শক্ত করে তুলল। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না, মতামত দিলেন না। শুধু একদিন অমলকে ডেকে গোপনে বললেন—আমার ভাগ্নীর সঙ্গে তোমার ভাব শুনছি, ঠিক নাকি?

ছেলেটা মাথা নীচু করে বলে—আজ্ঞা হ্যাঁ।

—বিয়ে তো করবে, কিন্তু কাজটাজ কিছু করছ?

—চেষ্টা করছি।

—চেষ্টায় কী হবে? ধরা-করার কেউ আছে?

—না।

—ঠিক আছে, সে ভার আমি নিচ্ছি। তবে একটা কথা, চাকরি পাকা হওয়ার আগে বিয়ে টিয়ে হবে না কিন্তু।

ছেলেটা চাকরির কথায় যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিল দিগিনের প্রতি বলল—আজ্ঞে না।

এম-ই-এস-এর প্রায় সব হর্তা-কর্তাকেই চেনেন দিগিন। তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। ক্লাস ফোর স্টাফ হিসেবে তার চাকরি হয় এবং চাকরির হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই আসামের নেফায় তাকে বদলি করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই দিগিন খুব নিপুণভাবে করেছিলেন। কেউ কিছু টের পায়নি। সবাই জেনেছিল হবু জামাইকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই দিগিনের এই চেষ্টা। পুন্নিও বোধহয় খুশি হয়েছিল। অমল নেফায় যাওয়ার আগেই একদিন পুন্নিকে দেকে দিগিন বললেন—ওর কাছ থেকে তোর চিঠিগুলি চেয়ে নিবি।

—কেন ছোটমামা?

—মিলিটারির সঙ্গে থাকবে, আজ এ জায়গায়, কাল সে জায়গায়, ওগুলো হারিয়ে যদি ফেলে, আর অন্য কারও হাতে যদি পড়ে তো লজ্জার ব্যাপার।

পুন্নি লজ্জা পায় বলে—আচ্ছা।

—সব কটা চেয়ে নিবি, নইলে কিন্তু ছাড়বি না।

—যদি দিতে না চায়?

—দেবে, বলিস না দিলে ছোটমামা রাগ করবে। চিঠিপত্র ছোটমামা পছন্দ করে না। কে কোথায় দেখে ফেলবে।

চিঠি ফেরত দিয়েছিল অমল। নেফা থেকে কয়েকখানা চিঠি লিখে থাকবে। বছরে এক আধবার আসে, দেখাসাক্ষাৎও বোধহয় করে পুন্নির সঙ্গে। কিন্তু পুন্নির প্রেমের দুধ কেটে ছানা হয়ে গেছে, এ সত্য পুন্নির মুখ দেখলেই আজকাল বোঝা যায়। সঙ্গ বন্ধ করে দিলে যে কত ফলস প্রেম নাকচ হয়ে যায়।

অমল কদিন আগেই এসে ঘুরে গেছে। শিগগির আর আসবে না। এই ফাঁকে পুন্নিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে পাচার করতে পারলে ভয়ের কিছু থাকবে না। প্রেমের তেজটাও কমজোরি হয়ে এসেছে। বাড়ির লোকও ব্যাপারটা ভুলে গেছে। কেবল দিগিন ভোলেনি। দুটো গিনিপিগের ওপর তার প্রেম-বিষয়ক পরীক্ষাটা তিনি চালিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার ফলাফলটা দেখবেন বলেই ভোলেননি।

কয়েকদিন পরে এসে পাটিপত্র করে যাবেন বলে কথা দিয়ে ভদ্রলোক উঠলেন।

এর আগে পুন্নির দুটো সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল উড়ো চিঠির জন্য। কে বা কারা উড়ে চিঠি দিয়েছিল কে জানে।

তবে দিগিনের পরিবারের শত্রু কেউ কেউ থাকাই সম্ভব। পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যেও কি নেই মাৎসর্যে আক্রান্ত লোক! এবার নিশ্চিতভাবে পাত্রটিকে কিনে নিলেন দিগিন, উড়োচিঠিতে বোধহয় আর কাজ হবে না।

ভদ্রলোক চলে যেতে দিগিন নিজের টংগি ঘরকখানায় এসে বসেন। মনটা ভালো নেই। উত্তরে মেঘপুঞ্জ জমে উঠছে। বেলা পড়ে এল। একটু শীত বাতাস বয় আজকাল, দিগিন ইজিচেয়ারে বসে টুলের ওপর পা তুলে দেন। পুন্নির বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর একটু একা লাগবে। পুন্নিটা খুব সেবা করত।

পুন্নির কথা ভাবতে ভাবতেই পুন্নি উঠে এল নীচে থেকে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—তুমি কী কাণ্ডটা করলে শুনি।

—কী?

—অত টাকা খরচ করে বিয়ে দেবে?

—না হয় দিলাম।

—ছি ছি, লোকে কী বলবে?

—কী বলবে?

—ভালো বলবে না। আমারও বিশ্রী লাগবে। বড়মামা, মেজমামা, মেসোমশাই কেউ খুশি হয়নি।

—কেন, কেউ কিছু বলেছে নাকি?

—বলেছে।

—কী?

—কী আবার। পাত্র আন্দাজে দেওয়া-থোওয়া বড্ড বেশি হয়ে গেছে।

—সে আমি বুঝব। তোর পাকামির দরকার কী? যা চা করে আন।

পুন্নি রাগ করে বলে—আমি এ বিয়ে করব না।

—না করিস না করবি। আমি ঠিক দকলির সঙ্গে সম্বন্ধ করে দেবো।

—তুমি অত টাকা খরচ করবে কেন? ওতে আমার সম্মান থাকে না।

—সে আমি বুঝব। সম্মান নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

পুন্নি চা করতে যায়।

বড়বউদি এসে ডাকেন—দিগিন ভাই।

—হুঁ।

—তাজ্জব। পুন্নির কি টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে?

—করলাম।

—এত কিছুতে রাজি হলে কেন? কী এমন পাত্র?

—পাত্র খারাপ না।

—তা হলেই বা। নগদ দশ হাজার, স্কুটার, ফ্রিজ, সোনা—তুমি কী ভেবেছ বলো দেখি। ওরা তো অত পাওনার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। তুমি আগে বাড়িয়ে বললে কেন?

—মুখ বন্ধ করে দিলাম। আর টু শব্দও করতে পারবে না।

—কেন? আরও অনেক কমেই তো হত। দশ হাজার নগদ শুনেই তো কাত হয়ে পড়েছিল।

দিগিন হাসেন। তিনি আসলে একটি সুন্দর বৃদ্ধের আকৃতির গিনিপিগকেই লক্ষ করেছিলেন সারাক্ষণ। যখন বুঝলেন ভদ্রলোকের টাকা-কেন্দ্রিক মন, তখন তিনি তাকে লোভানীর পর লোভানীতে উসকে তুলেছিলেন। লোকটার নির্বিকার ব্যক্তিত্ব, ঠান্ডা মেজাজ ঝরে গেল, কর্তৃত্বের ভাবটা পড়ল খসে। মানুষগিনিপিগের বেশি কিছু নয়।

বউদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—ঠাকরোন, আজ ভালো করে শুঁটকি মাছ রাঁধো তো।

—কেন, কেউ খাবে নাকি?

—হুঁ।

—কেন?

—ভটচায, আমার ব্যাঙ্কের এজেন্ট।

—মাইফেল বসবে, না?

দিগিন হেসে বলেন—ঠাকরোন, তুমি মাইফেলের মানেই জানো না।

—বয়স হল, এখন ওসব ছাড়ো না।

—ছেড়ে ধরবটা কী?

—সবই তোমার অদ্ভুত। শুধু শুঁটকি হলেই হবে নাকি?

—না। ওই সঙ্গে একটু ফ্রায়েড রাইস মাংস আর মাছও কোরো। চাটের জন্য আলুর বড়া কোরো। মেটে চচ্চড়ি তো আছেই। ভটচায মদটদ খায় না, একটু চাখবে মাত্র। তাই

খাবারটা দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

বউদি চলে যাওয়ার আগে বলেন—টাকাটা কিন্তু একদম ভস্মে ঘি ঢালা হল। পারলে পাটিপত্রের দিন একটু কাছছাঁট করো।

—তাই কখনও হয়! কথা হচ্ছে কথা। কিছু কাটছাঁট হবে না।

—তোমার দাদা বলছিলেন এত টাকা বেরিয়ে গেল, শানুটাও লস দিচ্ছে, ব্যবসাপত্রের না ক্ষতি হয়।

দিগিন একটা হাসি লুকোলেন, বললেন—ক্ষতি হবে তো বটেই। সোপস্টোনটা ডোবাবে, তবে ঠিকেদারি তো আছেই। চিন্তা কী?

বউদি একটু দাঁড়িয়ে থাকেন।

দিগিন বলেন—পুন্নির বিয়ে দেওয়ার পর আমি গরিব হয়ে যাবো না ঠাকরোন, ভয় নেই।

বউদি শ্বাস ফেলে বলেন—তোমরাই বোঝো। আমি মেয়েমানুষ আমার এসব কথায় থাকার কী?

—মেয়েমানুষই তো কথায় থাকে। নইলে সংসারটা বাক্যহারা হয়ে যেত।

বউদি বলেন—তবু তো মেয়েমানুষের পদতল ছাড়া গতি নেই।

বউদি চলে যান। পুন্নি চা নিয়ে আসে। সন্ধে হয়। হিমালয় ঢেকে যায়। তিনধারিয়ার আলোর মালা জেগে ওঠে। ডাউহিলের ডগায় বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে। দার্জিলিঙের রাস্তায় ক্রমান্বয়ে মোড় নিয়ে যেসব গাড়ি উঠছে বা নামছে তাদের হেডলাইট মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে।

সন্ধের মুখে দিগিন পোশাক পরে মোটরসাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়িতে বলে যান, ভটচায এলে যেন বসানো হয়।

এই শরৎকালে শিলিগুড়ির মতো এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না। আবহাওয়াটি বড় মনোরম। ঘাসে গাছপালার একটা ভেজা গন্ধ ওঠে। শিশির পড়ে, চারধারে একটা নিঃশব্দ উৎসব লেগে যায়।

নিউমার্কেটে আলো ঝলসানো দোকানপাট। হিলকার্ট রোড এখন কলকাতাকে টেক্কা দেয় আলোর বাহারে। চারধারে আলোয় আলোময়।

দিগিন বাইকটা আস্তে চালিয়ে সেবক রোডের মোড় পেরিয়ে মহানন্দার পুলের কাছে এসে ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভরে নেন। পাম্পের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর বর্ধমান রোড ধরেন। ফাঁকা রাস্তা, ঝড়ের বেগে চলে আসেন ময়নার বাড়ির কাছে।

উঁচু রাস্তা থেকে একটা শুঁড়িপথ নেমে গেছে। বড় রাস্তায় বাইকটা দাঁড় করিয়ে অন্ধকার রাস্তাটা ধরে নেমে যান। ড্রেনের ওপর কংক্রিটের স্ল্যাব পাতা, তারপর,

ঝুমকোলতার চালচিত্রওলা লোহার গেট। একটু ছোট বাগান। শিউলির গন্ধে ম ম করছে। কাঁচা মাটির গন্ধ পান। সেইসঙ্গে ধূপকাঠির একটা মিষ্টি গন্ধ।

ছোট হলেও বাড়িটা খারাপ না। দুখানা ঘর, বাগান, কুয়ো, সবই আছে। বাছাই ভালো কাঠের দরজা-জানালা, বারান্দায় গ্রিল। একটা রাগী ভুটিয়া কুকুর আছে পাহারাদার। আর আছে একজন নেপালি ঝি। ময়না কিছু কষ্টে নেই। দিগিন মাঝে মাঝে রাতে থেকেও যান। প্রায়দিনই দেখা করতে আসেন, যথেষ্ট টাকাপয়সা দেন। ময়নার খারাপ থাকার কথা নয়। গত বাইশ-তেইশ বছর তো এভাবেই কেটেছে।

ধূপকাঠির গন্ধটা উন্মুখ হয়ে শুঁকতে শুঁকতে বারান্দায় উঠে আসতেই একটা অস্ফুট আল্হাদের আওয়াজ করে কুকুরটা এসে লুটিয়ে পড়ে। বারংবার লাফ দিয়ে গায়ে ওঠে, প্রবল আবেগে পায়ে মুখ ঘষে। দিগিন তার মাথায় চাপড় মেরে আদর করেন। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে, নীল পরদা ফেলা। পুরুষকণ্ঠে ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে—কে?

দিগিন উত্তর দেন না। কণ্ঠস্বরটা তিনি চেনেন। কাটিহারের ফকির সাহেব। মাঝেমধ্যে এদিকে আসেন।

বাইরের ঘরে একটা চৌকি আছে, গোটা দুই বেতের চেয়ার। চৌকিতে ফকির সাহেব বসে। লম্বা চুল, পরনে আলখান্না, চোখে সুর্মা মুখে পান। দাড়িটা ট্রিম করে কামানো। চোখের দৃষ্টিতে একটা জ্বলজ্বলে তীব্রতা আছে। লোকে বলে ফকির সাহেবের বয়স একশো। সেটা বোধহয় বাড়িয়ে বলা। দেখে পঞ্চাশের বেশি মনে হয় না।

দিগিন পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

ফকির সাহেব মৃদু হেসে বলেন—আও বেটা।

—কখন এসেছেন?

—বিকেলে। রাতের গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, তো ভাবলাম ময়না বিটির সঙ্গে দেখা করে যাই।

—আমাদের ওখানে গেলেন না তো?

—যাব। ফি হপ্তা তো আসছিই।

ধূপকাঠির সুন্দর সুবাস আবার বুক ভরে টানেন দিগিন।

ময়নার ঝি উঁকি দিয়ে দেখে যায়। একটু পরেই ময়না আসে।

পরনে একটা চওড়া লালপাড়ের সাদা খোলের শাড়ি। বিয়াল্লিশ বছরের কিছু মেদ ও মেচেতা শরীরে আর মুখকে শ্রীহীন করেছে বটে, কিন্তু এখনও দীর্ঘ শরীরে যথেষ্ট যৌবন রয়ে গেছে। মাথায় এলো-খোঁপা, কপালে চন্দনের টিপ। নাকটা একটু ছোট হলেও ময়নার চোখ ছোট নয়। বেশ বড়বড় দুটি চোখ। মুখে কিছু ক্লান্তি, কিছু গাম্ভীর্য। ময়না আজকাল নেপালি ভাষায় কখনও কথা বলে না। এমনকী সে তার ঝিয়ের সঙ্গে পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে।

দিগিনকে দেখেই মুখটা অন্যধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল—ফকির সাহেবের জন্য রান্না করছি, তুমিও খেয়ে যেও।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন—বাসায় আজ এক বন্ধু খাবে।

—ও। ময়না বলে।

দিগিন বেতের চেয়ারে বসেন। একটা চুরুট ধরান। বিশ্বের এমন কোনও মানুষ নেই যার সামনে দিগিন চুরুট না খান।

ফকির সাহেব তাঁর পোঁটলা থেকে একটা কৌটো বের করে পান খেলেন, একগাদা দোক্তা মুখে দিয়ে ঝিম হয়ে বসে রইলেন একটু। পিকটিক ফেলেন না। বার দুই তিন হেঁচকি তুলে দোক্তার ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন—কি খবর-টবর?

—ভালোই।

—বন্নোরহো।

—আমার হাতটা একটু দেখবেন ফকির সাহেব?

—দিনের বেলা

—আগেও তো দেখেছেন।

—জরুর।

—আমার মরণ হবে?

ফকির সাহেব মজবুত দাঁত দেখিয়ে হাসলেন, বললেন—ওই সব জেনে কি হয় রে বেটা?

ময়না দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে দিগিনের দিকে। কথা বলে না।

দিগিন নীরবে চুরুট খেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক। একটা শ্বাস ফেলে বললেন—মানুষ জন্মায় কেন ফকির সাহেব?

—খোদায় মালুম। ফকির সাহেব উদাস উত্তর দেন। পানটা মজে এসেছে। নিমীলিত চোখে সেই স্বাদটা উপভোগ করতে করতে আস্তে করে বলেন—কৌন জানে। পয়দা বেফয়দা। তব ভি কুছ হ্যায় জরুর।

দিগিন হাসলেন। ফকির সাহেব তাত্ত্বিক নন, দার্শনিক কতাবার্তা আসে না, এমন অনেক কথা বলে ফেলেন যা ধর্মবিরুদ্ধ।

ষোলো বছরের সেই কিশোরীটি কত বড় হয়ে বুড়ো হতে চলল। কিন্তু কেন? আটান্ন বছর বয়সে এসব প্রশ্ন নিতান্ত জরুরি বলে মনে হয়।

ফকির সাহেব একটা মস্ত বোতল পোঁটলা থেকে বের করে ময়নার হাতে দিলেন। বললেন—রাখ। এক মাহিনা আওর খেয়ে দেখ।

ওষুধটা বাচ্চা হওয়ার জন্য খায় ময়না। দিগিন জানেন। গত তিন'চার মাস ধরে খাচ্ছে।

ময়না বোতলটা নিয়ে একবার দিগিনের দিকে তাকায়। চোখে একটা শূন্যভাব। বহুবছর ধরেই কি ময়না তার শূন্যচোখে চেয়ে আছে দিগিনের দিকে? দিগিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না। একটা বাচ্চা ময়নাকে তিনি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেটা হয়তো ময়নারই দোষ। কারণ, ময়না তো একা দিগিনের সঙ্গ করেনি। কাজেই দিগিন নিজেকে দায়ী করতে পারেন না। ময়নাও বাচ্চার জন্য তেমন ভিখিরিপনা করেনি কখনও। আজকাল কান্নাকাটি করে। দিগিন বিরক্ত হন। ময়না আজকাল কেবল একরকম ভাষাহীন চোখে চাইতে শিখেছে। দিগিন সেটা সহ্য করতে পারেন না। ময়নাকে তিনি যতদূর সম্ভব সুখে রেখেছেন, কখনও বিশ্বাসের ভঙ্গ হয়নি। বউয়ের চেয়ে কিছু কম তো নয়ই, বরং বেশি সুখেই আছে ময়না। মর্যাদা হয়তো নেই! কিন্তু মর্যাদা না পেলেই বা ঘুমের তরকারির দোকানের সেই অশিক্ষিত মেয়েটির কী যায় আসে। বরং উলটোদিক থেকে দেখলে ময়নাই দিগিনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেনি। অবাধে মেলামেশা করেছে ছোকরাদের সঙ্গে। পয়সা রোজগারের জন্য নয়, কিংবা কেবল যৌন কাতরতার জন্যও নয়। সে বোধহয় দিগিন নামের একটা পাথর ভাঙতে পারেনি বলেই পুরুষের বুক চিরে চিরে একটা নিরন্তর প্রবহমান ফল্গুধারাকে খুঁজেছে। পায়নি। দিগিনের কাছ থেকে চলে যেতে চেয়েও যেতে পারেনি ময়না। দাঁড়ের পোষা ময়না, যেতে পারে না। দিগিন ওর দিকে চেয়ে এক গিনিপিগকেই দেখতে পান। ময়নাকে তেমন শাসন কখনও করেননি দিগিন, কর্তৃত্ব নয়, দাবি-দাওয়াও নয়। হাওয়া-বাতাসের মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। কেউ কারও বাঁধা নয়। তবু কেন বাঁধা আছে ময়না তা ভাবেন দিগিন, অনেক চুরুট পুড়ে যায়, তবু সমাধান খুঁজে পাননি পঁচিশ বছর ধরে।

ময়না ভিতর-বাড়িতে চোখের ইশারায় ডাকে। দিগিন উঠে যান। ধূপকাঠির গন্ধ ছাপিয়ে উঠেছে মাংস রান্নার গন্ধ। প্রেশার কুকারের তীব্র হুইশল বেজে উঠল।

ভিতরের ঘরে ময়না শোয়। একটা খাট পাতা, একটা ড্রেসিং টেবিল, কাঠের কাচ-বসানো আলমারি আলনা। দিগিন বিছানায় পা তুলে বসেন, ময়না মোড়া টেনে মুখোমুখি বসে।

—ফকির সাহেবের ওষুধের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ময়না বলে।

—কত?

—বিয়াল্লিশ টাকা। আমি দিয়ে দিচ্ছি আজ!

—আমার কাছে আছে, দিয়ে দেব-খন যাওয়ার সময়।

ময়না চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। হঠাৎ মুখ তুলে বলে—মরার কথা জিগ্যেস করছিলে কেন?

—এমনিই।

—আমি জিগ্যেস করেছি।

—কী?

—বলেছি, বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

—ও।

—ফকির সাহেব বললেন যে বাচ্চা হলে বাঁচতে ইচ্ছা করবে।

—তাই নাকি।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—একা বেঁচে থাকা কত কষ্টের।

—কষ্ট কী? দুনিয়ায় সবাই একা।

ময়না এসব কথা ভালো বোঝে না। কিন্তু শুনলেই আজকাল ওর চোখ ভরে জল আসে। এখনও এল। চোখ মুছল নীরবে।

ময়না বলল—আমি কোথাও ঠিক চলে যাবো।

দিগিন চুপ করে রইলেন।

ময়না বলে—শুনছ?

—শুনেছি।

—আমি কোথাও চলে যাব।

—যেও, আমি তো কখনও বারণ করিনি।

একটু তীব্রস্বরে ময়না বলে—কেন বারণ করোনি?

—কেন করব?

ময়না কথা খুঁজে পায় না। আসলে সে বাঙালি মেয়েদের মতো কথার ওস্তাদ নয়। তার ওপর সে নানরকম পাপবোধে ভোগে। সে জানে, দিগিনের প্রতি সে তেমন বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়নি।

প্রেশার কুকারের আর একটা হুইশল বেজে ওঠে। শিউলির গন্ধের সঙ্গে মাংসের গন্ধ মিশে যায়। ময়নার ঝি কফি নিয়ে আসে।

দিগিন উঠে বসেন। বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুলের ওপর কাপসুদ্ধ প্লেটটা ধরে রেখে তিনি নীচে বসা ময়নার দিকে তাকান। দাঁড়ের ময়না। গিনিপিগ। বলেন—আজ সকালে শালুগাড়ার সিদ্ধাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম।

ময়না চেয়ে থাকে।

দিগিন কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন—সিদ্ধাই বলল, একজন ফরসা আর লম্বা মেয়েছেলে আমার খুব ক্ষতি করবে।

—মেয়েছেলেটা কে?

—তা বলেনি।

—ফরসা আর লম্বা?

—হ্যাঁ।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—সে কি আমি?

—কী করে বলি?

—কীরকম ক্ষতি?

—তাও স্পষ্ট করে বলেনি।

ময়না চেয়ে থাকে। হঠাৎ মাথাটা নোয়ায়।

দিগিন হেসে বলেন—বোগাস। আসলে সবাই তোমাকে চেনে। আমাদের সম্পর্ক জানে, তাই ওসব বলে।

—তুমি তো বিশ্বাস করো।

—না, করি না।

—তবে গিয়েছিলে কেন?

—গিনিপিগ দেখতে।

গিনিপিগের ব্যাপারটা ময়না জানে। তাই বুঝল।

—আমি তোমার আর কী ক্ষতি করতে পারি? যদি ক্ষতি করি তো আমারই ক্ষতি। তুমি ভালো না থাকলে আমার ভাত-কাপড় জুটবে কী করে?

—সেই জন্যই তো বলছি সব বোগাস।

ময়না হঠাৎ মুখখানা তুলে বলল—ক'দিন আগে একদিন সকালে শানু এসেছিল।

—শানু? চমকে ওঠেন দিগিন, কেন?

—তেমন কোনও কারণ তো বলেনি। একটা স্কুটার হাঁকিয়ে এল।

—কী বলল?

—বলল, কাকিমা কিছু টাকা দাও, খুব লস যাচ্ছে।

দিগিন অবাক হন, বলেন—কাকিমা বলে ডাকল?

ময়নার চোখে আবার জল। কথা ফুটল না, মাথা নাড়ল কেবল।

—টাকা দিলে?

—দিইনি। বললাম, দেবো।

—কত?

—খুব বেশি নয়। দু-হাজার, তোমাকে বলতে বারণ করেছিল।

—কেন?

—ও একটা হিসেব মেলাতে পারছে না! তোমাকে ভয় পাচ্ছে। বলল, কাকাকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। টাকাটা ক্যাশে দেখাতে হবে।

দিগিন আগুন গরম কফি শেষ করেন। চুরুট ধরিয়ে নেন। ছড়ানো ঠ্যাং দুটো নাড়তে-নাড়তে বলেন—ডোবাবে।

—কী?

ওই ছেলেটাই ডোবাবে। বংশের কুড়াল।

—এমন সুন্দর করে ডাকল। তোমাদের বাড়ির কেউ তো আমাকে ওরকম করে ডাকেনি কখনও। আমার কথা মুখেই আনে না কেউ। কখনও আনতে হলে নাম ধরে ময়না বলে। ছোট বড় সবাই।

দিগিন উঠতে উঠতে বলেন—টাকাটা ওকে দিও না।

—কথা দিলাম যে!

দিগিন নিশ্বাস ফেলে বলেন—তাতে ওর ক্ষতি হবে। যতদূর জানি ও জুয়াটুয়া ফেলছে, ফাটকায় টাকা ঢালছে। রাতারাতি বড়লোক হতে চায়।

—চা-ক। ছেলেমানুষ।

দিগিন অবাক হয়ে ময়নার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। মা হতে না পারা ময়না ভিখারিনির মতো চেয়ে আছে। দিগিন শ্বাস ফেলে বলেন—ইচ্ছে হলে দিও। কিন্তু ও টাকাটা বাজে ব্যাপারে নষ্ট করছে। তা ছাড়া তোমার কাছে টাকা চাইবে কেন? ওর লজ্জা থাকা উচিত।

ময়না তার বড় দুখানা চোখ পরিপূর্ণ মেলে দেয় দিগিনের মুখের ওপর। বলে—আপন মনে করে চেয়েছে। ওকে বোকো না। আমার ছেলে থাকলে সে যদি টাকা নষ্ট করত তাহলে কী করতে?

—শাসন করতাম।

—বেশি জোর করলে শাসন করা যায়। ও তো মোটে একবার চেয়েছে। টাকাটা কিন্তু আমি দেব। তুমি কিছু বলো না।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে বলেন—সোপস্টোনের পিছনে বহু টাকা নষ্ট করেছে। কিছু বলিনি। কিন্তু এ সবের একটা শেষ থাকা উচিত।

—তুমিও তো টাকা কম নষ্ট করো না।

—সে করি রোজগার করে। ওর তো এসব রোজগারের টাকা নয়। ব্যবসাতে আমি ওকে নিয়েছি বিশ্বাস করে, বিশ্বাস রাখতে না পারলে ছাড়িয়ে দেব।

—সবাইকে তো ছাড়িয়ে দিয়েছ, কাকে নিয়ে থাকবে?

—আমার কাউকে দরকার হয় না।

ময়না সে সত্যটা জানে! তাই চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বলে—শানু বিয়ে করবে।

দিগিন চমকে ওঠেন—কী বললে?

—শানু বিয়ে করবে।

—কাকে?

—পছন্দ করা মেয়েকে।

—তোমাকে কে বলল?

—শানু নিজেই বলে গেছে। কালিম্পঙের মেয়ে। বিয়ে করে আমার কাছে এনে তুলবে বলেছে।

দিগিন চেয়ে থাকেন। ঠিক বুঝতে পারে না!

ময়না নিজে বলে—মেয়েটা বিধবা, তোমরা নাকি ঘরে নেবে না, তাই আমার কাছে রাখবে।

দিগিন একটা হাই চাপলেন! বললেন—ও।

—আমি কি করব?

—শানুকে বলে দিও যে এ বাড়িটাও আমার, আর যে ঠিকাদারি ব্যবসার জোরে বাজারে ও নিজে চালু আছে সেটাও আমার। কাজেই ইচ্ছে করলেই ও যা খুশি করতে পারবে না।

ময়না হঠাৎ আস্তে করে বলে—আমি কি তোমার বউ?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলেন—এসব কথা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন?

—ধরো যদি শানুও তোমার মতোই কাজ করে তবে দোষের কী! আমার মতো কাউকে বউ করে এনে যদি বাঁধা মেয়েমানুষের মতো রেখে দেয় তো তুমি কি তাকে শাসন করতে পারো?

—পারি। দিগিন শান্ত গলায় বলেন।

—কেন পারো?

—কারণ আমি টাকা রোজগার করে নিজের পয়সায় সব করেছি। ওর মাজায় সে জোর নেই। ওর আছে বারফাট্টাই। ফকির সাহেব একা বসে আছেন, তুমি তার কাছে যাও। শানুর চিন্তা আমি করব।

ময়না শ্বাস ফেলে উঠে যায়। এ পাথর সে ভাঙতে পারবে না।

ভটচায আয়োজন দেখে খুব খুশি। পেটের রোগ আর প্রেশারের জন্য বাড়িতে খাওয়ার বড় ধরা-করা। কিন্তু লোকটা খাইয়ে মানুষ।

মদের গেলাসটা সরিয়ে রেখে মেটুলির চাটটা টেনে নিয়ে বললেন —বড় খাওয়ার আগে আবার এই ছোট খাওয়ার ব্যাপারটা কেন মশাই?

দিগিন হেসে বললেন—এ ছোট খাওয়া নয়, এ হল চাট, মদের মুখে একটু একটু খেতে হয়। নুন আর ঝাল স্বাদে তেষ্টা বাড়ে, তাতে মদটা খেয়ে আরাম।

কিন্তু ভটচায মদের মোটে স্বাদ পান না। দু-এক চুমুক কষ্টে খেয়ে বলেন—এ মশাই চলবে না! বড্ড লাউড জানিস।

—তাহলে চাটটাও খাবেন না। খামোখা খিদে নষ্ট হবে। বলে দিগিন জলপান করার মতো দিশি মদ গলায় ঢালেন।

—শুঁটকি মাছ আমি বড় ভালোবাসি।

—একটু মাল টেনে নিন, আরও ভালো লাগবে।

ভটচায কষ্টেসৃষ্টে আরও দু'এক চুমুক খান। বলেন—মাথা ঝিমঝিম করছে।

—তাহলে আর একটু চালান। ঝিমুনিটা কেটে ফুর্তি লাগবে।

ভটচায খেতে চেষ্টা করেন।

দিগিন উঠে গিয়ে পোর্টের একটা বোতল আনেন আলমারি থেকে। আলাদা গেলাসে ঢেলে দিয়ে বলেন—এটা খান। এটার স্বাদ ভালো।

পোর্ট ভটচাযের ভালোই লাগে। অনেকখানি খেয়ে নেন একেবারে। বলেন, হ্যাঁ, এটা বেশ।

—আর একটু দিই?

—দিন।

দিগিন মৃদু হেসে বলেন—খুব দামি জিনিস। এই বোতলটা একশো টাকা।

—বলেন কী! থাক থাক আর দেবেন না।

—খান না মশাই, দামকে ভয় কী?

—দামের জন্য নয়, নেশা হয়ে যাবে।

বোতলটা ভটচাযের হাতের নাগালে রেখে দিলেন, বুঝতে পারেন 'দামি জিনিস' কথাটাই ভটচাযকে কাত করবে।

করলও। ভটচায গেলাস শেষ করে বোতলটা হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন—দিগিনবাবু, এর জোরেই না এখনও ফিট আছেন। নইলে এখানকার জলহাওয়া সহ্য করেন কী করে?

—একজ্যাক্টলি।

ভটচায কথা বলতে থাকেন। প্রথমে চাকরির কথা। তারপর ঘর-সংসারের কথা। কী একটা দুঃখের কথা বলে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলেন। দিগিন চোখ ছোট করে চেয়ে গিনিপিগ দেখতে থাকেন। আজকাল তার বড় একটা নেশা হতে চায় না। কাল রাতে যেমন ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন তেমনি আজও একবার খাবেন নাকি!

ভটচায হেঁচকি তুলে বলেন—শুঁটকি মাছ!

—আসছে।

—খুব ভালো জিনিস।

—খুব।

—বহুকাল খাইনি, আমার বাসায় ওর পাট নেই। ছেলেবেলায় খুব খেয়েছি। আপনার বাসায় রেগুলার হয়?

—হয়।

—সবাই খায়?

—না। আমি খাই আর বড়বউদি। আর কেউ না।

—বউ থাকলে সে যদি না খেত তবে আপনারও খাওয়া হত না।

দিগিন হাসেন।

ভটচায হঠাৎ সংবিৎ পেলে বলেন—কিন্তু লোকে বলে আপনার কে একজন আছে।

দিগিন গম্ভীর পেয়ে বলেন—কে থাকবে?

—একজন মেয়েছেলে!

দিগিন হেসে বলেন—সে তো সবার থাকে।

—সবার থাকে? ভটচায হেঁচকি তোলেন।

—বিয়ে করলেই থাকে।

—না না, বিয়ে করা বউয়ের কথা নয়।

—তবু কথা একই, বিয়ে করা বা না করা সবই এক কথা।

ভটচায অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা নেড়ে বলেন—তা বটে। তাহলে আপনার একজন আছে?

—একজন না, কয়েকজন।

—কয়েকজন? ভটচায চোখ বড় করে তাকাল।

—লোকে বলে না সে কথা?

—না তো! একজনের কথাই শুনেছি।

—লোকে কমিয়ে বলেছে!

—রাখেন কি করে? একজনেরই যা খরচ।

—রোজগার করি। রাখি!

—বেশ খরচা পড়ে, না?

—তা পড়ে, ফুর্তিটাও তো কম নয়। মেয়েছেলে, কিন্তু বউ নয়, এর মধ্যে কি কম ফুর্তি নাকি।

ভটচায মাত্রাহীন টানতে থাকেন পোর্ট। বলেন—বাড়িতে বসে এসব খান, কেন কিছু বলে না?

—কী বলবে?

—আপত্তি করে না?

—বাড়িটা তো আমার।
—তবু ফ্যামিলিতে কি এসব চলে?
দিগিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—অত ভাবতে গেলে ফুর্তিই তো ফিকে হয়ে যায়।
—তা বটে।
—ভাববেন না। কেউ কিছু বলে তো বলুক। আপনার কাজ আপনি করে যাবেন।
—কী করব?
—ফুর্তি।
—এই বুড়ো বয়সে?
—ফুর্তির আবার বয়স কী? তাছাড়া সারাজীবন যদি ফূর্তি না করে থাকেন তো এই শেষ বয়সেই তা পুষিয়ে নেওয়া উচিত। আর তো বেশি সময় নেই। আপনি কিন্তু একটু বেশি খাচ্ছেন।
—না, আর খাব না।
—খান। ক্ষতি নেই। তবে আর বেশি টানলে খাবার খেতে পারবেন না।
—দাঁড়ান। আর দুই চুমুক। আবার অনেকটা খেয়ে ভটচায একটা প্রকাণ্ড ঢেকুর তুলে বললেন—ওই! গ্যাসটা বেরিয়ে গেল! পেটটা হালকা লাগছে।
—লাগবেই তো। দেশিটা খেলে আরও বেরিয়ে যেত।
—হ্যাঁ, ফুর্তির কথা কী যেন বলছিলেন?
—এইটাই ফুর্তির বয়স। মরার পর ওপারে গেলে স্বয়ং যম যখন সওয়াল করবে—বাপু, পৃথিবীর কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার, কী কী ভোগ করে এলে—তখন কী বলবেন? বলার কিছু আছে? ঘ্যান ঘ্যান প্যান-প্যান করে নাকি সুরে তখন পেটের রোগ, বউয়ের মেজাজ, প্রোমোশনের দেরি, ডেবিট, ক্রেডিট—এসবই বলতে হবে। যম তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে, বলবে—যাও, দুনিয়াটা আবার দেখে এসো, কিছুই দেখনি।
ভটচাযের চোখ দুখানা রক্তাভ। সেই চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলেন—শুঁটকি মাছ?
—হবে। আর একটু খিদেটা চাগিয়ে নিন।
ভটচায মদে সম্পূর্ণ ভেসে যাওয়ার আগে [illegible] কণ্ঠে বলেন—বাড়িতে বড় ধরাকাটা! কিছু খেতে-টেতে দেয় না মনের মতো। বহুকাল ধরে ডিপ্রেসনে আছি। যদি পেটটা ঠিক থাকত, যদি প্রেশারটা উৎপাত না করত।
খাবার দিয়ে গেল চাকর। ভটচায দু-চামচ ফ্রাইড রাইস খেলেন, একটুকরো মাংস, শুঁটকি মাছের চচ্চড়িটা মুখে তুললেন মাত্র, খেতে পারলেন না। তারপরেই গেলাস রেখে চেয়ারে এলিয়ে বসে চোখ বুজলেন। আস্তে করে বললেন—বউ বাচ্চা সব পাঠিয়ে দিয়েছি কোন্নগর। সেখানে আমার বাড়ি হচ্ছে। যে কদিন আছি রোজ আসব, বুঝলেন?
—নিশ্চয়ই। দিগিন বলেন।

একটা রিকশা ডেকে ভটচাযকে তুলে দিতে রাত হয়ে গেল।

ভিতর-বাড়িতে ফিরে আসবার সময়ে দেখলেন, শানুর ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ দরজার সামনে একটু দাঁড়ালেন। ঘরটা নিঃশব্দ। আস্তে টোকা দিলেন দরজায়।

—কে?

—আমি?

—ছোটকাকা।

—হ্যাঁ।

শানু উঠে এসে দরজা খোলে। এ সময়টা দিগিনকে সবাই সমঝে চলে। কারণ প্রায়দিনই সন্ধের পর দিগিন নেশা করেন।

কিন্তু আজ তাঁর নেশা হয়নি। যথেষ্ট পরিষ্কার আছে মাথা। চিন্তাশক্তি চমৎকার কাজ করছে।

শানু সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে বলে—কিছু বলবে?

—হুঁ, বলে দিগিন শানুর ঘরে ঢোকেন।

ঘরটা ভালো। বারো বাই বারো মাপের ঘর। ফোম রবারের গদি পাতা খাট, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি আঁটা চেয়ার, টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। শানু একটু শৌখিন মানুষ। অন্তত দশ জোড়া জুতো র্যাক সাজানো। ওয়ার্ডরোবটা বেশ বড়সড়। তাতে প্রয়োজনের অনেক বেশি জামাকাপড় ঠাসা আছে।

সেক্রেটারিয়েটের সামনের চেয়ারটায় বসেন দিগিন। কথা বলেন না।

শানু বিছানায় বসে। চেয়ে থাকে।

—শানু।

—বলো।

—ময়নার কাছে কেন গিয়েছিলি?

শানু স্মার্ট ছেলে। ঘাবড়াল না, একটু হাসল। বলল—তুমি চিরটা কাল কাকিমাকে বড় হেলাফেলা করেছ।

—কাকিমা!

—নয়?

দিগিন শ্বাস ফেললেন।

শানু বলে—মানুষ যাই বলে বলুক, আমি জানি কাকিমা বলেই।

একটু কর্কশ স্বরে দিগিন বলেন—বুঝলাম, কিন্তু গিয়েছিলি কেন?

—সম্পর্কটা সহজ করতে!

—সেটা নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন?

শানু গম্ভীর হয়ে বলে—ছোটকাকা, একটা মানুষের প্রতি সারাটা জীবন কেন অন্যায় করে যাচ্ছ?

—অন্যায়?

—অন্যায় ছাড়া কী? ভাত-কাপড়ের চেয়ে দামি জিনিস হচ্ছে মর্যাদা—

—থাক। টাকা চেয়েছিলি কেন?

—চেয়েছি ধার হিসেবে।

—কেন?

—সব টাকা লিকুইডেটেড হয়ে গেছে।

—সেটা আমাকে বলিসনি কেন?

—বললে তো বকতে।

—এখন কি বকব না?

শানু শ্বাস ফেলে বলল—সোপস্টোনের লসটা হিসেব করছিলাম। তোমাকে যা বলছি তার চেয়ে বেশি লস হবে। বাজারে ধারকর্জ একটু বেশি হয়েছে। জলঢাকায় যে ইরেকশনের কাজটা অর্ধেক বন্ধ রাখতে হয়েছে সেটার বিল আটকে দিয়েছে, লেবাররা খেপে আছে, যাওয়া যাচ্ছে না।

নিজের দুখানা হাতের দিকে অন্যমনে একটু চেয়ে থাকেন দিগিন, শানুর কোনও কথাই তাঁকে স্পর্শ করে না। জলঢাকা এম-ই-এস, সোপস্টোন, টাকা, বিল, এসব কথা একটা জীবনে তিনি অনেক ভেবেছেন। এখন আর ভাবতে ভালো লাগে না। জীবনে সব কিছুরই একটা কোটা থাকে। তাঁর কোটা ফুরিয়েছে। আর কিছু করার নেই বোধহয়।

দিগিন তাঁর চিন্তান্বিত মুখখানা তুলে বলেন—আমার অনেক দোষ ছিল। ছিল কেন বলি, এখনও আছে। লোকে বলে, আমার হৃদয় বলে বস্তু নেই। কিন্তু আমার সদগুণেরও কিছু অভাব ছিল না। আমি সেই জোরেই দু'হাতে টাকা রোজগার করেছি। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার কোনও শর্টকাট রাস্তা আমার জানা নেই। বাজে ফাটকায় বা অনিশ্চিত ব্যাপারে আমিও কিছু ক্ষতি স্বীকার করেছি, কিন্তু কোনও ব্যাপারেই আমার ফাঁকির ফিকির ছিল না। তাই আজও আমি টাকার ওপরে বসে আছি। তোমাদের আমলে তোমরা এই টাকার পাহাড় ধসিয়ে দেবে।

শানু মাথা নীচু করে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে—চেষ্টা তো আমিও কিছু কম করি না।

—কালিম্পঙে তোমার এখন কী কাজ হচ্ছে?

—একটা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন, তুমি তো জানোই।

—জানি। কিন্তু সে বাবদে তোমার সেখানে গিয়ে পড়ে থাকার মনে হয় না। কাল আমি নিজে সেখানে যাব। তুমি জলঢাকায় যাবে। ইরেকশনের কাজটা শেষ করতেই হবে, মনে

রেখো।

—লেবাররা ছেড়ে দেবে না! ওদের অনেক টাকা বাকি পড়ে গেছে।

—সেজন্য কে দায়ী?

—আমরা নই। ইরেকশনের ভুলটা ডিটেকটেড হয়েছে অনেক পরে। এখন নতুন করে করতে গেলে খরচ দ্বিগুণ হত। তাই আমরা ছেড়ে এসেছি।

—খরচের ভয় পেলে চলবে কেন? আমার নাম কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার গুডউইল নষ্ট করার তুমি কে? কালই তুমি জলঢাকা যাবে।

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন বলেন—বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল।

—কালিম্পঙে তোমাকে আর যেতে হবে না।

শানু মাথা তুলে বলে—জলঢাকায় কাজটা আবার হাতে নিলে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।

—হলে হব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—ছোটকাকা।

—বলো।

—আর একটু ভেবে দেখো।

—ভাববার কিছু নেই। কাজটা করতে হবে।

—একটা পয়সাও আসবে না, ঘরের টাকা চলে যাবে।

—জানি। আমি বোকা নই।

—তবু যেতে বলছ?

দিগিন রাগের গলায় বলেন—শুনতেই তো পাচ্ছ।

—ঠিক আছে।

—যদি লেবাররা গোলমাল করতে চায় তাহলে কী করবে?

—কিছু ঠিক করতে পারছি না।

—ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে রওনা হয়ো। টাকা নিয়ে গিয়ে প্রথম লেবার পেমেন্ট করবে। আমাদের ওয়ার্ক অর্ডার এখনও ক্যানসেল করেনি, সুতরাং বাকিটা করতে ঝামেলা হবে না। আমি চেক লিখে রাখছি।

শানু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—আচ্ছা।

—মনে রেখো লেবার পেমেন্ট সবার আগে।

—আচ্ছা।

—আর সোপস্টোনের ব্যাপারটা তোমাকে ছেড়ে দিতে বলেছি। তুমি কিছু ভেবেছ?

—অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছি।

—তবু ছেড়ে দাও।

—এটাতে তোমার টাকা ছাড়াও পার্টনারদের টাকা আছে। তারা কী বলবে?

—কী বলবে? যদি সন্দেহ করে তবে পার্টনাররা ইনিশিয়েটিভ নিক। তুমি ওটাতে আর টাকা ঢেলো না। ভুটান গভর্নমেন্ট দর কমাবে না।

—ভেবে দেখি।

—দেখো! আর শোনো, যদি ময়নাকে তোমার কাকিমা বলে ডাকতে ইচ্ছে হয় তো ডেকো। কিন্তু ওকে তোমার স্বার্থে জড়িও না।

শানু মুখটা তুলে নামিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন—বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

—ময়না আমাকে সবই বলেছে। কিছু গোপন করেনি।

দিগিন উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ালেন। শানুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু বলার আছে?

শানু তার ছোটকাকাকে চেনে। ভালোমানুষ, স্নেহশীল, কিন্তু তবু ছোটকাকা যা চায় সংসারে তাই শেষ পর্যন্ত হয়। কখনও ঈশ্বর, কখনও শয়তান এই মানুষটাকে শানু খুব ভালো করে চেনে, আবার আদৌ চেনেও না। শানু তাই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ বলে—তুমি যা চাও তাই তো হয় ছোটকাকা।

—তাই হবে।

শানু শ্বাস ফেলে বলে—আমি প্রতিবাদ করছি না।

—আমিও অবিহিত কিছু করছি না।

—কালিম্পঙে আমার যাওয়াটা তুমি বন্ধ করতে চাও কেন?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। বললেন—বুঝে দেখো।

—আমি খারাপ কিছু করছি না।

—তবে ময়নার আশ্রয় চেয়েছ কেন? সেখানে আমি তো যাই। আমার চোখ এড়াবে কীকরে?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন শান্ত গলায়ে বলেন—তুমি ভেবেছিলে তোমার ছোটকাকা যখন ময়নার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক রেখেছে তখন নিজের দুর্বলতাবশত তোমার যে-কোনও ভাগিয়ে আনা মেয়েকেও সহ্য করবে?

শানু চুপ।

—বলো, তাই ভেবেছিলে?

—না।

—তবে ময়নার কাছে তাকে রাখতে চেয়েছিলে কোন সাহসে?

—আমি তোমাকে যথাসময়ে বলতাম।

—না বললেও আমি জেনেছি। বলে রাখছি, তা হবে না।

—ঠিক আছে। বলে শানু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন—কী ঠিক আছে? স্পষ্ট করে বলো।

—আমি কাকিমার কাছে ওকে রাখব না।

—তাহলে কোথায় রাখবে?

অন্য কোথাও।

—রাখবেই?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন আস্তে করে বলেন—না।

শানু তাকায়, বলে—উপায় নেই ছোটকাকা।

দিগিন উত্তেজনাটা রাশ টেনে ধরেন। বলেন—তুমি কাল যাচ্ছ কিনা?

—যাচ্ছি তো বললাম।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন—কালিম্পঙ আর এম-ই-এস-এর কাজ আমি দেখব। ঠিক আছে?

শানু মৃদুস্বরে বলে—কিন্তু কালিম্পঙে তুমি যে জন্যে যাচ্ছ তা হবে না।

—কী জন্যে যাচ্ছি তা বুঝলে কী করে?

—বুঝেছি। তুমি গোলমাল করো না। লাভ হবে না।

দিগিন হাসেন, বলেন—শানু, দিগিন চ্যাটার্জি এখনও বহুকাল বাঁচবে।

শানু উত্তর দিল না।

দিগিন ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাঁর ঘরে চলে আসেন। একটু ঠান্ডা পড়েছে আজ। একটা চাদর নিয়ে বিছানায় যাওয়ার আগে বিয়ার দিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খেলেন। বাতি নিভিয়ে কাচের শার্শি দিয়ে চেয়ে রইলেন উত্তরদিকে। পাহাড় মুছে গেছে। একটা অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। কুয়াশার আবছায় ডুবে আছে শহর। নেশাটা আজ ধরছে না তেমন। তবু হাই উঠছে। ঘুম পাচ্ছে। তবু ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। সংসারে কিছুই তাঁর নয়। তবু সবই তাঁকে কেন যে ভাবতে হয়।

ঘুম চোখেই দুটো চেক লিখলেন দিগিন। একটা পুন্নির বাবার নামে। অন্যটা চ্যাটার্জি কনস্ট্রাকশনের শান্তি চ্যাটার্জির নামে। চেক দুটো সই করে রেখে দিলেন টেবিলে।

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। সেবকের করোনেশন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পায়ের নীচে, বহু নীচে তিস্তা। তিস্তার দুধারে খাড়া পাহাড় দুটোকে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে বিখ্যাত করোনেশন ব্রিজ। হঠাৎ দেখেন একটু দূরে দুই পাহাড় থেকে কে যেন একটা দোলনা দুলিয়েছে। সেই দোলনায় ঝুল খাচ্ছে একটা লোক। লোকটা চেনা। বহুকাল আগে শিলিগুড়িতে যখন প্রথম এসেছিলেন তখনকার চেনা। ফটিক লাহিড়ি। লাহিড়ি দোল খাচ্ছে, আর ভয়ে চিৎকার করছে। দিগিন হাতের রাইফেল তুলে লাহিড়িকে একবার নিশানা করে গুলি করলেন। ফসকাল, দিগিন আবার নিশানা স্থির করেন...পর পর কয়েকটা গুলি করেন দিগিন। লাগল না, কিন্তু লাহিড়ি চিৎকার করতে লাগল।

ঘুম ভেঙে যায় অস্বস্তির সঙ্গে। শুনতে পান দকলির মা চেঁচিয়ে সুর করে গাইছে, ও স্বামী তুই মর, ও স্বামী তুই মর। বোধহয় মাথাটা আবার গরম হয়েছে। সারাদিনই হাসে, কাঁদে, গায়। দকলির বাপ চিৎকার করে ধমকাল। অশান্তি। সংসার জিনিসটার রহস্য কখনও বোঝেননি দিগিন। ঘুমভাঙা চোখে তিনি একটু অবাক হয়ে হঠাৎ ফটিক লাহিড়ির কথা ভাবলেন। লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখার কোনও মানেই হয় না। বহুকাল আগে লাহিড়ি মারা গেছে, গুলি খেয়ে নয়, সাধারণত কতগুলো রোগে ভুগে। তাকে এতকাল পরে স্বপ্নে দেখার মানে কী?

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। সেই যে লাহিড়িকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভাঙল তারপর থেকে দিগিন জেগেই ছিলেন।

সকালে পুন্নি যখন চা করতে এল তখন দিগিন উত্তরমুখো ইজিচেয়ারে বসে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছেন। চোখে কটকট করে আলো লাগছে।

পায়ের পাতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢেকে দিগিন বলেন—আমার চায়ে দুধ-চিনি দিস না।

—কেন?

—লিকার খাব।

পুন্নি তাই এনে দেয়।

দিগিন চায়ের লিকারে খানিকটা হুইস্কি মিশিয়ে খেলেন। চুরুট ধরিয়ে নিলেন। শরীরটা ভালো নেই। কালিম্পঙ যেতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করছে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

কুণ্ঠিত পায়ে শানু এল। পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। মুখটা একটু শুকনো।

—ছোটকাকা।

—উঁ।

—ঘুমোচ্ছ?

—না।

—আমি জলঢাকা যাচ্ছি।

—কেন?

—তুমি বললে যে।

—ও।

—যাচ্ছি।

—যাবে? যাও।

—চেকটা লিখে রেখেছ?

—হ্যাঁ। টেবিলের ওপর আছে। নিয়ে যাও।

শানু টেবিলের কাছে যায়। চেকটা নেয়। দিগিন ক্লান্তভাবে কাঞ্চনজঙঘার দিকে চেয়ে থাকেন। চেকটা আজ ক্যাশ হয়ে যাবে, তারপর যা থাকবে তা ক্যাশ করে নেবে পুন্নির বাবা। তারপরও কিছু থাকবে। কিন্তু সে খুব বেশি কিছু নয়।

—সেভিংস অ্যাকাউন্টের চেক! এত টাকার চেক কি বিনা নোটিসে ক্যাশ করবে? শানু জিগ্যেস করে।

দিগিন বুঝতে পারেন ভুল করে সেভিংসের চেক সই করেছেন কাল, আজকাল বড় ভুলভাল হচ্ছে।

ভ্রূ কুঁচকে বললেন—করবে। ভটচাযকে একটা পার্সোনাল চিঠি লিখে দিচ্ছি। প্যাডটা দে আর কলমটা।

শানু প্যাড এনে দেয়। দিগিন খসখস করে দুলাইন লিখে দেন। শানু চলে যেতেই আবার ক্লান্তভাবে বসে থাকেন। সামনে আজ স্পষ্ট ও পরিষ্কার কাঞ্চনজঙঘা। বরফাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ, ভয়াল ভয়ঙ্কর। দিগিন চেয়েই থাকেন। কত বছর ধরে তিনি হিমালয়কে দেখেছেন আর দেখেছেন। ওই নিস্তব্ধতা কতবার তাঁকে কাছে টেনেছে। আজ যেন হিমালয় ছেড়ে তাঁর কাছেই চলে আসছে তুষার শুভ্র নিস্তব্ধতা। তিনি অপলক চেয়ে থাকেন পাহাড়ের দিকে।

কাল রাতে কেন ফটিক লাহিড়ির স্বপ্ন দেখলেন তিনি? কোনও মাথামুণ্ডু নেই। তাঁর জীবনের সঙ্গে ফটিক লাহিড়ির কোনও যোগাযোগ নেই।

পুন্নির বাপকে ডেকে পাঠালেন।

পুন্নির বাবা এসে দাঁড়াতে তেমনি ভটচাযকে দুলাইনের চিঠি সমেত চেকটা দিয়ে বললেন—এটা আজই ক্যাশ করবেন।

চেকটা দেখে পুন্নির বাবা অবাক হয়ে বলেন—এখনই কেন?

—আমি কালিম্পঙ যাচ্ছি আজই। বেশ কিছুদিন থাকব না। যদি ছেলের বাবা আসে তবে টাকাটা যে-কোনও অজুহাতে শো করবেন।

পুন্নির বাবা মাথা চুলকোন। অনিচ্ছুকভাবে বলেন—আচ্ছা।

দিগিন আর কোনও দিকে মনোযোগ দেন না। বেশ কিছুদিন থাকব না—এ কথাটা তিনি কেন বললেন? কালিম্পঙে তাঁর তো থাকার কথা নয়! পুন্নির বাবা চলে যান। দিগিন সবিস্ময়ে আবার কাঞ্চনজঙঘার নিস্তব্ধতার দিকে চেয়ে থাকেন। কালিম্পঙে যদি যেতে হয় তবে এক্ষুনি তোড়জোর করা দরকার। জিনিসপত্র গোছাতে হবে, জিপটা রেডি রাখতে হবে, দুচার জায়গায় দেখা করেও যেতে হবে। কিন্তু সেসব জরুরি কাজ পড়ে থাকে। দিগিন পুন্নিকে ডেকে এক কাপ চা করতে বলে বসে থাকেন চুপচাপ। ফটিক লাহিড়ির কথা অকারণে কেন যে মনে হচ্ছে। সরু মাদ্রাজি চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধের মধ্যে বসে থাকেন দিগিন। সামনে সোনালি সাদা কাঞ্চনজঙঘার ওপর নীল আকাশ।

টাকা—এই শব্দটাই অদ্ভুত। মানুষের ভিতরে ওই শব্দটা ঢুকে গেলেই টরেটক্কা বেজে উঠতে থাকে, মানুষ আর মানুষ থাকে না।

মোটরসাইকেলটার একটা পিন ভেঙেছে। পাঁচ দশ টাকার মামলা। অমর সিংয়ের গ্যারেজে সারাতে দিয়ে দিগিন রাস্তায় পায়চারি করেন। মিস্ত্রিটা উঠে এসে বলল—একটু সময় লাগবে। আপনি চলে যান না, সারিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিগিন লোক চেনেন। চোখের অড়াল হলেই ওদের জো। তখন পিন-এর সঙ্গে এটা ভেঙেছে, ওটা পুরোনো হয়েছে, সেটা পালটানো দরকার বলে নানারকম সারাইয়ের ফিরিস্তি দিয়ে বিল পাঠাবে বাড়িতে।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন না রে, জেলখানায় ঢালাইয়ের কাজ হবে, এক্ষুনি যাওয়া দরকার।

উত্তর দিকে চেয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকেন দিগিন, শরতের মেঘ কাটা আকাশ। বর্ষার জলে বাতাসের ধুলোকণা ধুয়ে গেছে। পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়, আর ঝকঝকে পাহাড়। সামনের পাহাড়ের রং মোষের গায়ের মতো ভূষকো, তার পিছনে রূপোর কাঞ্চনজঙঘা। ডানদিকে আরও কয়েকটা রুপোলি চূড়া, কত বছর ধরে দেখছেন, তবু পুরোনো হয় না।

উত্তর বাংলার কিছুই পুরোনো হয় না। তবু কিছু কিছু হারিয়ে গেছে, মানুষের অবিমৃষ্যকারিতায়, ন্যারোগেজের একটা লাইন ছিল কালিম্পঙের দিকে, নদীর ধার দিয়ে, পাহাড়ের কোলে কোলে যেত ছোট্ট রেলগাড়ি গেইলখোলা পর্যন্ত। দার্জিলিঙের মতো অত চড়াই-উৎরাই ছিল না, ছিল না অত রিভার্স আর লুপ। মায়াবী মাঠ প্রান্তর, ছোট ছোট কুয়াশার ঢাকা পাহাড়, নদীর খাত বেয়ে সেই ছোট ট্রেন বয়ে আনত সিকিমের কমলালেবু কাঠ, আপেল। সেই লাইন নাকি তেমন লাভজনক হচ্ছিল না, তাই রেলকোম্পানি লাইন তুলে দিল। ওই স্বপ্নের রেলগাড়ি উঠে যাওয়ার পর বহুকাল দিগিনের মন খারাপ ছিল। মংপু বা কালিম্পঙে যেতে হলে বরাবর ওই ট্রেনে চেপে যেতেন দিগিন। রিয়াত স্টেশন থেকে একটা রোপওয়ে ছিল। সেই রোপওয়ে দিয়ে মাল এবং মানুষ দুইই যেত। দিগিনও গেছেন। আর যাওয়া যেত খচ্চরের পিঠে। তখনও কালিম্পঙে মোটরগাড়ির রাস্তা হয়নি।

কিছুক্ষণ যেন রূপকথার রাজ্যে থেকে আসতেন। মাঝপথে একটা স্টেশন ছিল—নামটা মনে পড়ছে না—বহুকাল হয় উঠে গেছে। এক দুপুরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে, দিগিন চা খেতে নামলেন। তখন যৌবন বয়স। প্ল্যাটফরমের গায়ে প্রচণ্ড কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। ছোট কাঠের স্টেশন ঘর, চারদিকে খেলনা-খেলনা ভাব, ছোট লাইন, ছোট সিগন্যাল, ছোট নীচু প্ল্যাটফর্ম। তার চারদিকে সেই খেলাঘরের স্টেশন, ডানদিকে নদীর খাত, দুধারে পাহাড়ের বিশাল ঢাল। দিগিন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন, দেখলেন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে। আড়াই কি তিন বছর বয়স, গোলগাল চেহারা, শীতের চিমটিতে গালদুটো লাল, ফাটা গা। শীতের সোয়েটার গায়ে, পরনে প্যান্ট। কিন্তু দুষ্টু ছেলে সোয়েটার টেনে তুলে ফেলেছে বুকের ওপর, পেটটা উদোম। দু মুঠিতে কিছু কাঁকর আর ধুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ খেলা ভুলে চেয়ে আছে দূরের দিকে। দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাত বেয়ে গর্জে চলেছে দুরন্ত ফেনিল তিস্তা, তার দুরন্ত শব্দ গমগম করে প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে। কাজলপরা দুই চোখে শিশু হাঁ করে দেখছে, কতকাল আগেকার সেই দৃশ্য, আজও ভোলেননি দিগিন। বড় মায়া ঘনিয়ে উঠেছিল বুকে। সেই শিশুটির ধারে কাছে কেউ ছিল না। একা। খেলতে খেলতে খেলা ভুলে একা মুগ্ধ-বিস্মিত চোখে দেখছে। দিগিন হাতের কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, গাড়ির হুইশল যতক্ষণ না বাজল ততক্ষণ ভিখিরির মতো, কাঙালচোখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কোলে নেননি, আদর করেননি। কিন্তু আজও এত বছর পরেও প্রায় যখন মনে পড়ে, তখন কত আদর যে করেন। সে কত বড় হয়েছে এখন, সংসারিও হয়নি কি! কিন্তু সেসব মনে হয় না। কেবল দিগিনের মনের মধ্যে শিশুটি আজও অবিকল ওই কয়েক মুহূর্তের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, দুহাতে দুমুঠো ধুলো, আদুড় পেট, চোখ লেপটানো কাজল, আর তার চারধারে বিশাল পাহাড়, গতিময় প্রচণ্ড নদী, তার শব্দ, একা সে দাঁড়িয়ে।

চোখে কেন জল আসে! দৃশ্যটা ভাবলেই আসে, অথচ করুণ দৃশ্য তো নয়! তবে বুঝি সৌন্দর্য জিনিসটাই ওরকম, বুক ব্যথিয়ে তোলে! নাকি, শিশুটি নাড়া দেয় অক্ষম পিতৃত্বকে? কী হয়, কেন জানে! একটা কিছু হয়। নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পান নাকি। পৃথিবীর অঢেল সম্পদ নিজের জন্যে খেলার ছলে আহরণ করতে করতে তিনি নিজেও কি মাঝে মাঝে খেলা ভুলে চেয়ে থাকেন না কাঞ্চনজঙঘার দিকে!

সেই লাইন নেই, গাড়ি চলে না, স্টেশন কবে উঠে গেছে। তবু রয়ে গেছে একটি বীজ! কবে যেন অতীতের বাতাসে খসে পড়েছিল দিগিনের হৃদয়ে। আজ বয়সের বর্ষা পেয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে, দৃশ্যটা ভোলেননি দিগিন।

দিগিনের পাশ দিয়ে একটা জিপগাড়ি চলে যেতে যেতে থামল। দিগিন মুখ তুলে দেখলেন, তাঁরই জিপ, শানুই এখন এটা ব্যবহার করে। ড্রাইভার রমণীমোহন গাড়িটা সাইড করিয়ে রাখল। জিপের পিছন থেকে কপিল নেমে এল।

কালো বেঁটে এবং মজবুত চেহারা কপিলের, চোখে ধূর্তামী, মুখে একটু নির্বিকার শয়তানি ভাব, বহুকাল কপিল দিগিনের কারবারে আছে।

কপিল দিগিনকে জানে। দিগিনও কপিলকে জানেন। এই জানাজানির ব্যাপারটা বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। আজও শেষ হয়নি।

শিলিগুড়ির তল্লাটে কপিলের নাম কীর্তনিয়া বলে। ভালোই গায়। বিভোরতা আছে, ভক্তিভাব আছে। অবরে সবরে গাঁ গঞ্জ থানা থেকে তার ডাক আসে। ছোট মাপে সেও নামজাদা লোক। নিজের সেই মর্যাদা সম্পর্কে সে সচেতনও! মুখখানা সবসময়েই গম্ভীর হাসিহীন। কথা-টথা কমই বলে। একমাত্র দিগিন ছাড়া সে আর কারও বড় বাধ্য নয়। শানু ওকে সামলাতে পারে না, প্রায়ই দিগিনকে এসে বলে—তোমার কপিলকে নিয়ে আর পারা যায় না, ওকে তাড়াও।

দিগিন তাড়ান না।

সে আজকের কথা তো নয়। তখন সাহেবদের আমল। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে পুরোনো আমলের ব্রডগেজের দার্জিলিং মেল এসে থামত সকালবেলায়। সাহেবদের বড় প্রিয় ছিল দার্জিলিং। ফার্স্ট ক্লাস বোঝাই লাল রাঙা সাহেবরা নামত কুকুর, মেমসাহেব আর নধর বাচ্চাদের নিয়ে। সেরাবজির জাল-ঢাকা চমৎকার রেস্টুরেন্টে বসে ব্রেকফাস্ট খেত। তারপর দার্জিলিঙের ছোট গাড়িতে উঠত। টাউন স্টেশন তখন ঝকঝক করত। এখনকার মতো পাঁজরা সার হায়-হতভাগা চেহারা ছিল না। কপিল ছিল সেই সময়কার টি-আই সাহেবের সেলুন বেয়ারা। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টি-আই সাহেব লোক খারাপ ছিল না, কিন্তু কপিলটা ছিল হাড় হারামজাদা। সরাবজি থেকে সাহেবের নাম করে দু-বোতল বিলিতি হুইস্কি হাতিয়েছিল, তাই চাকরি যায়। চাকরি যাওয়ার পর কিছুকাল বড় কষ্টে গেছে। সেই কষ্টের দিনে একটামাত্র মেয়ে মল্লিকাকে রেখে কপিলের বউ মরল। মল্লিকা তখন দু-আড়াই বছরের, মা মরা, একলা। কপিল সেই মেয়ে রেখে কোথাও যেতে পারত না। পায়খানা পেচ্ছাপের সময়েও মেয়েকে কোলে নিয়ে গিয়ে বসত। আবার বিয়ে করবে তেমন মুরোদ নেই, নিজেরই তখন প্রায় ভিক্ষে-সিক্ষে করে চলছে।

তখন দিগিনের বাড়ি আসত। ঘরদোর সাফ-সুতরো করত, পয়সাকড়ি হাতাত, ফাঁক পেলে চুরি করে দিগিনের বোতল ফাঁক করত। এখন দিগিনের বাড়িতে যেখানে বড়দাদা পাকা বাড়ি তুলেছে সেখানে কপিল একদা চমৎকার একটা বাগান করেছিল, মল্লিকাফুল যে আসলে বেলফুল তা কপিলই শিখিয়েছিল দিগিনকে। কপিলের জন্য দিগিনের মায়াদয়া তেমন ছিল না, ছিল ওই মেয়েটার জন্য। ট্যাপাটোপা দেখতে ছিল মেয়েটা, বাপ দিগিনের বাগান করত, মেয়েটা বাপের কোপানো জমির মাটির ঢেলা ছোট দুই হাতে চৌরস করত দিনভর রোদে বসে। বাপ ঘর ঝাঁট দিচ্ছে তো সেও একটা ন্যাতা বুলিয়ে কাঠের মেঝে মুছতে লাগত নিজের মতো করে। বদলে বাপ-বেটিতে পেটভরে ভাত খেত দুপুরে, রাতের

ভাত গামছায় বেঁধে নিয়ে যেত। তখন মাঝে মাঝে রাঁধতও কপিল, মুরগির ঝোল, ডিমের ডালনা, খিচুড়ি।

মেয়েটাই ছিল কপিলের জীবনসর্বস্ব। মেয়ে কাঁধে সর্বত্র চলে যেত সে। কাছছাড়া করত না। গ্রামে গঞ্জে মেয়ে সঙ্গে করেই কীর্তন করে বেড়াত। বাপের গায়ের গন্ধে, শরীরের ছায়ায় মেয়েটা পাঁচ বছর পর্যন্ত বেড়ে উঠল। তারপর ধরল ম্যালেরিয়ায়। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার এক ধাক্কায় নিভে গেল মেয়েটা। মেয়েহারা বাপ সক্কালবেলায় কারও কাছে না গিয়ে খবরটা দিতে এল দিগিনকে। ডাকেনি, শব্দ করেনি। দিগিন তখনও ওঠেননি ঘুম থেকে, শেষরাতে এসে ঠায় দাঁড়িয়েছিল টংগি ঘরের বারান্দায়। শিলিগুড়ির সেই দুর্দান্ত শীতে গায়ে গেঞ্জির ওপর কেবলমাত্র চ্যাটার্জি সাহেবের বুড়ি পিসি কীর্তিন শুনে মরার আগে যে নামাবলিটা দান করে গিয়েছিলেন কপিলকে, সেইটে জড়ানো। দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। বাক্যহারা, বোধবুদ্ধি নেই, কেবল ঢোঁক গিলছে আর থুথু ফেলছে। পাড়াপ্রতিবেশীরা আর কীর্তনের দলের বন্ধুরা মেয়েটাকে নিয়ে গেছে শ্মশানে। এই সময়টায় সারা দুনিয়ার মধ্যে কপিল কেবল দিগিনকে মনে রেখে তারই কাছে চলে এসেছিল।

আজও কপিলের দিকে তাকালে সেই কপিলকে দেখতে পান দিগিন। শানু তাড়াতে বলে। তাড়ানো কি সোজা? সেই মেয়েহারা বাপটিকে আজও দিগিন মনের কপাট খুললেই দেখতে পান যে।

দিগিন জানেন, কপিল লোক ভালো নয়। চুরি-চামারি তো আছেই, চরিত্রের অন্য দোষও আছে। মেয়ে মরার পর কপিলকে নিজের কারবারে রাখলেন দিগিন। নানারকম কনস্ট্রাকশনের কাজে বহু হাজার টাকার মালপত্র এখানে সেখানে পড়ে থাকে। সেসব পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদার রাখতে হয়। সে আমলে নেপালিরাই এই কাজ করে বেড়াত। দিগিনেরও কয়েকজন নেপালি চৌকিদার ছিল। তাদের দলে কপিলকে ভিড়িয়ে নিলেন, কাঙালকে শাকের খেত দেখিয়ে দেওয়া হল। কৃতজ্ঞতাবোধ কিছু কমই ছিল কপিলের। রড, সিমেন্ট কাঠ, রং, সে কিছু কম চুরি করেনি। তবু দিগিনের প্রতি তার একরকম আনুগত্য আর ভালোবাসা আছে। জিনিস না বেচলে তার চলত না। ধরলে টপ করে স্বীকার করত।

নেপালি আর ভুটিয়ার মিশ্রণে দো-আঁশলা একটা লোক একবার একটা চায়ের দোকান করেছিল মহানন্দা ব্রিজের উত্তরে। খুবই রহস্যময় দোকান। লোকটার এক ছুকরি বউ ছিল, নাম ছিপকি। দু-গালে অজস্র ব্রণ, রোগাটে চেহারা। অনাহার এবং অর্ধাহারের গভীর চিহ্ন ছিল চোখের কোলে, গালে। রহস্যময় সেই দোকানের সামনের দিকে সেই দো-আঁশলা লোকটা রুটি, চা, বিস্কুট এবং ডিম বেচত। আর পিছনের খুপরিতে বিক্রি হত ছিপকি, আর চোলাই। সঙ্গে মেটে চচ্চড়ি কি তেলেভাজা। একটু নীচু শ্রেণির মানুষেরাই

ছিল সেই দোকানের খদ্দের। সন্ধেবেলা বেশ ভিড় হত। ছিপকি তার স্বামীর সঙ্গে সামনের দোকান সামলাত, চোখে কাজল, চুল খোঁপা করে বাঁধা, হাতে কাচের চুড়ি, রঙিন সস্তা শাড়ি পরনে, খুব হাসত আর চোখ হানত। ভিতরের ঘর থেকে মাতালদের [illegible] গলার নানান শব্দ আসত। ছিপকির স্বামী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে নোংরা পরদার আড়ালে চোলাইয়ের খদ্দেরদের পরিচর্যা করে আসত। লোকটা ছিল আধবুড়ো, খুব গম্ভীর, দার্শনিকের মতো মস্ত কপাল ছিল তার। এক সময়ে মিলিটারির ল্যান্স নায়ক ছিল বলে শোনা যায়। মিলিটারির মতোই আবেগহীন স্বভাব ছিল তার। পরনে চাপা পাজামা, গায়ে কোমরের বহু ভাঁজের কাপড়ের বন্ধনীতে গোঁজ থাকত কুকরি। নেপালিরা কোমরে যে চওড়া করে কাপড়ের বন্ধনী বাঁধে তার একটা কারণ পেটটাকে গরম রাখা। পাহাড়ি অঞ্চলে পেটে ঠান্ডা লেগে এক রকমের হিল-ডায়েরিয়া হয়, সহজে সারে না। দিগিনও পাহাড়ে গেলে কোমরে পেট ঢাকা কাপড় বাঁধতেন নেপালিদের দেখাদেখি।

মাতাল আর চা-পিপাসুদের সকলেই ছিপকিকে চাইত। কিন্তু সকলের পকেটে তো পয়সা নেই। যাদের আছে তারা একটু বেশি রাতের দিকে ছিপকির স্বামীর সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক করে নিত। পিছনের খুপরিতে চলে যেত ছিপকিকে নিয়ে। সামনের দোকানটায় লোকটা নির্বিকার বসে থাকত, তার সামনে উনুনে চায়ের জল ফুটছে, একটা ঘেয়ো, কুকুর বসে আছে দোরগোড়ায়। সামনে অন্ধকার, নদীর জল ছুঁয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এই রকমই ছিল লোকটা।

কপিল সেখান থেকে গরমি রোগ নিয়ে আসে। দিগিন তাকে দুবার চিকিৎসা করে ভালো করলেন। অবশ্য চিকিৎসার খুব সুবিধে হয়ে গেছে আজকাল। সিফিলিসের অমোঘ ওষুধ পেনিসিলিনে বাজার ছাওয়া। কিন্তু দিগিন সেটুকু করে ক্ষান্ত হননি। মহানন্দা পুলের কাছে ওই দোকানটা যেতে আসতে চোখে পড়ত, ভিড় দেখতেন, ছিপকিকেও দু'চারবার লক্ষ করেছেন, কপিলকে সেখানে প্রায়ই দেখা যেত।

একদিন শীতকালে শালবাড়ি থেকে ফেরার পথে জিপ থামালেন। হাড় ভেঙে যাচ্ছে উত্তুরে বাতাসে। অন্তত চার পাঁচ পেগ নিট হুইস্কি ছিল পেটে! মেজাজটা দুরন্ত ছিল। সোজা দোকানে ঢুকে জিগ্যেস করলেন...কী পাওয়া যায়?

সে রাতে ছিপকির বোধহয় খদ্দের জোটেনি। সাজগোজ করে একটা ভুটিয়া ফুলহাতা মেয়েলি সোয়েটার পরে ঘোমটায় কান মুখ ঢেকে আগুন পোহাচ্ছিল। লোকটা একটা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে রাখছে। দু'চার জন চায়ের খদ্দের বসে হাঁ করে ছিপকিকে দেখছিল, বিনা পয়সায় বিনা বাধায় যতটা দেখা যায়। ইয়ার্কি-টিয়ার্কিও বোধহয় করছিল, কারণ দিগিন যখন ঢোকেন তখন ছিপকি একজনের দিকে চেয়ে হাসছিল। দিগিন দেখলেন মেয়েটির হাসি বড় চমৎকার। মুখটা পালটে যায়। কিশোরীর মতো সরলহৃদয়া হয়ে ওঠে। দিগিনকে অনেকে চেনে, দোকানে ঢোকামাত্র খদ্দেরদের কয়েকজন পয়সা দিয়ে পালিয়ে

গেল। এক আধজন যারা বসে ছিল তারাও গরম চা হুস হাস করে মেরে দিয়ে উঠে গেলে ছিপকির চোখে একটু বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, সামনে জিপ দাঁড়িয়ে, দিগিনের মতো সুপুরুষ চেহারার মানুষ, লোকটার চারদিকে যেন টাকা আলো দিচ্ছে, এ মানুষ এখানে কেন?

ছিপকির স্বামীর সেসব নেই। দিগিন জিগ্যেস করলেন দ্বিতীয়বার—কী পাওয়া যায় এখানে?

লোকটা উনুন থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকার গলায় বলে—চা, রুটি, ডিম।

—আর কিছু না?

লোকটা দিগিনের দিকে তাকাল না। মাথা নাড়ল। না।

দিগেনের পেটে হুইস্কিটা তখন কাজ করছে, হাতের দস্তানা দুটো খুলে রেখে বেঞ্চে বসে বললেন—মাংস পাওয়া যায় না? মেয়েমানুষের মাংস?

লোকটা ভয় খেয়েছিল ঠিকই। জিপটা দাঁড়িয়ে, দিগিনের চেহারাটাও তার ভালো ঠেকছিল না। তবু বিনয়হীন গলায় বলে—ওসব এখানে হয় না।

দিগিন ছিপকির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার জিগ্যেস করলেন—দর কত?

ছিপকি একটু দিশাহারা হয়ে গেল। তার জীবনে এত বড় খদ্দের সে কখনও পায়নি। তাই স্বামীর দিকে চেয়ে নেপালিতে বলল—লোকটা কী বলছে শুনছ?

দিগিন দস্তানাটা টেবিলের ওপর ফটাস করে একবার আছড়ে বললেন—কুড়ি টাকা?

তখন টাকার দাম যথেষ্ট। অত টাকা কেউ দেয় না ছিপকিকে। মেয়েটা দিগিনের দিকে একবার চেয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নীচু স্বরে কী বলল।

দিগিন গরম খেয়ে বললেন—পঞ্চাশ টাকা!

বলেই কোটের ভিতর পকেট থেকে অন্তত সাত-আটশো টাকার একটা গোছা বের করে প্রকাশ্যে পাঁচখানা দশটাকার নোট গুণে বের করে নিলেন। লোকটা আড়চোখে দেখল, ছিপকি তার কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট গলায় কী যেন বলে। এত টাকা দেখে সে পাগল হয়ে গেছে। ছোটলোক, দুর্গন্ধযুক্ত, মাতাল এবং নীচ স্বভাবের লোকদের সঙ্গ করে সে ক্লান্ত। সেই মুহূর্তেই সে যেন সেই ক্লান্তিটা টের পেল। নতুন লোকটা তার কাছে শীতরাতে যেন স্বর্গ থেকে খসে-পড়া দেবদূত।

লোকটা উঠে গিয়ে ভিতরের ঘরের নোংরা পরদাটা কেবল তুলে বোবা হয়ে রইল। এক হাতে পরদা ধরা, অন্য হাতটা বাড়ানো। সেই বাড়ানো হাতে দিগিন টাকার নোটগুলো গুঁজে দিলেন।

ভিতরের খুপরিতে লণ্ঠন জ্বালা আলোয় ছিপকির দিকে তাকিয়ে তার প্রথম যে কথাটা মনে হল, এ হচ্ছে কপিলের মেয়েছেলে। চোর, হাভাতে ছোটলোক কপিল।

দিগিন বিছানায় বসেছিলেন, গা ঘেঁষে ছিপকি, কাঁধে হাত। মুখে অদ্ভুত উত্তেজিত হাসি! সে জানে তার বাজার ভালো। কিন্তু এতটা ভালো সে কল্পনা করেনি। সে মুগ্ধ চোখে চেয়ে

দিগিনের মুখের ওপরেই শ্বাস ফেলল। নিজের গালে আঙুল বুলিয়ে বলল—এসব কিন্তু গরমি নয়। ব্রণ। আমি খারাপ লোকের সঙ্গে দোস্তি করি না।

দিগিন ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চুরুট টানছিলেন। মেয়েটা ঘাড়ের ওপর হামলে পড়ে আছে। পঞ্চাশ টাকায় কেনা মেয়েছেলে, যা খুশি করতে পারেন। তবু এই মেয়েটা কপিলের এঁটো, কিংবা কপিলই এই মেয়েটার উচ্ছিষ্ট?

মেয়েটাকে এক ঝটকায় টেনে সামনে দাঁড় করালেন দিগিন। লণ্ঠনের আলোয় চেয়ে রইলেন ওর দিকে। শরীরে সীমাবদ্ধ মেয়েমানুষ। নদীর মতো, সবাই স্নান করে যায়। গহীন চুলের মস্ত খোঁপা, রোগা চেহারা, সর্বশরীরে চামড়ার ওপর খসখসে ভাব। গলার চামড়ার ভাঁজে ময়লা বা পাউডার জমে আছে।

নেপালিতে বললেন—ও লোকটা তোর কে হয়?

মেয়েটা লাজুক হেসে বলল—সঙ্গে থাকে।

—স্বামী?

ছিপকি মুখ ভ্যাঙাল।

—দেখি তোর হাত! বলে দিগিন ওর হাত টেনে নিবিষ্টমনে ওর হস্তরেখা দেখলেন। ভ্রূ কুঁচকে কপালে ভাঁজ ফেলে অনেকক্ষণ ধরে দেখে-টেখে বললেন—দূর! তুই এখানে পড়ে আছিস কেন? তোর ভাগ্য তো খুব ভালো। এখন বয়স কত?

মেয়েটা হিসেব জানে না। অবাক হয়ে বলল—কত জানি না!

দিগিন বললেন—বাইশ-তেইশ হবে। আর এক বছরের মধ্যে তোর ভাগ্য ফিরে যাবে।

সকলেরই এই দুর্বলতা থাকে, ভাগ্য বিষয়ক। মেয়েটা মাতাল দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, মাতালরা কত কাণ্ড করে। তবু হাতটা চেপে ধরে বলল—কী হবে?

—তোর বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, সব লেখা আছে। এ লোকটার সঙ্গে পড়ে আছিস কেন? পালা।

এই বলে দিগিন উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—তোর সঙ্গে সময় কাটাতে এসেছিলাম, কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম রে। তুই একদিন খুব বড় হবি তো, তাই ভয় লাগল।

দিগিন বিদায় নেওয়ার আগে আরও পঞ্চাশটা টাকা ছিপকির হাতে গোপনে দিয়ে বললেন —তোর স্বামী তোর কষ্টের টাকা সব মেরে দেয় জানি। এটা রাখ। জানি তুই যখন বড় হবি তখন এসব দশবিশ পঞ্চাশ টাকা ভিখিরিকে দিয়ে দিবি। ভালো চাস তো কালই পালিয়ে যা।

—কোথায় যাব?

—কোথায় যাবি!

দিগিন একটু ভাববার ভান করেন। শেষে আবার দশটা টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলেন—শালবাড়িতে চ্যাটার্জির কাঠগোলায় চলে যাস। শনিবার মঙ্গলবার থাকি।

কলকাতায় পাঠিয়ে দেব। ফিলমে নামবি? আমার দোস্ত আছে।

ছিপকির চোখমুখ কীরকম যে উজ্জ্বল হয়েছিল ফিলমের নামে! অনেকখানি ঘাড় হেলাল, আর ছুটে এসে বুকে পড়ে একটু আদর করেছিল দিগিনকে।

মেয়েটা বোধহয় পালিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছিল। কয়েকদিন পর তার শরীরটা এক সকালে পাওয়া গেল মহানন্দার বিশুষ্ক নদীর খাতে। একটু একটু জল চুঁইয়ে বসে যাচ্ছে নালার মতো শীতের পাহাড়ে নদী। তারই জল ছুঁয়ে একবুক রক্ত ঢেলেছে ছিপকি। কুকরিতে পেটটা হাঁ হয়ে আছে।

.লাকটা একমাস পরে ধরা পড়ল মাদারিহাটে। দোকানটা তার আগেই উঠে গেছে।

তখন এরকম মহানন্দার পাড়ে হামেশা লাশ পাওয়া যেত। চাটাইয়ে বেঁধে ধাঙড়রা দিয়ে আসত হাসপাতাল মর্গে। দু'চার ঘা ছুরি চালিয়ে ডাক্তাররা রিপোর্ট দিত। ধাঙড়রা ফের চাটাই বাঁধা মড়া নিয়ে হয় পোড়াত, নয়তো পুঁততো। ছিপকির জন্য এখনও একটা কষ্ট হয় দিগিনের। পালাতে গেলেই যে খুন হবে, সেটা ভেবে দেখেননি দিগিন। চালের ভুল। তা হোক, তবু দোকানটা ওঠানো গেছে। কপিল কিছুদিন মনমরা হয়ে ছিল।

এখন কপিলকে দেখে একটু ভ্রূ কোঁচকালেন দিগিন! রূঢ় মুখভাব করে একটু চেয়ে রইলেন। কর্মচারীদের সঙ্গে তার ব্যবহার একটু কর্কশ। মুখভাবে তিনি কাউকেই প্রশ্রয় দেন না।

কপিল কখনও দিগিনের চোখে তাকায় না। নানা পাপ জমে আছে ভিতরে। তাকাতে পারে না। একবার মুখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কাল রাতে শাটারিংয়ের কাঠ কারা খুলে নিয়ে গেছে। আজ ঢালাই হওয়ার কথা।

দিগিন অবাক হন। বলেন—জেলখানার ঢালাইয়ের?

কপিল মাথা নাড়ল—কয়েকটা শালখুঁটিও উপড়ে নিয়েছে। লোহার রডও।

দিগিন একটা বিরক্তিকর শব্দ করে বললেন—চৌকিদার কে ছিল?

—কেউ ছিল না। শানুবাবু তিনদিন আগে আমাকে জেলখানার ক্যাম্প থেকে সরিয়ে চালসার রোড কনস্ট্রাকশনের কাছে পাঠিয়ে দেন। বলেছিলেন, জেলখানার কাজ, মালপত্র পুলিশেরাই দেখতে পারবে। তবে দাজুকে শানুবাবু দেখতে বলেছিল, সে কাল থেকে মাল খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।

দিগিন শানুর বুদ্ধি দেখে অবাক হন। চৌকিদার হিসেবে কপিল ভালো নয় ঠিকই, মাল কিছু সরাবেই। কিন্তু কপিল কখনও কাজ নষ্ট করবে না। তাকে সরিয়ে দাজুর ভরসায় এত মালপত্র ফেলে রাখতে কে ওকে বলেছিল? দাজু কোনওকালে সন্ধের পর স্বাভাবিক থাকে না।

দিগিন বললেন—চালসায় তোর কী কাজ ছিল?

—কিছু না। একটা কালভার্ট হয়েছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে প্রথম লরিটা পাশ করতেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ডেকে শানুবাবুকে গরম খেয়েছেন। সেইটে ফের করে দিতে হচ্ছে, নইলে কেস করবে গভর্নমেন্ট। সেই কাজ সত্যেনবাবু দেখছেন, আমি গিয়ে ভেরেন্ডা ভেজে এলাম।

ভিতরে ভিতরে আগুন হয়ে যায় দিগিন। সোপস্টোন মায়ামৃগের মতো মিলিয়ে গেছে, ঠিকাদারিও যাবে। চ্যাটার্জি কনস্ট্রাকশনের যে সুনাম আছে তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে শানু। একটা কালভার্ট করতে গিয়েও বেশি লাভ খাবে, প্রথম লরিটাও নিরাপদে পেরোতে

পারবে না! আবার তৈরি করতে ডবল গচ্চা যাচ্ছে। শানু আজকাল কিছু খুলে বলে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যবসাটার মধ্যে উইয়ের মতো গর্ত খুঁড়ে ঝুরঝুর করে দিচ্ছে।

দিগিন মিস্তিরিকে ডেকে বললেন—কতক্ষণ লাগাবি?

—আপনি কাজ থাকলে চলে যান না। পিন আনতে লোক পাঠিয়েছি, ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দেবোখ'ন।

দিগিন চিন্তিতভবে জিপে উঠলেন, রমণীমোহন গাড়ি ছাড়ল, মুখটা ঘুরিয়ে নিল জেলখানার দিকে। পিছনের সিটে বসা কপিল একটু কেশে বলল—ঢালাইয়ের দিন মিস্তিরিদের ভরপেট মিষ্টি খাওয়ানোর নিয়ম, তা সেটা শানুবাবু তুলে দিয়েছেন। বললে বলেন—রোজ ঢালাইয়ের কাজ হবে আর রোজ মিষ্টি খাওয়াতে হবে এ নিয়ম চলবে না।

দিগিন গম্ভীর গলায় বললেন—হুঁ।

চুপ করে রইলেন। শানুর ওপর কেউ খুশি নয়। সবাই যেন পাকেপ্রকারে, নানা আকারে ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, শানুকে সরিয়ে দিয়ে এবার দিগিন হাল ধরুন। দিগিনের আজকাল আর ইচ্ছে করে না।

নতুন জেলখানা পুরোনো বাজার ছাড়িয়ে, জলপাইগুড়ির বাস যেখানে দাঁড়ায় তারও খানিকটা পশ্চিমে! গাড়িটা জেলখানায় ঢুকতেই দূর দেখে দেখেন, শানু কালো চশমা চোখে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে নেপাল থেকে চোরাপথে আনানো বিদেশি স্ট্রেচ প্যান্ট, গায়ে একটা মার্কিন ব্যানলনের গেঞ্জি। নীল প্যান্ট, আর হালকা হলুদ গেঞ্জিতে ভালো দেখাচ্ছে। বেশ লম্বাটে, সাহেবি ধরনের চেহারা। কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিল, তখন একবার সিনেমাতেও নেমেছিল। সেই থেকে শিলিগুড়িতে ওকে সবাই গুরু বলে ডাকে।

জিপ থামতেই শানু দৌড়ে এল।

—কাকা, জলঢাকা যাওয়া হয়নি। ঝামেলা পাকিয়ে গেল।

দিগিন তাকালেন। বললেন—কত টাকার মাল গেছে?

—তিন চার হাজার টাকার তো বটেই। ছোট কাজ ছিল, বেশি মার্জিন থাকত না।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—শাটারিংয়ের কাঠ আনতে লোক পাটিয়েছ?

শানু একটু যেন অবাক হয়ে বলে—না, এখনি আবার শাটারিংয়ের কাঠ কিনব কেন? যতদূর মনে হচ্ছে পুলিশের লোকই সরিয়েছে। কিছু সি-আর-পি আছে, বড্ড পাজি। দেখি যদি বের করতে পারি।

দিগিন বিরক্ত হয়ে বলেন—সে তুমি দেখোগে। তা বলে ঢালাইয়ের কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না। কাঠ কিনতে লোক পাঠাও, আর গোডাউনে কিছু রড আছে, আনিয়ে নাও।

শানু তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল—সময় তো আছে, এত তাড়ার কিছু নেই। আর সাতদিন দেরি করলেও কিছু হবে না। তাছাড়া মিস্তিরিরা আজই শাটারিং করে ঢালাই করতে কি পারবে?

দিগিন গম্ভীর হয়ে বললেন—পারতেই হবে। মিস্তিরিদের ডাকো। আমি কথা বলে যাব, তুমি একটি জিপ ভাড়া করে জলঢাকা চলে যাও আজই।

হেডমিস্তিরি দিগিনের হাতের লোক। সে এসে দিগিন কিছু বলার আগেই বলল—আজই ঢালাই করে দেব। আপনি যান।

জিপ থেকে দিগিন আর নামলেন না, জিপ ছাড়তে ইঙ্গিত করলেন রমণীমোহনকে। একবার চেয়ে দেখলেন, শানুর মুখ খুব গম্ভীর, প্রেস্টিজে লেগেছে বোধহয়। কর্মচারীদের সামনে দিগিন ওকে পাত্তা দিলেন না তেমন। তার ওপর জলঢাকা যেতে হচ্ছে।

রমণীমোহন জিপ ছাড়ল। কপিল দৌড়ে এল জিপের সঙ্গে, কী যেন বলবার জন্যে মুখটা উন্মুখ, দিগিন চোখের ইশারা করলেন, কপিল জিপের পিছনে উঠে পড়ল।

বাসার দিকেই মুখ ঘোরালো জিপ। দিগিন চুপ করে বসেছিলেন। হঠাৎ বললেন—কপিল।

—আজ্ঞে।

—শালখুঁটিগুলো কাকে বেচেছিস?

একটু চুপ করে থেকে কপিল বলল—অনাদিবাবুর গোলায়।

—কখন?

—ভোর রাতে। একটা সাপ্লাইয়ের লরি এসেছিল, তাদের ভজিয়ে মাল তুলে দিয়েছি।

—কততে বেচলি?

বিনা দ্বিধায় এবং সম্পূর্ণ অকপটে কপিল বলল—শানুবাবুর কথা ধরবেন না। তিনচার হাজার টাকার মাল ছিল না। মেরেকেটে হাজারখানেকের মতো হবে। আমি তিনশো পেয়েছি।

দিগিন একটু হাসলেন। কপিলকে তিনি চেনেন, এমন প্রতিশোধস্পৃহা খুব কম লোকেরই থাকে, প্রতিশোধ নেয়ও খুব কূটকৌশলে।

পিছন থেকে কপিলের হাতটা এগিয়ে এল। তাতে একশো টাকার তিনটে নোট, ভাঁজকরা, দিগিন নিয়ে বুক পকেটে রাখলেন। রমণীমোহনকে বললেন—সেবক রোড ধরে চল।

বিনা উত্তরে নিউমার্কেটের রাস্তা ধরে সেবক রোডে গাড়ি উঠিয়ে আনল রমণীমোহন, পিছনে কপিল চুপ করে বসে আছে। সে লজ্জিতও নয়, দুঃখিতও নয়, নির্বিকার। মল্লিকা মরে যাওয়ার পর থেকেই ওরকম। ওর ভালোবাসার, স্নেহের কোনও কেন্দ্রবিন্দু নেই। এখনও অবসর সময়ে কীর্তন করে। কীর্তন করতে করতে যদি কৃষ্ণভক্তি আসে কখনও, তো ভালো, না এলে একদিন বুড়ো হয়ে এমনিই মরে যাবে। কেউ কাঁদার নেই।

টাকা—এই কথাটা আবার মনে পড়ল। টাকা।

টাউন স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন মদন চৌধুরি। তেল চুকচুকে শরীরখানি। মুখভাবে আলহাদে ভরা, পান খেতেন, বিলোতেন। স্টেশনমাস্টার হিসেবে খারাপ ছিলেন না, মানুষটাও ভালো। তার দুই মেয়ে ছিল, নমিতা আর প্রণতি। প্রণতি ছোট, দীঘল কালো চেহারা। কিন্তু কালো রঙে অমন রূপবতী সে আমলে দেখেননি দিগিন। ভারী লোভ হত। দিগিনের বয়স তখন কিছু না। ওদের বাড়িতে যেতেন টেতেন। প্রণতি অবশ্য খুব একটা সামনে আসত না। তবু পাশের ঘরে তার পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ শুনতেন। পরদার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে দেখা যেত। মদন চৌধুরিরা বারেন্দ্রশ্রেণি, আর সে সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। প্রায়ই বলতেন—ভালো দুটো বারেন্দ্রশ্রেণির পাত্র খুঁজবেন তো চাটুজ্জে। এসব পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সালের কথা। তখনও ময়নাকে আনেননি দিগিন।

একবার কলকাতা যাবেন। চৌধুরি এসে বললেন—আমার বাড়ি ওরাও যাবে। আমি বলি কি আপনার সঙ্গে চলে যাক।

কে কে যাবে তা জিগ্যেস করলেন না দিগিন। কিন্তু উচাটন হয়ে রইলেন। প্রণতি যাবে!

যাওয়ার দিন স্টেশনে গিয়ে দেখেন, প্লেস করা গাড়ির একটা ইন্টারক্লাস কামরায় চৌধুরির দুই মেয়ে, বউ, আর ছেলে বসে আছে। বুকখানা নড়ে উঠল দিগিনের। ভিড়ের গাড়ি নয়, তখন অফ সিজিন চলছে। ফাঁকা কামরাটায় তারা মাত্র ক-জন। সে যে বয়ঃসন্ধির আশা-নিরাশার কী গভীর উদ্বেগের দিন গেছে সব! নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হয়, কখনও মনে হয় সবচেয়ে আহাম্মক বোকা। তখন গেরস্ত ঘরের মেয়েরা সহজলভ্যা ছিল না। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে বুকের পাটা লাগত।

প্রণতি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে রইল তো রইলই। চৌধুরির বউ আর ছেলে দিগিনকে খুব খাতির করতে থাকে। চৌধুরি গিন্নি টিফিন ক্যারিয়ার খুলে অনেক খাবার খাওয়াল, পান খাওয়াল। বাড়ি ঘরের খোঁজখবর নিল। দিগিন আড়চোখে প্রণতিকে দেখে নিয়ে কিছু বাড়িয়েই বললেন। বয়সের মেয়ের সামনে দুচারটে গুলচাল না ঝাড়ে কে!

রাতের গাড়ি। ছাড়তে না ছাড়তেই ঢুলুনি পেয়ে গেল সবার। খাওয়ার পর একে একে সবাই শুয়ে পড়ছে। দিগিন বাঙ্কে শুয়ে একটা বাসা প্রবাসী খুলে পড়বার চেষ্টা করছেন। আসলে সেটা ভান। প্রথমত দিগিন বই-টই পড়তে ভালোবাসেন না। দ্বিতীয়ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়া যাচ্ছিলও না।

চৌধুরিগিন্নি আর ছেলে একটা সিটে দুধারে মাথা রেখে শুলেন। অন্যটায় নমিতা আর প্রণতি। নমিতা শুল, কিন্তু প্রণতি ঠায় বসে রইল।

তার মা ডাকে—ও প্রণতি শুবি না!

সে মাথা নাড়ে। শোবে না।

—কেন?

—ঘুম আসছে না। বিরক্ত হয়ে প্রণতি বলে।

জামদানি শাড়িপরা নিশ্চল মূর্তি বসেই রইল। একবারও মুখ ফেরাল না ভিতরবাগে। সবাই যখন খাচ্ছিল তখনও ওই ভাবে ছিল। খায়নি! তার নাকি খিদে নেই। দিগিন বুঝতে পারছিলেন, তিনি কামরায় আছেন বলেই মেয়েটার ওই কাঠ-কাঠ ভাব। তবে কি মেয়েটা তাকে অপছন্দ করছে? দিগিন কি বিশ্রী দেখতে? মেয়েটা কি রোগা মানুষ পছন্দ করে? নাকি, দিগিনের গুলচালগুলো সব ধরে ফেলেছে মেয়েটা। বরাবরই কি দিগিনের প্রতি ঘৃণা পুষে এসেছে মনে মনে?

খুবই তুচ্ছ কিন্তু জরুরি প্রশ্ন সব।

অন্য বাঙ্কে শেষ সময়ে এক বুড়ো পশ্চিমা উঠে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাকের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে সকলেই গভীর বা হালকা ঘুমে ঢলে পড়েছিল, চৌধুরি গিন্নি ঘুমগলায় একবার বললেন—জানালাটা বন্ধ করে বোস, ঠান্ডা লাগবে।

—না। আমার মাথা ধরেছে।

গলার হার-টার যদি কেউ টেনে নেয়! দেখিস।

—উঃ, তুমি ঘুমোও না!

—কিছু তো খেলি না। বলে চৌধুরিগিন্নি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

দিগিনের মাথা তখন আগুন। ওই রোগা একরত্তি মেয়েটার অত দেমাক কীসের? না হয় দিগিন তেমন লেখাপড়া জানেন না, না হয় একটু জংলা চেহারা, তাই কি? পুরুষ, আস্ত একটা জলজ্যান্ত পুরুষ কাছে থাকলে একবার ফিরে তাকাতে নেই?

ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন দিগিন। না। অবস্থার কোনও পরিবর্তন নাই। শুধুমাত্র শরতের ঠান্ডা থেকে গলা বাঁচানোর জন্য আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে গলায়। আর, বোধহয় একটু হেলে বসেছে জানালার কাঠে ভর দিয়ে।

উপেক্ষা কোনওদিনই সহ্য করতে পারেন না দিগিন। অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করলেন। কামরার আলোগুলি ধূ ধূ করে জ্বলছিল। দিগিন হঠাৎ ঝুঁকে বললেন—আলোগুলো কি নিভিয়ে দেব? সবাই ঘুমোচ্ছে তো, আলো থাকলে অসুবিধে।

মেয়েটা শুনল কি না বোঝা গেল না। বসেই রইল।

—শুনছেন! দিগিন ডাকেন।

মেয়েটা একটু নড়ল, বা কাঁপল।

ক্ষীণ গলায় উত্তর এল—দিন।

আপনার অসুবিধে হবে না তো?

মেয়েটা ফেরানো মাথাটাই নাড়ল একটু। ঘাড় ফেরাল না।

দিগিন শব্দসাড়া করে বাথরুম সেরে এসে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কী অদ্ভুত দৃশ্য তখন? সেদিন পূর্ণিমা ছিল বোধহয়। কী জ্যোৎস্নার আলো এসে ভরে দিল কামরা। আর সেই জ্যোৎস্নায় মাখা কালো পরির মতো, রূপসী জিনের মতো জানালায় বসে আছে প্রণতি।

ঘুম কি হয় দিগিনের। কামস্পৃহা নয়। নারীপ্রেমও নয়, সে এক অলৌকিকের অনুভূতি। জীবনের সব চাওয়া যেন ওই মূর্তিটায় গিয়ে জমাট বেঁধেছে। কী জ্যোৎস্না! আর কী প্রস্তরীভূত সেই দেহখানি।

সজাগ দিগিন আর চোখ ফেরাতে পারেন না। পাশ ফিরে চেয়ে রইলেন।

অনেক অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটার বুঝি মনে হল যে এবার সবাই ঘুমিয়েছে! চকিতে একবার চাইল ভিতরের দিকে। সবার আগে তাকাল দিগিনের দিকে। সে দিগিনের মুখ দেখতে পাবে না জেনেও দিগিন চোখ বুজে নিথর হয়ে ঘুমের ভান করলেন।

মেয়েটা উঠল। বাথরুমের দিকে গেল পথ হাতড়ে।

খুটখাট একটু শব্দ হল বুঝি। বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কী সতর্ক মায়েদের মন। ওই যে একটু খুটখাট শব্দ হল তাইতেই চৌধুরিগিন্নি উঠে বসলেন। প্রণতির শূন্য আসন দেখলেন। প্রণতির শূন্য আসন দেখলেন। বাথরুমের দরজার ঘষা কাচে আলো দেখলেন। সন্দেহ হল। চকিতে একবার মুখ উঁচু করে দেখে নিলেন, দিগিন তার জায়গায় আছেন কিনা।

দিগিন মনে মনে হাসেন আজও। কত কূট হয় মানুষের মন! কত সন্দেহ আসে!

বাথরুম থেকে এসে আর কাঠ হয়ে থাকল না প্রণতি। সহজ হয়ে বসল। চুলটা ঠিক করল খানিক, বেণীর শেষ মাথায় রিবনের ফাঁস খুলে গিয়েছিল, সেটা বাঁধল। জলের বোতল থেকে জল খেল। এবং বারংবার তাকাল দিগিনের অন্ধকার বাঙ্কের দিকে। দিগিন মনে মনে হাসলেন।

খুব মাঝরাত তখন। প্রণতি অবশেষে শুয়েছে। দিগিনের ঘুম এল না। একবারে প্রথম রাতে না ঘুমোলে তাঁর ঘুম কেটে যায়। শুয়ে থেকে কাঁহাতক আর সময় কাটাবেন। সে আমলের ক্যাভেন্ডার সিগারেট একটা বের করে ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানছেন। সব জানালা বন্ধ। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কেবল দরজায় কাচ ফেলা বলে একটা ঘষা আলো দেখা যাচ্ছে! চাঁদের মুখে মেঘ জমেছে নিশ্চয়। ট্রেনটা থেমে আছে কোথাও সিগন্যাল না পেয়ে। বাইরে জলা-জমি থেকে ব্যাঙের ডাক আসছে। তখন পৃথিবীতে মানুষ কম ছিল, নির্জনতা ছিল। ট্রেন যেত বিজনের ভিতর দিয়ে। অনেকদূর পর্যন্ত লোকবসতি ছিল না উত্তরবাংলায়। ভুতুড়ে মাঠে ঘাঠে অলৌকিক জ্যোৎস্না খেলা করত। জিন ছিল, পরি ছিল।

সেই খুব আবছা অন্ধকার থেকে একটা অশরীরী স্বর এল—ক-টা বাজে?

দিগিন প্রথমটায় চমকে উঠলেন। এত ক্ষীণ স্বর যে প্রথমটায় বুঝতে পারলেন না ভুল শুনেছেন কিনা। তারপর বুঝলেন প্রণতি।

খুব সন্তর্পণে সিগারেটের আলোয় ঘড়ি দেখে বললেন—একটা।

তারপর সব চুপ।

খুব সাহস করে দিগিন আস্তে বাতাসে কথা ক'টা ছাড়লেন—তুমি ঘুমোওনি।

—না। ঘুম আসছে না। যেন কথা নয়, বাতাসের শব্দ—এত ক্ষীণ আর নরম গলা।

—আমিও না। দিগিন ঝুঁকে বললেন। তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে বুকের কাঁপুনিটা সামলালেন। বললেন—তুমি কিছু খেলে না।

—আমার খিদে পায় না।

—কেন?

—এমনিই।

এত আস্তে কথা হচ্ছিল যে পরস্পরও শোনবার কথা নয়। সে যেন দূর থেকে কানে-কানে বলা। তবু কি আশ্চর্য তাঁরা শুনতে পাচ্ছিলেন। ভালোবাসা বুঝি এমনিই। ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়ে দেয়!

—কলকাতায় ক-দিন থাকবে?

—বেশিদিন না।

—বেড়াতে যাচ্ছ?

—হুঁ। মামার বাড়ি।

—আমি সাতদিন পরে ফিরব। তোমরা?

—একমাস।

আর কি তেমন কোনও কথা হয়েছিল? ঠিকঠাক আজ আর মনে পড়ে না। তবে হলেও এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ কিছু নয়।

সকালে দিগিন ঘুমহীন রাত শেষে উঠলেন। আবার জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে প্রণতি। ফিরে তাকায় না।

বড্ড জ্বালিয়েছিল সেবার মেয়েটা। বুকে এমন একটা ঢেউ তুলে দিয়েছিল। দিগিনকে প্রায় গহীন সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঢেউ। তখনও প্রণতি কিশোরী মাত্র।

তখন প্রেম এটুকুই মাত্র ছিল। তবুও এটুকুও কম নয়।

কপাল। সেবার কলকাতা গিয়ে একমাসের নাম করে বহুকাল থেকে গেল প্রণতিরা। শিলিগুড়িতে ভালো ইস্কুল ছিল না, কলেজ তখনও হয়নি। মামারা বড়লোক। তারা ভাগনে-ভাগনীদের সেখানেই রেখে দিল। বহুকাল ওরা আর আসেনি। চৌধুরিগিন্নি অবশ্য এসে থাকতেন প্রায়ই।

প্রেমটা কেটে যাচ্ছিল কি! কে জানে। ঘটনাটা কেন আজও অত হুবহু মনে আছে?

কয়েক বছর বাদে ভারত সরকার আর পূর্বপাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। সেই তিপান্ন চুয়ান্ন সালের কথা, চুক্তি হল ভারতের মালপত্র নিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি

পূর্বপাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আসবে, তাতে দূরত্ব করবে, সময় বাঁচবে। তখন এ অঞ্চলে ব্রডগেজ লাইন উঠে গিয়ে মিটার গেজ হয়ে গেছে। তাই ঠিক হল পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি হলদিবাড়ি পর্যন্ত আসবে। সেখানে ট্র্যানশিপমেন্ট হয়ে মিটারগেজে উঠে চালান হবে উত্তরবাংলায় আর আসামে। এই চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলদিবাড়ি স্টেশনের দাম বেড়ে গেল রাতারাতি, সবাই হলদিবাড়িতে পোস্টিং চায়। ট্র্যানশিপমেন্ট মানেই টাকা, আর হলদিবাড়িতে যে বিপুল মাল এ গাড়ি থেকে ও গাড়িতে উঠবে তাতে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা খেলা করবে। স্টেশন-মাস্টাররা ট্র্যানশিপমেন্টের জন্য রেলওয়ের কাছ থেকে চুক্তিমতো টাকা পায়, আর কুলির সরদারদের সঙ্গে তারা আর একরকম চুক্তি করে নেয়। এই দুই চুক্তির মধ্যে ফারাক থাকে অনেক। ফলে ভালো স্টেশনের মাস্টারদের ঘরে লক্ষ্মী ঝাঁপি উপুড় করে দেন।

হলদিবাড়ির খবর হতেই চারদিকে স্টেশনমাস্টাররা আনচান করে উঠলেন। দৌড়োদৌড়ি শুরু হল, অফিসারদের বাংলোয় ভেটের ছড়াছড়ি হতে লাগল। শিলিগুড়ির এ-টি-এস সাহেব তখন বাঙালি, সজ্জন লোক, ঘুষটুষ খেতেন না। মদন চৌধুরি তাঁর মাকে মা ডেকে, সপরিবারে নেমন্তন্ন খাইয়ে এমন আত্মীয়তা গড়ে তোলেন যে সাহেব মদন চৌধুরিকে পোস্টিং দিয়ে দিলেন।

একমাসে মদন চৌধুরির চেহারা এবং স্বভাব পালটে গেল, একটা ওপেন ডেলিভারি নিতে হলদিবাড়ি গিয়েছিলেন দিগিন। দেখেন চৌধুরির মুখে চোখে একটা উদভ্রান্ত ভাব, চেহারার সেই স্নিগ্ধতা নেই, দিনরাত স্টেশনে পড়ে থাকেন। চোখদুটো চকচকে, সবসময়ে চতুর্দিকে ঘুরছে। দিগিনকে দেখে বললেন—চাটুজ্জে, আপনার তো অনেক জানা-শুনো, জলপাইগুড়ির কমিশনার সাহেবকে বলে আমাকে একটা রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিন।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন—রিভলভার দিয়ে কী হবে?

চৌধুরি তেমনি উদভ্রান্তভাবে অসংলগ্ন কথা বলেন—এত টাকা? কখন কি হয়!

চৌধুরির বাড়ির চেহারাও, পালটেছে, বড় ছেলে বাদে আর ছেলেমেয়েরা স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকে। বেশিরভাগ জিনিসপত্রও কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন চৌধুরি, স্ত্রীও গেছেন। সেখানে চৌধুরির বাড়ি হচ্ছে, দুটো বাড়ি একটা বউয়ের নামে, অন্যটা বিধবা বোনের নামে। রেলের কোয়ার্টারে দুটো ঘর। ভিতরের ঘরটায় সবসময়ে তালাবন্ধ, বাইরের ঘরটায় দুটো ক্যাম্প খাটে বাপ ব্যাটা শোয়। ঝি চাকর কাউকে রাখেনি। ছেলেই রান্না করে।

দিগিন বুঝলেন কাঁচা টাকার স্রোতে চৌধুরি ডুবছেন।

দিগিন অবশ্য চৌধুরিকে রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিয়েছিলেন। সেই রিভলভার শিয়রে নিয়ে শুতেন আর দুঃস্বপ্ন দেখতেন চৌধুরি। মানুষটার জন্য তখন কষ্ট

হত। হাভাতের হঠাৎ বিপুল টাকা হলে তার বড় একটা সুখ হয় না, অসুখ উপস্থিত হয়।

চৌধুরিরও হল, পোস্টিং পাওয়ার বছরখানেকের মধ্যে প্রথম স্ট্রোক। কিন্তু চৌধুরি সিক-লিভ নেবেন না, ওই অবস্থাতেই কাজ করার জন্য ব্যস্ত। বহু বলে কয়ে তাকে হাসপাতালে দেওয়া হল। কলকাতা থেকে কেউ এল না, এলে নাকি বাড়ির কাজে ব্যাঘাত হবে।

সে যাত্রা বেঁচে গেলেন চৌধুরি। রাশি রাশি টাকা কলকাতায় পাঠান, বড় ছেলে আনাগোনা করে, স্টেশনের অন্যান্য স্টাফ খুব অসন্তুষ্ট, তারা নাকি ভাগ পায় না। চৌধুরি এখন টাকা চিনেছেন, টাকা ছাড়া মুখে কথা নেই, কিন্তু চেহারাটায় একটা রুগ্ন খড়ি ওঠা ভাব, চোখে ক্ষয়রোগীর চোখের মতো অসুস্থ উজ্জ্বলতা।

এ সময়ে খবর এল, বোনের ছেলেরা বাড়ি দখল করেছে, তারা ভাড়াটে বসাতে দেবে না। বলছে—আমাদের মায়ের নামে বাড়ি, আমাদের ইচ্ছেমতো হবে।

চৌধুরি ছুটে গেলেন কলকাতায়, ভাগনেদের হাতে পায়ে ধরলেন। বোন বললেন—দাদা, আমি কী করব! ছেলেরা আমার কথা শোনে না।

ভগ্নমনোরথ চৌধুরি ফিরে এলেন একা। মাথায় টাক পড়ে গেছে, কদিনে চোখের কোলে কালি, অসুস্থ-অস্বাভাবিক চেহারা।

রিভলভারটা সেইসময়েই প্রথম কাজে লাগল। রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে এসেছিল, মোটে আর মাসখানেক আছে। তারপরই পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে গিয়ে কলকাতায় হাজির হবেন, সেখানে বাড়িঘর, ছেলে মেয়ে বউ, সংসার। একটা মাস কাটিয়ে যেতে পারলেই হত! কিন্তু ওই বাড়ির শোকটাই সামলাতে পারলেন না। রিভলভারটা কপালে ঠেকিয়ে ঘোড়া টেনে দিলেন এক নিশুতরাতে।

দিগিন হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন আপনমনে। ঘটনাটা মনে পড়লেই দুঃখের বদলে তার প্রবল হাসি পায়। চৌধুরি বেশ ছিল শিলিগুড়ির মাস্টার হয়ে, কিছু অভাব ছিল না, তারপর হলদিবাড়ি গিয়ে খুব বড়লোক হল, সেও ভালোই, কিন্তু সেই বড়লোকির একটু লোকসান, বিধবা বোনের নামের একটা বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেল, সেটুকু সহ্য করতে পারল না। বাড়িটা গেছে তো যাক না, তবু তো তোমার অনেক থাকছে। তুমি তো শিলিগুড়ির মাস্টার থাকা অবস্থায় ফিরে যাচ্ছ না। তবু মানুষের ওইরকম হয়। গরিব থেকে বড়লোক হলে ফের একটু গরিব হওয়া তার সহ্য হয় না।

জুয়াড়ি নির্মল গাঙ্গুলি তিনতাস খেলেই বড়লোক হয়েছিল। তার একটা পেটেন্ট কথা ছিল—এমনি লস সহ্য হয় ভাই। কিন্তু লভ্যাংশের লস সহ্য হয় না। গাঙ্গুলি যেদিন হারত সেদিন স্পোর্টসম্যানের মতো হারত। কিন্তু যেদিন প্রথমে জিতে পরে হারত সেদিন বড় মনমরা থাকত। বলত—ঈশ্বর আমাদের সহ্যশক্তি বড় কম দিয়েছেন। ক্ষতি সহ্য হয়, কিন্তু লাভের ক্ষতি সহ্য হয় না। ছেলেবেলায় একটা হাবা ছেলেকে সবাই খেপাতাম। সে বড়

পয়সা ভালোবাসত। সবাই তাকে বলত পয়সা নিবি? অমনি সে হাত পাতে। আমি বলতাম। সে হাত পাতত। পয়সা দিয়ে ফের নিয়ে নিতাম, আবার দিতাম, ফের নিয়ে নিতাম। শেষবারটা মজা করার জন্য পয়সাটা নিয়ে নিতাম, দিতাম না। সে খেপে গিয়ে বলে বেড়াত—নেম্মলটা খচ্চড়। দে-লে নে-লে, দে-লে নে-লে, ফের দে-লে, ফের নে-লে। নে-লে তো নে-লে, আর দে-লে না।

জীবনটা ওইরকম। মাঝে মাঝে সব নিয়ে নেয়। আর কিছু দেয় না।

সেবক স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে জিপ উঠে এল কালিম্পঙের পাহাড়ি রাস্তায়। দূরে দুই পাহাড়ের কোলে করোনেশন ব্রিজের আর্চ দেখা যাচ্ছে। নীচে তিস্তা। শরতের নদীটা এখনও বর্ষার ঢল নিয়ে নেমে যাচ্ছে। সাদা, সফেন জল, সেই জলের প্রবল শব্দ। তিস্তার দুধারে বালির বিছানা। বাঁ-পাশের তীর ধরে ছিল রেললাইন। ছোট্ট ছোট্ট সব স্টেশন। নিরিবিলি, নিঃঝুম। এখন আর কিছু নেই। স্টেশনের ঘরগুলো পর্যন্ত না। দিগিন ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

বেখেয়ালে গরমজামা আনেননি। হঠাৎ চলে এসেছেন খেয়াল খুশিমতো। রমণীমোহন আর কপিলেরও গরম জামা নেই। শরৎকাল। পাহাড়ে এ সময়ে শীত পড়ে যায়। কিন্তু রমণীমোহন বা কপিল তার জন্য দিগিনকে কিছু বলবে না। দিগিনকে তারা জানে। কখনও তাঁর কোনও কাজে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত ঢোকায়নি।

এখন আর কিছু করার নেই। দিগিন তবু বললেন—কপিল, গরমজামা আনার কথা খেয়াল হয়নি রে। তোদের কষ্ট হবে।

রমণীমোহন স্থিরচোখে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—কালিম্পঙ যাবেন তো?

—তাই তো যাচ্ছি।

—দুপুর দুপুর কাজ সারতে পারলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে না। রোদ থাকবে ততক্ষণ। বেলা পড়ে গেলে ঠান্ডা লাগবে।

কাজ! কাজের কথা খেয়াল ছিল না। মনেও পড়ল না। চারধারে চেনা পাহাড়, বনস্থলী, নদী, কত পুরোনো স্মৃতির ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সম্মোহিত দিগিন জানেন, এই হল কাজ। সেই পুরোনো রেললাইন খুঁজতে খুঁজতে, সেই পুরোনো স্টেশনের চিহ্ন ধরে ধরে আবার অতীতে ফিরে যাওয়া, যেখানে আজও এক অলীক স্টেশনে দুমুঠো ধুলো হাতে করে মুগ্ধ এক শিশু দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু কাজ নেই।

—ডাকলেন—কপিল।

—আজ্ঞে।

—ঠিকাদারের চৌকিদারি তোর কাজ নয়। তোর আসল কাজ কি কপিল?

কপিল চুপ করে থাকে।

দিগিন বললেন—তোকে একটা বাগান বানাতে দেব। শাল-বাড়িতে জমিটা পড়ে আছে, গেছিস তো!

কপিল হুঁ দিল।

—ওখানে একটা বাগান বানাবি, পলাশ লাগাবি, শিউলি, বেলফুল...

—মল্লিকা। কপিল বাধা দিয়ে বলল—দিগিন ভুলে গিয়েছিলেন, বেলফুলই মল্লিকাফুল।

দিগিন একবার ফিরে দেখলেন, কপিলের চোখদুটো চকচক করছে। মুখখানা লোভাতুর। বাগান! বাগান! এ পৃথিবীতে একমনে একখানা বাগান বানানোর মতো গভীর কাজ আর কি আছে? সে আর কিছু চায় না। একখানা বাগানমাত্র।

দিগিন অনেকক্ষণ কপিলের মুখের দিকে পিছু ফিরে চেয়ে দেখেন। কপিলের মুখটা পালটে যাচ্ছে। চতুর, ধূর্ত মুখখানা কতগুলো লাবণ্যের রেখায় ডুবে গেল। খুব তৃপ্তি পেলেন দিগিন। গাঢ়স্বরে বললেন—পারবি না?

—খুব।

—কাল চলে যাস শালবাড়িতে। কাল থেকেই লেগে যা।

আবেগে কপিল বুঝি কথা বলতে পারল না। চোখটা মুছল। মল্লিকা! মেয়েটা। জিপগাড়ি না হলে এখন সে দিগিনের পায়ে মুখ ঘষত। পলাশ লাগাবে, শিউলি লাগাবে, আর সেইসঙ্গে গ্রীষ্মের মল্লিকাফুল, সাদা ঘ্রাণে ভরা। মেয়েটার কথা মনে পড়বে। এই মাটিতেই তো মিশে আছে মেয়েটা।

গাড়ি চড়াই ভাঙছে। পাহাড়ি গরুর একটা পাল রাস্তা পার হয়ে নেমে যাচ্ছে বনভূমিতে। তাদের গলার ঘণ্টার শব্দ। রোদ লেগে বনভূমি মথিত হয়, গভীর উদ্ভিদজগতের নেশারু গন্ধ আসে। এক পাহাড়ের ঢালের ছায়ায় গভীর শীতল রাস্তা। ওপরে আকাশ আর তিস্তার ওপারে রোদ ঝলসাচ্ছে। টিপ টিপ করে চুঁইয়ে নামছে একটা জলধারা, পাহাড়ের গা বেয়ে, তার ওপর একটুখানি কালভার্ট, জিপটা গুমগুম শব্দ করে কালভার্ট পার হয়ে গেল। শীত বাড়ছে, শার্টের বোতামটা এঁটে নিলেন, বুকে হাত জড়ো করে বসলেন দিগিন।

কালিম্পঙের দিকে বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। বেশি দেরি নেই, জাগ্রত চোখে চেয়ে আছেন দিগিন। বহুকাল আসেন না। যা দেখছেন তাই যেন ভিতরটাকে নেড়ে দিচ্ছে। ঘুলিয়ে উঠছে সব। স্মৃতি আর বর্তমান হয়ে যাচ্ছে একাকার।

নড়ে বসলেন দিগিন। হাই উঠছে। ওই দেখা যাচ্ছে কালিম্পঙের ঢাল। ধানখেত। ধান চাষ বা আবাদ পাহাড়ি জায়গায় বড় একটা দেখা যায় না। কালিম্পঙ ব্যতিক্রম। এইজন্যই দিগিনের কালিম্পঙের প্রতি কিছু পক্ষপাত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চিত্রভানুর সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নামলেন। বাগানে সেই শ্বেতপাথরের কেদারা। আর একটা শ্বেতপাথরের ট্যাবলেটে কালিম্পঙ নিয়ে লেখা

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটার ওপর দুপুরের রোদ পড়েছে। সেই যখন রবিবাবু আসতেন তখন এসে তাঁকে এইখানে দেখে গেছেন দিগিন। ওই শ্বেতপাথরের কেদারায় গদি পেতে বসতেন। আদিগন্ত প্রকৃতির বিস্তার থাকত সামনে। প্রতিমা দেবীকে দেখেছেন। ওই কেদারার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখনও। কী সুন্দর, আর করুণ মুখশ্রী?

সেই রবীন্দ্রনাথের সেন্টেনারি হয়ে গেল! সময় কত তাড়াতাড়ি যায়। বাগানে কেউ নেই। চমৎকার বাড়িটায় একটু বয়সের দাগ পড়েছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি লম্বা দাড়িওলা জোব্বা পরা মূর্তি ধীর গম্ভীর রাজার মতো বেরিয়ে আসবেন।

দিগিন জিপে উঠলেন এসে। ডাকলেন—রমণী!

—আজ্ঞে।

—শানু এখানে কোথায় আসে রে?

রমণীমোহন চুপ করে থাকে।

—সেখানে চল। বলে দিগিন হেলান দিয়ে বসে চোখ বোজেন। রমণীমোহন স্টার্টারে চাপ দেয়। গাড়ি কেঁপে ওঠে।

হঠাৎ দিগিনের খেয়াল হয়, বলেন—তোরা কিছু খাসনি?

রমণী মাথা চুলকে বলে—আপনারও হয়নি।

দিগিন হাসলেন। বললেন—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নাকি রে? খাওয়ার কথা মনে থাকে না! চল।

ভালো হোটেলে তিনজন বয়স্যের মতো সমান সমানে বসে খেলেন। দিগিন সামান্যই খান। কিন্তু রমণী আর কপিল দু-পাশে পাহাড় পর্বত গিলে ফেলতে লাগল। এই খিদেটা চেপে ছিল ওরা এতক্ষণ। বেলা একটা বাজতে চলল। ওরা কিছু বলতে জানে না। চিরকালই ওদের ওইরকম সব সম্পর্ক দিগিনের সঙ্গে। কর্মচারী, তবু কিছু বেশি। চাকর, তবু যেন অন্যরকম। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা তলিয়ে দেখেননি দিগিন। গোলমেলে! একটা জিনিস জানেন ওরা তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে।

ফের জিপে উঠে রমণীমোহন দিগিনের দিকে তাকিয়ে বলে—সেইখানে তো?

কোথায় যাওয়ার কথা তা খেয়াল ছিল না দিগিনের। বড় রাস্তার ধারেই একটা নানারি। খুব বড় বড় পাইন আর দেবদারু গাছের ছায়ায় টালির চালওলা বাড়ি। বহুকাল আগে এক ফরাসি বুড়ি নানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখনকার এ-টি-এস সাহেব পেরেরা। বুড়ির কিছু মাল চুরি গিয়েছিল কলকাতা থেকে আসবার সময়ে ট্রেনে। বুড়ি রিপোর্ট করে। সাধারণত ট্রেন থেকে যাত্রীদের মাল চুরি গেলে রেল ক্ষতিপূরণ দেয় না। কিন্তু বুড়ি বিদেশি বলে, আর নান বলেই বোধহয় দিয়েছিল। পেরেরা সাহেবের দেহরক্ষী হয়ে রাইফেল হাতে দিগিন এসেছিলেন। সেই ফরাসি সন্ন্যাসিনীর অনাবিল হাসি আজও বুকে

লেগে আছে, তিরিশ বছর পরেও। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে করা কেক আর কফি খাইয়েছিল বুড়ি। অনেক আশীর্বাদ করেছিল।

অন্যমনস্কতা থেকে দিগিন ফিরে এসে বলেন—কোথায়?

—সেই মিসট্রেসের বাড়ি! রমণী বলে।

—কোন মিসট্রেস?

—যেখানে শানুবাবু আসেন।

—ওঃ। দিগিন বুঝতে পেরে বলেন—মেয়েটা মিসট্রেস বুঝি?

—না। মেয়েটা মিসট্রেসের মেয়ে। বিধবা।

দিগিন বিস্বাদ মুখে বলেন—শানু প্রায়ই আসে।

—সপ্তাহে দু-তিনবার।

—বিধবা। তাহলে বয়স কত? বেশি?

—না। কম।

—বাচ্চা-কাচ্চা নেই?

—না। বালবিধবা।

—এ যুগে বালবিধবা হয় নাকি?

—এ হয়েছে। নিখিল ব্যানার্জির মেয়ে।

—নিখিল ব্যানার্জি! সে কে?

—আপনার চেনা ছিল। মনীষা দিদিমণির বর। দিদিমণিকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে যে।

দিগিনের মনে পড়ল। উত্তরবাংলার প্রায় সব মানুষকেই চেনেন দিগিন। নিখিলকেও চিনলেন। খুব সুপুরুষ, খুব শিক্ষিত মানুষটা। কিন্তু চাকরি হয় জোটেনি, নয়তো করত না। মনীষা নামে মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছিল। কলকাতা থেকে দুজন পালিয়ে আসে এই জঙ্গুলে দেশে। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে দুজন হাবাগোবা হয়ে বসে আছে, জায়গা অচেনা, প্রেম পাংচার হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে, দায়দায়িত্বের চাপে চাকা বসে যাচ্ছে মাটিতে। নির্মল গাঙ্গুলি তার বাড়িতে নিয়ে তুলল সে অবস্থায়। পরের বাড়িতে নবদম্পতির প্রথম ফুলশয্যা হল। সেইখানে থাকতে থাকতেই দুজনের রোজ খিটিমিটি বাঁধত। গাঙ্গুলি অতিষ্ঠ হয়ে এসে বলত—মাইরি, কাদের জোটালুম।

প্রেম করে পালানো সে যুগে বিরল ঘটনা ছিল। গাঙ্গুলি এ ব্যাপারটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ওদের আশ্রয় দেয়। কিন্তু ওদের বনিবনার অভাব দেখে বিগড়ে যায়। মনীষা নাকি খুব বড়লোকের মেয়ে, আর নিখিল বেকার, মধ্যবিত্ত। সে-সময়ে সেই দুঃসাহসী আর দুঃসাহসিনীকে দেখার জন্য প্রায়ই দিগিন গেছেন ও বাড়ি। খুব স্মার্ট দম্পতি। দিব্যি কথাটথা বলত, কলকাত্তাই গুলচালও দিত। মাস দুই পর মনীষা চাকরি পেয়ে গেল কালিম্পঙে। বেকার স্বামীকে ঘাড়ে করে চলে গেল।

সুন্দর চেহারা ছাড়া, আর একটা ইসলামিক হিস্ট্রির এম-এ ডিগ্রি ছাড়া নিখিলের আর কিছু ছিল না। চাকরির উৎসাহ ছিল খুবই কম। বসে খেত। বউ চাকরি করত। বছরসাতেক ধরে ওদের দুজনের ঝগড়া হল। প্রেম কতদূর হয়েছিল কে জানে? তবে কালিম্পঙ থেকে যারা আসত তাদের কাছে মনীষা আর নিখিলের ঝগড়ার খবরই শোনা যেত। তারপর নিখিল এক আসামি মেয়ের সঙ্গে গৌহাটি পালিয়ে গেল। সেখানে নাকি সুখেই আছে তারা। নতুন শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে। নিখিলের মেয়ের খবর অবশ্য রাখতেন না দিগিন।

—শানু এখানে জুটল কী করে?

রমণীমোহন একটা ঢেঁকুর তুলে বলল—সাইটের কাছেই বাড়ি। ও বাড়িতে জলটল খেতে যেতেন। তারপরই চেনা জানা।

—কে কাকে জাল জানিস?

রমণীমোহন একবার আড়চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলে—শানুবাবুর দোষ নেই। মেয়েটা দেখতে ভালো। নিখিল ব্যানার্জির মতো।

গাড়িটাকে একটা পাক খাইয়ে টিলার মাঝবরাবর তুলে দাঁড় করাল রমণী। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল—এই বাড়ি।

দিগিন দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে নামলেন।

জিপ-এর শব্দ শুনে কেউ উঁকি দিয়েছিল বোধহয় জানালা দিয়ে। দিগিন মাথা নীচু করে ঢালু পথটা বেয়ে উঠছেন। এখনও লম্বাটে, টান চেহারা, দূর থেকে দেখলে শানু বলেও ভুল হতে পারে। মাথায় একটা টুপি ছিল, চোখে কালো চশমা।

বাড়ির কাছে যেতে না যেতেই দরজা খুলে চমৎকার একখানা মুখ উঁকি দিল। মুখে একটা হাসি একখানা আয়ুহীন প্রজাপতির মতো থিরথির করে কাঁপছে।

দিগিন মুখ তুলতেই সেই প্রজাপতিটা মরে গেল ঝুপ করে। মেয়েটা মুখ নামিয়ে সরে দাঁড়াল একটু।

দিগিন বললেন—মনীষা আছে?

মেয়েটা মাথা নাড়ল—নেই। এ সময়ে স্কুলে থাকে।

—আমি শান্তি চ্যাটার্জির কাকা।

মেয়েটার মুখে এক অসম্ভব আতঙ্কের ছায়া খেলা করে গেল। এমনভাবে তাকাল যেন দিগিন যমপুরী থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন। ব্যাধভীতা হরিণীর মতো পলকে সরে গেল ভিতরে।

দিগিন ক্লান্ত বোধ করলেন। বহুদিনকার পুরোনো বকেয়া ক্লান্তির বোঝা। শ্লথ পায়ে দরজার চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালেন।

ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বলল—আপনি বসুন। মা এখুনি আসবেন।

দিগিন পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ছোট্ট বসার ঘর, কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, ওপরে টিন, বসবার ঘরে ছোট্ট ছোট্ট সোফাসেট, বইয়ের র্যাক, মেঝেয় সিকিমের কার্পেট পাতা! ফুলদানিতে ফুল। কেউ নেই।

দিগিন বসলেন, হাই তুললেন, কী করবেন তা এখনও ভালো করে জানেন না। একটা চুরুট ধরিয়ে ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে দিলেন সামনে। মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে রইলেন খানিক। চোখ বুজেই টের পেলেন, তাকে কেউ দেখছে। অত্যন্ত মনোযোগে, অতি সাবধানে দেখছে।

চোখ না খুলেই বললেন—এসো মা, তোমার সঙ্গেই দুটো কথা বলি।

পরদার আড়ালে ভিতরের ঘর থেকে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ হল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর আস্তে একখানা সুন্দর ফরসা হাত পরদাটা সরাল। রঙিন ছাপা শাড়ি পরা, ভীতসন্ত্রস্ত মেয়েটি ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দিগিন চুরুটের ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন। অল্প একটু কাশি এল। সামলে নিয়ে বললেন—নামটি কী?

—অধরা ব্যানার্জি।

দিগিন ভ্রূ কোঁচকালেন। চুরুটের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার কি স্বগোত্রে বিয়ে হয়েছিল?

আবার একটা অস্ফুট কাতর শব্দ, ভয়ের। ধরা পড়ার। মেয়েটি তার সুন্দর মুখটি নত করে দু'ধারে দুবার ফেরাল। অর্থাৎ না।

—তোমার স্বামীর পদবি কী ছিল? দিগিন জিগ্যেস করলেন।

—ভট্টাচার্য। ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল।

—তাহলে ব্যানার্জি বললে কেন? ইচ্ছে করলেই কি পদবি বদলানো যায়?

বলে চেয়ে রইলেন দিগিন। বয়স কম। বোধহয় বাইশের বেশি কিছুতেই নয়। সাদা ধপধপে সিঁথি। কুমারীর মতো।

—কত বয়সে বিয়ে হয়েছিল?

—ষোলো। তেমনি ক্ষীণ উত্তর।

—এখন কত বয়স?

—একুশ।

—বিয়ের কদিন পর স্বামী মারা যায়?

কাঠ-কাঠ প্রশ্ন, পুরুষ গলায়। মেয়েটা একবার করুণাভিক্ষু চোখ দুটো তুলে তাকাল। পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল—ছ'মাস।

—কী হয়েছিল?

মেয়েটি বাঁ-হাতটি তুলে চোখ মুছল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আসাম অ্যাট্রোসাইটিসের সময়ে খুন হয়, তেজপুরে।

—ও! বলে দিগিন চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন—তার কথা তোমার মনে পড়ে?

মেয়েটা উত্তর দিল না। চুপ করে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার একটা কাঠে ঠেস দিয়ে, যেন কোর্টে দাঁড়িয়ে জেরার উত্তর দিচ্ছে।

—মনে পড়ে না? দিগিন প্রায় ধমকালেন।

মেয়েটি তার সজল চোখ দুখানা তুলে তাকাল। কী মায়া থাকে চোখে! কী বিপুল ফাঁদ। দিগিনের বরফ গলতে শুরু করে।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে—না।

—এত অল্পবয়সে তোমার বিয়ে দিল কে? কেনই বা!

—আমার দাদামশাই। আমার বাবা চলে যাওয়ার পর...বলে মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থামল। পারিবারিক ব্যাপার এ লোকটাকে বলা ঠিক হবে কি না তা বুঝতে পারছিল না বোধহয়।

দিগিন বললেন—আমি তোমার মা বাবার সব ঘটনা জানি। বলো।

—বাবা চলে যাওয়ার পর দাদামশাই আমাদের ভার নেন। অবশ্য আমরা তাঁর বাড়িতে যাইনি। কিন্তু তাঁর কথামতো আমরা চলতাম। তিনি আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। গৌরীদান করারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মা দেননি। তবু অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলে বললেন—যাও, কফি করে আনো।

মেয়েটা চলে গেল। পরিপূর্ণ গৃহকর্তার মতো বসে রইলেন দিগিন। শীতটা বাড়ছে। ফেরার সময় একটু মাল টেনে নেবেন। এসব রাতে আজকাল খুব জ্যোৎস্না ফুটছে। বহুকাল জঙ্গলে পাহাড়ে জ্যোৎস্না দেখেননি।

মেয়েটি কফি নিয়ে এল। দিগিন কাপটা হাতে নিয়ে তাপ দেখলেন, আগুন-গরম। খুব গরম ছাড়া খেতে পারেন না। খুশি হলেন।

নিঃশব্দে কফিটা খেয়ে উঠলেন। সকালে রাজমিস্তিরির সঙ্গে যেভাবে কাজের কথা বলেছেন অবিকল সেই স্বরে বললেন—কোথাও পালিয়ে-টালিয়ে যেও না, ওতে লাভ হয় না। আমার বাসাতেই তোমার জায়গা হবে। শানু এলে বলো।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—বিয়ের আগে শানুর সঙ্গে বেশি মিশো না, বুঝলে?

মেয়েটি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই অপরূপ লজ্জার দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে দেখলেন না দিগিন। কে যেন তাকে জ্যোৎস্নায় ডাকছে। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নিশুত রাতে।

বাইরে অবশ্য এখনও শেষ দুপুরের রক্তাভ রোদ।

জিপে উঠে দিগিন আর একটা চুরুট ধরালেন। বললেন—চালা। মেহের সিংয়ের দোকানে একটু থামাস।

কালিম্পঙের কনস্ট্রাকশনের কাজটা দেখার কথা তার মনে পড়ল না। সিংয়ের দোকান থেকে একটা বড় পাঁইট কিনলেন দিগিন, আর দুটো ছোট। তারপর ফেরার পথে মাঝরাস্তায় জিপ দাঁড় করিয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটু কপিল আর রমণীর দিকে তাকালেন। তারা ইঙ্গিত বুঝল। বড্ড শীত পড়েছে। ছোট পাঁইট দুটো তুলে নিয়ে দুজনে জিপের পিছন দিকে চলে গেল। মালিকের সামনে খায় না।

কয়েকদিন পর। শালবাড়িতে আজ খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না।

মোটর সাইকেলটা খামারবাড়ির সামনে থামলেন দিগিন। পিছনের সিট থেকে ময়না নামল। তার গায়ে শাল, মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

এখানেও প্ল্যাংকিং করা পুরোনো ঘর একটা। কেউ থাকত না। এখন কপিল থাকে। খামারবাড়ির চারধারে জমি সদ্য কোপানো। কয়েকদিনে দু-বিঘেটাক জমি কুপিয়ে ফেলেছে কপিল। আরও দু-বিঘে কোপাবে। জমিটা ছাড়া হয়ে পড়েছিল।

নিস্তব্ধ খামারবাড়ির গভীর থেকে একটা খঞ্জনীর শব্দ আসছে। মৃদু কান্নার সুরে কপিল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...' গাইছে। একদম একা। পরিপূর্ণ সুখী।

ময়না ঘোমটা ফেলে দিয়ে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার প্লাবনে স্নান করে বলল—এখানে আনলে যে!

দিগিন ভ্রূকুটি করলেন, বললেন—কেন, খারাপ লাগছে?

ময়না মাথা নাড়ল, বলল—ভাবছি, আমার এত ভাগ্য!

দিগিন এ কথায় সাড়া দিলেন না।

পিছনে গভীর শালবন। বর্ষা পেয়ে আগাছা জন্মেছে খুব। সেদিকে চেয়ে বললেন—যাবে ওখানে?

ময়না বলল—তুমি গেলে যাব না কেন?

—এসো।

বলে দিগিন হাঁটতে লাগলেন। শালবন খুবই গভীর। জ্যোৎস্না পৌঁছায়নি ভিতরে। স্বপ্নময় অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝি ডাকছে। পেঁচার শব্দ আসছে। পাখির ডানার শব্দ।

দিগিন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগলেন। পিছনে ময়না। ময়না পিছন থেকে দিগিনের একটা হাত ধরে বলল—আর যেও না।

—কেন?

—সাপখোপ আছে।

দিগিন হাত ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন—তুমি কপিলকে ডাকো, দরজা খুলে দেবে। ঘরে বসে থাকো গিয়ে। আমি আসছি।

ময়না অসহায়ের মতো বলল—যদি না আসো?

দিগিন ভ্রূ তুলে বললেন—আসব না কেন?

ময়না লজ্জা পেয়ে বলে—তুমি তো অদ্ভুত। তোমার সম্বন্ধে কোনও কথাই নিশ্চয় করে বলা যায় না।

—ও। বলে দিগিন ভাবলেন, বললেন—যদি না আসি তবে কপিল তোমাকে পৌঁছে দেবে।

ময়না দ্বিধাগ্রস্তের মতো শালবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। ফিরে গেল না। এলও না সঙ্গে।

মানুষ ওইরকম। অনেকদূর পর্যন্ত সঙ্গে আসে, কিন্তু সবটা পথ আসে না। জীবন থেকে তাই মানুষ খসতে থাকে, একটা বয়সের পর। দিগিন কোমর সমান আগাছা ভেদ করে এগোতে লাগলেন।

সংসারের কিছুই তাঁকে টানছে না। কেবল যেন এক মহা পর্বত, মহা আকাশ, মহা বৃক্ষ তাকে টানে।

হেমন্তের হিমে পাতা খসছে। কী সুন্দর এই পাতা খসে পড়ার শব্দ। ঘুড়ির মতো মস্ত শালপাতা খসে পড়ছে। কুয়াশামাখা অন্ধকার-আক্রান্ত জ্যোৎস্নায় চারদিকে ভুতুড়ে ছায়া। শীত। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইলেন দিগিন। চুরুট ধরালেন। সাপখোপের কথা তার মনেও আসে না। কেবল মনে হয় সব কাজ সারা হয়েছে। অনেকদিন ঘুমোননি, বিশ্রাম নেননি। অনেকদিন যেন আবার কোনও শক্ত কাজও করেননি।

হঠাৎ চমকে উঠলেন। একটা স্পর্শ পেলেন কাঁধে! প্রথমটায় ভয় হল, সাপ? ভূত? শত্রু?

মুখ তুলে দেখলেন, ময়না। ঘোমটা খসিয়ে ফেলা মুখ খুব আবছা দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো মস্ত বড় করে চেয়ে আছে।

—তোমার পায়ের শব্দ পাইনি তো! বললেন দিগিন।

—তুমি কি সজ্ঞানে ছিলে?

ময়না পাশে বসল। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটা বাংলা সংস্করণ ছিল বাড়িতে। তাতে ঠিক এই ভঙ্গিতে সাকির একটা ছবি ছিল। ওমরের হাঁটুতে হাত রেখে উন্মুখ হয়ে বসে আছে।

দিগিন ময়নাকে টেনে নিলেন বুকের কাছে। অনেক বয়স হয়ে গেছে। তবু দুরন্ত ঠোঁটে দীর্ঘস্থায়ী একটা চুম্বন করলেন। কোনও কামবোধ নেই। কেবলই একটি গভীর ভালোবাসা

থেকে উৎসারিত চুম্বন যেন। ময়নাও বোধহয় তা বুঝল। বলল—এমন সুন্দর আদর হয় না। এসো, আমিও তোমাকে একটা চুমু দিই।

ঠোঁট বাড়িয়ে দিলেন দিগিন। অনেকক্ষণ ধরে আকুল চুমু দিল ময়না। চারদিকে ঘুড়ির মতো বড় বড় পাতা খসে পড়ছে তো পড়ছেই। শীত। কুয়াশা। জ্যোৎস্না। কয়েকদিন পর। সকালবেলায় ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছেন দিগিন। উত্তরের দিকে চোখ। তেমনি পা দুখানা সামনে তোলা। কাঞ্চনজঙঘার শিরা উপশিরা এবং ক্ষতচিহ্ন সবই আজ সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাল একটা ঢালের ছায়া পড়েছে বুকে। পাহাড়টা যত সুন্দর ততই কুৎসিত। সাদা হাহাকারে ভরা একাকীত্ব। ওখানে তুষার ঝরছে, বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুহিম বাতাস, একটিও গাছ নেই, পতঙ্গ নেই, প্রাণ নেই। ওরই পায়ের কাছে কোনও দুর্জ্ঞেয় দুর্গম নির্জনতায় সৃষ্টি হচ্ছে তুষার নদী, পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনের বীজকে অঙ্কুরিত করবে বলে সৃষ্টি হচ্ছে হ্রদ—নদীর উৎস। ওকে ঘিরে আছে নিস্তব্ধতা, কেবলই নিস্তব্ধতা।

কেউ ডাকেনি, তবু দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন ডাক। বহুকাল আগে ফটিক লাহিড়ি একটা সবুজ রঙের পুরোনো হারকিউলিস সাইকেল চালাত। ফুলপ্যান্টে ক্লিপ আঁটা, মাথায় হ্যাট, সাইকেল করে শিলিগুড়ির রাস্তা তৈরির কাজ দেখে বেড়াত। সেই সাইকেলটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার তার ঘণ্টি বাজল হঠাৎ। দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন। চমকালেন না। যেন ঘণ্টি বাজার কথাই ছিল।

বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে তিনি দেখলেন, ফটিক লাহিড়ি বিশ বছর আগেকার সেই চেহারায় দাঁড়িয়ে। ফুলপ্যান্টে ক্লিপ আঁটা, মাথায় হ্যাট।

—আসছি। বললেন দিগিন, তারপর কাউকে কিছু না বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে বললেন—টানতে পারবে তো লাহিড়ি?

—পারব।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলেন।

লাহিড়ি সাইকেলটা চালাতে থাকে উত্তরের দিকে। রাস্তা ক্রমে চড়াইয়ে ওঠে। ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে যায়। ক্রমে চারধারে সাদা তুষার জেগে ওঠে। কেবল তার মধ্যে সাইকেলের চেন ঘোরাবার একটা মিহি শব্দ হয়। কাঞ্চনজঙঘার গা বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে লাহিড়ির সাইকেল।

—পারবে তো লাহিড়ি? দিগিন জিগ্যেস করেন।

লাহিড়ি হাঁফ ধরা গলায় বলে—পারব, পারতেই হবে।

—বরং তুমি ক্যারিয়ারে বোসো, আমি চালাই।

—না হে, তোমাকেও তো এরকম ট্রিপ মারতেই হবে। প্রথম দিনটা আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।

—আচ্ছা।

দিগিন আর কথা বলেন না। লাহিড়িও না। চারদিকে কেবল এক সাদা, শীতল অন্ধকার জমে। আর কিছুই দেখা যায় না। না পাহাড়, না আকাশ, না পথ। সাইকেলের শব্দটাও শেষ হয়। দিগিন হাতটা বাড়ান। বিড়বিড় করে ডাকেন—লাহিড়ি।

কেউ উত্তর দেয় না।

দিগিন জানতেন এরকমই হবে। বিড়বিড় করে বলেন—সাদা অন্ধকার। অদ্ভুত সাদা এক অন্ধকার!

পুন্নি চা নিয়ে এল।

কিন্তু দিগিন তা হাত বাড়িয়ে কোনওদিনই আর নিলেন না।

একটি . প্লেন আড়ালে

ধৃতির রিভলভার নেই কিন্তু হননেচ্ছা আছে। এই তিরিশের কাছাকাছি বয়সে তার জীবনে তেমন কোনও মহিলার আগমন ঘটল না, তা বলে কি তার হৃদয়ে নারীপ্রেম নেই? ঈশ্বর বা ধর্মে তার কোনও বিশ্বাসই নেই, তবু সে জানে যে পঞ্চাশ বছর বয়সের পর সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। একজন বা একাধিক জ্যোতিষী তাকে ওই সতর্কবাণী শুনিয়েছে।

রাত দুটো। তবু এখন টেলিপ্রিন্টার চলছে ঝড়ের বেগে। চিফ সাব-এডিটর উমেশ সিংহ প্রেসে নেমে গেছেন খবরের কাগজের পাতা সাজাতে। দেওয়ার মতো নতুন খবর কিছু নেই আজ। বাকি তিনজন সাব-এটিডরের একজন বাড়ি চলে গেছে, দুজন ঘুমোচ্ছে। ধৃতি একা বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। তার গায়ে গেঞ্জি, পরনে পাজামা। টেলিপ্রিন্টারের খবর সে অনেকক্ষণ দেখছে না। কাগজ লম্বা হয়ে হয়ে মেশিন থেকে বেরিয়ে মেঝেয় গড়াচ্ছে। এবার একটু দেখতে হয়। ধৃতি উঠে জল দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি একসঙ্গে খেয়ে নেয়। তারপর মেশিনের কাছে আসে। মাদ্রাজে আমের ফলন কম হল এবার, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন, যুগোশ্লাভিয়া ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রশংসা করেছে, ইজরায়েলের নিন্দা করছে আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র। কোনও খবরই যাওয়ার নয়। একটা ছোট্ট খবর কাগজের লেজের দিকে আটকে আছে। প্লেন ক্র্যাশে ব্যাঙ্গালোরে দুজন শিক্ষার্থী পাইলট নিহত। যাবে কি খবরটা? ইন্টার-কম টেলিফোন তুলে বলল—উমেশদা, একটা ছোট প্লেন ক্র্যাশের খবর আছে। দেব?

—কোথায়?

—ব্যাঙ্গালোর।

—ক'জন মারা গেছে?

—দুজন।

—রেখে দাও। আজ আর জায়গা নেই। এমনিতেই বহু খবর বাদ গেল। তিরিশ কলম বিজ্ঞাপন।

—আচ্ছা।

ধৃতি বসে থাকে চুপ করে। অনুভব করে তার ভিতর হননেচ্ছা আছে, প্রেম আছে, আর আছে সুপ্ত সন্ন্যাস। বয়স হয়ে গেল তিরিশের কাছাকাছি। তিরিশ কি খুব বেশি বয়স?

টেলিফোন বেজে ওঠে। এত রাতে সাধারণত প্রেস থেকেই ফোন আসে। উমেশদা হয়তো কোনও হেডিং পালটে দিতে বলবে বা কোনও খবর ছাঁটকাট করতে ডেকে পাঠাবে। তাই ধৃতি গিয়ে ইন্টার-কম রিসিভারটা তুলে নেয়। তখনই ভুল বুঝতে পারে। এটা নয়, অন্য টেলিফোনটা বাজছে। বাইরের কল।

দ্বিতীয় রিসিভারটা তুলেই সে বলে—নিউজ।

ওপাশে অপারেটারের গলা পাওয়া যায়—এলাহাবাদ থেকে পি.পি. ট্রাঙ্ক-কল। ধৃতি রায়কে চাইছে।

রাত দুটোর সময় মাথা খুব ভালো কাজ করার কথা নয়। তাই এলাহাবাদ থেকে তার ট্রাঙ্ক কল শুনেও সে তেমন চমকায় না। একটু উৎকর্ণ হয় মাত্র। তার তেমন কোনও নিকট আত্মীয়-স্বজন নেই, স্ত্রী বা পুত্র-কন্যা নেই, তেমন কোনও প্রিয়জন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই। কাজেই দুঃসংবাদ পাওয়ার কোনও ভয় নেই তার।

এলাহাবাদী কণ্ঠটি খুব ক্ষীণ শোনা গেল—হ্যালো! আমি ধৃতি রায়ের সঙ্গে—

—ধৃতি রায় বলছি।

—মাত্র তিন মিনিট সময়, কিন্তু আমার যে অনেক কথা বলার আছে।

—বলে ফেলুন।

—বলা যাবে না। শুধু বলে রাখি, আমি টুপুর মা। টুপুকে ওরা মেরে ফেলেছে, বুঝলেন? খবরটা আপনার কাগজে ছাপবেন কিন্তু! শুনুন, সবাই এটাকে আত্মহত্যা বলে ধরে নিচ্ছে। প্লিজ, বিশ্বাস করবেন না। আপনি লিখবেন টুপু খুন হয়েছে।

অধৈর্য ধৃতি বলে—কিন্তু টুপু কে?

—আমার মেয়ে।

—আপনি কে?

—আমি টুপুর মা।

—আপনি আমাকে চেনেন?

—চিনি। আপনি খবরের কাগজে কাজ করেন। মাঝে মাঝে আপনার নামে লেখা বেরোয় কাগজে। নামে চিনি।

—আমি যে নাইট শিফটে আছি তা জানলেন কী করে?

—আজ বিকেলে আপনার অফিসে আর একবার ট্রাঙ্ক-কল করি। তখন অফিস থেকে বলেছে।

—শুনুন, আপনার মুখের খবর তো আমরা ছাপতে পারি না, আপনি বরং এখানে আমাদের যে করেসপন্ডেন্ট আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

—না, না। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না। টুপুকে মেরে ফেলা হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন।

ধৃতি বুঝতে পারে এলাহাবাদী পুরো পাগল। সে তাই গলার স্বর মোলায়েম করে বলল—তাহলে বরং ঘটনাটা আদ্যোপান্ত লিখে ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

—ছাপবেন তো?

—দেখা যাক।

—না, দেখা যাক নয়। ছাপতেই হবে। টুপু যে খুন হয়েছে সেটা সকলের জানা দরকার। খবরের সঙ্গে ওর একটা ছবিও পাঠাব। দেখবেন টুপু কী সুন্দর ছিল। অদ্ভুত সুন্দর। ওর নামই ছিল মিস এলাহাবাদ।

—তাই নাকি?

—পড়াশুনোতেও ভালো ছিল।

অপারেটর তিন মিনিটের ওয়ার্নিং দিতেই ধৃতি বলল—আচ্ছা ছাড়ছি।

ছাপবেন কিন্তু।

ধৃতির কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। ফোন ছেড়ে সে উঠে মেশিন দেখতে থাকে। বাণিজ্য-মন্ত্রীর বিশাল এক বিবৃতি আসছে পার্টের পর পার্ট। এরা যে কী সাঙঘাতিক বেশি কথা বলতে পারে! আর কখনও নতুন কথা বলে না।

টেবিলের ওপর বিছানা পাতা রয়েছে। ধৃতি আর মেশিন পাহারা না দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। নতুন সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। সিগারেট শেষ হলেই চোখ বুজবে।

চোখের দুটো পাতা চুম্বকের টানে জুড়ে আসছে ক্রমে। মাথার দিকে অল্প দূরেই টেলিপ্রিণ্টার ঝোড়ো শব্দ তুলে যাচ্ছে। রিপোর্টারদের ঘরে নিষ্ফল টেলিফোন বেজে বেজে এক সময়ে থেমে গেল। মাথার ওপরকার বাতিগুলো নিভিয়ে দিচ্ছে সহদেব বেয়ারা। আবছা অন্ধকারে হলঘর ভরে গেল।

সিগারেট ফেলে পাশ ফিরে শুল ধৃতি। উমেশদা প্রেস থেকে কাগজ ছেড়ে উঠে এল, আধো-ঘুমের মধ্যেও টের পেল সে।

অনেকদিন আগে স্টেট ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়েছিল ধৃতি। তখন ব্যাংকের অল্পবয়সি কর্মীদের কয়েকজন তাকে ধরল—আপনি ধৃতি রায়? খবরের কাগজে ফিচার লেখেন আপনিই তো?

সেই থেকে তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। স্টেট ব্যাংকের ওপর তলায় কমন রুম আছে। সেখানে আজকাল বিকেলের দিকে অবসর পেলে এসে টেবিল টেনিস খেলে।

আজও খেলছিল। টেবিল টেনিস সে ভালোই খেলে। ইদানীং সে জাপানি কায়দায় পেন হোলড গ্রিপে খেলার অভ্যাস করছে। এতে একটা অসুবিধে যে ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না। বাঁ দিকে বলপড়লে হয় কোনওক্রমে ফিরিয়ে দিতে হয়, নয়তো বাঁ-দিকে সরে গিয়ে বলটাকে ডানদিকে নিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হয়। তবে এই কলম ধরার কায়দায় ব্যাট

ধরলে মারগুলো হয় ছিটেগুলির মতো জোরালো। সে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য খেলে না, এমনিতেই খেলে। কিন্তু ধৃতি যাই করে তাতেই তার অখণ্ড মনোযোগ।

আর এই মনোযোগের গুণেই সে যখনই যা করে তার মধ্যে ফাঁকি থাকে না। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছেয় সে যে কয়েকটা ফিচার লিখেছে তার সবগুলোই ভালোভাবে উতরে যায়। তার ফলে বাজারে সে সাংবাদিক হিসেবে মোটামুটি পরিচিত। নাম বলতেই অনেকে চিনে ফেলে। অবশ্য এর এক জ্বালাও আছে।

যেমন স্টেট ব্যাংকে যে নতুন এক টেকো ভদ্রলোক এসেছেন সেই ভদ্রলোকটি তাকে আজকাল ভারী জ্বালায়। নাম অভয় মিত্র, খুবই রোগা, ছোট্ট, ক্ষয়া একটি মানুষ। গায়ের রং ময়লা। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, কিন্তু এর মধ্যেই অসম্ভব বুড়িয়ে রসকষহীন হয়ে গেছে চেহারা। চোখ দুটোতে একটা জুলজুলে সন্দিহান দৃষ্টি। অভয় মিত্র তার নাম শুনেই প্রথম দিনই গম্ভীর হয়ে বলেছিল—দেশে যত অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে তার বিহিত করুন। আপনারাই পারেন।

কে না জানে যে এ দেশে প্রচুর অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে! আর এও সকলেরই জানা কথা যে কিছু করার নেই।

কিন্তু অভয় মিত্র ধৃতিকে ছাড়েন না। দ্যাখা হলেই ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকেন—আপনারা কী করছেন বলুন তো? দেশটা যে গেল!

ধৃতি খুবই ধৈর্যশীল, সহজে রাগে না। কিন্তু বিরক্ত হয়। বিরক্তি চেপে রেখে ধৃতি বলে —আমার কাগজ আমাকে মাইনে দেয় বটে, কিন্তু দেশকে দেখার দায়িত্ব দেয়নি অভয়বাবু। দিলেও কিছু তেমন করার ছিল না। খবরের কাগজ আর কতটুকু করতে পারে?

অভয় হাল ছাড়েন না। বলেন—মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা লিখুন। শয়তানদের মুখোশ খুলে দিন।

অভয় মিত্রের ধারণা খুবই সহজ ও সরল। তিনি জানেন কিছু মুখোশপরা লোক আড়াল থেকে দেশটার সর্বনাশ করছে। শোষণ করছে, অত্যাচার করছে, ডাকাতি, নারীধর্ষণ, কালো টাকা জামানো থেকে সব রকম দুষ্কর্মই করছে একদল লোক।

—তারা কারা? একদিন জিগ্যেস করেছিল ধৃতি।

—তারাই দেশের শত্রু। আমি আপনাকে অনেকগুলো কেস বলতে পারি।

—শুনব'খন একদিন।

এইভাবে এড়িয়েছে ধৃতি।

আজও টেবিল টেনিস খেলার দর্শকের আসনে অভয় মিত্র বসা। তিনি কোনওদিনই খেলেন না। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে বসে থাকেন।

ধৃতি স্টেট ব্যাংকের সবচেয়ে মারকুটে খেলোয়াড় সুব্রতকে এক গেমে হারিয়ে এসে চেয়ারে বসে দম নিচ্ছিল।

অভয় মিত্র বললেন—আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি দেশের ইন্টেলেকচুয়ালরা সি.আই এ-র টাকা খায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে নির্বিকার ভাবে বললো—খায়।

—সে কথা আপনারা কাগজে লেখেন না কেন?

—আমিও খাই যে। বলে ধৃতি হাসল।

—না না ইয়ার্কির কথা নয়। আমি আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলি। ময়নাগুড়িতে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গেল একবার। অতি সৎ লোক। কিন্তু কন্ট্রাক্টররা তাকে কিছুতেই ঘুষ না দিয়ে ছাড়বে না। তাদের ধারণা ঘুষ না নিলে ছোকরা সব ফাঁস করে দেবে। যখন কিছুতেই নিল না তখন একদিন দুম করে ছেলেটাকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেওয়া হল। এ ব্যাপারটাকে আপনি কী মনে করেন?

—খুব খারাপ।

—ভীষণ খারাপ ব্যাপার নয় কি?

—ভীষণ।

—এইসব চক্রান্তের পিছনে কারা আছে সে তো আপনি ভালোই জানেন।

এইসব চক্রান্ত ফাঁস করে দিন।

—দেব। সময় আসুক।

—সময় এসেছে, বুঝলেন! সময় এসে গেছে। ইন্ডিয়া আর চায়নার বর্ডারে এখন প্রচণ্ড মবিলাইজেশন শুরু হয়ে গেছে।

—বটে? খবর পাইনি তো!

—খবর আপনারা ঠিকই পান, কিন্তু সেগুলো চেপে দেন। আপনাকে আরও জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে নেতাজির রেগুলার টেলিফোনে কথাবার্তা হয়। নেতাজি সন্ন্যাস ছেড়ে আসতে চাইছেন না। কিন্তু হয়তো তাঁকে আসতেই হবে শেষ পর্যন্ত। আপনারাও জানেন যে নেতাজি বেঁচে আছেন, কিন্তু খবরটা ছাপেন না।

ধৃতি বিরক্ত হয় না। মুখ গম্ভীর করে বলে—তা অবশ্য ঠিক। সবর খবর কি ছাপা যায়?

কিন্তু মুখোশ একদিন খুলে যাবেই। সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে। ধৃতির সময় নেই। আবার নাইট শিফট। ঘড়ি দেখে সে উঠে পড়ে। ধৃতি আগে থাকত একটা মেসে। তার বন্ধু জয় নতুন একটা ফ্ল্যাট কিনল বিস্তর টাকার ঝুঁকি নিয়ে। প্রথমেই থোক তিরিশ হাজার দিতে হয়েছিল, তারপর মাসে মাসে সাড়ে চারশো করে গুনে যেতে হচ্ছে। চাকরিটা জয় কিছু খারাপ করে না। সে বিলেতফেরত ইঞ্জিনিয়ার, কলকাতার একটা এ-গ্রেড ফার্মে আছে। হাজার তিনেক টাকা পায়। কাটছাঁট করে আরও কিছু কম হাতে আসে।

জয়ের বয়স ধৃতির মতোই। বন্ধুত্বও খুব বেশি দিনের নয়। তৃতীয় এক বন্ধুর সূত্রে ওলিম্পিয়া রেস্টুরেন্টে ভাব হয়ে গিয়েছিল। পরে খুব জমে যায়।

জয় একদিন এসে বলল—একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। একটা ঘর আছে, তুমি থাকবে?

একটু দোনা-মোনা করেছিল ধৃতি। মেসের মতো অগাধ স্বাধীনতা তো বাড়িতে পাবে না।

দ্বিধাটা বুঝে নিয়ে জয় বললো—আরে আমার হাউসহোলড কি আর পাঁচজনের মতো নাকি! ইউ উইল বি ফ্রি অ্যাজ লাইট অ্যান্ড এয়ার। মান্থলি ইনস্টলমেন্টটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে ভাই, একা বিয়ার করতে পারছি না। তুমি যদি শেয়ার কর তাহলে আমি বেঁচে যাই।

ওরা ব্যাচেলর সাবটেনান্ট খুঁজছে। ধৃতির চেয়ে ভালো লোক আর কাকে পাবে? ধৃতির আত্মীয়-স্বজন নেই, বন্ধু-বান্ধবী নেই। ফলে হুটহাট লোকজন আসবে না।

ধৃতি রাজি হয়ে গেল। সেই থেকে সে জয়ের একডালিয়ার ফ্ল্যাট-বাড়িতে আছে। দু'তলায় দক্ষিণ-পূর্বমুখী চমৎকার আস্তানা। সামনের দিকের বেডরুমটা ধৃতি নিয়েছে। ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে থাকে। খাওয়া-দাওয়া সে বাইরেই সারে। তবে জয়ের বউ পরমা তাকে সকালের দিকে চা আর ব্রেকফাস্ট দেয়। বাড়িতে পার্টি হলে বা জোর খাওয়া-দাওয়া থাকলে ধৃতির বাঁধা নেমন্তন্ন থাকে। ধৃতি প্রতি মাসে দুশো টাকা করে দেয়।

ধৃতি যখন ফিরল তখন প্রায় সাতটা বাজে। নাইট শিফট শুরু হবে ন'টায়। সময় আছে।

কলিংবেল টিপতে হল না। দরজা খোলাই ছিল। সামনের সিটিং-কাম-ডাইনিং হল-এর মাঝখানের বিশাল টানা পরদাটা সরানো। খাওয়ার টেবিলের ওপর প্লেটে পেঁয়াজ কুচি করছিল পরমা। আর আঁচলে চোখ মুছছিল।

পরমা দারুণ সুন্দরী। ইদানীং সামান্য কিছু বেশি মেদ জমে গেছে, নইলে সচরাচর এত সুন্দরী দেখাই যায় না। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে পরমা অত্যন্ত সচেতন। কখনও তাকে না-সাজা অবস্থায় ঘরেও দেখেনি ধৃতি। যখনই দেখে তখনই পরমার মুখে মৃদু বা অতিরিক্ত প্রসাধন, চোখে কাজল, ঠোঁটে কখনও হালকা কখনও গাঢ় লিপস্টিক, পরনে সব সময়ে ঝলমলে শাড়ি। তেইশ-চব্বিশের বেশি বয়স নয়।

ধৃতি শিস দিতে দিতে দরজা দিয়ে ঢুকেই বলল...পরমা, কাঁদছ?

—কাঁদব না? পেঁয়াজ কাটতে গেলে সবারই কান্না আসে।

—আমার চিঠিফিটি কিছু এল শেষ ডাকে?

—কে চিঠি দেবে বাবা! রোজ কেবল চিঠি!

—চিঠি দেওয়ার লোক আছে।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে—সে-সব তো আজেবাজে লোকের চিঠি। কে লেখা ছাপাতে চায়, কে খবর ছাপাতে চায়, কে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। ওসব কি চিঠি নাকি? আপনি প্রেমপত্র পান না কেন বলুন তো?

ধৃতি নিজের ঘরে ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে বলে—দ্যাখ ভাই বন্ধুপত্নী, যাদের পারসোনালিটি থাকে তাদের সকলেই ভয় পায়। আমাকে প্রেমপত্র দিতে কোনও মেয়ে সাহস পায় না।

—ইস! বেশি বকবেন না। নিজে একটি ভীতুর ডিম। মেয়ে দেখলে তো খাটের তলায়লুকোন।

—কবে লুকিয়েছি?

—জানা আছে।

ঠোঁট ওলটালে পরমাকে বড় সুন্দর লাগে। এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। ধৃতি তাই স্থির চেয়ে থাকে একটু। মৃদু একটু মুগ্ধতার হাসি তার মুখে।

কোন মেয়ে না পুরুষের দৃষ্টির সরলার্থ করতে পারে! পরমা বরং তা আরও বেশি পারে। কেন না সুন্দরী বলে সে ছেলেবেলা থেকেই বহু পুরুষের নজর পেয়ে আসছে।

ধৃতি বলল—পরমা তোমার কেন একটা ছোট বোন নেই বল তো?

—থাকলে বিয়ে করতেন?

—আহা, বিয়ের কথাটা ফস করে তোলা কেন? অন্তত প্রেমটা তো করা যেত।

—প্রেম করতে কলজের জোর চাই সাংবাদিক মশাই। যত সস্তা ভাবছেন অত নয়।

—বিয়ের আগে তুমি ক'টা প্রেম করেছ? কমিয়ে বলো না, ঠিক করে বলো তো!

পরমা ঠোঁট উলটে বলে—অনেক। কতবার তো বলেছি।

—কোনওবারই সঠিক সংখ্যাটা বলোনি।

—হিসেব নেই যে।

—সেই সব রোমিওদের সঙ্গে এখন আর দেখা হয় না?

—একেবারে হয় না তো নয়। বলে পরমা একটু চোখ পাকিয়ে মৃদু হাসে।

—তাদের এখন অবস্থা কী?

—প্রথম প্রথম অক্সিজেন কোরামিন দিতে হতো, এখন সব সেরে উঠছে। ধৃতি খুব দুঃখের সঙ্গে বললো—বাস্তবিক, একজন সুন্দরী মেয়ে যে কত পুরুষের সর্বনাশ করতে পারে!

—পুরুষরা তো সর্বনাশই ভালোবাসে।

—শিস দিতে দিতে ধৃতি ঘরে ঢোকে। পরমা বাইরে থেকে বলে—চা চাই নাকি?

—দেবে?

—খেলে দেব না কেন? আহা, কী কথা!

—দাও তাহলে। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট ফিস্কুট দিও না আবার। আমি নেকেড চা ভালোবাসি।

পরমা অত্যন্ত দুষ্টু একটা জবাব দিল—অত নেকেড ভালোবাসতে হবে না।

ঘরে একা ধৃতি একটু হাসল।

তার ঘরটা অগোছালো বটে কিন্তু দামি জিনিসের অভাব নেই। একটা স্টিলের হাফ-সেকেরেটারিয়েট টেবিল জানলার পাশে, টেবিলের সামনে রিভলভিং চেয়ার, তার সিংগল খাটে ফোম রবারের তোশক। মহার্ঘ্য বুককেস। একটা চারহাজারি স্টিরিও গ্রামোফোন, একটা ছোট্ট জাপানি রেডিয়ো। যা রোজগার তার সবটাই কেবলমাত্র নিজের জন্য খরচ করতে পারে সে।

নিকট আত্মীয় বলতে এক দাদা আর দিদি আছে তার। দাদা বেনারসে রেলের বুকিং ক্লার্ক। দিদি স্বামী-পুত্র নিয়ে দিল্লি প্রবাসিনী। সারা বছর ভাই-বোনে কোনও যোগাযোগ নেই। বিজয়া বা নববর্ষে বড়জোর একটা পোস্টকার্ড আসে, একটা যায়। তাও সব বছর নয়। আত্মীয়তার বন্ধন বা দায় নেই বলে ধৃতির খারাপ লাগে না। বেশ আছে। দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে, যেবার সে অফিসের কাজে দিল্লি যায়। দিদির বাড়িতে ওঠেনি, অফিস হোটেল-খরচ দিয়েছিল। দ্যাখা হয়েছিল এক বেলার জন্য। ধৃতি দেখেছিল দিদি নিজের সংসারের সঙ্গে কী গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। ভাই বলে ধৃতিকে আদরের ত্রুটি করেনি, তবু ধৃতির নিজেকে পর মনে হয়েছিল। দাদা অবশ্য সে তুলনায় আরও পর। দিদি সেবার একটা দামি প্যান্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য টাকা দেয়, ভাইয়ের হাত ধরে বিদায়ের সময়ে কেঁদেও ফেলে। কিন্তু দাদা সেরকম নয়। বছরখানেক আগে বেনারসে দাদার ছেলের পইতে উপলক্ষ্যে গিয়ে ধৃতি প্রথম বুঝতে পারে যে না এলেই ভালো হতো। দাদা তার সঙ্গে তেমন করে কথাই বলেনি, আর বউদি নানাভাবে তাকে শুনিয়েছে তোমার দাদার একার হাতে সংসার কেউ তো আর সাহায্য করার নেই। খোঁজই নেয় না কেউ। এসব খোঁটা দেওয়া ধৃতির ভালো লাগে না। সে নিজে একসময়ে দাদার পয়সায় খেয়েছে পরেছে ঠিকই, কিন্তু বউদি যখন বলল—তোমার দাদা তো সকলের জন্যই করেছে, এখন তার জন্য কেউ যদি না করে তবে তো বলতেই হয় মানুষ অকৃতজ্ঞ, তখন ধৃতির ভারী ঘেন্না ধরে ভিখিরিপনা দেখে। কলকাতায় এসে সে দু-মাসে হাজারখানেক টাকা মানি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেয়।

পরমা নিজেই চা নিয়ে আসে। ধৃতি লক্ষ করে অল্প সময়ের মধ্যেই পরমা শাড়ি পালটেছে। কতবার যে দিনের মধ্যে শাড়ি পালটায় পরমা।

ধৃতি বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়েছিল। পরমা বিছানার ওপর এক টুকরো পিসবোর্ডে চায়ের কাপ রেখে রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে বলল—আজ নাইট শোতে সিনেমায় যাচ্ছি।

—জয়কে খুব ধসাচ্ছ ভাই বন্ধুপত্নী।

—আহা, সিনেমায় গেলে বুঝি ধসানো হয়?

—শুধু সিনেমা? ফি হপ্তায় যে শাড়ি কিনছ। টিভি কেনার বায়না ধরেছ। সব জানি। পার্ক স্ট্রিটের হোটেলেও খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে প্রায়ই। পরমা তার প্রিয় মুদ্রাদোষে ঠোঁট উলটে বলে—আমরা তো আর আপনার মতো রসকষহীন হাড়কঞ্জুস নই।

—আমি কঞ্জুস?

—নয়তো কী? খরচের ভয়ে তো বিয়েই করছেন না। পাছে প্রেমিকাকে সিনেমা দেখাতে কি হোটেলে খাওয়াতে হয় সেই ভয়েই বোধহয় প্রেমেও অরুচি হচ্ছে।

উপুড় হয়ে বুকে বালিশ দিয়ে চায়ে চুমুক মেরে ধৃতি বলল—তোমাদের বিবাহিতদের যা কাণ্ড-কারখানা দেখছি এরপর আহাম্মক ছাড়া কে বিয়ে করতে যায়?

—মারব থাপ্পড়, কী কাণ্ড দেখলেন শুনি?

—রোজ তো তোমাদের দুজনে খটামটি লেগে যায়।

—আহা, সে হাঁড়ি-কলসি এক জায়গায় থাকলে ঠোকাঠুকি হয়ই। তাছাড়া ওসব ছাড়া প্রেম জমে নাকি? একঘেয়ে হয়ে যায়।

—যা-ই বলে ভাই, জয়টার জন্য আমার কষ্ট হয়।

পরমা থমথমে মুখ করে বলে—বললেন তো? আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি। একটা চিঠি এসেছে আপনার। নীল খামে। কিছুতেই সেটা দেব না।

—মাইরি? বলে ধৃতি উঠতে চেষ্টা করে।

পরমা লঘু পায়ে দরজা পেরিয়ে ছুটে চলে যায়। ধৃতি একটু উঠতে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ওঠে না। চা খেতে থাকে আস্তে আস্তে।

হলঘরে জয়ের গলা পাওয়া যায়—ওঃ, যা একখানা কাণ্ড হয়ে গেল আজ! এই পরমা, শোন না।

পরমা কোনওদিনই জয়ের ডাকে সাড়া দেয় না। স্বামীরা আজকালকার মেয়েদের কাছে সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেন। পরমা কোনও জবাব দিল না।

—এই পরমা! জয় ডাকে।

ভারী বিরক্তির গলায় পরমা বলে—অত চেঁচাচ্ছ কেন বলো তো! এখন যেতে পারছি না।

—ডোন্ট শো মি বিজিনেস। কাম হিয়ার। গিভ মি এ—

—আঃ! কী যে করো। দাঁড়াও, ধৃতিকে ডাকছি, এসে দেখে যাক।

—ওঃ, ধৃতি দেখে কী করবে? হি ইজ ভারচুয়ালি সেক্সলেস। ওর কোনও রি-অ্যাকশন নেই।

পরমা চেঁচিয়ে ডাকল—ধৃতিবাবু! এই ধৃতি রায়!

ধৃতি শান্ত ভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ স্বরে ঘর থেকেই জবাব দেয়—ভাই, তোমাদের বসন্ত-উৎসবে আমাকে ডেকো না। আমি কোকিল নই, কাক।

পরমা পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বলে—একজন বিপন্ন মহিলাকে উদ্ধার করা পুরুষের কর্তব্য। আপনাদের শিভালরি কোথায় গেল বলুন তো?

—অগাধ জলে। পরমা, আমাদের সব ভেসে গেছে। নারী প্রগতির এই যুগে পুরুষ নাসবন্দি অপদার্থ মাত্র।

পরদার ওপাশে ঝটাপটির শব্দ হয়। আসলে ওটা জয়ের প্রেম নয়, টিকলিং। ধৃতি নির্বিকার ভাবে ধোঁয়ার রিং করার চেষ্টা করতে থাকে শুয়ে শুয়ে। সে জানে জয় সুব্রতর বোনের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করেছে সম্প্রতি। জানে বলে ধৃতির এক ধরনের নির্বিকার ভাব আছে। একটু বাদে জয় ঘরে এল। তার পরনে পাজামা, কাঁধে তোয়ালে। হাতে এক গ্লাস ফ্রিজের ঠান্ডা জল। এসে চেয়ারে বসে বলল—দিন দিন ডামি হয়ে যাচ্ছি মাইরি।

—মানে?

—মানে আর কি? কোথাও আমার কোনও ওপিনিয়ন অ্যাকসেপটেড হচ্ছে না। না ঘরে, না বাইরে। কোম্পানি আগ্রার কাছে তাদের প্রোডাকশন তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। আমাকে যেতে হবে সাইট আর আদার ফেসিলিটিজ দেখতে। এ নিয়ে আজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে দু'ঘণ্টা মুখের ফেকো তুলে বকলাম। কী মাল মাইরি! আসানসোলে কারখানা খোলবার লেটার অফ ইনডেন্ট পেয়ে গেছে, তবু সেখানে করবে না, আগ্রায় যাবে। হেডস্ট্রং যাকে বলে!

কবে যাচ্ছিস?

—ঠিক নেই এখনও। মে বি নেক্সট মান্থ, মে বি নেক্সট উইক, ইভেন টু-মরো।

—ঘুরে আয়। সেকেন্ড হানিমুন হয়ে যাবে।

—আর হানিমুন! ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে লালবাতি জ্বলছে। এই ফ্ল্যাটটা না বেচে দিতে হয়। আজকাল যে যত বড় চাকরি করে তার তত মানিটারি ওবলিগেশন। হ্যাঁ রে, তোরা ট্যাকসেশন নিয়ে কি কিছুই লিখবি না? খোদ আমেরিকায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পারসেন্টের বেশি ট্যাকসেশন নেই। আর এই ভুক্ষা দেশে কেন এরকম আনহাইজনিক ট্যাকসেশন!

—কে জানে!

—এটা নিয়ে কিন্তু লেখা দরকার। একটা তিনহাজারি মাস মাইনের লোক আজকাল পুরো প্রলেটারিয়েট। আর ওদিকে যত ট্যাক্স রেট বাড়ছে তত বাড়ছে ট্যাক্স ক্রাইম আর হ্যাজার্ডস।

ধৃতি চিত থেকে উপুড় হয়ে বলল—তুই তো এই ফ্ল্যাটটা তোর কোম্পানিকে লিজ দিয়েছিল। তারাই তো ভাড়া গুনছে।

—না করে কী করব? টাকা আসবে কোত্থেকে? আমার একমাত্র ট্যাক্স-ফ্রি ইনকাম কোনটা জানিস? তোর দেওয়া মাসে মাসে দুশো টাকা।

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে। বাস্তবিকই বড় চাকুরেরা আজকাল সুখে নেই।

জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ, ঠান্ডা জল খেলো।

ধৃতি বলল—তোর বউ আমার একটা চিঠি চুরি করেছে। মেয়েদের—নিন্দে করেছিলাম বলে পানিশমেন্ট।

নিন্দে করেছিস? সর্বনাশ! সে তো সাপের লেজে পা।

ওপাশের হলঘর থেকে পরমা চেঁচিয়ে বলে—খবর্দার সাপের সঙ্গে তুলনা দেবে না বলে দিচ্ছি। আমরা কি সাপ?

—সাপ কি খারাপ? জয় প্রশ্ন করে উঁচু স্বরে।

পরমা ঘুরে ঢুকে আসে। হাতে এক কোশ জল। সেটা সজোরে জয়ের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—সাপ ভালো কিনা নিজে জানো না?

ধৃতি বালিশে মুখ গুঁজে বলে—আচ্ছা বাবা, আমিই না হয় সাপ।

জয় ভেড়া, আর পরমা সিংহী।

—সিংহী না হাতি। পরমার সরোষ উত্তর।

—তবে হাতিই। দ্যাট ইজ ফাইনাল। ধৃতি বলে।

জয় হেসে বলে—হাতি বলছে কেন জানো তো! তোমার যে একটু ফ্যাট হয়েছে তাইতেই ওর চোখ টাটায়। ওর গায়ে এক মগ জল ঢেলে দাও।

পরমা 'ঠিক বলেছ' বলে দৌড়ে গেল জল আনতে।

জয় এক প্যাকেট আবদাল্লা সিগারেট ধৃতির বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে বলল—এটা তোর জন্য। রাখ।

ধৃতি পরম আলস্যে পাশ ফিরে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে বলে—কোথায় পেলি? ফরেনের মাল দেখছি।

—অফিসে একজন ক্লায়েন্ট চার প্যাকেট প্রেজেন্ট করে গেল। সদ্য ফরেন থেকে এসেছে।

ধৃতি একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানে।

জয় বলে—একটু গার্ড নে, পরমা বোধহয় সত্যিই জল আনছে।

—মাইরি! বলে ধৃতি লাফিয়ে ওঠে।

পরমা একটা লাল প্লাস্টিকের মগ হাতে ঘরে ঢুকেই ছুটে আসে। ধৃতি জাপানি ছাতাটা খুলে সামনে ধরতেই পরমা হেসে উঠে বলে—আহা, কী বুদ্ধি!

বলতে বলতে পরমা মগ থেকে জল হাতের আঁজলায় তুলে ওপর বাগে ছিটিয়ে দেয়, নানা কায়দায় ধৃতি ছাতা এদিক ওদিক করে জল আটকাতে আটকাতে বলে—আমি কী করেছি বলো তো?

—হাতি বললেন কেন?

—মোটেই বলিনি। তুমিই বলেছ।

—ইস! আপনিই বলেছেন।

—মাপ চাইছি।

—মাপ চাইছি।

—কান ধরুন।

ধৃতি ছাতা ফেলে কান ধরে দাঁড়ায়।

পরমা মগ রেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—মেয়েদের সম্মান করতে কবে যে শিখবেন আপনারা।

—কেন, খুব সম্মান করি তো।

—করলে জাতটা উদ্ধার পেয়ে যেতো।

জয় মৃদু হাসছিল। বলল—ওর কথা বিশ্বাস করো না পরমা। ধৃতি এক নম্বরের উওম্যান-হেটার! নারী-প্রগতির বিরোধী। আড়ালে ও মেয়েদের নামে যা তা বলে। ও যদি কখনও প্রাইম মিনিস্টার হয় তবে নাকি শ্লোগান দেবে—মেয়েরা রান্নাঘরে ফিরে যাও।

—বটে? পরমা চোখ বড় করে তাকায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে—মাইরি না। আমি মেয়েদের ক্রিকেট খেলা দেখতেও যাই।

পরমা শ্বাস ফেলে বলে—আমি অবশ্য মেয়েদের ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি না। কিন্তু মেয়েদের লিবার্টিকে সার্পোট করি।

—তোমরা তো ভাই লিবারেটেড। কেউ আজকাল মেয়েদের বাঁধে না। ছাড়া মেয়েরা কেমন চারদিকে পাখি প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে!

—ফের? ছাড়া মেয়ে মানে?

—মানে যারা লিবারেটেড।

সন্দেহের চোখে চেয়ে পরমা বলে—ব্যাড সেনসেই বলছেন না তো?

—আরে না।

জয় বলে—ব্যাড সেনসেই বলছে। ওকে ছেড়ো না।

পরমা জয়ের দিকে চেয়ে বলে—তুমি ফুট কাটছ কেন বলো তো? আমাকে খেপিয়ে দিয়ে বিনি পয়সায় মজা দেখতে চাইছ?

ধৃতি কথাটা লুফে নিয়ে বলে—একজ্যাকটলি। এবার জয়কেও একটু শাসন করো পরমা, বর বলে অতটা খাতির করো না।

—কে খাতির করছে? বলে ধৃতিকে একটা ধমক দিয়ে পরমা জয়কে বলে—আমি জোকার না কি?

জয় খুব বিষণ্ণ হয়ে বলে—যার জন্য করি ভালো সে-ই বলে চোর!

—থাক, আর সাধু সাজতে হবে না।

—তুমি নারীরত্ন।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে—ডিকশনারি কিংবা বঙ্কিমের বই খুললেই ওসব শব্দ জানা যায়। কমপ্লিমেন্ট দিতেও পারো না বুদ্ধু কোথাকার!

—তোমার দিকে চাইলে আমার যে কথা হারিয়ে যায়। আত্মহারা হয়ে পড়ি।

খুব সন্তর্পণে ধৃতি বলল—পরমা সুন্দরী।

পরমা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, এটা আবার কবে থেকে?

—এইমাত্র মনে এল। ভালো না?

—ভেবে দেখি।

—বলছিলাম পরমা সুন্দরী, আজকের ডাকে আমার কি কোনও চিঠি এসেছে?

—এসেছে, কিন্তু দেব না।

—না না, চাইছি না, এলেই হল। আমার যে চিঠি আসছে তার মানে হল এখনও লোকে আমাকে ভুলে যাচ্ছে না, আমি যে বেঁচে আছি তা এখনও কিছু লোক জানে, আর কষ্ট করে যে চিঠি লিখছে তার অর্থ হল আমার মতো অপদার্থকেও লোকের কিছু জানানোর আছে, বুঝলে? চিঠি আসাটাই ইম্পর্ট্যান্ট। চিঠিটা নয়।

—ওঃ, খুব ফিলজফার! আচ্ছা দেব না চিঠি।

—চাইনি তো। চাইছিও না। ধৃতি বলে।

—চাইছে না আবার! ভিতরে ভিতরে ছটফটাচ্ছে! কে চিঠি দিয়েছে বলুন তো? মেয়েলি হাতের লেখা আমি ঠিক চিনি।

—হয়তো দিদি। ধৃতি বলে।

—না, দিদি নয়, খামের বাঁ দিকে চিঠি যে দিয়েছে তার নাম-ঠিকানা আছে।

—তাই বলো! ধৃতি একগাল হেসে বলে—আমি ভাবছি, পরমার এত বুদ্ধি কবে থেকে হল যে হাতের লেখা দেখে মেয়ে না ছেলে বুঝে ফেলবে!

—শুনলে পরমা? জয় ফের খোঁচায়।

পরমা বলে—আমি কালা নই।

—তোমাকে বোকা বলছে।

—বোকা নয়। ধৃতি বলে—আমি বলতে চাইছি পরমা কুটিল নয়, পরমা সরল ও নিষ্পাপ।

—হয়েছে! এই নিন চিঠি। আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

বিছানার ওপর একটা খাম ফেলে দিয়ে পরমা চলে যায়।

ধৃতি ঘড়ি দেখে। সময় আছে। চিঠিটা নিয়ে বিছানায় ফের চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

খামের ওপর বাঁ ধারে লেখা, টুম্পা চৌধুরী। নামের নীচে মধ্য কলকাতার ঠিকানা।

ধৃতি টুম্পা নামে কাউকে মনে করতে পারলো না। চিঠি বেশি বড়ও নয়। খুলে দেখলো কয়েক ছত্র লেখা—শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার দাদা আপনার সঙ্গে পড়ত। দাদার নাম অশোক চৌধুরী। মনে আছে? একটা দরকারে এই চিঠি লিখছি। আমি একটা ডেফিসিট গ্র্যান্টের স্কুলে কাজ করি। আমাদের বিল্ডিংয়ের জন্য একটা গ্র্যান্ট দরকার। আমরা দরখাস্ত করেছি, কিন্তু ধরা করা ছাড়া তো এসব হয় না। আপনার সঙ্গে তো মিনিস্টারদের জানা-শোনা আছে। আমি সামনের সপ্তাহে আপনার অফিসে বা বাসায় গিয়ে দেখা করবো। প্রণাম জানবেন।—টুম্পা চৌধুরী।

টুম্পা মেয়েটা দেখতে কেমন হবে তা ভাবতে ভাবতে ধৃতি উঠে পোশাক পরতে থাকে। জয় চেয়ারে বসে থেকে ঘাড় কাৎ করে ঘুমোচ্ছে।

ধৃতি মেয়েদের অপছন্দ করে না। তবে কিনা তার কিছু বাছাবাছি আছে। মেয়ে মাত্রই তাকে আকর্ষণ করে না। এই যেমন পরমা। এত অসহনীয় সুন্দরী, এত সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবসাব তবু পরমার প্রতি কখনও দুর্বলতা বোধ করে না ধৃতি। অর্থাৎ পরমার চেহারা বা স্বভাবে এমন একটা কিছুর অভাব আছে যা ধৃতির কাছে ওকে কাম্য করে তোলেনি।

এসব বলার মতো কথা নয়। শুধু মনের মধ্যেই এসব কথা চিরকাল থেকে যায়। পরমা বন্ধুপত্নী এবং পরস্ত্রী। কাজেই কোনও রকমেই কাম্য নয়। কিন্তু সে হল বাইরের সামাজিক ব্যাপার। মানুষের মনের মধ্যে তো সমাজ নেই। সেখানে যে রাষ্ট্রের শাসন সেখানে নীতি নিয়ম নেই, অনুশাসন নেই, আছে কেবল মোটা দাগের কামনা, বাসনা, লোভ, ভয়।

২

টুপুর ছবি দেখলেন? কেমন? সুন্দরী নয়? টুপু ছিল মিস এলাহাবাদ। টুপুর কথা আপনাকে কিন্তু লিখতেই হবে।

বিশাল চিঠি। তাতে টুপুর খুন হওয়ার নানা সম্ভব ও অসম্ভব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। টুপু ছিল নিষ্পাপ, পবিত্র, স্বর্গীয় একটি মেয়ে।

চিঠিটা রেখে ধৃতি বরং ফোটোটাই দেখে। মিথ্যে নয় যে মেয়েটি সুন্দরী। এবং মিস এলাহাবাদ হলেও কোনও আপত্তির কারণ নেই। লম্বাটে ছাদের মুখ, বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে কথা ফুটে আছে। কী অসম্ভব সুন্দর টসটসে ঠোঁট দু'খানা! অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

পাশ থেকে অমিত উঁকি দিয়ে বলে—আরে! কার ছবি দেখছেন? দেখি দেখি!

ধৃতি ছবিটা অমিতের হাতে দিয়ে বলে—পাত্রীর মা ছবিটা পাঠিয়েছে।

—বেশ দেখতে। একে বিয়ে করুন।

ধৃতি হেসে চলে—বিয়ে করা শক্ত।

—কেন?

—মেয়েটা এখন অনেক দূরে। সেখানে জ্যান্ত যাওয়া যায় না।

—মরে গেছে?

—তাই তো জানিয়েছে।

—তবে যে বললেন পাত্রী!

—পাত্রী মানে কি বিয়ের পাত্রী? পাত্রীর অর্থ এখানে একটি ঘটনার পাত্রী। মেয়েটা খুন হয়েছে।

—ওঃ! দেখতে ভারী ভালো ছিল মেয়েটা!

ধৃতী গম্ভীর হয়ে বলে—হ্যাঁ, কিন্তু পাস্ট টেনস।

—আপনাকে ছবি পাঠিয়েছে কেন?

—কত পাগল আছে।

নিউজ এডিটর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত পায়ে চলে যেতে যেতেও হঠাৎ থমকে ধৃতির সামনে ঘুরে এসে বললেন—এ সপ্তাহে আপনার ইভনিং শিফট চলছে তো?

—হ্যাঁ।

—কালকের মধ্যে একটা ফিচার লিখে দিতে পারবেন?

—কী নিয়ে?

—ম্যারেজ ল অ্যামেন্ডমেন্ট।

—লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে?

আরে না, না। তাহলে আপনাকে বলা হত না। আপনি শুধু সোশ্যাল ইমপ্যাক্টটার ওপর লিখবেন। কিন্তু কাল চাই।

ধৃতি মাথা নাড়ল।

এখন ইমারজেনসি চলছে। খবরের ওপর কড়া সেনসর। বস্তুত দেওয়ার মতো কোনও খবর নেই। তাই এত ফিচারের তাগিদ। টেলিপ্রিন্টারে যাও বা খবর আসে তার অর্ধেক যায় সেনসরে। ট্রেনে ডাকাতি হওয়ার খবরটাও নিজের ইচ্ছেয় ছাপা যায় না।

ধৃতি উঠে লাইব্রেরিতে চলে আসে। লাইব্রেরিয়ান অতি সুপুরুষ জয়ন্ত সেন। বয়স চল্লিশের কিছু ওপরে, দেখলেও তিরিশও মনে হয় না। চমৎকার গোছানো মানুষ। লাইব্রেরিটা ঝকঝক তকতক করছে।

জয়ন্তী গম্ভীর মানুষ, চট করে কথা বলেন না। একবার তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে একটা মস্ত পুরোনো বই দেখতে থাকেন।

ধৃতি উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলে—দাদা, ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট ল নিয়ে লিখতে হবে।

জয়ন্ত এবার মৃদু একটু হাসলেন। বই থেকে মুখ তুলে বললেন—ফিচার?

—হ্যাঁ।

জয়ন্ত মস্ত টেবিলের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বলেন, হাতটা দেখি। জয়ন্তর ওই এক বাতিক। হাত দেখা আর কোষ্ঠী বিচার। গত শীতে কলকাতা আর ব্যাঙ্গালোর টেস্টম্যাচের ফলাফল আশ্চর্যজনক নিখুঁত বলে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে এক আধটা দারুণ কথা বলে দেন। রিপোর্টার সুশীল সান্যালকে গত বছর জুন মাসে হঠাৎ একদিন ডেকে বললেন—কিছু টাকা-পয়সা হাতে রাখো। তোমার দরকার হবে। আর এই হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছ ফুর্তি লুটছ, তাও কিছুদিন বন্ধ। চুপটি করে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে।

ঠিক তাই হয়েছিল। সুশীলবাবুর পেটে টিউমার ধরা পড়ল পরের মাসে। অপারেশনের পর পাক্কা তিন মাস বিছানায় শোওয়া। টাকা গেল জলের মতো। জয়ন্ত সেনকে তাই সবাই কিছু খাতির করে। এমনিতে মানুষটি বেশি কথা বলেন না বটে কিন্তু বাতিক চাড়া দিলে অ্যাসট্রোলজি নিয়ে অনেক কথা বলতে পারেন।

ধৃতির হাতটা দেখে তিনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—কোষ্ঠী আছে?

—ছিল। এখন নেই।

—হারিয়ে ফেলেছেন?

—আমার কিছু থাকে না। আমি হলাম নাগা সাধু। ভূত ভবিষ্যৎও নেই।

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বললেন—হাতের রেখা তো তা বলছে না।

—কী বলছে তবে?

—ভূত ছিল, ভবিষ্যৎও আছে।

ধৃতি একটু নড়ে বসে বলে—কী রকম?

জয়ন্ত হাতটা ছেড়ে নির্বিকার ভাবে বললেন—দুম করে কি বলা যায়! তবে খুব ইন্টারেস্টিং হাত।

ধৃতি কায়দাটা বুঝতে পারে। খুব আগ্রহ নিয়ে হাতটা দেখে একটু রহস্য জাগানো কথা বলেই যে নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন ওর পিছনে ছোট একটি মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা আছে। ধৃতি যে হাত দেখায় বিশ্বাসী নয় তা বুঝে তিনি ওই চাল দিলেন। দেখতে চাইছেন এবার ধৃতি নিজেই আগ্রহ দেখায় কিনা।

ধৃতি আগ্রহ দেখায় না। আবার বলে—কিন্তু আমার ল-এর কী হবে?

—হবে। আমার কাছে কাটিং আছে। বলে জয়ন্ত আবার মৃদু হেসে যোগ করলেন—কেবল আমার কাছেই সব থাকে।

—সেটা জানি বলেই তো আসা।

কলিংবেলে বেয়ারা ডেকে কাটিং বের করে দিতে বললেন জয়ন্ত।

রিডিং-এর ফাঁকা টেবিলে বসে বিভিন্ন খবরের কাগজের কাটিং থেকে ধৃতি অ্যামেন্ডমেন্ট ল সম্পর্কে তথ্য টুকে নিচ্ছিল প্যাডে। এসব অবশ্য খুব কাজে লাগবে না। তাকে ঘুরে ঘুরে কিছু মতামত নিতে হবে। সাক্ষাৎকার না হলে ব্যাপারটা সুপাঠ্য হবে না। আইন শুকনো জিনিস, কিন্তু মানুষ কেবল আইন মানা জীব নয়।

নতুন সংশোধিত আইনে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে ভারী সহজলভ্য। মামলা করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেপারেশন পাওয়া যাবে। আগে আইন ছিল, ডিভোর্সের পর কেউ এক বছর বিয়ে করতে পারবে না, নতুন আইনে সে সময় কমিয়ে অর্ধেক করে দেওয়া হচ্ছে। এসব ভালো না মন্দ তা ধৃতি জানে না। ডিভোর্স সহজলভ্য হলে কী হয় তা সে বোঝে না। তবে এটা বোঝে যে ডিভোর্সের কথা মনে রেখে কেউ বিয়ে করে না।

জয়ন্ত উঠে বাইরে যাচ্ছিলেন। টেবিলের সামনে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে বললেন—পেয়েছেন সবকিছু?

ধৃতি মুখ তুলে হেসে বললে—এভরিথিং।

—চলুন চা খেয়ে আসি? ফিরে এসে লিখবেন।

ধৃতি উঠে পড়ে। শিফটে এখনও কাজ তেমন শুরু হয়নি। সন্ধের আগে বড় খবর তেমন কিছু আসে না। তাছাড়া খবরও নেই। প্রতিদিনই ব্যানার করবার মতো খবরের অভাবে সমস্যা দ্যাখা দেয়। আজ কোনটা লীড হেডিং হবে সেটা প্রতিদিন মাথা ঘামিয়ে বের করতে হয়। সারাদিন টেলিপ্রিন্টার আর টেলেক্স বর্ণহীন গন্ধহীন জোলো খবরের রাশি উগরে দিচ্ছে। কাজেই খবর লিখবার জন্য এক্ষুনি তাকে ডেস্কে যেতে হবে না।

ধৃতি ক্যান্টিনের দিকে জয়ন্তর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলে—আপনি মানুষের মুখ দেখে কিছু বলতে পারেন?

জয়ন্ত বলেন—মুখ দেখে অনেকে বলে শুনেছি। আমি তেমন কিছু পারি না। তবে ভূত ভবিষ্যৎ বলতে না পারলেও ক্যারেক্টারিস্টিক কিছু বলা যায়।

—ফটো দেখে বলতে পারেন।

—ফটো প্রাণহীন বস্তু, তবু তা থেকেও আন্দাজ করা সম্ভব। কেন বলুন তো?

ক্যান্টিনে চা নিয়ে মুখোমুখি বসার পর ধৃতি হঠাৎ খুব কিছু না ভেবেচিন্তে টুপুর ফটোটা বের করে জয়ন্তকে দেখিয়ে বলে—বলুন তো কেমন মেয়ে?

জয়ন্ত চায়ে চুমুক দিয়ে ফটোটা হাতে নিয়ে বলেন—তাই বলুন। এতদিনে তাহলে বিয়ের ফুল ফুটতে যাচ্ছে! তবে ম্যাট্রিমোনিয়াল ব্যাপার হলে ফটোর চেয়ে কোষ্ঠী অনেক

সেফ। মেয়েটার কোষ্ঠী নেই?

ধৃতি ঠোঁট উলটে বলে—মেয়েটিই নেই।

—সে কী! বলে জয়ন্ত ছবিটা আর একবার দেখে ধৃতির দিকে তাকিয়ে বলেন—তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক জেনে কী হবে? মারা গেছে কবে?

—তা জানি না। তবে বলতে পারি খুন হয়েছে।

—খুন! ও বাবাঃ, পুলিশ কেস তাহলে! বলে জয়ন্ত ছবিটা ফেরত দিতে হাত বাড়িয়ে বললেন—তাহলে আর কিছু বলার নেই।

—আছে। ধৃতি বলে—ধরুন, মেয়েটার চরিত্রে এমনকী আছে যাতে খুন হতে পারি তা ছবি থেকে আন্দাজ করা যায় না?

জয়ন্ত গম্ভীর চোখে চেয়ে বলেন—মেয়েটি আপনার কে হয়?

—কেউ না।

—পরিচিতা তো। প্রেম-ট্রেম ছিল নাকি?

—আরে না দাদা, চিনতামই না।

—তবে অত ইন্টারেস্ট কেন? পুলিশ যা করবার করবে।

—পুলিশ তার কাজ করবে। আমার ইন্টারেস্ট মেয়েটির জন্য নয়।

—তবে?

—অ্যাসট্রোলজির জন্য।

ছবিটা আবার নিয়ে জয়ন্ত তাঁর প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পকেট থেকে বের করে চোখে আঁটলেন। তাতেও হল না। একটা খুদে আতস কাচ বের করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন ছবিটা। চা ঠান্ডা হয়ে গেল। প্রায় আট দশ মিনিট বাদে জয়ন্ত আতস কাচ আর চশমা রেখে ছবিটা দু'আঙুলে ধরে নাড়তে নাড়তে চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন—মেয়েটা খুন হয়েছে কে বললো?

—ওর মা।

—তিনি আপনার কে হন?

—কেউ না। চিনিই না। একটা ফোন-কলে প্রথম খবর পাই। আজ একটা চিঠিও এসেছে। দেখুন না। বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দেয়। জয়ন্ত খুব আলগা ভাবে চিঠিটা পড়লেন না। পড়লেন খুব মন দিয়ে। অনেক সময় নিয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট চলে গেল।

তারপর মুখ তুলে বললেন—আমি মুখ দেখে তেমন কিছু বলতে পারি না বটে, কিন্তু আমার একটা ফিলিং হচ্ছে যে মেয়েটা মরেনি।

—বলেন কি?

জয়ন্ত আবার চা আনলেন। গম্ভীর মুখে বসে চা খেতে খেতে চিন্তা করে বললেন—আপনি জ্যোতিষবিদ্যা মানেন না?

—না। মানে, তেমন মানি না।

—বুঝেছি। কিন্তু মানেন না কেন? যেহেতু সেকেন্ডহ্যান্ড নলেজ তাই না?

—তাই।

—তবে আপনাকে যুক্তিবাদী বলতে হয়। না?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আসলে আপনি যুক্তিবাদী নন, আপনার মনন বৈজ্ঞানিক সুলভ নয়।

—কেন?

—একটা ফোন-কল, একটা চিঠি আর একটা ফটো—মাত্র এই জিনিসগুলোর ভিত্তিতে আপনি কি করে বিশ্বাস করছেন যে মেয়েটা খুন হয়েছে?

—তবে কি হয়নি?

—না। আমার মন বলছে শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ।

—কি করে বললেন?

—বলছি তো আমার ধারণা।

—কোনও লজিক্যাল বেস নেই ধারণাটার?

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললেন—আপনি আচ্ছা লোক মশাই। মেয়েটা যে মরে গেছে, আপনার সে ধারণাটারও তো কোনও লজিক্যাল বেস নেই। আপনাকে একজন জানিয়েছে যে টুপু মারা গেছে বা খুন হয়েছে। আপনি সেটাই ধ্রুব বলে বিশ্বাস করছেন।

জয়ন্ত সেন ছবিটার দিকে আবার এতদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আপন মনে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন—খুব সেনসিটিভ, অসম্ভব সেন্টিমেন্টাল, মনের শক্তি বেশ কম, অন্যের দ্বারা চালিত হতে ভালোবাসে।

—কে? ধৃতি চমকে প্রশ্ন করে।

জয়ন্ত ছবিটার দিকে চেয়ে থেকেই বলে—আপনার টুপু সুন্দরী।

—আমার হতে যাবে কেন?

—দেখি আপনার হাতটা আর একটু! বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে ধৃতির ডান হাতটা টেনে নিলেন।

ফটোগ্রাফার সৌরীন এক প্লেট মাংস আর চার পিস রুটি খেয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে টেবিলের ধারে এসে বলে—আমার হাতটা দেখবেন না জয়ন্তদা?

—পরে। জয়ন্তর গম্ভীর উত্তর।

—অনেকদিন ধরে ঝোলাচ্ছেন। ধৃতিবাবু, কী খবর?

—ভালো।

সৌরীন হঠাৎ ঝুঁকে ছবিটা দেখে বলে—বাঃ, দারুণ ছবিটা তুলেছে তো! ফটোগ্রাফার কে?

ধৃতি হাসল। সৌরীন পেশাদার ফটোগ্রাফার, তাই মেয়েটার চেয়ে ফটোর সৌন্দর্যই তার কাছে বেশি গুরুতর।

ধৃতি বলে—মেয়েটা কেমন?

—ভালো। সৌরীন বলে—তবে ফ্রন্ট ফেস যতটা ভালো প্রোফাইল ততটা ভালো কিনা কে জানে! মেয়েটা কে?

—চিনবেন না। ধৃতি বলল।

সৌরীন চলে গেলে জয়ন্ত ধৃতির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—হুঁ।

—হুঁ মানে?

—মানে অনেক ব্যাপার আছে। আপনার বয়স এখন কত?

—উনতিরিশ বোধহয়। কম বেশি হতে পারে।

—একটা ট্র্যানজিশন আসছে।

—কী রকম?

—তা হুট করে বলি কেমন করে?

—কবে?

—শীগগিরই।

ধৃতি অবশ্য এসব কথার গুরুত্ব দেয় না। সারা জীবনে সে কখনও ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। যা কিছু হয়েছে বা করেছে সে, তা সবই নিজের চেষ্টায়, পরিশ্রমে।

ধৃতি বলল—খারাপ নয় তো?

—হয়তো খারাপ। হয়তো ভালো।

ধৃতি হাসল। বলল—এবার আসুন ডিম খাই—আমি খাওয়াচ্ছি।

দুজনে ওমলেট খেতে লাগল। খেতে খেতে ধৃতি বলে—জয়ন্তদা, আপনি টুপুর কেসটা যত সিরিয়াসলি দেখছেন ততটা কিছু নয়।

—তাই নাকি? নিস্পৃহ জবাব জয়ন্তর।

—ওর মা চাইছে খবরটা কাগজে বেরোক।

—খবরদার বের করবেন না।

—আরে মশাই আমি ইচ্ছে করলেই কি বের করতে পারব নাকি? কাগজ তো আমার ইচ্ছেয় হাবিজাবি খবর ছাপবে না।

—তা হলেও আপনি কোনও ইনিশিয়েটিভ নেবেন না। মেয়েটার মা ফোনে আপনাকে কী বলেছিল?

—এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ক-কল করেছিল। রাত তখন দুটো-আড়াইটে। শুধু বলছিল টুপুকে খুন করা হয়েছে, আপনি খবরটা ছাপবেন।

—চিঠিটা কবে এল?

—আজ।

—দেখি। বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর চিঠি ফেরত দিয়ে জয়ন্ত হেসে বললেন—আপনি মশাই দিনকানা লোক।

—কেন?

—চিঠিটা ভালো করে দেখেছেন?

—দেখেছি তো।

—কিছুই দেখেননি। চিঠির ওপর এলাহাবাদের ডেটলাইন। কিন্তু খামের ওপর কলকাতা উনতিরিশ ডাকঘরের শিলমোহর, সেটা লক্ষ করেছেন?

ধৃতি একটা চমক খেয়ে তাড়াতাড়ি খামটা দেখে। খুবই স্পষ্ট ছাপ। ভুল নেই।

ধৃতি বলে—তাই তো!

জয়ন্ত বলেন—এবার টেলিফোনটার কথা বলুন তো।

—সেটা এলাহাবাদের ট্রাঙ্ক-কলই ছিল।

—কী করে বুঝলেন?

—অপারেটার বললো যে।

—অপারেটারের গলা আপনি চেনেন?

—না।

—তবে?

—তবে কী?

—অপারেটার সেজে যে-কেউ ফোনে বলতে পারে এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ক-কলে আপনাকে ডাকা হচ্ছে। অফিসের অপারেটারও সেটা ধরতে পারবে না।

—সেটা ঠিক।

—আমার সন্দেহ সেই ফোন-কলটা কলকাতা থেকেই এসেছিল।

ধৃতি হঠাৎ হেসে উঠে বলে—কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছিল বলছেন?

—জোক কিনা জানি না, তবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড এফেকটিভ। আপনি তো ভোঁতা মানুষ নন, তবে মিসলেড হলেন কী করে? এবার থেকে একটু চোখ-কান খোলা রেখে চলবেন।

ধৃতি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল ফের।

ধৃতি মদের ভক্ত নয়। কোনও গোঁড়ামি নেই, কিন্তু মদ খেলেই তার নানারকম শারীরিক অসুবিধে হতে থাকে। কখনও আধকপালে মাথা ধরা, কখনও পেটে প্রচণ্ড গ্যাস জমে, কখনও দমফোট হয়ে হাঁসফাঁস লাগে। কাজেই পারতপক্ষে সে মদ ছোঁয় না।

অফিস থেকে আজ একটু আগে আগে কেটে পড়ার তালে ছিল সে। ছ'টায় ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে গ্যারি কুপারের একটা ফিল্ম দেখাবে। ধৃতি কার্ড পায়। প্রায়ই ছবি দেখা তার হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ ছবিটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল তার।

আজ চিফ সাব-এডিটার তারাপদবাবু কাজে বসেছেন। বয়স্ক লোক এবং প্রচণ্ড কাজপাগল। কোন খবরের কতটা ওজন তা তাঁর মতো কেউ বোঝে না।

ধৃতি গিয়ে বলল—তারাপদদা, আজ একটু আগে আগে চলে যাব।

—যাবে? বলে তারাপদবাবু মুখ তুলে একটু হেসে ফের বললেন—তোমার আর কি? কর্তারা ফিচার লেখাচ্ছেন তোমাকে দিয়ে। তুমি হলে যাকে বলে ইম্পর্ট্যান্ট লোক।

এটা অবশ্য ঠেস-দেওয়া কথা। কিন্তু তারাপদবাবুর মধ্যে হিংসা-দ্বেষ বড় একটা নেই। ভালোমানুষ রসিক লোক। তাই কথাটার মধ্যে বিষ নেই।

ধৃতি হেসে বলে—ইম্পর্ট্যান্ট নয় তারাদা, আমি হচ্ছি আসলে ইম্পোটেন্ট।

তারাপদবাবু মুখখানা খুব কেজো মানুষের মতো গম্ভীর করে পিন আঁটা একটা মোটাসোটা খবরের কপি ধৃতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এ খবরটা করে দিয়ে চলে যাও। এটা কাল লিড হতে পারে। বেশি বড় করো না।

ঘড়িতে চারটে বাজে। কপি লিখতে ধৃতির আধঘণ্টার বেশি লাগবে না। তাই তাড়াহুড়ো না করে ধৃতি নিজের টেবিলে কপিটা চাপা দিয়ে রেখে সিনেমার ডিপার্টমেন্টে আড্ডা মারতে গেল।

কালিবাবু চুলে কলপ দিয়ে থাকেন। চেহারাখানা জমিদার জমিদার ধরনের। ভারী শৌখিন লোক। এক সময়ে সিনেমায় নেমেছিলেন, পরে কিছুদিন ডিরেকশন দিলেন। তিন-চারটে ছবি ফ্লপ করার পর হলেন সিনেমার সাংবাদিক। এখন এ পত্রিকার সিনেমার পাতা এডিট করেন।

ধৃতিকে দেখে বলেন—কি ভায়া, হাতে নাকি একটা ভালো মেয়েছেলে আছে! থাকলে দাও না, সিনেমায় নামিয়ে দিই। বাংলা ছবিতে নায়িকার দুর্ভিক্ষ চলছে দেখছ তো!

ধৃতি অবাক হয়ে বলে—ভালো মেয়ে! আমার হাতে কোত্থেকে মেয়ে থাকবে কালিদা?

—কেন, এই তো সৌরীন বলছিল তুমি নাকি একটা ঘ্যাম মেয়েছেলের ছবি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছ!

—ওঃ! বলে ধৃতি বসে।

—দাও না মেয়েটার ঠিকানা। তোমার রিলেটিভ হলেও ক্ষতি নেই। আজকাল লাইন অনেক পরিষ্কার, কারও চরিত্র নষ্ট হয় না।

—সে জন্য নয়। অন্য অসুবিধে আছে।

—কেন লেজে খেলাচ্ছ ভাই?

—সৌরীন কিছু জানে না। শুধু ছবিটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে এসে আপনাকে বলেছে।

—অসুবিধেটা কী?

—যতদূর শুনছি মেয়েটা বেঁচে নেই।

ধৃতি দ্বিধায় পড়ে যায়। জয়ন্ত সেন বার বার বলেছিলেন—শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ। সে কথাটা মনে পড়ে যায়।

ধৃতি বললে—ঠিক চিনি না। তবে জানি। মরার খবরটা অবশ্য উড়ো খবর।

কালিবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন—সুন্দরী মেয়েরা মরবে কেন?

—সেটাই তো প্রবলেম।

—মোটেই কাজটা ভালো নয়। সুন্দরী মেয়েদের মরা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

ধৃতি একটু মৃদু হেসে বলে—এ মেয়েটাকে নিয়ে একটু মিস্ট্রি দেখা দিয়েছে। জয়ন্তদা ছবিটা দেখে বললেন—মেয়েটা নাকি মরেনি। অথচ আমার কাছে খবর আছে—

দেখি ছবিটা। আছে? বলে হাত বাড়ায় কালিবাবু।

ছবিটা আজকাল ধৃতির সঙ্গেই থাকে। কেন থাকে তা বলা মুশকিল। কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে ধৃতি এই ছবিটার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সব সময়ে তার মনে হয় এ ছবিটা খুব মারাত্মক একটা দলিল। কালিবাবু ছবিটা নিয়ে দেখলেন। সিনেমা লাইনের অভ্যস্ত প্রবীণ চোখ। উলটে-পালটে দেখে ছবিটা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে বলেন—মেয়েটার নাম-ঠিকানা দিতে পারো?

—নাম টুপু। ঠিকানা মুখস্থ নেই, তবে আছে বাড়িতে। এলাহাবাদের মেয়ে।

—ও। একটু দূর হয়ে গেল, নইলে আজই বাড়িতে হানা দিতাম গিয়ে।

—কেমন বুঝছেন ছবিটা?

—খুব ভালো। তবে সিঙ্গল ফটোগ্রাফ নয়।

—তার মানে?

—মানে এটা একটি জোড়ার ছবি। এর পাশে আর কেউ ছিল। কিন্তু নেগেটিভ থেকে আলাদা করে শুধু মেয়েটার ছবি প্রিন্ট করা হয়েছে।

ধৃতি অবাক হয়ে বলে—কী করে বুঝলেন?

কালিবাবু হেসে বলেন—যা বলছি তা হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট বলে ধরে নিতে পার। ছবিটা আবার ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে। ধৃতি ছবিটা ফের নেয়। এ পর্যন্ত অসংখ্য বার দেখেছে তবু বুঝতে পারেনি তো।

কালিবাবু বুঝিয়ে দেন—এই ডান পাশে মেয়েটার হাত ঘেঁষে একটু সাদা জমি দেখতে পাচ্ছ?

—হ্যাঁ। ওটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড।

—তোমার মাথা।

—তবে কী ওটা?

—ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে লাইট অ্যাশ কালার, এই সাদাটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা। ভালো করে দ্যাখো, দেখছ?

—হ্যাঁ.

—মানুষের কাঁধের ঢালু বুঝতে পারো না? সাদার ওপর অংশটা একটু বেঁকে গেছে দেখছ?

হ্যাঁ।

—অর্থাৎ মেয়েটির পাশে সাদা বা লাইট রঙের কোনও জামা পরা এক রোমিও ছিল। এ ছবিটায় তাকে বাদ রাখা হয়েছে। মেয়েটাকে তুমি একদম চেনো না?

—না।

—তবে এ ছবিটা এলো কোথা থেকে?

—এলো।

—খোঁজ নাও। এ মেয়েটা ফিল্মে এলে হই-চই পড়ে যাবে।

খোঁজ নিতে তো এলাহাবাদ যেতে হয়!

—যাবে। আমি ফিনান্স করব।

ধৃতির ফের মনে পড়ে, চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসেনি, এসেছে কলকাতা থেকে। মনে পড়ে, জয়ন্ত সেন সেদিন বলেছিলেন, ট্রাঙ্ক-কলটা স্রেফ ধোঁকাবাজি হতে পারে।

ধৃতি নড়েচড়ে বসে বলে—আচ্ছা কালিদা, আপনার কি মনে হয় মেয়েটা বেঁচে আছে?

কালিবাবু ছবিটা ফের দেখছিলেন হাতে নিয়ে। পুরু চশমার কাচের ভিতর দিয়ে চেয়ে বললেন—থাকাই উচিত। মরবে কেন হে?

—ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারেন? মানে কোনও ফিলিং হয়?

—খুব হয়? একটা ফিলিং হয়। বলে কালিবাবু বদমাসের মতো হেসে বলেন—সেক্স জেগে ওঠে।

—দূর! কোনও আনক্যানি ফিলিং হয় না?

—তুমি একটা বুদ্ধু। সুন্দরী মেয়েছেলে দেখে আনক্যানি ফিলিং হতে যাবে কোন দুঃখে?

—যাই, কপি পড়ে আছে। বলে ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল।

—আরে বসো বসো। চা খাও। রাগ করলে নাকি? আমি আবার একটু পষ্ট কথা বলি তো? বলে কালিবাবু ধৃতিকে বসিয়ে টেলিফোনে ক্যান্টিনকে চা পাঠাতে বলেন।

ধৃতি সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে বলে—আপনারা আমাকে ভারী মুশকিলে ফেললেন দেখছি।

—কী রকম?

—আমাকে মেয়েটার মা জানিয়েছিল যে টুপু মরে গেছে। আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম।

—তারপর?

—তারপর জয়ন্তবাবু ছবিটা দেখে বললেন তাঁর মনে হচ্ছে যে মেয়েটা বেঁচে আছে।

—বটে!

—তাঁর কথা উড়িয়েও দিতে পারছি না।—তার কারণ হল চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসার কথা, কিন্তু এসেছে কলকাতা থেকে।

—ভারী রহস্যময় ব্যাপার তো।

—আরও রহস্য হল যে আপনি আবার মেয়েটার পাশে এক অদৃশ্য রোমিওকে আবিষ্কার করলেন। তার মানে আরও জটপাকাল। মেয়েটার মা চেয়েছিল আমি মৃত্যু-সংবাদটা কাগজে বের করে দিই।

—খবরদার ওসব করো না।

—কেন?

—সুন্দরীরা মরে না। তারা অমর। স্ত্রীলিঙ্গে বোধহয় অমরা বা অমরী কিছু একটা হবে।

—সে যাই হোক, খবর বের করার এক্তিয়ার আমার নেই। এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু আমি বেশ ফাঁপরে পড়ে যাচ্ছি ক্রমে।

—ফাঁপরের কি আছে? খোঁজ নাও। তবে পুলিশ কেস হলে গা বাঁচিয়ে সরে এসো। ছবিটার মধ্যে একটু বদ গন্ধ আছে।

—তার অর্থ?

—অর্থাৎ মেয়েটা খুব ইনোসেন্ট নয়। চোখ-মুখ যত সুন্দরই হোক, এর মধ্যে একটা ইনহেরেন্ট দুষ্টুমি আছে। অ্যাডভেনচারাস টাইপ। পাশের ছোকরাটিকে দেখতে পেলে হতো। যাকগে, তুমি গ বাঁচিয়ে চলবে। ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল। কালিবাবু হাত তুলে থামিয়ে ফের বললেন—সিনেমায় নামাটা তেমন কোনও ব্যাপার নয়। ভেবো না যে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আমি তাকে সিনেমায় নামাবার জন্য পাগল হই।

—বুঝলাম।

কালিবাবু একটু হেসে বলেন—আসলে জয়ন্তই আমাকে ব্যাপারটা বলছিল গতকাল। তখন থেকেই ভাবছিলাম তোমাকে ডেকে একটু ওয়ার্নিং দিই।

—ওয়ার্নিং কেন?

—তুমি কাঁচা বয়সের ছেলে, কোথায় কোন ঘুণচক্করে পড়ে যাবে। মেয়েছেলে জাতটা যখন ভালো থাকে ভালো, যখন খারাপ হয় তখন হাড়বজ্জাত।

—তাই বলুন! জানতেন।

—জানতাম। আর এও বলি যে টুপুর মা ফের তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

—তা করবে।

—তুমি একটু রসের কথা-টথা বোলো। সিমপ্যাথি দেখাবে খুব। যদি দ্যাখা করতে চায় তো রাজি হয়ে যেও।

—আচ্ছা।

ধৃতি উঠল।

৪

বুধবার জয় গেল দিল্লি। স্বভাবতই একা বাড়িতে ধৃতি আর পরমার থাকা সম্ভব নয়। ধৃতির যাওয়ার জায়গা নেই তেমন। পরমার আছে। তাই পরমা গেল বাপের বাড়ি। সেই সঙ্গে ছুঁড়ি ঝিটাকেও নিয়ে গেল। গোটা ফ্ল্যাটে ধৃতি একা।

অবশ্য ধৃতি আর কতটুকুই বা ফ্ল্যাটে থাকে। তার আছে অফিস, আড্ডা, ফিচার লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে ঘুরে বেড়ানো। রাতে নাইট ডিউটি নেই বলে শুধু সেই সময়টুকু সে ফ্ল্যাটে থাকে।

রাত ন'টা নাগাদ ধৃতি অফিসে একটা বড় পলিটিক্যাল কপি লেখা শেষ করলো। খুব পরিশ্রম গেছে। এইবার ছুটি। চলে যাওয়ার আগে সে এর ওর তার সঙ্গে কিছু খুনসুটি করে রোজই। আজ বুড়ো ডেপুটি নিউজ এডিটার মদনবাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিল।

ঠিক এইসময়ে চিফ সাব-এডিটার ডেকে বললেন—তোমার ফোন হে!

ধৃতি 'হ্যালো' শুনেই কেঁপে ওঠে একটু। টুপুর মা।

—বলুন। ধৃতি বলে।

—চিঠি তো পেয়েছেন!

—পেয়েছি!

—ছবিটা দেখলেন?

—হুঁ।

—কেমন?

—টুপু খুবই সুন্দরী।

—আপনাকে তো বলেইছিলাম যে টুপুকে সবাই মিস এলাহাবাদ বলতো। আমার টুপু ছিল সাঙঘাতিক সুন্দরী।

—হুঁ।

—খবরটা কবে ছাপা হবে?

ধৃতি একটু ইতস্তত করে বলে—দেখুন এসব খবর ছাপার এক্তিয়ার তো আমাদের নেই।

—আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

—না পারি না।

—দোহাই! প্লিজ! আমার টুপু আপনাদের কাছে কিছুই না জানি। কিন্তু ওর খবরটা ছাপা হলে আমি বড় শান্তি পাব। মায়ের ব্যথা তো বোঝেন না আপনারা!

—শুনুন। প্রথম কথা, টুপু যদি নাম করা কেউ হত তবে খবরটা ছাপা সহজ হয়ে যেত। যদি খুনের কেস আদালতে উঠত তাও অসুবিধে হত না। কিন্তু শুধু অ্যাসাম্পশনের ওপর তো আমরা কিছু করতে পারি না।

—দু'চার লাইনও নয়?

—না। তবে আপনি ইচ্ছে করলে বিজ্ঞাপন দিয়ে খবরটা ছাপতে পারেন। কিন্তু তাতে খুনের উল্লেখ থাকলে চলবে না।

—কিন্তু আমি যে সবাইকে টুপুর খুনের খবরটাই জানাতে চাই।

—তাহলে আপনি পুলিশের থ্রুতে প্রসিড করুন। যদি মামলা হয় তাহলে আমি খবরটা ছেপে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। আর নইলে খুনের যথেষ্ট এভিডেনস চাই। এলাহাবাদের লোকাল কাগজে কি খবরটা বেরিয়েছিল?

—না।

—তবে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি পুলিশকে কিছু জানাননি?

—জানিয়েছি, কিন্তু তারা কোনও গা করছে না।

—কেন?

—তারা এটাকে খুন বলে মনে করছে না যে। তারা লাশ চায়।

—লাশ! কেন, লাশ পাওয়া যায়নি?

—না। কী করে যাবে? টুপুকে যে একটা পাহাড়ি নদীতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

—কোথায়?

টুপুর মা একটু চুপ করে থাকেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলেন—কোথায় তা আমি ঠিক জানি না।

—তাহলে খুন বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? সাক্ষী আছে?

—ন ন নাঃ।

—তবে কী করে জানলেন?

—ওরা কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে যায় আরও অনেক জায়গায়। সবশেষে ঘটনাটা ঘটে মাইথনে।

—মাইথনে?

—খুব নির্জন জায়গা। ওরা ফরেস্ট বাংলোতে থাকত।

—কারা? টুপু আর কে?

—ওঃ সে ঠিক জানি না।

—না জানলে কী করে হবে? টুপু কার সঙ্গে গিয়েছিল তা আপনার খোঁজ নেওয়া উচিত।

—কী করে নেব? আমি অনাথা বিধবা। টুপুর তো বাবা নেই, ভাইবোন নেই। টুপু একটিমাত্র। তবে আমাদের টাকা অছে। অনেক টাকা। খবরটা ছাপানোর জন্য যদি টাকা খরচ করতে হয়তো আমি পিছুপা হব না। বুঝলেন? টুপুই যখন নেই তখন এত টাকা আমার কোন কাজে লাগবে? আমি আপনাকে খবরটা ছাপানোর জন্য হাজার টাকা দিতে পারি। রাজি?

—না। ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে—টাকা থাকলে আপনি বরং তা সৎ কাজেই ব্যয় করুন খবরটা ছাপা গেলে আমি এমনিতেই ছাপতাম।

—কিছুতেই ছাপা যাবে না?

ধৃতি হঠাৎ প্রশ্ন করে—আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

টুপুর মা খানিক নিস্তব্ধ থেকে বললেন—কেন বলুন তো?

—এলাহাবাদ থেকে কি?

আবার খানিক চুপচাপ থাকার পর টুপুর মা বলেন—না—

—তবে কি কলকাতা থেকে?

—হ্যাঁ। আমি কাল কলকাতায় এসেছি।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—আপনার চিঠিটাও কিন্তু কলকাতা থেকে ডাকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও চিঠিতে ডেটলাইন ছিল এলাহাবাদের। টুপুর মা লজ্জার স্বরে বলেন—সে একটা কাণ্ড। আমার একজন চেনা লোককে চিঠিটা ডাকে দিতে দিই। সে সেইদিনই কলকাতা যাচ্ছিল। তাই একেবারে কলকাতায় গিয়ে ডাকে দিয়েছে। কিছু মনে করেছিলেন বোধহয়!

—না, মনে কী করব? এরকম হতেই পারে।

—আপনি হয়তো কিছু সন্দেহ করেছিলেন?

বিব্রত ধৃতি বলে—না না।

—আমি কলকাতায় এসেছিলাম টুপুর ব্যাপারেই। টুপু কলকাতায় কোথায় ছিল তা আমি জানি না। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ নিচ্ছি। কেউ কিছু বলতে পারছে না।

—টুপু কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল।

—কেন, বলিনি আপনাকে সে কথা?

—না।

টুপুর মা একটু হেসে বললেন—ওমা! আমারই ভুল তবে। যাহোক, আজকাল আমার মেমরিটা একদম গেছে। হ্যাঁ, টুপু তো পালিয়েই এসেছিল। টুপু যত সুন্দরী ছিল ততটা শান্ত বা বাধ্য ছিল না। খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপ।

—ও। তা পালাল কেন?

—আমি যা বারণ করতাম তাই করবো এই ছিল স্বভাব টুপুর। ও খানিকটা ছেলের মতো মানুষ হয়েছিল তো। সাইকেল, সাঁতার, গাড়ি চালানো, বন্দুক ছোঁড়া সব জানতো।

—খুব চৌখোস মেয়ে তো!

—খুব। একস্ট্রা-অর্ডিনারি যাকে বলা যায়।

—পালালো কেন তা তো বললেন না।

—টুপুর যে বিয়ের ঠিক হয়েছিল!

—টুপু বিয়েতে রাজি ছিল না বুঝি?

—না। ও বলত আর একটু বয়স হলে সে মাদার টেরেসার আশ্রমে বা সৎসঙ্গ কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যাবে। সারা জীবন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে।

—কেন?

—ও পুরুষদের পছন্দ করতো না। না, কথাটা ভুল বলা হল। আসলে ও কখনও তেমন পুরুষ দেখেনি যাকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করা যায়। সব পুরুষ মানুষকেই ও খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। বলত—এদের কাউকে বিয়ে করা যায় না।

—কিন্তু পালানোর ব্যাপারটা তো বললেন না।

—বলছি। আমরা ওর বিয়ে ঠিক করি একজন ব্রিলিয়ান্ট অ্যামেরিকা ফেরত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। দারুণ ছেলে। টুপুর আপত্তি আমরা শুনিনি।

—কেন?

—শুনিনি তার কারণ চট করে এরকম ভালো পাত্র কি পাওয়া যায়, বলুন? যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব, দেদার টাকা রোজগার করে, হাই পোজিশনে চাকরি করছে।

—তারপর?

—আশীর্বাদের আগের দিন টুপু একটা চিঠি লিখে রেখে চলে গেল। কাউকে, এমনকী আমাকে পর্যন্ত জানিয়ে যায়নি।

—সঙ্গে কেউ যায়নি?

—কী করে বলব?

—কলকাতায় গিয়েছিল কী করে জানলেন?

—সেখান থেকে আর একটা চিঠি দেয়। তাতে লেখে—আমি খুব ফুর্তিতে আছি। এবার বেড়াতে যাব দার্জিলিং, নেতারহাট, মাইথন, আরও কয়েকটা জায়গার নাম লেখে। সব মনে নেই।

—কিন্তু মারা যাওয়ার ব্যাপারটা?

—ওঃ হ্যাঁ। মাইথন থেকে ওর শেষ চিঠি। তাতে ও খুব মন খারাপের কথা লিখেছিল। জানিয়েছিল যে কে বা কারা ওর পিছু নিয়েছে। তারা ওর ভালো করতে চায় না, ক্ষতি করতে চায়।

—তারপর?

—তারপর আর কোনও খবর নেই। তবে আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখি যে টুপু উঁচু থেকে জলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। আপনি কখনও মাইথনে গেছেন?

—গেছি।

—আমি যাইনি। জায়গাটা কেমন?

—সুন্দর।

—সেখানে পাহাড় আছে?

—আছে। তবে ছোট পাহাড়।

—টুপুও তাই লিখেছিল। সেখানে কী একটা বিখ্যাত মন্দির আছে না?

—আছে। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির।

—সেখানে সেই মন্দিরে ঢোকবার গলিতে নাকি কারা টুপুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে শাসিয়েছিল যে মেরে ফেলবে।

—কিন্তু কেন?

—সে তো জানি না। টুপুর মতো মেয়ের কি শত্রু থাকতে পারে? তবু ছিল, জানেন। আর টুপু যে খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের ছিল!

—বুঝলাম। কিন্তু টুপুর সঙ্গে কেউ ছিল না?

—হয়তো ছিল। তাদের কথা টুপু লিখত না।

—কলকাতায় আপনাদের আত্মীয়স্বজন নেই?

—আমার শ্বশুরবাড়ি এখানে। তবে আমার দিককার কোনও আত্মীয় এদিকে থাকে না। আমার বাপের বাড়ি গোরক্ষপুরে, তিন পুরুষের বাস।

—টুপু কি তার বাপের বাড়িতে উঠেছিল?

—টুপুর মা হেসে বললেন, টুপুর বাপের বাড়ি বলতে অবশ্য এলাহাবাদের বাড়িই বোঝায়। তবে এখানে আমার স্বামীর খুড়তুতো ভাইটাই আছেন। বাড়ির একটা অংশ অবশ্য আমাদের। সে অংশ তালা দেওয়া থাকে, আমরা কলকাতায় এলে সেখানেই উঠি। কিন্তু টুপু এ বাড়িতে আসেনি।

ধৃতি একক্ষণ পরে টের পেল যে সে খামোখা এত কথা বলছে বা শুনছে। শুনে তার কোনও লাভ নেই। টুপুর ব্যাপারে তার কারও কিছু নেই।

ধৃতি বলল—সবই বুঝলাম। কিন্তু সিমপ্যাথি জানানো ছাড়া আর কী করতে পারি বলুন?

—শুনুন। দয়া করে আপনার বাসার ঠিকানাটা দেবেন?

—কেন?

—বিরক্ত হবেন না। ঠিকানাটা থাকলে আমি যদি দরকারে পড়ি তাহলে কন্ট্যাক্ট করতে পারব। আমি কলকাতার কিছুই চিনি না। আমার দেওররাও খুব সিমপ্যাথেটিক নয়। আমি আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য পেলে খুব উপকৃত হবো। অবশ্য যদি কখনও দরকার হয়। নইলে এমনিতে বিরক্ত করব না।

একটু দ্বিধা করেও ধৃতি ঠিকানা বললো।

—আপনার বাসায় ফোন নেই?

—না।

—আচ্ছা, ছাড়ছি।

ভদ্রমহিলা ফোন রাখলেন। ধৃতি হাঁফ ছাড়ল।

৫

পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় রেস্টুরেন্টে দামি ডিনার খেল ধৃতি। মাঝে মাঝে খায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। যতদিন এরকম একা আছে ততদিন আমিরি করে নিতে পারবে।

বিয়ে ধৃতি করতে চায় না। কিন্তু বউয়ের কথা ভাবতে তার খারাপ লাগে না। কিন্তু ভয় পায়। সে একটু প্রাচীনপন্থী। আজকালকার মেয়েদের হাবভাব আর চলা-ফেরা দেখে তার ভয় লাগে। এরা তো ঠিক বউ হতে পারবে না। বড়জোর কম্প্যানিয়ন হতে পারে, আর বেড-ফ্রেন্ড।

ট্যাক্সি ছেড়ে ধৃতি ফ্ল্যাটে উঠে এল। দরজা ভালো করে বন্ধ করলো। নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে টেবিলের সামনে বসে সিগারেট ধরালো। এখন রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকবে। কয়েকেটা থ্রিলার কেনা আছে। পড়বে। তার আগে একটু কিছু লিখবে। এই একা নিশুত রাতে জেগে থাকা তার বড় প্রিয়। এইটুকু একেবারে তার নিজস্ব সময়।

শৌখিন রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ে চিঠির বাক্সটা দেখে আসেনি।

আবার উঠে নীচে এলো ধৃতি। চিঠি পেতে সে ভীষণ ভালোবাসে। রোজ চিঠি এলে কত ভালো হয়।

চিঠি ছিল। দুটো। দুটোই খাম। একটার ওপর দিদির হাতের লেখা ঠিকানা। বোধহয় দীর্ঘকাল পর মনে পড়েছে ভাইকে। আর একটা খামে কোনও ডাকটিকিট নেই, হাতের লেখা অচেনা।

নিজের ঘরে এসে ধৃতি দিদির চিঠিটা প্রথমে খুলল। ভাইয়ের জন্য দিদি একটা পাত্রী দেখেছে। চিঠির সঙ্গে পাত্রীর পাসপোর্ট সাইজের ফটোও আছে। দেখলো ধৃতি। মন্দ নয়। তবে একটু আপস্টার্ট চেহারা। দিল্লিতে বি.এ. পড়ে। বাবা সরকারি অফিসার।

ধৃতি অন্য চিঠিটা খুললো। সাদা কাগজে লেখা—একা বাসায় ভূতের ভয় পাচ্ছেন না তো! ভূত না হলেও পেত্নীরা কিন্তু আছে। সাবধান! আপনার ঘর গুছিয়ে রেখে গেছি। যে অন্যমনস্ক আপনি, হয়তো লক্ষই করেননি। ফ্রিজে একটা চমৎকার খাবার রেখে যাচ্ছি! খাবেন। মেয়েরা কিন্তু খারাপ হয় না পুরুষগুলোই খারাপ। চিঠিটা লেটারবক্সে রেখে যাচ্ছি যাতে চট করে নজরে পড়ে।—পরমা। পুঃ পরশু হয়তো আবার আসব। দুপুরে। ঘরদোর পরিষ্কার করতে।

ধৃতি উঠে গিয়ে ডাইনিং হলে ফ্রিজ খুলল।

কথা ছিল এ ক'দিন ফ্রিজ বন্ধ থাকবে। ছিলও তাই। পরমা আজ চালিয়ে রেখে গেছে। একটা কাচের বাটিতে ক্ষীরের মতো কী একটা জিনিস। ঠান্ডা বস্তুটা মুখে ঠেকিয়ে ধৃতি দেখে পায়েস। তাতে কমলালেবুর গন্ধ। কাল খাবে।

ফ্রিজ বন্ধ করে ধৃতি হলঘর যখন পার হচ্ছিল তখন হঠাৎ খেয়াল হল বাইরের দরজাটি কি সে বন্ধ করেছে? এগিয়ে গিয়ে দরজার নব ঘোরাতেই বেকুব হয়ে বুঝল, সত্যিই বন্ধ ছিল না দরজাটা।

সকালে উঠে ধৃতি টের পায় সারা রাত ঘুমের মধ্যে সে কেবলই টুপুর কথা ভেবেছে। খুবই আশ্চর্য কথা।

টুপুর কথা সে ভাববে কেন? টুপু কে! টুপুকে সে তো চোখেও দেখেনি। মনটা বড় ভার হয়ে আছে। নিজের কোনও দুর্বলতা বা মানসিক শ্লথভার ধরা পড়লে ধৃতি খুশি হয় না।

টুপু বা টুপুর মা-র সমস্যা নিয়ে তার ভাববার কিছু নেই। ঘটনাটার মধ্যে হয়তো কিছু রহস্য আছে। তা থাক। যে রহস্য না জানলেও তার চলবে। টুপুর মা কি পাগল? হলেই বা তার তাতে কী?

টুপু কি বেঁচে আছে? টুপু কি সত্যিই বেঁচে নেই? এসব জানবার বা এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। ধৃতি স্বপ্ন-দেখা মানুষ নয়, কল্পনার ঘোড়া ছাড়তেও সে পটু নয় তেমন।

তবু কাল সারা রাত, ঘুমের মধ্যে সে কেন টুপুর কথা ভেবেছে?

দাঁত মেজে ধৃতি নিজেই চা তৈরি করে খেল। পত্রিকাটা বারান্দা থেকে এনে খুলে বসলো। খবর কিছুই নেই। তবু যথাসম্ভব সে যখন খবরগুলো পড়ে দেখছে তখনও টের পেল বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। লাইনের ফাঁকে ফাঁকে তার নানা চিন্তা-ভাবনা ঢুকে যাচ্ছে।

এবং ফের টুপুর কথাই ভাবছে সে। জ্বালাতন।

পত্রিকা ফেলে রেখে সিগারেট ধরিয়ে নিজের এই অদ্ভূত মানসিক অবস্থাটা বিশ্লেষণ করতে থাকে ধৃতি। কিন্তু বিশ্লেষণ করে কিছুই পায় না। টুপুর সঙ্গে তার সম্পর্ক মাত্র একটি ফটোর ভিতর দিয়ে। সে ফটোটাও খুব নির্দোষ নয়। আর টুপুর মা টেলিফোনে এবং চিঠিতে টুপুর সম্বন্ধে যা লিখেছে সেইটুকু মাত্র তার জানা। অবশ্য এগুলো যোগ-বিয়োগ করে নিয়ে একটা রক্তমাংসের মেয়েকে কল্পনা করা যায় না এমন নয়। কিন্তু ততদূর কল্পনা প্রবণ তো ধৃতি এতকাল ছিল না!

অন্যমনস্কতার মধ্যেই সে কখন প্রাতঃকৃত্য সেরেছে ফ্রিজ থেকে পরমার রেখে যাওয়া পায়েস বের করে খেয়েছে, আবার চা করেছে। ফের সিগারেটও ধরিয়েছে।

বিকেলের শিফটে ডিউটি। সারাটা দিনের অবকাশ পড়ে আছে। কাজ নেই বলে ধৃতি বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসলো। চমৎকার বারন্দাটা। নীচে রাস্তা। সারাদিন বসে বসে লোক-চলাচল দেখা যায়।

দেখছিল ধৃতি। কিন্তু আবার দেখছিলও না। তার কেবলই মনে হয়, টুপুর মা যা বলছে তার সবটা সত্যি নয়। টুপু যে মারা গেছেই তার কোনও প্রমাণ নেই। সেটা হয়তো কল্পনা বা গুজব। টুপু বেঁচে আছে ঠিকই। একটা কথা কাল টুপুর মাকে জিগ্যেস করতে ভুল হয়ে গেছে—টুপুর ফটোতে তার পাশে কে ছিল, যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে?

ধৃতির অবকাশ যে অখণ্ড তা নয়। সেই ফিচারটা সে এখনও লিখে উঠতে পারেনি। প্রায় দুসপ্তাহ আগে অ্যাসোসিয়েটেড এডিটর তাকে ডেকে পণপ্রথা নিয়ে আর একটা ফিচার লিখতে বলেছেন। দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া ছিল। বিভিন্ন বাড়ির গিন্নি, কলেজ-ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রী, সমাজের নানা স্তরের মানুষজনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। সে কাজ পড়ে আছে ধৃতির। এক অবান্তর চিন্তা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতদিন তেমন প্রকট ছিল না, কিন্তু কাল বহুক্ষণ টুপুর মা-র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর থেকেই তার মাথাটা অশরীরী বা নিরুদ্দেশ টুপুর হেপাজতে চলে গেছে।

আজ সময় আছে। ধৃতি টুপুর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সাজপোশাক করে বেরিয়ে পড়ল।

প্রফেসরদের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে পুলক নিমীলিতচোখে আধশোয়া হয়ে চুরুট টানছে, এমন দৃশ্যই দেখবে বলে আশা করেছিল ধৃতি। হুবহু মিলে গেল। প্রফেসরদের চাকরিটা আলসেমিতে ভরা। সপ্তাহে তিন চারদিন ক্লাস থাকে, বছরে লম্বা লম্বা গোটা দুই তিন ছুটি, আলসে না হয়ে উপায় কী? এই পুলক যে একসময়ে ফুটবলের ভালো লেফট আউট ছিল তা আজকের মোটাসোটা চেহারাটা দেখে মালুম হয় না। মুখে সর্বদা স্নিগ্ধ হাসি, নিরুদ্বেগ প্রশান্ত চাউনি, হাঁটাচলায় আয়েসি মন্থরতা।

ধৃতিকে দেখে সোজা হওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলল, আরে! আজই কি তোমার আসবার কথা ছিল নাকি? স্টুডেন্টরা তো বোধহয় কি একটা সেমিনারে গেল!

ধৃতি একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, আজই আসবার কথা ছিল না ঠিকই। তবে এসে যখন গেছি তখন দু-চারজনকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো। ইন্টারভিউটা আজ না নিলেই নয়।

—দেখছি, তুমি বোসো। বলে পুলক দু-মনি শরীর টেনে তুলল। রমেশ নামক কোনও বেয়ারাকে ডাকতে ডাকতে করিডোরে বেরিয়ে গেল।

পুলকদের কমপারেটিভ লিটারেচারে ছাত্র নগণ্য, ছাত্রীই বেশি। এসব ছাত্রীরাও আবার অধিকাংশই বড়লোকের মেয়ে। পণপ্রথাকে এরা কোন দৃষ্টিতে দ্যাখে তা ধৃতির অজানা নয়। চোখা চালাক আলট্রা স্মার্ট এসব মেয়েদের পেট থেকে কথা বের করাও মুশকিল। কিছুতেই সহজ সরলভাবে অকপট সত্যকে স্বীকার করবে না। ধৃতি তাই মনে মনে তৈরি হচ্ছিল।

মিনিট কুড়ি পঁচিশের চেষ্টায় পুলক একটা ফাঁকা ক্লাশরুমে জনা ছয়েক মেয়ে ও একটি ছেলেকে জুটিয়ে দিল। ছটির মধ্যে চারটি মেয়েই দারুণ সুন্দরী। বাকি দুজনের একজন একটু বয়স্কা এবং বিবাহিতা, অন্যটি সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু কালো আভরণহীন রূপটানহীন চেহারাটায় এক ধরনের ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

ধৃতি আজকাল মেয়েদের লজ্জা পায় না, আগে পেত। সুন্দরীদের ছেড়ে সে কালো মেয়েটিকেই প্রথম প্রশ্ন করে, আপনার বিয়েতে যদি পাত্রপক্ষ পণ চান তাহলে আপনার রিঅ্যাকশন কী হবে?

—আমি কালো বলে বলছেন?

—তা নয়, বরং আপনাকেই সবার আগে নজরে পড়ল বলে।

মেয়েটি কাঁধটা একটু বাঁকিয়ে বলে, প্রথমত আমার বিয়ে নেগোশিয়েট করে হবে না, আমি নিজেই আমার মেট বেছে নেব, পণের প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্নটাকে অত পারসোনালি নেবেন না। আমি পণপ্রথা সম্পর্কে আপনার মত জানতে চাইছি।

—ছেলেরা পণ চাইলে মেয়েদেরও কিছু কন্ডিশন থাকবে।

—কীরকম কন্ডিশন?

—বাবা-মা'র সঙ্গে থাকা চলবে না, সন্ধে ছ'টার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে, ঘরের কাজে হেল্প করতে হবে, উইক এন্ডে বাইরে নিয়ে যেতে হবে, রান্না এবং ঘরের সব কাজের জন্য লোক রাখতে হবে, স্বামীর পুরো রোজগারের ওপর স্ত্রীর কনট্রোল থাকবে...এরকম অনেক কিছু।

সুন্দরীদের মধ্যে একজন ভারী সুরেলা গলায় বলে ওঠে, অলকা আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে।

ধৃতি লিখতে লিখতে মুখ তুলে হেসে বলে, তাহলে আপনিই বলুন।

—আমি! ওঃ, পণপ্রথা শুনলে এমন হাসি পায় না! বলে মেয়েটি বাস্তবিকই হাতে মুখ ঢেকে হেসে ওঠে। সঙ্গে অন্যরাও।

ধৃতি একটু অপেক্ষা করে। হাসি থামলে মৃদু স্বরে বলে, ব্যাপারটা অবশ্য হাসির নয়।

মেয়েটি একটু গলা তুলে বলে, সিস্টেমটা ভীষণ প্রিমিটিভ।

—আধুনিক সমাজেও বিস্তর প্রিমিটিভনেস রয়ে গেছে যে!

—তা জানি। সেই জন্যই তো হাসি পায়।

—এই সিস্টেমটার বিরুদ্ধে আপনি কী করতে চান।

—কেউ পণটন চাইলে আমি তাকে বলব, আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। বিবাহিতা মহিলাটি উশখুশ করছিলেন। এবার বললেন, না না, শুনুন। আমি বিবাহিতা এবং একটি মেয়ের মা। আমি জানি সিস্টেমটা প্রিমিটিভ এবং হাস্যকর। তবু বলি, এই ইভিলটাকে ওভাবে ট্যাকল করা যাবে না। আমার মেয়েটার কথাই ধরুন। ভীষণ সিরিয়াস টাইপের, খুব একটা স্মার্টও নয়। নিজের বর নিজে জোগাড় করতে পারবে না। এখন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে যদি আমি একটা ভালো পাত্র পাই এবং সেক্ষেত্রে যদি কিছু পণের দাবি থাকেও তবে সেটা অন্যায় জেনেই মেয়ের স্বার্থে হয়তো আমি মেনে নেবো।

সুন্দরী মেয়েটি বলল, তুমি শুধু নিজের মেয়ের কথা ভাবছো নীতাদি!

—মেয়ের মা হ' আগে, তুইও বুঝবি।

ধৃতি প্রসঙ্গ পালটে আর একজন সুন্দরীর দিকে চেয়ে বলে, পণপ্রথা ভীষণ খারাপ তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা টিফলিশ প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা আপনাকে করব?

—খুব শক্ত প্রশ্ন নয় তো?

পুলক পাশেই একটা চেয়ারে বসে নীরবে চুরুট টেনে যাচ্ছিল। এবার মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, তুমি একটি আস্ত বিচ্ছু ইন্দ্রাণী। কিন্তু আমার এই বন্ধুটি তোমার চেয়েও বিচ্ছু। ওয়াচ ইওর স্টেপ।

ইন্দ্রাণী উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলে, কংগ্র্যাটস মিস্টার বিচ্ছু। বলুন প্রশ্নটা কি।

ধৃতি খুব অকপটে মেয়েটির দিক চেয়ে ছিল। এতক্ষণ ভালো করে লক্ষ করেনি। লক্ষ করে এখন হাঁ হওয়ার জোগাড়। ছবির টুপুর সঙ্গে আশ্চর্য মিল! কিন্তু গল্পে যা ঘটে, জীবনে তা ঘটে খুবই কদাচিৎ। এ মেয়েটির আসল টুপু হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই, ধৃতি তাও জানে। সে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা লক্ষ করেছি পাত্রপক্ষ আজকাল যতটা দাবিদাওয়া করে তার চেয়ে অনেক বেশি দাবি থাকে স্বয়ং পাত্রীর।

—তাই নাকি?

—মেয়েরা আজকাল বাবা মায়ের কাছ থেকে নানা কৌশলে অনেক কিছু আদায় করে নেয়। পণপ্রথার চেয়ে সেটা কি ভালো?

ইন্দ্রাণীর মুখ হঠাৎ ভীষণরকম গম্ভীর ও রক্তাভ হয়ে উঠল। মাথায় একটা ঝাপাটা খেলিয়ে বলল, কে বলেছে ওকথা? মোটেই মেয়েরা বাপের কাছ থেকে আদায় করে না। মিথ্যে কথা।

ধৃতি নরম গলায় বলে, রাগ করবেন না। এগুলো সবই জরুরি প্রশ্ন, আপনাকে অপ্রতিভ করার জন্য প্রশ্নটা করিনি।

বিবাহিতা মহিলাটি আগাগোড়া উশখুশ করছিলেন, এখন হঠাৎ বলে উঠলেন, ইন্দ্রাণী যাই বলুক আমি জানি কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েরা আজকাল বড্ড ওরকম হয়েছে।

একথায় ইন্দ্রাণী চটল। বলল, মোটেই না নীতাদি। তোমার এক্সপেরিয়েন্স অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু আমরা এই জেনারেশনের মেয়েরা মোটেই ওরকম নই। বরং আমরা মেয়েরা যতটা মা-বাবার দুঃখ বুঝি ততটা এযুগের ছেলেরা বোঝে না।

নীতা বললেন, সেকথাও অস্বীকার করছি না।

—তা হলে? আজকালকার ছেলেরা তো বিয়ে করেই বাবা-মাকে আলাদা করে দেয়। দেয় না বলো?

নীতা হেসে বললেন, সে তো ঠিকই, কিন্তু এযুগের ছেলেরা বিয়ে করে কাকে সেটা আগে বল, তার মতো একালের মেয়েদেরই তো।

—তা তো করেই।

—সেই মেয়েরাই তো বউ হয়ে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে আলাদা হওয়ার পরামর্শ দেয়।

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে বলে, ওটা একপেশে কথা হল। সবসময়ে বউরাই পরামর্শ দেয় না, ছেলেরা নিজেরাই ডিসিশন নেয়। তোমার ডিফেক্ট কী জানো? ওভার সিমপ্লিফিকেশন।

ধৃতি বিপদে পড়ে চুপ করে ছিল। এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি। পণপ্রথা নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল।

ইন্দ্রাণী তার উজ্জ্বল ও সুন্দর মুখখানা হঠাৎ ধৃতির দিকে ফিরিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল, এবার বলুন তো রিপোর্টারমশাই, নিজের বিয়ের সময় আপনি কী করবেন?

—আমি! ধৃতি একটু অবাক হল। তারপর এক গাল হেসে বলল, আমার বিয়ে তো কবে হয়ে গেছে। আমি ইনসিডেন্টালি তিন ছেলেমেয়ের বাপ। ইন্দ্রাণীর চোখে আচমকাই একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। কিন্তু টক করে মাথাটা নুইয়ে নিল সে। তারপর ফের নিপাট ভালোমানুষের মতো মুখটা তুলে বলল, আপনি পণ নেননি?

ধৃতি খুব লাজুকভাবে চোখ নামিয়ে বলল, সামান্য চাকরি, তাই পণও সামান্যই নিয়েছিলাম, হাজার পাঁচেক।

এই স্বীকারোক্তিতে সকলে একটু চুপ মেরে গেল। কিন্তু একটা নিঃশব্দ ছিছিক্কার স্পষ্ট টের পাচ্ছিল ধৃতি।

হঠাৎ পুলক হেসে ওঠায় অ্যাটমসফিয়ারটা মার খেয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী বলল, ইয়ার্কি মারছেন, না?

—কেন?

—আপনি মোটেই বিয়ে করেননি।

—আমার বিয়েটা ফ্যাকটর নয়। আপনি এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। ইন্দ্রাণী বলল, জবাব দিইনি কে বলল? আমরা মোটেই ওরকম নই।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করল ধৃতি কিন্তু তেমন কোনও লাভ হল না। বারবার তর্ক লেগে যেতে লাগল। শেষে ঝগড়ার উপক্রম।

অবশেষে ইন্টারভিউ শেষ করে ধৃতি উঠে পড়ল। যেটুকু জানা গেছে তাই যথেষ্ট।

পুলক নিয়ে গিয়ে কফি খাওয়াল। নিজে থেকেই যেচে বলল, ইন্দ্রাণী মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগল?

—খারাপ কী?

শি ইজ ইন্টারেস্টিং। পরে ওর কথা তোমাকে বলব। শিজ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। ধৃতি ফিরে এল বাসায়।

৬

টুপুর খোঁজ যদি ধৃতিকে করতেই হয় তবে তার কিছু সহায় সম্বল দরকার। তামাম কলকাতা, মাইথন, এলাহাবাদ বা ভারতবর্ষের সমগ্র জনবসতির মধ্যে কোথায় টুপু লুকিয়ে আছে তা একা খুঁজে দেখা ধৃতির পক্ষে অসম্ভব। টুপু মরে গেছে কিনা তাও বোধহয় সঠিক জানা যাবে না। মাইথনের পুলিশের কাছে কোনও রেকর্ড না থাকারই সম্ভাবনা।

এক দুপুরে ধৃতি টুপু সংক্রান্ত চিঠি ও ফটো বের করে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে বসল। টেলিফোনে টুপুর মা সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে লিখল ডায়েরিতে। জয়ন্ত সেন আর কালিবাবুর সঙ্গে যা সব কথাবার্তা হয়েছে তাও বাদ দিল না। পুরো একখানা কেস হিস্ট্রি তৈরি করেছিল সে। মাঝপথে কলিংবেল বাজল এবং রসভঙ্গ করে উদয় হলেন পরমা। সঙ্গে বাচ্চা ঝি।

—ইস! কতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কানটাও গেছে দেখছি।

ধৃতি বিরস মুখে বলে—কতক্ষণ জ্বালাবে বলো তো! ঘরের কাজ কিছু থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে কেটে পড়ো। আমার জরুরি লেখা আছে। পরমা কোমরে হাত দিয়ে চোখ গোল করে বলে—বলি এ ফ্ল্যাটটা আমার না আর কারও? আমারই ফ্ল্যাট থেকে আমাকেই কি না সরে পড়তে বলা হচ্ছে! মগের রাজত্ব নাকি?

—ফ্ল্যাট তোমার হতে পারে কিন্তু আমারও প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস আছে।

—ইঃ প্রাইভেসি! ব্যাচেলরদের আবার প্রাইভেসি কী? তারা হবে সরল, দরজা জানালা খোলা ঘরের মতো, আকাশের মতো, শিশুর মতো।

—থাক থাক। তুমি যে কবিতা লিখতে তা জানি।

—খারাপও লিখতাম না। বিয়ে হয়েই সর্বনাশ হয়ে গেল। কবিতা উবে গেল, প্রেম উবে গেল।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানও।

—তার মানে?

—কিছু বলিনি।

পরমা চোখ এড়িয়ে বলল—আমার অ্যাবসেনসে ঘরে কাউকে ঢোকাননি তো! ছেলেরা চরিত্রহীন হয়! বলতে বলতে পরমা ধৃতিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে তার ঘরের পরদা সরাল। পরমুহূর্তেই 'ও স্মা!' বলে ভিতরে ঢুকে গেল।

ধৃতি বুঝল সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন টুপুর ফটো লুকোনোর চেষ্টা বৃথা। তাই সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীরও ভ্রূকুটিকুটিল করে নিজের ঘরে এল।

পরমা খাটের ওপর সাজানো কাগজপত্র আর ফটো আঠা মাখানো মনোযোগ দিয়ে দেখছে। শ্বাস ফেলে বলল—চরিত্রহীন! আগাপাশতলা চরিত্রহীন।

কে?

পরমা ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে বলে—ছিঃ ছিঃ, প্রায় আমার মতোই সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন, আর সে খবরটা একবার জানাননি পর্যন্ত!

—তোমার চেয়ে ঢের সুন্দরী।

—ইস। আসুন না একবার কাছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি। সাহস আছে?

—আস্তে পরমা, কেউ শুনলে হাসবে।

—কে আছে এখানে শুনি! আর হাসবারই বা কী আছে।

উদাস ভাবে ধৃতি বলে, পাখি-টাখিও তো আসে জানালায়, বাতাসও তো আসে, তারাই শুনে হাসবে।

চোখ পাকিয়ে পরমা বলে, হাসবে কেন?

—তোমার চ্যালেঞ্জ-এর কথা শুনে। মেয়েটা কে জানো?

—কে, সেটাই তো জানতে চাইছি।

—মিস ক্যালকাটা ছিল, এখন মিস ইন্ডিয়া। হয়তো মিস ইউনিভার্স হয়ে যাবে।

—ইল্লি। অত সোজা নয়। এবারের মিস ক্যালকাটা রুমা চ্যাটার্জি আমার বান্ধবীর বোন।

—তুমি একজন সাংবাদিককে সংবাদ দিচ্ছো?

পরমা হেসে ফেলে বলে, আচ্ছা হার মানলাম। রুমা গতবার হয়েছিল।

—এ এবার হয়েছে।

—সত্যি?

—সত্যি।

—নাম কী?

—টুপু।

—যাঃ, টুপু একটা নাম নাকি? ডাকনাম হতে পারে। পোশাকি নাম কী?

—তোমার বয়স কত হল পরমা?

—আহা, বয়সের কথা ওঠে কীসে?

—ওঠে হে ওঠে, ইউ আর নট কিপিং উইথ দা টাইম। তোমার আমলে পোশাকি নাম আর ডাকনাম আলাদা ছিল। আজকাল ও সিস্টেম নেই। এখন ছেলেমেয়েদের একটাই নাম থাকে। পল্টু, ঝন্টু, পুসি, টুপু, রুণু, নিনা...

—থাক থাক, নামের লিস্টি শুনতে চাই না। মেয়েটার সঙ্গে আপনার রিলেশন কী?

—পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরীর সঙ্গে আমার একটাই রিলেশন। দাতা এবং গ্রহীতার।

—তার মানে?

—অর্থাৎ তারা সৌন্দর্য বিতরণ করে এবং আমি তা আকণ্ঠ পান করি। আর কিছু না?

ধৃতি মাথা নেড়ে করুণ মুখ করে বলে, তোমার চেহারাখানা একেবারে ফেলনা নয় বটে, কেউ কেউ সুন্দরী বলে তোমাকে ভুলও করে মানছি, কিন্তু আজ অবধি বোধহয় ভুল করেও তোমাকে কেউ বুদ্ধিমতী বলেনি! পরমা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, এ মা, কী সব অপমান করছে রে মুখের ওপর!

—ভাই বন্ধুপত্নী, দুঃখ কোরো না, সুন্দরীদের বুদ্ধিমতী না হলেও চলে। কিন্তু এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, একজন যৎসামান্য বেতনের সাব এডিটরের সঙ্গে মিস

ক্যালকাটার দেবী ও ভক্ত ছাড়া আর কোনও রিলেশন হতে পারে না!

—খুব পারে। নইলে ফটোটা আপনার কাছে এল কী করে?

—সে অনেক কথা। আগে তোমার ওই বাহনটিকে এই কাপ জমাটি কফি বানাতে বলো।

—বলছি। আগে একটু শুনি।

—আগে নয়, পরে। যাও।

—উঃ, বলে পরমা গেল।

পরমুহূর্তেই ফিরে এসে বলল, কফি আসছে, বলুন।

—মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগছে?

—মন্দ কী?

—না না, ওরকম ভাসা ভাসা করে নয়। বেশ ফিল করে বলো। ছবিটার দিকে তাকাও, অনুভব করো, তারপর বলো।

—নাকটা কি একটু চাপা?

—তাই মনে হচ্ছে?

—ফটোতে বোঝা যায় না অবশ্য। ঠোঁটদুটো কিন্তু বাপু, বেশ পুরু।

—আগে কহো আর।

—আর মোটামুটি চলে।

ধৃতি হেসে ফেলে বলে, বাস্তবিক মেয়েরা পারেও।

—তার মানে?

—এত সুন্দর একটা মেয়ের এতগুলো খুঁত বের করতে কোনও পুরুষ পারত না।

পরমা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ইঃ পুরুষ! পুরুষদের আবার চোখ আছে নাকি? মেয়ে দেখলেই হ্যাংলার মতো হামলে পড়ে।

—সব পুরুষই হ্যাংলা নয় হে বন্ধুপত্নী। এত পুরুষের মাথা খেয়েছ তবু পুরুষদের এখনও ঠিকমতো চেনোনি।

—চেনার দরকার নেই। এবার বলুন তো ফটোটা সত্যিই কার?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, আগে আমার কথা একটু-আধটু বিশ্বাস করতে, আজকাল বিশ্বাস করাটা একদম ছেড়ে দিয়েছো।

—আপনাকে বিশ্বাস! ও বাবা, তার চেয়ে কেউটে সাপ বেশি বিশ্বাসী। যা পাজি হয়েছেন আজকাল।

—তা বলে সাপখোপের সঙ্গে তুলনা দেবে?

—দেবোই তো। সব সময় আমাকে টিজ করেন কেন?

—মুখ দেখে তো মনে হয় টিজিংটা তোমার কিছু খারাপ লাগে না।

—লাগে না ঠিকই, তা বলে সবসময়ে নিশ্চয়ই পছন্দ করি না। যেমন এখন করছি না। একটা সিরিয়াস প্রশ্ন কেবলই ইয়ার্কি মেরে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বলে পরমা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা কটাক্ষ করল।

ধৃতি নিজের বুকে দুহাত চেপে ধরে বলল, মর গয়া। ওরকম করে কটাক্ষ কোরো না মাইরি। আমার এখনও বিয়ে হয়নি, মেয়েদের কটাক্ষ সামাল দেওয়ার মতো ইমিউনিটি নেই আমার।

—খুব আছে। কটাক্ষ কিছু কম পড়ছে বলে মনে তো হয় না। আগে মেয়েদের ছবি ঘরে আসত না, আজকাল আসছে।

—আরে ভাই, মেয়েটার ফটো নয়। মিস ক্যালকাটা অ্যান্ড মিস ইন্ডিয়া। এর ওপর একটা ফিচার হচ্ছে আমাদের কাগজে। আমাকেই এর ইন্টারভিউ নিতে হবে। তাই...

পরমা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এ যদি মিস ইন্ডিয়া হয়ে থাকে তবে তো খেঁদি-পেঁচিদেরই যুগ এল।

কফি এসে যেতে দুজনেই একটু ক্ষান্ত দিল কিছুক্ষণ। কিন্তু পরমা চেয়ারে বসে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে খুব দুষ্টু চোখে লক্ষ করছিল ধৃতিকে। ধৃতি বলল, তুমি কফি খেলে না?

—আমি তো আপনার আর আপনার বন্ধুর মতো নেশাখোর নই। উদাস ধৃতি বলল, খেলে পারতে। কফিতে বুদ্ধি খোলে। বিরহের জ্বালাও কমে যায়।

—আপনার মাথা। যাই বাবা, ঘরদোর সেরে আবার ফিরে যেতে হবে।

পরমা উঠল এবং দরজার কাছ বরাবর গিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, আচ্ছা একটা কথা বলব?

—বলে ফেল।

—এই যে আমার স্বামী দিল্লি গেছে বলে আমাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে এটার কোনও অর্থ হয়?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

পরমা বেশ তেজের গলায় বলে, থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। সব বুঝেও অমন না বোঝার ভান করেন কেন বলুন তো! আমি বলছি, রজত এখানে নেই বলে আমার এই ফ্ল্যাটে থাকা চলছে না কেন?

ধৃতি অকপট চোখে পরমার দিকে চেয়ে বোকা সেজে বলে, আমি আছি বলে।

—আপনি থাকলেই বা কী? আমরা দুজনেই থাকতে পারতাম। দিব্যি আড্ডা দিতাম, রান্না করতাম, বেড়াতাম।

—ও বাবা, তুমি যে ভারী সাহসিনী হয়ে উঠেছো।

—না না, ইয়ার্কি নয়। আজকাল খুব নারীমুক্তি আন্দোলন-টন হচ্ছে শুনি, কিন্তু মেয়েদের এত শুচিবায়ু থাকলে সেটা হবে কী করে? পুরুষ মানেই ভক্ষক আর মেয়ে

মানেই ভক্ষ্য বস্তু এরকম ধারণাটা পালটানো যায় না?

ধৃতি পরমার সামনে এই বোধহয় প্রথম সত্যিকারের অস্বস্তি আর অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। মেয়েদের নিয়ে তার ভাবনা চিন্তা খুব বেশি গভীর নয়। ভাববার দরকারও পড়েনি। কিন্তু পরমার প্রশ্নটি ভীষণ জরুরি বলেই তার মনে হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ে দিতে পণ লাগে, মেয়েরা একা সর্বত্র যেতে পারে না, মেয়েদের জীবনে অনেক বারণ।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, পুরুষরা এখনও পুরোপুরি পশুত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি পরমা। যেদিন পারবে সেদিন তোমরা অনেক বেশি ফ্রিডম পাবে।

পরমা মাথা নেড়ে বলল, পুরুষদের খামোখা পশু ভাবতে যাবো কেন? বড় জোর তারা ডমিন্যান্ট, কিন্তু পশু নয়। আমার বাবা পুরুষ, আমার ভাই পুরুষ, আমার স্বামী পুরুষ। আমার পুরুষ ওয়েল উইশারেরও অভাব নেই। তাদের আমি পশুর দলে ভাবতে পারি না।

—আলোচনাটা বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে পরমা।

পরমা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক পরদা নীচু গলায় বলল, আমি সত্যিই বাপের বাড়িতে থাকতে ভালোবাসি না। আপনার সঙ্গে আড্ডা মারাটাও আমার বেশ প্রিয়। কিন্তু তবু দেখুন, আপনার মতো একজন নিরীহ পুরুষের সঙ্গ বর্জন করার জন্য আমাকে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। এটা মেয়েদের পক্ষে অপমান নয়?

ধৃতি হেসে বলল, পুরুষদের পক্ষেও। আমার ভয়ে যে তুমি পালিয়ে আছো এটা তো আমার পক্ষে সম্মানের নয়।

পরমা হঠাৎ ধৃতিকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করল, আমি ভাবছি আজ আর বাপের বাড়ি যাবো না। এখানেই থাকবো। রাজি?

ধৃতি একটু হাসল। হাত দুটো উলটে দিয়ে বলল, আপকো মর্জি। আমি বারণ করার কে পরমা? এ তো তোমারই ফ্ল্যাট।

—ওসব বলে দায়িত্ব এড়াবেন না। এটা কার ফ্ল্যাট সেটা এ প্রসঙ্গে বড় কথা নয়। আসল কথা হল আমি একজন যুবতি, আপনি একজন পুরুষ। আমরা এই ফ্ল্যাটে থাকলে আপনি কি মনে করবেন?

ধৃতি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, কিছু মন করব না। কলকাতায় এরকম কতজনকে থাকতে হচ্ছে। কেউ মাথা ঘামায় না। তুমি অত ভাবছো কেন?

—ভাবছি আপনার জন্যই। রজত দিল্লি যাওয়ার আগে এই ব্যবস্থাটা করে গেছে। বিলেতে অ্যামেরিকায় ঘুরে এসেও কেন যে ওর শুচিবায়ু কাটেনি তা কে বলবে? অথচ এত করে খামোখা আপনাকে অপমান করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। অপমান আমারও।

ধৃতি স্মিতমুখে বলল, রজতটা একটু সেকেলে। কিন্তু আমার মনে হয় ও বিশেষ তলিয়ে ভাবেনি।

—ভাবা উচিত ছিল।

—সকলেরই কি এত ভাবাভাবি আসে?

—আপনার বন্ধুর না এলেও আমার আসে। তাই ঠিক করেছি থাকব। ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, থেকে যাও তাহলে।

—খুশি মনে মত দিলেন তো!

—দিচ্ছি। শুধু একটু কম টিকটিক করবে।

—আমি কি বেশি টিকটিক করি?

—না, না, তা বলছি না, তোমার টিকটিক করাটাও শুনতে ভারী ভালো। তবে কিনা—

—বুঝেছি। বলে পরমা রাগ করে বা রাগের ভান করে চলে গেল।

ধৃতি তাকে বেশি ঘাঁটাল না, বরং পণপ্রথা বিষয়ক সাক্ষাৎকারগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে রাখতে লাগল। তার ভাগ্য ভালো যে, প্রথম শ্রেণির একটি দৈনিক পত্রিকায় সে চাকরি করে এবং সাব-এডিটর হয়েও স্বনামে নানারকম ফিচার লেখার সুযোগ পায়। প্রাপ্ত এইসব সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ওপরে ওঠার পথ খোলা। সে লেখে ভালো, নামও আছে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার পাঠকদের স্মৃতি খুবই কম। বারবার নামটা তাদের চোখে না পড়লে তারা তাকে মনেও রাখবে না। তবে ধৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে লেখে এবং মোটামুটি সত্য ও তথ্যের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করে। পরমা রাত্তিরে চমৎকার ডিনার খাওয়াল। আলুর দম, ডাল, পাঁপর ভাজা আর স্যালাড। টুকটাক কথা হল। তবে ধৃতি অন্যমনস্ক ছিল, পরমাও। রাত্রিবেলা ধৃতি একটা বই নিয়েকাৎ হল বিছানায়। রোজকাল অভ্যাস কিছু না পড়লে ঘুম আসতে চায় না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে। পড়তে পড়তেই শুনতে পেল, পরমা তার ঘরের দরজা সন্তর্পণে ভেজাল, এবং আরও সন্তর্পণে ছিটকিনি দিল। একটু হাসল ধৃতি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পরমা জানতে পারলে কি দুঃখিত হবে যে ধৃতি কখনোই পরমার প্রতি কোনও দৈহিক বা মানসিক আকর্ষণ বোধ করে না? পরমা খুব সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু ধৃতি সবসময়ে সবরকম সুন্দরী মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় না। তার একটু বাছাবাছি আছে। অনেক সময় আবার কালো কুচ্ছিত মেয়ের প্রতিও তীব্র আকর্ষণ বোধ করে।

সকালে পুলিশ এল।

আতঙ্কিত পরমা দৌড়ে এসে ঢুকল ধৃতির ঘরে। বিস্ফারিত চোখ, চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, কোথায় কী করে এসেছেন বলুন তো! এত সকালে পুলিশ কেন?

ধৃতি খুব নিবিষ্টমনে খবরের কাগজ পড়েছিল। চোখ তুলে বলল, গত সাত দিনে মোটে তিনটে খুন আর চারটে ডাকাতি করতে পেরেছি। এত কম অপরাধে তো পুলিশের টনক নড়ার কথা নয়। যাকগে, আমি পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছি।

বলে ধৃতি উঠল।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, সবসময়ে ইয়ার্কি একদিন আপনার বেরোবে।

—হ্যাঁ, যেদিন পালে বাঘ পড়বে।

বলে ধৃতি একটু হাসল। পুলিশ কেন এসেছে তা ধৃতি জানে। প্রধানমন্ত্রীর চা-চক্রে আজ তার নিমন্ত্রণ। অল্প সময়ে সঠিক ঠিকানায় আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য লালবাজারের পুলিশকে সেই ভার দেওয়া হয়।

ধৃতি পিওন বুক-এ সই করে আমন্ত্রণপত্রটি নিয়ে ডাইনিং টেবিলে ফেলে রাখল। একটু অবহেলার ভঙ্গি। একটা চেয়ার টেনে বসে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আর একবার একটু গরম জল খাওয়াও পরমা। আগের বারেরটা জমেনি।

—দিচ্ছি। বলে পরমা কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ।

ধৃতি আড়চোখে লক্ষ করছিল পরমাকে। বলল, ওটা আসলে ওয়ারেন্ট। পরমা উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলল, ইস, কী লাকি আপনি। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে চায়ের নেমন্তন্ন! ভাবতেই পারছি না।

ধৃতি উদাস মুখে বলল, অত উচ্ছ্বাসের কিছু নেই। ভি আই পি-দের সঙ্গ খুব সুখপ্রদ নয়, অনেক বায়নাক্কা আছে।

পরমা বলল, তবু তো কাছ থেকে দেখতে পাবেন, কথাও বলবেন! আচ্ছা, আমি যদি সঙ্গে যাই?

—কী পরিচয়ে যাবে?

পরমা চোখ পাকিয়ে বলে, পরিচয় আবার কী? এমনি যাবো।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঢুকতে দেবে কেন? বউ হলেও না হয় কথা ছিল।

পরমা মুখ টিপে হেসে বলল, যদি তাই সেজেই যাই?

—তোমার খুব উন্নতি হয়েছে পরমা।

—তার মানে?

—তুমি আর আগের মতো সেকেলে নেই। বেশ আধুনিক হয়েছো। আমার বউ সেজে রাজভবনে অবধি যেতে চাইছো।

—আহা, তাতে দোষ কী?

—রজত শুনলে মূর্ছা যাবে।

পরমা মুখোমুখি বসে বলল, কোন ড্রেসটা পরে যাবেন?

—ড্রেস? ও একটা পরলেই হল।

মাথা নেড়ে পরমা বলে, না, যা খুশি পরে গেলেই চলবে নাকি? চকোলেট রঙের সেই বুশ শার্ট আর সাদা প্যান্ট—বুঝলেন?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, ও বাবা, তুমি আমার পোশাকেরও খবর রাখো দেখছি।

—রাখব না কেন? ছোটো ভাইয়ের মতোই দেখি, তাই খবর রাখতে হয়।

ধৃতি খুব হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলে বলল, আজ তুমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছো না যে, আমাক কোন প্লেসটা দিলে ভালো হয়। একটু আগে আমার বউ সাজতে চাইছিলে, এখন আবার বলছ ছোট ভাই। এরপর কি ভাসুর না মামাশ্বশুর?

পরমা লজ্জা পেয়ে বলে, যা বলেছি মনে থাকে যেন। সাদা প্যান্ট আর চকোলেট বুশ শার্ট।

—ঠিক আছে।

—প্রাইম মিনিস্টারকে কী জিগ্যেস করবেন?

—করব কিছু একটা।

—এখনও ঠিক করেননি?

—প্রশ্ন করার স্কোপ কতটা পাওয়া যাবে তা বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় উনি বলবেন, আমাদের শুনে যেতে হবে।

—তবু কিছু প্রশ্ন ঠিক করে রাখা ভালো।

ধৃতি কফি খেয়ে চিন্তিতভাবে উঠে দাড়ি কামাল, স্নান করল, খেলো। তারপর পরমার কথামতো পোশাক পরে বাইরের ঘরে এল। বলল, এই যে পরমা, দ্যাখ।

পরমা খাচ্ছিল, মুখ তুলে দেখে বলল, বাঃ, এই তো স্মার্ট দ্যাখাচ্ছে।

—এমনিতে দেখায় না?

—যা ক্যাবলা আপনি।

—আমি ক্যাবলা?

—তাছাড়া কী? বলে পরমা হাসল। তারপর প্রসঙ্গ পালটে বলল, আজ আর বাইরে খেয়ে আসবেন না। আমি রেঁধে রাখব।

—রোজ খাওয়ালে যে রজতটা ফতুর হয়ে যাবে।

—যতদিন ও না আসছে ততদিন ওর বরাদ্দ খাবারটাই আপনাকে খাওয়াচ্ছি।

ধৃতি অফিসে এসেই . নল, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের চা-চক্রের রিপোর্টিং তাকেই করতে হবে। সে নিজেও যে আমন্ত্রিত একথাটা জেনে চিফ সাব এডিটর বঙ্কুবাবু বিশেষ খুশি হলেন না। বললেন, সবই কপাল রে ভাই। আমি পঁচিশ বছর এ চেয়ারে পশ্চাদ্দেশ ঘষে যাচ্ছি, কিছুই হয়নি।

ধৃতি জবাব দিল না। মনে মনে একটু দুঃখ রইল, কপাল যে তার ভালো একথা সে নিজেও অস্বীকার করে না। মাত্র কিছুদিন হল সে এ চাকরি পেয়েছে। সাব এডিটর হিসেবেই। তবু তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফিচার লিখতে দেওয়া হয় এবং গুরুতর ঘটনার রিপোর্টিং-এ পাঠানো হয়। ধৃতিকে যে একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে অফিস তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ এ অফিসে ভালো ফিচার-লেখক এবং ঝানু রিপোর্টারের অভাব নেই।

প্রধানমন্ত্রী ময়দানে মিটিং সেরে রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বসবেন সন্ধে সাড়ে-ছটায়। এখনো তিনটে বাজেনি। ধৃতি সুতরাং আড্ডা মারতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সম্প্রতি কয়েকজন ট্রেনি জার্নালিস্ট নেওয়া হয়েছে অফিসে। মোট চারজন। তারা প্রত্যেকেই স্কুল কলেজে দুর্দান্ত ছাত্র ছিল। বুধাদিত্য হায়ার সেকেণ্ডারিতে ফার্স্ট হয়েছিল হিউম্যানিটিজে। নকশাল আন্দোলনে নেমে পড়ায় পরবর্তী রেজাল্ট তেমন ভালো নয়। রমেন স্টার পাওয়া ছেলে। এম-এ-তে ইকনমিকস-এ প্রথম শ্রেণি। তুষার হায়ার সেকেন্ডারির সায়েনস স্ট্রিমে শতকরা আটাত্তর নম্বর পেয়ে স্ট্যান্ড করেছিল। বি-এসসি ফিজিক্স অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস। এম-এসসি করছে। দেবাশিস দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষায় শতকরা একাশি পেয়ে পাস করেছিল। বি-এ, এম-এ-তে তেমন কিছু করতে পারেনি। চারজনের গায়েই স্কুল কলেজের গন্ধ, কারোরই ভালো করে দাড়ি গোঁফ পোক্ত হয়নি।

এদের মধ্যে রমেনকে একটু বেশি পছন্দ করে ধৃতি। ছেলেটি যেমন চালাক তেমনি গভীর। কথা কম বলে এবং সবসময়ে ওর মুখে একটা আনন্দময় উজ্জ্বলতা থাকে।

ধৃতি আজ রমেনকে একা টেবিলে কাজ করতে দেখে সামনে গিয়ে বসল।

—কী হে ব্রাদার, কী হচ্ছে?

—একটা রিপোর্ট লিখছি। কৃষিমন্ত্রীর ব্রিফিং।

—ও বাবা, অতটা লিখছো কেন? অত বড় রিপোর্ট যাবে নাকি? ডেসকে গেলেই হয় ফেলে রাখবে, না হলে কেটে-ছেঁটে সাত লাইন ছাপবে।

রমেন করুণ মুখে বলে, তাহলে না লিখলেই তো ভালো হত।

—মন্ত্রীদের ব্রিফিং মানেই তো কিছু খোঁড়া অজুহাত। ওসব ছেপে আজকাল কেউ কাগজের মূল্যবান স্পেস নষ্ট করে না। খুব ছোট করে লেখো, নইলে বাদ চলে যাবে।

—এই অবধি আমার মোটে চারটে খবর বেরিয়েছে। অথচ পঞ্চাশ ষাটটা লিখতে হয়েছে।

—এরকমই হয়। তবু তো তোমরা ফুল টাইম রিপোর্টার। যারা মফসসলের নিজস্ব সংবাদদাতা তাদের অবস্থা কত করুণ ভেবে দ্যাখো। কুচবিহার বা জলপাইগুড়ি থেকে কত খবর লিখে পাঠাচ্ছে, বছরে বেরোয় একটা কি দুটো।

—তাহলে আমাদের কভারেজে পাঠানোই বা কেন?

—নেট প্র্যাকটিসটা হয়ে যাচ্ছে। এর পরে যখন পাকা পোক্ত হবে, স্কুপ করতে শিখবে তখন তোমাকে নিয়েই হবে টানাটানি। যদি মানসিকতা তৈরি করে নিতে পারো তাহলে জার্নালিজম দারুণ ক্যারিয়ার।

—তা জানি। আর সেইজন্যই লেগে আছি। আপনি কি আজ পি এম-এর রাজভবনের মিটিং কভার করছেন?

—হুঁ, আমি অবশ্য আলাদা ইনভিটেশনও পেয়েছি।

রমেন একটু হেসে বলে, আশ্চর্যের বিষয় হল, আমিও পেয়েছি।

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তুমিও পেয়েছো! বলোনি তো!

—চানস পাইনি। আজ সকালেই লালবাজার থেকে বাড়িতে এসে দিয়ে গেল। আসলে কী জানেন, আমি একসময়ে একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করতাম, কবিতাও লিখতাম, সেই সূত্র ধরে আমাকেও ডেকেছে।

—এখন লেখো না?

—লিখি। অল্পস্বল্প। গত মাসেই দেশ-এ আমার কবিতা ছিল।

—বটে, ধৃতি খুশি হয়ে বলে, মনে পড়েছে। আমি দেশ খুলেই আগে কবিতার পাতা পড়ে ফেলি। রমেন সেন তুমিই তাহলে?

—অত অবাক হবেন না। আমার মতো কবি বাংলা দেশে কয়েক হাজার আছে।

তা থাক না। কবি কয়েক হাজার আছে বলেই কি তোমার দাম কমে যাবে?

—ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই-এর নিয়ম তো তাই বলে। কবিতার ডিমান্ড নেই, কিন্তু সাপ্লাই অঢেল। প্রাইস ফল করতে বাধ্য।

—ইকনমিকসের নিয়ম কি আর্টে প্রযোজ্য?

—খানিকটা তো বটেই। কবিতা লিখি বলে কজন আমাকে চেনে?

ধৃতি একটু হেসে বলে, একটা মনের মতো কবিতা লিখে তুমি যে আনন্দ পাও তা অকবিরা কজন পায়?

রমেনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হল। উষ্ণ কণ্ঠে বলল, কবিতা লিখে আমি সত্যিই আনন্দ পাই। এত আনন্দ বুঝি আর কিছুতে নেই।

—তবে! দামটা সেইদিক দিয়ে বিচার কোরো। খ্যাতি বা অর্থ দিয়ে তা মাপাই যায় না। যাকগে, যাচ্ছো তো রাজভবনে?

—যাবো। বড্ড ভয় করে। কী হবে গিয়ে?

—চলোই না। আর কিছু না হোক, রাজভবনের ইন্টিরিয়রটা তো দ্যাখা হবে।

—তা বটে। ঠিক আছে, যাবো।

—কাগজ কলম নিয়ে যেও। যা দেখবে বা শুনবে তার নোট নিও।

—আমি নোট নেব কেন? কী হবে? রিপোর্ট তো করবেন আপনি।

—তাতে কী? আমি যা মিস করব তুমি হয়তো তা করবে না। দুজনের রিপোর্ট মিলিয়ে নিয়ে করলে জিনিসটা ভালো দাঁড়াবে।

মাথা নেড়ে রমেন বলল, ঠিক আছে।

ডেসক থেকে বিমান হাত উঁচু করে ডাকল, ধৃতি! এই ধৃতি! তোর টেলিফোন।

ধৃতি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফোন ধরল, ধৃতি বলছি।

—আমি বলছি।

—কে বলছেন?

—গলা শুনে চিনতে পারছেন না? আমি টুপুর মা।

ধৃতি একটু স্তব্ধ থেকে বলল—আপনি এখনও কলকাতায় আছেন?

—মাইথন থেকে ঘুরে এলাম।

—সেখানে কোনও খবর পেলেন?

—না। কেউ কিছু বলতে চায় না। তবে আমার মনে হয় ওরা সবাই জানে যে টুপু খুন হয়েছিল!

—ওরা মানে কারা?

—ওখানকার লোকেরা।

—কী বলছে তারা?

—কিছুই বলছে না, আমি অনেককে টুপুর কথা জিগ্যেস করেছি।

—শুনুন, আপনি এলাহাবাদে ফিরে যান। এভাবে ঘুরে ঘুরে আপনি কিছুই করতে পারবেন না।

—একেবারে যে পারিনি তা নয়। একজন বুড়ো লোক স্বীকার করেছে যে সে টুপুকে বা টুপুর মতো একটি মেয়েকে দেখেছে।

—টুপুর মতো মেয়ে কি আর নেই? ভুলও তো হতে পারে!

—পারেই তো। সেইজন্য আমি ফিফটি পারসেন্ট ধরছি। টুপুর ঘাড়ের দিকে বাঁ-ধারে একটা জরুল আছে। সেটাই ওর আইডেনটিটি মার্ক। বুড়োটাকে সেই জরুলের কথা বলেছিলাম। সে বলল, হ্যাঁ, ওরকম জরুল সেও মেয়েটির ঘাড়ে দেখেছে। এতটা মিলে যাওয়ার পরও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিই কী করে বলুন!

—তা বটে।

—টুপুর সঙ্গে একজন লোককেও দেখেছে বুড়োটা। খুব দশাসই চেহারা। বিশাল লম্বা। লোকটা নাকি টুপুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছিল।

—বুড়োটা কে?

—একজন ফুলওয়ালা। টুপু লোকটার কাছ থেকে ফুল কিনেছিল।

ধৃতি একটু ঘামছিল উত্তেজনায়, ভয়ে। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নির্বিকার রেখে সে বলল, ঠিক আছে, শুনে রাখলাম। কিন্তু আমি একজন সামান্য সাব-এডিটর। টুপুর ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনও সাহায্যই করতে পারছি না। যা করার পুলিশই করবে।

টেলিফোনে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এলো। টুপুর মা বলল—এখন তো ইমার্জেন্সি চলছে, তাই পুলিশ খুব এলার্ট। কিন্তু কেন যেন টুপুর ব্যাপারে তারা তেমন ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না। এমন কি খুনটা পর্যন্ত বিশ্বাস করছে না।

—বিশ্বাস করাটা নির্ভর করে এভিডেন্সের ওপর। আপনি আপনার মেয়ের খুনের কোনও এভিডেন্সই যে দিতে পারছেন না।

—মায়ের মন সব টের পায়।

—কিন্তু পুলিশ তো আর মা নয়?

—ঠিক আছে, আপনাকে আজ আর বিরক্ত করব না। কিন্তু কখনো-সখনো দরকার হলে ফোন করব। বিরক্ত হবেন না তো!

—না, বিরক্ত হব কেন?

—আমি খবরের কাগজের অফিস কখনও দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। একদিন যদি আপনার অফিসে গিয়ে হাজির হই তো দেখাবেন? যদি অসুবিধে না থাকে?

—নিশ্চয়ই। কবে আসবেন?

—এ যাত্রায় হবে না। এলাহাবাদে আমার অনেক সম্পত্তি। সব পরের ভরসায় ফেলে এসেছি। শিগগিরই ফিরে যেতে হচ্ছে। তবে আমি প্রায়ই কলকাতায় আসি।

—বেশ তো, যখন সুবিধে হয়ে আসবেন।

—বিরক্ত হবেন না তো!

—না, এতে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। আজ ছাড়ি তাহলে?

—আপনার বুঝি খুব কাজ অফিসে?

—কাজ না করলে মাইনে দেবে কেন বলুন?

—আজ আপনার কী কাজ?

—আজ প্রাইম মিনিস্টারের একটা মিটিং কভার করতে হবে।

—ওমা! প্রাইম মিনিস্টার? আপনারা কত ভাগ্যবান! কোথায় মিটিং বলুন তো।

—রাজভবনে।

—ইস কী দারুণ? আপনি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবেন?

—বলব হয়তো।

—ভয় করবে না?

—ভয় কীসের? পিএম নিজেই তো মিটিং ডেকেছেন। আমাদের কথা শুনবার জন্যই।

—কী বলবেন?

—ঠিক করিনি। কথা জুগিয়ে যাবে।

—একটা কথা পিএম-কে বলবেন?

—কী কথা?

—বলবেন এদেশে মেয়েদের বড় কষ্ট।

—উনি নিজেও তো মেয়ে। উনি কি আর ভারতবর্ষের মেয়েদের কথা জানেন না?

—জানেন। উনি সব জানেন। এ দেশের মেয়েরা ওঁর মুখ চেয়েই তো বেঁচে আছে। তবু আপনি তো পুরুষ মানুষ, আপনার মুখ থেকে মেয়েদের কষ্টের কথা শুনলে উনি খুশি হবেন।

—ওঁকে খুশি করা তো আমার উদ্দেশ্য নয়।

টুপুর মা একটু চুপ করে থেকে বলে, তা ঠিক। তবে কী জানেন, ওঁকে খুশি করতে কেউ চায় না, সবাই শুধু ওঁর দোষটাই দ্যাখে। পি এম একজন মহিলা বলেই কি আপনারা পুরুষেরা ওঁকে সহ্য করতে পারেন না?

—তা কেন? পি এম মহিলা না পুরুষ সেটা কোনও ফ্যাকটরই নয়। আমরা দেখব ওঁর কাজ।

—আমার মনে হয় পুরুষেরা ওঁকে হিংসে করে।

—তাহলে পি এম পুরুষদের ভোটই পেতেন না। আপনি ভুল করছেন। এদেশের লোকেরা ইন্দিরা গান্ধীকে মায়ের মতো দ্যাখে।

—বলছেন! কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

—অবিশ্বাসের কিছু নেই। দেশটা একটু ঘুরে এলেই বুঝতে পারবেন।

—তা অবশ্য ঠিক। আমি দেশের কতটুকুই বা দেখেছি! কলকাতা আর এলাহাবাদ। আপনি খুব ঘুরে বেড়ান, না?

—খুব না হলেও কিছু ঘুরেছি, আর লোকের সঙ্গেও মিশি। আমি তাদের মনোভাব বুঝতে পারি।

—জানেন আমাদের এলাহাবাদের হাইকোর্টেই ওঁর মামলাটা হচ্ছিল, আমরা তখন প্রায়ই কোর্টে যেতাম। কী থ্রিলিং! তারপর উনি যখন হেরে গেলেন, কী মন খারাপ!

—হতেই পারে। আপনি খুব ইন্দিরা-ভক্ত।

—তা বলতে পারেন। আমি ওঁর ভীষণ ভক্ত। আপনি নন?

—আমি! আমার কারও ভক্ত হলে চলে না।

—ইন্দিরা এলাহাবাদের মেয়ে জানেন তো! আমাদের বাড়ি থেকে ওঁদের আনন্দ ভবন বেশি দূরেও নয়। ছাদে উঠলে দেখা যায়। আপনি তো গেছেন এলাহাবাদে, তাই না?

—হ্যাঁ, তবে খুব ভালো করে শহরটা দেখিনি।

—এবার গেলে দেখে আসবেন। খুব সুন্দর শহর।

—আচ্ছা দেখব।

—আর একটা কথা।

—বলুন।

—আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে কাজের।

—তেমন কিছু নয়।

—বলছিলাম কি, আমাকে দয়া করে পাগল ভাববেন না।

—ভেবেছি নাকি?

—হয়তো ভেবেছেন। ভাবলেও দোষ দেওয়া যায় না। সেই এলাহাবাদ থেকে মাঝরাতে ট্রাংক কল করা, তারপর মাঝে মাঝেই এইভাবে টেলিফোনে উত্যক্ত করা, তার ওপর টুপুর ঘটনা নিয়ে উটকো দায় চাপানো—আমি জানি আমার আচরণ খুব অদ্ভুত হচ্ছে। তবু আমি কিন্তু পাগল নই।

—আপনি যা করেছেন তা স্বাভাবিক অবস্থায় তো করেননি।

—ঠিক তাই। শোকে তাপে অস্থির হয়ে কী করব তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

—আমি আপনাকে পাগল ভাবিনি। কিন্তু আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। টুপুর বাবা কোথায়?

—ওমা! বলিনি আপনাকে?

—বলেছিলেন! তবে বোধহয় ভুলে গেছি।

—আমার স্বামী বেঁচে থেকেও নেই।

—তার মানে?

—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপুর মা বলে, মানে বুঝে আর কাজ নেই। আমার স্বামী ভালো লোক নন। তবে বড়লোকের ছেলে, তাই তাঁকে সবই মানিয়ে যায়।

—তিনি এখন কোথায়?

—যতদূর জানি বম্বেতে। একটি কচি মেয়ের সঙ্গে থাকেন।

—তিনি বেঁচে থাকতে আপনি তাঁর সম্পত্তি পেলেন কী করে?

—তাঁর সম্পত্তি পেলাম শাশুড়ি সেই রকম বন্দোবস্ত করে রেখে গিয়েছিলেন বলেই। তাছাড়া আমার বাপের বাড়িও খুব ফেলনা ছিল না। সেদিক থেকেও কিছু পেয়েছি।

—মাপ করবেন, এসব প্রশ্ন করা বোধহয় ঠিক হল না।

টুপুর মা একটু হাসলেন, আমাকে যে-কোনও প্রশ্নই করতে পারেন। আমার আর অপ্রস্তুত হওয়ার কিছু নেই। শোকে তাপে জ্বালায় আমি এখন কেমন একরকম হয়ে গেছি। আচ্ছা, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। ছাড়ছি।

—আচ্ছা।

ধৃতি টেলিফোন রেখে দিল। তার ভ্রূ একটু কোঁচকানো। মুখ চিন্তান্বিত।

নিউজ এডিটর ডেসকের সামনে দিয়ে একপাক ঘুরে যাওয়ার সময় সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ধৃতি, আজ তো তুমি পি এম-এর রাজভবন মিটিং কভার করবে।

—হ্যাঁ।

—কোনও পলিটিক্যাল ইস্যু তুলো না কিন্তু। মোটামুটি ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রবলেমের ওপর প্রশ্ন করতে পারো। ইমার্জেন্সি নিয়েও কিছু বলতে যেও না।

—না, ওসব বলব না।

—আমাদের কাগজের ওপর রুলিং পার্টি খুব সন্তুষ্ট নয়। টেক-ওভারের কথাও উঠেছিল। সাবধানে এগিও।

—ঠিক আছে।

—ইয়ং রাইটারদের কাকে কাকে চেনো?

—কয়েকজনকে চিনি।

—তাহলে তো ভালোই। পি এমকে কী জিগ্যেস করবে বলে ঠিক করেছো?

ধৃতি মৃদু হেসে বলে—দেখি।

প্রধানমন্ত্রীকে ধৃতির অনেক কথা জিগ্যেস করার আছে। যেমন, আপনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে ভালোই করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সেটা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচনী মামলায় হেরে যাওয়ার পর করলেন কেন? এতে আপনার ইমেজ নষ্ট হল না? কিংবা বিরোধীরা কোনও রাজ্যে সরকার গড়লেই কেন্দ্রে তার পিছনে লাগে কেন? কেনই বা নানা উপায়ে সেই সরকারকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে? আপনার কি মনে হয় না যে এতে সেই রাজ্যের ভোটাররা অপমানিত বোধ করতে থাকে এবং ফলে দ্বিগুণ সম্ভাবনা থেকে যায় ফের ওই রাজ্যে বিরোধীদের ক্ষমতায় ফিরে আসার? কিংবা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর যখন আপনার ভাবমূর্তি অতি উজ্জ্বল, যখন স্বতঃস্ফূর্ত ভোটের বন্যায় আপনি অনায়াসে ভেসে যেতে পারতেন তখন বাহাত্তরের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক রিগিং হয় তার কোনও দরকার ছিল কি? আপনি এমনিতেই বিপুল ভোট পেতেন,

তবু রিগিং করে এখানকার ভোটারদের অকারণে চটিয়ে দেওয়া কি অদূরদর্শিতার পরিচয় নয়? কিংবা আপনি যেমন ব্যক্তিত্বে, ক্ষমতায়, বুদ্ধিতে অতীব উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত মানুষ, আপনার আশেপাশে বা কাছাকাছি তেমন একজনও নেই কেন? আপনার দলের সকলেই কেন আপনারই মুখাপেক্ষী, আপনারই করুণাভিক্ষু? কেন আপনার দলে তৈরি হচ্ছে না পরবর্তী নেতৃবৃন্দের সেকেন্ড অফ লিডারশিপ?

কিন্তু এসব প্রশ্ন করা যাবে না। ধৃতি জানে, এই জরুরি অবস্থায় এসব প্রশ্ন করা বিপজ্জনক। তাছাড়া এই চা-চক্রটি নিতান্তই বুদ্ধিজীবীদের। এখানে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক কথাই উঠতে পারে।

নিউজ এডিটর বললেন—একটু সাবধানে প্রশ্ন-ট্রশ্ন কোরো। আর ওয়াচ কোরো কোন কবি সাহিত্যিক কী জিগ্যেস করেন।

ধৃতি একটু হেসে বলে—কবি সাহিত্যিকদের আমি জানি। তারা খুব সেয়ানা লোক। কোনও বিপজ্জনক প্রশ্ন তারা করবে না।

—সে তো জানি। তবু ওয়াচ কোরো। আর দরকার হলে গাড়ি নিয়ে যেও। মোটর ভেহিকেলসে তোমার নামে গাড়ি বুক করা আছে।

—দরকার নেই।

—নেই? তাহলে কী আছে।

মোটর ভেহিকেলসের গাড়ি নেওয়ার ঝক্কি অনেক। এই অফিসের সবচেয়ে কুখ্যাত বিভাগ হচ্ছে ওই মোটর ভেহিকেলস, গাড়ি মানেই চুরি। পার্টস, পেটরোল, টায়ার। এই কারণে দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলি তিতি-বিরক্ত হয়ে নিজস্ব মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্ট তুলেই দিচ্ছে। দিয়ে বাইরের গাড়ি ভাড়া করে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ধৃতি কয়েকবারই অফিসের কাজে গাড়ি নিয়েছে। নিতে গিয়ে দেখেছে গাড়ির ইনচার্জ অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে, দয়া করার মতো গাড়ি দেয়, গাড়ির ড্রাইভারও ভদ্র ব্যবহার করে না সব জায়গায় যেতে চায় না। বলতে গেলে মহাভারত। তাই ধৃতি অফিসের গাড়ি পারতপক্ষে নেয় না। আজও নেবে না।

পাঁচটার পর ধৃতি আর রমেন বেরোলো।

রাজভবনের ফটকে কড়া পাহারা। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কার্ড দেখাতেই ফটকের পুলিশ অফিসার উলটেপালটে দেখে বলল—যান।

দুজনে ভিতরে ঢুকতেই আবার পুলিশ ধরল এবং আবার কার্ড দেখাতে হল। এবং আবার এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ মিলল।

রমেন নীচুস্বরে বল, ধৃতিদা!

—বলো।

—বেশ ভয়-ভয় করছে।

—কেন বলো তো!

—আপনার করছে না?

—নাঃ। এক গণতান্ত্রিক দেশের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, ভয় কীসের? আমিও গণ তিনিও গণ।

রমেন একটু হেসে বলে—পুলিশ তা মনে করে না।

—তা অবশ্য ঠিক। সিকিউরিটির ব্যবস্থা স্টেট গভর্নমেন্টই করেছে। পি এম-এর কিছু হলে সরকারের বদনাম।

রমেন মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ বলল—আচ্ছা, রাজভবনের ভিতরের এই রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন তা জানেন?

—এমনি, পেবলের রাস্তা আরও কত জায়গায় আছে। বেশ লাগে।

রমেন মাথা নেড়ে বলল—না। এর একটা অন্য কারণও আছে।

—তাই নাকি?

—আমার কাকা পুলিশে চাকরি করতেন। বিগ অফিসার ছিলেন। নাম বললেই হয়তো চিনে ফেলবেন, তাই আপাতত নাম বলছি না। যখন চৌ এন লাই কলকাতায় এসে রাজভবনে ছিলেন তখন কাকা ছিলেন তাঁর সিকিউরিটি ইনচার্জ। তিনিই কাকাকে জিগ্যেস করেছিলেন, তোমাদের রাজভবনের রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন।

—তোমার কাকা কী বলেছিলেন?

—আপনার মতোই সৌন্দর্যের কথা বলছিলেন। চৌ এন লাই খুব মজার হাসি হেসে বলেছিলেন, মোটেই তা নয়। নুড়িপাথরের ওপর গাড়ি চললে শব্দ হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে লাটসাহেবদের সিকিউরিটির জন্যই ওই ব্যবস্থা তারপর চৌ এন লাই কাকাকে একটা গাড়ির শব্দ শোনালেন। শুনিয়ে বললেন, নাউ ইউ সি দ্যাট অন এ পেবল রোড দি সাউন্ড অফ এ কার কামিং অর গোয়িং ক্যানট বি সাপ্রেসড!

ধৃতি হেসে বলল—তাই হবে। সাহেবদের খুব বুদ্ধি ছিল।

—চৌ এন লাইয়েরও কম ছিল না। আমার কাকা পুলিশ হয়েও যেটা বুঝতে পারেনি উনি ঠিক পেরেছিলেন।

সিঁড়ির মুখে আর এক দফা বাধা ডিঙিয়ে যখন লাউঞ্জে ঢুকল তারা, তখন সেখানে ভীরু ও সংকুচিত মুখে এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বেশ কয়েকজন কবি সাহিত্যিক ও আর্টিস্ট জড়ো হয়েছে। রাজভবনের কালো প্রাচীন লিফটের সামনে বেশ একখানা ছোটখাটো ভিড়। এদের অনেককেই ধৃতি চেনে, রমেনও।

কয়েক ব্যাচ লিফট-বাহিত হয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার পরই ধৃতি আর রমেনের পালা এলো। লিফটম্যান সাফ জানিয়ে দিল, দোতলায় মিটিং বটে কিন্তু লিফট খারাপ বলে দোতলায় থামছে না। তিনতলায় উঠে দোতলায় নামতে হবে।

ধৃতি লিফটের ব্যাপারটা মনে মনে নোট করল। খরচের ওপর এখন কড়া সেনসর। কাজেই রাজভবনের লিফট ত্রুটিযুক্ত এ খবরটা লেখা হলেও ছাপা যাবে কিনা এতে ঘোর সন্দেহ।

তিনতলা থেকে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে দুজনে কিছু আতান্তরে পড়ে গেল। লিফটের সামনে সংকীর্ণ করিডোরে নেমে কোনদিকে যেতে হবে বুঝতে না পেরে সকলেই গাদাগদি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খেতেও কেউ সাহস করছে না। ফিসফাস কথা বলছে শুধু।

সেই ভিড়ে ধৃতি আর রমেনও দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন সকলেই খানিকটা উশখুশ করছে তখনই অত্যন্ত সুপুরুষ এবং তরুণ এক মিলিটারি অফিসার করিডোরে ঢুকেই হাত নেড়ে সবাইকে প্রায় গরু তাড়ানোর মতো করে নিয়ে তুলল দক্ষিণের প্রকাণ্ড বারান্দায়।

বারান্দার পরেই একখানা হলঘর। তাতে মস্ত মস্ত টেবিল পাতা। টেবিলে খাবার সাজানো থরে থরে। উর্দিপরা বেয়ারা ছাড়া সে ঘরে কেউ নেই। বোঝা গেল এই ঘরেই ইন্দিরার সঙ্গে তারা সবাই চা খাবে। তবে আপাতত প্রবেশাধিকার নেই। দরজায় গার্ড দাঁড়িয়ে।

বারান্দায় কয়েকজন সিগারেট ধরাল। কে এসে চুপি চুপি খবর দিল। ময়দানের মিটিং শেষ হয়েছে। ইন্দিরা রাজভবনে রওনা হয়েছেন। সকলেই কেমন যেন উদ্বিগ্ন, অসহজ, অপ্রতিভ। যারা জড়ো হয়েছে তারা সবাই কবি সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক বটে, কিন্তু সকলেই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের। রাজভবনে আসা বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাদের জীবনে খুব একটা সাধারণ ঘটনা নয়। তার ওপর জরুরি অবস্থার একটা গা ছমছমে ব্যাপার তো আছেই।

খুবই আকস্মিকভাবে একটা চঞ্চলতা বয়ে গেল ভিড়ের ভিতর দিয়ে।

এলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। স্মার্ট চেহারা, মুখে সপ্রতিভ হাসি, হাতজোড়। বললেন—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন তো! আসুন আসুন, এ ঘরে আসুন।

আবহাওয়াটা কিছু সহজ হয়ে গেল। হাতে পায়ে সাড় এলো যেন সকলের।

হলঘরে ঢুকে ভালো করে থিতু হওয়ার আগেই ধৃতি অবিশ্বাসের চোখে দেখল, ইন্দিরা ঘুরে ঢুকছেন।

সে কখনো ইন্দিরা গান্ধীকে এত কাছ থেকে দেখেনি। দেখে সে বেশ অবাক হয়ে গেল। ছবিতে যেরকম দেখায় মোটেই সেরকম নন ইন্দিরা। ছোটখাটো ছিপছিপে কিশোরীপ্রতিম তাঁর শরীরের গঠন। গায়ের রং বিশুদ্ধ গোলাপি। মুখে সামান্য পথশ্রমের ছাপ আছে। কিন্তু হাসিটি অমলিন।

ইন্দিরা ঘরে ঢুকেই আবহাওয়াটা আরও সহজ করে দিলেন। ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন। সঙ্গে ঘুরছেন রাজ্যপাল ডায়াসের পত্নী।

ধৃতি প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ ইন্দিরা তার মুখোমুখি এসে গেলেন।

ধৃতি চিন্তা না করেই হঠাৎ ইংরিজিতে জিগ্যেস করল—ম্যাডাম, আপনি কবিতা গল্প উপন্যাস পড়েন?

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ইন্দিরা বললেন—সময় তো আমার খুব কমই হতে থাকে। তবু পড়ি। আমি পড়তে ভালোবাসি।

—কীরকম লেখা আপনার ভালো লাগে?

একটু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, হতাশাব্যঞ্জক কিছুই আমার পছন্দ নয়, জীবনের অস্তিবাচক দিক নিয়ে লেখা আমি পছন্দ করি।

—মহান ট্র্যাজেডিগুলো আপনার কেমন লাগে?

—যা মহান তা তো ভালো বলেই মহান।

আর সুযোগ হল না। আর একজন এসে মৃদু ঠেলায় সরিয়ে দিল ধৃতিকে। ধৃতি সরে এল।

ইন্দিরা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। থাক করা প্লেট থেকে একটা দুটো তুলে দিলেন অভ্যাগতদের হাতে। ধৃতি সেই বিরল ভাগ্যবানদের একজন যে ইন্দিরার হাত থেকে প্লেট নিতে পারল। প্লেটটা নিয়েই সে মৃদু স্বরে বলল, ধন্যবাদ ম্যাডাম, আমি আপনার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুন্দরী মহিলা জীবনে দেখিনি। সুন্দরীরা সাধারণত বোকা হয়।

ইন্দিরা তার এই দুঃসাহসিক মন্তব্যে রাগ করলেন না। শুধু মৃদু হেসে বললেন, জীবনে কোনও লক্ষ্য না থাকলে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

চমৎকার কথা। ধৃতি মনে মনে কথাটা টুকে রাখল।

রাজভবনের জলখাবার কেমন তা সাংবাদিক হিসেবেই লক্ষ করছিল ধৃতি। খুব যে উঁচুমানের তা নয়। মোটামুটি খেয়ে নেওয়া যায়। খারাপ নয়, এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। তবে ইন্দিরা গান্ধীও এই খাবার মুখে দিচ্ছেন, এইটুকুই যা বলার মতো।

রমেন একটা প্যাস্ট্রি কামড়ে ধৃতিকে নীচু স্বরে বলল, পি এম-কে আমার হয়ে একটা প্রশ্ন করবেন?

—কী প্রশ্ন?

—উনি কবিতা পড়েন কিনা।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমি অলরেডি অনেক বাচালতা করে ফেলেছি। এবার তুমি করো।

—ও বাবা, আমার ভয় করে।

—ভয়! ইন্দিরাজিকে ভয়ের কী?

—আপনার গাটস আছে, আমার নেই।

—গাটস নয়। আমি জানি ইন্দিরাজি সাধারণ মানুষের অনেক উর্ধ্বে। ওঁর একটা দারুণ কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যা পলিটিক্যাল দলবাজিতে মার খায়নি। উনি হিউমার বোঝেন, আর্ট ভালোবাসেন, সৌন্দর্যবোধ আছে, যা পলিটিকিসওয়ালাদের অধিকাংশেরই নেই। এই মানুষকে যদি ভয় পেতে হয় তো পাবে ওঁর প্রতিপক্ষরা, আমরা পাব কেন?

—আপনি কি একটু ইন্দিরা-ভক্ত ধৃতিদা?

—আমি তো পলিটিকস বুঝি না, কিন্তু মানুষ হিসেবে এই মহিলাকে আমার দারুণ ভালো লাগে। তবে তোমার প্রশ্নের জবাবে আমিই বলে দিতে পারি, ইন্দিরাজি কবিতা না ভালোবেসেই পারেন না। ওঁকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পড়ে গেল দুজন। মুখ্যমন্ত্রী রায় সকলকেই বদান্যভাবে স্মিতহাসি বিতরণ করছিলেন। ধৃতির দিকে চেয়ে সেই হাসিমাখা মুখেই বললেন, চা খেয়েই হলঘরে চলে যাবেন, কেমন?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

হলঘরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গ্যালারির মতো। ডায়াসে পাঁচখানা চেয়ারে উপবিষ্ট ইন্দিরা, রাজ্যপাল ডায়াস ও তাঁর স্ত্রী, সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী।

বুদ্ধিজীবীরা একে একে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। নাম, কী লেখেন বা আঁকেন ইত্যাদি। ইংরিজি বা হিন্দিতে। ধৃতি দ্রুত নোট নিতে নিতেই নিজের পালা এলে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে নিল।

ধৃতি স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সহজ স্বতঃস্ফূতর্তা নেই। প্রত্যেকেই আড়ষ্ট, নিজেকে আড়াল করতে ব্যস্ত এবং কেউই আজকের আলোচনায় প্রাধান্য চায় না। সবকিছুরই মূলে রয়েছে ইমার্জেন্সি, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যা একটি অভূতপূর্ব জুজুর ভয়। ইউ পি-তে নাসবন্দির কথা শোনা যাচ্ছে, দিল্লিতে বস্তি এবং বসত উচ্ছেদের কথা কানাকানি হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতার উৎস সঞ্জয় গান্ধী ও তাঁর অত্যুৎসাহী সাঙ্গপাঙ্গদের কথা। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীরাও ভীত, বিরক্ত বা উদ্বিগ্ন। সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা ততোধিক। বিরোধী নেতাদের অনেকেই কারাগারে, ঠোঁটকাটা কতিপয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরাও অনুরূপ রাজরোষের শিকার। আর সবকিছুর মূলে যিনি, সেই অখণ্ড কর্তৃত্বময়ী নারী এখন ধৃতির চোখের সামনে ওই বসে আছেন। কিন্তু ধৃতি কিছুতেই মহিলাকে অপছন্দ করতে পারছিল না। একটু অস্বস্তি তারও আছে ঠিকই, কিন্তু এই মহিলার মানবিক আকর্ষণটাও তো কম নয়। এঁকে সে ডাইনি ভাববে কী করে?

প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার পর দু-চারজন উঠে একে একে ভয়ে ভয়ে দু-চার কথা বলল। তেমন কোনও প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নয়। কেউ বলল, লেখক ও কবিদের

জন্য একটা স্টুডিয়ো করে দেওয়া হোক, কারও প্রস্তাব, সরকার তাদের গ্রন্থ প্রকাশে কিছু সাহায্য করুক। এইরকম সব এলেবেলে কথা।

ইন্দিরা সাধ্যমতো জবাব দিলেন। কিছু জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রীও। তবে কেউ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছলো না।

সবশেষে ইন্দিরা দু-চারটে কথা খুব শান্ত গলায় বললেন। প্রধান কথাটা হল, এখন নিরাশার সময় নয়। নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। শিল্পে বা সাহিত্যেও কিছু দায়বদ্ধতা থাকা উচিত এবং কিছু স্বতঃপ্রণোদিত দায়িত্ববোধও।

সবাই খুশি। তেমন কোনও ওপর-চাপান দেননি ইন্দিরা, শাসন করেননি, ভয় দেখাননি। স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল সবাই। জরুরি অবস্থায় শুধু একটু সামলে লিখতে বা আঁকতে হবে।

ধৃতি জানে, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশেরই কোনও রাজনৈতিক বোঠ বা দলগত পক্ষপাতিত্ব নেই। রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনার চাষ তাঁরা বেশিরভাগই করেন না। একমাত্র বামপন্থী লেখক কবি বা শিল্পীরা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় তেমন বেশি নন।

তাছাড়া বামপন্থী বা মার্কসীয় সাহিত্য বাংলায় তেমন সফলও হয়নি। সুতরাং তাঁদের কথা না ধরলেও হয়। বাদবাকিরা রাজনীতিমুক্ত বুদ্ধিজীবী। রাজনীতির দলীয় কোন্দল থেকে তাঁদের বাস বহুদূরে। সেটা ভালো না মন্দ সে বিচার ভিন্ন। তবে এই জরুরি অবস্থার দরুণ তাঁরা কেউ আতঙ্কিত নন। কিন্তু অস্বস্তি একটা থাকেই। সেই অস্বস্তি ইন্দিরা আজ কাটিয়ে দিলেন।

অফিসে এসে রিপোর্টে লিখতে ধৃতির ন'টা বেজে গেল। কপিটা নিউজ এডিটরের টেবিলে গিয়ে রেখে সে বলল, শরীরটা ভালো লাগছে না। যাচ্ছি।

—শরীর ভালো নেই তো অফিসের গাড়ি নিয়ে যাও। বলে দিচ্ছি।

—না, চলে যেতে পারব।

—তাহলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—দেখছি। রিপোর্টটা আপনি যতক্ষণ পড়বেন ততক্ষণ অপেক্ষা করব কি?

—না, তার দরকার নেই। কিছু অদলবদল দরকার হলে আমিই করে নিতে পারব। সেনসর থেকে আগে ঘুরে আসুক তো।

ধৃতি বেরিয়ে এল। কাউকে সঙ্গে নিল না। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে। আর ট্যাক্সিতে বসেই বুঝতে পারল তার প্রবল জ্বর আসছে। জ্বরের এই লক্ষণ ধৃতি খুব ভালো চেনে। ছাত্রাবস্থা থেকেই হোটেলে মেসে এবং রেস্তোরাঁয় আজেবাজে খেয়ে তার পেটে একটা বায়ুর উপসর্গ দ্যাখা দিয়েছে। যখনই উপসর্গটা দেখা দেয় তখনই তার

কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠে যায় একশো তিন চার ডিগ্রি। এক ডাক্তার বন্ধু একবার বলেছিল, তোর জ্বর হলে পেটের চিকিৎসা করাবি, জ্বর সেরে যাবে।

এ জ্বরটা সেই জ্বর কিনা বুঝতে পারছিল না সে। তবে যখন বাসার সামনে এসে নামল তখন সে টলছে এবং চোখে ঘোর দেখছে।

নিতান্তই ইচ্ছাশক্তির জোরে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেতে চেষ্টা করল। থেমে থেমে, দম নিয়ে নিয়ে। পরমা বাসায় আছে তো! যদি না থাকে তবে একটু বিপাকে পড়তে হবে তাকে।

দোতলা অবধি উঠে তিনতলার সিঁড়িতে পা রেখে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধৃতি। মাথাটা বড্ডা টলমল করছে।

—কী হয়েছে আপনার?

ধৃতি আবছা দেখল, একটা মেয়ে, চেনা মুখ। এই ফ্ল্যাটবাড়িরই কোনও ফ্ল্যাটে থাকে। বেশ চেহারাখানা, বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি ঘন এবং গাঢ় শ্বাস ফেলছিল, শরীরটা বাস্তবিকই যে কতটা খারাপ তা এতক্ষণ সে টের পায়নি, এবার পাচ্ছ, তবু মর্যাদা বজায় রাখতে বলল, আমি পারব।

—আপনার যে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

—পারব। ও কিছু নয়।

—সত্যিই পারবেন? আমার দাদা আর বাবা ঘরে আছে, তাদের ডাকি? ধরে নিয়ে ওপরে দিয়ে আসবে।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, পারব, একটু রেস্ট নিয়ে নিই তাহলেই হবে।

—তবে আমাদের ফ্ল্যাটে বসে রেস্ট নিন। আমি পরমাদিকে খবর পাঠাচ্ছি। সহৃদয় পুরুষ এবং সহৃদয়া মহিলার সংখ্যা আজকাল খুব কমে গেছে। আজকাল ফুটপাথে পড়ে-থাকা মানুষের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। দায়িত্ব নিতে সকলেই ভয় পায়। মেয়েটির আন্তরিকতা তাই বেশ লাগছিল ধৃতির। সে রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু দু-ধাপ সিঁড়ি নামতে গিয়েই মাথাটা একটা চক্কর দিয়ে ভোম হয়ে গেল। তারপরই চোখের সামনে হলুদ আলোর ফুলঝুরি। ধৃতি একবার হাত বাড়াল শেষ চেষ্টায় কিছু ধরে পতনটা সামলানোর জন্য। কিন্তু বৃথাই। নিজের শরীরের ধমাস করে শানে আছড়ে পড়ার শব্দটা শুনতে পেল ধৃতি। তারপর আর জ্ঞান রইল না।

যখন চোখ চাইল তখন পরমা তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। মুখে উদ্বেগ।

ধৃতি চোখ মেলতেই পরমা মৃদু স্বরে জিগ্যেস করল, কেমন লাগছে? একটু ভালো?

ধৃতি পূর্বাপর ঘটনাটা মনে করতে পারল না। শুধু মনে পড়ল, সিঁড়ির ধাপে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। শরীরটা আগে থেকেই দুর্বল লাগছিল তার। শরীরে জ্বর। কিন্তু এই জ্বর তার হয় পেটের গোলমাল থেকে। দীর্ঘকাল মেসে হোটেলে খেয়ে তার একটা বিশ্রী

রকমের অম্বলের অসুখ হয়। এখনও পুরোপুরি সারেনি। সেই চোরা অম্বল থেকে পেটে গ্যাস জমে মাঝে মাঝে জ্বর হয় তার। আর এই অবস্থায় শরীর তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে।

ধৃতি পরমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, খুব ভয় পেয়ে গেছ, না?

—ভয় হবে না! কীভাবে পড়ে গিয়েছিলেন! ওরা সব ধরাধরি করে যখন নিয়ে এল তখন তো আমি সেই দৃশ্য দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার এসে বলে গেল, তেমন ভয়ের কিছু নেই।

ধৃতি একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, ভয় পেও না। এরকম জ্বর আমার মাঝে মাঝে হয়।

—জ্বর হতেই পারে। কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন কেন?

ধৃতি ফের একটু মুখ টিপে হেসে বলল, ওই মেয়েটাকে দেখেই বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

—যাঃ! ইয়ার্কি হচ্ছে?

—কেন, মেয়েটা সুন্দর নয়?

—সুন্দর নয় তো বলিনি। তবে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো নয় মোটেই। পৃথাকে আপনি বহুবার দেখেছেন।

ধৃতির আর ইয়ার্কি দেওয়ার মতো অবস্থা নয়। সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

—শুনছেন? ডাক্তার আপনাকে গরম দুধ-বার্লি খাইয়ে দিতে বলে গেছেন।

—দুধ-বার্লি আমি জীবনে খাইনি। ওয়াক।

—অসুখ হলে লোকে তবে কী খায়?

—ও আমি পারব না।

—না খেলে দুর্বল লাগবে না?

—পি এম-এর পার্টিতে খেয়েছি। খিদে নেই।

—কী খাওয়াল ওখানে?

—অনেক কিছু।

—পি এম-কে দেখলেন?

—দেখলাম।

—আপনি ভাগ্যবান। আমাকে দেখালেন না তো? আচ্ছা আপনি ঘুমোন। একটু বাদে তুলে খাওয়াবো।

—ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে আর ডেকো না পরমা। একটানা কিছুক্ষণ ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তা কি হয়? খেতে হবে।

—হবেই?

—না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বেন।

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, ওরা আমাকে চ্যাংদোলা করে ওপরে এনেছিল, না?

—প্রায় সেইরকম। কেন বলুন তো!

—আমিও বুঝতে পারছি না হঠাৎ একটা সুন্দর মেয়ের সামনে গাড়লের মতো আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম কেন। বিশেষ করে মেয়েটা যখন ওদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে।

পরমা সামান্য হেসে বলে, অজ্ঞান কি কেউ ইচ্ছে করে হয়?

—ইচ্ছাশক্তিও এক মস্ত শক্তি। ইচ্ছাশক্তি খাটাতে পারলে আমি কিছুতেই অজ্ঞান হতাম না।

—এটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন? কেউ তো আর কিছু বলেনি।

—বলার দরকারও নেই। আমি শুধু ভাবছি আমার ইচ্ছাশক্তি এত কম কেন।

—মোটেই কম নয়। আজ আপনার খুব ধকল গেছে। সেইজন্য।

ধৃতি একটু গুম হয়ে থেকে বলে, আচ্ছা কী খাওয়াবে খাইয়ে দাও। শোনো তোমাদের রাত্রে রুটি হয়নি?

—হচ্ছে।

—তাই দুখানা নিয়ে এসো। সঙ্গে ডাল-ফাল যা হোক কিছু।

শঙ্কিত গলায় পরমা বলে, রুটি খেলে খারাপ হবে না তো?

—আরে না। বার্লি-ফার্লি আমি কখনও খাই না। দুধও চুমুক দিয়ে খেতে পারি না। রুটিই আনো।

পরমা উঠে গেল।

ধৃতি চেয়ে রইল সিলিঙের দিকে। বড় আলো নেভানো। ঘরে একটা কমজোরি বালবের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে মাত্র। ধৃতি চেয়ে রইল। স্মরণকালের মধ্যে যে কখনও অজ্ঞান হয়নি। শরীর শত খারাপ হলেও না। তবে আজ তার এটা কী হল? ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হচ্ছে না তো তার? জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে না তো?

নিজেকে নিয়ে ধৃতির চিন্তার শেষ নেই।

পরমা রুটি নিয়ে এল। দু-খানার বদলে ছ'খানা। ডাল, তরকারি, আলুভাজা, মাংস অবধি।

—ও বাবা, এ যে ভোজের আয়োজন।

—রুটিতে ঘি মাখিয়ে দিয়েছি।

—বেশ করেছো। আমার বারোটা তুমিই বাজাবে।

—ওমা, আমি বারোটা বাজাব কী করে?

—জ্বোরো রুগিকে কেউ ঘি খাওয়ায়?

—রুটি শুকনো কেউ খায়?

ধৃতি একটু হাসল। পরমাকে বুঝিয়ে কিছু লাভ নেই। গ্রে ম্যাটার ওর মাথায় খুবই কম। তবে পরমা মেয়েটা বড় ভালো মানুষ। ধৃতি তাই খেতে শুরু করে দিল। কিন্তু বিস্বাদ মুখে তেমন কিছুই খেয়ে উঠতে পারল না। পরমার অনেক তাগিদ সত্বেও না।

ওষুধ খেয়ে সে ক্লান্তিতে চোখ বুঝল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু জ্বর-যন্ত্রণায় কাতর শরীরে নিপাট নিশ্ছিদ্র ঘুম হয় না। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘুমের চটকা ভেঙে চোখ চেয়েই সে পিপাসায় 'ওঃ' বলে শব্দ করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন কাছে এল। একটা সুন্দর গন্ধ পেল ধৃতি। ঘুম জড়ানো চোখে অবাক হয়ে দেখল, পরমা।

—তুমি! তুমি জেগে আছো কেন?

—ওমা! আপনার এত জ্বর আর আমি পড়ে পড়ে ঘুমোবো?

ধৃতি ম্লান একটু হেসে বলে, বন্ধুপত্নী, তুমি বড়ই সরলা।

—সরলা! হোয়াট ডু ইউ মিন? বোকা নয় তো!

—বোকা ছাড়া আর কী বলা যায় বলো তো তোমাকে! একেই তো পরপুরুষের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে বসবাস করছো। তার ওপর আবার এক ঘরে এবং এত রাতে!

—তাতে কী হয়েছে বলুন তো!

—এখনও কিছু হয়নি বটে তবে হতে কতক্ষণ! কথাটা বাইরে জানাজানি হলে যা একখানা নিন্দে হবে দেখো।

ঠোঁট উলটে পরমা বলে, হোক গে। তা বলে একশো চার জ্বরের একজন রুগিকে একা ঘরে ফেলে রাখতে পারব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, একটু জল দাও।

পরমা জল দেয় এবং ধৃতি শোয়ার পর তার কপালে জলে ভেজা ঠান্ডা করতলটি রেখে নরম স্বরে বলে, ঘুমোন, আমি আরও কিছুক্ষণ আপনার কাছে থাকব।

—থাকার দরকার নেই। এবার গিয়ে ঘুমোও।

—জ্বরটা আর একটু কমুক। তারপর যাবো।

—এত ভাবছো কেন বলো তো!

—কী জানি কেন, তবে কারও অসুখ করলে আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। আপনাকে তো দেখার কেউ নেই।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ক্বচিৎ কদাচিৎ তারও একথাটা মনে হয়। তার বাস্তবিকই কেউ নেই। দাদা দিদি এরা থেকেও অনাত্মীয়। তবে বয়সের গুণে এবং কাজকর্মের মধ্যে থাকার দরুন আত্মীয়হীনতা তাকে তেমন উদ্বিগ্ন করে না। বরং কেউ না থাকায় সে অনেকটাই স্বাধীন। তবু এইরকম অসুখ-বিসুখের সময় বা হঠাৎ ডিপ্রেসন হলে একাকীত্বটা সে বড় টের পায়।

পরমা কপালে একটা জলপটি লাগাল। বলল, মাথাটা একটু ধুয়ে দিতে পারলে হতো।

—এত রাতে আর ঝামেলায় যেয়ো না। আমি অনেকটা ভালো ফিল করছি।

—একশো চার জ্বরে কেমন ভালো ফিল করে লোকে তা জানি।

—তুমি সত্যিই জেগে থাকবে নাকি?

—থাকব তো বলেছি।

ধৃতি পরমার দিকে তাকাল। আবছা আলোয় এক অদ্ভুত রহস্যময় সৌন্দর্য ভর করেছে পরমার শরীরে। এলো চুলে ঘেরা মুখখানা যে কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু ধৃতি পরমার প্রতি কখনই কোনও শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেনি। আজও করল না। কিন্তু মেয়েটার প্রতি সে এক অদ্ভুত ব্যাখ্যাতীত মায়া আর ভালোবাসা টের পাচ্ছিল। জ্বরতপ্ত দুখানা হাতে পরমার হাতখানা নিজের কপালে চেপে ধরে ধৃতি বলল, তোমার মনটা যেন চিরকাল এরকমই থাকে পরমা। তুমি বড় ভালো।

হঠাৎ পরমার মুখখানা তার মুখের খুব কাছাকাছি সরে এল।

গাঢ়স্বরে পরমা বলল, আর কমপ্লিমেণ্ট দিতে হবে না। এখন ঘুমোন। ধৃতি ঘুমোলো। এক ঘুমে ভোর।

জ্বরটা ছাড়লেও দিন দুই বেরোতে পারেনি ধৃতি। তিন দিনের দিন অফিসে গেল।

ফোনটা এল চারটে নাগাদ।

—এ কদিন অফিসে আসেননি কেন? আমি রোজ আপনাকে ফোন করেছি।

ধৃতি একটু শিহরিত হল গলাটা শুনে। বলল, আমার জ্বর ছিল।

—আপনার গলার স্বরটা একটু উইক শোনাচ্ছে বটে। যাই হোক, সেদিন পিএম-এর সঙ্গে আপনাদের ইন্টারভিউয়ের রিপোর্ট কাগজে পড়েছি। বেশ লিখেছেন। কিন্তু আপনারা কেউই পি এম-কে তেমন অস্বস্তিতে ফেলতে পারেননি।

—পি এম অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাঁকে রংফুটে ফেলা কি সহজ?

—তা বটে।

—আপনি এখনও এলাহাবাদে ফিরে যাননি?

—না। রোজই যাব-যাব করি। কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে যায়। আবার ভাবি, গিয়েই বা কী হবে। টুপু নেই, ফাঁকা বাড়িতে একা একা সময়ও কাটে না ওখানে।

—এখানে কী ভাবে সময় কাটাচ্ছেন?

—এখানে! ও বাবাঃ, কলকাতায় কি সময় কাটানোর অসুবিধে? ছবির একজিবিশনে যাই, ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনি, থিয়েটার দেখি, মাঝে মাঝে সিনেমাতেও যাই, আর ঘুরে বেড়ানো বা মার্কেটিং তো আছেই।

—হ্যাঁ, কলকাতা বেশ ইন্টারেস্টিং শহর।

—আপনারও কি কলকাতা ভালো লাগে?

—লাগে বোধহয়, ঠিক বুঝতে পারি না।

—বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

—আমার! আমার প্রায় কেউই নেই। এক বন্ধুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট থাকি।

—ওমা। বলেননি তো কখনও?

—এটা বলার মতো কোনও খবর তো নয়।

—আপনার মা বাবা নেই?

—না।

—ভাই-বোন?

—আছে, তবে না থাকার মতোই।

—আপনি তাহলে খুব একা?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আমার মতোই।

—আপনার একাকীত্ব অন্যরকম। আমার অন্যরকম।

—আচ্ছা, একটা প্রস্তাব দিলে কি রাগ করবেন?

—রাগ করব কেন?

—আমাদের বাড়িতে আজ বা কাল একবার আসুন না!

—কী হবে এসে? টুপুর ব্যাপারে আমি তো কিছু করতে পারিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা বললেন, কারোরই কিছু করার নেই বোধহয়। কিন্তু তাতে কী? আমি আপনার একটু সঙ্গ চাই। রাজি হবেন না?

—না, রাজি হতে বাধা নেই। আচ্ছা যাব'খন।

—ওরকম ভাসা ভাসা বলা মানেই এড়িয়ে যাওয়া। আপনি কাল বিকেলে আসুন। আমি অপেক্ষা করব।

—কখন?

—চারটে।

—বিকেলে যে আমার অফিস।

—কখন ছুটি হয় আপনার?

—রাত নটা।

—তাহলে সকালে আসুন। এখানেই দুপুরে খেয়ে অফিসে যাবেন।

ধৃতি হেসে ফেলে বলে, চাক্ষুস পরিচয়ের আগেই একেবারে ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করে ফেলছেন! আমি কেমন লোক তাও তো জানেন না।

ওপাশে একটু হাসি শোনা গেল। টুপুর মা একটু বেশ তরল স্বরেই বলল,—বরং বলুন না যে, আমি আপনার অচেনা বলেই ভয়টা বরং আপনার।

ধৃতি বলে, আমি ভবঘুরে লোক, আত্মীয়হীন, আমার বিশেষ ভয়ের কিছু নেই। পুরুষদের বেলায় বিপদ কম। মহিলাদের কথা আলাদা।

—আপনার কিছুই তেমন জানি না বটে, চাক্ষুসও দেখিনি, কিন্তু পত্র-পত্রিকায় আপনার ফিচার পড়ে জানি যে আপনি খুব সৎ মানুষ।

—ফিচার পড়ে? বাঃ, ফিচার থেকে কিছু বুঝি বোঝা যায়?

—যায়। আপনি না বুঝলেও আমি বুঝি। ভুল আমার কমই হয়। আরও একটা কথা বলি। আপনার মতোই আমিও কিন্তু একা। আমার কেউ নেই বলতে গেলে। একা থাকি বলেই আমার নিরাপত্তার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে। সামান্য কারণে অহেতুক ভয় বা সংকোচ করলে আমার চলে না। এবার বলুন আসবেন?

—ঠিক আছে, যাব।

—সকালেই তো?

—খুব সকালে নয়। এগারোটা নাগাদ।

—ঠিক আছে। ঠিকানাটা বলছি, টুকে নিন।

ঠিকানা নিয়ে ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর ধৃতি ভাবতে লাগল কাজটা ঠিক হল কিনা, না, ঠিক হল না। তবে এই ভদ্রমহিলা আড়াল থেকে তাকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে আসছেন কিছুদিন হল। টুপু নামে এক ছায়াময়ীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক পরোক্ষ রহস্য। হয়তো মুখোমুখি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হলে সেই রহস্যের কুয়াশা খানিকটা কাটবে। তাই ধৃতি একটু ঝুঁকিটুকি নিল। বিপদে যদি বা পড়ে তার তেমন ভয়ের কিছু নেই। বিপদ তেমন আছে বলেও মনে হচ্ছে না তার।

একটু অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়ে দিনটা কাটল ধৃতির। পত্রিকায় ফিচার লিখতে প্রচুর চিঠি আসে। ধৃতিরও এসেছে। মোট সাতখানা। সেগুলো অন্য দিন যেমন আগ্রহ নিয়ে পড়ে ধৃতি, আজ সেরকম আগ্রহ ছিল না। কয়েকটা খবর লিখল, আড্ডা মারল, চা খেল বারকয়েক সবই অন্যমনস্কতার মধ্যে। শরীরটাও দুর্বল।

একটু আগেভাগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এল ধৃতি। সাড়ে আটটায় ঘরে ফিরে এসে দ্যাখে, পরমা দারুণ সেজে ডাইনিং টেবিলে খাবার গোছাচ্ছে।

—কী পরমা? তোমার পতিদেবটি ফিরেছে নাকি?

—না তো! হঠাৎ কী দেখে মনে হল?

—তোমার সাজ আর ব্যস্ততা দেখে।

—খুব ডিটেকশন শিখেছেন।

—তবে আজ এত সাজের কী হল?

—বাঃ, সাজটাই বা কী করেছি! মুগার শাড়িটা অনেককাল পরি না, একটু পরেছি, তাই আবার একজনের চোখ কটকট করছে।

—আহা, অত ঝলমলে জিনিস চোখে একটু লাগবেই। ব্যাপারটা একটু খুলে বললেই তো হয়। কেসটা কী?

পরমা খোঁপার মাথাটা ঠিক করতে করতে বলল, ফ্ল্যাটবাড়ি হল একটা কমিউনিটি, জানেন তো!

—জানবো না কেন, বুদ্ধু নাকি? ছ'মাস আগেই কলকাতার এই ফ্ল্যাটবাড়ির নিও কমিউনিটি নিয়ে ফিচার লিখেছিলাম।

—জানি। পড়েওছি। ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতে গেলে সকলের সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে চলতে হয়। আজ দোতলায় দোলাদের ফ্ল্যাটে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। ওদের মেয়ের জন্মদিন।

—খুব খাওয়াল?

—প্রচুর। মুরগি, গলদা, ভেটকি ফ্রাই, ফিস রোল, লুচি, ফ্রায়েড রাইস, পায়েস...

—রোখকে ভাই। তুমি ক্যালোরি হিসেব করে খাও না নাকি?

—তার মানে?

—ওরকম গান্ডেপিন্ডে খেলে যে দুদিনেই হাতির মতো হয়ে যাবে।

—আহা আমার ফিগার নিয়ে ভেবে ভেবে তো চোখে ঘুম নেই। আমি এত বোকা নই মশাই, একখানা মুরগির ঠ্যাং দু-ঘণ্টা ধরে চিবিয়ে এসেছি মাত্র।

—রোল খাওনি?

—আধখানা।

—গলদা ছেড়ে দিলে? চল্লিশ টাকা কিলো যাচ্ছে।

—ওই একটু।

—দইটা কেমন ছিল?

—দই! না, দই করেনি তো। আইসক্রিম।

—কেমন ছিল?

—বাঃ, আইসক্রিম আবার কেমন হবে? ভালোই।

—মিষ্টির আইটেম করেনি তাহলে! ছ্যাঁচড়া আছে।

—মোটেই না। তিন রকম সন্দেশ ছিল মশাই।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, না! তোমার ফিগার কিছুতেই রাখতে পারবে না পরমা। এত যে কেন খাও!

—নজর দেবেন না বলছি।

—দিচ্ছি না। কেউ আর দেবেও না।

—খুব হয়েছে। দোলা আপনার জন্যও চর্বচোষ্য পাঠিয়েছে। এতক্ষণ ধরে সেগুলো নীচু আঁচে রেখে বসে আছি। দয়া করে এবার গিলুন।

—আমার জন্য! আমার জন্য পাঠাবে কেন? তারা কি আমাকে চেনে?

—এমনিতে চেনে না। তবে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দহরম মহরম আছে মনে করে হঠাৎ চিনতে শুরু করেছে। যান তো, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে আসুন।

ধৃতি হাতমুখ ধুয়ে এল বটে, কিন্তু মুখে এক বিচ্ছিরি অরুচি জ্বরের পর থেকেই তার খাওয়ার আনন্দকে মাটি করে দিয়েছে। টেবিলে বসে বিপুল আয়োজনের দিকে চেয়ে সে শিউরে উঠে বলল, এক কাজ করো পরমা, মুরগি আর লুচি বাদে সব সরিয়ে নাও। ফ্রিজে রেখে দাও, পরে খাওয়া যাবে।

—অরুচি হচ্ছে, না?

—ভীষণ, খাবার দেখলেই এলার্জি হয় যেন।

—কী করি বলুন তো আপনাকে নিয়ে!

—আমাকে নিয়ে তোমার অনেক জ্বালা আছে ভবিষ্যতে। বুঝবে।

—এখনই কি বুঝছি না নাকি?

বলে পরমা সযত্নে তাকে খাবার বেড়ে দিল। একটা বাটিতে খানিকটা চাটনি দিয়ে বলল, এটা মুখে দিয়ে দিয়ে খাবেন, রুচি হবে।

খেতে খেতে ধৃতি বলল, একটা মুশকিল হয়েছে পরমা।

কী মুশকিল?

—টুপুর মা নেমন্তন্ন করেছে কাল।

—কে টুপুর মা?

—ওই যে সেদিন সুন্দর মেয়েটার ফটো দেখলে, মনে নেই?

—ওঃ, তা সে তো মরে গেছে।

—বটেই তো, কিন্তু তার মা তো মরেনি!

—নেমন্তন্নটা কীসের?

—বোধহয় একটু আলাপ করতে চান।

—আলাপও নেই?

—নাঃ, শুধু ফোনে কথা হতো।

—কী বলতে চায় মহিলা?

—তা কী করে বলব? হয়তো টুপুর কথা।

—বেচারা।

—যাবো কিনা ভাবছি।

—যাবেন না কেন?

—একটু ভয়-ভয় করছে। অচেনা বাড়ি, অচেনা ফ্যামিলি...

—তাতে কী, আলাপ হলেই অচেনা কেটে গিয়ে চেনা হয়ে যাবে। আপনি অত ভীতু কেন?

—আমি খুব ভীতু বুঝি?

—ভীতু নন? আমার সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতে হচ্ছে বলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন।

ধৃতি চোখ দুটো একটু বুজে রেখে খুব নিরীহভাবে জিগ্যেস করল, তোমার কোচটি কে বলো তো!

—কোচ! কীসের কোচ?

—তোমাকে এইসব আধুনিক কথাবার্তার ট্রেনিং দিচ্ছে কে?

—কেন, আমার বুঝি কথা আসে না?

—খুব আসে, হাড়ে হাড়ে আসে, কিন্তু ভাই বন্ধুপত্নী, তুমি তো এত প্রগতিশীলা ছিলে না এতদিন।

—হচ্ছি। আপনার পাল্লায় পড়ে। সে যাকগে, সব সময়ে অত ইয়ার্কি ভালো নয়। ভদ্রমহিলা ডাকল কেন সেটা ভেবে দ্যাখা ভালো।

—আমি বলি কি পরমা, মেয়েছেলের কেস যখন তুমিও সঙ্গে চল।

—আমি! ওমা, আমাকে তো নেমন্তন্ন করেনি!

—গুলি মারো নেমন্তন্ন।

—তাহলে কী বলে গিয়ে দাঁড়াবো? একটা কিছু পরিচয় তো চাই।

—বউ বলেই চালিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি যে ব্যাচেলর তা ভদ্রমহিলা জানেন।

—ইস, ওঁর বউ সাজতে বয়ে গেছে।

—একটা কাজ করা যাক পরমা, গিয়ে দুজনে আগে হাজির হই। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

পরমা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, ইচ্ছে করছে না এমন নয়। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এত উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। গিয়ে দেখেই আসুন না।

—ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, তাই হবে। বোধহয় তুমি ঠিকই বলছো।

পরমা কিছুক্ষণ ধৃতির দিকে চেয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, রাত হয়েছে। রোগা শরীরে আর জেগে থাকতে হবে না। শুয়ে পড়ুন গে।

শুয়ে শুয়ে ভাবুন।

ধৃতি উঠল।

৮

এত নিরস্ত্র এবং এত অসহায় ধৃতি এর আগে কদাচিৎ বোধ করেছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনও অকারণ দুর্বলতা বা ভয়-ভীতি নেই। কিন্তু এই এলাহাবাদী ভদ্রমহিলা

সম্পর্কে একটা রহস্যময়তার বোধ জমেছে ধৃতির। মহিলার কথাবার্তায় উলটোপালটা ব্যাপার আছে, মানসিক ভারসাম্যও হয়তো নেই। একটু যেন বেশি গায়ে-পড়া। তাছাড়া এলাহাবাদের ট্রাংক কল, চিঠিতে পোস্ট অফিসের ছাপ এবং টুপুর ছবি এর সবকটাই সন্দেহজনক। কাজেই ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হতে আজ ধৃতির খুব কিন্তু-কিন্তু লাগছিল।

সকালে ধৃতি চা খেল তিন কাপ।

পরমা বলল, চায়ের কেজি কত তা মশাইয়ের জানা আছে?

—কেন, চা-টা তো সেদিন আমিই কিনে আনলাম। লপচুর হাফ কেজি।

—ও, আপনার পয়সায় কেনাটা বুঝি কেনা নয়?

—মাইরি, তুমি জ্বালাতেও পারো।

—আর শুধু চা কিনলেই তো হবে না। দুধ চিনি এসবও লাগে।

—পরের বার চিনি দুধ ছাড়াই দিও।

—আর দিচ্ছিই না। চিনি দুধ লিকার কোনওটাই পাচ্ছেন না আপনি।

—আজ নার্ভ শক্ত রাখতে হবে পরমা। আজ এক রহস্যময়ীর সঙ্গে রহস্যময় সাক্ষাৎকার।

—আহা, রহস্যের রস তো খুব। মাঝবয়সি আধপাগল এক মহিলা, তার আবার রহস্য কীসের? খুব যে রহস্যের স্বপ্ন দ্যাখা হচ্ছে।

—স্বপ্ন নয় হে, স্বপ্ন হলে তো বাঁচতাম। কী কুক্ষণেই যে নেমন্তন্নটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম।

—আবার ফোন করুন না, নেমন্তন্ন ক্যানসেল করে দিন। ভীতুর ডিমদের এইসব কাজ করতে যাওয়াই ঠিক নয়। এখন দয়া করে আসুন, রোগা শরীরে খালিপেটে চা না গিলে একটু খাবার খেয়ে উদ্ধার করুন।

—তোমার ব্রেকফাস্টের মেনু কী?

—লুচি আর আলু ভাজা।

—কুকিং মিডিয়াম কি বনস্পতি নাকি?

—কেন, গাওয়া ঘি চাই নাকি? গরিবের বাড়ি এটা, মনে থাকে না কেন?

এখনও ফ্ল্যাটের দাম শোধ হয়নি।

ধৃতি ওঠার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ছেলেবেলায় কখনও ওই অখাদ্যটা কারও বাড়িতে তেমন ঢুকতে দেখিনি। বনস্পতি হল পোস্ট পার্টিশন বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সিনেম। কে ওটা আবিষ্কার করেছে জানো?

—না। গরিবের কোনও বন্ধু হবে।

—তার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

—আর বনস্পতির নিন্দে করতে হবে না। আমাদের পেটে সব সয়।

—ছাই সয়। সাক্ষাৎ বিষ।

—আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। রুগি মানুষকে বনস্পতি খাওয়াবো আমি তেমন আহাম্মক নই। ময়দায় ঘিয়ের ময়েন দিয়ে বাদাম তেলে ভাজা হচ্ছে। ভয় নেই, আসুন।

ধৃতি সরস মুখে বলে, এর চেয়ে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট ভালো ছিল পরমা। টোস্ট, ডিম, কফি।

—কাল থেকে তাই হবে। খাটুনিও কম।

ধৃতি উঠল, খেল। তারপর দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে স্নান করে প্রস্তুত হতে লাগল।

পরমা হঠাৎ উড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, কী ড্রেস পরে যাচ্ছেন দেখি! এ মা! ওই সাদা শার্ট আর ভুসকো প্যান্ট! আপনার রুচি-টুচি সব যাচ্ছে কোথায় বলুন তো!

—কেন, এই তো বেশ।

—তাহলে কী পরবো?

—সেই নেভি ব্লু প্ল্যান্টটা কোথায়?

—আছে।

—আর মাল্টি কালার স্ট্রাইপ শার্ট?

—আছে বোধহয়।

—ওই দুটো পরে যান।

অগত্যা ধৃতি তাই পরল। পরমা দেখে-টেখে বলল, মন্দ দেখাচ্ছে না। রুগ্ন ভাবটা আর চোখে পড়বে না বোধহয়।

ধৃতির পোশাকের দিকে মন ছিল না। মনে উদ্বেগ, অস্বস্তি। রওনা হওয়ার সময় পরমা দরজার কাছে এসে বলল, অফিসে গিয়ে একবার ফোন করবেন। লালিদের ফ্ল্যাটে আমি ফোনের জন্য অপেক্ষা করব।

—কেন পরমা, ফোন করব কেন?

—একটু অ্যাঙ্গজাইটি হচ্ছে।

—এই যে এতক্ষণ আমাকে সাহস দিচ্ছিলে!

—ভয়ের কিছু নেই জানি, কিন্তু আপনার ভয় দেখে ভয় হচ্ছে। করবেন তো ফোন? তিনটে পনেরো মিনিটে।

—আচ্ছা। তাহলে আমার জন্য তুমি ভাবো?

—যা নাবালক। ভাবতে হয়।

ধৃতি একটু হালকা মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

টুপুর মায়ের ঠিকানা খুব জটিল নয়। বড়লোকদের পাড়ায় বাস। সুতরাং খুঁজতে অসুবিধে হল না।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ধৃতি কিছুক্ষণ হাঁ করে বাড়িটা দেখল। বিশাল এবং পুরোনো বাড়ি। জরার চিহ্ন থাকলেও জীর্ণ নয় মোটেই। সামনেই বিশাল ফটক। ফটকের ওপাশ থেকেই অন্তত দশগজ চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে উঁচু প্রকাণ্ড বারান্দায়। বারান্দায় মস্ত গোলাকার থামের বাহার। তিনতলা বাড়ি, কিন্তু এখনকার পাঁচতলাকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে বসে আছে।

ফটকে প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা এক দারোয়ান মোতায়েন দেখে ধৃতি আরও ঘাবড়ে গেল।

দারোয়ান ধৃতিকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখেছে। উপরন্তু ওর পোশাক-আশাক এবং চেহারাটা বোধহয় দারোয়ানের খুব খারাপ লাগল না। ধৃতি সামনে যেতেই টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম গোছের ভঙ্গি করে ভাঙা বাংলায় জিগ্যেস করল, কাকে চাইছেন?

—টুপুর মা। মানে—

দারোয়ান গেটটা হড়াস করে খুলে দিয়ে বলল, যান।

ধৃতি অবাক হল। যাবে, কিন্তু কোথায় যাব? বাড়িটা দেখে তো মনে হচ্ছে সাতমহলা। এর কোন মহল্লায় কে থাকে তা কে জানে?

ধৃতি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তার কেমন যেন এই দুপুরেও গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে আড়াল থেকে খুব তীক্ষ্ণ নজরে কেউ তাকে লক্ষ করছে।

বারান্দায় পা দিয়ে ধৃতি দেখল, একখানা হলঘরের মতো প্রকাণ্ড জায়গা। সবটাই মার্বেলের মেঝে। বারান্দার তিন দিকেই প্রকাণ্ড তিনটে কাঠের ভারী পাল্লার দরজা। দু'পাশের দরজা বন্ধ, শুধু সামনেরটা খোলা।

ধৃতি পায়ে পায়ে এগোলো।

দরজার মুখে দ্বিধান্বিত ধৃতি দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম পুরোনো জমিদারি কায়দার বাড়ি ধৃতি দূর থেকে দেখেছে অনেক, তবে কখনও ভিতরে ঢোকার সুযোগ হয়নি। এইসব বাড়িতেই কি একদা ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে বাইজি নাচত আর উঠত ঝনাঝন মোহরের প্যালা ফেলার শব্দ? এইসব বাড়িরই অন্দর মহলে কি গভীর রাত অবধি স্বামীর প্রতীক্ষায় জেগে থেকে অবিরল অশ্রুমোচন করত অন্তঃপুরিকারা? চাষির গ্রাস কেড়ে নিয়েই কি একদা গড়ে ওঠেনি এই সব ইমারত? এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি ঢুকে আছে পাপ আর অভিশাপ?

বাইরের ঘরটা বিশাল। এতই বিশাল যে তাতে একটা বাস্কেটবলের কোর্ট বসানো যায়। সিলিং প্রায় দোতলার সমান উঁচুতে। কিন্তু আসবাব তেমন কিছু নেই। কয়েকটা পুরোনো প্রকাণ্ড কাঠের আলমারি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো। ঘরের মাঝখানে একটা নীচু তক্তপোষে সাদা চাদর পাতা, কয়েকটা কাঠের চেয়ার, মেঝেয় ফাটল, দাগ। দেওয়ালে অনেক জায়গায় মেরামতের তাপ্পি। তবু বোঝা যায়, এ বাড়ির সুদিন অতীত হলেও একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়নি।

ধৃতি কড়া নাড়ল না বা কাউকে ডাকার চেষ্টা করল না। কারণ ধারেকাছে কেউ নেই। ঘরটা ফাঁকা। ছাদের কাছ বরাবর কড়ি বরগায় পায়রারা বকবক করছে। কিন্তু ধৃতির মনে

হচ্ছিল, ঘর ফাঁকা হলেও কেউ কোনও এক রন্ধ্র-পথে বা ঘুলঘুলি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাকে ঠিকই লক্ষ করছে। এমন মনে করার কারণ নেই, অনুভূতি বলে একটা জিনিস তো আছেই।

ধৃতী সাহসী নয়, আবার খুব ভীতুও নয়। মাঝামাঝি। তার বুক একটু দুরুদুরু করছিল ঠিকই, তবে সেটা অনিশ্চিত এবং অপরিচিত পরিবেশ বলে। কয়েক বছর আগে এক বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করতে গিয়ে সে একটা ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। সেই বাড়ির এক সন্দিগ্ধ ও খিটকেলে বুড়ো তাকে বাইরের ঘরে ঘণ্টা খানেক বসিয়ে রেখে বিস্তর জেরা করে এবং নানাবিধ প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়। ধৃতি সেই থেকে অচেনা বাড়িতে ঢুকতে একটু অস্বস্তি বোধ করে আসছে।

প্রায় মিনিট খানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। যাতায়াতকারী কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায়। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। কিন্তু ধৃতি একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ক্ষীণ হলেও নির্ভুল শব্দ। কাছেপিঠে কোথাও, হলঘরের আশেপাশের কোনও ঘরে কারা যেন টেবিল টেনিস খেলছে।

বুকপকেটের আইডেনটিটি কার্ডখানা বের করে একবার দেখে নেয় ধৃতি। সে এক মস্ত খবরের কাগজের সাব-এডিটর। এই পরিচয়-পত্রখানা যে কোনও প্রতিকূল পরিবেশে কাজে লাগে। রেল-এর রিজার্ভেশনে, থানায়, বাইরের রিপোর্টিং-এ। এ বাড়িতে কেউ তার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তুললে কাজে লাগাতে পারে।

ধৃতি ভিতরে ঢুকল এবং শব্দটির অনুসরণ করে বাঁ দিকে এগোলো। হলঘরের পাশের ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লম্বাটে। সবুজ বোর্ডের দুপাশে একটি কিশোর ও একটি কিশোরী অখণ্ড মনোযোগে টেবিল-টেনিস খেলছে। মেয়েটির পরনে লাল শার্ট এবং জীনসের শর্টস। ছেলেটির পরনেও জীনসের শর্টস, গায়ে হলুদ টি-শার্ট। দুজনেরই নীল কেডস। মেয়েটির চুল স্টেপিং করে কাটা। ছেলেটির চুল লম্বা। দুজনের বয়সই পনেরো ষোলোর মধ্যে।

ধৃতি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে প্রথম লক্ষ করল মেয়েটিই। একটা মারের পর বল কুড়িয়ে সোজা হয়েই থমকে গেল। তারপর রিনরিনে মিষ্টি গলায় বলল, হুম ডু-ইয়া ওয়ান্ট?

কলকাতার ইংলিশ মিডিয়ামে শেখা হেঁচকি তোলা ইংরিজি নয়। রীতিমতো মার্কিন অ্যাকসেন্ট।

ধৃতি মৃদু একটু হেসে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলায় বলল, টুপুর মা আছেন? মেয়েটা ছেলেটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঠোঁট উলটে বলল, আছে বোধহয়। দোতলায়। পিছন থেকে সিঁড়ি আছে। গিয়ে দেখুন।

ধৃতি তবু দ্বিধার সঙ্গে বলল, ভিতরে কি খবর না দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে? মেয়েটি সার্ভ করার জন্য হাতের স্থির তোলায় বলটা রেখে বাঘিনীর মতো খাপ পেতে শরীরটাকে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছেড়ে দেওয়ার জন্য তৈরি ছিল। সেই অবস্থাতেই ধৃতির দিকে একঝলক দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, উড শি মাইন্ড? নো প্রবলেম। শি ইজ আ বিট গা-গা। গো অ্যাহেড। আপস্টেয়ার্স, ফাস্ট রাইট হ্যান্ড রুম। নোবডি উইল মাইন্ড। নান মাইন্ডস হিয়ার। নান হ্যাজ এনিথিং লাইক মাইন্ড।

ধৃতি একসঙ্গে মেয়েটির মুখে এত কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। এত কথার মানেই হয় না। তার মনে হল, এরা দুটি ভাইবোন কোনও সমৃদ্ধ দেশে—হয়তো অ্যামেরিকায়—থাকে। এদেশে এসেছে ছুটি কাটাতে এবং সময়টা খুব ভালো কাটাচ্ছে না। নিজেদের বাড়ি কি এটা ওদের? হলে বলতে হবে, নিজেদের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে ওরা মোটেই খুশি নয়। সেই বিরক্তিটাই তার কাছে প্রকাশ করল।

বেশ খোলা হাতে টপ স্পিন সার্ভ করল মেয়েটি। ছেলেটি পেন হোল্ড গ্রিপ-এ খেলছে। পিছনে দু'পা সরে গিয়ে সপাটে স্ম্যাশ করল। মেয়েটি টেবিল থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়ে স্ম্যাশটা তুলে দিল টেবিলে...ধৃতির হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল এদের এলেম দেখে। তবে সে র্যালিটা দাঁড়িয়ে দেখল। মেয়েটাই তুখোড়। বারবার ছেলেটার ব্যাক হ্যান্ডে ফেলছে বল। পেন হোল্ড গ্রিপ-এ ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না বলে ছেলেটিকে হাত ঘুরিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হচ্ছিল। মেয়েটা পয়েন্ট নিয়ে নিল।

ধৃতি এটুকু দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পিছনে সিঁড়ি আছে। কিন্তু কোনদিক দিয়ে যেতে হবে তা মেয়েটা বলে দেয়নি। ধৃতি হলঘরটা পার হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঁকি মারতেই পুরোনো চওড়া পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি দেখতে পায়। বাড়িটা খুবই নির্জন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

একটু সাহস সঞ্চয় করতেই হবে। নইলে এতটা এসে ফিরে গেলে সে নিজের কাছেই নিজে কাপুরুষ থেকে যাবে চিরকাল।

সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল ধৃতি। এবং ওপরে উঠে মুখোমুখি হঠাৎ একজন দাসী গোছের মহিলাকে দেখতে পেল সে। হাতে একটা জলের বালতি।

ধৃতি খুব নরম গলায় বলল, টুপুর মা আছেন?

ঝি খুব যেন অবাক হয়েছে এমন মুখ করে বলল, কার মা?

টুপুর মা। আমাকে আসতে বলেছিলেন।

ঝিটার অবাক ভাব গেল না। বলল, আসতে বলেছিলেন? ওমা! সে কী গো?

এই উক্তির পর কী বলা যায় তা ধৃতির মাথায় এল না। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

ঝিটা একটু হেসে বলল, আসতে বলবে কী? সে তো পাগল।

গা-গা বলতে নীচের মেয়েটা তাহলে বাড়াবাড়ি করেনি। কিন্তু পাগল কেন হবে টুপুর মা? একটু ছিটগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু খুব পাগল কি?

—কোন ঘরটা বলুন তো? ধৃতি জিগ্যেস করে।

—ওই তো দরজা। ঠেলে ঢুকে যান।

ধৃতির হাত পা ঠান্ডা আর অবশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, গোটা ব্যাপারটাই একটা সাজানো ফাঁদ নয় তো? কিন্তু সামান্য একটু রোখও আছে ধৃতির। যে-কোনও ঘটনারই শেষ দেখতে ভালোবাসে।

দ্বিধা ঝেড়ে সে ডান দিকের দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড ঘর। খুব উঁচু সিলিং। মেঝে থেকে জানালা। ঘরের মধ্যে এক বিশাল পালঙ্ক, কয়েকটা পুরোনো আমলের আসবাব, অর্গান, ডেক্স, চেয়ার, বুকশেলফ, আলনা, থ্রি পিস আয়নার ড্রেসিং টেবিল, আরও কত কী।

খাটের বিছানায় এক প্রৌঢ়া রোগা-ভোগা চেহারার মহিলা শুয়ে আছেন। চোখ বোজা। গলা পর্যন্ত টানা লেপ। বালিশে কাঁচা পাকা চুলের ঢল। একসময়ে সুন্দরী ছিলেন, এখনও বোঝা যায়।

ধৃতি শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করল যাতে উনি চোখ মেলেন।

মেললেন, এবং ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, কে?

—আমি ধৃতি। ধৃতি রায়।

—ধৃতি রায়! কে বলো তো তুমি।

—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

—না তো! হ্যারিকেনটা উসকে দাও তো, তোমাকে দেখি।

—এখন তো দিনের আলো।

—কোথায় আলো? আলো আবার কবে ছিল? তোমার সাঁইথিয়ায় বাড়ি ছিল না?

—না।

টুপুর মা উঠে বসেছেন। চোখে খর অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

—কার খোঁজে এসেছেন?

—আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন ফোনে। মনে নেই?

—ও তাই বলো। তা বোসো বোসো। আমি খুব ফোনের শব্দ পাই, বুঝলে! কেন পাই বলো তো! এত ফোন কে কাকে করে জানো?

—না।

টুপুর মার পরনে থান, গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে প্রাচীন সব আঁকিবুকি। টুপুর মার যে গলা ধৃতি টেলিফোনে শুনেছে এঁর গলা মোটেই তেমন নয়।

—তুমি কে বললে?

—ধৃতি রায়। আমি খবরের কাগজে লিখি।

—খবরের কাগজ! এখন পুরোনো খবরের কাগজ কত করে কিলো যাচ্ছে বলো তো! আমাকে সেদিন একটা কাগজওয়ালা খুব ঠকিয়ে গেছে।

—জানি না।

—তোমার দাঁড়ি পাল্লা কোথায়? বস্তা কোথায়?

—আমি কাগজওয়ালা নই।

—শিশিবোতল নেবে? অনেক আছে।

ধৃতি ফাঁপড়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। সন্দেহের লেশ নেই, সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভুলে পা দিয়েছে। তবু মরীয়া হয়ে সে বলল, আপনি আমাকে ফোন করে টুপুর খবর দিয়েছিলেন, মনে নেই? এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ক কল!

টুপুর মা অন্য দিকে চেয়ে বললেন, সে কথাই তো বলছি তোমাকে বাগদি-বউ, অত ঘ্যানাতে নেই। পুরুষমানুষ কি ঘ্যানানি ভালোবাসে?

ধৃতি একটু একটু ঘামছে।

আচমকাই সে আয়নায় দেখল, দরজাটা সাবধানে ফাঁক করে ঝিটা উঁকি দিল!

—শুনছেন?

ধৃতি ফিরে চেয়ে বলল, কী?

—উনি কি আপনার কেউ হন?

—না। চেনাও নয়। ফোন পেয়ে এসেছি।

—আপনি একটু বাইরে আসুন। মেজো গিন্নিমা ডাকছেন।

ধৃতি হাঁফ ছেড়ে উঠে পড়ল। টুপুর মা তাকে আর আমল না দিয়ে ফের গায়ে লেপ টেনে শুয়ে পড়ল।

সাবধানে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঝি বলল, ওই ঘর, চলে যান।

—মেজো গিন্নিমা কে?

—উনিই কর্ত্রী। যান না।

ধৃতি এগোল। এ ঘরের দরজা খোলা এবং সে ঘরে ঢোকার আগেই পরদা সরিয়ে একজন অত্যন্ত ফরসা ও মোটাসোটা মহিলা বেরিয়ে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আসুন ভাই, ভিতরে আসুন।

ঘরটা বেশ আধুনিক কায়দায় সাজানো। যদিও প্রকাণ্ড, সোফা সেট আছে, দেওয়ালে যামিনী রায় আছে।

তাকে বসিয়ে ভদ্রমহিলা মুখোমুখি একটা মোড়া টেনে বসে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো! টুপুর মা নাকি আপনাকে ডেকে এনেছে। কী কাণ্ড।

ধৃতি থমথমে মুখ করে বলল, কোথাও একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে আপনি শুনতে চাইলে ব্যাপারটা ডিটেলসে বলতে পারি।

—বলুন না। আগে একটু চা খেয়ে নিন, কেমন?

ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। একটু বাদে চা এল, একটু সন্দেশের জলখাবারও। ধৃতি শুধু চা নিল, তারপর মিনিট পনেরো ধরে আদ্যোপান্ত বলে গেল ঘটনাটা।

ভদ্রমহিলা স্থিরভাবে বসে শুনলেন। কোনও উঃ, আঃ, আহা, তাই নাকি, ওমা এসব বললেন না। সব শোনার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার আশ্চর্য লাগছে কী জানেন?

—কী বলুন তো?

—টুপুর ঘটনাটা মোটেই মিথ্যে নয়। এরকমই ঘটেছিল। তবে তা ঘটেছিল বছর সাতেক আগে। সেই থেকে টুপুর মা কেমন যেন হয়ে গেলেন। এখন আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছি। যতদিন বাঁচবেন ওরকমই থাকবেন। তবে গল্পটার শেষটাই রহস্য। আপনাকে যে ফোন করত সে আর যেই হোক টুপুর মা নয়।

—তাহলে কে?

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, উনি ঘর থেকেই বেরোন না। ফোন করতে জানেনও না বোধহয়। তবে যেই করুক সে আমাদের অনেক খবর রাখে।

—টুপু কি সত্যিই মারা গেছে?

মাথা নেড়ে ভদ্রমহিলা বললেন, বলা অসম্ভব। পুলিশও কোনও হদিশ পায়নি। কোথায় যে গেল মেয়েটা!

—কিছু মাইন্ড করবেন না, উনি মানে টুপুর মা আপনার কে হন?

—আমার বড় জা। ওঁরা তিন ভাই। বড় জন নেই, ছোট অর্থাৎ আমার দেওর আমেরিকায় থাকে। ওখানকারই সিটিজেন। ছুটি কাটাতে এসেছে। দু'ভাই মিলে আজ মাছ ধরতে গেছে ব্যান্ডেলে।

—নীচের তলায় যে দুটি ছেলেমেয়েকে টেবিল টেনিস খেলতে দেখলাম ওরা কারা? আপনার দেওরের ছেলেমেয়ে?

—হ্যাঁ। বলে মেজোগিন্নি একটু তেড়চা হেসে বললেন, একেবারে সাহেব-মেম। এদেশের কিছুই পছন্দ নয়। কেবল নাক সিঁটকে থাকে সবসময়ে।

—আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায়?

—মেয়ে শান্তিনিকেতনে। ছেলে দুটি। দুজনেই ব্যাঙ্গালোরে ডাক্তারি পড়ে।

—ব্যাঙ্গালোরে কেন?

—আমরা ওখানেই থাকতাম। আমার হাজব্যান্ডের তখন ওখানে একটা পার্টনারশিপের ব্যবসা ছিল। উনি একটু খেয়ালি। হঠাৎ 'ভালো লাগছে না' বলে নিজের শেয়ার বেচে চলে

এলেন। ছেলেরা হোস্টেলে থাকে।

—আর কেউ নেই এ বাড়িতে?

মেজোগিন্নি খুব অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, টুপুর মা সেজে ফোন করার মতো কেউ তো এ বাড়িতে আছে বলে মনে হয় না!

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, না, ঠিক তা বলিনি। আমি ব্যাপারটায় নিজেকে জড়াতেও চাইছিলাম না। বুঝতে পারছি না ঘটনার মানে কী?

—হয়তো কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করার চেষ্টা করেছিল। হয়তো আপনার পরিচিতা কেউ। তবে আশ্চর্যের কথা হল, টুপু সম্পর্কে সে কিছু জানে। যাকগে, আপনি তো নিজের চোখেই দেখে গেলেন, এখন ঘটনাটা ভুলে যেতে চেষ্টা করুন।

মেজোগিন্নিকে ধৃতি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। গোলগাল ফরসা, জমিদারগিন্নি ধরনের চেহারা। বয়স খুববেশি হলে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। চোখে মুখে বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি খুব হতাশা বোধ করে উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ গলায় বলল, আচ্ছা, আজ চলি।

—আসুন ভাই। আপনার খবরের কাগজের লেখা আমিও কিন্তু পড়েছি। আপনি তো ফেমাস লোক।

ধৃতি ক্লিষ্ট একটু হাসল।

—ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তার রিপোর্টটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আবার কখনও ইচ্ছে হলে আসবেন।

—আচ্ছা।

ধৃতি একা ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ক্লান্ত লাগছে, হতাশ লাগছে।

সে একটা প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল। সেটা যে কী তা স্পষ্ট নয়। তার বদলে যা দেখল তা বিকট।

ধৃতি যখন মাঝ-সিঁড়িতে তখন তলা থেকে দুদ্দাড় করে সেই কিশোরী মেয়েটি উঠে আসছিল, পথ দিতে একটু সরে দাঁড়াল ধৃতি। মেয়েটা উঠতে উঠতে তাকে দেখে থমকে গেল। মুখে জবজব করছে ঘাম। একটু লালচে মুখ।

—ডিড ইয়া সিট হার?

—হ্যাঁ।

মেয়েটা হঠাৎ একটু হাসল। সুন্দর মুখশ্রী যেন আরও ফুটফুটে হয়ে উঠল।

—পাগলি নয়?

ধৃতিও একটু হাসল। বলল, তাই তো মনে হল।

—আপনি কি কোনও রিলেটিভ?

—না! পরিচিত।

—টেক হার সমহোয়ার। নার্সিং হোম বা মেন্টাল হোম কোথাও নিয়ে গেলেই তো হয়। জেঠু কিছুতেই বুঝতে চায় না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, তাই দেওয়া উচিত। আচ্ছা, এ বাড়ির ফোনটা কোন ঘরে?

—জেঠুর ঘরে। ফোন করবেন? আসুন না আমার সঙ্গে।

—না। তার দরকার নেই। ভাবছিলাম ফোন করলে টুপুর মাকে পাওয়া যাবে কিনা। আচ্ছা নম্বরটা কত?

মেয়েটা নম্বর বলল। ধৃতি মনে মনে দু-একবার আউড়ে মুখস্থ করে নিল। মেয়েটা বলল, বাই। তারপর উঠে গেল দ্রুত পায়ে।

—বাই। বলে ধৃতি নেমে এল নীচে। মনটা বিস্বাদে ভরে গেছে। হতাশা এবং গ্লানি বোধ করছে সে। কেন যে কে জানে! এতটা আশাহত হওয়ার মতো কিছু নয়। ঘটনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেই হয়। পারছে না। তার মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল জোক নয়, ভিতরে আর একটা কিছু আছে। সেটা সে ধরতে পারল না।

মোটামুটিভাবে ব্যর্থ হয়েই ধৃতি যখন বেরোতে যাচ্ছিল তখন দেখল, হলঘরে সেই ঝিটা মেঝে মুছছে উবু হয়ে বসে। তাকে দেখে কৌতূহলভরে একটু চেয়ে রইল।

ধৃতি তাকে উপেক্ষা করে যখন পেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সে হঠাৎ চাপা গলায় বলল, একজন যে বসে আছে আপনার জন্য।

ধৃতি চমকে উঠে বলল, কে?

ঝি ফিক করে হেসে বলল, বাঃ বুড়োকর্তা আছে না?

—সে আবার কে?

—সে-ই তো সব। দেখা করবেন না?

—বুড়ো মানুষ খিটখিটে নন তো?

—না গো, তবে খুব বকবক করেন। নতুন মানুষ পেলে তো কথাই নেই। ওইদিকে ঘর। চলে যান।

হলঘরের ডানপ্রান্তে একটা ভেজানো কপাট দেখা যাচ্ছিল। মরীয়া ধৃতি পায়ে পায়ে গিয়ে দরজায় শব্দ করল।

—এসো, চলে এসো। এভরিবডি অলওয়েজ ওয়েলকম।

ধৃতি দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। লম্বাটে এবং বেশ বড়সড় ঘরখানা। দক্ষিণের জানালা দরজা খোলা বলে ধপধপ করছে আলো। একখানা মজবুত ও ভারী চৌকির ওপর সাদা বিছানা পাতা। দরজার পাশেই একখানা ডেক চেয়ার। তাতে সাদা দাড়িওয়ালা এবং অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো চেহারার মানুষ বসে আছেন। পরনে ঢোলা পায়জামা, গায়ে একটা সুতির গেঞ্জির ওপর একটা উলের গেঞ্জি। শরীরের কাঠামোটা প্রকাণ্ড। বোঝা যায় একসময়ে খুব শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। এখনও শরীরে মেদের সঞ্চার নেই। বয়স আশি

বা তার ওপর। কিন্তু চোখে গোল রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমার ভিতরে দুটি চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ এবং কৌতুকে ভরা।

মুখোমুখি একটা খালি চেয়ার পাতা। সেটা দেখিয়ে বললেন, বোসো। এ বাড়িতে নতুন কেউ এলেই আমি তাকে ডেকে পাঠাই। কিছু মনে করোনি তো?

ধৃতি বসল এবং মাথা নেড়ে বলল, না।

—কার কাছে এসেছিলে?

ধৃতি হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আমি একটা ভুল খবর পেয়ে এসেছিলাম। যার কাছে এসেছিলাম আসলে তার সঙ্গে আমার কোনও দরকার নেই।

—একটু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন! কার কাছে এসেছিলে বলো তো?

—টুপুর মা। ওই নাম নিয়ে কে যেন আমাকে অফিসে প্রায়ই টেলিফোন করত। কালও টেলিফোনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই জন্যই আসা।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম হয়ে গেলেন। সামনের শূন্যে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। চোখ স্বপ্নাতুর ও ভাসা ভাসা হয়ে গেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমাকে কি সে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল?

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, সেইরকমই। তবে সেটা বড় কথা নয়।

বুড়োকর্তা তার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই দুপুরের খাওয়া খেয়ে আসোনি?

—আপনি খাওয়ার ব্যাপারটা বড় করে দেখছেন কেন? ওটা কোনও ব্যাপার নয়।

বুড়োকর্তা মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে একটু বুঝতে দাও। বুড়ো হলে মগজে ধোঁয়া জমে যায় বটে, তবু অভিজ্ঞতার একটা দাম অছে। তোমার নাম কী? কী করো?

ধৃতি বলল।

বুড়োকর্তা মাথা ওপর নীচে দুলিয়ে বললেন, জানি। তোমার লেখা আমি পড়েছি। খবরের কাগজটা আদ্যোপান্ত পড়া আমার রোজকার কাজ।

ধৃতি বিনয়ে একটু মাথা নোয়ালো। তারপর বলল, আপনি অযথা এই ঘটনাটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না। কেউ একটু আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চেয়েছিল।

—রসিকতা! বলে বুড়োকর্তা একটু অবাক হলেন যেন। তারপর মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, এমনও হতে পারে যে সে কোনও একটি সত্যের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। নইলে একটি মেয়ে তোমাকে বার বার ফোন করবে কেন?

—সেটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তাছাড়া সে সবটাই কিন্তু মিথ্যে বলেনি। আমার নাতনি টুপুর সত্যিই কোনও ট্রেস নেই। কয়েক বছর। আমরা ধরে নিয়েছি যে সে মারা গেছে। সম্ভবত খুন হয়েছে। এগুলো তো মিথ্যে নয়।

—সম্ভবত সে ঘটনাটা জানে।

—তা তো জানেই। কিন্তু কে হতে পারে সেটাই ভাবছি।

—হয়তো আপনাদের চেনা কেউ।

—তোমার কি আজ কোনও জরুরি কাজ আছে?

—কেন বলুন তো?

—যদি সঙ্কোচ বোধ না করো তবে আমার সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নাও। যেই তোমাকে নিমন্ত্রণ করুক সে এবাড়িকে জড়িয়েই তো করেছে। নিমন্ত্রণটা অন্তত সত্যিকারের হোক। আমার রান্না আলাদা হয়, আলাদা ব্রাহ্মণ পাচক রাঁধে, আমি ওদের সঙ্গে খাই না। এ ঘরেই সব ব্যবস্থা হবে।

—আমার একদম খিদে নেই।

—তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ এবং এবাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাইছো বলে খিদে টের পাচ্ছো না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমার মনে হয়, তোমাকে যে এতদূর টেনে এনেছে তার কোনও পজিটিভ উদ্দেশ্য আছে। হয়তো আমি তোমাকে কিছু সাহায্যও করতে পারব, যদি অবশ্য টুপুর রহস্য ভেদ করতে আগ্রহ বোধ কর।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমার আগ্রহ নেই। টুপুর কেসটা মনেহয় ক্লোজড চ্যাপটার। আর পুলিশই যখন কিছু পারেনি তখন আমার কিছু করার প্রশ্ন ওঠে না। আমি ডিটেকটিভ নই।

বুড়োকর্তা খুব সমঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, ঠিক কথা। অর্বাচীনের মতো দুম করে অন্য কারও ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা ভালো নয়। তবে এই বুড়ো মানুষটার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে দুপুরবেলা তোমার সঙ্গে বসে দুটি খেতে, তাহলে তোমার আপত্তি হবে কেন?

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, একটিমাত্র কারণে। যে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল সে একটা ফ্রড। আমি সেই নিমন্ত্রণ মানতে পারি না।

—ফ্রড! বুড়োকর্তা আবার অন্যমনস্ক হলেন। তারপর বললেন, হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ঘটনাটা আমাকে আর একটু ডিটেলসে বলতে পারো? যদি বিব্রত বোধ না করো?

ধৃতি আবার একটু দম নিল। তারপর সেই নাইট ডিউটির রাত থেকে শুরু করে সব ঘটনাই বলে গেল। বুড়োকর্তা চুপ করে শুনলেন। সবটা শুনে তারপর মুখ খুললেন।

—ফটোটা তোমার কাছে আছে?

—আছে।

—দেখাতে পারো?

—ধৃতির ব্যাগে ফটোটা প্রায় সবসময়েই থাকে। সে বের করে বুড়োকর্তার হাতে দিল। উনি একপলক তাকিয়েই বললেন, টুপুই। কোনও সন্দেহ নেই।

ফটোটা ফেরত নিয়ে ধৃতি বলে, এই ফটো কার হাতে যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বুড়োকর্তা হাত উলটে অসহায় ভাব করে বললেন, কে বলতে পারে তা? চিঠিটা দেখাতে পারো?

—পারি। বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দিল।

বুড়োকর্তা চিঠিটা দেখলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তারপর পড়লেন। ফের মাথা নেড়ে বললেন, হাতের লেখা কার কেমন তা আমি জানি না। সুতরাং এবাড়ির কেউ লিখে থাকলেও আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।

ধৃতি মৃদু হেসে বলল, চিনেই বা লাভ কী? ব্যাপারটা সিরিয়াসলি না ধরলেই হয়।

—তা বটে তবে তুমি যত সহজে উড়িয়ে দিতে পারছ আমার পক্ষে তা অত সহজ নয়। ঘটনাটা তো এই বংশেরই। টুপুর সমস্যার কোন সমাধানও তো হয়নি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই চিঠি আর ফটো আপনিই রেখে দিন বরং।

—লাভ কী? আমি বুড়ো, অক্ষম। আমার পক্ষে কি কিছু করা সম্ভব? বরং তোমার কাছেই থাক। তুমি হয়তো বা কোনওদিন কোনও সূত্র পেয়ে যেতে পারো।

—বলছেন যখন থাক। কিন্তু আমার মনে হয় এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই।

—এবার খেতে দিতে বলি?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, না। আমি খাবো না। প্লিজ, আমাকে আপনি জোর করবেন না।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম হয়ে রইলেন ফের। তারপর দাড়ি গোঁফের ফাঁকে চমৎকার একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে। শুধু একটা অনুরোধ, যদি কখনও ইচ্ছে হয় তো বুড়োর কাছে এসো। তোমাকে আমার বেশ লাগল।

৯

অফিসে এসে ধৃতি আজ বহুক্ষণ আনমনা রইল। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বেড়াল। তারপর ফের এসে বসে রইল টেলিফোনটার কাছে।

উমেশবাবু টেলিপ্রিন্টারের কপি কাটতে কাটতে তলচোখে একবার তাকে দেখে নিয়ে বললেন, আজ যেন একটু বিরহী-বিরহী দেখাচ্ছে। ব্যাপারখানা কী?

—বিরহই। বউ বাপের বাড়ি গেছে।

—হুঁ। বাপের বাড়ি থেকে টোপর পরে গিয়ে নিয়ে টেনে আনো গে না। বিয়ে করতে মুরোদ লাগে বুঝলে! এত টাকা মাইনে পাও তবু বিয়ে করার সাহস হয় না কেন? পণপ্রথার ওপর খুব তো গরম গরম ফিচার ছাড়ছো, নিজ একটা অবলা জীবকে উদ্ধার

করে দেখাও না। আমি যখন বিয়ে করি তখন চাকরি ছিল না, বাপের হোটেলে খেতাম। প্রথম চাকরি হল আঠাশ টাকা মাইনেয়, বুঝলে...

কথার মাঝখানেই ফোন বাজল।

উমেশবাবু 'হ্যালো' বলেই ফোনটা ধৃতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, বাপের বাড়ি থেকেই বোধহয় করছে ফোন।

ধৃতি একটু কেঁপে উঠল। বুকটা দুরুদুর করল। ফোনটা কানে চেপে ধরে বলল, হ্যালো।

ওপাশে সেই কণ্ঠস্বর। একটু কোমল। একটু বিষণ্ণতর।

—আপনি না খেয়েই চলে গেলেন!

—আপনার লজ্জা করে না?

—শুনুনই প্লিজ। রাগ করবেন না।

—রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

—জানি। আমার চেয়ে বেশি সেকথা আর কে জানে? তবু পায়ে পড়ি রাগ করবেন না।

—তাহলে আপনার পরিচয় দিন।

—সেটা এখনই সম্ভব নয়। তবে আমি টুপুর মা নই।

—তবে কি আপনি টুপু?

—উঃ, কী যে সব বলছেন না। আপনার টেবিলের লোক নিশ্চয়ই শুনছে আর হাঁ করে চেয়ে আছে!

উমেশবাবু ঠিক হাঁ করে চেয়ে ছিলেন না। তবে স্বভাবসিদ্ধ তলচোখের চাউনিটা ধৃতির দিকেই নিবদ্ধ রেখেছেন। ধৃতি গলা আরও নামিয়ে বলল, পরিচয় না দিলে আর কোনও কথা নেই।

—আপনি সবই জানতে পারবেন। শুধু একটু যদি সময় দেন।

ধৃতি দৃঢ় গলায় বলে, আর নয়। সময় এবং প্রশ্রয় আমি অনেক দিয়েছি আপনাকে। আজ রীতিমতো অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। আপনি এতটা কেন করলেন? আমি তো কোনও ক্ষতি করিনি আপনার!

—না। আপনার মতো ভদ্রলোক হয় না। আমি কাণ্ডটা করেছি শুধু টুপুর মায়ের অবস্থাটা আপনি নিজের চোখে দেখবেন বলে।

—তাতে কী লাভ? আমি তো কিছু করতে পারব না।

—আপনি কি জানেন যে টুপুর মায়ের অনেক সম্পত্তি?

—না। আপনার মুখে শুনেছি মাত্র।

—বিশ্বাস করুন, সম্পত্তি জিনিসটা খুব খারাপ। টুপু ছিল সেই সম্পত্তির ওয়ারিশান।

—তা হবে। শুনে আমার লাভ কী?

—আপনার লাভ না হলেই কি কিছু নয়? ধৈর্য ধরে একটু শুনবেন তো!

—শুনছি।

—টুপুর মৃত্যুসংবাদ আমি রটাতে চেয়েছিলাম টুপুর জন্যেই। আমার বিশ্বাস টুপু বেঁচে আছে। কিন্তু ওর আত্মীয়রা ওকে বেঁচে থাকতে দিতে চায় না। মৃত্যুসংবাদ রটে গেলে ও নিরাপদ। কেউ আর ওকে মারতে চাইবে না।

—কেন? টুপুর মৃত্যুতে তাদের কী লাভ?

—টুপু বেঁচে থাকলে ওদের চলবে কী করে? অত বড় বাড়ি দেখলেন, কিন্তু ফোঁপড়া। কিছু নেই ওদের। পুরো সংসার চলছে টুপুদের টাকায়।

—এত কথা আমাকে বলছেন কেন?

—তা জানি না। বোধহয় কাউকে জানানো দরকার বলে জানাচ্ছি।

—তাহলে আইনের আশ্রয় নিন, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করুন। পুলিশেও যেতে পারেন।

—আমি কে যে সেসব করতে যাব?

—তবে আমিই বা কে?

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল, তা অবিশ্যি সত্যি। আপনাকে আজ হয়রান করা আমার হয়তো উচিত হয়নি, আপনি রেগে আছেন।

—তা আছি।

—আপনার অফিসে টেলিফোনের ডাইরেক্ট লাইন নেই? থাকলে দিন না। পি বি একস লাইনে তো কোনও কথাই গোপন থাকে না।

—আর কী বলার আছে আপনার?

—প্লিজ, দিন। আর টেলিফোনের কাছে থাকুন দয়া করে। আমি এক্ষুনি রিং করব।

ধৃতি রিপোর্টিং-এর একটা নম্বর দিল এবং ফোনটা রেখে রাগে ভিতরে ভিতরে গজরাতে গজরাতে টেলিফোনটার কাছে গিয়ে বসল। এখন রিপোর্টিং ফাঁকা। প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে।

ফোনটা বাজতেই লাইন ধরল ধৃতি, হ্যাঁ বলুন।

—আপনিই তো?

—তবে আর কে হবে?

একটু হাসি শোনা গেল, না মানে ভীষণ ভয় করে। কী করছি কে জানে!

—মজা করছেন। আর কী?

—মোটেই না। রেগে আছেন বলে আপনি আমার সমস্যা বুঝতে চাইছেন না।

—আপনি কে আগে বলুন। তারপর অন্য কথা।

—বলব। একটু ধৈর্য ধরুন। আগে আর দু-একটা কথা বলার আছে।

—বলে ফেলুন, কিন্তু প্লিজ আর গল্প ফেঁদে বসবেন না।

—টুপু একটু অন্যরকম ছিল। খুব ভালো মেয়ে নয়। অনেক অ্যাফেয়ার ছিল তার।

বিরক্ত হয়ে ধৃতি বলে, এরকম কথা আগেও শুনেছি।

—আর একটু শুনুন। প্লিজ।

—সংক্ষেপে বলুন।

—টুপু অবশেষে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ছেলেটা বাজে। কিন্তু টুপুও ভালো নয়। ছেলেটার রোজগারপাতি কিছু ছিল না। তবে খুব হ্যান্ডসাম ছিল, আর সেইটেই একমাত্র তার প্লাস পয়েন্ট। রূপনারায়ণপুরে তারা কিছুদিন ঘরভাড়া করে ছিল। তারপর ছেলেটা পালায়। টুপুর তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। চেহারা সুন্দর বলে আবার একজন জুটে যায়। এ বড় মকন্ট্রাক্টর। বিবাহিত। ক্রমে টুপু গাঁজা, মদ, ড্রাগ-এর নেশা করতে থাকে। একসময়ে তার জীবনে একটা গভীর জটিল অন্ধকার নেমে আসে। সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল একবার। পারেনি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে এখনও বেঁচে আছে জানলেন কী করে?

—জানি না। অনুমান করি।

—অনুমানের কোনও বেস নেই?

—আছে। টুপু এখনও রূপনারায়ণপুরে আছে বলে খবর পেয়েছি।

—আপনি কি তাকে উদ্ধার করতে চান?

—যদি চাই তাহলে সেটা খুব অসম্ভব কিছু মনে হচ্ছে কি?

—হচ্ছে। কারণ এসব মেয়েরা বড় একটা ফেরে না। মূল উপড়ে ফেললে কি গাছ বাঁচে?

—যদি টুপুর অনুশোচনা এসে থাকে?

ধৃতি একটু হাসল, অনুশোচনা জিনিসটা ভালো। কিন্তু ফেরার পথটাও যে বন্ধ। সংসার তো তার জন্য কোল পেতে বসে নেই। সে এখন কীরকম জীবন কাটাচ্ছে তার খবর রাখেন?

—খুব লোনলি।

—পুরুষ সঙ্গী কেউ নেই?

—না। টুপুকে এখন সবাই ভয় পায়। তার রূপ গেছে, টাকা নেই, নেশা করে করে কেমন যেন বেকুবের মতোও হয়ে গেছে।

—তার চলে কী করে?

—যেভাবে চলে তাকে ঠিক চলা বলে না বোধহয়। ধরুন একরকম ভিক্ষে করেই চলে।

—ভিক্ষে?

—শুনেছি সে একটা নাচগানের স্কুল করছে।

—কীরকম স্কুল? চালু?

—সে সেই স্কুলে চাকরি করে। নাচ গান শেখায়, সামান্য মাইনে।

—তবে তো সে ভালোই আছে।

—না, মোটেই ভালো নেই। সে ফিরতে চায়।

—ফিরতে বাধা কী?

—সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কোথায় সে ফিরবে?

—কেন, নিজেদের এলাহাবাদের বাড়িতে?

—সে বাড়ি আর ওদের দখলে নেই। বিক্রি হয়ে গেছে। কলকাতার বাড়িতে আত্মীয়রা তাকে ঢুকতেই দেবে না। তার বিয়ে করারও আর চান্স নেই। তবু সে মাঝে মাঝে ফিরতে চায়। কোথায় তা বুঝতে পারে না।

—আমি কী করতে পারি বলুন?

—আমার অনুরোধ আপনি একবার ওকে দেখে আসুন।

—আপনি কি পাগল? টুপুকে দেখতে যাব কেন?

—আপনি তো হিউম্যান স্টোরি খুঁজে বেড়ান। টুপুর ঘটনা কি হিউম্যান স্টোরি নয়?

—মোটেই নয়। একটা বেহেড বেলেল্লা মেয়ের অধঃপাতে যাওয়ার গপ্পো, তাও যদি সত্যি হয়ে থাকে। আমি এখনও টুপুর গল্প বিশ্বাস করি না। করলেও ইন্টারেস্টেড নই।

—আমি যদি সঙ্গে যাই?

—আপনি কে?

—সেইটেই তো বলতে চাইছি না। তবে কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

—কাল কেন? আজই নয় কেন?

—প্লিজ, কাল। আমি অফিসেই আসব। তিনটেয়। কাল দেরি করবেন না, লক্ষ্মীটি।

ফোন কেটে গেল।

টেবিলে ফিরে আসতেই উমেশবাবু একটু গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, কেসটা কী হে?

—আছে একটা কেস। তবে প্রেমঘটিত নয়।

মেয়েছেলের ব্যাপারে বেশি থেকো না। বরং একটা দেখেশুনে ঝুলে পড়ো। ল্যাঠা চুকে যাক। বাঙালির শেষ সম্বল বউয়ের আঁচল।

ধৃতি খুব কষ্টে মুখে একটু হাসি আনল। মনটা একদম হাসছে না। রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখল, পরমা বাপের বাড়ি গেছে। ডাইনিং টেবিলে একটা চিরকূট : ফোন করে করে অফিসের লাইন পেলাম না। চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। বাবার শরীর ভীষণ খারাপ। প্রেশার হাই। ফ্রিজে রান্না-বান্না আছে, গরম করে খেয়ে নেবেন। পরমা। পুঃ বাবার প্রেশারটা

ডিপ্লোম্যাটিকও হতে পারে। জামাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে মেয়ে এক ফ্ল্যাটে আছে, এটা বোধহয় পছন্দ নয়। আপনি যে ভেজিটেবল তা তো আর সবাই জানে না। ওখানে কী হল? টুপুর মা কী বলল জানতে খুব ইচ্ছে করছে। রাতটা কোনওক্রমে কাটাল ধৃতি। কিছুক্ষণ হাকসলি পড়ল, কিছুক্ষণ গীতা। ঘুমিয়ে অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে ভারী ভ্যাবলা লাগল নিজেকে।

যখন মুখ ধুচ্ছে তখন কলিংবেল। তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে গিয়ে দরজা খুলে দেখে ফুটফুটে এক যুবতত দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের কাপ।

মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, আমি নন্দিনী। পরমা বউদি আপনাকে সকালের চা-টা দিতে বলে গেছে।

—আপনি কোন ফ্ল্যাটে থাকেন?

—ওই তো উলটোদিকে। একদিন আসবেন।

—আচ্ছা।

—কাপটা থাক। পরে আমাদের কাজের মেয়ে নিয়ে যাবে।

ধৃতি সকালবেলাটা খবরের কাগজ পড়ে কাটাল। তারপর সাজগোজ করে হাতে সময় থাকতেই বেরিয়ে পড়ল। অফিসের ক্যান্টিনে খেয়ে নেবে।

অফিসেও সময় বড় একটা কাটছিল না। তিনটেয় মেয়েটা আসবে। অন্তত আসার কথা। একটু ভয়-ভয় করছে ধৃতির। সে বুঝতে পারছে একটা জালে জড়িয়ে যাচ্ছে সে।

তিনটের সময় রিসেপশনে নেমে এল ধৃতি। অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ এল না। ঘড়ির কাঁটা তিনটে পেরিয়ে সোয়া তিন, সাড়ে তিন ছুঁই-ছুঁই। ধৃতি যখন হাল ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল তখনই আচমকা রিসেপশন কাউন্টারে একটি মেয়ের গলা বলে উঠল, ধৃতি রায় কি আছেন?

মেয়েটা লম্বাটে, রোগাটে, এক বেনিতে বাঁধা চুল। ফরসা? হ্যাঁ বেশ ফরসা। মুখশ্রী এক কথায় চমৎকার। তবে না, এ আর যেই হোক, টুপু নয়।

রিসেপশনিস্ট কিছু বলার আগেই ধৃতি এগিয়ে গিয়ে বলল, আমিই ধৃতি রায়।

মেয়েটা ধৃতির দিকে চাইল। চমকাল না, বিস্মিত হল না, কোনও রিঅ্যাকশন দেখা গেল না চোখে। তবে একটু ক্ষীণ হাসল।

ধৃতি কাউন্টার পেরিয়ে কাছে গিয়ে বলল, এখানে বসে কথা বলবেন, না বাইরে কোথাও?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলল, আপনি আমাকে আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন? আমি তো অণিমা।

—অণিমা?

—চিনতে পারছেন না? লক্ষ্মণ-কুণ্ডু আমার দাদা। আপনার বন্ধু লক্ষ্মণ।

ধৃতি দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তাই তো! এ তো অনিমা। উত্তেজনায় সে চিনতেই পারেনি।

—কী চাস তুই?

—আমি স্বদেশি আমলের একটা পিরিয়ডের ওপর রিসার্চ করছি। লাইব্রেরিতে পুরোনো খবরের কাগজের ফাইল দেখব। একটু বলে দেবেন? ধৃতি বিরক্তি চেপে ফোন তুলে লাইব্রেরিয়ানকে বলে দিল। অণিমা চলে গেলে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর রাগে হতাশায় প্রায় ফেটে পড়তে পড়তে উঠে এল নিজউ রুমে। কে তার সঙ্গে এই লাগাতার রসিকতা করে যাচ্ছে? কেনই বা? সে কি খেলার পুতুল?

গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর নিজেগে ডুবিয়ে দিল কাজে। কপির পর কপি লিখতে লাগল। সঙ্গে চা আর সিগারেট। রাগে মাথা গরম, গায়ে জ্বালা।

কিন্তু সারাক্ষণ রূপনারায়ণপুর নামটা ঘোরাফেরা করছে মনের মধ্যে। গুনগুন করে উঠছে।

ধৃতি রূপনারায়ণপুর গিয়েছিল একবার মাত্র। একজন পলাতক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক নেতা ধরা পড়েছিল রূপনারায়ণপুরে। সেটা কভার করতে। তখন অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছিল তার। কারও কথা বিশেষ করে মনে নেই। কিন্তু নামটা গুনগুন করছে। রূপনারায়ণপুর! রূপনারায়ণপুর।

তিন দিন বাদে ইংল্যান্ডে চিঠিটা পেল ধৃতি।

'খুব রাগ করে আছেন তো! থাকুন গে। রাগটুকু আমার কথা সারা জীবন আপনাকে বার বার মনে পড়িয়ে দেবে। আপাতত এটুকুই যা আমার লাভ।

'টুপুর কথা বলে বলে কান ঝালাপালা করেছি। আসলে তা নিজেরই কথা। আমিই টুপু। যা বলেছি তার এক বিন্দু মিথ্যে নয়। দ্যাখা করার কথা ছিল। পারলাম না। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। একবার শিকড় উপড়ে ফেললে গাছ কি বাঁচে? বাঁচলেও আগের মতো আর হয় না।

'রূপনারায়ণপুরে আপনাকে যখন দেখেছিলাম তখন ভীষণ ভালো লেগেছিল। কৌতূহলী, উদ্যমী, সত্যানুসন্ধানী এক সাংবাদিক। উজ্জ্বল, ধারালো, স্ট্রেটকাট। তখন থেকেই আপনার কথা খুব মনে হয়। ভেবেছিলাম, আপনার কাছে একবার এসে সব বলব।

'এলামও, কিন্তু সোজা গিয়ে হাজির হতে পারলাম না। কেমন বুক কাঁপছিল, ভয় করছিল। জীবনে কখনও তো সত্যিকারের প্রেমে পড়িনি। এই বোধহয় প্রথম। কিংবা অন্য এক আকর্ষণ। নানারকম ছলছুতো করলাম। কিন্তু তাতে আড়াল বাড়ল, ব্যবধান হয়ে উঠল দুস্তর।

'মরেই গেছি যখন আর বেঁচে উঠবার আকাঙ্ক্ষা কেন? এর কোনও মানে হয় না। নিজে নষ্ট হয়েছি, আপনাকেও নষ্ট করে দেবো হয়তো। সুন্দর মুখের অসাধ্যি কী আছে?

'নেশার কথা যা বলেছি তার সবটা সত্যি নয়। হ্যাস খেয়েছি, মদও। নেশা করিনি। কিন্তু অভ্যাস আছে। আর বিয়ের ব্যাপারটা সত্যি। কিন্তু কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে তা অত ব্যাখ্যা করে হবেই বা কী?

'সেদিন তিনটের সময় গিয়েছিলাম কিন্তু। রিসেপশনের এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম। খুব ভিড় ছিল। আপনি আমাকে লক্ষ করেননি। চিনতেও পারতেন না। আমি কিন্তু অনেকক্ষণ চোখ ভরে আপনাকে দেখলাম। খুব উদ্বিগ্ন, রাগী, উত্তেজিত। মনে মনে হাসছিলাম। আর বুকের মধ্যে সে কী দপদপানি!

'পায়ে পড়ি, মাঝে মাঝে আমাকে একটু মনে করবেন। আর কিছু চাই না।

'কাছে আসতে পারলাম না, সে আমারই ক্ষতি। আপনার কিছুই হারায়নি। এ দুঃসহ জীবন বহন করে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলে একটা স্বপ্ন অন্তত চাই। মিথ্যে হোক, তবু চাই। আপনাকে স্বপ্ন করে নিলাম।

রাগিয়েছি, ভাবিয়েছি, হয়রান করেছি বলে একটুও দুঃখিত নই। বেশ করেছি। আবার যে হাত গুটিয়ে নিলাম, নিজেকে সরিয়ে নিলাম সেইটেই কি কম?

ভালো থাকবেন।

কী জানাব আপনাকে বলুন তো? ভালোবাসা? প্রণাম? শুভেচ্ছা? যাঃ সবটাই ভারী কৃত্রিম। তার চেয়ে কিছু জানালাম না। জানানোর কী আছে?

আসি।

ধৃতি একবার পড়ল। দুবার। চিঠিটা সে ফেলে দিতে পারত দুমড়ে মুচড়ে। পারল না।

তবে দিনটা তার আজ ভালো গেল না। বার বার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। চিঠিটা তাকে আরও বহুবার পড়তে হবে সে জানে। গভীর রাত্রে, শীতে বা বৃষ্টিতে, দুঃখে বা আনন্দে, একটা মানুষ যে কত সাবলীলভাবে চিঠি হয়ে যায়!

কাচের মানুষ

১

লাভ .স্টারের বারান্দায় পা-ঠেকিয়ে সাইকেলটা দাঁড় করাল ঝিন্টু। কাউন্টারের ওধারে তার মেজদা বিটু একজন খদ্দেরকে হাত নেড়ে কী যেন খুব নিবিষ্টভাবে বোঝাচ্ছিল। আরও দুজন দাঁড়িয়ে শুনছিল মন দিয়ে। খদ্দেরদের একজন গোপাল মুখার্জি—রেলের টিকিট কালেক্টর, দ্বিতীয় জন বিষ্ণু সমাদ্দার—গুদামবাবু। বিটু যার সঙ্গে কথা বলছে তাকে চিনতে পারল না ঝিন্টু।

মেজদা! এই মেজদা!

বিটু একবার তাকাল। বিরক্ত না নির্লিপ্ত তা বোঝা গেল না। তবে বিটুর মুখে একটা স্থায়ী উদাসীনতা আছে। কোন কথা শুনছে, কোন কথা শুনছে না তা ওর ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝা যাবে না কিছুতেই।

ঝিন্টু বলল, পেইন! পেইন! বউদির!

বিটু শুনল বা বুঝল কি না তা বোঝা গেল না। তবে নিজের বউকে দেখাশোনা করার অনেক লোক বাড়িতে আছে। তার বাবা, মা, দাদা-বউদি, ভাইপো-ভাইঝি, ভাই। বিটু খবরটা শুনল মাত্র, তারপর আবার খদ্দেরকে হাত নেড়ে বোঝাতে লাগল।

ঝিন্টু বারান্দা থেকে পা তুলে পেডালে চাপ দিল। খবরটা তার দেওয়ার কথা ছিল, দিয়েছে। এখন সে ফ্রি। তার নীচু হ্যান্ডেলের রেসিং সাইকেলটা ভালো রাস্তা পেলে দারুণ চলে। এরকম সাইকেল এ শহরে দু'তিনটির বেশি নেই। ছ'মাস আগে বাবা তাকে এটা কিনে দিয়েছিল। তবু আগের সাইকেলটার কথা তার খুব মনে পড়ে। না, সেটা খুব ভালো জাতের সাইকেল ছিল না। অতি সাধারণ। তার চার বন্ধু সাইকেলে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিল। উড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, মহারষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ হয়ে তাদের ফেরার কথা ছিল। নাগপুরের কাছে দুপুরবেলা দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটা লরি তার সাইকেলটাকে পিষে দিয়ে গেল। তার বাঁ-হাতটা ভাঙল, মাথায় চোট হল দারুণ। দিনদশেক হাসপাতালে পড়ে থেকে সে অবশেষে ফিরে এল। বাকি রাস্তাটা তাকে আসতে হল ট্রেনে এবং একা। তার তিন বন্ধু সাইকেলে যাত্রা শুরু করে সাইকেলেই যাত্রা শেষ করে। এই সাইকেলটা সেই সাইকেলের চেয়ে অনেক বেশি দামি এবং ভালোও। কিন্তু এটা যে সেটা নয়, সেই ভাঙাচোরা সাইকেলটা মহারাষ্ট্রের কোন জংলা জায়গায় পড়ে পড়ে

লক্কড় হয়ে যাচ্ছে সেই কথা ভেবে আজও তা মাঝে মাঝে খুঁতখুঁত করে মনটা। কান্না পায়। সেই সাইকেল তাকে অনেকটা রাস্তা পার করে দিয়েছিল তো!

ঝিন্টুর এত নরম মনের ছেলে হওয়ার কথা নয়। সে বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়, কলেজের অপরিহার্য ক্রিকেট খেলোয়াড়, শহরের সেরা পাঁচজন অ্যাথলিটদের মধ্যে একজন, টেবিল টেনিসেও তার হাত দুর্দান্ত। এই মফসসলে অবশ্য স্পেসিফিকেশনের বালাই নেই। কলকাতা হলে এত বহুমুখী প্রতিভা কল্কে পেত না। সেখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়ালড়ি। যে ক্রিকেট খেলে সে ক্রিকেটেই জান লড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে তাকানোর ফুরসত পায় না। যে ফুটবল খেলে তার দম ফুটবলের জন্যই নিংড়ে দিতে হয়। কিন্তু এ শহর তো কলকাতা নয়, এখানে খেলাধুলো কারও পেশাও হয়ে ওঠে না কখনও। এখানে যে-কেউ যা-খুশি খেলে এবং কেউ বেশি ওপরে ওঠে না। ঝিন্টুর একটিই শখ আছে। গোটা পৃথিবী সাইকেলে ঘুরে আসবে।

সেবক রোডের দিকে মোড় নিতেই পেছনে একট স্কুটার তাড়া করল। ঝিন্টু মুখ ফিরিয়ে দেখল, অলক আগরওয়াল। তার দিকে একবার হাত তুলে হাসল। তারপর ধেয়ে এল।

অল্প বয়সের এইটেই ধর্ম। স্পিড। আরও স্পিড। এবং কমপিটিশন।

ঝন্টু তার রেসিং সাইকেলটা উড়িয়ে দিল। পেছনে অলক।

আগের মতো সেবক রোড এখন আর ফাঁকা রাস্তা নয়। দোকানপাট, রিকশায় ছয়লাপ। পদে পদে জ্যাম। তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝিন্টু গলে যেতে লাগল, ডাইনে বাঁয়ে আশ্চর্যরকম অ্যাঙ্গেলে হেলে এবং দোল খেয়ে খেয়ে। অলকের ছোট চাকার স্কুটারে অতটা ব্যালেন্স নেই। পারল না।

কিছুদূর দিগে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে যায় ঝন্টু। মাঝে মাঝে ভারী সব লোড করা লরি মার-মার করে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায় দ্রুতগতি গাড়িও। এগুলোর সঙ্গে ঝিন্টু পারবে না জানে। তবু সে সাইকেলটায় একটা দামাল গতি তুলে দেয়। সাইকেল আর ঝিন্টু, ঝিন্টু আর সাইকেল। একাকার।

২

পুরনো জেলখানার পাশে একটা লাশকাটা ঘর ছিল। কবে সেই ঘর ভেঙে দিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি। কিন্তু আশ্চর্য এই কংক্রিটের যে টেবিলটায় পোস্টমর্টেম হত সেটা আজও দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে ভেঙে-পড়া দেওয়াল, টুকরো ইট, ফাঁকে ফাঁকে আগাছা, তারই মধ্যে চারটে পায়ে আস্ত টেবিলটা দাঁড়িয়ে। চোখ পড়লেই বুকের ভিতরটা ঝাঁত করে ওঠে। সকলের হয়তো হয় না। পিন্টুর হয়। আসতে যেতে রোজ তার ওইদিকে চোখ

পড়ে। আজও পড়ল। চলন্ত রিকশা থেকে সে অপলক চোখে কিছুক্ষণ দেখল, যতক্ষণ দেখা যায়।

এই টেবিলটাকে অনেকবার নানাভাবে সে স্বপ্ন দেখেছে। বাঁদিকে কাছারি, কাছারির পাশে কাঁচা নর্দমা, ডানধারে জেলখানায় উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের পাশেই ওই পুরনো লাশকাটা ঘরের ধ্বংসাবশেষ। এখানে সবাই আজকাল আবর্জনা ফেলে। দুর্গন্ধে নাকে রুমাল দিতে হয়।

একদিন পিন্টুরও এই টেবিলে শুয়ে কাটাকুটি হওয়ার কথা ছিল। কপালটা কি তার একটু ফেবারে?

রাজনীতি ছাড়া কোনও মানুষ বাঁচতে পারে বা বেঁচে আছে বলে পিন্টু বিশ্বাস করে না। কোনও-কোনওভাবে সব মানুষই রাজনীতি করে। কেউ জেনে, কেউ না জেনে। পিন্টু বরাবর যা করেছে তা জেনেই করেছে। সে রাজনীতিতে নামে কলেজে থাকতে। তখন থেকেই তার খ্যাতি। কুখ্যাতিও। পিন্টু এ-ও বিশ্বাস করে, রাজনীতি করতে গেলে কখনও-সখনও গা-জোয়ারির দরকার হয়, দরকার হয় সমাজবিরোধী মার্কামারা ছেলেদেরও। নিরামিষ রাজনীতি বলে কিছু নেই, কিছু হয় না। কাজেই সে রাজনীতিতে নেমেছিল আস্তিন গুটিয়েই। ফলে কলেজে থাকতেই মোটামুটি তাকে লোক ভয় খেতে শুরু করে।

ফুন্টসোলিং থেকে ফেরার পথে মধু চা-বাগানের কাছে চিরুর দল তাদের জিপে হামলা করেছিল। না-হক হামলা। পিন্টুর মাথার রড লেগেছিল। জলপাইগুড়ি হাসপাতালে আসবার পথে কয়েক লিটার রক্ত বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। মরতে মরতে বেঁচে ফিরে আসে পিন্টু। তারপর চিরুর ওপর হামলা চালায়। কিছুদিন শহর গরম করে রেখেছিল দুই পক্ষ। তখন মনে হয়েছিল হয় চিরু না হয় পিন্টু শিলিগুড়ি দখল করবে। কার্যত তার কিছুই হয়নি। চিরু এখন সরকারি ট্যুরিস্ট লজ আর এম-ই এস-এ মাছ মুরগি সাপ্লাইয়ের ঠিকাদারি করছে, বেচেছে দেদার বিদেশি জিনিস। আর পিন্টু? সে এখন তার বাবার জুনিয়র হয়ে ওকালতি জমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। জীবনের ধারাটাই অন্যভাবে বইতে লাগল। রাজনীতি হল বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে থাকার মতো। যতক্ষণ পিঠে চেপে আছ ততক্ষণ ভালো, পড়লেই বাঘে খেয়ে নেবে।

পিন্টু এখন আর তেমনভাবে রাজনীতি করে না। সোজা কথায় বলতে গেলে, সে এখন কলকে পায় না। তবে একসময়ে তার যে হাঁকডাক এবং প্রতাপ ছিল তার কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে। লোকে তাকে হ্যাটা করে না। অনেকে সেলাম বাজায়।

পিন্টুর বয়স এখন তিরিশ। নতুন করে জীবন শুরু করার পক্ষে বয়সটা এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু আসল সমস্যা হল, নতুন জীবনটা গড়ে উঠবে কী নিয়ে? কীরকম ভাবে? রাজনীতি ছাড়া তার কাছে আর সবকিছুই 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'-র মতো। সে জানে রাজনীতির জন্যই তার এই জীবনধারণ। কিন্তু সে এ-ও জানে যে, রাজনীতির অচলায়তনে

নতুন কোনও ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা তার আর নেই। দলে এখনও নাম লেখানো আছে, দলের মিটিং-এ তার ডাকও পড়ে, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে তাকে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হয় না আজকাল।

বেঁচে থেকেও মৃত্যু এইভাবেই প্রত্যেক্ষ করে পিন্টু।

কলেজের মোড়ে পানের দোকানের সামনে যে রিকশা দাঁড় করাতে হবে তা রিকশাওয়ালা জানে। পিন্টুকে নামতে হয় না, দোকানদার তাকে দেখেই পিলাপাতি কালপাতি দিয়ে পান সেজে নেমে এসে এগিয়ে দেয়। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে।

পিন্টু এই শ্রদ্ধার ভাবটা খুব নজর করে দেখে। শ্রদ্ধা কোথাও কমে যাচ্ছে কি না, বা আর কারও প্রতি বেড়ে উঠছে কি না এটা তার জানা দরকার। এই যে রিকশাওয়ালাকে কিছু বলতে হয় না, শুধু পিন্টু উঠে বসলেই রিকশা নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে থাকে, পানের দোকানে দাঁড় করায় বা বাসায় নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেয় এর ব্যাত্যয় হলেই পিন্টুর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এসব ছোটখাটো ঘটনা হল মিটার। জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি মাপবার যন্ত্রবিশেষ।

এল আই সি, স্টেট ব্যাংক, সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, কোর্ট, এস ডিও অফিস যেখানেই সে যায় কোথাও তার নিজেকে পরিচয় দিতে হয় না। পিন্টু নিজে গিয়ে দাঁড়ালে বা পিন্টুর নাম করে কেউ গেলে এখনও এই টাউনে অনেক কার্যোদ্ধার হয়ে যায়। মরা হাতি এখনও লাখ টাকা।

দোকানের অদূরে একটা গাছতলায় কয়েকজন ছেলেছোকরা গ্যাঞ্জাম করছিল। পিন্টুকে দেখে এগিয়ে এল।

পিন্টুদা শুনেছেন?

পিন্টু বোঁটা থেকে একটু চুন চেটে নিয়ে বলে, কী?

ফুডের চ্যাটার্জি সাহেব আবার কাল রাত থেকে ঘেরাও হয়ে আছে।

ফুড কর্পোরেশনের ম্যানেজার চ্যাটার্জি সাহেব প্রায়ই ঘেরাও হন। এ যুগের পক্ষে লোকটা নিদারুণ 'মিসফিট'। ঘুসটুস খান না, কর্মচারীদের একটু ডিসিপ্লিনে রাখতে চেষ্টা করেন, তার চেয়েও বড় কথা চুরি আটকানোর চেষ্টা করেন। ফলে মাসে দু-একবার তাঁকে ঘেরাও হতে হয়। খবরটা তাই নতুন নয় বটে, কিন্তু পিন্টুর খিঁচ অন্যখানে। খবরটা যে যথাসময়ে পায়নি। আজকাল টাউনে কোনও ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পিন্টুর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। আর আজকাল? সে সময় মতো কোনও খবরই পায় না।

সামনেই ফুড কর্পোরেশনের অফিস। পিন্টু রিকশায় বসেই অফিসের সামনে ভিড় দেখতে পেল। খুব নিস্পৃতভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। ভেতরে কোনও তাদিগ অনুভব করল না। ফুড কর্পোরেশনের ইউনিয়নে চারটে ভাগ। বড় ভাগটি তাদের—অর্থাৎ তার দলের। কিন্তু কেউ তাকে ডাকেনি, তার পরামর্শ চাইনি।

পিলা আর কালাপাতি জর্দার ধার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। পিক ফেলে পিন্টু অস্পষ্ট গলায় বলল, চল।

রিকশা চলতে থাকল।

৩

ব্রহ্মকুমার গাঙ্গুলিকে এশহরের সবচেয়ে বড় উকিল বলা যাবে কি না তা বলা মুশকিল, তবে তিনি যে সবচেয়ে বড়দের একজন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই শহরে সবচেয়ে বড় উকিলদের সংখ্যা খুব বেশিও নয়। মেরে কেটে চার-পাঁচজন। এবং তাঁদের মধ্যে সকলেই বৃদ্ধ এবং প্রবৃদ্ধ। উপেন বিশ্বাসের বয়েস আশি ছাড়িয়েছে। তবু সক্ষম আছেন বলে কোর্টে প্রায় রোজই হাজিরা দেন। বেশিরভাগ সময়েই বসে ঝিমোন। মামলা চালায় জুনিয়াররা। নিরাপদ সরকার ছিয়াত্তরে পা দিয়েছেন। আজকাল আদালতে আসতে চান না। প্রায়ই ছেলের কাছে আমেরিকার হিউস্টনে চলে যান এবং কয়েকমাস করে থেকে আসেন। কেস প্রায় নেন না বললেই চলে। গৌর ব্যানার্জি কিছুটা অ্যাকটিভ। বয়স তিয়াত্তর। ব্রহ্মকুমারের একমাত্র সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রদ্যোৎ সেন তেমন বৃদ্ধ নন, মাত্র পঞ্চান্ন বা ছাপান্ন। উকিলও ভালো। কিন্তু শোকতাপ পেয়ে ইদানীং বড্ড নিজঝুম হয়ে গেছেন, কোনও কাজেই উৎসাহ নেই।

আর যে সব উকিল আছে তারা উঠতি, ছলবলে খলখলে। এখনও কারোই ভালো পসার জমেনি। বুড়ো আর যুবোদের মধ্যে পেশাগত এই প্রজন্মের ফাঁকটুকুতে যে ভ্যাকুয়াম আছে সেখানেই ব্রহ্মকুমারের স্থান। তিনি যথেষ্ট রোজগার করেন, উদয়াস্ত তাঁর সময় নেই। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি তাঁর মেশিন চালু থাকে। তাঁর তেমন কোনও শখ নেই, আহ্লাদ বা প্রমোদ নেই, তিনি কোথাও ভ্রমণে যান না, চা ছাড়া তাঁর কোনও নেশা নেই। তাঁর একটাই নেশা—মামলা। কত টাকা তিনি মাসে রোজগার করেন তার সঠিক হিসেব তাঁর নিজেরও জানা নেই। তবে কম করেও দশ থেকে পনেরো হাজারের মধ্যে। টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে, জমা হচ্ছে না খরচ হয়ে যাচ্ছে তা তাঁর স্ত্রী বলতে পারেন। তিনি কিছুই জানেন না সংসার কীভাবে চলে। স্ত্রী-ই সব কিছু চালিয়ে নেন, সংসারকে এবং তাঁকেও। তিনি আজকাল সুখাদ্যের স্বাদ টের পান না, সুন্দরী ও কুৎসিত নারীর তফাত বুঝতে পারেন না, মাত্র ঊনষাট বছর বয়সেই কামবোধ লুপ্তপ্রায়।

সকাল বেলায় ব্রহ্মকুমার তাঁর বাইরের ঘরে বসেই তার চতুর্থ পুত্র পিন্টুকে গালাগাল করছিলেন, অপদার্থ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, ফাজিল, ভূত। তার কারণ জলপাইগুড়িতে পরশু দিন একটা মামলার হিয়ারিং ছিল। কথা ছিল পিন্টু কেসটা অ্যাটেন্ড করবে। কিন্তু সে তা করেনি এবং সে কথা বাপকে জানায়নি পর্যন্ত।

মক্কেলদের দিকে চেয়ে ব্রহ্মকুমার বলছিলেন, এই এরাই সব আধুনিক কালের ছেলেমেয়ে। এদের হাতে দেশ আর দশের ভার দিয়ে যেতে হবে আমাদের। বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ বছর পর দুনিয়াটার কী হাল হবে ভাবতে পারেন?

জলপাইগুড়ির মক্কেল করুণভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল একধারে। ফাঁক পেয়ে বলল, সামনের পনেরো তারিখে ডেট পড়েছে। এবারটায় আপনি নিজে যাবেন তো উকিলবাবু?

যেতেই হবে। তুমি তেরো-চোদ্দো তারিখে একবার তাগিদ দিয়ে যেও। আর মুহুরির কাছে আমার এনগেজমেন্ট বুক আছে, তাতে শুনানর তারিখ আর নামধাম লিখে রেখে যাও। কোনওরকমে যাতে ভুল না হয়। মামলার ব্যাপারে ব্রহ্মকুমারের ভুল হয় কদাচিৎ, তিনি তো এই প্রজন্মের দায়দায়িত্বহীন বাপের হোটেলের অন্নধ্বংসকারী ছেলেছোকরা নন। যখন বিয়ে করেছিলেন তখনও ল'য়ের ছাত্র, রোজগারের নামে ঢুঢু, তবু বাপের হুকুমে টোপর পরতে হয়েছিল। বাপের হুকুম কী জিনিস তা এরা সব বুঝবে না, তখন বাপই ছিল আইন, বাপই সুপ্রিমকোর্ট, প্রিভি কাউন্সিল। খেঁদি পেঁচি কাকে গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন বিগ বস তা বুঝতে পারছেন না বলে ভয়ে শুভ দৃষ্টির সময় চোখ পর্যন্ত খোলেননি। আর এই পিন্টুকে বিয়ে করার কথা বলে বলে মুখে ফেকো উঠে গেল, কথাটা শুনতে পায় বলেই মনে হয় না। অথচ ছেলেটার বিয়ে দরকার। রাজনীতি করতে গিয়ে দাগা খেয়েছে, আইনেও মন নেই। এই অবস্থায় বিয়ের বাড়া ওষুধ নেই। কিন্তু ওষুধ না গিললে কী করবেন তিনি?

বাচ্চা চাকরটা এসে খবর দিল, মা একটু ডাকছেন বাবু।

ব্রহ্মকুমার আঁতকে উঠে বলেন, এখন ডাকছে কী রে? কত মক্কেল রয়েছে দেখছিস না।

আজ্ঞে খুব দরকার।

পরে হবে, পরে, এখন যা।

চারকটাকে ব্রহ্মকুমার স্টেশন থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। উত্তর বঙ্গের বছরওয়ারি বন্যায় বছরচারেক আগে গোটা পরগনা ভেসে গিয়েছিল। শিলিগুড়ি উঁচু ভিতের শহর, কখনও ডোবে না, রাজ্যের লোক এসে পঙ্গপালের মতো ঝাঁপ ফেলল শহরে। স্টেশন, গুমটি, চালা, স্কুল-কলেজ সব জায়গায় লোক। সেই সময় পুরোনোও বাজার থেকে মাসকাবারি বাজার করে ফেরার পথে স্টেশনে এ এস এম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশকাল পরিস্থিতি নিয়ে দুটো কথা বলেছিলেন দাঁড়িয়ে। বাচ্চা একটা সাত-আট বছরের গোপাল-গোপাল চেহারার ছেলে কাছেই দাঁড়িয়ে তারস্বরে চেঁচায়ে কাঁদছিল। ছেলেটার দিকে বিরক্ত চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন ব্রহ্মকুমার। এমন সময় পাশেই একটা দঙ্গল থেকে একটা আদুড় গা লোক বিগলিও মুখে এগিয়ে এল। গায়ে-পড়া অসহ্য রকমের আলাপি কিছু লোক আছে দুনিয়ায়। এদের আস্পদ্দার শেষ নেই। হুট বলে যখনতখন শ্রেণিভেদ ভুলে

যার তার সঙ্গে মনের কথা বলতে লেগে যায়। এ লোকটাও তেমন। চক্রবর্তী আর তাঁর কথা হচ্ছে, মাঝখানে উদয় হয়ে লোকটা বলল, এই যে ছেলেটা দেখছেন না বাবু এর বাপ নেই। মা একটা পাগলি। তা ছিল মায়ে পোয়ে একরকম, কিন্তু আজ সকাল থেকে মা-টারও তল্লাস নেই। কোথায় চলে গেছে পাগল মানুষ। ছেলেটা কেঁদে কেটে সারা হচ্ছে। তা বাবু নেবেন নাকি ছেলেটাকে? ঘরে দোরে থাকবে, কাজকম্ম করবে, মানুষ হয়ে যাবে একরকম।

ব্রহ্মকুমারের রেগে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু একটু সংসারী বুদ্ধি তখন খেলল মাথায়। তাঁর স্ত্রীর একটু বাতের লক্ষণ আছে। হাঁটু আর পায়ে কোনও বাচ্চা ছেলে উঠে মাড়িয়ে দিলে আরাম পান। কিন্তু সেরকম বাচ্চা তাঁর বাড়িতে কেউ নেই। এটাকে নিলে সেই কাজ হয়। লোকটাকে ব্রহ্মকুমার জিগ্যেস করলেন, জাতে কী রে?

আজ্ঞে, বারুজীবী। ভালোই, জলচল।

গার্জিয়ান কেউ নেই?

আমি গ্রাম সম্পর্কে কাকা। আর কেউ নেই।

ব্রহ্মকুমার লোকটার নামধাম টুকে নিলেন। তারপর ছেলেটাকে নিয়ে এলেন বাসায়। প্রথম প্রথম তিন-চারদিন খুব কাঁদত। খেতে চাইত না, খেলতে চাইত না। পরে আস্তে আস্তে এমন বশ মানল যে আর বলার নয়। ভেলু না ফেলু কী একটা নাম যেন ছিল আগে। এ বাড়িতে আসার পর নাম দেওয়া হয়েছে জনার্দন। ছেলেটা একটু খেতে ভালোবাসে। কোমরের কষি খুলে খায়। ভোজনে চ জর্নাদন স্মরণ করে ওই নামটা বোধহয় পিন্টুই দিয়েছিল। সেই থেকে জনার্দন।

মায়া মোহের কথা শাস্ত্রে যা বলা আছে তা যে অতিশয় খাঁটি তা উকিলবাবু বেশ টের পান। এই জনার্দনকে দিয়েই টের পান। কুড়িয়ে পাওয়া এই ছেলেটার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, কিছু নেই তবু একটা ভারা মায়ার টান এসে গেছে। এখন যদি জনার্দনের মা এসে ছেলেকে দাবি করে বসে তবে ছাড়তে ভীষণ কষ্ট হবে।

ব্রহ্মকুমার জনার্দনের দিকে চেয়ে বললেন, তোর মার এমনকী জরুরি দরকার বল তো যে মক্কেল ছেড়ে যেতে হবে?

জনার্দন মাথা নেড়ে বলল, সে জানি না।

এক মক্কেল আগ বাড়িয়ে বলে উঠল, শুনেই আসুন না উকিলবাবু আমরা বসছি।

বসুন তাহলে। বলে ব্রহ্মকুমার উঠলেন, বেলা প্রায় পৌনে দশটা হল। কোর্টে একটু বেলা করেই যান। তবু তারও বেশি সময় নেই।

সুমনা জানেন, স্বামীটিকে ডেকে তেমন কোনও লাভ নেই। কারণ খুব দুঁদে উকিল হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মকুমারের বাস্তব বুদ্ধি অতিশয় সীমাবদ্ধ। বিপদের সময় ব্রহ্মকুমারের একমাত্র ভূমিকা হল চ্যাঁচামেচি করে অন্যদের ডাকাডাকি করা। এবং অবাস্তব সব পরামর্শ দেওয়া।

বিপদ বলতে অবশ্য তেমন কিছু নয়। তা মেজো বউমার ব্যথা উঠেছে। সুমনা নিজে বহুবার মা হয়েছেন। কাজেই অভিজ্ঞতা অভাব তাঁর নেই। এ অবস্থায় কী করতে হয় না হয় সবই তাঁর নখদর্পণে। তাছাড়া কেষ্ট মিত্রের নাসিংহোম-এ নাম লেখানো আছে।

কিন্তু মুশকিল হল তাঁর মেজো বউমা সোমার হার্ট ভালো নয়। কলকাতার বড় ডাক্তারও দেখে বলেছে, বেশি ধকল সইতে পারবে না। সন্তান প্রসব না করলেই ভালো।

ডাক্তারদের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে জীবন অচল। সুতরাং তা কদাচিৎ মানা হয়।

কিন্তু সুমনা ভাবছেন, এক্ষেত্রে মানাই বোধহয় ভালো ছিল। ব্যথা ওঠার পর থেকেই সোমার প্রচণ্ড শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। বুকে ভীষণ ধড়ফড়ানি এবং ক্ষীণ একটু ব্যথাও। ছেলেরা কেউ বাড়ি নেই। ভরসা জনার্দন আর ব্রহ্মকুমার। শুধু নার্সিংহোম-এ নিয়ে ফেলে রেখে আসলেই চলবে না, ব্যাপারটা বুঝেও আসতে হবে। বড় বউমা মঞ্জুরি কাছে থাকলেও খানিকটা ভরসা পেতেন সুমনা। সে গেছে লাটাগুড়ি চা-বাগানে বাপের বাড়ি, তার মায়ের এখনতখন অবস্থা বলে আজ সকালেই ভাই এসে নিয়ে গেল। দুই ছেলে আর এক মেয়েকে রেখে গেছে। এখন তারাও সবাই স্কুলে।

চিনচিনে ব্যথাটা উঠতেই সোমাকে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করিয়েছেন তিনি। এ সময়ে হাঁটাহাঁটি করলে প্রসব সহজ হয়। কিন্তু ভেতরের বারান্দায় কয়েকবার এপাশ ওপাশ করেই সোমা বুক চেপে এসে বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে। ঝিন্টুকে পাঠিয়েছেন বিটুকে খবর দিতে। কিন্তু সে-ও এসে পৌঁছোয়নি এখনও। সুমনা পরিস্থিতিটা ভালো বুঝছেন না।

ব্রহ্মকুমার ব্যস্তবাগীশ লোক। চোখ কপালে তুলেই বাইরের ঘর থেকে ধেয়ে এসে বললেন, কী হয়েছে কী? তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় নেই।

শোন, চ্যাঁচামেচি কোরও না। বউমার ব্যথা উঠেছে।

ব্যথা!

প্রসবের ব্যথা। বাড়িতে ছেলেরা কেউ নেই। তুমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো এক্ষুনি।

কথাটা শুনেই ব্রহ্মকুমার চেঁচাতে লাগলেন, কোথায় থাকে সব নবাব-নন্দনেরা? কোথায় যায়? এটা কি হোটেলখানা নাকি? এখন হার্ট ফেল-টেল করলে কে দায়ী হবে?

সুমনা স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে তাঁকে ভস্ম করে দেওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করে বললেন, ষাঁড়ের মতো চেঁচালে বউমার আরও শরীর খারাপ হবে, খেয়াল আছে?

ব্রহ্মকুমারও স্ত্রীর দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, তোমরা আমাকে পেয়েছটা কী বলতে পারো? এক ঘর মক্কেল ছেড়ে এখন আমি ছুটব গাড়ি আনতে?

তাতে দোষের কী হল? মক্কেলরা কেউ পালাবে না। সারা জীবন কেবল মক্কেল মক্কেল করে গলা শুকোলেই তো হবে না। সংসারে আরও পাঁচ জনের প্রতি কর্তব্যও আছে।

ব্রহ্মকুমার আদালতে সওয়াল জবাব মারফত রোজই বিস্তর ঝগড়া কাজিয়া করে থাকেন। বস্তুতপক্ষে মামলা মানেই তো দু-পক্ষের ঝগড়া। সেই ঝগড়ায় তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেতেনও। কিন্তু মুশকিল হল সংসারের ঝগড়ায় তিনি কিছুতেই এঁটে ওঠেন না। সেই জন্য পারতপক্ষে সুমনার সঙ্গে তিনি বিতর্ক এড়িয়ে চলেন। কিন্তু ঝগড়া না করলেও রোষকষায়িত লোচনে স্ত্রীকে বিদ্ধ করতে ছাড়েন না ব্রহ্মকুমার। বলেন, কর্তব্য কেবল এক আমারই? বাঃ, বেশ।

সুমনা ব্রহ্মকুমারের রোষদৃষ্টিকে একটুও গ্রাহ্য না করে বললেন, সংসারের দায়-দায়িত্ব আমি ঘাড়ে না নিলে বাইরের ঘরে বসে ঠ্যাং নাচানো বেরিয়ে যেত। কিন্তু এখন এত কথায় সময় নেই, ঘরে সিরিয়াস রুগি। দয়া করে একটা গাড়ি ব্যবস্থা করো।

ব্রহ্মকুমার বিরক্তির গলায় বলেন, গৌর কন্ট্রাকটরকে তো বলাই আছে তার গাড়িটা দরকার হতে পারে। কাউকে দিয়ে তাকে একটু খবর পাঠালেই তো হয়।

সুমনা মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। একটু রাঙাও হলেন কি? গলাটা এক পরদা নেমে গেল। বললেন, গৌর তোমার পেয়ারের লোক, তুমি খবর পাঠাও গে। কিন্তু সে থাকে সেই এক নম্বর ডাব গ্রামে, মাইলতিনেক দূর! অতদূর গিয়ে গাড়ি আনতে ভালোমন্দ কিছু না হয়ে যায়।

তাহলে?

তাহলে কী সেটা জানার জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠালাম। একটু বেরিয়ে দ্যাখো কাছাকাছি কারও গাড়ি পাও কি না। রিকশায় নিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না। তোমার মক্কেলদের কারও গাড়ি-টাড়ি নেই?

ব্রহ্মকুমার হঠাৎ উদ্ভাসিত হন। তাই তো। জলপাইগুড়ির মক্কেলটি যতদূর মনে হয় গাড়ি করে এসেছে। লোকটা এখনও চলে যায়নি বোধহয়।

দেখছি। বলে ব্যস্তসমস্ত ব্রহ্মকুমার বেরিয়ে গেলেন। জলপাইগুড়ির মক্কেল বারান্দায় মুহুরির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় এনগেজমেন্ট বুক-এ মামলার তারিখ লেখাচ্ছে। সেরকমই কথা।

লোকটার নাম মনে পড়ল না। ব্রহ্মকুমার বললেন, ওহে—

লোকটা ফিরে তাকাল, আমাকে বলছেন?

ইয়ে, আপনার গাড়ি আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই তো।

ব্রহ্মকুমার দেখলেন, নতুন ঝকমকে অ্যামব্যাসাডার।

ইয়ে, আমার পুত্রবধূকে একটু নার্সিংহোম-এ নিয়ে যেতে হবে। সিরিয়াস অবস্থা।

মক্কেল ব্যস্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৌঁছে দিচ্ছি। এ আর বেশি কী কথা? আড়াল থেকে সুমনা দৃশ্যটা দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ি পালটাতে গেলেন। সোমার ঘরে উঁকি মেরে দেখলেন, বউটা নিজঝুম হয়ে পড়ে আছে।

বউমা।

উঁ?

চলো। একটু তৈরি হয়ে নাও। গাড়ি জোগাড় হয়েছে।

একটু কাতর শব্দ করে উঠল সোমা।

কেমন লাগছে বউমা?

বুকের ভেতরটায় ভীষণ ভার।

শাড়ি কি আমি পরিয়ে দেব?

না। পারব।

তাহলে আর দেরি কোরও না। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

ব্রহ্মকুমার আবার গিয়ে বাইরের ঘরে বসেছেন। সুমনা একখানা পাটভাঙা শাড়ি পরতে পরতে স্বামীর কথা ভাবছিলেন। যা রোজগার তাতে একটা গাড়ি কেনা কিছু শক্তি নয় ব্রহ্মকুমারের পক্ষে। বাড়িতে একটা টেলিফোনও বড্ড দরকার। কিন্তু এসব প্রয়োজনের কথা ব্রহ্মকুমার কানে তোলেন না। কথা উঠলেই বলেন, ওসব স্ট্যাটাস সিমবল-এ আমার দরকার নেই।

টাকাপয়সা অবিশ্যি সবই সুমনার হেফাজতে। কিনলে তিনিই কিনতে পারেন। কিন্তু নিজেকে ততটা স্বাধীন বলে আজও ভাবতে শেখেননি সুমনা। ব্রহ্মকুমারের মতো না হলে সেটা সম্ভব নয়। শুধু গত বছর অনেক বলে কয়ে মত আদায় করে একটা ফ্রিজ কেনা সম্ভব হয়েছে মাত্র।

আর গ্যাসের উনুন। সংসার এখনও ব্রহ্মকুমারের আয়েই চলে। বড় দুই ছেলে রোজগার করে বটে কিন্তু এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য রকমের টাকা সংসারে দেয় না। না দিলে সুমনা কী-ই বা করতে পারেন?

শাড়ি পরা হয়ে গেল। সোমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, বউমা হল?

হয়ে এল মা। ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছি।

ঠাকুর প্রণাম করে যাও এসে। মক্কেলের গাড়ি, বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা চলবে না।

জনার্দনকে ডেকে বললেন, রান্না অর্ধেক করে রেখে যাচ্ছি। আজ বাবুর খাওয়ার খুব কষ্ট হবে। মাছ ভাজা আর ডাল দিয়ে ভাত দিস। গাছ থেকে একটা গন্ধ লেবু এনে কেটে

দিস। দেখিস, সর্দারি করে আবার গ্যাস জ্বালাতে যাবি না খবরদার। আর একবার সিলিন্ডার বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলি মনে আছে তো!

তুমি এবেলা ফিরবে না মা?

ফিরব বইকি। পৌঁছে দিয়েই ফিরব। সব একটু দেখেশুনে রাখিস বাবা। আর বিটু ফিরলে বলিস তখনই যেন নার্সিংহোম-এ চলে যায়।

নতুন গাড়িটার অভ্যন্তরে যখন উঠে বসলেন সুমনা তখন তাঁর একটু হিংসে হল। এরকম একখানা গাড়ি ব্রহ্মকুমার অনায়াসেই কিনতে পারেন। কিন্তু লোকটার বড় জেদ, বড় গোঁ। যেন গাড়ি কিনলেই ট্রাডিশন ভাঙা হবে, বড়লোকি দেখানো হবে আর ছেলেদের অধঃপাতে যাওয়ার রাস্তা করে দেওয়া হবে।

বিটুকে দোকান থেকে তুলে নেবেন কি না একবার ভাবলেন সুমনা। কিন্তু ভেবে মনে হল, কাজটা যুক্তিযুক্ত হবে না। বউয়ের প্রতি বিটুর বিশেষ দায়িত্ববোধ আছে বলে সুমনার মনে হয় না। তাছাড়া ওর সঙ্গে গিয়ে কী-ই বা করবে? সোমার সঙ্গে বিটুর বিয়ে দেওয়াটা হয়তো ভুলই হয়েছে। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় আর পাত্রী খুঁজেও পাওয়া গেল না। দিয়ে না দিয়েও উপায় ছিল না। বেশিরভাগ পরিবারেই একটু আধটু কেলেঙ্কারি থাকে। বড় বউমা মঞ্জুরি আর মেজো ছেলে বিটু এই সাদামাটা পরিবারে সেই দাগটাই দেগে দিতে গিয়েছিল প্রায়।

মন্টুর সঙ্গে মঞ্জুরির সবে বিয়ে হয়েছে তখন। বছর না ঘুরতেই দেওর আর বউদির সম্পর্কটা বড্ড বেশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে পড়েছিল। মন্টু চাকরি করত মালদায় স্টেট ব্যাংকে। আসা-যাওয়া ছিল। তবে টানা থাকত না। বউ নিয়ে যাওয়ারও খুব আগ্রহ ছিল না। মন্টু একটু অন্যরকম। সাধু-সাধুভাব। অবসর পেলেই ধর্মের বই পড়ে। সাধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। মঠে মন্দিরে যায়। একা একা গাঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারবদ্রী, কাশী গয়া ঘুরে বেড়ায়। ওই ছেলের বউ যদি এদিক ওদিক করে তবে আর সুমনা দোষ দেবেন কাকে। আর বিটু তখন দুর্দান্ত পুরুষ। ব্যাডমিন্টনে জেলার চ্যাম্পিয়ান। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপে খেলে রানারস আপ হয়ে এসেছে। তাছাড়া চোখা, চালাক, ছলবলে যুবক। সিনেমায় নামাবার জন্যেও তোড়জোড় করেছিল। এ ছেলের সঙ্গে যে-কোনও যুবতির ঢলাঢলি খুব স্বাভাবিক। দোষের মধ্যে বিটুটার লেখাপড়া তেমন এগোয়নি। বি-এসসি-টা কিছুতেই পাস করতে পারল না। তাতেও বাধেনি। একদিন মঞ্জুরির কোলে মাথা রেখে বুঝি শুয়ে ছিল সন্ধেবেলায়। অন্ধকার ঘরে ফোঁপানির শব্দ পেয়ে জানালার ফোকর দিয়ে দৃশ্যটা দেখে ফেলে যূথী। যূথী এসে মাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দৃশ্যটা দেখায়। অন্ধকার বলে তেমন কিছু দেখতে পাননি সুমনা। তবে কিছু গাঢ় কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন।

বিটুর একটা অসাধারণ গুণ আছে। মাতৃভক্তি। পারতপক্ষে কখনও সে সুমনার অবাধ্য হয়নি কখনও। খুব শিশুবেলা থেকেই সে মায়ের ন্যাওটা। সুমনা বিপদ দেখে ছেলের সেই

দুর্বলতা কাজে লাগালেন। বিয়ের প্রস্তাবে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল বিটু। রাগারাগিও করেছিল। কিন্তু সুমনা নাওয়াখাওয়া ছেড়ে শয্যা নেওয়ায় আর বেশি প্রতিরোধ করতে পারেনি। হয়তো সে বুঝেছিল যে, বউদির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা বাড়ির লোকে জানে। মত দিতেই পাত্রী খোঁজা হয়েছিল ঝড়ের বেগে। সোমা চা-বাগানের মেয়ে। মা-বাবা নেই, মামার কাছে অনাদরে মানুষ। বড় মায়া হয়েছিল মেয়েটাকে দেখে।

মায়া এখানও একটু আছে। বিটুটা বড় অনাদর করে ওকে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বিয়ে, তা সফল হয়েছে সন্দেহ নেই। মঞ্জুরি আর বিটু একই বাড়িতে আজও বাস করে। কিন্তু দুজনেই পরস্পরের প্রতি একেবারেই উদাসীন। বিটুর ব্যাডমিন্টন গেছে, দুরন্তপনা গেছে, স্মার্টনেস গেছে। বিয়ের পর থেকেই কেমন যেন আনমনা, কেমন যেন ছন্নছাড়া ভাব ওর।

সেই বিটুকে আর চেনা যায় না। ব্রহ্মকুমার একটা দোকান করে দিয়েছেন। বিটু এখন সেই দোকান নিয়েই পড়ে থাকে।

সোমা খুব ক্ষীণ স্বরে কোঁকাচ্ছিল। সুমনা ঝুঁকে জিগ্যেস করলেন, খুব কষ্ট হচ্ছে?

বুকটা কেমন করছে মা।

ব্যথাটা?

তেমন নয়। শুধু চিনচিন করছে।

ব্রহ্মকুমারে মক্কেল সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসা। মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে একবার চেয়ে বলল, মিত্র সাহেবের নার্সিংহোম তো! এসে গেছি। সুমনা বউমাকে নিয়ে নামলেন।

৫

স্টকে অনেক জিনিস নেই। আনতে হবে। দুটো বেবি ফুড, একটা সিরিয়াল, দু-রকম হোল মিল্ক, দু'ধরনের ক্রিম, একটা বিশেষ ব্র্যান্ডের বিস্কুট, একটা বিশেষ কোম্পানির মাখন, তিন পপুলার ব্র্যান্ডের ব্লেড, আরও অনেক রকম জিনিস। চালু জিনিস টপ করে বিক্রি হয়ে যায়। কিন্ত আনতে গেলেই দেখা যায়, প্রতি পিস জিনিসের ওপর কিছু দাম চড়িয়ে বসে আছে পাইকার, আজকাল জিনিসের দাম বাড়ে মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে। ম্যানুফ্যাকচারার বা পাইকারকে পাবলিক ফেস করতে হয় না। খুচরো খদ্দেরদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয় রোজ এই তার মতো খুচরো দোকানদারদের।

এই তো গত সপ্তাহে তিনটাকা ডজন দরে ব্লেড নিলাম। এর মধ্যেই সাড়ে তিন।

কোম্পানি দাম বাড়ালে আমরা কী করব বলুন।

কই সম্পদ স্টোরে তো বাড়েনি। এই তো কালই কলেজের নয়নবাবু তিন টাকা দরে কিনে নিয়ে গেলেন।

কিংবা...

মশাই কি ব্ল্যাক করছেন নাকি?

কেন বলুন তো!

বেবি ফুডটার তো টিনের গায়েই লেখা আছে রিটেল প্রাইস নট টু একসিড—

লেখা তো থাকেই। আমরাও জানি। কিন্তু হোলসেলার যদি বেশি নেয়—

না মশাই, এটা একটা কথার কথাই নয়। এ সোজা ব্ল্যাক।

সারাদিনই বিটু এবং বিটুর মতো দোকানদারকে মুখ বাড়িয়ে যেতে হয়। কতগুলো স্টক কথা আছে। সেগুলোয় কাজ না হলে মিনমিন করতে হয়। পুরনো স্টক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ একরকম। নতুন স্টক আনলেই হাঙ্গামা। লোকে বোঝে না একটা চালু দোকানের দোকানদার অনর্থক বেশি দাম চেয়ে নাম খারাপ করতে চায় না। তাই বিটুকে ফের মুখের তুবড়ি ছোটাতে হয়।

বিটু কি ক্লান্তি বোধ করে? হতাশা? বিরক্তি?

না। বিটু জানে সে আর কোনওদিনই ভারতের এক নম্বর ব্যাটমিন্টন খেলোয়াড় হতে পারবে না। বিটু জানে সে আর কখনও হতে পারবে না কোনও সিনেমার নায়ক। বিটু জানে পৃথিবীর ভালোবাসা বলে আর কিছু নেই। আছে শুধু অন্তহীন কেনা -বেচা। আছে লাভ-লোকসান নামক কিছু উত্তেজনা।

প্রবীর।

বলুন বিটুদা।

বিটঠলভাইয়ের আড়তে গিয়ে মালগুলো একটু নিয়ে আয়। লিস্ট করে রেখেছি।

যাচ্ছি।

স্টক মিলিয়ে দেখেছিস তো। আর কিছু লাগবে?

এ সপ্তাহটা চলে যাবে। গ্লিসারিন সাবানটা কম আছে। নুডলসের প্যাকেট আর নেলপালিশটাও।

লিস্টে ওগুলোও লিখে নে। পরের সপ্তাহে দাম বাড়তে পারে। স্টক রাখা ভালো। আর সম্পদ স্টোর্সে ব্লেডের দামটা জেনে আসিস তো। তিন টাকা ডজন দিচ্ছে কী করে পৌনে তিন টাকায় কিনে?

ঠিক আছে। বলে প্রবীর নামক উনিশ কুড়ি বছরের দীন এবং বিনয়ী চেহারার ছেলেটি খুব নরম স্বরে বলে, একবার বাড়ি যাবেন না দাদা?

বাড়ি! কেন?

ঝিন্টু কী বলে গেল শোনেননি?

ঝিন্টু! ওঃ!

একবার যাবেন না?

এখন না। যাব'খন। তুই মালগুলো নিয়ে আয়।

দশটা বেজে গেছে। অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ বসে গেছে। এই সময়টায় খদ্দের কিছু কম। গিন্নিবান্নি গোছের কয়েকজন খদ্দের আসতে পারে। তাদের সুখময়-ই সামলাতে পারবে। দোকানটা আগের চেয়ে একটু বড় হওয়াতে এখন দুজন সেলসম্যান রাখতে হয়েছে বিটুকে।

সুখময় নতুন। বয়স কম, একটু অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে দাম বলতে ভুল করে। ওজন করার হাতও পাকা নয়। তাছাড়া বড্ড কামাই করে। ওর ভরসা বড় একটা করা উচিত নয়। তবে এ সময়টায় সুখময়ই সামলাতে পারবে।

বিটু সকালে দোকানে আসে বলে বাড়িতে খবরের কাগজ পড়ার সময় পায় না। তাই দোকানে সে একখানা করে কাগজ রাখে। শিলিগুড়িতে কলকাতার খবরের কাগজ আসে বিকেলের দিকে প্লেনে। কাজেই বিটুকে স্থানীয় দৈনিকটি রাখতে হয়। চার পৃষ্ঠার কাগজ তবে সব রকম খবরই থাকে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে।

প্রথম পৃষ্ঠায় বিটুর পড়ার কিছু নেই। রাজনীতি, বক্তৃতা আর দুর্ঘটনার খবর। সে খোলে খেলার পৃষ্ঠা। ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে প্রকাশ পাড়ুকোন সেমি ফাইন্যালে হেরে গেল।

এখন তার নিজেরই বিশ্বাস হয় না যে, অনেকদিন আগে জব্বলপুরে সে এই প্রকাশের সঙ্গে খেলেছিল। খুবই ভালো খেলেছিল সে। তবে স্ট্রেট সেটে হারতে হয়েছিল তাকে। কেন হেরেছিল তা হারের দিন বুঝতে পারেনি সে। নিজস্ব অ্যাটাকিং গেম খেলে সে অগ্নীবর্ষী সব স্ম্যাশ-এ মাটি কাঁপিয়ে দিয়েছিল সেদিন। পায়ের কাজও ছিল ভালো। প্লেস করেছিল নানা কোনে বুদ্ধি খাটিয়ে। কিন্তু মুশকিল হল প্রকাশ একটুও অ্যাটাকিং গেম খেলেনি শুধু অনায়াস দক্ষতায় তার স্ম্যাশগুলো তুলে তুলে দিচ্ছিল। বারবার লম্বা মার মেরে তাকে ঠেলে দিচ্ছিল বেস লাইনে। স্ম্যাশ করে তার ফলো-আপ করতে গিয়ে বেদম হয়ে পড়ছিল বিটু। দ্বিতীয় গেমেই বুঝতে পেরেছিল তার বিরুদ্ধে খেলছে একটি রোবট। রোবট ক্লান্ত হয় না, ঘাম ঝরায় না, রোবটের খেলায় আছে নির্ভুল ধারাবাহিকতা। বিটু পারবে কেন? বহুদিন ধরে খেলাটা বিশ্লেষণ করে দেখেছে সে। আধুনিক ব্যাডমিন্টনে বা যেকোনও খেলারই মূল কথা হল স্ট্যামিনা, ফিসনেস এবং কন্ট্রোল। প্রকাশের সঙ্গে, দাপু বা রমেন ঘোষ, পার্থ গাঙ্গুলি বা অরুণ ব্যানার্জি কার সঙ্গেই বা খেলেনি বিটু? বিভিন্ন টুর্নামেন্টে এক আধজন অল ইন্ডিয়া খেলোয়াড়কে সে প্রায়ই পেয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। খুব বড় অঘটন ঘটাতে না পারলেই এক-আধবার জিতেও গেছে। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের সেমি-ফাইনালে সে হারিয়েছিল তৎকালিন চ্যাম্পিয়নকে। ফাইনালে হেরে গেল উঠতি যে খেলোয়াড়ের কাছে সেই খেলোয়াড় টানা তিন-তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

সুখময় এক কাপ চা এনে সামনে রাখল।

বিটু চায়ে একটা চুমুক দিয়ে প্রকাশের খবরটা আবার পড়ল।

বিদেশে সত্যজিৎ রায় যদি প্রাইজ পায়, রবিশংকর যদি বাহবা কুড়োয়, প্রকাশ পাডুকোন যদি জেতে, হকিতে যদি ভারত সোনা আনে অলিম্পিক থেকে, ক্রিকেটে যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারায় এবং গাভাসকার যদি ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙে একমাত্র তখনই নিজেকে কিছুক্ষণ ভারতীয় বলে মনে হয় বিটুর। আর কোনও সময়ে এটা হয় না।

এখনও হচ্ছিল না। প্রকাশ সেমিফাইনালে হেরে গেছে। হেরে তো বিটুও যেতে পারে। হারার জন্য তো প্রকাশকে পাঠানো হয়নি!

আরে আসুন ভটচায্যিদা। কী খবর?

একটা মশার ক্রিম দাও তো বিটু। তোমার খবর কী?

এই তো, চলে যাচ্ছে।

গেলেই ভালো। তোমার বউয়ের কি বাচ্চা কাচ্চা হবে নাকি?

বিটু একটু বিনয়ের হাসি হাসল।

ভটচায ওডোমসের দাম দিতে দিতে বলে, এই তো প্রথম, না?

না। আগেও একবার ইয়ে হয়ে গেল।

আহা রে। সবই ভবিতব্য।

আপনার কলকাতা যাওয়ার একটা কথা শুনেছিলাম না?

আজই যাচ্ছি। আর সেইজন্যই তো ওডোমস কেনা। বুঝলে আজকাল ট্রেনের কমপার্টমেন্টে পর্যন্ত দারুণ মশার উৎপাত।

জানি। আগে ছিল ছারপোকা।

আজকাল মশা! কলকাতাতেও ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে মশা। আগে মফসসলে মশা ছিল, কলকাতায় ছিল না। আজকাল উলটো। কেন জানো?

না।

গাঁয়ে গঞ্জে ফসলের পোকা মারতে বিষ দেয়, তাতে মশাও সাফ হয়ে গেছে। কলকাতায় তো আর তা নেই। যে শালার বিয়েতে যাচ্ছি সে থাকে যাদবপুরে। সেখানে যে কী মশা না দেখলে বিশ্বাস করবে না। গত পুজোয় গিয়েছিলাম, রোদে বসে দাড়ি কামাচ্ছি, দেখি পায়ের পাতায় একসঙ্গে সার দিয়ে দশ থেকে বারোটা মশা বসে ভোজ খাচ্ছে।

বিটু বিনয়ের সঙ্গে হাসল। আগড়ম বাগড়ম কথা দোকানিকে শুনতেই হয়। নিয়ম।

যাওয়ার সময় ভটচায বলে গেল, দেশে অ্যাডমিনস্ট্রেশন বলে আর কিছু নেই, বুঝলে। যা কন্ডিশন তৈরি হয়েছে তাতে মানুষ বেশিদিন টিকবে না। ওই মশা-মাছিই থাকবে।

চায়ের তলানিটুকু গঙ্গায় ঢেলে বিটু আবার খবরের কাগজ খোলে। খেলার পাতা। বাংলা বিহার রঞ্জি ট্রফি ম্যাচের খবর পড়তে থাকে।

টিকটিক করে একটা কিছু নড়ে তার ভিতরে। ঝিন্টু খবর দিয়ে গেছে সোমার পেইন উঠেছে। তার একবার যাওয়াটা বোধহয় দরকার। কাজটা শক্তও নয় কিছু। রিকশায় গেলে তিন-চার মিনিট।

বিটু!

মফসসল শহরের এই এক দোষ। বেশিরভাগ লোকই চেনা। বিটু ব্যস্ত হয়ে বলে, আরে দুলুদি! ময়নাগুড়ি থেকে কবে এলেন?

পরশু। তোর কী খবর? শুনলাম বউয়ের বাচ্চা হবে!

বিটুকে কথা বলে যেতে হয়। কী বলছে তা সবসময়ে বিটু বুঝতেও পারে না। অর্থহীন সংলাপ সম্পূর্ণ না ভেবে-চিন্তে চালিয়ে যায়। কিন্তু বলে খুব কনফিডেনস নিয়ে। বাকযন্ত্রের এরকম অপব্যবহার বুঝি আর হয় না।

বিটু পরিষ্কার বুঝতে পারে, এই যারা আসে, কথা বলে, জিনিস কেনে তারা কেউ পুরোনো বিটুকে মনে রাখেনি। যে বিটু একসময়ে প্রকাশ পাডুকোনের সঙ্গে খেলেছিল, যে বিটুর সিনেমার নায়ক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরা বিটুকে চেনে কেবল দোকানদার বলে।

দুলুদি একখানা ক্রিমের টিউব কিনল। তারপর বলল, কালই চলে যাচ্ছি।

কালই? কেন ক'দিন থেকে যাননা।

না রে। কর্তাকে তো জানিস। আমি ছাড়া চলে না।

বিটু খবরের কাগজটা ফের টেনে নেয়।

কিন্তু পড়তে পারে না। বারবারই টিকটিক করছে কী একটা। সোমা! সোমার পেইন উঠেছে। সেটা বড় কথা নয়। মেয়েদের তো বাচ্চা হয়েই থাকে।

তবে সোমার একটু বুকের দোষ আছে। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছিল, বাচ্চা হতে গিয়ে বিপদ ঘটতে পারে। তার কি একবার যাওয়া উচিত?

আজকাল গভীর একটা আলস্য এসেছে বিটুর। শরীরে নয়, মনে। কিছুই যেন তাকে চমকে দেয় না, নড়তে পারে না। সংসারে যাই ঘটুক তার মনে একটুও বুজকুরি কাটে না কোনও ঘটনা। নিজের এই নির্লিপ্ততা দেখে নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয় বিটু। দু-তিন বছর আগেও যে বিটু এশহরে দাবড়ে বেড়াত তার সঙ্গে আর এই বিটুর দেখা হলে কেউ কাউকে চিনতেই পারবে না।

৬

শাশুড়ির অসুখ, একটু দেখতে যাওয়া উচিত। কিন্তু মন্টু বুঝতে পারে না সে গিয়েই বা কী করবে। মঞ্জরী তাকে বারবার বলে গেছে বটে, অফিসের পরই সোজা গিয়ে মহানন্দায় মোড় থেকে মিনিবাস ধরবে। ভুল যেন না হয়। মা তোমাকে দেখতে দেয়েছে।

শাশুড়ির বোধহয় শেষ অবস্থা। কিন্তু তিনি মন্টুকে দেখতে চান কেন সেটাই প্রশ্ন। ভয় অবশ্য তাঁর একটা আছে। জামাইয়ের বৈরাগ্যব্যাধির কথা তিনি জানেন। যদি জামাই কখনও সংসার ছেড়ে হিমালয়-টিমালয়ে লম্বা দেয় তো তাঁর মেয়েটির কী দশা হবে।

মন্টু তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি যে, এই বিশাল জীবজগতে হরেক প্রাণের নিত্যি নতুন খেলায় কোথায় একটি প্রাণ নিবে গেল, কোথায় আর একটি জ্বলে উঠল তাতে জগতের ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। যে একবার এই জগতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে সেই জানে ব্যক্তিগত মৃত্যু কোনও ঘটনাই নয়। যেমন নয় বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী নাই বা হল মন্টু, যদি আজই অফিস থেকে ফেরার পথে অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় তাহলে কি দুনিয়া অচল হয়ে যাবে? নাকি দিন কাটবে না মঞ্জুরির? পৃথিবীতে অপরিহার্য তো কেউ নয়।

উনি অবশ্য এসব খুবই মন দিয়ে শোনেন। আবেগে চোখের জল মুছে বলেন, তুমি বড় জ্ঞানী বাবা, বড় জ্ঞানী। তবে কি জানো, আমরা সংসারী মানুষ, তত্ত্ব দিয়ে সংসারীদের কি বিচার হয়?

মন্টু টের পায় বৈরাগ্য তো নয়ই বরং সংসার এবং বিষয় তাকে এক মস্ত অজগরের মতো পাকে পাকে জড়াচ্ছে আরও। দেব না-দেব না করেও অফিসারের পরীক্ষা দিয়েছিল মন্টু। এক চান্সে হয়ে গেল। মালদা থেকে সটান পাঠিয়ে দিল শিলিগুড়ি। মন্টুর ইচ্ছে ছিল সংসার থেকে একটু দূরে থাকে। বিশেষ করে স্ত্রী মঞ্জুরির কাছে থেকে। স্ত্রী-সঙ্গকে সে পাপ মনে করে না বটে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে থাকা মানেই ধ্যান থেকে দূরে নিক্ষেপ হওয়া। ভ্যানর ভ্যানর ভ্যাজর ভ্যাজর নানা তুচ্ছাতি-তুচ্ছ অভিযোগ অনুযোগ নালিশ ও পরনিন্দা শুনতে শুনতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় সে। অবিরল তার ভেতর এক রক্তক্ষরণ হতে থাকে। শিলিগুড়িতে বদলি না হলে খুব ভালো হতো। সে চেয়েছিল সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের বদলে এই বদলির চাকরি একরকম ভালো। সে নিজে রেঁধে খেত। একলা ঘরে বসে নিত্য পূজা পাঠ করে কাটিয়ে দিতে পারত। শিলিগুড়িতে আসতে হল বোধহয় কর্মফল কাটাতে।

বেলা সাড়ে দশটা বাজতে চলল। এখন অফিসে হাজিরায় বিস্তর ফাঁক। অধিকাংশ কাউন্টার এবং টেবিলেই লোক নেই। আমানতকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। অধৈর্যের নানা শব্দ আসছে।

মন্টু একটু চিন্তিতভাবে চারদিকে তাকায়। ভারি অস্বস্তি বোধ করে। ধর্মের মধ্যে নানা কথা থাকে। সবই প্র্যাকটিক্যাল কথা। একটা হল, যথাসময়ে যথাবিহিত কর্তব্যটি কোরও। মন্টু এক মিনিটও দেরিতে অফিসে আসে না। ডিসিপ্লিন কথাটার মূলে আছে ডিসাপেল কথাটা। শিষ্যত্ব। আগের দিনে গুরুগৃহে শিষ্যত্ব নিয়ে বহু কষ্টে শিখতে হতো আত্মশাসন। এখন কে কাকে শেখায় আর কে-ই বা শেখে?

মন্টু পাশের টেবিলে টেলিফোন? বারসাতেক বাজার পর করচৌধুরী টেলিফোনটা তুলল। অনেক আগেই তুলতে পারত। বসে বসে খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল।

গাঙ্গুলি, আপনার ফোন।

মন্টু হাত বাড়িয়েই ফোনটা নাগালে পায়। শাশুড়ির কিছু হয়ে গেল নাকি?

মিত্র নার্সিংহোম থেকে বলছি। আপনার মা কথা বলবেন।

মা! কী হয়েছে মা-র?

সুমনার ঘাবড়ানো গলা পাওয়া গেল, মেজো বউমাকে ভরতি করে দিলাম।

কেন, পেইন উঠেছে নাকি?

হ্যাঁ, কিন্তু হার্টটাও বোধহয় ভালো না। ডাক্তার ই সি জি করাতে নিয়ে গেছে। একজন হার্ট স্পেশালিস্টকে খবর দেওয়া হয়েছে। একবার আসতে পারবি?

পারব। ঘন্টাখানেক পরে গেলে হবে তো?

তা হবে। বিটুকে খবর দিয়ে দিয়ে আনতে পারিনি। পারলে তাকেও নিয়ে আসিস।

ঠিক আছে।

আমি তাহলে বাড়ি চলে যাই।

যাবে? যাও না।

তোর বাবাকে ভাতটুকুও বেড়ে দিয়ে আসতে পারিনি। জনার্দন কী দিতে কী দেয়, ছেলেমানুষ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে যাও। তোমার ওখানে আর কাজই বা কী?

তুই কিন্তু আসিস বাবা। ডাক্তারের কাছে অবস্থাটা একটু বুঝে যাস।

মন্টু ফোন রেখে দিল। মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল তার। সোমা মেয়েটিকে বড় স্নেহ করে সে। বড় দুঃখী মেয়ে। দুঃখীদের মুখে ভগবানের ছাপ থাকে। এ কথা ঠিক যে দুঃখী ব্যাপারটা মানুষ পছন্দ করে না। ধর্মের উদ্দেশ্যই হল দুঃখকে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু এমন কিছু দুঃখ আছে যা আনন্দের চেয়েও গভীর। যে দুঃখের ভিতর দিয়ে ভগবান ধরা দেন তা কি পরিত্যাগযোগ্য?

মন্টু সংসার-উদাসীন বটে, কিন্তু সোমা আর বিটুর সম্পর্কটা সে টের পায়। বিটুটা, একদম অন্যরকম হয়ে গেছে, আজকাল। দোকান ছাড়া আর কোনও দিকেই মন নেই। বউটার প্রতি তার কোনওদিনই কোনও মনোযোগ নেই। অথচ মেয়েটা বিয়ের আগেও এক দুঃখের জীবনযাপন করে এসেছে। বিয়ের পরও তাই। কী যে হবে! এত অনাদরেই বুঝি মেয়েটার শরীর সারে না। ওই অনাদরেই বুঝি জন্ম দিয়েছে দুরারোগ্য হৃদরোগের।

এক-একদিন সোমাকে উপনিষদ বোঝায় বা গীতা শোনায় এবং ব্যাখ্যা করে। মেয়েটা ভাশুরকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে বটে কিন্তু এইসব ধর্মগ্রন্থ পাঠে তেমন আগ্রহ বোধ করে না। কেমন শক্ত হয়ে জোর করে বসে থাকে মাত্র।

ভাইয়ের বউ হলেও সোমাকে মা বলেই ডাকে মন্টু। বেশিরভাগ মহিলাকেই সে মাতৃ সম্বোধন করে। মা ডাকের মতো ডাক নেই। যে ডাকে তারও শুদ্ধি হয়, যে শোনে তারও শুদ্ধি হয়। একদিন সে সোমাকে বলল, মাগো, তোমার কি ধর্মে বিশ্বাস নেই?

সোমা অনেকক্ষণ চুপ করে গোঁজ হয়ে বসে থেকে বলল, ঠিক বুঝতে পারি না।

কেন মা? কোনটা শক্ত?

সবটাই ভীষণ শক্ত মনে হয়।

মন্টু মৃদু মাথা নেড়ে বলে, ধর্মের মতো সহজ স্বাভাবিক আর কিছুই নয়। এ তো বাক্সে তুলে রাখার জিনিস না, এ নিত্য চর্চার ব্যাপার। যদি ধর্মকে জীবনের সব আচার-আচরণের মধ্যে অনুবাদই না করা গেল তবে ধর্ম দিয়ে মানুষের কোনও লাভ নেই। ধর্ম একটা ফলিত জিনিস, একটা হওয়ার ব্যাপার। শুধু শুনলে শক্ত তো লাগবেই। কিন্তু যদি করে দেখ, যদি চর্চা করো তা হলে দেখবে শ্বাস চলার মতো স্বাভাবিক।

সোমা তর্ক করেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করেছিল শুধু।

মেয়েটা তর্ক জানে না। ঝগড়া জানে না, কুচুটেপানা নেই, এক অবোধ ভীরু চাউনি আছে শুধু। মেয়েটাকে কেন যে বিটু অত অবহেলা করে! বিটু আর মঞ্জুরিকে নিয়ে যে গুজবটা আছে তা সবই জানে মন্টু। যূথীর কাছে শুনেছে, মায়ের কাছেও খানিকটা। বাকিটা আন্দাজ করে নিতে তা কষ্ট হয়নি। কিন্তু মন্টু এমন এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছোতে পেরেছে যেখানে ঈর্ষার জ্বলুনি নেই, রাগ নেই, দখলদারি নেই। সে ঘটনাটি শুনেই ওদের ক্ষমা করেছে। সে জানে কৃতকর্মের জন্য মানুষের অনুশোচনা না এলে বাইরের গঞ্জনা দিয়ে কর্মফল কাটে না।

মন্টু হাফ ডে ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে উঠে পড়ল। গিয়ে ঢুকল এজেন্ট কর্মকার সাহেবের ঘরে।

ছুটি! হঠাৎ ছুটি কেন গাঙ্গুলি?

একটু দরকার আছে। বাড়ির লোকের অসুখ। কার? আপনার ওয়াইফের?

না, ভাইয়ের স্ত্রীর।

ভাই মানে বিটু তো? তার বউ তো আমাদের সোমা! তার আবার হল কী?

বাচ্চা হবে। হার্টটাও ভালো না।

আপনি জানেন না সোমাকে আমি এইটুকু থেকে দেখছি। আমিও চা-বাগানের ছেলে তো। ওর মামা আর আমি বানারহাট স্কুলে পড়তাম। ওর মামা অবশ্য আমার চেয়ে বছর কয়েকের সিনিয়র।

তাই নাকি! বলেননি তো কখনও।

আপনি তো মশাই সদ্য বদলি হয়ে এলেন। আপনার পর আমি এসে জয়েন করেছি। বলার সুযোগ হয়নি বলে বলিনি। সোমার হার্টের অসুখ ছিল জানতাম না তো! অবশ্য

হতেই পারে। যা অত্যাচার ওর ওপর করত।

মন্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। সোমার সঙ্গে যখন বিটুর সম্বন্ধ হচ্ছিল তখনকার একটি ঘটনা মন্টুর খুব মনে পড়ে। একদিন বিকেলের দিকে সোমার মামা এসেছেন বিয়ের কথাবার্তা বলতে। হঠাৎ জামার বোতাম খুলে পইতেগাছা বের করে হাতে জড়িয়ে নিয়ে জোড়হাত করে কেঁদে ফেলে বলে উঠল, আমার ভাগনিটাকে সংসারের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করুন। এর বেশি আর কিছু বলার নেই আমার।

বড় কষ্ট হয়েছিল মন্টুর। নিজের স্ত্রীর কথা ভদ্রলোক ভেঙে বলেননি। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ওই ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

কর্মকার জরুরি কাজ সারতে সারতে বললেন, বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

মন্টু বসল।

কর্মকার কাগজপত্র সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, আপনি তো ধার্মিক মানুষ বলে সবাই বলে। আমার ছেলের কুষ্ঠিটা একদিন একটু বিচার করে দেবেন?

মন্টুর হাসি পেল। ধর্ম আর জ্যোতিষকে অনেকেই এক করে দেখে। অনেকে আবার ভাবে ধর্ম মানেই অলৌকিক ঘটনাবলি। এই অজ্ঞতার বুঝি শেষ নেই। সে বলল, আমি জ্যোতিষচর্চা করিনি তো কখন!

সে কী মশাই? জ্যোতিষ না জানলে ধর্ম করেন কীসের?

মন্টু একটু হাসল, ধর্ম আর কী-ই বা করি বলুন তবে জ্যোতিষের সঙ্গে ধর্মের তেমন কোনও যোগাযোগ আছে বলে জানি না ও একটা আলাদা শাস্ত্র, খানিকটা বিজ্ঞান, খানিকটা অনুমান। অদৃষ্ট মানে যা দৃষ্ট নয়, যা অগোচর। আমার তো মনে হয় সৎ কাজ করে গেলে তার ফল পাওয়া যায়ই। সৎকর্মী কখনও অমঙ্গল হয় না। একদিন আগে আর পাছে।

কুষ্ঠি বলে কিছু বিশ্বাস করেন না?

করি। তবে প্রাচীন শাস্ত্রে যে ক'টা গ্রহের উল্লেখ আছে তা ছাড়াও আরও গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে পরে। সুতরাং জ্যোতিষ শাস্ত্র পুর্ণাঙ্গ নয়।

যাঃ, আপনি যে একেবারে জল ঢেলে দিলেন মশাই। আমি ভাবছিলাম একদিন আপনাকে নিয়ে জমিয়ে বসব কুষ্ঠি-ফুষ্টি পেতে।

না, আমি ওসব তেমন জানি না।

ঠিক আছে। তাহলে একদিন ধর্ম আলোচনাই শোনান আমাদের। আমার বাড়িতে। আমার স্ত্রী আবার ভীষণ সন্তোষী মা-র ভক্ত।

আজকাল অনেকেই।

হুজুগ, না?

তা একরকম বলা যায়।

শুক্রবারে তো মশাই উপোসটুপোস করে সে এক পেল্লায় কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

মন্টু বিনীতভাবে একটু হাসল।

কর্মকার মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি চলে যান। সোমা কি নার্সিংহোম আছে?

বিকেলের দিকে একবার যাব'খন।

৭

ড্রেনের ওপর বাঁশের চ্যাটাইয়ের সাঁকোটা ঝিন্টুর খুব অদ্ভুত লাগে। একটু উঁচু রাস্তা থেকে এবড়ো খেবড়ো জমি নেমে গেছে। তার পরই মস্ত ড্রেন। তার ওপর সাঁকো। যখন নতুন ছিল তখন একরকম। এখন জরাজীর্ণ। বাঁধন খুলে গেছে, বাচ্চা ছেলেরা বাঁখারি টেনে বের করে নিয়ে খেলা করেছে, সাঁকোটার ওপর এখন বিপজ্জনক গর্ত। সাইকেলে পার হওয়া খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু ঝিন্টুকে সে কথা কে বোঝাবে? সে ওই উঁচু রাস্তা থেকে সাইকেল গড়িয়ে প্রচণ্ড স্পিডে নেমে আসে। ধুলো উড়িয়ে, মচাক মচাক শব্দ তুলে সাঁকোটা পার হয় প্রায়ই।

পর্ণা রাগ করে, খুব বাহাদুরি, না! একদিন যখন উলটে পড়বে তখন তো প্রেস্টিজ পাংচার্ড।

সকলেরই যেমন থাকে তেমনি ঝিন্টুরও একজন আছে। পর্ণা। খুব ডাঁটিয়াল মেয়ে কাউকে পাত্তা দিত না এতকাল। ঝিন্টুর সঙ্গেই প্রথম। তবে ডাঁটিয়াল হলেও পর্ণারা গরিব। শহরের একটু বাইরে গরিবদের পাড়ায় সরে এসে বাড়ি করতে হয়েছে ওর বাবাকে। বাড়িটাও তেমন দেখনসই নয়। পাকা ঘর, টিনের চাল। পর্ণার বাবা যে কী করে তা বলা মুশকিল। সোজা কথায় বলা যায় ধান্দাবাজ। যেখানেই কোনও কাজ কারবার হচ্ছে সেখানেই গিয়ে টুঁ মারা ভদ্রলোকের স্বভাব। এই ধান্দাতেই সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তার মধ্যেই দেখা যায় জ্যোতিষচর্চা করছেন, হোমিওপ্যাথি করছেন, বাড়ির দালালি করছেন।

পর্ণা ঝিন্টুর চেয়ে নীচুতে পড়ে। মুখখানায় শ্রী আছে। চোখ দুখানা ভারী মায়াবী। ঝিন্টুর বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল ওকে। আজও লাগে। তা বলে যে পর্ণার সঙ্গেই গাঁটছাড়া বাঁধতে হবে এমন নয়। ঝিন্টুর একটু আপত্তি আছে পর্ণার বাবাকে নিয়ে। ফোর টুয়েন্টি শ্বশুর তার পছন্দ নয়। তার ওপর পর্ণারা কায়স্থ। অন্য জাতের বউ বাড়িতে নিয়ে তুললে তুলকালাম হবে। তাই ঝিন্টু ওসব ভাবে না। ভাববার দরকারও নেই। তার বিয়ের এখনও ঢের দেরি।

পর্ণাদের বারান্দায় পা ঠেকিয়ে সাইকেল দাঁড় করিয়ে ঘনঘন দুবার ঘণ্টি দিল ঝিন্টু। পর্ণা আজ কলেজ যাবে না, কথা ছিল।

পরদা সরিয়েই পর্ণা বলল, এই মাংস খাবে?

কীসের মাংস?

আহা! কীসের আবার, খাসির। আমি রাঁধছি।

ওরে বাবা। তুমি রাঁধছ তার মানে খাসিটার মরেও সুখ নেই।

ইয়ার্কি কোরও না। বোসো, আসছি।

ঝিন্টু ঘরে ঢুকে চারদিকে রোজকার মতো চেয়ে দেখল। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না বলে একটা উদ্ভট প্রবাদ আছে। প্রবাদটার অবশ্য কোনও মানে হয় না। ঝিন্টুর তো মনে হয় প্রচুর শাক দিয়ে এক টুকরো মাছ অনায়াসেই ঢাকা যায়। ড্যাম ইজি। তবু পর্ণাদের এই ঘরে ঢুকলে তার প্রবাদটা মনে পড়বেই। কারণ এই ঘরে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার একটা প্রাণান্তকর প্রয়াস তার চোখে পড়ে। দেওয়াল থেকে বেশি বালি মেশানো পলকা পলেস্তারা খসে যাচ্ছে, চৌকাঠের কাঠ ফাটছে, জানালা দরজার রং চটে যাচ্ছে, তবু বাঁধানো এমব্রয়ডারি ঝোলে দেওয়ালে, লেস লাগালো ঢাকনায় ঢাকা হয় সস্তায় টেবিল, নড়বড়ে চৌকির বিছানায় বেশ ঝকঝকে বেডকভার পাতা। এলেবেলে একটা কাচ বসানো আলমারিতে গুচ্ছের মাটির পুতুল। এ সবই ঝিন্টুর একটু বাঁকা চোখে এবং সকৌতুকে লক্ষ করে। গরিবদের ঘরে দেখা যায় পরদাটা বাহারি হবেই। পর্ণাদেরও তাই। ভারী উজ্জ্বল সব উদ্ভট ফুল ছাপা পরদা ঝুলছে।

পর্ণা নয়, ঘরে ঢুকলেন ওর ফোর টুয়েন্টি বাবা। হাতে ঘটিভরা জল, পরনে ভেজা গামছা, চোখে ধান্দাবাজের চাউনি।

এই যে, বোসো বোসো। পর্ণা বোধহয় রান্নাঘরে।

দেখা হয়েছে!

হয়েছে? বাঃ।

ভদ্রলোক ঘটিটা ঘরের কোণে রাখলেন। কাঁধ থেকে নিংড়ানো ধুতিটা চট করে বারান্দার তারে মেলে দিয়ে একটা লুঙ্গি গলিয়ে ফের ঘরে ঢুকে গিঁট মারতে মারতে বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে সেদিন সারদা ক্লথ হাউসে দেখা। তুমি নাকি ওয়ার্ল্ড টুরে যাচ্ছ!

ইচ্ছে আছে।

বেশ বেশ। সাইকেলে গেলে বোধহয় পাসপোর্ট লাগে না, না?

লাগে।

পৃথিবীটা খুব বড়। বিশাল। যাও, দেখে এসো। আমাদের লাইফে অ্যাডভেঞ্চার বলে তো কিছু নেই। ওনলি টু পাইস। আচ্ছা, বিটুর বউয়ের নাকি হার্টের কিসব ট্রাবল

শুনছিলাম!

হ্যাঁ।

এদিকে তো আবার প্রেগন্যান্সি। বড় মুশকিল। ভেরি ডেলিকেট কেস।

আমি একটা ওষুধ রেখেছি বেছে। নিয়ে যাবে নাকি? প্রসবের ব্যথা উঠলেই দিতে হবে।

উঠেছে।

উঠেছে? সর্বনাশ! কবে?

আজ সকালে। এতক্ষণে বোধহয় নার্সিংহোমে-এ নিয়েও গেছে।

ইস পালসেটিলা থার্টিটা সকালেই পড়া উচিত ছিল। একেবারে পাকা আমের মতো প্রসব হয়ে যেত। নার্সিংহোম-এ কি হোমিয়োপ্যাথি চলবে?

ঝিন্টু জানে লোকটা ধূর্ত। সাবাই জানে বউদির জন্য মা, নিশ্চয়ই ওর কাছে ওষুধ চায়নি। কিন্তু ধান্দাবাজটা নিজেই একটা যোগসূত্র খুঁজছে। কাছে ঘেঁষতে চাইছে। এরকম শ্বশুর হলে ঝিন্টুকে আত্মহত্যা করতে হবে।

ঝিন্টু পা নাচিয়ে বলল, হোমিয়োপ্যাথি একটা বোগাস জিনিস।

লোকটা চটল না। দেওয়ালের গায়ে লটকানো কাঠের ফ্রেমের মধ্যে তেড়াবেঁকা আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নির্বিকার মুখে বলল, হোমিয়োপ্যাথি হলে পরমাণু তত্ব। তোমরা অ্যাটমিক এজ-এর ছেলে হয়ে পরমাণুর শক্তি মানো না?

পরমাণুর সঙ্গে হোমিয়োপ্যাথির কোনও মিল নেই। পরমাণু একটা এনার্জি আর হোমিয়োপ্যাথি একটা ধাপ্পাবাজি।

পর্ণার বাবা যে চটবেন না তা ঝিন্টু জানে। এই সব ধান্দাবাজরা সহজে চটে না। চটলে এদের চলে না। তাছাড়া চটবেই বা কেন, এর তো কোনও আদর্শবোধ নেই, ব্যক্তিত্ব নেই।

পর্ণার বাবা হাতের মাদুলিটা সেট করে দিয়ে বলল, অনেকেই বলে বটে, তারা জানে না। জিনিসটা জানলেই তবে বোঝা যায়—

এই ঝিন্টু, চলে যাওনি তো— বলতে বলতে পর্ণা ঘরে ঢুকল। বাবাকে দেখেও বিশেষ গ্রাহ্য করল না। হাতে একটা ছোট প্লেট। তাতে ধোঁয়া ওঠা অনেকটা মাংস।

ঝিন্টুর ভারী কষ্ট হল দেখে। অত মাংস সে এমনিতে খাবে না। কিন্তু অতটা যে নিয়ে এসেছে তাও চক্ষুলজ্জাবশে। মাংসের কেজি এখন বাইশ বা চব্বিশ টাকার কম নয়। সম্ভবত পর্ণাদের বাড়িতে পাঁচশো গ্রামের বেশি আসেনি। ওদের ফ্যামিলি মেম্বার তো কম নয়। তবু সেই টানটান পরিমাণ থেকে যতটা পারে তুলে এনেছে শুধু গরিব বলে প্রমাণিত না হওয়ার জন্যই।

ঝিন্টু মাথা নেড়ে বলল, মাংস খেয়েই কাল রাত থেকে পেট আপসেট। দেখলেই গা শিরশির করে। নিয়ে যাও সামনে থেকে।

পর্ণা ফ্যাকাশে হয়ে বলে, খাবে না? এ মা!

কী বললাম তাহলে? খাওয়ার উপায় নেই। তবে গন্ধটা দারুণ ছেড়েছে। রিমার্কেবল। ঘ্রাণেই অর্ধভোজন হয়ে গেল।

ইস দেখ তো!

ফোর টুয়েন্টিটা আর দাঁড়াল না। চট করে ভিতরবাড়িতে সেঁধিয়ে গেল।

পর্ণা বলল, তাহলে রেখে আসি?

প্লিজ রেখে এসো।

কত কষ্ট করে করলাম। খেলে না।

আহা, যদি তেমন কপাল হয় তবে তোমার রান্নাই তো হোল লাইফ খেতে হবে।

কী আমার সুখের কথা রে। হোল লাইফ ওঁর জন্য রাঁধতে হবে! ইঃ বয়ে গেছে।

আর আমাকে যে সে রান্না কষ্ট করে খেতেও হবে সেটাও কি কম কথা?

পর্ণা মাংস রেখে আসতে গেল। একটু বাদে আঁচলে মুখের তেলঘাম মুছতে মুছতে ঘরে এসে বলল, বিটুদার বউয়ের নাকি পেন উঠেছে? বাবা বলছিল।

তোমার বাবাটা পর্ণা, মাইরি একটা ফোর টুয়েন্টি।

অ্যাই! ভ্যাট ওসব বলতে নেই।

আমাকে হোমিয়োপ্যাথি বোঝাচ্ছিল।

তা বোঝাক না শুনে গেলেই তো হয়। কম-জানা হোমিয়োপ্যাথরা একটু বেশি বকবক করেই।

ঝিন্টু হেসে ফেলল। বলল, তা বটে।

তোমার মেজো বউদির চোখ দুখানা কিন্তু ফ্যান্টা।

বউদিটা খুব আনহ্যাপি।

শুনেছি। বিটুদা নাকি একটু নেগলেকট করে।

এ শহরে কারও কোনও সিক্রেট থাকে না কেন বলো তো! সবাই সকলের ঘরের কথা জানে।

সোমা বউদির কথা তুমিই বলেছো আমাকে মশাই।

কবে?

একদিন সাইকেলের রডে আমাকে বসিয়ে আনছিলে তিলক ময়দানে ফাংশানের পর। রিকশা পাওয়া যায়নি সেদিন। মনে আছে?

ওঃ, মে বি।

তখন তোমার রডওলা সাইকেলটা ছিল। পুরোনোটা।

একটু মাথা নাড়ল ঝিন্টু। চোখের সামনে ঝক করে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য। মহারাষ্ট্রের এক অখ্যাত অজ্ঞাত জায়গায় রাস্তার ধারে আগাছার জঙ্গলে সাইকেলটা আজও কি পড়ে আছে? জং ধরছে তাতে? মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে?

মনটা ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে গেল। ঝিন্টু উঠে বলল, চলি পর্ণা।

কোথায় যাচ্ছো এখনই?

যাই একটু শহরটা টহল দিই গে।

এত টহল দাও কেন বলো তো! সাইকেল যে তোমার শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেল। দুচোখে দেখতে পারি না তোমার সাইকেল।

ওয়ার্ল্ড ট্যুর করে ফিরে এলে যখন খবরের কাগজে নাম বেরোবে তখন বুঝবে সাইকেলের মহিমা।

সাইকেল আমার সতীন।

হাসতে হাসতে ঝিন্টু উঠল।

বাইরে তো ঘরের অবরোধ নেই। অবারিত পৃথিবী। উত্তরে ওই দেখা যায় পৃথিবীর উত্তুঙ্গে ঢেউ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝকঝক করে জ্বলছে রোদে। পাহাড় মিন্টুকে ডাকে। তাকে ডাক পাঠায় সমুদ্র। জঙ্গল। মাঠ। প্রান্তর। দেশ ও বিদেশ। সাইকেল তাকে ডেকে নিয়ে যাবে দূর-দূরান্তে। একদিন খুব বেশি বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগেই যে নাগপুরের কাছে সেই জায়গাটায় যাবে। বহু খুঁজতে হবে তাকে। তবু খুঁজে দেখবে তার পুরোনো সাইকেলখানা তখনও সেখানে পড়ে আছে কি না।

দুঃসাহস ছাড়া কেউ এভাবে বাঁশের চ্যাটাইয়ের সাঁকো দ্বিতীয়বার প্রবল গতিতে পার হয় না তারপর দুরূহ অসম্ভব চড়াই ভেঙে খানাখন্দ পার হয়ে উঠে আসবে রাস্তায়। ঝিন্টুকে শিলিগুড়ির লোকেরা যে সাইকেল জাগলার বলে তা এমনিতে নয়। রোজ এইভাবেই সাইকেলে এই পথটুকু নামে এবং ওঠে ঝিন্টু। লোকে অবাক মানে। কিন্তু তারা দেখেনি, ঝিন্টু কলেজের পাঁচ-সাতটা সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় উঠে যেতে পারে সাইকেলে। এক দেড় ঘণ্টা অনায়াসে সাইকেল স্থির রেখে বসে থাকতে পারে সিটে। গোলপোস্টের ক্রসবারের ওপর সাইকেল চালিয়ে লোককে তাক লাগিয়েছে ঝিন্টু। চালিয়েছে তারের ওপর। সাইকেল তার অঙ্গীভূত স্বাভাবিক, সহজাত। পৃথিবীতে সাইকেল আবিষ্কার না হলে ঝিন্টু বোধহয় জন্মগ্রহণই করত না।

পিছনের চাকায় একটু হাওয়া কম আছে। কাঞ্চার দোকানে হাওয়া ভরে নিল সে।

পাম্প করতে করতেই রিকশায় আর একজন ফোর টুয়েন্টিকে যেতে দেখল। ধর্ম-গেঁড়ে, ধান্দাবাজ, পুরুষত্বহীন। লোকটা তার বড়দা মন্টু। ছেলেবেলা থেকেই ঝিন্টু শুনে আসছে তার বড়দার মধ্যে নাকি বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকট, একদিন লোকটা নাকি সাধু হয়ে যাবে। আজও হয়নি, আজও হব হব করছে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, ভালো চাকরি, ব্যাঙ্ক ব্যালন্স,

শরীরে সুখের মেদ। তবু লোকটা নাক হাফ-সাধু হাফ-গেরস্থ। খুবই হাসি পায় ঝিন্টুর। মাঝে মাঝে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, ঈশ্বর আছেন জলে, আছেন অগ্নিতে, আছেন প্রতি পরমাণুতে...ইত্যাদি। এ আর এক হোমিওপ্যাথি। আছেন তো বুঝলাম বাবা, কিন্তু মালটিকে বের করে দেখাও চাঁদু। গদগদ স্বরে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে 'আছেন' বললেই তো হবে না।

ধর্ম-বাতিকের জন্য লোকটার বোধহয় সেক্স ফোর্সও করে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। আর সেই জন্য বড় বউদি এক সময়ে তিতিবিরক্ত হয়েই জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ধরে পড়েছিল মেজদা বিটুকে। কেলেংকারিয়াসে কাণ্ড আর কাকে বলে। শহরে ঢি ঢি। সেই ছিঃছিক্কারেও এই ধর্মের ষাঁড়ের চৈতন্য হল না। দিব্যি নির্বিকার ঠান্ডা মেরে নানা বাতিক করে যাচ্ছে।

আজকাল ধরেছে সেজো বউদি সোমাকে। আহা সোমার বড় দুঃখ। সোমা বড় হতভাগিনী। সোমা বড় একা। তাই সোমা-উদ্ধার করতে বেদ বেদান্ত গীতার কচকচি ঝেড়ে যাচ্ছে। ঝিন্টুর পাপী মন। তার সন্দেহ হয়, লোকটার মধ্যে অবরুদ্ধ সেক্স একটা নির্গমনের পথ খুঁজছে। সোজা পথে বেরোতে পারছে না। অতএব বাঁকা পথ। সোজা কথায় বিকৃতি। বোধহয় সোমার সাহচার্যে লোকটার মানসিক ভাবে যৌনতৃপ্তি হয়। এরকম হতেই পারে।

রিকশাটা ঘ্যাচ করে থামল।

এই, এই ঝিন্টু।

ঝিন্টু সাইকেল ঝড়াকসে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, কী বড়দা?

কোথায় যাচ্ছিস?

সাইকেলে হাওয়া দিচ্ছিলাম।

বউমার খবর শুনেছিস তো।

শুনেছি।

অবস্থা খুব ভালো নয়।

কেমন অবস্থা?

অপারেশন মানে সিজারিয়ান করা দরকার। কিন্তু হার্টের কন্ডিশন ভীষণ খারাপ।

ঝিন্টু একটু ভাববার ভান করে বলল, তা আমাদের কী করার আছে?

করার নেই?

ঝিন্টু বাধো বাধো গলায় বলে, মানে বলছিলাম, আমরা তো লে ম্যান, মেডিকেল ম্যানরা যা করার তা তো করবেই। খামাখো আমাদের ব্যস্ত হওয়ার দরকার কী?

বড়দা একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে? তারপর বলল, বিটুকে খবর দিয়েছিলি?

দিয়েছি।

এল না কেন?

কিছু বলল না তো।

আমি নার্সিংহোম-এ যাচ্ছি। তুই বিটুকে ধরে নিয়ে আয়।

ঝিন্টু এ ব্যাপারটা একদম বোঝে না। কারও অসুখ হলে আত্মীয়রা অকারণ অস্থির হতে থাকে! কিন্তু বোঝে না যে, তারা ডাক্তার না হলে অসুখের ব্যাপারটা তাদের হাতে নেই। অনেক সময় ডাক্তার হলেও নেই। মেডিকেল সায়েন্স সীমাবদ্ধ জিনিস। তবু নিজেরা উদ্বিগ্ন হবে এবং সবাইকে খুঁচিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। বউদি নার্সিংহোমে আছে, চিকিৎসাও হচ্ছে। তবু একে ডাক, ওকে ডাক। বিরক্তিকর।

সাইকেলে উঠে ঝিন্টু বলল, যাচ্ছি।

দোকানটার নাম লাভ স্টোর কে রেখেছিল যেন। তার বাবাই। হ্যাঁ, যৌবনে যখন কলকাতায় ল' পড়তেন তখন তাঁর এক গরিব বন্ধু লাভ স্টোর নামে এক দোকান খুলে ধাঁ করে বড়লোক হয়ে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি থেকেই নামটা রাখা। ইংরিজিতে সাইনবোর্ড, সুতরাং লোক ভাবে লাভ মানে প্রেম। আসলে তো জানে না ওই লাভ-এর ধ্বনিসাদৃশ্যের বাংলা শব্দটির মানে হল নাফা বা মুনাফা। তার মধ্যে কোনও রোমান্টিক ব্যঞ্জনা নেই। এঅলওভিই নয়, নিতান্তই ল-এ আকার আরম্ভ।

৮

ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টি বাজছে। ঝিন্টু।

মেজদা, বউদি নার্সিংহোমে। এখনও যাওনি যে!

বিটু ঝিন্টুর দিকে তাকাল। বলল, গিয়ে কী হবে?

ঝিন্টু বিরক্ত মুখে বলে, বড়দা তোমাকে বলতে বলল যে, বউদির অবস্থা খারাপ। তোমার একবার যাওয়া দরকার।

খারাপ? কীরকম খারাপ?

খুব খারাপ, হার্ট ট্রাবল হচ্ছে।

বিটু হাতের কাগজটা ভাঁজ করে রেখে বলল, সেদিনই তো ইসিজি করানো হয়েছে। নরম্যাল। আজ আবার কী হল?

জানি না। আমি যাচ্ছি। তুমি চলে এসো।

দাঁড়া দাঁড়া। দোকান ফেলে এখনই যাওয়ার উপায় নেই। দুপুরে যখন বাড়িতে খেতে যাব তখন নার্সিংহোম হয়ে যাবো। আর যদি তেমন বুঝিস তবে সাইকেলে করে এসে খবর দিয়ে যাস। বুঝলি?

ঝিন্টু সাইকেলটা রেখে নেমে এসে বলল, দোকান আমি দেখছি। তুমি গিয়ে ঘুরে এসো।

পারবি?

এ আবার না পারার কী? সুখময় আর প্রবীর আছেই।

প্রবীর নেই! তাকে মাল আনতে পাঠিয়েছি। সুখময়টা নভিস।

তবু আমি পারব। তুমি যাও।

বিটু বুঝল, কেস জটিল। ভ্যাবলার মতো বোধবুদ্ধিহীন চোখে কিছুক্ষণ ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, মরে-ফরে যায়নি তো অলরেডি?

আরে না। তাহলে আমি এত নরম্যাল থাকতাম নাকি?

পিন্টু কোথায়?

সকালে বোধহয় বউদিকে বাসে তুলে দিতে গিয়েছিল। তারপর এখনও ফেরেনি।

বিটু উঠে বলল, তাহলে বোস। আমি তোর সাইকেলটা নিয়ে যাচ্ছি।

সাবধানে চালিয়ে যেও।

কেন সাবধান হওয়ার কী আছে?

এটা তো তুমি চালাওনি কখনও। গিয়ার সিস্টেম। টপ করে স্পিড উঠে যায়। তার ওপর যা রাস্তা।

তুই পারলে আমিও পারব। একটু ঝাঁঝের গলায় কথাটা বলে বিটু বেরিয়ে এল। সেদিনকার ছোকরা সব বিটুকে সাইকেল চেনাচ্ছে।

ঝিন্টুর বয়সে বিটুও কিছু কম সাইকেলবাজ ছিল না। শুকনা থেকে একবার সাইকেলে পাহাড়ে অবধি অনেকখানি উঠে গিয়েছিল। সত্য বটে আজকাল সে আর সাইকেল চালায় না। তার স্কুটার আছে। তবে সেটা কয়েকদিন হল খারাপ হয়ে গ্যারেজে পড়ে আছে।

বিটু সাইকেলে উঠেই বুঝল, ঝিন্টু কিছু বাজে কথা বলেনি। সাইকেলটায় আচমকাই স্পিড ওঠে। ঝিন্টু রাখে যত্নে। নিয়মিত তেল-টেল দেয়, ঝাড়ে মোছে। এই-ই ওর স্বভাব। যা কিছু ওর আছে সব জিনিসের প্রতিই ওর প্রগাঢ় যত্ন। পারতপক্ষে নিজের জিনিসে ও কাউকে হাত দিতে দেয় না। বিটুকে যে সাইকেলটা দিল তার কারণ হল বিটু তার স্কুটার ওকে প্রায়ই চড়তে দেয়।

নিউ মার্কেট অবধি ভিড়েও বেশ চলে এল বিটু। মোড় ঘুরবার সময় ঘ্যাচাং করে পেছনের চাকাটা একটা রিকশার সঙ্গে বেঁধে গেল। বিটু পা ঠেকিয়ে পতন আটকাল বটে, কিন্তু লক্ষ করতে দেরি হল না যে পিছনের চাকার একটা স্পোক বেঁকে গেছে। দামি সাইকেল।

রিকশাওয়ালাটা বেকুবের মতো চেয়েছিল। বিটু এবং তার ভাইদের বোধহয় খানিকটা চেনে।

সাইকেল থেকে নেমে রাগে অন্ধ বিটু চটাং করে চড় কষাল বেকুবটার গালে।

বাপ রে! বলে লোটা মুখটা চেপে ধরল দুহাতে।

বিটু বাঁহাতে চুলের মুঠিটা ধরে আরও দু-চারটে রদ্দা কষাতেই লোক জমে যেতে লাগল চারদিকে।

শুয়োরের বাচ্চা! গাঁজা খেয়ে রিকশা চালাস?

মারটা একটু বেশি হয়ে গেল বুঝি। বিটু চুলটা ছাড়তেই লোকটা মাটিতে বসে পড়ল, তারপর হিক্কা তোলার মতো একটা অদ্ভুত জান্তব শব্দ তুলতে লাগল গলায়।

এতক্ষণ লক্ষ করেনি বিটু, রিকশায় একজন অল্প বয়সি মেয়ে বসে আছে অদ্ভুত সুন্দর চেহারা। মেয়েটার মুখে কেমন ঘাবড়ানো সাদা ভাব। অপলক চোখে দৃশ্যটা দেখেও বাক্যহারা হয়ে, চোখের পলক অবধি ফেলছে না।

লোকজন রিকশাওয়ালাটাকে টেনে ওঠানোর চেষ্টা করল। একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, কী হয়েছে বিটুদা?

দ্যাখ না শুয়োরের বাচ্চা ঝিন্টুর দামি সাইকেলটা বরবাদ করে দিল।

ঝিন্টুর সাইকেল? ও বাবা। দেখি দেখি, এঃ, স্পোকটা একদম গেছে।

বিটু মেয়েটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেও লজ্জা পেল মনে মনে। একটু চিনতেও পারল। পরশু কি তার আগের দিন লাভ স্টোরে একটা টমেটো কেচাপ আর নুডলস কিনতে এসেছিল। শহরে বোধহয় নতুন। আগে দ্যাখেনি।

একটা খদ্দের বোধহয় হাতছাড়া হয়ে গেল তার। যদি অবশ্য মেয়েটা তাকে চিনে থাকে।

বিটু ফের সাইকেলে ওঠার সময়েও লক্ষ করল, রিকশাওয়ালা মাটিতে বসেই আছে। উঠতে পারছে না। হিক্কার মতো শব্দটা হচ্ছে।

কিন্তু বিটু আর অপেক্ষা করল না। সাইকেলে উঠে পড়ল। বাঁকা স্পোক ফ্রেমে ঘষটাচ্ছে। অস্বস্তিকর একটা শব্দ। স্পিড নিচ্ছে না। হ্যান্ডেল কাঁপছে। বিটু নামল। সামনেই সুশীলদের বাড়ি। বারান্দায় উঠে হাঁক মারল, বেলা, এই বেলা।

সুশীলের ছোট বোন ছুটে এসে বলে, বিটুদা?

এই সাইকেলটা তোদের বাড়ি রেখে যাচ্ছি। ঝিন্টু এসে পরে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা। তুলে রাখব ঘরে।

বিটু রাস্তায় এসে রিকশা নিল।

এ শহরের রিকশাওয়ালারা তার হাতে কিছু কম মার খায়নি। বেয়াদবি করলেই চড়টা চাপড়টা অনায়াসে কষিয়েছে। তখন কোনও অনুশোচনা হতো না, মনে কষ্ট হতো না। এখন কিন্তু একটু হল। অ্যাকসিডেন্টে দোষ যতটা রিকশাওয়ালার, ততটা তারও। কিন্তু না মারলে রাগটা যেত না। ঝিন্টুর দামি সাইকেল ও কাউকে ধরতে দেয় না, তাকেও খুব

সদিচ্ছার সঙ্গে দেয়নি। তার ওপর সেও যে এক সময়ে একজন দারুণ সাইকেলবাজ ছিল তা আর তেমন বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না ঝিন্টুর কাছে।

ঝিন্টু সাইকেল ভালোই চালায়, বিটু জানে। ঝিন্টু আরও অনেক কিছুই ভালো জানে। ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেনিস। কতটা ভালো তা অবশ্য পরীক্ষা করে দেখেনি বিটু। শুনেছে। এবার নাকি ওয়ার্ল্ড ট্যুরে যাওয়ারও তোড়জোড় করছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে জমা হল বিটুর।

নার্সিংহোমের ফটকেই রোদে দাঁড়িয়ে আছে মন্টু। মুখচোখে সাঙঘাতিক উদ্বেগের ছাপ।

বিটু রিকশা থেকে নামতে নামতে বলল, কী রে?

অবস্থা খুব খারাপ।

কতটা খারাপ?

স্পেশ্যালিস্ট এসে দেখে গেছে। বলেছে চান্স ফিফটি ফিফটি। হার্ট দুর্বল বলে সিজারিয়ানও করা মুশকিল।

বিটু এসব শুনল উদাস মুখে।

মন্টু বলল, বাবাকে বোধহয় একটা খবর দেওয়ার দরকার।

বাবাকে কেন?

একবার এসে দেখে যেত।

দেখতে কি দেবে?

কি জানি।

বিটু মাথা নেড়ে বলে, দেবে না। ওকে রেখেছে কোথায়?

ওটি-তে। অক্সিজেন দিচ্ছে। বিমলকে একটু খবর দিবি?

বিমল?

ওই যে কন্ট্রাক্টর। দারুণ হোমিয়োপ্যাথ শুনেছি।

এখন এই অবস্থায় হোমিয়োপ্যাথি?

হোমিওপ্যাথি সকলে সবার শেষেই করায়। যখন অ্যালোপ্যাথি ফেল করে।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু মিত্র কি অ্যালাউ করবে?

করবে। আফটার অল ক্ষতি তো নেই।

দেখি।

বিটু আবার একটা রিকশায় উঠল। রিকশাওয়ালাটা ঝুঁকে পেডাল মারছে। পিছন থেকে দেখে একটু চমকে উঠল বিটু। এইটে সেই রিকশাওয়ালাই নয় তো, যাকে একটু আগে সে মেরেছে? ভালো করে দেখার জন্য ঝুঁকে বসল বিটু। তারপর বুঝল, না। এ নয়। এ অনেক বাচ্চা। তবে চেহারায় তেমন বৈশিষ্ট্য থাকে না বলে এদের সকলকেই কেমন যেন একরকম লাগে।

৯

সুমনা কাপড় ছেড়ে সবে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, পিন্টু এল।

কোথায় যে থাকিস।

কী হল মা?

সোমাকে এই নার্সিংহোমে ভরতি করে দিয়ে এলাম। হার্টের ব্যথা উঠেছে। কী যে হবে! আলায় বালায় কোথায় ঘুরিস বল তো। সেই বড় বউমাকে বাসে তুলে দিতে কোন সকালে বেরিয়েছিস, আর এই ফিরলি! যা গিয়ে একটু মুখটা দেখিয়ে আয় নার্সিংহোমে। তোকে দেখলে একটু তটস্থ হবে সবাই।

পিন্টু জানে মা ঠিকই বলছে। এখনও সে গিয়ে দাঁড়ালে শিলিগুড়ির লোক তটস্থ হয়। তবে এই প্রভাব কতদিন থাকবে তা বলা কঠিন। এখন যুগ দ্রুত পালটায়। পরের জেনারেশনের ঢেউ এসে আগের জেনারেশনের সব চিহ্ন মুছে দেয়। সে যদিও নিতান্তই যুবাপুরুষ, তবু যুবতররাও এসে গেছে। রাজনীতি আজকাল এক মস্ত ক্যারিয়ার। চাকরির চেয়ে বহু বহুগুণে ভালো জিনিস। সুতরাং আজকাল রাজনীতিতে বেজায় ভিড়। দলে দলে এসে জোটে। তীব্র প্রতিযোগিতা। এই বাজারে প্রভাব প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখা শক্ত।

পিন্টু বলল, যাচ্ছি। ছোট বউদির অবস্থা কি খারাপ নাকি?

কি জানি বাবা, রোগা মেয়ে। বাচ্চা হওয়ার ধকল সইতে পারা কি চাট্টিখানি কথা। তার ওপর হার্টের ব্যামো। বিয়ের আগে ভালো করে খোঁজখবর করা উচিত ছিল। হুট করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল, এখন পস্তাও।

কথাটা শুনে পিন্টু খুশি হল না। একটু ঝাঁঝ দিয়ে বলল, নিজের মেয়ে বলে একটু ভেবে দ্যাখো তো। তাহলেই দেখবে আর দুঃখ থাকবে না। পরের মেয়ের হরেক দোষ।

তোকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না। এখন যা, গিয়ে দেখ কিছু করতে পারিস কি না?

ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

পিন্টু বাইরে ফের রিকশা থামাল একটা। একটা বিধ্বস্ত লাশকাটা ঘরের ধ্বংসস্তূপে কংক্রিটের টেবিলটা আজও দাঁড়িয়ে আছে—এই দৃশ্যটা সে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না আজ। ছোট বউদিটা কি বাঁচবে? চান্স খুব কম। কিন্তু মেয়েটা বড় ভালো ছিল। দেমাক-টেমাক নেই, দেওরদেরও ভাসুরের মতো করে সম্মান-টম্মান করত। আসলে বোধহয় খুব ভীতু। গরিবের ঘরের অনিশ্চয়তা থেকে, নিপীড়ন থেকে হঠাৎ এক সম্পন্ন পরিবারে অধিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রেণিগত দূরত্বটা ঘোচাতে অসুবিধে হচ্ছিল বোধহয়। খুব খাটে মেয়েটা। রোগা শরীর আর দুর্বল হৃদযন্ত্র নিয়েও প্রাণপাত পরিশ্রম করে। কুয়ো থেকে জল তোলা, কাপড় কাচা, গুল দেওয়া নিজে থেকেই করে যেত। অত কাজ করার দরকার নেই তার। বোধহয় নিজেকে ভুলে থাকার জন্য করে। পিন্টু ফেরে অনেক রাতে। কোনওদিনই

রাত বারোটার আগে খায় না। বরাবর তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে। এই বউদিটি সেই নিয়ম ভেঙে প্রতি রাতে তাকে গরম ভাত খাওয়ায়। প্রথম প্রথম তাকে আপনি-আজ্ঞে করত, পিন্টু ধমক দিয়ে ছাড়িয়েছে। বউদি হলেও বয়সে পিন্টুর চেয়ে ঢের ছোট। তবু নববর্ষে বা বিজয়ায় বয়সে ছোট বউদিকে সে প্রকৃত ভক্তিভরে প্রণাম করে।

কে জানে কে, এ বাড়িতে পিন্টুর একটু অনাদর আছে। বিটু যেমন মায়ের প্রাণ, ঝিন্টু তেমনি বাবার আদুরে। বড়দা মন্টুকেও সকলে খুব সুনজরে দেখে। শুধু পিন্টুই ঘরকা, না ঘাটকা। একটু উড়নচণ্ডী, বারমুখো, পলিটিক্সবাজ ছেলে বলেই হয়তো। কিংবা কে জানে কী। সংসারে আদরের বড় তোয়াক্কাও করে না পিন্টু। সে চায় জনসাধারণের আদর, সমর্থন এবং ভোট। মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ ইত্যাদি তার কাছে ফালতু হয়ে গেছে কবে থেকে। সংসার হচ্ছে একটা বদ্ধ জলাশয়। তাতে জল পচে, গন্ধ হয়। বাইরে জগৎ হচ্ছে সমুদ্রের মতো বিশাল। পচন নেই, আবদ্ধতা নেই, অবিকল ঢেউ আর ঢেউ।

তবু সংসার এই একটা মানুষ যে তাকে আদর জানায় সেটাই বা ভোলে কী করে পিন্টু? সে তো অকৃতজ্ঞ নয়।

রিকশা থেকে একটু ঝুঁকে পড়ল পিন্টু, এই দাঁড়া! দাঁড়া! কী হয়েছে রে?

একটা রিকশাকে ঘিরে মেলা ভিড়। পিন্টু নেমে পড়ল।

একটা মুখচেনা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, পিন্টুদা! যাক বাবা, বাঁচা গেল।

কী হয়েছে?

একটা রিকশাওয়ালাকে একটু আগেই বিটুদা কয়েকটা চড়চাপড় দিয়েছিল।

ব্যাটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

চড়চাপড় দিল কেন?

সাইকেলে ধাক্কা দিয়েছিল।

পিন্টু দুহাতে ভিড় সরিয়ে এড়িয়ে যায়। রিকশাওয়ালাটা মাটিতে পড়ে আছে। কেউ জল-টল দিয়েছিল মুখে। মাথা মুখ জামা সব ভেজা। ভিড়ের মধ্যে সুন্দরমতো একটা মেয়ে খুব অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

পিন্টু ভিড়টাকে একটা ধমক দিল, হাঁ করে মজা দেখছেন সবাই। যান যান পাতলা হন। অ্যাই এদিকে এসে ধর তো, আমার রিকশায় তুলে দে।

পিন্টুর কাছে এসব জলভাত। পলিটিক্স করে করে তার মনের জড়তা ভেঙে গেছে। শহরে বা যেখানেই যা কিছু ঘটুক সে চট করে যথা কর্তব্য করতে এবং দায়িত্ব নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। রিকশায় লোকটাকে তুলে পিন্টু তাকে জড়িয়ে ধরে বসল।

মেয়েটা এগিয়ে এসে বলল, শুনুন, ওকে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

কেন বলুন তো?

আমি ওর রিকশায় ছিলাম। আমি পুলিশে একটা ডায়েরি করতে চাই।

পিন্টু বিনা দ্বিধায় বলল, করবেন। আমি ওকে হসপিটালে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

আপনার নামটা?

পিন্টু, পিন্টু গাঙ্গুলি।

ভিড়ের ভিতর থেকে দু-চারজন বলে উঠল, আরে আরে আমাদের পিন্টুদা, পিন্টুদাকে সবাই চেনে দিদি, ভাববেন না।

পিন্টু বলল, আপনি?

আমি শচী চক্রবর্তী। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশের লেকচারার। নতুন এসেছি।

পিন্টু একটু হেসে বলল, মনে থাকবে। এই রিকশা, চল।

পুলিশে ডায়েরি করবে। এঃ। পিন্টু, আপনমনেই একটু মুখ ভেঙাল। রিকশাওয়ালাটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর উনি স্টাইল মেরে দাঁড়িয়ে মুখে প্যাথস ফোটাচ্ছেন, এই তো সিমপ্যাথি। সিমপ্যাথি থাকলে আগে পুলিশের কথা না ভেবে চিকিৎসার কথা ভাবতিস।

লোকটা একটু গোঙাল। কেমন করুণ কাতর শব্দ।

পিন্টু লোকটাকে ভালো করে ধরে রইল। ঘাড়টা লটপট করছে। বিটুটা যে দিন দিন কী হচ্ছে!

পিন্টু শুনেছে, জাপানে রাস্তায় ঘাটে ছোটখাটো অ্যাকসিডেন্ট হলে কেউ কারও সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়া করে না। দুপক্ষই গায়ের ধুলো ঝেড়ে পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে যে যার পথে চলে যায়। ভারী সুসভ্য জাত। আর এখানে সকলেই সকলের প্রতি মুখিয়ে আছে। কিছু হলেই খ্যাঁক।

পিন্টু জানে, রিকশাওয়ালাদের ওপর এরকম নির্যাতনের পিছনে কারণটা অর্থনৈতিক। ছোটলোককে ভদ্রলোকেরা হ্যাটা করবেই। যদি এরা সংগঠিত হতো। শ্রেণিগতভাবে কিছু মর্যাদা পেত তাহলে এরকমটা ঘটতে পারত না। রিকশাওয়ালাদের একটা ইউনিয়ন আছে বটে। কিন্তু রিকশা যেমন কমজোরি যান রিকশাওয়ালাদের ইউনিয়নটাও সেইরকম।

হাসপাতালের দিকে যেতে যেতে পিন্টু সমাজব্যবস্থার হাজারো ফুটোর কথা ভাবতে থাকে। কবে যে পলিটিকসে প্রাণ আসবে, কবে যে জেগে উঠবে দেশটা, কবে যে সচেতন হবে মানুষ!

হাসপাতালে রুগি ভরতি করা পিন্টুর কাছে কোনও সমস্যা নয়। আউট ডোরের ডাক্তার দেখে-টেকে বলল, হেড ইনজুরি বলে মনে হচ্ছে।

কেসটা কি সিরিয়াস?

দেখা যাক। ভরতি তো করে দিই। নামধাম জানেন?

না। কেয়ার অফ পিন্টু গাঙ্গুলি করে দিন। জ্ঞান হলে নাম বলবে।

ডাক্তারের ভ্রূকুটি কুটিল মুখখানা অনেকক্ষণ ধরে চোখের সামনে ভাসল পিন্টুর। কী যেন নাম বলল মেয়েটা? শচী চক্রবর্তী। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভাসিটির ইংলিশের লেকচারার। একটু স্পিরিটেড মেয়ে কী? খোঁজ নিতে হবে।

রিকশাওয়ালাটার যদি ভালো-মন্দ কিছু হয় তাহলে রাস্তার লোক কেউই বিটুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে যাবে না। কিন্তু মেয়েটা গড়বড় করতে পারে। আহাম্মক বিটু বড্ড বেমক্কা মেরে বসেছে কমজোরি আধুবুড়ো লোকটাকে।

১০

ব্রহ্মকুমার রায়টা খুব নির্বিকারভাবেই শুনলেন। তাঁর মক্কেল জিতেছে। কিন্তু যাকে এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জেতালেন ব্রহ্মকুমার সে একটি ঘড়েলস্যে ঘড়েল। চোতা দলিল আর ব্রহ্মকুমারের গলাবাজির জোরে একটা পুরো সুপুরিবাগান গাপ করে নিল। ওই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আর একগাল ভ্যাটকানো হাসি নিয়ে বসে আছে। তবে কে কীরকম তা আর ভাবেন না ব্রহ্মকুমাব। মক্কেলমাত্রই লক্ষ্মী। মক্কেল মানেই সজ্জন।

ব্রহ্মকুমার কাগজপত্র ব্রিফকেসে ভরলেন। আর একটা শুনানি ছিল আজ। ডেট পিছিয়ে দিয়েছেন। নার্সিংহোমে একবার না গেলেই নয়। সংসারে বড্ড ঝামেলা। শুধু মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে থাকতে পারতেন তো বেশ হতো।

বাইরে আসতেই মক্কেলটা ঢিপ করে প্রণাম করল।

জোর লড়ে দিলেন উকিলবাবু।

ব্রহ্মকুমার জোর করে একটু হাসলেন। লোকটার পিছনে আর একজন চামচা গোছের লোক। তার হাতে মস্ত সন্দেশের বাক্স। মক্কেল বাক্সটা নিয়ে ব্রহ্মকুমারের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, একটু মিষ্টিমুখ করবেন। সুপুরিও দিয়ে যাব'খন কিছু।

দিও।

বাঁধা রিকশাওয়ালা খগেন এগিয়ে এল গাড়ি নিয়ে। ব্রহ্মকুমার উঠলেন।

তাঁর মেজো বউমাটি ভালো না মন্দ সঠিক জানেন না ব্রহ্মকুমার। কথাটথা বিশেষ বলেননি কখনও। তবে মেয়েটির গলার আওয়াজ কদাচিৎ পাওয়া যায়। যারা চুপচাপ থাকে তাদের একটু সমীহ করেন ব্রহ্মকুমার। তবে তিনি লোকমুখে শুনেছেন, মেয়েটি ভালোই। তাঁর স্ত্রী সুমনা কারোই বিশেষ প্রশংসা করেন না। কিন্তু তিনিও এই মেয়েটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলেন না। তিনি আরও শুনেছেন, তাঁর ছেলে বিটুর সঙ্গে বউমার সম্পর্কও ভালো নয়। কিন্তু ব্রহ্মকুমার এর বেশি আর কিছু অবয়ব, আধচেনা কিছু মানুষ মাত্র, সম্পর্কও নিতান্তই ক্ষীণ।

লাভ স্টোরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ব্রহ্মকুমার রিকশা থামিয়ে নামলেন। দোকানটা বেশ ঝকঝকে। প্রচুর জিনিস। কিন্তু কাউন্টারে ঝিন্টু কেন?

ঝিন্টুকে জিগ্যেস করার আগেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মেজদা নার্সিংহোমে গেছে। আমি দোকান দেখছি।

ও। বলেই ব্রহ্মকুমারের কথা ফুরিয়ে গেল। ছেলের সঙ্গে আর কী কথা বলা যায় তা ভেবেই পেলেন না।

কিছু বলবে বাবা?

না, এই একটু খোঁজ নিয়ে গেলাম। বিক্রিবাটা কেমন?

খুব ভালো।

খদ্দের তো নেই দেখছি।

এ সময়টায় খদ্দের হয় না। সন্ধেবেলা দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না।

তাই নাকি? বাঃ।

আবার রিকশায় এসে বসলেন ব্রহ্মকুমার। কিন্তু খগেনটা কোথায়?

এই তো ছিল। বিড়ি-টিড়ি খেতে গেল নাকি? চারদিকে তাকিয়ে খগেনকে খুঁজতে লাগলেন ব্রহ্মকুমার। কোথায় যে যায়!

রিকশাটা আপনা থেকেই একটু পিছিয়ে গেল। তারপর থামল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই খগেন এসে সিটে চেপে বসল আবার। টাটকা বিড়ির গন্ধ পেলেন ব্রহ্মকুমার।

হুট করে কোথায় গিয়েছিলি?

কয়েকজন ডাকল, একটা হাঙ্গামা হয়েছে।

হাঙ্গামা? কীসের হাঙ্গামা?

একজন রিকশাওয়ালাকে খুব মেরেছে। হাসপাতালে দিতে হয়েছে। বিকেলে রিকশা স্ট্রাইক হতে পারে।

কে মারল?

বিটুবাবু।

বিটু? বলিস কী?

তাই তো বলছে সবাই।

ব্রহ্মকুমার ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

কেন মেরেছে জানিস।

সাইকেলের সঙ্গে নাকি ধাক্কা লেগেছিল।

ব্রহ্মকুমার বললেন, সাবধানে চালাস। তোরাও বড্ড রেকলেস। এমন চালাস যে মনে হয় তোরা বুঝি ট্রাক ড্রাইভার।

মনে মনে ব্রহ্মকুমার ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন, গর্ভস্রাব। গর্ভস্রাব!

নার্সিংহোমে নামতেই তিন ছেলে এগিয়ে এল।

কী খবর রে?

মন্টু বলল, ভালো নয়।

ভালো! ভালো বলে কি কিছু আছে তাঁর জীবনে? নিজের মনে যে একটু নিজের কাজ নিয়ে থাকবেন, তার উপায় নেই। সংসার খাবলা মারে, নিয়তি এসে চিমটি কাটে, দুর্ভাগ্য আড়ালে হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকে। বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, কাকে বলে মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছিস!

বিটুকে একটু বিবর্ণ দেখায়। মিনমিন করে বলে, ঝিন্টুর দামি সাইকেলটার বারোটা বাড়িয়েছে। তাই দু-একটা চড়াচাপড় দিয়েছিলাম রেগে গিয়ে।

কী সব শুনছি। স্ট্রাইক-ফাইক হবে নাকি।

পিন্টু বলল, ও নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি জগার সঙ্গে কথা বলেছি।

জগা কে?

রিকশা ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

কী বলল?

রিকশাটার পারমিট ছিল না। রিকশাওয়ালাটাও নতুন। কেউ তেমন চেনে না। ম্যানেজ করা গেছে।

ব্রহ্মকুমার সন্দেশের বাক্সটা নিয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বড় ছেলের দিকে বাক্সটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা রাখ।

এর পরেই তাঁর কথা ফুরিয়ে গেল। কী বলতে হবে বা কীরকম মুখভাব করতে হবে তা বুঝতে পারছেন না। ভ্রূ কুঁচকে একটা দুশ্চিন্তার ভাব ফোটানোর চেষ্টা করলেন। ফুটল কিনা কে জানে।

হঠাৎ জলপাইগুড়ির মক্কেলের কথা মনে পড়ল। পিন্টুর দিকে চেয়ে ছেলেদের বললেন, জলপাইগুড়ির মামলাটায় তোকে অ্যাটেন্ড করতে বলেছিলাম না!

পিন্টু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, পার্টির একটা মিটিং ছিল।

সেটা আমায় জানাতে কী হয়েছিল?

পিন্টু অধোবদন হল। কিন্তু ব্রহ্মকুমার আর কিছু বলতে পারলেন না। ছেলেদের তিনি কখনও শাসন করেননি। কী করে বকাবকি করতে হয় সেই প্রসেসটাই জানেন না।

তিন ছেলে ও তাঁর মধ্যে এক অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। অস্বস্তিকর নীরবতা। যেন চারজন আগন্তুক পরস্পর পরিচয়বিহীন দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তার কপালে চিনচিনে ঘাম। চোখে উদ্বেগ। দুটি নিপুণ হাত রক্তাক্ত দক্ষ গহ্বর থেকে একটা মানুষের ছানাকে বের করে আনল। একজন নার্স হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল বাচ্চাটাকে?

হার্ট?

ও.কে.।

পালস?

ও.কে.।

যাক, বেঁচে গেল বউটা। এ যাত্রায় বেঁচে গেল। বিটুকে ডাক্তার সাবধান করে দেবেন, আর যেন বাচ্চা না হয়।

ডাক্তার খুব দ্রুত হাতে সেলাই করতে লাগলেন!

বড়লোকেরা সহজে মরে না। তারে জন্যই নার্সিংহোম, দামি ওষুধ, ভালো ডাক্তার, ভালো খাদ্যদ্রব্য। গরিবেরা হাসপাতালে যায়। সেখানে অনন্ত ও গভীর এক নরক। ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তার কুকুর ও বেড়াল, পড়ে আছে মেঝেময় মল-মূত্র-বমি, বেড প্যান দেওয়ার লোককে কখনও ডেকে পাওয়া যায় না, ইউরিন্যাল বা বাথরুমে যাওয়ার পথ থইছই করছে মলমূত্রে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে ইনফেকেশন ঘটছে, সেখানে এমন সব খাবার দেওয়া হয় যা গরিবেও গলা দিয়ে নামাতে পারে না। দু-একজন ডাক্তার আছে, যারা ওই নরকেও মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে। আছে কয়েকজন নিষ্ঠাবতী নার্স। কিন্তু তারা হাস্যকর রকমের সংখ্যালঘু। ওই অনন্ত ও গভীর নরকে বসে তারা ঈশ্বরকে ডাকে।

ডাক্তার বাসু হাসপাতালের ডাক্তার। তিনি জানেন। আর জানেন বলেই শহরে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক চিকিৎসার জায়গা তিনি খুঁজে নিয়েছেন। এই নার্সিংহোম যাঁর তিনিও বাসুর সিনিয়র ডাক্তার। ডাক্তার মিত্রর সঙ্গে বাসুর এই নিয়ে কথা হয়। বাসুর বয়স কম, রক্ত তেজি, অন্যায় অবিচারের নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব তাঁর মধ্যে এখনও প্রবল। মফসসলের আর এক হাসপাতালে তাঁর কর্মীজবনের শুরুতে তিনি ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে লটকে দামি ওষুধ পাচার হয়ে যাওয়ার দুষ্টচক্র ভাঙতে এবং রোগীর পথ্য নিয়ে মামাদোবাজি রুখতে তিনি কোমর বেঁধে লাগেন। ফলে তাঁরই অধস্তন কর্মচারীরা দল বেঁধে একদিন চড়াও হল। অকথ্য গালাগাল, চড়চাপড় আর প্রাণনাশের হুমকি খেয়ে তিনি হতভম্ব। শেষ অবধি কলকাতায় গিয়ে হেলথ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে সব বলে বিহিত চান। মন্ত্রী করুণ হেসে বলেছিলেন, সবই জানি, করার কিছু নেই। আপনি বরং ট্রান্সফার নিয়ে নিন। চুজ ইওর স্পট।

বাসু সেদিনই বুঝেছিলেন, এদেশে সৎকর্মীরা বড় একা, বড় বেশি সংখ্যালঘু এবং নিরাপত্তাহীন। যে দুষ্টচক্র চিকিৎসা জগৎকে ঘিরে বেড়ে উঠছে তাকে ভাঙতে হলে অনেক

বড় শক্তিমান কাউকে দরকার। তাঁর মতো লোককে দিয়ে হবে না।

শিলিগুড়িতে বাসুর দু-বছর হয়ে গেল। একটু চড়া মেজাজ, ঠোঁট কাটা এবং দাম্ভিক বলে তাঁর দুর্নাম আছে। আবার দক্ষ এবং নিষ্ঠাবান শল্যবিদ বলেও খ্যাতি আছে। এ সবই বাসু জানেন। কিন্তু নিজেকে বদলানোর কোনও প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন না।

অপারেশনের পর ডাক্তার তাঁর বাক্স খুললেন, রক্তমাখা অ্যাপ্রন ছাড়লেন। ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন অপারেশন থিয়েটারে দরজার মাথায় রামকৃষ্ণ-সারদার যুগ্ম মস্ত ছবির দিকে। তিনি ঠাকুর-দেবতা ধর্মগুরু মানেন না। ডাক্তার মিত্র মানেন। নার্সিংহোমের প্রায় সর্বত্রই ওই দুটি ছবি সাজানো।

রুগীকে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হল। বাসু হাত মুখ ধুয়ে ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে এলেন।

লবিতে বাপ আর তিন ছেলে গাড়লের মতো দাঁড়ানো। দুবছর এ শহরে বাসুর বাস। তিনি এঁদের চেনেন।

প্রথম কথা বললেন ব্রহ্মকুমার, ডাক্তার বোস, মেয়েটা বাঁচবে তো?

বাঁচবে।

বাচ্চাটা?

বেঁচে যাবে। চিন্তা নেই।

ব্রহ্মকুমার একটা মস্ত স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন।

ডাক্তার বাসুর মুডটা যথানিয়মেই খারাপ। রিসেপশনের লগবুকে সই করতে করতে বললেন, কিন্তু একটা কথা। বউটাকে আপনারা ভীষণ নেগলেক্ট করেছেন। ওর হার্ট ট্রাবলটা ক্রনিক। আপনাদের তো টাকার অভাব নেই। ইচ্ছে করলে কলকাতা থেকেও ট্রিটমেন্ট করিয়ে আনতে পারতেন। তাহলে এত টেনশন হতো না, আমাদেরও জীবন-মৃত্যুর খেলা খেলতে হতো না।

হার্টের অবস্থা যে এত খারাপ তা বুঝতে পারিনি। বিশ্বাস তো দেখছিল। কিছু তেমন বলেনি।

বিশ্বাস? ডাক্তার বিশ্বাসের চেয়ে হাতুড়েও ভালো। যাকগে, সেম প্রফেশনের লোকদের সম্পর্ক নিন্দে করতে নেই। তবে আমি আবার মনে মুখে আলাদা হতে পারি না।

সই করে বিটুর দিকে তাকালেন বাসু। ছেলেটার চেহারার অতীতের একটা জৌলুস দেখা যায়। এখন কেমন যেন মনমরা। তবে একসময়ে ব্রাইট ছিল। বাসু তার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো ওর হাজব্যান্ড।

আপনারই তো দায়িত্ব ছিল ওর প্রপার ট্রিটমেন্ট করানোর।

বিটু মাথা নোয়াল। জবাব দিল না।

এনিওয়ে, এবার থেকে নজর রাখবেন। আমি নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের ডাক্তার সেনগুপ্তকে খবর দিয়ে রেখেছি। উনি এখানে থাকেন না। সপ্তাহে দুদিন প্লেনে কলকাতা

থেকে এসে ক্লাস নিয়ে যায়। আজ তাঁর আসার ডেট। উনি বিকেলের দিকে এসে দেখে যাবেন।

হঠাৎ পিন্টু বলে উঠল, এ শহরে একজন ভালো হার্ট স্পেশালিস্ট নেই, এটা খুব লজ্জার কথা।

ডাক্তার বাসু পিন্টুর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ খুবই লজ্জার কথা। আপনি আরও লজ্জিত হয়ে পড়বেন যখন শুনবেন যে, মফসসলের অনেক হাসপাতাল বা হেলথ সেন্টারে কোয়ালিফায়েড ডাক্তারই নেই। ওষুধ নেই, নার্স নেই, ঝাড়ুদার নেই, কম্পাউন্ডার নেই।

জানি। আমি মফসসলে ঘুরি না না কি?

হ্যাঁ ঘোরেন। কিন্তু পলিটিক্স করতে ঘোরেন।

তাহলে কী করব?

ডাক্তাররা যাতে মফসলে কাজ করতে পারে যেমন কন্ডিশন তৈরি করুন। খুব শক্ত তো নয়। তাদের ওষুধ দিন, এনভিরনমেন্ট দিন, নিরাপত্তা দিন। দেখবেন সব পালটে গেছে। ডাক্তাররা কাজ করতে চায় না এমন তো নয়।

জানি।

আপনারা পয়সার জোরে সে সুবিধেটা পাচ্ছেন তা তো আর সবাই পায় না। নার্সিংহোম বা বেশি ফি দিয়ে ডাক্তার দেখানো এসব অ্যাফোর্ড করতে পারতেন, কিন্তু হাসপাতালটা গিয়ে দেখে আসুন একবার। হার্ট স্পেশ্যালিস্টের কথা বলছেন, একজন ভালো হার্ট স্পেশ্যালিস্টকে এ শহরে আনলেও আপনাদের মতো কিছু পয়সাওয়ালা লোকই তাকে বিজনেস দিতে পারেন, গরিবেরা পারবে না।

পিন্টু বাসুর দিকে কটমট করে একটু চেয়ে থেকে বলল, ডাক্তার বাসু, আমি আপনাকে জানি। আপনি গরিবের জন্য করেন, বিনা পয়সায় রুগি দেখেন, খুব ভালো। কিন্তু এ শহরের যে সব ডাক্তার আসে তাদের মধ্যে কয়টা মানুষ বলুন তো। বেশিরভাগই আসে টাকা লুটতে। এ শহরে দুবছর প্র্যাকটিস করলেই লাল হয়ে যায়। ডাক্তার কর, ডাক্তার পাল এরা সব আসলে কষাই। কর দুবার পাবলিকের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়েছে, তবু শিক্ষা হয়নি। প্লিজ, ডাক্তারদের হয়ে ওকালতি করবেন না।

ব্রহ্মকুমার এই বিতর্কটি পছন্দ করছিলেন না। হঠাৎ ছেলের কাঁধে একটা থাবড়া মেরে বললেন, হয়েছে হয়েছে, চুপ করো। যে যত মুখ্য তার তত লম্বা লম্বা স্পিচ। উনি এই বড় একটা অপারেশন করে বউমাকে বাঁচালেন, আর তুমি ওকে লেকচার দিচ্ছ। যাও এখান থেকে।

পিন্টু একটু থতোমতো খেয়ে গেল। বাপকে সমীহ করে, তাই আর কথা বাড়াল না। গুটিগুটি 'যাচ্ছি' বলে কেটে পড়ল।

ক্লান্ত চোখে ডাক্তার বাসু চেয়ে ছিলেন ব্রহ্মকুমারের দিকে।

ব্রহ্মকুমার অমায়িক হেসে বললেন, ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। পলিটিক্স করে করে মাথাটা গেছে। অতি অপদার্থ। মানী লোককে মান দিতে শেখেনি।

বাসু একটু হাসলেন, পিন্টুবাবুকে আমি জানি।

দোষ আমাদেরই হয়েছে ডাক্তারবাবু। সময়মতো চিকিৎসা করানোর খুব দরকার ছিল। আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন, এ আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে।

ডাক্তার বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, আমি একটু হাসপাতালে যাব।

তটস্থ ব্রহ্মকুমার বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা।

বাসুর প্র্যাকটিস খুবই ভালো। দিনে দুটো-তিনটে অপারেশন থাকে বিভিন্ন নার্সিংহোমে। নিজস্ব চেম্বারে রুগির অভাব নেই। এই শহরে বাসু হলেন সার্জেনদের রাজা। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে একটা প্রচার আছে যে, তিনি নির্লোভ, টাকাপয়সার খাঁই নেই। উপরন্তু বাসু ব্যাচেলার। সেই জন্য যারা টাকা দিতে পারে তারাও কাঁচুমাচু মুখ করে গরিব সাজে। সুতরাং বাসুর টাকা তেমন হয় না। ফলে তাঁর সমকক্ষ ডাক্তাররা গাড়িবাড়ি করে ফেললেও তাঁর কিছুই হয়নি। এমনকী একটা স্কুটার কিনতেও তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছে। এক মাড়োয়াড়ি খদ্দের স্কুটারটা মাগনা দিতে চেয়েছিল। উপহার। বাসু নেননি। পরে অনেক ঝোলাঝুলি করে সেই মাড়োয়াড়ি স্কুটারটা নামমাত্র দামে গছিয়ে ছাড়ল।

বাসুর মতো অন্যমনস্ক লোকের যে স্কুটার জাতীয় বিপজ্জনক যান চালানো উচিত নয় তা তিনি নিজেও জানেন। কিন্তু এই শহরে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা দিনের মধ্যে পঁচিশ বা দিনে ও রাতে টানা মারা তো সহজ কথা নয়। প্রথম প্রথম হাঁটতেন। পরে রিকশার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু মন্থর রিকশা তাঁর পেশার পক্ষে উপযুক্ত বাহন নয়। স্কুটার সেদিক দিয়ে খুবই উপযোগী। কিন্তু বাসু সারাক্ষণ নানা চিন্তায় এমন আচ্ছন্ন থাকেন যে, স্কুটার চালাতে তাঁর নিজেরও একটু ভয়-ভয় করে। কিন্তু উপায়ই বা কী?

যতক্ষণ স্কুটারটা চলে এবং তার ওপর বাসু সওয়ার থাকেন ততক্ষণ তাঁর একটা টেনশন হয়। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে সমস্ত শরীর ও মন সজাগ ও পথ-অভিমুখী রেখে তিনি ছোটখাটো দূরত্ব পার হন। এবং যাত্রাশেষে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। সেই কারণেই স্কুটারটার সঙ্গে আজও তাঁর সঠিক বনিবনা হয়নি।

হাসপাতালের চত্বরে স্কুটার থামতেই আবার নতুন টেনশন। এক দঙ্গল রিকশাওয়ালা এসে ঘিরে ফেলল।

ডাক্তারবাবু মাহিন্দরকে মেরে লাট করে দিয়েছে।

না বাঁচালে বহুৎ ঝঞ্ঝাট হয়ে যাবে বাবু।

আমরা বদলা নেবো। বিটুবাবুর খুব তেল হয়েছে।

লাভ স্টোর জালিয়ে দেব।

বাসু খুব ক্লান্ত বোধ করেন। কিছু একটা হয়েছে। রোজই হয়। স্কুটারটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে সমবেত ক্রুদ্ধ রিকশাওয়ালাদের দিকে চেয়ে ঠান্ডা গলাতে শুধু বললেন, আমি দেখছি। তোমরা শান্ত হয়ে বোসো।

ওয়ার্ডে যেতেই মিত্রা নার্স বলল, এমারর্জেন্সিতে একটা কেস আছে স্যার। মনে হয় সার্জিক্যাল কেস।

রিকশাওয়ালা কি?

হ্যাঁ। ওই যে বাইরে সবে জড়ো হয়েছে। এতক্ষণ চ্যাঁচামেচি করছিল।

কীরকম দেখলেন?

হেমারেজ হচ্ছে। কোমা।

দেখছি। আর কোনও কেস?

একটা স্নেক বাইট আছে। আর একটা বোন ফ্র্যাকচার। সার্জিক্যাল ওয়াডে বার্ন, কেসটার সেকেন্ডারি ইনফেকশন দেখা দিয়েছে।

কোয়াইট এক্সপেকটেড।

বাসু এমারর্জেন্সিতে এসে দেখলেন লোকটাকে মেঝের কম্বলের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। জ্ঞান নেই। গোঙানোর একটা শব্দ হচ্ছে। কষে রক্ত।

বাসু হাঁটু গেড়ে বসে নাড়ি দেখলেন। তারপর বুকে স্টেথো বসিয়ে এবং নানারকম নাড়াচাড়া করে অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর উঠে দাঁড়ালেন।

ঝাটকা মার সহ্য করতে পারেনি লোকটা। অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, অনির্ণীত নানারকম রোগ, দুশ্চিন্তা শরীরটাকে অনেক আগে থেকেই খেয়ে রেখেছে। এসব লোক বেঁচে থাকে মাত্র পঁচিশ পারসেন্ট। অস্তিত্বে শতকরা পঁচাত্তর ভাগই মরা। বাসু প্রতিদিন শয়ে শয়ে পঁচাত্তর ভাগ মরা মানুষকে দেখতে পান, রিকশা টানছে, মোট বইছে, ভিক্ষে করছে, বেকার বসে আছে। শরীরে স্বাস্থ্য নেই, চোখে দীপ্তি নেই, মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল নয়!

এ লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা বাসু কেন করবেন? বাঁচাতে হলে অনেক মেহনত যাবে। প্রথম কথা, এর রক্ত দরকার। প্রচুর রক্ত। ব্রেন ড্যামেজ যদি হয়ে থাকে তবে চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হবে অবজারভেশনে। ইনটেনসিভ কেয়ার বলে এখানে কিছু নেই, কিংবা যা আছে তাকে ইনটেনসিভ কেয়ারের ক্যারিক্যাচার বলা যায়। সামান্য একজন রিকশাওয়ালার জন্য এতটা কেন করতে যাবেন বাসু? আরও কোটি কোটি ভারতবাসীর মতো এরও মৃত্যু ঘটে যাক অর্থহীন ভাবে। এ মরলে কার কতটা ক্ষতি?

হঠাৎ বাসুর মনে পড়ল, রিকশাওয়ালারা বিটুর কথা বলছিল। বিটু একে মেরেছে। একটু আগে বিটুর বউকে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন বাসু। আর বিটুর হাতেই মার খেয়ে এ বেচারা ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে।

না, তাহলে লোকটাকে এভাবে মরতে দেওয়া যায় না। বড়লোকেরা টাকা আর প্রভাবের জোরে বাঁচে। গরিবেরা মরে এ দুইয়ের অভাবে। বাসু তাদের মরা ঠেকাতে পারল না। কিন্তু বিটুর হাতে মার-খাওয়া লোকটাকে না বাঁচালে একটা অপরাধ থেকে যাবে।

বাসু নার্সকে ডেকে একটা বেড-এর ব্যবস্থা করতে বললেন।

১২

নামের সঙ্গে মন্টুদের পদবি এমন জুরে গেছে যে আর ছাড়াতে পারে না গৌর কন্ট্রাক্টর। চেষ্টাও করে না। পৈতৃক পদবি বিশ্বাস। পারশিদের পদবি ছিল না, পেশা অনুযায়ী যেমন তেমন পদবি নিয়েছিল তারা। তাই কন্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, সোডাওয়াটার বটল ওপেনারওয়াল ইত্যাকার নানা বিচিত্র পদবিতে তার ভূষিত। গৌরবেরও তাই হয়ে যায়।

কন্ট্রাক্টরি করলেও গৌর একসময়ে মধ্যপ্রদেশের এমএলএ ছিল। রাজ্যসভায় যাওয়ার কথা হয়েছিল একবার। গৌর দুবার অল ইন্ডিয়া মোটর র্যালি জিতেছিল। গৌর তারও আগে পাহাড়ে উঠল। বেশ দুরূহ কয়েকটা শৃঙ্গ সে জয় করেছে। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, প্লে বয়, বুদ্ধিমান ও প্রায় অবিশ্বাস্য সাহসের অধিকারী গৌর অবশেষে ঠিকাদারিতে থামবে এটা কেউ আশা করেনি। শিলিগুড়িতে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। অনেকগুলো ভাইবোন। অভাবের সংসার থেকে গৌর একদিন উধাও হল। তার সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী আছে। মধ্যপ্রদেশে সে সোনার খনি বা গুপ্তধন পেয়েছে, বোম্বাইতে একটা ঘোড়দৌড়ে কয়েক লাখ টাকা পিটেছে, উদ্বাস্তু রিলিফের টাকা মেরেছে ইত্যাদি। বলা বহুল্য গৌর এসব কিছুই করেনি। মধ্যপ্রদেশ জায়গাটা সে বেছে নিয়েছিল নিজের চারণভূমি হিসেবে। এই রাজ্যে লোক কম প্রচুর অনাবাদী জমি ও গহীন জঙ্গল আজও আছে। এ রাজ্যের অধিবাসীরা অধিকাংশই বহিরাগত। গৌর এ রাজ্যে এসে কয়েকজন প্রবাসী ও প্রভাবশলী বাঙালির আনুকূল্য পেয়ে যায়। প্রতিভাবানদের খুব সামান্য সাহায্য হলেই চলে। গৌরেরও চলল। মোট দশ-বারো বছর মধ্যপ্রদেশে ছিল সে। তার মধ্যেই ওই এম এল এ হওয়া অবধি ছিল। এর থেকেই তার এলেম অনুমান করা যায়।

শিলিগুড়িতে সুমনার বাস ছিল গৌরদের বাড়ির কাছেই। এ দুজনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই। সুমনাও জানতেন, গৌরও জানত। কিন্তু বাউন্ডুলে গৌর ফিরলই না সময়মতো। সুমনার বিয়ে হয়ে গেল ব্রহ্মকুমারের সঙ্গে।

গৌর ফিরল যখন সুমনার কোল ভরে দুটি বাচ্চা এসে গেছে। ফিরেই গৌর ঝাঁপিয়ে পড়ল শিলিগুড়ির ভাণ্ডার লুটতে। মাত্র দু-তিন বছরে নিজস্ব বুদ্ধি ও ভুজবলে গৌর এমন উঁচু থাকের ঠিকাদার হয়ে বসল যে, মাড়োয়াড়ি বেনেরা পর্যন্ত অবাক। আজ গৌরের চার-

পাঁচ খানা গাড়ি, শ খানেক লরি, চারখানা পেল্লায় বাড়ি, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি এবং দিঘায় হোটেল, হিল কার্ট রোডে মস্ত মোটর পার্টসের দোকান, নিউ মার্কেটে টিভি এবং ইলেকট্রনিকসের শোরুম, আরও নাকি করবে কী সব। বিয়ে করেনি। টাকা রোজগারই একমাত্র নেশা।

এমনিতে গৌর অতিশয় সজ্জন মানুষ।

সুমনার বিয়ের তিন বছর বাদে গৌর একদিন দেখা করতে এল। সমুনা লজ্জায় সামনে যাননি প্রথমে। ব্রহ্মকুমার বড্ড বেশি ব্যাকুল হয়ে ডাকাডাকি করতে গেলেন।

এ মানুষটা তাঁর স্বামী হতে পারত, এ কথা ভাবাও যে এখন পাপ!

গৌর বেশ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ সুমনার দিকে চেয়েছিল। তারপর বলল, বেশ হয়েছ তো! একদম অন্যরকম!

সুমনা লজ্জা পেয়ে পালাচ্ছিলেন!

গৌর বলল, লজ্জা পেয়ো না, এখন লজ্জা পাওয়ার মানে হয় না।

সুমনার অনেক কথা বলার ছিল। খুব বকতে ইচ্ছে করছিল লোকটাকে, একটা জীবন এই যে অন্যের বউ হয়ে কাটাতে হচ্ছে তাঁকে এটা তো একটা অপমানই।

পরে বিরলে গৌর একদিন সুমনার কাছে এসেছিল।

মিতু সুমনার ডাক নাম। সেই নাম ধরে ডেকে বলল, দোষ আমারই। কিন্তু আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরলে পারতে।

কী হতো তাতে? তুমি মধ্যপ্রদেশের অত কাজ ছেড়ে আমাকে বিয়ে করতে আসতে?

আসতাম। বিয়ের জন্যই তৈরি হচ্ছিলাম। হঠাৎ বাড়ির চিঠি গেল তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

তখন কী করলে?

কী আর করব। জীবনের অর্থটাই হারিয়ে গেল। আর বিয়ে করারও কোনও মানে হয় না। কাউকে তো আর বউ বলে নেওয়া যাবে না।

সুমনা খুব কাঁদলেন এ কথায়।

গৌর চলে যাওয়ার আগে বলল, শিলিগুড়িতে ফিরে এলাম তোমার জন্যেই, তোমাকে পেলাম না ঠিকই, তবে কাছাকাছি থাকারও সুখ আছে।

থাকো। কোথাও চলে যেও না পাগলা সাহেব।

যাব না।

সত্যিই বিয়ে করব না?

না। বলেছি না, বিয়ে করা অর্থহীন হবে। ওরও তো একটা রচনা আছে।

গৌর যে বিয়ে করল না সুমনার এক মস্ত জয়। বলতে গেলে তাঁর একমাত্র জয়। গৌর যে খুব আসে বা তাঁদের মধ্যে যে গোপনে অনেক কথা হয়, তা কিন্তু মোটেই নয়।

গৌর ব্যস্ত মানুষ, হিল্লি-দিল্লি করতে হয়। তবে আড়াল থেকে এই পরিবারটিকে গৌর ঠিকানা দিয়েছে অনেক। ব্রহ্মকুমারের যখন প্রসার ছিল না তখন গৌরই তাঁকে প্রতিষ্ঠা পেতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। গৌরই করে দিয়েছে ব্রহ্মকুমারের বাড়িখানা। গৌর আরও কত কী করছে তার হিসেব নেই। সুমনা যে-কোনও প্রয়োজনেই আজ নিঃসঙ্কোচে গৌরের কাছে হাত পাতেন। একটি অধিকারবোধ কাজ করে। মাঝে মাঝে তিনি জিব কেটে ভাবেন, আমার কি দুটো স্বামী?

গৌর সেরকম ভাবে না। তার মনটা অন্য রকম। প্রেমার্ত সে কোনওদিনই নয়। আসলে সুমনার প্রতি তার এক নিরঙ্কুশ অধিকারবোধ ছিল। শরৎচন্দ্রের নভেলে এরকম অনেক দেখা যায়। সেই বাল্য-প্রণয়ের ব্যাপারটা সুগন্ধের শূন্য শিশিতে কেমন করে যেন একটু লেগে থাকে।

বিটুর বাচ্চা হয়েছে, এ খবরটা গৌর পেলে তার মোটর পার্টসের দোকানে বাসে। নার্সিংহোম থেকে ফোন করেছিল পিন্টু।

গোরাকা, তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি।

গৌর খুবই ব্যস্ত ছিল। সামনেই এক মিলিটারি অফিসার বসা। বিজনেস টক হচ্ছে। একটু সতর্ক গলায় বলল, খারাপ কিছু নয় তো!

আরে না। মেজোবউদির একটা বাচ্চা হয়েছে।

ও। সোমা কেমন আছে?

ভালো।

ওর না সেই হার্টের কী একটা গণ্ডগোল ছিল।

হ্যাঁ। ডাক্তার বাসু সেফলি ব্যাপারটা ট্যাকল করেছেন।

কোনও কমপ্লিকেশন নেই তো?

না।

এই পিন্টুকে পুষ্যি নিতে চেয়েছিল গৌর। সুমনা দেননি। তিনি মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, পুষ্যি আবার ঘটা করে নেবে কেন। পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে তাহলে। তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তা তো কিছু লোক জানে। তার চেয়ে নিজের ছেলে বলে ধরে নাও, ওর যাতে ভালো হয় দেখো, সেইটেই ভালো।

গৌর যুক্তিটা বুঝেছিল। পুষ্যি নেওয়াটা কাজের কথা নয়। পিন্টুকে সেই থেকে গৌর আলাদা রকমের প্রশ্রয় দেয়। শখের জিনিস কিনে দেওয়া, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, সাইকেল বা স্কুটারে বা গাড়িতে চাপানো এসব পিন্টুর ছেলেবেলায় গৌর অনেক করেছে। রোজ একবার ছেলেটাকে না দেখে থাকতে পারত না। পিন্টু একটু বড় হওয়ার পর তার স্কুল-কলেজের মাইনে বইখাতা জামাকাপড় এবং হাতখরচ সবই ছিল গৌরের দায়িত্ব।

রাজনীতিতে পিন্টুর তালিমও গৌরের কাছে। গৌরের সঙ্গে পিন্টুর সম্পর্ক পরস্পরের অজান্তেই বাপ-ব্যাটায় দাঁড়িয়ে গেছে। আজও গৌরকেই যা একটু পৌঁছে পিন্টু।

গৌর পিন্টুর মুখখানা একটু ভাবল। বুকটি ভরে গেল মায়ায়। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, ভালো খবর। বিকেলের দিকে একবার নার্সিংহোম-এ যেতে পারি।

আর শোন গৌরকা। একটা বিপদ হয়েছে।

কী বিপদ?

বিটু আজ একটা রিকশাওয়ালাকে খুব মেরেছে। লোকটা এখন হাসপাতালে। বাঁচতে পারে, নাও পারে। মনে হচ্ছে লোকটা মরে গেলে একটা জোর হাঙ্গামা হবে।

গৌর একটু বিরক্ত হয়ে বলে, তোরা কি হাত-ফাত না চালিয়ে থাকতে পারিস না। ভদ্রতা সৌজন্য মায়াদয়ার পাট যে তুলে দিলি!

আহা, আমাকে বলছ কেন? আমি আর এখন ওসব করি?

নিজে হাতে না করলেও তোর দল করে। যাকগে, কী হয়েছে পরিষ্কার করে বল। পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে?

এ কেস পুলিশের খাতায় উঠবেই। তবে এখনও এনকোয়ারি হয়নি। হলে মুশকিল।

তা আমাকে কী করতে হবে?

আমি তার কী বলব? যা ভালো বুঝবে করবে।

আমি এসব ভালো বুঝি না। তুই বরং একবার থানায় যা। দ্যাখ ডায়েরি হয়েছে কি না। এক্ষুনি যা।

হলে কী করব?

আমাকে ফোন করিস। রিকশা ইউনিয়ন থেকে এসেছিল?

না। তবে রিকশাওয়ালা মেলা জড়ো হয়েছে হাসপাতালে, শুনলাম।

হবেই। এখন যা বলছি করগে যা।

আর একটা কথা। শচী চক্রবর্তী নামে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির এক লেকচারার আছে। চেনো?

না। চেনবার মতো নাকি?

সে একটু জল ঘোলা করতে পারে। তেজি মেয়ে।

গৌর একটু শঙ্কিত গলায় বলে, কেন, তুই কি তার সঙ্গে তর্কাতর্কি কিছু করেছিস নাকি?

না। মেয়েদের সঙ্গে আমি কখনও ঝগড়া-টগড়া করি না। সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেনদের সঙ্গে কেউ তর্ক করে জাত খোওয়ায়?

গৌর একটু হাসল। তারপর বলল, মেয়েটা দেখতে কেমন?

খুব চোখা।

বয়স?

বেশি নয়। ছুকরি।

সে কি ওই রিকশায় ছিল?

হ্যাঁ। সেটাই তো শুনলাম।

বিটু হঠাৎ রুস্তম সাজতে গেল কেন? তোদের ভাইদের রক্ত আর ধাত এত গরম কেন বল তো! গরিব একটা রিকশাওয়ালার ওপর এই সব করার কোনও মানে হয়?

সেইটেই তো কথা গোরাকা। মানুষ যে কেন এত রিঅ্যাক্ট করে বুঝি না। বিটুকে তো জানো, টোটালি ফ্রস্ট্রেটেড। ও যে কখন কী করবে তার ঠিক নেই। এমনিতে তো ঠান্ডা, শান্ত, ভদ্র।

গৌর গম্ভীর গলায় বলল, জানি। বিটুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস। আর লাভ স্টোর এক বেলার জন্য বন্ধ করে দিতে বল। আজ যেন আর না খোলে।

কেন বলো তো!

পাবলিকের হাতের নাগালে থাকার দরকার কী?

এ কথায় পিন্টু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হেসে বলল, আরে গোরাকা, তুমি মারধরের ভয় পাচ্ছ নাকি? ও সব হবে না। হলেও থোড়াই পরোয়া করি। পাবলিক এখনও আমাদের সমঝে চলে। আর বিটু মারদাঙ্গা কিছু কম করেনি।

করেছে বলেই ভয়। অনেকের রাগ পোষা আছে।

১৩

শচী শিলিগুড়িতে নতুন। শহরটা সে ভালো চেনেও না। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস শহর থেকে অনেক দূরে, সেই রামমোহন রায়পুরে। সেখানেই তার কোয়ার্টার, মাঝেমধ্যে বাস ধরে চলে আসে কেনাকাটা করতে। শহর মাত্রই ভালো লাগে শচীর। লোকজন, দোকান পসার, জমজমে ভাব। রামমোহনপুরে বড্ড একটেরে একঘেয়ে লাগে। পড়াশুনো ছাড়া দ্বিতীয় কোনও অবসর বিনোদন নেই। মাত্রই মাসচারেক হল সে এসেছে, এখনও তেমন চেনাজানাও হয়নি সকলের সঙ্গে।

একা থাকতে তার কোনও অসুবিধে হয় কি না তা জিগ্যেস করেছিলেন এক বয়স্ক কলিগ।

শচী বলেছিল, হয়, একঘেয়ে লাগে।

উনি বললেন, সে কথা বলছি না, একঘেয়ে তো লাগবেই, আমি বলছিলাম, আপনি যুবতি মেয়ে, একা, বিপদের আশঙ্কা করে না?

শচী একটু হেসেছিল। এরা তো আর অতীতটা জানে না। শচী চক্রবর্তী ভয় পাবে কি, শচীই তো মানুষের ভয়ের কারণ ছিল একদা। যখন যে সক্রিয় রাজনীতি করত এবং ছিল মোটামুটি সাহসী, মুখর ও প্রবল অনুভূতিশীল। থানা ঘেরাও করা বা পুলিশের উদ্যত বন্দুকের সামনে এগিয়ে যাওয়া কোনও ব্যাপার ছিল না তার কাছে। দুবার সে গ্রেফতার হয়েছিল। তার মধ্যে একবার তাকে দেড়মাসের মতো জেল খাটতে হয়েছে।

এসব খুব বেশি দিনের কথা নয়।

তবে বছরখানেক হল, শচী অনেকটা জুড়িয়ে গেছে। ঘোর বামপন্থী শচী ভূত-ভগবান-ভাগ্য মানে না। প্রচণ্ড আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মবিশ্বাসী। লতানে স্বভাব তার এক্কেবারেই নেই। বাঙালি ছেলেদের সম্পর্কে সে এতই উন্নাসিক যে, আজ অবধি কোনও বাঙালি ছেলের প্রেমে পড়ার কথা সে ভাবতেও পারেনি। বিয়ে ব্যাপারটাকে এখনও অবধি সে প্রচণ্ড ঘেন্না পায়।

শচী রাজনীতিতে যেমন উগ্রপন্থী ছিল, ব্যক্তিগত রুচি এবং মেজাজেও তেমনি উগ্রপন্থী। তার সঙ্গে যে-ই একটু মিশেছে সে-ই বুঝেছে যে এটি একটি ঠান্ডা বোমা। সাবধানে না চললে যে-কোনও সময়ে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

আজ রিকশা-সাইকেল সংঘর্ষের পর যে কুৎসিত ব্যাপারটা ঘটে গেল তা শচীর জীবনে একেবারে নতুন ঘটনা। এরকম পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। সে হকচকিয়ে গিয়েছিল বলে বিটু আজ বেঁচে গেছে। কিন্তু দরিদ্র রোগা বুড়ো রিকশাওয়ালার ওপর ওই মারের দৃশ্যটা শচীর মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।

মারকুট্টা ছেলেদের নাম জেনে গিয়েছে শচী। যে ছেলেটা রিকশাওয়ালাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে তার নামও। শচী ছাড়বে না।

আর একটা রিকশা ধরে সে সোজা থানায় চলে এল।

সর্বত্রই শচী নিজেকে জাহির করতে পারে। তার চোখ, ধারালো মুখ, মুখে কাঠিন্যের রেখা, দৃপ্ত ভঙ্গি এসবের মধ্যেই তার অন্তর্নিহিত সেই উগ্রতা প্রকাশ পায় যাকে কেউ সহজে উপেক্ষা করতে পারে না। ভাঁড়ের মধ্যেও তাকে আলাদা করে চিনে নেয় লোকে। মাতাল, বদমাশ, পাড়ার মস্তান বা রকবাজেরা সহজে তাকে ঘাঁটায় না। তাকে কখনও বিরক্ত করেনি তার সহপাঠীরা।

থানায় সে ঢোকামাত্র খাতির পেল। একজন সুদর্শন সেকেন্ড অফিসার তাকে বসাল, পরিচয় জানাল এবং কেসটা লিখে নিল।

শচী জিগ্যেস করে, আপনারা বিটুকে কখন অ্যারেস্ট করবেন?

এনকোয়্যারির পর।

এনকোয়্যারির কখন হবে?

সেকেন্ড অফিসার ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি। জিপটা একটু বেরিয়েছে। ওটা ফিরলেই।

আমি শুনেছি বিটুবাবুর বাবা বেশ প্রভাবশালী উকিল এবং পরিবারটাও বোধহয় টাকাপয়সাওয়ালা। কিন্তু আমার অনুরোধ এগুলো যেন আপনাদের ইনফ্লুয়েন্স না করে।

সেকেন্ড অফিসার একটু হাসল। বলল, আমরা সরকারি চাকরি করি। আমাদের ওপর হাজার রকমের প্রেশার। এ সব তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তবু বলছি, আমরা যথাসাধ্য করব। বিটু আর পিন্টুকে আমি চিনি। পিন্টু তো প্রায়ই থানায় আসে।

শচী একটু চিন্তিতভাবে বলল, এখানে একটা ডেইলি পেপার আছে না?

আছে।

খবরটা আমি তাদেরও জানাতে চাই।

ঠিক আছে। তবে আপনি না জানালেও জেনে যাবে। থানা থেকেই ওরা খবর নেয় রোজ।

শচী উঠল। রিকশা অপেক্ষা করছিল তার জন্য। রিকশাওয়ালা একটি ছোকরা। সে জানে যে, শচী তাদেরই একজন সহকর্মীর জন্য লড়তে নামছে। শচী সিটে উঠে বসতেই ছোকরাটি বলল, কিছুই হবে না দিদি। বিটুবাবুদের পয়সা আছে। ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে।

শচী বলল, জানি। তবু ছাড়ব না। তোমরাও ছেড়ো না।

আমাদের মধ্যে এককাট্টা ভাবটা নেই তো।

তোমাদের তো ইউনিয়ন আছে।

আছে। কিন্তু বিটুবাবুদের কিছু করতে পারবে না। ইউনিয়নের লিডাররা পিন্টুবাবুর বন্ধু।

শচী কিছু বলল না। তবে ভাবল। এক জায়গায় একটা পুরোনো পরিবার বহুদিন বসবাস করার ফলে শেকড়বাকড় গেড়ে ফেলেছে। প্রভাব প্রতিপত্তি টাকার জোরও কম নয়। হয়তো কিছুই করা যাবে না এদের। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।

হাসপাতালের সামনে বেশ একটু ভিড়। জনাত্রিশেক রিকশাওয়ালা জড়ো হয়েছে। চ্যাঁচামেচি নেই, তবে চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

শচী নামতেই একজন এগিয়ে এল। একটু মস্তানের মতো চেহারা। গায়ে লাল স্যান্ডো গেঞ্জি। গলায় কারে বাঁধা একটা চৌকো তাবিজ। পরনে ময়লা লুঙ্গি। বয়স বছর তিরিশেক।

দিদি। আপনি কিন্তু সাক্ষী দেবেন।

শচী অবাক হয়ে বলল, কেন দেব না?

অনেকেই শেষ অবধি ভয় খেয়ে যায় তো।

আমি কাউকে ভয় পাই না। লোকটা কেমন আছে?

ডাক্তার বাসু দেখছেন। ভালো ডাক্তার। তবে কেউ কিছু বলছে না।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করা যায় না?

লোকটা হাত তুলে দেখাল, ওই দিকে আউটডোরের ঘর আছে। ওখানেই চলে আসবেন। আপনি গিয়ে বসুন।

হাসপাতালের অবস্থা এই প্রথম দেখল শচী। যথেষ্টই খারাপ। তবে তৃতীয় বিশ্বে তো এরকমই হওয়ার কথা।

ডাক্তারের ঘরখানা একেবারেই বে আব্রু এবং শ্রীহীন। এখানে কোনও চিকিৎসা বা রোগী-পরীক্ষা হয় বলে মনেই হয় না। শচী একটা শক্ত কাঠো চেয়ারে বসে আঁচল দিয়ে মুখের সামান্য ঘাম মুছল। একটা লড়াইয়ের গন্ধ আছে বলে সে যথেষ্ট চনমনে বোধ করছে। টনটন করছে বিষদাঁত। সে ছোবল তুলছে। ছোবলটা লক্ষ্যবস্তুতে সে বিঁধিয়ে দেবেই।

শান্তভাবেই অপেক্ষা করতে লাগল শচী। হাতব্যাগ থেকে একখানা বই বের করে পড়তে লাগল। 'টেরোরিস্টস অব মারসিন্যারিজ' নামে একখানা পেপারব্যাক! সদ্যই কিনেছে। টেররিজম-এর মধ্যে যে পেশাদার ভাড়াটে মনোভাব ঢুকেছে তা-ই প্রতিপাদ্য বিষয়। অশান্ত পৃথিবীর সর্বত্রই চলছে সন্ত্রাস, হত্যা, গণ্ডগোল এবং তার পেছনে মদত দিচ্ছে অন্ধ ব্যবসায়ী, ড্রাগ পাচারকারী, অসাধু ক্ষমতালোভী। শচী সবই মোটামুটি জানে।

পড়তে পড়তে ডুবে গিয়েছিল। ডাক্তার বাসু চেয়ারের শব্দ তুলে বসতে শচীর চটকা ভাঙল।

বাসুকে এক নজরে জরিপ করে নিল শচী। বিষণ্ণ চেহারা। তবে সুপুরুষ।

আপনিই ডাক্তার বসু?

বাসু প্রথমে কোনও জবাব দিল না। নীরবে একটু চেয়ে রইল শচীর দিকে। তারপর বলল বসু আমার পদবি নয়। আমার নাম বাসুদেব ব্যানার্জি। লোকে ডাক্তার বাসু যে কেন বলে তা আমিও ভেবে পাই না।

শচী একটু লজ্জা পেয়ে বলে, মাফ করবেন।

আরে না, লোকে যা বলে তা বলতে দোষ কী? তবে আপনি ডাক্তার বাসু বলার ভুলটা ভেঙে দিলাম। এবার বলুন, কী জানতে চান।

আমি ওই লোকটার খবর দিতে এসেছি। রিকশাওয়ালা।

মার্জিন্যাল কেস। তবে—

তবে কি?

ইনজুরি তো ফ্যাটাল নয়। সমস্যা হল ভাইটালিটি নিয়ে। শরীরে জীবনীশক্তি বলে কিছু নেই।

এটাকে নিশ্চয়ই পুলিশ-কেস হিসেবে নিয়েছেন?

দুহাতের তেলো ডলে একটা অসহায় ভঙ্গি করে বাসু বলল, আমি তার কী জানি। পুলিশকে খবর দেওয়ার দায়িত্ব আমার নয়, হাসপাতালের।

আমি ওর রিকশায় ছিলাম। আমার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে।

বাসু আবার তার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদু স্বরে বলল, আপনি কি অ্যাকশন চান?

চাই। বিটু না কী যেন লোকটার নাম, তাকে আমি জেলে পাঠাতে চাই। মেডিকেল রিপোর্টটা আপনি কীরকম দেবেন তার ওপর সব নির্ভর করবে।

বাসু এবার হাসল। মৃদুস্বরে বলল, রিপোর্ট হবে। তার আগে আমার যা কাজ তা আমাকে করতে হবে। বিটুর জেল হওয়ার চেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট লোকটাকে বাঁচানো। আপনার ব্লাড গ্রুপ কী তা জানা আছে?

ও গ্রুপ।

খুব ভালো। আপনার রিকশাওয়ালার কিছু রক্ত দরকার। আপাতত আপনি ওর জন্য কিছুটা রক্ত দিতে পারেন।

শচী একটু বিবর্ণ হল সে যথেষ্ট সাহসী ও ডাকাবুকো বটে, কিন্তু ছুঁচকে সে ভয় পায়। রক্তের রং দেখলে তার গা শিরশির করে। একটু থেমে ভেবে নিল শচী। তারপর বলল, ঠিক আছে।

বাসু ক্লান্তিতে একটু পিছন দিকে হেলে বসল। চোখ বুজে নিস্পন্দ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর স্তিমিত গলায় বলল, আপনি বোধহয় একটু নার্ভাস টাইপ।

না। আমি রক্ত দিতে পারব।

ইরোইকাসের দরকার নেই। ও গ্রুপ খুব কমন গ্রুপ। আপনি না দিলেও ওর বন্ধুরা দেবে। হয়ে যাবে।

শচী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, প্রয়োজন হলে আমিও দিতে পারি।

বাসু তার দিকে চেয়ে বিমর্ষ মিয়োনা গলায় বলল, হাসপাতালের অবস্থা কীরকম তা তো নিশ্চয়ই জানেন?

দেখছি, খুব খারাপ।

হ্যাঁ, ভীষণ খারাপ, চিকিৎসা খারাপ, ওষুধ খারাপ, পরিবেশ খারাপ, আর তার চেয়েও খারাপ হল এখানকার খাবার। খুব গরিবেরও খেতে কষ্ট হয়।

তাও জানি।

আপনার রিকশাওয়ালাটির যখন জ্ঞান ফিরবে এবং নরম্যাল ডায়েট নিতে পারবে তখন তার কিছু পুষ্টিকর খাবার দরকার হবে। পারবেন কিছু কিনে দিতে?

নিশ্চয়ই পারব। কী লাগবে বলুন।

এখন নয়। এখন ওকে ড্রিপ দেওয়া হয়েছে। যদি লোকটা বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারে তাহলে দু-তিনদিন পর আপনি আমার কাছ থেকে একটা লিস্ট নিয়ে যাবেন। ভয়াবহ কিছু নয়। দামি কিছুই লাগবে না। কিছু ফল, কয়েকটা ওষুধ, একটু প্রোটিন আর দুধ।

নিশ্চয়ই। আমার নাম শচী চক্রবর্তী। নর্থ বেঙ্গল ইউনির্সিটিতে পড়াই। আমার ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে যাব?

বাসু অবাক হয়ে বলল, ঠিকানা দিয়ে কী করব? আপনি যদি নিজে থেকেই রোগীর খবর নেন তবেই হবে।

ডাক্তার বাসু ছোকরা নয়, তবে বয়স বেশিও নয়। এই বয়সেই মুখে গভীর বিষাদের রেখা কেন তা বুঝতে চেষ্টা করছিল শচী। তারপর সে ডাক্তার বাসুকে যা বলল তা সম্পূর্ণ বাস্তব এক হিসেবি কথা। সে বলল, রিকশাওয়ালার জন্য আমার যা করা উচিত তা শুনলাম। কিন্তু যে লোকটা ওকে মেরেছে তার কি কিছুই কর্তব্য নেই?

ডাক্তার বাসু তার ম্লান চোখ তুলে তাকাল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আমি যাকে সামনে পাই তাকেই কিছু না কিছু করার কথা বলি। কার কোনটা কর্তব্য তা সব সময়ে মনে থাকে না। বিটুকে দিয়ে যদি করাতে চান তাও পারেন। কেউ একজন করলেই হল। বোধহয় ওর ফ্যামিলির জন্যও কাউকে কিছু করতে হবে, নইলে তারা মরবে না খেয়ে। হ্যাঁ, সেটাও বিটুদেরই করা উচিত।

বাসু একটা কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কে করাবে?

পুলিশ।

বাসু চুপ করে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আপনি কি সোশ্যাল ওয়ার্কার?

একরকম।

তাহলে হয়তো আপনি পারবেন। কে করবে, কার করা উচিত তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু কাউকে তো করতেই হবে। সেই দায়িত্বটা আপনি নেবেন? নিলে ভালো হয়। আমার মাইনে বা প্র্যাকটিসের রোজগার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, থাকলে—

শচী একটু আগ্রহ বোধ করল বাকিটা শুনতে, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করা অভদ্রতা হবে বলে চুপ করে রইল।

শচী একটু নম্র হয়ে বলল, এটা তো একার কাজ নয়। অনেকের কাজ। সরকারের দায়িত্ব। আপনি নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে কত মানুষের উপকার করবেন।

বাসু গভীর হাতাশার গলায় বলল, কেউ তো দায়িত্ব নেয় না। কাউকে বলেও কিছু লাভ হয় না। এই হাসপাতালের পিছনে যে বিরাট টাকা খরচ হয় তাই দিয়ে চমৎকার চলতে পারত। ওষুধ, খাবার, যন্ত্রপাতি কিছুই যে কেন পাওয়া যায় না হাসপাতালে! একজন ঝাড়ুদার বা মেথরও ঠিকমতো কাজ করে না।

ডাক্তার বাসুর গভীর হতাশা শচীকে একটু স্পর্শ করল। লোকটির মধ্যে এখনও দয়ামায়া আছে। এখনও পোড় খায়নি, শক্তপোক্ত হয়ে ওঠেনি। বেচারা।

শচী বলল, আমার যেটুকু করার করব। তবে আমি অনেক দূর থাকি। অত দূর থেকে খুব বেশি কিছু করা যাবে না।

আপনি কোথায় থাকেন?

একবার বোধহয় বলেছি আপনাকে, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির ক্যামপাসে। আপনি এত অন্যমনস্ক কেন? ডাক্তারের অন্যমনস্ক হওয়াটা কিন্তু বিপজ্জনক।

বাসু অবাক হয়ে শচীর দিকে চেয়ে বলল, আমি আর অন্য সব ব্যাপারে অন্যমনস্ক হলেও চিকিৎসার ব্যাপারে নেই। আজ অবধি কেউ এই কথা বলেনি।

যাদের মধ্যে আনমাইন্ডফুলনেস থাকে তাদের সব ব্যাপারেই সেটা ফুটে ওঠে।

বাসুর ফরসা রঙে, একটু লালচে আভা লাগল। তবে কিছু তেমন বললেন না, শুধু বলল, ও, তা হবে।

শচী উঠল, আজ যাচ্ছি।

১৪

ঝিন্টু তার আদরের সাইকেলটার দুর্দশা দেখছিল, হাঁটু গেড়ে বসে। লাভ স্টোরের সামনে। এই স্পোক এখানে পাওয়া যাবে না। সারাই করে নিতে হবে।

একটু অপরাধী মুখ নিয়ে বিটু দৃশ্যটা দেখছিল। ঝিন্টু তার চমৎকার সাইকেলটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

ঝিন্টু সাইকেলটা একটু তুলে চাকাটা ঘোরাল। না, রিম টাল খায়নি। খেলে ফ্রেমের গায়ে লাগত। স্পোকগুলো মোটামুটি ঠুকে সোজ করে দিয়েছে সারাইকর। আপাতত চালানো যাবে। তবে নিখুঁত জিনিসটার একটা খুঁত হয়ে গেল। ঝিন্টুর চোখ ফেটে জল আসছিল। শরীর রি-রি করছে রাগে। দাদা না হলে হাত চালিয়ে দিত। তবে মনে মনে যে অবিরল গালাগাল দিয়েছিল, শ্যালা ঢ্যামনা, সাইকেল চালাতে জানে না তবু শালা ওস্তাদি দেখাবে। ব্যালান্স নেই, শরীর ঢ্যাপসা, রিফ্লেক্স নেই, দু'নম্বরি একটা দোকানদার, তোর এত আস্মা কীসের। ইঃ, বউয়ের বাচ্চা হয়েছে! উনি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটলেন সাইকেলটার বারোটা বাজাতে।

সাফাই হিসেবে বিটু অবশ্য ভাইকে অনেক স্তোক দিয়েছে। ঝিন্টু, একটাও কথা বলেনি।

বিটু নেমে এল দোকান থেকে।

বুঝলি ঝিন্টু, লোকটাকে খুব মেরেছি। খুব।

ভালো। আমি যাচ্ছি।

তোর সাইকেল আমি কিনে দেব।

লাগবে না। দেনেওয়ালা বহুত দেখেছি।

রাগছিস কেন। সাইকেল আমারও ছিল।

জানি। ব্যলান্স নেই, সাইকেল চালাতে জানো না, তবু চড়তে গেলে কেন?

বিটু একটু গরম হয়ে বলে, দ্যাখ, বড় বড় কথা বলিস না। সাইকেলবাজ আমি তোর চেয়ে কম ছিলাম না।

ছিলে তো ছিলে। তাতে কী? এখন তো বসে বসে আর খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছ। সাইকেলে তোমার চড়াই উচিত নয়।

বিটুর রাগ হঠাৎ ওঠে। তার কার বহুবিধ। এক হল, যে বুড়ো রিকশাওয়ালাকে সে মেরেছে তার অবস্থা ভালো নয় বলে একটা খবর রটেছে। হাঙ্গামা লাগা বিচিত্র নয়। তার ওপর বাচ্চা হওয়া নিয়ে টেনশন, তার ওপর দোকান দিয়ে টেনশন।

বিটু রাগে গড়গড় করে উঠল, মুখ সামলে কথা বলিস কিন্তু ঝিন্টু, ভালো হবে না।

ঝিন্টু সেদিককার ছেলে, এক রত্তি। কিন্তু তেজ তার কিছু কম নয়। মুখটা তুলে বিটুর দিকে চেয়ে সমান দাপটের গলায় বলল, যাও যাও, বেশি দাদাগিরি ফলাতে এসো না। কাকে ভয় দেখাচ্ছ?

খুব বাড় বেড়েছে তোর! অ্যাঁ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

তোমাকে আমি কিছুই বলিনি, আগ বাড়িয়ে ভালোমানুষি দেখাতে এসেছ কেন? জানো, এই সাইকেলটার দাম কত? কিনে দেবে! এঃ বড় কিনে দেনেওয়ালা লোক। ব্রহ্ম গাঙ্গুলির পয়সায় ফুটানি করে বেড়াচ্ছ আবার কিনে দেবে।

বিটু আচমকাই ভাইয়ের চুলের মুঠির জন্য হাত বাড়াল, ডান হাতে তুলল থাবড়া। চোখের পলকেই ঝিন্টু সাইকেলটা টেনে আনল দুজনের মাঝখানে।

বিটু কিছু দ্বিধা করেছিল। একটু আগেই এক রিকশাওয়ালাকে মেরেছে সে। কাজটা ভালো হয়নি।

কী হতো বলা যায় না। কিন্তু কিছু হওয়ার আগেই একটা রিকশা এসে লাভ স্টোরের সামনে থামল। চটপটে পায়ে একটা মেয়ে নেমে এসে বিটুর দিকে অতিশয় কঠিন চোখে বলল, আপনি বিটু গাঙ্গুলি?

বিটু ঝিন্টুকে মারার জন্য যে হাতখানা তুলেছিল তা নামিয়ে এনে বলল, হ্যাঁ।

আমকে চিনতে পারছেন?

না তো!

একটু আগে আপনি যে রিকশাওয়ালার ওপর দারুণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন আমি তার রিকশায় ছিলাম। আমার নাম শচী চক্রবর্তী।

বিটুর রিফ্লেক্স অনেক কমে গেছে। কেমন ভোঁদামার্কা হয়ে গেছে তার মাথা। কেমন যেন হতচকিত হয়ে বলল, ও।

আপনার নামে আমি পুলিশে একটা রিপোর্ট করেছি। তারা অ্যাকশান নেবে কিনা জানি না। যদি না নেয় তাহলে আমি আপনার বিরুদ্ধে পলিটিক্যাল অ্যাকশান নেওয়ার চেষ্টা করব।

বিটু মেয়েটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। তার মুখের ওপর এরকম ভাবে কথা বলছে, মেয়েটা কে?

ঝিন্টু সাইকেলে কনুইয়ের ভর রেখে দৃশ্যটা দেখছিল। এটা ঠিকই মেজদাকে সে পছন্দ করছে না। রাগ এখনও দাউদাউ জ্বলছে ভিতরে। কিন্তু মেজদার অপমানটাও সে তো আর দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না।

ঝিন্টু হঠাৎ বলল, শুনুন দিদি, আমি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। তবে আপনার সাবজেক্টে নয়। আপনাকে চিনি। নতুন এসেছেন, এক সময় পলিটিকস করতেন, সব জানি। কিন্তু এভাবে রাস্তায় ঘাটে চোখ রাঙানোটা ঠিক নয়। আপনি চলে যান।

শচী ঝিন্টুর দিকে তাকাল। ছেলেটাকে তার চেনা ঠেকল না। বলল, তুমি এর মধ্যে কথা বলছ কেন?

ঝিন্টু ইংগিতে বিটুকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, আপনার ভিকটিম আমার দাদা, সহোদর ভাই। আমাদের সব ভাইকেই শহরের সবাই চেনে। কেউ কখনও চোখ রাঙায় না।

শচী রাগে জ্বলে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। তবু গলা ঠান্ডা রেখে বলল, কেন রাঙায় না বলো তো? তোমরা কি গুন্ডা?

গুন্ডা-ফুন্ডা নই। ভদ্রলোক। আর ভদ্রলোক বলেই রাস্তার লোক আমাদের চোখ রাঙায় না।

শচী তবু মাথা ঠান্ডা রাখল, তুমি জানো তোমার দাদা কী করেছে? একটা রোগ-ভোগা রিকশাওয়ালাকে এমন মেরেছে যে সে এখন কোথায় পড়ে আছে, বাঁচবে কি না ঠিক নেই!

ঝিন্টু একটু ভড়কে গেল। গণ্ডগোল একটু হয়েছে সে জানে। সেই গণ্ডগোলে তার আদরের সাইকেলটাও চোট হয়েছে। কিন্তু এটা জানত না।

অবাক হয়ে ঝিন্টু বলল, কী বলল?

কে বলবে? আমি হাসপাতাল থেকেই আসছি।

শচীর রিকশাওয়ালা ছোকরা ছেলেটা নেমে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হঠাৎ সে বলল, দিদি ঠিকই বলেছেন। লোকটার অবস্থা খারাপ।

ঝিন্টু বলল, কে দেখছে? ডাক্তার বাসু?

শচী দেবী জবাব দিল, হ্যাঁ।

ঠিক আছে, খোঁজ নিচ্ছি।

নাও। ভালো করে নাও।

ভাববেন না দিদি, আমরা ভদ্রলোক। রিকশাওয়ালার তেমন কিছু হলে আমরা দায়িত্ব নেব।

শচী বিটুর দিকে চেয়ে বলল, সেই কথাটাই বলতে আসা। ডাক্তার বাসু একটা প্রেসক্রিপশন করে দিয়েছেন। কয়েকটা ওষুধ আর ইনজেকশন, এগুলো হাসপাতালে পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে কিনতে হবে। রিকশাওয়ালারা চাঁদা তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে বোধহয় হবে না। যদি আপনারা ভদ্রলোকই হবেন তাহলে অন্তত লোকটার চিকিৎসার ভার নিন।

বিটু হাত বাড়িয়েছিল, তার আগেই ঝিন্টু ছোঁ মেরে প্রেসক্রিপশনটা শচীর হাত থেকে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। আমরা দেখছি।

শচী বিরক্তির গলায় বলল, ডাক্তার বাসু ওষুধগুলোর জন্য অপেক্ষা করছেন। একটু তাড়াতাড়ি দেখলে ভালো হয়।

বিটু মিইয়ে গেছে এটা ঠিক। আজই তার বাচ্চাটা জন্মেছে। এই দিনটায় যত অঘটন না ঘটলেও পারত। মাথাটা তার কেমন যেন নীরেট লাগছিল।

শচীর দিকে চেয়ে বিটু অতিশয় নরম গলায় বলল, দেখুন আমার একটা ভুল হয়ে গেছে। মানুষ সব সময়ে ইচ্ছে করে সব কাজ করে না। হয়ে যায়।

শচী একটু ভ্রূ কুঁচকে লোকটাকে দেখল। এক সময়ে লোকটা বেশ হ্যান্ডসাম ছিল, সন্দেহ নেই। সম্ভবত স্পোর্টসম্যান ছিল। শরীরটা পেটানো, শক্তপোক্ত, শচীর রাগটা এক পরদা নেমে গেল। তবু যথেষ্ট ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, রিকশাওয়ালার কোনও দোষ না। আপনি সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে পারেননি, অথচ ও বেচারা মার খেয়ে মরল।

সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে পারেননি কথাটা কানে খট করে লাগল বিটুর। সে অবশ্য রাগল না। বলল, ব্যালান্স তো সব সময়ে রাখা যায় না। যাই হোক, আমার ভাই যা বলেছে তাই হবে। লোকটা চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করব।

ঝিন্টু হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলল, কিন্তু মেজদা, উনি যে পুলিশে রিপোর্ট করেছেন তার কী হবে?

শচী অবাক হয়ে বলত, পুলিশে রিপোর্ট তো করাই উচিত।

ঝিন্টু মাথা নেড়ে বলল, পুলিশ যদি অ্যাকশন নেয় তাহলে আমরা লোকটার চিকিৎসা করাব কেন? পুলিশকে দিয়েই করান গে।

শচী এই উদ্ধত যুবকটির কথা শুনে বুঝল, ছেলেটা সোজা নয়! বলল, তাহলে কী করবে?

আমরা চিকিৎসাও করাব আবার জেলও খাটব তা তো হয় না। আপনি থানায় গিয়ে কেসটা উইথড্র করুন, বাদবাকি যা করার আমরা করব।

যদি না করি?

তাহলে আমাদের দায়িত্ব নেই।

শচী হাত বাড়িয়ে বলল, প্রেসক্রিপশনটা আমাকে ফেরত দাও।

ঝিন্টু পকেট থেকে সজোরে প্রেসক্রিপশনটা বের করে একরকম ছুঁড়ে দিয়ে বলল, অতই যদি দরদ তাহলে নিজের পকেট থেকে খরচ করুন।

শচী অসহায় রাগে মূক হয়ে গেল।

বিটু মৃদু স্বরে বলল প্রেসক্রিপশনটা আমাকে দিন।

না থাক। যা পারি আমিই করব।

রাস্তায় দু-চারজন দাঁড়িয়ে গেছে এবং ভিড় জমে যাওয়ার লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠছে দেখে শচী আত্মসংবরণ করল। আসলে ঠিক এভাবে অ্যাপ্রোচ করাটাও বোধহয় ঠিক হয়নি। রাগ এবং ঝোঁকের বশে সে ওরকম হুট করে এদের মুখোমুখি হয়েছে।

শচী বিটুর দিকে ফিরে বলল, আপনি কোনও কথাই বলবেন না। আমি আপনার মুখ থেকে জবাবটা শুনতে চেয়েছিলাম, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবে না।

বিটু কথাটা শুনল, কিন্তু তবু কেমন যেন ভ্যাবলার মতো চেয়ে রইল। তারপর বলল, ভুল হয়ে গেছে। আমার মেজাজটার কিছু ঠিক নেই। তারপর ঝিন্টুর দিকে চেয়ে বলল, তুই এখান থেকে যা তো। চ্যাটাং চ্যাটাং অনেক কথা বলেছিস। যা।

বিটুর চাপা আক্রোশ তার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছিল। ঝিন্টু আর কথা বাড়াল না। সাইকেলে উঠে চলে গেল।

শচী এসে রিকশায় উঠল। ব্যাসস্ট্যান্ডে গিয়ে বাস ধরবে।

১৫

বিকেল পাঁচটা নাগাদ .গৌরের জিপ গাড়িটা এসে লাভ স্টোরের সামনে থামল। গৌর নেমে এল।

বিটু!

আরে, কাকা! কী খবর, কিছু লাগবে?

গৌর গম্ভীরভাবে বলে, তুই দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যা।

কেন?

বাড়ি গিয়ে বই-টই পড়। আজ দোকানে থেকে কাজ নেই।

কেন বলুন তো! বিকেলেই তো বিক্রিবাটা।

রিকশা ইউনিয়ন থেকে স্ট্রাইক কল করেছে। মিছিল বেরোবে। সিচুয়েশন খারাপ হতে কতক্ষণ? পুলিশ অ্যাকশন নেবে, খবর পেয়েছি।

বিটুর ফরসা মুখটা আচমকাই লাল হয়ে উঠল। রাগে, অপমানে গরগর করে উঠে সে বলল, কেন, লোকটা কি মরে গেছে?

মরে যে যায়নি সে তোর কপাল ভালো বলে। ডাক্তার বাসু বুক দিয়ে আগলে না থাকলে এতক্ষণে হয়ে যেত। তা কমও কিছু হয়নি। আমি হাসপাতালে খবর নিয়ে এসেছি। অক্সিজেন স্যালাইন চলছে।

বিটু মাথা নেড়ে বলল, আমি দোকান বন্ধ করব না। যা হয় হোক দোষ যখন করেই ফেলেছি, একটা ফলও পেতে হবে।

অত বীরত্ব ভালো নয়। এটা ট্যাকটিকসের যুগ। ফিলজফির নয়। যা বলছি শোন। বাড়ি যা। না যদি যাস তবে তোর মা-বাবা এসে চ্যাঁচামেচি শুরু করবে।

স্ট্রাইক কল হল, ঝিন্টু জানে না?

জানে। জেনে কী করবে?

ঝিন্টুর তো হোল্ড আছে।

ছিল। এখন নেই। পলিটিকসে হোল্ড রাখা অত সোজা নয়! তুই তো আর খবর রাখিস না।

বিটু কেমন হাল-ছাড়া গলায় বলল, ঠিক আছে। আপনি যান, আমি দেখছি।

গোঁয়াতুর্মি করিস না কিন্তু। হাঙ্গামা হলে ঠেকানোর কেউ নেই। মিছিল এই রাস্তা দিয়েই যাবে। বাঘা যতীন পার্কে জমায়েত শুরু হয়ে গেছে। যদি চাস তো জিপটা রেখে যেতে পারি। ড্রাইভার তোকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

আমি নিজেই যেতে পারব কাকা, আপনি চলে যান।

আর একটা কথা। পুলিশ তোকে আজ হোক কিংবা কাল হোক, অ্যারেস্ট করবেই। অ্যারেস্ট করতে এলে রেজিস্ট করিস না। পুলিশের কর্তাকে আমার কথা বলা আছে। অ্যান্টিসিপেটরি বেইলও নিয়ে রাখছি।

বিটু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে শুনল। জবাব দিল না।

তুই কীসে যাতায়াত করিস?

একটা বাঁধা রিকশা আছে।

সেটা কই?

সে তো রাত ন'টায় নিতে আসবে।

তাহলে কীসে বাড়ি ফিরবি?

আর একটা রিকশা ধরে নেব।

গৌর বিরক্ত গলায় বলে, তোর মাথায় কথাটা ঢুকছে না—না কি? বললাম না স্ট্রাইক কল হয়েছে। রাস্তা থেকে সব রিকশা তুলে নিয়েছে। বাস-টাসও বন্ধ হয়ে যাবে এর পর।

তাহলে হেঁটেই চলে যাব।

ভেবে দেখ। জিপটা রেখে যাব?

না। দরকার নেই।

একা ফিরবি, লোকের মাথা এখন গরম। সামনাসামনি কিছু না করলেও দূর থেকে ইঁটফিট মেরে দিতে পারে।

এখনও লোকের এত সাহস হয়নি কাকা।

ওই অহংকারেই তুই গেলি। ভাবছিস বিটু মস্তান এখনও মস্তানই আছে। বোকা কোথাকার, তোদের যুগ বহুদিন আগে শেষ হয়ে গেছে। আমি বলি, এই সিচুয়েশনে বীরত্ব দেখনোটা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। পাবলিক খেপলে কোনও বীরত্বই টেঁকে না।

এই বলে গৌর জিপগাড়িতে গিয়ে উঠল। চলে গেল।

বিটু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। দোকানে খদ্দের অনেকক্ষণ আসেনি। রাস্তায় বাস্তবিকই কোনও রিকশা দেখা যাচ্ছে না। আবহাওয়াটা কি একটু থমথমে?

বিটু লাভ স্টোরের সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল। দোকানে নিজের প্রিয় জায়গাটিতে বসে ভাবতে লাগল।

কেন মারলাম লোকটাকে? কোনও ভাইট্যাল কারণও ছিল না। লোকটার বয়স বেশি, রোগা, গাঁইয়া, মারার তো কারণও নেই। আজ সে প্রথম বাবা হল, আর আজই এই ঘটনা? বাচ্চাটা কি তাহলে অপয়া?

কর্মচারীরা একটু গা-ছাড়া ভাবে বসে আছে। সুখময় আর প্রবীর দুজনেই নিরীহ প্রকৃতির, ভীতুও।

বিটু দুজনকে ডেকে বলল, প্রবীর, সুখময়, তোরা বাড়ি চলে যা। এবেলা আর আসতে হবে না।

প্রবীর অবাক হয়ে বলে, কেন দাদা?

দোকান বন্ধ করে দেব।

এখনই?

না, একটু বাদে। কিন্তু তোদের থাকার দরকার নেই।

হাঙ্গামা হবে নাকি?

হতে পারে।

তাহলে আপনিই বা থাকবেন কেন?

আমার একটু খুচরো কাজ আছে। হিসেব মিলিয়ে যাব। তোরা যা। একটু দোনোমোনো করল দুজন। তারপর সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল। বিটু একা। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে বাইরের লোক চলাচল দেখল বিটু। তারপর উঠে রোলিং শাটারটা টেনে নামিয়ে দিল। দোকান থেকে বেরোনোর ওই একটাই পথ।

ভিতরটা সঙ্গে সঙ্গে ভেপসে উঠল। সামান্য ভেন্টিলেশন দিয়ে তেমন বায়ু চলাচল নেই। পাখাটা খুলে বিটু, তার হিসেবের খাতা নিয়ে বসল। সে একজন সফল দোকানদার, তার বেশি কিছু নয়। শুধু কেনাবেচা। এইভাবেই একদিন জীবন শেষ হয়ে যাবে।

বছরতিনেক আগে একবার বন্ধুদের সঙ্গে কেদারবদ্রী গিয়েছিল বিটু। তারপর আর বাইরে কোথাও বেড়াতে যায়নি। কেদারবদ্রীর স্মৃতি তিন বছরেই ঝাপসা হয়ে এসেছে। এক বদ্ধ জলাশয়ে, নিত্যকার চেনা মানুষজনের মধ্যে একই প্যাটার্নের জীবনযাপন করতে করতে মানুষের কি পচন ধরে? তার মধ্যে নানা উন্মার্গগামিতা মাথা চাড়া দেয়?

দেয়, নইলে সে কেন এতটা অস্বাভাবিক?

আর এক মস্ত যন্ত্রণা হল সোমা। যাকে সে ভালোবাসে না, যার প্রতি তার কোনও আসাক্তি নেই, তার সঙ্গে দিনের পর দিন এক ঘরে রাত কাটানো যে কী শক্ত! অথচ সোমা মেয়েটা খারাপও নয়। অনাদরে মানুষ হয়েছে বলে ওর প্রতি স্বাভাবিক একটু করুণাও হতে পারত তার। কিন্তু তাও হয়নি। মায়ের মুখ চেয়ে বিয়ে করতে হয়েছিল। ব্যস, ওইটুকুতেই তার কর্তব্য ফুরিয়ে গেছে।

বন্ধ দোকান ঘরের মধ্যে ফ্যানের হাওয়ায় আবদ্ধ বাতাসই ঘুরে ঘুরে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে দিচ্ছে। হিসেবটা ঠিকমতো করতে পারছে না সে।

বাচ্চাটা চেয়েছিল সোমাই। একদিন কেঁদে কেটে বলেছিল, যদি আমাকে তোমার প্রয়োজন না-ই থাকে তাহলে অন্তত আমাকে একটা অবলম্বন দাও। একটা বাচ্চা হোক, তাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে পারব। নইলে গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে।

সেই সুবাদে এই বাচ্চা। সোমার হার্ট ভালো নয়। বাচ্চা এখনই হোক তা ডাক্তাররাও চাননি। বাসু একবার বলেছিলেন, আগে হার্টটা ঠিক করে আসুন তারপর ওসব হবে।

বাইরে কার গলা না?

বিটু বাতি নিবিয়ে দিল। তারপর উঠে গিয়ে শ্যাটারে কান পাতল।

মনে হচ্ছে ঝিন্টু আর তার সাঙ্গপাঙ্গোরা।

ঝিন্টু কাকে বলল, দোকান তো বন্ধ দেখছি। কিন্তু তালা তো বাইরে লাগানো নেই!

ভিতরে নেই তো?

মেজদা! এই মেজদা!

বিটু ভাবল, জবাব দেবে না। তারপর সিদ্ধান্ত পালটে শ্যাটারটা টেনে খানিক তুলল।

কী রে?

দোকান বন্ধ করেছিস না কি?

গৌর কাকা তাই তো বলে গেল।

বন্ধ করে ভালো করেছিস। জোর হাঙ্গামা হতে পারে। তোকে বাড়ি নিয়ে যেতে মা পাঠিয়ে দিল।

বিরক্ত বিটু বলল, আমি নিজেই যাচ্ছি। তোরা আয়।

নিজে পারবি না। বহু লোক জড়ো হয়েছে বাঘা যতীন পার্কে। লেকচার হচ্ছে। বাজার গরম।

শুনেছি। গৌর কাকা বলে গেছে।

দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেছে মেলা।

তাতে কী?

তোর বাড়ি যাওয়াটা উচিত। মা-বাবা ভাবছে।

পুলিশ এসেছিল?

এখনও আসেনি। চল, আর দেরি করিস না।

বিটু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। একটু ভাবল। তারপর বলল, চল।

সন্ধ্যাবাতিটাও দেওয়া হল না।

ওসব পরে ভাবিস।

বিটু দোকানে তালা দিচ্ছিল নীচু হয়ে, এমন সময় একটা মস্ত ইঁট এসে লাগল ঠং করে রোলিং শাটারের গায়ে।

বিটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। কার এত সাহস?

ছায়ামূর্তির মতো সটাসট সরে গেল ঝিন্টু আর তার সাঙ্গপাঙ্গোরা।

আর তখন মাঝারি মাপের একখানা ইট উড়ে এসে জমে গেল বিটুর কপালে।

টুঁ শব্দটিও করতে পারল না বিটু। ধড়াস করে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল।

১৬

বহুকাল বাদে গৌর কন্ট্রাক্টর মুখোমুখি হল সুমনার।

ছেলেরা আজ কেউ বাড়ি নেই। ব্রহ্মকুমার নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। তারপর হাসপাতালে গেছেন আহত রিকশাওয়ালার বিলিব্যবস্থা দেখতে। সেখান থেকে নিউ মার্কেট যাবেন বিকেলের বাজার করতে। ফিরে এসে মক্কেল নিয়ে রাত দশটা অবধি কাটিয়ে দেবেন কাছারিঘরে।

সুমনা আজ বড্ডই একা।

গৌরের জিপ যখন বাইরে থামল তখন সুমনা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। এই বয়সেও গৌরকে দেখলে বুক কাঁপে। লজ্জায় রাঙা হন।

দরজাটা খুলে দিয়ে বললেন, এসো।

কর্তাটি কই?

বেরিয়েছে।

রিকশা ছাড়া বেরেল কী করে?

হেঁটেই।

হাঁটা তো ভালোই। তোমার কর্তা দিনকে দিন তো স্থাবর হয়ে যাচ্ছে। কেবল টাকা রোজগার ছাড়া কোনও ব্যায়াম নেই। এভাবে চললে তো ব্লাড সুগার বেড়ে যাবে।

সেই চিন্তায় বুঝি ঘুম হচ্ছে না। কী খবর বলো তো! পাশের বাড়ির ছেলেটা এসে বলে গেল, বিটুকে নাকি মারধর করতে পারে!

গৌর গম্ভীর হয়ে বলে, তোমার এ ছেলেটা মানুষ হল না সুমনা। একটি একগুঁয়ে গাড়ল।

সুমনা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, ছেলেটা কার দেখতে হবে তো?

গৌর নীরবে সুমনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, হঠাৎ বুঝি মনে পড়ল কথাটা?

হঠাৎ পড়বে কেন? সব সময়েই মনে হয়।

তোমার কোনও পাপবোধ নেই তো?

সুমনা মাথা নড়লেন, না, নেই। কেন থাকবে বলো। ওদের একজনেও যে তোমার সেটাই আমার সান্ত্বনা। নইলে তোমার ওপর খুব অবিচার করা হতো। সে কথা থাক, কী করবে এখন বলো তো?

গাড়লটাকে তো বললাম, দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে আসতে, এখনও আসেনি?

না।

থানা পুলিশ নিয়ে ভয় নেই। ম্যানেজ করা যাবে। কয়েকটা দিন ওকে কোথাও পাঠানো যায় না?

যাবে কি?

তোমার কথা নাকি খুব শোনে?

শোনে। আবার শোনেও না। অত বড় ছেলেকে কি আর ইচ্ছামতো চালানো যায়। তুমি ভিতরে এসে বেসো। চা করে দিই।

বসব? এখন কি আর বসবার সময় আছে?

একটু বোসো। ফাঁকা বাড়িটায় কেমন ভার লাগছে বুকটা। আচ্ছা বিটুর কি খুব বিপদ?

আরে না। তোমার ছেলেরা কিছু কম গুন্ডা নয়। পিন্টু, বিটু, ঝিন্টু এরা কি কিছু হাঙ্গামা করেছে?

ভয় তো সেখানেই। বিশেষ করে বিটু। বিয়ের পর এখন একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে বটে, কিন্তু আগে ওকে নিয়েই ছিল আমার সবচেয়ে বেশি ভয়।

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিটুই ছিল তোমার ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে ব্রাইট।

সুমনা আবার লাল হলেন। মেয়েদের কতই গোপন কথা থাকে। দুনিয়া জানতে পারে না, কিন্তু তলায় তলায় কত বাঁধ ভাঙে, ভূমিক্ষয় হয়, ঝড় বাদলায় মাতাল হয় যায় অভ্যন্তর। ও কি পাপ হয়েছিল তাঁর? গৌরকে আর তো কি ছুই দেওয়া যায়নি। ওই একটি সন্তান শুধু। এমনকী পাপ হয়েছিল?

পাপ-পুণ্য কর্মফলের হিসেব করে কি শেষ করা যায়? ও হতেই থাকে, হয়েই যেতে থাকে। কে যে পাপ-পুণ্যের বিচার করে কে জানে?

সুমনা মাথা নীচু করে ছিলেন। খুব ধীরে মাথাটা তুলে বললেন, কী হল বলো তো? এই ব্রাইট ছিল, কেন অমনধারা হয়ে গেল?

গৌর খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, তেমন খারাপও তো কিছু হয়নি। বলতে পারো, সিনেমার নায়ক বা অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তা না-ই হল, মদ মেয়েমানুষের দোষও ডেভেলপ করেনি। তা ছাড়া মন্দ গুণ, মাতৃভক্ত। মায়ের ওপর টান থাকলে সব কাটিয়ে উঠবে।

সুমনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ নাতি হল আমার। তোমারও। কত আনন্দের দিন। আর কী সব হচ্ছে দ্যাখো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ। বসো তো, চা করে আনি।

তোমার কাজের লোকটা কোথায়?

নার্সিংহোমে গেছে বউমার খাবার নিয়ে। খেতে তো আর পারবে না আজ। তবু পাঠিয়ে দিলাম।

গৌর বসল।

সুমনা রান্নাঘরে গিয়ে সযত্নে চা করলেন দু-কাপ। প্লেটে বিস্কুট আর চানাচুর সাজিয়ে নিয়ে এলেন, ট্রেতে করে। গৌর খুব চানাচুর, ঝালমুড়ি তেলেভাজা ভালোবাসে। এই সব করেই পেটে আলসার বাঁধিয়ে বসেছিল। খাও।

গৌর কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। তেমনি আনমনেই চা খেল।

কী ভাবছ বলো তো!

কত কী! তোমার কথা, আমার কথা, আমাদের কথা। তোমরা ছাড়া আমার আপনজন আর কে আছে বলো সুমনা।

আপনজনের কথা আর বলো না। পুরুষেরা থোড়াই আপনজনদের তোয়াক্কা করে। কর্তাটাকে তো দেখছি, আমরা থেকেও নেই।

১৭

বিটুকে ইটটা যে নির্ভুল লক্ষ্যে ছুঁড়ে মেরেছিল সে কোনও রিকশাওয়ালা নয়। ঝিন্টু তাকে ভালোই চেনে। পালপাড়ার লাট্টু। নয়া মস্তান। মেঘদূত সিনেমা হলে যারা টিকিট ব্ল্যাক করে তাদের সরদার। হংকং মার্কেটে দুটো স্টল দিয়েছে। বিরাজবাবুর কাছ থেকেই যখন দোকানটা নেয় বিটু তখন লাট্টুও চেষ্টা করেছিল। তখন থেকেই বিটুর সঙ্গে খটাখটি। মিনি বাস-এর জন্য ব্যাঙ্কের লোন পেতে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিল। ঝিন্টুর জন্য লোনটা হয়নি। সেই রাগও আছে।

ঝিন্টু গোটা ষাটেক লোককে চক্রকারে এগিয়ে আসতে দেখতে পেয়েই ঝাঁপ খেয়ে সরে যায়। সে বুঝতে পেরেছিল ওরা মারলে বিটুকেই মারবে।

ইট খেয়ে বিটু যখন লাট হয়ে পড়ল তখন ঝিন্টু আর তাই দুই বন্ধু কী করবে ঠিক করতে পারছিল না। লাট্টু পালায়নি। সজ্ঞানেই এগিয়ে এল পড়ে থাকা বিটুর কাছ বরাবর।

লাট্টু ঝিন্টুর দিকে চেয়ে বলল, ফোট, নইলে কলজে খিঁচে নেবো।

ঝিন্টু একটু কাঁপা গলায় বলল, ওকে মারছিস কেন?

তাতে তোর বাবার কী? ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

খুন করতে চাস?

লাট্টু, এর ফল ভালো হবে না।

যাঃ, যাঃ বে, এই লালু, দে শালাকে ভরে।

লালুকেও চেনে ঝিন্টু। মহাবীরস্থানের কাছে বাড়ি। একনম্বর হেক্কোড়। ঠোঁট চোয়াল, হিংস্র।

ঝিন্টু পালাতে পারত। গায়ের জোরে না হোক ছুটে এদের আজও হারিয়ে দিতে পারে সে। কিন্তু সব কিছুরই তো একটা শেষ আছে।

ঝিন্টু কিন্তু ভাবনা চিন্তা না করেই এগিয়ে গেল। তারপর আচমকা লাফিয়ে একটা লাথি কষাল সোজা লালুর বুকে। শব্দটা হল সাংঘাতিক। মড়াৎ।

ঝিন্টুর পা বিখ্যাত। সাইকেল চড়ে এবং দু-পায়ের আরও বহু ব্যায়ামের পর দুখানাতেই সাংঘাতিক জোর।

লালু বুকটা চেপে ধরে একটা কোঁক শব্দ করে মাতালের মতো কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েই পড়ল।

তারপর কী হল ঝিন্টুর আর মনে নেই। বিস্তর দ্রুত পা হাত ঘুঁষি ইট ইত্যাদির মধ্যে একটা ক্যালোর্ডওস্কোপ কোনও প্যাটার্নই স্থির নয়।

তবে ঝিন্টুর জ্ঞান রইল না।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন বাসু ডাক্তার তার মুখের দিকে চেয়ে চিন্তিত ভাবে বসে আছেন।

কোথায় লেগেছে ঠিক বুঝতে পারছে না ঝিন্টু। মনে হচ্ছে শরীরের কোনও অংশই বাকি নেই। মাথা থেকে পা অবধি শরীরটা কোথাও অবশ, কোথাও ফোঁড়ার মতো যন্ত্রণা।

বেশ কয়েক মিনিট লাগল মাথার ধোঁয়াটে ভাবটা কাটতে।

ডাক্তার বাসু বললেন, তোমাদের আজকের দিনটাই খারাপ। না?

কেন? কী হয়েছে?

কত কী তো হল।

মেজদা! মেজদা কি শেষ?

বাসু মাথা নাড়লেন, না, শেষ কি এত সোজা? একটা মানুষ বড় অল্পে শেষ হয় না। একটু সময় নাও। পুলিশ অপেক্ষা করছে জেরা করার জন্য।

আমার বাবা কোথায়?

তিনিও আছেন।

লালুকে আমি একটা লাথি মেরেছিলাম বাসুদা।

বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, মাথা ঠান্ডা রাখো।

লালুকে তুমি লাথি মেরেছিলে কি না তা তো কেউ জানে না। পুলিশকে তোমার অত কিছু বলার দরকার নেই। শুধু বোলো বিটুকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি মার খেয়েছ।

ঝিন্টু একটু হেসে বলল, আমি উকিলের ছেলে, কী বলতে হবে তা জানি। আউট অফ রেকর্ডস আপনাকে জিগ্যেস করছি, লালুর অবস্থা কী?

পাঁজরে কয়েকটা হাড় ভেঙেছে। যদি ভাঙা হাড় ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে থাকে তবে কেস খুব সিরিয়াস। সাধারণত পাঁজরের হাড় ভিতর দিকেই ভেঙে ঢোকে। কাল সকালের আগে কিছু বোঝা যাবে না।

আর লাট্টু? ওর কিছু হয়নি?

লাট্টু কে?

ওই যে মেজদাকে ইট মেরেছে। লম্বা, ছিপছিপে, হাড়কাঠ চেহারা। মেঘদূতে টিকিট ব্ল্যাক করে, দ্যাখেননি?

বাসু হাসলেন, না আমি সিনেমা দেখার সময়ও পাই না।

আমার চোট কতখানি বাসুদা।

কয়েকদিন ভুগবে। বিটুকে মারল কেন জানো?

না বাসুদা, আজকাল কে যে কাকে মারে তার কোনও ঠিক নেই।

লাট্টুর খাড় ছিল। অনেক কারণ।

যাকগে। তুমি পাঁচ মিনিট শুয়ে চোখ বুজে মনটাকে ঠিক করে নিও। পুলিশ আসছে।

আমি কি আন্ডার অ্যারেস্ট?

না, এখনও নও।

বাসু চলে গেলেন, পুলিশ এল। ঝিন্টু পুলিশ ইনস্পেকটরকে ভালোই চেনে। তাদের বাড়িতেও গিয়েছে কয়েকবার।

এই যে ঝিন্টুবাবু কী খবর?

ভালো।

প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?

পারব।

গণ্ডগোলটা লাগল কী করে?

গণ্ডগোল লাগেনি। লাট্টু হঠাৎ মেজদাকে ইট মারল। মেজদা তখন দোকান বন্ধ করছিল। ইন ফ্যাক্ট মেজদাকে দোকান থেকে আমিই টেনে বের করেছিলাম।

লাট্টুর ঠিকানা জানো?

হাসালেন স্যার, লাট্টুর ঠিকানা সবাই জানে।

ইনস্পেক্টর একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, তা বটে। তবে এখন সেখানে সে নেই। অ্যাবসকন্ডিং।

হংকং মার্কেটে ওর স্টল আছে।

সেখানেও খোঁজা হয়েছে।

তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই। তোমার দাদা বিটুর সঙ্গে ওর কোনও শত্রুতা ছিল?

লাভ স্টোরের ঘরটা লাট্টু নিতে চেয়েছিল। তখন কিছু হয়ে থাকলে থাকতে পারে।

লাট্টু পলিটিক্স করে কি না জানো?

না। তবে গুন্ডা বদমাশদের পলিটিক্যাল কভার তো একটা থাকবেই।

সেটাই হয়েছে মুশকিল। একজন লিডার অ্যান্টিসিপেটারি বেইল চেয়েছেন ওর জন্য।

তাহলে কেস কেঁচেই গেল।

না, না, অত সহজে কাঁচবে না, আমরা তো আছি।

মেজদা কোনও স্টেটমেন্ট দিতে পেরেছে?

না। জ্ঞান এখনও ফেরেনি।

ওকে জিগ্যেস করলে জানতে পারবেন। আর সেজদা পিন্টু যদি কিছু জানে।

তোমার সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে, সুতরাং যা হয়েছে তার একটা ডিটেল স্টেটমেন্ট কাল এসে নেব। তোমার সঙ্গে বোধহয় তোমার দুই বন্ধুও ছিল, তাই না।

হ্যাঁ। তারা কোথায় তা অবশ্য জানি না। মারপিটের সময় যে কোথায় ছিটকে গিয়েছিল কে জানে। ওদের কোনও খবর জানেন?

না। ইনজিওরড অবস্থায় তিনজনকে পাওয়া গিয়েছিল। তুমি, বিটু আর লালু।

ঝিন্টু চোখ বুজল! একটু শঙ্কিত গলায় বলল, আমার সাইকেলটা ছিল। সেটা আস্ত আছে?

ইনস্পেক্টর একটু হাসলেন, সাইকেল ঠিক আছে। ভয় নেই।

ইনস্পেক্টরের দিকে চেয়ে ঝিন্টু একটু হাসল। তৃপ্তির হাসি। পৃথিবীতে তার সাইকেলখানার চেয়ে মূল্যমান সামগ্রী আর কী-ই বা আছে?

শোনো ঝিন্টু, আমি চাই না তোমার ওপর আর কোনও হামলা হোক। লালুকে তুমি যে লাথিটা মেরেছ সেটা ফেটাল হতে পারত। এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। যদি লালুর কিছু হয় তবে কেসটা জটিল হয়ে যাবে।

আমি কী করব? লালুকে না মারলে যে লালুই আমাকে মারত।

সে তো জানি। আমি বলি কি, তুমি তোমার স্টেটমেন্টে লালুকে মারার কথাটা কাবুল কোরও না। তোমার বাবা অবশ্য সবই সাজিয়ে দেবেন। তবু বলে গেলাম।

ইনস্পেক্টর চলে যাওয়ার পরই ব্রহ্মকুমার ঘরে ঢুকলেন। চারদিক চেয়ে হাসপাতালের বিলিব্যবস্থার প্রতি নাসিকাকুঞ্চন করে ছেলের দিকে তাকালেন।

ব্রহ্মকুমারের একটিই সমস্যা। ছেলেদের সঙ্গে তিনি সহজ ভাবে কথা বলতে পারেন না। আসলে সওয়াল জবাব ছাড়া অন্যরকম কথার অভ্যাসটাই তাঁর চলে গেছে।

কী রে? অ্যাঁ! কী সব হচ্ছে! তোরা সব কী গণ্ডগোল করছিস?

ঝিন্টু বাবার দিকে চেয়ে রইল করুণভাবে। বলল, বাবা, আমরা কিন্তু কিছুই করিনি।

করোনি! অ্যাঁ! করোনি! তাহলে রিকশাওয়ালটাকে বিটু মেরেছিল কেন? অ্যাঁ।

তুমি কি ভাবছো সেজদাকে রিকশাওয়ালারা মেরেছে?

তাই তো শুনছি। লাট্টু না কী যেন নাম!

সে রিকশাওয়াল নয়। ব্ল্যাকার।

ও-ই হল। এ সব ভালো কথা নয়। তোর এখন কেমন লাগছে?

ভালো। আমার কিছু হয়নি।

কিন্তু হতে পারত। সাংঘাতিক হতে পারত। তোমরা দুই ভাই আজ মারাও যেতে পারতে।

মরিনি তো! বাবা, মা কোথায়? আসেনি?

তাকে খবর দেওয়া হয়নি। প্রেশার বেড়ে যেত শুনলে।

তুমি ভয় পেয়ো না বাবা। আমরা সামলে উঠব।

বিটুটার এখনও জ্ঞান নেই।

ডাক্তার কী বলছে?

বাসু তো বলছে চিন্তা নেই। কিন্তু কত রক্ত গেছে। তার ওপর তুই আবার কাকে লাথি মেরেছিস। পুলিশ কেস।

ও কিছু নয়। সে তো বিকেলে মেরেছি। পুলিশ বলল, ওটা স্টেটমেন্টে উল্লেখ না করতে।

ব্রহ্মকুমার সামান্য উষ্মার সঙ্গে বললেন, গুন্ডাদের খেপিয়ে দিলে তারা কি তোমাদের সহজে ছাড়বে?

তাদের পরিবারে ঝিন্টুই একমাত্র লোক যে ব্রহ্মকুমারের সঙ্গে মোটামুটি জড়তাহীন ভাবে কথা বলতে পারে। ব্রহ্মকুমারের বোধহয় এক কনিষ্ঠ পুত্রটির ওপর একটু বিস্ময়কর টান থেকে গেছে। ঝিন্টু তাই ব্রহ্মকুমারের চোখের দিকে চেয়েই বলল, লাট্টু এমন কিছু মস্তান নয় বাবা। ওকে ভয় খাওয়ার কিছু নেই। দেখলে না, মেজদাকে সামনে থেকে অ্যাটাক করার সাহস পর্যন্ত নেই। আগে খাড়া হই সাত দিনের মধ্যে তারপর ওকে শিক্ষা দিয়ে দেব।

ব্রহ্মকুমার রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললেন, নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়াটা সবচেয়ে বড় অপরাধ। ও সব যারা করে তারা করুক। তোমাদের ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী? লাট্টু একটা অন্যায় করেছে, তার জন্য পুলিশ যা করার করবে।

বাঃ, আর আমরা ছেড়ে দেব?

তোমরা একদম গণ্ডগোল করবে না, এটা আমার অর্ডার বুঝলে।

ঝিন্টু বাবাকে চেনে। খেপলে চণ্ডাল, ভালো থাকলে গঙ্গাজল। সে একটু হেসে বলল, ঠিক আছে বাবা। তবে পুলিশ কিছু করবে না। ধরলেও লাট্টুকে ছেড়ে দেবে। তখন কী হবে?

সে তখন দেখা যাবে।

ব্রহ্মকুমার উঠলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, তোমার মা এখনও খবরটা জানেন না। জানলে কী হবে বুঝতে পারছি না।

বিটুর জ্ঞান ফিরেছে অনেকক্ষণ। সে শক্ত মালে তৈরি। বহু জলঝড় তার ওপর দিয়ে গেছে এক সময়। ঘায়েল হলেও সে নিস্তেজ হয়ে বা নেতিয়ে পড়েনি।

অনেকটা রক্ত গেছে। মাথার ক্ষতটাও বেশ গভীর। তবু জ্ঞান ফেরার পর থেকেই সে ছটফট করছে, আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে বাড়ি যেতে দিন।

ডাক্তার বাসু চিন্তিত ভাবে বললেন, বাড়ি যাওয়াটা রিস্কি হবে বিটুবাবু। অন্তত আজকের রাতটা রেস্ট নিন। হেড ইনজুরিতে অবজারভেশনে রাখাটা ভীষণ জরুরি।

আমার কিছু হয়নি। ছেড়ে দিন।

কতটা রক্ত গেছে জানেন?

আমি প্রতি মাসে একবার ব্লাড ডোনেট করি। শরীরে অনেক ফালতু রক্ত থাকে ডাক্তার বাসু, আমি জানি ইট-ফিট আমি অনেক খেয়েছি। ছাত্র আন্দোলন করেছি না! দুবার ছুরি খেতে হয়েছিল।

তাহলে তো আপনার অভিজ্ঞতা অনেক।

হ্যাঁ। তাই তো বলছি দু-চার লিটার রক্ত চলে গেলেও আমার কিছু হবে না।

ডাক্তার বাসু একটু হাসলেন। বড়লোকদের তেমন কিছু হয় না তা তিনি জানেন। তাদের শরীরে যথেষ্ট বাড়তি রক্ত থাকে। তারা মরে অতি ভোগে, রোগগ্রস্ত হয়ে।

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের তিন তলায় কেবিনে দুটো বিছানাওয়ালা এই ঘরখানাই হাসপাতালের শ্রেষ্ঠ ঘর। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ঘরের অবস্থা এতই খারাপ যে, কোনওরকম ইনফেকশনই ঠেকানোর উপায় নেই। এই ঘরেই রাখা হয়েছে বিটুকে। পাশের বেডে হাতে নল, মুখে নল আর একজন রুগি। অচেতন।

ডাক্তার বাসুকে একজন লোক দরজার কাছ থেকে ডাকল, স্যার।

কী হল আবার?

ওই পেশেন্টের বউ এসেছে।

বউ? ডাকো।

ডাক্তার বাসু হঠাৎ বিটুকে জিগ্যেস করলেন, ওই পেশেন্টকে চিনতে পারছেন?

না তো! কে?

মনে পড়ছে না। আজ দুপুরে যাকে আপনি মেরেছিলেন সেই রিকশাওয়ালা।

বিটু কেমন ফ্যাকাসে মেরে গেল। তারপর ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখল। বেড-এর মাথার ওপরকার বাতিটা নেবানো। মুখটা আবছামতো। একটু কাঁপা গলায় বিটু বলল, ও কি বাঁচবে?

বাঁচত না। রিকশাওয়ালা তো হাসপাতালের মেঝেয় পড়ে থাকত, কেউ অ্যাটেন্ড করত না, ওষুধ পড়ত না, মরে যেত। তবে আমি কেসটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম।

বিটু কাঁপা গলায় বলল, ডাক্তার বাসু, আমি জানি আপনি ভীষণ ভালো লোক।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, এ দেশে কোনও ভালো লোক নেই। আমিও নই। ভালো থাকার চেষ্টা হয়তো কেউ কেউ করি। কিন্তু যে সিস্টেমের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয় তা আস্তে আস্তে আমাদের খারাপ করতে থাকে।

বিটু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, জানি। সিস্টেমের কথা খুব জানি। বিটু জানবে না তো কে জানবে? বেঙ্গল টিমের স্কোয়াডেও সে শেষ অবধি চান্স পায়নি আর একজন কমজোরি খেলোয়াড় খুঁটির জোরে জায়গা করে দিয়েছিল বলে। কোচিং নিতে ইন্দোনেশিয়া যেতে চেয়েছিল। পারেনি। সে প্রকাশের মতো খেলোয়াড ছিল কি না কে জানে, কোচিং নিলে বোঝা যেত। আজকাল ব্যাডমিন্টন আর টেবিল টেনিস শিলিগুড়ির খেলোয়াড়েরা সারা ভারতেই সুযোগ পাচ্ছে। কেউ কেউ খুবই নাম করেছে। তাদের আমলে শিলিগুড়ির এত গুরুত্ব তো ছিল না। সিস্টেমই ডুবিয়েছিল বিটুকে।

বিটু স্বভয়ে লোকটার দিকে চেয়ে ডাক্তারকে বলল, আপনি কি ইচ্ছে করেই আমাকে ওর ঘরে রেখেছেন?

ডাক্তার বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ইচ্ছে করে রেখেছি বললে বাড়াবাড়ি হবে। তা নয়। আসলে এই ঘরখানাই হাসপাতালের সব চেয়ে ভালো ঘর। পেয়িং বেড। একজন রিকশাওয়ালার এখানে থাকার কথাই নয়। আমি নিজের রিক্স-এ রেখেছি। আর একটা বেড ছিল, আপনার সার্জিক্যাল কেস বলে এখানেই রাখতে হল। পরে দেখলাম ব্যাপারটা বেশ মজার। আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী একই ঘরে।

বিটু বালিশে কনুই রেখে উঠে বসল। বলল, ওর জন্য যা খরচ করতে হয়েছে সব আমি দেব ডাক্তারবাবু।

দেবেন।

শচী চক্রবর্তী নামে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর আজ আমাকে গিয়ে এ ব্যাপারটা নিয়ে ধমক চমক করছিল। অ্যাগ্রাসিভ টাইপের ভদ্রমহিলা।

জানি। উনি আজ এখানেও এসেছিলেন। রিকশার সওয়ারি ছিলেন তিনিই। পুলিশে উনিই রিপোর্ট করে এসেছেন, বললেন।

ডাক্তার বাসু হাসলেন, পুলিশ নীচে অপেক্ষা করছে বিটুবাবু।

অপেক্ষা করছে। কেন, আমাকে অ্যারেস্ট করবে নাকি?

বোধহয়। আর সেই জন্যই আজ রাতে আমি আপনাকে ছাড়তে চাইছিলাম না।

বিটু একটু চিন্তিত হয়। তারপর বলল, বাবা কি সব জানে?

আপনার বাবাও নীচে আছেন। আপনি অ্যারেস্ট হলেও জামিন পেয়ে যাবেন। সেটা প্রবলেম নয়। প্রবলেম হল হ্যারাসমেন্ট। আপনি পায়ে হেঁটে বেরোলে পুলিশ হয়তো থানায় নিয়ে যাবে। সেটা ভালো হবে না। কিন্তু এখানে যে আমার ঘুম হবে না।

আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে দেব। আনফিট অবস্থায় আপনাকে ছাড়লে আমার বদনামও হবে। অবশ্য বন্ড দিয়ে আপনি যে-কোনও সময়েই চলে যেতে পারেন।

এই সময়ে দরজায় এক শীর্ণকায়া যুবতি এসে দাঁড়াল। কালো চোখ, গলা বসা, পরনে একখানা সস্তা ছাপা শাড়ি। কাঁধে একটা বাচ্চা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই এসেছে।

ডাক্তার তার দিকে চেয়ে বললেন, কাঁদছো কেন? সব ঠিক আছে।

ও কোথায় ডাক্তারবাবু? একটু দেখা করে যাব।

দেখা তো হবে না। ওই শুয়ে আছে দরজা থেকেই দেখে নাও। কথা তো বলতে পারবে না।

জ্ঞান আছে?

জ্ঞান ফিরেছে। এখন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

মেয়েটা দোরগোড়ায় বসে পড়ল। বাচ্চাটা ককিয়ে উঠল। মেয়েটা বলল, খুনই হয়ে গিয়েছিল, সবাই বলছে যে!

না, তেমন কিছু নয়।

তবে অত সব নল কীসের?

ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওষুধ দেওয়া হয়েছে শিরা দিয়ে।

বাঁচবে তো?

না বাঁচলে এসে আঁশবটি নিয়ে আমার গলাটা কেটে দিও।

আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। গলা কাটতে হলে সেই গুন্ডাটাকে কাটতে হয় যে ওকে ওরকম করেছে।

বিটুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল দেখে ডাক্তার একটু হাসলেন। তারপর মেয়েটাকে বললেন, এই যে বাবুকে দেখছ একে কেমন লোক বলে মনে হয়?

মেয়েটা বিটুর দিকে জল ভরা চোখে তাকাল। আঁচলে চোখটা মুছে নিয়ে বলল, ভদ্রলোক।

একেও কারা যেন মেরেছে। মাথা ফেটে গেছে।

মেয়েটা কিছু বলল না।

ডাক্তার বাসু মেয়েটার দিয়ে চেয়ে বললেন, এরকম কত কী হয়ে যায়। বাচ্চাটাকে কিছু খাইয়েছ?

মেয়েটা মাথা নীচু করে বলল, এটাকে খাওয়াতে পারি। বুকের দুধ খায় তো। কিন্তু অন্যগুলো পেটে কিল মেরে আছে।

তোমার ক'টা বাচ্চা?

তিনটে। ওবেলা রান্না হয়নি। লোকটা তো তিন দিন জ্বরে পড়েছিল। আজ জ্বর গায়েই বেরিয়েছিল। এতগুলো লোক উপোস। আমি যে বাড়িতে কাজ করি তারা আগাম টাকা দেবে না।

ডাক্তার বাসু পকেট থেকে টাকা বের করলেন, যা তাঁকে প্রায়ই করতে হয়। গোটা কুড়ি টাকা মেয়েটার হাতে দিয়ে বললেন, দু-চারদিন আমার কাছ থেকে নিয়ে চালিয়ে নিও।

মেয়েটা টাকাটা হাতে ধরে বলল, রিকশাওয়ালারা চাঁদা তুলে কিছু দিয়েছে ডাক্তারবাবু।

কত দিয়েছে?

গুনিনি। গোনার মতো মনের অবস্থা ছিল না। পেট কোঁচড়ে বেঁধে রেখেছি। বেশি হবে না। দশ-বিশ টাকা।

ঠিক আছে। দু-চার দিন চালিয়ে নাও। এখন বাড়ি যাও। রান্নাবান্না করে বাচ্চাদের খাওয়াও গে। তোমার বরের জন্য চিন্তার কিছু নেই। ভালো হয়ে যাবে।

কথা বলবে না?

আজ নয়। কাল বিকেলে এসো। কথা বলতে পারবে।

বউটা বসে বসে খানিক্ষণ চোখ মুছল। তারপর কাউকে কিছু না বলে যান্ত্রিক ভাবে চলে গেল।

ডাক্তার বাসু বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, আমাকে রাউন্ডে যেতে হবে।

লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকুন।

আমার বাবা তো কই দেখা করতে এলেন না?

আসবেন। ছোট জনের সঙ্গে এখন আছেন।

ছোটো জন। বিটু অবাক হয়ে বলল, ছোট জন কে?

ঝিন্টু। আপনার চেয়ে মার সে বেশিই খেয়েছে। সিরিয়াস নয়, তবে ভুগবে ওই বেশি।

ঝিন্টু মার খেলো কেন?

আমি তো স্পটে ছিলাম না। কে বলবে কেন আপনারা মার খেলেন।

আমি কেন মার খেয়েছি তা আন্দাজ করতে পারি। কোনও রিকশাওয়ালার বুকের পাটা হবে না আমাকে ইট মারবে।

আপনার কি অনেক শত্রু।

শত্রু? হ্যাঁ অনেক। আমার শত্রুর অভাব নেই। অন্তত বারোজন মাড়োয়ারি আর গুজরাটি আর পাঞ্জাবি আমার দোকানটা কিনতে চেয়েছে। আপনি কি জানেন ইটটা কে মেরেছিল?

লাট্টু না কার নাম যেন শুনছিলাম?

লাট্টু? বুঝেছি। এর আগেও আমাকে থ্রেট করেছিল। লাট্টুর পিছনে অন্য লোক আছে। কিন্তু ওরা ঝিন্টুকে মারল কেন? ঝিন্টু তো কিছু করেনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বলল, ঝিন্টু আপনার মারের বদলা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর বিটু খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল চোখ বুজে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। রিকশাওয়ালার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে। বিটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ নয়। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

উঠে বসে বিটু অনুভব করল, তার তেমন কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। শরীরটা একটু দুর্বল ঠিকই। তার শরীরের ভিত শক্ত কাঠামোয় তৈরি। এই দুর্বলতা তার কাছে কিছুই নয়।

বিটু বিছানা ছেড়ে নামল এবং কয়েক পা হেঁটে দেখল। চমৎকার। কোনও জড়তা বোধ করছে না, মাথা টলমল করছে না, চোখে ঝাপসা দেখছে না। মাথায় একটা গভীর ব্যথা টনটন করছে। সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়।

বিটু ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

পুলিশ নীচে অপেক্ষা করছে হয়তো কিন্তু তারা সকলে বিটুকে চেনে না। তাছাড়া এমন কিছু সতর্কও তারা থাকবে না। কারণ বিটু বড় অপরাধী নয়।

বিটু একতলায় নেমে চারদিকে চেয়ে দেখল। রাত সাড়ে ন'টা। ভীড়ভাট্টা নেই। দুজন কনস্টেবল সিঁড়ির মুখে বসে আছে।

বিটু তাদের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল। তাকে কেউ তেমন গ্রাহ্য করল না।

রাস্তায় নেমে সে দেখল, রিকশা চলছে। বিকেলে ওর একটা মিছিল করেছিল ঠিকই। তবে ধর্মঘট হয়নি। সে একটা রিকশা থামাল। ছেলেটা চেনা, মন্টু।

বাড়তে পৌঁছে দে।

মন্টু একটু অবাক হয়ে বলল, আরে বিটুদা! আপনার কী হয়েছে?

ইট লেগেছে। সে অনেক কথা। দারুণ খিদে পেয়েছে। চালা।

মন্টু জোরে চালাতে গেল। কিন্তু পয়লা ঝাঁকুনিতেই মাথাটা ঝন করে ওঠায় বিটু ককিয়ে উঠে বলল, একটু আস্তে। ঝাঁকুনি লাগলে ফের হেমারেজ হবে রে।

পিন্টু যখন ফিরল তখন সুমনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ রে, কী সব শুনছি?

কী শুনছ?

বিটু আর ঝিন্টুর কী হয়েছে?

পিন্টু মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু না। লাট্টু গুন্ডা নাকি একটু হামলা করেছিল। অল্প চোট লেগেছে।

ওরা কি হাসপাতালে?

হ্যাঁ। কাল পরশুই ছেড়ে দেবে।

তাহলে তো ভালোরকমই চোট লেগেছে। আমাকে সব কথা খুলে বলবি?

বললেই তো কাঁদতে টাঁদতে শুরু করবে।

আমি তত নরম মেয়ে নাকি রে? তোদের মতো চার-চারটে গুন্ডাকে পেটে ধরতে হয়েছে। মারদাঙ্গা কম করেছিস তোরা? এখন বুক শক্ত হয়ে গেছে। বল তো কী হয়েছিল।

লাট্টু ইট মেরেছিল বিটুকে।

কেন?

অনেক দিন ধরে রাগ জমে আছে। পিছনে কিছু টাকাওয়ালা লোক আছে। তারাই কাজটা করিয়েছে।

আর ঝিন্টু?

ওটার তো কাণ্ডজ্ঞান নেই। খালি হাতে লাট্টুর সঙ্গে লড়তে গেছে।

লাট্টু কে?

একটা উঠতি মস্তান।

তার ঘাড়টা তোরা মুচড়ে ভেঙে দিতে পারিস না?

দেবো। গা-ঢাকা দিয়েছে। তুমি ভেব না মা।

ঘটনাটা তোর গৌর কাকা জানে?

গৌরকা সব জানে। এ শহরে যা যখন হয় গৌরকা তখনই জেনে যায়।

তার হাতে অনেক লোক আছে।

পিন্টু মাকে একরকম টেনে ঘরে এনে বলল, তুমি আজ খুব রেগে আছ মা।

সুমনা রাগে গমগম করছেন। আর দুচোখ জলে ভরা। সোফায় বসে বললেন, আমার দুটো ছেলেকে যে মেরেছে তাকে কি সহজে ছেড়ে দেব? তুই একটা রিকশা ডাক, আমি হাসপাতালে যাব।

ডাকছি। খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও। আজ বহুত পেরাসনি গেছে। বিটু সেই রিকশাওয়ালকে মেরেছিল বলে দারুণ গণ্ডগোল। শেষে ইউনিয়নের নেতা-ফেতাকে ধরে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছি।

সুমনা উঠে ছেলেকে খাবার বেড়ে দিয়ে বললেন, তোরা আর আমাকে শান্তি দিলি না। আজ আমার নাতি হল, তা আনন্দ আর করব কখন? সন্ধেবেলা গিয়ে একটু দেখে আসা উচিত ছিল।

পিন্টু চটপট খেয়ে উঠে পড়ল।

বেরোবার মুখেই একটা রিকশা এসে থামল বাড়ির সামনে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা বিটু নেমে দাঁড়াল।

মা!

সুমনা ছেলের দিকে চেয়ে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

বিটুই এসে মাকে ধরল, কাঁদছ কেন? কিছু হয়নি আমার। দ্যাখো না, হাসপাতাল থেকে চলে এলাম।

মাতৃভক্ত বিটুকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন সুমনা।

১৯

আউটডোরে আজ প্রচণ্ড ভিড়। ডাক্তার বাসুর হিমশিম অবস্থা। এক-একদিন রোগভোগ দুর্ঘটনা এত বেড়ে যায় যে, দম ফেলার সময় থাকে না।

ডাক্তার বাসু তবু এই পেশাটিকে উপভোগ করেন। কদাচিৎ কোনও রুগি রোগমুক্ত হয়ে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসে। সেরকম ঘটনা ঘটেই না। মানুষ স্বভাবত অকৃতজ্ঞ। মানুষ স্বভাবত বিস্মৃতিপরায়ণ। কিন্তু ডাক্তার—একজন সত্যিকারের ডাক্তার সর্বদাই উপভোগ করতে পারেন নানা বিচিত্র রোগভোগের সঙ্গে তাঁর লড়াই।

ডাক্তার বাসুদেব আজ ক্লান্ত ছিলেন। আজকাল ক্লান্তিত ক্রমেই বাড়ছে। মানুষের রোগভোগ নিয়ে তাঁর চিন্তা প্রবল বটে, কিন্তু নিজের শরীরের খবর অনেককাল নেওয়া হয়নি।

হাসপাতালে আর বেড খালি নেই। তবু অন্তত ছ'জন রুগিকে ভরতি করা একান্ত দরকার। তার মধ্যে দুটো বোধহয় ক্রিমিন্যাল কেস। তবু চেষ্টা করা যেত। কিন্তু জায়গা না থাকলে কী করতে পারেন বাসু? বেড নেই, মেঝেতেও আর জায়গা নেই। অন্তত আরও শ'খানেক বেড যদি পাওয়া যেত। কত লোককে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে রোজ।

ডাক্তারের ক্লান্তি কেন এত গভীর তা মানুষ বুঝতে পারবে না। ডাক্তার বাসু কতকাল যে ভালো করে ঘুমোননি, কতকাল পুষ্টিকর খাবার খাননি, কোনও আমোদ-প্রমোদ করেননি, একটাও সিনেমা দ্যাখেননি, গান শোনেননি। শুধু রোগ আর রোগ তাঁকে ঘিরে আছে চব্বিশ ঘণ্টা।

মাঝরাতে টেলিফোন পেয়ে চলে আসতে হয় বিছানা ছেড়ে। হাসপাতালে নার্সিংহোমে। বিয়ে করেননি বলে বাঁচোয়া, নইলে বোধহয় বউ ডিভোর্স করত।

আডেটডোরের সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও আজ বাসু রুগি দেখে গেলেন আরও ঘণ্টাখানেক। এর পর হাসপাতালে দুটি এবং নার্সিংহোমে একটি জরুরি অপারেশন।

দুপুরে আজ খাওয়া জুটবে না হয়তো। ব্রেকফাস্ট বলতে দুটো টোস্ট আর সঙ্গে কালো কফি। পেটের মধ্যে একটা অস্বস্তি হচ্ছে কখন থেকে। তবু এই খিদের কষ্টটা সহ্য করতে হবে। খালি পেটে ডাক্তার বাসুদেব অপারেশন ভালো করেন।

শেষে রুগিকে বিদেয় করে উঠতে যাবেন, হঠাৎ দেখলেন, লম্বা বেঞ্চের একটি প্রান্তে সপ্রতিভ সুন্দরী এক তরুণীকে।

চিনতে পেরে একটু হাসলেন বাসু। আরে! আপনি কখন?

ঘণ্টা দেড়েক ধরে বসে আছি, যদি আপনার চোখে পড়ে।

বাসু লজ্জিত ভাবে বললেন, বড্ড ভিড় ছিল আজ। একটু যদি আওয়াজ দিতেন!

শচী উঠে এসে মুখোমুখি বসে বলল, ডিস্টার্ব করা উচিত নয় বলে করিনি। একজন ব্যস্ত ডাক্তারকে অন্যমনস্ক করে দিলে রুগির বিপদ। আমার দরকারটা তেমন জরুরিও নয়।

বলুন কী করতে পারি।

আমি সেই রিকশাওলাটার জন্য কিছু ফলটল এনেছিলাম। পাঠিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে দু-একটা ওষুধ।

ভালো করেছেন।

কাল বিটু আর ঝিন্টুদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। পুলিশে খবর দিয়েছি বলে ওরা খুব অসন্তুষ্ট।

বাসু হাসলেন, জানি।

আমার কি আর কিছু করার আছে।

২০

দিন সাতেক বাদে এক সন্ধেবেলা ব্রহ্মকুমার তাঁর অফিসঘরে মক্কেলদের সঙ্গে মোকদ্দমা নিয়ে তুমুল আলোচনা ব্যস্ত, সুমনা রান্নাঘরে তাঁর নিজের জায়গায় স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা। কোণের একখানা ঘরে মশারির নীচে সোমা কাত হয়ে শুয়ে তার নবজাতকের মুখখানা নিবিড় চোখে দেখছে আর দেখছে। নিষ্পলক। আশা যেন আর মিটতেই চায় না। মঞ্জুরি তার নিজের ঘর গোছাচ্ছিল, সাহায্য করছিল জনার্দন। দিন কয়েক বাপের বাড়িতে যেতে হয়েছিল মায়ের অসুখের খবর পেয়ে। মা এ যাত্রা বাঁচল, ঘরদোর সৃষ্টিছাড়া নোংরা হয়ে রয়েছে কয়দিনে। মন্টু, বিটু, পিন্টু, ঝিন্টু কেউ বাড়িতে নেই। এ সময়ে থাকেও না।

ব্রহ্মকুমার এক মক্কেলকে খুব ধমকাচ্ছিলেন। সে এক ঝুড়ি কচু নিয়ে এসেছে উকিলবাবুর জন্য। নিতান্ত গেঁয়ো লোক। যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে। কিন্তু কচু দেখে

মেজাজটা ব্রহ্মকুমারের বিগড়েছে। তিনি কচু দু-চোখে দেখতে পারেন না। ছেলেরাও পছন্দ করে না। কে খাবে?

ব্রহ্মকুমার বলছিলেন, এ কি কচু খাওয়ার সিজন হে? ও সব তুমি নিয়ে যাও। আমাদের হেঁসেলে ওসবের বিশেষ চলন নেই।

বলতে বলতে ব্রহ্মকুমারের হঠাৎ মনে হল, শরীরের মধ্যে একটা কী যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন একটু বে-এক্কেয়ার লাগছে মাথাটা। ঊনষাট বছর বয়সের কথা খেয়াল থাকে না সবসময়। এখন হঠাৎ খেয়াল হল।

উকিলবাবু! আপনার কি শরীর খারাপ?

ব্রহ্মকুমার কথাটার জবাব দিলেন না। মাথাটা চড়াত করে একটা পাক খেল। টেবিলটা দুহাতে ধরে সামাল দিলেন। তারপর তাঁর মনে হল, দুনিয়ার খেলা তাঁর দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। শরীরে একটা ঘাম দিচ্ছে। মাথাটা খুব দ্রুত আর একটা চক্কর দিতেই চোখ অন্ধকার হয়ে গেল।

মাথাটা আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মকুমার আর দেরি করলেন না। উঠে দাঁড়ালেন।

দুজন মক্কেল এসে তাড়াতাড়ি ধরল দুদিক দিয়ে, চলুন নিয়ে যাচ্ছি।

ব্রহ্মকুমার ভিতর বাড়িতে আসতেই প্রথম চেঁচাল জনার্দন, বাবামশাইয়ের কী হয়েছে?

তারপর দৌড়ে এলেন সুমনা।

ব্রহ্মকুমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে কলকল করে ঘুমছেন। হাঁসফাঁস করছেন। চোখের দৃষ্টি যেন কেমনধারা।

কোনওরকমে বললেন, ছেলেদের খবর পাঠাও। আর বেশিক্ষণ নয়।

সুমনা চোখে আঁচল চাপা দিলেন। মঞ্জুরি কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

জনার্দন ছুটল দাদাদের খবর দিতে। একজন মক্কেল নিজের গরজেই বলল, আমার মোটর বাইক আছে, বাসু ডাক্তারকে ধরে আনি গিয়ে।

খুব কষ্টে দেওয়াল ধরে ধরে উঠে এল সোমা।

বাবা! আপনার কী হয়েছে?

যাচ্ছি মা। ভালো থেকো।

সোমা তার নিজের মতো করে শ্বশুরকে ভালোবাসে। সে উবু হয়ে বসে কাঁদতে লাগল।

ব্রহ্মকুমার আর একটা চক্করে পড়লেন। চোখে ধাঁধা দেখলেন। মাকড়সার জাল যেন আবছা করে দিয়েছে দৃষ্টি। ওপরে পাখা ঘুরছে, কিন্তু তিনি বাতাস টের পাচ্ছেন না।

সুমনা মাথায় গলায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ব্রহ্মকুমার স্ত্রীর দিকে চাইলেন, তোমার জন্য কিছু করতে পারলাম না। যা আছে সব দেখে রেখো।

এরকম করছ কেন? কেন ওসব ভাবছ?

টের পাচ্ছি। মানুষ মৃত্যুকে খুব টের পায়। একটু জল দাও, বড্ড তেষ্টা।

অনেকটা জল খেলেন ব্রহ্মকুমার।

মঞ্জুরি বেরিয়ে গেল, একে ওকে খবর দিতে। বাচ্চা কাঁদছে বলে সোমাকেও যেতে হল।

ফাঁকা ঘর পেয়ে ব্রহ্মকুমার বললেন, শোনও সুমনা, আমার কাছে কিছু গোপন নেই। ঝিন্টু আমার ছেলে নয়, জানি। তবু তাকে কখনও অনাদর করিনি। করেছি বলো? তোমাকেও কখনও...

সুমনার পায়ের মাটি দুলে উঠল, মাথায় বজ্রপাত ঘটতে লাগল মুহুর্মুহু।

শেষ সময়টায় অসত্যের আড়ালটা সরিয়ে দিলাম। তোমাকে জানানও দরকার যে আমি সব জানি। ক্ষমা করেছি।

সুমনা এমন স্থির ও ঠান্ডা হয়ে গেলেন যে তাঁকে প্রস্তরমূর্তির মতো মনে হচ্ছিল।

ব্রহ্মকুমার চোখ বুজলেন। তলিয়ে যাচ্ছেন, কোথায় যেন এক গভীর গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন, নিরালম্ব বায়ুভূক, মরার পর কী হবে তা বুঝতে পারছেন না। অস্ফুট একটা চিৎকার করলেন, আঃ.....

সুমনার চটাক ভাঙল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, কী হল? কী হল তোমার?

চোখ থেকে টপটপ করে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ল ব্রহ্মকুমারের মুখের ওপর। ব্রহ্মকুমার সাড়া দিলেন না।

সাইকেলের একটা ঘণ্টির শব্দ হল। তার পরই বাড়ি কাঁপিয়ে ঝিন্টু ঢুকল ঘরে।

বাবা! বাবার কী হয়েছে? এঃ এ তো সিরিয়াস অবস্থা দেখছি!

বলেই ঝিন্টু আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

খবর পেয়ে দ্বিতীয় জন যে এল সে বিটু। লাভ স্টোর্সে এখন খদ্দেরের দারুণ ভিড়। তার মধ্যেই জনার্দন গিয়ে খবর দিল বাবামশাইয়ো সাংঘাতিক অবস্থা।

বিটুর বিশ্বাস ছিল তার বাবা ব্রহ্মকুমারের আয়ু খুব দীর্ঘ, অসুখ-বিসুখ কখনই করে না। সে প্রথমটায় খবরটা বিশ্বাসই করেনি।

কিন্তু ব্রহ্মকুমারের ঘর্মাক্ত মুখ, শ্বাসকষ্ট আর শরীরের পাক খাওয়া দেখে সে-ও কেমন হয়ে গেল। তার মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ।

মন্টুকে খবর দিতে পারেনি জনার্দন। সে একটা এনকোয়ারিতে বাইরে গেছে। পিন্টুরও কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। বোধহয় সে একটা মোকদ্দমা তার বাবার হয়ে লড়তে জলপাইগুড়ি গেছে!

জনার্দন হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে বলল, গৌর কন্ট্রাক্টরকে খবর দিয়ে এসেছি, দুই দাদাকে পেলাম না।

সুমনা বিপন্ন চোখে চেয়ে রইলেন, কী করবেন? তাঁর তো কিছু করার নেই।

মোটর বাইকের শব্দ তুলে মক্কেল ফিরে এল।

বাসু ডাক্তার কল-এ বেরিয়েছে। অন্য ডাক্তার কাউকে কাছেপিঠে ধরতে পারলাম না। তবে বাসুর বাড়িতে খবর দিয়ে এসেছি। আমি বলি কি, নার্সিংহোম বা হাসপাতালে নিলে ভালো হয়।

সুমনা বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, কী করবি?

বিটু মাথা নাড়াল, দেখছি।

বাসু এলেন বিটু বেরোবার মুখেই স্কুটারটা ধীরেসুস্থে স্ট্যান্ডে খাড়া করে ঢুকলেন ঘরে। মুখটা বরাবরই গম্ভীর আর হাস্যহীন। বাসুর ওপরেই যেন দুনিয়ার সব ভার চেপে আছে। লোকটাকে তেমন পছন্দ করে না বিটু। অনেকেই করে না। কিন্তু ডাক্তার ভালো। দারুণ ভালো।

বাসু একটিও কথা না বলে ব্রহ্মকুমারকে পরীক্ষা করতে লাগল। নাড়ি, বুক, প্রেশার।

আর সেই সময়টুকু সকলের চোখ নিষ্পলক চেয়ে রইল বাসুর দিকে। ডাক্তার বাসুদেব ব্যানার্জি কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন ভগবান। ভাগ্যনয়ন্তা। ভাবীকাল।

ব্রহ্মকুমারের সঠিক জ্ঞান ছিল না। মাঝে মাঝে অস্ফুট আওয়াজ করছিলেন। সেই সঙ্গে শরীরটা মোচড় খাচ্ছে মাঝে মাঝে।

বাসু নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে একটা অ্যাম্পুল বের করলেন। ইনজেকশান ভরলেন। তারপর ওষুধটা ঠেলে দিলেন ব্রহ্মকুমারের হাতে।

হাসিমুখে সুমনার দিকে চাইলেন তারপর।

সুমনাও চেয়ে আছেন, কিছু জিগ্যেস করতে ভয় হচ্ছে।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, অতটা গম্ভীর হওয়ার কিছু নেই। কিছুই তেমন হয়নি ওঁর। পেটে প্রচুর গ্যাস। তাই থেকে প্রেসার বেড়েছে। রাতটা ঘুমোতে দিন। কাল সকালে আমি আবার আসব।

কোনও ভয় নেই?

না, তবে ডিমেনশিয়া হতে পারে। হয়তো একটু স্মৃতিভ্রংশ ঘটবে, তবে সাময়িক। ভয় পাবেন না। এ সব কেসে হয়।

বাসু উঠলেন। ক্লান্ত, ধীর পায়ে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সুমনা ব্রহ্মকুমারের মশারিটা টাঙাতে টাঙাতে বিটুকে বললেন, আর কাউকে ডাকবি?

বিটু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি চাইলে ডাকতে পারি, কিন্তু বাসুর ওপর ডাক্তার নেই।

জানি। তবু কেমন যেন মনে হয়, শুধু গ্যাস থেকে কি এতটা হবে?

ডাক্তারির আমিও তো কিছু জানি না মা। কী বলব?

সুমনা মশারি গুঁজলেন। বাসু প্রেসক্রিপশন রেখে গেছেন একটা। সেটা বিটুর হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে আয়।

বিটু বেরিয়ে গেল।

সুমনা পায়ে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জিপের নির্ভুল শব্দ শুনতে পেলেন। বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল, গৌর আসছে।

জিপটা থামতেই গৌর লাফ দিয়ে নামল।

কী খবর?

ভালো।

জনার্দন যে গিয়ে বলল, শেষ অবস্থা!

না। সিরিয়াস কিছু নয়। বাসু ডাক্তার দেখে গেছে।

বাসু! ওঃ তাহলে চিন্তা নেই।

আমার একটু কথা আছে।

কথা! বলো।

ঘরে এসো। আমার ঘরে।

গৌরকে নিজের ঘরে এনে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলেন সুমনা।

সর্বনাশ হয়েছে।

কী সর্বনাশ হয়েছে সুমনা?

ও তো সব জানে।

কে? ব্রহ্ম?

হ্যাঁ।

গৌর হঠাৎ হেসে উঠল, জানবে না কেন?

তার মানে?

গৌর সুমনার দিকে হাসিমুখেই চেয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, সব কি গোপন করা যায় সুমনা?

তার মানে?

ব্রহ্ম একদিন আমাকে বলেছিল।

কী বলেছিল?

সে অনেক কথা। সব তোমার শুনে কাজ নেই। কিন্তু তোমার বর আমাকে চার্জ করেনি, রাগ দেখায়নি, কিছু না। শুধু সে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে সব জানে বা আন্দাজ করে।

সুমনার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে।

আমার তাহলে কী হবে? কী করে ওর ঘর করব?

যেমন করছ তেমনই করবে। কিছু ইতরবিশেষ হবে না। ব্রহ্মও তো জানে, সে তোমাকে সময় দিতে পারে না, বেচারার প্রেম-ভালোবোসাও আসে না, অ্যান্টিরোমান্টিক লোক। হি ইজ এ ডিফলটার অ্যাজ এ হাজব্যান্ড। সুতরাং তার বউ যদি সামান্য দ্বিচারিণী হয় তো কী করার আছে।

কিন্তু আমি। আমি কী করে ওকে মুখ দেখাব?

পারবে। জীবন তো একটাই, যা পেয়েছ আঁজলা ভরে তুলে নিয়েছ। পাপ-টাপ বলে কিছু নেই সুমনা।

তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন এসব কিছুই নয়। এরকম হওয়াই বুঝি স্বাভাবিক। আমি তোমার বউ হলে বলতে পারতে একথা?

গৌর হঠাৎ গম্ভীর হল। চোখ নামিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘাশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল, না সুমনা, তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী হলে হয়তো এরকম উদার হতে পারতাম না। সেদিক দিয়ে ব্রহ্ম অনেক বড় মাপের মানুষ। কিন্তু কেন পারতাম না জানো? তুমি বলেই। আর তোমার সঙ্গে যে পরকীয়া করেছি তারও কারণ হল, তোমাকে আমার হাফ-বউ বলেই তো ধরতে হয়। একটু সময়ের গণ্ডগোল পিছলে গেল লগ্নটা, নইলে—

সুমনার চোখ টলমল করছে জল, যদি ঝিন্টু যদি কখনও জানতে পারে?

গৌর উদার গলায় বলল, আজকালকার ছেলে তাদের মানসিকতাই আলাদা। হয়তো স্পোর্টিংলিই নেবে। আমার তো মনে হয়, ঝিন্টু অলরেডি এরকম কিছু আন্দাজও করেছে।

সুমনা চোখ কপালে তুলে বলেন, সে কী। আমি তাহলে মরে যাব। বুঝলে মরে যাব।

গৌর একটু তিক্ত মুখ করে বলে, শোনো সুমনা, গোপন করার লজ্জা আর ভয় বড় মারাত্মক। ওই টেনশন সহ্য করা যায় না, তার চেয়ে জানাজানি হয়ে গেলে খোলসা হওয়া যায়।

ঝিন্টু তোমাকে কী বলেছে?

মাঝে মাঝেই তো বলে, গৌরকা তুমি আমার বাবা হলে বেশ হতো।

তুমি কি কখনও কিছু বলেছ?

না। আমি কি পাগল?

তাহলে?

ঝিন্টুর মুখ সে তো নিজেও দেখতে পায়। ওমুখে কার ছাপ আছে তা কি এতই কঠিন যে ধরা যায় না?

যায়? আমি তো ওর মুখে আমার ছাপ দেখি।

সে-ও আছে। দুজনেই আছি আমরা ঝিন্টুর ভিতর।

সুমনা কথা বলতে পারলেন না। মুখ চাপা দিলেন আঁচলে।

গৌর বলল, বয়স হয়ে গেল সুমনা, এসব নিয়ে আর খামোখা মন খারাপ কোরও না। যা ভালো মনে হয়েছিল করিছি। এখন যা হওয়ার হবে। আমরা তো আর বেশিদিন থাকব না।

তুমি বুঝলে না মায়ের কতখানি লজ্জা সন্তানের কাছে।

লজ্জা একটু তো থাকবেই। তোমরা সামাজিক মানুষ। কিন্তু আমার ওসব নেই। আমি বাস করি আদিম পৃথিবীর মানসিকতায়। তখন বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানই ছিল না। সকলেই সকলের ভোগ্যে আর ভোগ্যা ছিল। আমার সমাজ নেই।

অনেকক্ষণ হল দরজা বন্ধ করে আছেন। আর ভালো দেখায় না। সুমনা গিয়ে ছিটকিনিতে হাত দিলেন।

তাঁর হাতের ওপর গৌরের হাত এসে পড়ল।

বড্ড গা ঘেঁষে উত্তপ্ত লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

কী হল? দরজা খুলতে দাও।

দাঁড়াও, শেষ পাপটুকু করে নিই।

এই বলে হঠাৎ সুমনার ওষ্ঠাধর চুম্বন করে গৌর। দীর্ঘ প্রগাঢ় এক চুম্বন।

সুমনা বাধা দিলেন না। কোনওদিনই দেননি। দুজন পুরুষের মধ্যে তিনি বারবার দ্বিধাবিভক্ত। কার পাল্লা ভারী বলা মুশকিল।

গৌর বলল, শোনও সুমনা, মোরো না। তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে একটা কিছু কাণ্ড করার কথা ভাবছ। মোরো না, প্লিজ। তুমি মরলে আমাকেও মরতে হয়। তোমাকে আমি বড্ড বেশি ভালোবাসি।

সুমনা এ কথার জবাব দিলেন না। দরজা খুললেন।

সামনেই মঞ্জরি দাঁড়ানো, মুখটা কেমন যেন।

সুমনা লজ্জা পেলেন না। মাথা উঁচুতে রেখেই জিগ্যেস করলেন, কিছু বলবে?

বাবা কি কিছুই খাবেন না?

না।

ড্রিপ দিতে লোক এসেছে। বাসু পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চলো যাচ্ছি।

যখন স্বামীর বিছানায় পাশে গিয়ে বসলেন সুমনা তখনও নিজেকে অশুচি লাগল না তাঁর। দুজন লোক স্ট্যান্ডে বোতল ঝুলিয়ে ব্রহ্মকুমারের হাতে ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল। ফোঁটা ফোঁটা ড্রিপ চলে যেতে লাগল শরীরে।

সুমনা শুনতে পেলেন, বাইরের ঘরে গৌর উঁচু গলায় কথা বলছে বিটুর সঙ্গে। তারপর জিপগাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ হল। গাড়িটা বহুদূর চলে গেলে।

সুমনা ভাবলেন, মরব কেন? শেষ পর্যন্ত দেখব। তারপর, মরণ তো আছেই, কে খণ্ডাবে?

ট্যাঁ করে কেঁদে উঠল নবজাতক, একটু হাসলেন সুমনা। এই সংসার ছেড়ে কোথায় যাবেন তিনি?

২১

ডা. ব্যানার্জি।

বাসু টেবিল থেকে ওপরে মুখখানা তুললেন। আউটডোর শেষ করে রাউন্ড সেরে এসে ফাঁকা ঘরটায় বসেছিলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলতে পারেন না।

সামনে দাঁড়িয়ে শচী।

আরে আপনি? কী খবর?

আমি আপনার খবর নিতে এসেছি। কেমন আছেন সত্যি করে বলুন তো!

আমি! আমি তো অ্যাবসোলিউটলি ভালো আছি।

শচী মাথা নেড়ে বলল, না, আপনি ভালো নেই।

কে বলল?

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, কিছু নয়। একটু টায়ার্ড এই যা।

আপনি বড্ড খাটেন।

একটু খাটতে তো হয়ই।

এদেশে কিছু লোক ক্রনিক অলস। তাই বাকি কিছু লোককে ডবল খাটতে হয়। উপায় নেই। বসুন।

বসব না। আপনার তো ছুটি হয়ে গেছে, এবার উঠুন।

উঠব? কোথায় যেতে হবে?

বাড়ি।

বাসু হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, সেখানেই বা কী আছে। একজন চাকর ব্যস।

শচী গম্ভীর হয়ে বলল, ডাক্তার ব্যানার্জি, আপনি নিজেকে শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু সেটা বুঝতে পারছেন না।

খাটলে কি লোকে শেষ হয়? আমি তো কাজের মধ্যেই বেশ থাকি।

আর কাজ নয়। বিশ্রাম। উঠুন।

দাঁড়ান মিস চক্রবর্তী। এখনও একটা ভিজিট বাকি। ব্রহ্মকুমার গাঙ্গুলি ইজ সিক। আজ সকালে তাকে দেখতে যাওয়ার কথা। আউটডোর থাকায় সকালে হয়ে ওঠেনি।

শচী অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বিয়ে করলে আপনার বউ নিশ্চয়ই পালিয়ে যেত।

বাসুদেব হাসলেন। শরীরটাকে টেনে দাঁড় করাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। টায়ার্ড। ভীষণ টায়ার্ড।

মিস চক্রবর্তী, কোনও দরকার ছিল কি?

শচী গম্ভীর মুখে বলল, ছিল। কিন্তু আপনাকে দেখে ভারি মায়া হচ্ছে। যাক, পরে বলা যাবে।

বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, হাতে এখনও কিছু সময় আছে। বলুন না।

আপনার রুগি আগে! দেখে আসুন।

এসে তো আর আপনাকে পাব না।

শচী মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, সাধারণ মেয়েদের মতো আমার লজ্জা-টজ্জা নেই। আমি এক সময়ে একস্ট্রিমিস্ট ছিলাম, জানেন কি?

জানি।

অ্যাকশনে ছিলাম।

তাও জানি।

আমি একটি ছেলের সঙ্গে ইনভলভড হয়েছিলাম তখন। পুলিশ তাকে গুলি করে মারে। আমার দু-হাতের মধ্যেই সে মারা যায়।

এটা জানতাম না। সরি।

শচী মাথা নেড়ে বলল, আমার সেন্টিমেন্ট নেই। যা হয়েছে তা হয়েছে।

আমি বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে ভালোবাসি।

বাসু চুপ করে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, বর্তমান মানেই হচ্ছে অতীতের ক্রম পরিণতি। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমানকে মানা যায় না। ওটা ক্রনোলজিক্যাল নয়, সায়েন্টিফিক নয়।

স্বীকার করছি। কিন্তু আমার মানসিকতা ওই রকম।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু কথাটা কী?

শচী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, আজ থাক। কথাটা আর একদিন হবে।

বাসুদেব আপত্তি করলেন না। অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে বললেন, কিন্তু বলবেন। ভুলে যাবেন না।

শচী মাথা নেড়ে বলল, ভুলব না।

শচী চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন বাসু। তারপর স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ব্রহ্মকুমার আজ ভালো আছেন। মুখচোখ স্বাভাবিক। রক্ত চাপ নেমে এসেছে। ড্রিপ খুলে নেওয়া হয়েছে।

বাসু সহাস্যে জিগ্যেস করলেন, খিদে পাচ্ছে তো!

পাচ্ছে।

সব খাবেন। ঝালমশলা কিছু কম। সাতদিন রেস্ট নিন। তারপর পুরোপুরি কাজে নেমে পড়বেন।

আমার যে ইম্পর্ট্যান্ট মামলা আছে ডাক্তার।

পিন্টু তো আছেই। ও দেখবে।

পিন্টু। বলে চুপ করে রইলেন ব্রহ্মকুমার। তারপর বললেন, বেশ তাই হোক।

বাসুদেব বাড়ি ফেরার পথে টের পেলেন তাঁর মনের মধ্যে একটা গুঞ্জন হচ্ছে। শচী কিছু বলতে চায়। খুব সাধারণ কথা কি? কোনও রোগ? কোনও সমস্যা? কী?

ডাক্তার বাসু বুঝতে পারলেন না।

স্নান করে খেয়ে একটু শুলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতায় আঠা হয়ে লেগে গেল। আজকাল বড্ড ঘুম পায়।

ঘুমিয়ে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন বাসু। শচীর বিয়ে হয়ে গেছে। একটা ফুটফুটে বাচ্চা কোলে নিয়ে তাঁকে দেখাতে এসেছে। সঙ্গে ছোকরা স্বামী, তার বুকে একটা ছ্যাঁদা। রক্ত পড়ছে। অভ্যাসবশে ডাক্তার বাসু স্বপ্নেও ক্ষতটার দিকে চেয়ে রইলেন। রক্ত দরকার, এর এক্ষুনি রক্ত দরকার।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন বাসু। মাথাটা বড্ড ঝিমঝিম করছে। উঠে কিছু না ভেবেচিন্তেই পোশাক পরলেন।

চাকর এসে বলল, বাবু বেরোচ্ছেন?

হ্যাঁ। ফিরতে রাত হবে।

স্কুটারের তেল ভরে নিলেন পেট্রল পাম্প থেকে। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অনেকটা দূর।

শেষ দুপুরে রাস্তায় তেমন ট্রাফিক নেই। বাসুদেব বিনা বাধায় চলে এলেন ক্যাম্পাসে। দু'চারজনকে জিগ্যেস করে শচীর কোয়ার্টারের হদিস পাওয়া গেল। একটা বিল্ডিং-এর দোতলায় দু'ঘরের ফ্ল্যাট।

দরজা খোলা। পরদা ঝুলছে।

আসতে পারি?

জবাব নেই।

আসতে পারি?

জবাব নেই।

বাসু পরদাটা সরালেন। ভিতরে কেউ নেই। ঘর ফাঁকা। বাসু ঢুকলেন। অজস্র বই আর বই। বিছানা, জামাকাপড়, রূপটান কোনওটাই তেমন গুছিয়ে রাখা নয়। তবু মেয়েলি ঘর বোঝা যায়।

বাসু বিছানার ওপরেই বসলেন। একটা হাই উঠল। দুটো, তিনটে।

বাসুর আজকাল এটা হয়। কোথাও বসলেই ঘুম পায়। ভীষণ ঘুম। বাসু কখন ঘুমিয়ে পড়লেন টেরই পেলেন না।

শচী গিয়েছিল বাগানে। বাসার পিছন দিয়ে ফাঁকা জমিতে সে বাগান করেছে। এক গোছা গোলাপ হাতে ঘরে ঢুকেই সে থমকাল। বুকটা কি ধিক করে উঠল তার?

তারপর সে একটু হাসল। গোলাপগুলো টেবিলে ছুড়ে দিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে বাসুর জুতো জোড়া খুলে পা দুটো তুলে দিল বিছানায়। তারপর মায়াভরে মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আপন মনে বলল, ওর চিকিৎসা কে করে তার ঠিক নেই। উনি আবার পরের চিকিৎসা করবেন।

বাসু গভীরতম ঘুমে তলিয়ে গেছেন। কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত।

শচী গিয়ে দরজাটায় ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর বাসুর দিকে চেয়ে মুখ টিপে একটু হাসল।

বাসুর চেতনা থাকলে হাসিটার গভীর অর্থ অন্যমনস্ক বাসুরও বুঝতে ভুল হত না।

নভেলেট

. প

আপনি সঞ্জিত চৌধুরীকে চেনেন?

চিনি।

কতদিনের আলাপ?

বেশিদিন নয়। বছর খানেক।

কীরকম আলাপ?

জাস্ট হাই, হ্যালো।

আলাপটা কীভাবে হয়েছিল?

ঠিক ডিটেলসে মনে নেই। সোশ্যাল কোনও গ্যাদারিং-এ বোধ হয়।

আপনার মেমরি কি খুব খারাপ?

না তো! এ কথা কেন বলছেন?

সঞ্জিত এমন একজন লোক যার সঙ্গে আলাপ হওয়াটা ভুলে যাওয়ার মতো ঘটনা নয়।

আমার সঙ্গে তো কত লোকেরই আলাপ হয়েছে রোজ, সব কি মনে থাকে?

আপনার স্মৃতিটা একটু জাগিয়ে দিতে পারি কি?

সেটা কি খুব দরকার?

দেখুন যদি মনে পড়ে!

তার দরকার নেই। আমাদের আলাপ হয়েছিল একটা ডিনারে।

এই তো মনে পড়েছে। ডিনারটা হয়েছিল একটা বিউটি কনটেস্টের পর।

হ্যাঁ।

সেই কনটেস্টে আপনিও একজন প্রতিযোগী ছিলেন, তাই না!

ছিলাম। সেটা কি দোষের কিছু?

দোষের কথা উঠছে না। শুধু বলছি আপনি একজন কনটেস্ট্যান্ট ছিলেন।

হ্যাঁ।

এবং আপনি নম্রতা শা নামে একটা মেয়ের কাছে হেরে যান।

হ্যাঁ।

অথচ সেই কনটেস্টে আপনারই বিউটি কুইন হওয়ার কথা। আর হলে আপনি মডেলিংয়ের একটা খুব লোভনীয় কনট্রাক্ট পেতেন। সেই সঙ্গে হয়তো ফিল্মের রোলও।

এখন ওসব কথা উঠছে কেন? যা হয়নি তা নিয়ে ভেবে কী হবে!

ক্যাশ প্রাইজ, সোনার মুকুট এবং উপহারের পরিমাণটাও খুব কম ছিল না।

আমি এসব নিয়ে ভাবি না।

আপনি কিন্তু সেই কনটেস্টে রানার আপও হননি। আপনি হয়েছিলেন চতুর্থ বা পঞ্চম।

হ্যাঁ।

অথচ সবাই জানত রানার আপ বা বিউটি কুইন কেউই আপনার ধারে কাছে আসার মতো ছিল না।

বলছি তো, ওসব আমি ভুলে গেছি।

আপনার কি রাগ হয়নি?

হয়তো হয়েছিল।

কার ওপর?

কারও ওপর নয়। ভাগ্যের ওপর।

ভাগ্য ছাড়া অন্য কোনও ফ্যাক্টর ছিল না?

তা আমি কী করে জানব?

জানেন না?

না। আমি কিছু জানি না।

নম্রতা শা-কে আপনি চিনতেন?

আগে আলাপ ছিল না। কনটেস্টে গিয়ে আলাপ হয়েছিল।

তার পরিচয় জানেন?

খুব ভালো করে জানি না। শুনেছি বড়লোকের মেয়ে।

বড়লোক বললে কিছুই বলা হয় না। নম্রতা শা হল বিমলাপ্রসাদ শা-র মেয়ে। বাড়ি ইউ পি, বিমলাপ্রসাদ এক্সপোর্ট বিশেষজ্ঞ। খ্রিস্টান এবং চামড়া চালান দিয়ে কোটি-কোটি টাকা বছরে আয়।

ও, তা হবে।

ওরকম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন, তার মানে বিমলাপ্রসাদের টাকাটা আপনাকে বোধ হয় ইমপ্রেস করল না।

অন্যের টাকা আছে, তাতে আমার কী যায় আসে বলুন?

অবাক হওয়ার ব্যাপারও একটা আছে। শুনবেন?

আপনি পুলিশের লোক, শোনালে শুনব।

না মিস মিত্র, আমি জোর করে শোনাতে চাইছি না কিন্তু। তবে শুনলে হয়তো আপনার ধাঁধা কেটে যাবে।

আমার কোনও ধাঁধা নেই তো! এক বছর আগে একটা বিউটি কনটেস্টে হেরে গিয়েছিলাম তো কী হয়েছে? সে সব নিয়ে কি আমি ভাবি নাকি? কেন যে আপনি সেইসব

পুরোনো কথা খুঁচিয়ে তুলেছেন।

আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?

না-না, বিরক্ত হব কেন? আসলে আমাকে নিয়ে কথা উঠলে আমার খুব অস্বস্তি হয়।

কথাটা আপনাকে নিয়ে তো হচ্ছে না। হচ্ছে নম্রতাকে নিয়ে।

তাকে নিয়েই বা কেন?

আমি পুলিশের লোক এবং অন ডিউটি। আপনার কি মনে হয় আমি শুধু গালগল্প করতে এসেছি?

ছিঃ-ছিঃ, আমি তাই বললাম বুঝি! আসলে আমি প্রসঙ্গটা ধরতে পারছি না যে!

প্রসঙ্গটা যাতে আপনি ধরতে পারেন সেইজন্যই তো পুরোনো এবং মৃত অতীতকে পুনর্নির্মাণের এই চেষ্টা। নইলে কবর খুঁড়ে কঙ্কাল বের করার লাভ কী বলুন!

আমি ক্ষমা চাইছি। যা বলছিলেন বলুন।

আরেঃ, ক্ষমা চাইছেন কেন? পুলিশের কাছে ক্ষমা চাইতে নেই। তারা এতই অভদ্র যে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা জিনিসটাকেই অপমান করা হয়।

গার্গী একটু হেসে বলল, আপনাকে অভদ্র বলিনি কিন্তু।

বলার সময় যায়নি। আমার ভদ্রতার মুখোশ এখনও খুলে ফেলিনি কিনা।

আমি কিন্তু এবার একটু-একটু ভয় পাচ্ছি।

আগেই ভয় পাবেন না। কিছুটা জানার পর ভয় হলেও হতে পারে।

জানাটা বিশেষ দরকার কি?

হ্যাঁ।

তাহলে বলুন।

কনটেস্টের দিনটা মনে পড়ে?

পড়ে।

জাজেরা প্রত্যেকেই আপনার ফেবারে ছিল সেদিন। আপনি তা বুঝতে পেরেছিলেন?

না বুঝবার কী!

তিনজন বিচারকের স্কোরশিটেই আপনার নামের পাশে মোটা মোট নম্বর জমা হচ্ছিল। হাসছেন যে?

ভাবছি আপনি এত সব জানলেন কী করে? আমি তো জানি না!

অনেক পরিশ্রম করে জানতে হয়েছে।

একটা বাজে ব্যাপারে অনেক সময় নষ্ট করেছেন।

ব্যাপারটা যদি বাজে বলেই মনে হয়ে থাকে আপনার তাহলে বিউটি কনটেস্টে নাম দিতে গেলেন কেন?

হুজুগে। আমার এক মামা ইমপ্রেসারিও। তিনিই একরকম জোর করে নামিয়েছিলেন। এই কনটেস্ট থেকে নাকি মিস ইন্ডিয়া কনটেস্টে পাঠানো হয়। আরও অনেক লোভনীয় প্রস্তাব ছিল।

মাত্র এক বছরের মধ্যেই কি আপনার মোহভঙ্গ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। আমার আর এসব ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট নেই।

মোহভঙ্গ কীভাবে হল?

সেটাও কি বলতে হবে?

কোনও জবরদস্তি তো নেই। ইচ্ছে হলে বলবেন।

ওই কনটেস্টেই আমার মোহভঙ্গ হয়েছিল।

আমি একজন পুলিশ, আমার মতামতের হয়তো দাম নেই। তবু বলছি, আপনি চেষ্টা করলেই মিস ইন্ডিয়া হতে পারেন। আপনি তো দারুণ সুন্দরী।

প্লিজ, আর ওকথা বলবেন না। এখন এই সুন্দরী শব্দটা শুনলে আমার রিপালশন হয়। সুন্দর হওয়ার যে কী ঝামেলা তা তো আপনি বুঝবেন না।

আপনি আমাকে খুবই অবাক করলেন। মেয়েরা তো কমপ্লিমেন্ট পছন্দই করে।

আমি করি না। লোভী পুরুষদের অনেক অ্যাডভানটেস আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা খুব ঘিনঘিনে। এমনকী আমার এক জ্যেঠতুতো দাদা অবধি আমাকে বিয়ে করার জন্য পাগল। এসবের ফলে আমার সৌন্দর্য জিনিসটার ওপরেই আকর্ষণ চলে গেছে। এতটাই চলে গেছে যে, আমি একবার ন্যাড়া হওয়ার জন্য একটা সেলুনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

বলেন কী?

গার্গী হাসতে-হাসতে বলে, তাহলেই বুঝুন। কিন্তু নাপিতটা আমার প্রস্তাব শুনে হাত গুটিয়ে বলল, আপনার মাথা চেঁছে দিলে আমার হাতে কুষ্ঠ হবে দিদি। কিছুতেই ন্যাড়া করতে রাজি হল না।

আমার হিসেব মতো আপনার বয়স মাত্র কুড়ি। এই বয়সেই এরকম যোগিনী হয়ে যাওয়ার কথা তো নয় আপনার। আপনি কি একটু পিউরিটান?

আমার বাবা খুব পিউরিটান। মা আবার ঠিক উলটো। আমি পিউরিটান না হলেও আমার আর ওসব ভালো লাগে না। আপনি যেন কী বলছিলেন শবরবাবু!

ও হ্যাঁ। আশ্চর্যের বিষয় হল বিমলাপ্রসাদ শা-র পরিবারও কিন্তু ভীষণ পিউরিটান। ওদের বাড়ির কোনও মেয়ে বিউটি কনটেস্টে নামছে এটা ভাবাই যায় না।

তবে নম্রতা নামল কেন?

নম্রতা ইজ রেবেল। কলকাতায় পড়তে এসে খুব অল্প বয়সেই সে একটি বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করে। ছেলেটির তেমন কোনও গুণ নেই। তবে ভেরি হ্যান্ডসাম। ওরকম

সুপুরুষ খুব কম দেখা যায়। এই বিয়ের ব্যাপারে শা পরিবারে খুব অশান্তি হয়েছিল। ছেলেটি ওদের স্বজাতি তো নয়ই, উপরন্তু বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ভ্যাগাবন্ড টাইপের। বউয়ের ভরণপোষণের ভার নেওয়ার যোগ্যতা ওর ছিল না।

এই গল্পটাও কি আমার শোনা দরকার?

না চাইলে নয়। বলেছি তো শুধু গল্প করতে আমি আসিনি।

তা হলে বলুন।

নম্রতা এ ছেলেটাকে বিয়ে করায় শা পরিবার রেগে গেলেও তাদের কিছু করার ছিল না। বিমলাপ্রসাদ মেয়ে-জামাইকে তাঁর কলকাতার বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িটা দিয়েছিলেন এবং জামাইকে তাঁর অফিসে একটা মোটা মাইনের চাকরিতেও বহাল করেন। ছেলেটার অবশ্য চাকরিতে কোনও মন ছিল না। সারাদিন মদ খেত আর বাড়ির সুইমিং পুলের ধারে বসে থাকত। বিয়েটা অবশ্য সুখের হয়নি। নম্রতার সঙ্গে তার বর বিজিত রায়চৌধুরীর প্রায়ই প্রবল ঝগড়া হত। শোনা যায় মারপিট অবধি গড়াত ব্যাপারটা। অথচ নম্রতা বিজিতকে ডিভোর্স করার কথাও ভাবতে পারত না। লাভ-হেট রিলেশনই হবে বোধ হয়। প্রচণ্ড আক্রোশ, আবার প্রচণ্ড ভালোবাসা। কিন্তু এর একটা সাইকোলজিক্যাল রিঅ্যাকশনও আছে। নম্রতা অসম্ভব ডিপ্রেশানে ভুগতে থাকে মাঝে মাঝে। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেও যেতে হয়েছিল তাকে। বিজিত তার প্রতি ফেথফুল কি না তা নিয়েও সে ভয়ঙ্কর সন্দেহ বাতিকে ভুগত। সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিও ছিল। যাই হোক, ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকসাইটে বাবা-মাও জব্দ হয়ে যায়। বিমলাপ্রসাদের মতো গোঁড়া, রক্ষণশীল মানুষও মেয়ের এই অবস্থা দেখে সে যখন যা বায়না করত তখনই তা মেটাতেন। বিউটি কনটেস্টে নামার ব্যাপারেও বাবা কোনও আপত্তি তোলেননি। আপনি কিন্তু আর কোনও প্রশ্ন করছেন না।

আমি শুনছি তো!

হ্যাঁ। কিন্তু নম্রতা তেমন সুন্দরী না হয়েও বিউটি কনটেস্টে কেন নামতে গেল তা জানার কৌতূহল নেই?

নম্রতা সুন্দরী নয় বুঝি! আমার তো তা মনে হয়নি! ওর ফিগার খুব ভালো, মুখশ্রীও চমৎকার।

একটা শ্বাস ফেলে শবর বলে, আপনি সত্যিই একটু অদ্ভুত আছেন। নম্রতা জাস্ট সো-সো, বিউটি কনটেস্টে নামবার মতো চটক বা গ্ল্যামার ওর নেই। যাক গে, ও কেন নেমেছিল জানেন? জাস্ট টু মেক বিজিত জেলাস। নম্রতার সব প্রবলেম বিজিতকে নিয়ে। বিজিতকে ও পুরোপুরি গ্রাস করতে চায়। বিজিতের চোখে ও সর্বোত্তমা নারী হয়ে থাকতে চায়। এক ধরনের পাগলাটে অবসেশন। কনটেস্টে জয়ী হওয়া ওর কাছে খুবই জরুরি ব্যাপার ছিল। বিমলাপ্রসাদকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট সাবধান করে দিয়েছিলেন, ওর মেয়ের যা অবস্থা তাতে ইগোতে আঘাত লাগলে ম্যাসিভ নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে পারে।

সুতরাং বিমলাপ্রসাদ ওঁর মেয়ের হয়ে কলকাঠি নেড়েছিলেন। কনটেস্টের মাঝপথে যখন সবাই বুঝতে পেরেছে যে গার্গী মিত্র নামে মেয়েটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে তখনই তিনজন বিচারকের কানে-কানে কিছু বলে দেওয়া হল এবং কয়েকটা মুখ আঁটা মোটা খামও হল হাতবদল। বুঝেছেন?

গার্গী হাসছিল। বলল, বুঝেছি।

কিন্তু নম্রতা শা বিউটি কুইন হওয়ার পর দর্শকদের মধ্যে থেকে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। আপনার কি মনে আছে একজন যুবক বিচারকদের পিছন থেকে উঠে চিৎকার করে বলেছিল যে, এটা সম্পূর্ণ জালি ব্যাপার, সাজানো জিনিস, জোচ্চুরি ইত্যাদি। ছেলেটা রেগে জাজদের শিটও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সিকিউরিটির লোকেরা তাকে ধরে বাইরে নিয়ে যায়।

হ্যাঁ। একটা গোলমাল হয়েছিল শুনেছি। সেই সময় আমাদের র্যাম্প থেকে সরিয়ে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমার খুব লজ্জা করছিল।

যে ছেলেটা ওরকম রি-অ্যাক্ট করেছিল সে কে জানেন?

না।

নম্রতার হাজব্যান্ড বিজিত রায়চৌধুরী।

তা হবে।

এবার আমার প্রশ্ন, বিজিতকে কি আপনি চেনেন?

গার্গী একটু চুপ করে থেকে বলল, একথার জবাব দেওয়া কি খুব জরুরি? নিজস্ব সুত্রে আপনি বোধহয় সব খবরই রাখেন।

শবর দাশগুপ্ত একটু হাসল, আমি কিন্তু সবজান্তা নই। আমার খবর সবই সেকেন্ড হ্যান্ড। সেগুলো যাচাইয়ের অপেক্ষা রাখে। বিজিতের কথা থাক। সঞ্জিত চৌধুরীর প্রসঙ্গে যদি কিছু প্রশ্ন করি জবাব দেবেন কি?

গার্গী একটা শ্বাস ফেলে বলে, গোপন করার কিছু তো নেই।

তাকে আপনি কতটা চেনেন?

বললাম তো, ওই হ্যালোর বেশি নয়।

সঞ্জিত একজন ডাক্তার। বেশ ভালো গায়নোকোলজিস্ট। বেহালায় একটা নার্সিং হোম খোলার জন্য চেষ্টা করছে। প্রচুর টাকার দরকার তার। সেদিন বিউটি কনটেস্টে সে ছিল তিনজন বিচারকের একজন। খুব অন্যায়ভাবে তিনজন বিচারকই আপনাকে বঞ্চিত করে নম্রতা শা-কে বিউটি কুইন করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু সঞ্জিতের বোধহয় একটু বিবেকদংশন হয়েছিল। কী বলেন?

হতেই পারে।

ডিনারে আপনি ছিলেন সঞ্জিতের পাশে। ঠিক তো! এবং সেদিন সঞ্জিত আপনাকে কিছু বলেছিল। কথাগুলো কী তা আমরা হয়তো কোনওদিনই জানতে পারব না, যদি আপনি তা প্রকাশ না করেন। কথাগুলো অবশ্য ইম্পর্ট্যান্ট নয়। ইম্পর্ট্যান্ট হল সঞ্জিতের অ্যাপ্রোচ। অ্যাপ্রোচটা কীরকম ছিল মিস মিত্র?

গার্গী খুব মিষ্টি করে একটু হাসল। তারপর বলল, উনি আমার ওপর একটু ডাক্তারি করতে চেয়েছিলেন। আমাকে দেখে নাকি ওঁর মনে হয়েছিল আমার কিছু শারীরিক প্রবলেম আছে। উনি ওঁর চেম্বারে যেতে বলেছিলেন।

আপনি গিয়েছিলেন কি?

না। তবে উনি মাঝে-মাঝে আমাকে ফোন করতেন এবং যেতে বলতেন।

তবু আপনি যাননি!

কেন যাব বলুন! আমার কোনও প্রবলেম আছে বলে তো আমার মনে হয়নি।

তারপর কি উনি উপযাচক হয়ে আপনার কাছে আসেন?

গার্গী মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ।

এই বদান্যতা দেখেও আপনি খুশি হননি?

আমাকে তো এভাবেই বেঁচে থাকতে হয়। যেচে কত লোকই যে আমার উপকার করতে চায়।

সেই ডিনার পার্টিতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। মাতাল বিজিত রায়চৌধুরী ডিনারে আমন্ত্রিত ছিল বটে, কিন্তু তাকে প্রথমে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু শেষ দিকে সে জোর করে ঢোকে এবং প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে। সে জাজদের ওপরেও হামলা করেছিল।

হ্যাঁ, বিশ্রী ব্যাপার।

সঞ্জিত চৌধুরীর সঙ্গে তার একটা হাতাহাতিও হয়েছিল। সঞ্জিত বিজিতকে বোধ হয় ঘুষিটুষি মারে।

আমি দেখিনি। গণ্ডগোল শুরু হতেই আমি ঘর থেকে পালিয়ে যাই। আমি খুব ভিতু মেয়ে।

কিন্তু সেই ঘুঁষির রি-অ্যাকশন ভালো হয়নি। বিজিত যে কাণ্ডই করে থাকুক সে বিমলাপ্রসাদের জামাই। তার গায়ে হাত তোলা বিমলাপ্রসাদ নিশ্চয়ই পছন্দ করেননি। আর নম্রতা বিকেম ফিউরিয়াস। বিজিতকে মারার ফলে নম্রতা এসে বাঘিনীর মতো সঞ্জিতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঞ্জিত প্রচণ্ড রেগে যায়। চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে কীভাবে নম্রতাকে জেতানো হয়েছে তা প্রকাশ করে দেয়। ইট ওয়াজ আ রিয়েল প্যান্ডেমোনিয়াম।

হ্যাঁ শুনেছি। সঞ্জিত চৌধুরী আমাকে টেলিফোনে সব বলেছিলেন পরদিন। হি ট্রায়েড টু বি এ হিরো।

আপনি তার হিরোইজমকে বোধ হয় খুব একটা মূল্য দেননি।

গার্গী ফের মৃদু হেসে বলল, আমি আমার চারদিকে রোজই এত হিরো দেখতে পাই যে এখন আমার তেমন রি-অ্যাকশন হয় না। গতকালও আমাকে দোতলার বারান্দায় দেখতে পেয়ে একজন হিরো তার সাইকেলটা এত জোরে চালাতে লাগল যে, শেষে একটা রিকশার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড,বেচারা!

তাহলে কি ধরে নেব ব্যক্তিগত জীবনে আপনার কোনও হিরো নেই?

কী মনে হয় আপনার পুলিশসাহেব?

পুলিশরা হৃদয়ের খবর কী করে রাখবে, বলুন? তবে হৃদয় থেকে সেটা যদি খুনোখুনিতে দাঁড়ায় তখন পুলিশকে খবর রাখতে হয়। ইন ফ্যাক্ট পৃথিবীতে হৃদয়ঘটিত খুনোখুনির সংখ্যা খুবই বেশি। আপনি কি তা জানেন?

না। আমি খবরের কাগজ অত মন দিয়ে পড়ি না।

ভালোই করেন। পৃথিবীতে যত ময়লা আর গাদ আছে খবরের কাগজ তা সযত্নে তুলে সকালবেলায় আমাদের সামনে সাজিয়ে দেয়। যে দেশে খবরের কাগজ নেই সেই দেশের লোক বোধ হয় খুবই সুখী। এবার দু-একটা কথা।

হ্যাঁ, বলুন।

সঞ্জিত চৌধুরীকে আপনি তাহলে পাত্তা দেননি, এই তো!

আমি তো তা বলিনি! পাত্তা-টাত্তা নয়, আমি জাস্ট তার চেম্বারে যাইনি।

সঞ্জিত আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা করে?

এখানে, আমাদের বাড়িতে ও একদিন সকালে এসে হাজির। যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন ওখানেই বসেছিলেন তিনি। বড় একজন ডাক্তার এসেছেন শুনে আমার বাবা আর মাও তাঁর সঙ্গে এসে কথাটথা বলে যান।

তারপর?

তিনি বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন। দারুণ স্মার্ট, চেহারাটাও রীতিমতো ভালো।

সঞ্জিত কী বলতে এসেছিল?

বিউটি কনটেস্টে আমার হেরে যাওয়া নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করাটা তার মধ্যে ছিল। আর বারবার আমার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আমার মা-বাবাকে বলে যান যেন তাঁরা মেয়েকে একবার তাঁর চেম্বারে পাঠান।

আপনি বোধহয় তবুও রাজি হননি।

না। তবে বলেছিলাম প্রয়োজন হলেই যাব।

একটু ইন্টারাপ্ট করছি। বিজিত রায়চৌধুরী ঠিক কবে আপনাকে অ্যাপ্রোচ করে?

গার্গী মুখটা নামিয়ে নিল। তারপর ফের মুখটা তুলে বলল, এত খবর যে কে আপনাকে সাপ্লাই করেছে!

ইনস্টিংক্ট।

বিজিত এ-বাড়িতে হানা দেয়নি। সে একদিন আমাকে ফোন করে। দেখা করতে চায়। আমি বিরক্ত হয়ে বলি যে আমার ইচ্ছে নেই। সে ফোন রেখে দেয়। তবে সে বারবার ফোন করত, রোজ। আমি ফোন রেখে দিতাম। তারপর একদিন একটা বড় কোম্পানির মডেলিং টেস্ট-এর জন্য তাদের এজেন্ট আমাকে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়। আমি জানতাম না যে সেটা বিজিতেরই পাতা ফাঁদ। যাই হোক, সেখানে—অর্থাৎ সেই এজেন্টের অফিসে বিজিতের সঙ্গে আমার দেখা হয়।

কী বলেছিল বিজিত?

কী বলতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

প্রেম ভালোবাসার কথা তো!

পুরুষরা তো তাই বলে। অ্যান্ড হি ওয়াজ ম্যাড অ্যাবাউট দ্যাট। সে পরিষ্কার বলেছিল নম্রতাকে সে ভালোবাসে না, সে আমাকে চায়।

আপনি কী করলেন?

করুণ হেসে গার্গী বলল, আমার ফের ন্যাড়া হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল।

একজন বড় ডাক্তার আর একজন বড়লোকের জামাই। দুজনেই পাওয়ারফুল এবং দুজনেই মরিয়া। আপনার বেশ বিপদই গেছে, তাই না?

নিজের চেহারার জন্য তাই আজকাল আমার লজ্জা হয়।

কিন্তু দোষটা তো আপনার নয়, সৃষ্টিকর্তার, তাই না? ভালো কথা, আপনি কি মডেলিং-এর কন্ট্রাক্টটা পেয়েছিলেন শেষ অবধি?

হ্যাঁ।

বিগ অফার?

হ্যাঁ, মোটামুটি ভালো অফার।

গত আট মাসে আমার হিসেব মতো আপনি অন্তত আটটা কোম্পানির হয়ে ভিডিও মডেলিং করেছেন। তা ছাড়া খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন, প্রোডাক্ট লেবেল এবং পোস্টারিং তো আছেই। টিভি সিরিয়ালে আপনার মুখ সম্প্রতি দেখা দিতে শুরু করেছে।

এসব তো আর গোপন খবর নয়। সবাই জানে।

ঠিক কথা মিস মিত্র। কিন্তু সবাই যা জানে তার আড়ালে গোপন খবরও কি কিছু তৈরি হয় না?

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আপনার হয়তো জানা থাকতেও পারে যে, সেই বিউটি কনটেস্টের তিন মাস পর ডাক্তার সঞ্জিত চৌধুরীর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। হেপাটাইটিস ই। কীভাবে রোগটা হয়েছিল তা খুবই রহস্যময়। কেউ জানে না। আমিও না। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করে শুধু এটুকু

জেনেছি যে, ক্রনিক সর্দি কাশির জন্য তিনি একটা বিদেশি অ্যান্টিজেন ইনজেকশন নিচ্ছিলেন। হতে পারে সেটা থেকে ইনফেকশনটা আসে।

তো?

মাথা নেড়ে শবর বলল, ব্যাখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ইট ওয়াজ এ ভেরি ন্যাচারাল ডেথ।

গার্গী চুপ করে রইল।

কিছু ভাবছেন?

ভাবছি আমার কিছু ভাবা উচিত কি না।

আরে না মিস মিত্র, আপনাকে চিন্তায় ফেলার জন্য কথাটা বলিনি। আসলে ঘটনাগুলিকে একটা পরম্পরায় বা কার্যকারণসূত্রে বিন্যস্ত করা যায় কি না সেটাই দেখছিলাম! কিন্তু না, মিসেস চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যু কোনওভাবেই পচা ইঁদুরের গন্ধ ছড়াচ্ছে না।

তাহলে কথাটা উঠল কেন?

পুলিশের মন হল সন্দেহ পিশাচ। বিউটি কনটেস্টের ছয় মাসের মাথায় যে নার্সিংহোমে ডাক্তার চৌধুরী অ্যাটাচড ছিলেন সেখানে তাঁর এক পেশেন্টের মৃত্যু হয় এবং রুগির বাড়ি আর পাড়ার লোক এসে এমন হামলা করে যে নার্সিংহোমে প্রচণ্ড ভাঙচুর হয়েছিল। ডাক্তার চৌধুরীও উন্ডেড হয়েছিলেন।

জানি। শুনেছিলাম। এটাও কি অস্বাভাবিক ঘটনা?

না। কলকাতায় এরকম প্রায়ই হয়।

তাহলে?

একটা শ্বাস ফেলে শবর বলে, ব্যাপারটা বাইরে থেকে দেখলে একটা আবেগজনিত ঘটনা মাত্র। কিন্তু তদন্ত করতে নেমে দেখা গিয়েছিল হামলাকারীরা কেউই পেশেন্টের বাড়ির বা পাড়ার লোক ছিল না। তারা কারা তাও জানতে পারা যায়নি। তবে যেটুকু জানা গেছে তা হল, এরা ছিল পেশাদার বা ভাড়াটে গুণ্ডা।

কেন যে আমাকে এসব শোনাচ্ছেন!

শবর একটু হেসে বলল, সঞ্জিত চৌধুরী একজন বড় ডাক্তার। কীভাবে তাঁর স্ত্রীর হেপাটাইটিস ই হয়েছিল তা আমরা না জানলেও তিনি অবশ্যই জানবেন। আমরা শুধু জানতে চাই, কেন হয়েছিল? একটা বিশেষ সময়ে সঞ্জিত চৌধুরীর স্ত্রীর মরাটা কি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল?

আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না যে!

বুঝতে যে আমিও পারছি, তা নয়। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, একজন ডাক্তারের পক্ষে কারও মৃত্যুর আয়োজন করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়।

ও মা! আপনি কি বলতে চান ওটা খুন?

এখনও বলিনি। কারণ, প্রমাণ নেই। তবে মোটিভ হয়তো আছে।

কী মোটিভ?

ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিয়ে হয় প্রায় ছয় বছর আগে। তাঁদের একটি বছর তিনেকের মেয়েও আছে। মোটামুটি একটা সেট পরিবার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব একটা ঝগড়া বিবাদেরও ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে হঠাৎ একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরু হয়েছিল বলে বাড়ির দুজন কাজের লোক আমাদের জানিয়েছে। ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে পড়বার আগে নাকি একদিন দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয় এবং ভদ্রমহিলা নাকি বলেছিলেন, তুমি ডির্ভোস করতে চাও? তোমাকে আমি নাকে খত দিইয়ে ছাড়ব। ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরেই হঠাৎ অসুখ এবং মৃত্যু।

শুধু ঝগড়া থেকেই কি কেউ কাউকে খুন করে?

না ম্যাডাম। দেখতে হবে ঝগড়ার উৎসে কী আছে। সেইটেই আসল। পৃথিবীতে স্বামীরা যখনই স্ত্রীকে হত্যা করেন তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় হত্যার পিছনে আর একটি স্ত্রীলোক রয়েছেন। তবে আগেই বলেছি আমাদের হাতে প্রমাণ নেই। আরও একটা কথা হল, ডাক্তার চৌধুরী একজন গায়নোকোলজিস্ট। মহিলাদের সঙ্গেই তার নিত্য কাজ। সুতরাং মহিলাদের সম্পর্কে একটা ইমিউনিটি তৈরি হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার, যদি না কোনও এক্সট্রা অর্ডিনারি মহিলার সঙ্গে ইনভলভমেন্ট ঘটে।

আমি আবার এক গলা জলে।

আমিও। ডাক্তার চৌধুরী তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন এমন সন্দেহ কেউ করেনি। প্রশ্নটাও ওঠেনি। কোনও মহিলার সঙ্গে তাঁর সর্ম্পকের কথাও কেউ জানে না।

তাহলে?

তাহলেও একটা কথা আছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দেখা যায় ডাক্তার চৌধুরী রাত জেগে কাউকে অনেকক্ষণ ধরে লম্বা ফোন করতেন। একজন বিশেষ কাউকে। সে সময়ে তাঁর মুখ-চোখ অন্যরকম হয়ে যেত। কিছুদিন পরেই নার্সিংহোমে তাঁর ওপর হামলা হয়। এর মধ্যেও কেউ কোনও কার্যকারণসূত্র খোঁজেনি।

শুধু আপনিই খুঁজেছেন?

হ্যাঁ। এই হামলাটা একজন বিশেষ কেউ করেছিল। যার সঙ্গে সেই পেশেন্টের সম্পর্ক ছিল না।

সে কে?

সেটা বলা আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো হয়ে যাবে। তবে এমন কেউ যে পাওয়ারফুল, স্ট্রং মোটিভ আছে এবং বেপরোয়া। এসব ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি পিকচারে ছিলাম না। কোনও তদন্তের ভারও আমাকে দেওয়া হয়নি এবং এসব ঘটনা যে ঘটছে তাও

আমার জানার কথা নয়। আমি এই এত সব ঘটনা জেনেছি মাত্র সাত দিন আগে। যখন আমাকে ডাক্তার সঞ্জিত চৌধুরীর—বাই দি বাই, আপনি কি জানেন যে সঞ্জিত চৌধুরী মারা গেছেন?

অবাক গার্গী তার বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলল, মারা গেছেন! কই, জানি না তো!

চিন্তিত শবর তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, জানেন না!

না।

ও, আপনি তো আবার খবরের কাগজ পড়েন না!

না, পড়ি না।

খবরটা অবশ্য তেমন গুরুত্ব দিয়ে ছাপাও হয়নি। সঞ্জিত চৌধুরী মারা যান একটি মোটর অ্যাক্সিডেন্টে।

ইস। দুঃখের খবর!

সব মৃত্যুই দুঃখের। আমি—শবর দাশগুপ্ত কোনও মৃত্যুই পছন্দ করি না।

কেউই করি না শবরবাবু। কিন্তু তবু মৃত্যু তো আছেই তাই না?

হ্যাঁ মিস মিত্র, মৃত্যু আছেই আমাদের পেছনে। কত সুন্দর মুখ, কত সুন্দর শরীর, কত প্রতিভা, কত মেধা, কত অতৃপ্ত বাসনা, কত লোভ, কত আসক্তি মৃত্যুতে শেষ হয়ে যায়।

হ্যাঁ। ব্যাপারটা ট্র্যাজিক, কিন্তু আমাদের তো কিছু করার নেই।

শবর মাথা নেড়ে বলল, সঞ্জিত চৌধুরীর মৃত্যু না হলে এত ঘটনা আমার জানা হত না, আপনার সঙ্গেও পরিচয় হত না। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেও তার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি থাকায় তদন্তে আমার তলব পড়ে। দুর্ঘটনা ঘটেছিল বেশি রাতে। বোধহয় বারোটা বা তারও পরে। ওঁদের নার্সিংহোমে একজন ভি আই পি-র স্ত্রী ভরতি ছিলেন। রাত বারোটায় হঠাৎ ফোন আসে যে রোগীর অবস্থা খারাপ, ডাক্তার চৌধুরীকে এক্ষুনি যেতে হবে। চৌধুরী তাড়াতাড়ি তাঁর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। নিউ আলিপুরের নির্জন রাস্তায় একটা লোহা বোঝাই ট্রাক তাঁর গাড়িকে প্রায় পিষে দেয়। ইনসিডেন্টালি গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাতে ব্রেক অয়েল ছিল না। অর্থাৎ বিপদের সময় চৌধুরীর গাড়ির ব্রেকও কাজ করেনি। লরিটা তাঁকে মেরে পালিয়ে যায়।

ইস রে!

ঘটনাটা এমনিতে উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু তদন্তে নেমে দেখেছি নার্সিংহোম থেকে কোনও ফোন করা হয়নি এবং রুগির অবস্থা সেই রাতে ভালোই ছিল।

ও মা! তাহলে?

শবর একটু হাসল, আপনি বুদ্ধিমতী, বুঝে নিন।

ইজ ইট মার্ডার এগেন?

খুব ছক কষে হিসেব করে চৌধুরীকে মারা হয়েছিল।

কে মারল তাঁকে?

আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন?

না তো! আমি কী করে অনুমান করব?

মাপ করবেন। ভুল প্রশ্ন করেছি বোধ হয়। আচ্ছা আপনার কি কোনও মোবাইল ফোন আছে?

না তো!

চৌধুরীর ছিল, বিজিতের ছিল, নম্রতার আছে।

কেন জিগ্যেস করছেন?

ডাক্তার চৌধুরীর মোবাইল ফোনের রেকর্ড চেক করে দেখা যাচ্ছে উনি একটা নম্বর খুব ফেবার করতেন। সেই নম্বরটা আপনার।

হ্যাঁ। বলেছি তো, উনি মাঝে-মাঝেই আমাকে ফোন করতেন।

কী বলতেন তিনি আপনাকে?

খুব ইম্পর্ট্যান্ট কথা কিছু নয়। গল্প করতেন।

কখনও-কখনও রাত বারোটাতেও?

আমার অত খেয়াল নেই।

একটু ভেবে বলুন।

বোধহয় এক-আধবার বেশি রাতেও করেছেন।

অত রাতে ফোন করার কি বিশেষ কারণ ছিল?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গার্গী বলল, উনি পাগলামি করতেন।

কীরকম পাগলামি?

বিয়ে করার কথা বলতেন। অনেক কিছু প্রমিস করতেন। লোভ দেখাতেন বিদেশে নিয়ে যাওয়ার।

আপনি কি তাঁকে প্রশ্রয় দিতেন?

প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে তো ওরকম প্রস্তাব কতজন কতভাবেই দিয়েছে। প্রশ্রয় দেওয়ার কথা উঠছে কেন পুলিশসাহেব?

কারণ, কোনও-কোনও ফোন কলের ডিউরেশন আধঘণ্টা বা তারও বেশি ছিল।

বললাম তো উনি অনেক কথা বলে যেতেন। আমি তার কিছুটা শুনতাম, কিছুটা শুনতাম না। তবে অভদ্রতা করে ফোনটা নামিয়েও রাখতে পারতাম না।

ঠিক আছে মিস মিত্র।

কোনও দোষ হয়নি তো!

আরে না, না। দোষের কী আছে! আমি শুধু জেনে নিচ্ছি।

আর কী জানতে চান?

বেশি কিছু নয়। আপনি কি জানেন যে, গত পরশু রাতে নম্রতার বাড়ির সুইমিং পুলে ডুবে বিজিত রায়চৌধুরী মারা গেছে?

ও মা! সত্যি বলছেন?

মিস মিত্র, গুজব ছড়ানো আমার কাজ নয়।

সুইমিং পুলে।

হ্যাঁ। ঘোর মাতাল অবস্থায়। সাক্ষ্য প্রমাণাদি বলে, নম্রতা আর বিজিত অনেক রাত অবধি সুইমিং পুলের ধারে বসে ছিল। তাদের মধ্যে রোজকার মতোই ঝগড়াঝাঁটিও হয়। তারপর নম্রতা শুতে চলে যায়। ভোরবেলা বিজিতের মৃতদেহ সুইমিং পুলের মধ্যে পাওয়া যায়।

স্যাড।

হ্যাঁ, স্যাড। বিজিত আপনার সঙ্গে টেলিফোনে অনেক কথা বলত, তাই না?

হ্যাঁ, আমার মডেলিং-এর ব্যাপারে উনি হেলপ করতেন।

কেন?

হি হ্যাড এ ক্র্যাশ অন মি। পুরুষদের তো ওইটাই দোষ। আমি তো কিছু লুকোইনি শবরবাবু!

না। আপনি এ পর্যন্ত তেমন কিছু লুকোননি। লুকোবার দরকারও আপনার নেই। আপনি এই কুড়ি বছর বয়সেই পুরুষদের সম্পর্কে বেশ হতাশ হয়ে পড়েছেন দেখছি।

একটু হতাশা তো হতেই পারে, তাই না?

হ্যাঁ। তা তো ঠিকই। ডাক্তার চৌধুরী যদি তাঁর স্ত্রীকে খুন করে থাকেন তবে তার পেছনে তাঁর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, নার্সিংহোমে হামলা করে মারধর যে করেছিল তারও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। হয়তো ডাক্তার চৌধুরীকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করার জন্য। ডাক্তার চৌধুরী নিরস্ত হননি। ফলে তাঁকে খুন করার প্রয়োজন দেখা দিল। যে খুনটা করেছিল তারও একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে হয়তো বিশেষ একজনকে খুশি ও নিষ্কণ্টক করার জন্য; হয়তো তারই অনুরোধে চৌধুরীকে খুন করায়। দ্বিতীয় লোকটা পাওয়ারফুল, প্রচুর টাকার মালিক, পিছনে শাঁসালো শ্বশুর।

আপনি কি বিজিতের কথা বলছেন?

অনুমান মাত্র। সত্যি কি না কে বলবে?

আমার অবশ্য অনুমান হল নম্রতা একদিন জানতে পারে যে তার স্বামী বিজিত কোনও বিশেষ একজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার সন্দেহ যার প্রেমে সে পড়েছিল সেই নম্রতাকে জানিয়ে দেয়। না জানালে বিজিত তার জীবন বিষময় করে দিত। ক্রমশ বিজিত নানা লোভনীয় কন্ট্রাক্ট তাকে দিয়ে ফেলছিল। ওই জাল কেটে না বেরতে পারলে মেয়েটির রক্ষে ছিল না। আর আপনি জানেন নম্রতা কেমন মেয়ে। পজেসিভ, রাগি, খেয়ালি, জেলাস

এবং ক্রুয়েল। বিজিত তার একার জিনিস। বিজিতের সামান্য বেচাল সে সহ্য করতে পারে না।

দৃপ্ত মুখে গার্গী বলে ওঠে, মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি কি এসব নোংরা ঘটনায় আমাকে জড়াতে চাইছেন?

শবর দাশগুপ্ত একদৃষ্টে কিছুক্ষণ গার্গী মিত্রের দিকে চেয়ে রইল। গার্গীর চোখ ধীরে-ধীরে নেমে গেল কোলের ওপর।

শবর মৃদু হেসে বলে, আপনাকে দেবীপ্রতিমার মতো দেখাচ্ছে। না, আপনার দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু নেই। শুধু বলি, আমার কল্পনাশক্তি একটা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করছে। সুইমিং পুলের ধারে হতচেতন মাতাল বিজিত বসে আছে। অনেক রাত। অন্ধকারে দ্রুত পায়ে একটি ছিপছিপে মেয়ে তার কাছে এল। মেয়েটি নম্রতা। সম্ভবত মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধও দেওয়া হয়েছিল বিজিতকে। নম্রতা তাকে সুইমিংপুলে চেয়ারসুদ্ধ ফেলে দেয়। তারপরে জলে নেমে মায়াভরে বিজিতের মাথাটা জলের নিচে চেপে ধরে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে ফিরে যায়। ইট ওয়াজ অ্যাজ ইজি অ্যাজ দ্যাট।

তাহলে আপনার তো নম্রতার কাছেই যাওয়া উচিত। তাকেই তো অ্যারেস্ট করার কথা আপনার।

হাত তুলে শবর বলে, ধীরে, মিস মিত্র, ধীরে। এখনও বিজিতের অটোপসি রিপোর্ট আমার হাতে আসেনি। কোনও সাক্ষী নেই, প্রমাণ নেই। তার ওপর বিমলাপ্রসাদের মেয়ের টাকা আর কানেকশানের জোর এত বেশি যে, সামান্য পুলিশের পক্ষে তাকে ফাঁসানো প্রায় অসম্ভব। সম্ভবত তাকে ধরলেও বেনিফিট অব ডাউট-এ মুক্তি পেয়ে যাবে। কারণ, বিজিতের মৃত্যুটা খুন না অ্যাকসিডেন্ট সেটাই তো বিরাট প্রশ্ন। সুইমিং পুল তার প্রিয় জায়গা ছিল, সে মাতাল ছিল, অ্যাকসিডেন্ট তো হতেই পারে।

কেন যে আমার কাছে এলেন!

শুধু এই কথাটা জানাতে যে এই সব ঘটনার কোথাও আপনি নেই। আপনি সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। দেবীপ্রতিমার মতোই দেখাচ্ছে আপনাকে।

কেন একথা বলছেন? আমার যে কেমন লাগছে।

কেমন লাগছে মিস মিত্র? খারাপ! কিন্তু এসব ঘটনার একটা ভালো দিকও তো আছে। বিউটি কনটেস্টের তিনজন অসাধু বিচারকের একজন অন্তত চরম শাস্তি পেয়েছে। অন্যায়ভাবে যে আপনাকে হারিয়ে বিউটি কুইন হয়েছিল সে নিজের হাতে তার প্রিয়তম পুরুষটিকে খুন করে উন্মাদের মতো দেওয়ালে মাথা ঠুকে প্রলাপ বকছে। এ তো প্রকৃতিরই প্রতিশোধে—তাই না? আপনি যদি সেই প্রক্রিয়াটাকে একটুখানি সাহায্য করেই থাকেন তা হলেও ইন্ডিয়ান পেনাল কোড আপনাকে ছুঁতেও পারবে না। অভিনন্দন মিস মিত্র, অভিনন্দন।

গার্গী মিত্র হঠাৎ দু-হাতে তার মুখ চাপা দিল।

আমি চলি মিস মিত্র। আপনি বরং একটু কাঁদুন। কাঁদলে মন হালকা হয়ে যায়।

মারীচ

আপনি .তা বাহাদুর লোক দেখছি।

কেমন করে দেখলেন?

আপনার বায়োডাটা বলছে আপনি এক সময়ে বোম্বের ফিলমে কিছুদিন স্টান্টম্যানের কাজ করেছিলেন।

ওটা বাহাদুরির ব্যাপার নয়। পেটের দায়।

কী ধরনের স্টান্টম্যান ছিলেন আপনি?

মোটরবাইক আর কিছু লাফ ঝাঁপ। টাকার জন্য করতে হত, তবে টাকাও তেমন কিছু রোজগার করতে পারিনি। কিন্তু আমার তো বায়োডাটা নেই। ছিলও না, আপনি পেলেন কী করে?

বায়োডাটাটি তৈরি করেছে পুলিশ। বিস্তর খোঁজখবর করে।

তার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? আই অ্যাম নট এ ক্রিমিন্যাল।

ক্রিমিন্যাল কিনা সেটা তদন্তের পর বোঝা যাবে। আপনি বোম্বে থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকা। এবং সেটা বোধহয় আইনকে ফাঁকি দিয়েই।

না। আইনকে ফাঁকি দিয়ে নয়। আমি বোম্বেতে থাকার সময় একটা জাহাজের চাকরি পেয়ে যাই। খালাসির কাজ। সেটা আইনসম্মতই ছিল।

কিন্তু আমেরিকার নিউ ইয়র্কে যখন জাহাজটা প্রায় বছরখানেক পরে ভিড়ে ছিল তখন বোধহয় খুব আইনসম্মত পদ্ধতিতে আপনি জাহাজ থেকে পালাননি।

সেটা বৈধ ছিল না বটে। আই ওয়াজ এ ডেজার্টার। আমার বহুকালের ইচ্ছে ছিল আমেরিকায় গিয়ে সেটল করব।

আপনি আমেরিকায় বেশ কিছুদিন বড়-বড় ট্রাক চালাতেন। তাই না?

হ্যাঁ, আমেরিকায় গিয়ে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল। তখন খুব কষ্ট গেছে। নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়েছিল। শেষে একটা গ্যারাজে জুটে গিয়েছিলাম হেলপার হিসেবে। সেখানেই ওইসব সুপার ট্রাক চালানো শিখে যাই।

অ্যামনেস্টির সুবাদে আপনি মার্কিন নাগরিকত্বও পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ। আমার জীবন খুব বিচিত্র।

তাই দেখছি। আমেরিকায় আপনার ক্রিমিন্যাল রেকর্ড ছিল কি?

না।

ঠিক বলছেন?

হ্যাঁ।

সুব্রত বকসী আমাদের জানিয়েছেন আপনি সেখানে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন। এবং আপনার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ ছিল।

চার্জ ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা স্রেফ আমাকে প্যাঁচে ফেলা ছাড়া কিছু নয়।

যে-মেয়েটি খুন হয়েছিল তার নাম কি জুলি?

হ্যাঁ, জুলিয়া।

আপনার স্ত্রী না গার্লফ্রেন্ড?

স্ত্রী নয়, আমি বিয়ে করিনি।

তাহলে গার্লফ্রেন্ড?

বলতে পারেন। তাকে খুন করেছিল একটা একস্ট্রিমিস্ট গ্রুপ। জুলি এক সময়ে ওই গ্রুপের একজন মেম্বার ছিল। তখন বোধহয় টাকাপয়সা নিয়ে কোনও প্রবলেম হয়েছিল।

যাকগে, আমি ওই পয়েন্টে স্টিক করতে চাইছি না।

ধন্যবাদ।

আপনি বছরখানেক আগে দেশে ফিরে এসেছেন। তাই তো?

হ্যাঁ, এক বছর এক মাস।

কেন বলুন তো? আপনার তো ওখানেই সেটল করার ইচ্ছে ছিল। এখনও আপনার মার্কিন নাগরিকত্ব বহাল রয়েছে।

সত্যি কথা বললে বলতে হয়, আমেরিকার মোহ আর আমার নেই।

বাঃ, চমৎকার। কিন্তু মোহটা হঠাৎ কেটে গেল কেন?

শুধু টাকা রোজগার করাটা কারও জীবনের লক্ষ হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়।

আপনি কি একজন দার্শনিক?

আজ্ঞে না। আমি দর্শনশাস্ত্র পড়িনি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতাই আমাকে খানিকটা দার্শনিক করেছে।

বাঃ বেশ। কিন্তু এটাও কি সত্যি যে আমেরিকায় আপনি বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি!

এটা কোন সূত্রে জানলেন?

আমাদের মার্কিন সোর্স জানিয়েছেন যে, দীর্ঘদিন ট্রাক চালানো এবং ফিলাডেলফিয়ায় একটা দোকান করার চেষ্টা, এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি এসব করে আপনাকে পেট চালাতে হয়েছে।

আমি এসব করেছি ঠিকই। তবে অর্ডারটা উলটোপালটা হয়ে গেছে। এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি ছিল আমার প্রথম দিককার চেষ্টা। তারপর দোকানঘর। তারপর

ট্রাক চালানো।

আর কিছু?

হ্যাঁ, আমি মিউজিক গ্রুপে ইনস্ট্রুমেন্ট বাজিয়েছি, হোটেলে আশার-এর চাকরি করেছি। শেষ অবধি আমি একটা ব্যাবসা শুরু করি।

সেটা কি একটা জাপানি কোম্পানির সঙ্গে?

আপনি তো সবই জানেন। হ্যাঁ, একটা জাপানি কোম্পানি আমাকে একটা ফ্রানচাইজি দিয়েছিল। সুব্রত বকসীর সঙ্গে আমার সেই সূত্রেই ভাব হয়।

তারপর?

আপনি যখন সবই জানেন তখন আর নতুন করে কী বলব?

মানুষ যত কথা বলে ততই আমাদের কাজের সুবিধে হয়।

তা হয়তো হয়। কিন্তু আমাকে ঝুটমুট হয়রান করছেন। সুব্রত বকসী আমাকে পছন্দ করেন না বলেই তিনি আপনাদের নানারকম ইনফর্মেশন দিয়েছেন হয়তো।

সুব্রত বকসীর সঙ্গে কী আপনার এক সময়ে খুব বন্ধুত্ব ছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি ওই জাপানি কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন।

তাহলে উনি তো আপনার উপকারই করেছেন!

আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

তারপর কী হল? আপনি ওর সুন্দরী স্ত্রীর প্রেমে পড়ে গেলেন। নয়কি?

ব্যাপারটা ওরকম ভাবে বললে আমাকে লম্পট বলে ধরে নিতে কি আপনার সুবিধে হয়?

আপনি কি লম্পট নন বলে দাবী করছেন?

আমি স্বভাবগতভাবে অবশ্যই লম্পট নই।

তাহলে মিসেস অরুণিমা বকসীর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কীরকম ছিল? প্লেটোনিক?

সম্পর্কটার জন্য আমাকে দায়ী করা অন্যায় হবে।

খুলে বলুন।

অরুণিমা বকসী সুন্দরী হলেও তরুণী নন। আমার পক্ষে মেয়েদের বয়স অনুমান করা কঠিন। তবে মনে হয় চল্লিশের কাছাকাছি।

সো হোয়াট?

আপনাকে এ সম্পর্কটা মনে রাখতে বলছি।

বলতে হবে না। অরুণিমা বকসীর ডেট অফ বার্থ আমরা জানি। তাঁর বয়স ঊনচল্লিশ। আপনার বয়স ত্রিশ। ঠিক তো?

হ্যাঁ।

আপনি কি মনে করেন যে, ত্রিশ বছরের এক যুবকের সঙ্গে ঊনচল্লিশ বছরের এক মহিলার প্রেম হওয়া সম্ভব নয়?

তা হতেই পারে। আজকাল নানারকম রিলেশন তৈরি হচ্ছে।

আপনার ক্ষেত্রে কী হয়েছিল?

সুব্রত বকসী আমাকে বিজনেসের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। নিউ ইয়র্কে তিনি আমার অফিসেরও ব্যবস্থা করে দেন। তিনি থাকতেন কুইনসে। আমাকে প্রায়ই বাড়িতে নেমন্তন্ন করতেন। মিসেস বকসীও আমাকে বেশ পছন্দ করতেন।

কী ধরনের পছন্দ?

আমি গেলে খুশি হতেন, লক্ষ করেছি।

তারপর?

দু-তিন মাসের মাথায় তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন।

সেটা কীরকম ঘনিষ্ঠতা? ফিজিক্যাল?

হ্যাঁ।

আপনিও রাজি হয়ে গেলেন?

আমার উপায় ছিল না। মিসেস বকসীই আসলে কোম্পানি চালাতেন। তাঁর ইচ্ছেতেই সব হত। সুব্রতবাবু ছিলেন ফ্রন্ট মাত্র।

তার মানে আপনি মিসেস বকসীকে খুশি করার জন্যই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন?

আমেরিকায় ফিজিক্যাল রিলেশনটা জলভাত। মিসেস বকসী বাঙালি হলেও ওঁরা দুই পুরুষের আমেরিকান। উনি মার্কিন মেইনস্ট্রিমের মানুষ। বাংলা ভালো বলতেও পারতেন না। কোনও সংস্কারও মানতেন না।

এ ব্যাখ্যা তো আপনার।

আপনি তো আমার ব্যাখ্যাই শুনতে চাইছেন।

ঠিক কথা। বলুন। আপনার ভার্সানটাই শোনা যাক।

আমি আমার ভার্সানটাই বলতে পারি, তা থেকে ডিডাকশন যা করার তা আপনি করবেন। আমার মনে হয় মিসেস বকসী সেই সময়ে সুব্রতবাবুর ওপর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাকে উনি একসঙ্গে থাকার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

লিভিং টুগেদার?

হ্যাঁ, আমি রাজি হইনি।

রাজি না হওয়ার কারণটা কী?

আমি ওঁর প্রতি আসক্ত ছিলাম না। জীবিকার প্রয়োজনেই ওঁকে খুশি করার চেষ্টা করতাম মাত্র।

আপনাকে তো মোটেই ভালো লোক বলে মনে হচ্ছে না মশাই।

আমি ভালো লোক বলে দাবি করছি না। তবে আমি ভীষণ রকমের খারাপ লোকও নই। প্র্যাকটিক্যাল। জীবন সংগ্রাম করতে গিয়ে আমাকে নানারকম আপসরফা করতে হয়েছে।

তাই দেখছি। তাহলে আপনার ব্যাবসা মিসেস বকসীর কল্যাণে বেশ ভালোই চলছিল?

মোটামুটি। মিসেস বকসী আমাকে ব্যবহার করতেন বটে, তাবলে উনি খুব দরাজ হাতের মহিলা ছিলেন না। খুব হিসেবিই ছিলেন।

তাতে তো আপনার ক্ষতি হয়নি। কারণ আপনি তো আর ওঁদের কর্মচারী ছিলেন না, কোলাবরেটর ছিলেন মাত্র। মিসেস বকসী কৃপণ হলেই বা আপনার ক্ষতি কী?

ঠিক কথা। আপাত দৃষ্টিতে আমার ওপর ওঁর কোনও ফিনানসিয়াল কন্ট্রোল থাকার কথা নয়। কিন্তু মিসেস বকসীকে চিনলে আপনার ধারণা পালটে যেত। উনি আমার কাছ থেকে নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট হারে কমিশন নিতেন।

আমেরিকায় ওসব হয় নাকি?

কেন হবে না? সেটা তো আর সাধুর দেশ নয়।

মিসেস বকসী কি সুন্দরী ছিলেন বলে আপনার মনে হয়?

না। তবে নিয়মিত ব্যায়াম-ট্যায়াম করে নিজেকে ট্রিম রাখতেন।

মিসেস বকসীর সঙ্গে তাঁর হাজব্যান্ডের রিলেশন কীরকম ছিল?

ঝামেলাহীন। দুজনেই বেশ কুল কাস্টমার। ওঁদের বাড়িতে বা র্যানচে যখন গেছি তখন দুজনকে বেশ ইন্টিমেট বলেই ধারণা হত। ঝগড়া-টগড়া শুনিনি। সুব্রতবাবু তাঁর স্ত্রীর অনুগত ছিলেন বলেই মনে হত।

সুব্রতবাবুর কী এক্সট্রা ম্যারিটাল কোনও রিলেশন ছিল?

থাকলেও আমি জানি না। আমি নিজের কাজ কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম।

মিসেস বকসীর সঙ্গে আপনার রিলেশনটা সুব্রতবাবু কি টের পাননি?

টের না পাওয়ার কথা নয়। আমার ধারণা সুব্রতবাবু সবই জানতেন।

কীভাবে বুঝলেন?

অন্তত দুবার উনি আমাকে ওঁর বাড়িতে খুবই অদ্ভুত সময়ে দেখতে পান। তা ছাড়া মিসেস বকসীর সঙ্গে উইক এন্ড কাটাতেও আমি কয়েকবার বাইরে গেছি। সুব্রতদার তখন হয়তো কোনও ট্যুর থাকত। কিন্তু টের না পাওয়ার কথা নয়। ওসব উইক এন্ডেও ওঁদের মধ্যে টেলিফোনে কথা হত।

তাহলে ব্যাপারটা খোলাখুলিই হত বলছেন?

হ্যাঁ, অন্তত আমার তাই ধারণা।

আপনি বেশ ফ্র্যাংক লোক, তাই না! কোনও লুকোছাপা নেই!

আমার জীবনটাই যে ওরকম। লজ্জাশরমের বালাই নেই।

ভালো কথা। আপনি একসময়ে আমেরিকার জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন, তাই তো!

হ্যাঁ, আমার আর ভালো লাগছিল না।

এই ভালো না লাগার কারণ কি মিসেস বকসী?

হয়ত।

নাকি জনা?

জনা আর আমাকে নিয়ে যা রটনা হয়েছে তার অর্ধেক সত্য।

অর্ধ সত্য নয় তো?

অর্ধ সত্য মানে হাফ ট্রুথ। না, তা নয়।

খুলে বলুন।

জনা সুব্রতদার ছোটো বোন। বয়স কুড়ি-টুড়ি হবে। সে পড়াশুনো করতে আমেরিকা গিয়েছিল।

এবং গিয়েই আপনার প্রেমে পড়ে গেল তো?

ঠিক তাই।

আপনি মেয়েদের কি খুব সহজেই অ্যাট্রাক্ট করেন?

আমি কিন্তু করি না। আমার কী করার আছে বলুন, ইফ দে ফল ফর মি!

ঠিক কথা, আপনার চেহারাটা অবশ্য খুবই ভালো, বেশ হি-ম্যানের মতো। জনার সঙ্গেও কি আপনার ফিজিক্যাল—

না-না, ছিঃ, ও কথা বলবেন না।

তাহলে?

জনা রোমান্টিক মেয়ে। সেক্সি টাইপের নয়।

আপনারা তাহলে প্রেমে পড়ে গেলেন?

ওই তো বললাম, অর্ধেকটা সত্য। জনা প্রেমে পড়ল, কিন্তু আমার তো এত ভাবাবেগ নেই। আমি পোড়-খাওয়া, কাঠ-খোট্টা মানুষ। জীবনে মহিলা সঙ্গিনীর অভাব কখনও ঘটেনি। চেহারাটাই সেই জন্য খানিকটা দায়ী। প্রেমে পড়ার মতো মনটাই আর আমার নেই। কিন্তু জনা পড়েছিল, স্বীকার করছি।

তাই নিয়েই কী অশান্তি?

হ্যাঁ। মিসেস বকসী জনাকে অপছন্দ করতে শুরু করেন। এবং আমার ওপরেও আধিপত্য বাড়িয়ে দেন।

সেটা কীরকম?

আমাকে খুবই চোখে-চোখে রাখতেন এবং থ্রেট করতেন।

জনা কতদূর এগিয়েছিল?

ফোন করত। রোম্যান্টিক কথাবার্তা বলত, প্রেমে পড়লে যেমনটা বলে আর কি?

আপনি কি প্রশ্রয় দিতেন?

দিতাম। মেয়েদের আমি সহজে চটাই না।

আপনি বেশ বুদ্ধিমান মানুষ।

বুদ্ধি না হলে কী আমার চলে?

এবার মিসেস বকসীর খুনের ঘটনায় আসি।

আমার যা বলার তো বলেছি।

আবার বলুন।

খুনের দিন সকালে আমি মিসেস বকসীর সঙ্গে ওঁর আয়রণ সাইড রোডের বাড়িতে দেখা করি। উনিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শনিবার ছিল।

কী কথাবার্তা হয়েছিল?

উনি আমার ওপর ভীষণ রেগে ছিলেন।

রাগের কারণ?

সেটাও বলেছি, হঠাৎ আমেরিকা থেকে চলে আসা এবং ওঁদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা হল একটা কারণ। আরও একটা কারণ হল জনা। আমি চলে আসায় জনাও নাকি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করা হয়।

খুনটা হয়েছিল দুপুরে।

খবরের কাগজে তাই তো পড়েছি।

খুনটা আপনি করেননি?

কেন করব সেটা তো বলবেন! মিসেস বকসীর সঙ্গে আর আমার বিজনেস রিলেশন ছিল না। দেশে ফিরে আসি। একে-একে তিনটে ট্রেলার কিনি এবং গত আট মাসে আমার ব্যাবসা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। মিসেস বকসীর প্রতি আমার কোনও সেন্টিমেন্টও নেই। খুন করতে যাব কেন?

মিসেস বকসী কী আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেষ্টা করেছিলেন?

ব্ল্যাকমেল করার ব্যাপারটা আপনাদের মাথায় কে ঢোকাল কে জানে! আমি তো খোলামেলা মানুষ। যা করেছি তা স্বীকার করি। লুকোনোর তো কিছু নেই আমার। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার মতো গুপ্ত কিছুই থাকতে পারে না।

কিন্তু ভাইস ভার্সা। আপনি ওঁকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেননি তো!

আজ্ঞে, সেটাও পুলিশ বলছে। কিন্তু তারা এখনও কোনও সূত্র পাচ্ছে না। আমি বলি কী, একটু স্ট্রং হানচ ছাড়া আমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করাটা কিন্তু হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে।

আপনার পক্ষে মিসেস বকসীর গুপ্ত খবর জানা কি অসম্ভব?

মিসেস বকসী স্ট্রং মাইন্ডেড মহিলা। ওঁর গুপ্ত ব্যাপার বলতে আমার সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশন। তিনি সেটা গোপন করতে যাবেন কোন দুঃখে? সুব্রতদাকে তো ওঁর কোনও ভয় ছিল না। বরং সুব্রতদাই ওঁকে ভয় পেতেন।

আপনার অ্যালিবাই স্ট্রং নয়।

জানি। কিন্তু সেটাই তো কোনও প্রমাণ হতে পারে না!

মিহিরবাবু, আপনি কিন্তু পুলিশকে যথেষ্ট হেলপ করছেন না।

হেলপ করার দায় কী বলুন। আপনার পুলিশের লোক যদি আমাকে অকারণে হ্যারাস আর থ্রেট না করত তাহলে আমি নিশ্চয়ই হেলপ করতাম। ইন্সপেক্টর নাগ একজন অভদ্র লোক। তিনি আমাকে প্রথম ইন্টেরোগেশনের সময়ে একটা থাপ্পড় মেরেছেন। আর কুৎসিত গালাগালের তো হিসেব নেই। ওরা ধরেই নিয়েছেন খুনটা আমিই করেছি, এখন কনফেস করে ফেললেই হয়।

মিস্টার নাগের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।

কেন, নাগসাহেবের হয়ে আপনি ক্ষমা চাইবেন কেন? আর ক্ষমা চাওয়াটাও অর্থহীন। লোকটাকে দেখেই মনে হয় রাফিয়ান টাইপ। দরকার হলেই ফের চড়-থাপ্পড় মেরে বসবে। আপনি কাজ উদ্ধারের জন্য ক্ষমা চাইছেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই।

জনা দেবী সম্পর্কে যদি কিছু জিগ্যেস করি?

জনা সম্পর্কে যা বলার তো বলেইছি।

আপনি বলেছেন জনা দেবী সম্পর্কে আপনি ইন্টারেস্টেড নন।

হ্যাঁ, এবং সেটা সত্যি কথা। মেয়েদের নিয়ে রোমান্টিক চিন্তা করার সময় আমার হাতে নেই।

জনা দেবী কি এখনও আপনার প্রতি দুর্বল?

তা জানি না। তবে মাঝে-মাঝে চিঠি দেয়, ফোনও করে।

আপনি চিঠির জবাব দেন না?

দিই, দেব না কেন? তবে তাতে ভালোবাসার কথা থাকে না।

জনা দেবীর চিঠিতে কি ভালোবাসার কথা থাকে?

খুব থাকে। তবে সেসব হচ্ছে শ্যাম্পেনের ফেনার মতো, ওর মধ্যে বস্তু বিশেষ থাকে না।

আপনি তো দেখছি নর-নারীর প্রেমে বিশ্বাসী নন।

আপনাকে তো বলেছি, আমি খাটিয়ে পিটিয়ে মানুষ। দেশে ফিরে আসার পর আমাকে নতুন করে আবার জীবন সংগ্রাম করতে হচ্ছে। নেপাল, ভুটান, আসাম, পাঞ্জাব জুড়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করা তো চাট্টিখানি কথা নয়।

আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে যদি কিছু জানতে চাই?

স্বচ্ছন্দে।

আপনার মা-বাবা?

বাবা রিটায়ার্ড পোস্ট মাস্টার, সামান্য পেনশন পান। মা বরাবর হাউস ওয়াইফ, দুজনেই নানারকম অসুখে ভুগছেন। আমার দুই দাদা আছেন। একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট—তার প্রচুর পয়সা। তিনি আলাদা হয়ে গেছেন। মেজো দাদাও আলাদা। তিনি চাকরি করেন দিল্লির একটি ইংরিজি পত্রিকায়। মোটামুটি এই হচ্ছে আমার ফ্যামিলি।

মা-বাবাকে কে দেখে?

কেউ দেখে না। মা-বাবা দুজনেই এখনও পরস্পরের দেখাশোনা করেন। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর আমি তাদের কাছেই থাকি বটে, কিন্তু কাজের চাপে তাঁদের ওপর বিশেষ নজর দিতে পারি না। কিন্তু এসব জানতে চাইছেন কেন? এগুলো তো আপনার কেস-এ ইররেলেভ্যান্ট।

আমি আসলে আপনাকে অফ গার্ড ধরতে চাইছি। অসতর্ক মনে যদি হঠাৎ কিছু রিভ্যালেইররেলেভ্যান্ট বলে ফেলেন।

মিহির একটু হেসে বলে, আপনার কি এখনও ধারণা যে, আমি সত্য গোপন করছি?

অফ কোর্স! আপনার চোখে-মুখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আপনি সত্যি কথা বলছেন না। অন্তত সব সময়ে নয়।

কী যে বলেন শবরবাবু! গোপন করার মতো কিছুই নেই আমার।

এমনও হতে পারে যে, আপনি ইচ্ছে করে গোপন করছেন না। হয়তো যেটা সামান্য কোনও ঘটনা যা হয়তো কোনও একটা কথা বা আচরণ, যেটাকে আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না, অথচ সেটা তদন্তের পক্ষে খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিহির বলে, আমি থ্রিলার পড়ি, এক সময়ে আমেরিকায় লং ডিসট্যান্স ড্রাইভের পর মোটেলে সময় কাটানোর জন্য পড়তাম। কাজেই আপনি যা বলছেন তা বুঝতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু আপাতত কিছুই তেমন মনে পড়ছে না আমার। পড়লে জানাব।

ধন্যবাদ, বাই দি বাই, জনা দেবী দেখতে কেমন তা বলবেন?

অবাক হয়ে মিহির বলে, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

এমনি, কৌতুহল মাত্র।

মৃদু হেসে মিহির বলল, এ যাবৎ যে কজন পুলিশের লোক দেখেছি তার মধ্যে আপনাকেই ইন্টেলিজেন্ট বলে মনে হয়েছে। ফালতু প্রশ্ন করার লোক আপনি নন। তবে মেয়েদের রূপের ব্যাপারে আমার মতামতকে গুরুত্ব দেবেন না। আমার সৌন্দর্য বিচারের

চোখ নেই। আমার একটা খুড়তুতো বোন আছে, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। সে বলে, দুখুদা, তুই কিন্তু তোর পাত্রী দেখতে যাস না, তাহলে একেবারে কেলোর কীর্তি হবে।

শবর মৃদু হেসে বলল, তা হোক। তবু আপনার জাজমেন্টটাই আমি জানতে আগ্রহী।

জনা হল গুডি-গুডি টাইপ। শুনেছি খুব ভালো ছাত্রী। যাদবপুর থেকে এম টেক-এ ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। ভালো ছাত্রীরা যেমন দেখতে হয় জনা ঠিক তেমনি। চোখে ভারী চশমা, মুখ গম্ভীর, হাসিঠাট্টা নেই, কথাবার্তা কম, রং একটু ফ্যাকাসে, স্বাস্থ্য রোগা এবং মুখটা রসকষহীন।

বাঃ, এই তো চমৎকার বিবরণ দিলেন। কে বলল আপনার বিচারকের চোখ নেই?

কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছেন? থ্যাংক ইউ।

এবার বলি, জনা কেমন টাইপের মেয়ে? ডেসপারেট? রাগী? টেম্পারামেন্টাল? মুডি? না কী ঠান্ডা ভালোমানুষ?

বোঝা মুশকিল। ওর এক্সপ্রেশন নেই তেমন। তা ছাড়া আমি ওকে স্টাডি করিনি কখনও। কথা-টথা বলতাম ঠিকই, তবে মনোযোগ দিইনি।

সুব্রত বকসী কি তাঁর বোনেরই মতো?

না-না, সুব্রতদা অন্যরকম। দারুণ স্মার্ট, আড্ডাবাজ, বুদ্ধিমান, ডাউন টু আর্থ ম্যান। বেশ ভালো স্কলারও বটে। শুধু ওঁর দাম্পত্য সম্পর্কটাই গোলমেলে।

কীরকম গোলমাল?

সেটাও তো বলেছি আপনাকে।

আবারও না হয় বলুন।

উনি ওঁর স্ত্রীকে খুব তোয়াজ করতেন, খুবই খাতির করতেন, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হত স্ত্রীকে উনি মোটেই ভালোবাসেন না।

বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখেছেন কি?

ঠিক সেভাবে বলা যায় না। তবে অরুণিমা বকসী যে আমার সঙ্গে ইনভলভড এটা জেনেও ওঁর কোনও ভাবান্তর ছিল না। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে স্বামীর তো স্বাভাবিকভাবেই রি-অ্যাক্ট করা উচিত, তাই না?

উনি নপুংসক নন তো!

মিহির হেসে ফেলে বলল, তা তো আমার জানা নেই।

মিসেস বকসী তাঁর স্বামীর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য আপনার কাছে করেননি?

না। ওই ব্যাপারে উনি খুব রিজার্ভড ছিলেন। ওঁর স্বামী ইমপোটেন্ট কিনা তা আমাকে বলবার লোক উনি নন। আমাদের ইন্টিম্যাসিটা শুধু ফিজিক্যাল লেভেলেই ছিল, হৃদয়ঘটিত নয়।

তাহলে উনি জনাকে হিংসে করতেন কেন?

ফিজিক্যাল পজেশনও তো একটা পজেশন। উনি ওটাও ছাড়তে চাননি।

ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গটা থাক। এবার মিসেস বকসীর মৃত্যুর প্রসঙ্গে আসি। উনি মারা যাওয়ায় আপনি কি দুঃখ পেয়েছেন?

যে কারও মৃত্যুই দুঃখজনক।

আপনি আপনার কথা বলুন।

হ্যাঁ, আই ফেল্ট স্যাড।

কে ওঁকে খুন করতে পারে বলে মনে হয়?

নো আইডিয়া। পুলিশ যে কতবার কত ভাবে এ প্রশ্ন করেছে তার হিসেব নেই।

জানি, পুলিশকে একই প্রশ্ন বারবার করতেই হয়।

উইথ থার্ড ডিগ্রি?

শবর দাশগুপ্ত ম্লান একটু হেসে বলল, পুলিশের কাজ তো ভালো কাজ নয়। অপরাধী আর অপরাধ যে কত জটিল আর কুটিল তা যদি জানতেন তাহলে রাগ করতেন না।

পুলিশের কাজ কীরকম এবং কাদের নিয়ে তা আমি খানিকটা জানি। কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট হতে পুলিশের বাধা কোথায় বলুন তো! আপনাদের ওই মিস্টার নাগের কথাই ধরুন, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ উনি ঠাস করে একটা চড় মেরে বসলেন! যেন মারের চোটেই আমি স্বীকারোক্তিটা করে ফেলব। আমি ওঁকে উলটে মারলে কী হত জানেন?

জানি। আপনি ফিজিক্যালি একজন স্ট্রং ম্যান। হয়তো ক্যারাটে জানেন।

ক্যারাটে জানি বলেই রক্ষে। আমরা ক্যারাটের সঙ্গে ধৈর্য ও স্থৈর্যও শিখেছি। কাজেই চরম প্রয়োজন ছাড়া কাউকে মারি না। মারশাল আর্ট তো মারপিট নয়, ওটা একটা ধরন।

জানি। তবে আমি তো নাগ নই, আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করিনি।

আপনার কথা আলাদা। আপনি শুধু ভালো ব্যবহারই করেননি, অকারণ হাজতবাসের হাত থেকেও মুক্তি দিয়েছেন। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ, আশা করি আপনি কো-অপারেট করবেন।

করব। আপনার মোডাস অপারেন্ডি খুবই বাস্তবসম্মত এবং লজিক্যাল। মিসেস বকসীর খুনিকে ধরতে যদি পারেন তাহলে আমি খুশিই হব। কিন্তু মুশকিল হল আমার কাছে তেমন কোনও তথ্য নেই যা আপনার সাহায্যে আসতে পারে।

ধন্যবাদ। মিসেস বকসী কীভাবে খুন হন তা তো আপনি জানেনই।

হ্যাঁ, গলা টিপে ওঁকে খুন করা হয়েছিল।

ওঁর বাড়িতে আপনি গিয়েছিলেন সকাল আটটা বেজে পনেরো মিনিটে। ঠিক তো!

দু-এক মিনিট এদিক-সেদিক হতে পারে। তবে মোটামুটি সোয়া আটটাই ধরে নিতে পারেন।

বাড়িতে গিয়ে কী দেখলেন?

বিশাল বাড়ি, বিরাট কম্পাউন্ডও, মিসেস বকসীদের ফ্যামিলি বনেদি বড়লোক। আয়রণ সাইড রোডের মতো ঘ্যাম জায়গায় ওরকম বাড়ির দাম কয়েক কোটি টাকা।

সে তো বটেই।

বাড়ি দেখেই আমি ট্যারা হয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছি, একজন দারোয়ান আর একটা চাকর সেই বাড়ি মেনটেন করে।

ঠিকই শুনেছেন। তারপর বলুন, সকাল সোয়া আটটায় পৌঁছে আপনি কী দেখেছিলেন?

নাথিং অফ এনি ইমপর্টেন্স। ফটক দিয়ে ঢোকার সময় দারোয়ান আটকাল। তার কাছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক থাকে। সেটা দেখে ছেড়ে দিল। আমি দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে বাগানটা দেখলাম। তারপর বৈঠকখানায় ঢুকলাম। একজন চাকর এসে স্লিপ লিখিয়ে নিয়ে ভিতরে গেল। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই মিসেস বকসী এসে ঘরে ঢুকলেন।

ডিসক্রাইব হার। ওঁকে কীরকম মুড আর পোশাকে দেখলেন?

গায়ে একটা কিমোনো ছিল। গাঢ় বেগুনি রঙের ওপর একটা ড্রাগন আঁকা। মনে হল খাঁটি জাপানি জিনিস। এ তো গেল পোশাক। আর মুড একটু অফ ছিল। আমাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন।

চাকর-বাকরদের সামনেই?

চাকরটা বোধহয় তখন বেরিয়ে গিয়েছিল। ঠিক লক্ষ করিনি। তবে কে দেখল না-দেখল উনি তার পরোয়া করতেন না।

আপনার কি মনে হয় না যে উনি আপনার প্রতি ইমোশনালি অ্যাটাচড ছিলেন।

সেদিনই প্রথম মনে হল, মে বি শি ইজ সিরিয়াসলি ইন লাভ উইথ মি।

আগে মনে হয়নি?

ইমোশনের চেয়ে ওঁর বোধহয় সেকসুয়াল আর্জটাই বেশি ছিল বলে মনে হত।

উনি আপনাকে চিঠিপত্র লিখতেন না?

হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে লিখতেন।

লাভ লেটার?

ঠিক লাভ লেটার বলা যায় না। আমি হঠাৎ আমেরিকার কারবার গুটিয়ে চলে আসায় উনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ওঁর ধারণা ছিল আমি ওঁকে বিট্রে করেছি।

আপনি হঠাৎ চলে এলেন কেন?

হঠাৎ করে আসিনি। মাস দুই ধরে ধীরে-ধীরে কাজকারবার গুটিয়ে তৈরি হয়েই এসেছি। তবে ব্যাপারটা সুব্রতদা বা তাঁর স্ত্রীকে জানাইনি।

জানাননি কেন?

আমার বিশ্বাস ওঁরা বাগড়া দিতেন। বিশেষ করে মিসেস বকসী।

ওদের তো সন্তান নেই, না?

না। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

এমনি, হঠাৎ মনে হল।

ওঁরা অবশ্য অ্যাডপ্ট করার কথা ভাবছিলেন।

অ্যাডপ্ট কি শেষপর্যন্ত করেছেন?

যতদূর জানি, না।

সুব্রতবাবুর বয়স এখন কত?

আপনারা তো তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, আপনারাই তো সেটা জানবেন।

আমি এই কেসটা সদ্য হাতে নিয়েছি। সুব্রতবাবু তার আগেই আমেরিকায় ফিরে গেছেন। ওঁর বায়োডাটা এখনও আমার স্টাডি করা হয়নি।

পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে।

বিয়ে করার বয়স আছে বলছেন!

নিশ্চয়ই। ও-দেশে এখনও অনেকে এই বয়সে প্রথম বিয়ে করে।

আপনি কি সত্যিই জানেন না সুব্রতবাবুর কোনও প্রেমিকা বা বান্ধবী আছে কিনা!

সত্যিই জানি না।

থাকা কি সম্ভব?

থাকতেই পারে। কোয়াইট নরমাল।

হ্যাঁ, তারপর অরুণিমা বকসীর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার ঘটনাটা বলুন।

উনি আমাকে এমব্রেস করলেন, বলেছি তো!

হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ একটু ইমোশনাল কথাবার্তাও বললেন, তার মধ্যে প্রেমের কথাই ছিল, ওঃ আই লাভ ইউ সো মাচ! আই মিস ইউ সো মাচ! ওঃ ডিয়ারেস্ট, ওঃ ডার্লিং, ওঃ সুইটহার্ট! এইসব আর কী।

আপনার রিঅ্যাকশন কী হল?

খুব একটা কিছু নয়। বরং বছরখানেক বাদে ফের এইসব আমার খারাপই লাগছিল। ভদ্রমহিলার জন্য একটু দুঃখও হচ্ছিল।

এনি সেক্স?

বি সেনসিবল মিস্টার দাশগুপ্ত। ইট ওয়াজ আর্লি ইন দি মরনিং এবং আমাদের আগের রিলেশনটাও তখন ছিল না, অন্তত আমি এখন একদম আলাদা মানুষ।

ওকে, ওকে। ঝগড়া হল কেন?

ঝগড়া! না ঝগড়া হয়নি। ঝগড়া হতে দুটো পক্ষ লাগে। আমি সম্পূর্ণ প্যাসিভ ছিলাম। উনি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

উত্তেজিত হলেন কেন?

উনি পুরোনো কথা তুলে আবার আমাদের আগের সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেন, আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করতে থাকেন, এমনকী সুব্রতদাকে ডির্ভোস করে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়ে ফেলেছিলেন। দেখলাম ভদ্রমহিলা আমার জন্য বেশ পাগল হয়ে উঠেছেন। খুব ডেসপারেট, অথচ আমি ওঁকে কুল ক্যালকুলেটিং অ্যান্ড ক্রুয়েল টাইপের বলে জানতাম। বেহিসেবী হওয়ার মতো মহিলা উনি ছিলেন না।

আপনি ওঁর প্রস্তাবের সায় দেননি বোধহয়?

দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমার জীবনের ধারা পালটে গেছে। তা ছাড়া, আপনাকে তো বলেইছি আমি ওঁর প্রতি কখনও অ্যাট্রাকটেড ছিলাম না, উনি আমাকে ব্যবহার করেছেন, আমিও নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিয়েছি লাইক এ গিগোলো, তার বেশি কিছু নয়।

সেদিন কি ওঁর প্রস্তাবে আপনি রেগে গিয়েছিলেন?

একটুও না। বলেছি তো, ভদ্রমহিলার জন্য আমার করুণা হচ্ছিল, আমি খুব শান্তভাবে ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, লজিক্যালি, কিন্তু উনি ক্রমশ রেগে উঠছিলেন, ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন।

রেগে গিয়ে উনি কী করলেন?

চেঁচামেচি করলেন, কাঁদলেন, আমাকে যা-খুশি বলে অপমান করলেন, আমি কিছুই গায়ে মাখিনি।

বাড়িতে কজন ঝি-চাকর ছিল বলে আপনার অনুমান?

খুব বেশি নয়। দারোয়ান আর একজন চাকরকেই আমি দেখেছি।

কোনও মহিলা?

না, কারও কোথাও সাড়া শব্দও পাইনি।

বাই দি বাই, আপনি সেদিন কীসে করে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন?

আমার একটা গাড়ি আছে।

নিজে চালান?

তা তো বটেই।

কী গাড়ি আপনার?

হুন্ডাই।

মিসেস বকসী কি আপনাকে মারধর করেছিলেন?

উত্তেজনার বশে উনি আমাকে একটা চড় মারেন এবং গালে খিমচে দেন। পুলিশ সেই দাগ থেকে ধারণা করে নেয় যে, আমি যখন ওঁকে গলা টিপে মারছিলাম তখন নাকি উনি আত্মরক্ষার জন্য আমাকে খিমচে দিয়েছিলেন, পুলিশ খুব সরল পথে চলতে চায়, তাই না?

ব্যাপারটাকে আপনিই বা জটিল ভাবছেন কেন?

আমি জটিল ভাবছি না, আপনারা যত সরল সিদ্ধান্তে আসছেন আমার পক্ষে পরিস্থিতি ততই জটিল হয়ে উঠছে। এই যে আপনি আমাকে তলব করে লালবাজারে টেনে এনেছেন তাতে আমার কত জরুরি কাজ পণ্ড হচ্ছে তা কি জানেন?

কেসটা খুনের, তাই আমাদের একটু সিরিয়াস হতে হয়েছে। তার ওপর সুব্রত বকসীর কিছু পাওয়ারফুল কানেকশান আছে বলে আমাদের ওপর প্রেশার আসছে। যদিও আপনার একটু হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে তবু একটু বিয়ার করুন, আপনাকে হয়তো আরও ইন্টারোগেট করা হবে।

আপনি ওঁর সঙ্গে কতক্ষন ছিলেন?

খুব বেশি হলে ঘণ্টা খানেক।

তার বেশি নয়?

না, বরং দু-চার মিনিট কমই হবে।

যখন আপনি চলে আসেন তখন কি মিসেস বকসী শান্ত ছিলেন? মানে প্যাসিফায়েড হয়েছিলেন কি?

না। উই পার্টেড উইথ এ বিটার নোট। শি ওয়াজ আপসেট।

আর আপনি?

আমি খুবই হেলপলেস ফিল করেছিলাম। মিসেস বকসীর মতো কঠিন মানুষ যে এতটা ইমোশনাল হতে পারেন সে ধারণা আমার ছিল না। এ যেন মিসেস বকসী নয়, অন্য কেউ। যেন বয়ঃসন্ধির কিশোরী। সাধারণত কম বয়সে প্রথম প্রেমে দাগা খেয়ে মেয়েরা ওরকম ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু মিসেস বকসীর মতো প্র্যাকটিক্যাল ডাউন টু আর্থ সেনসিবল মহিলাদের এরকম হওয়ার কথা নয়।

আপনার কি মনে হয় উনি অভিনয় করছিলেন?

না, একেবারেই না। অভিনয় করবেন কেন?

আপনাকে ইমপ্রেস করার জন্য।

না-না মিস্টার দাশগুপ্ত, অভিনয় হতেই পারে না, অভিনয় হলে ঠিকই ধরতে পারতাম।

তাহলে এই নতুন রূপের মিসেস বকসীকে দেখে আপনি ইমপ্রেসড?

তা এক রকম বলতে পারেন।

আপনি কি একটুও সফট হয়ে পড়েননি?

সফট কথাটার যদি বাঁকা অর্থ না ধরেন তবে বলতে পারি, হ্যাঁ, ওঁর প্রতি সহানুভূতিও হচ্ছিল। কিন্তু আমি একজন ওয়েদারবিটন ম্যান, বয়স ত্রিশ হলেও অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া মানুষ। সহানুভূতি হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা কোনও দুর্বলতা নয়। ওঁকে আর প্রশ্রয় দেওয়া বা ওঁর কুক্ষিগত হয়ে পড়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

খুনটা কখন হয় তা কি আপনি জানেন?

আপনাদের কাছ থেকেই জেনেছি। দুপুর দুটো আড়াইটে নাগাদ।

সে সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন?

সেও পুলিশকে বলেছি, তারা আমার কথা বিশ্বাস করছে না।

তবু আর একবার বলুন। আমি হয়তো বিশ্বাস করতেও পারি।

দুপুর একটা-দেড়টা থেকে বিকেল চারটে অবধি আমি আমার একটা ট্রাকের মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম।

কোথায়?

বেলতলায় আমার ট্রেলারগুলো রাখার জন্য আমি একটা জমি লিজ নিয়েছি। ছোটোখাটো সারাইয়ের কাজও হয়। সেদিন আমি নিজেই আমার ট্রাকের একটা জখম চাকা মেরামত করছিলাম। খুব পরিশ্রান্ত হওয়ায় ড্রাইভারের কেবিনে উঠে শুয়ে পড়ি।

কোনও সাক্ষী আছে?

না।

আপনার গ্যারেজ পাহারা দেয় কে?

ওয়াচম্যান আছে।

ওয়াচম্যান আপনাকে দেখেনি?

সেদিন ওয়াচম্যান ছুটি নিয়েছিল। ভোর রাতে তার মা মারা যায়। ফলে কেউ ছিল না। ওয়াচম্যানকে পুলিশ জেরাও করেছে।

জানি। মিসেস বকসীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় গেলেন?

ডোভার লেন-এ আমার অফিসে। সেদিন আমার দম ফেলার সময় ছিল না। সেখান থেকে বেরিয়ে বেলতলায় যাই।

আপনার অ্যালিবাই কিন্তু দুর্বল।

কান্ট হেলপ ইট। এবার কি আমি যেতে পারি?

পারেন। আসুন।

২

তুমি এই বাড়ির কাজের লোক ভিখু?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতদিন হল এ-বাড়িতে কাজ করছ?

প্রায় দশ বছর।

বাড়ি কোথায়?

ছাপড়া জেলা।

এ-বাড়িতে কীভাবে কাজে ঢুকলে?

আমার কাকা এ-বাড়িতে কাজ করত। কাকা এখন দোকান করে। আমাকে কাকা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

তুমি তো বেশ ভালো বাংলা বলো!

আমি তো জন্ম থেকেই কলকাতায় আছি। এখানেই মানুষ।

এ-বাড়িতে তোমার কাজ কী?

এ-বাড়িতে তো কেউ থাকে না। আমার কাজ ঘরদোর বিছানা-টিছানা সব পরিষ্কার রাখা। বছরে একবার মেমসাহেব আসেন, তখন তার দেখভাল করতে হয়।

মেমসাহেবের বাপের বাড়ির লোকেরা কোথায়?

মেমসাহেবের তো কেউ নেই। বড় মালিক আর মালকিনও এখানে থাকতেন না। আমেরিকায় থাকতেন। সেখানেই একটা অ্যাক্সিডেন্টে দুজনেই মারা যান। এ-বাড়িও বিক্রির চেষ্টা চলছে।

তোমাকে কত মাইনে দেওয়া হয়?

আড়াই হাজার টাকা।

বাড়ির কাজের লোকের পক্ষে মাইনেটা তো ভালোই, কী বলো?

না সাহেব, এ-টাকায় সংসার চালানো মুশকিল।

তোমার সংসারে কে আছে?

আমার বউ আর চার ছেলেমেয়ে। দুই বেটা, দুই বেটি।

এ-বাড়িতেই থাকো?

না সাহেব। ফ্যামিলি নিয়ে এ-বাড়িতে থাকার হুকুম নেই। আমার পরিবার থাকে তিলজলায়, একটা বস্তিতে।

তোমার চলে কী করে?

আমার বউও কাজ করে। বাড়ির কাজ।

ফ্যামিলি নিয়ে এখানে থাকার হুকুম নেই কেন? এ-বাড়িতে তো আউট হাউস আছে এবং সেগুলো ফাঁকাই পড়ে থাকে।

বাচ্চা-কাচ্চা থাকলে বাড়ি নোংরা করবে, বাগানের গাছপালা ছিঁড়বে বলেই হুকুম নেই। তা ছাড়া অনেকে বাড়ি দখল-টখল করে নেয়।

এ-বাড়িতে তো অনেক দামি জিনিস রয়েছে দেখছি। তোমাকে কি মেমসাহেব খুব বিশ্বাস করতেন?

তা জানি না। তবে থানায় আমার নাম ঠিকানা ফটো সব রেকর্ড করা আছে। কোনও জিনিস চুরি গেলে পুলিশ তো আমাদেরই ধরবে।

এবার ঘটনার দিনের কথা বলো।

ঘটনার দিন সকালে মেমসাহেব আমাকে ডেকে বলে দিলেন, একজন বাবু দেখা করতে আসবেন, ঘরদোর যেন ফিটফাট থাকে।

ঘরদোর তো ফিটফাটই আছে দেখছি।

হ্যাঁ সাহেব। এ-বাড়ি সবসময়ে ফিটফাট থাকে। তবু মেমসাহেব বললেন বলে আমি আরও একটু ঝাড়পোঁছ করলাম।

মেমসাহেব কীরকম লোক ছিলেন বলে তোমার মনে হয়?

ভালো লোক ছিলেন।

কীরকম ভালো?

ঝুট ঝামেলা কিছু করতেন না। চুপচাপ থাকতেন।

রাগী মানুষ ছিলেন কি?

বেয়াদবী বরদাস্ত করতেন না। আমাদের খুব ফিটফাট থাকতে হত, নোংরা দেখলে রেগে যেতেন।

কাজে খুশি হলে বখশিশ দিতেন নাকি?

না। বখশিশ দিতেন না।

উনি কি কৃপণ ছিলেন?

না সাহেব। কিন্তু বখশিশ দিতেন না।

তোমাদের মাসের মাইনে কে দিত?

সতুবাবু। মেমসাহেবের সম্পর্কে দাদা। নিউ আলিপুরে থাকেন।

সতুবাবু কি প্রতি মাসে নিজে এসে টাকা দিয়ে যেতেন?

না। আমরা গিয়ে নিয়ে আসতাম।

সতুবাবুই কি এ-বাড়ির দেখাশোনা করতেন?

হ্যাঁ। তবে উনি খুব একটা আসতেন না। ইদানীং এক প্রোমোটার বাবুকে নিয়ে মাঝে-মাঝে এসে মাপ জোক করাতেন।

প্রোমোটারকে চেনো?

ঘোষবাবু। শুনেছি বড় প্রোমোটার।

তার সঙ্গে তোমাদের কোনও কথাবার্তা হয়েছে?

না সাহেব। উনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন কেন?

এবার ঘটনার দিনের কথা বলো। সেই বাবুটি কখন এলেন?

আটটার পর।

চেহারা কেমন?

লম্বা-চওড়া চেহারা। হিরোর মতো।

দেখে কীরকম মনে হল?

আমি ভেবেছিলাম ফিল্মস্টার হবেন বোধহয়।

মেমসাহেবের সঙ্গে তার কি কথাবার্তা হল জানো?

না সাহেব।

মেমসাহেব কি গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন?

তা হতে পারে সাহেব। আমি ওসব দেখিনি।

উনি কতক্ষন ছিলেন?

এক ঘণ্টার মতো হবে। একটু কমও হতে পারে।

তুমি কি কফি বা চা দিয়েছিলে?

মেমসাহেব বলেছিলেন যেন কথাবার্তার সময় ওদের ডিস্টার্ব না করি। তাই আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর ভিতরে যাইনি। তবে দরজার কাছেই ছিলাম, যদি ডাকেন তাহলে যেন শুনতে পাই।

ভিতরে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা শুনতে পেয়েছিলে?

মেমসাহেব রাগারাগি করছিলেন, তবে আমি ইংরিজি জানি না বলে কথা কিছু বুঝতে পারিনি।

মেমসাহেব কি কান্নাকাটিও করেছিলেন?

হ্যাঁ। বাবুটি চলে যাওয়ার পর মেমসাহেব খুব আপসেট ছিলেন।

তুমি কি একেবারেই ইংরিজি জানো না? এই যে বললে আপসেট!

দুটো একটা শব্দ জানি সাহেব।

সেরকম কোনও শব্দ মনে করতে পারো?

মেমসাহেব একবার বাস্টার্ড বলে গাল দিয়েছিলেন, মনে আছে।

ব্যস?

হ্যাঁ। আর কিছু মনে নেই।

বাবুটি যখন বেরিয়ে যায় তখন তাকে দেখেছ?

না সাহেব, আমি ভিতর দিকের দরজার পাশে ছিলাম। বাবু সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি জানো যে মেমসাহেব বাবুটিকে চড় মারেন?

জানি সাহেব, শব্দ শুনেছি।

আর কিছু?

দারোয়ান বলরাম বলেছিল বাবুর বাঁ-গাল থেকে রক্ত পড়ছিল। বাবু রুমাল দিয়ে গাল চেপে গিয়ে গাড়িতে ওঠেন।

মেমসাহেবকে তারপর কেমন দেখলে?

উনি খুব আপসেট ছিলেন। ইংরিজিতে কী সব বলতে-বলতে দোতলায় উঠে গেলেন।

উনি সেদিন দুপুরে লাঞ্চ করেছিলেন কি?

না সাহেব। আমি বেলা সাড়ে বারোটায় ওঁর দরজায় নক করি।

উনি সাড়া দেননি?

হ্যাঁ, দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আমি কিছু খাব না। দুধ থাকলে এক গেলাস ঠান্ডা দুধ দিতে বললেন।

দুধটা খেয়েছিলেন কি?

হ্যাঁ সাহেব।

তারপর কী করলেন?

ঘরে চুপচাপ শুয়েছিলেন বলে মনে হয়।

খুনটা ক'টার সময় হয় তুমি তো জানো!

হ্যাঁ সাহেব, পুলিশের কাছে শুনেছি। বেলা দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে।

তুমি তখন কোথায় ছিলে এবং কেন তা পরিষ্কার করে বলো।

পুলিশকে সব বলেছি সাহেব। কিছু লুকোইনি। বেলা দেড়টা নাগাদ একটা ফোন আসে।

ফোন কি মেমসাহেব ধরতেন না?

না। মেমসাহেব ফোন ধরতেন না। কোনও জরুরি ফোন থাকলে আমি কর্ডলেস ফোনটা নিয়ে ওঁকে দিতাম।

সব ফোন তুমিই ধরো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবার বলো।

ফোনে একটা লোক আমাকে বলল, ভিখুচাচা তোমার ছেলে অ্যাক্সিডেন্টে জখম হয়েছে। খুব গহেরা জখম। আমরা তাকে পি জি হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তুমি এখনই চলে এসো।

গলাটা কার তা চিনতে পেরেছিলে?

না।

জিগ্যেস করনি?

হ্যাঁ। বলল, আরে আমি তোমার পাড়ার ছেলে রামু। তাড়াতাড়ি চলে এসো। বহুত ইমার্জেন্সি। আমার মাথার ঠিক ছিল না সাহেব। আমি দৌড়ে গিয়ে মেমসাহেবকে বললাম। উনি ছুটি দিয়ে দিলেন। আমি পাগলের মতো হাসপাতালে ছুটলাম। গিয়ে দেখি ওখানে আমার ছেলের নামে কাউকে ভরতি করা হয়নি। তখন ছুটলাম বাড়িতে। গিয়ে দেখি আমার বউ ঘুমোচ্ছে। তাকে ডেকে তুলে সব বললাম। তারপর ছুটলাম ছেলের ইস্কুলে। গিয়ে দেখি, ছেলে ঠিক আছে, কিছু হয়নি।

কখন ফিরলে?

বেলা চারটে হবে।

এসে কী দেখলে?

চারটের সময় মেমসাহেবকে রোজ কফি দিই। সোজা রান্নাঘরে গিয়ে কফি করে দোতলায় উঠে দরজা নক করতে গিয়ে দেখি দরজা খোলা রয়েছে। বাইরে থেকে বললাম, কফি এনেছি। মেমসাহেব সাড়া দিলেন না। ভাবলাম ঘুমোচ্ছেন। পরদা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি মেমসাহেবের বডি অর্ধেকটা বিছানায় আর অর্ধেকটা নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। মাথা নিচের দিকে।

ঠিক আছে। বাকিটা আমরা জানি। পুলিশ তোমাকে কি বলেছে?

সাহেব, পুলিশ আমাদের খুব হয়রান করেছে। চড় থাপ্পড় মেরেছে। কিন্তু আমি বা বলরাম আমরা মেমসাহেবকে খুন করতে যাব কেন বলুন! আমরাই তো তাহলে ভাতে মরব।

ঘর থেকে কিছু চুরি গিয়েছিল বলে মনে হয়?

ঘরের জিনিসপত্র সবই আমি চিনি। সেসব কিছু চুরি যায়নি। তবে মেমসাহেবের ব্যাগ বা স্যুটকেশ থেকে কিছু চুরি গিয়ে থাকলে তা বলতে পারব না। মেমসাহেবের জিনিস তো আমি ধরতাম না।

এবার যা জিগ্যেস করব খুব ভেবেচিন্তে তার জবাব দেবে।

বলুন সাহেব।

মাসখানেক আগে মেমসাহেব যখন এলেন তখন কী একাই এসেছিলেন?

হ্যাঁ সাহেব। মেমসাহেবের ফ্লাইট দেরিতে এসেছিল। আমার ওপর হুকুম ছিল সব রেডি রাখতে।

উনি কখন আসেন?

সন্ধেবেলা। সতুবাবু ওঁকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসেন।

সতুবাবু ছাড়া আর কেউ ছিল না?

না সাহেব।

সুব্রতবাবু কবে আসেন?

ছোটসাহেব তো মেমসাহেব মারা যাওয়ার পরে আসেন, খবর পেয়ে।

এসে উনি কি করলেন?

উনি এ-বাড়িতে ওঠেননি। কলকাতায় ওঁর বাড়ি আছে, সেখানে উঠেছিলেন।

সুব্রতবাবু কি কখনও এ-বাড়িতে উঠতেন না?

বেশিরভাগ সময়ে মেমসাহেব একাই আসতেন। ছোটসাহেবকে আমি খুব একটা দেখিনি।

ঠিক আছে। তুমি যেতে পারো। গিয়ে পাঁচ মিনিট পর বলরামকে পাঠিয়ে দাও।

ভিখু চলে যাওয়ার পর টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করে শবর উঠল। এটাই ছিল মিসেস বকসীর শোওয়ার ঘর। খাঁটি আবলুশ কাঠের বিশাল একটা খাট, যার মাথার দিকটা সিংহাসনের মতো কাজ করা। দেরাজ আলমারি সবই একই কাঠের এবং ঝকমক করছে তাদের পালিশ।

আসবাবগুলো সেকেলে, ভারী এবং অতিশয় মূল্যবান। ঘরে ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেটটাও পুরোনো বটে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ির স্থাপত্যও আধুনিক নয়। পুরোনো ব্রিটিশ আমলের প্যালেসের আদলে তৈরি। ঘরটা বিশাল, লাগোয়া দক্ষিণের বারান্দাটিও চমৎকার সোফাসেট দিয়ে সাজানো। আধুনিক জিনিস বলতে শুধু এয়ারকুলার লাগানো আছে ঘরে। শোওয়ার ঘরের একপাশে নিচু ক্যাবিনেটের ওপর দুটো বড় স্যুটকেশ। আমেরিকায় তৈরি। সফট লাগেজ। কালচে রঙের স্যুটকেশ দুটোই আটকে সিল করে দিয়ে গেছে পুলিশ। স্যুটকেশ দুটো খোলার অধিকার আছে শবরের, কিন্তু সে খুলল না।

আসব স্যার?

এসো।

মধ্যবয়সি মজবুত চেহারার বলরাম শঙ্কিত মুখে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

তুমিই তো দারোয়ান?

হ্যাঁ স্যার।

কতদিন কাজ করছো এ-বাড়িতে?

কুড়ি বছর।

বাড়ির মালিককে তো তাহলে ভালোই চেনো।

মাথা নেড়ে বলরাম বলে, না স্যার। মালিকরা কেউ তো এখানে থাকতেন না। ওঁরা অনেক বছর আমেরিকায়, দিদিমণির জন্মও তো হয়েছে ওখানেই। আমি ফাঁকা বাড়ি সামলে রাখতাম।

তোমার কাজ তাহলে কী?

কাজ বলতে কিছুই নেই। শুধু বসে থাকা।

কত মাইনে পাও?

আড়াই হাজার।

মাইনে তো ভালোই।

যে আজ্ঞে, আমি একা লোক, চলে যায়।

একা কেন, পরিবার কোথায়?

আমি বিয়ে করিনি স্যার। মা-বাবা মারা গেছেন। কেউ বিশেষ নেইও।

তুমি এ-বাড়িতেই থাকো?

হ্যাঁ স্যার। গেট-এর পাশেই আমার ঘর। চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি।

খুনের দিন সকালবেলা যে ভদ্রলোক এসেছিল তাকে মনে আছে?

হ্যাঁ স্যার। ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

দিদিমণির কি অনেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকত?

না। বাড়িতে বেশি লোক আসত না।

লোকটা এসে কী করল?

নাম বলল। আমি খাতা খুলে মিলিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। এক ঘণ্টা পর উনি চলে যান।

তখন তুমি কী লক্ষ করেছিলে?

বাবুর বাঁ-গাল কেটে গিয়েছিল। রুমাল চাপা দিয়ে রেখেছিলেন।

তোমার কী মনে হল তখন?

কিছু ঝামেলা হয়ে থাকবে। ভিখুকে জিগ্যেস করেছিলাম। ভিখু বলল দুজনে ঝগড়া হয়েছিল, দিদিমনি বাবুকে খিমচে দেন।

সুব্রতবাবু কি এ-বাড়িতে আসত না?

খুব কম স্যার। দিদিমণির বিয়ে হয়েছে ষোলো-সতেরো বছর। দু-তিনবারের বেশি জামাইবাবুকে দেখিনি ভালো করে।

দিদিমণি কি প্রতি বছর নিয়ম করে দেশে আসতেন?

না স্যার। এক-দুই বছর বাদও যেত। শুনছিলাম এ-বাড়ি বিক্রি করে দিদিমণি এবার আমেরিকাতেই থাকবেন, দেশের পাট চুকিয়ে। এখন যে কী হবে তা বুঝতে পারছি না। চাকরিটা তো যাবেই। বুড়ো বয়সে খুব অসুবিধেয় পড়তে হবে।

টাকা-পয়সা জমাওনি?

কিছু জমিয়েছি স্যার, পোস্ট অফিসে আছে। কিন্তু সেই সামান্য টাকায় কি জীবন কাটবে? টাকার দাম তো কমে যাচ্ছে, কতদিন বাঁচব তার ঠিক কী?

তোমার শরীর তো মজবুত, এখনও খাটতে পারো।

যে আজ্ঞে। কিন্তু লোকে কাজই দিতে চায় না।

চেষ্টা করছো নাকি?

সতুবাবু কয়েকমাস আগেই বলে দিয়েছেন যে, বাড়ি বিক্রির চেষ্টা হচ্ছে, আমি যেন অন্য ব্যবস্থা দেখে নিই। তাই একটু-আধটু চেষ্টা করেছি।

খুনের সময়ে তুমি কোথায় ছিলে?

থানায়। ঝুটমুট আমাকে হয়রান করা হল স্যার। বেলা একটা হবে তখন। একজন সার্জেন্ট মোটরবাইক চেপে এসে বলল, থানার বড়বাবু নাকি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে, এখনই যেতে হবে।

কেন ডেকেছে তা বলেনি?

বলল, কেন ডেকেছে জানি না, তবে বলে দিয়েছে যেতে না চাইলে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে। বলেই চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দিদিমণিকে বললাম। দিদিমণি তখন বিছানায় শোয়া। হাত নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাও।

দিদিমণি কি তখন কাঁদছিলেন?

ঠিক বুঝতে পারিনি। হতেও পারে। গলাটা ভারী লাগছিল।

তারপর বলো।

থানায় গেলাম, তা সেপাই আটকাল। কিছুতেই বড়বাবুর কাছে যেতে দেবে না। তখন বললাম বড়বাবুই ডেকে পাঠিয়েছেন। অনেক তত্ব তালাসের পর বড়বাবুর ঘর দেখিয়ে দিল। গিয়ে যখন নামটাম বললাম বড়বাবু কিছুই বুঝতে পারেন না। যখন বললাম সার্জেন্ট গিয়ে এত্তেলা দিয়েছে তখন বড়বাবু বললেন, তাহলে সিরিয়াস কেসই হবে। আর একজন অফিসারকে ডেকে বললেন, এর একটা স্টেটমেন্ট নিন তো, মনে হচ্ছে সিরিয়াস কেস। তা সেই অফিসার আমাকে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে বলল, ধুস, একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে বোধ হয়। বলে নামধাম নিয়ে ছেড়ে দিল।

তখন ক'টা বাজে?

তা তিনটে সাড়ে তিনটে হবে।

গেট ততক্ষণ খোলা ছিল?

তালা ছিল না। তবে ফটকে আগল দিয়ে গিয়েছিলাম।

দিদিমণি যে খুন হয়েছে তা কখন বুঝলে?

সাড়ে চারটে নাগাদ ভিখু এসে বলল।

কী করলে তখন?

খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমরা গরিব মানুষ স্যার, বিশেষ লেখাপড়াও জানি না, কী থেকে কী হয় ভেবে আমরা সহজেই ভয় পাই। একবার তো ভেবেছিলাম পালিয়ে যাব। তারপর মনে হল হিতে বিপরীত হবে। তাই পুলিশে খবর দিই। পুলিশ স্যার, আমাদেরই ধরে নিয়ে গেল। তারপর অনেক জল ঘোলা হওয়ার পর সতুবাবু গিয়ে ছাড়িয়ে আনেন।

দিদিমণি কীভাবে খুন হয়েছেন জানো?

কেউ গলা টিপে খুন করে গেছে। যে গলা টিপেছে তার হাতে নাকি দস্তানা ছিল।

ঠিক কথা। আর কিছু বলতে পারো?

কী বলব স্যার?

তোমার কি কাউকে সন্দেহ হয়?

না স্যার, কাকে সন্দেহ করব?

দিদিমণি খুন হওয়ার আগে এ-বাড়ির সামনে দিয়ে কোনও একজন বা দুজন লোককে বারবার যাতায়াত করতে দেখেছ? কিংবা কোনও অচেনা লোক কি গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেয়েছে?

এ তো বড়লোকদের পাড়া স্যার। লোকের যাতায়াত কম, তবে আমি বেকার বসে থাকি বলে আশপাশের বাড়ির চাকর দারোয়ানরা মাঝে-মাঝে এসে গল্পটল্প করে যায়।

অচেনা কেউ?

না স্যার, মনে পড়ছে না। গেটের কাছে টুলে বসে থাকলে অবশ্য অনেকে বাড়ির হদিশ চায়, এত নম্বর বাড়িটা কোনদিকে হবে এইসব।

ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। সতুবাবু একটু বাদেই আসবেন। তিনি এলেই সোজা আমার কাছে নিয়ে এসো।

ঠিক আছে স্যার। ভিখুকে কি আপনার জন্য চা করতে বলব স্যার?

বলতে পারো। বলরাম চলে যাওয়ার পর শবর ঘুরে-ঘুরে বাড়ির দোতলাটা দেখছিল। ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝে। দারুণ সুন্দর সব রঙের কম্বিনেশন। বাথরুমে খুব আধুনিক ফিটিংস লাগানো। প্রতি ঘরেই নানারকম সাবেকি আসবাব। দুই আলমারি বোঝাই বিলিতি আর জাপানি পুতুল। পিয়ানো, অর্গান ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র রাখা প্রকাণ্ড হলঘরে। বিশাল-বিশাল ঝাড়বাতি। অথচ এ-বাড়িতে থাকার লোকই নেই। অন্তত বিগত চল্লিশ বছর ধরে বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সতুবাবু বিশাল গাড়ি করে এলেন। বছর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের ফরসা নাদুশ-নুদুশ মানুষ। মোটা গোঁফ আছে। পরনে প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট।

নমস্কার মিস্টার দাশগুপ্ত।

আসুন।

আপনার তদন্ত কতদূর?

চলছে।

আমার কাছে কী জানতে চান বলুন।

এ-বাড়ির ওয়ারিশান কে?

বাড়ির ওয়ারিশান এখন সুব্রত। স্বাভাবিক আইনে।

এ-বাড়ি কি বিক্রি হওয়ার কথা চলছিল?

হ্যাঁ, অরুর তো সেরকমই ইচ্ছে ছিল। কলকাতার পাট তুলে দেবে বলেছিল।

সুব্রতবাবুরও কি তাই ইচ্ছে?

সুব্রতর বোধহয় একটু অমত আছে। অরুণিমা বলছিল সুব্রত এরকম প্রস্তাবে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

কোনও কারণ আছে?

তা জানি না।

সুব্রতবাবুদের এখানকার বাড়ির অবস্থা কেমন?

মুখটা একটু বিকৃত করে সতুবাবু বললেন, অবস্থা আবার কেমন হবে? ছিল তো বনগাঁর রিফিউজি ক্যাম্পে। তারপর বিধানপল্লিতে কোনওরকমে টিনের ঘর করে থাকত। এখন অবশ্য পাকা ঘর হয়েছে শুনেছি, তা তারও অনেক ভাগীদার। ওর কাকা-জ্যাঠাদেরও নাকি ও-বাড়ির শেয়ার আছে। সুব্রতর বাবা তো চিরকালের ভ্যাগাবণ্ড। কোন একটা কো-অপারেটিভে সামান্য বেতনের চাকরি করত। ভাগ্য ভালো ছেলেটা হল ব্রিলিয়ান্ট। সেই জোরেই আমেরিকা গেল। এই তো ওদের হিস্ট্রি। এখন বুঝে নিন।

অরুণিমা দেবী আর সুব্রতবাবুর কি লাভ ম্যারেজ?

হ্যাঁ মশাই, নইলে মনাকাকা কখনও এই পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেয়? তবে সুব্রত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে বলে কাকা আপত্তি করেননি।

ওদের দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন ছিল জানেন?

আগে তো ভালোই ছিল। ইদানীং অরু কিছু অনুযোগ করছিল।

কীরকম অনুযোগ?

এমনিতে কংক্রিট কিছু নয়। অরু চাপা স্বভাবের মেয়ে ছিল। তবে নানা কথায় দু-একটা মন্তব্য করে ফেলত।

ওঁদের সন্তানহীনতাই কি তার জন্য দায়ী?

না মশাই, সন্তানের জন্য দুঃখ সে তো থাকতেই পারে। তাতে কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়?

হয়। সন্তান একটা মস্ত বড় ফ্যাকটর।

মানছি। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা খারাপ হয়ে থাকলে হয়েছে অন্য কারণে।

সেই কারণটা কি?

জানি না।

মিসেস বকসী আপনার খুড়তুতো বোন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার কাকার অবস্থা তো খুবই ভালো ছিল দেখছি!

আমরা ব্যবসায়ী পরিবার। মনাকাকার তো জাহাজ ছিল। সেসব অনেক ব্যাপার।

এ-বাড়িটা কি আপনার মনাকাকাই করেছিলেন?

না। আমার দাদুর তৈরি বাড়ি। চার ছেলের জন্য চার জায়গায় উনি বাড়ি করে রেখে গেছেন।

সবক'টা বাড়িই এরকম ভালো?

বড়কাকার আলিপুরের বাড়িটা আরও ভালো।

এ-বাড়ি কি বিক্রি ঠিক হয়ে গেছে?

সবই তো পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার সব কেঁচে যাবে বলে মনে হয়। এখন তো অরু নেই, সুব্রত মালিক। সে রাজি না হলে বিক্রি আটকে যাবে।

উনি কি বিক্রি করতে রাজি নন?

আমার সঙ্গে কথা হয়নি। কিন্তু অরুর কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় সুব্রত রাজি হবে না।

দারোয়ান আর চাকর দুজনেই বলেছে যে, সুব্রতবাবু নাকি এ-বাড়িতে আসতেন না।

ঠিকই বলেছে। কলকাতায় এলে সুব্রত ওদের কলোনির বাড়িতেই থাকত। অরুণিমা থাকত এ-বাড়িতে। তবে ওরা কেউই এখানে এসে বেশিদিন থাকত না। বড় জোর পনেরো-কুড়ি দিন।

অরুণিমা দেবীর জন্ম তো আমেরিকায়। আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন কি করে?

আমাদের পরিবারের অনেকেই বিদেশে আছে। আমি নিজে বেশ কয়েকবছর আমেরিকায় ছিলাম। তখন অরু ছোটো। আমি ওর নিজের দাদার চেয়েও বেশি ছিলাম।

খুনের খবরটা আপনি কখন পান?

সেইদিনই বিকেলে। ভিখু ফোন করে আমায় জানায়।

আপনার নিজের কোনও ডিডাকশন আছে কি?

মাথা নেড়ে সতুবাবু বললেন, না মশাই, এ একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাত। অরুকে কে কেন খুন করবে তা আমি আজ অবধি বুঝে উঠতে পারিনি। মিহির বলে ছোকরাটারই বা কী স্বার্থ ওকে খুন করার তাও জানি না।

মিহিরের সঙ্গে অরুণিমা দেবীর সম্পর্কটা কীরকম ছিল, জানেন?

একেবারে জানি না বললে ভুল হবে। ঘাসে মুখ দিয়ে তো চলি না। অরুণিমা ওর প্রতি সফট ছিল।

আপনার কাছে অরুনিমা কিছু বলেছেন কি?

খুব পরিষ্কার করে নয়।

উনি কি সুব্রতবাবুকে ডিভোর্স করার কথা ভাবছিলেন?

আমাকে খুলে কিন্তু বলেনি। তবে অরুর হাবভাব দেখে মনে হয় সুব্রতর প্রতি ওর আর তেমন টান নেই।

তারজন্য মিহিরবাবুর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাই কি দায়ী?

তাও জানি না মশাই।

সুব্রতবাবুকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?

সতুবাবুর মুখটা ফের বিকৃত হল। তারপর একটু হেসে বলল, কিছু মনে করবেন না মশাই, নিজের মুখেই বলছি উই আর ভেরি রিচ পিপল। বনেদি বড়লোক। সুব্রতরা হল এ

ক্লাস অ্যাপার্ট, সুব্রত নিজের যোগ্যতায় ওপরে উঠেছে বটে, কিন্তু ওদের কালচার আর রুচি তো সেই নিম্নমধ্যবিত্তই রয়ে গেছে। ওদের টাকা হলে লোক-দেখানো বড়লোকি করতে থাকে। বনেদি পরিবার অন্যরকম হয়। সুব্রতকে অরুর সঙ্গে আমার মিসফিট বলেই মনে হয়েছে।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু সুব্রতবাবু লোকটি কেমন?

মাপ করবেন, আমি জানি না। দু-চারবার দেখা হয়েছে, হেসে দু-চারটে কথাও কয়েছে, কিন্তু ওকে স্টাডি করিনি কখনও।

অরুণিমা দেবীও কি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী ছিলেন?

হ্যাঁ, ওদেশে স্কুলে কলেজে ওর স্কোর দুর্দান্ত। যে জাপানি কম্পানিতে ওরা দুজনে কাজ করে তাতে অরুর পজিশনই বেটার।

দুজনের মধ্যে কি প্রফেশনাল জেলাসি ছিল?

কি জানি, অত জানি না।

সুব্রতবাবুর এক বোন এখন আমেরিকায় আছে, জানেন?

জানি মশাই, জনা, শুঁটকি মেয়েটার বোধহয় এখানে বর জুটছিল না তাই সুব্রত ওকে নিয়ে গিয়েছে। মার্কিন গন্ধ মাখিয়ে পাত্রস্থ করবে।

শুনেছি মেয়েটা লেখাপড়ায় ভালো।

তা হতে পারে। অরু তো ওকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না।

কেন?

বলতো খুব ন্যাকা টাইপের মেয়ে, ভাবুক-ভাবুক ভাব করে থাকে। আসলে ভিজে বেড়াল।

আপনি নিম্নমধ্যবিত্তদের খুব ঘেন্না করেন না?

এবার সতুবাবু তটস্থ হয়ে হেসে ফেললেন, আরে না মশাই, ঘেন্না করব কেন? সমাজের নানা স্তর তো থাকবেই, নইলে সমাজ বলেছে কেন? আসলে কালচার ক্রশ হলেই প্রবলেম দেখা দেয়। অরুর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। মানুষকে তো ঘেন্না করার কিছু নেই।

শুনে স্বস্তি পেলাম।

৩

ইউ হেট উইমেন।

দ্যাটস নট ট্রু।

আই নো, ইউ হেট গার্লস। অল গার্লস।

তা নয়। বলতে পারেন আমি নিস্পৃহ।

ইউ মিন প্যাসিভ?

অনেকটা তাই। আমি খেটে-খাওয়া মানুষ, নন-রোমান্টিক।

খেটে-খাওয়া মানুষেরা বুঝি রোমান্টিক হতে পারে না?

তা পারে। কিন্তু আমি বোধহয় মনের দিক দিয়ে শুষ্ক।

আসল কথাটা স্বীকার করলেই তো হয়। ইউ আর অ্যান্টি ফেমিনিন।

অতবড় কথাটা স্বীকার করি কি করে?

কখনও প্রেমে পড়েছেন?

প্রেমে পড়তে দিল কই মেয়েরা? তার আগেই যে মেয়েরা আমাকে ব্যবহার করে ফেলল! ব্যবহৃত হয়ে-হয়ে প্রেমটাই গেল হারিয়ে।

ব্যবহার মানে? সেকসুয়ালি?

তা ছাড়া আর কী?

আপনি একটু শেমলেস। খোলাখুলি কেউ ওসব বলে?

ট্রুথফুল হতে গেলে বোধহয় একটু শেমলেস হতেই হয়। না?

আপনি বাজে লোক।

অনেকে তাই বলে বটে।

আপনার নিজের কী ধারণা?

বোধহয় খুব ভালো লোক নই।

এটা বিনয় নয় তো?

না-না, আমার ডিফেক্টগুলো সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল।

আর কী-কী ডিফেক্ট আছে আপনার?

লম্বা লিস্ট হয়ে যাবে ম্যাডাম। দোষগুলো না দেখলেই হয়।

এই তো বললেন আপনি ট্রুথফুল, কীরকম সততা আপনার?

অন্তত ডিজঅনেস্ট নই। কিন্তু ম্যাডাম, এই যে রোজ রাত বারোটায় আপনি আমাকে ফোন করে এসব খবর নেন এর পিছনে মতলবটা কী?

অ্যাসেস করা।

নিজের পরিচয়টাও আজ অবধি দেননি।

একটা নাম তো! যা হোক একটা ভেবে নিন না!

আপনি তাহলে কিছুতেই নিজের নাম পরিচয় দেবেন না?

ওটা ইররেলেভ্যান্ট।

আপনি পুলিশের লোক নন তো!

হলেই বা ক্ষতি কী?

না, ক্ষতি আর কী? যা ক্ষতি হওয়ার তো হয়েই গেছে!

কী ক্ষতি হয়েছে শুনি?

পুলিশ আমাকে মারধর করেছে, অপমানজনক গালাগাল দিয়েছে, তার ওপর মার্ডারের চার্জ চাপিয়ে দিয়েছে।

আপনি কি বলতে চান মিসেস বকসীকে আপনি খুন করেননি?

বললেই বা বিশ্বাস করছে কে বলুন!

কেউ না করলে জামিন পেলেন কী করে?

শবর দাশগুপ্ত নামে এক ভদ্রগোছের গোয়েন্দার দাক্ষিণ্যে। শেষ রক্ষা হবে কিনা জানি না। জামিন তো আর অ্যাকুইটাল নয়।

শবর দাশগুপ্ত খুব ইন্টেলিজেন্ট গোয়েন্দা।

হলেই বা। শবর দাশগুপ্ত একা কি করবে। গোটা পুলিশ ফোর্স তো আমার বিরুদ্ধে।

মিসেস বকসী কি আপনাকে ভালোবাসতেন?

উনি তো সেরকমই বলতেন।

তার মানে আপনি ওঁর ভালোবাসাকে বিশ্বাস করতেন না?

না।

ওমা! কেন? ভালোবাসাকে কি বিশ্বাস না করা যায়?

ভালোবাসা অনেক সময়েই কতগুলো আবেগ বা স্বার্থকে নিয়ে তৈরি হয়। স্বার্থ আহত হলে বা আবেগ উবে গেলে ভালোবাসাও হাওয়া। বুঝলেন ম্যাডাম?

আপনি ভীষণ বাজে লোক। বোধহয় একটু পাষণ্ডও, তাই না?

কী জানি ম্যাডাম। নিজের সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা নেই। বেঁচে থাকার জন্য আমাকে নানা কাজ করতে হয়। কাজ নিয়েই সময় কেটে যায়। নিজেকে নিয়ে খুব একটা ভাবি না।

কাজ আমাদের সবাইকেই করতে হয়।

তা তো বটেই।

বারবার নিজেকে অত কাজের লোক বলে জাহির করছেন কেন?

খেটে খাই তো, সে কথাটাই বোঝাতে চাইছি।

দুনিয়ায় সবাই খেটে খায়, কেউ মাথা খাটিয়ে, কেউ শরীর খাটিয়ে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাহলে আপনি তো আর পাঁচ জনের চেয়ে আলাদা কিছু নন!

না, তা নই বটে।

যারা খেটে খায় বা জীবন সংগ্রাম করে তাদের তো হৃদয়বৃত্তি মরে যায় না।

আমি কি বলেছি, যে আমার হৃদয়বৃত্তি মরে গেছে?

সেরকমই তো বোঝাতে চাইছেন। যেন এত কাজ যে প্রেম পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

ম্যাডাম, আমি তা বলতে চাইনি। আমি তো বলেছি মেয়েরা আমাকে বড্ড বেশি স্থূলভাবে ব্যবহার করেছে।

আপনি ব্যবহৃত হলেন কেন?

বললে আপনি চটে যাবেন।

তবু বলুন।

বায়োলজিক্যাল প্রয়োজন তো আমারও আছে।

ইস আপনি ভীষণ অসভ্য।

এই তো চটে গেলেন! এসব আপনার না শোনাই ভালো।

আর এ বিষয়ে একটাই প্রশ্ন।

বলুন।

জনা কে?

সুব্রত বকসীর বোন।

কেমন মেয়ে?

ভালো মেয়ে।

সুন্দর?

সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। ওই একরকম। খুব গম্ভীর।

জনা নাকি আপনার প্রেমে হাবুডুবু?

আপনি তো সবই জানেন দেখছি।

জানি।

তাহলে আর জিগ্যেস করছেন কেন?

আপনার মুখ থেকে শোনার জন্য।

কি আর শুনবেন ম্যাডাম! চেষ্টা করেও জনার প্রেমে পড়তে পারিনি।

আপনার কি একজন মার্কিন স্ত্রী ছিল?

না। স্ত্রী আমার ছিল না। মেয়েটি ছিল লিভ ইন গার্লফ্রেণ্ড।

এমাঃ। আপনি তো জঘন্য লোক!

ম্যাডাম, এটাই তো অর্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড।

মোটেই নয়। সুবিধেবাদীরা ওসব কথা বলে।

আমি যে সুবিধেবাদী তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।

সেই মেয়েটি কি খুন হয়েছিল?

মাই গড, আপনার নেটওয়ার্ক তো দারুণ!

খুন হয়েছিল, না?

হ্যাঁ।

তাকে খুন করলেন কেন আপনি?

ম্যাডাম আমার যে দু-একটা গুণকে আমি নিজেই অ্যাপ্রেসিয়েট করি তা হল আমি খুন-খারাপি করতে অক্ষম।

তার মানে কী?

ওই একটা জিনিস আমি বোধহয় পারি না। আজ অবধি পারিনি।

সত্যি বলছেন?

বিশ্বাস করা বা না করা আপনার হাতে।

দু-দুটো মেয়ে আপনার সংস্পর্শে আসার পর খুন হল, এটা কি কাকতালীয় বলতে চান?

আমি কিছুই বলতে চাই না। শুধু বলি, দুশ্চরিত্র হলেও আমি খুনি নই।

দুশ্চরিত্র কথাটা কিন্তু আমি বলিনি।

না। আপনি বেশ ভদ্র। বললেও কিছু মনে করতাম না।

আচ্ছা আপনি দুশ্চরিত্রই বা কেন?

ম্যাডাম, ওখানেও গণ্ডগোল আছে। আমি লম্পট হিসেবে কারও-কারও কাছে চিহ্নিত বটে, কিন্তু সেটাও আমার চারিত্রিক তারল্যের ব্যাপার নয়। বরং বলতে পারেন ভিকটিম অফ সারকামস্ট্যান্সেস।

অর্থাৎ আপনি সাধুপুরুষ, মেয়েরাই আপনাকে নষ্ট করেছে, এই তো!

আকাঁড়া সত্যি কথা বলতে গেলে তাই বলতে হয়।

দেখুন মশাই, আপনার মধ্যে নষ্ট হওয়ার ইচ্ছে না থাকলে কোনও মেয়ে কি আপনাকে নষ্ট করতে পারত?

আপনি বেশ পিউরিটান আছেন। ব্যাপারটাকে নষ্ট হওয়া বলছেন কেন বলুন তো? বিদেশে ফিজিক্যাল নিডটাকে ওরা টয়লেটে যাওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় না। তবে মরালিটি বা পিউরিটানিজমকে আমি অশ্রদ্ধা করি না। ওরও দাম আছে।

দামটা কি আপনি দেন?

দিই ম্যাডাম, দিই।

তবে নিজে ঠিক থাকেন না কেন?

ওই যে বললাম, আমি কেবল খেলার পুতুল হিসেবে কাজ করেছি।

এদেশে এসে ক'জন মেয়ের সর্বনাশ করেছেন?

গত এক বছর আমার জীবনে নারী সঙ্গ বলতে কিছু নেই তেমন। মিথ্যে বলব না, দু-চারটে কেস হয়ে গেছে।

রোমান্টিক ইনভলভমেন্ট না ফিজিক্যাল?

ফিজিক্যাল।

তারা কারা?

শুনবেন?

শুনিই না।

একজন এয়ার হোস্টেস, একজন বড়লোকের বয়স্কা স্ত্রী, একজন বয়স্কা অ্যাকট্রেস এবং একজন মধ্যবয়স্কা বিধবা।

সবাই বয়স্কা?

কপালে আমার দেখছি বয়স্কাই জোটে।

আপনি সত্যিই ভীষণ খারাপ।

তা তো বলাই যায়। কিন্তু এর প্রত্যেকটারই প্রয়োজন ছিল, তা কি জানেন?

না। আপনার প্রফেশনাল প্রয়োজন?

হ্যাঁ। ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্ট, পুলিশের ঝামেলা এইসব নানা স্বার্থে আমাকে আপনার ভাষায় নষ্ট হতে হয়েছে।

নষ্ট হতে তো আপনি ভালোইবাসেন দেখছি।

তা ম্যাডাম, খারাপও কিছু লাগে না।

আবার মরালিটিকেও পছন্দ করেন!

তাও করি। আমি নিজে বিশুদ্ধ নই বলে বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করব কেন?

বিশুদ্ধ হতে ইচ্ছে করে না?

কোনও ফল পচতে শুরু করলে আর কি বাঁচানো যায়?

ফলে ইচ্ছাশক্তি নেই, মানুষের তো তা আছে।

ভালো বলেছেন। তবে ফের ওই কথা বলতে হয়, আমি নিমিত্ত মাত্র।

ওটা অজুহাত। আসলে আপনি একজন প্লে-বয়।

প্লে-বয় হতে যোগ্যতা লাগে। আমার সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং কই? সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার স্কোপ কম। বিশেষ করে হাই সোসাইটির। আমাকে যারা ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশই হল বয়স্কা, সেক্স স্টার্ভাড, ফ্রাস্ট্রেটেড বা সিনিক মহিলা। ওরা আমাকে কাজে লাগায়, আমি ওদের কাজে লাগাই।

ছিঃ-ছিঃ, আপনি একটা কী বলুন তো?

বলেছি তো, নিজেকে নিয়ে আমার গৌরব হয় না।

নিজেকে ঘেন্না হয় না?

না ম্যাডাম, তাও হয় না। কারণ মস্তিষ্কহীন হওয়ার ফলে আমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার বালাই নেই। আর আমি তো রেপিস্ট নই।

রেপিস্টের চেয়ে ভালোও কিছু নন।

ভালো কথা রেপিস্ট শব্দটা আমার মতে একটা ভুল শব্দ। ওটা হওয়া উচিত রেপার।

ওমা! তা কেন?

যে অর্থে কমিউনিস্ট, লিরিসিস্ট, আইডিয়ালিস্ট সেই অর্থে তো রেপিস্ট হওয়া উচিত নয়। কমিউনিজম, আইডিয়ালিজম, লিরিসিজমের মতো তো রেপিজম বলে কিছু নেই। আছে কি?

না।

তাহলে রেপিস্ট হয় কি করে?

সেটা একটা প্রশ্ন বটে।

আপনি কি ইংরেজির ছাত্রী?

নিজের সম্পর্কে আমি আপনাকে কোনও কথাই বলব না।

আপনি শুধু একটি কণ্ঠস্বর হয়েই থাকতে চান?

মন্দ কি?

রহস্যময়ী হয়ে থাকতেই কি আপনি পছন্দ করেন?

হ্যাঁ।

আপনি কি জানেন যে আমি ইচ্ছে করলেই আপনার নম্বর ট্রেস করতে পারি?

নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু কষ্ট করে যে-নম্বরটা আপনি খুঁজে পাবেন সেটা একটা পাবলিক কল বুথ।

আপনি কি বলতে চান এত রাতে আপনি একটা পাবলিক কল বুথে এসে ফোন করছেন?

তা তো বলিনি? আমি আমার বাড়ি থেকেই ফোন করছি, তবে সরাসরি নয়। একটা কল বুথের থ্রু দিয়ে। আর ওই বুথ কিছুতেই আপনাকে আমার নম্বর দেবে না।

আচ্ছা মানুষ আপনি! এত গোপনীয়তা আর সাবধানতার কি দরকার ছিল?

ছিল। আমি চাই না আপনি আমাকে ট্রেস করুন।

আপনি কি আমাকে ভয় পান না কি ঘেন্না করেন?

কোনওটাই না।

নিছক কৌতূহল?

যা হোক একটা কিছু হবে।

একজন অচেনা মহিলা আমাকে রাত বারোটায় কেন ফোন করেন তার কারণটা কি আমার জানা উচিত নয় বলে মনে করেন?

আপনার কি খারাপ লাগছে? তাহলে বলুন ছেড়ে দিই।

আরে না, ইন ফ্যাক্ট আপনার গলার স্বরটা এত ভালো যে আই ফিল অ্যাট্রাক্টেড টু ইট। আর আপনি বেশ ইন্টেলিজেন্টও বটে। সেই জন্য আমি আজকাল আপনার ফোনের জন্য

অপেক্ষাই করি।

আপনার কি মনে হয় আমি আপনার বিবেকের ভূমিকা নিচ্ছি?

তা একটু মনে হয়। তবে সেটা খারাপই বা কি বলুন! আমার বিবেক জাগ্রত নেই। তাই আর কেউ বিবেকের বিকল্প হতে চাইলে তো ভালোই।

আপনার ঘুম পাচ্ছে না তো!

না। আমি সারাদিনে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে দু-পাঁচ মিনিট করে ঘুমিয়ে নিই। আমার অনেক কালের অভ্যেস। ওভাবেই আমার চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুম হয়ে যায়। অ্যান্ড দ্যাট ইজ এনাফ।

যাক, তাহলে বিরক্ত হচ্ছেন না?

না-না, বরং বেশ ভালো লাগছে। আপনি কি রবীন্দ্রসঙ্গীত বা ওরকম কিছু গান নাকি?

কেন বলুন তো।

বেশ মিউজিক্যাল ভয়েস।

গাইলেই কি বলব নাকি?

ও, আপনি তো আবার পণ করেছেন নিজের সম্পর্কে কিছু আমাকে বলবেন না।

না। এবার বলুন তো, মিসেস বকসী আপনাকে কেন ডেকেছিলেন?

এমনি। পুরোনো চেনার সূত্রে।

এড়িয়ে যাচ্ছেন তো?

কথাটা কী আগে হয়নি?

হয়েছে, কিন্তু আপনি ভাঙছেন না।

আসলে ভসভসে আবেগ ভালোবাসার কথাই বলছিলেন তিনি সেদিন। আমাকে বিয়ে করারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

রাজি হননি বলেই কি রেগে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনাকে কি উনি কোনও লোভ দেখাননি?

তাও দেখিয়েছিলেন। কী করে জানলেন আপনি?

সিমপল লজিক।

আপনি খুব বুদ্ধিমতী।

বলুন না।

হ্যাঁ, উনি আমাকে সেদিন অনেক টাকা অফার করেছিলেন। টাকাটা নিলে তিনটে ট্রেলার কেনার সব ব্যাঙ্ক লোন আমার শোধ হয়ে যেত।

কত টাকা?

ওঁর যা অফার ছিল তা দু-আড়াই কোটি টাকা তো হবেই।

আপনি রিফিউজ করলেন! বোকা নাকি?

ম্যাডাম, একজন ভদ্রলোককে এক জায়গায় তো থামতেই হয়। লাইন অফ কন্ট্রোল। তা নইলে যে নিজের মুখ আয়নায়ও দেখা যাবে না।

হঠাৎ মরালিটি জেগে উঠল নাকি আপনার?

তাও বলতে পারেন। আমার মনে হল এই ভদ্রমহিলাকে যদি এখনই আমি সত্যি কথাটা বলে না দিই তাহলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি থেমে যাবে।

যাঃ। আপনি তো আর গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা নন মশাই।

না, তা নই। তবু আই কনফেসড।

কী বললেন ভদ্রমহিলাকে?

আপনার প্রশ্নগুলো ঠিক পুলিশের মতোই।

হয়তো আমি পুলিশেরই লোক। বলতে আপত্তি আছে?

আরে না। আমি হলাম খোলা বই। আপত্তির কী আছে? আমি খুব বিনয়ের সঙ্গেই বললাম, আমার টাকা পয়সা রোজগার করতে ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু অযথা অর্থপ্রাপ্তিতে আমার আনন্দ হয় না। দ্বিতীয়ত খুব বেশি টাকাও আমাকে আনন্দ দেয় না এবং আত্মবিক্রয় করার মধ্যেও আর আমি এন্টারটেনমেন্ট খুঁজে পাই না।

বাঃ বেশ বলেছেন তো! লাইক এ কারেজিয়াস ম্যান! লাইক এ ম্যান অফ স্ট্রং ক্যারেক্টার।

ঠাট্টা করছেন? তা করতেই পারেন। আমার রেকর্ড তো ভালো নয়।

ঠাট্টা করলাম বুঝি?

তাহলে?

কমপ্লিমেন্টই দিলাম তো?

তাহলে অন্যরকম শোনাল কেন? একে ব্যাজস্তুতি বলে না?

আমি অত বাংলা জানি না। ভদ্রমহিলা কী করলেন?

শি ওয়াজ অন হার নিজ। হাঁটু গেড়ে বসা যাকে বলে।

এতটা? শুনেছিলাম উনি বেশ ব্যক্তিত্বওয়ালা মানুষ!

তাই ছিলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি, চমৎকার মেধা, স্ট্রং লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস। কিন্তু কোনও কারণে আমার ওপর অবসেশনটা একটা অপটিমামে পৌঁছেছিল। দেখলাম উনি প্রায় পাগলামি করছেন।

কেন যে অ্যাকসেপ্ট করলেন না?

সেটা যে মিথ্যাচার হত ম্যাডাম। ওঁর সঙ্গে আমার শরীরের সম্পর্ক ছিল ঠিকই, মনের সম্পর্ক কখনও নয়। আর একটা কথা হল, ওঁর এই ম্যাডনেস দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার নয়। ওর প্যাশনটা ছিল অস্থির এবং উৎকেন্দ্রিক।

আপনি খুব শক্ত-শক্ত বাংলা বলেন, তাই না?

না ম্যাডাম, বাংলা কী করে জানব? আমি ঘোর অশিক্ষিত।

অশিক্ষিত কেন?

মাধ্যমিক পাশ করার পরই সার্কাস দলে চলে যাই বাড়ি থেকে পালিয়ে। তারপর কসরৎ করে-করেই তো সময় পার হয়ে গেল। এখন মনে হয়, পড়াশুনো করলে বোধহয় জীবনটা অন্যরকম হত।

কেন, এই জীবনটা কি আপনার ভালো লাগে না?

ব্যাবসা মানেই হচ্ছে প্রতিদিন অসতের সঙ্গে আপস করে চলা। তিনটে বিশাল ট্রেলার আছে আমার। এগুলোকে খাটিয়ে পয়সা রোজগার করতে এ-দেশে কালঘাম ছুটে যায়। কত দেবতার যে প্রণামী দিতে হয় ভাবতে পারবেন না। পুলিশ, প্রশাসন, ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার সিকিউরিটি থেকে গুন্ডা, মস্তান কে কার চেয়ে কম যায় বলুন। তা ছাড়া রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো তো আছেই, অ্যাক্সিডেন্ট, ডাকাতি, চুরি, ব্যাবসা মানেই হল কনস্ট্যান্ট হেডেক অ্যান্ড টেনশন।

অন্য ব্যাবসা করুন না। যেখানে এত টেনশন নেই?

আমি যেটা ধরি সেটার শেষ অবধি দেখতে চেষ্টা করি। এটা ফেল করলে অন্য রাস্তা ধরতে হবে।

ফেল করছে কি?

না-না, তা বলিনি। আয় মোটামুটি ভালোই হয়।

আমি তো শুনেছি আপনি বেশ পয়সাওয়ালা লোক।

তা বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। পয়সা আসে যায়। আমার দুঃখ কিছু নেই অবশ্য। বেশি বড়লোক হতে আমি কখনও চাইনি।

মদ খান না?

শরীর-সচেতন ছিলাম তো, তাই নেশাটেশা করতাম না। অভ্যাসটা তাই হয়ে ওঠেনি। তবে পার্টিটার্টিতে ভদ্রতার খাতিরে এক-আধ সিপ খেয়েছি, প্রেজুডিস নেই। কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন? মদ্যপান আজকাল ভাইসের মধ্যে পড়ে না। সবাই খায়।

আপনি খুব শক্তপোক্ত লোক, তাই না? গায়ে ভীষণ জোর?

গায়ের জোর ফালতু জিনিস। ও দিয়ে কিছু হয় না।

আপনি কি একটু গুন্ডা গোছের লোক?

বরং ঠিক উলটো। আমি ভীষণ ঠান্ডা মাথার লোক। রাগ নেই। শুনলে অবাক হবেন, আমি মারপিট করিনি কখনও। ঝগড়া-ঝাঁটির উপক্রম দেখলে পালিয়ে আসি।

তার মানে কি কুল কাস্টমার?

তা বলতে পারেন। আমার সম্পর্কে আপনার সোর্স অফ ইনফর্মেশনটা কে বলুন তো।

সেসব কিছুই বলা যাবে না।

আপনিও একজন কুল কাস্টমার, তাই না?

হ্যাঁ, মিসেস বকসীকে কে খুন করেছে বলে আপনার মনে হয়?

নো আইডিয়া।

বাড়িতে তো লোকজন আছে। দুপুরবেলা কী করে খুনটা করল বলুন তো।

সেটা নিয়ে পুলিশ তো ভাবছেই।

আপনার সিক্সথ সেন্স কী বলে?

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে আমার কিছু নেই। খুনটা নিয়ে আমাকে প্রচণ্ড হ্যারাস করেছে পুলিশ। হাজতবাসও করতে হয়েছে। শবর দাশগুপ্ত এসে না পড়লে কী যে হত কে জানে।

আপনার অ্যালিবাই নেই?

একেবারে নেই যে তা নয়, কিন্তু খুব দুর্বল অ্যালিবাই, পুলিশ বিশ্বাসই করছে না।

শবর দাশগুপ্ত কি আপনাকে বিশ্বাস করে?

বিশ্বাস। হাসালেন ম্যাডাম। শবর দাশগুপ্তর চোখ দেখেছেন? বাঘের চোখ, বিশ্বাস করার ধাত নয়। তবে মনে যা-ই থাক, লোকটা মুখে ভদ্র এবং লজিক্যাল। হয়তো আমাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিয়েছে।

আপনার জামিন কে দিলেন?

আমার উকিল সদাশিব মজুমদার।

খুনি যদি ধরা না পড়ে তাহলে কি আপনাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে?

সেটাই তো স্বাভাবিক।

আপনি ভয় পাচ্ছেন না?

ভয় না হলেও উদ্বেগ তো আছেই। তবে আমার তো কেউ নেই। বুড়ো বাবা আর মা। তবে তারা একটা জীবন আমার জন্য এত উদ্বেগ পুইয়েছেন যে, তাঁদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।

আপনার ব্যাবসার কী হবে?

উড়ে-পুড়ে যাবে। হিসেব করে দেখেছি, চৌদ্দ বছর হাজতবাস করলে যখন বেরোব তখন আমার বয়স হবে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। জীবন ফের শুরু করা যাবে। আর যদি ফাঁসিতে লটকে দেয় তো ল্যাটা চুকেই গেল।

ফাঁসি!

তাও হতে পারে। এদেশে মৃত্যুদণ্ড এখনও বহাল আছে। আমি অবশ্য আইন কানুন তেমন জানি না।

খুনটা আপনি কি করেননি?

কেন করব বলুন তো। মিসেস বকসীকে মেরে আমার কী লাভ? কোনও প্রতিশোধস্পৃহা নেই, ওঁর সম্পত্তি পাব না, জেলাসি নেই। খুনটা তবে করব কেন?

মোটিভ? সে তো কতরকমের থাকে। আপনি হয়তো সাইকোপ্যাথ।

আপনি যা খুশি ডিডাকশন করতেই পারেন। তার ওপর তো আমার হাত নেই।

আপনার উচিত পুলিশের কাজে খুশি না থেকে নিজেও একটু তদন্ত করা।

ও বাবা! আপনি তো ডোবাবেন দেখছি।

কেন? নিজের স্বার্থেই তো আপনার একটু উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

পাগল নাকি? পুলিশ আমার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে। থানায় রেগুলার হাজিরা দিয়ে আসতে হয়। একটু বেচাল দেখলেই ফের খপ করে নিয়ে যাবে।

আহা, আমি বলছি আপনি বসে-বসে তো একটু ডিডাকশনও করতে পারেন। কে মারতে পারে তা আন্দাজ করা আপনার পক্ষেই সবচেয়ে সহজ। কারণ, আপনি ভদ্রমহিলাকে চিনতেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র এবং দুর্বলতা সবই আপনার জানা। এখানে ওঁর পরিচিত কারা আছেন তাও আপনার জানা থাকার কথা।

সব মানছি। চিন্তা যে করিনি তাও নয়। আমার ডিডাকশন করার ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। আমার কেন যেন মনে হয় এটা প্রফেশনালদের কাজ।

তার মানে?

মানে খুব সোজা। কেউ চুরি বা ডাকাতি করার মতলবে ঢোকে। মিসেস বকসী বাধা দেওয়ায় খুন করে রেখে যায়।

ডাকাতি কি কিছু হয়েছে?

পুলিশি বলতে পারছে না।

আলমারি বা স্যুটকেস কি ভাঙা ছিল?

না ম্যাডাম, ভাঙার তো দরকার ছিল না। মিসেস বকসীকে খুন করে ওরা ওঁর চাবি দিয়েই সবকিছু খুলেছে। কাজ সেরে ফের চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

বড্ড সরল ডিডাকশন।

আমার মাথায় এর চেয়ে বেশি কোনও সম্ভাবনার কথা আসেনি যে!

আরও ভাবুন।

ভেবে মাথা ভারাক্রান্ত করা কি ঠিক হবে? বরং আমার শবর দাশগুপ্তকে খুব এফিসিয়েন্ট বলে মনে হয়। উনি হয়তো কিনারা করে ফেলতেও পারেন।

ওঁর ওপর খুব ভরসা আপনার!

হ্যাঁ। ভরসা একটু আছে। খুব স্ট্রং ভরসা নয়, তবে সামান্য একটু নির্ভর করতে পারছি। ভদ্রলোক ফেল করলে আমার কপালে কষ্ট আছে। তবে ভাগ্য ভালো যে, বিয়েটিয়ে করিনি। আমার একার ওপর দিয়ে যাবে।

মা-বাবাও তো কষ্ট পাবেন।

তা পাবে। তবে দেয়ার ডে'জ আর নাম্বারড। আমার মা-বাবা জীবনে সুখে থাকেনি। আমি যৌবনকালে কষ্ট দিয়েছি, এখন আমার দাদারা দেয়।

আপনি তো এখনও কষ্ট দিচ্ছেন।

না ম্যাডাম, এই খুন জনিত ঝামেলা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমি বিদেশ থেকে ফিরে এসে মা-বাবার অর্থকষ্ট জনিত সমস্যা নির্মূল করেছি। কাজের লোক রেখে দিয়েছি। মা-বাবা এখন আরামেই আছে। শ্রীঘরে যেতে না হলে আমি তাদের ছেড়ে যে আর কোথাও যাব না তাও তাদের কাছে শপথ করেছি।

ওরা হয়তো আপনাকে সংসারী দেখলেই বেশি খুশি হতেন।

তা আর বলতে! মা তো বিয়ে-বিয়ে করে পাগল করে তুলেছে আমায়। গোটা দশেক পাত্রী দেখেও ফেলেছে। দেখার জন্য আমাকেও টানা-হাঁচড়া কম করা হয়নি। খুনের কেসটায় ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়েছে।

আপনি কি বিবাহ-বিরোধী?

তা কেন? আসলে ওসব নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে না। আর দাদাদের তো দেখছি। মা-বাবার খোঁজ অবধি নেয় না।

সেটা কি তাদের বউদের দোষ?

তা জানি না। তবে বিয়ের পরেই তাদের মানসিক পরিবর্তন হয়েছে।

সেই জন্য বউরা দায়ী হবে কেন? আপনার দাদারাই দায়ী।

ঠিকই বলেছেন। বউদিদের দায়ী করা আমার ঠিক হয়নি।

আজকাল মা-বাবার সঙ্গে থাকলে খটাখটি, অশান্তি বেশি হয়।

আমি সংসার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই। তবে আপনি যা বলছেন তা হতেও পারে।

হ্যাঁ মশাই, ছেলেরা বউ নিয়ে আলাদা থাকাই ভালো।

তাহলে আর আমার বিয়ে করা হবে না।

ওমা! কেন?

আমি বুড়ো মা-বাবাকে ছাড়তে পারব না। একটা জীবন অনেক কষ্ট দিয়েছি। দু-তিন বছর নাপাত্তা ছিলাম। ভেবে-ভেবে আমার মায়ের হার্টের অসুখ হয়েছে।

তাহলে বোবা-কালা মেয়ে বিয়ে করুন। না হলে গাঁ-গঞ্জের একটু হাবাগোবা মেয়ে।

আমার তো বউয়ের দরকারই নেই।

ও! তাহলে সেই ফুলে-ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো!

বলেছি তো, ওটাও আমার হাতে নেই। ফুলের মধু বিতরণ করতে চাইলে বেচারি মৌমাছির দোষটা কোথায়?

আপনি ভীষণ খারাপ লোক।

তা তো আগেও বলেছেন।

আবার বলছি।

বেশ তো, মেনেও নিচ্ছি। আমি খারাপ লোক।

... ...

ফোন ছেড়ে দিলেন নাকি?

... ...

ম্যাডাম, তাহলে কি গুড নাইট?

ফোন ছাড়িনি মশাই।

তাহলে চুপ করে ছিলেন কেন?

আপনার ওপর রাগ হচ্ছিল।

সে তো বুঝতেই পারছি। আমাকে অনেকেই পছন্দ করে না।

আচ্ছা, যদি সেরকম মেয়ে পান তাহলে বিয়ে করবেন?

আপনাকে তো আমার মায়ের মতোই বিয়েতে পেয়েছে দেখছি!

আহা বলুন না।

কীরকম মেয়ের কথা বলছেন?

যে আপনার মা-বাবার যত্নআত্তি করবে?

সে কি আর পাওয়া যাবে? আমার মা-বাবা তো তার মা-বাবা নয়। সে কি আর আমার চোখ দিয়ে আমার বাবা-মাকে দেখবে? ওসব শরৎচন্দ্রের নভেলে হয়।

কেন হবে না?

এখনকার মেয়েরা তাদের অন্যরকম আইডেন্টিটি খুঁজে পেয়েছে। তারা কেন শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে পড়ে থাকবে?

তা থাকতে হবে কেন? আপনি তো তাঁদের জন্য লোক রেখে দিয়েছেন। বউ একটু দেখাশোনা করবে, ভালো ব্যবহার করবে।

সেটাও দূরাশা। হয়তো আমার মাকে বা বাবাকে সে পছন্দ করতে পারবে না। তারা তো আর পারফেক্ট হিউম্যানবিয়িং নয়। না ম্যাডাম, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

তাহলে মা কি খুশি হবেন?

তা হবে না। তবু বিয়ে না করা লেসার ইভিল।

আপনার ঘুম পাচ্ছে না তো!

না ম্যাডাম, আমার ইচ্ছা-ঘুম।

এখন ক'টা বাজে জানেন?

রাত একটা।

আপনার কথা বলতে খারাপ লাগছে না তো?

আরে না ম্যাডাম, সারাদিন তো আড্ডা মারার সময়ও পাই না, মানুষও পাই না। এখন যাহোক একটু আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হচ্ছে।

আমি মোটেই আড্ডা দিচ্ছি না।

তাহলে কী করছেন?

আমি আপনাকে অ্যাসেস করছি।

ওঃ হ্যাঁ, তাও তো বটে!

ইয়ার্কি হচ্ছে?

না তো! তবে অ্যাসেস করে কী লাভ? আমি সামান্য মানুষ।

একটা মার্ডার কেসে আপনি প্রাইম সাসপেক্ট। খবরের কাগজে আপনার নাম উঠেছিল, মনে নেই?

হ্যাঁ, তা বটে। আমি কুখ্যাত লোক।

যা বলেছি তা মনে থাকবে?

অনেক কথাই তো বলেছেন। কোনটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে?

মার্ডারটা নিয়ে ভাবুন।

ভাবছি তো।

ওরকম এলোমেলো ভাবনা নয়।

তাহলে?

সেদিন মিসেস বকসীর সঙ্গে আপনার যা-যা কথা হয়েছিল সেগুলোর ওপর কনসেনট্রেট করুন।

সেগুলোও তো মাঝে-মাঝে ভাবি।

আপনি ভীষণ ক্যালাস লোক।

তা হয়তো হবে।

সেদিন মিসেস বকসীর কোনও কথার কোনও আলাদা অর্থ হয় কি না ভেবে দেখুন। খুব ডিপলি ভাবুন। আমি কাল আবার রাত বারোটায় ফোন করব।

ধন্যবাদ ম্যাডাম। আপনি আমার জন্য ভাবছেন বলে ধন্যবাদ।

আপনার জন্য ভাবছি কে বলল?

তাহলে?

জাস্ট একটা নাগরিক কর্তব্য হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি।

সেটাই বা কে দেয় বলুন।

এখন ইয়ার্কি ছেড়ে ভাবুন তো। এক্ষুনি ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোতে হবে না। রাতে—বিশেষ করে গভীর রাতে ভাবনা-চিন্তা খুব শার্প হয়। এখন বসে-বসে কিছুক্ষণ মাথাটাকে খাটান তো! আমিও ভাবছি।

আপনার ঘুম পায়নি তো!

না। বিবেক কি ঘুমোয়? ছাড়ছি।

আচ্ছা ম্যাডাম। কাল আবার —

টুক করে ফোনটা কেটে গেল।

মহিলা যে কে তা কিছুই বুঝতে পারছে না মিহির, দিন-চারেক আগে প্রথম ফোনটা আসে। রহস্যময় কথাবার্তা, কিছুতেই পরিচয় না দেওয়া। তারপর প্রতি রাতেই ফোন। মেয়েটা কে হতে পারে তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না সে। এদেশের খুব বেশি মেয়েকে চেনেও না মিহির। গলার স্বর থেকে অনুমান হয়, বয়স কম। আঠেরো, উনিশ, কুড়ি হতে পারে। মিহির সম্পর্কে মেয়েটির দুর্বার কৌতুহল এবং বোধহয় হৃদয়ের একটু দ্রব ভাব! কিন্তু এসব কী করে হয়? মিহির একটু হি-ম্যান গোছের আছে ঠিকই। বেশ লম্বা-চওড়া এবং সুপুরুষ, কিন্তু তা বলে সব মেয়েই ঢলে পড়বে এমন নয়।

কোনও চিন্তাই বেশিক্ষণ মাথায় থাকে না মিহিরের। ঘুম আসছিল না। সারাদিন আসুরিক খাটুনির পর ঘুম। আধো তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ সে একটু চমকে উঠল। না, তেমন কনসেনট্রেট না করেও হঠাৎ তার মনে পড়ল, অরুণিমা যেদিন হঠাৎ এক সময়ে খুব অন্যমনস্ক ভাবে বলেছিল, আমি মরে গেলে ও সব পাবে। আমি একদম তা চাই না, একদম না। আমি চাই এ সব তোমার হোক। কত টাকার সম্পত্তি আমার জানো! ভাবতেই পারবে না।

এটা কি ইম্পর্ট্যান্ট কথা? কে জানে।

মিহির ঘুমিয়ে পড়ল।

৪

মিস্টার দাশগুপ্ত, লোকটিকে কি আপনারা ছেড়ে দিলেন?

না। মিহিরবাবু বেল পেয়েছেন।

বেলই বা পায় কী করে? হি ইজ দি প্রাইম সাসপেক্ট।

সেটা আদালত জানে। আমাদের কিছু করার নেই।

পাবলিক প্রসিকিউটর কি বেল-এর বিরোধিতা করেননি?

বলতে পারব না। আমি আদালতে ছিলাম না। কিন্তু মিহিরবাবুর বেল নিয়ে আপনি অত ভাবছেন কেন? প্রয়োজন হলে তাকে আবার অ্যারেস্ট করা যাবে।

ওকে আপনারা চেনেন না মিস্টার দাশগুপ্ত। যে-কোনও সময়ে ও হাওয়া হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে ওর প্রতিভা সাঙ্ঘাতিক।

সেক্ষেত্রে কী আর করা যাবে বলুন। পুলিশ তো সর্বশক্তিমান নয়। আদালতের বিরুদ্ধাচরণ তো করতে পারি না।

ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই ভালো হল না। খুনটা যে মিহিরই করেছে সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহই নেই!

কে বলল নেই? সন্দেহ অবশ্যই আছে।

সে কী?

পুলিশের হাতে ভদ্রলোককে কনডেম করার মতো যথেষ্ট তথ্য নেই।

এদেশের পুলিশ কি এতই অপদার্থ?

এদেশের পুলিশ এদেশের মতোই। কী আর করা যাবে বলুন।

ডিসগাস্টিং! ভেরি ডিসগাস্টিং।

দুঃখিত মিস্টার বকসী। আপনাকে খুশি করতে পারছি না। বাই দি বাই আপনি কবে এলেন?

কাল রাতে।

আপনি তো মোটে মাস খানেক আগেই আমেরিকায় ফিরে গেলেন!

দেড় মাস। আসতে হল জরুরি প্রয়োজনে। আমার সম্বন্ধী সত্যব্রত আয়রন সাইড রোডের বাড়িটা প্রোমোটারকে বিক্রি করার তোড়জোর শুরু করেছে। ওর কাছে নাকি আমার স্ত্রীর দেওয়া পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিও আছে। খবর পেয়ে আসতেই হল।

বাড়িটা বোধহয় আপনি বিক্রি করতে রাজি নন?

পাগল নাকি? বাড়ি বিক্রি করব কেন? সত্যব্রতর সঙ্গে এই নিয়ে ঝামেলা চলছে বলেই আমাকে আসতে হয়েছে।

আমি যতদূর খবর রাখি আপনার স্ত্রীর আরও গোটা দুই বাড়ি আছে এবং ব্যাঙ্কে ক্যাশ এবং অন্যান্য বন্ডে আছে প্রচুর টাকা।

হ্যাঁ। ওদের অবস্থা তো ভালোই ছিল।

আপনিই এখন এসবের মালিক তো!

ন্যাচারালি। জিগ্যেস করছেন কেন?

না, ভাবছিলাম অন্য কোনও ওয়ারিশান আছে কিনা।

কে থাকবে?

উনি কোনও উইল-টুইল করেছিলেন কিনা জানেন?

লুক ম্যান, অরুণিমা ওয়াজ জাস্ট আন্ডার ফর্টি। এই বয়সে কেউ উইল করতে যায়?

ভালো করে খুঁজে দেখেছেন?

খোঁজার প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু একথা বলছেন কেন?

প্রিয়ব্রত মজুমদার নামে একজন বিখ্যাত অ্যাটর্নি আছেন, জানেন কি?

না তো!

আমি তার ফোন নম্বর আপনাকে দিচ্ছি। একটু কথা বলে দেখুন।

হোয়াট ডু ইউ মিন? হঠাৎ আমি উটকো একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে যাব কেন?

উনি অরুণিমা দেবীর অ্যাপয়েন্টেড অ্যাটর্নি।

অরুণিমার অ্যাটর্নি! কই জানতাম না তো!

আপনি আপনার স্ত্রীর অনেক কিছুই হয়তো জানতেন না!

তার মানে?

স্ত্রীয়াশ্চত্রিম।

আপনি ননসেন্স টক করছেন।

আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন কেন? আমি তো জাস্ট আপনাকে একজনের সঙ্গে একটু কথা বলতে বলেছি। এতে মেজাজ খারাপ করার মতো কিছু তো নেই।

আর ইউ হিন্টিং সামথিং?

আরে মশাই, কথা বলেই দেখুন না। প্রিয়ব্রতবাবু ইজ এ রিনাউন্ড ম্যান ইন দি ফিল্ড অফ ল'। আজেবাজে লোক নন।

তিনি আমাকে কী বলবেন?

যা বলবেন তা হয়তো আপনার পছন্দ হবে না। কিন্তু ট্রুথ ইজ অলওয়েজ লাইক দ্যাট। নট প্যালেটেবল।

ঠিক আছে, নম্বরটা দিন।

নোট করে নিন। এখন দশটা বাজে, ঘণ্টাখানেক পরে ওঁকে ওঁর চেম্বারে এই নম্বরে পাবেন।

অরুণিমা কি গোপনে কোনও ডিল করেছিল?

আমার মুখ থেকে শুনবেন কেন? প্রপার অথরিটির কাছ থেকে জেনে নিন।

আপনি আমাকে টেনশনে ফেলে দিলেন।

তা হয়তো দিলাম। কিন্তু সবটা জেনে এবং বুঝেই এগোনো ভালো।

ফোনটা কেটে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল শবর। কলকাতার ক্ষণস্থায়ী শীত বিদায় নিচ্ছে। বাইরে রোদের তেজ বাড়ছে। ফেব্রুয়ারির শেষে কলকাতায় আজকাল রোদের বেশ তাপ, হাঁটলেই ঘাম হয়। বেরোতে ইচ্ছে করছিল না শবরের। কিন্তু একটা মোবাইল নম্বরে বারবার ফোন করেও মিহিরকে ধরা যাচ্ছে না। ফোন সুইচ অফ করা আছে।

শবর অগত্যা উঠল। ফোনটা বেজে উঠতেই ভ্রু কুঁচকে তাকাল যন্ত্রটার দিকে। তারপর তুলে নিল।

শবর দাশগুপ্ত বলছি।

শাহেনশাকে ধরা গেছে স্যার। চালান দেব কি?

আরে না-না, চালান-ফালান নয়। বসিয়ে রাখুন। কয়েকটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেবো।

ওর নাকি ড্রাগ নেওয়ার সময় হয়েছে। খুব রেস্টলেস।

ওকে ড্রাগ নিতে দিন।

আপনি পারমিশন দিচ্ছেন তো?

হ্যাঁ। আমি ওকে নরম্যাল অবস্থায় চাই।

ঠিক আছে। আপনি কি আসছেন?

হ্যাঁ। আমি এখনই রওনা হচ্ছি। আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।

আধঘণ্টা পর দক্ষিণ কলকাতার একটা ফাঁড়িতে শবর দাশগুপ্ত শাহেনশার মুখোমুখি হতেই সুপুরুষ, দীর্ঘকায় বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের শাহেনশা উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম করল। শাহেনশার দাড়ি এবং গোঁফ খুব যত্ন করে ট্রিম করা। পরনের পোশাক অবশ্য এলোমেলো। ময়লা জিনসের প্যান্ট আর গায়ে ইস্তিরিহীন সবুজ পাঞ্জাবি।

ভালো আছেন তো সাহেব?

ভালো। তুমি কেমন?

সব ঠিক হ্যায়। কুছ মুসিবত হল নাকি সাহেব?

সাউথ ক্যালকাটার আয়রন সাইড রোডে অরুণিমা বকসী মার্ডার হয়েছিল জানো তো!

জানি সাহেব।

কে জানো?

না সাহেব।

তোমাকে না জানিয়ে কে কাজ করবে এখানে? তুমি না ডন?

আজকাল বহুত মস্তান উঠছে সাহেব। আপনি তো সব জানেন।

উঠতি মস্তান?

হাঁ সাহেব।

এরকম ছক কষে কি ওরা কাজ করবে? মনে হয় না।

খোঁজ নিয়ে বলব সাহেব।

তোমার তো কখনও ভয়ডর বা জানের পরোয়া ছিল না।

ও বাত তো ঠিক সাহেব।

কিন্তু তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে আজকাল তোমার ভয়ডর হয়েছে।

শাহেনশা মাথাটা নিচু করে বলল, দিনকাল খারাপ আছে সাহেব। বহুত কম্পিটিশন, বহুত পলিটিক্স, বহুত টেনশন।

সেটা আমি জানি। তোমার চেলা মিল্টন কি আলাদা হয়ে গেছে?

জি সাহেব। মিল্টন তিলজলায় ডেরা করেছে।

তোমার দলে কে আছে এখন?

বাচ্চু, ঘিয়া, পাগলু। সব নতুন আছে সাহেব।

তুমি কেস করো না?

না সাহেব। বখরা পাই।

অরুণিমা বকসীকে যে খুন করেছে সে পুরোনো লোক।

আমার লোক করেনি সাহেব।

সেটা আমি জানি। কিন্তু কে করেছে সেটা তোমার না জানার কথা নয়।

জানি না সাহেব।

তুমি ভয় পাচ্ছ শাহেনশা!

শাহেনশা পায়ে-পায়ে একটু ঘষাঘষি করল। মুখটা একটু বিবর্ণ।

কন্ট্রাক্ট মার্ডার, বুঝলে?

হাঁ সাহেব।

খুনটা হয়েছে তোমার এলাকায়। তোমাকে সেলামি না দিয়ে কাজটা কি কেউ করতে পারে?

সাহেব, আজকাল এলাকা কেউ মানে না। পয়সার লালচ বাড়ছে তো। পুরানা জমানা তো আর নেই।

সেটা আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। লোকটাকে আমার চাই শাহেনশা।

খবর নিয়ে জানাব সাহেব।

আজ বিকেলে?

আর একটু টাইম লাগবে।

টাইম লাগার কথা নয় শাহেনশা, তুমি আসলে ভয় পাচ্ছ। ড্রাগ ধরার পর কি এসব হচ্ছে?

না সাহেব। সিচুয়েশন বদল হয়ে গেছে।

কাকে ভয় পাও?

কাউকে না। টাইমটাকে ভয় পাই সাহেব। আজকাল সব উলটোপালটা ব্যাপার হয়।

ঝেড়ে কাশো শাহেনশা, চুপ করে থাকার জন্য কত টাকা পেয়েছ?

শাহেনশা মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে।

তোমার বিরুদ্ধে তো কোনও কেস দিচ্ছি না, তোমাকে ধরাও হবে না, শুধু একটা ইনফর্মেশন চাইছি। মনে পড়ে তোমাকে আমি এর আগে তিনবার বাঁচিয়ে দিয়েছি?

বহুত মেহেরবানি। সাহেব, আমি ভুলিনি।

তাহলে আমার ঋণ একটু শোধ করো।

ছোকরা অ্যারেস্ট হয়ে গেলে বহুত হুজ্জত হবে সাহেব। রায়ট হয়ে যাবে। আমি খতম হয়ে যাব।

অ্যারেস্ট করব না। যে খুনটা করে সে-ই তো আর আসল খুনি নয়, যে খুনটা করায় সে-ই আসল খুনি। আমি তাকে ধরতে চাইছি।

কথা দিচ্ছেন স্যার?

হ্যাঁ। তবে আমি জানতে চাই পেমেন্ট কে করেছে।

বকসী মেমসাহেবকে খুন করেছে লম্বুর দল। খাঁটো আর সেলিম ছিল অপারেশনে।

পেমেন্ট কের করেছে?

এজেন্সি।

কোন এজেন্সি?

সার্ভিস টু দি পিপল।

খাঁটো কি কলকাতায়?

না সাহেব। অপারেশনের পর সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওটাই নিয়ম।

জানি। এজেন্সির মালিক জনি, তাই না?

জি সাহেব। জনি ইনফর্মেশন পায় টেলিফোনে। টাকা ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায়।

তার মানে খুনটা কে করিয়েছে তা জনি জানে না?

না সাহেব।

কাকে সন্দেহ হয় শাহেনশা?

আমরা কাউকে সন্দেহ করি না। টাকা পাই, কাজ করি।

বুঝলাম। টাকার অ্যামাউন্ট জানো?

না সাহেব। আমি দশ হাজার পেয়েছি।

সেটা কত পারসেন্ট?

জানি না সাহেব। নিট দশ হাজার। নো বারগেন।

ঠকে গেছ। আমার হিসেবে পাঁচ থেকে দশ লাখের মধ্যে কন্ট্রাক্ট হয়েছে। তার কম নয়।

হতে পারে সাহেব। আমার কাছে তো এটা ফালতু টাকা। তাই আমি আর খোঁজখবর নিইনি।

ঠিক আছে শাহেনশা, তুমি যেতে পারো।

জি সাহেব। লম্বুর মোবাইল নম্বর জানো?

জানি সাহেব।

দাও। নম্বরটা ডায়াল করতেই ওপাশ থেকে কেউ বলল, বোলো।

শবর গম্ভীর গলায় বলল, ফোনটা লম্বুকে দাও।

তুমি কে?

তোর বাপ। লম্বুকে দে।

ওপাশটা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর একটা গমগমে গলা বলে উঠল, কৌন হ্যায় বে?

বলেছি তো তোর বাপ। আমি শবর দাশগুপ্ত!

আরে স্যার, আপনি! নমস্কার স্যার। আমি লম্বু।

শোনো, কথা আছে।

বলুন স্যার।

আয়রন সাইড রোডের অরুণিমা বকসীকে খুন করানোর কন্ট্রাক্ট তোমাকে কে দিয়েছিল জানো?

স্যার, এসব কী বলছেন!

আকাশ থেকে পড়লে যে! অ্যাকটিং ছাড়ো। তুমিও সেয়ানা, আমিও সেয়ানা।

সে কথা তো ঠিক, কিন্তু স্যার, পার্টিকে তো চিনি না।

খবর নিতে পারবে?

জনি কাজটা দিয়েছিল। জনিও জানে না।

কত টাকার কন্ট্রাক্ট?

পাঁচ।

জনি কোথায়?

এখানে আছে স্যার। আমি জনির এজেন্সি থেকেই বলছি।

ভারি মিষ্টি মোলায়েম একটা গলা বলল, নমস্কার স্যার। আমি জনি।

কন্ট্রাক্টটা কত টাকার ছিল জনি?

ছয়।

কে তোমাকে ফোন করেছিল?

নাম বলেনি।

পুরুষ না মহিলা?

মহিলা।

সিওর?

হ্যাঁ স্যার। সিওর।

বয়স কীরকম হবে?

বেশি নয় স্যার। ছুকরির গলা।

তোমার অ্যাকাউন্ট নম্বর জেনে নিয়েছিল?

হ্যাঁ স্যার। অনেকে তো নিজে কন্ট্রাক্ট করে না। ভয় পায়।

ক'বার ফোন করেছিল?

দু-বার।

গলা চিনতে পারবে?

পারব। আমার ভয়েস মেমারি ভালো।

হয়তো দরকার হবে না। শোনো। এখন কয়েকদিন তোমার ফোন এলে ধরবে না। অ্যানসারিং মেশিনে রেকর্ড করে রাখবে তোমাকে যেন মোবাইলে ফোন করে।

স্যার, আপনি কি আমাদের ওপর অ্যাকশন নেবেন?

আপাতত নয়। কিন্তু এ লাইনটা ছাড়ো। যেদিন ধরব সেদিন ঝুলিয়ে দেব। পার পাবে না।

জানি স্যার। কিন্তু এটা তো প্রফেশন, নাথিং এলস।

ফিলজফি ঝেড়ো না।

দোষ ধরবেন না স্যার, পুলিশের বখরাও দিয়েছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা নামিয়ে রাখল শবর।

আরও চল্লিশ মিনিট বাদে মিহিরের গ্যারাজে হাজির হয়ে গেল শবর।

মিহির তার ট্রাকের ইঞ্জিনে কাজ করছিল। কালিঝুলি মাখা অবস্থায় নেমে এল।

আরে আপনি?

মোবাইলটা তো সুইচ অফ করে রেখেছেন, তাই আসতে হল।

কাজ করছিলাম বলে ফোন অফ রেখেছি। বলুন কী খবর।

অ্যাটর্নি প্রিয়ব্রত মজুমদারকে চেনেন?

না। কে তিনি?

আপনাকে ফোনটোন করেননি?

আজ্ঞে না।

অরুণিমা বকসী আপনাকে কত টাকা অফার করেছিল?

ওঃ সে অনেক টাকা। কোয়াইট এ ফরচুপ। অ্যামাউন্ট বলেনি।

আপনি কি জানেন যে তিনি একটা উইল করে রেখে গেছেন?

উইল! না, আমি জানব কোত্থেকে?

ইন কোর্স অফ টাইম, আপনি জানতে পারবেন।

কী জানব?

জানবেন যে উনি ওঁর কলকাতার বিষয়-সম্পত্তি আপনার নামে ট্রান্সফার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমার নামে! হোয়াই মি?

বোধহয় ওঁর ভালোবাসার নিদর্শন।

পাগল নাকি? ভালোবাসা নয়, ওটা ছিল ওঁর ইগো জনিত পাগলামি। আমাকে উনি দখল করতে চেয়েছিলেন, লাইক এ ট্রফি।

আপনি তো এখন বিপুল সম্পত্তির মালিক হতে যাচ্ছেন!

শবরবাবু, আমাকে আপনি কী ভাবেন বলুন তো!

কী আবার ভাবব?

আমি কি লোভী! নাকি ল্যালা! আমাকে মিসেস বকসী যদি সব দিয়ে গিয়েও থাকেন ওঁর এক পয়সাও আমি ছোঁবো না।

আপনার ইগোও তো কম নয়।

এটা আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। ইগো নয়। আমার টাকার কোনও অভাব নেই এবং খুব বেশি বড়লোক হওয়ারও ইচ্ছে নেই। মধ্য পন্থাই আমার ভালো লাগে।

তাহলে কী করবেন?

কিছুই করব না। উইলটা ছিঁড়ে ফেলে দেব।

শুধু উইল নয়, উনি অলরেডি আপনার নামে সবকিছু ট্রান্সফার করেছেন।

তাতেও কিছু নয়। আবার ট্রান্সফার করে দেব।

কাকে?

ওঁর হাজব্যান্ডকে।

এত টাকা ছেড়ে দেবেন?

ধরার যখন প্রশ্নই নেই।

আপনি চান বা না চান, অরুণিমা বকসী আপনাকে তাঁর সবকিছু দিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে আপনাকে একটু বিপদেও ফেলে গেছেন।

বিষয় সম্পত্তি মানেই তো বিপদ।

ঠিক কথা। কিন্তু আপনি যে অর্থে বলছেন তা ছাড়াও বিপদ আছে।

সেটা কীরকম?

মরটাল ডেনজার।

তার মানে কী?

আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন।

মাই গড! কেন?

কারণ আছে বলেই।

কিন্তু আমি তো ওসব চাইছি না।

সেটা সবাই বুঝবে না।

আমাকে কে খুন করবে?

ভাড়াটে খুনি।

সর্বনাশ!

আপনি তো বাহাদুর লোক, ভয় পাচ্ছেন কেন?

ভয়ের কথাই বলছেন যে!

আরে, নার্ভাস হলে চলবে কেন?

নার্ভাস নই মশাই, আমি ঝুট ঝামেলা পছন্দ করি না।

পিসফুল লাইফ চান তো!

হ্যাঁ।

তাহলে কোঅপারেট করুন।

করছি তো।

করছেন না। সেদিন অরুণিমা বকসী আপনাকে আরও কিছু বলেছিলেন যা আপনি আমার কাছে চেপে গেছেন।

আমার যা মনে পড়েছে বলেছি।

উনি সুব্রত বকসীর একজন বান্ধবীর কথাও বলেছিলেন।

মাথা নেড়ে মিহির বলে, না, বলেননি। বিশ্বাস করুন।

সুব্রত বকসীর কি কোনও বান্ধবী নেই?

থাকলেও আমি জানি না। সুব্রতদার সঙ্গে আমার বিজনেস রিলেশন ছিল, ইনটিমেসি ছিল না। মিসেস বকসী সুব্রতদাকে এতই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন যে ওঁকে নিয়ে ওঁর মাথাব্যথাই ছিল না।

শবরের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল একটু। সামান্য চুপ করে থেকে বলল, সত্যি কথা বলছেন?

হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছি।

তাহলে তো জটিলতা বাড়ল।

কিন্তু তার জন্য তো আমি দায়ী নই।

প্যাটার্নটা ঠিকঠাক মিলছে না। সুব্রত বকসীর একজন বাঙালি বান্ধবী থাকা উচিত। তাহলে প্যাটার্নটা মেলে। নইলে আবার নতুন করে ভাবতে হবে। আপনি কি বলতে পারেন সুব্রতবাবু সম্পর্কে অরুণিমার এত রিপালশনের কারণ কী?

রিপালশন নয়। রিপালশনও একরকমের রি-অ্যাকশন। অরুণিমা সুব্রতদাকে ঘেন্না করতেন বলে মনে হয় না। তেমন কোনও রাগেরও প্রকাশ দেখিনি। জাস্ট ইগনোর করতেন।

সুব্রত বকসী কি ওঁর আজ্ঞাবহের মতো ছিলেন?

পুরোপুরি তাও নয়। কাজের সূত্রে ওঁদের কো-অপারেশন ছিল। দুজনেই পরিশ্রমী। পরস্পরের মধ্যে কাজ নিয়ে শলাপরামর্শও হত। গুড কলিগস। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে

বোধহয় ক্লোজ ছিলেন না। ভেরি স্ট্রেঞ্জ রিলেশন।

সুব্রত বকসীর অ্যাটিটিউড কীরকম ছিল?

সেও আপনাকে বলেছি। উনি স্ত্রীকে তোয়াজ করতেন। ডালিং, ডিয়ার, সুইটহার্ট, বলতেন সবসময়ে। কিন্তু সেগুলি মিথ্যে।

হুঁ। ভাবিয়ে তুললেন মিহিরবাবু।

৫

ওমা! ঘুম ভাঙালুম বুঝি?

না ম্যাডাম, ঘুমোইনি। চিন্তা করছি।

আপনাকে আমি যা চিন্তা করতে বলেছি তা করছেন তো?

না ম্যাডাম, তার চেয়েও ইম্পর্টেন্ট চিন্তা করতে হচ্ছে।

সে আবার কীসের চিন্তা।

শবরবাবু নতুন দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন মাথায়।

কীরকম দুশ্চিন্তা?

ওঁর ধারণা হয়েছে আমাকে কেউ খুন করবে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ ম্যাডাম।

উদ্বিগ্ন নারীকণ্ঠটি থেকে রহস্য খসে পড়ল, একটু আর্তনাদের মতো কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল, কেন? কে খুন করতে চাইছে?

তা তো উনি বলেননি। তবে সাবধানে থাকতে বলেছেন।

কী আশ্চর্য! আপনার ওপর কার রাগ থাকতে পারে?

তা তো জানি না। তবে আপনাকে তো বলেইছি, আমি লোক ভালো নই। কারও হয়তো খার আছে।

প্লিজ, একটু ডিটেলসে বলুন।

ডিটেলস তো আমিও জানি না ম্যাডাম। তবে পুলিশসাহেব আজ আমার গ্যারাজে হানা দিয়েছিলেন। ঘটনার ক্রম দেখে বা কোনও সূত্রে উনি এরকমই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

তাহলে আপনি কোথাও চলে যান। কাল সকালেই চলে যান।

না ম্যাডাম, আমি ভিতু হলেও ততটা কাপুরুষ নই।

নারীকণ্ঠ ঝেঁঝে উঠল, যাক, অত বীরত্ব দেখাতে হবে না। এ-শহরে ভীষণ বিচ্ছিরিভাবে খুনটুন হয়। দিনে দুপুরে। প্লিজ, অকারণে বেশি সাহস দেখাবেন না।

আপনি কি আমার জন্য উদ্বিগ্ন?

যদি বলি হ্যাঁ?

তাহলে তো বলতে হয় অচেনা একজন মানুষের জন্য আপনার যথেষ্ট সিমপ্যাথি আছে।

দেখুন, এসব সিরিয়াস সিচুয়েশনে ইয়ার্কি ভালো লাগছে না। আপনি তো বলেছিলেন দিল্লিতে আপনার দাদা থাকেন।

হ্যাঁ।

তাঁর কাছে চলে যান না!

তার কাছে গিয়ে তো অনন্তকাল থাকা যাবে না। কলকাতায় বুড়ো মা-বাবা, কাজকারবার সব ফেলে চলে গেলেই তো হবে না। আর দাদার সঙ্গে আমার সদ্ভাবও নেই।

অন্য কোথাও গিয়ে থাকার মতো টাকা কি আপনার নেই? খুব পারবেন প্লিজ!

ম্যাডাম, গেলেই তো হবে না। একদিন ফিরতেই তো হবে।

সে তখন পরে দেখা যাবে।

আমার এখন অনেক টাকা, জানেন?

কীসের টাকা?

শুনছি অরুণিমা বকসী নাকি মারা যাওয়ার আগে তার বিষয়সম্পত্তি আমার নামে ট্রান্সফার করে গেছে।

সত্যি?

হ্যাঁ।

এত টাকা নিয়ে কী করবেন?

কিছুই করব না ম্যাডাম। একটা পয়সাও ছোঁবো না।

কেন?

নেব কেন বলুন তো! কোন অধিকারে?

সত্যি নেবেন না?

প্রশ্নই ওঠে না। শুনে বরং আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল।

ওমা! কেন?

এটা হয়তো ঘুষ, হয়তো করুণা, হয়তো ক্রয়মূল্য। কিন্তু কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই না?

থ্যাংক ইউ।

হঠাৎ থ্যাংক ইউ দিলেন কেন?

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তাই বা কেন?

সে আপনি বুঝবেন না।

আপনি বেশ অদ্ভুত লোক ম্যাডাম।

মোটেই অদ্ভুত নই। মেয়েদের আপনি একটুও চেনেন না।

মেয়েরা কি সব একরকম যে চিনব? এক-একজন এক-একরকম। কে যে কী চায় তা একদম বুঝতে পারি না। তাই নারীচিন্তা করিই না। পারতপক্ষে। হাসলেন নাকি?

হ্যাঁ।

কেন হাসলেন?

আপনার অসহায় অবস্থা দেখে। এত মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেও মেয়েদের চিনতে পারলেন না?

ম্যাডাম, আপনি আমার প্রকৃত অবস্থাটা জানেন না। মেয়েদের আমি বরাবরই এড়িয়ে চলতাম। আজও চলি। সার্কাসে যখন কাজ করতাম তখনই দেখেছি, কোনও-কোনও মেয়ে আমার ওপর ইন্টারেস্ট নিচ্ছে। ঠেকানোর চেষ্টা যে করিনি তা নয়। তবু মেলামেশা হয়ে গেল। ফিজিক্যাল রিলেশন, তার বেশি কিছু নয়। সেই থেকে শুরু আজও শরীর ছাড়া আর কোনও রিলেশন মেয়েদের সঙ্গে আমার হয়নি। বলুন ম্যাডাম, তার জন্য কি আমি দায়ী? আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। অরুণিমা বকসী যে পাগলামি করলেন তারও কোনও গভীরতা নেই কিন্তু। ওঁর মন বলে বস্তুই ছিল না। আমি ছিলাম ওঁর জাস্ট একটা টয়। খেলা ফুরোলেই ফেলে দিতেন।

বুঝেছি। আপনি ভালো লোক, মেয়েরা খারাপ।

তা বলিনি। বলছি আই ইজিলি অ্যাট্রাক্ট দি ব্যাড পিপল।

তাই বুঝি?

আমি ব্যাড তো, তাই ব্যাডদেরই আমাকে পছন্দ হয়।

আপনি খুব খারাপ। কিন্তু চিকিৎসার অতীত নন।

বলছেন?

হ্যাঁ।

তাহলে আমারও আশা আছে?

খুব আছে। তবে একটা শর্ত।

কী সেটা?

আর কখনও মেয়েদের ওভাবে ব্যবহার করবেন না।

ফিজিক্যালি তো।

হ্যাঁ।

ম্যাডাম, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন? আমি ব্যবহার করি না, ব্যবহৃত হই।

দয়া করে আর ব্যবহৃত হবেন না। কথা দিন।

কথা দেব? কেন ম্যাডাম? আপনি তো আমার কাছে একজন অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা মাত্র। আপনাকে এত বড় একটা কথা দেব কেন:?

তার মানে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানাটাই আপনার পছন্দ?

তা নয়। কিন্তু আপনাকে কথা দেব কেন? যে মহিলা বিশ্বাস করে নিজের নামটাও আজ অবধি আমাকে বলেনি তাকে কথা দেওয়ার কী দায়?

পরিচয় দিয়েই বা কী লাভ বলুন। আপনি তো মেয়েদের একটাই ব্যবহার জানেন। সেটা হল শরীর। আপনি নিজেই বলেছেন মেয়েদের ব্যাপারে কৌতূহলও নেই আপনার।

তা ঠিক। তবে আপনার ব্যাপারে একটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।

আমার ভাগ্যি।

আমি কিন্তু কথা বলতে জানি না। অনেক সময়ে উলটোপালটা বলে ফেলি কিছু মনে করলেন না তো!

না, মনে করার মতো কিছু তো বলেননি। তবে কথা দিলেন না বলে দুঃখ পেলাম।

আগে বলুন, আপনি কে?

জেনে কোনও লাভ নেই আপনার।

আমার কী মনে হয় জানেন?

কী?

আপনি বোধহয় খুব অচেনা নন।

বাঃ, তাহলে তো ভালোই। মাথা খাটিয়ে বের করুন তো আমি কে?

একটু সময় লাগবে। মাথাটা তো এখন নানা চিন্তায় এনগেজড।

তাড়া নেই। ভাবুন।

নিজে থেকে কিছুতেই বলবেন না তো!

না। একটু কষ্ট করুন। বরাবর তো সব মেয়েদের অনায়াসেই পেয়ে গেছেন।

ভুল বললেন। আমি কোনও মেয়েকেই পাইনি। আমার চেহারাটা ভালো। দুর্ভাগ্য হল, মেয়েরা অর্থাৎ যারা একটু ফিজিক্যাল তারাই আমার শরীরটাই কেবল চেয়েছে। ওটাকে পাওয়া বলে না।

ওটাকেই তো সবাই পাওয়া বলে মনে করে।

আমি মনে করি না।

আপনি তাহলে কীভাবে পেতে চান?

সেটা ঠিক বুঝতে পারি না। তবে ফিজিক্যাল পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

টোটাল সারেন্ডার তো! সব পুরুষই মেয়েদের কাছে তাই চায়।

দেখুন, ভালোবাসার মধ্যে সারেন্ডারও কিন্তু একটু থাকে।

আপনিও আসলে ক্রীতদাসী চাইছেন।

দোষ কি? আমিও যদি তার ক্রীতদাস হই?

ছেলেরা কখনও ক্রীতদাস হতে পারে না। তারা নিতে জানে, দিতে নয়।

ছেলেদের সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা হয়তো সুখকর নয়।

ছেলেদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বেশি নেই, কিন্তু পুরুষদের মোটামুটি বুঝতে পারি।

কিচ্ছু বুঝতে পারেননি। আপনি আমাকে দেখেননি।

কে বলল দেখিনি?

কবে দেখলেন? কোথায় দেখলেন?

তা বলব কেন?

বাজে কথা, আপনি মোটেই দেখেননি। বলুন তো আমার বাঁ-গালে যে আঁচিলটা আছে সেটা লালচে না খয়েরি?

আপনার বাঁ-গালে কোনও আঁচিল নেই।

বলুন তো আমার নাকটা থ্যাবড়া না চোখা।

থ্যাবড়া নয়, তবে একটু চাপা। মনে হয় কখনও নাকটা ভেঙে গিয়েছিল।

ঠিক বলেছেন তো! সার্কাসে চাকরি যখন করি তখন প্র্যাকটিসের সময় আমি ট্রাপিজ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। নিচে নেট ছিল, আমি নেটের বাইরে ছিটকে গিয়েছিলাম। নাঃ, স্বীকার করতেই হচ্ছে আপনি আমাকে দেখেছেন।

দেখেছি।

ভাবিয়ে তুললেন ম্যাডাম।

কেন ভাবনার কী হল।

এ যে ওয়ান ওয়ে গ্লাস। আপনি দেখেছেন, আমি দেখিনি।

কোনওদিন দেখা হতেও পারে।

৬

আমি জনি স্যার।

হ্যাঁ জনি, বলো।

আপনি যেরকম বলেছিলেন সেরকমই করেছি। অ্যানসারিং মেশিন চালু রেখেছিলাম, একটা ভয়েস রেকর্ড করা আছে। কিন্তু ভদ্রমহিলা আমাকে মোবাইলে ফোন করেননি।

কী রেকর্ড করতে পেরেছ?

শুধু একটা কথা, জনি আছে? তারপর সাইলেন্স।

নম্বরটা দাও। আর টাইমটা।

জনি নম্বরটা দিল। এবং আধ ঘন্টার মধ্যে শবর হানা দিল বালিগঞ্জের একটা এস টি ডি বুথে।

আমি পুলিশের লোক। কাল রাত আটটার পর সাড়ে আটটার মধ্যে এই বুথ থেকে এক ভদ্রমহিলা কাউকে ফোন করেছিলেন। খুব কম সময়ের জন্য। সেই ভদ্রমহিলাকে কি মনে আছে?

বুথের ছোকরটা ঘাবড়ানো মুখে বলে, না স্যার। মনে পড়ছে না।

ভয় পেও না। ঠান্ডা মাথায় ভাবো। খবরটা জরুরি।

ছেলেটা একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ স্যার।

তাকে চেনো?

এ-পাড়ারই মানুষ। তবে নাম ঠিকানা জানি না।

তোমার বুথ থেকে প্রায়ই ফোন করেন কি?

খুব কম।

চেহারাটা কেমন বলতে পারো?

লম্বা-চওড়া চেহারা স্যার, খুব ফরসা।

কোন দিক থেকে এসেছিলেন?

ওই পাশের গলিটা দিয়ে, ফোন করে গলিতে ঢুকে গেলেন।

উনি ছাড়া আর কোনও মেয়ে এসেছিল?

না স্যার। এখন চারদিকে অনেক বুথ খুলে গেছে, কাস্টমার নেই।

ঠিক আছে।

আরও চল্লিশ মিনিট ধরে গলির বিভিন্ন দোকান আর বাড়িতে হানা দিল শবর। শেষে সোমা রায়ের নামটা জানা গেল। ঠিকানাও।

কলিং বেল টিপতেই একজন বাচ্চা মেয়ে দরজা খুলে বলল, কী চাই?

সোমা রায়।

এখন দেখা হবে না।

কেন?

বাথরুমে আছেন।

শবর দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে বলল, ওকে বলো পুলিশের লোক এসেছে। জরুরি দরকার।

মেয়েটা ভয় পেয়ে ছুটে গেল ভিতরে। শবর চারদিকে চেয়ে দেখল, বেশ সাজানো গোছানো রুচিশীল বৈঠকখানা। পয়সাওলা মহিলা বলে মনে হয়।

একটু অপেক্ষা করতে হল। তারপর মুখে এক রাশ বিরক্তি আর থমথমে রাগ নিয়ে ফরসা, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী এবং বেশ সুন্দরী ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকেই বেশ উঁচু গলায় বললেন। কে বলুন তো আপনি? কী চাই?

কয়েকটা কথা জানতে চাই।

কী কথা? শুনলাম আপনি পুলিশের লোক। পুলিশের কী দরকার আমাকে?

ঠান্ডা হয়ে বসুন ম্যাডাম। অত উত্তেজিত হবেন না। আমি তো আপনাকে অপমান করিনি?

আমার সময় নেই। এখনই বেরোব।

সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করা হবে। সেটা কি সুবিধাজনক হবে বলে আপনার মনে হয়?

দাঁতে ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ রাগটাকে সামলে নিয়ে সোমা বলল, কিন্তু আমার অপরাধ কী?

আপনার টেলিফোন আছে?

আছে। কেন?

ফোনটা কি ডেড?

না।

তা হলে কাল রাতে আপনি জনিকে ফোন করার জন্য কষ্ট করে টেলিফোন বুথে গিয়েছিলেন কেন?

পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেল সোমার মুখ।

কে বলল আমি বুথে গিয়েছিলাম?

বুথের ছেলেটা আপনাকে দেখলেই চিনতে পারবে।

বাজে কথা।

জনির সঙ্গে আপনার কীসের দরকার?

জনি নামে আমি কাউকে চিনি না।

সুব্রত বকসী নামে কাউকে চেনেন কি? নাকি তাও না।

এসব কী হচ্ছে বলুন তো? রঙ্গ-তামাশা নাকি?

না, বরং খুব সিরিয়াস ব্যাপার।

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

ঠিক আছে ম্যাডাম। আমি থানায় জানিয়ে দিচ্ছি যাতে তারা আপনাকে হাতকড়া পরিয়ে প্রকাশ্যে টেনে নিয়ে যায়। থানায় কাঠের বেঞ্চে বসে কথা বলতে বোধহয় আপনার সুবিধে হবে।

সোমার মুখে আচমকা রক্তোচ্ছ্বাস দেখা গেল। সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, কেন এসব করছেন?

স্পিল দা বিন। সুব্রত বকসীকে চেনেন?

সোমা দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তারপর হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে লাগল।

আমি কিন্তু জানি না...আমি কিচ্ছু জানি না...।

আপনার পাসপোর্টটা নিয়ে আসুন।

সোমার অনেকক্ষণ সময় লাগল সামলাতে। তারপর গিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে এল।

বছরে আপনি ক'বার আমেরিকা যান।

বিজনেস পারপাসে ঘন-ঘন যেতে হয়।

বুঝলাম।

সুব্রতর সঙ্গে আমার একটা জয়েন্ট বিজনেস আছে।

হ্যান্ডিক্র্যাফটস?

হ্যাঁ। আর শাড়ি।

অরুণিমা বকসী কি আপনাকে চিনতেন?

হ্যাঁ।

কীরকম রিলেশান ছিল?

ভালোই তো।

তাহলে তাকে মারতে হল কেন?

সোমা চুপ।

ডিভোর্স করলে অরুণিমার সম্পত্তি সুব্রতর হাতছাড়া হত বলে?

আমাকে ওসব জিগ্যেস করবেন না প্লিজ!

নয় কেন? আপনি একজন অ্যাকসেনসরি টু মার্ডার। একটা নয়, দুটো মার্ডার। মিহিরকে খুন করার জন্য আপনি জনিকে ফের ফোন করেছিলেন। অ্যানসারিং মেশিনে ওর মোবাইলে ফোন করতে বলায় আপনি ভয় পেয়ে ফোন কেটে দেন, কারণ মোবাইলে কলার-এর নম্বর উঠে যায়। তাই না?

প্লিজ!

কী লাভ হল বলুন। অরুণিমা তার সব সম্পত্তি মিহিরের নামে ট্রানসফার করে গেছে।

আমি কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন।

সুব্রত আর আপনি দুজনেই জেল খাটবেন, যদি ফাঁসি নাও হয়, কী লাভ হবে বলুন। সুব্রতবাবুর পাসপোর্টও এতক্ষণে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। আমি আপনারটা করছি। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

৭

মিহিরবাবু, কেমন আছেন?

ও শবরবাবু! আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ফাঁসির দড়ি থেকে যে আমি বেঁচে যাব তা ভাবিনি। আপনি এসে না পড়লে কপালে কষ্ট ছিল।

তা ছিল। সুব্রতবাবু স্টেটমেন্ট দিয়েছেন।

ওঁর কি ফাঁসি হবে শবরবাবু?

বোধ হয় না। চৌদ্দ বছর মেয়াদ হতে পারে। প্যারোল-ট্যারোল বাদ দিয়ে বড়জোর দশ বছর ঘানি টানবেন। তবে আমেরিকান সিটিজেন বলে কিছু কনসিডারেশন হতে পারে। ওসব আনইকানুন আমার জানা নেই। আপনি কি সত্যিই অরুণিমা বকসীর বিষয় সম্পত্তি কিছুই নেবেন না।

পাগল নাকি? ওসব আমি ছোঁবোও না।

তাহলে সম্পত্তির গতি কী হবে?

যা খুশি হোক।

আপনি অদ্ভুত লোক কিন্তু।

না শবরবাবু, আমি ভিতু লোক। অনার্জিত সম্পদকে খুব ভয় পাই।

আচ্ছা, গুডবাই। ভালো থাকুন।

ধন্যবাদ।

আমি বলছি।

সব খবর পেয়েছেন?

খবরের কাগজে দেখেছি।

আপনার কি সন্দেহ ছিল খুনটা আমি করেও থাকতে পারি?

না, কখনও নয়। সন্দেহ থাকলে কি এত কথা বলি?

আমি লম্পট বলে প্রতীয়মান হলেও তা নই কিন্তু।

আপনি ভীষণ খারাপ।

কি করে আপনার কাছে ভালো লোক হওয়া যায় বলবেন?

শুধু আমার কাছে কেন, সকলের কাছে নয়?

আপাতত আমার একজনের জন্যই মাথাব্যথা। হাসছেন!

এত পাগল হওয়ার কী আছে?

আপনি যে আমাকে ভীষণ জ্বালাচ্ছেন!

ওঃ! তাহলে আর ফোন করব না।

তাই তো বললেন!

তাই বললাম বুঝি!

এই বুদ্ধি! আপনাকে আমি বুদ্ধিমতী ভেবেছিলাম।

ঝগড়া করার জন্য গলা চুলকোচ্ছেন, না?

আপনিও তো ঝোগডুটে। এক বুঝতে আর এক বোঝেন।

বেশ তা হলে কথা না বললেই তো হয়।

না না, বরং ঝগড়াই হোক।

ঝগড়া হবে! ওমা, কেন?

এরকম ঝগড়া বেশ ভালো, মন ভালো হয়ে যায়।

তাহলে তো সারাজীবন ঝগড়াই করতে হবে আপনার সঙ্গে।

রাজি। হাসছেন কেন?

একটা পাগলার পাল্লায় পড়েছি বলে।

আমিও তো একটা পাগলির পাল্লায় পড়েছি। পাগলিকে এখন আমার ভীষণ দরকার।

কেন?

বোঝেন না? না বুঝে থাকলে আর বুঝে কাজ নেই। আমি পাগলির কাছে বসে এই জীবনটাকে বুঝে নিতে চাই। আপনার পাঠশালায় আমাকে ভরতি করে নেবেন?

ভেবে দেখি।

না, ভাবলে সব গুলিয়ে যাবে। নিন না ভরতি করে! নেবেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। তারপর মেয়েটি বলল, না নিয়ে উপায় কী?

ধূসর সময়

এবাড়িতে রাতের খাওয়ার .টবিলের জমায়েতটাই সবচেয়ে উপভোগ্য ব্যাপার। বিশ্বদেব এবং তার স্ত্রী, তাদের দুই ছেলে নভোজিৎ এবং চন্দ্রজিৎ, এক বউমা শর্মিলা, এক মেয়ে স্বস্তি, সবাই জড়ো হয় এ সময়ে। টেবিলটা এত বড় নয় বলে সবাই একসঙ্গে খেতে বসে না। দুই ছেলেকে নিয়ে বিশ্বদেব বসে, আর কখনও কখনও ছেলেদের চাপাচাপিতে তাদের মাও। শর্মিলা আর স্বস্তি প্রায়ই দেরিতে একসঙ্গে খায়। দুজনে খুব ভাব। আপাতত তারা পরিবেশন তদারকি করছে। প্রকাশ তেওয়ারি এবাড়ির রান্নার লোক, ফর্সা, মধ্যবয়সি সুদর্শন পুরুষ। সে বিশ্বদেবের অফিসেও হেড বেয়ারার চাকরি করে। এবাড়িতে রান্নার বিনিময়ে সে মাসে হাজার টাকা, খোরাক এবং গ্যারেজের ওপরে মেজেনাইন ফ্লোরে থাকার জায়গা পেয়েছে। বিশ্বদেবের বড় মেয়ে শ্রাবন্তীর বিয়ে হয়ে গেছে। সে দিল্লিতে থাকে। নভোজিৎ অত্যন্ত কৃতবিদ্য ডাক্তার। সে এফ আর সি এস এবং এই শহরে তার জন্যই বিশ্বদেব একটা বড় এবং অত্যাধুনিক নার্সিংহোম খুলেছে। এত ভালো নার্সিংহোম আশেপাশে কোনও শহরেই নেই। চন্দ্রজিৎও ডাক্তার, সবে পাশ করে এখন কলকাতা মেডিকেল কলেজে ইন্টার্ন। টার্ম শেষ হলে বিদেশে যাওয়ার প্ল্যান আঁটছে। সে কয়েকদিনের ছুটিতে এসেছে।

বিশ্বদেবের অবস্থা ভালো, মূলত কন্ট্রাক্টরির কারবার ছিল, সিভিল কনস্ট্রাকশন থেকে সে কাঠের ব্যবসা শুরু করে। তারপরে একটি টিকপ্লাই তৈরির কারখানাও। সে এই মফস্বল শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

রোজই রাতের এই খাওয়ার টেবিলে একটি গরম আড্ডা হয়।

বিশ্বদেব খেতে খেতে হঠাৎ বলল, টুলু, আজ তোকে একটু অফ-মুড বলে মনে হচ্ছে কেন রে?

টুলু নভোজিতের ডাকনাম। সে একটু হেসে বলল, প্রফেশনাল হ্যাজার্ড।

তার মানে? কোথাও সিরিয়াস রুগি নাকি?

একরকম তাই। তবে রোগ নয়, একটা মেয়ে বিষ খেয়েছে। পাম্প করে বের করা হয়েছে বটে, কিন্তু খানিকটা রক্তে মিশে গেছে। কোমাটিক কন্ডিশন।

বয়স কত?

উনিশ-কুড়ি।

লাভ অ্যাফেয়ার, না কি ডাওরি ফল আউট।

মেয়েটা কুমারী।

ব্যর্থ প্রেম, পরীক্ষায় ফেল বা ডিপ্রেশন।

না, তাও নয়। মেয়েটাকে তুমি হয়তো চিনবে।

কে বল তো!

হেডমিস্ট্রেস মৃন্ময়ী ভট্টাচার্যের মেয়ে রাখি।

বিশ্বদেব থমকে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, রাখি?

হ্যাঁ, স্পিরিডেট মেয়ে। ভালো গান গায়, চমৎকার ডিবেটার। তার ওপর ভালো ছাত্রী। দেখতেও খারাপ নয়। আজ সন্ধেবেলা নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। জ্ঞান নেই।

বিশ্বদেব স্থিরদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে ছিল। খুব আস্তে করে জিগ্যেস করল, অবস্থা কেমন? বাঁচবে?

বোঝা যাচ্ছে না। রাতের দিকে ডায়ালিসিস করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাকে রাতে যেতে হতে পারে।

ডায়ালিসিস করা হল না কেন?

ডাক্তার বৈদ্য আর সেনশর্মা দেখছেন। অ্যান্টিডোট পুশ করা হয়েছে। রি-অ্যাক্ট করলে খুব একটা ভয় নেই। টকসিনটাও ডিটেকটেড হয়েছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। মৃন্ময়ী দিদিমণি বলেছেন, অ্যাটেম্পটেড মার্ডার।

বিশ্বদেব অবাক হয়ে প্রতিধ্বনি করল, মার্ডার!

বিশ্বদেবের স্ত্রী রুচিরা মন দিয়ে শুনছিল, এবার বলল, রাখিকে খুন করতে চাইবে কে? একটু ঠোঁটকাটা আর দেমাকি আছে বটে, কিন্তু এমনিতে তো ভীষণ ভালো মেয়ে।

স্বস্তি চুপ করে ছিল। হঠাৎ বলল, আমি কিন্তু জানতাম।

রুচিরা বলল, কী জানতিস?

রাখির এরকম একটা কিছু হবে।

কী করে জানলি?

চকোলেট ক্লাবের হাবুকে তো ও-ই ধরিয়ে দিয়েছিল। ওর ভীষণ সাহস। গতবার পুজোর ফাংশানে অষ্টবসু নামে যে বাংলা ব্যান্ডটা গাইতে এসেছিল তাদের তিনজন মাতাল অবস্থায় স্টেজে উঠেছিল বলে ও-ই তো প্রথম দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। তারপর কী গণ্ডগোল! পুজো কমিটি পারলে রাখিকে খুন করে ফেলত।

শর্মিলা বলল, কাল যাব তো মেয়েটাকে দেখতে নার্সিংহোমে। শুনেই মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং মেয়ে।

চন্দ্রজিৎ ওরফে বাবলু একটু কম কথার মানুষ। এতক্ষণ এই প্রসঙ্গে একটাও কথা বলেনি। শর্মিলা তার দিকে চেয়ে হঠাৎ বলল, আচ্ছা বাবলু এত চুপচাপ কেন আজকে? এই বাবলু, কী হয়েছে তোমার?

বাবলু মুখ তুলে একটু হাসল, বলল, কিছু না।
শরীর ঠিক আছে তো?
আরে হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।
বাবলু উঠে বেসিনে হাত ধুতে গেল।
রুচিরা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, ও-ই তো মাথাটা খেয়েছে।
বিশ্বদেব একটু অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, কে কার মাথা খেয়েছে?
সে আর তোমার শুনে কাজ নেই।
নভোজিৎ তার বাবার দিকে চেয়ে বলল, এব্যাপারে পুলিশ কিন্তু খুব ক্যালাস। তেমন একটা ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে না। শিবদাসবাবুকে তোমার কেমন পুলিশ অফিসার বলে মনে হয়?
কেন, শিবদাস তো বেশ এফিসিয়েন্ট!
রাখির ব্যাপারে কিন্তু তেমন কোথাও খোঁজখবর করল না। আমাকে শুধু জিগ্যেস করল, পয়জনিংয়ের কেস নার্সিংহোমে ভর্তি করলেন কেন? হাসপাতালে পাঠানোই তো উচিত ছিল। আর জিগ্যেস করল, সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে কি না।
সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে?
তা জানি না। রাখিকে তো পাওয়া গেছে ওদের বাড়ির চিলেকোঠায়। সুইসাইড নোট থাকলে সেখানেই থাকবে। ওকে যখন নার্সিংহোমে আনা হয় তখন পরনে একটা হাউসকোট ছিল। তার পকেটে কিছু পাওয়া যায়নি।
বাড়িতে তখন কেউ ছিল না?
না, মৃন্ময়ী ভট্টাচার্য তো ডিভোর্সি। মা আর মেয়ে থাকে। কাজের ঠিকে ঝি বিকেলে কাজটাজ করে চলে যাওয়ার পর রাখি একাই ছিল। ওর মা সন্ধের সময় ফিরে কলিং বেল বাজিয়ে সাড়া পাননি। অথচ মাত্র মিনিটপনেরো কী কুড়ি আগেই নাকি মেয়ের সঙ্গে ফোনে ওঁর কথা হয়েছে। উনি জোর দিয়ে বলছেন, কথা বলার সময় উনি টের পেয়েছেন যে রাখির সঙ্গে কেউ একজন আছে।
কে ছিল?
সেটা বলতে পারছেন না। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস এটা খুনের চেষ্টা।
তোরা, ডাক্তাররা কী বলিস?
সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাখির মাথার পেছনদিকে একটা জায়গা ফুলে কালসিটে পড়েছে। ইনজুরি মারাত্মক নয়; তবে এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, কেউ মাথার পেছনদিকে শক্ত কিছু দিয়ে মেরেছিল। আবার বিষ খাওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়ে থাকলেও ওরকম ইনজুরি হতে পারে।
অজ্ঞান হয়ে গেলে বিষ খাওয়ানো হল কেমন করে?

মুখে ঢেলে দিলেও হতে পারে। শিবদাসবাবু অবশ্য এসব জানতে চাইছেন না। তিনি সুইসাইড বলে হাত ধুয়ে ফেলতে চান। মেয়েটা বেঁচে উঠলে অবশ্য অন্য কথা।

শিবদাসকে মাথার চোটের কথা জানিয়েছিস?

হ্যাঁ, উনি পড়ে যাওয়ার থিয়োরিতে বিশ্বাসী। তুমি কী জানো মৃণ্ময়ীর হাজব্যান্ড রমেন ভট্টাচার্য কোথায় আছে?

না, কলকাতায় তো ছিল।

বাবলু তার ঘরে আলো নিবিয়ে চুপ করে জানালার ধারে বসে ছিল। জানালাটা উত্তরে। খোলা জানালা দিয়ে প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে হুড়হুড় করে।

দরজায় টোকা দিয়ে বউদি চাপাস্বরে ডাকল, এই বাবলু!

বাবলু জানে, বউদি সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। বউদি মেয়েটা বড্ড ভালো। বোকা নয়, অতি চালাক নয়, স্বার্থপর নয়, মিশুকে এবং স্বভাবটি ভালো। এই জন্যেই বউদির সঙ্গে তার একটা ভারি মিষ্টি বন্ধুত্ব হয়েছে। সে উঠে নিঃশব্দে দরজাটা খুলে দিল।

জ্বালাতে এসেছ তো?

মোটেই নয়। খবরটা নিশ্চয়ই তুমি জানতে?

হ্যাঁ।

কখন জানলে?

সন্ধেবেলাতেই। ওদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম।

কী সাহস! মৃন্ময়ী দিদিমণি তোমাকে আগেরবার অত অপমান করার পরও? বাড়ি না গিয়ে বাইরেই তো দেখা করতে পারতে!

চেষ্টা করেছিলাম। রাখি কাল থেকেই ফোনে কাটাকাটা কথা বলছে। দেখা করতে চাইছে না।

ওমাঃ কেন? হঠাৎ ওর হল কী?

সেটা জানবার জন্যেই তো আজ মরিয়া হয়ে যাচ্ছিলাম। তখন ছ'টা বেজে গেছে। দিদিমণি সাধারণত আরও একটু দেরিতে ফেরেন। আজ গিয়ে দেখলাম, বাড়িতে চেঁচামেচি, লোক জড়ো হয়েছে।

নার্সিংহোমে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, গা-ঢাকা দিয়ে।

হঠাৎ সুইসাইড করতে গেল কেন?

করেনি। করার চেষ্টা করেছিল। নার্সিংহোমের পিউ মজুমদারকে জিগ্যেস করেছিলাম। বলল, বেঁচে যাওয়ার চান্স আছে।

তোমার সঙ্গে কিছু হয়নি তো?

না বউদি।

তোমাদের মধ্যে কমিউনিকেশন আছে তো!

ছিল। দিনসাতেক আগে অবধি ফোনে রেগুলার কথা হত। দিনে অন্তত চার-পাঁচটা এসএমএস পেতাম। কিন্তু সাতদিন আগে হঠাৎ একদিন কমিউনিকেশনটা কেটে গেল।

কে কাটল? রাখি?

হ্যাঁ। ফোন করলে খুব আলতো দু-একটা কথা বলে লাইন কেটে দিত। নিজে ফোন করত না, এসএমএসও বন্ধ।

খুব স্ট্রেঞ্জ তো! একটা কারণ তো থাকবে।

সেটাই বুঝতে পারছি না। আমার হঠাৎ এখানে আসার কারণও সেটাই। আমি জানতে চেয়েছিলাম হঠাৎ কী এমন হল, কিন্তু ও তো দুদিন ধরে দেখাই করতে চাইছে না। তার ওপর আজ এই কাণ্ড!

ওর বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিয়েছিলে? তেমন কিছু প্রবলেম হয়ে থাকলে তো বন্ধুদের কাছে বলবে।

ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু নন্দিনী। কাল তাকে জিগ্যেস করেছিলাম। সে বলল, রাখি কোনও কারণে আমাকে কাটিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু কারণটা বলেনি। চাপা স্বভাবের মেয়ে, জানো তো!

দাঁড়াও, আমি বরং কাল থেকে একটু গোয়েন্দাগিরি শুরু করি।

না বউদি, ব্যাপারটা চাউর হোক আমি চাই না, রাখি নিজেই হয়তো কোনওদিন বলবে। তুমি খোঁজখবর করতে গেলে মা যদি জানতে পারে, তবে খুশি হবে না।

জানি। মা রাখিকে হয়তো ততটা অপছন্দ করেন না, কিন্তু রাখির মাকে করেন। তাঁর ধারণা রাখির বাবার সঙ্গে ওঁর ডিভোর্সটা ওঁর দোষেই হয়েছে।

কোনও অজ্ঞাত কারণে মৃন্ময়ী দিদিমণিও মাকে পছন্দ করেন না।

সেটাও জানি। এখন তবে কী করবে?

কী করব বলো তো! আমার তো কিছুই মাথায় আসছে না। তুমি নিজে তো একজন মেয়ে। বলো তো, একটা মেয়ে তার ভালোবাসার ছেলেটিকে হঠাৎ অপছন্দ করতে শুরু করবে কেন? যতদূর জানি, আমি তো কোনও দোষও করিনি।

মেয়েদের ভালোবাসা বেশ স্ট্রং হয় মশাই। ছেলেদের মতো তারা অত ছুঁকছুঁক করে বেড়ায় না। আর রাখি বেশ সিরিয়াস টাইপের মেয়ে।

এমনকী হতে পারে যে, ও হঠাৎ অন্য কারও প্রেমে পড়েছে?

দূর! ওসব নয়। বললাম তো, মেয়েরা অত সহজে পুরুষ বদল করতে পারে না। খুব স্ট্রং কারণ থাকলে অন্য কথা।

রাখির ব্যাপারে আমার তো সেরকমই কনফিডেন্স ছিল।

বিশ্বাসটা ভেঙে ফ্যালো না। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ভাব। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করতে যেও না।

আচ্ছা ধরো, রাখি যদি তোমার ওপর ইন্টারেস্ট হারিয়েই ফেলে থাকে, তাহলে তুমি কী করবে?

তা জানি না, শুধু জানি আমি ওকে ভালোবাসি। মনে মনে একটা রচনা তো হয়ে আছে। কিন্তু যদি বুঝি যে, ও আমাকে আর সত্যিই চায় না, তাহলে পাগলও হব না, সুইসাইডও করব না। কষ্ট তো হবেই। খুব কষ্ট হবে।

তা তো হওয়ারই কথা, দাদা কী বলল শুনেছ তো? মৃন্ময়ী সন্দেহ করছেন অ্যাটেম্পটেড মার্ডার।

শুনলাম।

ভয় হচ্ছে, উনি আবার তোমাকে ফাঁসাতে চাইছেন না তো!

সেই জন্যেই রাখির বেঁচে ওঠা দরকার। কিন্তু আমাকেই বা সন্দেহ করবেন কেন উনি? আমি তো রাখিকে ভালোইবাসি। খুনের প্রশ্ন উঠবে কেন?

মৃন্ময়ী ফ্রাস্ট্রেটেড মহিলা। ওঁদের মন সোজা পথে হাঁটে না।

রমেন ভট্টাচার্যকে তো তুমি দ্যাখোনি বউদি।

না, ওঁদের ডিভোর্স হয় বোধহয় বারো-চোদ্দো বছর আগে। তবে শুনেছি, রমেন ভট্টাচার্য ভালো লোক ছিলেন।

হ্যাঁ, নিরীহ শান্ত মানুষ। পিডবলুডি-তে কাজ করতেন। খুব উঁচুদরের চাকরি নয়। লো-প্রোফাইল ছিলেন। মৃন্ময়ী বরাবর ওঁকে ডমিনেট করতেন, শোনা যায় স্বামীকে মারধরও করেছেন। রাখি তখন খুব ছোট। কিন্তু ওরও সেই সব অশান্তির কথা মনে আছে। ডিভোর্সের মামলা হওয়ার পর ভদ্রলোক একতরফা দাবিদাওয়া ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে রিজাইন দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

মৃন্ময়ী কি খুব খারাপ স্বভাবের মহিলা বাবলু? শুনতে পাই, উনি প্রচুর সোশ্যাল ওয়ার্ক করেন, দানধ্যানও আছে, ভালো গাইতে পারেন।

সেটাই তো মুশকিল হয়েছে বউদি, ওকে খলচরিত্রও বলা যাবে না। এশহরে ওর মানমর্যাদা কিছু কম নয়। সকলেরই মৃন্ময়ীকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখেন। স্কুলটাকে প্রায় একার হাতেই এতটা বড় করে তুলেছেন।

সে তো জানি, কিন্তু মৃন্ময়ী দিদিমণি তোমাকে কেন অপছন্দ করেন সেটাই বুঝতে পারছি না। তুমি অত্যন্ত ব্রাইট ছেলে, বলতে নেই দারুণ হ্যান্ডসাম, স্মার্ট, ডাক্তার, পাত্রীর বাজারে এরকম ছেলে তো পড়তে পায় না। তাহলে মৃন্ময়ীর তোমাকে অপছন্দ কেন?

চন্দ্রজিৎ ওরফে বাবলু ম্লান হেসে বলল, উনি হয়তো মেয়ের জন্য আরও প্রসপেকটিভ পাত্র আশা করে বসে আছেন।

বাজে বোকো না। রাখিই-বা এমন কী মেয়ে? মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। গুণও আছে। তা বলে হুরিপরি তো নয়, সাধারণ ঘরের আটপৌরে মেয়ে।

ঠিক তাই।

তোমার দাদাকে বলব?

না বউদি। সেটা ভালো হবে না। দাদা আমাদের মেলামেশার খবর হয়তো জানে না, তুমি যদি না বলে থাকো।

না, আমি বলিনি, তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলার মতো বাড়তি সময় পাই নাকি? সপ্তাহে একবার-দুবার কলকাতায় অপারেশন করতে যায়, তার ওপর প্রায় সময়েই কনফারেন্সে হিল্লিদিল্লি যাচ্ছে, বাকি সময়টা নার্সিংহোমে থাকতে হচ্ছে। দোষ দিচ্ছি না, ভালো সার্জনের ব্যস্ততা তো থাকবেই। ওই ফোন বাজল, বোধহয় নার্সিংহোম থেকে জরুরি কল! যাই...

শর্মিলা ব্যস্ত হয়ে চলে যাওয়ার পর বাবলু উঠে বাতি নিবিয়ে দিল। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়, তারপর কী ভেবে উঠে সিডিতে একটা সেতার চালিয়ে দিয়ে ফের শুয়ে পড়ল।

এক সময়ে সে সেতারের ভক্ত ছিল খুব। জীমূতবাহন নামে একজন সেতারি ছিলেন এশহরে। নামজাদা লোক নন। তবে প্রাথমিক পাঠ দেওয়ার পক্ষে চমৎকার। তাঁর কাছেই শিখত। জীমূতবাহন তার ভেতরে বড় সেতারি হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন বলে মন দিয়ে তালিম দিতেন।

কিন্তু বাবলু সময় দিতে পারল কই? ডাক্তারি পড়তে গিয়ে পড়ার চাপে সেতার বন্ধই হয়ে গেল একরকম। আজকাল হাসপাতালের লাগোয়া কোয়ার্টারে মাঝে মাঝে বাজায় বটে, কিন্তু সেই আবেগ আর নেই।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল কি? হ্যাঁ, দাদা তাহলে নার্সিংহোমেই গেল! কেন? রাখির কি অবস্থা খারাপ?

তার মোবাইল ফোন তুলে সে নার্সিংহোমে ডায়াল করল।

পিউ মজুমদারকে একটু দেবেন?

একটু বাদে পিউ ফোন ধরল, বলো।

আমি বাবলু, দাদাকে কল করা হল কেন?

ভয় নেই। এটা অন্য কেস। রাখি স্টেবল আছে, ঘুমোও।

দুই

ধীরে ধীরে ঘুম কমে যাচ্ছে বিশ্বদেবের। আটান্ন বছর বয়সে তার স্বাস্থ্য রীতিমতো পেটানো। মেদের বাহুল্য নেই। তেমন কোনও রোগ নেই। অসুখবিসুখ নেই। তবে হ্যাঁ, চিন্তা আর টেনশন যথেষ্ট আছে। সেটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশ্বদেব রীতিমতো যোগব্যায়াম করে, সকালে নিয়ম করে হাঁটে, নিয়মিত সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে সিটিং দেয় এবং দীক্ষা নেওয়ার কথাও সিরিয়াসলি ভাবছে। তার বউ রুচিরা একটু উন্নাসিক মহিলা। আর্ট, কালচার, মার্গসংগীত ইত্যাদি তার প্রিয় বিষয়। এশহরে তার একটা কালচারাল সেন্টার আছে। সেখানে আর্ট এগজিবিশন, পেইন্টিংয়ের এগজিবিশন, ফ্লাওয়ার শো, বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ইত্যাদি হয়ে থাকে। মফস্বল শহরে অবশ্য এগুলো তেমন ঢেউ তোলে না। তবে রুচিরা হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয়, ব্যবসায়ী এবং ধনী স্বামীটির চেয়ে সেরিব্রাল ব্যাপারে বা রুচিতে সে অনেক ওপরে। বিশ্বদেব স্ত্রীর এই অহংকারটুকু মেনে নেয়। সস্নেহ প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকে। সত্যি কথাটা হল, রুচিরাকে আর তার প্রয়োজনই হয় না। রুচিরা তার মতো আছে থাকুক। বিশ্বদেব ভালোই জানে, তার বিপুল বৈভব রুচিরাকে যে শক্ত জমিটি দিয়েছে তার ওপর দাঁড়িয়েও ওর যত কালচার--গোঁড়ামি।

কাল রাতে ঘুম না হওয়ার কারণ হল রাখি। রাখি কেন মরতে চায় বা কে ওকে মারতে চায়, এটা নিয়ে অনেক রাত অবধি ভেবেছে সে। তবে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তাছাড়া কাল রাতেই সে আবছাভাবে বুঝতে পেরেছে, তার ছোট ছেলে বাবলুর সঙ্গে রাখির একটা ভাব ভালোবাসার সম্পর্ক রচিত হয়েছে। সেটা যে কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না, এটাও তার দুশ্চিন্তার বিষয়। কাজেই আজ সকালে বেশ ক্লান্ত বোধ করছে বিশ্বদেব।

আজ সকালের অবসাদ তাকে মর্নিং ওয়াকে পর্যন্ত যেতে উৎসাহিত করেনি। সকালে সামনের চওড়া বারান্দায় শীতের রোদে বেতের সোফায় বসে ছিল সে। সামনে চমৎকার বাগান। গাড়িবারান্দাটি অর্ধচন্দ্রাকার, মোরামের রাস্তা চলে গেছে সামনের ফটক অবধি।

ফটক দিয়ে একটা লম্বা চেহারার ছেলে ঢুকল। পরনে জিনসের প্যান্ট, গায়ে শার্টের ওপর জিনসেরই একটা জ্যাকেট। গালে ঘন দাড়ি আর গোঁফ আছে। এবাড়িতে লোকের অবারিত দ্বার। কারণ বিশ্বদেবের কাছে সারাদিন নানা কাজে নানা লোক আসে। ফটকে দারোয়ান মোতায়েন আছে বটে, কিন্তু কাউকে আটকানোর হুকুম নেই। শুধু ভিখিরিদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, ফটক থেকেই তাদের পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দেওয়া হয়। ছেলেটার ডান কাঁধে একটা ঝোলা, শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, যার স্ট্র্যাপ ডান হাতের মুঠোয় চেপে রেখেছে সে, বেশ বড় বড় সতেজ পদক্ষেপে ছেলেটা হেঁটে এসে বারান্দায় উঠল।

আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বিশ্বদেব সামনের বেতের চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, বসুন।

ছেলেটার বয়স সাতাশ-আটাশ। মুখটা দেখে মনে হয়, খুব রোদে জলে ঘোরে। শরীরটা ছিপছিপে, শক্তপোক্ত, মাথায় অবিন্যস্ত লম্বা চুল। একনজরে দেখে ছেলেটার প্রতি বিরাগ অনুভব করল না বিশ্বদেব। বলল, বলুন।

আপনি আমাকে কতক্ষণ সময় দিতে পারবেন?

কেন, আপনার কি লম্বা কোনও কথা আছে?

হ্যাঁ, আসলে কথাটা শুধু আমার নয়। পৃথিবীর সব মানুষের।

বলেন কী? পৃথিবীর সব মানুষের কথা আপনি একা বলবেন?

ছেলেটা হাসল, তার দাঁতগুলোর সেটিং ভারি চমৎকার।

হাসিটা অতি সরল, বলল, ভূমিকাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, মাপ করবেন। আসলে আমার বিষয় হচ্ছে জল।

জল! মাই গুডনেস? জল সম্পর্কে আমার কাছে কেন? যদি আপনার তেষ্টা পেয়ে থাকে, তাহলে অন্য কথা।

আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে দিন। আপনি নিশ্চিত জানেন যে, ধীরে ধীরে পৃথিবীর আবহাওয়া গরম হচ্ছে। গ্রিনহাউস এফেক্টের ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে আজকাল পৃথিবী জুড়েই কথা হচ্ছে, দক্ষিণ মেরুর ওপরে ওজোন স্তরের ফুটো থেকেই আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত।

হ্যাঁ জানি, সেজন্যে আমরা সবাই চিন্তিত।

বটেই তো। সবাই চিন্তিত, আর সেইজন্যেই আমি ঘুরে ঘুরে আমাদের জলের প্রাকৃতিক উৎসগুলি দেখছি। উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর বরফ গলতে শুরু করলে সমুদ্রের জলস্তর ওপরে উঠবে, পৃথিবীর অনেক স্থলভূমি ডুবে যাবে, অনেক দেশ হয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন, তেমনি বিপদ আমাদেরও। হিমালয় এবং অন্যান্য পর্বতমালার হিমবাহগুলি আমাদের বেশিরভাগ নদীর উৎস। হিমবাহগুলি গলে গেলে আমাদের নদীগুলিতে ভয়ংকর প্লাবন দেখা দেবে। একটা নদীর বদলে হাজারটা জলধারা সমভূমিকে প্লাবিত করে সমুদ্রে গিয়ে মিশবে। বিস্তর মানুষ মারা পড়বে। শহরগুলি ভেসে যাবে। কিন্তু তারপর আরও একটা ভয়ংকর বিপদ হবে।

সেটা কী?

হিমবাহ গলে প্রাথমিক প্লাবনের পর নদীগুলোর উৎস বলে আর কিছু থাকবে না। নদীর খাত যাবে শুকিয়ে। দেখা দেবে সাংঘাতিক জলসংকট। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আগামী কুড়ি-ত্রিশ বছরের মধ্যেই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। হিমালয়ে বরফ বলে যদি কিছু না থাকে, তবে কী হবে, তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন।

পারছি। কিন্তু আপনি কী করতে চাইছেন?

সময় থাকতেই যাতে কতগুলি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেইজন্যেই আমি বিভিন্ন মানুষের কাছে যাচ্ছি। ভবিষ্যতের ভয়ংকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমার কিছু প্রজেক্ট আছে। একটা হল যতটা সম্ভব সোর্সের কাছাকাছি বাঁধ দিয়ে হিমবাহের জল আটক করা। দ্বিতীয় প্রজেক্ট হল কয়েকটা নিকাশি খাল বের করা, আর হাইডেল তৈরি করা।

এসব নিয়ে পৃথিবীর বিশেষজ্ঞরা কি ভাবছেন না?

হ্যাঁ, অবশ্যই ভাবছেন, ধরে নিন আমার ভাবনাও তাঁদের প্রতিধ্বনি।

আপনি কি একজন বিশেষজ্ঞ? টেকনিক্যাল ম্যান?

না। আমি টেকনিক্যাল ম্যান বা অথোরাইজড পারসোনাল নই। তবে আমি একটি কোম্পানিতে চাকরি করি। কনসালটেন্সি ফার্ম, তাদের কাজই হল ডিজাস্টার অ্যান্টিসিপেট করে আগাম ব্যবস্থাপত্র তৈরি করা।

এসব বিগ প্রজেক্টের ব্যাপার, আমি কী করতে পারি বলুন। আমি একটা ছোট্ট শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মাত্র।

সেটাও কম কথা নয়। আপনার শহরের ধার দিয়ে আর মাঝখান দিয়ে দুটো ছোট নদী বয়ে গেছে। এদের সোর্স পাহাড়ে। এই সোর্স আমি দেখে এসেছি। আমার মনে হয়েছে, সোর্সের দিকে মাইলদশেক ভেতরে একটা বড় ভ্যালি আছে। দুদিকে পাহাড়। জলটা এখানে আটকাতে পারলে একটা বিশাল ন্যাচারাল বেসিন তৈরি করা যাবে, হাইডেল প্রজেক্টের পক্ষেও চমৎকার জায়গা।

ওটা আমার এলাকা নয়।

তাও জানি। আমি শুধু বলতে চাইছি, এই এলাকা আপনি খুব ভালো চেনেন। এই প্রোপোজালের এগেনস্টে কোথাও অবজেকশন উঠতে পারে কি না, সেটা জানতেই আপনার কাছে আসা।

আপনার কোম্পানির নাম কী?

গ্লোবাল ফ্রেন্ড ইনকরপোরেটেড।

নামটা চেনা ঠেকছে না।

নামটা শুনে প্রভাবিত হওয়ার মতো বড় কোম্পানিও নয়। তবে সরকার এদের অ্যাপয়েন্ট করেছে।

অ্যাপয়েন্ট করেছে মানে কি কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়ে গেছে?

না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমাদের কোম্পানি কিছু সাজেশন দেয়। সেটা অ্যাকসেপ্ট করা বা না করা সরকারের মর্জি, সরকারি বাজেটেরও প্রশ্ন আছে।

আপনারা বাঁধ দেওয়ার কথা বলছেন, ভালো কথা, কিন্তু হাইডেল তো অনেক টাকার ব্যাপার।

বড় প্রজেক্টের জন্যে অনেক টাকা দরকার বটে, কিন্তু ছোট মিনি হাইডেল অনেক কম খরচে করা যায়। আমরা জল সংরক্ষণের সঙ্গে হাইডেলটা সব সময়েই জুড়ে দিই। তার কারণ, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যখন ফুয়েল ক্রাইসিস দেখা দেবে, তখন এই হাইডেলগুলোর গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যাবে। উঁচু জায়গা থেকে যে-জল নীচে নামবে, তা তো আর আপনা থেকে সোর্সে ফিরে যাবে না। আর তা না গেলে সেই সব সোর্সও শুকিয়ে যাবে। এই সব হাইডেল পাওয়ারের সাহায্যে বাষ্প করে জল আবার সোর্সে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, ভবিষ্যতে এই ওয়াটারসাইকেল ভীষণ প্রয়োজন হবে। ইন ফ্যাক্ট সারাদেশেই আমরা এরকম প্রজেক্টের প্রস্তাব সরকারকে দিচ্ছি।

আপনি টেকনিক্যাল হ্যান্ড নন?

না। সেই অর্থে নই।

তাহলে আপনার কোম্পানি আপনাকে একাজে পাঠাল কেন?

ছেলেটি একটু হেসে বলল, বিকজ আই অ্যাম প্যাশনেটলি ইন লাভ উইথ ওয়াটার, জলের চরিত্র বুঝবার জন্য আমি বিস্তর মাথা ঘামিয়েছি। জলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়েও আমি পত্র-পত্রিকায় কিছু লিখেছি। কোম্পানি আমাকে সেই জন্যই চাকরি দিয়েছে, তবে আমার রিপোর্ট ফেবারেবল হলে কোম্পানির বিশেষজ্ঞ আর আমিনরাও আসবে।

আপনার নাম?

অলক চক্রবর্তী।

ক্রেডেনশিয়ালস দেখাতে পারেন?

কেন পারব না? বলে অলক তার ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ল্যামিনেট করা আইডেনটিটি কার্ড বের করে বিশ্বদেবের হাতে দিল।

বিশ্বদেব ভ্রূ কুঁচকে কার্ডটার দিকে চেয়ে বলল, আপনার ডেজিগনেশন এগজিকিউটিভ। এ শব্দটা খুব ধোঁয়াটে। কোম্পানিতে আপনার পজিশনটা ঠিক বোঝা গেল না।

ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি সামান্য বেতনভুক লো-লেভেল কর্মচারী মাত্র।

সরকার যখন আপনার কোম্পানিকে অ্যাপয়েন্ট করেছে, তখন ধরে নিতে হবে আপনার কোম্পানি এলেবেলে নয়। এখন বলুন, আপনি এখানে ঘুরে কী অ্যাসেসমেন্ট করলেন। ফেবারেবল?

হ্যাঁ, খুবই ফেবারেবল। তবে উপত্যকায় কিছু পাহাড়ি মতো গ্রাম আছে, জলাধার হলে সেগুলো ডুবে যাবে। ওই লোকগুলোর পুনর্বাসন দরকার হবে। অবশ্য প্রজেক্ট হলে লোকে কাজও পাবে।

সরকার প্রজেক্ট করার কথা ভাবে ঠিকই, কিন্তু টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারে না।

ঠিকই তো। তাছাড়া এদেশে জোনাল সেন্টিমেন্ট এবং পক্ষপাত আছে, মন্ত্রীরা যে-যার নিজের রাজ্য বা এলাকার ডেভেলপমেন্ট করতে চায়। বাধা আছে। তবে তা নিয়ে সরকার মাথা ঘামাবে।

আপনি কতদিন হল এশহরে এসেছেন?

প্রায় একমাস।

এতদিন খবর দেননি কেন?

খবর তৈরি হলে অবশ্যই দিতাম। স্পটগুলো ঘুরে দেখে তবেই আপনার কাছে এসেছি।

কোথায় উঠেছেন?

প্রথমে রূপকথা হোটেলে উঠেছিলাম। তারপর পাহাড়ে চলে যাই, শাওন নামে একটা গাঁয়ে এক চাষি পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন কাটাই। তারপর হায়ার অলটিচুডে তাঁবুতে থাকতে হয়। গতকাল আমার কাজ একরকম শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে দিল্লি থেকে আমার দুজন সহকারীও এসে গেছেন। ফলে আমরা পেরেরা সাহেবের বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি।

পেরেরার বাংলো?

হ্যাঁ।

তিনজনের জন্যে অত বড় বাড়ি নিয়ে কী করবেন? ভাড়াও তো অনেক।

আমাদের কোম্পানির টেকনিক্যাল হ্যান্ডরাও এসে পড়বেন।

বুঝতে পারছি আপনি এক মাসের মধ্যে অনেক কাজ করে ফেলেছেন। কিন্তু আমি কেন জানতে পারলাম না সেটাই ভাবছি।

আমার কাজ ছিল বাইরে, গাঁয়ে, জঙ্গলে আর পাহাড়ে। তাই খবরটা আপনার কাছে আসেনি। তবে হয়তো আমারই উচিত ছিল সব কথা আপনাকে জানানো।

বেটার লেট দ্যান নেভার। এ শহরের যারা এমিনেন্ট পারসোনালিটিজ খবরটা তাদেরও জানানো দরকার। তাই না? ধরুন আপনারা চেষ্টা করলেন, সরকার প্রস্তাবটা মানতে চাইল না। সে ক্ষেত্রে এই শহরের মানুষ একজোট হয়ে, আন্ডার প্রপার লিডারশিপ, সরকারের ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে। প্রজেক্ট যদি সত্যিই হয় তাহলে আমাদের শহরটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে।

অলক একটু হাসল, কিছু বলল না।

বিশ্বদেব বললেন, তাই নয় কি?

অলক একটু উদাস গলায় বলে, মুশকিল কী জানেন, সবাই নিজের লোকালিটিস নিয়ে ভাবে। গোটা দেশটা নিয়ে ভাববার লোক ক্রমে কমে যাচ্ছে।

আরে মশাই, আপনি তো আচ্ছা লোক! আপনিই তো বললেন যে, এই জায়গাটা আপনার প্রজেক্টের পক্ষে খুবই সুটেবল। তাহলে এখন আবার অন্যরকম বলছেন কেন?

অলক একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ভারতবর্ষে নদীর অভাব নেই। সব নদীকেই ঠিকমতো ব্যবহার করলে এবং জলকে কাজে লাগালে গোটা দেশটারই চেহারা পালটে ফেলা সম্ভব। এই প্রজেক্টটা হলে শুধু আপনার শহর নয়, অনেকটা এলাকা জুড়ে একটা পরিবর্তন ঘটবে। হ্যাঁ, আপনার প্রস্তাবটা আমি মানছি। শহরের ইমপর্টেন্ট লোকদের ব্যাপারটা জানানো উচিত এবং প্রয়োজন। আমি বহিরাগত এবং এখানকার বাসিন্দা নই। আমার কথা লোকে শুনবে না বা উলটো বুঝবে। যদি দয়া করে আপনি এটা করেন তাহলে ভালো হয়।

সেটা সহজ কাজ। একটা মিটিং কল করলেই হবে। কিন্তু তার আগে প্রজেক্টের একটা ব্লু-প্রিন্ট বা সারভে রিপোর্টের অফিসিয়াল কপি আমার হাতে আসা চাই।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি জানি, আপনি নিজের সোর্স থেকেও খবর পেয়ে যাবেন। তবে আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে, কোম্পানি আমার রিপোর্ট অ্যাপ্রnভ করেছে। তাদের সুপারিশ দিল্লির সরকারি দফতরেও জমাও পড়ে গেছে। কাজ অনেকটা এগিয়েছে বলেই আমি আপনার কাছে এসেছি।

বুঝেছি। একটু বসুন, চা খান।

না, না, ফর্মালিটির দরকার নেই। আপনি আমাকে অনেকটা সময় দিয়েছেন। ধন্যবাদ!

আরে মশাই! বসুন তো! কথা আছে।

অলক উঠতে গিয়েও একটু হেসে বসে পড়ল।

আপনি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছেন। আমার কাছে খবর আছে যে, ওখানে একস্ট্রিমিস্টরা ডেরা বেঁধেছে। আপনি বিপদে পড়েননি?

অলক ফের হাসল। বলল, দু-তিনবার বিপদ হয়েছে বটে, তবে একস্ট্রিমিস্টরা গোঁয়ার বা হ্যাবিচুয়াল খুনি নয়। তারা আমাকে দুবার ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের ডেরায়। চোখ বেঁধে এবং পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে। ভাগ্য ভালো যে তাদের আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পেরেছি।

আপনার প্রোটেকশন নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যে সাহসটা দেখিয়েছেন তাতে খুন হয়ে যেতে পারতেন।

আমাকে অন্যান্য জায়গাতেও এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়, এরা কেউ সাইকোপ্যাথ কিলার নয়। প্রয়োজনে খুন করে ঠিকই, কিন্তু লোক বুঝে। আর প্রোটেকশন কে দেবে বলুন, এদের কাছে পুলিশও অসহায়। পাহাড় জঙ্গল ওরা নিজের করতলের মতো চেনে, পুলিশ চেনে না। আমাকে মাঝে মাঝে এটুকু রিস্ক নিতেই হয়।

বিশ্বদেব হাসল, বলল, আপনার মতো বয়সে আমিও রিস্ক নিতে ভালোবাসতাম। কিন্তু আজকাল কেন যেন ভয় জিনিসটা বেড়ে গেছে। একটু আধটু রাজনীতি করি, সেটাই

বোধহয় কাল হয়েছে। একটু চা খান। চা, না কফি?

যে কোনওটা। আমার নেশা নেই, চয়েসও না।

রিমোট কলিংবেল টিপে চায়ের সংকেত ভিতর বাড়িতে পাঠিয়ে দিল বিশ্বদেব। তারপর বলল, আগামীকাল একবার আসতে পারবেন?

কখন বলুন।

সন্ধের পর। ধরুন সাতটা বা সাড়ে সাতটা!

পারব।

আপনার কাগজপত্রও আনবেন। দেখি যদি ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে পারি।

ভাববেন, অবশ্যই ভাববেন। পৃথিবীর যে সংকট ঘনিয়ে আসছে তা নিয়ে সিরিয়াসলি আমাদের ভাবা উচিত। কয়লা, ডিজেল পোড়ানো, এসি চালানো, কলকারখানার অত্যধিক বিস্তার, গ্রিনহাউস গ্যাসের যত এমিশন হবে তত বাড়বে ওয়ার্মিং, তত বাড়বে পলিউশন, প্লিজ একটু ভাববেন।

বিশ্বদেব মাথা নেড়ে বলল, অবশ্যই।

চা নিয়ে এল বলরাম, এবাড়ির কাজের লোক, ট্রে টেবিলে রেখে বলল, মা একটু ডাকছেন আপনাকে।

বিশ্বদেব অলকের দিকে চেয়ে বলল, আপনি চা খান, আমি এখনই আসছি।

বাইরের ঘরেই অপেক্ষা করছিল রুচিরা। বলল, ছেলেটা কে বলো তো! কী চায়?

কেন? একটা কাজে এসেছে।

চেনো?

চিনতাম না, তবে চেনা হল।

হুটহাট অচেনা ছেলে-ছোকরার সঙ্গে দেখা করার দরকার কী? গুন্ডার মতো চেহারা!

গুন্ডা! কী যে বলো! গুন্ডার মতো হবে কেন?

কি জানি বাপু, স্বস্তি ঘুরে গিয়ে বলল, মা দ্যাখোগে যাও, বাবার সঙ্গে একটা গুন্ডার মতো ছেলে দেখা করতে এসেছে।

দূর! ও একটা ভালো কোম্পানিতে চাকরি করে। কিছু খারাপ নয়। আমি তো লোক চরিয়েই খাই, নাকি?

দ্যাখো বাপু, দিনকাল ভালো নয় কিন্তু।

হঠাৎ ওকে দেখে স্বস্তি ভয় পেল কেন? ছেলেটাকে তো আমার বেশ ভালোই লাগছে, শিক্ষিত ছেলে ভাবনচিন্তা করে।

চেহারাটা দেখে অবশ্য খারাপ বলে মনে হচ্ছে না আমারও। স্বস্তি কী ভেবে বলল কে জানে।

রুচিরা ভিতরে চলে যাওয়ার পর বিশ্বদেব বারান্দায় এসে দেখে অলক একইভাবে বসে আছে। চা ছোঁয়নি। গভীরভাবে অন্যমনস্ক।

চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে মশাই, খেয়ে নিন।

অলক একটু চমকে উঠে বলল, হ্যাঁ, নিই।

আপনাকে কোনও সাহায্য করার দরকার হলে বলবেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

তা জানি, এখানে সকলে আপনার প্রশংসাই করে। আপনি এ শহরের জন্য অনেক কিছু করেছেন।

কী আর করলাম বলুন। টাকা নেই, কো-অপারেশন নেই, কো-অর্ডিনেশন নেই, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে করাপশন। ইচ্ছে থাকলেও ভালো কিছু করা প্রায় অসম্ভব। কন্ডিশন ফেবারেবল হলে এ শহরের ভোল আমি পালটে দিতে পারতাম।

চায়ের কাপটা রেখে অলক বলল, এবার আমি আসি?

বিশেষ তাড়া আছে নাকি?

একটু আছে। নার্সিংহোমে একজনকে দেখতে যাব।

কোন নার্সিংহোম?

অলক হেসে বলে, আপনার নার্সিংহোম।

ওঃ, কে বলুন তো?

হেডমিস্ট্রেস মৃন্ময়ী ভট্টচার্যের মেয়ে রাখি।

বিশ্বদেব একটা ঢোঁক গিলে বলে, আপনি ওঁদের চেনেন?

সামান্য আলাপ আছে। দিদিমণি আমাকে কয়েকটা ব্যাপারে সাহায্য করেছেন।

ওঃ, আচ্ছা আসুন।

কাল আমি সন্ধেবেলা কাগজপত্র নিয়ে আসব।

হ্যাঁ, আসবেন।

অলক চলে যাওয়ার পর বিশ্বদেব খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তিন

নার্সিংহোমটার মালিক যদিও তার বাবা, তবু কর্মচারীরা সবাই চন্দ্রজিৎ ওফে বাবলুকে চেনে না। সে কলকাতায় থাকে, এখানে এলেও কদাচিৎ নার্সিংহোমে আসে। সেটা একদিক দিয়ে রক্ষে।

সে রিসেপশনে গিয়ে দাঁড়াল। এ শহরের সবচেয়ে নামজাদা এবং ব্যস্ত নার্সিংহোম। ফলে রিসেপশনে বেশ কয়েকজন লোকের জমাট ভিড়। একটু অপেক্ষা করে সে অবশেষে

কাউন্টারে গিয়ে জিগ্যেস করতে পারল, আমি পিউ মজুমদারে সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তরুণী রিসেপশনিস্ট খুব একটা পাত্তা দিল না, বলল, একটু অপেক্ষা করুন। উনি এখন রাউন্ডে আছেন। সময়মতো খবর দেওয়া হবে।

আমি ওর কাছে যেতে চাই।

সেটা সম্ভব নয়। ভিতরে যাওয়ার নিয়ম নেই।

আমি একজন ডাক্তার, একটু বিশেষ দরকার ছিল। ওঁর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

মেয়েটি ঠান্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, বলছি তো, রাউন্ড শেষ হলেই খবর দেব।

বাবলু কথা বাড়াতে সাহস পেল না। নিজের পরিচয় দিয়ে সে ঢুকতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হবে। সে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে এসে মোবাইলে পিউকে ধরল।

পিউদি, প্রবলেন।

কী হল?

রিসেপশন আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।

আচ্ছা, তুমি কী বলো তো! নিজের পরিচয় দিয়েই তো গটগট করে ঢুকতে পারো, কে বারণ করবে?

না, না, বাবা আমাদের প্রোটোকল মানতে শিখিয়েছেন। ওটা করা ঠিক হবে না। এটা ভিজিটিং আওয়ার্সও নয়।

দাঁড়াও, আমি নীচে আসছি।

আসতে হবে না। রাখির কন্ডিশনটা কী?

ডাক্তারি ভাষায় বলব?

বলো।

সেমি কোমাটিক। ব্লাড টেস্টে পয়জন অ্যানালাইজিং এখনও হয়নি। মনে হয় ওভারডোজ অফ অ্যালজোলাম।

রেসপন্ড করছে?

না। এখনও ক্রিটিক্যাল। কেবিনে যাবে?

কেউ দেখে ফেলবে না তো!

না যাওয়াই ভালো। মৃন্ময়ীদি এখনও বোধহয় রাখির কেবিনে রয়ে গেছেন। ভিজিটিং আওয়ার চল্লিশ মিনিট আগে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু জানোই তো, উনি ইনফ্লুয়েনশিয়াল মানুষ, ওকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। আমিও তো ওঁর ছাত্রী।

মৃন্ময়ীদি নাকি বলছেন যে, এটা অ্যাটেম্পট টু মার্ডার?

তাই তো শুনছি।

পুলিশ কী বলছে?

পুলিশ কি কিছু বলে? গোমড়া মুখে আসে যায়। শিবদাস দারোগা হল গোমড়ামুখোদের মধ্যেও যেন আরও গোমড়ামুখো। লোকটাকে কখনও হাসতে দেখিনি।

রাখির মাথার উন্ডটা দেখেছ?

হ্যাঁ। ডিপ উন্ড।

স্ক্যান হয়েছে?

হয়েছে। রিপোর্ট দেয়নি এখনও। অত ভেবো না। পেটে যা টকসিন ছিল তা বের করে দেওয়া হয়েছে। স্যালাইন গ্লুকোজ চলছে। ইউরিনের সঙ্গে খানিকটা বেরোবে।। অ্যান্টিডোট দেওয়া হচ্ছে। বয়স কম, শি উইল কাম অ্যারাউন্ড। ডায়ালিসিস আরম্ভ হয়েছে।

জানি। কেসটা হয়তো ফ্যাটাল নয়। কিন্তু আমার কেসটা ফ্যাটাল।

তোমার আবার কী কেস?

বুঝতে পারছি না রাখির এই ঘটনার কারণ আমি হতে পারি কিনা। আমাকে মৃন্ময়ী কোনওদিন পছন্দ করতেন না। ইদানীং রাখি করছে না। ব্যাপারটা কি পিউদি?

ভাবছ কেন? মেয়েটা সেরে উঠুক তারপর কথা বলে দেখো।

আমাকে কালকেই ফিরে যেতে হবে। উপায় নেই।

চলে যাও। টেনশন কোরো না। ফোনে আমার কাছ থেকে জেনে নিও।

সে তো জানবই। কিন্তু আমার অনেক হিসেবনিকেশ উলটে গেল।

কিছু উলটে যায়নি। এ বয়সে ওরকম মনে হয়। মন খারাপ কোরো না তো!

ঠিক আছে পিউদি।

শোনো, বেলা দুটো আড়াইটের সময় একবার এসো। আমি ব্যবস্থা করে রাখব, যাতে চুপটি করে রাখিকে দেখে যেতে পারবে।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

বাবলু নার্সিংহোমের বাইরে এসে একবার বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল। চারতলা চমৎকার আধুনিক প্ল্যানিং-এর বাড়ি। তিনটে উইং। ভিতরে অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতিতে সাজানো ব্যবস্থা। শোনা যাচ্ছে, আরও সব যন্ত্রপাতি আসছে। নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার নভোজিৎকে দেশে আটকে রাখার জন্যই তার বাবা বিশ্বদেব নার্সিংহোমটা করেছেন। বাবলুর এখনও বড় ডাক্তার হতে ঢের দেরি। তবে সে বিদেশেই সেটল করবে বলে ঠিক করে রেখেছে।

নার্সিংহোমের সামনে বিস্তীর্ণ বাগান। চমৎকার ফুলটুল ফুটে আছে।

মাঝখানে চওড়া কংক্রিটের রাস্তা। অত্যন্ত দেখনসই ব্যাপার। নার্সিংহোমটা চলেও বেজায় ভালো। চট করে জায়গা পাওয়া যায় না।

বাবলু নার্সিংহোমটার দিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন চেয়ে রইল। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল।

বাড়িতে ঢুকবার মুখে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল সে। পুলিশ এল নাকি?

বারান্দায় দুজন সাদা পোশাকের অফিসার। এদের চেনে বাবলু। রমেন আর দীপক।

একটু থমকে বলল, কী হয়েছে?

রমেন গম্ভীর মুখে বলল, বড়বাবু ভেতরে অপেক্ষা করছেন। যাও।

শিবদাসের চেহারাটা একটু রুক্ষ এবং শুষ্ক। বেশ লম্বা হাড়েমাস চেহারা, ভুঁড়ো গোঁফ আছে। মুখে হাসি বা স্মিতভাব কখনও দেখা যায় না। চেহারার মতো স্বভাবটাও কেঠো এবং রসকষহীন। তবে হাঁকডাক নেই, রগচটা মানুষ নন, ঠান্ডা মাথার বিচক্ষণ মানুষ।

অন্য সোফায় মা, বউদি আর স্বস্তিও বসে আছে। চুপ, উদ্বিগ্ন।

শিবদাস বললেন, তোর জন্যেই বসে আছি।

কেন শিবদাসকাকু, কী হয়েছে?

তেমন কিছু নয়। কয়েকটা কথা জানার আছে। তবে এখানে নয়, একটু বাইরে চল।

মা উদ্বেগের গলায় বলে, কোনও চার্জ নেই তো!

শিবদাস উদার গলায় বলেন, আরে না, ওসব নয়। কতগুলো ক্লারিফিকেশনের ব্যাপার আছে। কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। আধঘণ্টা বাদেই ফেরত আসবে।

বাবলু শিবদাসের পিছুপিছু গিয়ে জিপে উঠল।

থানায় নিজের ঘরে মুখোমুখি চেয়ারে বসিয়ে শিবদাস বলল, ব্যাপারটা কী রে?

কোন ব্যাপার?

তোর আর রাখির মধ্যে কোনও অ্যাফেয়ার আছে নাকি?

বাবলু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ছিল।

ছিল মানে, এখন নেই?

হ্যাঁ।

পরিষ্কার করে বল, তোদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে?

না। রাখি অ্যাভয়েড করছে।

কেন?

জানি না।

তুই কাল ঠিক কখন রাখিদের বাড়ি গিয়েছিলি?

বেলা দেড়টা-দুটো।

কী হয়েছিল? এনি শো-ডাউন?

না। ওর সঙ্গে আমার দ্যাখা হয়নি।

কিন্তু রাখি তো বাড়িতে ছিল।

ছিল, কিন্তু দরজা খোলেনি, সম্ভবত কি-হোল দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েছিল।

ভালো করে ভেবে দেখিস, কোনও খাড়াখাড়ি হয়েছিল কি না, মেয়েটা তো অকারণে সুইসাইড অ্যাটেম্প করতে পারে না।

ও কেন এ কাজ করল আমি জানি না। বেশ কিছুদিন হল আমি ফোন করলে ও দু-একটা কাটাকাটা কথা বলে ফোন রেখে দেয়।

যদি মেয়েটা বেঁচে যায় তাহলে ঝামেলা নেই। কিন্তু বাইচান্স মারা গেলে তোকে আবার ডাকতে হবে। মৃন্ময়ী দিদিমণি এটাকে মার্ডার মনে করছেন।

ও ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।

কলকাতায় যাচ্ছিস কবে?

কালই যেতে হবে।

যা। আর মনে রাখিস, রাখি বেঁচে উঠলেও এখন কিছুদিন ওর সঙ্গে কমিউনিকেট করিস না।

কেন কাকু?

ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড হয়ে উঠতে পারে।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কতগুলো সত্য আছে যা খুব ক্রুয়েল। এই যেমন তোর আর রাখির ব্যাপারটা। রাখি যদি তোকে না চায় তাহলে স্পোর্টসম্যানের মতো ব্যাপারটা মেনে নেওয়াই তো ভালো। না হলে তোর বিরুদ্ধে আমাকে ব্যবস্থা নিতে হয়। ইভটিজিং-এর দায়ে। সেটা তোর ফ্যামিলির পক্ষে সম্মানজনক হবে কি?

কেউ কি এরকম কোনও কমপ্লেন করেছে?

মৃন্ময়ী দিদিমণি ওরকমই একটা হিন্ট দিয়ে রেখেছেন।

উনি আমাকে পছন্দ করেন না জানি। কিন্তু এতটা করবেন তা জানা ছিল না।

তুই একজন ব্রাইট ইয়ংম্যান। কাঁচা বয়স। এ সব কাফ লাভের তেমন কোনও দাম নেই। বরং কিছুদিন দূরে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আপনি বলছিলেন, রাখী মারা গেলে ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড হবে। কেন কাকু?

সেক্ষেত্রে সুইসাইড না হয়ে মার্ডার বলে প্রমাণ হলে আমাদের তদন্ত করতে হবে। তখন বোধহয় তোকেও ফের টেনে এনে নতুন অ্যাঙ্গেলে তদন্ত করার প্রয়োজন দ্যাখা দেবে। তবে রাখী বেঁচে যাবে বলেই মনে হয়। তোকে সাবধান করে দেওয়া দরকার বলেই ডেকে এনেছি। কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম হার।

আমি এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

আমিও না। এখন বাড়ি যা।

আমার অ্যাবসেন্সে এমন কী ঘটল যে সব সম্পর্ক পালটে গেল! আমাকেই বা আপনি এসব বলছেন কেন? কাকু, ব্যাপারটা খোলাখুলি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

বোঝানোর কিছু নেই রে পাগলা। শুধু বলি, কলকাতায় ফিরে যা, লেখাপড়ায় মন দে, এখানকার ঘটনা-টটনা ভুলে যা।

তাই কী হয় নাকি কাকু? ইচ্ছে করলেই সব ভুলে যাওয়া যায়?

চেষ্টা কর। তুই তো মানী লোকের ছেলে। আত্মসম্মানবোধ তো তোরও আছে। একটা মেয়ে যখন তোকে রিফিউজ করছে তখন তুই তার পিছনে লেগে থাকবি কেন? কাজকর্মে মন দে, হৃদয়ের ব্যাপার স্যাপার ভুলে যেতে সময় লাগবে না।

আমি বাচ্চা ছেলে নই কাকু যে, ওভাবে আমাকে ডাইভার্ট করবেন। রাখিকে না হয় আমি ডিস্টার্ব করব না, ব্যাপারটাও ভুলবার চেষ্টা করব, কিন্তু তা বলে কারণটা না জেনে তো সেটা করতে পারি না। এর কারণটা কী তা আমাকে জানতেই হবে।

এখন বাড়ি যা, মাথা ঠান্ডা কর।

চার

আপনাকে আজ রিলিভড দেখাচ্ছে। তার মানে কি রাখি এখন আউট অফ ডেঞ্জার?

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বললেন, না। ডাক্তাররা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হচ্ছে না সেটা ঠিক। তবে হার্ট আর কিডনিতে কিছু প্রবলেম ডেভেলপ করেছে বলে শুনছি।

এখানকার ডাক্তাররা ভালো বলেই তো জানি।

হ্যাঁ। তাঁরা ভরসা দিচ্ছেন। তুমি বুঝি আজ রাখিকে দেখতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, দুপুরবেলা।

দুপুরবেলা! ও সময়টায় তো ভিজিটিং আওয়ার নয়।

না। বলেকয়ে ঢুকে গিয়েছিলাম।

বলেকয়ে? সেটা আবার কিরকম?

ভিজিটিং আওয়ারসে ভিড় হয়, অপেক্ষা করতে হয়। অন্য সময়ে ওসব ঝামেলা থাকে না। দারোয়ানকে মিষ্টি কথায় রাজি করানো যায়।

আর ধরা পড়লে?

আমি খুব একটা বীরত্ব দ্যাখাতে যাই না। ভদ্রভাবে, বিনীত গলায় কথা কইলেই দেখি কাজ বেশি হয়।

অন্যসময় হলে নার্সিংহোমের নিয়ম ভাঙার জন্য তোমাকে হয়তো বকতুম। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। রাখিকে দেখে তোমার কী মনে হল বলো তো! বাঁচবে মনে হয়?

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই বাঁচবে।

শুধু মুখ দেখেই বলছ?

মুখেও তো কিছু ছাপ থাকে!

তার মানে?

শরীরে ভিতরকার জ্বালা-যন্ত্রণা বা অসুখের একটা ইমপ্রেশন মুখে প্রকাশ পায়।

কী জানি বাপু, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

একটা কথা জিগ্যেস করব?

কী বলো তো।

আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

মনের করার মতো কথা কি?

একটু সেনসিটিভ হয়তো।

হোক গে, বলো।

রাখির বাবাকে কি একটা খবর দেওয়া উচিত নয়?

মৃন্ময়ী একটু অবাক হয়ে অলকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, তার দরকার নেই। সে তো আর আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি।

কিন্তু এটা তো একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। উনি হয়তো পরে জানতে পেরে দুঃখিত হবেন। হয়তো অভিমান করে আছেন বলে সম্পর্ক রাখেন না। খবর পেলে হয়তো এসে হাজির হবেন।

মৃন্ময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তাঁকে আমি ভালোই চিনি। অনেক বছর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমাদের সম্পর্কে কোনও আগ্রহ থাকলে খোঁজখবর তো করত। তাকে খবর দেওয়ার মানেই হয় না।

আপনি যদি রাগ না করেন বলি, আপনি কি কখনও তাঁর খোঁজ করেছেন?

তা করিনি সত্যি। তেতো সম্পর্কের জের টেনে কী হবে বলো।

সে তো ঠিক কথাই।

তাছাড়া সে চলে যাওয়ার পর কোথায় গেছে কী করছে, এমনকী বেঁচে আছে কি না তাও তো জানি না। তোমার বোধহয় কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছে না।

কথাগুলো ভালো লাগারও তো কথা নয়। নিষ্ঠুর সত্য। আমাদের সবাইকেই জীবনে এরকম কিছু সত্যকে মেনে নিতে হয়। ভালো না লাগলেও। তিনি ঠিক কীরকম মানুষ ছিলেন, ডমিনেটিং?

না, না, বরং উলটোটা। মুখচোরা, লাজুক গোছের।

আমিও সেরকমই শুনেছি।

কার কাছে শুনেছ?

লোকের কাছে। রাখির কাছেও।

মুখচোরা, লাজুক এবং অনেস্ট, ঠিক কথা। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন আনকেয়ারিং, ক্যালাস এবং অলস। স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার সম্পর্কটাই গড়ে উঠল না তার সঙ্গে আমার।

রাখি কি তাকে মিস করে?

করারই কথা। আফটার অল বাবা তো! তবে আগে যতটা করত ততটা তো আর এখন নয়। ভুলে গেছে। রাখি কি তার বাবার কথা তোমাকে কিছু বলেছে অলক?

সামান্যই।

লোকে যা বলে তাকে গুরুত্ব দিও না। বেশিরভাগ লোকই স্ক্যান্ডাল ভালোবাসে। অ্যাপারেন্টলি রমেন ভট্টাচার্যকে ভালো লোক মনে হলেও আমি তার অন্য রূপটাও জানি।

সেটা বোধহয় খুবই খারাপ?

হ্যাঁ, ভীষণ খারাপ। প্রসঙ্গটা আজ থাক অলক।

আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম রমেনবাবুকে এ সময়ে একটা খবর দেওয়া বোধহয় দরকার।

খবর দিতে চাইলেও উপায় নেই। সে কোথায় আছে তা জানি না।

আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তুমি! তুমি কী করে জানবে?

অলক একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, আমি তাঁকে চিনি।

চেনো! মাই গড, তুমি রমেনকে চেনো? কীভাবে?

আপনি তো জানেন যে, রমেন ভট্টাচার্য একসময়ে দারুণ ছাত্র ছিলেন। নকশাল মুভমেন্টে আক্টিভিস্ট হওয়ায় লেখাপড়া ছাড়তে হয়।

জানি। জানব না কেন?

ফিজিক্স অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন, ডিভোর্সের পর উনি দিল্লি থেকে এমএসসি করেন।

এতদিন পর?

এরপর চাকরি ছেড়ে বিদেশে যান। ভালো জার্মান জানতেন বলে সুবিধে হয়ে যায়। একটু বেশি বয়সে পিএইচডি করেন। তারপর গবেষণা। এখন গ্লোবাল ফ্রেন্ড-এর ইস্ট এশিয়ার ওয়ান অফ দি ডিরেক্টরস।

খুব ভালো চাকরি বোধহয়!

খুব। বেশিরভাগ সময়ে ম্যানিলা আর টোকিয়োয় থাকেন।

বিয়ে করেনি?

না। কাজপাগল মানুষ।

আগে খুব কুঁড়ে ছিল।

মনের মতো কাজ পেলে আলস্য থাকে না।

রমেন ভট্টাচার্যের উন্নতির গল্প শুনে আমার কী হবে বলো।

কথায় কথায় বলে ফেললাম বটে, ভাবছি না বললেই হত।

না ঠিকই করেছ। এক সময়ে তার ঘর করেছি, সেটা তো আর মুছে ফেলতে পারি না। তবে রাখির ব্যাপারে তাকে টেনে আনার কোনও দরকার নেই। তুমি তাকে কতটা চেনো?

ভালোই চিনি। ইন ফ্যাক্ট তিনি আমার এখনকার ওয়ার্ক প্ল্যান অ্যান্ড প্রোগ্রাম ঠিক করে দিয়েছেন। এখানে যে একটা ন্যাচারাল প্রসপেক্ট আছে সেটা তিনিই প্রথম কোম্পানিকে জানান।

তোমাদের কোম্পানি কি খুব বড়?

হ্যাঁ। খুব বড়, তবে যতটা বড় ততটা বিজ্ঞাপিত নয়। গ্লোবাল ফ্রেন্ড শুধু লাভ করার জন্য কাজ করে না। তাদের আসল লক্ষ্য পৃথিবীর কল্যাণ। কনসালটেনসি এবং ওয়েলফেয়ার কাউনসেলিংকে ভিত্তি করেই তাদের যত কর্মকাণ্ড। কোর গ্রপে কয়েকজন সায়েন্টিস্ট-এর সঙ্গে কয়েকজন ফিলজফার, ইকনমিস্ট এবং ইকোলজিস্ট যেমন আছেন, তেমনি আছেন কবি-লেখক, পেইন্টার এবং সাংবাদিকও। এঁদের সকলের গুরুত্বই কিন্তু সমান। আচ্ছা থাক, এ সব কথা হয়তো আপনার এখন বোরিং লাগবে।

না, শুনে ভালো লাগছে। তবে আমার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ, ভালো কথার ওজন বুঝতে সময় লাগবে। শুনলাম তুমি বিশ্বদেববাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে!

হ্যাঁ

কেন?

উনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। অনেক আগেই ওঁর সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত ছিল।

কী কথা হল?

কাজের কথা। উনি আজ রাতে আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। আমার বিষয়টাতে উনি বেশ ইন্টারেস্ট নিলেন।

ভালো। বিশ্বদেবকে যদি ব্যাপারটা বোঝাতে পারো তবে উনি প্রাণপণে তোমাকে সাহায্য করবেন।

সেটা জানি।

লোকটাকে কেমন লাগল?

ভালোই তো?

একটু চুপ করে থেকে মৃন্ময়ী আনমনা হয়ে বলে, বিশ্বদেব খুব ভালো। আমার স্কুলের জন্য যখনই যা করতে বলেছি, করেছে। এ শহরটার অনেক দৈন্য আর অব্যবস্থা দূর করেছে।

হ্যাঁ, ওঁর বেশ সুনাম আছে।

দুর্নামও শুনতে পাবে। নার্সিংহোমটা নিয়ে কম কান্ড হয়েছে? কেউ কেউ তো বলেছিল ওটা নাকি চুরির টাকা। মিউনিসিপ্যালিটির টাকা গাপ করে নার্সিংহোম হয়েছে। অথচ লোকের অজানা নেই যে, বিশ্বদেবের বেশ প্রফিটেবল একটা বিজনেস আছে। আর নার্সিংহোম তো হয়েছে ব্যাংকের লোন নিয়ে। এদেশে কেউ কোনও ভালো লোককেও সহ্য করতে পারে না। যেন ভালোটাই খারাপ।

অলক একটু হাসল। তারপর বলল, তাহলে কি রমেনদাকে কিছুই জানাব না?

তোমার সঙ্গে বোধহয় রমেনের খুব যোগাযোগ আছে।

বললাম তো, আমাদের প্রোগ্রামের ডাইরেকটিভস উনিই দেন। রোজই কথা হয়।

আমাদের কথা জানতে চায় বোধহয়?

না। উনি কখনও আপনার বা রাখির কথা জানতে চাননি।

বাঃ বেশ। তাহলে আমাদেরই যা জানানোর কী দায়?

আপনি না চাইলে জানানোর প্রশ্নই নেই।

তবে কথাটা তুললে কেন অলক? যা চুকে বুকে গেছে তাকে ফের খুঁচিয়ে তোলার কোনও অর্থই নেই। তাই না?

সিচুয়েশনটা সিরিয়াস বলে মনে হয়েছিল, তাই ভেবেছিলাম, ওঁকে জানানোটা বোধহয় প্রয়োজন।

অলক আর বসল না। অস্পষ্টভাবে 'আজ আসি' বলে উঠে চলে গেল।

অলক চলে যাওয়ার পর মৃন্ময়ী অনেকক্ষণ পাথরের মতো নিস্পন্দ বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে বিশ্বদেবের মোবাইলে ফোন করলেন।

ফ্রি আছো? কথা বলতে পারবে?

পারব। কী হল, গলা অত উত্তেজিত কেন?

উত্তেজিত নই, উদ্বিগ্ন।

কেন? আমি তো খবর নিয়েছি। রাখি ইজ কামিং অ্যারাউন্ড।

রাখির জন্য নয়।

তাহলে?

তুমি তো অলককে চেনো!

পরিচয় হয়েছে। ব্রাইট, ডেডিকেটেড ছেলে।

দুটো ব্যাপার বলছি। মন দিয়ে শোনো। ওর সঙ্গে রাখির চেনা আছে। পিকনিক করতে গিয়ে ওদের পরিচয় হয়। দু-একবার বাড়িতে এসেছে। ছেলেটাকে আমার বেশ ভালো লেগেছিল।

হ্যাঁ, ভালো লাগার মতোই তো ছেলে।

কিন্তু তুমি কি জানো যে, রমেন ভট্টাচার্য ওর বস!

সে কী? রমেন তো সরকারি চাকরি করত!

আমরা তো আর তার খোঁজ রাখিনি। রমেন অবশ্য বরাবর ভালো ছাত্র ছিল। নকশাল হয়ে পড়াশুনো ছাড়ে। ডিভোর্সের পর নাকি চাকরি ছেড়ে পড়াশুনো শুরু করে। বিদেশে গিয়ে পিএইচডি করেছে। এখন গ্লোব্যাল ফ্রেন্ডে বড় চাকরি করে।

খুবই অবাক কাণ্ড। রমেনের বয়স কত হল বলো তো!

আমার সমান। তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন।

বুঝলাম। কিন্তু তোমার উদ্বেগের কী আছে?

আছে। অলক রমেন ভট্টাচার্যকে চেনে, ভাবসাবও আছে। ভাবছি, আমাদের কথা আবার বলে দেয়নি তো!

রমেন এমনিতে চাপা স্বভাবের মানুষ। তবে বলা যায় না।

আজ অলক খুব ধরেছিল রাখির ঘটনাটা রমেনকে জানানোর জন্য। আমি রাজি হইনি।

ঠিকই তো করেছ।

সেটা বুঝতে পারছি না। ধরো রমেন ভট্টাচার্য যদি সত্যিই রাখির বায়োলজিকাল বাবা হত, তাহলে আমি অত স্ট্রংলি অপোজ করতে পারতাম না। অলক হয়তো সেটাই দেখতে এসেছিল, আমি আপত্তি করি কি না। হয়তো ও জানে যে রাখি রমেনের মেয়ে নয়। কার মেয়ে সেটাও হয়তো জানে।

ঘাবড়ে যেও না। শুধু হানচ থেকে ডিডাকশন করা ঠিক নয়। চুপচাপ থাকো।

আমার মনে হচ্ছে, আমি মনের দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছি। মেয়েটার এই ঘটনা আমাকে এত ভেঙে ফেলেছে।

রাখির জন্য আমিও তো ভাবছি। কিন্তু মার্ডার অ্যাটেম্পট বলে তুমি শিবদাসকে ক্ষেপিয়ে তুলছ কেন?

আমার খুব মনে হচ্ছে, ওকে কেউ খুন করার চেষ্টা করেছে।

যে খুন করে সে এভাবে জটিল পথে করবে না। সে টপ করে কাজ সারবে। ছুরি মারবে, গুলি করবে বা গলা টিপে মারবে। বিষ খাওয়াতে যাওয়াটা বোকামি।

একটা কথা বলব? কিছু মনে কোরো না।

বলো।

ইদানিং জানতে পেরেছি, বাবলু আর রাখি প্রেমে পড়েছে। কী ঘেন্নার কথা বলো।

উড়ো কথা আমারও কানে এসেছে।

তুমি সামলাও। নইলে কী বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে বলো তো!

রাখি ভালো হয়ে উঠলে তুমি ওকে অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা কোরো।

কী বলে বোঝাব? নিজের পাপের কথা কবুল করব?

পাপ কেন হবে! পাপ বলছ কেন? রমেন ভট্টাচার্যের বাবা হওয়ার ক্ষমতা ছিল না, তাই তোমাকে অন্য পন্থায় মা হতে হয়েছে। পাপের কথা উঠছে কেন?

ওভাবে বোলো না। রমেনের বাবা হওয়ার ক্ষমতা তো পরীক্ষা করা হয়নি। তবে সে বাবা হতে চাইত না। ওই একটা ব্যাপারে তার বিরাগ ছিল। অতিরিক্ত বন্ধন সে পছন্দ করত না। এসব তো তুমি জানো।

ক্ষমতা ছিল না বলেই চাইত না। ঠিক আছে, প্রসঙ্গটা থাক। বলছি, এখন মাথা ঠিক রাখো। পরিস্থিতি জটিল করে তুললে মুশকিল হবে। অ্যান্ড ডোন্ট ক্রাই মার্ডার।

নইলে রাখি সুইসাইড করতে যাবে কেন বলো! এমন তো কিছু ঘটেনি যাতে মরতে হবে।

এখনকার জেনারেশনকে তুমি কতটা বোঝো? তুমি শিক্ষিকা বটে, কিন্তু জেনারেশন গ্যাপ অতিক্রম করা তো সহজ নয়। রাখির মনের খবর বা অ্যাটিচুড বা বাবলুর সঙ্গে কতটা ইনভলভমেন্ট তাও তো তুমি জানো না।

ওটা ঠিক কথা নয় বিশু। রাখির সঙ্গে আমি বন্ধুর মতোই মিশি। আমাদের মধ্যে খোলামেলা কথা হয়। ও আমাকে সব বলে।

তাহলে বাবলুর কথা বলেনি কেন?

হয়তো সময়মতো ঠিকই বলত।

মৃন্ময়ী, মায়েরা ওরকমই ভেবে নেয় ছেলেমেয়েদের। আর এটাই ভুল করে।

তুমি কি রাখিকে দেখতে গিয়েছিলে?

না। ইন ফ্যাক্ট, অফিস থেকে বেরিয়ে নার্সিংহোম হয়ে বাড়ি ফিরব বলে বেরোতে যাচ্ছিলাম, ঠিক এ সময়ে তোমার ফোন এল।

রাখি মাঝে মাঝে আমাকে একটা কথা জিগ্যেস করে।

কী কথা?

জিগ্যেস করে কার সঙ্গে ওর মুখের আদল বেশি মেলে। মা না বাবা।

তুমি কী জবাব দাও?

কী বলার আছে বলো। যার সঙ্গে ওর মুখের আদলের আশ্চর্য মিল তার কথা তো ওকে বলতে পারি না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বদেব বলে, সেটাই দুশ্চিন্তার কারণ মৃন্ময়ী। কখনও কি মিলটা রাখি খুঁজে পাবে? মাস ছয়েক আগে একটা মেয়ের বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য

এসেছিল আমার কাছে। খুব যেন অবাক চোখে বারবার দেখছিল আমার মুখ। একটু অস্বস্তি হয়েছিল আমার।

বলোনি তো।

মনের ভুলও হতে পারে। মনে পাপ আছে বলেই হয়তো। অস্বস্তি হচ্ছিল।

মৃন্ময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কী জানি কী হবে। যাও, একবারটি মেয়েটাকে দেখে এসো।

যাচ্ছি মৃন্ময়ী। চিন্তা কোরো না। ওর চিকিৎসার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। দরকার হলে কলকাতা থেকে স্পেশালিস্ট আনব। রাখিকে বাঁচতেই হবে।

পাঁচ

ভিজিটিং আওয়ার কেটে গেছে। রিসেপশনের বেশির ভাগ আলোই নেবানো। একটিমাত্র মেয়ে রিসেপশন সামলাচ্ছে। তার সামনে শিবদাস দাঁড়ানো, সঙ্গে আরও দুজন উর্দিধারী লোক।

শিবদাস যে! কী ব্যাপার!

আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

আসুন, আমার ঘরে আসুন।

নার্সিংহোমে নিজের সুন্দর করে সাজানো অফিসে নিয়ে গিয়ে শিবদাসকে বসিয়ে নিজের রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে বিশ্বদেব।

বলুন।

আজ একটা গুরুতর কথা বলতে আসা।

বলুন না।

রিগার্ডিং বাবলু।

বাবলুকে নিয়ে আবার কী হল?

আপনি কি জানেন যে বাবলু ওয়াজ ইন লাভ উইথ রাখি?

ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বিশ্বদেব বলে, হ্যাঁ এরকম একটা উড়ো খবর শুনেছি।

উড়ো খবর নয়। বাবলুর বন্ধুরা কবুল করেছে যে ব্যাপারটা সত্যি।

এরকম হওয়া বিচিত্র নয়। তবে ডিসগাস্টিং।

কথাটা হল, মার্ডার বা সুইসাইড যেকোনও চেষ্টা হয়ে থাকলে আমাদের একটা নিয়মমাফিক এনকোয়ারি করতেই হবে। সে ক্ষেত্রে লাভ অ্যাঙ্গেল বাদ যাবে না।

মেয়েটা সেরে উঠবে শিবদাস, ডাক্তাররা সেরকমই ভরসা দিচ্ছে। জ্ঞান ফিরলে ওকে জিগ্যেস করে দেখলেই হবে।

তবু কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখছি। পাবলিসিটি হয়তো পুরোটা এড়ানো যাবে না। বাবলুকে আমি একটু সাবধান করে দিয়েছি।

বাবলু কলকাতায় থাকে, এ ব্যাপারে তার দায় কতটা তা ভেবে দেখার ব্যাপার।

ইদানিং নাকি মেয়েটা বাবলুকে অ্যাভয়েড করছিল। বাবলু তাতে খুবই অ্যাজিটেটেড। ও মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। আমি ওকে বলেছি মেয়েটা যখন চাইছে না তখন ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। আপনিও বাবা হিসেবে ওকে কথাটা বুঝিয়ে দেবেন।

ঠিক আছে। আর কিছু?

হ্যাঁ, রিগার্ডিং সিকিউরিটি।

সিকিউরিটি!

হ্যাঁ। মৃন্ময়ী বলছেন এটা অ্যাটেম্পট অব মার্ডার। যদি তাই হয়, তাহলে রাখি হয়তো আততায়ীকে চেনে। সে ক্ষেত্রে যদি রাখি সারভাইভ করে, তাহলে আততায়ীর বিপদ। তাই আততায়ী রাখিকে আর একবার মার্ডার করার চেষ্টা করবে না কে বলতে পারে।

মাই গড, আমি তো এদিকটা ভাবিনি।

ভাববেন কেন? এ সব ভাবনা পুলিশের জন্য। আর আপনার নার্সিংহোমে পুলিশ মোতায়েন করার সুবিধে নেই। বড্ড ইজি অ্যাকসেস। হাসপাতালে একটা আইসোলেশনে হাই সিকিউরিটি ওয়ার্ড আছে। এখানে তো জানালায় গ্রিল অবধি নেই।

তা ঠিক, কিন্তু ট্রিটমেন্টটা এখানে বেটার হবে। যদি বলেন তো আমি চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারির ব্যবস্থা করতে পারি।

রিস্ক তবু থাকবেই। ডাক্তাররা অবশ্য রিমুভ করতে বারণ করছে। পয়জনিংয়ের ফলে নাকি হার্টটা খুব উইক। সামান্য শকে ফ্যাটালিটি ঘটতে পারে।

হ্যাঁ। কেসটা এখনও পুরো কন্ট্রোলে নেই।

শিবদাস বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর বিশ্বদেব রাখির কেবিনে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে রাখির দিকে চেয়ে রইল। চোখে একটু জল চিকচিক করছে।

একজন ডাক্তার এবং নার্স পিউ মজুমদার ঘরে ঢুকলে বিশ্বদেব অস্বস্তি বোধ করে।

ডাক্তার তাকে দেখে হেসে বলে, গুড মর্নিং স্যার। কেমন আছেন?

আপনিই তো একে দেখছেন?

হ্যাঁ।

কেমন মনে হচ্ছে?

বেঁচে যাবে বলেই তো মনে হয়।

সেটা কতদিনে বোঝা যাবে?

বলা মুশকিল। কোমাটা না কাটলে অ্যাসুয়েরেন্স দেওয়া যাচ্ছে না। হার্টটা নিয়েই প্রবলেম। কিডনি বেশ খানিকটা ড্যামেজড। তবে শি ইজ অ্যাপারেন্টলি ইমপ্রুভিং।

কোনও কথাটথা কি বলেছে?

না। কথা বলার মতো সিচুয়েশন আসেনি।

সারভাইভ্যাল চান্স কতটা?

ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর পিউ বলল, একটা কথা বলব স্যার?

বলো।

রাগ করবেন না। রাখি বেশ ভালো মেয়ে।

আমি জানি।

বাবলু ওকে ভালোবাসে।

বিশ্বদেব হঠাৎ হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলে, ওসব ভালোবাসাবাসির কথা আর বোলো না। আজকাল পাঁচ বছর প্রেম করার পর যে বিয়ে হয় তা পাঁচমাস টিকছে না। অল বোগাস।

কিন্তু--

বিশ্বদেব হাত তুলে পিউকে থামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলল, আজকাল এত ভালোবাসার কথা শুনি যে আমার অ্যালার্জি হওয়ার জোগাড়। মেয়েটা এখনও সিরিয়াস কন্ডিশনে পড়ে আছে, এটা কি ওসব কথা বলার সময়? তোমার কাণ্ডজ্ঞান কবে হবে?

পিউ থতমত খেয়ে বলে, সরি স্যার। বাবলু খুব ভেঙে পড়েছে দেখে বলে ফেলেছি।

আমি জানি, বাবলুর প্রতি তোমার একটা দিদিসুলভ টান আছে। ওকে বরং বুঝিয়ে বোলো, এখন এসব রোমান্টিক চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ক্যারিয়ারে মন দিক। কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশে যাবে, সেখানে বিস্তর পড়াশুনো করতে হবে। অন্য দিকে মন পড়ে থাকলে কী করে দাঁড়াবে? হৃদয়দৌর্বল্য কোনও কাজের জিনিস নয়, জঞ্জালবিশেষ। মানুষের বারোটা বাজায়, তার বিনিময়ে দেয় না কিছুই।

ঠিক আছে স্যার, আমি বাবলুকে বোঝানোর চেষ্টা করব।

বাড়িতে ফিরে বিশ্বদেব কিছুক্ষণ বাইরের খোলা অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ বসে রইল। পরিস্থিতি কি একটু ঘোরালো হয়ে উঠছে? কর্মফল বলে কিছু একটা আছে, যার ফল এখন নানাভাবে ফলছে! বিচক্ষণ বিশ্বদেব কখনও তাকে আর মৃন্ময়ীকে নিয়ে রসাল গুজব সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ দেয়নি। তাদের নিয়ে কোনও গুঞ্জন ওঠেনি এ শহরে। এতটাই সাবধান ছিল বিশ্বদেব। কিন্তু মেয়েটার মুখে তার অবিকল প্রতিকৃতি ফুটে উঠেছে। লোকে মিলিয়ে দেখলে অবাক হবে। তারপর রাখির হঠাৎ আত্মহত্যার এই চেষ্টা কি কোনওভাবে সেই অতীতকে আরও উন্মোচিত করে দেবে? এবং সেই সঙ্গে বিস্মৃতপ্রায় অতীত থেকে

অলকের হাত ধরে রমেন ভট্টাচার্যের পুনরাবির্ভাব কোন সংকেত দিচ্ছে? ঘটনাবলীর যে প্যাটার্ন অবলোকন করছে বিশ্বদেব তাতে মনে হয়, রাশ তার হাতে নেই। নিয়তি নির্দিষ্টভাবেই একটা নাটকীয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি তার জীবন?

গেটের বাইরে একটা মোটরবাইক এসে থামল। তারপর ফটক খুলে লম্বাপানা একটি যুবক সবল পায়ে এগিয়ে এল বারান্দার দিকে। অলক! আশ্চর্য, বিশ্বদেব ভুলেই গিয়েছিল যে, তার বাড়িতে আজ অলকের ডিনারের নেমন্তন্ন।

বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিয়ে বিশ্বদেব একটা উচ্চাঙ্গের হাসিতে তার উদ্বিগ্ন মুখের ছবি ঢাকা দিয়ে বলল, আরে, এসো, এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

অলক একটা বেতের সোফায় বসে বলল, আমি এমন কিছু ইম্পর্ট্যান্ট লোক নই যে, আমার জন্য আপনি বারান্দায় বসে অপেক্ষা করবেন।

বারান্দাটা আমার খুব প্রিয় জায়গা। এখান থেকে বাগানটা দেখা যায়। সারাদিন মানুষ চরিয়ে এসে একটু নির্জনে বসতে ইচ্ছে করে।

হ্যাঁ, আপনি যা ব্যস্ত মানুষ।

আজকাল ভাবি এত কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লেও পারতাম। পৌরসভা, ব্যবসা, নার্সিংহোম, সভাসমিতি। এখন বোরিং লাগে। তোমার মতো একটা কাজ নিয়ে থাকতে পারলে ভালো হত। পৃথিবী নিয়ে আর কতজন ভাবে বল। আমার ভাবনার দৌড় বড়জোর এই শহরটা।

এ শহরটা নিয়েও তো কাউকে ভাবতে হবে। সবাই পৃথিবীর সংকট নিয়ে ভাবতে গেলে তো চলবে না।

সে-ও ঠিক কথা। তোমার কাজের কতদূর?

কাজ! সে তো অনন্ত। কাজের কোনও শেষ নেই।

তোমার সার্ভে শেষ হয়েছে?

প্রফেশনাল সার্ভেয়াররা কাজে নেমেছেন। পাহাড় জঙ্গল ঘুরে সার্ভে এবং ম্যাপিং বেশ কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর ম্যানপাওয়ারও দরকার। আমরা গ্রামবাসীদের কিছু কাজে লাগিয়েছি। হঠাৎ রোজগারের সুযোগ পেয়ে তারা খুব খুশি।

আর উগ্রপন্থীরা?

আমরা তাদের অ্যাডভাইজার হিসেবে রাখছি। পার্টি ফান্ডে চাঁদাও দেওয়া হয়েছে। তারাও আপত্তি করছে না।

তোমার কিন্তু দুর্জয় সাহস।

না, না। এ সব হ্যাজার্ড সর্বত্র আছে। আমরা নেগোশিয়েট করতে শিখেছি। আমাদের তো পলিটিক্যাল অবলিগেশন নেই। সেই দিক দিয়ে গ্লোবাল ফ্রেন্ড কারও শত্রু নয়।

আমি ইন্টারনেট থেকে তোমাদের কোম্পানির কথা জেনেছি।

ভালো করেছেন।

তোমার সম্পর্কেও খোঁজ নিয়েছি।

অলক হেসে বলল, বেশ করেছেন। নেওয়াই উচিত।

তুমি আমেরিকায় থাকো, বলোনি তো?

বলার মতো কিছু নয়। কাজের জন্য থাকতে হয়।

বিয়ে করেছ?

না, আমি বিয়ে করলে বউ পালিয়ে যাবে। কারণ তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ এতই কম হবে যে, বাড়ি ফিরলে সে আমাকে হয়তো প্রথমে চিনতেই পারবে না। আমার মায়ের বয়স এখন বাষট্টি। আমি কুপুত্র বলে মায়ের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রায় ছিল না। আমার দুই দাদা আর দিদি বাইরে থাকেন। মা তাদের কাছেও যেতে চান না। অবশেষে চন্দননগরের বাড়িটার একতলায় ভাড়াটে বসিয়ে মাকে প্রায় জোর করে সিয়াটলে নিয়ে গেছি।

একা থাকতে পারেন?

সেটাই তো প্রবলেম ছিল। বুদ্ধি খাটিয়ে মাকে এই বুড়ো বয়সে একটা দোকান করে দিয়েছি। গ্রসারি শপ। বাড়ি থেকে এক ব্লক দূরে। আশ্চর্যের বিষয় মা কিন্তু দোকান পেয়ে মহাখুশি। গাড়ি লাগে না, সকালে ব্রেকফাস্ট করে দোকানে গিয়ে বসেন। খদ্দের সামলান, এবং ব্যাপারটা এনজয় করেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

বিশ্বদেব হেসে বলল, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে।

প্র্যাকটিক্যাল বলতে পারেন।

চা খাবে?

আমার কিন্তু চায়ের নেশা নেই।

ড্রিংক করো?

না।

তাহলে শুধু কাজের নেশা?

আমার কাজটা ইন্টারেস্টিং।

এখানে তোমার থাকা খাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে না তো?

অসুবিধে যেটা হয় তার কারণ আমি ভেজিটেরিয়ান।

সে কী? আগে বলোনি কেন? আজ তো বোধহয় আমাদের বাড়িতে মাংস আর মাছের আইটেমই হয়েছে।

নো প্রবলেম। আমি ডাল ভীষণ ভালোবাসি। ডাল ভাতই যথেষ্ট।

দূর পাগল! দাঁড়াও ভিতরে গিয়ে খবর দিয়ে আসি।

আমি সিম্পল খাওয়াই পছন্দ করি। একটু অসুবিধে হয় ট্রাইবাল এরিয়ায়।

তুমি ভেজিটেরিয়ান কেন?

বাই চয়েস। আমার পশু-পাখি খেতে ইচ্ছে করে না।

এ নোবল কজ!

বলতে পারেন। তবে অনিচ্ছেটা জেনুইন।

দাঁড়াও বাপু, গিন্নিকে বলে আসি। নইলে ডিনার টেবিলে উনি লজ্জায় পড়বেন।

কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে বিশ্বদেবকে আহাম্মক বনতে হল। শর্মিলা মৃদু হেসে বলল, উনি যে ভেজিটেরিয়ান সে তো আমরা জানি!

জানি! কী করে জানো?

শর্মিলা হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, স্বস্তি খবর এনেছে।

আহা, স্বস্তিই বা জানবে কী করে?

রুচিরা গম্ভীর হয়ে বলে, কেউ ওকে বলেছে হয়তো। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না, তোমার অতিথির সম্মানে আজ আমাদের পুরো ভেজিটেরিয়ান ডিনারই হচ্ছে। আর তাতে আমাদের তেওয়ারি ভীষণ খুশি।

যাক, একটা দুশ্চিন্তা গেল।

ফের বারান্দায় ফিরে এসে বিশ্বদেব দেখল, অলক নিঝুম হয়ে বসে আছে।

কী ভাবছ?

কিছুই না।

বোধহয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কথা!

সেটা ভাবতে হয় না, সর্বদাই মনে একটা ভয়ের মতো বাস করে।

তুমি বরং একটা সফট ড্রিংক নাও। শুধু মুখে বসে থাকছ ভালো দেখাচ্ছে না।

ব্যস্ত হবেন না। অনেক জায়গায় আমাদের দিনের পর দিন খাবার জোটে না। সফট ড্রিংকস আপনারাও খাবেন না। আল্টিমেটলি ওতে চিনি ছাড়া কোনও বিভারেজই থাকে না।

জানি। তবু তো সবাই বোতল বোতল খাচ্ছে।

তা ঠিক। তবে দেশে আগে যে সোডা বা লেমোনেড পাওয়া যেত তা অনেক ভালো ছিল।

ঠিকই বলেছ। সেই স্বাদ ভোলার নয়।

ফটক খুলে একটি মেয়ে ঢুকল।

স্বস্তি! কোথায় গিয়েছিলি?

একটি নীল চুড়িদারে স্বস্তিকে দারুণ দেখাচ্ছে। মুখে তেমন কোনও দৃশ্যমান প্রসাধন নেই, বাঁহাতের কবজিতে একটি পুরুষালি ঘড়ি ছাড়া কোনও আভরণও নেই। মিষ্টি গলায় বলল, নার্সিংহোমে। রাখিকে দেখে এলাম।

ও। কেমন দেখলি?

তুমি তো গিয়েছিলে আজ, পিউদি বলছিল।

হ্যাঁ।

একটু একটু তাকাচ্ছে কিন্তু। মনে হয় বেঁচে যাবে, না?

বাঁচবে।

ডাক্তাররা তোমাকে বলেছে?

হ্যাঁ। বয়সের জোর তো আছে। কমপ্লিকেশন কাটিয়ে উঠবে।

কিন্তু ওকে যদি হাসপাতালে শিফট করে?

দ্যাখা যাক শিবদাস অবিবেচক লোক নয়। ইচ্ছে করলে ওরা নার্সিংহোমে সিপাই রাখতে পারে। আমার আপত্তি নেই। এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আয়।

আমি ওকে চিনি। যদিও আলাপ নেই।

আলাপ কর না। ও হচ্ছে।

জানি। তোমার কাছেই তো শুনেছি। রাখির কাছেও।

অলক মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, রাখির সঙ্গে আমার একটা চান্স মিটিং হয়ে যায়, তারপর উই বিকেম ফ্রেন্ডস।

রাখি আপনার কথা আমাদের কাছে বলেছে। আপনি নাকি খুব মিশুকে মানুষ।

তা বলতে পারেন। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করারই চেষ্টা করি। আমরা যে গ্লোবাল ফ্রেন্ডস।

আপনি রাখির বন্ধু, রাখি কেন সুইসাইড করার চেষ্টা করল তা জানেন?

সেটা তো আমার জানার কথা নয়।

আন্দাজ করতে পারেন না?

না। উই আর নট দ্যাট ক্লোজ।

রাখি কিন্তু অন্য কথা বলে।

স্বস্তির গলা ওপরে চড়ছে দেখে বিশ্বদেব অস্বস্তিবোধ করে বলে, ও কী স্বস্তি? তুমি কি রাখির কারণে একে চার্জ করছ নাকি? ভুলে যেও না, অলক আজ আমাদের অতিথি।

স্বস্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, সরি বাবা। আই অ্যাপোলোজাইস। যাচ্ছি।

বলে স্বস্তি এক ঝটকায় পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

বিশ্বদেব বলল, কিছু মনে কোরো না অলক। আমার ছোট মেয়ে একটু মুডি।

না। মনে করার কী আছে। উনি হয়তো আর কিছু ভেবে নিয়েছেন।

রাখি ভালো মেয়ে। খুব তেজিও। জানো বোধহয়।

রাখির সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। পাহাড়ে একদল মেয়ে পিকনিক করতে গিয়েছিল, আমি তখন তাঁবুতে থাকতাম। সেই সময়ে হঠাৎ আলাপ হয়। আমার মিশন জেনে উনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন। খুব ইন্টেলিজেন্ট প্রশ্ন। তারপর কয়েকবার

বাড়িতে চা খেতে ডাকেন। এভাবেই একটা চেনাজানা তৈরি হয়ে যায়। আপনার মেয়ে হয়তো মনে করে সম্পর্কটা তার চেয়েও গভীর কিছু।

তাহলেই বা ক্ষতি কী?

ক্ষতি আছে।

কী ক্ষতি অলক?

আমি ঠিক ওরকম নই।

তোমাকে দেখেও আমার মনে হয়েছে তুমি লঘুচিত্ত নও। তুমি একজন ডেডিকেটেড ভলান্টিয়ার। এ কারেজিয়াস ম্যান। ইগনোর স্বস্তি, ওর কথায় কান দিও না।

ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি।

একটু বাদে খাওয়ার টেবিলে যখন দেখা হল তখন স্বস্তির মুখখানা থমথমে, তবে সে অলককে উপেক্ষার ভাব দেখাল না। প্রথমেই বলল, জানেন তো, আপনার সম্মানে আমরা সবাই আজ নিরামিষ খাব?

অলক বিস্মিত হয়ে বলল, তা কেন? আপনারা মাছ মাংস খেতেই পারেন।

নাঃ, আপনার একটা সম্মান আছে না?

আছে বুঝি! বলে অলক হোহো করে হাসল।

আর লজ্জায় রাঙা হয়ে কুঁকড়ে গেল স্বস্তি।

টুলু খুব মন দিয়ে লক্ষ করছিল অলককে। বলল, আপনি সিয়াটলে থাকেন?

ওটা আমার আস্তানা বলতে পারেন। কিন্তু থাকা আর হয় কই। কেবল ছোটাছুটি করে বেড়াতে হয়।

কোথায় কোথায় যেতে হয় আপনাকে?

যেখানে জল সেখানেই আমি। খাল, বিল, সমুদ্র, গ্লেসিয়ার, প্রাইমা ফ্রস্ট সবই আমার বিষয়।

জল নিয়ে গবেষণাটা কী ব্যাপার বুঝিয়ে বলবেন?

জলই তো ভবিষ্যতে সমস্যা হয়ে উঠবে। অতি জল এবং জলহীনতা। ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েকটা দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ডাঙায় দেখা দেবে জলকষ্ট। আবহাওয়া যাবে পালটে, এই ওলটপালটের জন্য দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাস। সভ্যতার বেহিসেবি অগ্রগমনের খাজনা দিতে হবে মানুষকে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ব্যাপার তো!

হ্যাঁ।

ঠেকাতে পারবেন?

মানুষের চৈতন্য হলে ঠেকানো যাবে।

আপনি যে দেশে থাকেন সেই আমেরিকাই তো সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস বাতাসে ছাড়ে।

হ্যাঁ। তারা কোনও নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না। ভোগবাদ টসকালে তারা বিগড়ে যায়।

আপনি প্রাইমা ফ্রস্টের কথা বললেন। কিন্তু সে তো শুধু পোলার রিজিয়নে পাওয়া যায় শুনেছি। তার মানে আপনি পোলার রিজিয়নেও গেছেন?

না গেলে চলবে কেন?

তার মানে গেছেন?

হ্যাঁ।

কোনটাতে?

অলক মৃদু হেসে বলে, দুটোতেই। এবং অনেকবার।

মাই গড!

পৃথিবীর যথার্থ অবস্থা বুঝতে গেলে দুটো পোলেই যাওয়া দরকার।

গিয়ে কী বুঝলেন?

আমি তো একা যাইনি। টিমের সঙ্গে গিয়েছিলাম। দলে অনেক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে। আমার কাজ ছিল কিছু অ্যানালাইসিস।

তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হত?

দক্ষিণমেরুতে অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে। খুব সাবধানে চলতে ফিরতে হয়। কোনও জন্তু-জানোয়ারের কাছে যাওয়া যায় না, কোনও বর্জ্য ফেলা যাবে না। এমন কী স্পিটিং-ও চলবে না। একজন মুখের চুইংগাম ফেলেছিল বলে তাকে দেড় ঘণ্টা ধরে সেটা খুঁজে বের করে পকেটস্থ করতে হয়েছিল। আমরা জাহাজে থাকতাম, তবে মোটোর স্লেজ-এ করে অনেকটা ভিতরে যেতে হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের একটা স্থায়ী ক্যাম্পও ওখানে আছে। সেখানেও কিছুদিন থেকেছি। অ্যান্টার্কটিকা ইজ এ ম্যাগনিফিসেন্ট প্লেস।

আর ঠান্ডা?

সাংঘাতিক। ঈশ্বরের কাছে আমাদের সকলের প্রার্থনা, আর্কটিকা বা অ্যান্টার্কটিকা যেন কখনও তার শীতলতা না হারায়, বরং আরও শীতল হয়। পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য তাদের ঠান্ডা থাকা দরকার।

এসব আমরা কিছু কিছু জানি। আপনার কোম্পানি এর অ্যান্টিডোট হিসেবে কী করতে চায়?

শুধু আমাদের কোম্পানি কেন, পৃথিবীর বহু সায়েন্টিস্ট এবং সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশন কাজ করছে। কিন্তু হিউম্যান হ্যাবিটস এবং বিহেভিয়র নিয়ন্ত্রিত না হলে কিছুই হওয়ার নয়। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে, বিশেষ করে থার্ড ওয়ার্ল্ডে হিউম্যান হ্যাবিট্যাট বাড়ছে, নগরায়ণ হচ্ছে, জঙ্গল সাফ করা চলছে। এমনকী ব্রাজিলের রেইন

ফরেস্টও রেহাই পাচ্ছে না। এর ফল ভয়াবহ। এখনও যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, গাছ কাটা বন্ধ না করা যায় তাহলে পৃথিবীর সাংঘাতিক বিপদ। ম্যালথাসের থিওরি অনুযায়ী প্রকৃতিই নির্মমভাবে লোকক্ষয় ঘটিয়ে ভারসাম্য আনবে। আমরা প্ল্যান করে জনসংখ্যা যদি না কমাতে পারি তাহলে প্রকৃতিই তা করবে, তবে সেটা ঘটবে অতি নিষ্ঠুরভাবে।

আপনি তো ভয় ধরিয়ে দিচ্ছেন মশাই!

হ্যাঁ, আমরা সাধারণ মানুষরা তো ভয় পাচ্ছিই, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানরা যে পাচ্ছেন না। আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না, ইউরোপ মানতে চায় না, পশ্চিম এশিয়া মানতে চায় না। এই পশ্চিমবঙ্গেই তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন যত ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে ততই জমি, তৃণভূমি, জঙ্গল লোপাট হবে, ততই ক্ষতি হবে পৃথিবীর।

আপনি জল নিয়ে কাজ করেন শুনেছি।

হ্যাঁ, জল আমাদের বন্ধু, আবার শত্রুও।

আপনি কী সায়েন্টিস্ট?

মৃদু একটু হেসে অলক বলল, সায়েন্টিস্ট বললে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। যেটুকু সায়েন্স জানলে চাকরিটা বজায় রাখা যায় সেটুকু জানি। আমরা উদ্বাস্তু, গরিব বাবা আমাকে যথাসাধ্য লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যতটা সচ্ছলতার প্রয়োজন ছিল, তা তো আমাদের ছিল না। ফলে লেখাপড়া বারবার বাধা পেয়েছে।

গ্লোবাল ফ্রেন্ড ইনকরপোরেটেড কি খুব বড় কনসার্ন?

হ্যাঁ। বিগ কনসার্ন।

টেকনিক্যাল লোক না হয়েও আপনি এখানে চাকরি পেলেন কীভাবে?

সে একটা মজার গল্প।

মজার গল্প? মজার গল্প শুনতে আমরা সবাই ভালোবাসি।

বিশ্বদেব এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে-ও বলল, হ্যাঁ, মজার গল্পটা শুনিয়ে দাও।

অলক বলল, রসায়নে এমএসসি পাশ করে আমি একটা ছোট মফস্বল শহরের কলেজে অধ্যাপনা করতাম। কিন্তু অধ্যাপনা মানেই সিলেবাসে আটকে যাওয়া। বিশ্বের বিজ্ঞানে রোজ নতুন নতুন থিয়োরি আসছে, পুরনো সংজ্ঞা পালটে যাচ্ছে, কত কী আবিষ্কার হচ্ছে। অধ্যাপনার জালে আটকে গিয়ে আর সেসবের খবরই রাখা হচ্ছিল না। তবে পাগলামিবশত আমি বিদেশি জারনালে আমার নানা ভাবনা চিন্তার কথা লিখে পাঠাতাম। বেশিরভাগই ছাপা হত না। তবে একটা-দুটো বেরিয়েও যেত। গ্লোবাল ফ্রেন্ডেরও বেশ কয়েকটি পত্রিকা বেরোয় আমেরিকায়। আমি তাদের পত্রিকাতেও লেখা পাঠাই। রিসার্চ গ্রুপের এক কর্তা হঠাৎ আমাকে একটা চিঠি লিখে জানালেন যে, তিনি

কলকাতায় আসছেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে খুশি হবেন। আমি গিয়েছিলাম। দেখলাম ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষ। আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গল্প করলেন। তার মধ্যে তিনি বারবার আমার ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। আমি তখনও বুঝতে পারিনি যে, উনি আসলে আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। শেষে আমাকে বললেন, আমাদের কোম্পানি কিছু পাগলকে রিক্রুট করতে চায়, যেসব পাগলের চিন্তার ধারা কোনও পূর্বসিদ্ধান্তের দ্বারা শৃঙ্খলিত নয়। মনে আছে তিনি ওয়াইল্ড থিংকার শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন।

তার পরই চাকরি?

প্রায় বারোমাস বাদে আমাকে চাকরি দেওয়া হয়।

কোথায় জয়েন করলেন?

সিয়াটলে।

সেখানেই সেটল করবেন?

জানি না। তবে থাকা তো আর হয় না। যেখানে যেখানে কোম্পানি কাজ পায়, সেখানেই ছুটতে হয়।

আর আপনার মা? তিনি কোথায় থাকবেন?

মায়ের কথা আর কী বলব। আমি কুপুত্র, তাই এই বুড়োবয়সে, যখন আমাকে তাঁর সবচেয়ে বেশি দরকার, তখন আমি তাঁর কাছে থাকতে পারি না। আর আমাকে ছাড়া মা-ও বড্ড অসহায় বোধ করত। সেই জন্য মাকে আমি সিয়াটলে একটা দোকান করে বসিয়ে রেখেছি। ছোট গ্রসারি শপ। এখন দেখছি, এই বাষট্টি বছর বয়সে মা দোকানটা নিয়ে দিব্যি মেতে আছেন। দোকান থেকে এক ব্লক দূরে আমাদের বাড়ি। কাজেই গাড়ি চালাতে না জানলেও মা-র অসুবিধে হয় না।

আপনি গ্রিনকার্ড হোল্ডার না সিটিজেন?

গ্রিনকার্ড। সিটিজেন হওয়ার ইচ্ছে নেই।

ফিরে আসার ইচ্ছে আছে তাহলে?

যাওয়া বা ফেরার কথা ভাবি না। আমি তো সারা দুনিয়ায় দৌড়ে বেড়াচ্ছি। যাওয়া বা ফেরা কোনওটাই বুঝতে পারি না। আর এই ছোটাছুটি করতে করতে কোনও বিশেষ দেশ নয়, পৃথিবীটাকেই আমার বড্ড ভালো লাগে। গোটা পৃথিবীটাই যেন আমার দেশ।

বিশ্বদেব বলল, দ্যাটস এ নোবল থট। আসলে পৃথিবীটাই তো আমাদের দেশ হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা ছোট করে ভাবি বলে যত গণ্ডগোল।

হঠাৎ টুলুর দিকে চেয়ে অলক বলল, আপনার রুগির কী খবর?

রুগি! কে রুগি বলুন তো!

আমি রাখির কথা জিগ্যেস করছি।

রাখি ঠিক আমার আন্ডারে নেই। মেডিসিনের লোকদের আন্ডারে আছে। তবে অপারেশনের দরকার হলে অন্য কথা। কেন, আপনি কি রাখিকে চেনেন নাকি?

ঠিক সেরকম চেনা নয়। উনি একটা দলের সঙ্গে পিকনিক করতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। আমরা তখন সেখানে তাঁবু ফেলে কাজ করছিলাম। উনি কৌতূহলী হয়ে এসে আলাপ করেন।

শুধু আলাপ?

হ্যাঁ। উনি আমাদের মোড অব অপারেশনস জানতে চেয়েছিলেন।

এটা কবেকার ঘটনা?

মাসখানেক আগে। তখনই মনে হয়েছিল কোনও কারণে উনি খুব আপসেট। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন।

টুলু অবাক হয়ে বলল, কেন আপসেট তা বলেছিল?

নট ইন সো মাচ ওয়ার্ডস। সদ্য চেনা কাউকে বলবেই বা কেন? আমিও ভদ্রতাবশে কৌতূহল দেখাইনি। শুধু বলেছিলাম, ওয়াচ ইওর স্টেপস। আপনি খুব আনমাইন্ডফুল আছেন। উনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, সেটা ঠিক কথা।

আর কিছু নয়?

না। শুধু বলেছিলেন, একজন লোক ওর জীবনটাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কারও নাম বলেননি।

মাই গড! এসব তো আমরা জানতাম না।

খাওয়ার পর অলক বিদায় নিতেই স্বস্তি ঘোষণা করল, লোকটা চালিয়াত, মোটেই সত্যি কথা বলেনি।

শর্মিলা অবাক হয়ে বলে, কী করে বুঝলি?

কেমন ক্যাবলা টাইপের দেখলে না! গুলগল্প ঝেড়ে গেল। পোশাক দেখলেই তো বোঝা যায়, একদম গোবরগণেশ। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, মোটেই সিয়াটলে থাকে না।

বিশ্বদেব খুব শান্ত গলায় বলল, খোঁজ আমার নেওয়া হয়ে গেছে। আমি আজ সকাল দশটায় এদের দিল্লি অফিসেই মেল করে অলকের পজিশন জানতে চাই। তারা যে জবাব পাঠিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে অলক সিয়াটলে থাকে। গ্লোবাল ফ্রেন্ডের রিসার্চ গ্রুপের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট। আমেরিকায় ডক্টরেট করেছে।

স্বস্তি একটু লাল হয়ে বলল, তা হলেই-বা কী? মোটেই ভালো লোক নয়। কেমন যেন দেমাকি।

শর্মিলা হেসে ফেলে বলল, স্বস্তি সত্যি করে বলো তো, ছেলেটাকে তোমার পছন্দ হয়ে যায়নি তো!

যাঃ, কী যে বলো বউদি!

বলেই স্বস্তি পালিয়ে গেল।

বিশ্বদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ছেলেটা মন্দ নয়। বুঝলে রুচিরা, স্বস্তির জন্য ভাবছিলাম। কিন্তু এ ছেলে তো সংসারধর্মই করতে পারবে না। সারা বছর বাইরে বাইরে থাকলে সংসার করবে কখন?

তা হোক, আমার অপছন্দ নয়।

শর্মিলা বলল, আমারও খুব পছন্দ বাবা।

টুলু ভ্রু কুঁচকে কী ভাবছিল। বলল, আমি ভাবছি অন্য কথা।

বিশ্বদেব বলল, কী কথা?

রাখির সঙ্গে ছোকরা আবার ঝুলে পড়েনি তো? রাখির সুইসাইডের অ্যাটেম্পটে এ ছোকরারও অবদান থাকতে পারে। এ হয়তো রিফিউজ করেছে।

শর্মিলা অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলে, হতেই পারে না।

কেন পারে না?

রাখি কখনও ওর প্রেমে পড়েনি।

বলতে চাও অন্য কারও প্রেমে পড়েছে?

হ্যাঁ।

সে কে?

সেটা বলা যাবে না।

হোটেলের ঘর। রমেন ভট্টাচার্য আর মৃন্ময়ী।

রমেন বলল, মৃন্ময়ী, আমি তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে আসিনি। এসেছি অফিসের কাজে। যদি প্রজেক্টটা হয়, তবে হয়তো আগামী দু-তিনবছর আমাকে এখানে ঘনঘন আসতে হবে এবং বেশ অনেকদিন করে থাকতে হবে। সেটা কথা নয়। আসল কথা আমি সব জেনে এবং বুঝেও তোমার সঙ্গে একটা আপসরফায় আসতে চাই। তুমি ভেবে দ্যাখো।

কীরকম আপসরফা চাও তুমি?

রিকনসিলিয়েশন।

সেটা কি সম্ভব! এতদিন পরে?

সেটাই তো ভেবে দেখতে বলছি তোমাকে।

আর রাখি?

রাখি আমার সন্তান নয় জানি। কিন্তু ওর প্রতি মায়া আছে।

আছে?

হাঁ। ওর দু-তিনবছর বয়স পর্যন্ত নিজের মেয়ে মনে করে ওকে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু বড় হওয়ার পর দেখলাম ওর মুখে আমার বা তোমার আদল নেই। তৃতীয় ব্যক্তির

আদল। সেই ব্যক্তি বিশ্বদেব। তখনই আমি ডিভোর্স করি।

সব মনে আছে।

অভিযোগ তুমিও অস্বীকার করোনি।

কেন করব? আজকাল ডিএনএ টেস্টে সত্য গোপন থাকে না।

ঠিক কথা। কিন্তু এতগুলো বছর কেটে যাওয়ার পর ভেবে দেখলাম দুনিয়ায় একা বাঁচা যায় না। আমার তো কেউ নেই। তুমি-আমি দুজনেই অনেক বদলে গেছি।

আমাকে কি তোমার আর বিশ্বাস হবে?

বললাম তো, এবয়সে মানুষের দায়বদ্ধতা এসে যায়। ভেবে দ্যাখো।

বিয়ে করোনি কেন?

ভয়ে। নতুন মানুষ এনে ফের যদি বিপাকে পড়ি?

নারীহীন জীবন?

তা বলতে পারি না। ওসব কথা থাক। আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

আমি ভাবব, মেয়েটার জন্যে উদ্বেগে আমার মাথার ঠিক নেই।

জানি, মেয়েটা কি আমার কথা বলত?

খুব। তারপর ধীরে ধীরে অ্যাডজাস্ট করে নিল। তুমি কি ওকে নিজের মেয়ের মতো ভাবতে পারবে?

নিজের মেয়ে তো নেই, তাই সেটা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ওই তো বললাম, ওকে অ্যাকসেপ্ট করতে অসুবিধে হবে না।

সকালে বিশ্বদেব যখন বারান্দায় বসে খবরের কাগজ দেখছে, তখন রুচিরা এল, পরনে হাউসকোট।

তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

বলো।

ওই অলক ছেলেটিকে তোমার কেমন লাগে?

ভারি ভালো।

কত মাইনে পায় জানো?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

স্বস্তির জন্যে ভাবছি।

আরে স্বস্তি তো এখনও নাবালিকা।

তোমার নাবালিকা মেয়ের বয়স আঠারো পেরিয়েছে।

তাতে কী? বিয়ের কথা ভাববার বয়স তো নয়।

শোনো, স্বস্তি লেখাপড়ায় তেমন ভালো নয়, মন নেই। আমার মনে হয় ও বেসিক্যালি হাউসওয়াইফ টাইপ। ঘর-সংসার করার আগ্রহ বেশি।

স্বস্তি কি ওর প্রতি ইন্টারেস্টেড?

অ্যাপারেন্টলি না। বরং উলটোই।

কীরকম?

বউমাকে বলেছে, ছেলেটাকে ওর নাকি একটুও ভালো লাগে না। কেমন জংলি টাইপ, বোকা-বোকা, আনমনা, এই সব।

তাতে বোঝা গেল ওর পছন্দ নয়।

আবার উলটো বুঝলে। ওসব বলা মানেই ও ইন্টারেস্টেড। একটু বেশিই ইন্টারেস্টেড, সেটা ঢাকা দিতেই ওসব বলছে।

উঃ বাপ রে! এ তো দেখছি সাংঘাতিক ভুলভুলাইয়া!

এবার বলো, অলক কত মাইনে পায়?

মাইনে তোমার মনোমতো না হলে কী পাত্র খারিজ?

না, তা নয়। ওকে আমার ভারি ভালো লেগেছে।

তাহলে মাইনে-ফাইনে গুলি মেরে বিয়ে লাগিয়ে দিলেই তো হয়। পুরুষমানুষ যেমন করেই হোক বউকে ঠিকই খাওয়াতে পারবে। কিন্তু কথা হল অলকের মতটাও তো নেওয়া দরকার।

সেটার জন্যও তোমাকে লাগবে। ওর মতটা জেনে নাও।

বড্ড তাড়াহুড়ো করছ। অলক সম্পর্কে আরও একটু খোঁজখবর নেওয়াও দরকার।

তাড়াহুড়ো করব কেন? প্রস্তাবটা দিয়ে রাখলাম। এখন খোঁজখবর যা করার তুমিই করো।

টুলু আর শর্মিলা কি জানে?

খুব জানে। শর্মিলাই তো আমাকে বলল, মা, স্বস্তি কিন্তু বেহেড।

নার্সিংহোমে রাত্রিবেলা একা ঘরে হঠাৎ রাখির জ্ঞান সামান্য সময়ের জন্যে ফিরে আসে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি শূন্য, কর্তব্যরত নার্স গিয়ে ডাক্তারকে খবর দেয়। ডাক্তার আসে।

মিস ভট্টাচার্য। কেমন আছেন?

রাখি জবাব দেয় না। চেয়ে থাকে।

ডাক্তার আরও কিছু প্রশ্ন করে। আঙুল দেখিয়ে ক'টা আঙুল জিগ্যেস করে। রাখি নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ পর রাখি ফের আচ্ছন্নতায় ডুবে যায়।

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বলে, লস অফ মেমরি মনে হচ্ছে। নার্স, সাইক্রিয়াট্রিস্ট মুকুল সেনকে কল দিয়ে রাখুন।

সকালে মুকুল সেন আসে, আবার রাখির জ্ঞান ফেরে, মুকুল সেন কিছু প্রশ্ন করে। রাখি জবাব দেয় না। কিন্তু চারদিকে তাকায়। অস্থিরতা প্রকাশ করে।

মৃন্ময়ী এবং রমেন ভট্টাচার্য একসঙ্গে ঘরে ঢোকেন।

রাখী মৃন্ময়ীকে চিনতে পারে না। কিন্তু কিছুক্ষণ রমেনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ফের আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

ডাক্তার মুকুল সেন বললেন, টেমপোরারি মেমোরি লস বলেই মনে হচ্ছে।

রমেন জিগ্যেস করে, চান্স অফ সারভাইভ্যাল কতটা?

মুকুল সেন বলেন, শি উইল কাম অ্যারাউন্ড।

মেডিসিনের ডাক্তার বললেন, শি ইজ ইমপ্রnভিং, কনটিনিউয়াস ইসিজি চলছে। এখনও পর্যন্ত অ্যালার্মিং কিছু পাওয়া যায়নি। তবে হার্ট ইজ উইক।

ডাক্তাররা বেরিয়ে গেলে রমেন আর মৃন্ময়ী পরস্পরের দিকে তাকায়।

মৃন্ময়ী হঠাৎ বলে, রাখি তোমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল কেন বলো তো!

রমেন মাথা নেড়ে বলে, জানি না, তবে দেখলাম তাকিয়ে যেন চেনার চেষ্টা করছিল। অথচ আমি ওর কেউ নই। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত।

বাড়ি চলো।

দাঁড়াও। সবে তো এলাম। আবার হয়তো জ্ঞান ফিরবে।

না। বাড়ি চলো। আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি। তোমাকে বলা দরকার।

এখনই?

হ্যাঁ। আমার মন বলছে রাখির জন্যে আর চিন্তা নেই। ও বাঁচবে। চলো, আমাদের কথাটা জরুরি।

চলো। নার্স, প্লিজ মেয়েটার ওপর নজর রাখবেন।

নার্স হেসে বলল, চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে। এটা আইসিইউ, কাজেই নজর রাখাই নিয়ম। তার ওপর সাদা পোশাকের পুলিশও আছে বাইরে।

পুলিশ! পুলিশ কেন?

তা, জানি না। বোধহয় জ্ঞান ফিরলে ওকে ইন্টারোগেট করা হবে।

দুজনে বেরিয়ে আসে।

মৃন্ময়ী বাড়িতে এসে প্রথমে রমেনের জন্য কফি করে আনে। তারপর কাছাকাছি বসে বলে, শোনো, তুমি হয়তো জানো না যে, রাখি বিশ্বদেবের ছোট ছেলে বাবলুর প্রেমে পড়েছে।

রমেনের হাতের কফির কাপ খানিকটা চলকে যায়। সে অবাক হয়ে বলে, মাই গড! বায়োলজিক্যালি ওরা ভাইবোন।

আমাদের মাথা চিন্তায়-চিন্তায় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বদেব জানে?

হ্যাঁ। কিন্তু জেনে কী হবে? আমি ছেলেটার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছি। কিন্তু তাতে তো ঠেকানো যাবে না।

কী করতে চাও?

আমাদের এখানকার পাট তুলে দিতে হবে।

পারবে?

রাখির জন্যে পারতেই হবে। দরকার হলে চাকরি ছেড়ে দেব। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি। ভেবে দেখেছি। এটা বেস্ট অলটারনেটিভ।

দাঁড়াও। আমি যে আমার কোম্পানির কাজে এখানেই পোস্টেড।

তাহলে তুমিও চাকরি ছাড়ো। আমাদের অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

তোমার ডিসিশনটা হেস্টি হয়ে যাচ্ছে। রাখি যদি যেতে না চায়?

ওর মেমরি কাজ করছে না। এখন যদি চলে যাই, তাহলে আপত্তি করতে পারবে না।

উদ্বেগে তোমার মাথা কাজ করছে না। মেমরি ফিরে এলে তখন ও মানবে কেন এই সিদ্ধান্ত।

আমি যে কিছুই ভাবতে পারছি না।

যেটা সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন সেটা হল, রাখি সুইসাইড করতে চাইল কেন?

জানি না। সত্যিই জানি না। সুইসাইড বলে আমার মনে হয় না। ওকে কেউ খুন করতে চেয়েছিল।

কেন তা চাইবে?

ও তখন বাড়িতে একা ছিল। আমার মনে হয় কোনও চেনা মানুষ এসে ওকে ছাদে নিয়ে যায়। মাথায় কিছু দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে চলে যায়।

মৃন্ময়ী, খুনের তো মোটিভ থাকবে। উদ্দেশ্যহীন খুন তো লজিক্যাল নয়।

তুমি ঠান্ডা মাথার লোক। তোমার কী মনে হয়?

কোনওভাবে ও হয়তো জানতে পেরেছে ওর বাবা কে।

তুমি, আমি আর বিশ্বদেব ছাড়া আর কেউ একথাটা জানে না।

ঠিক বলছ?

হ্যাঁ।

রমেন মাথা নেড়ে বলে, অঙ্ক মিলছে না।

বিশ্বদেবের অফিসঘরে বিশ্বদেব আর অলক মুখোমুখি।

বিশ্বদেব বলে, বাই দি ওয়ে, তুমি কী রমেন ভট্টাচার্যকে চেনো?

কেন চিনব না? উনি আমাদের বস। আগে তো এখানেই থাকতেন। ওঁর স্ত্রী এখনও-।

বিশ্বদেব হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। রমেনের পজিশন কীরকম?

উনি সিনিয়র পোস্টে আছেন। ম্যানেজেরিয়াল র্যাঙ্ক।

শুনলাম সে এখানে এসেছে। আমার সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। উই ওয়ার ক্লোজ ফ্রেন্ডস।

প্রজেক্ট হলে উনি এখানেই থাকবেন। ভেরি কমপিটেন্ট ম্যান।

হঠাৎ বিশ্বদেব প্রসঙ্গ পালটে বলে, শোনো অলক, আজ রাতেও তুমি আমাদের সঙ্গেই খাবে।

আরে, তার কী দরকার? রোজ রোজ আপনার অন্ন ধ্বংস করতে যাব কেন?

তোমার মাসিমার ইচ্ছে।

উঠে দাঁড়ায় অলক, বলে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে এখন একটু সাইটগুলোতে যেতে হবে টিম নিয়ে। ফিরতে দেরি হবে।

হোক। আমরা অপেক্ষা করব।

একটু বাদেই রমেন ভট্টাচার্যকে মোটরবাইকের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলের রাস্তায় দেখা যায় অলককে।

রমেন বলে, অলক প্লিজ সাবধানে চালাও। তোমার রাশড্রাইভ করার বদ অভ্যাস কেন?

অলক তবু স্পিড কমায় না। এক জায়গায় বাইক দাঁড় করিয়ে সে তার প্ল্যান বোঝাতে থাকে।

রমেন দু-চারটি প্রশ্ন করে।

তারপর দুজনে একটা গাছতলায় বসে।

অলক জিগ্যেস করে, ভট্টাচার্যদা, বউদিকে ডিভোর্স করেছিলেন কেন?

রমেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে অনেক কথা! সব শুনতে চেও না। মেয়েরা যখন ক্যারিয়ারকে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে, তখনই সংসারের ভিত আলগা হতে শুরু করে।

মৃন্ময়ী অত্যন্ত অ্যাকমপ্লিশড হেডমিস্ট্রেস বলে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছ, তবে শি ওয়াজ নট দ্যাট অ্যাকমপ্লিশড হাউজওয়াইফ।

আপনি সেই পুরনো মেল শোভিনিস্টের মতো কথা বলছেন।

না রে ভাই, সংসার বা পরিবার যদি গুরুত্বহীন ব্যাপার হত তাহলে মানুষ চিরকাল নোম্যাডস থাকত। পরিবার তৈরি হয়েছিল গুরুতর প্রয়োজনেই।

ফের বিয়ে করলেন না কেন?

ভয় হয়েছিল, দাম্পত্য বোধহয় আমার সইবে না। আমি অচল মুদ্রা।

এখনও তাই ভাবছেন?

হ্যাঁ। তবে আমি মৃন্ময়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।

করেছেন? সেটা আগে বলবেন তো!

মৃন্ময়ীর এটা ক্রাইসিস যাচ্ছে, জানো বোধহয়? ওর মেয়ে—

অলক অবাক হয়ে বলে, তার মানে? সে তো আপনারও মেয়ে!

কিছুক্ষণ থম ধরে বসে থেকে রমেন বলে, তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি, তাই বলছি। মেয়েটি আমার নয়। কার তা জিগ্যেস কোরো না। কিন্তু মেয়েটাকে আমার কখনও ঘেন্না করতে ইচ্ছে হয়নি।

সরি ভট্টাচার্যদা, বোধহয় একটা সেনসিটিভ প্রসঙ্গ তুলে ফেললাম।

না। যা সত্য তাকে কী আর চিরকাল চাপা দিয়ে রাখা যায়? মেয়েটা কেন সুইসাইড করতে চেয়েছিল সেটা জানা দরকার। আরেকটা কথা, মৃন্ময়ীর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়াও হয়েছে।

সত্যি! কনগ্র্যাচুলেনস।

ইট ইজ অ্যান অ্যাগ্রিমেন্ট ইন ক্রাইসিস। মৃন্ময়ীর বোধহয় এখন আমাকেই দরকার। আমারও দরকার মৃন্ময়ীকে। লাইক দ্যাট।

অন্যমনস্ক অলক বলে, মানুষকেই তো মানুষের দরকার।

সন্ধেবেলা নার্সিংহোমে রাখির কেবিনে ঢুকল মৃন্ময়ী আর রমেন।

নার্স বলল, রাখির আজ বিকেলে জ্ঞান ফিরেছিল।

মৃন্ময়ী ঃ কিছু বলছিলে?

হ্যাঁ, আজই প্রথম দু-একটা কথা বলল। তবে বোঝা গেল না। শুধু দু-একবার বলল, ফটো! ফটো!

ফটো! কীসের ফটো?

তা বলল না। কয়েকবার উঃ আঃ করেছিল। প্রায় দশ মিনিটের মতো জ্ঞান ছিল। তারপর ফের আগের অবস্থা।

মৃন্ময়ী রমেনের দিকে চাইল। রমেন মাথা নেড়ে জানায়, সে-ও ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

কিছুক্ষণ রাখির পাশে বসে তারা পরস্পর কথা বলল। রাখিকে নিয়ে স্মৃতিচারণ, রাখির ছেলেবেলার কথা।

বেরিয়ে আসার পর মৃন্ময়ী বলল, হোটেলে না থেকে বাড়িতেই এসে থাকো না কেন? আমি যে ভরসা পাই।

সেটা কী ভালো দেখাবে মৃন্ময়ী?

খারাপই বা দেখানোর কী আছে? আমরা তো স্বামী-স্ত্রী-ই ছিলাম। আবার হয়তো তাই হব।

তুমি এশহরের মান্যগণ্য মহিলা। তোমার কোনও বদনাম হলে দুঃখের ব্যাপার হবে। স্বামী-স্ত্রী হতে গেলে লোককে জানিয়েই হওয়া ভালো।

তাই হোক, দিনের কিছুটা সময় আমার কাছে থেকো। কী জানি, কেন তুমি আসার পর আমি প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে তুমি আসায় বেঁচেছি। জোর পাচ্ছি।

লোকে তোমাকে প্রশ্ন করছে না আমাকে নিয়ে?

না। লোকে তো রাখির কথা জানে, তাই আমাকে বেশি বিরক্ত করতে চায় না। স্কুল থেকে ছুটিও নিয়েছি। ফটোর কথা কেন বলছিল বলো তো!

বুঝতে পারছি না। খুব সংকোচের সঙ্গে একটা কথা জিগ্যেস করব তোমাকে?

করোই না।

খারাপ ভাবে নিও না। অদম্য কৌতূহল থেকে বলছি।

বলো। কিছু খারাপ ভাবব না।

রাখির সঙ্গে বিশ্বদেবের মুখের আদল ভীষণভাবে মিলে যায়, তাই না?

হ্যাঁ। কিন্তু ও-কথা কেন?

জানতে চাইছি, এ-ব্যাপারে কেউ কি মিলটা লক্ষ করে তোমাকে কিছু বলেনি কখনও?

না। লোকে অত লক্ষ করে না আজকাল। আর মিলটা বোধহয় এখন আর ততটা নেই। রাখি বড় হওয়ার পর ওর চুল বড় হয়েছে, ভ্রু প্লাক করে, মেকআপ নেয়। না, এখন চট করে আদল ধরা যায় না, খুব মন দিয়ে লক্ষ না করলে।

লোকে লক্ষ না করুক, রাখি কি লক্ষ করেছে?

না। রাখি আমার বন্ধুর মতো। সব কথা বলে। লক্ষ করলে বলত।

সেটাই বাঁচোয়া।

ভোরবেলা রাখি চোখ মেলেই বাবলুকে দেখতে পেল। চমকাল না, অবাক হল না। ব্যথাতুর মুখে একটু হাসল।

কেমন আছো রাখি?

ভালো।

আমি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

আমি ভালো আছি। বলেই ফের চোখ বুজল রাখি।

তোমার সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার ছিল।

রাখী চোখ খুলল না। নিস্তেজ গলায় বলল, এখন কোনও কথা শুনতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমি একটু চুপচাপ থাকতে চাই, তুমি এখন যাও।

যাচ্ছি। কিন্তু আমার কথাও একটু ভেব। আমি যে খাদের কিনারায় পৌঁছে গেছি।

জীবনে যা কিছু ঘটে তার সবকিছুর লাগাম আমাদের হাতে নেই। অন্যের পাপ এবং তার ফল আমাদের বহন করতে হয়। তুমি যাও বাবলু, কে কোন খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তা ভাবনার কোনও আগ্রহ নেই আমার। দয়া করে চলে যাও।

একটি অল্পবয়সি নার্স ঘুরে ঢুকে বাবলুকে দেখে একটু ভ্রু কুঁচকে বলল, এটা ভিজিটিং আওয়ার নয়। আপনি কী করে ঢুকে পড়লেন?

রাখি চোখ না খুলেই একটু টেনে টেনে বলল, রূপু উনি হলেন নার্সিংহোমের মালিকের ছেলে। ওঁর নিয়মকানুন মানবার দরকার হয় না। বরং আপনার চাকরি যেতে পারে।

নার্সটি থতমত খেয়ে বলল, ওঃ সরি। আমি তো আপনাকে চিনতাম না।

বাবলু গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল।

রুপু গরম জলে তুলো ভিজিয়ে রাখির মুখ স্পঞ্জ করতে করতে বলল, চোখে জল কেন?

চোখের জলের পেছনে অনেক কারণ আছে রুপু। জীবন যে কত অদ্ভুত খেলা দেখায়!

তা খুব সত্যি।

বিষ খেয়েছিলাম, কিন্তু মরলাম না। কেন কে জানে! মরাও হল না, আবার এখন লোকের বিদ্রুপের পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকার জ্বালা সইতে হবে।

ওসব কেন ভাবছেন? আমাদের কার জীবনে দুঃখ নেই বলুন তো, তবু বেঁচে থাকার জন্যে কি না করতে হয় বলুন? মরলে জ্বালা জুড়োয় হয়তো, কিন্তু জীবনের সবটাই তো আর জ্বালাযন্ত্রণা নয়। মাঝেমধ্যে আশ্চর্য সুখ, অবাক করা অভিজ্ঞতাও তো হয়। মাস দুই আগে এক মহিলার খুব সেবা করেছিলাম। যাওয়ার সময় উনি আমাকে একছড়া সোনার হার দিলেন জোর করে। বললেন, তুমি প্রফেশনাল নার্স, কিন্তু মেয়ের মতো সেবা করেছ। আমার নিজের ছেলে বিদেশে থাকে, কেবল টাকা পাঠিয়ে খালাস। আপনজনরা তো আপন হল না, তুমি পর হয়েও আপনজনের মতো সেবা করলে।

রাখি চুপ করে শুয়ে রইল, কথা বলল না।

সকাল আটটার পর রমেন আর মৃন্ময়ী এল। মুখে একটু খুশির ভাব।

তোকে নাকি আজ বিকেলে ছেড়ে দেবে।

জানি না।

তার মাথায় হাত রেখে মৃন্ময়ী বলে, খুশি হোসনি?

রাখি চোখ খুলে ম্লান একটু হেসে বলল, খুশি হব কেন? নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেলেই কি মুক্তি? কত কর্মফলের বন্ধন আমাদের আটকে রেখেছে, তা থেকে মুক্তি কোথায় বলো!

মৃন্ময়ীর মুখটা শুকিয়ে গেল। চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, আমার দোষ, আমার অপরাধ তো [illegible] হওয়ার নয় মা। কিন্তু মানুষ তো কত প্রতিকূলতা নিয়েও বাঁচে। রমেন অবধি আজ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ ওর সঙ্গেই তো আমি সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম।

রাখি স্তিমিত গলায় বলে, তোমার দোষ বা অপরাধ নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না মা।

আমি শুধু ভাবি, আমার জন্ম অন্যের ইচ্ছাধীন, আমার কর্মফল অন্যের কর্মফলের পরিণতি, আমার স্বাধীন সত্বা বলে কিছু নেই। তাহলে আমরা স্বাধীনতার কথা বলি কেন? কত কত মানুষের রক্ত আমার শরীরে বলো তো!

ওসব ভাবিস না মা। আমরা ঠিক করেছি, অন্য কোথাও চলে যাব। তোকে নিয়ে।

পালাবে? তা কেন মা? আমি কোথাও যাব না। এখানেই থাকব। এই শহরে জন্মেছি, বড় হয়েছি, এর প্রতিটি ইঞ্চি আমার চেনা। এজায়গা থেকে আমি পালাব কেন? যা সত্যি তার কাছ থেকে কি পালানো যায়? না সেটা উচিত?

মৃন্ময়ী আর রমেন পরস্পরের দিকে একবার তাকাল।

মৃন্ময়ী বলল, তাহলে কী করতে বলিস আমাদের?

কপালদোষে আমার দুটো বাবা, একজন জন্মদাতা, অন্যজন পালনকর্তা। জীবনটাকে নতুন ছকে, অন্য প্যাটার্নে আবার নতুন করে ভাবব মা। সেজীবন অন্যরকম হবে, আর পাঁচজনের মতো নয়। আমি সত্যকে গোপন করব না, পালাব না, মরতে গিয়েও মরা যখন হল না, তখন নতুন আলাদা রকমের একটা জীবন যাপন করার চেষ্টা করতে হবে। তোমাকেও পালাতে দেব না, যা সত্য তা স্বীকার করে এখানেই থাকতে হবে তোমাকে, পারবে না?

মৃন্ময়ী কাঁদছিল। মেয়ের মাথায় আরেকবার হাত রেখে বলল, পারব।

.বশি দূরে নয়

এক

খানিকটা দৌড়াতে হল শেষ দিকে। নইলে, মেচেদা লোকালটা ধরা যেত না। কিন্তুট্রেনে উঠেই বুকটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মণিরামের। বাঁ বুকটা চেপে ধরে মণিরাম কঁকিয়ে উঠল,—গেছে রে প্রীতম!

প্রীতম গায়ে-পায়ে মানুষ। অত বড় দুটো ভারী ব্যাগ দু-হাতে নিয়ে মণিরামকে সাত হাত পিছনে ফেলে শেষের দু-নম্বর বগিতে উঠে পড়েছে। মেচেদা লোকালে তেমন ভিড় নেই। সিটে বসে প্রীতম পাশে জায়গা রেখেছে তবু। বলল,—কী গেল?

—মানিব্যাগটা। তেইশ বছরে এই প্রথম পকেটমারি। বুঝলি?

—বউনি হল তা হলে! তা গেল কত?

—টাকাটাই কি বড় কথা রে? গুমোর ভেঙে দিল যে।

—টাকাটা কি ফ্যালনা না কি?

—তা ধর, সুখরামের গদিতে দেড় হাজার ঝেড়ে এলাম। কেশববাবু তিনশো চল্লিশ। আগাম দিতে হল ধানুরামকে। নেই নেই করেও একুশ টাকা ছিল।

—তাই বলো। চোরেরও কি মুখরক্ষা হল? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

মণিরাম ধপ করে বসে পড়ল পাশে। বুকপকেটের কাছটা এখনও ডান হাতে চেপে ধরে আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না যেন।

—কখন নিল বলতে পারিস? ভোজবাজির মতো উবে গেল যে!

—ও সব না শিখে কি আর লাইনে নেমেছে গো! টেরই যদি পাবে, তা হলে সে আর পকেটমার কীসের? তবে আহাম্মক বটে। ফিরতি পথে মাল গস্ত করে করে পকেটে পয়সা থাকে?

গাড়ি ছেড়েছে। কার্তিকের শেষ, এখন চলন্ত ট্রেনের হাওয়ায় গা শিরশির করে। আজ একটু মেঘলাও আছে বলে হাওয়াটা ঠান্ডা।

—জানালাটা নামিয়ে দিবি নাকি?

—আমার মাল টেনে ঘাম হচ্ছে। একটু শুকোতে দাও, তারপর নামিয়ে দেবখন।

—একুশটা টাকাই তো নয়, মেলা কুচো কাগজ ছিল। বগলামায়ের একখানা ছবি, পাঁচ-ছ'টা ঠিকানা, গোটা কয়েক ফোন নম্বর। বড় গুমোর ছিল। কোনও দিন পকেটমারি হয়নি

আমার। প্রায় নিত্যি যাতায়াত এই তেইশ বছরে।

—ও সব ভেবে খামোখা হা-হুতাশ করো কেন? টাকাই যখন তেমন যায়নি তখন দুঃখ কীসের? অল্পের ওপর দিয়ে বউনিটা হয়ে গেল। বরাবর তোমার বরাতের জোর তো দেখছি!

—তোর নজরে নজরেই আমার এ সব হয়েছে। বরাতের দেখলিটা কী রে শালা! মরছি নিজের জ্বালায়। বাজারে দেনা কত জানিস?

প্রীতম জানালাটা নামিয়ে দিয়ে বলল,—ঠান্ডা হয়ে বোসো তো। দেনার কথা কাকে বলছ? মায়ের কাছে মাসির গপ্পো? দেনায় তোমার হাঁটুজল হলে আমার ডুবজল। বছর ঘুরতে কারবারটা যদি না দাঁড়ায়, তাহলে হাজতবাস কপালে আছে।

মণিরাম প্রীতমের অবস্থাটা জানে। রা কাড়ল না। ছোঁড়া পরিবার নিয়ে হয়রান হয়ে গেল। বাপ বিনোদকুমার একটা জীবন জুয়ো খেলে ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করে এখন জবুথুবু হয়ে বসে বসে বিড়বিড় করে।

মণিরামের বউ দীপির আবার প্রীতিমকে ভারি পছন্দ। ননদ ফুলির জন্য দেগে রেখেছে। ফুলির ভাবগতিক অবশ্য বোঝা যায় না। লেখাপড়া নিয়ে ভারি ব্যস্ত। বিয়ের কথা বলতে গেলেই ঝেঁঝে ওঠে।

প্রীতম তার ভগ্নিপোত হলে মণিরামের ব্যাপারটা অপছন্দের হবে না। ছোকরা লড়িয়ে আছে বটে। বাপের এক পয়সার মুরোদ ছিল না। চারটে ভাইবোন যে কী কষ্ট করে বড় হয়েছে তা না দেখলে প্রত্যয় হয় না। শাকের ঝোল আর ভাত। কিংবা কখনও শুধু শাকের ঝোল, কখনও মেটে আলু, কচু-ঘেঁচু খেয়ে বড় হয়েছে। বাড়ি-জমি সব বেহাত হয়েছে। দেনায় বিনোদকুমার ভুরু অবধি ডুবে ছিল। প্রীতম মাধ্যমিকটা ডিঙিয়েই কাজে নেমে পড়ল। মণিরাম নিজে ব্যবসাদার বলে জানে, হ্যাপা কত। আর কত লোকের বায়নাক্কা বুঝে চলতে হয়। প্রীতম শুরু করেছিল চাল বেচে। এখন গঙ্গারামপুরে দু-দুখানা দোকান। ধারকর্জ আছে বটে, কিন্তু বুকের পাটা আর রোখ আছে বলে সব কাটিয়ে ভেসে উঠবে ঠিক।

মানিব্যাগটার কথা খানিক ভুল পড়ল লেবু-চা খেয়ে। প্রীতমই খাওয়াল। বলল,—মুখটা অমন আঁশটে করে রেখো না তো। পিছনের দিকে যত চাইবে তত এগোতে ঢিলে পড়বে।

—ওরে, পকেটমারিটা বড় কথা নয়, আহাম্মকির কথাটাই ভাবছি। আমার বিশ্বাস ছিল, আমি হুঁশিয়ার মানুষ। ট্রেনটা ধরতে দৌড়োতে না হলে—

—এবার থেকে গোঁজ করে নাও। অবিশ্যি যখন যাওয়ার তখন গোঁজও যাবে।

চেনাজানা দু-চারজন উঠে পড়ল কামরায়। রাধাপুরের সুধীর হাজরা, বীরশিবপুরের কানাই মণ্ডল, আরও দু-তিন জন এদিক-ওদিককার চেনা লোক। সুধীর পাশের ফাঁকা

সিটে বসে বিড়ি ধরিয়ে তার শালার বিয়ের গল্প ফেঁদে বসল। কথায় কথায় পথটা কেটেও গেল, যেমন রোজই যায়।

উলুবেড়েতে নেমে কুতুবের দোকান থেকে দুজনে জমা রাখা সাইকেল বের করল। ক্যারিয়ারে একখানা ব্যাগ নাইলনের দড়িতে বেঁধে, আর একখানা ব্যাগ হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে প্রীতম বলল, তুমি এগিয়ে পড়ো মণিরামদা। আমাকে সাইকেল ঠেলেই যেতে হবে। এ গন্ধমাদন নিয়ে তো সাইকেলে চাপার উপায় নেই।

—চাপবখন। একটু হাঁটি চল তোর সঙ্গে। একখানা ব্যাগ আমার সাইকেলে চাপিয়ে দে না।

—না গো মণিরামদা। তুমি হলে আয়েসি মানুষ। জীবনে মালপত্র বয়েছ কখনও?

—ছেলেবেলায় বয়েছি। তখন তো বাবার এত ফাঁদালো কারবার ছিল না। তখন বাপ-ব্যাটায় বিস্তর বয়েছি।

—তোমার হল আদরের শরীর। গদিতে পয়সা ফেলে চলে এলে। তারা মালপত্র ট্রাকে পাঠিয়ে দেবে। আমার তো তা নয়।

গঙ্গরামপুর অনেকটা রাস্তা। হেঁটে যাওয়ার কথা ভাবতেই মণিরামের গায়ে জ্বর আসে। কথাটা ঠিক, তার বেশি কষ্ট করার স্বভাব নয়। বাপের বড় কারবার থাকলে এইটে সুবিধে।

প্রীতম আগে আগে, কয়েক পা পিছিয়ে মণিরাম। ও দুখানা ব্যাগের ওজন মণিরাম জানে। সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়াও সহজ নয়। মণিরাম পেরে উঠত না। একটু ঝুঁকে ওই গন্ধমাদন ঠেলাওয়ালার মতো নিয়ে চলেছে প্রীতম। একটা ভ্যান ভাড়া করতে পারত। কিন্তু ও তা করবে না। বরাবর নিজের মাল নিজেই বয়ে আসছে। পিছন থেকে দৃশ্যটা দেখে হিংসে হয় মণিরামের। কী পুরুষালি, শক্ত সমর্থ শরীর প্রীতমের। তার নিজের বড় বাবু শরীর। এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই তার চর্বি জমেছে শরীরে, দৌড়ঝাঁপেও কমছে না। দীপি আজকাল বলে,—কেমন ন্যাদস মার্কা হয়ে যাচ্ছ, কেন গো?

—তুমি সাইকেলে চেপে এগিয়ে পড়ো মণিরামদা। আমার সঙ্গে ভদ্রতা কীসের?

—একা একা এতটা পথ যাবি?

—দোকা পাব কোথায়? নিত্যিদিন যাচ্ছি। রোজ তো আর তুমি থাকো না।

—তা বটে। ফেরার সময় আজ আবার বিপিন ডাক্তারের বাড়ি হয়ে যেতে হবে। তোর বউদির ব্যথাটা কমছে না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও।

—দেখে বুঝে যাস। সন্ধের পর দ্যাখা হবেখন।

মণিরাম সাইকেলে চেপে বসল।

বয়সে পাঁচ-সাত বছরের বড় এই মণিরামদাদাকে প্রীতম পছন্দই করে। বহুবার মণিরাম তাকে ব্যবসার জন্য টাকা হাওলাত দিতে চেয়েছে। অভাবের দিনে সাহায্য করতে চেয়েছে। প্রীতম নেয়নি। নেওয়া জিনিসটার একটা অসুবিধে হল, লোকটার মুখোমুখি হলেই কেমন যেন অসোয়াস্তি হতে থাকে, যেন সমান সমান মনে হয় না। দুর্বল আর ছোট লাগে নিজেকে। তবে হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের লোনটা পাইয়ে দিতে মণিরামদা জামিন না হলে মুশকিল ছিল। সেই লোন প্রাণপাত করে শুধতে হচ্ছে। আধাআধি হয়ে এসেছে এখন। বিকিকিনি একটু একটু করে বাড়ছে। রাতারাতি, শর্টকাটে যে কিছু হওয়ার নয়, তা প্রীতম ভালোই জানে। শর্টকাটে বড়লোক হতে গিয়েই না তার বাপটা ডুবে গেল।

না, বাপের ওপর রাগ নেই তার। সব লোক কি সমান হয়? অপদার্থ হোক, জুয়াড়ি হোক, এই বাপটা তো তাকে বরাবর বুক দিয়ে ভালোবেসেও এসেছে। ভাতে টান পড়লে 'বাইরে খেয়ে এসেছি' বলে ছেলেমেয়েদের মুখে গ্রাস তুলে দিত। মা যদিও দু-বেলা ঘর-বসা লোকটাকে উঠতে-বসতে উস্তম-কুস্তম অপমান করে, কিন্তু প্রীতমের বড্ড মায়া হয়। বাপটা খারাপ ছিল না তার, তবে বড্ড বোকা আর অদূরদর্শী। এখন মনস্তাপে কষ্ট পায়। মাঝে মাঝে ভেউ ভেউ করে কাঁদে।

বাপকে দেখে দেখে ছেলেবেলা থেকেই তার রোখ চেপেছিল, কিছুতেই বাপের মতো হবে না সে। সংসারকে বাঁচাতে হবে। মাধ্যমিকটা পাশ করার পরই সে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে রোজগারের জন্য হন্যে হয়ে উঠল। তখন এই মণিরামদাদা পাশে না থাকলে গাড্ডায় পড়ে যেত সে। তেজেনবাবু চানাচুরের কারখানা খুলেছিলেন। প্রথমে সেটাই বাকিতে নিয়ে দোকানে দোকানে দিত সে। বিক্রি ভালো ছিল না। তার পরে বেকারি বিস্কুট সাপ্লাই দিতে লাগল। সেটাও ফেল মারল। কাঁচা সবজিও চলল না তেমন। বাজারের একটেরে গলির মধ্যে হীরু দাসের মনোহারী দোকান ছিল। সেটা মোটেই চলত না। হীরু দাস মারা যাওয়ার পর তার ছেলে সুধীর দোকানটা বেচে দিল। কিনল মণিরামদাদার বাবা সফলরাম। কিন্তু তার গোটাপাঁচেক দোকান, তার ওপর হোলসেল। হীরু দাসের দোকানটা কিনেও ফেলেই রাখতে হচ্ছিল। মণিরামদাদা তখন তার বাপকে বলে দোকানটা বন্দোবস্ত দিল প্রীতমকে। সফলরাম ছেলের মতো নয়। মায়াদয়া দেখানোর লোক নয়। পরিষ্কার বলে দিল,—দানখয়রাত করতে পারব না বাপু, তবে তোর কাছ থেকে লাভও তেমন নিচ্ছি না। পাঁচ পারসেন্টে ছেড়ে দিচ্ছি। তবে তিন মাসের মধ্যে ডাউন পেমেন্ট।

ব্যাঙ্কের টাকাটা পেয়ে ধার শোধ করে দোকানটা নিয়ে ফেলেছিল সে। গলির দোকান চলে না হয়তো। কিন্তু, দোকানি যদি ভালো হয় তবে তেপান্তরে দোকান দিলেও খদ্দের খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হয়। প্রীতম দাঁতে দাঁত চেপে তার গলির দোকানটার পিছনে পড়ে রইল। বাছাই জিনিস, কম লাভ আর মিষ্টি কথা। এই সবই ছিল তার মূলধন। লোককে ঠকায় না, নিজেও না ঠকবার চেষ্টা করে।

দুই

সাইকেলের হ্যান্ডেলের দু-ধারে দুটো আর ক্যারিয়ারে আরও একটা পেল্লায় সাইজের ঠাস-ভর্তি নাইলনের ভারী ব্যাগ চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে যে লোকটা সে হল গঙ্গারামপুর বাজারের ছোট দোকানদার প্রীতম। সপ্তাহে দু-দিন বিকেল চারটে ছত্রিশের লোকালে এসে নামে। কুতুবের দোকানের পিছনে সাইকেলের খোঁয়াড় থেকে নিজের দীনদরিদ্র সাইকেলখানায় মালপত্র চাপিয়ে সেই গন্ধমাদন ঠেলতে ঠেলতে গঙ্গরামপুর পর্যন্ত যায়। কোনও দিকে তাকায় না। অত বোঝা টানলে কি আর মানুষ মানুষের মতো থাকে? হালের বলদের মতো হয়ে যায়। কিন্তু তাকালে, এই কার্তিকের বিকেলের মায়াময় আলোয় শিকদারবাড়ির বারান্দায় শেফালিকে ঠিক দেখতে পেত। প্রীতম শেফালিকে দেখতে পায় না বটে, কিন্তু শেফালি প্রীতমকে দেখতে পায় এবং দ্যাখে। বলতে নেই, শত কাজ থাকলেও সপ্তাহে দু-দিন ঠিক সাড়ে চারটের লোকাল আসার সময়টায় শেফালি বারান্দায় এসে দাঁড়াবেই।

না, প্রীতম ঠিক মানুষ নয়, খানিকটা মানুষ, বাকিটা এক বলশালী, গোঁয়ার অবুঝ জন্তু। টালমাটাল সাইকেলখানাকে ওই ভারী মালসমেত সামলানোর জন্য গায়ের জোর লাগে। প্রীতমের সেটা আছে। কিন্তু শুধু গায়ের জোর থাকলেই তো হবে না গো! তোমার আর কিছু নেই? চোখ নেই তোমার? দেখতে পাও না, তোমার জন্যই একটা তাজা বয়সের মেয়ে কেমন লাতন হয়ে, বিভোর হয়ে চোখ বিছিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে? তাও তো রোজ তোমার দেখা নেই। সপ্তাহে মোটে দুটো দিন।

যত দূর দেখা গেল চেয়ে রইল শেফালি। কী চওড়া পিঠ, দুখানা শাবলের মতো হাত, একটু কুঁজো হয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলেছে। যেন এ ছাড়া ওর আর কোনও কাজ নেই দুনিয়ায়।

প্রীতম চলে গেলে শেফালির বিকেল ফুরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ আর কিছুই থাকে না। সব 'না' হয়ে যায়।

সে যে খুব সুন্দরী মেয়ে তা নয়, আবার কুচ্ছিতও নয়। তাকে দেখে কেউ কখনও বলেনি, 'বাঃ, কী সুন্দর মুখখানা', বা বলেনি, 'ইস কী কুচ্ছিত রে'! বড্ড মাঝারি মেয়ে সে। নিজেকে আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দ্যাখে সে। কখনও পছন্দ হয়, কখনও হয় না। কিন্তু চেহারা ছাড়া কি মেয়েদের আর কিছু নেই? শুধু দেখনসই হলেই হল?

'পিউ স্টোর্স'-এ সে এক আধবার গেছে। প্রীতমের দোকান। চোখ তুলে দোকানির দিকে চাইতে সাহস হয়নি। পেনসিল, মাথার তেল বা ওই রকম কিছু কিনে কাঁপা হাতে দাম দিয়ে মুখ নীচু করে চলে এসেছে। তার বেশি এগোতে পারেনি কখনও। ও সব

জিনিস পাড়ার দোকানেই পাওয়া যায়। তবু কেন এত দূর কষ্ট করে যায় সে তা কি কেউ টের পায়, বোঝে?

আজও একটু সেজেই দাঁড়িয়ে ছিল শেফালি। কোনও কাজে লাগল না। মধুমিতাকে সে সব বলে। তার গলাগলি বন্ধু। মধুমিতা বলে, দাঁড়া না, ঠিক একটা ব্যবস্থা হবে। তবে প্রীতমদারা কিন্তু বড্ড গরিব। এখন অবশ্য ততটা গরিব আর নেই।

—গরিব তো কী? গরিবরাই ভালো।

তিন

শেফালির হাবা ভাই সীতু ওই বসে আছে দাদুর কাছে। পুজোর ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে দাদু বসে আছে একটা হাঁটু বুকের কাছে জড়ো করে। সীতু হাফ প্যান্টের নীচে তার দুটো আদুর রোগ ঠ্যাং ঝুলিয়ে। পায়ের কাছে টাইগার কুকুর। এই ষোলো বছর বয়সেও বুদ্ধি খুলল না সীতুর। সারাক্ষণ কেবল বড় বড় দাঁত বের করে হাসে। একটা পচা স্কুলে সেই কবে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছিল, আজও সেই থ্রিতেই পড়ছে। সীতু কোনওদিন ফোরে উঠবে না, সবাই জানে। তবু মাসে মাসে বাবা ওর স্কুলের বেতন মিটিয়ে দেয়। তাই স্কুল থেকে ওকে তাড়ায় না। ওর যত ভাব দাদু আর টাইগারের সঙ্গে। এ বাড়িতে একমাত্র দাদুই যা ওকে কাছে ডেকে বসায়, কথা-টথা কয়। আর টাইগার সারাদিন সীতুর পিছনে পিছনে ছায়ার মতো লেগে থাকে। বোকা বলে সীতুর তেমন বন্ধু নেই। খেলায়ও নেয় না কেউ ওকে। ও যে বোকা তা টাইগার বুঝতে পারে না, তাই ও টাইগারের সঙ্গেই ছোটাছুটি করে খেলে।

আর তার দাদু খুব একাবোকা মানুষ। যেন একটা ফেলে দেওয়া ন্যাকড়ার মতো এক ধারে পড়ে থাকে। ঠাকুরঘরের পিছন দিকটায় একটা খুপরি মতো আছে। ভারি ছোট্টো ঘর। একটা চৌকি এঁটে আর এক চিলতে জায়গা। তেল, মাজন সব জানালার তাকে। ব্যস ওতেই দাদুর হয়ে যায়। ঠাকমা মারা গিয়ে অবধি দাদু পিছু হটতে হটতে ওইখানে গিয়ে ঠেকেছে। তাকে কারও মনেই পড়ে না। শেফালির পড়ে। দিনে একবার-দুবার সে গিয়ে দাদুকে দেখে আসে। কথা কয়। তবে শেফালিরও তো কাজ আছে। ক্লাসের পড়া, মায়ের ফরমাস, একটু আড্ডা, একটু মন-খারাপ করে বসে থাকা। এই মন-খারাপটা বড্ড ভালো জিনিস। রাজ্যের অভিমান উঠে আসে বুকে। নাক ফুলে ফুলে ওঠে। কান্না পায়। কার ওপর অভিমান তা বুঝতে পারে না। গোটা দুনিয়াটার ওপর, এই মানবী জন্মের ওপর, প্রীতমের ওপর। সব কিছুর ওপর অভিমান উথলে ওঠে যখন, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে যে কী ভালোই লাগে।

মেয়ে-জন্মের একটা বাধক হল, বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই কেউ না কেউ চোখ পাকিয়ে বলবে, অ্যাই কোথায় যাচ্ছিস? যেন নিজের ইচ্ছেয় কোথাও যাওয়ার নেই তার। এই যে কার্তিকের এই মায়াবী বিকেলে পশ্চিমের খুনখারাপি আকাশের তলায় এক মায়াজাল পাতা হয়েছে, এ কী তার জন্যেই নয়?

জন্ম থেকেই দেখে আসছে শেফালি, তাদের এই জায়গাটা ভারি দুঃখী জায়গা। জায়গাটার যেন সব সময়ে মুখভার। কখনও হাসি ফোটে না মুখে। ক'দিন আগে রানাঘাটে মাসির বাড়িতে গিয়েছিল শেফালি। কী হাসিখুশি জায়গাটা। সব সময়ে যেন আল্হাদে গড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে সাহস করে বোম্বে রোডের দিকে বন্ধুদের সঙ্গে যখন যায় শেফালি, তখন মনে হয়, জায়গাটা যেন এক দুষ্টু-দুষ্টু পুরুষ মানুষ। লরির সার দাঁড়িয়ে আছে। ধাবায় কেমন ব্যস্তসমস্ত লোকজন। কেমন সাঁ করে অনেক দূর চলে যাচ্ছে চকচকে সব গাড়ি। বাবা যে কেন বাড়িটা ওদিকে করল না কে জানে। স্টেশনের এপাশটা বড্ড পান্তাভাত, ঝিমধরা।

—মা একটু আসছি।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—মণিমালাদের বাড়িতে।

—দয়া করে তাড়াতাড়ি এসো।

সবাই জানে, সে খুব বেশি দূর যাবে না। তারা, মেয়েরা সব অদৃশ্য দড়িতে শক্ত করে বাঁধা। তাদের কোনও দূর নেই। কোনও অনন্ত নেই। এক বাঁধা অবস্থা থেকে আর এক বাঁধা পড়ার জন্যই তারা জন্মায়।

কী হল হেনার? তাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট মাঠটায় এক শীতকালে বাহাত্তর ঘণ্টা সাইকেল চালিয়েছিল বিনোদ মাল। বাঁশের খুঁটিতে লাইট লাগানো, চব্বিশ ঘণ্টা মাইকে হিন্দি গান, চার দিকে ভিড়ের মধ্যে ঝালমুড়ি, ফুচকা, চানাচুর-বাদামের দোকান বসে গেল। বিনোদ সাইকেল চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। শেফালিও বন্ধুদের সঙ্গে দেখতে যেত। কিন্তু মজা লাগত না তার। কষ্ট হত রোগাপানা ছেলেটার জন্য। কী কষ্ট ক্লান্ত পায়ে প্যাডেল করে যাওয়ার মধ্যে! বিনোদের ওই কষ্ট আর পুরুষকার জানালার ফাঁক দিয়ে দিনরাত দেখত হেনা। তারও কষ্ট হত। আর হতে হতেই তার বুক উথলে উঠল। প্রাণ আকুল হল। হাউ হাউ করে কাঁদত। যে দিন বাহাত্তর ঘণ্টা শেষ হল সেদিন বিনোদকে কাঁধে নিয়ে পাড়া ঘোরাল ক্লাবের ছেলেরা। টাকার মালা পরানো হল। বিনোদের জয়ধ্বনিতে কান পাতা দায়। হেনা গিয়ে ছলছলে চোখে তার গলার সোনার চেনটা খুলে পরিয়ে গিয়েছিল বিনোদকে। প্রকাশ্যেই। তাতে একটা কানাকানি শুরু হয়েছিল। আর বাবার হাতে বিশ বছরের মেয়েটা খেয়েছিল বেদম মার। শেষে ওই বিনোদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল হেনা। গিয়ে দেখল বিনোদের আরও একটা বউ আছে,

দুটো বাচ্চা এবং হাঁড়ির হাল! বিনোদের সংসারের জন্য সময় নেই। সে কেবল এখানে-সেখানে সাইকেল চালিয়ে বেড়ায়। ওটাই তার রুজি-রোজগার। শখ আহ্লাদ দু-দিনেই মরে গিয়েছিল হেনার। এই বছরখানেক আগে কোলে একটা খোকা নিয়ে বাপের বাড়িতে ফেরত এসেছে।

মেয়েদের জীবনটাই ওরকম। যতই ভালোবাসুক না কেন, পুরুষ জাতটাই তো বিশ্বাসঘাতকের জাত। হেনা আজকাল দুঃখ করে বলে, কী বয়স আমার বল! লেখাপড়া করতে পারতাম, গান গাইতে পারতাম। জীবনটাই মাটি হয়ে গেল। কেন যে পোড়া চোখে ওই সাইকেল চালানো দেখতে গিয়েছিলাম।

মেয়েদের জীবনটা এরকম। তা বোঝে শেফালি। সব বুঝেও ফের ফাঁদে পা দিতেও ইচ্ছে হয়। যতবার ঠকে যাক, ফের ঠকতে রাজি হয়ে যাবে হাসি-হাসি মুখ করে। তারা বড্ড বোকা। তার হাঁদা ভাই সীতুর সঙ্গে সত্যিই কি তার কোনও তফাত আছে?

কথাটা ভাবতে ভাবতেই সীতুর ডাক কানে এল, দিদি! এই দিদি!

ফিরে দাঁড়িয়ে শেফালি বিরক্ত গলায় বলল, কী হল?

—কোথায় যাচ্ছিস?

—তাতে তোর কী?

—মা ডাকছে।

—কেন?

—মায়ের হাওয়াই চপ্পলটা ছিঁড়ে গেছে। এক জোড়া কিনে আনতে বলল।

—আমার কাছে পয়সা নেই। দৌড়ে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আয়। আমি দাঁড়াচ্ছি।

সীতু সত্যিই দৌড়োল।

বুকটায় এক মুঠো আবির কে যেন ছড়িয়ে দিল হঠাৎ। ভিতরটা যেন রঙিন। এক জোড়া হাওয়াই চটি তাকে গঙ্গারামপুর অবধি নিয়ে যাবে। ওইখানে এক মানুষ জন্তু, এক শ্রমিক-পুরুষ, এক উদাস উদ্যমী তাকে হেলাফেলা করবে বলে বসে আছে নিজের দোকানে। চেনেও না তাকে। না চিনল তো বয়েই গেল। তবু কি আমি তোমার চোখের বালি না হয়ে থাকতে পারি? অবহেলা কি আজকের? সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তো আমরা তোমাদের হেলাফেলার জিনিস! কখনও কখনও আদর করে বুকে তুলে নাও বটে, তারপরই শোঁকা ফুলের মতো ফেলে দাও, আর ফিরেও তাকাও না। তবু আমরা তো বারবার অচ্ছেদ্দা সয়েও তোমাদের জন্যই ফুটে থাকি।

ছুটতে ছুটতেই এল সীতু, তার পিছনে টাইগার। দিদি, আমাকে সঙ্গে নিবি?

শেফালি ভ্রূ কুঁচকে একটু দেখল। গায়ে একখানা হলুদ ডোরাকাটা জামা, পরনে হাফপ্যান্ট। রোগা ল্যাকপ্যাকে চেহারা। কী জানি একটু মায়া হল। বলল, চল।

মাঝখানে দুটো ঝুড়ি আর ধার ঘেঁষে দুজনে বসা, তার মধ্যেই ঠেলে ঘেঁষটে ভ্যানগাড়িতে উঠে পড়ল ভাইবোন।

সীতু হাসছে, যেমন সব সময়ে হাসে।

শেফালি ধমক দিয়ে বলল, দাঁত বন্ধ কর তো। সব সময় হাসি আসে কেন তোর? লোকে বোকা বলবে না?

—চপ খাওয়াবি দিদি?

টাইগার ভ্যানগাড়ির পিছনে ছুটছে। গঙ্গারামপুর অবধি যাবে। যাক। সীতু যে বোকা সেটা টাইগার বুঝতে পারে না। তাই সীতুর সঙ্গে থাকে সব সময়ে।

—ইস্কুল থেকে ফিরে ভাত খাসনি?

—খেয়েছি তো!

—তবে আবার চপ কীসের?

—খাওয়াবি না?

—আচ্ছা খাস!

—দিদি।

—হুঁ।

—আমাকে তোর স্কুলে ভর্তি করে নিবি?

—আমার স্কুলে! পাগল নাকি? আমাদের তো মেয়েদের স্কুল।

—মেয়েরাই ভালো। ছেলেগুলো বড় পিছনে লাগে।

—তুই তো বোকা, সবাই বোকাদের পিছনে লাগে।

—তোর স্কুলে আমাকে নেবে না?

—তাই নেয় কখনও? চুপ কর তো!

—ঠোক্কর মারে যে! এই দ্যাখ না, মাথা ফুলে গেছে।

শেফালি গম্ভীর হয়ে রইল। সীতুটাকে নিয়ে সব জায়গায় যাওয়া যায় না। ভারি লজ্জা করে। অপ্রস্তুত হতে হয়।

—চুপচাপ বসে থাক। বকবক করতে হবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সীতু ফের ডাকে, দিদি!

—হুঁ।

—তোর বিয়ে হবে না?

—চুপ কর তো!

—তোর কার সঙ্গে বিয়ে হবে জানিস?

—কার সঙ্গে!

—ফুটুদার সঙ্গে।

—সে আবার কে?

—আছে একজন।

—তোকে কে বলল?

—আমি জানি।

—ভ্যাট। কোথা থেকে এক ফুটুদা জুটিয়েছে। বোকা কোথাকার। অ্যাই ফুটুদাটা কে বল তো?

—সে আছে।

—মারব থাপ্পড়। কোন বদমাশের পাল্লায় পড়েছিস বল তো! খবরদার ও সব ফুটুদা মুটুদাকে একদম লাই দিবি না।

—ফুটুদা তো খুব ভালো।

—তোর আবার ভালো মন্দ। একটু যদি বুদ্ধি থাকে।

গঙ্গারামপুরে নেমে পড়ল দুজন। গঙ্গারামপুর এলেই বুকের ভিতরে কী যেন একটু চলকে ওঠে শেফালির। এ বড় দুষ্টু জায়গা। এ বড় পাগল জায়গা। এখানেই মরবে একদিন শেফালি।

চার

প্রীতমের পর দুটো বোন, তারপর ভাই। তার ভাইটা এখনও বড্ড ছোট। বছর দশেক বয়স। তাই সদর রাস্তার দোকানটায় বাধ্য হয়ে পরের বোনটাকে বসায়ে। প্রথমে বাবা বিনোদকুমারকেই বসিয়েছিল। কিন্তু বাবা ব্যবসা করবে কী, লোক জুটিয়ে এমন আড্ডা বসাল যে, বিকিকিনি লাটে ওঠার জোগাড়। বাধ্য হয়ে সরস্বতীকে রাজি করাল। সে তো ভয়ে মরে, ও দাদা, আমি যে হিসেবে ভীষণ কাঁচা, কী করতে কী করে ফেলব।

প্রীতম বলল, ঠিক পারবি। শুধু লোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে যাবি না। পয়সা গুনতে পারিস তো, তা হলেই হবে।

—কেউ যদি বদমাইশি করে?

—মুখটা মনে রাখবি। তারপর আমাকে বলে দিবি।

এ তল্লাটে সবাই মোটামুটি প্রীতমকে সমঝে চলে। এক সময়ে সে এ ধারে নিজের শাসন কায়েম করেছিল। এখনও লোকে তাকে ঘাঁটায় না।

সরস্বতীর আজকাল কোনও অসুবিধে হয় না। স্কুলের পর এসে দোকান খুলে বসে এবং দিব্যি সামাল দেয়। দেখতে শুনতে ভালো বলে সরস্বতীর দোকানে খদ্দেরদের আনাগোনা একটু বেশি। ছেলে-ছোকরারা আসে, বুড়ো ধুড়োরাও আসে। ছেলে-ছোকরাদের

চোখ তেমন খারাপ নয়। তাদের চোখে একটু পুজোর ভাব থাকে। ষাট-সত্তর পেরনো বুড়োদের নজর বড্ড খারাপ। যেন পোশাক ভেদ করে ভিতরের ন্যাংটোটাকে জরিপ করতে চায়। কী নোলা রে বাবা!

আজ অবধি অবশ্য দাদার কাছে কারও নামে নালিশ করতে হয়নি। এক রত্তি জায়গা তো, সবাই সবাইকে চেনে। এখানে কেউ ফস করে কিছু করে বসতে সাহস পায় না। তার ওপর দাদা হার্মাদ লোক। তাকে সবাই ভয় খায়।

দোকানটা নতুন। মাত্র ছয় মাস হল খুলেছে। পাউরুটি, ডিম, চা-পাতা, বিস্কুট, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, মাথার তেল, ক্রিম, পাউডার, হজমিগুলি, ডট পেন, খাতা পেনসিল, দিস্তা কাগজ, আঠা, বল, ফিনাইল, অ্যাসিড ইত্যাকার হাজারো জিনিস নিয়ে আগে হিমসিম খেত সরস্বতী। আজকাল খায় না। ধীরে ধীরে জিনিসপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ এসেছে। চোখ বুজে দাম বলে দিতে পারে। পড়াশুনো একটু মার খাচ্ছে বটে, কিন্তু দোকান করতে সরস্বতীর কিছু খারাপ লাগছে না।

ওই দাদা এল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় সরস্বতী। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে ভারী ব্যাগ নামাচ্ছে প্রীতম। সরস্বতী তাড়াতাড়ি গিয়ে এক পাশটা ধরল।

প্রীতম বলল, ছাড়। মেয়েদের ভারী তুলতে নেই। প্রকাণ্ড এবং ভারী ব্যাগখানা দোকানে তুলে দিয়ে প্রীতম বলল, যতটা পারিস নামিয়ে সাজিয়ে রাখিস। বাকিটা আমি এক সময়ে সাজিয়ে দিয়ে যাব।

সরস্বতী ঘাড় কাত করে বলে, আচ্ছা।

তার দেখা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আজ পর্যন্ত দাদা। কী সরল, শিশুর মতো নিষ্পাপ মুখ। পরিশ্রম ছাড়া কিছুই বোঝে না। নিজের পরিবারটি নিশ্চিত ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দাদার এই জান কবুল লড়াই দেখলে পাষণ্ডেরও চোখে জল আসবে। একখানা ভালো জামা-প্যান্ট নেই। ভালো জুতো নেই। আছে শুধু বাপ-মা আর ভাইবোনকে আগলে থাকা।

দাদার প্রতি মায়ের মতোই গভীর এক ভালোবাসা আছে সরস্বতীর। দাদার মতো মানুষ হয় না। এই যে তাদের বাবা বিনোদকুমার সারাটা জীবন পরিবারটাকে ধীরে ধীরে সর্বনাশে নিয়ে যাচ্ছিল, তার জন্যও কখনও বাবার ওপর রাগ করে না তার দাদা প্রীতম! মা তো দিনরাত বাবাকে উস্তমকুস্তম করে ছাড়ে। কিন্তু দাদা ঠিকই বাবার প্রিয় মাছ-তরকারি কিনে আনে। জামা-জুতো কিনে দেয়, সিগারেট-দেশলাইয়ের অভাব রাখে না। প্রীতম বলে, মানুষ যেমনই হোক আমি বিচার করার কে? জন্মদাতা বাপ বলে কথা, বাবা এক মস্ত জিনিস।

আপাত দৃষ্টিতে প্রীতমের শরীরে রাগ নেই। কিন্তু কখনও রাগলে যে সেই রাগ ভয়ংকর তাও সবাই জানে।

ল্যাকপ্যাক একটা হাফপ্যান্ট পরা ছেলে উঁকিঝুঁকি মারছিল।

—কে রে? কী চাস?

—ফুটুদা নেই?

—ফুটুদাকে কি দরকার তোর?

ছেলেটা বড় বড় দাঁত বার করে হাসছে। কেবল হাসছে।

—এমনি।

—তুই কোন বাড়ির ছেলে?

—ওই স্টেশনের দিকে। লক্ষ্মী রায়ের বাড়ি।

—কী চাস?

—এমনি। এলাম তো, তাই।

—দাদা যে এ দোকানে বসে না, তা জানিস না? মুদির দোকানে বসে। চিনিস? ওই বাঁ হাতে গলির ভিতরে।

ছেলেটা হেসেই যাচ্ছে।

—অমন হাসছিস কেন? নাম কী তোর?

—সীতানাথ। সীতু।

—কোন ক্লাসে পড়িস?

—থ্রি।

—অ্যাঁ! থ্রি কী রে?

—ক্লাস থ্রিতে পড়ি।

—এ বাবা, এত বয়সে মোটে থ্রি! বছর বছর ডাব্বা মারিস বুঝি?

—হ্যাঁ।

সরস্বতী হেসে ফেলল। এমন ভাবে হ্যাঁ বলল যেন গৌরবের ব্যাপার।

—ফুটুদার সঙ্গে তোর কীসের দরকার?

—এমনই। দিদিকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই ভাবলাম ফুটুদার সঙ্গে একটু গল্প করি।

—তাই বুঝি! তা তোর দিদি কে?

—শেফালি। ক্লাস নাইন।

—ও। তুই শেফালির সেই হাবা ভাইটা বুঝি?

—হ্যাঁ।

—হারাবে কোথায়? এইটুকু জায়গায় কি কেউ হারাতে পারে? ভালো করে খোঁজ। কোনও দোকানে বোধহয় কেনাকাটা করছে। পরশু ইঁদুর মারার ওষুধ আটার গুলিতে মাখিয়ে দোকানের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছিল সরস্বতী। আজ মাঝেমধ্যে পচা গন্ধ পাচ্ছে। চারটে ঘেঁষাঘেষি কাচের আলমারি, শো-কেস, বসবার টুল। মেজেতে অ্যাসিড, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডারের শিশি আর প্যাকেটের সংকীর্ণ পরিসরে মরা ইঁদুর খুঁজে বের করা সহজ

কাজ নয়। ফুরসুতই বা কোথায়? এই তো, পরপর চার জন খদ্দের আর একঝাঁক বাচ্চা মেয়ে এসে কত কী নিয়ে গেল। বিক্রি হওয়া জিনিসের নাম আর দাম খাতায় টুকতে টুকতে সরস্বতী বলল, অ্যাই, একটা কাজ পারবি?

—কী কাজ?

—করিস যদি বিস্কুট খাওয়াব।

—বলো না, কী কী করতে হবে?

—মরা ইঁদু খুঁজে বের করতে হবে। তুই তো রোগা পটকা আছিস। ঠিক পারবি। দেখ না ভাই। ওই আলমারির তলায় টলায় কোথায় আছে। অন্ধকারে কি দেখতে পাবি? দাঁড়া, একটা মোম জ্বেলে দিই।

—আমি খুব ভালো দেখতে পাই। মোম লাগবে না।

সীতু দিব্যি হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে লাগল আনাচ কানাচ। একটু ভয় হল সরস্বতীর। শেফালি যদি জানতে পারে যে তার হাবা ভাইটাকে মরা ইঁদুর খুঁজতে লাগিয়েছে তাহলে কি দু-কথা শোনাতে ছাড়বে? ছেলেটা তো হাবা, ভালো-মন্দ বোঝে না। কিন্তু, হাবা লোক না থাকলে দুনিয়াটা কি চলে? ওই জন্যেই তো ভগবান দু-চারটে হাবা লোককে দুনিয়ায় পাঠান।

দু-হাতে দুটো মরা ইঁদুরের লেজ ধরে বের করে এনে তার মুখের সামনে দুলিয়ে একগাল হেসে সীতু বলল, এই দুটোই ছিল, আর নেই।

নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সরস্বতী আর্তনাদ করে উঠল, উঁঃ! ফেলে দিয়ে আয় না।

সীতুর ঘিনপিত নেই। নির্বিকার মুখে ইঁদুরদুটোকে নাচাতে নাচাতে দোকানের পিছনে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসে বলল, কাক এসে নিয়ে গেল।

সরস্বতী বলে, ওই কোণে বোতলে জল আছে, হাত ধুয়ে নে তো। তোর বাপু একটুও ঘেন্নাপিত্তি নেই।

—ইঁদুরের বিষ দিয়েছিলে তো? কাকদুটোও মরবে তা হলে।

—মরুক গে। কাঠের বাক্সে সোডা আছে। একটু হাতে নিয়ে ঘষে ঘষে হাত ধুয়ে আয়।

সীতু বেশ বাধ্যের ছেলে। যা বলা হল, তাই করল। আসলে, বুদ্ধি নেই বলেই যে যা বলে তা শোনে।

দুটো ফুকিন বিস্কুট বয়ম থেকে বের করে দিল সরস্বতী। দোকান থেকে কাউকে বিনা পয়সায় কিছু দেওয়া বারণ। তাই নিজের ছোট্ট বটুয়া থেকে বিস্কুটের দাম নিয়ে ক্যাশবাক্সে রেখে দিল।

—খা।

কুড়মুড় শব্দে বিস্কুট দাঁতে ভেঙে সীতু বলল, দিদি তো খাওয়াবে বলেছিল। কোথায় যে গেল!

মনোরঞ্জন মাইতি চানাচুরের প্যাকেট, পরিমল আদক ডিমসুতো, অনাদি দাস থিন অ্যারারুট আর দুটো মেয়ে স্যাম্পু আর সাবান কিনে নিয়ে গেল।

একটু ফাঁক পেয়ে সরস্বতী বলল, কী বলছিলি যেন?

কাউন্টারের বাইরে এক কোণে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রাস্তা দেখছিল সীতু। দিদিকেই খুঁজছিল বোধহয়। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সরস্বতীর দিকে চেয়ে বলল, তোমার ডান কাঁধে একটি টিকটিকি পড়বে।

—অ্যাঁ। টিকটিকি পড়বে কেন রে?

—পড়বে। দেখো।

—দূর পাগল! এ ঘরে একটাও টিকটিকি নেই। আমি টিকটিকি ভীষণ ঘেন্না পাই, বাবা।

—দিদিও পায়। ডান কাঁধে টিকটিকি পড়লে অনেক টাকা হয়।

—দূর বোকা। আমার কাঁধে টিকটিকি পড়বে, তুই কী করে জানলি?

—পড়বে।

—আমার ভয় করে না বুঝি? ভয় দেখাচ্ছিস, না ইয়ারকি মারছিস?

—টিকটিকি কামড়ায় না।

—হ্যাঁ, তুই বড় জানিস কিনা!

ভিড়ের ভিতর থেকে একটা শ্যামলা মেয়ে দোকানের আলোয় এসে দাঁড়াল। বলল, এই হাঁদারাম, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? কতক্ষণ ধরে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তোকে।

—ফুটুদার খোঁজে এসেছিলাম।

—ফুটুদা! ফুটুদা কে?

সরস্বতী বয়মের আড়াল থেকে মুখ তুলে বলল, আমার দাদা। তোমার ভাই আমার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিল।

শেফালি তার বন্ধু নয়। এক ক্লাস নীচে পড়ে। তবে, চেনা।

শেফালি একটু জড়সড় হয়ে বলল, ও, এই দোকান তো প্রীতম...

—হ্যাঁ, দাদা সময় পায় না বলে আজকাল আমি বসছি।

শেফালি যেন একটু কেমনধারা হয়ে গেল। বলল, ও, তুমি প্রীতমদার বোন! আমি জানতাম না।

—এসো না, আমাদের দোকান দেখে যাও।

—এসেছি তো। সীতু তোমাকে বোর করছিল বুঝি?

—না। তবে, ভয় দেখাচ্ছিল।

—ওমা! তাই নাকি?

ঠিক এই সময় ঝপ করে সরস্বতীর ডান কাঁধে নরম মতো কী যেন পড়ল। আর, পড়েই কিলবিল করতে লাগল।

—ও মাগো, এটা কী! কী এটা...

বলেই টুল থেকে লাফিয়ে উঠে কাঁধ একটা ঝকটা মারতেই তার ডান কাঁধ থেকে একটা টিকটিকি কাউন্টারের কাচের ওপর ছিটকে পড়ল।

অবিশ্বাস্য! অবাক চোখে চেয়েছিল সরস্বতী।

—কী হল, কী পড়ল গায়ে? বলে তাড়াতাড়ি দোকানের পাদানিতে উঠে এল শেফালি।

সীতু বলল, টিকটিকি।

সরস্বতী কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর হাঁফধরা গলায় বলল, তোমার ভাইটা...

—ভাইটা কী করেছে?

—বড় অদ্ভুত ছেলে তো! একটু আগেই বলেছিল, আমার ডান কাঁধে নাকি টিকটিকি পড়বে। কী করে বলল, বলো তো?

শেফালি হেসে বলে, ও তো কেবল আবোলতাবোল বকে।

সরস্বতী বড় বড় চোখে একবার সীতুর দিকে তাকিয়ে ফের শেফালির দিকে ফিরে বলল, তাহলে টিকটিকির কথাটা কী করে বলল, বলো তো! আমার এ দোকানে আমি একটাও টিকটিকি কখনও দেখিনি। আজই প্রথম...

টিকটিকিটা ঝিম ধরে কিছুক্ষণ পড়ে থেকে তারপর ধীরে ধীরে শোকেস পার হয়ে দেয়ালে উঠে গেল। দুজনেই দেখল দৃশ্যটা। সীতু নয়। সে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। বিস্কুট খাচ্ছে আর হাসছে।

—ও অত হাসে কেন?

—ওটাই তো ওর রোগ। বকুনি খায় কত, তবু ওর হাসি সারে না। এই বোকাটা, চপ খাবি বলেছিলি না?

—খাওয়াবি?

—চল?

সরস্বতী এই দুই ভাইবোনের কথার মধ্যে পড়ে বলল, দাঁড়াও। আমার আজ খুব ইচ্ছে করছে তোমাদের দুজনকে চপ খাওয়াতে।

শেফালি বলল, না না। তুমি কেন খাওয়াবে?

—খাওয়ালেই বা! এই সীতু, মাঝেমাঝে আমার কাছে আসবি তো। তুই যা সাংঘাতিক ছেলে, আমাকে আজ ভারি চমকে দিয়েছিস। এসো না শেফালি, দোকানের ভিতরে এসে

বসো। বসার জায়গা আছে। আমি চপের কথা বলে দিয়ে আসছি। ষষ্ঠীপদ দোকানের গরম চপ পাঠিয়ে দেবে।

দোকানের ভিতরে বসবার জায়গা আছে বললে ভুল হবে। একটা ওলটানো কাঠের বাক্স আছে। বোধহয় সেটাতে উঠে দাঁড়িয়ে সরস্বতী ডিং মেরে উঁচু তাকের জিনিস পাড়ে। ভাইবোন তাইতেই ঘেঁষাঘেষি করে বসল। সরস্বতী চপের কথা বলেই ফিরে এসে বলল, এখুনি আসছে।

*

চপ খেতে খেতে কত গল্পই যে হল! সরস্বতীর মুখে শুধু তার দাদার কথা। দাদার মতো মানুষ যে হয় না, সেটা শতমুখে বলছিল। কথাগুলো হাঁ করে গিলছিল শেফালি। হ্যাঁ, শেফালি জানে, পৃথিবীর সেরা পুরুষও, প্রীতম। ওরকম আর একজনও চোখে পড়ল না তার। শেফালি এই দোকানঘরের বসে প্রীতমের গায়ের স্বেদগন্ধ পাচ্ছে। এই দোকানের আনাচেকানাচে তার স্পর্শ। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। চপের ডেলা গিলতে পারছে না। একখানা পেটুক ভাইটাকে দিয়ে দিল।

ফেরার সময় শেফালি বলল, অ্যাই, তুই টিকটিকি পড়ার কথা কী বলেছিলি?

—জানতাম, তাই বলেছিলাম।

—তুই তো কেবল আবোলতাবোল বলিস।

—না। আমি টের পেয়েছিলাম। মনে হল, তাই বলেছিলাম।

—তুই তো বলেছিলি, ফুটুদার সঙ্গে নাকি...হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ

—ঠিকই বলেছি।

—কী ঠিক বলেছিস?

—তোর তো ফুটুদার সঙ্গেই বিয়ে হবে।

—যাঃ, পাজি কোথাকার!

—দেখিস।

হঠাৎ সর্বাঙ্গে শিরশির করল তার। কাঁটা দিল গায়ে। সত্যিই কি সীতু কিছু টের পায়? ওর কথা সত্যিই ফলে? হে ভগবান...

পাঁচ

কার্তিক মাসে শীত করার কথা নয়। কিন্তু বিনোদকুমারের আজকাল শীত করে। তাই সে বিকেলে গায়ে একটা আলোয়ান চাপিয়ে বেরিয়েছে। সঙ্গে ছোট মেয়ে বিম্ববতী। সামান্য

সবজিবাজার, তাও আজকাল বইতে পারে না বিনোদকুমার। শরীরটা যে গেছে তা আজকাল বেশ মালুম হচ্ছে, তার নাম ছিল বিনোদবিহারী। পিতৃদত্ত নাম। যাত্রা-থিয়েটার যখন করত তখনই বিহারী ছেড়ে কুমার করে নিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল শিশির ভাদুড়ি, উত্তমকুমারের লাইনে নিজেকে তুলে ধরবে। সংসার-টংসারে মোটে মন ছিল না। বউটা ঘর আগলে পড়ে থাকত আর বিনোদকুমার ইচ্ছে-ঘুড়ি ওড়াতে বেরিয়ে পড়ত। আকাশে মই লাগানোর বৃথা চেষ্টায় জীবনটাই পড়ে গেল হাওলাতে। টাকাপয়সা যে কোন গাছের পাখি সেটা আজ অবধি বুঝতে পারল না সে, তার সঙ্গে চিরকাল ফেরেববাজি করে গেল ওই শালার টাকাপয়সা। জুয়োর লাক তার কিছু খারাপ ছিল না, শখ করে তাসে বসলে এক সময়ে বিশ-পঞ্চাশ টাকা আসত। কিন্তু যেই বরাত ফেরাতে কোমর বেঁধে বসল সেদিন থেকেই বরাতও বেইমানি শুরু করে দিয়েছিল।

—ফের বিড়বিড় করছ বাবা?

থতমত খেয়ে বিনোদকুমার বলল, কই? এই তো চুপ করেই আছি।

—ওম্মা গো; পষ্ট শুনলুম যে!

বিনোদকুমার আজকাল প্রায় সবাইকেই ভয় পায়। এমনকী এই এগারো বছরের মেয়ে বিম্ববতীকেও। মেয়েটা কটকটি আছে। তাকানোর মধ্যে মায়াদয়া নেই।

বিনোদকুমার বলল, বিড়বিড় নয়, ডায়ালগ বলছিলুম রে।

—কীসের ডায়ালগ?

—কত নাটকের ডায়ালগ আজও মুখস্থ আছে। সেই সব মনে পড়ে তো, তাই।

—মুখ চেপে বন্ধ করে রাখো। লোকে পাগল ভাববে।

—তা ভাববে কেন? আমি কি পাগল? সবাই চেনে আমাকে।

—চেনে বলেই তো মুশকিল। জোরে হাঁটো তো।

বিনোদকুমার এককালে পরগনার মাঠঘাট তো কম ঠ্যাঙায়নি। লম্বা লম্বা হাঁটাপথ পেরোতে হয়েছে। কখনও জলকাদা ভেঙেছে। কিন্তু এখন শরীরের মধ্যে একটা শীত ঘনিয়ে উঠেছে। হাত পা যেন সিঁটিয়ে থাকে। তাতে জোরবল সবই খামতি পড়েছে।

—তুই এগিয়ে হাঁট না। আমি ঠিক গিয়ে তোকে ধরে ফেলব।

—না, তুমি ফের গিয়ে আড্ডায় বসে যাবে।

—আড্ডা? না, না, সে আর কোথায়? গিরি মল্লিক মরে গিয়ে অবধি আর একটাও ঠেক নেই। বুঝলি? আড্ডা সব উঠে গেছে।

—তোমাকে বিশ্বাস নেই। এসো আমার সঙ্গে সঙ্গে।

তার বউ মালতী মেয়েকে একা ছাড়বে না বলে সঙ্গে তাকে আসতে হয়। নিয়মমাফিক। বাজার করার টাকাগুলো পর্যন্ত তার হাতে দেয় না মালতী। সেটাও বিম্ববতীর কাছে। তাকে কেউ এখন আর বিশ্বাস করে না।

ফুটু না থাকলে বিনোদ সন্নিসি হয়ে যেত। একমাত্র ওই ছেলেটাই যা একটু মায়া করে তাকে। কিন্তু বিনোদ হাড়ে হাড়ে জানে, এই মায়াটুকু সে অর্জন করেনি, ওটুকু তার ছেলেরই গুণ। একেবার বাতিল মানুষটাকেও বুঝি ভগবান একটু কিছু দেন, ওই মায়াটুকু।

উড়নচণ্ডী মানুষের এই এক অসুবিধে। ঘরদোর ভালো লাগে না। সংসারের নিত্যদিনের দিন গুজরান বড্ড আলুনি লাগে। সকাল হল তো মশারি খোলো, বিছানা ঝাড়ো, ভাত বসাও, কুটনো কোটো, ফাঁকে ফাঁকে ক্যাট ক্যাট করে শতেক কাজ-অকাজের কথা শোনো আর চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরপাক খাও। ঘর, উঠোন, বাগান ব্যস। তারপর সংসারের সীমানা শেষ। এই যে বাইরের দুনিয়াটার খোলামেলা সীমানাহীনতা এতেই বিনোদ আজও বড় স্বস্তি বোধ করে। তবে বয়স আর শরীরের অক্ষমতা তার একটা সীমানা বেঁধে দিয়েছে। লম্বা দড়ি পরানো আছে গলায়, খুঁটো টেনে রাখে।

—হাঁফ ধরছে কেন রে?

—কার হাঁফ ধরছে? তোমার?

—জোরে হাঁটতে বলিস, আমি কি পারি?

—একটু দাঁড়িয়ে দম নিয়ে নাও। বাজার তো এসে গেছে।

—হাঁটুতে জোর নেই মোটে। শচীর দোকানে বরং একটু বসি।

—ওমা! ও তো সেলুন। কুচি কুচি চুল উড়ছে সব সময়ে।

—আমি বরং খেউরিটা হয়ে নিই। গালে দাড়ি বিজবিজ করছে। ততক্ষণ একটু বসাও হবে।

—তা হলে যাও, হলে দিদির কাছে দিয়ে দোকানে বসে থাকো। যাওয়ার সময় তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।

ওটা ভাঁওতাবাজি। সবজি বাজারের মতো ভ্যাতভ্যাতে জিনিস আর নেই। কাল শনিবার। তার বউ মালতী শনিবারটা হেঁসেলে মাছ ঢুকতে দেয় না। নিরামিষ কি গলা দিয়ে নামে বাপ? শনিবার এলেই তার মনটা নেতিয়ে পড়ে।

খদ্দের ছিল বসে একটু বসতে হল। তা হোক, বসাই তো চায় বিনোদ। বাজারে তার বিস্তর চেনা মানুষ। বয়সের মানুষরা অবশ্য আর গুনতিতে বেশি নেই। ফিফটি পারসেন্ট টেঁসে গেছে। যারা আছে তাদেরও অনেকেই খাড়া নেই। কেউ শয্যাশায়ী, কেউ বা মরো-মরো। দু-চারজন যা আছে, ঘোরাফেরা করে তাদের সঙ্গে এই জায়গাতেই যা দেখা হয়ে যায়।

বসে একটা সিগারেট ধরাল বিনোদ।

পাশে বসা লুঙ্গিপরা একটি হাড়গিলে লোক বিড়ি খাচ্ছিল। কাঁচা-পাকা চুল, গালে পাতলা দাড়ি, নাকের নীচে ভুঁড়ো গোঁফ। কয়েকবার তেরছা চোখে চেয়ে দেখল তাকে। তারপর হঠাৎ বলল, বিনোদ না?

বিনোদ একটু অবাক হয়। নাম ধরে ডাকে কে রে বাবা? বয়সের একটা সম্মান নেই?

—কে হে তুমি?

—আমি রজব আলি। বীরশিবপুর। মনে পড়ে?

তাই তো! রজবের সঙ্গে একসময়ে বেশ মাখামাখি ছিল তার। আলকাপের দল ছিল রজবের। গলা দরাজ। কত আসর মাত করেছে।

বিনোদ বলে ওঠে, দিব্যি তরতাজা আছো তো! বুড়ো হওনি কেন?

—আমাদের কি বুড়ো হলে চলে! খেটেখুটে খেতে হয়।

—তবে আমি বুড়ো হলাম যে?

—তাই নাকি? তোমার আমার তো একই বয়স। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে। তা তুমি আগ বাড়িয়ে বুড়ো হতে গেলে কেন? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

—বড় চিন্তায় ফেলে দিলে মিঞা।

—কেন চিন্তাটা কীসের তোমার?

—চিন্তা হবে না? ঘরে বসে বসে কেবল ভাবি, বুড়ো হচ্ছি, বুড়ো হচ্ছি। আর ভাবতে ভাবতে হাতে-পায়ে বুড়োটে ভাবও এসে গেল। এই যে হঠাৎ তোমাকে দেখছি, দিব্যি তরতাজা আছো। তাই মনের মধ্যে একটা টানা হ্যাচড়া পড়ে গেল।

—ওরে বাপু, বুড়ো তো আমারই আগে হওয়ার কথা। ছেলেগুলো মানুষ হল না তেমন। বড়টা বোকাসোকা, মেজো জন ভ্যান চালায়, পরেরটা কী করে বেড়ায় আল্লা জানে, ছোট জন ওর মধ্যেই একটু ভালো। মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে যায়। আর তোমার দেখো, ছেলেখানা জব্বর দাঁড়িয়েছে। ফুটুর কথা সবাই বলাবলি করে। তোমার চিন্তা কীসের হে?

—তাই ভাবছি। সব ওলটপালট করে দিলে হে। এখন আবার ফিরে সব হিসেবনিকেশ করতে হবে।

—ওই দেখো। এতে আবার হিসেবনিকেশের কী?

—এই বয়স-কাল, অবস্থা-ব্যবস্থা। নিজেকে জরিপ করা বড় শক্ত কাজ হে, রজবভাই।

দাড়িটা আর কামানো হল না। গালে হাত বোলাতে বোলাতে উঠে পড়ল বিনোদ।

—চললে কোথায় হে?

—একটু দেখি, মেয়েটা কোথায় গেল। বাচ্চা মেয়ে দেখে দোকানিরা কী গছিয়ে দেয় কে জানে।

আসলে বিনোদের কেমন বেশ ঝরঝরে লাগছে। একটু আগে যেন গা থেকে একটা ভেজা কম্বল সরিয়ে নিয়েছে কেউ। এখন আর শীত করছে না তেমন। গায়ের আলোয়ানটা খুলে ভাঁজ করে কাঁধে ফেলল সে।

ভিড়ের ভিতরে একটা রোগা ছেলে আর যুবতী মেয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটা বলে উঠল, ওই দ্যাখ দিদি, ফুটুদার বাবা।

মেয়েটা ভারি অবাক চোখে তাকাল বিনোদের দিকে। তাকানোটা ভারি ভালো লাগল বিনোদের। আজকাল তো আর কেউ তাকায় না। উচ্ছিষ্টের মতো পড়ে আছে এক ধারে।

না, দিনটা আজ ভালোই গেল।

বুক চিতিয়ে সপাটে খানিক হাঁটার পরই বিনোদকুমার বুঝল, বুড়োবয়সকে খুব বেশি পিছনে ফেলতে পারেনি। পোষা কুকুরের মতো গা শুঁকতে শুঁকতে পিছন পিছন আসছে। টের পেল, যখন হাঁফ ধরে যাওয়ায় মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দম নিতে হচ্ছিল। ওরে বাপু! যৌবনপ্রাপ্তি কি আর ছেলের হাতের মোয়া? বয়স তেমন ভাঁটিয়ে যায়নি কিন্তু শরীরের জোয়ার নেমে গেছে। বয়সকালে নেশাভাঙও তো কম করেনি! তার ওপর এই ফুকফুক রোজ ডজনখানেক সিগারেট ফোঁকা—এরও তো মাশুল আছে, নাকি?

মাশুল মেলাই দিতে হচ্ছে বিনোদকে। কতক জানিত কর্মফল, কতক অজান। আটন গেট-এ তার একজন মেয়েমানুষ ছিল, একজন ছিল ফুলেশ্বরে। সব্বার নামও মনে নেই। পাপটাপ যখন করেছে, তখন পাপ জেনেই করেছে। তবে মনস্তাপ ছিল না। একটু আধটু তো ওরকম হবেই বাপু! তখন বিনোদের চেহারাখানা কী ছিল বলো! নদের নিমাই করে কত বুড়োবুড়ির চোখে জল এনে ফেলেছিল। কত বুড়ি পালার পর পায়ের ধুলো নিয়ে যেত।

বিনোদ টের পেল, বয়সটা তার পায়ের গোছের কাছেই বসে আছে। তাড়ালেও যাবে না। অথচ হিসেবের বয়স তার হয়নি।

—বিনোদ নাকি রে? এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?

বিনোদ দেখল, সামনে সফলরাম। তা সফলই বটে। গঙ্গারামপুরের সব কটা টাকওলা লোককে পাল্লার এক ধারে, আর সফলরামকে অন্য ধারে চাপালে সফলের দিকেই পাল্লা মাটিতে ঠেকবে।

—এই মেয়েটির জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

—তা দাঁড়িয়ে থাকবি তো থাক না! বিড়বিড় করে কাকে গাল দিচ্ছিস?

বিড়বিড় করছে নাকি সে? ওই এক মুশকিল হয়েছে আজকাল। সে টের পায় না, কিন্তু লোকে দেখতে পায়। সে নাকি একা একা বিড়বিড় করে। তা করে হয়তো, কিন্তু সেটা টের পায় না কেন সেটাই বুঝতে পারে না বিনোদ।

—গাল দিচ্ছি না দাদা, নানা কথা ভাবছি আর কী!

—পষ্ট দেখলুম হাত-পা নেড়ে কথা কইছিস! বলি লোককে শাপশাপান্ত করিস না তো?

—কী যে বলেন দাদা!

—বিচিত্র কী! ঘরবসা লোকের মনে মেলা গাঁদ জমে থাকে তো!

প্রকৃতির নিয়মেই বড়লোকদের সামনে বিনোদ ভারি দুর্বল বোধ করে। মনের জোরটা পায় না। টাকার জোরের কাছে কোন জোরটাই বা খাটে বাপু? সে একটু হেঃ হেঃ করে বলল, ঘরবসা না হয়ে উপায়ই বা কী বলুন? শরীরটা জুত-এর নেই।

—তাই থাকে রে পাজি? তুই তো চিরকালের নষ্ট! এইটুকুন বেলা থেকে দেখে আসছি। তবে তোর কপালটা বড্ড ভালো।

সসম্ভ্রমে চুপ করে থাকে বিনোদ।

সফলরাম নিজেই বলে, তুই নষ্ট হলেও ছেলেটা তোর ভালো। তোর মতো লপেটাবাবু নয়। করে-কর্মে দাঁড়িয়ে গেছে।

—তা আপনাদের আশীর্বাদে।

এটা কলিযুগ জানিস তো। এ যুগে আশীর্বাদও ফলে না, অভিশাপও ফলে না। এ হল নগদা-নগদির যুগ, যেমন করবি তেমনি পাবি। জুয়োর ধান করে নেংটি-ঘটি সার করলি, এখনও চোখ খুলল না? আশীর্বাদ টাশীর্বাদ সব বাজে কথা। ছেলেটা যে তোর মতো হয়নি সেইটেই তোর কপাল।

তা বিনোদ এ সব কথাও বিস্তর শোনে। ঘরে, বাইরে, পথেঘাটে। বউ শোনায়, আত্মীয়স্বজন শোনায়, উটকো লোকও শোনায়। কিছু ভুলও শোনায় না। হ্যাঁ, তার ছেলেটা ভালো, আর সে খারাপ। তা বাপু, তাতে হলটা কী?

কী একটা কথা বলছিল সফলরাম, ধরতাইটা ঠিকমতো শোনেনি। কানের দোষই হবে বোধহয়। শেষটা শুনতে পেল, আমি বাপু রাজি হইনি।

—কথাটা কী হচ্ছিল দাদা?

—তোর ছেলের কথাই হচ্ছিল। আমার বউমা বলছিল, ফুলির সঙ্গে ফুটুর সম্বন্ধ করলে কেমন হয়! আমি বলে দিয়েছি, ও লাইনে মোটেই চিন্তা কোরো না। ছেলে ভালো হলে কী হবে, বিনোদেরই তো রক্ত। রক্তে রক্তে কোন বিষ অর্শায় তার ঠিক কী! তোর কাছে বলেছে কিছু?

ব্যাপারটা স্পর্ধারই সামিল। জিভ কেটে বিনোদ বলল, আজ্ঞে না, ওরকম কোনও কথা হয়নি মোটেই।

—আর হবেও না। বারণ করে দিয়েছি। আগেভাগেই জানিয়ে রাখা ভালো, নইলে আবার একটা প্রত্যাশা থাকবে তো!

না, বিনোদের কোনও প্রত্যাশা নেই। বউ মানেই একটা ফ্যাকড়া, একটা বাধক। বউ-বাচ্চার জন্যই না বিনোদের দুই নৌকোয় পা রেখে জীবন কাটল! ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে সে বলে, না, না, তা হয় না।

ঘাড়ে দু-দুটো আইবুড়ো বোন, জুয়াড়ি বাপ, কে যে বউমাকে বুদ্ধিটা দিল কে জানে!

সফলরাম ঠোঁটকাটা লোক সবাই জানে। বিনোদের মোটেই রাগ বা অপমান হল না। সে দিব্যি হাসি-হাসি মুখ করে বলে, সে তো বটেই।

সফলরাম চলে যাওয়ার পরও খানিক দাঁড়িয়ে রইল বিনোদ। তার একটু ভয় হচ্ছে। ফুটু বিয়ে করে বসলে তার নতুন বিপদ দেখা দেবে। বউ এসে যদি বাড়ি-ছাড়া করে, তা হলে তাকে এই বাজারেই ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করতে হবে।

—ও বাবা!

চটকা ভেঙে বিনোদ দেখে, সামনে বিম্ববতী।

—চল মা, বাড়ি চল। বাজার হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—দে, একখানা ব্যাগ বরং আমাকে দে।

—আমি পারব। তুমি চলো তো!

বুকটা ধকধক করছে। এখনও হাঁফটা পুরোপুরি কাটেনি। বয়স হয়েছে কী হয়নি, তা ঠিক বুঝতে পারছে না বিনোদ।

ছয়

ডালের বস্তার ওপর টং-এ বসে এক্সারসাইজ খাতায় হিসেব করছিল প্রীতম। বাহ্যজ্ঞান নেই। হিসেব করতে তার বড় ভালো লাগে। আর ব্যবসার প্রাণ হল হিসেব। আগে হিসেবের কায়দাটা ভালো জানা ছিল না তার। মণিরাম শিখিয়েছে। বলেছে, হিসেবটা যদি ঠিকমতো করতে পারিস তো ভিত বেঁধে ফেললি। ওইখানে ভুলচুক করলে দর ফেলতে গড়বড় হয়ে যাবে। তা হলেই সর্বনাশ।

দোকান সামলাতে পরেশকে রেখেছে সে। মাইনে দিয়ে লোক রাখার মতো তালেবর সে এখনও হয়নি। পরেশ এক রকম যেচে এসেই আগ বাড়িয়ে দোকানের ভার নিয়েছে। তার মুশকিল হল, থাকার জায়গা নেই। ট্রাকের খালাসি ছিল। গড়বড়ে জিনিস লোড হত ট্রাকে। ড্রাইভার আর তার এক অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। আর সেই সময়টায় পেচ্ছাপ করতে নেমেছিল বলে বেঁচে যায় পরেশ। সেই থেকে পালিয়ে আছে। ঘনশ্যাম ব্যাপারি পাইকার। তারই কেমন একটু আত্মীয় হয় বলে ঘনশ্যামই একদিন এসে গছিয়ে গেল। বলল, কটা দিন থাকতে দাও। ও বেচারার দোষ নেই, সাতে-পাঁচে ছিলও না, ফেঁসে গেছে ঝুটমুট। গণ্ডগোল থিতু হলে ফিরে যাবে। চুরিটুরি করলে আমি জামিন আছি।

সেই থেকে পরেশ আছে। ছেলে কিছু খারাপও নয়। দু'বেলা ঘনশ্যামের বাড়িতেই খেয়ে আসে। দিনে পাঁচ টাকা করে হাতখরচ দেয় প্রীতম। সুবিধে হল, সে মাল আনতে গেলে দোকানটা চালু রাখে পরেশ। খদ্দের ফিরে যায় না। রাতে চাল-ডালের বস্তার ওপর শুয়ে ঘুমায়। কিন্তু মুশকিল একটাই। সর্বদা একখানা দুঃখী মুখ চোখের সামনে দেখতে প্রীতমের মোটেই ভালো লাগে না। চোখটাও যেন সব সময় কান্নার আগে ছলোছলো মতো হয়ে থাকে। কথা বিশেষ কয় না। ভারি চুপচাপ আর মনখারাপ। এইটেই কেমন যেন সহ্য হতে চায় না প্রীতমের।

চাপাচাপি করায় একদিন কেবল বলেছিল, কত দূরে দূরে চলে যেতুম তো, সেইটে ভেবে কষ্ট হয়।

দুনিয়ায় হরেক রকমের চিড়িয়া, কার যে কীসের ওপরে টান তা বোঝে কার বাপের সাধ্যি। টাকাপয়সার আমদানি নেই, ছুটি নেই, ভবিষ্যৎ নেই, শুধু দূরে দূরে যাওয়ার আনন্দ আবার কেমনধারা, কে জানে বাপু!

একটা রোগাভোগা চেহারার ছেলে উঁকিঝুঁকি মারছিল, বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে দেখা যাচ্ছিল না।

—এটা কি ফুটুদার দোকান?

পরেশ কী বলল, বোঝা গেল না।

—সীতু নাকি রে? বলে বস্তার ওপর থেকে নেমে এল প্রীতম।

—ভেতরে আয়।

—তুমি আর পিউ স্টোর্সে বসো না?

—দু'দুটো দোকান সামলানো কি সোজা! ওটাতে সরস্বতী বসে।

—এ দোকানটাও তোমার?

—হ্যাঁ, জিলিপি খাবি?

—না, সরস্বতীদি তো খাইয়েছে।

—তাই বুঝি?

—দুটো।

প্রীতম হাসল। বোকা ছেলেটা অল্পেই ভারি খুশি হয়।

—আমার হিসেবের খাতাটা একটু দেখে দে তো। দিবি?

—দাও না।

প্রীতম ওকে এক্সারসাইজ খাতাটা ধরিয়ে দিল। সিল করা তেলের টিনের ওপর নিজেই একটা বস্তা ভাঁজ করে পেতে বসে গেল সীতু। সে আর কিছু না পারলেও যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগটা খুব পারে। কখনও ভুল হয় না। অন্য বিষয়ে ডাব্বা খেলেও অঙ্কে আশি নব্বই পায়।

প্রীতমের হিসেবে কখনও ভুল হয় না। তবু এক জোড়ার চেয়ে দু-জোড়া চোখ সব সময়েই ভালো। আর সীতুর যে অঙ্কের মাথা পরিষ্কার এটা সে ভালোই জানে। আর শুধু অঙ্কই নয়, সীতুর মধ্যে আরও একটা ব্যাপার আছে। সে যখন পিউ স্টোর্সে বসত তখন একদিন জিলিপি খেতে খেতে সীতু বলেছিল, তোমার দাঁড়িপাল্লা নেই?

—না, স্টেশনারি দোকান তো, তাই দাঁড়িপালা লাগে না।

—দাঁড়িপাল্লার দোকান আমার খুব ভালো লাগে।

সেই দাঁড়িপাল্লার দোকান হল এইটে। আর বলতে নেই, এই দোকানে প্রীতম মা লক্ষ্মীর পায়ের মলের শব্দও যেন শুনতে পায়। এই দোকান করেই সে ব্যাঙ্কের টাকা প্রায় শোধ করে এনেছে।

—ও সীতু?

—উঁ!

—দাঁড়িপাল্লার দোকানটা তোর পছন্দ হয়েছে?

—ও লোকটা কে?

—ও পরেশ। কেন রে?

—এমনি। ও আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল।

—তাই নাকি? তোকে চেনে না তো, তাই। আর তাড়াবে না।

—তোমার হিসেব ঠিক আছে। ভুল নেই।

খাতাটা প্রীতমের হাতে দিয়ে উঠে পড়ল সীতু।

—কোথায় চললি?

—দিদিকে খুঁজতে। নগেনের দোকানে ঢুকেছে।

—ওই তো নগেনের দোকান। খুঁজতে হবে কেন, বেরোলেই দেখতে পাবি।

—দিদি বেরোবে না। আমি বেরোলে, তারপর বেরোবে।

—তাই নাকি? কেন কে?

—কী জানি। বলল, তুই প্রীতমদার দোকানে গিয়ে বসে থাক। তুই বেরোলে আমিও বেরোবো।

—তোর দিদিটা কে বল তো?

—শেফালি। ক্লাস নাইন।

—তা হবে, আচ্ছা আজ যা, আবার আসিস।

সীতু চলে গেলে প্রীতম চুপচাপ বসে রইল। সীতুকে দেখে নগেনের দোকান থেকে যে মেয়েটা বেরিয়ে এল তাকে এই সুঁঝকো আঁধারে ভালো দেখতে পেল না প্রীতম। এ দিকে একটু তাকিয়ে রইল মেয়েটা। তারপর সীতুর সঙ্গে চলে গেল।

সন্ধের মুখে খদ্দেরের আনাগোনা বেড়ে গেল খুব। গলির দোকান হলে কী হয়, বিক্রিবাটা খুব ভালো। প্রীতমের কোনও দুঃখ নেই এখন।

পরেশের দোকানদারির অভিজ্ঞতা নেই। চটপটেও নয়। তাই সন্ধের মুখটায় প্রীতমকেই হাত লাগাতে হয়। মুদির দোকানের বিক্রির হিসেব রাখা মুশকিল। শশী পাল কেরোসিন, ব্লেড আর ন্যাপথলিন নিয়ে গেল তো বাসন্তী আড়াইশো সর্ষের তেল, কালোজিরে আর গোলা সাবান। নিত্যানন্দ একখানা ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে হাওয়া হল তো শ্রীপতি এল কাঠকয়লা, গরুর দড়ি আর শটিফুড কিনতে। হিমসিম অবস্থা।

ওরই মধ্যে টুলে বসে রোজকার মতো ফুট কেটে যাচ্ছে হরিপদ দাস, বলি, তোর কি মাথায় কোনও চিন্তাভাবনা নেই! দোকান করলেই হবে? সরস্বতীর তো বাপু সতেরো আঠারো হল, চেহারার চটক থাকতে থাকতে বিয়ে লাগিয়ে দে। সুমন্ত কি খারাপ পাত্তর রে? বারো বিঘে জমি, রাইস মিল, মুড়ি-কল। পছন্দ নয় তো, সুধীর রায়ও আছে। আদালতের বাঁধা সরকারি চাকরি। হোক পিওন, সরকারি চাকরি বলে কথা। বাগনানে পাকা বাড়ি।

কথা কওয়ার সময় নেই, কিন্তু শুনে যেতে হচ্ছে। তবে, প্রীতম বিরক্ত হয় না। হরিপদরও দোষ নেই। পেট চালাতে নানান ধান্দা করে বেড়াতে হয়। জমি-বাড়ির দালালি, ঘটকালি, দরখাস্তর মুসাবিদা, কাউকে ফেলে না প্রীতম, 'দূর ছাই' করে না, তার সর্বদা তূষ্ণী ভাব।

একজন ঝাঁ চকচকে বউ মানুষ এসে দাঁড়াল। শশব্যস্তে বসা থেকে উঠে পড়ল প্রীতম। বাপ রে! সাব ইন্সপেক্টর বরেন মজুমদারের বউ, বন্দনা মজুমদার।

—চাওমিন আছে?

—আছে বউদি।

—লোকাল মেড নয় কিন্তু।

—আজ্ঞে না, ব্র্যান্ডেড মাল।

—আর সয়া সস, চিলি সস?

—আছে বউদি।

মহিলার হাবভাবই অন্যরকম। এ জায়গার সঙ্গে মেলে না। যেমন চেহারার চেকনাই, তেমনই আদবকায়দা। জিনিসগুলো খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বটুয়া খুলে দাম দিয়ে দিল।

—আপনি আজকাল পিউ স্টোর্সে বসেন না?

—না, আমার বোন বসে।

—হ্যাঁ, সেদিন আইলাইনার চাইলাম, খুঁজেই পেল না।

কাঁচুমাচু হয়ে প্রীতম বলে, নতুন তো, তাই। আমি বরং বাড়িতে আইলাইনার পৌঁছে দেব।

—দরকার নেই। আমি আনিয়ে নিয়েছি। আপনি যখন বসতেন তখন পিউ স্টোর্সে মেয়েদের খুব ভিড় হত। আজকাল হয় না। আপনি মেয়েমহলে বেশ পপুলার, তাই না?

প্রীতম লজ্জার হাসি হেসে বলল, মেয়েদের জিনিসপত্র রাখি তো, তাই।

মুখ টিপে একটু হেসে বন্দনা চলে গেল।

হরিপদ পিছন থেকে ফুট কাটল, জব্বর কাস্টমার পেয়েছিস।

—সব কাস্টমারই সমান!

—এমএবিটি, বুঝলি? কিন্তু আজও বাচ্চা বিয়োতে পারেনি।

—মেয়েরা কি শুধু বাচ্চা বিয়োনোর যন্তর নাকি?

—তা নইলে বিয়োবে কে? পুরুষমানুষ আর সব পারে, ওইটি পারে না। বুঝলি রে? যে-মেয়ে ওইটে পারে না, সে যতই তড়পাক, মেয়ে জন্মই বৃথা। পুরিয়ায় করে একটু ইসবগুল দে তো দেখি। আজ মোটে ক্লিয়ার হয়নি। পেটটা থম মেরে আছে।

ইসবগুল সস্তা জিনিস নয়, তাই প্রীতম শশী কবরেজের করা ত্রিফলার গুঁড়ো খানিকটা পুরিয়া করে দিয়ে বলল, এইটে মেরে দাও গে, সকালে বগবগ করে নেমে যাবে।

নির্বিকার মুখে পুরিয়াখানা জামার বুকপকেটে ঢুকিয়ে হরিপদ বলে, দু-দুটো কারবার ফেঁদে বসলি, আমদানিও তো ভালোই দেখছি। এইবেলা একটা পলিসি করিয়ে নিবি নাকি। ধর হাজার পঞ্চাশেক। প্রিমিয়ামও গায়ে লাগার মতো নয়।

প্রীতম একটু হেসে বলল, তুমি কি পোড়াচোখে আর কাউকে দেখতে পাও না? এখনও ভরপেট ভাতের পাকা ব্যবস্থা হয়নি, এর মধ্যেই ওসব লাখ-বেলাখ এনে ফেলছ?

—ওরে, তোরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে, নাকি? বিয়ে করবি, সংসার হবে, তখন...

কে বলল আমার ভবিষ্যৎ আছে? ওসব আমার নেই। আমি শুধু আজকের দিনটা বুঝি। কাল ভোর হলে কালকের কথা ভাবতে লাগব। আগ বাড়িয়ে কবে কি হবে তা নিয়ে মাথা গরম করতে যাব কেন?

প্রীতমের গলায় একটু ঝাঁঝ ছিল, তাইতেই হরিপদ চুপ মেরে গেল। টোপটা খেলো না। বেশিরভাগই খায় না। তা বলে চেষ্টার ত্রুটি রাখে না হরিপদ। কথা পালটে সে বলে, হ্যাঁ রে, মোদকের মধ্যে কি হেরোইন থাকে?

প্রীতম ভ্রু কুঁচকে বলে, হেরোইনের দাম জানো?

—কে যেন বলছিল, শশী কবরেজের মোদকে হেরোইন আছে।

—তোমার মাথা।

—আমিও তাই ভাবছি, হেরোইন থাকলে মোদক এত সস্তা হয় কি করে?

গোপাল মাইতি এসে একখানা বড় ফর্দ দাখিল করে বলল, মেপে রাখ, আধঘণ্টা বাদে নিয়ে যাব। তাড়া আছে।

প্রীতম আর পরেশ ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

হরিপদ আক্ষেপ করে আপনমনেই বলতে লাগল, আহাম্মক আর কাকে বলে? ওর নাকি আখের বলেই কিছু নেই। দুনিয়ার মানুষ আখের গোছানোর জন্য হাঁসফাঁস করে মরছে, তারা কি সব বোকা? দশ পনেরো বছর বাদে যখন গোছা গোছা টাকা পেতিস তখন বুঝতিস পলিসি কি জিনিস। তা না হয় নাই করলি, শেয়ার বাজারেও লাগাতে পারিস কিছু। মন্দা বাজারে ধরলি, তেজি বাজারে ছাড়লি, গায়ে হাওয়াটি লাগল না, হাতে বান্ডিল বান্ডিল চলে এল।

—কথা কমাও হরিদা। কথা বেশি কও বলেই তোমার হাওয়া বেরিয়ে যায়। আজ অবধি কাজের কাজ একটা করে উঠতে পারলে না।

হরিপদ মোটেই রাগ করল না। নির্বিকার মুখে বলে, ওরে, এবার হাওয়া ঘুরবে, দেখিস।

—তাই নাকি?

—শাশুড়ি মরো মরো।

—মরলে কি তুমি গিয়ে খন্যাডিহিতেই গেড়ে বসবে নাকি?

—খন্যাডিহি ভালো জায়গা। ফুলের চাষ হয়। ফসলে আর কটা টাকাই বা থাকে। ফুলের চাষ সারা বছর। গতবারই তো শুনেছি শাশুড়ি চল্লিশ হাজার টাকার ব্যবসা করেছে। দেখাশুনো করার লোক থাকলে আরও হত।

প্রীতম জানে হরিপদ এ জায়গা ছেড়ে নড়বে না। শাশুড়ি মরলে খন্যাডিহি যাবে বটে, কিন্তু দুদিনেই সব বেচেবুচে দিয়ে ফিরে আসবে। তারপর টাকাটা উড়িয়ে ফের এইরকম সন্ধেবেলায় এসে তার দোকনে বসে লেজ নাড়বে। কিছু লোকই থাকে ওরকম, যারা উড়িয়ে যত সুখ পায় তত আর কিছুতে নয়। হরিপদর মধ্যে তার বাবা বিনোদকুমারের একটা আদল আছে। জলের লেখার মতো ভেসে যেতে বড় সুখ পায়। কিন্তু ঘটিয়ে তুলতে পারে না। কেউ জুয়ার বাজি ধরে, কেউ শাশুড়ির মরার জন্য অপেক্ষা করে, কেউ অদৃষ্টের ওপর বরাত দিয়ে বসে থাকে।

রাত নটা নাগাদ দোকানের ঝাঁপ ফেলল প্রীতম। বিক্রিবাটার টাকা গুণে গেঁথে ব্যাগে ভরল। তারপর উঠে পড়ল।

—চলি হে পরেশ।

—হুঁ।

সাইকেলখানার ওপর কম রগড়ানি যায় না। তবে প্রীতম জিনিসের সঙ্গে ভাবসাব করতে জানে। রোজ ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মোছে। তেল দেয়। তাছাড়া দরকারমতো

মেরামত করিয়ে নেয়। নিতাই পোদ্দারের কাছ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিল। দিব্যি চলছে। আরও বছর দশেক চালিয়ে দেবে সে।

মোড়ের কাছে এসে দেখল সীতু শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

—কি রে বাড়ি যাসনি?

—রিকশা পাচ্ছি না যে!

—কেন, রিকশার অনটন কীসের?

সীতু একগাল হাসল, সব নাকি ধান তুলতে চলে গেছে। কাল সকালে ফিরবে।

—তা হেঁটেই মেরে দে না। একটুখানি তো পথ।

—দিদি পারবে না যে।

—দিদি! তোর দিদি কোথায়?

—ওই যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফুচফুচ করে কাঁদছে। মা বকবে তো, তাই।

সাইকেল থেকে নেমে পড়ল প্রীতম। তাই তো! এরা তো বেশ আতান্তরেই পড়েছে। পথটা পুরুষের পক্ষে বেশি নয় বটে, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে বোধহয় বেশিই। তাছাড়া বিপদ আপদ ঘটতে পারে।

—তুই সাইকেল চালাতে পারিস না?

—পারি তো।

—তাহলে দিদিকে চাপিয়ে নিয়ে চলে যা আমার সাইকেলে। ফেরত দিতে হবে না। কুতুবের দোকানে জমা করে দিস।

—আমি জানতাম।

—কী জানতিস?

—আজ আমি তোমার সাইকেলটাতে চাপব।

কথাটা বিশ্বাস হয় প্রীতমের। সবাই বোকা বলে বটে, কিন্তু ছোঁড়াটার মধ্যে একটা কিছু আছে। ভগবান নানা বিচিত্র জিনিস দুনিয়ায় পাঠান, কার মধ্যে ঝাঁপি থেকে কী বেরোয় কে জানে বাবা।

ওপাশ থেকে শেফালি চাপাস্বরে ভাইকে বলল, না না, আমি তোর সাইকেলে চাপব না, ফেলে দিবি।

সীতু বলে আচ্ছা, একটুক্ষণের জন্য উঠেই দ্যাখ না।

না বাপু, তুই তো রোগা ভোগা ছেলে।

চাপাচাপিতে নিমরাজি হল মেয়েটা। উপায়ও নেই। রাত হয়ে যাচ্ছে। দিদিকে রডে বসিয়ে কেতরে মেতরে উঠে পড়ল সীতু। কিন্তু সাইকেল টলোমলো করছে। এক হাত যেতে না যেতেই ঝপাং করে রাস্তার গর্তে পড়ে কাত হল। দুজনেই মাটিতে গড়াগড়ি।

প্রীতম গিয়ে সীতুকে তুলল। মেয়েটা লজ্জা পেয়ে নিজেই উঠে পড়ল টপ করে, ফেললি তো! হাঁদারাম কোথাকার!

—ব্যথা পেয়েছিস দিদি?

—না। লাগেনি।

তীক্ষ্ণ চোখে সাইকেলখানা পরখ করছিল প্রীতম। না, চোট হয়নি, ঠিকই আছে। বলল, সাইকেল ছাড়া তো উপায় নেই। সাড়ে নটা বেজে গেছে।

শেফালি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, ও তো পারবে না। আবার ফেলে দেবে।

—ঠিক আছে, তোমরা দুজন রড আর ক্যারিয়ারে বসে যাও আমি ঝট করে নামিয়ে দিয়ে আসছি। পারবে তো? ভয় করবে না?

শেফালি চুপ। সীতু বলল, খুব পারব। চল রে দিদি।

শেফালির আর কোনও আপত্তি হল না।

সীতু উঠল রডে শেফালি ক্যারিয়ারে।

একটু একটু হিমেল বাতাসে আলোছায়াময় রাস্তায় সাইকেলখানা মসৃণ গতিতে ছুটছে। দুই শক্তিমান হাতে হ্যান্ডেল ধরা, চওড়া পিঠের আড়াল, শেফালির শরীর আর মন শিউরে শিউরে উঠছে। স্বপ্নের পুরুষ এত কাছে এলে কি বাঁচে কোনও মেয়ে? সে তো মরে যাচ্ছে! হে ভগবান, এটা যেন আবার স্বপ্ন না হয়। যা দুষ্টু তুমি, সুখ ভন্ডুল করে দিতে তোমার জুড়ি আর কে?

সাত

মধ্যরাতে যৌবন ফিরে পেল বিনোদকুমার। কালীচরণের ঠেক থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে সে যৌবনটাকে বেশ টের পাচ্ছিল। মনটা একেবারে চলকে চলকে যাচ্ছে, কানায় কানায় ভরা সে। আকাশের দিকে তর্জনী তুলে সে ভগবানকে বলল, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ...

আশপাশটা একটু দেখেও নিল বিনোদ। বুড়ো বয়সটা নেড়ি কুকুরের মতো পায়ে পায়ে লেগে আছে নাকি? না, নেই। বুড়ো বয়সটা তাড়া খেয়ে হাওয়া হয়েছে।

বিনোদের মনটা বড় খারাপ ছিল আজ। ওই যে সফল শালা কী কতগুলো কথা না হক শুনিয়ে দিল, কাজটা কি উচিত হয়েছে ওর? কত বড় কেওকেটা রে তুই? অ্যাঁ! বড়লোক আছিস থাক না। তোর টাকায় পেচ্ছাপ করে এই বিনোদ।

ভিতরটা বড্ড গরম হয়ে ছিল বলে আজ আর কোনও আঁটশাঁট মানেনি সে। বউয়ের তোশকের তলা থেকে এক খাবলা টাকা তুলে নিয়ে সোজা চলে এল কালীর ঠেক-এ!

সময়টা জলের মতো বয়ে গেল।

রাস্তাটা একটু দুলছে বলে হাঁটাটা তেমন সটান হচ্ছে না তার। ঝুলা পোলের মতো দুলবার দরকারটাই বা কি রে তোর? একটু থিতু হ না বাপু। আজ বাড়িঘরগুলোও মোটে স্থির হয়ে নেই। বড্ড পাশ ফিরছে। তা হোক, সবাই আনন্দে থাকুক বিনোদের মতো। বুড়ো বয়স ঝেড়ে ফেলে এই যে নতুন বিনোদ বেরিয়ে এল এটা কি টের পাচ্ছে লোকে?

আচ্ছা, সে যাচ্ছে কোথায়? সেই বুড়ি বউ আর বদ্ধ ঘরের দমচাপা বাড়িটায়? ওইরকম থেকে থেকেই তো বয়সের উইপোকা তার শরীরে বাসা বেঁধেছিল। যুবক বিনোদ ওই বুড়িটার কাছে যাবে কেন? সেটা তো নিয়ম নয় রে বাপু! এখন যেতে হলে কাঁচা বয়সের মেয়ের কাছেই যাওয়া ভালো। কিন্তু কারও কথাই মনে পড়ে না যে!

কুয়াশা চেপে ধরেছে চরাচর। সাদা ভূতের মতো চারদিক গুলিয়ে দিচ্ছে। রাস্তাঘাট বেভুল, উলটোপালটা। এরকম গোলমাল হলে বড় মুশকিল হয়।

ভেজা ধুতিটা ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে লাগছে গায়ে। ধুতিটা ভেজা কেন তা বুঝতে পারছে না সে। বৃষ্টি পড়ছে কি? নাকি জলে নেমে পড়েছিল! কিন্তু এখন সে ভাঙা জমিতেই হাঁটছে বটে! ঘড়াৎ করে একটা ঢেঁকুর তুলে সে ফ্যাঁস ফ্যাঁস গলায় বলে, আজ বড় আনন্দ...থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ...

হাতে টর্চ নিয়ে বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছে সরস্বতী আর বিম্ববতী। মা বারণ করেছিল, যেতে হবে না। আমার তোশকের তলা থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে, আজ মদ গিলে আসবে।

সরস্বতী আপত্তি তুলেছিল, বাবা তো ছেড়ে দিয়েছে মা!

—শয়তান কি আর রং বদলায়? হাবভাব আমি ভালো বুঝছিলাম না। ঠিকই ফিরবে। যাবে কোথায়? মুরোদ জানা আছে।

তবু দু-বোন কিছুক্ষণ দেখে বেরিয়েছে। রাত দশটার পর গঙ্গারামপুরে আর কবরস্থানে তফাত নেই। তার ওপর আজ বড় দিক-ভুল কুয়াশা। হিম পড়ছে একটু একটু।

রাস্তায় উঠে দু'বোনে ভয়ে ভয়ে দেখল, দোকানপাট সব বন্ধ। আলো তেমন নেই। খাঁ খাঁ করছে। কাশীনাথের পাইস হোটেলটা খোলা। কিন্তু খদ্দের নেই তেমন। বাসন ধোয়ার শব্দ হচ্ছে।

হ্যাঁরে দিদি, বাবা যদি মদ খেয়ে থাকে তাহলে কী করবি? আমার যে মাতালকে খুব ভয়!

দূর! মাতালকে ভয় তা বলে বাবাকে তো নয়।

যদি আমাদের চিনতে না পারে!

মদ খেলে কি আর নিজের ছেলেমেয়েকে চিনতে পারে না নাকি?

দুজনে খুঁজল খানিক, তবে তেমন করে খুঁজতে সাহস হল না। রাতের দিকে মাতাল-বদমাশদেরই তো জো।

চল, বাড়ি যাই, দাদা এলে ঠিক বাবাকে খুঁজে আনবে।

সাইকেল চালিয়ে ফেরার সময়ে হঠাৎ প্রীতমের মনে হল, সীতুর দিদির মুখখানাই দেখা হয়নি তার। শেফালি না কি যেন নাম! মেয়ে নিয়ে তার কোনও চিন্তাভাবনা নেই। বিয়ের কথা ভাবে না, সংসার করার কথাও ভাবে না। তার এখন মেলা কাজ। ক্যারি করে নিয়ে এল, অথচ মুখ-চেনাই হল না এ একটা মজার ব্যাপারই হয়ে থাকল। কোথাও দেখলে চিনতেই পারবে না। কথাও কয়নি তার সঙ্গে বিশেষ।

বাড়ির সামনে এসে যখন নামল প্রীতম তখন এগারোটা বাজে। সাইকেলখানা সযত্নে দু'হাতে তুলে গ্রিলের বারান্দায় রাখার সময় সে গন্ধটা পেল। একটা মৃদু মেয়েলি গন্ধ সাইকেলখানার গায়ে লেগে আছে।

ঠিক করে দরজা খুলে সরস্বতী বেরিয়ে এল, দাদা, বাবা এখনও ফেরেনি।

—সে কি! কোথায় গেল বাবা?

—আমরা খুঁজে এলাম।

প্রীতম দাঁড়াল না। সাইকেলটা নামিয়ে পাঁই পাঁই করে চালিয়ে দিল।

খালের ওপর সাঁকোটায় বেভুল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বিনোদ। কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পাচ্ছিল না। এখানে শুয়ে থাকলেও হয়। আর সেই কথাটাই নিজেকে বোঝাচ্ছিল সে। বাড়িঘর আবার কি, বউ-ছেলেপুলে আবার কি, সংসার আবার কি, আকাশে ভগবান আর নীচে এই তুমি, এ বই আর কিছু নেই। ঠেসে আনন্দ করো বাবা। যৌবন ফিরে পেয়েছ, আর চাই কি? একটা ভোজ দিয়ে দিও বরং। ব্যাপারটা সাব্যস্ত হওয়ার পর বিনোদ হেঁকে সবাইকে জানান দিল, অ্যাই, সবাই শুনে রাখো, কাল সবার ভোজের নেমন্তন্ন। বুঝলে! এই আমি, খাওয়াবো সব্বাইকে, সব্বাইকে সব্বাইকে, কেউ যেন বাদ না যায়।

বিনোদের এই হাঁকটা শুনতে পেল প্রীতম। সাইকেলখানা গড়িয়ে কাছে এল, মদ খেয়েছ নাকি?

—কে? কে রে?

—বাড়ি চলো।

একগাল হাসল বিনোদ, ও তুই! এই সব্বাইকে নেমন্তন্ন করে দিলাম, বুঝলি!

—বেশ করেছ। এবার চলো।

আর গাঁইগুঁই করল না বিনোদ। সাইকেলখানায় হাত রেখে টাল সামলে সামলে হাঁটতে লাগল। কোথাও একটা যাচ্ছে সে। সেই বুড়ি বউ, সেই চেনা ছেলে-মেয়ে, সেই বদ্ধ ঘরের খাঁচা, সেই বুড়ো বয়স। ভালো লাগে না বিনোদের।

*

গভীর রাতে বারান্দায় রাখা সাইকেলখানার গা থেকে একটা মিষ্টি মেয়েলি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল বাতাসে। সাইকেলখানার বড় ধকল গেছে আজ। রোজই যায়। আজ এত ধকলের পরও মিষ্টি গন্ধ মেখে বড় ভালো লাগছে তার। নিথর ঘুমের মধ্যেও তাই সাইকেলটা মাঝে মাঝে ফিকফিক করে হেসে উঠছে।

স. ত্তি

লোক বুঝে বাপ ডাকতে পারলে কাম বাগায়ে নেওয়া যায়। এই টগরবালা নগেন নস্করকে বাপ ডেকেছিল ওইতেই কেল্লা ফতে। নগেনের ছেলেপুলে ছিল না, শেষ বয়সে স্ত্রী-বিয়োগ, বাড়িখানা টগরবালাকে লিখে দিয়ে গেল। শুধু কি বাড়ি? খাট-পালঙ্ক, বাসনপত্র, গয়নাগাঁটি, নগদ টাকা। নগেনের তো কম ছিল না। ডাকের বাপ যা করল আজকাল নিজের বাপ তত করে না। আর নিজের মেয়ে যা করে না পাতানো মেয়ে টগরবালা ডাকের বাপ নগেন নস্করের জন্য তা করেছিল। শেষ দিকটায় হাঁপের টানে নড়াচড়াই বন্ধ ছিল নগেনের। পিকদানিতে শ্লেষ্মা ধরত টগরবালা, হাগামোতাও কিছু কম পরিষ্কার করেনি। ওই বাপ-মেয়ের সম্পর্কের মধ্যেও লোকে পাপ দেখতে শুরু করল। তা লোকে অমন দ্যাখে। আজকাল পাপ দ্যাখাটাই রেওয়াজ। ও ভাই ডাকের বাপ, তলে তলে অন্য ব্যাপার।

তলে তলে যে অন্য কোনও ব্যাপার ছিল না তা লোকনাথ জানে। গোল গোল চশমার পিছনে তার দুটি দ্যাখনদার চোখ আছে। দেখে বেড়ানো ছাড়া আর তেমন কাজ নেই আজকাল। লোকনাথ দেখতে ভালোবাসে। দেখে বেড়ানোই তার নেশা।

বাজারের পিছনে রথতলায় নগেন নস্করের দোতলা বাড়ি। ওপর নীচে সাতখানা ঘর, দুটো বারান্দা, একখানা মস্ত দরদালান, পিছনে না হোক দশ কাঠা বাগান, তাতে ফলন্ত সব গাছ-গাছালি। পুকুরের মধ্যে নাকি ডুবোজলে আরও দু'কাঠা আছে। দশ বিঘে ধানজমি।

এত সব পেয়েথুয়ে তার অভ্যাস নেই। তাই যখন নগেন নস্কর সব লিখে দিল তাকে তখন কী করতে হবে বুঝতে না পেরে টগরবালা হাপুস হয়ে কাঁদতে বসল। ও বাবা, এত সব দিয়ে আমি করব কী? আমি মেয়েমানুষ।

লোকনাথ সাক্ষী আছে, নগেন নস্কর বলেছিল, তুই আমার মায়ের চেয়ে বেশি করেছিস। লোভে পড়ে তো করিসনি, আমি তোকে চিনি।

এগারো দিন বাদে নগেন নস্কর মারা যায়।

গরু মরলে নাকি গৃধিণীর ঝুঁটি নড়ে, শতেক মাইল দূর থেকে টের পায়। তা তেমনি নগেন নস্কর মারা যাওয়ায় লুটমারের গন্ধে বিস্তর ফড়ে দালাল মতলববাজ জুটে গেল। যারা মড়া তুলতে এসেছিল তাদেরই কত জনা যে কত জিনিস হাতিয়ে নিয়ে গেল তার হিসেব নেই। তখন দ্যাখেই বা কে? টগরবালা ভুঁয়ে পড়ে কাঁদছিল, যেমন বাপ মরলে মেয়ে কাঁদে। তবে দেখেছিল লোকনাথ। সে সাক্ষী আছে। পেতলের জগ আর দেয়ালঘড়ি

নিয়ে গেল সুবল। হরেন গুছাইত এক পাঁজা থালা, দুটো ঘটি সরাল পূর্ণর বউ সবিতা। আরও সব আছে। রাতে বাড়ি ফিরে একটা ফর্দের মতো করে রেখেছিল লোকনাথ। কে কী সরিয়েছে তার একটা কাঁচা হিসেব।

কিন্তু আসল গন্ডগোল শুরু হল দু-চারদিন পর থেকে। শীতলা ক্লাবের ছেলেরা বলল নগেন নস্করের উইল-টুইল সব জাল। ওয়ারিশ কেউ নেই। ও বাড়ি তারা দখল নেবে। পার্টির ছেলেরা বলল, তা হবে না। ও বাড়িতে পার্টির অফিস হবে। নগেন নস্করের এক ভাইপোও এসে হাজির হল। সে নাকি দাবিদার।

উনিশ বছর বয়সের গরিব যুবতী টগরবালা তখন দিশেহারা। পাগলের মতো এর ওর কাছে ছুটছে। সে আইন জানে না। সম্পত্তি রক্ষা করার কৌশল জানে না। মুরব্বিও নেই। করে কী?

টগরবালার বাপ হরিপদ বা হরিপদর বউ লক্ষ্মীমণি কারও পেটেই বিদ্যে নেই, মাথায় নেই বুদ্ধি। তারাও এর ওর তার হাতেপায়ে ধরে বেড়াতে লাগল। কাজ হল না তাতে।

সেই সময়টায় টগরবালার যা অবস্থা তাতে নগেন নস্করের সম্পত্তি পাওয়ার আশা তো ছিলই না, উলটে লোকে তাকে শাসাতে লাগল। কল্কি অবতার ছাড়া টগরবালাকে উদ্ধার করার কেউ ছিল না।

লোকনাথের বয়স হয়েছে। তার ওপর সে লেখাপড়া খানিকটা জানলেও আইনের মারপ্যাঁচ জানে না। সে তেমন ডাকাবুকো লোকও নয়। তবে তার একটা জিনিস আছে। তা হল চোখ। টগরবালার বিপদের দিনে সে একদিন গিয়ে সুজিত সরকারের ডেরায় হানা দিল।

সুজিত হল এক জখম মানুষ। গাঁয়ের লোকও নয়। কলকাতা থেকে এসেছিল গড়ানডাঙ্গা ইস্কুলে চাকরির আশায়। কথা ছিল চল্লিশ হাজার টাকা ডোনেশন দিলে চাকরিটা হয়ে যাবে। টাকাটা অতি কষ্টে জোগাড় করে এনেওছিল। কিন্তু নন্দবাবুর ক্যান্ডিডেট বাবুরাম ষাট হাজার টাকা কবুল করে ঢুকে পড়ল। সুজিত সরকারের হাতে হেরিকেন। ফিরেই যেতে হত, জগদীশ পোড়েল দয়াপরবশ তাকে রেখে দিল। বলল, লেখাপড়া জানো, আমার ছেলেগুলোকে পড়াও। থাকা-খাওয়া আর পঞ্চাশটা টাকা পাবে।

কে জানে কেন সুজিত থেকে গেল। তার সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। শুধু এটুকু লোকে জানে যে, হাওড়ার দিকে কোথায় যেন বাড়ি। কেমন লোক কেউ জানে না। তবে পেটে দু-দুটো ছোরার দাগ আছে। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। মুখচোখ সবসময়েই কেমন যেন আনমনা। হাসেও না, বেশি কথাও কয় না। পায়জামা আর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরে। জগদীশের দোকানঘরে বছরটাক হল একটা হোমিওপ্যাথির দোকান খুলেছে। ইদানিং জ্যোতিষীও করে একটু-আধটু। তবে কোনটাতেই পয়সা নেই তেমন। কাজের মধ্যে

সারাদিন একখানা খাটিয়ায় চিত হয়ে শুয়ে বই পড়া। কারও সাতে-পাঁচে থাকে না কখনও।

লোকনাথ একদিন গিয়ে তার কাছেই হাজির হল। ঘেমো জামাখানা খুলে বাঁশের বেড়ার গায়ে টাঙিয়ে রেখে লোহার চেয়ারে বসে চশমাখানা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে পুঁছতে-পুঁছতে বলল, টগরবালার ঘটনাটা শুনেছ নাকি ভায়া?

সুজিত মুখ থেকে ভারী বইখানা সরিয়ে উঠে বসল। বেশ লম্বাপানা দেখতে। গা কখনও আদুর থাকে না। বোধহয় পেটের ক্ষতস্থান ঢেকে রাখতেই। গরমেও গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। পরনে সাদা লুঙ্গি।

বলল, কে টগরবালা?

নগেন নস্করকে বাপ ডেকেছিল। চিনবার কথাও নয় তোমার। গরিব গুর্বো লোক। মেয়েটার বড় হেনস্থা হচ্ছে।

সুজিত চেয়ে রইল। সে কল্কি অবতার নয় বটে, কিন্তু লোকনাথের চোখ যদি খুব ভুল না করে থাকে তাহলে ওই আনমনা চোখের ভিতরে কোথাও একটু ফুলকি আজও আছে বলে মনে হয়।

লোকনাথ গুছিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। কখনওই তাড়াহুড়ো করে না। অনাবশ্যক আবেগ বা রাগও নেই। সাদামাটা চালে ঘটনাটা বলে গেল মাত্র।

সুজিত শুনে বলল, হ্যাঁ, কী একটা গন্ডগোল বলে শুনেছি।

খুব গন্ডগোল। সম্পত্তি তো পাবেই না, উলটে লোকে গাঁ-ছাড়া করার চেষ্টা করছে।

সুজিত চুপ করে থাকল।

ছুঁড়ির লোকবল নেই। বাপটা বোকার হদ্দ। কে এখন ছুঁড়িটার পেছনে দাঁড়ায়!

সুজিত বলল, গভীর জল।

তা বটে। তুমি তো শহুরে লোক, আইন-টাইন জানা নেই তোমার?

আইনে পাশও করেছিলাম। এখন সব ভুলে গেছি। আর এখানে আইন খাটিয়ে কিছু হওয়ার নয়। উইলের সাক্ষী কে আছে?

রমেন পাল, সুধীর নস্কর, যতীন মাস্টার, জগদীশ পোড়েল আর আমিও।

সাক্ষীরা চুপ করে আছে কেন?

কে কী বলবে ভায়া? হাঙ্গামা দেখে সব ভড়কে গেছে। ছাপোষা লোক সব।

সুজিত সরকার একটু হাসল। বলল, তাহলে গভীর জল।

কিছু করা যায় না?

সাক্ষীরা একটু রুখে দাঁড়ালে হয়। পারলে তাদের জড়ো করুন। সবাই এককাট্টা হলে একটা হিল্লে হতে পারে।

জড়ো না হয় আমি করছি। কিন্তু বলা-কওয়ার ভারটা তুমিই নিও। আমরা গাঁয়ের লোক, গেঁয়ো যোগী। আমাদের কথার দাম হয় না।

সুজিত সরকার ফের হাসল এবং খাটিয়ায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। সুজিত ওরকমই মানুষ। কেমনধারা তা ঠিক বোঝা যায় না।

গভীর জল কাকে বলে তা লোকনাথ দুদিনেই বুঝল। সাক্ষীদের দোরে দোরে ঘুরে একটা জিনিস ভারী পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। একটা হাড়হাভাতে মেয়েছেলের হঠাৎ এই সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারটা কেউ খুব ভাল চোখে দেখছে না।

রমেন পাল গাঁয়ের মুরুব্বি গোছের লোক নয় বটে, কিন্তু কুচুটে লোক। দিনেরাতে তার কাজই হচ্ছে কুচ্ছো কুড়িয়ে বেড়ানো আর সেগুলো ছড়ানো। তাকে এমনিতেই কেউ পাত্তা দেয় না, কিন্তু সে যখন নিন্দেমন্দ করতে বসে তখন সবাই শোনে। মন দিয়েই শোনে।

লোকনাথ গিয়ে কথাটা পাড়তেই এক গাল হেসে রমেন পাল বলল, বোসো ভায়া, বোসো। তা মেয়েছেলেটা চাইছে কী?

কী আবার চাইবে। নগেন নস্কর টগরবালাকে সব লিখে দিয়ে গিয়েছিল, তুমি সাক্ষী আছ।

সাক্ষীটাক্ষী সব ফক্কিকারি ব্যাপার। বুড়ো বয়সে নগেন নস্করের মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। আর না হবেই বা কেন। ডবকা একটা ছুঁড়ি সারাদিন আশেপাশে ঘুরঘুর করলে অমন হয়। শরীরের ক্ষ্যামতা তো ছিল না, তবু মেয়েমানুষের লোভ কি আর ছাড়ে?

লোকনাথ একটু ভাবিত হয়ে পড়ল। বলল, নগেন নস্কর যে টগরকে গালভরে মা ডাকত।

ফ্যাক করে হেসে ফেলল রমেন। তার সামনের দু-খানা ওপরপাটির দাঁত নেই, মনে হল একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখ খুলে গেল। কাঁচাপাকা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলল, হেঁকে মা ডাকত আর চাপা গলায় বলত গী। বুঝলে? মেয়েছেলের ব্যাপার ভায়া, কতরকম কায়দা-ফিকির করতে হয় সে তো আর তুমি না জান এমন নয়!

লোকনাথ রমেনকে খুব ভাল করে দেখল তার দ্যাখনদার চোখ দিয়ে। এ লোক দুর্গন্ধ শুঁকতে ভালোবাসে। সারাদিন মনে মনে ভাগাড় খুঁজে বেড়ায়। তবু সে বলল, তাহলে তুমি যে দস্তখৎ করেছো সেটা স্বীকার যাবে না?

দস্তখৎ? দস্তখৎ আবার কী? বুড়ো বয়সের রগড় দেখতে যাওয়া। তা দিলুম কলমের আঁচড় টেনে। ও কি আর দস্তখৎ?

সুধীর নস্কর তখন গোয়ালঘর পরিষ্কার করছে। হাতে বালতি আর ঝ্যাঁটা। লোকনাথ ওই অবস্থাতেই কথাটা তুলল। নস্করের পো খিঁচিয়ে উঠে বলল, একে মেয়েছেলে তায়

ছোটলোক, তাকে অত লাই দেওয়া কেন হে? পাঁচবাড়ি খেটে খাচ্ছে খাক না। নগেন নস্করের বিষয়আশায় গাঁয়ের কাজে লাগুক। তুমি এর মধ্যে আসছ কেন?

ন্যায়-অন্যায় বলে একটা কথা আছে সুধীরদাদা।

সে কথাই তো বলছি। হঠাৎ টগরবালা দাসীকে বাড়িঘর ধানী জমি লিখে দেওয়াটা খুব ন্যায্য কাজ হল বুঝি? সেবাটেবা করেছে তো কী, দুশো-পাঁচশো টাকা বখশিশ দিলেই খুশি হয়ে যেত। হঠাৎ তাকে সবকিছু দিয়ে দেওয়াটা কোন ধর্ম হল শুনি? গাঁয়ে তো গরিবগুর্বোর অভাব নেই।

কিন্তু আপনি যে সাক্ষী দিয়েছেন?

তো কী? নগেনদা ডেকে বলল, তাই দিলুম সই মেরে। গুরুজন বলে কথা। তা বলে মনটা তো আর সায় দেয়নি।

কথা উঠলে কী বলবেন?

সত্যি কথাই বলব। সই দিয়েছি, কিন্তু সায় দিইনি।

লোকনাথ ঝ্যাঁটা-হাতে লোকটার দিকে চেয়ে যেন একটা দেয়াল দেখতে পেল। সেঁধোবার মতো ফোকর নেই।

টগরবালার কপালে যে আরও কষ্ট আছে সেটা গিয়ে বুঝল যতীন মাস্টারের বাড়ি। ইস্কুল থেকে ফিরে যতীন তখন তার এঁড়ি-গেঁড়ি বাচ্চাদের নিয়ে মুড়ি খেতে বসেছে। বেশ বড় করে পুরোনো খবরের কাগজ মেঝেতে বিছিয়ে বসেছে। কাগজের ওপর মুড়ি, বাতাসা আর শশা। লোকনাথ গুনে দেখল মোট পাঁচটা ছেলেমেয়ে। মেয়ে তিনটে আট থেকে ষোলোর মধ্যে। ছেলে দুটো চার ছয় হবে। যতীনের বউ এই গতবছর মরেছে।

যতীন লোকনাথের কথায় মাথা নেড়ে বলল, হক কথা। টগরবালারই ন্যায্য পাওয়া উচিত।

বলছ?

বলব না মানে? গলা তুলেই বলব।

লোকনাথের মনে পাপ। বলছ? সত্যিই বলছ?

যতীন উদাস মুখে মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলল, অনাথা মেয়ে, তার ওপর বড্ড জুলুম হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। উইলে আমি সাক্ষী দিয়েছি। দরকার হলে আদালতেও বলব।

দুটো বাচ্চার ঝগড়া লেগে পড়ল। বড় মেয়েটা একটা বাচ্চাকে ঠাস করে চড় কসাল। বাচ্চাটা কেঁদে উঠল অ্যাঁ করে।

যতীন গলাটা একটু খাটো করে বলল, লোকে কু-নজরও দিচ্ছে। মেয়েটার জন্য কিছু একটা করাই দরকার।

এই বলে যতীন মুড়ি ফেলে উঠে পড়ল। লোকনাথকে নিয়ে নিরিবিলিতে দাওয়ায় বসে বলল, আমি একটা উপায় ভেবেও ফেলেছি। বলব তোমাকে?

লোকনাথ বোকা নয়। ভাবসাব দেখে আঁচ করে নিয়েছিল। তবু ভালোমানুষির ভাব দেখিয়ে বলল, বলেই ফেল। শুনতেই তো আসা।

দেখ লোকনাথদাদা, জীবনে ভালো কাজ আর কটাই বা করেছি? করতে কি ইচ্ছে যায় না? যায়, তবে সংসার আর চাকরি সামলে করিই বা কখন? ছুঁড়িটার যা অবস্থা দেখছি তাতে সম্পত্তি তো পাবেই না, উলটে গাঁ না ছাড়তে হয়। তাই ভাবছি--বলব?

বলেই ফেল।

অন্যরকম ধরে বোসো না। ভাবছি টগরের পাশে দাঁড়াই। বেশ বুক ফুলিয়েই দাঁড়াই।

তাহলে আর কথা কী? দাঁড়াও।

আমি যদি ছুঁড়িটার সহায় হই তাহলে আর কেউ ট্যাঁ ফোঁ করতে পারবে না। পারবে, বল?

লোকনাথ তার গোল চশমার ভিতর দিয়ে ভালো করে যতীন মাস্টারকে দেখে নিল একবার। না, বয়স খুব বেশি নয়। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ হবে। চেহারাটা মরকুটে মার্কা। কেমন যেন পাকানো, শক্ত চেহারা। মুখখানা চোয়াড়ে। তবে যতীন মাস্টার তালেবর লোক। সে একটু পার্টিটার্টি করে, ভোটের সময় বক্তৃতা দেয়। তার ওপর নন্দবাবুর সঙ্গে তার নিত্যি ওঠা-বসা। যতীন ফ্যালনা লোক নয়। এ কথাও সত্যি, যতীন দাঁড়ালে টগরের হিল্লে হতে পারে।

লোকনাথ যেন বাঁয়া কোলে করে বসেছে। যতীনের কথায় সায় দিয়ে গেল, হুঁ।

ঘরে বাচ্চারা মুড়ির ভাগাভাগি নিয়ে চিল্লামিল্লি করছে। ধারেকাছে কেউ নেই। তবু যতীন গলাটা আরও এক পর্দা নামিয়ে বলল, বিয়ের সম্বন্ধ মেলাই আসছে। গতকালও হাসনাবাদ থেকে নরেন হালদার একটা সম্বন্ধ এনে ঝোলাঝুলি। বিয়ে করার ইচ্ছেও ছিল না তেমন, কিন্তু ছুঁড়ির দুর্দশা দেখে ভাবছি, জীবনে এই একটা ভালো কাজ করেই ফেলি চোখ বুজে। অনাথা মেয়েটাও বাঁচবে, সম্পত্তিটারও একটা হিল্লে হবে।

লোকনাথ বলল, তুমি মাস্টার মানুষ, কথাটথা মেলাই জানো। কিন্তু টগরবালাকে বার বার অনাথা বলছ কেন বলো তো? টগরের তো মা-বাপ আছে। মা-বাবা থাকলেও কি অনাথা হয়?

আহা, বাপের কথা বাদ দাও তো! বোকার হদ্দ! অনাথা না হলেও তার চেয়ে ভালো কিছু নয়। অনাথাই ধরতে পারো। প্রস্তাবটা তোমার কেমন লাগছে? ভালো নয়?

লোকনাথ একটু ভেবে বলল, আমার ভালো লাগলে তো হবে না, টগরেরও ভালো লাগা চাই।

যতীন যেন খুব অবাক হয়ে বলল, বল কী? সে তো আকাশের চাঁদ হাতে পাচ্ছে! লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের বউ হবে, সে তো জাতে উঠে গেল।

তা বটে।

নিজের মুখে প্রস্তাবটা দিতে পারি না, আত্মসম্মানের প্রশ্ন আছে। তুমি এসে পড়ে ভালোই করেছ। প্রস্তাবটা তুমিই টগরের কাছে নিয়ে যাও। বোলো, বিয়ের কথাটা তুমিই পেড়েছ। আমি প্রথমটায় রাজি ছিলুম না, তোমার চাপাচাপিতে রাজি হয়েছি। পারবে না বলতে?

এ আর শক্ত কী?

ছুঁড়ি এখন ডুবতে বসেছে, কুটো গাছ পেলেও চেপে ধরে। তা এ তো একেবারে জাহাজে উঠে পড়ল প্রায়।

যতীন বড় একটা হাসে না। এ কথার পর হাসল। তার দাঁতগুলো বড় বড়। হাসলে দু'দিকের ঠোঁট একটু ওপর দিকে উঠে যায়। তাতে তাকে ভালো দেখায় না খারাপ দেখায় তা লোকনাথ জানে না। তবে তার চোখ দেখল, একটা উপোসী টিকটিকি একটা গুবরে পোকাকে তাক করে এগোচ্ছে। পারবে কি গিলতে? হাঁ-এর চেয়ে গরাসটা যদি মাপে অনেক বড় হয় তখন বড় ভাবনার কথা।

তবে লোকনাথ আর বসল না। উঠে পড়ে বলল, তাহলে ও কথাই বলবখন।

যতীন ফের সাবধান করে দিয়ে বলল, প্রস্তাবটা কিন্তু আমি তুলিনি, তুমিই তুলেছ। মনে থাকবে কথাটা?

খুব থাকবে। বলতে হবে তুমি যেন গাঁইগুঁই করেছিলে।

হ্যাঁ।

পরের সাক্ষী হল জগদীশ পোড়েল। সে বিষয়ী মানুষ। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আছে। ও-ই তার নেশা। তা ছাড়া সে তুমুল গেরস্ত। গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি, ছাগল-কুকুর, ঢেঁকি, আটাচাক্কি, বউ-বাচ্চা, ভাই-ভাদ্দরবউ, ভাইপো-ভাইঝি এ সব নিয়ে মেতে আছে।

লোকনাথ কথাটা যখন তুলল তখন রাত হয়েছে। জগদীশ দোকানে বসে হিসেব লিখছিল।

গম্ভীর হয়ে বলল, আমার কি ঝঞ্ঝাট কিছু কমতি দেখছিস রে লোকনাথ? তোরও তেষট্টি আমারও তেষট্টি। তুই চাকরি থেকে রিটায়ার করে জিরেন নিচ্ছিস, আর আমার দেখ, দম ফেলার সময় নেই। এসব ঝঞ্ঝাটে জড়ানোর সময় কোথায়?

তাহলে মেয়েটার কী হবে?

কী আবার হবে? তখনই নগেনদাকে বলেছিলাম, লিখে তো দিচ্ছেন কিন্তু ভোগে লাগবে কি? লেখাপড়া জানে না, মুরুব্বি নেই, দখল পাবে কী করে? তা নগেনদা বলল, তোরা তো আছিস। আরে বাবা, আমরা কি আর তেমনভাবে আছি যে, সব ছেড়েছুড়ে পতিত উদ্ধার করে বেড়াব? নগেনদাকে বলেওছিলাম, সম্পত্তি টগর রাখতে পারবে না। তার চেয়ে সব বেচেবুচে দিয়ে নগদ টাকাটা ওকে দিন। তাতে নগেনদা বললেন, দূর, ওরা টাকা রাখতে পারে না। অত টাকা হাতে পেলে মাথা ঘুরে যাবে, চোরে ডাকাতে কেড়ে

নেবে। সম্পত্তি থাকলে বরং খেয়ে-পরে বাঁচবে। তাই অগত্যা সই দিয়েছিলাম। তবে ঝামেলা যে হবে তা জানতাম।

একটা বুদ্ধি বের করতে পারছ না?

বুদ্ধি! ওরে বাবা, পার্টি লেগেছে, ক্লাব লেগেছে, বুদ্ধি করে কিছু করা যাবে? নগেনদার ভাইপো নবীনচাঁদ নস্কর তো তড়পে বেড়াচ্ছে, মামলা করবে। সে বলেছে, তার জ্যাঠাকে নাকি গুণ করে সব লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। সব জালিয়াতি।

তাহলে?

তাহলে আর কী? আমি বলি, তুইও আর এর মধ্যে থাকিস না। বুড়ো বয়সে আর আয়ুক্ষয় না করে একটু জিরেন নে। যা হচ্ছে হোক।

আবার একদিন সন্ধেবেলা সুজিত সরকারের ডিসপেনসারিতে হানা দিল লোকনাথ। ঘেমো জামাটা খুলে রাখল বেড়ার গায়ে।

সুজিত সরকার একজন রোগীকে ওষুধ দিচ্ছে। রোগী হল মাখন পাল। একসময়ে নাকি চন্ডীগর থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত ট্রাক চালাত। দিন নেই রাত নেই বোঝাই ট্রাক নিয়ে ছুটত হাজার হাজার মাইল। ধাবায় বসে ঘপাত ঘপাত করে মুরগির মাংস খেত তন্দুরি রুটি দিয়ে। তখন মাখন পালের গালভর্তি দাড়ি ছিল, ভালো স্বাস্থ্য ছিল। এখন মনে হবে সেই পর্বত মাখন পালের ভিতর থেকে একটা মুষিক মাখন পাল বেরিয়ে এসেছে। আমাশায় ধুঁকছে, সর্দিকাশি লেগেই আছে। পঞ্চাশ সবে পেরিয়েছে, চেহারায় সত্তরের ছাপ।

সুজিত দু-আউন্স ডিস্টিলড ওয়াটারে এক ফোঁটা ডলকামারা ফেলে তাতে দশ ফোঁটা রেকটিফায়েড স্পিরিট মিশিয়ে ছ-দাগ ওষুধ বানাল।

মাখন পাল পাঁচ টাকার একটা ময়লা নেতানো নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, এতে হবে?

সুজিত টাকাটা নিয়ে আড়াই টাকা ফেরত দিয়ে বলল, দু-বেলা এক দাগ করে খাবেন।

মাখন চলে যেতে সুজিত বলল, কী খবর?

সাক্ষীরা পিছোচ্ছে।

কীসের সাক্ষী?

ওই যে টগরলবালার ব্যাপারটা।

কে টগরবালা?

তুমি বড্ড ভুলে যাও হে। ওই যে নগেন নস্কর যাকে সম্পত্তি দিয়ে গেল!

ও। বলে কথাটা পাশে সরিয়ে রেখে চিন্তিত মুখে সুজিত বলল, শুধু বই পড়ে শেখা যায় না, সাগরেদি না করলে অসম্ভব।

কীসের কথা বলছ?

হোমিওপ্যাথির কথা। বই-পড়া বিদ্যে দিয়ে হওয়ার নয়। বড় একজন ডাক্তারের সঙ্গে কিছুদিন থাকতে পারলে হত। এই মাখন পালের কথাই ধরুন। দিন দশেক হল ওষুধ খাচ্ছে, কাজও হচ্ছে কিন্তু একেবারে সেরে উঠছে না। ফলো-আপ ঠিকমতো হচ্ছে না, ঠেকে যাচ্ছে। বড় ডাক্তার এইটে ধরিয়ে দেয়।

ডলকামারা দিলে তো!

একটু অবাক হয়ে সুজিত বলল, কী করে বুঝলেন?

উঁকিঝুঁকি মারা আমার স্বভাব।

আপনার চোখ আছে।

লোকনাথ বলল, ওষুধ ঠিকই দিয়েছ। পোটেন্সি বাড়িয়ে দিলে কাজ হবে।

সুজিত চোখ একটু ওপরে তুলে বলল, ঠিক আছে বলছেন?

তা আছে। তবে মাখন একটা জীবনে অখাদ্য-কুখাদ্য বড্ড খেয়েছে। বোতলও চলত। ভেতরে কী পাকিয়ে আছে কে জানে। ভালো হলেও সময় লাগবে।

চিন্তিত সুজিত বলল, হুঁ, এক জায়গায় ঠেকে যাচ্ছে।

লোকনাথ কিছুক্ষণ উদাসভাবে বসে থেকে বলল, সাক্ষীরা পেছোচ্ছে, বুঝলে?

কোন সাক্ষীরা?

ওই যে টগরবালার ব্যাপারটা। তুমিও তো বললে সাক্ষীদের জোট বাঁধাতে।

ও। তা কী হল?

কেউ রা করছে না। শুধু যতীন মাস্টার খুব ভরসা দিচ্ছে, সে টগরের হয়ে লড়বে। তবে সে টগরকে বিয়ে করতে চায়।

ও। তা করুক না বিয়ে। জাতেকাটে ঠিকঠাক থাকলে লাগিয়ে দিন।

তুমি জাতটাত মানো? শহুরে লোক তো আজকাল ওসব মানছে না।

আমিও মানতুম না। আজকাল মানি।

লোকনাথ একটা শ্বাস ফেলে বলল, জাতে-বর্ণে আটকায় কিনা জানি না, তবে বয়সে একটু আটকায় বোধহয়। টগরের আঠেরো উনিশ, যতীন মাস্টার বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ। তার ওপর পাঁচটা এন্ডি-গেন্ডি ছেলেমেয়ে।

তা হোক না।

টগর কি রাজি হবে ভাবছ?

আমার আবার ভাবাভাবির কী আছে? যাদের ভাবনা তারা ভাবুক। টগর রাজি থাকলে লাগিয়ে দিন বিয়ে।

বিয়ে হলে যতীন মাস্টার সম্পত্তি সব গাপ করবো না তো!

ওসব তো হয়েই থাকে।

তুমি বাপু গা করছ না।

করার কথাও নয়। কে টগর, কী তার সমস্যা, তা নিয়ে ভাববোই বা কেন?

মাখন পালকে নিয়ে তো ভাবছ।

বাঃ, তার কথা ভাবব না? সে আমার রোগী।

এসবও ব্যাধি হে। সমাজের নানা ব্যাধি। তা নিয়েও ভাবতে হয়।

সুজিত একটু হাসল। কিছু বলল না।

গোল গোল দুটো চশমার ভিতর দিয়ে লোকনাথ সুজিতকে ভালো করে দেখছিল। এ ছেলেটা সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। চেহারাটা বেশ ভদ্রলোকের মতো, মুখে-চোখে লেখা-পড়ার ছাপ আছে, চোখে বুদ্ধির ঝিকিমিকি আছে। আর পেটে আছে দু'দুটো ছোরার দাগ। জগদীশ বলেছিল, ও ছোরার দাগ হবে কেন? ওর পেটে একটা অপারেশন হয়েছিল সেই দাগ। কথাটা লোকনাথ বিশ্বাস করেও ছিল, করেওনি। তাই একদিন সন্তর্পণে জিগ্যেস করেছিল সুজিতকে, ও দাগদুটো কীসের? সুজিত ঠিক এইরকমই মুচকি হেসেছিল। জবাব দেয়নি।

লোকনাথের চোখ আছে। চোখের পিছনে একটু মগজও আছে। সে ভেবে দেখেছে, অপারেশনের দাগ অমন ছোট হয় না। পেটের ভিতর কিছু মেরামতির দরকার হলে ডাক্তাররা একটু বড় করেই কাটে। দাগদুটো তেমন বড় নয়। দু-তিন ইঞ্চির বেশি নয়। তবে দগদগে। কথা আরও আছে। ছোরা খেলেও তেমন গভীর হয়নি ক্ষতস্থান। হলে ডাক্তাররা পেট চিরে ভিতরে মেরামত করত। তাতে দাগটা বড়ই হওয়ার কথা। সুতরাং সুজিত সরকার ছোরা খেলেও তেমন মারাত্মক জখম হয়নি। কিন্তু সত্যিকারের কী হয়েছিল তা ওর মুখ থেকে বের করে কার সাধ্যি?

কী ভাবছ ভায়া?

সুজিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মাখন পালের কথা। লাইন অব ট্রিটমেন্ট ঠিকই আছে। সমস্যা হচ্ছে ফলো-আপ নিয়ে। আনাড়ির হল ওই বিপদ। ফলো-আপটাই ঠিকমতো হয় না।

লোকনাথ বুঝল, একে এখন মাখন পাল থেকে এদিকে ফেরানো যাবে না। একটু বিরক্ত হয়ে বলল, ভেবে আর করবে কী? মাখনকে ভালো করা তোমার হোমিওপ্যাথির কম্ম নয়। ফাঁক পেলেই এখনও তাড়ির আড্ডায় গিয়ে বসে, তা জান?

চিন্তিত সুজিত বলল, তাই নাকি?

তাড়ির সঙ্গে ভাজাভুজিও চলছে। পেঁয়াজি, চপ, পচা চিংড়ির বড়া, শুকনো লঙ্কা ভাজা। তোমার কাছে ভালোমানুষটি সেজে আসে, যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না।

সুজিত ফের একটু হাসল। সেই মুচকি হাসি। এ হাসি গাঁয়ের হাসি নয়, শহুরে হাসি, লোকনাথ চেনে।

আপনার যেমন টগরবালা, আমার তেমনি মাখন পাল। কখন যে কে কাকে পেয়ে বসে।

আচ্ছা, ল'পাশ করে তুমি কি প্র্যাকটিস করেছিলে কখনও?

না তো! কিছুদিন একজন ইনকাম ট্যাক্সের উকিলের জুনিয়ার ছিলাম।

লোকনাথ অবাক হল। নিজের সম্পর্কে এত কথা ছোকরা আগে কখনও বলেনি। সে সাগ্রহে বলল, তারপর?

সুজিত টপ করে নিজের অতীতের ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বলল, তারপর আর কী? প্র্যাকটিস করিনি।

বলি মোকদ্দমা করলে কি টগর জিতবে?

কে জানে? কিন্তু মোকদ্দমা কার সঙ্গে?

ধর দাবিদারদের সঙ্গে!

দাবিদার কে?

ক্লাব, পার্টি আর নগেদার ভাইপো।

মোকদ্দমা করলে তো দাবিদাররা করবে। টগর করবে কেন?

লোকনাথ একটা শ্বাস ফেলে বলল, তাই ভাবছি।

ভাবার কিছু নেই। যতীন মাস্টারের সঙ্গে বিয়েটা লাগিয়ে দিন। যা করার যতীন করুক।

লোকনাথ মাথা নেড়ে বলে, ব্যাপার অত সোজা নয় ভায়া।

তাহলে গভীর জল!

গভীর জল কথাটা সুজিত সরকারের খুব প্রিয়। প্রায়ই বলে। লোকনাথ উঠে পড়ল।

হঠাৎ সুজিত বলল, যতীন মাস্টারের সঙ্গে টগরের বিয়ে দিতে আপনি রাজি নন কেন বলুন তো!

বিয়ে দেওয়ার আমি কে? ঘটকালি করতে রাজি আছি, কিন্তু বিয়ে দেওয়ানো তো আমার কম্ম নয়।

আপনি রাজি তো!

লোকনাথ মাথা নেড়ে বলল, মন সায় দিচ্ছে না। একটা দোজবরেকে বিয়ে করবেই বা কেন মেয়েটা? তাও একাবোকা তো নয়, পাঁচটা বাচ্চা, সম্পত্তি পেয়ে তাহলে মেয়েটার লাভ হল কী?

সুজিত একটু হাসল। তারপর বলল, কার কী লাভ, কীসে কতটা হয় তা কে জানে। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম বলে একটা কথা আছে। হয়তো দেখবেন যতীন মাস্টারকে পেয়েই টগর বর্তে গেছে। আমার কথা হল, প্রস্তাবটা টগরের কাছে করে দেখুন।

তাই দেখল লোকনাথ। টগরের বাড়ি হল গাঁয়ের শেষ মাথায়। দু-খানা কুঁড়েঘর আর একটু উঠোন। হাঁস আছে, ছাগল আছে। তার বেশি কিছু নেই। টগর আর তার মা গায়ে-গতরে খেটে কিছু রোজগার করে। কখনও খেতের কাজ, কখনও কারও বাড়ির কাজ।

তখন বিকেল। টগর হাঁসগুলোকে পুকুর থেকে তাড়িয়ে এনে ছোট টিনের ঘরে বন্ধ করছিল। লোকনাথ দাওয়ায় বসে হরিপদর কাছেই কথাটা পাড়ল।

হরিপদ অভাবী মানুষ, লোভীও। কথাটা শুনে একটু দোনামোনা করে বলল, তাতে কি সম্পত্তিটা পাওয়া যাবে বাবু?

তা বলতে পারি না। তবে যতীন মাস্টার বলেছে, বিয়ে হলে সে লড়বে।

হরিপদ খুব নিশ্চিত হল না। বলল, পাওয়া যাবে কিনা সেটাই হল কথা। আমার মেয়ের ন্যায্যপাওনা জিনিস। বাবুরা বললে কইলে হয়েও যায়।

সেইজন্যেই তো যতীন মাস্টারের প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে বলছি। বিয়ে হলে সে দৌড়ঝাঁপ করবে।

বোকা হরিপদ একটু শঙ্কিত হয়ে বলল, কিন্তু বাবু, সাক্ষী তো পাঁচজন। আর আমার মেয়ে মোটে একটা। সবাই বিয়ে করতে চাইলে তো বড় মুশকিল হবে।

লোকনাথ জিব কেটে বলল, আরে ছিঃ ছিঃ, কী যে সব বল না, তোমার মাথারই ঠিক নেই। যতীন মাস্টার তো আর আমাদের মতো বুড়ো-হাবড়া নয়। জোয়ান মানুষ, বউটাও অকালে গেল। যতীনের তো আর কনের অভাব হবে না। টগরের ওপর মায়া হয়েছে বলেই প্রস্তাবটা করেছে।

যথাসাধ্য যতীনের দিকে টেনেই বলল লোকনাথ।

ওপাশের ঘরের দাওয়ায় বাখারি দিয়ে তৈরি খোঁয়াড়ে চারটে ছাগলকে ঢুকিয়ে আগল বন্ধ করে দুটো ছাগলছানাকে বুকে চেপে সোহাগ করতে করতে এদিকপানেই এল টগর। লোকনাথকে দেখে একটু হেসে বলল, ওমা খুড়োমশাই যে! কখন এলেন, দেখতে পাইনি তো!

এই এলাম একটু আগে।

ছাগলছানাদুটিকে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে সামনে এসে ধপ করে বসে পড়ে বলল, খুড়োমশাই, আমার কী হবে তাহলে? কিছু পাব না?

সেই কথাই বলতে আসা।

কেউ আমাদের পাত্তাই দিচ্ছে না। আজও নন্দবাবুর বাড়ি গিয়ে কতক্ষণ বসে থেকে এলাম।

নন্দবাবু গাঁয়ের মাথা। মান্যগণ্য লোক। মেলা টাকা। বর্ধমানে তার কোল্ড স্টোরেজ আছে, গঞ্জে আছে দু-দুটো দোকান। আর এই গাঁয়ে তার মস্ত বাড়ি, পুকুর, বাগানে হরিণ চরে বেড়ায়। মস্ত খামার আছে মাইল পাঁচেক দূরে। লোকনাথ জানে নন্দবাবু ঘড়েল

লোক। ঘড়েল ছাড়া এ যুগে উন্নতি করা যায়ও না। লোকনাথ তবু জিজ্ঞেস করে, নন্দবাবু কী বলল?

ঠোঁট উলটে টগর বলল, বাড়িতেই থাকে না। সকালে কাজ কামাই করে গিয়ে শুনি কলকাতায় গেছে। বেলা বারোটা নাগাদ আসবে। নন্দবাবুর বউ কত কাজ করিয়ে নিল। ডাল ভাঙলুম, চিঁড়ে কুটলুম, নন্দবাবুর মেয়ে মিলুর চুল আঁচড়ে বিনুনি বাঁধলুম। নন্দবাবু এল দুপুর পার করে। তেতেপুড়ে এসেছে, কিন্তু বলতে গেলে যদি রেগে যায়। তবে তার বউ বলল, ওগো, টগরের একটা ব্যবস্থা করে দাও। তখন নন্দবাবু বলল, দেখছি কী করা যায়। ওই কথা রোজ বলে, দেখছি কী করা যায়। দেখছে তো কচুপোড়া।

কথার মাঝখানে বোকা হরিপদ হঠাৎ ফস করে বলে বসল, বাবু তো তোর বিয়ের কথা পাড়তে এসেছে।

টগর হঠাৎ এ কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, বিয়ে? বিয়ের কথা কেন?

যতীন মাস্টার তোকে বিয়ে করতে চাইছে। তাহলে নাকি তোর হয়ে সাক্ষী দেবে।

কথাটা যেভাবে বলা উচিত হরিপদ মোটেই সেভাবে বলল না। কেমন খেঁকিয়ে উঠে বলল। ওতেই কি নাকচ হয়ে যায় না প্রস্তাবটা?

টগর যেন ভয় খেয়ে বলল, ও খুড়োমশাই, বিয়ে করতে চায় কেন?

লোকনাথ বলল, ভেবে দ্যাখ।

না, বলি বিয়ে করতে চায় কেন?

লোকনাথ আতান্তরে পড়ল। এ কথার কী জবাব হয়?

টগর ভারী শুকনো মুখ করে বলল, শীতলা ক্লাবের স্বপন ও সেদিন পিছু নিয়েছিল। বটতলায় একা পেয়ে এসে বলল, টগর, তোমাকে আমি ভালোবাসি। শুনে একগাল মাছি।

লোকনাথ একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, আর কেউ?

হ্যাঁ। নয়ন মুদির ছেলে সুব্রত। সে আবার হাতে চিঠি গুঁজে দিয়েছে। মরণ! আমি কি পড়তে জানি?

এ তো ভালো খবর রে। আগে পুঁছত না, এখন সবাই তোকে পুঁছছে।

কেন পুঁচছে সে জানি। কিন্তু খুড়োমশাই, আমি বিয়েটিয়ে করতে চাই না। ওসবে আমার কাজ নেই। সম্পত্তিটা পেলে আরামসে খাবদাব আর সিনেমা দেখব ক-দিন। তারপর তো মেলা কাজ। চাষবাড়ি যাও, ঘরদোর সারো, হাসমুরগি-গরুবাছুর সামলাও।

মুখখানা কেমনধারা ভাবালু হয়ে গেল টগরের।

লোকনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে মাস্টারকে কী বলব বল তো!

বলে দিন, বিয়েটিয়ে করতে পারব না।

লোকনাথ এ জবাবে অখুশি হল না বটে, কিন্তু তার দুশ্চিন্তা বাড়ল। বিয়ের প্রস্তাব নাকচ হলে যতীন মাস্টারও পিছোবে। কোথাকার কে টগরবালার বিষয়সম্পত্তির জন্য সে

লড়তে যাবে কেন?

বিকেলের দিকে গুটি গুটি যতীন মাস্টারের বাড়ি গিয়ে হাজির হল লোকনাথ। যতীন মাস্টার তখন তার এক কুপুত্তুরকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে। লোকনাথকে দেখে ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে কটমট করে চেয়ে বলল, যাঃ যাঃ সুমুখ থেকে।

ছেলেটা চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছিল এতক্ষণ। বাপের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাঁই বাঁই করে ছুটে হাওয়া হয়ে গেল।

যতীন মাস্টার হাতটা যে কেন ধুতির খুঁটে মুছল কে জানে। লোকনাথের দিকে চেয়ে উদাস মুখে বলল, ঘরে একটা শক্ত মেয়েছেলের অভাবে ছেলেপুলেগুলো উচ্ছন্নে যাচ্ছে, দেখছ তো!

হুঁ।

বউটা মরে গিয়ে ইস্তক দেখছি, সব কটা বাঁদর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একজন কেউ এসে হাল না ধরলে সর্বনাশটা রোখা যাবে না। চলো, নিরিবিলিতে বসি একটু। চা খাবে নাকি?

না, ওসবরে দরকার নেই।

দু-গাল মুড়িই খাও তাহলে।

ও বাবা, কষের দুটো দাঁত বিগড়ে আছে, মুড়ি চিবোতে গেলে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি ঝিলিক দেয়।

নিরিবিলিতে বসে লোকনাথ বলল, টগর একরকম নিমরাজি বলে ধরে নাও। তবে কিনা একটাই কথা, আগে সম্পত্তি তারপর বিয়ে!

কথাটায় যতীন খুশি হল না। অসন্তুষ্ট গলায় বলল, নিমরাজি! নিমরাজিটা কীরকম, পাত্রটা কি ফেলনা? ওর চৌদ্দপুরুষে আমার মতো পাত্র পেয়েছে?

আহা, চটো কেন? তোমার মতো পাত্র তল্লাট ঢুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। সে কি আর টগর বোঝে না? তার অমতও নেই। তবে আচমকা কথাটা পেড়েছি কিনা, একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে সে ঠিক। একটু সময় দিলেই মাথায় প্রস্তাবটা থিতিয়ে বসবে। তখন আনন্দে ডগোমগো না হয়ে পারে?

শোনো লোকনাথদাদা, এ হল দেওয়ানি মামলা। ফস করে এর নিষ্পত্তি হয় না। অনেক সময়ে বছরের পর বছর চলে। তাই বলে কি আমিও হাঁ করে বসে থাকব?

আহা এখনই মামলামোকদ্দমার কথা ওঠে কীসে? সাক্ষীরা সবাই মিলে এককাট্টা হলে গাঁয়ের মাতব্বর মুরুব্বিদের ডেকে খোলসা করে ব্যাপারটা বলা। তাহলেই হল।

উঁহু, অত সোজা নয়। মামলা একটা হবেই। নগেনদার ভাইপো নবীনচাঁদ মামলা করবে।

ঠিক জানো?

খুব জানি। সে নিজেই বলেছে। উকিলের পরামর্শও নিচ্ছে। তাহলেই বোঝ, কেন তোমার কথায় সায় দিচ্ছি না।

গভীর জল কাকে বলে তা লোকনাথ আরও একবার বুঝল। নাঃ, মেয়েটার ভাগ্যই খারাপ। মামলা হলে উকিলের ফি, আদালতের খরচটাও তো চালাতে পারবে না। আর দু-চারদিনের ব্যাপার তো নয়। সম্পত্তির মোকদ্দমা চলে তো চলেই। মামলা হল অজগর, সব গিলে খেয়ে নেয়। মেয়েটা পেরে উঠবে না।

লোকনাথ বলল, হ্যাঁ হে, তাহলে কি উইলটা টিকবে না বলছ?

টিকবে না কেন, খুব টিকবে। তবে হয়রানি আছে।

ধর টগর যদি তোমায় বিয়েই করে তাহলে তুমি সম্পত্তি কী করে উদ্ধার করবে? মামলা লড়তে হবে তো!

তখন অন্য কথা। বউয়ের জন্য মানুষ না পারে কী? নবীনচাঁদকে গাঁ-ছাড়া করে ছাড়ব। করুক না মামলা, সম্পত্তির দখল নিয়ে নিলে মামলা করলে হবে লবডঙ্কা। তখন এই শর্মার এলেম দেখে নিও।

লোকনাথ বুঝল, বিয়েটা না হলে যতীন তার এলেমটা দ্যাখাবে না মোটেই। তবে এলেম যতীনের আছে। পার্টি তার হাতে, নন্দবাবুরও সে পেয়ারের লোক, যতীন মাস্টারের দলবলও আছে। লোকনাথ উঠে পড়ল। বলল, চিন্তা কোরো না। টগর একরকম রাজিই। যেটুকু বাকি আছে সেটুকুও হয়ে যাবে'খন।

খবরদার! আমি চাইছি বলে যেন বুঝতে না পারে।

আরে নাঃ, তুমি আবার চাইলে কখন? অরক্ষণীয়া, গরিবের মেয়েকে উদ্ধার করতে চাওয়াকে কি খারাপ ভাবে কেউ?

লোকনাথ হাল একরকম ছেড়েই দিয়েছে। তবু সন্ধের পর সুজিতের ডেরায় হানা দিল। সুজিত গম্ভীর মুখে বসে আছে। রুগী-টুগি নেই। কী যেন ভাবছে। তাকে দেখে হাসল। বলল, এখনও হাল ছাড়েননি?

ছেড়েই দিয়েছি। মেয়েটার বরাত খারাপ।

সুজিত বিনা ভূমিকায় বলল, আজ নন্দবাবু এসেছিলেন।

লোকনাথ অবাক হয়ে বলল, নন্দবাবু? এখানে! বল কী হে?

অবাক হওয়ার কারণ আছে। নন্দবাবু যে কী বিরাট ধনী তা এখানে রূপকথার গল্পের মতো প্রচার হয়ে থাকে। তাঁর বাড়িতেই দুবেলা গাঁয়ের মাথা-মানুষেরা সেলাম ঠুকতে যায়। তিনি সুজিতের মতো হেঁজি-পেঁজি লোকের কাছে আসবেন কেন? কোন দুঃখে?

সুজিত বলল, এসেছিলেন। তাঁর মাইগ্রেন আছে। বহু চিকিৎসাতেও সারেনি। তাই আসা।

লোকনাথ চোখ কপালে তুলে বলল, নন্দবাবু তোমার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন? এ যে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়!

তাই বটে। তবে চিকিৎসাটা মনে হল একটা ছুতো। একটু আলাপ করে গেলেন। আমার সঙ্গে তো আলাপ ছিল না।

লোকনাথ বলল, ওহে, নন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ থাকাটাও মস্তবড় কথা কিনা, আমার তো এই গাঁয়েই জন্ম, পেরেছি আজ অবধি নন্দবাবুর টিকির নাগালটি ধরতে? তা কী কথা হল?

তিনিও টগরবালার জন্য চিন্তিত। তবে উলটো দিক থেকে।

তার মানে?

নন্দবাবু মনে করেন, নগেন নস্কর কাজটা অন্যায় করেছে। গাঁয়ের অপমান হয়েছে তাতে। টগরবালাকে সম্পত্তি দেওয়ার চেয়ে সৎকাজে দিলে ভালো হত।

তারপর?

তিনি এই কথাটাই বলতে এসেছিলেন বোধহয়।

গভীর জল কাকে বলে ফের বুঝতে পারল লোকনাথ। চশমাটা ধুতির খুঁটে পুছে নিয়ে বলল, তাহলে আর কী? এ কথা হল এ গাঁয়ে হাইকোর্টের রায়।

সুজিত একটা হাই তুলে অলস গলায় বলল, বড়লোকগুলোকে আমি দু'চোক্ষে দেখতে পারি না।

ও আর নতুন কথা কী? বড়লোকদের কেউই পছন্দ করে না। কিন্তু তবু খাতির দেখাতে হয়, সেলাম বাজাতে হয়। টাকার একটা মান্যি আছে না?

সুজিত মিচকে হাসি হেসে বলল, তা আর নেই? খুব আছে। টাকা হল সুপ্রিম কোর্ট।

সুজিতের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে লোকনাথের মনে হল, ছোকরা কিছু একটা চেপে যাচ্ছে যেন। সুজিতের পেট থেকে কথা বের করা ব্রহ্মার অসাধ্যি। আজ অবধি ওর বাবার নামটা অবধি আদায় করা যায়নি।

তা নন্দবাবু আর কী বলল?

সুজিতের মুখে সেই ফিচেল মিচকি হাসি খেলে গেল। বলল, এই কথার পিঠে কথা। নন্দবাবুর বড় মেয়ে শ্যামলীকে চেনেন?

চিনব না? এইটুকু থেকে দেখছি। কেন বল তো!

সুজিত মুখের ফিচেল হাসিটা বজায় রেখেই বলল, নন্দবাবু মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন।

লোকনাথ হাঁ হয়ে গেল। তারপর অবিশ্বাসের গলায় বলল, বল কী? শ্যামলীর পাত্রের খোঁজে তোমার দ্বারস্থ হয়েছিল নন্দবাবু? তার মেয়ের কি পাত্রের অভাব? একটু টু দিলে

হাজারো সুপাত্র এসে পাকা কাঁঠালে মাছির মতো পড়বে। তুমি যে আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছ হে! ভাবছি আমার মাথাটারই গন্ডগোল হল কিনা!

সুজিত মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, পাত্রের অভাব হবে কেন? তবে উনি একটু অন্যরকম পাত্র খুঁজছেন।

কীরকম হে?

এই ধরুন গরু কিনতে গিয়ে আপনারা যেমন সেই গরুই খোঁজেন যে খাবে কম নাদবে বেশি। তা উনিও পছন্দমাফিক পাত্র খুঁজছেন।

তা পছন্দেরও তো একটা বৃত্তান্ত আছে না কী?

তা আছে। মেয়ের জন্য উনি কোনও পুরুষসিংহ চান না। বরং যেন মৃদু-মোলায়েম ভেড়ার মতো পাত্র হবে, চেহারাটি দেখনসই চাই। পেটে একটু বিদ্যেও থাকতে হবে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলে কিছু থাকা চলবে না। ঠিক ঘর-জামাই চান না, তবে এই গাঁয়েই বসবাস করতে হবে। জামাই-মেয়ের জন্য উনি একখানা বাড়ি করে দেবেন। জামাইয়ের চাকরির ব্যবস্থাও হবে। আজকাল বড্ড বধূ নির্যাতন আর বউ পোড়ানো হচ্ছে বলেই এই ব্যবস্থা।

লোকনাথ চশমাটা ধুতির খুঁটে পুঁছতে পুঁছতে বলল, সেইরকমই পাবে। নন্দবাবু চাইলে কী না হতে পারে বলো! কিন্তু আমি ভাবছি এ কথা বলতে উনি তোমার কাছে এলেন কেন?

কেন, আমি কি একটা ফ্যালনা লোক?

তা বলিনি। তবে অজান অচিন লোকের কাছে হুট বলতে হাজির হওয়ার পাত্র নন্দবাবু নন। কিছু গুহ্য কথা আছে নিশ্চয়ই, বলছ না।

সুজিত আড়মোড়া ভেঙে একটা হাই তুলে বলল, গুহ্য কথা হলে গুহ্যই থাক। আপনি পেট-পাতলা লোক, কথা লুকোতে জানেন না। ওসব আপনার শুনে কাজ নেই।

খুব চিনেছ আমাকে! কবে দেখেছ এর কথা ওর কাছে বলে বেড়াচ্ছি? আমার ধাত হল শক্ত ঢাকনার কৌটোর মতো। কথাটি ঢুকিয়ে ঢাকনাটি এঁটে দিই। ব্যস, কার সাধ্য কথা বের করে?

বটে! বলে খুব বিচ্ছু হাসি হাসল সুজিত। তারপর বলল, প্রস্তাবটা শোনার পর থেকে আমার নিজের ওপর বড্ড ঘেন্না হচ্ছে। উনি আমাকেই পাত্র বেছেছেন।

এত অবাক হল যে এক মিনিট বাক্যই সরল না লোকনাথের! তারপর বলল, তোমাকে?

আমাকেই। শ্যামলী নাকি আমাকে পছন্দ করে বসে আছে। আমি অবশ্য তাকে চোখেও দেখিনি।

লোকনাথ প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, এ যে ডার্বি মেরেছ হে!

বলেছি তো, বড়লোকদের আমি দু-চোখে দেখতে পারি না।

দুই

গোধূলি দেখতে এইখানে আসে সুজিত। রোজ নয়, মাঝে মাঝে। মনটা যেদিন একটু ম্যাদাটে মেরে থাকে সেদিন। কুমোরপাড়ার মেটে রাস্তাটা এখানে এসে একটা পোড়ো জমিতে গায়েব হয়েছে। সামনে বিস্তর বাবলার গাছ। ডাইনে হল একটা গোচর জমি, বাঁয়ে খাল। খালটাই পশ্চিম। ওদিকে মুখ করে দাঁড়ালে খালের ওপাশে কতগুলো সজনে গাছের ফাঁকে সেই খুনখারাপি সূর্যাস্ত।

গোধূলিই বটে। খালের ওপাশে এসময়ে গরুর খুর থেকে ধুলো ওড়ে। সূর্যাস্তটা ভারী নির্জন। ভারী নিস্তব্ধ। দেখতে দেখতে মনটা যে ভাল হয় তা নয়। বরং পুরনো ক্ষতে যেন টাটানো ব্যথা হয়। একটা-দুটো সূর্যাস্ত তো সকলের জীবনেই ঘটে।

মোট সাড়ে চারটে ডাকাতি করেছিল সুজিত। দুটো ব্যাঙ্ক আর একটা গদিবাড়িতে। আরেকটায় কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি। ব্যাঙ্ক দুটোই ছিল কলকাতার কাছেপিঠে। গদিটা ছিল কালীবাবুর বাজারের কাছে। বাড়িটা নারকোলডাঙায়। পঞ্চমটা ছিল লেকটাউনে। নতুন একটা হাইরাইজের তিনতলায়। সে বাড়িতে তখনও অন্য সব ফ্ল্যাটে লোক আসেনি, দারোয়ানও বহাল ছিল না। ঠিকাদার থাকত ওই ফ্ল্যাটটায়। মাঝরাতে দরজা ভেঙে ঢুকেছিল তারা। পলকা দরজা, পাকা দরজা তখনও লাগানো হয়নি। ঠিকাদারটা ছিল ডাকাবুকো ধরনের। কয়েকজন মিস্ত্রি থাকত ফ্ল্যাটে। তারাও রুখে দাঁড়াল। সুজিতরা দলে পাঁচজন। দু-জনের পাইপগান ছিল, একজনের কাছে বোমা, একজনের রিভলভার, সুজিতের হাতে ভোজালি। কিন্তু রিভলভার ওদিকেও ছিল। হাতে নিয়েই বসেছিল ঠিকাদারটা। ঘরে ঢুকতেই চালাল। পাঁচজনের তিনজন পালাল। একজন বুকে গুলি খেয়ে মরল। সুজিতের পেটে দুবার রড ঢুকিয়ে দিয়েছিল একটা মিস্ত্রি। চোখা রড, ছুরির চেয়েও মারাত্মক। সুজিত সেই ক্ষত নিয়েও পালিয়েছিল, তার কারণ যে ছোকরা গুলি খেয়ে মরেছিল তার কাছেই ছিল বোমার ব্যাগটা। মরবার সময় যখন মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল সেই সময়ে বোমা ফাটে। একটার রিঅ্যাকশনে বাকিগুলো। নাকাশ নামে ছেলেটা প্রায় উড়ে গেল সেই বিস্ফোরণে। সঙ্গে গেল ঠিকাদার আর তার তিন শাগরেদ। রক্তাক্ত, আহত সুজিত একটা ট্যাক্সি ধরে পালিয়েছিল।

সুখস্মৃতি নয়, তবু খুব মনে পড়ে। পুলিশ হয়তো আজও খোঁজে তাকে। কে জানে কী! এখানে সে এই বেশ আছে। চারটে ডাকাতির হিসসা প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো টাকা আজও আছে তার। তাতে কখনও হাত পড়েনি। আজও আছে, কিন্তু কাজে লাগে না।

তার এক মামা আছে, সে শেয়ারবাজারে খাটায়। সুজিত সেই টাকা নিয়ে মাথাই ঘামায় না। ভাগ্য ভাল, চারটে ডাকাতির একটাতেও খুনখারাপি হয়নি। হলে পুলিশ খুঁজে তাকে বের করতই।

কোনও গ্লানি হয় কি তার? বুকে হাত দিয়ে বলতে হলে সে বলবে, না হয় না। এম এ পাশ করার পর সে তিনটে বছর টিউশানি ছাড়া আর এল আই সি-র এজেন্সি ছাড়া আর একটা স্টিল আলমারি কোম্পানির ব্যর্থ সেলসম্যানশিপ ছাড়া কিছু করে উঠতে পারেনি। বাঁচতে চাওয়ার মধ্যে আবার গ্লানি কীসের?

তবে এখন আর তার বাঁচার এবং কিছু হয়ে ওঠার সেই উদগ্র ইচ্ছেটা নেই। মামা টাকা খাটিয়ে লাভ করছে না লোকসান সেই খবরও সে নেয় না। এখানে এই যে নিস্তরঙ্গ জীবন এবং সামান্য পুঁজি নিয়ে বেঁচে থাকা এও তার কিছু খারাপ লাগে না। হোমিওপ্যাথির মধ্যে সে একটা তীব্র আকর্ষণ আর রহস্য খুঁজে পাচ্ছে আজকাল। জ্যোতিষীর মধ্যেও খানিকটা, এখানকার স্কুলে তার চাকরিটা যে হতে হতেও হল না তার জন্যও তার দুঃখ হয় না তেমন।

সে ভালো নেই, খারাপও নেই।

গোচর জমিটা থেকে কয়েকটা ছাগল তাড়িয়ে একটা মেয়ে ফিরে আসছিল। একটু লক্ষ্য করল সুজিত, এই নির্জন জায়গাগুলো কমবয়সী মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ নয়। গত সপ্তাহেও দিনদুপুরে এখানে একটা রেপ হয়ে গেছে। মেয়েটাকে কি সাবধান করে দেওয়া উচিত? দিয়েই বা কী হবে? গরিবঘরের মেয়েদের তো বেরোতেই হয়, মাঠে ময়দানে না গিয়েও উপায় নেই। জীবনের এসব বিপদ-আপদ মাথায় করেই চলা।

মেয়েটা রাস্তায় উঠে এসে তাকে দেখে দাঁড়াল, বাবু?

সুজিত ভ্রূ তুলে বলল, কী?

আমার কী হবে বলো তো!

কীসের কী হবে? কী বলছ?

খুড়োমশাই তো রোজ তোমার কাছে গিয়ে আমার কথা বলে। আমি টগরবালা।

সুজিত তবু বুঝল না। আসলে টগরবালা তার চেনা মেয়ে নয়। মাথায় টগরবালার সমস্যার কথাটা থাকে না। তাই একটু সময় লাগল বুঝতে। তারপর বলল, ওঃ, সেই নগেন নস্করের সম্পত্তি নিয়ে যে কথা উঠেছে?

হ্যাঁ, আমারই তো ন্যায্যপাওনা না কী? গাঁয়ের লোক কেন বাগড়া দিচ্ছে বলো তো!

সুজিত মেয়েটার দিকে চাইল। খুবই কচি বয়স। রোগাই বলতে হয়। মুখখানা বড্ড করুণ। সুজিত একটু হেসে বলল, সম্পত্তি দিয়ে কী করবে?

মেয়েটা চোখ কপালে তুলে বলল, ও কী কথা গো বাবু? আমরা গরিব লোক, সম্পত্তি পেলে চাট্টি খেতে পরতে পাব। মাগনা তো পাইনি গো! জ্যাঠামশাইয়ের সেবা-টেবা

করেছিলাম বলেই তো দিল।

সুজিত বলল, সম্পত্তি পেতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। মুরুব্বিদের ধরো।

মেয়েটা ঠোঁট উল্টে বলল, কত জনার কাছে যাচ্ছি। আমার কথা কেউ কানেই তুলছে না। দোষটা কী করেছি বলো তো!

সেটাই ভাবনার কথা।

খুড়োমশাইয়ের তোমার ওপর খুব ভরসা। তা তুমি কিছু করতে পারছ না? গরিব বলেই না কেউ পাত্তা দেয় না আমাদের। শুধু খুড়োমশাই যা কিছু করছেন, দেবতুল্য লোক। আর কেউ ফিরেও চায় না।

সুজিত জড়াতে চায় না। এসব উটকো ঝামেলা তার ঘাড় পেতে নিতে ইচ্ছেও করে না। টগরবালা কার সম্পত্তি পেল বা না পেল তাতে কী এসে যায়? সে বলল, ধৈর্য ধরে দ্যাখ কী হয়।

সে তো আছিই। ওদিকে যে সবাই মুখিয়ে আছে দখল নেবে বলে। নবীনচাঁদ নাকি মামলা করবে। বাবা গো, আমরা কি মামলা মোকদ্দমায় যেতে পারি? উকিলের পয়সা কোত্থেকে দেব?

নবীনচাঁদ কে?

নগেনজ্যাঠার ভাইপো। আজ সকালে দলবল নিয়ে এসে ভয় দেখিয়ে গেছে। বলেছে বেশি ট্যান্ডাইম্যান্ডাই করলে ঘরে আগুন দিয়ে যাবে! আচ্ছা বলো তো, আমি কি কিছু দোষ করেছি?

উইলটা কার কাছে?

আমার কাছে। লুকিয়ে রেখেছি। লোকনাথ জ্যাঠা বলেছে সাবধানে রাখতে।

যদি পারো একবার আমাকে দেখিয়ে যেও। লোকনাথবাবুর হাত দিয়ে পাঠালেও হবে।

মেয়েটার মুখে হঠাৎ একটু খুশির ভাব দেখা দিল। বলল, কিছু করবে তো বাবু? তুমি যদি কিছু করো তা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। লোকনাথ জ্যাঠা বলে, তুমি লাগলে অসাধ্যসাধন হবে। সাধে কী আর নন্দবাবু তোমাকে জামাই করতে চায়?

ভারী অবাক হয়ে সুজিত বলল, এ কথা তোমাকে কে বলল?

টগরবালা হাসি-হাসি মুখ করে বলে, সবাই তো জানে। শ্যামলীদি তো তোমাকে বিয়ে করার জন্য কেঁদে-কেটে একশা। বলে, ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তোমার জন্য পাগল।

কেন পাগল বলো তো! আমি তো একটা দুঃখী লোক এক কোণে পড়ে থাকি।

ওমা, কী বলে গো! তোমার জন্য কে পাগল নয় বলো তো? নন্দবাবুর মেয়ে সবাইকে টেক্কা মেরে দিল বটে, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দ্যাখ তো, নাথবাবুর মেয়ে গীতা, জটেশ্বর সামন্তর

মেয়ে মালতী, জাহ্নবীবাবুর মেয়ে দময়ন্তী, আরও কত! তোমাকে নিয়েই যত ফিসফাস আর রসের কথা।

সত্যিকারের অবাক হয়ে সুজিত বলল, বল কী? এসব তো আমি কক্ষনো টের পাই না!

পাবে কী করে? যা গোমড়ামুখে থাকো, সবাই তোমাকে ভয় পায়।

এ কথা ঠিক যে সে গোমড়ামুখে থাকে এবং এ গাঁয়ের লোক তাকে একটু সমীহ করে চলে। ফালতু আলাপ করতে কেউ তার কাছে আসতে সাহস পায় না। দু-চারজন চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কঠিন চোখ আর শক্ত মুখে সুজিত তাদের নিরস্ত করেছে। কিন্তু এই মেয়েমহলের ব্যাপারটা তাকে ভাবিত করে তুলল। মেয়েমানুষের কথা সে ভাবে তো নিই, এমনকী তাকায় না পর্যন্ত মেয়েদের দিকে। কিছুদিন আগে দুটো ফ্রক পরা পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে এসেছিল ওষুধ নিতে। একটু কথা-টথা বলেই সুজিত বুঝতে পারল, ওষুধ নয়, এদের অন্য কোনও মতলব আছে। এমন ধমক দিয়েছিল যে মেয়ে দুটো পালানোর পথ পায় না।

মেয়েদের ব্যাপারে এই যে তার বিমুখতা এর দুটো কারণ। এক, সে বিয়ে করবে না কারণ বউকে খাওয়ানোর মতো রোজগার তার নেই। দ্বিতীয় কথা, সাড়ে চারটে ডাকাতির তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। সূত্র ধরতে পারলে একদিন পুলিশ ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে।

তার চেয়ে এই সে বেশ আছে। সে মৃদু একটু হেসে বলল, শ্যামলীকে চেনো বুঝি তুমি?

চিনব না? খুব চিনি।

কেমন মেয়ে বলো তো!

কী সুন্দর গড়নপেটন, আর কী ফর্সা। গোলগাল আলহাদি পুতুলের মতো। দ্যাখনি?

না। আমি তাকে চিনি না।

তোমার দোকানের সামনে দিয়েই তো ইস্কুলে যায়।

সুজিত উদাসভাবে বলল, তা যায় হয়তো। কত লোকই সারাদিন যাচ্ছে আসছে।

কুমোরপাড়া পেরিয়ে এসে টগরবালা বলল, বাবু, ওই আমাদের বাড়ি। একবারটি যাবে?

সুজিত অবাক হয়ে বলে, কেন বল তো?

সেই কাগজখানা তাহলে তোমাকে দেখাতাম।

একটু দোনোমোনো করে সুজিত রাজি হয়ে গেল। বলল, চলো, দেখেই যাই।

টগররা যে বেশ গরিব তা উঠোনে পা দিয়েই বুঝল সুজিত। তবে গরিব হলেও বাড়িটার লক্ষ্মীশ্রী আছে একটু। বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে। উঠোনে একটা মোড়া পেতে দিয়ে

টগর বলল, বোসো বাবু, আমি হাঁসগুলোকে ঘরে বন্ধ করে আসছি।

খটখটে উঠোন। মাঝখানটায় তুলসীমঞ্চ। একটা সজনে আর একটা আমগাছ আছে। টগরবালার বাপও বেরিয়ে এসে সামনেই উবু হয়ে বসে বলল, আজ্ঞে, দেন করে একটা ব্যবস্থা। মেয়েটার বড় হয়রানি যাচ্ছে। আপনারা পাঁচজন পিছনে দাঁড়ালে হয়ে যায়।

সুজিত গম্ভীর মুখে বলল, আমি কোনও কেওকেটা নই বাপু। আমার কথায় কিছু হবে না।

লোকনাথবাবু যে বলল আপনি লাগলে হয়। আপনার মেলা ক্ষমতা।

লোকনাথবাবু বাড়িয়ে বলেছে, তেমন কিছু পারব বলে মনে হয় না। তবু উইলটা দেখি একটু।

হরিপদই উইলটা নিয়ে এল। উলটেপালটে দেখল সুজিত। আলো সরে এসেছে উঠোনে। সাঁঝের ঝুঁঝকো আঁধার ঘোরালো হয়ে এসেছে। তার মধ্যেই যা দেখার দেখে নিল। দেখার বিশেষ কিছু নেইও। ন্যায্য উইল। প্রশ্নটা উইলের ন্যায্যতা নিয়েও নয়। আসল কথা হল, এরা গরিব, লেখাপড়া জানে না। হাতে চাঁদ পেয়েও তাই না-পাওয়ার সামিল।

বাবু, চা খাবে? টগর এসে জিগ্যেস করে।

না, তার দরকার নেই।

তা হলে ছাগলের দুধ খাও এক গেলাস।

না, দুধ খাই না।

উইল দেখলে? কিছু গোলমাল আছে?

না। উইল ঠিকই আছে।

তাহলে কেন ওরা এমন করছে বল তো!

সুজিত একটু ম্লান হাসল। উইলটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এ কাঁচা উইল। আদালত থেকে প্রবেট বের করতে হবে। তাতে খরচ আছে।

হরিপদ হাউমাউ করে উঠল, ও সব কি আমরা বুঝি বাবু? যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দেন। মেঠাই খাওয়ার জন্য না হয় কিছু দেব আপনাকে।

ঘুষের এই প্রস্তাবে হেসে ফেলল সুজিত। টগরবালা বাপকে ধমক দিয়ে বলল, কাকে যে কী বলো না তার ঠিক নেই। বাবুর কী মেঠাই খাওয়ার পয়সার অভাব? কত বড়লোকের জামাই হতে যাচ্ছে তা জানো?

না, হরিপদ জানে না। ধমক খেয়ে অপরাধী মুখ করে বসে রইল। সে বোকার হদ্দ। বেফাঁস বলার জন্য হেনস্থা হতে হয় প্রায়ই।

টগরবলা বলল, ও বাবু, একটা কথা কইব? রাগ করবে না তো?

বলো।

তোমার শ্বশুরমশাইকে একবারটি বলবে? নন্দবাবু বললে আর কেউ রা কাড়বে না।

সুজিত একটু লাল হল। উঠে পড়ে বলল, কাউকে বলার দরকার নেই। ওসব আমি পারিও না। তোমার কথাটা ভেবে দেখি। মাথায় কোনও মতলব এলে বলব।

দেখো বাবু একটু। আমাদের তো আর কেউ নেই।

সন্ধের পর যখন চেম্বারে বসে আছে সুজিত তখন একটু আগে পরে তিনজন লোক গ্যালগ্যালে মুখ নিয়ে এসে হাজির হল। তিনজনের একজন নগেন নস্করের উইলের সাক্ষী রমেন পাল। আর দুজন গাঁয়ের লোক।

তিনজনের মুখেই তিনরকম হাসি দেখতে পাচ্ছিল সুজিত। কেউ তেমন কথা বলার সাহস পাচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে রমেন পাল হঠাৎ বলল, আপনি তাহলে এ গাঁয়েরই পাকা বাসিন্দা হয়ে গেলেন! খুব ভাল কথা। প্রস্তাবটা আমিই দিয়েছিলাম নন্দদাদাকে। বললাম, এমন পাত্র আর পাবে না দাদা। অন্যে গাপ করার আগে খপ করে ধরে ফেলো। ফসকালে পরে পস্তাবে।

এসব লোকের তেমন কোনও কাজ থাকে না। মাথায় বুদ্ধিরও তেমন চাষ নেই। গড়ানে জীবন। গাঁয়ে একটা কিছু ঘটলে জো পায়। নন্দবাবুর মেয়ে শ্যামলীর খবরটা পেয়েই এসেছে সব তাকে নতুন করে দেখতে। ভ্রূকুটিটা স্থায়ীভাবে ধরে রাখল সুজিত।

হরিদাস নস্কর বলল, মেয়েটাও বড্ড ভালো। যেমন দেখতে, তেমনি স্বভাব, স্বজাতি, স্বঘর, তার ওপর পালটি।

নব দাস ভারী খুশির হাসি হাসতে লাগল, হেঃ হেঃ হেঃ!

সুজিত চুপচাপ বসে রইল। নন্দবাবু কাল যখন শ্যামলীর সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবটা তোলেন তখনই মনটা ভরে গিয়েছিল তার। শ্যামলীকে সে দ্যাখেইনি, সুতরাং মেয়েটার ওপর তার রাগ নেই। কিন্তু প্রস্তাবটাই কি যথেষ্ট অপমানকর নয়? সে কেন একটা লোকের মেয়েকে বিয়ে করে সেই লোকটার পয়সায় পায়ের ওপর পা দিয়ে থাকবে বা তার দয়ায় দেওয়া চাকরিতে বহাল হবে? তাকে যে এরকম ভাবা হচ্ছে এটাই তো তার পরাজয়।

সুজিত হঠাৎ রমেন পালের দিকে চেয়ে বলল, রমেনবাবু, আপনি কি নগেন নস্করের উইলের সাক্ষী ছিলেন?

রমেন পাল একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল, ও হ্যাঁ, সে একটা কান্ডই হয়েছিল!

কী কান্ড?

সে আর বলবেন না। ফেঁসে গিয়েছিলুম।

কিন্তু নগেন নস্কর যে টগরবালাকে সব লিখে দিয়ে গেছে সেটা তো আর মিথ্যে নয়। উইল মানে ইচ্ছে। নগেন নস্করের ইচ্ছেটা তো তাই ছিল, না কী?

রমেন পাল হঠাৎ ফিচিক করে একটু হেসে চোখ মুখ কুঁচকে এমন ভাব করল যে, ঠাট্টা ইয়ার্কি হচ্ছে। তারপর গলা নামিয়ে বলল, ও সব পাপের বৃত্তান্ত না শোনাই ভাল। ভিতরে অনেক প্যাঁচ আছে।

কীসের প্যাঁচ?

লাট্টুর প্যাঁচ, ঘুঁড়ির প্যাঁচ, দড়ির প্যাঁচ, যা বলুন।

বলে খুব হাসল রমেন পাল। তারপর হাসিটা গিলে ফেলে বলল, নগেনদাদারও বলিহারি যাই। ওসব বুড়ো বয়সের দোষ হয় অনেকের। কিন্তু তা বলে সম্পত্তি লেখাপড়া করাটা ভালো? তাতে ব্যাপারটা জানাজানি হল, চাউর হল। লোকে বুঝে গেল দুইয়ে দুইয়ে চার।

সুজিত রমেন পালের দিকে চেয়ে বলল, যতদূর জানি নগেন নস্করের বয়স হয়েছিল প্রায় সত্তর। ব্লাডসুগার, রক্তচাপ আর কিডনির অসুখ ছিল। এ সব যার হয় তার আর সেক্স থাকে কি?

রমেন পাল আমতা আমতা করে বলল, আমি অত খবর রাখি না।

আমি রাখি। ডাক্তারি করি বলেই রাখি।

রমেন পাল পিছু হটে বলল, তা হবে।

সুতরাং ও যুক্তিটা টিকছে না রমেনবাবু।

রমেন পাল একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। সুজিত কোন পক্ষে তা বুঝে উঠতে পারল না। বাতাস শুঁকে সে একটু আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। এ গাঁয়ের কোনও মাতব্বরই টগর ছুঁড়ির পক্ষে নয়। হাড়হাভাতে লোকনাথই যা একটু চেষ্টা করে যাচ্ছে। নন্দবাবুর ভাবী জামাই যদি ছুঁড়ির পক্ষে ঢলে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে ভাবনার কথা। সেই ভাবনাটাই একটু ভেবে নিল রমেন।

নন্দবাবুর ছেলে নেই, দুটো মেয়ে। সুতরাং জামাইয়ের ওপরেই সব অর্শাবে। জামাইরা যখন নন্দবাবুর জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসবে তখন তারাই হবে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আর এই সুজিত ছোকরা শক্ত ধাতুতে তৈরি। গাঁয়ের লোক একে সমঝে চলে। তার ওপর যদি নন্দবাবুর কুবেরের ধনদৌলত পায় তবে তো হাতে মাথা কাটবে। আগে থেকে সেলাম জানিয়ে রাখা ভালো। এসব লোকের বিষ নজরে থাকাটা মোটেই কাজের কথা নয়। রমেন পাল সুতরাং মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখ করে বলল, আমারও ওরকমই মনে হয়েছিল। তবে গাঁয়ের লোক কুচ্ছো গেয়ে গেয়ে এমন করল যে--থাকগে সেকথা। তা ছুঁড়িটা কি দখলপত্তন পাবে বলে মনে হয় সুজিতবাবু?

তা জানি না। তবে তার সহায় সম্বল বিশেষ নেই। লোকে ভয়ও দেখাচ্ছে।

রমেন পাল ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবনার ভান করে বলল, ওইটেই তো কথা। দখল পাওয়া কঠিন হবে মশাই, খুব কঠিন হবে।

এ সময়ে মাখন পাল এসে পড়ায় এই তিনজন উঠে পড়ল। মাখন পাল বিদায় নিতে না নিতেই এল লোকনাথ। ঘেমো জামাটা খুলে বেড়ার গায়ে টাঙিয়ে বলল, ও বাড়ি ঘুরে এলুম।

কোন বাড়ি

তোমার ভাবী শ্বশুরবাড়ি হে। গেছো কখনও?

না, যাইনি।

গেলে পারতে একবার। দেখার মতো জিনিস একখানা। পাঁচ বিঘের বাগান, সঙ্গে দু বিঘের পুকুর। ঘাট-টাট সব পাথর দিয়ে বাঁধানো। বাগানে হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, ময়ূর আছে, খরগোশ টরগোশ আছে। আপেল, বেদানা, ন্যাসপাতি, আঙুর থেকে শুরু করে কোন গাছটা নেই বলো দিকিনি! আঙুর, আপেল, বেদানা ফলেও শুনেছি, তবে খাওয়া যায় না। তা হোক, লোকটার শখ শৌখিনতা খুব আছে। সাত আটটা বিলিতি কুকুর আছে, গোটা চার পাঁচ দারোয়ান। একটা বাঘও পুষেছিলেন নন্দবাবু। সেটা কেঁদো হয়ে ওঠায় চিড়িয়াখানায় দিয়ে দিয়েছেন।

ওসব শুনে কী হবে?

শুনে রাখা ভালো হে। যে-বাড়ির জামাই হতে যাচ্ছ তার কথা একটু শুনবে না? গিয়ে দেখলুম, শ্যামলীর বিয়ের জন্য সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে। কথাটাই তোলা গেল না।

কোন কথাটা?

টগরবালার কথা। মরিয়া হয়ে নন্দবাবুকেই ধরে পড়ার জন্য গিয়েছিলুম। তা উনি এখন দেখছি তোমাকে জামাই পেয়ে আল্হাদে ডগমগ। তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ।

বটে!

মেয়েও দেখলাম অহংকারে মকমক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা কেল্লা মারলে বটে ভায়া।

সুজিত একটু হাসল।

বিয়েটা লেগে গেলে সুবিধেই হবে। নন্দবাবুকে হাতে পাওয়া যাবে তাহলে। অবশ্য বড়লোকের জামাই হয়ে তুমি যদি অন্যরকম হয়ে না যাও।

সুজিত একটু হাসল। সেই ছটাকে হাসি। বলল, নন্দবাবু কি মুস্কিল আসান নাকি?

তুমি আর এ গাঁয়ে কতদিনই বা আছ। আমরা জানি নন্দবাবুর ক্ষমতাটা কী? উনি ইচ্ছে করলে সব হয়।

আপনি তাকে দিয়ে কী করাতে চান?

আমি নয় রে ভায়া, যা করানোর তুমি করাবে। আগে টগরবালার সম্পত্তিটা তো পাইয়ে দাও।

আপনাকে টগরবালায় পেয়েছে। ও মেয়েটার জন্য অত ভাবছেন কেন?

লোকনাথ মাথাটা নেড়ে বলল, জানি না। এর মধ্যে যদি আঁশটে গন্ধ পেয়ে থাকো তাও কিছু বলার নেই। লোকে তো নগেন নস্কর সম্পর্কেও কত কথা বলে টগরকে জড়িয়ে। আমার সম্পর্কেও হয়তো বলবে। আর কেউ নয় আমিই কেন মাথা ঘামাচ্ছি। কেন ঘামাচ্ছি তা বলতে পারব না। তবে চোখের সামনে একটা অন্যায় হচ্ছে তো, যতদূর পারি সেটা ঠেকাতে চাইছি। সারা জীবন তো কোনও অন্যায় ঠেকাতে পারিনি, চোখের সামনে দিয়েই কত কী হয়ে গেল। এটাও হয়তো পারব না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি।

টগর আমাকে আজ খালধারে ধরেছিল। বাড়িতেও নিয়ে গেল।

লোকনাথ একটু অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি?

উইলটাও দেখাল।

তা তোমার কী মনে হচ্ছে?

মনে আবার নতুন করে কী হবে? উইল ঠিকই আছে, আসল হল দখল নেওয়া। তাতে অনেক বাঁধা। নবীনচাঁদ ইনজাংশন দিতে পারে। তা ছাড়া ক্লাব আর পার্টি তো তৈরিই আছে।

লোকনাথ একটু গুম হয়ে বসে থেকে বলল, সবে বিয়ের প্রস্তাবটা উঠেছে, এখনই তোমার পক্ষে নন্দবাবুকে কিছু বলতে যাওয়াটা খারাপ দেখাবে। দু-চারদিন যাক, তারপর যদি কথাটা ফাঁক বুঝে তোলো, আমার মনে হয় কাজ হবে।

নন্দবাবু কী করবেন?

নন্দবাবু যা পারেন তা আমরা সবাই মিলেও পেরে উঠবো না। উনি সব পক্ষকে ডেকে বলে দেবেন, আমি চাই সম্পত্তিটা টগরবালাই পাক। ব্যস, তাতেই হয়ে যাবে।

ব্যস?

ওহে ভায়া, নন্দবাবুর মুখের কথাই এখানে বেদবাক্য।

এত ক্ষমতা লোকটার হল কী করে?

দাপের লোক। তার ওপর অত টাকা।

টাকা যত তার চেয়েও কিংবদন্তী একটু বেশিই হয়ে থাকে।

লোকনাথ মাথা নেড়ে বলল, না হে, টাকাও আছে। একটা কোল্ডস্টোরেজের দাম জানো? দেড় থেকে দু-কোটি টাকা। ওঁর একটা আছে, আর একটাও কিনেছেন সম্প্রতি। অন্য কারবারের কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি। একদিন এসব জামাইদেরই হবে। তুমি অর্ধেক হিসসাদার।

সুজিত ভ্রূকুটিটা এখনও ফুটিয়ে রেখেছে কপালে। বলল, নন্দবাবু আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন না, দুম করে বিয়ের প্রস্তাব করে ফেললেন, এটা একটু অদ্ভুত লাগছে। বিচক্ষণ মানুষরা কি এরকম করে?

খোঁজখবর নেননি কে বলল?

নিয়েছেন?

নেবেন না? অত কাঁচা কাজ করার লোক নয় হে।

খোঁজ যে নিয়েছেন তা আপনি জানলেন কি করে?

শোনো কথা, জানব কী করে আবার? আমি কি ফুসমন্তর জানি? নিজেই বলে গেলেন গড়গড় করে। তোমরা ক ভাইবোন, বাপ মা জীবিত না মৃত, বাড়ির অবস্থা কেমন সব বলে গেলেন। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার সঙ্গে এত মেলামেশা করেও আমি আজ অবধি তোমার বাবার নামটাও আদায় করতে পারিনি। ওঁর কাছেই সব শুনলাম।

সুজিত চুপ করে বসে রইল। তার সম্পর্কে আর কতটুকু জানে লোকটা? কতখানি জানে?

তোমাকে ভাবিত দেখাচ্ছে কেন ভায়া?

সুজিত সেই ফচকে হাসি হেসে বলল, খোঁজ নিলে তো বিয়ের প্রস্তাবটা না করাই উচিত ছিল।

কেন ভায়া, উনি যেমন চাইছেন তেমনটিই তো হচ্ছে। তোমার একটাই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, একটাই ভাই চাকরি করছে ডকে। বাবা গত হয়েছেন। বিধবা মা আছেন। বাড়িটাও নিজেদের। তোমার পিছটানও তেমন কিছু নেই। দিব্যি পাত্র।

পাড়া-প্রতিবেশীর কাছেও খোঁজ নিয়েছেন নাকি?

তাও নিয়েছেন।

সুজিত হাসল। বলল, পুলিশের রেকর্ডটাও দেখলে পারতেন।

লোকনাথ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, ওঁর ভায়রাভাই পুলিশের মস্ত হোমরাচোমরা। খবরাখবর সব তারই দেওয়া। সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

সুজিত একটু ঠান্ডা মেরে গেল। তবে ভয় পেল না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শ্যামলীকে বিয়ে করার প্রশ্নও ওঠে না। তবু নন্দবাবুর প্রস্তাবটা যে সে সরাসরি মুখের ওপর নাচক করেনি তার মধ্যে একটু বুদ্ধির খেলা আছে। তাকে এ গাঁয়ে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। সে সুতরাং নন্দবাবুকে চটাতে চায় না। পুলিশের দিকটা পরিষ্কার হয়ে গেলে সে কেটে পড়বে। পাঁচ নম্বর ডাকাতিটার কোনও সাক্ষীসাবুদ নেই। একমাত্র পেটের জখম নিয়ে ট্যাক্সি ধরেছিল বলে ট্যাক্সিওলা সাক্ষী আছে। তা সেও চিন্তার বিষয় নয়। কারণ সে ট্যাক্সিওলাকে বলেছিল যে, সে ছিনতাইবাজদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দু-দুটো ব্যাংকের বিস্তর লোক তাকে দেখেছে। মুখে রুমাল বাঁধা ছিল বটে, তবু সেটা কোনও কাজের কথা নয়। নাক থেকে থুঁতনি অবধি ঢাকা পড়েছিল মাত্র। মুখের ঊর্ধ্বাংশ ছিল অনাবৃত। সেটাই চিন্তার বিষয়। অর্ধেক মুখও অনেকের মনে থাকতে পারে।

বৃথাই ভয় পাচ্ছ ভায়া।

সুজিত একটু অবাক হয়ে বলল, কীসের ভয়?

থলি থেকে কোনও ম্যাও বেরোয়নি।

তার মানে?

সোজা কথা, তোমার রেকর্ড খুব পরিষ্কার।

তাই বললেন বুঝি নন্দবাবু?

সেই নিয়েই তো কথা হল এতক্ষণ।

সুজিত সেই ফচকে হাসি হেসে বলল, আমার পেটে দুটো জখমের দাগ আছে, জানেন?

জানব না? গাঁ-সুদ্ধ সবাই জানে।

এই দাগদুটোর ইতিহাস তো জানে না।

নন্দবাবু জানেন।

সুজিত নড়েচড়ে বসে বলল, কী জানেন?

তুমি গুন্ডার হাতে পড়েছিলে।

সুজিত খুব সন্তর্পণে স্বস্তির শ্বাসটা ছাড়ল।

লোকনাথ একটু ষড়যন্ত্রের গলায় বলল, আর খারাপ যদি কিছু বেরোতো তাতেই বা কী? মেয়ে স্বয়ং তোমাকে পছন্দ করে বসে আছে। তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। আদুরে মেয়েরা একটু জেদি হয়। নন্দবাবু তো ওখানেই কাত। মেয়ে পছন্দ করেছে মানে ধরে নাও হয়েই গেল।

পছন্দটা করল কেন জানেন?

সবেগে মাথা নেড়ে লোকনাথ বলে, না ভায়া, ওটা জানি না। পছন্দ ব্যাপারটাই গোলমেলে, অনেকটা ভূতে পাওয়ার মতো। কখন যে কে কাকে পেয়ে বসে কিছু ঠিক নেই।

পছন্দটা একতরফা। মেয়েটাকে আমি দেখিইনি।

তা জানি। তবে দেখেও থাকতে পারো। এ রাস্তা দিয়েই তো স্কুলে যায়। যাতায়াতের পথেই দেখেছে তোমাকে। তুমি খেয়াল করনি। মেয়ে কিন্তু ভাল। চেহারাখানা লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো। ছটফটে নয়, পাড়াবেড়ানি নয়, শান্ত মেয়ে।

মাথা নেড়ে সুজিত সেই ফচকে হাসি হেসে বলল, শুনে লাভ নেই।

লাভ নেই কেন ভায়া?

এ বিয়ে হচ্ছে না।

লোকনাথের এক গাল মাছি। বলল, বলো কী? সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবে? তোমার মাথাটাই গেছে দেখছি!

সুজিত হাসি-হাসি মুখ করে বলল, মেয়েটার তাতে ভালোই হবে। আমি ভালো পাত্র নই। মেয়েটার বয়স বোধহয় ষোলো সতেরোর বেশি নয়। এ বয়সের পছন্দের কোনও দাম নেই।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে লোকনাথ বলল, কথাটা ঠিক বলনি। মেয়েটা ভুল করলেও বাপ ভুল করার পাত্র নয়।

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।

নন্দবাবুর হয় না।

আপনাদের নন্দবাবু হিপনোটাইজ করে রেখেছেন।

তা নয় ভায়া। মানুষ যেমনই হোক, নন্দবাবু যে বিচক্ষণ মানুষ তাতে সন্দেহ নেই।

যদি বলি আমারও একটা মতামত আছে?

তা থাকবে না কেন? থাকারই কথা। তোমাকে যেটুকু চিনি তাতে তোমার ঘাড় বেশ শক্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু অকারণে হুট বলে একটা নেগেটিভ সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না।

কেন বলুন তো? আমার তো এসব পছন্দ হচ্ছে না।

বলি, তোমার জীবনের প্রসপেক্টটা কী ভেবে দেখেছ? হোমিওপ্যাথি আর জ্যোতিষীতে ক পয়সা হয়? জগদীশ দুবেলা দুমুঠো দিচ্ছে সে ঠিক কথা, কিন্তু ওটা তো অন্যের হাত-তোলা হয়ে থাকা। বরং এ তো একটা দিব্যি প্রস্তাব। ঘর-জামাইও থাকতে হচ্ছে না। কোন দিক দিয়ে খারাপ হচ্ছে বলো তো!

আপনি বুঝবেন না।

আমি বলি কি, ঠান্ডা মাথায় ভাবো। তুমি শক্ত মানুষ জানি, কিন্তু আমি চাই নন্দবাবুর মেয়েকে তুমিই বিয়ে করো, তাতে আমাদের অনেক উপকার হবে।

সেই হাসিটাই হাসল সুজিত। বলল, আপনার মনে প্যাঁচ খেলছে। এ বিয়েটা আপনি কার্যসিদ্ধির জন্য চাইছেন।

তাও বলতে পারো। একরকম তা-ই। আমি কী চাই জানো?

কী চান?

তোমাকে এ গাঁয়ে বেঁধে ফেলতে।

কেন, আমি এ গাঁয়ে চিরকাল থেকে কী করব?

তা জানি না। তোমাকে দিয়ে কাজ হবে, এটাই শুধু মনে হয়।

এ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে কোন কাজটা হয়েছে বলুন তো? আমি তো চুপচাপ অলস সময় কাটিয়ে দিই মাত্র।

আছে ভায়া, আছে।

আপনি একটু উদ্ভট চিন্তা করতে ভালোবাসেন দেখছি।

লোকনাথ কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বলল, তাও হতে পারে। আমার চিন্তাভাবনার মধ্যে বুদ্ধি জিনিসটা কাজ করে না। আবোলতাবোল ভাবি। তবে আমার একটা জিনিস আছে। ওই একটাই জিনিস। আর কিছু নেই।

জিনিসটা কী?

চোখ। আজ অবধি বড় একটা ভুল করিনি।

চোখই যদি থাকবে তাহলে আমার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখতে পেতেন না। আপনার চোখ আছে, একথাটা মানতে পারছি না।

লোকনাথ হেসে বলল, তুমি যে মানবে না সে আমি জানি। তবু বলি ভায়া, থেকেই যাও। নন্দবাবুর টাকায় ছাতা পড়ছে। ও টাকা কারও উপকারেও লাগছে না। ভরসার কথা, ও সম্পত্তি তোমার হাতে এলে অনেক কাজ হতে পারবে।

খুব চিনেছেন আমাকে তো! ভাবছেন টাকা পেলেই আমি দানছত্র খুলে বসব? আর ওরকমভাবে টাকা করবই বা কেন? বড়লোকদের আমি দুচোখে দেখতে পারি না, তাদের টাকায় বড়লোক হওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই।

তবে যে বললে আমার চোখ নেই?

ঠিকই তো বলেছি!

কোথায় ঠিক বললে? তোমাকে দেখেই তো আমার মন বলেছে এ টাকার চাকর নয়। ভুল দেখব কেন ভায়া, আমার চোখে সব ঠিকঠাক ধরা পড়ে।

সুজিত হেসে বলল। তারপরই গম্ভীর হয়ে বলল, বিয়েটা হচ্ছে না লোকনাথবাবু। কাল সেটা নন্দবাবুকে জানিয়ে দেব, ওরা হয়তো আশা করে বসে থাকবেন।

লোকনাথ উঠে ঘেমো জামাটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল, তা তোমার সেরকম ইচ্ছে হলে জানাবে বইকি। তবে তার পরে না তোমার এ গাঁয়ের বাস ওঠে!

কেন, নন্দবাবু মারবে বুঝি?

তা বলিনি। তবে নন্দবাবু দুঃখ পাবেন তো! আর নন্দবাবু দুঃখ পেলে গোটা গাঁও দুঃখ পাবে। কেন পাবে তা জিগ্যেস কোরো না। ওটাই নিয়ম। আর গাঁ যদি দুঃখ পায়, তাহলে কি আর তোমাকে সুখে থাকতে দেবে?

ভয় দেখাচ্ছেন নাকি?

ওরে বাবা! ভয় দেখাব আমি কি তেমন মনিষ্যি? যা বললুম খতিয়ে দেখো। প্রস্তাবটা ফ্যালনা নয়।

সুজিত গুম হয়ে বসে রইল। লোকনাথ চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ বাদে অবধি তার গোমড়া ভাবটা গেল না।

জগদীশ পোড়েলের ছেলেরা আজকাল আর পড়ে না। মনোযোগই নেই। ছেলেরা একটু একটু বড় হচ্ছে আর জগদীশ তাদের নানা কাজ-কারবারে লাগিয়ে দিচ্ছে। মেয়ে বিন্তি

এখনও পড়ে বটে, কিন্তু তারও বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

জগদীশের বাড়িতে খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটু অন্য ধরনের। জগদীশ ও তার বিরাট পরিবার দরদালানে সারি দিয়ে বসে খায়। সেইসঙ্গে সুজিতকেও দেওয়া হয় বটে, কিন্তু একটু আলাদা করে একটু তফাতে। তার জন্য আলাদা বড় পিঁড়ি, মস্ত কাঁসার থালা, বড় গেলাস। সুজিত লক্ষ্য করে, তাকে দু'এক পদ বেশিও দেওয়া হয়। এই তফাৎটা সে প্রথমাবধি পছন্দ করেনি। আপত্তি তুলেছে। জগদীশ বলেছে, আপনি আমার ছেলেদের মাস্টারমশাই, আপনার একটা আলাদা সম্মান আছে তো! আমাদের কারও পেটে বিদ্যে নেই, একজন বিদ্বান বাড়িতে থাকা ভাগ্যের কথা। আপনাকে কি সমানে সমানে নামাতে পারি? এসব আগড়ম বাগড়ম যুক্তি সে মেনেও নিয়েছে ক্রমে। তবে আজ রাতে খেতে বসে সে বলেই ফেলল, জগদীশবাবু, কাল থেকে আমি আলাদা বন্দোবস্ত করে নেব।

কীসের বন্দোবস্ত?

খাওয়া-দাওয়ার।

জগদীশ খুব অবাক হয়ে বলল, কেন মাস্টারমশাই?

আপনি তো আর অন্নসত্র খোলেননি যে দু'বেলা বিনিমাগনা খেয়ে যাব! ছেলেরা তো কেউ পড়ছে না এখন, আমি তাহলে কোন অধিকারে আপনার অন্ন ধ্বংস করি?

জগদীশ হাঃ হাঃ করে হাসল। তারপর বলল, এই কথা! তা আপনি কি এখন আর বাইরের লোক? ঘরের লোকই তো হয়ে গেছেন।

না জগদীশবাবু, আমি এখনও বাইরের লোক।

তাই কি হয়? তবে বলি, আপনার মান রাখি এমন সাধ্যি কি আমাদের আছে? কত বড় মানুষের জামাই হচ্ছেন, তখন তো আর আমরা জলের ঘটিটাও এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাব না।

বলে ফের হাঃ হাঃ করে হাসে জগদীশ। সুজিতের গা জ্বলে যায়।

এই বিয়ের প্রস্তাবটাই জলবিছুটির কাজ করছে। সুজিতের ভারী একাবোকা নিরিবিলির বাস ক্রমে জতুগৃহ হয়ে উঠল বুঝি! কিন্তু এরকম তো চলতে পারে না! বিহিত একটা না করলেই নয়। আর তা করতে হবে খুবই তাড়াতাড়ি।

আগে জগদীশের বাড়িতেই শুত। বেশ কিছুদিন হল সুজিত বাজারে তার চেম্বারেই শোয়। ছোটো ঘর। তস্য ছোট চৌকি, কিন্তু অন্যের পরিবারের মধ্যে থাকার চেয়ে এ অনেক ভালো, অনেক এক্সক্লুসিভ। জগদীশের বাড়ির মেয়েছেলেরা বড্ড উঁকিঝুঁকি দিত। অপার কৌতূহল। বাইরের জগৎটা তো বেশি দ্যাখেনি তারা। অচেনা উটকো লোক এল তো তারাও পেল জো।

চেম্বারে এসে দরজা বন্ধ করে খুব ভাবল সুজিত। ভাবতে ভাবতে রাত প্রায় কাবার করে দিল। সে একজন ডাকাত এবং ফেরারি। এই সহজ সত্যটা একজন পুলিশ

অফিসারের কাছেও কেন ধরা পড়ল না? কেনই বা নন্দবাবুর মেয়ে তাকে পছন্দ করছে? কেনই বা তার জীবনে আসছে এসব ঝামেলা? এর চেয়ে যে জেল খাটা ভাল ছিল!

পরদিন বিকেলে সে ফের সূর্যাস্ত দেখতে গেল। খালধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। সত্যিকারের গোধূলি। এ গাঁয়ে আর না থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। সুতরাং এই গোধূলিও আর দেখা হবে না।

ছাগল নিয়ে আজও ফিরছিল টগর।

ও বাবু!

জ্বালাতন। আজ মেজাজ ভালো নেই সুজিতের। একটু কঠিন গলায় বলল, কী বলছ?

টগরবালা তার কঠিন মুখখানার দিকে ভীত চোখে চেয়ে বলল, খুড়োমশাইকে কাল রাতে যা মেরেছে না গো, দ্যাখ গে যাও।

কে? কে কাকে মেরেছে?

খুড়োমশাইকে গো।

লোকনাথবাবুকে?

হ্যাঁ গো। অন্ধকারে ফিরছিল। রতথলার কাছে দশ-বারোজন মিলে সে কী মার! রক্তারক্তি কান্ড!

সুজিত অবাক হয়ে বলল, কই, শুনিনি তো!

খুড়োমশাই কি আর তেমন বড় মানুষ? কে তাঁকে চেনে যে খবর হবে?

কেন মারল জানো?

কেন আবার, আমার জন্যই। আমার হয়ে লড়ছিলেন যে!

তাই মারল?

মেরেই ফেলত। গোয়ালপাড়ার কাছে তো, গয়লারা এসে মাঝখানে না পড়লে হয়ে যেত।

খুব চোট হয়েছে নাকি?

তা হয়েছে। নাকের হাড় ভেঙেছে, রক্তও পড়েছে খুব নাক দিয়ে। ঠোঁট আর চোখ ফুলে ঢোল, চশমাটাও গেছে। বাঁ হাতে খুব লেগেছে, হাত তুলতেই পারছে না। আর বুকে ব্যথা।

সুজিত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, কারা?

মনে হচ্ছে ক্লাবের ছেলেরা আর নবীনচাঁদ। শোনো বাবু, আমি কী ঠিক করেছি জানো? নগেন জ্যাঠার সম্পত্তি আর নেবো না। আমার আর দরকারই নেই। সম্পত্তি না পেয়েই বেশ আছি। লোভ করতে গেলে খুন হতে হবে।

সুজিত একটু হাসল, কথাটা দেরিতে বুঝলে। তবু ভালো।

ভালো বলেছি না?

খুব ভালো, বাড়ি যাও, সম্পত্তি নিয়ে আর মাথা ঘামিও না।

কাজটা কিন্তু ওরা খুব খারাপ করল বাবু। ন্যায্য আমারই পাওনা ছিল। তা ওদের সঙ্গে কি আমরা পারি? জ্যাঠা নির্দোষ মানুষ, বুড়ো বয়সে মার খেয়ে শয্যা নিয়েছে।

পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে?

ও বাবা, বলো কী? পুলিশে গেলে তো ক্লাবের ছেলেরা জ্যাঠার ঘরে আগুন দেবে।

হুঁ। ঠিক আছে।

মেয়েটা ঘরপানে গেল। সুজিত এসে তার চেম্বারে বসল মাছি তাড়াতে। না, লোকনাথের সঙ্গে তার তেমন খাতির-মহব্বত নেই। তবু লোকটা তার ভিতরে কিছু একটা দেখতে পেত যা সে নিজে কখনও দেখেনি। কী সেটা কে জানে! তবে মায়া বাড়িয়ে আর লাভ নেই। এবার চলো মুসাফির, বাঁধো গাঁঠেরি।

গম্ভীর মুখে মাখন পাল এল।

সুজিত একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, আজ কেমন?

অম্বলটা কমে যাচ্ছে। ফের হচ্ছে। ব্যথাটাও কম, কিন্তু ছাড়ছে না। আছেই একটু।

সুজিত নতুন ওষুধ দিল। বলল, কেমন থাকেন জানিয়ে যাবেন একবার।

মাখন পাল কম কথার মানুষ। ওষুধ পেলেই চলে যায় রোজ। আজ গেল না। একটু বসে রইল।

কিছু বলবেন?

মাখন পাল খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, একটা জিনিস আপনাকে দেবো। ঠিক সাহস পাচ্ছি না।

কী জিনিস?

মাখল পাল তার হাওয়াই শার্টের বুকপকেট থেকে একটা মুখআঁটা খাম বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, বড্ড ছেলেমানুষ। কী লিখেছে জানি না। দোষ ঘাট হলে মাপ করে দেবেন।

সুজিত দেখল খামের ওপর সুছাঁদ অক্ষরে মেয়েলি হাতের লেখায় তার নাম। একটু অবাক হয়ে বলল, কার চিঠি?

শ্যামলীর।

শ্যামলী কে?

নন্দবাবুর মেয়ে, যার সঙ্গে আপনার বিয়ে।

ও, তা আমাকে চিঠি দিচ্ছে কেন?

পড়ে দেখবেন। কী লিখেছে জানি না। ছেলেমানুষ তো!

সুজিত চিঠিটা না খুলে ড্রয়ারে রেখে দিয়ে বলল, আপনি শ্যামলীকে চেনেন বুঝি?

কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমি এক সময়ে নন্দবাবুর ট্রাক চালাতাম। বাড়ির ছেলেই ছিলাম একরকম।

ও। আপনাকে খুব বিশ্বাস করে দেখছি।

খুব। আপনার কথা তো প্রথমে আমাকেই বলেছিল। আমি নন্দবাবুর স্ত্রীকে বলি।

তাঁরা আপত্তি করেননি?

না। আপনাকে সবাই চেনে তো।

সুজিত একটু হাসল। মাখন পাল চলে যাওয়ার পর সে চিঠিটা বের করে পড়ল। বেশ গোছানো লেখা ঃ শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। জরুরি দরকার। আগামী কাল সকাল সাতটায় যদি শীতলাতলার পুকুরের ধারে ব্রহ্মকুঞ্জে আসেন আমি সেখানে থাকব। ও জায়গটায় কেউ যায় না। পায়ে পড়ি। আসবেন কিন্তু। প্রণতা শ্যামলী।

চিঠিটা ফের ড্রয়ারে রেখে উঠে পড়ল সুজিত। একবার লোকনাথকে দেখতে যাওয়া দরকার। সুজিত বেরিয়ে পড়ল।

লোকনাথ ঘুমোচ্ছিল। মুখে-টুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগানো। বাঁ হাতের কবজিতে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা। লোকনাথের বড় ছেলে সুজিতকে ঘরে নিয়ে গেল, বাপকে ডেকে তুলল।

লোকনাথ রক্তচক্ষু মেলে সুজিতকে দেখে একটু হাসার চেষ্টা করল। ফোলা ঠোঁটে হাসিটা ফুটল না।

বোসা ভায়া। কান্ডকারখানা দেখেছ?

দেখছি। আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করেন।

লোকনাথের ছেলে বলল, ওইটেই বাবার দোষ। আমিও কানাঘুষো শুনছিলাম ক্লাবের ছেলেরা বাবার উপর খাপ্পা হচ্ছে। দু-একজন বাবাকে বলেও গেছে, টগরবালার ব্যাপার নিয়ে এত বেশি মাথা না ঘামাতে। তবু বাবা কথা শোনে না। টগরবালা সম্পত্তি পেলে আমাদের কী লাভ? কোথাকার কে টগরবালা, তার জন্য এত ছোটাছুটি করার কোনও মানে হয়?

লোকনাথ সুজিতের দিকে চেয়ে বলল, পকেটে করে আর্নিকা এনেছ নাকি?

সুজিত হেসে বলল, না। ওষুধ আপনার কাছেও থাকে জানি। তাই আনিনি।

লোকনাথ উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বলল, বুড়ো বয়সের রসস্থ শরীর তো, এ ব্যথা সহজে যাবে না।

যারা মেরেছে তাদের চিনতে পেরেছেন?

লোকনাথ হাসল, চিনে লাভ কী, অরাজক দেশ, কার কাছে নালিশ করতে যাব বলো তো!

কেন মারল তা জানেন?

জানব না? সেই সব কথা বলে শাসাতে শাসাতেই তো মারল হে। টগরবালার সঙ্গে নাকি আমার রসের সম্পর্ক, কমিশনও নাকি পাব। ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করলে গলা নামিয়ে দেবে বলে ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছে। বাড়াবাড়ির কথা বলছ, আমার বাড়াবাড়ি দেখলে, ওদেরটা দেখলে না?

দেখছি।

আর কী গালাগালিটাই করছিল। বাপের বয়সী একটা লোককে যে ওসব কথা বলা যায় তা এই জানলুম। আর মারের কী কায়দা বাবা! সব কটাই যেন অমিতাভ বচ্চন। দু-চারজন আবার হিন্দিতেও বুকনি ঝাড়ছিল।

সুজিত হাসল না। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলল, শুনলাম পুলিশকে কিছু জানাননি। জানালে পারতেন।

বললুম তো, এ হল অরাজক দেশ। নালিশ করলে কপালে আরও কষ্ট আছে। আমার ভয় কী জানো? গরিব মেয়েটার ওপর না অত্যাচার করে। সে কথাও যেন বলছিল। টগরবালাকে যেন কী কী করবে। সে সব কথা মুখে আনা যায় না। তুমি নন্দবাবুর মেয়েটাকেও ফিরিও না। বড় ভাল মেয়ে।

কোন কথা থেকে কোন কথা!

অত ভেবে কি বলছি? শুধু ভাবছি কীসে গাঁয়ের ভাল হয়। মনে হচ্ছে, এটাতেই ভাল হবে। কাল তোমার ওখান থেকে বেরিয়ে নন্দবাবুর বাড়িতেও গিয়েছিলাম। ফেরার পথেই ফেরে পড়ে গেলাম।

নন্দবাবুর বাড়িতে আবার গিয়েছিলেন কেন?

একটু কাজ ছিল।

কী কাজ?

সে বলা যাবে না। বলে একটু হাসল লোকনাথ।

সুজিত উঠে পড়ল।

মধ্যরাতে যারা টগরবালার বাড়িতে হানা দিল তারা সংখ্যায় বারো তেরোজন। তাদের কাছে এটা একটা উৎসব। গভীর আনন্দের ব্যাপার। চারজন বলেই রেখেছে তারা টগরকে রেপ করবই। বাকিরা ভাঙচুর আর মারধর। এ গাঁয়ে পুলিশ কদাচিৎ আসে। এলেও মুখ খুলবে কে? তা ছাড়া গাঁয়ের কিছু মাতব্বর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝিয়েই দিয়েছেন, টগরবালার যা-ই হোক তাঁরা মুখ ঘুরিয়ে থাকবেন। একজন মাতব্বর হামলাবাজদের সঙ্গেই আছে, একটু তফাতে। সে দূর থেকে দেখাশুনো করবে। যতীন মাস্টার। মেয়েছেলেটার বড্ড বাড় হয়েছে। যতীন মাস্টার সন্ধের পর গিয়ে টগরের বাপকে ধরেছিল। বাপটা অরাজি নয়, কিন্তু টগর শুনেই ঝামরে উঠল, তার আগে গলায় দড়ি দেব, বুঝলে? দড়ি! আচ্ছা বেহায়া লোক বাবা!

অন্ধকারে দুটো চারটে টর্চ জ্বলে জ্বলে উঠছে। খালধারের রাস্তা থেকে ঝুপ ঝুপ মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল তারা। টগরের বাড়ি ওই দেখা যাচ্ছে। কুকুরেরা টের পেল নাকি কিছু? দুটো কুকুর খুব চেঁচিয়ে উঠল। টগরবালার ঘরবন্দি হাঁসেরা অবধি প্যাঁক প্যাঁক করে ওঠে। ছাগল ডাকে ম্যা।

দুটো টাঙ্গি ঝিকিরে ওঠে টর্চের আলোয়। লাঠিসোটাও আছে।

শেষ দিকটায় তারা একরকম ছুট-পায়েই মাঠটা পেরিয়ে এল। সামনে নবীনচাঁদ। সে একটা হাঁক মারল, এই মাগি, বেরিয়ে আয়!

কিন্তু উঠোনে ঢুকবার মুখেই ফটকে একটা বাধা। বেশ শক্ত বাধা। লম্বা একটা লোক দাঁড়িয়ে। মুখের আধখানা রুমালে ঢাকা। মাথায় একটা কালো ফেট্টি। তার চেয়েও মারাত্মক, তার ডান হাতে একটা পিস্তল নিম্নমুখ হয়ে ঝুলে আছে। সবচেয়ে আরও যেটা মারাত্মক তা হল, অন্ধকারে লোকটার চোখ জ্বলছে ঠিক বাঘের মতো।

প্রথম ডিগবাজি খেল নবীনচাঁদই। বাপ রে বলে ঘুরে দৌড়।

লোকটা পিস্তলটা তুলে চোখের পলকে তাক করল। মুখে কথা নেই, হুঁশিয়ারিও নেই।

দলটা পড়ি কি মরি করে ঘুরে দৌড়োতে লাগল রাস্তার দিকে।

যতীন মাস্টার হাফসাতে হাফসাতে বলল, কে, কে লোকটা?

ও শালা যমদূত।

তারা জাত কাপুরুষ। পালাল।

টগরবালার ঘুম খুব গাঢ়। তবু মাঝরাতে একবার ঘুম ভাঙল তার। কী যেন একটা চ্যাঁচামেচি। তারপর চুপচাপ। টগরবালা ফের পাশ ফিরে ঘুমোলো।

ব্রহ্মকুঞ্জে ভোর। কী সুন্দর যে এই ব্রহ্মকুঞ্জ তা সুজিত বলে শেষ করতে পারবে না। দেয়ালঘেরা অন্তত বিঘেচারেক জমি। সাজানো বাগান। অপরূপ সব ফুল ফুটে আছে। জামগাছতলায় বাঁধানো শ্বেতপাথরের বেদী। ছোট্ট একটা পুকুরে টলটল করছে জল। ঘুরে ঘুরে দেখছিল সে। দেখছিল আর মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

সারা রাত সে ঘুমোয়নি। তবু ক্লান্তি লাগছে না। সকালে এই ব্রহ্মকুঞ্জের পরিষ্কার বাতাস যেন সব ক্লান্তি হরণ করে নিচ্ছে।

একটা বোগেনভেলিয়া গাছের আড়াল থেকে সে এগিয়ে এল। চোখে জল। ঠোঁটে একটু কাঁপন।

আমি সারা রাত ঘুমোইনি।

সুজিত অবাক হয়ে মুখখানা দেখল। যেন এই ব্রহ্মকুঞ্জের হরেক ফুলের মধ্যে আর একটি ফুল। কীট আছে কি? থাক, কুসুমে কীট তো থাকেই।

আপনি নাকি এ বিয়েতে রাজি নন?

সুজিত হাসল। ফচকে হাসি নয়। এ অন্য রকম হাসি। কিছু বলল না।

আমি তাহলে মরব। বলে দিচ্ছি, মরব।
সুজিত একটা পাখির আশ্চর্য ডাক শুনল উৎকর্ণ হয়ে। তারপর আবার হাসল।
আপনার বুঝি মায়াদয়া নেই! আমি মরলে ভালো হবে?
সুজিত মাথা নাড়ল, না।
তাহলে?
মরতে হবে না।
মেয়েটা চোখের জল মুছে বলল, তাহলে?
সুজিত শুধু হাসল। মিটিমিটি হাসি।

আলো অ. কার

উত্তরবাংলার কুচবিহার শহর থেকে এবারও মোনা বোসকে ডেকে পাঠানো হয়েছে রঞ্জিট্রফির ট্রায়ালে, প্রতিবারের মতোই, এবং খামোখা। গত বছর দশেকের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছ'বার মোনা বোস ট্রায়ালে এসেছে, এগারোজনের মধ্যে জায়গা না পেয়ে প্রতিবারই ফিরে গেছে কুচবিহারে, তবে অন্যের পয়সায় কলকাতায় আসা, থাকা এবং ফেরত যাওয়ার খরচাটা পাওয়া যায় এবং শহরটাকে মাঝে মাঝে দেখে যাওয়া যায়, এই যা লাভ। নইলে মোনা বোস জানে, এই প্রায় উনত্রিশ বছর বয়সে পয়লা শ্রেণির ক্রিকেট খেলার মতো কষ্ট তার আর নেই, কুচবিহারের আননোন ক্লাব বা জেলা একাদশের হয়ে সে প্রায়ই সেঞ্চুরি পেটায়। আর চমকপ্রদ গুগলি বলের ভেলকি দেখায় বটে, কিন্তু কলকাতার খেলোয়াড়দের মতো একটানা ভালো মাঠে, ভালো কোচের কাছে প্র্যাকটিস কিংবা ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা তার নেই।

কুচবিহারে সে গত ক-বছর ধরে শিকড় গেড়ে আছে, ডি-সি-অফিসের বড় কেরানি। এখানে তার কিছু নামডাক ছিল বরাবরই, রাজা জগদ্দীপেন্দ্র তাকে স্নেহ করতেন। মোনা বোস যে এককালে নামডাকওলা খেলোয়াড় হবে, এটা অনেকেই ধরে নিয়েছিল। সেই থেকেই এই প্রহসন চলে আসছে। নিয়মমাফিক উত্তরবাংলার একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে রঞ্জির ট্রায়ালে ডাক পায় মোনা বোস। প্রতিবারই নতুন খেলোয়াড় দু'একজন টিমে জায়গা পায়। মোনা বোস ফিরে যায়। কালীঘাট বা মোহনবাগান বা স্পোর্টিং-এর বাচ্চা তেজি খেলোয়াড়দের বলে সে তেমন জুৎসই স্ট্রোক প্লে দেখাতে পারে না, তার ধাঁধাঁর মতো গুগলি, যা উত্তরবাংলার ত্রাস, তা পিটিয়ে ছাতু বানায় কলকাতার বহু অনুশীলিত ব্যাটসম্যানরা, এবং তাতে কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলাদেশের ওপর মোনা বোসের রাগ বাড়ে বই কমে না।

কৈশোর-যৌবনকালটা কলকাতায় কাটাতে পারলে মোনা বোস হয়তো ক্রিকেটে কিছু অঘটন ঘটাত, কিন্তু তার গরিব পরিবার সে বিলাসিতার ব্যয়ভার বহন করতে পারল না। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি এসসি পাস করেই সে খেলার জোরে এবং রাজার আনুকুল্যে ডিসি অফিসের চাকরিটা পেয়ে যায় এবং সেটাই ধরে রাখে। দুটো বোনের বিয়ে, তিনটে ভাইয়ের পড়াশুনো আর বাবার হার্টের চিকিৎসা চালাতে গিয়ে ক্রিকেটে ফতুর হয়ে গেছে মোনা বোস, কলকাতায় আসা হয়নি।

গত বছর মোনা বোস নেট-এ কিছু দারুণ খেলা দেখিয়েছে। প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে যেমন জ্বলে, তাতে ছাঁটাইয়ের তালিকার শেষে পনেরোজনের মধ্যে জায়গা পেয়ে যায়, কিন্তু কালীঘাটের স্কুল ক্রিকেটার অধীর রায়ের ফিল্ডিংটা আর বয়স দুটোই মোনা বোসের চেয়ে ভাল ছিল বলে বারোজনের মধ্যে অধীর ঢুকে গেল। রিজার্ভে মোনা বোসের নাম ছিল বটে কিন্তু মাঠে নামার দরকার হয়নি। রিজার্ভের তিন নম্বর খেলোয়াড়ের মাঠে নামার দরকার কদাচিৎ হয়। গত বছরের সুবাদেই এবারও মোনা বোস মুফৎ কলকাতায় আসার রাহাখরচ পেয়ে গেল, কিন্তু নেট প্র্যাকটিসের সময়েই বুঝল সে কিছু দেখাতে পারছে না। লেগ কাট করতে গিয়ে দু-বার ক্যাচ উঠে গেল। সুইপ করতে গেলে হয়ে গেল বোল্ড, দু-চারটে যা মার মারল তা তেমন চাবুকের মতো তো হলই না, গাঁইয়া তাড়ু হাঁকড়ানোর মতো হয়ে গেল। বল করবার সময়েও সে বুঝল পিচ ঠিক নিশানায় পড়ছে না, খুব বেশি ধীরে ধীরে উঠছে এবং পেটাচ্ছে চকচকে চোখওলা কলকাতার চৌখস খেলোয়াড়রা। মোনা বোস যে গাঁইয়া ক্রিকেট খেলছে এ বিষয়ে তার নিজেরও সন্দেহ রইল না। কয়েকটা দিন বৃথা চেষ্টা করে মোনা একদিন ছুটি নিল, কলকাতা দেখবে। কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল, শরীর খারাপ। ভগ্নীপতি ডাক্তার, কাজেই বিনিপয়সার মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জুড়ে দিতে অসুবিধে হল না।

এ সময়টায় কলকাতা চমৎকার। শরৎকাল শেষ হয়ে এল। নির্মল আকাশ, গরম নেই, ঠান্ডাও নেই, চারপাশে একটা আনন্দিত প্রবাহ। মানুষের, বাতাসের, রোদের, প্রকৃতিহীন কলকাতায় যেন কেবল যা এই সময়টুকুর জন্যই একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। কুচবিহার এ সময়ে অনেক সুন্দর বটে, কিন্তু সেখানে এমন মানুষ নেই, এত দোকানপাট এত রং নেই।

লাইটহাউসে ভাগ্নে-ভাগ্নীকে নিয়ে একটা মারপিটের ছবি দেখে বেরিয়ে ওজন নিল তারা। ভাগ্নেটা রোগাভোগা কম ওজন বলে মন খারাপ করে থাকে। স্লট মেশিনে পয়সা ফেলার পর ভাগ্নে যখন টিকিটের জন্য উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছে তখনই মোনা বোস পেডেস্টাল থেকে অলক্ষ্যে পা সরাল। ভাগ্নী মটরি আর তার মধ্যে চোখাচোখি হাসাহাসি হয়ে গেল গোপনে। ভাগ্নে ল্যাং লাফ দিয়ে নেমে চেঁচিয়ে বলে, বড়মামা, আমার ওজন বেড়ে গেছে কত দেখেছ!

—কত?

—বিয়াল্লিশ কেজি। গত মাসেও ছত্রিশ কেজি ছিল।

—তাই তো খুব মোটা হয়ে যাচ্ছিস।

মটরি ওজন নিতে উঠে বলল, বড়মামা, আমি কিন্তু মোটা হতে চাই না, দেখো আবার পা চাপিও না।

ল্যাং তক্ষুনি ব্যাপারটা ধরতে পারে, তুমি ঠিক আমার পেছন দিক দিয়ে পা চাপিয়েছো, না বড়মামা?

ল্যাং রোগা হাতে ঘুঁষি বসায় মোনার পেটে। মোনা কোলকুঁজো হয়ে বলে, কিন্তু গতবারের চেয়ে তুই একটু মুটিয়েছিস ঠিকই।

রাস্তায় চানাচুর, রেস্টুরেন্টে মোগলাই, আবার রাস্তায় নেমে মুখে পান খেয়ে তারা ট্রাম ধরে টালিগঞ্জে ফিরল।

মফঃসসল থেকে লোকেরা যা যা করে মোনাও তাই তাই করে বেড়াতে লাগল। জু-গার্ডেন মিউজিয়াম, প্লানেটোরিয়াম, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় বোটানিক্যাল গার্ডেন আর সিনেমা দেখে বেড়াল। সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকে চোদ্দো বছরের ল্যাং আর তেরো বছরের মটরি। ল্যাং আর মটরির বাবা ডাক্তার মানুষ, বড্ড ব্যস্ত, তাদের মা ঘরসংসার নিয়ে মজে থাকে। এ দুটো ছেলেমেয়ে তাই কলকাতায় থেকেও নেই, কোথাও বেড়াতে টেড়াতে পায় না। বড়মামা এলে তাদের জো। বেড়ানো, নিষিদ্ধ ফুচকা বা আলুকাবলি, রেস্টুরেন্ট বা সিনেমা সবই বড়মামার জন্য তারা পেয়ে যায়।

রাতে তারা লুডো খেলে, তাসের রং মিলান্তি খেলে কিংবা মোনা ম্যাজিক দেখায়। দিদি এই বয়সেই একটু ভারিক্কি গিন্নিবান্নি গোছের হয়ে গেছে। জামাইবাবুর রোজগার দোহাত্তা, তাই দিদির হাতে মোটা সোনার বালা, আগেকার আমলের মতো মটরদানা সোনার হার গলায়। নীচের তলায় ভাড়াটে বসিয়েছে। জামাইবাবুর দুটো ডিসপেনসারি, বেশি সুখে থাকলে বোধহয় মানুষ একটু ভারভাত্তিক হয়ে যায়, দিদিরও তাই হয়েছে। মাঝে মাঝে এসে তাদের দলে ভিড়ে যায় দিদিও। লুডো খেলে, তাস খেলে, একটু বেশি রাতে ফেরে জামাইবাবু। চেহারাখানা কালো, একটু মোটাসোটা বেঁটে, মুখে সবসময়ে একটা চিন্তার ছাপ, গায়ে বীজাণু নাশকের চড়া গন্ধ। ডাক্তার হিসেবে ভালই, কেবলমাত্র এম. বি. বি. এস হয়েও খুব নামডাক। দিদিরই ভাল বিয়ে হয়েছে। ছোটো বোন দুটোকে তেমন ভালো পাত্রে দেওয়া গেল না। মোনার এই একটা দুঃখ। একজনকে ডি-সি অফিসেরই এক দরিদ্র কেরানির সঙ্গে, অন্যজনকে পুত্তিবাড়ির এক স্কুলমাস্টারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। তবে দিদির মতো এত সুন্দর নয় বলে ছোটো বোন দুটোর এর চেয়ে ভালো পাত্র জোটার সম্ভাবনা ছিলই না।

জামাইবাবু রাতে ফিরে পোশাক ছেড়ে কিছু বইপত্র নাড়াচাড়া করে, গোমড়ামুখো চেহারা হলেও ভিতরের রস-কষ মরে যায়নি এখনও, হেঁকে বলে—শালাবাবু কোথায় রঞ্জি খেলবে, চাই কি টেস্ট খেলবে কোথায়, তা নয় লুডো পেড়ে বসেছো, তোমার বারোটা বেজে গেছে।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে জামাইবাবু ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইত, এখনও জার্মান রীডের হারমোনিয়ম, তানপুরা, তবলা সব রয়ে গেছে। এখন ল্যাং তবলা ঠোকে, মটরি গায়।

জামাইবাবু মাঝে মাঝে বাথরুমে যখন গলা ছাড়ে তখন কান পেতে শোনার ব্যাপার হয় সেটা। এমনিতে বড় একটা গায় না, মোনা মাঝে মাঝে ধরে বসলে রাতে খাওয়ার পর ছাদে পাটিতে বসে দু-একখানা গায়, বলে, গাইব কি দম পাই না। বুঝলে শালাবাবু, এসব ফাইন আর্টসকে একদিন না একদিন ইকনমিকস-এর কাছে ছেড়ে দিতে হয়। তোমার অবস্থাও তো দেখছ, কত সাধের খেলা তবু চাকরি-বাকরির জন্য লেগে থাকতে পারলে না। বয়সকালে কলকাতায় এলে একটা কিছু করে ফেলতে পারতে। নর্থ বেঙ্গলে কেন, তোমার মতো ব্যাটের হাত আর স্লো বল চট করে দেখা যায় না।

—সে আপনি শালা বলে ভালো বলছেন।

—তা হবে হয়তো, কিন্তু ক্রিকেট তো এককালে আমিও খেলেছি, লে-ম্যান নই বুঝলে! খেলোয়াড়দের জাত আর ধাত চিনি।

মোনা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—কিছুই তো চিরকাল থাকে না, আমারটাও থাকল না। এ বছর নেট-এ খুব খারাপ খেলেছি।

—কপাল। গতবছর তোমাকে ওরা একটা ম্যাচে খেলালেও পারত, দুটো ম্যাচে রিজার্ভ রেখে তৃতীয় ম্যাচে বাদ দেওয়াটা কীরকম বিচার?

—বাদ দিন, যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমারও কোনও দুঃখ নেই। বড় খেলার টেনশন নার্ভের উপর বড্ড চাপ দেয়, তার চেয়ে নর্থ বেঙ্গলের মাঠে মাঠে শীতের রোদে উদ্বেগহীন হয়ে খেলা অনেক ভালো, তাই খেলব।

—ঠিক বলেছ, নার্ভই হচ্ছে আসল আর আনন্দ। আমিও শখ করে গান শিখেছিলাম, রেডিওতে অডিশন দিয়ে চান্স পেলাম। কী উদ্বেগ, কী উৎকণ্ঠা, রেকর্ডিং-এর সিস্টেম ছিল না। লীভ প্রোগ্রাম, গানের মাঝখানে বার বার মনে হচ্ছিল, আমার গান দেশসুদ্ধ লোক শুনছে, পানের দোকানে বাড়িতে রাস্তায় হাজার-হাজার মানুষ শুনছে কান পেতে। ব্যস, গানের মাঝখানে গলা কাঁপতে লাগল, ঢোঁক গিলতে লাগলাম, তাল কেটে যেতে লাগল, খুব খারাপ হল প্রোগ্রাম, এরপর আর চান্স পাইনি, চেষ্টাও করিনি। ভেবেছি কী দরকার ওই সাঙঘাতিক টেনশনের মধ্যে গিয়ে, গানের যে আনন্দ তা তো আমার থাকলই। তুমি বড় ঠিক কথা বলেছ হে শালাবাবু, নার্ভ ঠিক রাখাই ভালো।

ল্যাং শুয়েছিল পাটিতে, টপ করে উঠে বসে বলল—আমি কিন্তু বড়মামার চেয়ে বড় খেলোয়াড় হবো, দেখো, আমার নার্ভ ঠিক আছে।

—আমারও, বলে মটরি—রেডিয়োতে গাইতে আমার একটু ভয়-টয় করবে না। অঞ্জলিদের মাড়িতে টেপ করলাম সেদিন একঘর লোকের সামনে, অঞ্জলির গলা কাঁপছিল, আমার কিছু হয়নি, শিশুমহলে অডিশন দেবো শিগগিরই।

—কাজের সময়ে দেখা যাবে। জামাইবাবু বলে।

রান্নাঘর-টর সব সেরে-টেরে দিদি পানের বাটা হাতে উঠে এল ছাদে, মস্ত চাঁদ উঠেছে। এসময়ে হিম পড়ে; শরৎকাল শেষ হয়ে গেছে, তবে কলকাতার ফিনফিনে শীত গায়ে লাগে না বলে তারা কিছুক্ষণ ছাদে থাকে রোজই। খোলা হাওয়া জামাইবাবুর ভীষণ প্রিয়। ছেলেমেয়েদের বলে—ছাদে থাকবি যতক্ষণ খুশি। একটু ওপরে কন্টামিনেশন কম থাকে বাতাসে, ফুসফুস পরিষ্কার হয়ে যাবে। দিদির ব্যাপারটা পছন্দ না, আস্ত একটা ডাক্তারের কথাতেও দিদির মন সরে না। কেবলই বলে—হিম লাগছে, ঘরে চলো সব। মটরির টন্সিল, ল্যাং বড্ড সর্দিতে ভোগে। রাতে শোওয়ার ঘরের জানালা বন্ধ কিংবা খোলা রাখা নিয়ে রোজই জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির মন-কষাকষি হয়। জামাইবাবু জানালা খোলা রাখতে চায়, দিদি চায় বন্ধ রাখতে।

দিদি ছাদে উঠে চারধারটা ঘুরে ঘুরে দেখল, একসময়ে এসে বসল সকলের সঙ্গে, মুখে পানের ঢিপি, বলে—আর কতক্ষণ? তোরা ঘুমোবি না ল্যাং, মটরি?

—তুমি যাও না শুয়ে পড়ো, আমরা এখন গল্প শুনবো।

—কীসের গল্প?

—বাবার আর বড় মামার। ল্যাং বলে।

—ও ভারী তো গল্প, একজন গাইতেন, একজন খেলতেন, তারপর কেউ কিছু করতে পারলেন না।

জামাইবাবুর সঙ্গে মোনাও হাসে।

জামাইবাবু বলে—মোনার এখনও চান্স আছে, এবছরও ডেকে পাঠিয়েছে যখন তখন কিছু বলা যায় না।

দিদি শ্বাস ফেলে বলে—খবরের কাগজে কত সব বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের নাম ওঠে, আমার এমনই কপাল, শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়ির কোনও দিকেও কেউ একটু নামকরা লোক হল না।

জামাইবাবু সিগারেট ধরিয়ে গায়ের এন্ডির চাদরটা আর একটু ভালো করে গলার কাছটায় জড়িয়ে বলে—বুঝলে শালাবাবু, মেয়েদের একটা না একটা দুঃখ থাকবেই, ওরা কখনও খুশি হয় না, খুব সুখে থাকলেও ঠিক খুঁজে খুঁজে একটু ঘরের কোণের ঝুল বা মেঝের ধুলোর মতো দুঃখ বের করবেই।

দিদি পিক ফেলতে ছাদের ধারে গেল, সেখান থেকেই মুখ ফিরিয়ে বলে—মোনা!

—উঁ।

—রতনবাবুর মেয়েকে এবার দেখে যাবি। আমার তো খুব পছন্দ, তোর জামাইবাবুরও।

—ওসব তোমরা দ্যাখগে, বিয়ে-ফিয়ে এখন না।

—তুই বললেই হবে নাকি? বাবার হার্টের কী অবস্থা জানিস না?

—আমার অনেক ধারকর্জ জমে আছে, ঝামেলা পোষাবে না দিদি।

—সে ধারকর্জ যদি চিরকাল থাকে তো চিরকালই আইবুড়ো থাকবি নাকি?

—বেশ তো আছি, পরের মেয়েকে ধরে বেঁধে এনে কষ্ট দেওয়া কেন?

—বিয়ে করিস না করিস একবার দেখ তো, পছন্দ না হলে অন্য কথা, আর যদি পছন্দ হয় তা আমরা না হয় একটু দেরি করতে বলব ওদের, ততদিনে তুই ধারকর্জ মিটিয়ে ফেল।

—দূর, বিয়ে যখন করব না তখন দেখব কেন? দেখলে ওদের একটা এক্সপেক্টেশন থেকে যাবে। মেয়েটাও মনে মনে আমাকে ভাবী স্বামী হিসেবে ভাবতে থাকবে, ওসব ভালো না, ছেড়ে দাও।

—দিচ্ছি আর কি! এত ভালো সম্বন্ধ সহজে পাওয়া যায় না, কালই আমি রতনবাবুর বাড়িতে খবর পাঠাচ্ছি। দেবে থোবে খুব।

মোনা হাসিমুখে জিগ্যেস করে—কী দেবে?

—ঢের দেবে। ওদের একমাত্র মেয়ে, সে আবার ক্রিকেট খেলার ভক্ত, রতনবাবু দুহাতে পয়সা রোজগার করে। সল্টলেকে চারকাঠা জমি দেবে, নগদ আমরা যা চাই, স্কুটার চাইলে তাও দেবে, ফার্নিচার-টার্নিচার বা গয়নাগাঁটি নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

—এত দেবে কেন? আমি তো ডি-সি অফিসের গরিব চাকুরে, ওরা ইচ্ছে করলে কত ভালো পাত্র পেতে পারে। দেওয়ার যা বহর দেখছি তাতে তো বিলেতফেরত ইঞ্জিনিয়ার বা আই.এ.এস. পেয়ে যেতে পারে।

—পাবে তো ঠিকই, দিদি কাছে এসে পার্টির ওপর আঁট হয়ে বসে বলে—কিন্তু তোকেই ওদের পছন্দ, সেবার যখন ট্রায়ালে এসেছিলি তখনই একদিন রতনবাবু আর তার বউ বেড়াতে এসে তোকে দেখে গেছে। তোর হয়তো মনে নেই, দু'বছর আগেকার কথা, তখন থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল। ওদের মেয়ের তখন একটু ছোট ছিল, দু'বছরে একটু বেড়েছে, এবার বিয়ের কথা ভাবতে হয়েছে। ওরা বলে, একটু গরিব ঘরেই ওদের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে।

—কেন?

—বড়লোকেদের নাকি মায়ামমতা কম হয়।

জামাইবাবু হেসে ওঠে—শোনো কথা।

দিদি ঝংকার দেয়—তা আমার কথা তো নয়। ওরা ওদের কথা বলেছে, হয়ও তো বাপু, বড়লোকেরা কি আর গরিবদের মতো বউ ছেলেপুলে নিয়ে হামলে থাকে? তারা মদ-টদ খায়, পার্টিতে-টার্টিতে যায়, নানারকম দোষ থাকে তাদের। আমারও খুব টাকাওলা বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না। মোটামুটি খেতে-পরতে পারে, স্বভাবচরিত্র ভাল, সংসারটা বেশ নির্ঝঞ্ঝাট এমন পরিবারই ভালো।

মটরি মাথা নেড়ে বলে—কিন্তু গাড়ি যাদের নেই তেমন ফ্যামিলি আমার পছন্দ না।

—ইস! বলে গাঁট্টা তুলেছিল ল্যাং। মোনা তাকে ধরল।

—ইস আবার কী? ঠিকই বলেছি, গাড়ি-টাড়ি না থাকলে মজা কী?

—তোমাকে এখন ওসব ভাবতে হবে না। দিদি গম্ভীর গলায় মটরিকে বলে।

কিন্তু যতই গাম্ভীর্য থাক দিদির গলায়, মটরি আর ল্যাং তাদের মাকে একটুও ভয় খায় না, বরং সারাদিন মার নানা ব্যাপার নিয়ে খ্যাপায়।

মটরি বলে—আগে থেকেই বলে রাখলাম, পাত্র খুঁজবার সময়ে তোমাদের সুবিধে হবে।

—তোর বিয়ে হবে রিকশাওলার সঙ্গে, সেটাও গাড়িই, বেশ বিনা পয়সায় রিকশা চড়তে পারবি।

—শালাবাবু, তোমার মত নেই কেন? জামাইবাবু জিগ্যেস করে। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলে—কোনও অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার নেই তো?

মোনা মাথা নাড়ল। নেগেটিভ।

—তবে?

—সংসারটা পুরো আমার ওপর, আই অ্যাম লুকিং বিফোর আই লিপ, খামোখা কেষ্টর এক জীবকে এনে কষ্ট দেওয়া কেন। তার উপর বড়লোকের মেয়ে, সংসারের কাজকর্ম করার অভ্যাস নেই। আমাদের পরিবারে এসে তো হাঁড়ি-টাড়ি না ঠেলে উপায় নেই।

—রান্নার লোক রেখে দেবে।

—সেটা কেমন দেখাবে? মা এই বুড়ো বয়সেও সব নিজের হাতে করে। তার জন্যই লোক রাখলাম না, এখন বউয়ের কষ্টের কথা ভেবে লোক রাখলে পাঁচজনে বলবে কী?

জামাইবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—সংসারের লোকদের মুখ বন্ধ করতে পারে এমন হারকিউলিস কেউ নেই। অত সব ভাবলে চলে না, শাশুড়ি ঠাকরুণ পারেন তাই করছেন, যে পারে না সে করে না।

দিদি পানের ছিবড়ে রেলিঙের বাইরে ফেলে এসে বলল—ওটা ভাবতে হবে না। আমি ও নিয়েও রতনবাবুর বউয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁরা বলেছেন সংসারের কাজ-টাজ শিখিয়ে দেবেন, মেয়েটাও চালাক চতুর, শিখে যাবে। সংসারে পড়লে সব মেয়েই আদুরীপনা ঝেড়ে ফেলতে পারে। তাহলে মোনা, সামনের রবিবার তারিখ ঠিক করি?

—আমার দেখার কী দরকার?

—দেখবি না কেন? যারা ঘর করবে তাদেরই দ্যাখাশোনা হওয়া ভালো। আমরা তো বিয়ে দিয়েই খালাস। তাহলে ঠিক করি?

—রাজি হয়ে যাও শালাবাবু। ঝুলিও না। জামাইবাবু বলে।

মটরি একটু চাপাস্বরে বলে—স্বপ্নার কিন্তু নাকটা একটু চাপা।

দিদি শুনে ধমক দেয়—চাপা আবার কী! একটু ছোটো, কিন্তু মুখখানা কী ঢলঢলে। আমাদের ঘরে সিনেমার নায়িকার তো দরকার নেই, মোটামুটি সুন্দর হলেই যথেষ্ট।

একটু থমকে থাকে মোনা বোস। জামাইবাবুকে সে একটা মিথ্যে কথা বলেছে, আসলে তার একটা অ্যাফেয়ার ছিল, সেই থমকানো ভাবটা তার রয়েই গেল। উত্তর দিতে পারল না। ওরা তাকে মৌন দেখে ধরে নিল, তার সম্মতি আছে।

ট্রায়াল ম্যাচ-এ মাঠে নামল মোনা। কয়েকটা দিন প্র্যাকটিস বাদ গেছে, এমনিতেও তার ফর্ম ভালো নয়, তবু গোটা দুই উইকেট পেল, ষোলো রান করল, ফিল্ডিংটা যথার্থই খারাপ হল তার, বিস্তর রান গলে গেল তার হাতের ফাঁক দিয়ে, একটা ক্যাচও ফেলল। খেলাটিকে একটুও গুরুত্ব দেয়নি, জানে হবে না। নির্বাচিত হওয়ার কথা নয়। দিন চলে গেছে, তাই হতাশা বোধ করল না সে। কয়েকদিনের মধ্যেই সে ফিরে যাবে উত্তরবাংলা। এখন উত্তরবাংলায় কলকাতার তুলনায় অনেক বেশি শীত পড়ে গেছে। চমৎকার রোদে ভেসে যাচ্ছে সেখানকার মাঠঘাট। সেই রোদে শীতের বাতাস গায়ে মেখে খোলা মাঠে উদ্বেগহীন আনন্দের ক্রিকেট খেলবে সে। কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির মাঠে মাঠে খেলে বেড়াবে। সেখানে মোনা বোসকে সবাই চেনে।

ম্যাচের শেষে চুপিসাড়েই সে বেরিয়ে আসে। প্যাড বাঁধার দরুণ প্যান্টের ক্রিজ নষ্ট হয়ে গেছে, ঘামে ভিজে গেছে শার্টটা। ক্লান্তিও খুব। ল্যাং আর মটরিকে খুঁজে নিয়ে সে হাঁটতে থাকে।

—বড়মামা, তোমার ব্যাটিংটা কিন্তু খুব ভালো হচ্ছিল। ল্যাং একটু বিষণ্ণ গলায় বলে।

—মোনা হাসল।

ল্যাং একটু ভেবেচিন্তে বলে—এল-বি-ডব্লিউটা বাজে দিল আম্পায়ার। আমাদের পাশে একটা বুড়োমতো লোক বসে খেলা দেখছিল, সে বলল—মোনা বোস পাকা খেলুড়ে, ষোলো রানেই খেলা দেখিয়ে দিল। তবে আউটটা ঠিক দেয়নি আম্পায়ার, বাইরের বল বলেই ওরকম বেমক্কা মারতে গিয়েছিল।

মোনা কথা বলল না। মটরি চুপ কিন্তু তার সারাদিন ধরে রোদে পোড়া শুকনো মুখখানায় একটা রক্তাভা, চোখদুটো ছলছলে। সেও বুঝেছে বড়মামা পারল না।

ল্যাং আবার বলে—তোমার তিনটে বাউন্ডারিই কিন্তু চাবুক হয়েছিল বড়মামা। আর একজনও মারতে পারেনি, সবাই তো ভয়ে ভয়ে ঠুকে ঠুকে খেলছিল।

মটরি তার শুকনো মুখখানা তুলে বলে—মাঠে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায় বড়মামা। কী লম্বা, গম্ভীর রাজা-রাজা ভাব, মনে হচ্ছিল তুমি একটা অন্য লোক, বড়মামা নও।

মটরির মাথাটায় একটু হাত রাখে মোনা। বলে—এখন কী হবে? খাবি কিছু? চল সেই রেস্টুরেন্টটায় যাই, আমিনিয়া না কী যেন!

দুজনেই লাফিয়ে ওঠে—চলো, স্পেশাল খাবো।

—না, না, চা খাবো।

মোনা বলে—দুটোই খাবো। বড্ড খিদে, চল।

কলকাতায় যেজন্য আসা তা শেষ হয়ে গেল। এবার যে-কোনও দিন ফিরে গেলে হয়। আসামের বিরুদ্ধে রঞ্জির এই প্রথম ম্যাচে বাংলার টিম ঘোষণা করা হয়ে গেছে। কাগজে পনেরোজনের নাম বেরিয়ে গেল। মোনা বোস বাদ। জানা কথা। কলকাতা আর ভালো লাগছিল না তার। দিদি কেবল ধরে বসে আছে রবিবারে রতনবাবুর মেয়েকে দেখে যাওয়ার জন্য। মোনার মন চাইছিল না। বিয়ে সে কখনও করবে না তা নয়, তবে বিয়ের কথা সে বড় একটা ভাবে না। একটা নিজস্ব মেয়েমানুষ থাকলে মন্দ হয় না। কিন্তু ঝামেলা অনেক, মোনার তাই ইচ্ছে করছিল না।

আকাশের নীল গম্বুজ, তার স্ফটিকের মতো স্বচ্ছতা, শীতের টান এ সবই অমোঘভাবে মোনাকে উত্তরবাংলার দিকে টানতে থাকে। উত্তরবাংলায় এখন প্রকৃতির অসামান্য সম্ভার। তোর্ষার পাড়ে হয়তো কাশফুল ফুটেছে। কুচবিহার থেকে বীরপাড়ার বাসরাস্তার ধারে ধারে শীতের বনে পাতাঝরার কী মন্থর দৃশ্য! শিলিগুড়ি থেকে এখন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়, এমন স্পষ্ট ঝকঝকে দেখায়। উত্তরবাংলার এ শহর থেকে ও শহর ঘুরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কেমন নেশা লেগে যায়। সেখানে মোনার ব্যর্থতার কোনও প্রশ্ন নেই। সেখানে প্রকৃতির সুন্দর আবহে মোনা বোস আনন্দের খেলা খেলবে।

দিদি বলে—যাওয়ার কথা মুখেও আনবি না। রোববারে মেয়ে দেখবি, তারপর মঙ্গলবারে মটরির জন্মদিন। বুধ-বৃহস্পতির আগে তোকে ছাড়ব নাকি?

ল্যাং আর মটরি স্কুলে যায়, সামনে অ্যানুয়্যাল পরীক্ষা। মোনা সারাদিন একা, বেরিয়ে পড়ে। এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ফার্স্ট ডিভিশনের দুটো ক্লাব তাকে নিতে চাইছে। কিন্তু চাইলে কী হবে, এখানে চাকরিবাকরি দেবে কে? ক্রিকেটের কদর এখানে ততটা নয়, তার ওপর সারা দেশজুড়ে বেকার সমস্যা। মোনা বোসেরও পড়তি ফর্ম, কেউ ডেকে চাকরি দেবে না।

হিমাদ্রির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল না মোনার। সেই ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর দ্যাখা করেওনি, কিন্তু তবু দেখা হয়ে গেল।

ফার্স্ট ডিভিশনের যে টিম তাকে নিতে চাইছে তাদেরই সূত্রে একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ছিল। মোনা খেলছিল, উদ্বেগহীন খেলা। দমাদম মেরে সত্তর রাণ তুলে দিল চোখের পলকে, মুষ্টিমেয় দর্শক খুব হাততালি দিচ্ছিল। বলটাও করল ভালোই। ফিল্ডিংও খারাপ করল না। ল্যাং অন-এ দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের বাউন্ডারি আটকাতে ছুটে গেল। বাউন্ডারিটা আটকানো গেলনা, ঝোঁক সামলাতে না পেরে লাইনের বাইরে গড়িয়ে যাচ্ছিল মোনা বোস। গায়ে ধুলো, মরা ঘাসের পাতা, গড়াগড়ি খেয়ে উঠে অপমানে হেসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে মাঠে ঢুকতে যাবে, ঠিক সে সময় কে যে প্যাভিলিয়নের তাঁবুর বাইরে পেতে রাখা চেয়ারে সম্ভ্রান্ত দশর্কদের ভিতর থেকে একটু উচ্চ স্বরে বলে উঠল—এখনও বডিটা দিব্যি ফিট আছে দেখছি!

মোনা ঘাড় ফেরাতেই হিমাদ্রিকে দেখে। ফোল্ডিং চেয়ারে কালো বনমানুষের মত বসে আছে, হাতে কোকা-কোলার বোতল। পাশে সন্ধ্যা। দুজনেরই চকমকে পোশাক পরণে, চোখে দুজনেরই রোদ-চশমা। চোখাচোখি হতেই হিমাদ্রি চেঁচিয়ে বলে—আর আমি কেমন মোটা হয়ে গেছি!

কারা যেন হাসল।

মোনা দৌড়ে ঢুকে যায় মাঠে।

হিমাদ্রিরা এই খেলা দেখতে এসেছে, ভাবা যায় না। ক্রিকেটে এককালে কিছু কৌতূহল হয়তো ছিল হিমাদ্রির, এখন না থাকারই কথা। পৈতৃকসূত্রে ও টায়ারের যে ব্যবসাটা পেয়েছে তাতে লাখ লাখ টাকা খাটে। উপরন্তু সম্প্রতি একটা মস্ত মোটরগ্যারেজ আর গোটা দুই পেট্রল পাম্প করেছে কলকাতায়। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ দেখার সময় পাওয়ার কথা নয়। সন্ধ্যার মুখটা একপলক দেখেছিল মোনা। রোদ-চশমা পরলে মানুষের মুখ অন্য রকম হয়ে যায়, তার ওপর চশমাটা যদি গো-গো হয়। কাজেই মুখখানার প্রকৃত সৌন্দর্য দ্যাখা হয়নি। কিন্তু দ্যাখার দরকারই বা কী? ও মুখ তো মুছে যাওয়ার নয় মন থেকে!

সাড়ে চারটে বেজে আসছিল। শেষদিকটায় দাঁড়িয়ে থাকা এবং চার ওভার এরাটিক বল করা ছাড়া কিছুই করতে পারল না মোনা। অবশ্য তবু একটা উইকেট পেল দ্বিতীয় ওভারে।

মাঠ থেকে বেরোতেই মুখোমুখি হিমাদ্রির সঙ্গে দেখা। যেন বা মোনার জন্যই দাঁড়িয়েছিল।

প্রচণ্ড লম্বা এবং সেই অনুপাতে চওড়া মনুমেন্টের মতো বিশাল শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে মোনার মাথার ওপর থেকে নীচু চোখে চেয়ে বলল—কী খবর বোসসাহেব?

—খবর! খবর আর কী?

—এখনও খেলে যাচ্ছো? কত বয়স হল?

মোনা হাসল একটু, বলল—ঊনতিরিশ-তিরিশ হবে।

—ওঃ, তাই তো! তুমি বরাবরই আমার চেয়ে কিছু ছোটো ছিলে। হিসেবটা ভুলে যাই। ঊনতিরিশ হলে তুমি এখনও বুড়িয়ে যাওনি, তোমার বডি থ্রো আর গড়িয়ে যাওয়া দেখেও তা মনে হয়। আমার ছত্রিশ।

বলে হাসল হিমাদ্রি। গালে কড়া দাড়ি, কামানোর পর দাড়ির গোড়া ব্রণর মত ফুলে আছে। মস্ত গোঁফ, গোঁফের ডগা একটু পাকানো, গায়ের রঙটা মিশকালো না হলেও বেশ কালো, একটু ব্রোঞ্জ ধরণের রঙ। মুখে সব সময়ে একটা শ্লেষের হাসি, পুরু ঠোঁটজোড়া সব সময়েই বাঁকা হাসি হাসবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সন্ধ্যাকে ও ঠিক মোনার কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি, বরং সন্ধ্যাই স্বেচ্ছায় লুণ্ঠিতা হয়েছিল। হিমাদ্রির মধ্যে কী আছে যা

কোমলপ্রাণা মেয়েদের কাছে এতদূর আকর্ষণীয় হতে পারে তা একবার হিমাদ্রির চোখে চোখ রেখে খুঁজতে ইচ্ছে করে মোনার।

কিন্তু মোনা পাকা খেলোয়াড় হয়েও তেমন সবল হৃদয় নয়, আর হিমাদ্রি ঘোষের চোখ একটু আলাদা ধরণের। তাতে একটু রক্তাভা বিদ্যমান, এবং চোখের ডিম দুটো সব সময়েই যেন ঠেলে বেরিয়ে এসে দুটো গুলির মতো চতুর্দিককে ধমক দিচ্ছে। কারো স্বাভাবিক চোখ যে এমন রেগে-যাওয়া এবং সন্দেহপ্রবণ হয় তা ভাবা যায় না।

—ট্রায়ালে এসেছিলে? হিমাদ্রি বিদ্রুপের গলায় জিগ্যাসা করে।

—হ্যাঁ।

—কিছু হল?

—কী হবে!

—তেল-ফেল দাও, নইলে হবে না।

—তেল দিলেও হবে না, ফর্ম পড়ে গেছে।

—বাংলাদেশের সবাই কিচেনগার্ডেন ক্রিকেটার, কারই বা ফর্ম আছে?

—তোমার খবর কী হিমাদ্রি? ভালো আছো?

—ভালোই। আমি ভালো, সন্ধ্যা ভালো, সব ভালো। নো ফ্রাস্ট্রেশন।

মোনা লাল হল। ইচ্ছাকৃত অপমান। তবু মোনার কিছু করার নেই। হিমাদ্রির প্রকাণ্ড শরীরের আড়ালে পেলব কচি একটা চারাগাছের মতো সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে আছে। একটু অন্যমনস্কতার ভান, অন্যদিকে চেয়ে আছে। অকারণে কিংবা কারণবশতই আঁচলটা ডান কাঁধের ওপর ঘুরিয়ে এনে ঢেকেছে শরীর। চটি-পরা-পা ওঠা-নামা করছে এক অশ্রুত সঙ্গীতের তালে। দেখতে ভালোই ছিল সন্ধ্যা, এখন আরও একটু ভালো আছে। কলকাতায় গঙ্গার হাওয়া পায়, তার ওপর ভালো খায়দায়, মন খারাপ হলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, কিংবা রেকর্ড বাজায়, কিংবা আর কী কী করে বড়লোকদের মতো, মোনা তা জানে না।

—আমার একটু ভুড়ি হয়েছে, দেখেছ বোস? গায়ে একটু ফ্যাট। তোমার মতো হালকা ছিপছিপে আর নই।

—দেখছি।

—অথচ রেগুলার বেন্ডিং করছি, ম্যাসাজ করাচ্ছি। কিছু হচ্ছে না। সন্ধ্যা আবার ফ্যাটিশ শরীর পছন্দ করে না। একটু ছিপছিপে তোমার ধরনের চেহারাই ওর পছন্দ, বুঝলে? কিন্তু সে আর কোথায় পাবে ও? সম্ভব হলে তোমার শরীরটা ধার চাইতাম। চমকে-দেওয়া হাসি হাসে হিমাদ্রি।

এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। আমি মুটিয়ে গেছি, বয়সও বেশি, তবু আমার অধিকার কত জোরালো। এরকমই অহংকার এই বিশাল লোকটার। একটু বাড়িয়ে বলল, নইলে মোনার হিসেবমতো হিমাদ্রির বয়স এখন বড় জোর বত্রিশ-তেত্রিশ। মোটাও তেমন নয়, শুধু ঢিলা

হাওয়াই শার্টের তলায় ঢাকা কোমরে সামান্য একটু চর্বি জমেছে বলে সন্দেহ হয়। কিন্তু তবু এখনও প্রচণ্ড শক্তিমানের চেহারা হিমাদ্রির।

—সন্ধ্যাকে কি দেখতে পাওনি, না চিনতে পারছো না?

—চিনবো না কেন?

—আলাপ-সালাপ করো একটু। কতকাল পরে দ্যাখা।

সন্ধ্যা পিছন থেকে বিরক্তির গলায় বলে—যাবে না নাকি? আর ভালো লাগছে না, এত টায়ার্ড!

হিমাদ্রি একটু নীচু গলায় বলে—তোমার খেলা দেখতেই দুজনে এসে গেলাম। অবশ্য ইনভিটেশনও ছিল। বলে মুখ ফিরিয়ে সন্ধ্যাকে ডাকল হিমাদ্রি।

সন্ধ্যা সহজভাবেই আসে। নির্লিপ্ত মুখ। একটু হাসি ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলে—ভালো তো?

—খারাপ কী?

—কুচবিহারের খবর কী? চার বছর যাই না!

—কী খবর চাও?

—কুচবিহারেরই খবর। বলে মৃদু সত্যিকারের হাসি হাসি সন্ধ্যা।

—কুচবিহার আগেকার মতো নেই। সুন্দর দিঘিগুলোর চারপাশে চালাঘরের দোকান উঠেছে। তোর্ষায় আজকাল প্রতিবছর বন্যা হয়। কোনও ডেভেলপমেন্ট হয়নি। বরং সুন্দর শহরটা এখন কুচ্ছিৎ হয়ে গেছে।

—রাসমেলা হয় এখনও?

—হবে না কেন? তবে রাসমেলার মাঠের অর্ধেকটা নিয়ে ঘেরা খেলার মাঠ হয়েছে, জায়গা কমে গেছে। এখন আর জাঁকজমক হয় না।

—সাগরদিঘির পার এখনও তেমনি আছে?

—তেমনিই।

—কী সুন্দর ছিল আমাদের কুচবিহার!

—একবার যেও সময় করে। দেখে এসো।

সন্ধ্যা একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মোনার এবং সন্ধ্যার যৌবনকালে কুচবিহারে ছেলেমেয়েরা প্রকাশ্যে প্রেম করত না। সে বড় লজ্জা আর লোকনিন্দার বিষয় ছিল। কুচবিহারের সামাজিক ধারাটা একটু সেকেলে। স্কুলে পড়ার সময়ে মোনাদের সবচেয়ে উত্তেজনার ব্যাপার হয়েছিল যখন পাটাকুড়ার একটি যুবক নিউ টাউনের একটি মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করে। তারা দুজন রাস্তায় হাঁটলে মোনারা খেলা-টেলা থামিয়ে চেয়ে থাকত। এবং পরস্পরের মধ্যে গা-টেপাটেপি করে হাসত।

মোনা বড় হয়ে গুঞ্জবাড়ি থেকে সাইকেলে টেবিল টেনিস খেলতে আসত কখনও পোস্ট অফিসে, কখনও কলেজের কমনরুমে, কখনও মহারাজার ক্লাবে। সারাদিন ক্রিকেট

পিটিয়ে বা ফুটবল লাথিয়েও ছটফটে শরীরের আশ মিটত না বলে বিকেল বা সন্ধ্যায় টেবিল টেনিস খেলতেই হয়। সেখান থেকে একটু বেশি রাতে যেত গর্ডন রোডে সন্ধ্যাদের বাড়ি। প্রেম তারা করত না ঠিক, তবে বোঝাবুঝি ছিল। সন্ধ্যার মা-মাসির সঙ্গে, ভাইদের সঙ্গেই কথা হত বেশি, সন্ধ্যার সঙ্গে কখনও কদাচিৎ, তবু বোঝাবুঝি ছিলই। ভিক্টোরিয়া কলেজে তখনও সব সাবজেক্টে অনার্স পড়ানো হত না। সন্ধ্যার শখ চেপেছিল সে বেথুনে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে পড়বে। কলকাতায় যাওয়ার আগেই কয়েকদিন মরিয়া হয়ে তারা আড়ালে-আবডালে দ্যাখা করেছিল। জনান্তিক কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল তাদের। প্রতিশ্রুতিও দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল। সন্ধ্যা চলে এসেছিল কলকাতায়।

তখন মোনা বোস মাঝে মাঝে খেলতে আসত কলকাতায়। রঞ্জির ট্রায়ালে ডাক পেতে শুরু করে। বেশ নাম হচ্ছিল। কলকাতায় সে থাকত হিমাদ্রির বাড়িতে। কৈশোরকালে একবার হিমাদ্রি বখে গিয়েছিল বলে তার বাবা কলকাতা থেকে তাকে সরিয়ে কুচবিহারের কলেজে পড়তে পাঠায়। হোস্টেলে থাকত আর নানান বদমায়েসী করত। খারাপ খারাপ কথা বলত অনর্গল। কলকাতার চালু চৌকশ ছেলে, কাজেই অল্প দিনেই বিস্তর ছেলে তার ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। মোনার সঙ্গে সেই সময়ে বন্ধুত্ব। কুচবিহারের বিস্তর মেয়ে হিমাদ্রির জ্বালায় জ্বলেছিল কিছুদিন। সন্ধ্যাও চিনত তাকে। তবে সে দূরের চেনা, মুখোমুখি নয়।

কলকাতায় সব গোলমাল হয়ে গেল। কী হয়েছিল তা অবশ্য সঠিক মোনা জানে না, জানার দরকারও নেই আর। সে খবর পেয়েছিল সন্ধ্যা বিশ্বাস হিমাদ্রি ঘোষকে বিয়ে করেছে। মোনা কখনও ভুলতে পারেনি ব্যাপারটা। বিয়ের পর সন্ধ্যা আর যায়নি কুচবিহারে। তাদের কৈশোর-যৌবনের সেই সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন শহরটায় কেন আর যায়নি সন্ধ্যা? মোনার জন্য? নাকি সাগরদিঘির পারে, মদনমোহন বাড়ির সরল মহান পামগাছের ছায়ায়, বৈরাগী দিঘি তোর্ষার বাঁধের ওপর সে যে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের স্মৃতি রেখে এসেছে তার মুখোমুখি হতে চায় না বলে?

'কথা বলো, আমি আসছি।' এই বলে হিমাদ্রি সম্ভবতঃ তাদের একটু সুযোগ দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্যাভিলিয়নের অস্থায়ী তাঁবুর দিকে হেঁটে যাচ্ছিল, সন্ধ্যা অনুচ্চ স্বরে বলল—বেশি দেরী কোরো না কিন্তু...। হিমাদ্রি হাসিমুখ ফিরিয়ে বলল—দেরী করবো কেন, আমার কি ভয় নেই?

—ও ওইরকম। সন্ধ্যা প্রশ্রয়ের গলায় বলল মোনাকে।

মোনা গম্ভীর থেকেই বলে—তুমি বরং ওর পিছু নাও।

—কেন?

—হিমাদ্রিকে আমি ঠিক বুঝি না, ও একটু অ্যাগ্রেসিভ।

—ওকে তুমি ভয় পাও?

—ভয় পাওয়ার মতো কিছু কান্ড ও ঘটিয়েছে বলেই ভয় পাই।

সন্ধ্যা মৃদু হেসে বলে—কী কান্ড ঘটিয়েছে?

মোনা একটুক্ষণ সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা কি তাকে ঠাট্টা করছে? কলকাতায় দীর্ঘকাল বসবাস করলে বোধহয় মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে যায়। কলকাতায় না এলে সন্ধ্যা বোধহয় তার থাকত, বিশ্বাস ভাঙত না। হিমাদ্রিকে মোনা কেন ভয় পায় তা অন্তত সন্ধ্যার জানা উচিত।

মোনা বলল—সে সব কথা থাক, তুমি বরং হিমাদ্রির কাছে যাও। আমার কিছু বলার নেই তোমাকে, শোনারও নেই।

সন্ধ্যা আস্তে বলে—রাগ করছো কেন? কতদিন পরে দ্যাখা!

—দেখা না হলেই ভালো ছিল।

—তা কেন? তোমার খেলা দেখব বলে ওকে সঙ্গে নিয়ে কষ্ট করে এসেছি, সারাদিন রোদে বসে খেলা দেখেছি। সে কি এমনি এমনি?

—খেলা? আমার খেলা দেখার কী? খেলা পড়ে গেছে।

—খেলা ঠিক নয় অবশ্য।

—তবে

—তোমাকেই দেখতে আসা আসলে।

মোনা একটু লাল হল।

বলল—কেন সন্ধ্যা, আমাকেই বা দেখতে আসা কেন?

—বাঃ, পুরোনো চেনা মানুষকে মানুষের দেখতে ইচ্ছে করে না?

—না দ্যাখাই ভালো। তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, সম্ভবতঃ সুখীও হয়েছো, আবার পুরোনো ব্যাপারগুলোকে জাগিয়ে তোলা ঠিক নয়।

—তুমি ঠিক বইয়ের ভাষায় কথা বলছ।

—তার মানে?

—ব্যাপারটা অত সিরিয়াস কিছু নয়। আমার মনে পাপ থাকলে হিমাদ্রিকে সঙ্গে নিয়ে আসতাম না। ওসব নয়। খেলার মাঠে তোমাকে দেখার একটা আনন্দ আছে। অনেকে তো তোমার খেলা দেখতে ভালোবাসে।

মোনা হাসল—আমি বোধহয় ম্যাজিকওলার মতো, না? সন্ধ্যা, হিমাদ্রিকে আমি ভয় করি, বেশিক্ষণ একা তোমার সঙ্গে কথা বললে ও ঠিক একটা কিছু ধরে নিয়ে পরে ঠাট্টা করবে।

—ঠাট্টা করতে পারে, তবে ও কিছু ধরে নেয় না। ও জানে, ওর প্রভুত্ব একচেটিয়া। দেখলেই তো, ও ইচ্ছে করে আমাদের কথা বলতে দিয়ে গেল।

—সেই জন্যই তো ভয়। কিছু মানুষ থাকে, যারা সবাইকে ভুল করার সুযোগ দেয়, পরে খোঁটা দেওয়ার জন্য। হিমাদ্রি সে রকম।

সন্ধ্যা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—ওকে যতটা খারাপ বলে লোকে জানে ও ততটা খারাপ নয়। দুষ্টুবুদ্ধি থাকতে পারে কিন্তু ওর ভিতরটা সাদা। আমার সামনে তুমি ওর নিন্দে কোরো না।

সন্ধ্যার মুখে কথাটা শুনে ভিতরে একটা হিংসের কামড় টের পায় মোনা। বিরক্ত হয়ে বলে —হিমাদ্রি তোমার স্বামী বা তোমার ভালোবাসার লোক হতে পারে, আমার কাছে ও অবিশ্বাসী দু'মুখো মানুষ ছাড়া কিছু নয়। সন্ধ্যা, আমিও হিমাদ্রির প্রশংসা শুনতে রাজি নই।

সন্ধ্যা হঠাৎ হেসে ফেলে বলে—তুমি বাচ্চা ছেলের মতো রাগী। আচ্ছা, না হয় হিমাদ্রি খারাপ লোক, তাতে আমাদের কথা বলায় বাধা কী? ও কি কামড়ে দেবে?

—ওর ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। তুমি যাও।

—মোনাদা, তুমি এখনও বেশ ভালো খেল। হিমাদ্রি তোমাকে হিংসে করে। খেলা দেখতে দেখতে বলছিল আমাকে—দ্যাখ দ্যাখ, কীরকম বডি রেখেছে মোনা, কেমন শার্প চোখ, কী স্ট্রোক হাতে...ইস, আমি ঠিক ওর মতো হতে পারলে বেশ হত।

—এটা কি কমপ্লিমেন্ট?

—ও সহজে কাউকে হিংসে করে না।

—আমাকে হিংসে করার কিছু নেই, আমি শেষ হয়ে গেছি।

—কিছু শেষ হওনি, দিব্যি আছো।

মোনা হাসি। বলে—সন্ধ্যা, তোমার আর কী বলার আছে?

সন্ধ্যা শ্বাস ছেড়ে বলে—তাড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচো, না?

—বলেছি তো, আমাদের মধ্যে আর সম্পর্ক না থাকাই ভালো।

—কেন?

—বোঝো না?

—বুঝি, কিন্তু কিছু ফিল করি না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার সত্যিই ভালো লাগছে, এত অপমান সত্বেও।

মোনা নিরুপায় চেয়ে থাকে সন্ধ্যার দিকে। তারপর চোখ সরায়। আস্তে আস্তে বলে— সন্ধ্যা, তুমি ক্রুয়েল। আমার সঙ্গে যত সহজে তুমি কথা বলছ ততটা সহজ হওয়ার কথা নয় তোমার। কিছুমাত্র সেন্টিমেন্ট থাকলে তুমি অন্ততঃ একটু ব্লাশ করতে, একটু চোখ নামাতে।

সন্ধ্যা গম্ভীর হয়ে গেল, চোখ ছলছল করছিল। হাতের ক্ষুদে রুমাল তুলে দাঁতে কামড়ে ঘন শ্বাসের সঙ্গে বলল—তুমি আমাকে কী ভীষণ ঘেন্না করো মোনাদা?

—করি হয় তো। এখন যাও।

—না। বলো কেন ঘেন্না করো? আমি কী করেছি?

বিস্ময়ে মোনা সন্ধ্যার দিকে তাকায়। অস্পষ্ট স্বগতোক্তির মতো বলে—কী করেছো! কী করেছো!

সন্ধ্যা মুখটা হঠাৎ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—থাক, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি বলি মোনাদা, আমার জন্য তুমি কষ্ট পেও না। আমি সুখী হয়েছি। তুমিও সুখী হও।

—ওটাও বইয়ের কথা সন্ধ্যা, বা সিনেমার ডায়লগ। ওতে সত্যিকারের কোনও ব্যাপার নেই। কে সুখী হয়েছে, আর কে সুখী হবে, এটা শুধু ইচ্ছের ওপর বা ডায়লগের ওপর নির্ভর করে না। দোকানদার যেমন খদ্দেরকে ওজনে বা দামে ঠকায়, তেমনি প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার। আমিও ঠকে গেছি, সহজে সেটা ভুলব না, কিন্তু প্রতিশোধও নেবো না।

সন্ধ্যা তার সজল চোখ ফিরিয়ে বলল—তোমার খেলা দেখতে সারাদিন আমার খুব ভালো লাগছিল। কেবল এ কথাগুলো বলে তুমি সেই ভালো লাগাকে নষ্ট করে দিলে।

—ভালই করেছি। নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষকে বেশি ভালো লাগা মেয়েদের পক্ষে ভালো নয়।

—যাই মোনাদা।

—এসো।

সন্ধ্যা বোধহয় মাঠের বাইরে রাস্তায় পার্ক-করা ওদের গাড়িটার দিকে হেঁটে চলে গেল। মোনা প্যাভিলিয়নে তার কিটব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল, দু-চারজন কর্মকর্তা এগিয়ে আসে, খেলা নিয়ে কথা হয়।

একজন বলে—মিস্টার বোস, আমরা বোধহয় কলকাতায় আপনার জন্য একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারি।

মোনা মুখ তুলে বলে—কীরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট?

—একটা চাকরির ব্যবস্থা বোধহয় হবে। তাহলে আমাদের ক্লাব আপনাকে এক্সপেক্ট করতে পারে?

—চাকরি! ভারী অবাক হয় মোনা। বলে—কীরকম চাকরি।

সরকারী?

—না, না। তবে মিস্টার হিমাদ্রি ঘোষের কোম্পানিতে চাকরির কন্ডিশন ভালোই। গুড পেমেন্ট, সিকিউরিটি অ্যান্ড এভরিথিং।

মোনা আপনমনে হাসল। বলল—অফারটা কে দিয়েছে?

—মিস্টার ঘোষ নিজেই। উনি খেলা দেখে প্লিজড।

—হাউ কাইন্ড অফ হিম! বলে হাসে মোনা। তারপর মাথা নাড়ে।

—আপনি চাকরি নেবেন না?

মোনা কিটব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—আমি কুচবিহারে সরকারী চাকরি করি। পার্মানেন্ট পোস্টে। সে চাকরির ইকোয়্যাল চাকরি না পেলে নেবো না। হিমাদ্রির

কোম্পানিতে তো নয়ই।

—কেন?

—বন্ধু যখন বস হয় তখনই বিপদ। আমি রাজি নই।

একটু দূরেই হিমাদ্রি দাঁড়িয়ে। পিছন ফিরে কার সঙ্গে কথা বলছিল। মোনার শেষ কথাটা কানে যেতেই মুখ ফেরাল, একবার ভ্রু কোঁচকাল, পরমুহূর্তেই হাসল। চেঁচিয়ে বলল-কংগ্র্যাচুলেশনস ফর টারনিং ডাউন দ্য অফার, মাই হিরো!

বিদ্রুপের তরঙ্গটা বিদ্যুতের মতোই স্পর্শ করে মোনাকে। সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হিমাদ্রি এগিয়ে এসে মনুমেন্টের মতো শরীর দিয়ে পথ জুড়ল—কী বুঝলে বোস?

—কীসের কী বুঝব?

—সন্ধ্যার কথা বলছিলাম। কিছু বুঝলে?

মোনার মুখে-চোখে উষ্ণ রক্তস্রোত উঠে আসছে।

—হিমাদ্রি, কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।

—বলি এখনও কি ওর সেই পুরোনো ভালোবাসার ছিটেফোঁটা আছে?

—জিগ্যেস করতে তোমার লজ্জা করে না?

—ভাই বোস, দুনিয়াতে কোনও মানুষ কি আর একটা মানুষকে পুরোপুরি পায়? আমি শুধু জানতে চাইছি, তুমি সন্ধ্যার কতটা পেয়েছ, আমিই বা কতটা?

—হিমাদ্রি, কলকাতার লোক বোধহয় ক্রমশঃ হৃদয়হীন হয়ে যাচ্ছে।

হিমাদ্রি ঘোষ ফাটা হাসি হাসে, চারপাশের লোকজন ফিরে তাকায়।

হিমাদ্রি স্বরটা নীচু করে বলে—বাহবা!

—চলি হিমাদ্রি।

—আরে থাকতে কে এসেছে, দাঁড়াও না! সন্ধ্যা কোনও সফট কথাবার্তা বলল না?

—না।

—পিটি! বলে কৃত্রিম দুঃখের শ্বাস ফেলে বলে—কিন্তু বলা উচিত ছিল। আমি ওকে সকাল থেকে পাখি-পড়া করে শেখালুম মোনাকে এই বোলো কিংবা সেই বোলো। আসল সময়ে সব ভুলে মেরে দিয়েছে। যাকগে ওকে আমি ভালোই রেখেছি, চিন্তা কোরো না।

মোনা একটু হাসে, বলে—আমার কী হিমাদ্রি? ভালো রাখো বা মন্দ রাখো, তোমার ব্যাপার। তবে তুমি যতই শেখাও আর সন্ধ্যা যতই বলুক, কিছু যায় আসে না।

—তুমি একটুও জেলাস নও?

—না, তবে ক্রুদ্ধ বলতে পারো, আই অ্যাম অ্যাংগ্রি।

—তাতেই হবে, আমাকে একেবারে উপেক্ষা না করলেই হল।

—তোমার চেহারা আর চরিত্র কোনওটাই উপেক্ষার ব্যাপার নয়। চারিদিকের লোকে সবসময়ে তোমাকে ফিল করে হিমাদ্রি।

—আরে তাই তো আমি চাই। চাকরিটা নিলে না কেন?

—কেন নেবো?

—আমি তোমাকে মোটর ভেইকলসের পারসোনেল অফিসার করব বলে ভেবে রেখেছিলাম।

—আমাকে কেউ কিছু করে দিক তা আর চাই না। আমি নিজেই কিছু হতে পারলাম না, এটাই দুঃখ।

—তুমি হয়েছ।

—কী?

—প্রতিদ্বন্দ্বী।

—কার?

—আমার।

মোনা চেয়ে থাকে।

হিমাদ্রি একটু হেসে বাইরে তার কালো প্রকান্ড ক্রাইসলার গাড়িটার দিকে ইংগিত করে। বড় গাড়িটা নিথর দাঁড়িয়ে আছে, বিকেলে আবছা আলোতে গাড়ির ভিতরকার অন্ধকারে সন্ধ্যা কোথায় হারিয়ে গেছে, কিছু দেখা যায় না। হিমাদ্রি বলল—বিশ্বাস করো বোস, সন্ধ্যা আমার কাছে ভালোই আছে কিন্তু সুখী নয়।

—তাতে আমার কী?

—তোমার জিৎ।

—তার মানে?

—তুমিই জিতে গেছ, যে পুরুষ জানে তার প্রেমিকা অন্য পুরুষের স্ত্রী হয়েও সুখী হয়নি তার জন্যই, সে পুরুষ বড় ভাগ্যবান। সে বরাবর এক ডিগ্রি ওপরে থেকে যায় মানুষ হিসেবে, বোস তুমিও তাই।

—বাজে কথা বোলো না।

—ফ্যাক্ট।

—সন্ধ্যার কোনও দুঃখ নেই আমার জন্য, তুমি ওকে খামোখা সন্দেহ কর, তুমি এত সাসপিসিয়াস তো ছিলে না হিমাদ্রি!

—তুমি ভয় পেয়ে গেছ বোস। আরে না, আমি তার জন্য সন্ধ্যাকে টর্চার করব না, ভয় নেই।

মোনার বুক কাঁপছিল। মিথ্যে নয়, সন্ধ্যার ওপর হিমাদ্রি কোনও অত্যাচার করুক, সন্দেহবশতঃ দুঃখ দিক এটা মোনা চায় না। সন্ধ্যা সম্পর্কে তার হৃদয় চিরকালের জন্য একটু কোমল রয়ে গেল। সে বলল—সন্ধ্যার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, ও বলেছে যে ও সুখী, শী ডাজনট ফিল ফর মি।

—ওটা মুখের কথা।

—না।

—তুমি মেয়েমানুষের কী জানো বোস? চিরকাল খেলে গেলে মাঠে, হৃদয়ের খেলা তো দেখনি। সে থাকগে, চারকরিটায় তোমাকে আটকাতে পারলে ভালো হত।

—কেন?

—তোমাদের দুজনকে কাছাকাছি দেখার সুযোগ পেতাম, রি-অ্যাকশন-গুলো দ্যাখা যেত তাহলে।

—রাস্কেল।

হঠাৎ অভিনয়ের মতো সভয়ে এক পা পিছিয়ে গিয়ে দু-হাত মার ঠেকানোর ভঙ্গিতে তুলে হিমাদ্রি বলে—আরে মারবে নাকি?

নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল মোনা, শান্ত গলায় বলে—না, আই অ্যাম এ স্পোর্টসম্যান।

হিমাদ্রি হাত দুটো নামিয়ে শেকহ্যান্ডের জন্য ডান হাত বাড়িয়ে বলে—আই অ্যাডমিট।

—কী? মোনা হাতটা ধরে জিগ্যেস করে।

—তুমি সত্যিই স্পোর্টসম্যান।

মোনা হাসে, বলে—হঠাৎ এই মহত্ব?

—ফ্যাক্ট হচ্ছে এই যে, সন্ধ্যা আমাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসে না। ও তোমাকে সত্যিই ভুলেছে। আমি তোমাকে ইরিটেট করার চেষ্টা করছিলাম।

মোনা কী শুনে খুশি হল? বলা যায় না।

—কবে ফিরে যাচ্ছো বোস?

—শিগগিরই।

—আমাদের মনে রেখো।

—রাখার কী, কতগুলো জিনিস মনে রাখতে হয় না, থেকে যায়।

—তোমাকে আমার গাড়িতে লিফট দিতে পারতাম কিন্তু দেবো না। সন্ধ্যা তোমাকে ভুলেছে বটে কিন্তু তুমি ভোলোনি। ওর কোম্পানি তোমার এখন ভালো না লাগতে পারে, তাই টর্চার করলাম না। ও.কে. বোস, চলি।

—আচ্ছা।

শালাবাবু কী ঠিক করলে? খাওয়ার টেবিলে বসে জামাইবাবু জিগ্যেস করে।

ল্যাং আর মটরি উঠে গেছে। পড়তে বসেছে। অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে ওরা। দিদি কী আনতে রান্নাঘরে গেছে।

কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না মোনা।

জামাইবাবু বলল—আমি ডাক্তারি-চোখে মেয়েটিকে দেখেছি, হেলথ ভালো, গাম বা টিথ কমপ্লেন নেই, রক্তটাও বোধ হয় পরিষ্কার, সুন্দরীও, তার ওপর মেয়েটির এই সদ্য যৌবনকাল, এ বয়সে একটা চটক থাকেই।

—ওসব জেনে কী হবে জামাইবাবু?

—মেয়েটি ক্রিকেট ভালোবাসে, সেটাও কিছু কম কথা নয়। তুমি খুব বুড়িয়ে যাওনি, বৌয়ের উৎসাহে হয়তো এখনও কিছু করে ফেলতে পারো।

মোনা হেসে মাথা নাড়ে—ক্রিকেটই সব নয়, তা ছাড়া কেউ যদি আমার কাছে ভালো খেলা এক্সপেক্ট করে তবে এখন আমি ভয় পাই। এক্সপেক্টেশন জিনিসটা ভালো না, প্রত্যাশা থাকলে তা পরিপূর্ণ করার ইচ্ছেও থাকে, সেই ইচ্ছেটা আমাকে যত যন্ত্রণা দেবে আমি তত খারাপ খেলব, বরং ক্রিকেটের 'ক' বোঝে না এমন মেয়েই ভালো আমার পক্ষে।

—তোমার দিদি যে একরকম কথা দিয়েছে, বিয়ে না করো অন্তত দেখে যাও।

মোনা কথা বলল না।

পরদিন সে আবার কলকাতায় রাস্তার পর রাস্তা হাঁটল, কিছু ঠিক করতে পারল না। রতনবাবুর মেয়েকে দ্যাখার কিছু নেই, সে জানে দিদি বড় খুঁতখুঁতে, সুন্দর না হলে পছন্দ করত না। তার ওপর অনেক দেবে-থোবে, তাদের গরিবের সংসারে সেটা কিছু অনভিপ্রেত নয়। সল্টলেকে জমির দাম কত তা তার একেবারে অজানা নয়, তার সঙ্গে স্কুটার এবং আরও অনেক কিছু। কী কারণে মফসসলের একজন সামান্য কেরানিকে ওরা পছন্দ করেছে কে জানে!

শনিবারে আবার একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে খেলল মোনা। কপাল ভালোই, রঞ্জিতে নির্বাচিত না হওয়ার আক্রোশে, নাকি সন্ধ্যার ব্যবহার মনে পড়ায়, সে প্রথম ওভারটা বেদম মারতে গিয়ে দুটো ক্যাচ তুলে বেঁচে গেল। দ্বিতীয় ওভার থেকে সে ক্রিকেট খেলতে লাগল। ওয়ান ডাউন নেমেছিল, লাঞ্চের মধ্যে সত্তর নট আউট। আর লাঞ্চের পর এক ঘণ্টায় আরও ষাট রান তুলে দিল। মোট একুশ-তিরিশ, উইকেট নিল ছ'টা, এবং মনের কোণে জমে থাকা মেঘ একটা দমকা, ক্রিকেট-ঝড়ে উড়িয়ে বের করে দিল। খেলার শেষে একটুও ক্লান্তি লাগছিল না। দু'পক্ষেই রঞ্জিতে নির্বাচিত দলের কয়েকজন খেলছিল। তাদের কারও কারও মুখের চেহারা থমথমে। মোনা বোসের ব্যাপারটা খুব স্বাদু লাগছিল না।

আজও একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার ওপর, লক্ষ্য করেনি মোনা। কিট ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে পরিপূর্ণ আনন্দিত মনে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসছিল সে, হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে সন্ধ্যা নেমে এল। বলল—ভয় নেই, হিমাদ্রি দিল্লি গেছে, সাতদিনের আগে ফিরবে না।

—তুমি এখানে কী করছ?

—খেলা দেখতে এসেছি।

—খেলা দেখতে! কই মাঠে দেখিনি তো?

—মাঠে যাইনি, গাড়ি থেকেই দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম। তুমি সেঞ্চুরি করলে, ছজনকে আউট করলে, সব দেখেছি।

—তাতে কী হল?

—কিছুই না।

—তোমার এভাবে আসা ঠিক নয়।

—মোনাদা, আমি তোমাকে ডিসটার্ব করব বলে আসিনি। তোমাকে খেলতে দেখলে আমার ভাল লাগে, মাঠের মধ্যে তোমাকে দেখলে কী যে আনন্দ হয়!

—মাঠ, কেবল মাঠ সন্ধ্যা? আমি কি মাঠের বাইরে কেউ নই?

সন্ধ্যা একটু সম্মোহিত চোখে চুপ করে থাকে, তারপর আস্তে হেঁটে কাছে আসে, বলে — তোমার শরীরে রোদের গন্ধ, কী ভালো তোমার পরিশ্রম করা চেহারা, এলোমেলো চুল, ভাঁজহীন পোশাক, মাঠের বাইরে এই তো তুমি।

—না, এ আমি নই। আমি খেলার পোশাক একটু পরেই ছেড়ে ফেলব, স্নান করব, পাজামা আর পাঞ্জাবি পরব, খদ্দরের চাদর জড়িয়ে বসব তাস খেলতে কিংবা গল্প করতে, আমার সে চেহারাটা তোমার কেমন লাগবে?

—ভালো নয়, সেই জন্যই তো বিয়ে করিনি।

—কী বলছ সন্ধ্যা?

—এটাই সত্যি কথা। তুমি যতক্ষণ খেল ততক্ষণ তোমার চেয়ে সুন্দর আমার চোখে কেউ নয়। তুমি যখন খেল না, তখন অন্যেরা তোমার চেয়ে সুন্দর হতে থাকে।

মোনা একটু শিউরে উঠে ঘড়ি দ্যাখে, এখনও সময় আছে।

সন্ধ্যাকে একটুও সময় না দিয়ে সে দৌড়ে আসে বড় রাস্তায়, পার্ক স্ট্রিটের মুখ থেকে একটা ট্যাক্সি ধরতে পারে কপালজোরে।

দিদিকে কী সব আবোলতাবোল বুঝিয়ে সে তার সুটকেস-টেস নিয়ে সন্ধের কামরূপ এক্সপ্রেস ধরল।

উত্তরবাংলার দশর্করা মোনা বোসের খেলা এবছর আর দেখতে পেল না, কোনওদিনই আর দেখতে পাবে না।

মোনা বোস ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছে।

পিপুল

পিপুলের জীবনটা নানা গ. গোলে ভরা। সেই সব গণ্ডগোলের বেশির ভাগই সে নিজে পাকায়নি, কিন্তু তাকে নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে। তার মাত্র চার-পাঁচ বছর বয়সে তার মা গলায় দড়ি দিয়ে মরে। বলাই বাহুল্য মায়ের আত্মহত্যার পিছনে প্রত্যক্ষ হাত না থাক, পরোক্ষ ইন্ধন ছিল তার মাতাল ও ফুর্তিবাজ বাবার। কিন্তু কিছু লোক থাকে, এমনিতে খুব গভীরভাবে খারাপ নয়, কিন্তু স্বভাবের চুলকুনির ফলে নানা অকাজ করে ফেলে। পিপুল যতদূর জানে, তার বাবা ভীতু ধরনের লোক, বউকে যথেষ্ট ভয় পেত, এবং রোজ মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করত। নিরীহ হলেও মদ খেলে লোকটা একেবারে বাঘ হয়ে উঠত, তখন হম্বিতম্বি ছিল দেখার মতো। যাই হোক, নিত্য মদ নিয়ে এবং মদজনিত অশান্তি ছাড়াও সংসারে আরও বিস্তর খটামটি ছিল। সেসব অভাবজনিত নানা আক্রোশ আর ক্ষোভের প্রকাশ। তাছাড়া দুই পরিবারের মধ্যেও বড় একটা সদ্ভাব ছিল না। বিয়ের সময়ে দানসামগ্রী ইতাদি এবং মেয়ের বাড়ির একটা গুপ্ত কলঙ্ক নিয়ে বিস্তর ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। ফলে পিপুলের সঙ্গে তার মামাবাড়ির সম্পর্ক ছিল না।

মা মরার পর, মামারা পুলিশ নিয়ে এসে বাড়ি ঘিরে তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল। পিপুলদের লোকবল, অর্থবল বিশেষ ছিল না। তবে তার ঠাকুরদা এবং একমাত্র কাকা উকিল-টুকিল লাগায় ঘটিবাটি বেচে। তার বেআক্কেলে-বাবা ছাড়া পেয়ে দিগ্বিজয়ীর মতো হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল। যার বউ সবে মরেছে তার যে হাসিখুশি হওয়া উচিত নয় এই বুদ্ধিটুকুও কেউ দেয়নি তাকে। এই সহজে রেহাই পাওয়া ইদানীং হলে হতো না। ইদানীং বউ মরলে স্বামীকে দেশছাড়া হতে হয়, নইলে থানা-পুলিশ নাকাল করে মারে। তার বাবার অল্পের ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা কাটিয়েই কদিন খুব ফুর্তি করল। তখন পিপুল তার কাকিমার কাছে খানিকটা লাথি-ঝাঁটা খেয়েই পড়ে আছে। কাকিমার দোষ নেই, তার অনেক কটা ছেলেপুলে, অভাবের সংসার, তার ওপর মাতাল ভাসুর। পিপুল একটু দুষ্টুও ছিল বটে, কাকা দাদু বাবা সবাই তাকে প্রায় পালা করে পেটাত।

এইভাবে সে তার জীবনের গণ্ডগোলগুলো টের পেতে শুরু করে।

মা-মরা ছেলেদের অনেক সমস্যা থাকে। পিপুলেরও ছিল। কিন্তু সে-সব গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছিল তার। সংসারে কারও কাছ ভালো ব্যবহার পেত না বলে—ঘরের চেয়ে বাইরেটাই ছিল তার প্রিয়। সারাদিন স্কুল ছাড়া তাকে দেখা যেত রাস্তায় ঘাটে, নদীর ধারে, মাঠে-জঙ্গলে।

ওদিকে বাবার অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠছে। টাকা-পয়সা যা রোজগার করে তা উড়িয়ে দেয় হাজারো ফুর্তিতে। যে বাপ টাকা দেয় না তার ছেলের দুর্দশা তো সবাই জানে। কাকা কাকিমা আর দাদু মিলে তাকে রোজ বিস্তর খারাপ কথা শোনাত।

একদিন পয়সার অভাবে তার বাবা তাকে কাজে লাগানোর একটা উদ্ভট চেষ্টা করেছিল।

সেটা রবিবারই হবে। সকালবেলায় তার বাবা তাকে ডেকে খুব হাসি-হাসি মুখে বলল, ওরে পিপুল, মামাবাড়ি যাবি?

পিপুল অবাক হয়ে বলে, মামাবাড়ি! সেখানে কে আছে?

আরে রে আছে। তাদের মেলা পয়সা হয়েছে। যাবি?

গিয়ে?

গিয়ে? গিয়ে মামা, মামি, মাসি, দাদু, দিদিদের একটু পেন্নাম করে আসবি। তোর দিদিমা খুব ভালো লোক। খুব চুপিচুপি তোর দিদিমার কানে কানে একটা কথা বলবি। বলবি, তোর মায়ের গয়নাগুলো যেন তোর কাছে দিয়ে দেয়।

গয়না! বলে হাঁ করে চেয়ে ছিল পিপুল।

তোর মা গলায় দড়ি দেওয়ার আগে গয়নাগুলো সব সরিয়ে ফেলেছিল। মনে হয় তোর দিদিমার কাছেই গচ্ছিত রেখে এসেছিল। ওগুলো পেলে এখন আমরা বাপ-ব্যাটায় একটু খেয়ে-পরে থাকতে পারি। তোর মামাবাড়ির অনেক পয়সা। হাত ঝাড়লেই পর্বত। ছেঁড়া জামাটামা পরে নিস, তাহলে তাদেরও কেটু মায়া হবে।

পরদিন ছেঁড়া আর ময়লা জামা পরিয়ে, খালি পায়ে হাঁটিয়ে তাকে নিয়ে তার বাবা শ্বশুরবাড়ি চলল। লোকাল ট্রেনে মিনিট পনেরোর পথ। স্টেশন থেকে রিকশায় অনেকখানি। মামাবাড়ি থেকে দু ফার্লং দূরে রিকশা থেকে নেমে পড়ল তারা।

বাবা বলল, ওই সোজা রাস্তা। একটু এগিয়ে প্রথম ডানহাতি রাস্তায় ঢুকলেই দেখতে পাবি, সামনে পুকুরওলা পুরনো বাড়ি। সোজা ঢুকে যাবি ভিতরে।

পিপুল কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, কাউকে চিনি না যে!

দূর বোকা! চেনাচেনির কী আছে? গিয়ে বলবি আমি অমুকের ছেলে। আমার নামটা বলবার দরকার নেই, মায়ের নামটাই বলিস। মা-মরা ছেলে তুই, তোকে আদর-যত্নই করবে মনে হয়। তবে আদরে কাজের কথাটা ভুলে যাস না বাবা। গয়নার কথা মনে আছে তো। খুব চুপিচুপি দিদিমাকে বলবি, আর কাউকে নয়। আমি এই যে চায়ের দোকানটা দেখছিস, এখানেই থাকব। কাজ হয়ে গেলে এখানে এসে ডেকে নিবি। আর শোন, আমি যে সঙ্গে আছি একথা খবরদার বলিস না কাউকে!

ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নিয়ে পিপুল অনিচ্ছের সঙ্গেই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল, তার বুকটা দুরদুর করছিল। মামাবাড়ির কাউকেই সে ভালো চেনে না। কোন শিশুকালে

মায়ের সঙ্গে আসত, কিছু মনেই নেই তেমন।

পুকুরওলা বাড়িটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না। পুকুরের পাশ দিয়ে একটা ইঁট বাঁধনো সরু পথ। সেই পথ একটা পুরনো পাকা বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাড়িটা বেশ বড় এবং দোতলা। লাল রঙের। বাগান আছে, কয়েকটা নারকেল আর সুপুরির গাছ আছে।

পিপুল খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। খিদেয় তেষ্টায় বড় নেতিয়ে পড়েছে সে। ও বাড়িতে গেলে খেতে দেবে কিনা সেইটেই ভাবছিল সে। আবার ভাবছিল, যদি তাড়িয়ে দেয়!

পুকুরে একজন বউ মানুষ চান করছিল। ভরদুপুরে আর কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। বউ-মানুষটি স্নান সেরে বাড়ির পাকা ঘাটলায় উঠে গামছা নিংড়োতে নিংড়োতে তার দিকে চেয়ে বলে, এই ছোঁড়া, তখন থেকে হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস ড্যাবড্যাব করে? চুরিটুরির মতলব আছে নাকি? যাঃ এখান থেকে!

পিপুল ভয় খেয়ে গেল। তারপর করুণ গলায় বলল, আমি গিরীশ রায়ের বাড়ি যাবো।

কেন রে, সেখানে তোর কি?

পিপুল বলল, সেটা আমার মামাবাড়ি।

মামাবাড়ি! বলে বউটি অবাক, এটা তোর মামাবাড়ি হল কবে থেকে রে ছোঁড়া? চালাকি করছিস?

আমার দাদুর নাম গিরীশ রায়।

বউটা এবার ধমকাল না। খুব ভালো করে তার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর বলল, শ্রীরামপুর থেকে আসছিস নাকি?

হ্যাঁ।

তোর বাবার নাম হরিশ্চন্দ্র?

পিপুল অবাক হয়ে বলে, হ্যাঁ।

কি চাস এখানে? কে তোকে পাঠাল?

বাবার শেখানো কথা সব ভুলে গেছে পিপুল। কিন্তু বেফাঁস কথাও যে বলা চলবে না এ বুদ্ধি তার ছিল। সে বলল, আমার বড় জলতেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দেবেন?

তেষ্টার কথায় সবাই নরম হয়। বউটাও হল। বলল, আয় আমার পিছু পিছু।

বাড়ির ভিতরে মস্ত ঝকঝকে উঠোন। তাতে ধান শুকোচ্ছে। বেশ কয়েকটা মড়াই আর খড়ের গাদা। বউটা উঠোনে পা দিয়েই হঠাৎ পাড়া মাত করে চেঁচিয়ে উঠল, দেখ এস তোমরা, কে এসে উদয় হয়েছে! ওই যে খুনে হরিশ্চন্দ্রের ব্যাটা। নিশ্চয়ই ওই মুখপোড়াই নিয়ে এসেছে!

চেঁচামেচিতে লোকজন বেরিয়ে এল। একজন বুড়ো মানুষ, জনাতিনেক পুরুষ। সকলের চোখ তার দিকে।

পুরুষদের মধ্যে চোয়াড়ে চেহারার একজন বারান্দা থেকে নেমে তার সামনে এসে দাঁড়াল। কড়া গুল্লু গুল্লু চোখে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, কার ব্যাটা তুই?

আমার বাবার নাম শ্রীহরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

ও বাবা! বাপের নামের আগে আবার শ্রী লাগায় দেখছি। তোর মায়ের নাম কি?

আশালতা ঘোষ।

বারান্দা থেকে সেই বুড়ো লোকটি বলল, অত জিজ্ঞাসাবাদের দরকার নেই। মুখে ওর মায়ের মুখের আদল আছে।

পিপুলের ভারি ভয় আর অপমান লাগছিল। বাবা তাকে এ কোন শত্রুপুরীতে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল।

চোয়াড়ে লোকটা বলল, কে তোকে এ বাড়িতে পাঠিয়েছে

পিপুল কাঁদে-কাঁদো হয়ে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলল, কেউ পাঠায়নি।

তুই নিজেই এসেছিস? একা?

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

তোর বয়সি ছেলে শ্রীরামপুর থেকে এখানে একা আসতে পারে?

পিপুল চুপ করে থাকল।

কী চাস তুই?

পিপুল মুখস্থ করা কথাগুলো বলে গেল, আমি মা-মরা ছেলে। বাড়িতে খুব অনাদর। আমার একটু আশ্রয় হলে ভালো হয়।

কাল রাতে তার বাবা তাকে এ কথাগুলোই শিখিয়ে দিয়েছিল। মুখস্থও সে ভালোই বলেছে। কিন্তু চটাস করে একটা চড় যে কেন এ সময়ে তার গালে এসে পড়ল কেন জানে!

বুড়ো লোকটি বলল, আহা, মারিস কেন?

চোয়াড়ে লোকটা বলে, মারব না? কেমন যাত্রার পার্টের মতো শেখানো কথা বলছে দেখ! মা-মরা ছেলে, অনাদর, আশ্রয়--এসব মুখ থেকে কখনও বেরোয়? এই ছোঁড়া, কে তোকে এখানে এনেছে সত্যি করে বল!

মারধরে কিছু হয় না পিপুলের। নিজের বাড়িতে নিত্যই মার খায় সে। রাস্তায়-ঘাটেও ছেলেদের সঙ্গে তার নিয়মিত মারপিট হয়। স্কুলে মাস্টারমশাইরা ঠেঙিয়ে তার ছাল তুলে দেন মাঝে মাঝে। চড়টা খেয়েও তাই সে দমেনি। কিন্তু বাবার কাজটা যে হবে না সে বুঝতে পারছিল। সে চোয়াড়ে লোকটার দিকে চেয়ে সত্যি কথাই বলল, বাবা নিয়ে এসেছে আমাকে।

চোয়াড়ে লোকটা লাফিয়ে উঠে বলল, কোথায় সেই শয়তানটা? আজ ওটাকে পুকুরের কাদায় পুঁতে রাখব। লাশটাও কেউ খুঁজে পাবে না। বল ছোঁড়া, কোথায় খুনে বদমাসটা?

পিপুল মাথা বাঁচাতে বলে ফেলল, একটা চায়ের দোকানে বসে আছে। মোড় পেরিয়ে বাঁদিকে।

চোয়াড়ে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে দুই লম্ভে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর যা হয়েছিল তা দেখেনি পিপুল। তবে শুনেছে। তার মেজো মামা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাঁকে ডাকে লোক জোগাড় করে চায়ের দোকান থেকে তার বাপকে টেনে বের করে হাটুরে মার মারে। হাসপাতালে দিন পনেরো পড়ে থাকতে হয়েছিল তার বাপকে। পুলিশ কেস হয়েছিল। বিরাট গণ্ডগোল।

কিন্তু ইতিমধ্যে পিপুলের যা হয়েছিল সেইটেই আসল কথা। মামা বেরিয়ে যাওয়ার পরই দাদামশাই অর্থাৎ বুড়ো মানুষটি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন, ওরে, কি জানি কোন খুনোখুনি হয়ে যায়! ওরে তোরা দেখ, কালিপদর মাথা তো গরম, কি কাণ্ড করে ফেলে!

দাদামশাইয়ের চেঁচামেচিতে কয়েকজন মহিলা নানা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন পাকাচুলো বুড়ি। পরে জেনেছে সে-ই দিদিমা। তবে দাদু দিদিমা মাসি মামি সব কেমন হয় তা তো জানা ছিল না পিপুলের। সে হাঁ করে এঁদের দেখতে লাগল।

দিদিমা তার দিকে চেয়ে বলল, এ ছেলেটা কে?

দাদু বলল, তোমার নাতি গো, চিনতে পারছো না? আশার মুখ একেবারে বসানো!

দিদিমা ভারি অবাক, আশার ছেলে? এর নামই তো পিপুল!

তা হবে। নাম-টাম জিজ্ঞেস করা হয়নি। ওদিকে কালিপদ যে কোন সর্বনাশ করতে বেরিয়ে গেল কে জানে! এর বাপটাকে বোধ হয় ঠেঙিয়েই মেরে ফেলবে। হাতে না হাতকড়া পড়ে।

পিপুলকে কেউ ডাক-খোঁজ করল না আর। বাড়িসুদ্ধ লোক বেরিয়ে গেল পুকুরধারে, কী কাণ্ড হচ্ছে তা দেখতে। পিপুলেরই শুধু দেখতে ইচ্ছে হল না। সে উঠোনের কুয়োতলায় গিয়ে কপিকলে বাঁধা বালতি ফেলে জল তুলল। তারপর হাতের কোশে জল ঢেলে গলা অবধি জল খেল।

মনটা ভালো ছিল না তার। বাপের সঙ্গে যদিও তার বিশেষ আদর-আশকারার সম্পর্ক নেই, তবু ওই লোকটা ছাড়া তার কে-ই বা আছে? দাদু কাকা সবাই তাকে মারে। মারে বাবাও। তবে কিছু কম। আর সে এটা জানে যে, দুনিয়ায় কোনও রহস্যময় কার্যকারণে এই বাপ লোকটার সঙ্গেই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

বারান্দায় উঠতে তার সাহস হল না। সে কুয়োতলায় পাশে একটা আতা গাছের ছায়ায় বসে রইল উবু হয়ে। বাইরে কী হচ্ছে তা দেখতে গেল না। শুনতে পেল, কোনও ঘরে একটা বাচ্চা খুব চেঁচিয়ে কাঁদছে। খুব কাঁদছে। বোধহয় চৌকি বা খাট থেকে পড়ে-টড়ে গেছে।

একটু অপেক্ষা করে পিপুল ওই বিকট কান্নাটা আর সহ্য করতে পারল না।

উঠে পায়ে পায়ে সে এগোলো। বারান্দায় উঠে যে ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছিল সেই ঘরে উঁকি মেরে দেখল, চার-পাঁচ মাস বয়সের একটা বাচ্চা সত্যিই খাটের নীচে মেঝেয় পড়ে অছে। ইঁট দিয়ে বেশি উঁচু করা খাট। বাচ্চাটা পড়ে কপাল ফাটিয়েছে, মুখ নীল হয়ে গেছে ব্যথায়।

পিপুল গিয়ে বাচ্চাটাকে তুলে বিছানায় শোয়াতে যাচ্ছিল। ঠিক এ সময়ে হুড়মুড় করে একটা বউ এসে ঢুকল। তার চোখ কপালে, মুখ হাঁ-করা, চুল উড়ছে। ঢুকেই বিকল গলায় চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই অ্যাই, কী করছিলি এ ঘরে? অ্যাঁ, কী করছিলি? মেরে ফেলেছিস আমার ছেলেটাকে!

পিপুল বলল, না তো। এ পড়ে গিয়েছিল!

খপ করে বাচ্চাটাকে তার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে বউটা পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল। ওগো, দেখ কী সাংঘাতিক কাণ্ড! ঘুরে ঢুকে বাচ্চাটাকে আছাড় মেরেছে..

আবার একটা চেঁচামেচি উঠল, লোকজন দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।

তারপর যে কী কাণ্ড হল তা ভালো করে আজ আর মনে পড়ে না। শুধু মনে আছে। সবাই মিলে তাকে এমন মারতে লাগল চারধার থেকে যে সে চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে পড়ে গেল।

জ্ঞান ফিরল কুয়োর ধারে। কুয়োতলায় তাকে শুইয়ে জল ঢালা হচ্ছিল মাথায় আর গায়ে। সারা গা ভিজে সপসপে। জ্ঞান হতেই টের পেল তার মাথায় আর শরীরে ব্যথা আর জ্বলুনি। মাথার চুল বোধহয় কয়েক খাবলা উঠে গেছে। কান কেটে, কপাল ফেটে রক্ত পড়েছে। হাতে-পায়ে ঝনঝন করছে ব্যথা।

চোখ চেয়েই সে আতঙ্কের গলায় বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি যাবো।

সামনে সেই চোয়াড়ে লোকটা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো। তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখ। লোকটার পিছনে পাড়াসুদ্ধ লোক জড়ো হয়েছে।

কে একজন বলল, এ কি আপনার ভাগ্নে?

চোয়াড়ে লোকটা অর্থাৎ কালিপদ তেজের গলায় জবাব দিল, কিসের ভাগ্নে মশাই? ভাগ্নে-ফাগ্নে এখন ভুলে যান। বাপ যেমন শয়তান, ছেলে তার চেয়ে কম যায় না। হরিপদর ছেলেটাকে আছাড় মেরে খুন করতে গিয়েছিল--চুরিটুরিরও মতলব ছিল বোধহয়।

সেই লোকটা বলল, যে যাই বলুন, কাজটা আপনারা ভালো করছেন না। বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এর বাপকে তো হাসপাতালে পাঠালেন। যা মার মেরেছেন তাতে ফিরলে হয়। তার ওপর এই একফোঁটা ছেলেটাকে হাটুরে মার দেওয়া হল, আপনারা তো পাষণ্ড মশাই।

কালিপদ এ কথায় লাফিয়ে উঠে লোকটার দিকে তেড়ে গেল, ওঃ খুব যে দরদ দেখছি! যখন এর বাপ আমার বোনটাকে গলা টিপে মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তখন কোথায় ছিলেন?

কালিপদ যে গুন্ডা লোক তা বোঝা গেল সেই প্রতিবাদকারী চুপ করে যাওয়ায়।

কালিপদ বলল, দরদি ঢের দেখা আছে। বেশি ফোপরদালালি করতে এলে মজা বুঝিয়ে দেব।

পিপুল আতঙ্কিত চোখে চারদিকে চেয়ে দেখছে। এরা তাকে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না। উঠে একটা দৌড় লাগাবে? কিন্তু শরীর এমন নেতিয়ে পড়েছে যে, উঠে দাঁড়ানোর সাধ্যই নেই!

কালিপদ তার দিকে কটমট করে এমন চেয়েছিল যে পিপুলের রক্ত জল হওয়ার উপক্রম। মারের চোটে ইতিমধ্যেই সে প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলেছে। আর তার ভীষণ জলতেষ্টা পাচ্ছে।

কালিপদ কড়া গলায় বলল, এবার বলবি তোর মতলবখানা কী ছিল?

পিপুল কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আর কখনও আসব না।

কিন্তু এসেছিলি কেন?

আমি আসতে চাইনি। বাবা জোর করে এনেছিল।

কালিপদ চোয়ালটা আবার শক্ত হল। বোধহয় আরও একটা চড় মারার জন্যই হাতটা তুলেছিল সে। এমন সময় বারান্দা থেকে একজন বুড়ি চেঁচিয়ে বলল, ওরে ও কালি, এরপর মানুষ-খুনের দায়ে পড়বি যে! অনেক হয়েছে! এটা গেরস্তবাড়ি, রাজ্যের লোক ঢুকে পড়েছে তামাশা দেখতে। ও সব হুড়যুদ্ধু এবার বন্ধ কর বাবা। ওই একফোঁটা ছেলেটাকে আর কত মারবি!

কালি চড়টা মারল না। তবে আরও কিছুক্ষণ তড়পাল। তারপর চাকরগোছের একটা লোককে ডেকে বলল, অ্যাই গোপলা, এটাকে নিয়ে চোরকুঠুরিতে পুরে রাখ। খবরদার, কিছু খেতেটেতে দিবি না। জল অবধি নয়।

তার মামাবাড়ি পুরনো আমলের। হয়তো একসময়ে অবস্থা খুবই ভালো ছিল। মাটির নীচে মেটে জলের জালা রাখার মস্ত ঘর আছে। গোপাল তাকে ধরে নিয়ে সেই অন্ধকার পাতাল ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ভারি স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। ঘুটঘুট্টি অন্ধকারও বটে। পিপুল শরীরে মারের যন্ত্রণা নিয়ে সেখানে মেঝেয় পড়ে কাঁদতে লাগল। পেটের খিদে, গলার তেষ্টা তো ছিলই। আর ছিল অপমান আর লাঞ্ছনা। নিজের বাড়িতেও তার আদর নেই, বটে, কিন্তু সেখানেও এই হেনস্থা তার কখনও হয়নি।

কাঁদতে কাঁদতে পিপুল অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেলা কত হল, দিন গিয়ে রাত এল কিনা, সে জানে না, তবে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখল, তার সামনে লণ্ঠন হাতে একটি বুড়ি দাঁড়িয়ে। সেই বুড়িটাই যে তাকে আর মারতে কালিপদকে নিষেধ করেছিল।

বুড়ি বলল, তুই কি পিপুল?

পিপুল ভয় খাওয়া গলায় বলে, হ্যাঁ।

আমি তোর দিদিমা। জানিস?

দিদিমা-টিদিমা পিপুলের কাছে কোনও সুখের ব্যাপার নয়। সে বুঝে গেছে, মামাবাড়ির পাট তার চুকে গেছে। সে ফুঁপিয়ে উঠে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আপনাদের পায়ে পড়ি।

তুই কি বাচ্চাটাকে সত্যিই আছাড় মেরেছিলি?

পিপুল সবেগে মাথা নেড়ে বলল, না, আছাড় মারব কেন? বাচ্চাটা খাট থেকে পড়ে গিয়ে ভীষণ কাঁদছিল, আমি গিয়ে কোলে নিয়েছিলাম।

দিদিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তাই হবে। তোর কপালটাই খারাপ। ছোট বউ এমন চেঁচামেচি করল যে সকলে ধরে নিল আছাড় মেরে ছেলেটাকে তুই মেরে ফেলতে চেয়েছিলি। এ বাড়িতে যে কী অশান্তি রে ভাই, কী আর বলব! খুব মেরেছে তোকে, না?

পিপুল এসব আদুরে কথায় আর বিশ্বাস করে না। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, নাকে খত দিচ্ছি, আর আসব না কখনও।

ছেড়ে দেবেটা কে? কালিপদকে তো চিনিস না! কুরুক্ষেত্র করবে। এখন ও বাড়িতে নেই। ফিরতে রাত হবে। কোন মূর্তি নিয়ে ফিরবে কে জানে বাবা!

এ-কথা শুনে পিপুল ফের কাঁদতে লাগল। মনে হচ্ছিল, এই পাতালঘর থেকে আর সে কোনও দিন বেরোতে পারবে না। কাঁদতে গিয়ে দেখল তার হিক্কা উঠছে। মাথা ঝিমঝিম করছে।

দিদিমা উবু হয়ে তার কাছে বসে গায়ে হাত দিয়ে বলল, শোন ভাই, এ বাড়িতে আমিও বড় সুখে নেই। দিন-রাত ভাজা-ভাজা হচ্ছি, কেন যে প্রাণটা আজও ধুকপুক করছে তা বুঝি না। সংসার তো নয়। আস্তাকুঁড়!

আমি বাড়ি যাবো।

আমাদের ক্ষমতা থাকলে কি এ সংসারে এভাবে পড়ে থাকতুম!

আমি তো বাচ্চাটাকে ফেলিনি। কিছু তো চুরিও করিনি। তবে কেন আমায় আটকে রাখছেন?

তোর দোষ নেই জানি। কিন্তু তোর বাবা বড্ড খারাপ যে, ওর জন্যই তো মেয়েটা মরল। তাই তোদের ওপর সকলের রাগ। বেঁচে যখন ছিল তখনও বাপের বাড়িতে আসতে দিত না।

আমাকে কি আপনারা আরও মারবেন? আর মারলে কিন্তু আমি মরেই যাবো।

দিদিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সবই ভবিতব্য রে ভাই। মারলেও কি আটকাতে পারব! আমার কথা কে শুনবে বল!

পিপুলের কান্না থামছিল না। ভয়ে বুকটা বড্ড দুরদুর করছিল। আরও মারবে? কিন্তু কেন মারবে সেটাই যে সে বুঝতে পারছে না!

দিদিমা তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে বলল, শোন ভাই, এখন যদি তোকে ওপরে নিয়ে যাই তাহলে সবাই দেখতে পাবে। কথাটা কালিরও কানে যাবে। তুই। বরং মটকা মেরে পড়ে থাক, আর একটু রাত হলে আমি চুপিচুপি আসব'খন।

আমার যে বড্ড ভয় করছে!

এই লণ্ঠনটা রেখে যাচ্ছি। এখানে ভয়ের কিছু নেই। এ ঘরটা বেশ পরিষ্কার আছে। তোর কি ভূতের ভয়?

না, আমার এমনিই ভয় করছে।

এইটুকু তো তোর বয়স, ভয় তো করবেই। তবু আর একটু কষ্ট কর দাদা। বেশিক্ষণ নয়। এ বাড়ির সবাই রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। শুধু ভয় কালিপদকে। তার একটু রাত হয় শুতে। তুই চুপটি করে পড়ে থাক। আর এই জলের ঘটিটা রাখ, আর দুটো বাতাসা। চুপটি করে এনেছি। ওদিকে একটা জালা আছে, ঘটিটা ওর পিছনে লুকিয়ে রাখিস।

দিদিমা চলে গেল। পিপুল তার প্রচণ্ড তেষ্টা মেটাতে জল খেতে গিয়ে বিষম খেল। তারপর সবটুকু জলই প্রায় খেয়ে ফেলল। তারপর বড় বড় চারখানা বাতাস চিবোলো গোগ্রাসে। জীবনে যেন এত সুস্বাদু খাবার সে আর খায়নি।

খানিক জেগে, খানিক ঘুমিয়ে কতটা সময় পেরোলো কে জানে! তবে এক সময়ে তার অপেক্ষা শেষ হল। ওপরে দরজা খোলার মৃদু শব্দ পেল সে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, শুধু দিদিমা নয়--দাদুও।

দিদিমা বলল, কী মার মেরেছে দেখছো ছেলেটাকে!

দাদু গম্ভীর গলায় বলল, দেখেছি। কী আর করা যাবে বলো, আমাদের তো কিছু করার ছিল না।

এখন কী করবে?

কিছু করতে যে সাহস হয় না।

তা বলে চোখের সামনে দুধের ছেলেটাকে মরতে দেখব নাকি? শত হলেও নিজের নাতি। আমদের আর ভয়টা কিসের বলো। বেঁচে থেকেও তো মরেই আছি।

দাদু চিন্তিত মুখে পিপুলের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, একেবারে মায়ের মুখের আদল, দেখেছো?

দিদিমা ঝংকার দিয়ে বলল, আমি কি ছাই চোখে ভালো দেখি! তিন বছর হল ছানি পড়ে চোখ আঁধার হয়ে আছে। সব কিছু যেন কুয়াশায় ডোবা, আবছা আবছা। ওরে ভাই, তোর নাম তো পিপুল?

পিপুল চিঁচি গলায় বলল, হ্যাঁ।

আমাদের সঙ্গে আয়, চাট্টি ভাত খাইয়ে দিই। খিদে পায়নি তোর?

পিপুলের চোখ ভাতের কথায় জল এল। মাথা নেড়ে বলে, আমার কিছু চাই না। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি যাবো।

দিদিমা আক্ষেপ করে বলে, ওরে আমাদের কপাল যদি ভালো হতো তাহলে বলতে পারতুম যে, এটাও তোর বাড়ির মতোই। মামাবাড়ি কি ফেলনা নাকি? কত আদর মামাবাড়িতে! তা ভাই, কপালটাই যে আমাদের ঝামা-পোড়া। এখন আয়। দেরি করিসনি। দেরি করলেই বিপদ। শুধু তোর নয়। আমাদেরও।

এত ভয়ের ওপর ভয়ে পিপুল সিঁটিয়ে যাচ্ছিল। ভাত খাবে কি, তার শরীর এত কাঁপছে যে মনে হচ্ছে জ্বর এসেছে বুঝি। তবে এই অন্ধকারে চোরকুঠুরি থেকে বেরোনোর জন্যই সে ভাত খেতে রাজি হল। দাদু আর দিদিমা চুপিসাড়ে তাকে ওপরে নিয়ে এল। বারান্দায় এক প্রান্তে রান্নাঘর। বাড়ি নিঃঝুম। কত রাত তা জানে না পিপুল। তবে রাত বেশ গভীর বলেই মনে হল তার। উঠোনে একটা কুকুর তাকে দেখে ভেউ-ভেউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

দাদু তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে চাপা ধমক দিল কুকুরটাকে, অ্যাই, চোপ!

কুকুরটা লেজ নাড়তে লাগল।

রান্নাঘরে তাকে পিঁড়িতে বসিয়ে একটা থালায় ভাত বেড়ে দিল দিদিমা। বেশ তাড়াহুড়োর ভাব। বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে ভাই।

পিপুলের বিশাল খিদে মরে গেছে অনেকক্ষণ আগে। এখন তার একটা বমিবমি ভাব হচ্ছে। দু-তিন গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে সে কেবল জল খেতে লাগল ঢকঢক করে। জল খেয়েই পেট ভরে গেল। আর কেমন শীত করতে লাগল।

কিছু একটা সন্দেহ করেই দিদিমা তার কপালে হাত দিয়ে বলল, ইস, তোর যে জ্বর এসেছে দেখছি! গা পুড়ে যাচ্ছে!

পিপুলের খুব ঘুম পাচ্ছে। আর শুধু জলতেষ্টা।

দিদিমা গিয়ে দাদুকে ডেকে এনে বলল, ছেলেটার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, কি করবে?

দাদু চিন্তিতভাবে বলে, অনেক ক্ষত হয়েছে দেখছি। কেটেকুটে বিষিয়ে গেছে। ব্যথার তাড়সে জ্বর।

তোমার হোমিও চিকিৎসায় হবে না?

হবে না কেন? তবে চোর-কুঠুরিতে রাখলে আজ রাতেই মরে যাবে। ওকে আমাদের ঘরে নিয়ে ঢেকেঢুকে শোওয়াও। আমি চারদিকটা দেখে নিয়ে আসছি।

অনেকক্ষণ বাদে এই প্রথম পিপুল তার জ্বরঘোরেও বুঝতে পারছিল, এ পৃথিবীতে এখনও দুটি মানুষ অবশিষ্ট আছে যারা তাকে একটু আধটু মায়া করে।

পিপুলকে ধরে তুলল দিদিমা। তারপর দাদুকে বলল, শোনো, এই ছেলে নিয়ে অনেক গণ্ডগোল হবে। কালি এসে কুরুক্ষেত্র করবে। তুমি একবার গৌর মিত্রের কাছে যাও এখনই। তাকে সব বলো গিয়ে।

দাদু একটু যেন ভয় খেয়ে বলে, গৌর মিত্তির! বলো কী? গৌর রগচটা লোক, খুনোখুনি করে ফেলতে পারে! শত হলেও কালি আমাদের ছেলে!

দিদিমা খুব শান্ত গলায় বলে, ছেলে আমারও কিন্তু আমি তার মা হয়েও বলছি, গৌর মিত্তিরকে একটা জানান দিয়ে রাখো। সে ষণ্ডাগুন্ডা হতে পারে, কিন্তু দশজনের উপকারও করে। আমরা বুড়োবুড়ি পেরে উঠব না, কালি এ ছেলেকে মেরে তবে ছাড়বে।

দাদু একটু দোনোমোনা করে বলল, তাই যাচ্ছি। তুমি একে ভালো করে ঢেকে শোওয়াওগে। আমি আসছি।

দিদিমা পিপুলকে দোতলার একখানা ঘরে নিয়ে এল। বেশ বড় ঘর। মস্ত খাট পাতা। মশারি ফেলা। সেই খাটের বিছানায় তাকে শুইয়ে একটা কাঁথা চাপা দিয়ে বলল, ঘুমো-- ভয় নেই। তোর জন্যই বোধহয় আজও অবধি আমরা বেঁচে ছিলাম। আমাদের প্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মরবি না। ঘুমো তো ভাই।

পিপুলকে আর বলতে হল না। নরম বিছানা পেয়েই তার শরীর অবসন্ন করে এক গাঢ় ঘুম ঢেকে ফেলল তাকে।

মাথার দিককার মস্ত জানালা দিয়ে যখন ভোরের লালচে রোদ এসে বিছানা ভরে দিল তখন চোখ চাইল পিপুল। বিছানায় সে একা। তার দু'ধারে দাদু আর দিদিমা যে রাত্রে শুয়েছিল তা বালিশ আর বিছানা দেখেই সে টের পেল। দেখতে পেল তার শরীরে কাটা আর ফাটা জায়গাগুলোয় তুলো আর ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। তা বলে ব্যথা সে কিছু কম টের পাচ্ছিল না। জ্বরের একটা রেশ শরীরে রয়েছে এখনও। আর বড্ড তেষ্টা।

বাড়িটা নিস্তব্ধ। কোনও গোলমাল বা চেঁচামেচি নেই। তবু কান খাড়া করে রইল পিপুল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। বিছানা ছেড়ে ধীরপায়ে গিয়ে জানলায় দাঁড়াল। এটা পুব দিক। সামনেই সেই পুকুরটা। ওপাশে কিছু বাড়িঘর। তার ওপাশে সূর্য উঠছে। কী সুন্দর দৃশ্য। পুকুরের স্থির জলে ভোর আকাশের ছায়া।

দিদিমা পিছন থেকে হঠাৎ কথা বলে উঠতেই একটু চমকে গেল পিপুল।

উঠেছিস? দেখি গা-টা দেখি, কত জ্বর!

পিপুল কপালটা এগিয়ে দিল। তারপর চাপা গলায় বলল, কালিমামা ফিরেছে?

দিদিমা একটু হাসল, ফিরেছে। তোর ভয় নেই। রাত বারোটায় ফিরেই চোরকুঠুরির চাবি চাইল। দিইনি। নেশা করে আসে, অত বুদ্ধি কাজ করে না। তবু একটু চ্যাঁচামেচি করেছিল ঠিকই। রাত সাড়ে বারোটায় গৌর মিত্তির এল। সে আসতেই সব ঠান্ডা।

গৌর মিত্তির কে দিদিমা?

দিদিমা বলে ডাকলি নাকি ভাই! সোনা আমার! গোপাল আমার! কখন থেকে কানদুটো পেতে আছি, ডাকটা শুনবো বলে!

ফোকলা মুখের হাসিটি এত ভালো লাগল পিপুলের। সে বলল, বললে না?

গৌর মিত্তির তো! তার কথা কী-ই বা বলি তোকে। সে ষণ্ডাগুন্ডা লোক, সবাই তাকে ভয় খায়। চণ্ডালের মতো রাগ। লোকের ভালোও করে, মন্দও করে। এখানে তার খুব দাপট।

সে এসে কী করল?

তোর দাদু গিয়ে তাকে সব খুলে বলেছিল। সে দেরি করেনি। তখন-তখনই চলে এসেছিল। কালি শুতে গিয়েছিল, তাকে তুলে এনে চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে গেল। আর তোর ভয় নেই। গৌর মিত্তির যখন আশ্রয় দিয়েছে, কালি আর ভয়ে কিছু করবে না!

কালিমামা কি খুব রাগী?

খুব। রাগ বলে নয় রে ভাই, রাগী মানুষ অনেক থাকে। সে হল বংশের কুড়ুল। অশান্তির শেষ নেই রে ছেলে।

আমি এখন কী করব দিদিমা? বাবা তো শুনেছি হাসপাতালে, কে আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে?

বাড়িতে তোর তো ঠাকুরদা আর কাকা আছে, না? তারা তোকে দেখে-শোনে?

পিপুল চুপ করে রইল।

সেখানে তোর আদর নেই, না?

না।

তবে সেখানে গিয়ে কি করবি? এখানে থাকতে পারবি না?

এখানে! বলে আতঙ্কে চোখ বড় করে ফেলল সে।

দিদিমা দুঃখের গলায় বলে, থাকতে তো বলছি, কিন্তু এ বাড়িতে আমাদের কি আর জোর আছে? এখন বুড়োবুড়িকে পারলে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমাদের ঠাঁই নেই। তবু শ্বশুরের ভিটে আঁকড়ে আর বুড়োটার মুখ চেয়ে পড়ে আছি। এখানে কি আর শান্তিতে থাকতে পারবি? যদি শতেক অত্যাচার সয়ে থাকতে পারিস তবে হয়। যতদিন আমরা আছি তোকে আগলে রাখব।

আমার বড় ভয় করছে যে দিদিমা।

ভয় তো আমাদেরও করে। উমাপদ মামাকে মনে আছে তোর?

না, আমার কাউকে মনে নেই।

না থাকারই কথা। আমার বড় ছেলে হল উমাপদ। সে ততটা খারাপ নয়, তবে ভাইদের অত্যাচারে সেও তিষ্টোতে পারেনি। স্টেশনের কাছে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। বউটি বিচ্ছু হলেও উমাপদ কিন্তু ভালো। তার কাছে থাকবি?

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, আমি এখানে থাকব না, বাড়ি যাবো।

বাড়িতেও তার আদর নেই বটে, কিন্তু সেখানে অবস্থা এতটা খারাপ নয়। মামাবাড়িতে এসে তার মনে হচ্ছে, তাদের চেয়েও ঢের ঢের খারাপ অবস্থায় লোকে দিব্যি আছে। বাড়ি তার চেনা জায়গা। বাড়িতে আদর না থাক, পাড়াভরতি, স্কুলভরতি তার কত বন্ধু। পালিয়ে থাকার কত জায়গা।

দিদিমা আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই যদি যাবি ভাই, তবে তাই যাস। উমাপদ গিয়ে দিয়ে আসবে-খন। ওদিকে তো আর এক সর্বনাশের কথা শুনছি! জামাইকে মেরে পাটপাট করেছে, পুলিশ আসতে পারে!

বাবার সঙ্গে পিপুলের তেমন ভাবসাব নেই। তেমন টানও নেই বাবার ওপর। তবু একটু কষ্ট হচ্ছিল বাবার জন্য। মামাবাড়িটা যে ভারি বিপদের জায়গা আর কালিমামা যে সাংঘাতিক লোক এটা সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

দিদিমা বাসি রুটি আর গুড় এনে দিল। সকালবেলায় সে রাক্ষুসে খিদে টের পাচ্ছিল। পেট ভরে খেল। শরীরে হাজারো ব্যথা, ভীষণ দুর্বল। খাবারটুকু খেয়ে শরীরে যেন একটু জোর পেল।

দিদিমা সাবধান করে দিয়ে বলল, আমার ওদিকে অনেক কাজ। তোর দাদু গেছে এজমালি পুকুরে, সেখানে আজে মাছের বাঁটোয়ারা হবে। তোর ঘর থেকে বেশি বেরোনোর দরকার নেই। চুপচাপ পড়ে থাক। বিছানায়। ওরা ধরে নেবে তোর এখনও অসুখ।

দিদিমা দরজা ভেজিয়ে চলে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ সত্যিই মটকা মেরে পড়ে রইল পিপুল। কিন্তু সে নিতান্তই বালক। তার পক্ষে এভাবে অসময়ে শুয়ে থাকা তো সম্ভব নয়। সে ছটফট করছে, বার বার উঠে বসছে। পেচ্ছাপ পেয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু কোথায় সেটা করা যায় তা বুঝতে পারছে না।

দিদিমা আর এ ঘরে আসছে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে আর না পেরে ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে এল পিপুল। লম্বা দরদালান হাঁ-হাঁ করছে ফাঁকা। কিন্তু কোনও দিকে কোনও কলঘর নেই। পেচ্ছাপ পাওয়াটাই একটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল পিপুলের কাছে। দরদালানের জানালা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিয়ে সে দিদিমাকে খুঁজল। নীচে বড় উঠোন। কুয়োতলায় দুজন ঝি বাসন মাজছে, একজন লুঙ্গিপরা লোক দাঁতন করছে পেয়ারাতলায় দাঁড়িয়ে। পিছনদিকে গোয়ালঘরের সামনে দুটো গরু মাটির গামলা থেকে জাবনা খাচ্ছে একমনে। দিদিমাকে কোথাও দেখা গেল না।

যে লোকটা দাঁতন করছে সে কে তা জানে না পিপুল। এ তার আর একজন মামা নয় তো! মামাদের বড় ভয় খাচ্ছে সে। পিপুল লক্ষ করল, কুয়োতলার ওধারে একটু জংলা জায়গা আছে। ওখানে পেচ্ছাপ করে আসা যায়। কিন্তু কে কি বলবে কে জানে! ভরসা এই, এখনও বেলা হয়নি। বাড়ির সবাই বোধহয় ঘুম থেকে ওঠেওনি। ক্ষীণ একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কালকের সেই বাচ্চাটাই কি?

পিপুল খুব সাহস করে সিঁড়ি দিয়ে খুব আস্তে আস্তে নামতে লাগল। বুক দুরদুর করছে, গলা শুকিয়ে আসছে। এরকম অদ্ভুত ভয়-ভয় ভাব এর আগে তার কখনও হয়নি। নীচের দরদালানে সিঁড়িটা যেখানে ঘুরে নেমে গেছে সেখানকার চাতালে দাঁড়িয়ে সাবধানে রেলিং-এর ওপর দিয়ে দেখে নিল সে। একজন বউমতো মানুষ একেবারে ওধারে বসে কুটনো কুটছে। বউটি তাকে হয়তো দেখতে পাবে না, কিন্তু উঠোনের দাঁতনওলা লোকটা পাবে।

কিন্তু পিপুলের আর উপায় নেই। সে সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে নেমে দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠোনে নেমে পড়ল। দাঁতনওলা লোকটার দিকে তাকালই না পিপুল। একরকম তার নাকের ডগা দিয়েই একছুটে গিয়ে কচুবনের মধ্যে বসে পড়ল।

ওটা কে রে ঝিকু? একটা হেঁড়ে গলা হেঁকে উঠল।

যারা বাসন মাজছিল তাদের একজন বলল, ওই তো তোমাদের বোনের ছেলে, যাকে নিয়ে কাল অত হাঙ্গামা হল!

কিন্তু এ তো দিব্যি ছুটে গেল দেখছি! শুনলুম যে সাংঘাতিক জ্বর! মা বলছিল?

তা জ্বর হতেই পারে বাপু। যা মার মেরেছো ওকে তোমরা। ওরকম মারের তাড়সে জ্বর হবে না তো কি! ওইটুকু তো ছেলে!

বেশি ফটফট করিস না। কাল আমার ঘরে ঢুকে কী করেছে জানিস?

ঝিকু নামের ঝি-টা একটু সাহসী আর মুখ আলগা। ঝঙ্কার দিয়ে বলল, ওসব বলে কি লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায়? ওটুকু ছেলে খামোখা ঘরে ঢুকে তোমার বাচ্চাকে আছড়াবে কেন? বাচ্চা গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল, ও গিয়ে তুলেছে! তোমরা বাপু দিনকে রাত করতে পারো!

হেঁড়ে গলা বলল, চুপ করবি না কি? আমাদের ব্যাপার আমরা বুঝব!

তোমাদের ব্যাপার আবার কি? ভাগ্নে বলে তাকে মারবে এটাই কি নিয়ম নাকি?

পিপুলের পেচ্ছাপ হয়ে গেছে। সে ভয়ের চোটে কিছুক্ষণ বসে রইল এমনি। কিন্তু বেলাভর তো বসে থাকা যাবে না।

দাঁতনওলা লোকটা এইবার তার উদ্দেশ্যেই একটা হাঁক মারল, এই ছোঁড়া ওখানে কি করছিস, অ্যাঁ?

পিপুল উঠল। ঝিকুর জন্যই তার একটু সাহস হল। ঝিকুটা বোধহয় দজ্জাল। এরা বোধহয় ওকে একটু ভয় খায়।

এদিকে আয় তো! দাঁতনওলা ডাকল।

পিপুল খুব ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা হ্যাঁক থুঃ করে মুখ থেকে খানিকটা দাঁতনের ছিবড়ে ফেলে বলল, তোর নাকি জ্বর?

হ্যাঁ। কাল রাতে খুব জ্বর এসেছিল। আজ সকালে ছেড়েছে।

ঝিকু কুয়োতলা থেকে বলল, ইস মাগো! কী মার মেরেছে দেখ! সারা গায়ে কালশিটে--তোমরা মানুষ না কী গো!

লোকটা খুব কড়া চোখে তাকে দেখছিল। মুখখানাও চোয়াড়ে। যেন জীবনে কখনও হাসেনি। বলল, লম্পট আর মাতালের ছেলে--কত আর ভালো হবি! একটা সত্যি কথা কবুল করবি? তোর মাকে তোর বাবা খুন করেনি?

না, মা তো গলায় দড়ি দিয়েছিল।

সে তো গপ্পো। গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। বল তো সত্যি কিনা?

পিপুলের চোখ জল এল। মা! মা থাকলে দুনিয়াটা কি এরকম হত? এত মারতে, অপমান করতে পারত কেউ?

সত্যি কথা তোর মুখে আসবে না জানি। এবার বল তো, তোর বাবা তোকে কেন এ বাড়িতে ঢুকিয়ে নিজে আড়ালে লুকিয়ে বসেছিল?

ঝিকু বালতিতে জল তুলতে তুলতে বলল, ওসব কথা তুলছ কেন? মশা মারতে তো কামান দেগে বসে আছো! চারদিকে তোমাদের নিয়ে কথা হচ্ছে! ছেলেটাকে মেরেছো, বাপটাকে প্রায় খুন করে ফেলেছো--কোমরে দড়ি পড়ল বলে।

তুই চুপ করবি?

ঝিকু মাঝবয়সি মজবুত চেহারার মহিলা। গায়ের রং ঘোর কালো, দাঁত উঁচু, কপালে আর সিঁথিকে ডগডগে সিঁদুর। হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বলল, আমাকে অত চোখ রাঙিও না। মাসকাবারে চল্লিশটা টাকা দাও বলে মাথা কিনে নাওনি!

এ কথায় লোকটা একটু মিইয়ে গেল যেন। বলল, তুই ঘরে যা। আমি আসছি।

পিপুল ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে ঘরে এসে খাটে বসে রইল। তার দুর্গতি যে কেন শেষ হচ্ছে না তা সে বুঝতে পারছে না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে লোকটা হাতে এক কাপ গরম চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। কাঠের চেয়ারটায় জুত করে বসে বলল, দিদিমার খুব আশকারা পাচ্ছিস, না?

পিপুল কিছু বলল না, চেয়ে রইল।

কাল অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের রাগ এখনও যায়নি।

পিপুল একটু সাহস করে হঠাৎ বলল, আমি তো কিছু করিনি।

আলবাত করেছিস। তোকে দিয়ে তোর বাপ কিছু করাতে চেয়েছিল। নইলে তার এত সাহস হয় না যে এ তল্লাটে আসবে!

সেটা আমার বাবা জানে।

তুইও জানিস। পেট থেকে কথা বার কর ভালো চাইলে।

কে জানে কেন, হঠাৎ পিপুলের একটা সাহস এল। সে হঠাৎ লোকটার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আপনারা আমার বাবাকে কেন মেরেছেন? আমাকে কেন মেরেছেন? মারলেই হল!

লোকটা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। চমকে যাওয়ায় চা-ও খানিক চলকে পড়ল। খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না।

পিপুলের সাংঘাতিক রাগ হল এবার। লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে সে বিকট গলায় বলল, আপনারা ভীষণ খারাপ লোক, খুব খারাপ লোক।

আমরা খারাপ লোক! বলে লোকটা হাঁ করে রইল। তারপর হঠাৎ উঠবার একটা চেষ্টা করে বলল, তবে রে! তোর এত সাহস!

কি হল কে জানে, লোকটা উঠতে গিয়ে প্রথমে চেয়ারটা ফেলল দড়াম করে, তারপর চা সামলাতে গিয়ে নিজেও টাল খেয়ে একেবারে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর। চায়ের কাপ ডিশ ভাঙল ঝনঝন করে। এই কাণ্ড দেখে ঠান্ডা হয়ে গেল পিপুল। সে কিছু করেনি।

লোকটা উঃ আঃ করে কাতর শব্দ করছিল। বিকট শব্দে নীচের তলা থেকে দুটি বউ একজন পুরুষ 'কি হল, কি হল' বলতে বলতে উঠে এল ওপরে। লোকট সেই ভয়ঙ্কর কালিমামা।

লোকটি কোমর ধরে অতিকষ্টে উঠে বসে বলল, ওফ, মাজাটা গেছে।

কালিপদ চোখ পাকিয়ে বলল, এই ছোঁড়া তোকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বুঝি?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, না না, ও ফেলেনি। চেয়ারটা উলটে পড়ে গেল হঠাৎ।

লোকটা দাঁড়িয়ে মাজায় হাত বোলাতে লাগল।

কালিমামা একবার বিষদৃষ্টিতে পিপুলের দিকে চেয়ে নিচে নেমে গেল। বউ দুটোও ভাঙা কাপ ডিশ কুড়িয়ে মেঝের চা ন্যাকড়ায় মুছে নিয়ে চলে যাওয়ার পর চোয়াড়ে লোকটা হঠাৎ পিপুলের দিকে চেয়ে একটু হাসল। ঝকঝকে মজবুত দাঁত, আর হাসলে চোয়াড়ে মুখটাকে বেশ ভালোই দেখায়। লোকটা চেয়ারে বসে বলল, অমন রাগিয়ে দিতে আছে!

পিপুল কথাটার জবাব খুঁজে পেল না।

লোকটা মাঝে মাঝে কাতর শব্দ করছে। তার মধ্যেই বলল, আমি তোর সেজো মামা বুঝলি?

পিপুল ঘাড় নাড়ে--বুঝেছি।

তা এখানেই বুঝি তোর থানা গাড়ার মতলব?

পিপুল মাথা নেড়ে বলে না। আমি বাড়ি যাবো।

হরিপদ তার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বলে, বাড়ি যাবি? তার তো লক্ষণ দেখছি না! মা আর বাবা তো দেখছি নাতি পেয়ে হাতে চাঁদ পেয়েছে।

আমি বাড়ি যাবো।

কেন, এ জায়গাটা কি খারাপ?

আমার ভালো লাগছে না।

হরিপদ এবার বেশ খুশিমনে একখানা হাসি হাসল, ওরে শোন বোকা, তেতো দিয়ে শুরু হলে খাওয়াটা শেষ অবধি ভালোই হয়। উত্তম মধ্যম খেয়ে শুরু করেছিস, তোর বউনি ভালোই হয়েছে। যতটা খারাপ ভাবছিস আমরা ততটা খারাপ নই। মেজদা একটু রগচটা গুণ্ডা লোক বটে। একটু সামলে থাকলেই হল। আমার দুখানা ঘর আছে নীচে, আরামে থাকবি। ইস্কুলে ভরতি করে দেবো-খন। আমার বাচ্চাটাকে একটু রাখবি আর ফাইফরমাশ খাটবি একটু। পারবি না? বাড়ি গিয়ে কোন কচুপোড়া হবে?

পিপুল ছেলেমানুষ হলেও বোকা নয়। সে বুঝল, এ লোক ধড়িবাজ। তাকে বিনি-মাগনা চাকর রাখতে চায়। সে মাথা নেড়ে বলে, থাকলে দিদিমার কাছে থাকব, আর কারও কাছে নয়।

আচ্ছা এখন জিরো, পরে দেখা যাবে।

এই বলে হরিপদ ক্যাকাকে ক্যাকাতে একটু নেংচে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুই

রণেশ নীচের তলার ঘরে বসে ছবি আঁকে। বাঁদিকের জানালা দিয়ে আলো আসে। জানালার পাশে একটু পোড়ো জমি। তার ওপাশে রাস্তা। জানালার ধারে একটা আতা গাছ আছে। আতা গাছ রণেশের খুব প্রিয়। ভারি সুন্দর এ গাছের পাতা। পৃথিবীর দৃশ্যমান যা কিছু সুন্দর তাই তার প্রিয়। সুন্দরের কোনও অভাব পৃথিবীতে মোটেই নেই। চারদিকে মনোযোগী চোখ ফেললে কত সুন্দরের দেখা পাওয়া যায়। রণেশের চোখে স্থায়ী এক রূপমুগ্ধতা আছে।

আজকাল সকালের দিকে জানলার ধারে একটা বাচ্চা ছেলে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ছবি আঁকার সময় কেউ চেয়ে থাকলে রণেশের কাজ এগোতে চায় না, অস্বস্তি হয়। তাই প্রথম দিন 'অ্যাই পালা' বলে ধমকে দিয়েছিল। ছেলেটা কয়েকদিন আসেনি। দিনসাতেক বাদে আবার ছেলেটার কৌতূহলী মুখ জানালার দেখে রণেশ অবাক হয়ে বলল, কি চাস বল তো!

ছবি দেখছি।

ছবি দেখতে ভালো লাগে?

হ্যাঁ।

আঁকতে পারিস?

না তো!

রণেশ সেদিন ছেলেটাকে তাড়াল না, শুধু বলল, জানালার পাল্লার ওদিকটায় সরে দাঁড়া, নইলে তোর ছায়া এসে ছবিতে পড়বে।

ছেলেটা সন্তর্পণে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছবি আঁকা দেখল।

আজকাল প্রায়ই আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তারপর চলে যায়।

ছবি নিয়ে মস্ত জুয়া খেলেছিল রণেশ। চাকরি বা ব্যবসা না করে শুধু ছবি এঁকে সংসার চালানোর ঝুঁকি নিয়েছিল। বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক হওয়া সত্বেও। কিছুদিন খুব কষ্ট গেছে। তবে তার ভাগ্য ভালো, সে নাম করল এবং বাজার পেল অত্যন্ত দ্রুত। কলকাতায় তার নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে, স্টুডিয়ো আছে। তবু কলকাতা থেকে একটু দূরে নিরুপদ্রবে নিরবচ্ছিন্ন ছবি আঁকার জন্য সে এখানে একটা বাড়ি কিনে নিয়েছে। এখানে সে বেশির ভাগ সময়েই একা থাকে, একজন কাজের লোক তার রান্নাবান্না সব করে দেয়। মাঝে মাঝে তার বউ বাচ্চারা আসে এবং কয়েকদিন করে থেকে যায়।

রণেশ কয়েকদিন দেখার পর একদিন ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে, তোর নাম কী?

পিপুল ঘোষ।

কোন বাড়ির ছেলে তুই?

ওই রায় বাড়িতে থাকি। ওটা আমার মামাবাড়ি।

রায় বাড়ি? ওখানে তো খুব গণ্ডগোল হয়েছিল কয়েকদিন আগে, তাই না?

হ্যাঁ।

তোর কে আছে?

শুধু বাবা, দাদু আর কাকা কাকিমা। মা নেই।

ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে?

পারি না যে।

কাল একটা কিছু এঁকে নিয়ে আসিস তো দেখব। একটা কথা বলে দিই, কোনও ছবি দেখে নকল করিস না কিন্তু। যত খারাপ হোক মন থেকে আঁকবি।

পরদিন পিপুল একটা সাদা পাতায় পেনসিলে আঁকা যে ছবিটা নিয়ে এল তা একটা উড়ন্ত কাকের ছবি। বেশ ভালোই এঁকেছে। রণেশ খুশি হয়ে বলে, ছবির নেশা দেখেই বুঝেছি তোর ভেতরে আর্ট আছে। ঘরে আয়। ওধারে চুপটি করে বসে আঁকা দেখ। শব্দ করিস না।

শব্দ করেনি পিপুল। ছবির রাজ্যে কোনও শব্দ নেই, কোলাহল নেই। শুধু রূপের জগৎ খুলে যায় চোখের সামনে। নির্জন শব্দহীন ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে যে খেলাধুলো দুষ্টুমি ভুলে চুপ করে বসে থাকতে পারে এটা একটা সুলক্ষণ। রণেশ ছবি আঁকতে আঁকতে মাঝে মাঝে কফি বানিয়ে খায়, কখনও বা পায়চারি করে, কখনও চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকে। মাঝে মাঝে নিরবচ্ছিন্ন ছবির আঁকায় একটু-আধটু ফাঁক দিতে হয়।

এরকমই একটা ব্রেক নিয়ে আজ রণেশ ছেলেটার মুখোমুখি বসল। ছেলেটি বাচ্চা হলেও এই বয়সেই এর জীবন বেশ ঘটনাবহুল। সব মন দিয়ে শুনল রণেশ। ছেলেটা বড্ড গণ্ডগোলে পড়েছে। বাবা হাসপাতালে, অস্তিত্ব অনিশ্চিত।

রণেশ জিগ্যেস করে, ইস্কুলে ভরতি হোসনি?

উদাস মুখে পিপুল বলে, মামারা কি আর পড়াবে!

পড়াবে না কেন?

আমার এখানে থাকাটাই তো পছন্দ করছে না। তাড়াতে চাইছে।

আমি যদি তোর স্কুলের খরচ দিই?

তাহলে পড়ব।

আরও বলে দিই, যদি ও বাড়ি থেকে তোকে তাড়ায়, তাহলে আমার কাছে এসে থাকতে পারিস। এ বাড়িতে তো জায়গার অভাব নেই।

পিপুল এ কথায় খুশি হল। বলল, আমাকে থাকতে দেবেন? চুরি করব বলে ভয় পাবেন না তো?

রণেশ হাসল, এ বাড়িতে চুরি করার মতো কিছুই থাকে না। একমাত্র রং, তুলি আর ক্যানভাস ছাড়া। আর তোকে চোর বলে মনে হয়নি আমার। ওসব ভাবিস কেন!

পিপুল অবশ্য থাকল না। রণেশ তার স্কুলে ভরতির টাকা দিল আর বই-খাতার খরচ। ছবি আঁকার কিছু সরঞ্জাম দিয়ে বলল, খবরদার, ছবি আঁকতে গিয়ে পড়াশুনোর ফাঁকি দিস না, তাহলে কিন্তু দুটোই যাবে।

*

পিপুলের জীবনে এইভাবে শুরু হল, নানা গণ্ডগোল, কিন্তু থেমে রইল না। রণেশ ছবি আঁকে বলেই বাস্তব জগতের অনেক কিছু মাথায় রাখতে পারে না। কিন্তু পিপুলের মুখ দেখে সে ঠিক বুঝতে পারে কবে এর খাওয়া হয়নি, কবে এ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে বা মারধোর খেয়েছে।

মামাবাড়িতে পিপুলের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। দাদু আর দিদিমা তাকে আগলে রাখে বটে, কিন্তু তারা সব কিছু ঠেকাতে পারে না। মামারা নানাভাবে তাকে উৎখাত করতে চাইছে। বড় কারণ হল, এখনকার আইনে মামাবাড়িতে পিপুলের মায়েরও অংশ আছে। সুতরাং পিপুল যদি একদিন দাবি করে তাহলে বাড়ি আর সম্পত্তির অংশ তাকে দিতে হবে। তাছাড়া আছে তার মা আশালতার বেশ কিছু গয়না। আশালতা গলায় দড়ি দেওয়ার আগে সব গয়না তার মায়ের কাছে গচ্ছিত রেখে যায়। সে খবর মামা-মামিরা জানে। তক্কে তক্কে ছিল সবাই, সে সব গয়না ভাগজোখ করে নেবে। পিপুল মস্ত দাবিদার।

সে আসার পরে মামাবাড়িতে গণ্ডগোল ঝগড়াঝাঁটি অনেক বেড়ে গেছে। সকলেরই লক্ষ্য হল দিদিমা আর দাদু। উপলক্ষ্য পিপুল। দাদু চুপচাপ মানুষ। দিদিমা কিছু বলিয়ে কইয়ে। কিন্তু মামা-মামিদের সমবেত ঝগড়ার সামনে দাঁড়াতে পারবে কেন? ভালোর মধ্যে শুধু পিপুলের গায়ে আর কেউ হাত তোলেনি!

প্রায় ছ মাস বাদে এক সকালে পিপুলের বাবা হরিশ্চন্দ্র ঘোষের একটা হাতচিঠি নিয়ে একজন লোক এল। তাতে লেখা, পত্রপাঠ এই লোকটির সঙ্গে আমার ছেলেকে ফেরত পাঠাবেন। নইলে মামলা করব।

চিঠি নিয়ে আবার হইচই লাগল। মামা-মামিরা পিপুলকে বিদায় করার পক্ষে। দিদিমার মত হল, হাতচিঠি পেয়েই অচেনা মানুষের হাতে নাতিকে ছেড়ে দিতে পারব না। তাতে যা হয় হোক।

কালিমামা লাফাতে লাগল, ছাড়বে না মানে? পরের ছেলে আটকে রেখে জেল খাটব নাকি সবাই?

জেল হলে আমার হবে, তোদের কী? পুলিশ এলে আমাকে ধরিয়ে দিস। এই বলে দিদিমা পিপুলকে কাছে টেনে ধরে রইল, পাছে ওকে কেড়ে নেয় ওরা।

হরিমামা কালিমামার মতো লাফলাফি করে না। সে মিটমিটে মানুষ। খুব মোলায়েম গলায় বলল, এখানেই বা ওকে কোন আদরে রেখেছি আমরা বলো! নিজের বাপের কাছে ওর তবু দাম আছে। যেমনই লোক হোক, ছেলেকে তো আর ফেলবে না।

যে লোকটা চিঠি নিয়ে এসেছে তাকে চেনে না পিপুল। তবে চেহারা দেখে মনে হয়, লোকটা সুবিধের নয়। রোগা, রগ-ওঠা চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখদুটো বেশ লাল। সে প্রথমটায় কথা বলছিল না, এবার এসব শুনে বলল,

কাজটা খুব খারাপ করছেন আপনারা। হরিশ্চন্দ্রকে আপনারা মারধোর করেছেন, তার জন্য খেসারত আছে। আবার ছেলেকে আটকে রাখছেন, এর জন্য দুনো খেসারত!

কালিমামা তিড়িং-বিড়িং করে উঠে বলল, কিসের খেসারত? হরিশ্চন্দ্র যা করেছে তাতে তার ফাঁসি হয়। আমাদের হাতে সে শুধু ঠ্যাঙানি খেয়ে বেঁচে গেছে। আর ছেলে? ছেলেকে তো সে-ই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে। তৈরি ছেলে, চুরি-চামারিতে পাকা হাত। অতি শয়তান।

লোকটা বারান্দায় ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসা, বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে বলল, মারধোর বাবদ পাঁচটি হাজার টাকা গুনে না দিলে হরিশ্চন্দ্র আপনাদের শ্রীঘর ঘোরাবে, এই বলে রাখলুম। এ তল্লাটের মেলা সাক্ষী জোগাড় হয়ে গেছে। পুলিশেও সব জানানো হয়েছে, তবে মোকদ্দমায় না গিয়ে আপসে হয়ে গেলে হরিশ্চন্দ্র ঝামেলা করবে না। ওই পাঁচটি হাজার টাকা আর ছেলের সঙ্গে ওর মায়ের গয়নাগুলোও দেবেন। না হোক বিশ ভরি সোনা, কম কথা তো নয়।

কালি আর হরি এ কথা শুনে এত চেঁচাতে লাগল যে, অন্য কেউ হলে ভয় খেত। এ লোকটা পোক্ত লোক। পাকা বাঁশের মতো পোক্ত। একটুও ঘাবড়াল না। বলল, আমার হাতে টাকাটা না দেন, হরিশ্চন্দ্রর হাতেই দেবেন। সে স্টেশনে লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছে।

তবে রে! বলে কালিপদ তখনই স্টেশনে যাওয়ার জন্য ছুটে বেরোতে যাচ্ছিল।

হরিপদ তাকে আটকাল। বলল, আর ও কাজ করতে যাসনি। এবার বিপদ হবে। বরং দল বেঁধে গিয়ে আপসে কথা বলে আসাই ভালো।

লোকটা মিটিমিটি হাসছিল। বলল, আমাকে আপনারা চেনেন না। আমি হলুম শ্রীপদ মণ্ডল। শ্রীরামপুর শহরে যে কাউকে নামটা একবার বলে দেখবেন, কপালে হাত ঠেকাবে। এটা আমার এলাকা নয় বটে, কিন্তু এ-জায়গাতেও আমার যাতায়াত আছে। রেসো, নন্দু, কোকা সব আমার বন্ধু-মানুষ। আপনারাও নাম শুনে থাকবেন।

নাম সবাই শুনেছে। রেসো, নন্দ আর কোকা এ অঞ্চলের ষণ্ডাগুন্ডা। কালিপদর মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল। কথা ফুটল না মুখে। তবে রাগে কাঁপছিল।

লোকটা তার দিকে চেয়ে বলে, এবার সুবিধে হবে না আপনার!

লোকটা কালিপদর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসিটি বজায় রেখেই বলল, আপনার এখন জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ!

কালিপদ হুংকার দিতে গিয়েছিল, হল না। গলাটা ফেঁসে গিয়ে মিয়োনো আওয়াজ বেরোলো, তার মানে?

পুলিশে যদি কিছু না করে তাহলে আমি করব।

কী করবে?

ঘাড় নামিয়ে দেবো। এই আপনার বাড়িতে বসেই বলে যাচ্ছি, টাকাপয়সা দিয়ে যদি মিটমাট না করেন, গয়না যদি ফেরত না দেন, তাহলে খুব বিপদ হয়ে যাবে।

কালিমামা ফের একটু তড়পানোর চেষ্টা করে বলল, মগের মুলুক পেয়েছো? বাড়ি বয়ে এসে চোখ রাঙানো, অ্যাঁ?

শ্রীপদ মণ্ডল যে আত্মবিশ্বাসী লোক তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল এবার। মগজটি ঠান্ডা, মুখে একটু হাসির ভাব আছেই, কথাবার্তায় তেমন কিছু গরম নেই, গলাটি এবারও তুলল না। বলল, মশাই, আপনার তো কেবল তর্জন-গর্জনই দেখছি। আমি যা বলেছি সেটা একটু ঠান্ডা মাথায় বসে বিবেচনা করুন, তারপর আপনার যা ইচ্ছে করবেন। কিন্তু আমি যা বলি তা কাজেও করি, কখনও নড়চড় হয় না।

এ কথায় কালিমামার মুখে কুলুপ পড়ল। তার জায়গা নিল হরিমামা। বেশ মোলায়েম গলায় হরিমামা বলল, আমার দাদার মাথাটি কিছু গরম, নইলে লোক খুব খারাপ নন। তা হরিশ্চন্দ্র একটা দাঁও মারতে চাইছে তাহলে! বলি কাজটা কি তার উচিত হচ্ছে? শত হলেও জামাই মানুষ, একরকম আত্মীয়ই তো?

শ্রীপদ মণ্ডল ঠান্ডা গলায় বলল, সেটা আপনারা মনে রাখলেই ভালো হয়। আত্মীয় বলেই যদি বিবেচনা হয়ে থাকে তাহলে আত্মীয়কে কেউ লোক জুটিয়ে হাটুরে কিল দিয়ে হাসপাতালে পাঠায় নাকি!

সে যা হয়ে গেছে, গেছেই। মানুষ তো ভুল করেই। তবে কিনা আমাদের বোনটাকে ওভাবে খুন করাটাও তো হরিশ্চন্দ্রের ঠিক কাজ হয়নি।

খুন বলে প্রমাণ করতে পেরেছেন কি?

প্রমাণ করতে পারলে কি আর হাত গুটিয়ে বসে আছি রে ভাই! সে তো আর কাঁচা খুনি নয়। সব দিক বেঁধেছেঁদে কাজটি ফরসা করেছে। সে বাবদে তো তার কাছ থেকে আমরা কানাকড়িটিও চাইনি। চেয়েছি, বলো?

এবার কি চাইতে ইচ্ছে করছে?

হরিপদ একটু হাসল। বলল, আর গয়নাগাঁটি আমাদের কাছে পাচার করবেটা কে? আমার বোনকে তো সে বাপের বাড়িতে আসতেও দিত না। ওই গয়না একটি একটি করে নিয়ে বন্ধক রেখে রোজ ফুর্তি করত। খুনটাও সেই গয়নার বাবদেই কিনা, সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার।

তার মানে আপনারা উপুড়হস্ত হচ্ছেন না?

তোমার সঙ্গে কততে রফা করেছে হরিশ্চন্দ্র?

রফাটফা কিসের মশাই। সে আমার বন্ধু লোক।

হরিপদ ফের হেসে বলে, এটা কলিকাল কিনা, ওসব শুনলে ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। হরিশ্চন্দ্র যদি পাঁচ হাজার পায়, তবে তুমি তা থেকে না হোক আড়াইটি হাজার নেবে।

তাই না?

শ্রীপদ একটা হাই তুলে বলল, হরিশ্চন্দ্র তো স্টেশনেই বসে আছে। কথাবার্তা তার সঙ্গেই গিয়ে বলে আসুন না। জেনে আসুন কার কত বখরা।

বাপু হে, টাকাটা যদি দিই তাহলে গলা বাড়িয়ে নিজের দোষ কবুল করা হয়। আমরাও ফাঁদে পা দিচ্ছি না। তুমি আসতে পারো।

কাজটা বোধহয় ভালো করলেন না মশাই। বলে শ্রীপদ উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, হরিশ্চন্দ্রের ছেলেকে আমি সঙ্গে নিচ্ছি না। ওর দিদিমার বড় মায়া ওর ওপর। তবে আপনারা যদি পৌঁছে দেন কখনও, দেবেন।

এই বলে শ্রীপদ মণ্ডল বেশ দুলকি চালে চলে গেল।

হরিপদর সাহস দেখে সবাই অবাক । সন্ত্রস্ত কালিমামা বার বার বলতে লাগল, কাজটা ঠিক হল না--কাজটা ঠিক হল না। লোকটা মোটেই সুবিধের নয়।

উত্তেজিত কালিমামার হঠাৎ নজর পড়ল পিপুলের দিকে। পিপুল তার দিদিমার গা ঘেঁষে তখনও দরদালানের বাইরের বারান্দামতো জায়গাটায় দাঁড়ানো। কালিমামা পিপুলের ওপর চোখ পড়তেই শক-খাওয়া লোকের মতো লাফিয়ে উঠে বলল, ওই ছোঁড়াই যত নষ্টের গোড়া! আর মায়েরও বলিহারি যাই, একটা অজ্ঞাতকুলশীলকে একেবারে ঘরদোরে বিছানায় অবধি নিয়ে তুলেছে! অ্যাই ছোঁড়া, এখনই বারহ বাড়ি থেকে!

দিদিমা তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। দিয়েই হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, তোকে যে এখন কোথায় রাখি দাদা! আমার মাথাটা বড্ড কেমন-কেমন করছে।

বলতে বলতেই দিদিমা ঢলে পড়ল মেঝের ওপর। পিপুল তাড়াতাড়ি গিয়ে না ধরলে মেঝের ওপর পড়ে মাথাটা ফাটত।

ও দিদিমা! ও দিদিমা! বলে ডাকাডাকি করতে থাকে পিপুল।

দিদিমা একবার চোখ খুলে খুব ক্ষীণ গলায় বলে, বুকে ব্যথা হচ্ছে, তোর দাদুকে ডাক...

পিপুল দিদিমাকে তুলে যে বিছানায় শোয়াবে ততখানি জোর তার শরীরে নেই। তবে বুদ্ধি করে সে মেঝের ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে বালিশ পাতল। তারপর দিদিমাকে গড়িয়ে নিয়ে সে মাদুরের ওপর শোওয়াল।

পিপুল চেঁচামেচি করল না, ঘাবড়েও গেল না। নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরোলো। নীচে অবশ্য চ্যাঁচামেচি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু দরদালানে খুব উত্তেজিত গলা পাওয়া যাচ্ছে কয়েকজনের। একটা লোক বাড়ি বয়ে এসে অপমান করে গেছে, ব্যাপারটা সহজ নয়। পাড়ার লোকজনও কিছু জুটেছে, আরও আসছে।

দাদুকে সিঁড়ির গোড়ায় পেয়ে গেল পিপুল। কানে কানে খবরটা দিতেই দাদু ফ্যাকাসে মুখে উঠে এল ওপরে। দিদিমার নাড়ি ধরেই বলল, গতিক সুবিধের নয়। তুই শিয়রে বসে মাথায় হাওয়া দে।

এক ডোজ হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিদিমার মুখে ঢেলে দিয়ে দাদু বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনল।

তারপর দিদিমাকে নিয়ে পরদিন সকাল অবধি যমে-মানুষে টানাটানি। পিপুলের দিকে কেউ নজর দিল না তেমন।

শেষরাতে পিপুল ঘুমিয়েছিল একটু, যখন চোখ চাইল তখন তার চোখের কোণে জল। ঘুমের মধ্যেও সে কেঁদেছে। বুক বড় ভার। ইহজীবনে এই দিদিমার কাছেই সে আদরের মতো একটা জিনিস পেয়েছিল কয়েকদিন। সেই আদরের দিন কি তবে ফুরোলো?

দিদিমা অবশ্য মরল না। সামলে উঠল।

দুপুরবেলা দিদিমা তাকে ডেকে চুপিচুপি বলল, আমার মনে হয় এ যাত্রা আর খাড়া হবো না। ঋণ রেখে যেতে নেই। ভালো করে শোন। ওই যে উঁচু কাঠের আলমারি দেখছিস, ওর মাথায় রাজ্যের ডাঁই করা বাজে জিনিস আছে। পুরোনো কৌটো, ন্যাকড়ার পুঁটুলি এইসব। খুঁজলে দেখবি ওর মধ্যে একটা পুরোনো বড় কৌটো আছে--তার মধ্যে তোর মায়ের গয়না।

গয়না দিয়ে কি হয় তা পিপুল জানে না। গয়না দামী জিনিস হতে পারে, কিন্তু তার কোনও কাজে লাগবে? সে বলল, আমার গয়না চাই না দিদিমা, তুমি ভালো হয়ে ওঠো।

চাই না বললেই তো হয় না। জিনিসটা তোর। তবে ও নিয়ে বিপদে পড়বি। তোর দাদুকে ডাক, তাকে বলছি।

দাদু কাছেই ছিল, ডেকে আনল পিপুল।

দিদিমা অবসন্ন শরীরে হাঁফধরা গলায় বলল, গয়নার খবর ওকে দিয়েছি। তুমি ওগুলো বেচে ওর একটা ব্যবস্থা করে দিও।

দাদু হতাশ গলায় বলে, কী ব্যবস্থা করতে বলছো?

গয়নাগুলো বিক্রি করে যা টাকা পাবে সেটা ওর নামে ডাকঘরে রাখলে কেমন হয়?

ও তো এখনও ছোট। গার্জিয়ান ছাড়া টাকা তুলতে পারবে না।

তোমরা পুরুষমানুষ, ভেবে একটা কিছু বের করো। ওর কাছে গয়না থাকলে হয় মামারা কিংবা ওর বাবা কেড়ে নেবে।

সে তো বটেই। তুমি অত হাল ছেড়ে দিচ্ছো কেন? মনটা শক্ত করো—বেঁচে উঠবে। ডাক্তার তেমন কোনও ভয় দেখায়নি।

ডাক্তাররা কি বোঝে আমার শরীরের ভিতরে কি হচ্ছে! যদি মরি তাহলে পিপুলের জন্য বড় অস্থির মন নিয়ে যাবো। আমার মনটাকে একটু শান্ত করে দাও।

একটু ঘুমোও। আমারও নানা অশান্তিতে মাথা ভালো কাজ করছে না। তোমাকে সুস্থ করে তুলতে না পারলে আমার অবস্থা কি হবে একবার ভেবে দেখেছো?

দেখেছি। আমি গেলে এ সংসারে তুমি বড় বালাই। কিন্তু কি করব বলো, ভগবানের ওপর তো আমাদের হাত নেই।

ওভাবে বোলো না, আমার বুকের জোর-বল চলে যায়। ডাক্তার তোমাকে বেশি কথা কইতে বারণ করেছে।

কথা কইতে হয় কি সাধে! এই শেষ কথা কটা না বলে নিলেই নয়--ঋণ রেখে মরা কি ভালো?

গয়না কত ভরি আছে?

সে কি আর জানি! কিছু গয়না জামাই ভেঙে খেয়েছে। বাকিগুলো রক্ষা করতে আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। যক্ষের মতো আগলে রেখেছি এতকাল। আর কি পারব? যার ধন তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এইবেলা।

আর কথা বলো না। তোমার হাঁফ ধরে যাচ্ছে। গয়নার বিলিব্যবস্থা করব, চিন্তা কোরো না।

ডাক্তারকে আর ডাকতে হবে না। তুমি নিজেই বরং একটু করে হোমিয়ো ওষুধ দাও। যা হওয়ার তাতেই হবে।

আমারও কি বুদ্ধি কাজ করছে এখন? হোমিয়োপ্যাথি করতে স্থির বুদ্ধি চাই। আমার তো হাত কাঁপছে। ফোঁটা বা বড়ি ফেলতে পারছি না। ওষুধও ঠিক করতে পারছি না।

ওতেই হবে। তুমি যা দেবে তাতেই আমার কাজ হবে।

আচ্ছা, তাই হবে।

দিদিমা চোখ বুজল।

পিপুলের পৃথিবী দিদিমার সঙ্গেই যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারে দিদিমা না বাঁচলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা বড় কঠিন হবে।

দিদিমা ঘুমোলে দাদু তাকে নিয়ে ছাদে এল। পায়চারি করতে করতে বলল, শুধু গয়না নয়, এ বাড়ি বা সম্পত্তিতেও তোর ভাগ আছে।

করুণ গলায় পিপুল বলে, ভাগ চাই না দাদু। এ বাড়িতে আমাকে কেউ দেখতে পারে না। আমি শ্রীরামপুরে ফিরে যাবো।

দাদু মাথা নেড়ে বলে, সে যাস। তবু কথাগুলো তোকে বলে রাখলাম। দিদিমা তোকে বড় ভালোবাসে, এখনই যদি চলে যাস তবে বুড়ি বোধহয় হার্টফেল করবে। এখন কয়েকটা দিন কষ্ট করে থাক, তোর দিদিমা একটু সুস্থ হলে আমি নিজে গিয়ে তোকে শ্রীরামপুর স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে আসব।

এ প্রস্তাবে আপত্তি নেই পিপুলের । দিদিমা আর দাদুকে ছেড়ে যেতে তার যে খুব ইচ্ছে করছে তাও নয়। কিন্তু এ বাড়িতে তো থাকাও যায় না। বড় অশান্তি তাকে নিয়ে।

দিদিমা অবশ্য বেঁচে রইল। মরতে মরতেও শেষ অবধি মরল না। পরদিন সকালবেলায় একটুক্ষণের জন্য উঠেও বসল এবং একটু দুধ খেল। ডাক্তার এসে দেখেটেখে বলল, হার্ট অ্যাটাক বলে ভেবেছিলাম। লক্ষণও তাই ছিল। তবে বোধহয় সিরিয়াস কিছু নয়। অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে।

দাদু একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বাঁচালে ডাক্তার। লক্ষণ দেখে আমার তো হাত-পা হিম হয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার প্রেসারের যন্ত্র আর স্টেথস্কোপ গুছিয়ে ফেলে বলল, আপনাদের বাড়িতে কী একটা হাঙ্গামা হয়েছিল কাল, তাই না? ওরকম কিছু আবার হলে কিন্তু অ্যাটাকটা রেকার করবে। কোনওরকম উত্তেজনা একদম বারণ।

আর ওরকম হবে বলে মনে হয় না।

তবু সাবধানে রাখবেন।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর দাদু দিদিমাকে বলল, নীচে শুনে এলাম, কাল রাতে নাকি স্টেশনে গিয়ে হরিপদ আর পাড়ার মাতব্বররা হরিশ্চন্দ্রে হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মিটমাট করে এসেছে।

দিল?

না দিয়ে উপায় কি? জামাই যা একখানা খুনে ঠ্যাঙাড়েকে পাঠিয়েছিল, ভয়ে সবাই জল! দুনিয়াটা হল শক্তের ভক্ত আর নরমের যম।

টাকাটা দিল কে?

কালিপদকেই দিতে হয়েছে। মারধরে সে-ই তো পাণ্ডা ছিল কিনা, তবে ভয়ে সে নিজে যায়নি। হরিপদ এসে নাকি বলেছে যে, জামাই আর তার দলবল সব স্টেশনেই মাইফেল বসিয়ে ফেলেছিল। সব নাকি মদে চুর। টাকা পেয়ে জামাই নাকি হরিপদর থুতনি নেড়ে চুমু খেয়ে বলেছে, যাও তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। আমার ছেলেটাকেও তোমাদের দান করে দিলাম। তার অযত্ন কোরো না, তাহলে ফের হাঙ্গামায় পড়ে যাবে।

দিদিমা চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সবই আমার কপাল। তবু নাতিটাকে তো রাখতে পারব। সেটাই আমার ঢের।

দেখ কতদিন রাখতে পারো টাকাপয়সা দিয়ে আপসরফার ফল ভালো হয় না। টাকায় টান পড়লে জামাই ফের আসবে। ব্ল্যাকমেল বোঝো? এ হচ্ছে সেই ব্ল্যাকমেল!

কালি তার পাপের শাস্তি পাচ্ছে। আমরা কী করব বলো।

তিন

রণেশের সঙ্গে পিপুলের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠতে লাগল ছবি নিয়েই। ইস্কুল আর পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে রণেশের কাছে চলে আসে। ড্রয়িং শেখে, রঙের সঙ্গে রং মেশাতে শেখে, ক্যানভাসে তুলি চালাতে শেখে। রণেশ তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, খেলাধুলো করিস?

একটু-আধটু।

দূর বোকা! একটু-আধটু করলে হয় না। রীতিমতো শরীরচর্চা করতে হয়। আর্টিস্টের বেসিক স্বাস্থ্য হওয়া দরকার চমৎকার। স্বাস্থ্য ভালো হলে অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কাজ করতে পারবি, হাতে বা ঘাড়ে যন্ত্রণা হবে না, পিঠ টনটন করবে না। আরও কথা আছে। শিল্প হল বসে বসে কাজ। ব্যায়ামট্যায়াম না করলে ব্লাড-সুগার হয়ে যেতে পারে। দেখিসনি দ্য ভিঞ্চি বা পিকাসোর কেমন স্বাস্থ্য ছিল! দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তো কুস্তিগীর ছিলেন। ভালো আর্টিস্ট হতে হলে কোনও ব্যায়ামাগারে ভরতি হয়ে শরীরটাকে ঠিক কর।

আর্টিস্ট হওয়ার জন্য পিপুল সবকিছু করতে রাজি। রণেশের কথায় সে একটা ব্যায়ামাগারে ভরতি হয়ে গেল। অখণ্ড মনোযোগে ব্যায়াম করতে লাগল।

মামাবাড়িতে শান্তি নেই, কিন্তু গোটা বাড়ি এক দিকে আর দাদু দিদিমা ও পিপুল আর এক দিকে হওয়ায় সম্পর্কটা কম। মাঝখানে একটা গোলযোগ হয়ে গেল। মামারা এক বাড়িতেই হাঁড়ি ভাগাভাগি করে নিল। আর সেই গণ্ডগোলে দাদু আর দিদিমাও মূল সংসার থেকে বাদ পড়ে গেল। দিদিমা দোতলার দরদালানে উনুন পেতে আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করে নিল। পিপুল যে রয়ে যেতে পারল, সেটাই বড় কথা।

পিপুল অখণ্ড মনোযোগে পড়ে, একই মনোযোগে ব্যায়াম করে এবং ছবিও আঁকে। সে একটু একটু বুঝতে পারে, এ দুনিয়ায় তাকে ঠেকনো দেওয়ার মতো আপজনের বড়ই অভাব। দাদু আর দিদিমা তাকে যক্ষীর মতো আগলে থাকে বটে, কিন্তু তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। বাবা মাতাল এবং কাকা আর কাকিমার সংসারে তার অবস্থান অনিশ্চিত। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে একটু বড় হতে হবে। বড় না হলে এ দুনিয়াটার সঙ্গে যুঝতে পারবে না সে।

ইস্কুলে তার অনেক বন্ধু জুটে গেল! পাড়ায় জুটল। অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাজানা হল। যে লোকটা তাকে কালিমামার হাত থেকে প্রথম রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল সেই গৌর মিত্তিরের সঙ্গে তার দারুণ ভাব হয়ে গেল। কারণ গৌর মিত্তিরের আখড়াতেই সে ব্যায়াম শেখে। বাঘা চেহারা, দারুণ দাপট, প্রবল অহংকার। পিপুলের বুকে একটা প্রবল থাবড়া কষিয়ে একদিন বলল, শুধু চেহারা বাগালেই হবে না, ওতে

শরীর-সর্বস্ব হয়ে পড়বি। শুধু শরীর-শরীর করে স্বার্থপর, ভীতু আর বোকা হয়ে যাবি। সঙ্গে সাহস, স্বার্থত্যাগ এসবও চাই।

পিপুল করুণ গলায় বলে, ওসবের জন্যও কি আখড়া আছে?

গৌর হাঃ হাঃ করে খুব হাসল। বলল, তুই বেশ ত্যাঁদড় আছিস তো! বোকা তো নোস দেখছি! ব্যায়ামবীরদের বড় একটা সেন্স অফ হিউমার থাকে না--তোর আছে। খুব খুশি হলুম রে।

পিপুলও খুশি হয়ে বলে, আমি ওরকম মোটেই হতে চাই না। আমি ছবি আঁকব বলেই ব্যায়াম করছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ছবি আঁকাও খুব ভালো। গান গাইতে পারসি?

জানি না। কখনও গাইনি।

শুনতে ভালোবাসিস?

হ্যাঁ।

তাহলেই হবে। একখানা গা দেখি।

সন্ধের পর ব্যায়ামাগাার প্রায় ফাঁকা। শরৎকালে সন্ধের পর একটু হিম পড়ছে। আদুর গায়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে বেঞ্চের ওপর বসা গৌর মিত্তিরকে দেখলে বোম্বেটে বলে মনে হলেও লোকটা মোটেই ওরকম নয়। কিছুক্ষণ পিপুলকে অনুরোধ উপরোধ করেও যখন গাওয়াতে পারল না, তখন নিজেই খোলা গলায় একখানা রাগাশ্রয়ী শ্যামাসংগীত ধরে ফেলল গৌর মিত্তির। গাইতে গাইতে চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল।

পিপুল মুগ্ধ। বলল, আমাকে গান শেখাবেন?

শেখাবো। তবে সবকিছু একসঙ্গে করতে যাস না--সব পণ্ড হবে। কোনটা বেশি ভালো লাগে সেটা ভালো করে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখিস। যেটা বেশি ভালো লাগবে সেটাতেই জান লড়িয়ে দিবি।

পিপুলের জীবন শুরু হল ছবি, গান, শরীরচর্চা দিয়ে। জীবনের স্বাদ সে এই প্রথম পাচ্ছে। ছুটছাট গণ্ডগোল মামাবাড়িতে লেগেই আছে বটে, কিন্তু পিপুল আর গ্রাহ্য করে না।

দিদিমা একদিন বলল, হ্যাঁ রে দাদা, তুই যে বেশ জোয়ানটি হয়ে উঠলি! এই তো ছোট্টটি এসে হাজির হয়েছিলি গুটিগুটি!

সে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, খুব খাওয়াচ্ছো যে! পেটভরে এতকাল কি খেতে পেতুম?

আর একদিন আরও মজার একটা ঘটনা ঘটল। সন্ধেবেলা ব্যায়ামাগার থেকে ফিরছিল পিপুল। বিকেলের আলো তখনও একটু আছে। বাড়ির সামনের পুকুরের ধারে কদম গাছের তলায় একজন লোক বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। পিপুল তাকে এক লহমায় চিনতে

পারল। তার বাবা হরিশ্চন্দ্র। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, তার বাবা তাকে একদম চিনতে পারল না। বরং তাকে দেখে বলল, তুমি ও বাড়িতে যাচ্ছো ভাই?

পিপুল বাবাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। প্রশ্ন শুনে হাঁ হয়ে গেল। বলল, হ্যাঁ তো, কিন্তু...

আমাকে চিনবে না। ও বাড়িতে একটি ছোটো ছেলে আছে, তার নাম পিপুল—একটু ডেকে দেবে তাকে?

পিপুল এত অবাক হল যে বলবার নয়। কিন্তু সে একটু বাজিয়ে নেওয়ার লোভও সামলাতে পারল না। বলল, আপনি পিপুলের কে হন?

হরিশ্চন্দ্রের চেহারা অনেক ভেঙে গেছে। দু-গাল গর্তে, চোখ ডেবে গেছে। জামা-কাপড়ের অবস্থাও ভালো নয়। হরিশ্চন্দ্র যে কিছু একটা মতলবে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। হরিশ্চন্দ্র বলল, বিশেষ কিছু হই না--দেশের লোক আর কি!

পিপুল তার বাবার কথা খুব জিজ্ঞেস করে, আপনি কি তার বাবার কাছ থেকে আসছেন?

হ্যাঁ, ওরকমই।

আপনি কি তাকে নিয়ে যেতে চান?

হরিশ্চন্দ্র মলিন মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। কোথায় নেবো? আমার জায়গা নেই!

পিপুলকে কিছু বলতে চান?

হরিশ্চন্দ্র ইতস্তত করে বলে, একটা দুটো কথা ছিল। তা তাকে কি পাওয়া যাবে এখন?

যান না, ভিতরে চলে যান। দোতলায় থাকে।

হরিশ্চন্দ্রের সে সাহস হল না। জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, ভিতরে আর যাবো না, এখানে দাঁড়িয়েই দুটো কথা কয়ে নেবো। সময় লাগবে না।

বাবার প্রতি পিপুলের তেমন কোনও আকর্ষণ কোনও দিনই ছিল না। বাবার জন্যই তার মা আত্মহত্যা করেছে। এই বাবার জন্যই সে নিজেদের বাড়িতে শতেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। এই বাবাই তাকে মামাবাড়িতে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল গয়নার লোভে। সুতরাং বাবার ওপর তার খুশি হওয়ার কারণ নেই।

সে বলল, কেন, ভিতরে যাবেন না কেন?

হরিশ্চন্দ্র থুতনি চুলকে বলল, না আমার জামাকাপড় তো ভালো নয়। এ পোশাকে কি আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া যায়!

শ্বশুরবাড়ি কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। পিপুল হেসে ফেলল, বলল, এটা আপনার শ্বশুরবাড়ি নাকি?

হরিশ্চন্দ্র জিব কেটে বলল, না, ঠিক তা নয়। অনেক দূর-সম্পর্কের একটা ব্যাপার ছিল তো, তাই।

পিপুল নাটকটা আর বাড়াতে দিল না। একটু হেসে বলল, এতগুলো মিথ্যে কথা কেন বলছ বাবা? আমিই পিপুল!

এবার হরিশ্চন্দ্রের সত্যিকারের হাঁ হওয়ার পালা। এমন হাঁ করে রইল যেন ভূত দেখেছে। অনেকক্ষণ কথাই কইতে পারল না। তারপর বেশ ঘাবড়ানো গলায় বলল, তুই! সত্যিই তুই নাকি!

আমিই।

বয়ঃসন্ধির বাড়টা একটু তাড়াতাড়ি ঘটে। সেটা খেয়াল ছিল না হরিশচন্দ্রের। তাছাড়া রোগাভোগা এই পিপুল তো আর নেই। দুবেলা তার খাওয়া জোটে। সে ব্যায়াম করে, খেলে, গান গায়।

হরিশ্চন্দ্রের বিস্ময়টা কাটতে সময় লাগল। তারপর বলল, আমি তোর কাছেই এসেছি। একটু কথা আছে।

কি কথা?

ওদিকপানে চল। আড়াল হলে ভালো হয়।

অপেক্ষাকৃত একটু নির্জন জায়গায় এসে হরিশচন্দ্র ছেলের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁরে, গয়নাগুলোর হদিস করতে পারলি?

কীসের গয়না?

দূর আহাম্মক! গয়নার জন্যই তো তোকে এখানে এনে হাজির করেছিলাম! তোর মায়ের গয়না--তোর দিদিমার কাছে গচ্ছিত আছে!

মায়ের গয়না? কেন, তুমি তা দিয়ে কী করবে?

হরিশ্চন্দ্র অতিশয় করুণ গলায় বলে, আমার চিকিৎসার জন্য টাকা চাই। ঘরে একটি পয়সাও নেই। বাড়িতে নানা গণ্ডগোল, সেখানেও বেশিদিন থাকা যাবে না। বউ-বাচ্চা নিয়ে এখন কোথায় যাই বল!

এটা হরিশ্চন্দ্রের দ্বিতীয় ভুল। সে যে বিয়ে করেছে এবং বাচ্চাও হয়েছে এ খবর মামাবাড়িতে এখনও পৌঁছয়নি। হরিশ্চন্দ্র না বললে পিপুল জানতেও পারত না।

পিপুল জিজ্ঞেস করে, তুমি আবার বিয়ে করেছো নাকি?

হরিশ্চন্দ্র ফের জিব কেটে ভারি অস্বস্তির সঙ্গে মুখটা নামিয়ে বলল, কি করব, সবাই ধরে-বেঁধে দিয়ে দিল। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না।

কবে করলে?

তুই চলে এলি--তা বছর তিনকে হবে না?

চার বছর।

এই তিন বছর হল, বন্ধু-বান্ধবরা ধরে পড়ায় বিয়েটা করতে হল।

পিপুল বড্ড রেগে গেল লোকটার ওপর। তার ইচ্ছে হল, ধাঁই করে লোকটার নাকে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দেয়। কিন্তু বাপ বলে কথা, ইচ্ছেটা দমন করে সে বলল, তুমি আমার মায়ের গয়না চাইতে এসেছো কেন? ও গয়না তো তোমার নয়?

হরিশ্চন্দ্র একটু খিঁচিয়ে উঠে বলে, আমার নয় তোর কার? বিয়ের সময়ে পঁচিশ ভরি গয়না কড়ার করে বিয়ে হয়েছিল। বউয়ের গয়নার হক তার স্বামীর!

তাহলে গিয়ে নিজেই চেয়ে নাও?

হরিশ্চন্দ্র মিইয়ে গিয়ে বলে, আমাকে দিতে চাইবে না।

দিদিমার কাছে শুনেছি, তুমি মায়ের কিছু গয়না বেচে দিয়েছো!

হরিশচন্দ্র মাথা নেড়ে বলে, ওরে না না, ওটা বাড়িয়ে বলেছে। আসলে অভাবের সংসারে কতরকম টানাটানি থাকে। তুই যখন ছোটো ছিলি, তখন বোধহয় দুধ জোটাতে না পেরে একদিন একটা আংটি না কি যেন দিয়ে বন্ধক দিই। তা সে ফের ছাড়িয়েও এনেছি।

তোমার হাত থেকে গয়নাগুলো বাঁচাতে মা সেগুলো দিদিমার কাছে রেখে গিয়েছিল।

হরিশ্চন্দ্র সাগ্রহে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্বীকার করেছে তাহলে? তা কোথায় রেখেছে সেসব?

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, তা আমি জানি না।

হরিশ্চন্দ্রের চোখ জুলজুল করছিল লোভে। বলল, চারদিকে নজর রেখেছিলি! নাকি আদরে-আল্হাদে একেবারে ভোম্বল হয়ে আছিস?

আমার তো গয়নার খোঁজে দরকার নেই।

আহা, তোর দরকারের কথা ওঠে কিসে? আইনত ন্যায্যত গয়না হল আমার সম্পত্তি। তোর দিদিমাকে ইচ্ছে করলে আমি জেলে পাঠাতে পারি, তা জানিস?

পিপুল এই অদ্ভুত লোকটাকে হাঁ করে দেখছিল। তার দিদিমা এত অত্যাচার, প্রতিবাদ, গঞ্জনা সয়ে তাকে আগলে রেখেছিল বলে সে আজও বেঁচে আছে। সেই দিদিমাকে এ লোকটা জেল খাটাতে চায়!

সে এবার নাবালক থেকে সাবালক হয়ে বেশ ধমকের গলায় বলল, দিদিমা তোমার গুরুজন না?

এঃ গুরুজন! গুন্ডা লাগিয়ে যখন আমাকে মার দিয়েছিল তখন গুরুজন কোথায় ছিল বাবা!

দিদিমা মোটেই গুন্ডা লাগায়নি।

সব শেয়ালের এক রা। এদের হাড়ে হাড়ে চিনি কিনা। এখন শোন, আমি সামনের শুক্কুরবার আবার আসব। চারদিক আঁতিপাঁতি করে দেখে রাখবি। আর দিদিমার সঙ্গে নানা কথাবার্তার ফাঁকে সুলুকসন্ধান জেনে নিবি। বোকা হয়ে থাকিস না, বুঝলি?

ও গয়না আমি বড় হলে আমাকে দেবে দিদিমা।

হরিশ্চন্দ্র একগাল হেসে বলে, ওরে আমিও তো সেটাই চাই। আমার কাছে থাকলে তোরই থাকল। দিদিমা বুড়ো মানুষ, কবে মরে-টরে যায়। তার আগেই ওগুলো হাত করা দরকার। যদি সন্ধানটাও জানতে পারিস, তাহলে আমি লোক লাগিয়ে হলেও ঠিক জিনিসটা উদ্ধার করব।

চুরি করবে?

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয় রে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। অন্যের জিনিস গাপ করে বসে আছে, চোর তো তোর দিদিমাই। আমার জিনিস আমি ফেরত নিলে কি চুরি করা হয়!

পিপুল খুব রেগে যাচ্ছিল। বলল, তুমি খুব খারাপ লোক।

খারাপ লোক! কেন, খারাপটা কী দেখলি শুনি? আজ আমার অবস্থা পড়ে গেছে, সবাই অচ্ছেদা করে বলে তুইও করবি? তুই না আমার ছেলে?

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, তুমি খারাপ লোক। সবাই বলে তুমি আমার মাকে খুন করেছো। তুমি মদ খেয়ে মাতলামি করো।

হরিশ্চন্দ্র আগের হরিশ্চন্দ্র হলে এবং পিপুল চারবছর আগেকার পিপুল হলে এই সময়ে পিপুলের গালে চড়-থাপ্পড় পড়তে পারত। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, দুর্বল। সে ধান্ধাবাজ ও লোভী। সেইজন্য এতটা উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আর তার নেই। সে ছেলের সঙ্গে এঁটে উঠবে না এটা আন্দাজ করেই নিজের রাগ সামলে নিয়ে মিঠে গলায় বলল, তুই তো দেখিসনি, তোর কালিমামা লোক জুটিয়ে নিয়ে গিয়ে কী মারটাই না মেরেছিল আমাকে। সর্বাঙ্গে হাজারটা ক্ষত। বাঁ চোখটা ভগবানের দয়ায় বেঁচে গিয়েছিল, নইলে কানা হয়ে যাওয়ার কথা। তোর বাপকে মারল, আর তুই ওদের পক্ষ নিয়েই কথা বলছিস! আমি ভালো বাবা না হতে পারি, কিন্তু বাবা তো!

তাতে কী হল? তুমি তো আমার খোঁজও নাওনি?

কেন, আমি শ্রীপদকে পাঠাইনি চিঠি দিয়ে তোকে নিয়ে যেতে? তোর দিদিমাই তো তোকে আটকে রেখেছিল।

দিদিমা তো ভালোই করেছিল। শ্রীরামপুরে গিয়ে কি হত? সবাই মিলে মারধর করে, খেতে-পরতে দেয় না, সব সময়ে গালাগাল করে।

ছেলেপুলেকে শাসন সবাই করে--ওটা ধরতে নেই।

গত চার বছরে তুমি তো আর আমার খোঁজ নাওনি!

হরিশচন্দ্র মৃদু মৃদু হেসে বলল, খোঁজ নিইনি কে বলল? এখানে আমার মেলা চর আছে। তারা ঠিক খবর দিত। তবে নিজে আসতাম না অপমানের ভয়ে। তাছাড়া তোকে

নিয়ে গিয়ে সৎমার হাতে ফেলতেও ইচ্ছে যায়নি। এ মাগিও বড্ড বদরাগী। তা তুই কি রেগে আছিস আমার ওপর বাবা?

পিপুলের চোখে জল আসছিল। বাবাকে সে ভালোবাসে না তেমন, তবু এই ভাঙাচোরা লোকটাকে দেখে তার কষ্ট হয়। মিথ্যেবাদী, পাজি, নিষ্ঠুর, মমতাহীন, মাতাল, স্বার্থপর এ লোকটা তার বাবা নাহলে সে হয়তো খুশি হত। কিন্তু এ লোকটাকে একেবারে মুছেও তো সে ফেলতে পারেনি।

পিপুল বলল, বাবা বাড়ি যাও। মায়ের গয়না দিদিমা লুকিয়ে রেখেছে, কেউ তা খুঁজে বের করতে পারবে না।

হরিশ্চন্দ্র এবার তেড়িয়া হয়ে বলে, এঃ লুকিয়ে রাখলেই হল? দেশে আইন নেই? পুলিশ নেই?

পিপুল বলল, অত সব আমি জানি না। গয়না দিদিমা তোমাকে দেবে না।

তাহলে তুই আমার সঙ্গে চল!

কেন যাবো?

তুই গেলে ওই বুড়ি নরম হয়ে পড়বে। নাতির মায়া বড় মায়া। সুড়সুড় করে গয়না বের করে দেবে তখন।

আমি শ্রীরামপুরে যাবো না।

আহা, বেশি দিনের জন্য বলছি না। সাতটা দিন একটু থেকে আসবি চল, তার মধ্যেই আমি বুড়িকে পটিয়ে মাল বের করে নেবো।

পিপুল মাথা নেড়ে বলল, না বাবা, তুমি বাড়ি যাও। আমি তোমার সঙ্গে যাবো না, দিদিমার কাছেই থাকব।

আজ বুঝি আমার চেয়েও দিদিমা তোর আপন হল! আমি যে ওদিকে না খেয়ে মরছি!

তুমি তো চাকরি করো।

সে চাকরি কবে চলে গেছে।

কালিমামা তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল না?

সেসব কবে ফুঁকে দিয়েছি। পাঁচ হাজারের অর্ধেকই তো গুণ্ডাটা কেড়ে নিল। কটা টাকাই বা পেয়েছিলাম। দে বাবা এ যাত্রাটা উদ্ধার করে।

আমি তো গয়নার খবর জানি না--আমি পারব না।

হরিশ্চন্দ্র খুবই হতাশ হল। গয়নাগুলোই ছিল তার শেষ আশাভরসা। সে উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থেকে কাহিল গলায় বলল, তাহলে একটা কাজ করবি বাবা?

কি কাজ?

তোর দিদিমাকে গিয়ে বল গে, আমার অবস্থা এখন-তখন। দুশোটা টাকা চাই। না, দাঁড়া--দুশো নয়, চাইলে একটু বেশিই চাইতে হয়, কষাকষি করে ওই দুশোই দেবে--তুই পাঁচশো চাস।

শোনো বাবা, তুমি আবার এসেছ শুনলে এবার কিন্তু মামারা তোমাকে ছাড়বে না। সবাই খুব রেগে আছে তোমার ওপর।

হরিশ্চন্দ্র কেমন ক্যাবলাকান্তের মতো ছেলের দিকে চেয়ে ছিল। কথাটা যেন বুঝতে পারল না। বলল, টাকাটা এনে দিলেই চলে যাবো। তোর দিদিমার অনেক টাকা। দিদিমা যদি না দিতে চায়, দাদুকে বলিস। শ্বশুরটা খুব কেপ্পন ছিল বলে তার কাছে চাইতে ইচ্ছে যায় না। তবে শাশুড়িটা খুব খারাপ ছিল না। শালা-সম্বন্ধীরা ছিল এক নম্বরের খচ্চর। যা বাবা, ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আয়। নাহলে বেঘোরে মারা পড়ব।

পিপুল শেষ অবধি গিয়েছিল দিদিমার কাছে। সব কথা খুলে বলেছিল।

দিদিমার মনটা বড় নরম। জামাইয়ের অবস্থা শুনে চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে। বলে, কিছু চাইছে বোধহয়?

প্রথমে দুশো টাকা চেয়েছিল। পরে বলল, পাঁচশো। বলল, কষাকষি করে ওই দুশোই দেবে।

দিদিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তার চরিত্র ভাল নয়, আবার বিয়ে করে আর একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে। সংসারে টান পড়ায় এসে হাজির হয়েছে। টাকা কিছু দিতে পারি, তবে ভয় হয় টাকা নিয়ে গিয়ে মদ গিলে পড়ে থাকবে হয়তো।

তাহলে বলে দিই যে হবে না!

না, একেবারে শুধু হাতে ফেরানোর দরকার নেই। পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি, দিয়ে আয় গে, বলিস যেন মদটদ না খায়।

পিপুল অবাক হয়ে বলল, দেবে?

যদি কষ্ট পায়!

বাবাকে আমি চিনি দিদিমা, টাকা পেলেই মদ খাবে।

তা কপালে কষ্ট লেখা থাকলে আর কী করা যাবে! যা, দিয়ে আয়।

পিপুল পঞ্চাশটা টাকা এনে দিলে। হরিশ্চন্দ্র পাওনাগণ্ডা বুঝে নেওয়ার মতো স্বাভাবিক ভাবেই টাকাটা পকেটে রাখল। যেন হক্কের টাকা। বলল, এ বাজারে পঞ্চাশে কিছু হয়? তোর দিদিমার নজরটা বড় ছোট। আমি আজ যাচ্ছি--ফের আসব সামনের হপ্তায়। এর মধ্যে গয়নাগুলোর একটা খোঁজখবর করে রাখিস।

চার

রণেশের সঙ্গে তার বউয়ের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। তার একটা মস্ত কারণ একটা মেয়ে। আর্ট কলেজের এই ছাত্রীটি রণেশের সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে একটা বিশেষ কারণে। মেয়েটির বাবা প্রভাবশালী লোক। তাঁর সহায়তায় রণেশ প্যারিসে একটা এক বছরের বৃত্তি পায় এবং বিদেশে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়। রণেশ যখন বিদেশে যায় তখন মেয়েটাও আগেভাগে গিয়ে প্যারিসে বসে আছে। শোনা যায়, সেখানেই তাদের মেলামেশা মাত্রা ছাড়াতে শুরু করে। রণেশ প্যারিসে থাকে এক বছর। এক বছরে মেয়েটি অন্তত তিনবার প্যারিসে যায়।

এসব খবর চাপা থাকে না। পল্লবিত হয়ে এদেশেও এসে পৌঁছোয়। রণেশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং তৎসহ পয়সা বেড়েছে। পোশাক বদলেছে। সবচেয়ে বেশি বদলেছে মেজাজ। রণেশ চল্লিশোর্ধ্ব। এ বয়সে কাঁচা মেয়ের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা যেমন রোমাঞ্চক তেমনি বিপজ্জনক।

রণেশ যখন প্যারিসে তখন পিপুল রণেশের স্টুডিয়ো দেখেশুনে রাখত। রণেশের রং তুলি নিয়ে ক্যানভাসে ইচ্ছেমতো ছবিও আঁকত। রণেশ তাকে সে অধিকার দিয়েই গেছে।

এক বরিবার রণেশের স্টুডিয়োতে বসে সকালের আলোয় ছবি আঁকছিল পিপুল, এমন সময় দরজার কড়া নড়ল। দরজা খুলে পিপুল দেখে, রণেশের পুরুষালী কুচ্ছিত বউ ধারাশ্রী দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রমহিলা একটু কঞ্জুস এবং খিটখিটে। কণ্ঠস্বরে মিষ্টতা নেই। সম্ভবত বউয়ের জন্যই রণেশ আলাদা থাকত। পিপুলও ধারাশ্রীকে তেমন পছন্দ করে উঠতে পারেনি কখনও।

কিন্তু এই সকালে ধারাশ্রীর মুখচোখের ভাব অন্য রকম। ভীষণ অসহায়, বিবর্ণ, কাঁদো-কাঁদো।

পিপুল একটু অবাক হয়েই বলল, আসুন কাকিমা।

ধারাশ্রী ভিতরে এলে। চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে গা এলিয়ে হাঁফ ছাড়ল কিছুক্ষণ। ধারাশ্রী কদাচিৎ এখানে আসে। আসবার দরকারই হয় না। কলকাতায় তাদের নিজস্ব চমৎকার একখানা বাড়ি আছে। ছেলেমেয়েরা ভালো ইস্কুলে পড়ে। গাড়ি কেনা হয়েছে সম্প্রতি।

ধারাশ্রী হঠাৎ জিগ্যেস করল, তুমি রণিতা বলে কোনও মেয়েকে চেনো?

পিপুল অবাক হয়ে বলে, রণিতা চৌধুরী? হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছিল।

এখানে আসত?

দুবার এসেছিল।

দুবার? এসে কি রাত কাটিয়েছে?

পিপুল তটস্থ হয়ে বলে, না। রণেশকাকার সঙ্গে ছবি নিয়ে কিসব কথাবার্তা হচ্ছিল। দুবারই বিকেলের ট্রেনে ফিরে গেছে।

ঠিক জানো? নাকি লুকোচ্ছো?

না, আমি জানি। রণিতাদিকে আমি নিজেই ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছি।

ধারাশ্রী হঠাৎ বলল, ওদের সম্পর্কটা কিরকম তা কি তুমি জানো?

না তো! কী জানব?

আমি কিছু জানি না।

রণেশ যে রণিতাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে তা জানো?

হতভম্ব পিপুল বলে, না তো!

তুমি খুব সেয়ানা ছেলে, তাই না? সব জেনেও বোকাটি সেজে আছে। রণিতা আর রণেশের বৃন্দাবন ছিল এইখানে। তুমি রণেশের শাগরেদ, তোমার না জানার কথা নয়।

পিপুল বিপদে পড়ে বলল, আমি কিছুই জানি না।

জানলেও বলবে না। তুমিই না ওই রায়বাড়ির ভাগ্নে! তোমার বাবা তো শুনেছি মাতাল আর লম্পট। তুমি তো চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা হবেই।

পিপুল এখন কলেজে পড়ে, দাড়ি কামায় এবং একটা ছোটখাটো দলের সরদারি করে। এ তল্লাটে তার একটা নামডাক আছে। ছেলেবেলয়ে যা হয়েছে হয়ে গেছে। কিন্তু এখন কেউ তাকে এত সরাসরি অপমান করতে সাহস পায় না। তার আত্মমর্যাদাজ্ঞান খুব টনটনে। রণেশের বউ বলে সে এতক্ষণ কিছু বলতে দ্বিধা করছিল, কিন্তু এবার আর সামলাতে পারল না। বলল, আপনি এত অভদ্র কেন?

এ কথায় ধারাশ্রীর ফেটে পড়ার কথা রাগে। কিন্তু ফল হল উলটো। হঠাৎ ধারাশ্রী হাউমাউ করে কেঁদে মুখ ঢাকল শাড়ির আঁচলে। তারপর অনেকক্ষণ শুধু কাঁদল। পিপুল ভ্যাবাচ্যাকা।

কান্নার পর যে ধারাশ্রী মুখ তুলল সে অন্যরকম দুঃখী, নরম, অনুতপ্ত। পিপুলের দিকে চেয়ে বলল, তুমি কি কিছুই জানো না পিপুল?

পিপুলও অনুতপ্ত। বিনয়ী গলায় বলল, এটা মফসসল। এখনও এখানে কেউ কিছু শোনেনি।

রণেশ তোমাকেও বলেনি কখনও?

না। বিশ্বাস করুন।

করছি। কাউকে বিশ্বাস করা আমার এখন বড্ড দরকার। রণেশ ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্টে প্রায় চার লাখ টাকা ট্রান্সফার করেছে। কলকাতার বাড়ি আমার নামেই ছিল, এখনও আছে। রণেশ দাবি তুলবে না। তার বদলে সে মুক্তি চাইছে--রণিতাকে বিয়ে করবে।

পিপুল চুপ করে রইল। তার মনে পড়ল, রণেশ তাকে মাঝে মাঝে বলত, পুরুষমানুষের, বিশেষ করে শিল্পীদের একজন মাত্র মহিলা নিয়ে থাকা অসম্ভব। প্রকৃতির

নিয়ম এরকম নয়।

ধারাশ্রী বলল, রণিতা ওর হাঁটুর বয়সি। এমন কিছু সুন্দরী কি তুমিই বলো!

পিপুল দেখেছে, রণিতা খুব সুন্দরী না হলেও মুখশ্রী ভারি মিষ্টি। কালোর ওপর ছিপছিপে ছোটখাটো চেহারা। চোখে সবসময়ে একটু অবাক দৃষ্টি।

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, না, তেমন সুন্দরী নয়।

তাহলে? তাহলে এ এরকম করল কেন?

আপনি অস্থির হবেন না কাকিমা।

ধারাশ্রী অবাক হয়ে বলে, হবো না! কী বলছ? আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, তবু অস্থির হবো না?

পিপুল নম্র গলায় বলে, রণেশ কাকা কিন্তু এখানে কখনও কোনও বাড়াবাড়ি করেননি। আপনমনে ছবি আঁকতেন। কখনও কখনও আমার সঙ্গে বসে ছবি নিয়ে কথা কইতেন।

তুমি হয়তো সব জানো না। ওদের মাখামাখি এখানেও হত। অবশ্য সেটা জেনেই বা আর আমার লাভ কি? আমার যা সর্বনাশ হওয়ার তো হয়েই গেছে!

কিন্তু রণেশকাকা তো এখন প্যারিসে?

সেখান থেকেই খবর আসছে। কয়েকদিন আগে রণেশ একটা চিঠি লিখেছে আমাকে। তাতে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছে। যদি না ভাঙি, তাহলেও ও রণিতাকে নিয়ে আলাদা থাকবে।

আপনি রণেশকাকাকে কী লিখলেন?

কিছু লিখিনি। উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি। উকিল বলেছে, বিয়ে যদি আমি ভাঙতে না চাই, তাহলেও কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তাতে কী লাভ বলো! তুমি এখনও তেমন বড় হওনি, তোমার কাছে বলতে লজ্জা করে, তবু বলি, আমার রূপ নেই, ছবি আঁকতে পারি না, ছবি বুঝিও না, বয়সও হচ্ছে--কী দিয়ে রণেশকে বেঁধে রাখব বলো তো? বিয়ে না ভাঙলেই কি আর ও বশ মানবে?

পিপুল খুব সংকোচের সঙ্গে বলে, রণেশকাকা তো এমনিতে বেশ ভালো লোক।

সে তোমাদের কাছে। আমি ওর স্ত্রী, আমার চেয়ে ভালো আর ওকে কে জানে!

এখানে কেউ রণেশকাকার চরিত্র নিয়ে কখনও কিছু বলেনি?

এখানকার লোক ওকে জানে না। অনেকদিন ধরেই ও আর আমাকে পছন্দ করছে না, টের পাচ্ছি, এখানে পড়ে থাকে, কলকাতায় যেতে চায় না। গেলেও কেমন আলগোছ হয়ে থাকে। আমাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না, তুমি কি জানো?

পিপুল না বলতে পারল না। কথার ফাঁকে ফাঁকে রণেশ তাকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নয়। ধারাশ্রী বড্ড অহংকারী আর আত্মসর্বস্ব। রণেশের টাকার

দিকেই তার নজর। পিপুল অবশ্য সেসব বলল না। মুখে সমবেদনা মেখে বসে রইল সামনে।

ধারাশ্রী অনেক কথা বলল, বিয়ের পর প্রথম প্রথম চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে শুধু পরস্পরের ওপর নির্ভর করে কেমন করে তারা বেঁচে ছিল। কত ভালোবাসা আর বিশ্বাস ছিল দুজনের প্রতি দুজনের। বহুবার কাঁদল ধারাশ্রী।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিল, পিপুল জোর করে ধারাশ্রীকে নিয়ে গেল দিদিমার কাছে। ভাত খাওয়াল। তারপর বলল, বিকেলের গাড়িতে আমি গিয়ে কলকাতায় পৌঁছে দেবো আপনাকে। আপনি একটু ঘুমোন।

খুবই ক্লান্ত ছিল ধারাশ্রী। বোধহয় রাতের পর রাত ঘুমোয় না। বলতেই বিছানায় শুল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধের সময় উঠে বলল, পিপুল, তুমি আজ আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে, কিন্তু তোমাকে ফিরতে দেবো না--কাল ফিরো।

টালিগঞ্জের বাড়িতে একবার আগেও এসেছিল পিপুল। সুন্দর ছোটো একখানা দোতলা বাড়ি। একতলায় সবটা জুড়ে স্টুডিয়ো। ছবি বিশেষ নেই। কারণ রণেশের ছবি আজকাল আঁকা মাত্র বিক্রি হয়ে যায়।

রণেশের দুই মেয়ে, এক ছেলে। ছেলে বড়, মেয়েরা কিশোরী। ফুটফুটে সুন্দর চেহারা তাদের। মা-বাবার ডিভোর্সের আশঙ্কায় প্রত্যেকেই কেমন যেন ভীতু, লাজুক আর সংকুচিত। কথা বলছে না কেউ।

এরকম মুহ্যমান বাড়িতে থাকা খুব কষ্টকর। পিপুলের অস্বস্তি হচ্ছিল।

এত দুঃখের মধ্যেও ধারাশ্রী তার কোনও অযত্ন করল না। নিজের হাতে রান্না করে তাকে খাওয়াল রাতে। বলল, তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে। আমার জীবনটা যে ছারখার হয়ে গেল সেকথা তো সবাইকে বলা যায় না।

পিপুল বুঝতে পারছিল না, তাকেই বা ধারাশ্রী এত দুঃখের কথা বলতে চায় কেন? সে তো ধারাশ্রীর কাছে প্রায় অচেনা একটি ছেলে! তাকে আজ ধরেই বা রয়েছে কেন ধারাশ্রী?

নীচের স্টুডিয়োতে একটা ক্যাম্প-খাটে বিছানা পাতাই থাকে। রণেশ এখানে বিশ্রাম নেয়। সেই বিছানায় শুয়ে সবে চোখ বুজেছে পিপুল, এমন সময় ধারাশ্রী এল। একটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসে বলল, আমি এখন অনেক কথা বলব তোমাকে। শুধু শুনে যেও, জবাব দেওয়ার দরকার নেই। কথাগুলো বলতে না পারলে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো!

পিপুল উঠে বসে বলল, আপনি বলুন।

সারারাত কথা বলল ধারাশ্রী। তাদের প্রেমের কথা, বিয়ের কথা, ছেলে-মেয়ে জন্মানোর কথা, দারিদ্র্যের কথা, তারপর প্রেমছুট হওয়ার কথা, তার সঙ্গে ধারাশ্রীর নিজের জীবনের নানা ঘটনার কথা। বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। অসংলগ্ন হয়ে পড়ছিল। পিপুল খুব মন দিয়ে অনুধাবন করছিল ধারাশ্রীকে। কিন্তু বুঝতে পারছিল ধারাশ্রী স্বাভাবিক নেই। খানিকটা পাগলামি দেখা দিয়েছে বোধহয়।

সকালে ধারাশ্রী এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল ঘাড় কাত করে।

সকালে রণেশের ফুটফুটে বড় মেয়েটি নেমে এল দোতলা থেকে। মাকে চেয়ারে বসে ঘুমোতে দেখে একটু অবাক হয়ে পিপুলের দিকে চেয়ে বলল, ইজ শি সিক?

পিপুল কি বলবে ভেবে পেল না। মাথা নেড়ে বলে, বুঝতে পারছি না। সারারাত কথা বলেছেন।

আজকাল মা বড্ড বেশি কথা বলছে। একা-একাও বলে। ওকে কি ডাক্তার দেখানো উচিত?

আমার তো সেটাই ভালো মনে হয়।

আপনি কি আজকের দিনটা থাকতে পারবেন?

কেন বলো তো?

মেয়েটা লাজুক মুখে বলল, আসলে আমাদের মন ভালো নেই কারও, মা যদি সিক হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের কিছু হেল্প দরকার।

পিপুল বলে, যদি কিছু করার থাকে করব। ওটা নিয়ে ভেবো না।

ডাক্তার এল, দেখল। সঙ্গে সঙ্গে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল ধারাশ্রীকে। তারপর বলল, এ বাড়িতে বড় কেউ নেই?

পিপুল বলল, আমি আছি।

ওঃ! বলে ডাক্তার তার বড়ত্বে একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, এক্সট্রিম মেন্টাল প্রেসার। হাইপারটেনশনটাও বিপজ্জনক। প্রেসক্রিপশন দিয়ে যাচ্ছি, ওষুধগুলো ঠিকমতো যেন দেওয়া হয়।

একদিনের জায়গায় পিপুলকে থাকতে হল তিন দিন। তিন দিন কাটল দারুণ উদবেগে, অনিশ্চয়তায়। ঘুম ভাঙলেই ধারাশ্রী নানা অসংলগ্ন কথা বলে, হাসে, কাঁদে। বিছানা ছেড়ে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল একবার। বিছানার কাছাকাছি পিপুল চেয়ারে বসে থাকে দিন রাত। প্রয়োজন হলে ডাক্তার ডাকে ফোনে, ওষুধ এনে দেয়। তিন দিন ধরে সে বুঝতে পারল, রণেশের তিন ছেলেমেয়েই অপদার্থ বাস্তববুদ্ধিবর্জিত। অতি আদরে এরা কেউ কাজের মানুষ হয়নি। এমনকী রান্না-খাওয়া অবধি বন্ধ হতে বসেছিল। পিপুল বেগতিক দেখে বাজার করে আনল, নিজেই রান্না করল এবং পরিবেশন করে

খাওয়াল সবাইকে। মায়ের অসুখে ভেঙে পড়া তিনটে ছেলেমেয়েকে প্রবোধ দেওয়ার কাজটাও তাকে করতে হল সঙ্গে সঙ্গে।

বড় মেয়েটির নাম অদিতি। ফরসা। দারুণ সুন্দর বছর সতেরোর মেয়েটিকে মেমসাহেব বলে ভুল হয়। অন্য দুটিও প্রায় সমান সুন্দর, কিন্তু অদিতি দারুণ। কিন্তু সুন্দর বলেই কি একটু বেশি সরল? মাঝে মাঝেই কি পিপুলকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা পিপুলদা, মা যদি মরে যায়, তাহলে আমাদের কী হবে? বাবা তো আর আমাদের বাবা নেই?

কে বলল নেই?

বাবা যদি রণিতাকে বিয়ে করে, তাহলে কি আর বাবা আমাদের বাবা থাকবে?

বাবা সব সময়েই বাবা। কিন্তু অত ঘাবড়াচ্ছো কেন? কাকিমা ঠিক ভালো হয়ে উঠবেন। ওঁর অসুখ সিরিয়াস নয়। মেন্টাল শক থেকে ওরকম হয়।

অদিতির চোখ ছলছল করে, মা ছাড়া আমাদের যে কী হবে!

রণেশের বড় সন্তানটি ছেলে, তার নাম অতিথি। ছোটটি মেয়ে--তার নাম মোনালিজা। তারা চমৎকার দুটি ছেলেমেয়ে, কিন্তু তাদেরও বাস স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। এই বাস্তব পৃথিবীর কিছুই প্রায় তারা জানে না। সারাদিন তারা পিপুলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, পিপুল যা করার করবে, তাদের যেন কিছু করার নেই। তবে তারা পিপুল যা বলে তাই নীরবে এবং বিনা প্রতিবাদে করে। এমনকী পিপুলের সঙ্গে রাতেও জেগে থাকার চেষ্টা করতে করতে ধারাশ্রীর বিছানার চারপাশে নানা ভঙ্গিতে শুয়ে বা বসে ঘুমিয়ে পড়ে।

জেগে থাকে পিপুল। চুপচাপ বসে বই পড়ে, কিংবা ভাবে। তার ঢুলুনিও আসে না। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে পাঞ্জা কষে সে বড় হচ্ছে। সে তো এদের মতো পরির রাজ্যের মানুষ নয়।

দ্বিতীয় রাতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে অদিতি বলল, আচ্ছা পিপুলদা, তোমাকে কি আমি এক কাপ কফি করে দেবো?

হঠাৎ এ কথা কেন?

আমার বাবা যখন রাত জাগে তখন কফি খেতে দেখেছি।

পিপুল হাসল, আমি চা বা কফি বিশেষ খাই না। আমার কোনও নেশা নেই।

আমার বাবা হুইস্কি খায়, তুমি খাও?

অদিতি আপনি থেকে প্রথম দিনেই তুমিতে নেমে গেছে। তিন ভাইবোনই তাকে বোধহয় একটু আপনজন বলে ধরে নিয়েছে, তাই দাদা আর তুমি বলছে। পিপুলের ভালোই লাগছে এদের।

সে বলল, আমি মদ খাই না। কোনওদিন খাবোও না।

কেন খাবে না? খাওয়াটা খারাপ, তাই না?

খুব খারাপ। মদ খেত বলেই তো আমার বাবার আজ কত দুর্দশা। তাকে দেখেই আমার চোখ খুলে গেছে।

মার কাছে শুনেছি তোমার খুব দুঃখ। সত্যি?

কাকিমা তোমাকে বলেছে বুঝি?

তোমাকে যখন নিয়ে এল তখন আমাদের আড়ালে বলেছে। তুমি কি খুব গরিব?

খুব। দিদিমার কাছে আশ্রয় না পেলে কী হত কে জানে।

আমার বাবাও খুব গরিব ছিল, জানো?

জানি। রণেশকাকা আমাকে সব বলেছে।

গরিব কি ভালো হয়?

তার কি কিছু ঠিক আছে? ভালোও হয়, মন্দও হয়।

তুমি কিন্তু খুব ভালো। ভীষণ।

পিপুল হাসল। এই সরলা বালিকার মধ্যে এখনও পাপ ঢোকেনি। এদের ভগবান কি চিরকাল এরকম নিষ্পাপ রাখবেন?

তিন দিন বাদে চতুর্থ দিন সকালে ধারাশ্রী তার বিপদ কাটিয়ে উঠে বসল। শরীর দুর্বল, কিন্তু রক্তচাপ কমেছে। কথাবার্তার অসংলগ্নতাও আর নেই। ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে অনেকক্ষণ তৃষিত চোখে চেয়ে দেখল তাদের। তারপর বলল, এ কদিন কি করলি তোরা? কে তোদের দেখল?

কেন, পিপুলদা! সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

ধারাশ্রী পিপুলের দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম, তাই না?

আপনার কষ্টের তুলনায় আমারটা কিছুই না। আপনি ওসব ভাববেন না।

তোমার কলেজের ক্ষতি হল তো?

পুষিয়ে নেবো। আজকাল কলেজে তেমন পড়াশুনো হয় না।

দিদিমা ভাবছে না?

দিদিমা একটু ভাববে। তাই আজ একবার বাড়ি যাবো।

এসো গিয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে চলে এসো। তোমার রণেশকাকা আমাদের ত্যাগ করেছে, তাই বলে তুমি কোরো না কিন্তু।

এতকাল দিদিমা ছাড়া আর কারও মায়া ছিল না তার। এই প্রথম রণেশের পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তিন দিনে মায়ায় জড়িয়ে পড়ল নাকি সে!

ফিরে আসার পর রণেশের স্টুডিয়োতে বসে ছবি আঁকতে আঁকতে প্রায়ই তিন দিনের নানা স্মৃতি এসে হাজির হয়। আদিতির মুখখানা খুব মনে পড়ে তার। আঁকতে চেষ্টা করে, পারে না--অন্যরকম হয়ে যায়।

তিন মাস আর কোনও খোঁজখবর নেয়নি পিপুল। মন থেকে ধীরে ধীরে মুছেই যাচ্ছিল ওরা। পিপুলের নিজেরও অনেক কাজ। পড়াশুনো, ব্যায়াম, ছবি আঁকা, পরোপকার করে বেড়ানো। মাসতিনেক বাদে হঠাৎ একদিন রণেশ এসে হাজির। চেহারাটা অনেক ভালো হয়েছে, গায়ের রং ফরসা হয়েছে, মুখটা একটু বেশি গম্ভীর।

পিপুলের সঙ্গে দেখা হতে বলল, কেমন আছিস?

ভালো। আপনি কেমন?

আমিও ভালো। তুই তো দেখছি অ্যাডাল্ট হয়ে গেছিস!

পিপুল অস্বস্তির সঙ্গে হাসল।

রণেশ তার ঘরে আরামচেয়ারে বসে মাথার পাতলা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, আমার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছিস, না?

হ্যাঁ, কাকিমা খুব আপসেট।

হওয়ারই কথা। কুড়ি বছরের ম্যারেড লাইফ। একটা অভ্যাসও তো হয়ে যায়।

আপনি কাকিমার কাছেই আছেন তো?

দেখা করেছি, কিন্তু থাকব না। এত পাগলামি করছে যে সহ্য করা মুশকিল!

আপনি কি রণিতাদিকে বিয়ে করবেন?

বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। ধারা তো ডিভোর্স দেয়নি। তবে দিলে ভালো করত। এখন ও পাগলামি করছে বটে, কিন্তু মরা সম্পর্ককে কি বাঁচানো যায়?

পিপুল মরা বা জ্যান্ত কোনও সম্পর্কের কথাই জানে না। তবে নিজের বাবার কথা মনে পড়লে সে একটা মৃত সম্পর্কের জের টের পায়। জন্মদাতা বাপ, তবু কতই না পর!

রণেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ধীরস্বরে বলল, কখনও আমাকে মানুষ বলেই ধারা গ্রাহ্য করল না। আমার ভালো-মন্দ দেখল না। এখন যেই সম্পর্ক ভাঙতে চলেছে তখন খেপে উঠেছে। এসব পাগলামিকে ভালোবাসা বা সেন্টিমেন্ট বলে ভাবিস না যেন--এ হল আহত অহং। ও রণিতার কাছে হার মানতে চাইছে না।

আপনি তাহলে কী করবেন?

রণেশ হাসল। বলল, আমার তো এসকেপ রুট আছেই ছবি আঁকব, ছবিতে ডুবে যাবো।

আর কাকিমা?

তাকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে। তবে আমি তো নিষ্ঠুর নই। মেয়েরা যত নিষ্ঠুর হতে পারে, ছেলেরা তত পারে না।

রণিতাদির কী হবে?

রণিতা আধুনিক মেয়ে। সে হিসেব না কষে কাজে করে না।

তার মানে কি কাকা?

রণিতা আর আমি প্ল্যান করেছি, ধারা ডিভোর্স না দিলে আমরা অন্য কোনও রিলিজিয়নে কনভার্ট করব। তখন অসুবিধে হবে না। কিন্তু এসব তোকে বলছি কেন রে পাগলা! এসব হচ্ছে জীবনের কুৎসিত দিক। এগুলোর দিকে নজর দিস না। তুই আমাকে খারাপ ভাবিস নাকি?

না, যার হাতে অত সুন্দর ছবি বেরোয়, সে কি খারাপ হতে পারে?

ঠিক বলেছিস। দুঃখের বিষয়, আমি ছবিতে ডুব দিতে পারি কিন্তু ধারা ডুব দেবে কিসে? ওরও তো একটা এসকেপ রুট দরকার, তাই না?

আমি জানি না।

ওর জন্য একটু ভাবিস তো। আগে গান গাইত—চর্চাটা রাখেনি। চর্চা থাকলে ওই গানই ওকে বাঁচিয়ে দিত। যাদের কোনও শিল্প নেই, শখ নেই তাদের বড় কষ্ট—তাই না?

বোধহয়।

আয়, আজ দুজনে ছবি আঁকি।

দুজনে পাশাপাশি বসে গেল ছবি আঁকতে। আঁকতে আঁকতে রণেশ প্যারিসের গল্প করছিল মাঝে মাঝে। মহান সব ছবির গল্প, শিল্পীদের গল্প, বিদেশের নানা অভিজ্ঞতার গল্প। বলতে বলতে হঠাৎ বলল, ওঃ হ্যাঁ, ভালো কথা! তোর কথা আমার ছেলেমেয়েরা খুব বলছে আজকাল!

তাই নাকি?

ওরে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ওদের তুই মেসমেরাইজ করে এসেছিল—তোর কাকিমাকেও।

পিপুল লজ্জার সঙ্গে হাসল।

রণেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুই না থাকলে ধারার কী হতো কে জানে! আমার ছেলেমেয়েরা তুলোর বাক্সে মানুষ হয়েছে, দুনিয়ার আঁচ টেরই পায়নি কখনও। তুই সে সময়ে না থাকলে ওরা দিশেহারা হয়ে যেত। কী যে করত কে জানে!

কাকিমা এখন ভালো আছেন?

শরীর খারাপ নয়, তবে মনে হয় প্রেসারটা ক্রনিক হয়ে গেল। একটু হার্টেরও প্রবলেম। তবে সিরিয়াস কিছু নয়।

কাকিমা কিন্তু সেদিন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

শুনেছি। তোকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল। তবে সে ভাবটা এখনও আছে। বেশি কথা বলছে, বেশি কাঁদছে, বেশি চ্যাঁচামেচি করছে। আয়, ওসব কথা ভুলে যা। ছবি আঁক, ছবি তোকে সব ভুলিয়ে দেবে। দুনিয়া নিয়ে বেশি ভাববি না কখনও। ওটা আমাদের কনট্রোলে তো নেই।

দুজনে অনেকক্ষণ নীরবে ছবি আঁকল। অখণ্ড মনোযোগে।

রণেশ বলল, তোর স্ট্রোক অনেক পাওয়ারফুল হয়েছে তো! খুব খেটেছিস মনে হচ্ছে! কালারসেন্সটা এখনও গ্রো করেনি—আয় তোর ছবিটা একটু রিটাচ করে দিই। দেবো?

সে তো আমার ভাগ্য।

পোর্ট্রেট করতে ভালোবাসিস বুঝি? কার মুখ?

মন থেকে আঁকা।

রণেশ পাকা আর্টিস্ট, প্রতিভাবানও। দু-একটা শেড পালটে দিল, দু'চারটে নতুন টান মারল। তারপরই হঠাৎ ঝকঝকে করে হেসে উঠল একটা চেনা মেয়ের মুখ।

রণেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে ছবিটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তাই তো ভাবছি, মুখটা এত চেনা-চেনা ঠেকছিল কেন! এ তো অদিতি!

এই বলে হঠাৎ হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে রণেশ।

পিপুল লজ্জায় মরে গেল।

জীবনী

কাছের ঠাকুর

ি. স্টাব্দ ১৮৮৮, ১৪ সেপ্টেম্বর, বঙ্গাব্দ ১২৯৫, ৩০ ভাদ্র, শুক্রবার, শুভ তালনবমী তিথিতে পাবনা জেলায় (অধুনা বাংলাদেশ) হিমায়েতপুর গ্রামে সকাল সাতটা পাঁচ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী ও মাতা মনোমোহিনী দেবীর তিনি প্রথম সন্তান।

মাতা মনোমোহিনী আগ্রা সৎসঙ্গের হুজুর মহারাজের শিষ্যা ছিলেন। এই তেজস্বিনী, ধর্মপ্রাণা, সেবাপরায়ণা নারী স্বীয় গুণেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হুজুর মহারাজের তিরোধানের পর যখন সরকার সাহেব তৎস্থলাভিষিক্ত হন তখন বালক অনুকূলচন্দ্রকে সৎমন্ত্র প্রদানের জন্য মাতা মনোমোহিনী তাঁকে পত্র দেন। সরকার সাহেব পত্রোত্তরে মাতা মনোমোহিনীকেই সৎমন্ত্র প্রদান করতে নির্দেশ দেন। মায়ের কাছে দীক্ষা লাভের পরই অনুকূলচন্দ্র বলেন যে, এই বীজমন্ত্র তাঁর অচেনা নয়। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেও তিনি এই নাম জপ করতেন।

অনুকূলচন্দ্র প্রথমে পাবনা ইন্সটিটিউশন ও পরে নৈহাটি মহেন্দ্রনাথ স্কুলে পড়াশুনো করেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা তাঁর আর দেওয়া হয়নি, কারণ এক দরিদ্র বন্ধুকে তিনি এই পরীক্ষার ফি-এর টাকা দান করে দেন।

অনুকূলচন্দ্রের পর মাতা মনোমোহিনীর আরও কয়েকটি পুত্রকন্যা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় তন্মধ্যে প্রভাসচন্দ্র, কুমুদরঞ্জন ও গুরুপ্রসাদি ছাড়া আর কেউ বেশিদিন বাঁচেননি। চিরকুমারী গুরুপ্রসাদি এখনও বর্তমান।

নিজের চারপাশ সম্পর্কে বালক অনুকূলচন্দ্রের কৌতূহল ছিল দুর্নিবার। তীক্ষ্ণ ও গভীর পর্যবেক্ষণ, নিজের মতো করে তা বিশ্লেষণ ও অনুধাবন এবং যুক্তিপরম্পরা সিদ্ধান্তে বা সত্যে পৌঁছনোর প্রবণতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। একদিন বৃষ্টিস্নাত অপরাহ্নে স্কুল থেকে একাকী ফেরার পথে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সম্মোহিত হয়ে যান। তিনি দেখতে পান তাঁর চারদিকে যা কিছু সবই আলোকবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সেই সব দ্যুতিময় কণিকা নানা ছন্দে আন্দোলিত হচ্ছে, নৃত্য করছে, তরঙ্গায়িত হচ্ছে। কিছুক্ষণ তিনি এমন অভিভূত হয়ে ছিলেন যে বাহ্যচৈতন্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অবলোকনের ভিতর দিয়েই বিশ্বরহস্যের দরজা তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়। কণিকা বা অণুময় এই বস্তু ও বাহ্যজগতের কথা বিজ্ঞান অনেক আগেই জেনেছে। কিন্তু ঠাকুর তবু তা জেনেছেন তাঁর নিজস্ব ইন্দ্রিয় ও সত্তা দিয়েই। তিনি পুথিপড়া বিদ্যায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। ঠাকুর সত্যকে জানতে চাইতেন

নিজের মতো করে এবং হাতেকলমে। তিনি যখন খাগের কলম দিয়ে নিজের মতো করে ফাউন্টেন পেন আবিষ্কার করলেন তার অনেক আগেই ফাউন্টেন পেন আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু তাতে ঠাকুরের কী? তিনি নিজে আবিষ্কার করবেন তবে তৃপ্তি। বাল্য বয়সে ভাঁটি গাছের পাতা খেয়ে ঠাকুরের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। মুখে গ্যাঁজলা উঠে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু লক্ষণটা তিনি মনে রেখেছিলেন। কিছুদিন পর আর একজন বালকের পেটে ব্যথা আর মুখে গ্যাঁজলা উঠতে দেখে ঠাকুর তাকে ভাঁটি গাছের পাতা খাওয়ান। তাতেই ছেলেটি আরোগ্য লাভ করে। আমরা জানি এ হল সদৃশ লক্ষণের চিকিৎসা পদ্ধতি, যা থেকে হোমিয়োপ্যাথির উদ্ভব। ঠাকুর তা জেনেছেন পরে। কিন্তু নিজের জীবনে প্রয়োগ করে করেই তিনি যা কিছু অধিগত করেছেন।

বোধ হয় এই কারণেই পুথিপড়া বিদ্যের প্রতি তাঁর অনীহা ছিল। বই পড়ে না শিখে যা কিছু শিখতে চেয়েছেন হাতেকলমে। বইকেও উপেক্ষা করেনি, পড়েছেন প্রয়োজনমাফিক! পাস করে চাকরি করার ইচ্ছে তো তাঁর কখনও ছিল না।

অনুকূলচন্দ্রের মাতৃভক্তি ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ। জননীই যেন ছিলেন তাঁর ভুবন। মাকে খুশি করার জন্য তিনি সর্বদাই ছিলেন তৎপর। পরবর্তীকালে তিনি ছড়া দিয়েছেন—মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলেই হয় কৃতী তত। যা তিনি সারাজীবন ধরে বলেছেন তার প্রত্যেকটির মধ্যেই ছিল তাঁর জীবনের প্রতিফলন। বালক অনুকূলচন্দ্র দুষ্ট বড় কম ছিলেন না। কিন্তু প্রগাঢ় মাতৃভক্তি সেই দুষ্টুমিকেও যেন ভূমায়তি করেছিল। মাকে খুশি করার প্রাণপত চেষ্টার ভিতর দিয়েই জীবনের অনেক সারসত্য তাঁর অধিগত হয়েছিল।

বঙ্গাব্দ ১৩১৩, ২৮ শ্রাবণ মাত্র সতেরো বছর বয়সে অনুকূলচন্দ্র পিতামাতার ইচ্ছানুক্রমে ধোপাদহ গ্রামের (তৎকাল পাবনা শহর নিবাসী) রামাগোপাল ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা একাদশ বর্ষিয়া সরসীবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

এর পর ঠাকুর ডাক্তারি পড়তে কলকাতায় এসে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে ভরতি হন। এই পর্বে তাঁকে প্রবল অর্থকষ্ট, অনাহার ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়। যে সামান্য টাকা জননী তাঁকে পাঠাতে সমর্থ হতেন তাতে তাঁর চলত না। পয়সার অভাবে কলের জল খেয়ে কাটিয়েছেন, আশ্রয়ের অভাবে অনেক দিন ফুটপাথে শুয়ে রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়েছে। গ্রে স্ট্রিটে যোগেন ভট্টাচার্যের কয়লার গুদামেও বেশ কিছুদিন ছিলেন। কয়লার গুদামে থাকায় তাঁর জামাকাপড় নোংরা হত, শরীর মলিন হত, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের উজ্জ্বল শুভ্রতা ম্লান হত না। তাই সে সব কুলিদের মধ্যে তিনি বাস করতেন তারা তাঁকে গভীর ভাবে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। অনুকূলচন্দ্রের চুম্বকের মতো আকর্ষণ শক্তির উৎসই হল তাঁর দরদ, তাঁর সুগভীর প্রেম। সেখানে যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন, তাঁর অন্তরের আলোই যেন চারধারে ছড়িয়ে পড়ত। তাঁকে চিনতে মানুষের ভুল হত না।

এই ছাত্রটির ঐশ্বরিক ভাব আর ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে ওই মেডিকেল স্কুলের এক শিক্ষক ডা. শশীভূষণ মিত্র পরবর্তীকালে তাঁকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন।

কলকাতায় থাকাকালীন যে কষ্ট ও দুর্দশা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল তাই থেকেও তিনি সংগ্রহ করেছেন জীবনের রসদ, অভিজ্ঞতা। অন্যের কষ্টকে চিনতে পেরেছেন। আবার কুলি বা শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা ও ভাব-ভালোবাসার দরুন ঠাকুর তাদের জীবনের পরিচয়ও সম্যক লাভ করেছেন। এ সবই তাঁর জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা সঞ্চার করেছিল।

কী রকম ডাক্তার ছিলেন তিনি? এ কথায় জবাবও সহজ নয়। ডাক্তারি পড়া শেষ করে তিনি হিমায়েতপুরে ফিরে এসে অবলম্বন করলেন হোমিয়োপ্যাথি। বাস্তববোধ, অনুমানশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রখর হওয়ার ফলে চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর সাফল্য অবশ্যম্ভাবিই ছিল। সাফল্য এলও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁর ওষুধে রোগীর আরোগ্য একটা কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়াল। চারদিকে তাঁর খ্যাতি এতই ছড়িয়ে পড়ল যে বহু দূর থেকেও রোগী আসতে লাগল তাঁর কাছে। কিন্তু এই সাফল্য ঠাকুরের কাছে বড় কথা ছিল না। সবসময়েই তাঁর উৎসুক মন জীবনের সব ঘটনা থেকেই সংগ্রহ করত অভিজ্ঞতা। চিকিৎসা করতে গিয়েই তিনি দেখলেন, শুধু ওষুধ দিয়েই বা নিদান হেঁকেই চিকিৎসকের কাজ শেষ হয় না। রোগী সেই ওষুধ সংগ্রহ করতে পারল কিনা, ঠিকমতো খেল কিনা, তার পথ্য জুটছে কিনা, তার গৃহপরিবেশ স্বাস্থ্যকর কিনা এসবও চিকিৎসকের নজর রাখা দরকার। পরবর্তীকালে শুধু হোমিয়োপ্যাথি নয়, ভেষজ ওষুধ ঠাকুর অনেকগুলিই আবিষ্কার করেন। তাঁর সৃষ্টি সৎসঙ্গ রসৈষণা মন্দিরে সে সব ওষুধ আজও তৈরি হয় এবং তার চাহিদা এতই বিপুল যে জোগান দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর দেওয়া ওষুধের মধ্যে প্রিভেনটিনা (অ্যানটিসেপটি ক্রিম), অ্যাজামঞ্জিট, উৎপলাদিকষায়, কবল, কার্ডোটোন, হেপাটোন, বাসার্জুন ইত্যাদির কথা আজ সর্বসাধারণের কাছেও পরিচিত। নিজে ডাক্তারি করতেন বলেই চিকিৎসা সর্ম্পকে তাঁর গভীর নিবেশ ছিল। ডাক্তারদের কেমন হওয়া উচিত তাঁর খুঁটিনাটি তিনি দিয়ে গেছেন। বিশেষ করে প্রতিটি রোগীর কেস হিস্ট্রি লিখে রাখা যে ডাক্তারের একান্ত প্রয়োজন তাও জোর দিয়ে বলেছেন।

ডাক্তারি পসার হতে না হতেই তিনি ধীরে ধীরে শুরু করলেন তাঁর উদ্দিষ্ট অধ্যাত্মমণ্ডলটি সৃষ্টির কাজ। শুরু হল কীর্তন যুগ। এবং এই যুগটিই শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দিল। ইনি যে মহা পাবক পুরুষ, মানুষকে অন্তরে বাইরে যে ইনিই অমৃতত্ব সঞ্চার করতে পারেন সে বিষয়ে আর ভক্তজনের সন্দেহ রইল না।

এই কীর্তনযুগের যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এটা পরিষ্কার যে, ঠাকুরের প্রবর্তিত এই কীর্তন সেই যুগে এক বিশাল ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করে। শ্রীশ্রীঠাকুর অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। আজানুলম্বিত বাহু, ঈষৎ তাম্রাভ গৌর বর্ণ, বিশাল আয়ত দুটি গভীর চোখ এবং

অপরূপ মুখশ্রী। দীর্ঘদেহী ছিলেন, তবে ঢ্যাঙা লম্বা নন। তনুটি ছিল সুঠাম ও সুন্দর। এই অপরূপ মানুষটি যখন কীর্তনে যোগ দিতেন তখন নানা বিভঙ্গে তাঁর বরতনুটি শুধু আন্দোলিত হত। সেই সুঠাম সুন্দর তনুর তরঙ্গ যেন মানুষকে পাগল করে দিত।

প্রথমে কীর্তনের দলটি হয়তো খুব বড় ছিল না। মূলত কিশোরীমোহন দাস, অনন্তনাথ রায়, নফর ঘোষ, দুর্গানাথ সান্যাল, কোকন, বুনে প্রভৃতি এবং পরে সতীশচন্দ্র গোস্বামী, সুশীল বসু প্রমুখ কীর্তনের দলে যোগ দেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এই কীর্তনকে খুব স্বাভাবিক সংঘটন বলে মনে হয় না। উদ্দণ্ড কীর্তন করতে করতে এক এক জন লাফ দিয়ে বাদ্যরত জয়ঢাকের ওপরে উঠে দাঁড়াতেন এবং নৃত্য করতেন। এই কীর্তনের সময়ে চারিদিকে যেন অতিলৌকিক বাতাবরণ সৃষ্টি হত। বৃক্ষরাজি কীর্তনের তালে তালে কাঁপত। নাচত পশুপাখিরাও। ঠাকুর প্রথমেই কীর্তনে যোগ দিতেন না। কীর্তন জমে উঠলে তিনি ছুটে এসে মাঝখানে পড়ে তাঁর মোহন নাচ নাচতে থাকতেন। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে ছুটে আসত।

ঠাকুরের বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছর। কীর্তনের যুগ। আর এই যুগ ঠাকুরের ভাবসমাধিরও যুগ। কীর্তন করতে করতেই কখনও ঠাকুর মূর্ছিতবৎ মাটিতে পড়ে যেতেন। দেহখানি বিবশ, প্রাণহীন হয়ে পড়ত। নাড়ি বন্ধ হয়ে যেত। শ্বাস চলত না। কিন্তু তাঁর শরীরে দেখা দিত বিচিত্র সুন্দর সব স্পন্দন, আন্দোলন। কখনও বা বিচিত্র, দুরূহ ও অসম্ভব সব আসন মুদ্রাদি হতে থাকত। কূর্মাসন, পদ্মাসন, বীরাসন, রাজাসন প্রভৃতি শতাধিক আসন অতি দ্রুতবেগে সংঘটিত হত। কখনও পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে সমস্ত শরীর শূন্যে আন্দোলিত হত। কখনও কচ্ছপের মতো হাত-পা সব শরীরের মধ্যে ঢুকে যেত। কখনও ডাঙায় তোলা কাতলা মাছের মতো শরীরখালি লাফাতে থাকত। সমাধি হলেই প্রথমে তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থরথর করে কাঁপতে থাকত। ওই কম্পন থামলেই তাঁর বাহ্যসংজ্ঞা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যেত। এই অবস্থায় তাঁর বদনমণ্ডল কখনও হাস্যোদীপ্ত, কখনও নীলবর্ণ, কখনও বা ঈষদারক্তিম স্বর্গীয় জ্যোতিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠত। আর এই অবস্থায় কোনও কোনও দিন তাঁর মুখ থেকে ধীর উদাত্ত স্বরে বিভিন্ন ভাষায় অদ্ভুত বাণীসমূহ উচ্চারিত হতে থাকত। এই বাণীগুলি সম্পর্কে তিনি নিজে পরবর্তীকালে বলেছেন, 'বাণীর সময় কখনও কখনও মনে হত যেন কতগুলি আইডিয়ার ঢেউ আমার অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে ফক ফক করে বেরিয়ে আসছে আর বায়োস্কোপের ফিল্মের মতো আইডিয়াগুলি দেখাও দিত মূর্ত জীবন্ত হয়ে। সে কী ভীষণ! যেন উল্কাটা এসে সামনে দাঁড়াল আর তাই দেখে সব বেরুত।'

প্রথমদিকে এসব বাণীর তাৎপর্য বা গুরুত্ব সকলে উপলব্ধি করেনি। কিছুদিন পরে বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী, অনন্তনাথ রায় ও কিশোরীমোহন দাসের চেষ্টায় বাণীগুলি লিপিবদ্ধ

হতে থাকে। বিভিন্ন ভাষায় ঠাকুরের মুখ থেকে বাণী উচ্চারিত হত। কিন্তু সেই সব ভাষা সকলের জানা না থাকায় শুধু ইংরিজি, বাংলা আর সংস্কৃত বাণীগুলি লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এই বাণীগুলি পরে গ্রন্থাকারে 'পুণ্যপুথি' নামে প্রকাশিত হয়। সৃষ্টিতত্ব থেকে শুরু করে মানুষের অনেক প্রশ্নের সমাধান এই মহা গ্রন্থটিতে আছে।

ভক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য অন্যত্র চলে যাবেন বলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কিছু লিখিত উপদেশ প্রার্থনা করেন। দয়াল ঠাকুর এক রাত্রে ভক্তের এই আব্দার পূর্ণ করতে কিছু উপদেশ লিখে দেন। এই উপদেশাবলি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে লেখা হয়। এই উপাদেশাবলিই 'সত্যনুসরণ'।

সৎসঙ্গ বলে কোনও আশ্রম ঠাকুর আনুষ্ঠানিভাবে গঠন করেননি। কীর্তনযুগে তাঁর কাছে চুম্বকের আকর্ষণের মতো হাজার হাজার মানুষ এসে জুটতে লাগল। তাঁকে ঘিরে আপনা থেকেই রূপ নিতে লাগল একটা সংগঠন। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজনেই গড়ে উঠতে লাগল নানারকম নির্মাণ। ঘরদোর তৈরি হতে লাগল, ক্রমে স্কুল হল, কলেজ হল, হাসপাতাল, বিজ্ঞান গবেষণাগার হস্তশিল্পের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে উদ্ভিন্ন হতে লাগল। লোকে ঠাকুরের নামানুসারেই এই আশ্রমকে অভিহত করত। পরে মাতা মনোমোহিনী এই আশ্রমের নামকরণ করেন সৎসঙ্গ।

কীর্তনযুগে ঠাকুর সদলবলে গ্রামে, শহরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পরিক্রমা করতেন। অনেক ভক্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন। তাঁর মধ্যে মানুষ খুঁজে পেত অমৃতের স্বাদ। তাঁর সঙ্গই ছিল মানুষের কাছে পরম প্রাপ্তি। একে ওই মোহন রূপ, অপরূপ নৃত্যের ভঙ্গিমা, ভাবসমাধি, তার ওপর তাঁর অমৃতময় কথোপকথন মানুষের প্রতি অপরিসীম মমতা ও ভালোবাসা মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।

১৩৩০ বঙ্গব্দে ২৪ অগ্রহায়ণ তাঁর পিতা শিবচন্দ্র পরলোকে গমন করেন। ঠাকুরের বয়স তখন ৩৫ বছর। এর ঠিক ১৪ বছর পর ১৩৪৪ বঙ্গব্দের ৬ চৈত্র পরলোকগমন করেন মাতা মনোমোহিনী। মাকে ঠাকুর প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তাই মাতৃবিয়োগ তাঁর কাছে এক বজ্রকঠিন আঘাত। এই শোক বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত তাঁকে বিহ্বল রেখেছে। মায়ের অভাবে যে তিনি ঠুঁটো হয়ে পড়েছেন এ কথা বারবার বলতেন।

প্রথমা পত্নী সরসীবালার গর্ভে ঠাকুরের দুই পুত্র অমরেন্দ্রনাথ ও বিবেকরঞ্জন এবং দুই কন্যা সাধনা ও সান্ত্বনা জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের পঞ্চাশোর্ধ বয়সে সরসীবালার কনিষ্ঠা ভগ্নী সর্বমঙ্গলা শ্রীশ্রীঠাকুরের বরণ করার প্রবল ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেন। তারপর মাতা মনোমোহিনী সর্বমঙ্গলার প্রবল অনুরাগ দেখে অনুকূলচন্দ্রকে বিবাহ করার আদেশ দেন। মাতৃ আজ্ঞা বরাবরই শ্রীশ্রীঠাকুরের শিরোধার্য ছিল। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে শ্রীশ্রীঠাকুরের তৃতীয় পুত্র প্রচেতারঞ্জনের জন্ম। আরও পরবর্তীকালে অব্রাহ্মণ পারুলবালা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পতিত্বে বরণ করেন। এই

অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে শ্রীশ্রীঠাকুরের এক কন্যা অনুকা জন্মগ্রহণ করেন। বলে রাখা ভালো যে, শ্রীশ্রীঠাকুর সংসারে থেকেও নিজেকে দূরে রাখতেন। ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়েই কাটত তাঁর দিবসরজনী। দাম্পত্য জীবন ছিল নামমাত্র।

দয়াল ঠাকুর নিজে খুব কমই দীক্ষা দিয়েছেন। প্রথম দিকে বিশেষ কয়েকজনকে। তারপর দীক্ষা দানের জন্য তিনি আচারনিষ্ঠ, ইষ্টপ্রাণ, সদাচারী ভক্তদের বেছে নিয়ে ঋত্বিকের পাঞ্জা প্রদান করেন। ঋত্বিকরা তাঁর পুরোহিত, কোনওক্রমেই তাঁরা গুরু নন। ঠাকুরের সৎনাম তাঁর আদেশে বিতরণ করাই তাঁদের কাজ। এই প্রথা শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তন করেছিলেন বলে কথিত আছে। ঋত্বিক ছাড়াও যাজনকার্যে সাহায্য ও ঋত্বিকদের সহায়তা দানের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর অধ্বর্য্যু ও যাজক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এঁরা দীক্ষা দিতে পারেন না বটে, কিন্তু মানুষ যাতে উদ্বুদ্ধ হয় সেই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি এই তিন স্তম্ভের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুশাসন দাঁড়িয়ে আছে। যজন মানে নাম-ধ্যান পরয়াণতা, ইষ্ট বা গুরুতে মনকে সম্যকভাবে ন্যস্ত করার প্রয়াস। যাজন মানে নাম-ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে বিনায়িত করে চরিত্রের এমন বিকাশ সাধন যাতে মানুষের নিজেকে ইষ্টের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। যাজন শুধু মুখের কথা নয়, কথার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা না থাকলে যাজন সার্থক হয় না। মানুষকে দীক্ষা নেওয়ার কথা বলতেই নেই, কিন্তু তার ভিতরের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হয় যাতে সে দীক্ষা নেওয়ার আগ্রহী হয়ে ওঠে। ইষ্টভৃতি মানে ইষ্টকে ভরণপোষণ। দয়াল ঠাকুর আমাদের ইষ্ট, বাস্তবজীবনে তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রতিদিন বাস্তবভাবে অর্ঘ্য নিবেদন করাই ইষ্টভৃতি। নিজে অর্জন করে তবেই তা প্রতিদিন ভোরবেলা অন্নজল গ্রহণের আগে পবিত্রভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করে নিবেদন করতে হয় এবং প্রতি তিরিশ দিনের দিন তা দক্ষিণা ও সংগঠনীসহ ইষ্টসকাশে পাঠাতে হয়। পাঠানোর দিন যতক্ষণ পাঠানো না হচ্ছে ততক্ষণে জলগ্রহণ নিষেধ। ইষ্টভৃতি পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ভ্রাতৃভোজ্য দিতে হয়।

এ ছাড়া ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রত, সদাচার ইত্যাদিও কাঠোরভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণাশ্রম কখনও ভাঙা উচিত নয় এবং বিবাহাদির ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করারই বিধি তিনি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত বলা আছে।

১৯৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঠাকুর খানিকটা আকস্মিক ভাবেই পাবনা হিমায়েতপুর ছেড়ে দেওঘর বৈদ্যনাথধামে রওনা হয়ে যান। চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ুপরিবর্তনের জন্যই যাওয়া বটে, কিন্তু এই যাত্রার নিহিত অন্য কোনও গভীর তাৎপর্য থাকা সম্ভব। হিমায়েতপুর আশ্রমে তাঁর কোটি কোটি টাকার সম্পদ পড়ে রইল। দেওঘর শহরের উপান্তে বড়াল বাংলো নামে একখানি বাড়ি ভাড়া করে সেখানেই বেশ কষ্ট করে ঠাকুর বাস করতে লাগলেন। তিনি তো কখনও একা নন, তিনি মানেই সঙ্গে তাঁর প্রিয় শিষ্যরা। বহু মানুষ নিয়েই থেকেছেন এবং চলেছেন ঠাকুর। তাই শত কষ্ট হলেও কাউকে পরিত্যাগ

করার প্রশ্নই কখনও তাঁর জীবনে দেখা দেয়নি। দেওঘরে তাঁকে ঘিরে, তাঁকে নিয়েই ফের গড়ে উঠল আশ্রম—যা সৎসঙ্গ নামে আজ বিখ্যাত। মনে রাখতে হবে সংগঠনটা ঠাকুরের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে, ঠাকুরের জন্যই সংগঠন। নইলে সংগঠনই মূল্যহীন। ঠাকুরের ইচ্ছা রূপায়ণ, অনুশাসনকে ফলিত করে তোলাই সংগঠনের কাজ। ঠাকুরের সারাটা জীবনই কেটেছে দুঃখ কষ্টের মধ্যে। বাল্যকালে এবং ছাত্রজীবনে দারিদ্র্য ছিল প্রকট। পরে অন্যের দুঃখ-দুর্দশার ভাগীদার হয়ে মানুষকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজের জীবনে ডেকে এনেছেন কত কষ্ট। নিজে পরমপ্রেমময় আবার ভালোবাসার কাঙাল। মানুষকে ভালোবেসে ঠাকুরের কোনও ক্লান্তি নেই। আবার তিনি চাইতেন আমরাও যেন ভালোবাসাময় হয়ে উঠি।

১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারি সকাল চারটে পঞ্চান্ন মিনিটে পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বরতনু ত্যাগ করেন। ১৭৭১-এর ১০ মে প্রয়াণ করেন সরসীবালা।

তিনি মানবদেহে এসেছিলেন। মানবদেহের রোগ-ভোগ অবসান তো আছেই। কিন্তু তিনি যে অমৃত্যুময় জীবনের সন্ধান দিয়ে গেছেন তাতে উত্তীর্ণ হতে পারে যে-কোনও মানুষই। তাঁর অনুশাসনকে তাই কঠোরভাবে এবং আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। চাই গুরুর প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠা। মনে রাখতে হবে ঠাকুরই একমাত্র উপাস্য, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম।

অনুশীলন

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওয়া সৎনাম গ্রহণ করার পর কতগুলি জিনিস [illegible] এবং অনুরাগের সঙ্গে নিত্য পালন করতে হয়।

ইষ্টভৃতি : ইষ্টভৃতি হল নিজের উপার্জন থেকে প্রতিদিন নিজে অন্নজল গ্রহণ করার আগেই ঠাকুরকে ভোজ্য নিবেদন করা। ভোরবেলা শয্যাত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্যাদী সেরে বাসি জামা কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ঠাকুরের প্রতিকৃতি এবং আসনের সামনে বসতে হয়। প্রথমেই 'ওঁ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কূলমালিক রাধাস্বামী দয়ালের চরণে কোটি কোটি' প্রণাম বলে আভূমি প্রণামান্তে দু-এক মিনিট জপধ্যান করে মন্ত্রপাঠপূর্বক ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য নিবেদন করে তা একটি কৌটো বা উপযুক্ত পাত্রে রাখতে হয়। ইষ্টভৃতি নিবেদনের সময় মনে কোনও কামনা বাসনা রাখতে নেই। যতদূর সম্ভব ভক্তি ভালোবাসা নিয়ে নিবেদন করার চেষ্টা করতে হয়। এই ইষ্টভৃতি ঠিক তিরিশ দিন পূর্ণ হলে তিরিশ দিনের দিনই মানি অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট যোগে ইষ্টসকাশে পাঠাতে হয়। যতক্ষণ না ইষ্টভৃতি পাঠানো হচ্ছে ততক্ষণ জলগ্রহণ করতে নেই। ইষ্টভৃতির সঙ্গে দক্ষিণা, সংগঠনী, প্রণামী ও ঋত্বিকী

পাঠানোর নিয়ম। নইলে ইষ্টভৃতি সম্পূর্ণ হয় না। ইষ্টভৃত প্রেরণ করার পর ওইদিন দুজন ইষ্টভ্রাতাকে ভোজ্য দান করতে হয়। ভোজ্য হল চাল ডাল তরকারি ইত্যাদি।

নামধ্যান : সকালে উঠে আগে ইষ্টভৃতি করে তার পর নামধ্যান বসা ভালো। ভোর তিনটের পর থেকে ইষ্টভৃতি করা চলে। ঠাকুর চাইতেন ঊষাকালের আগেই আমার ইষ্টভৃতি করি। ইষ্টভৃতির পর একটি আরামদায়ক আসনে বসে (কাঠের চেয়ার, কৌচ যাই হোক তাতে বসা চলে) মুখ মাথা ও শরীর একটু পাতলা চাদরে ঢাকা দিয়ে পিঠ সোজা রেখে আজ্ঞাচক্রে মনোনিবেশ করতে হয়। ধ্যানের প্রাণই হচ্ছে ভালোবাসা। ধ্যানের সময় ঠাকুরের প্রতি একটা ভালোবাসার ভাব মনে সৃষ্টি করে নিতে হয়। ধ্যানে প্রাথমিক মনোনিবেশের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর চক্র ফটো প্রবর্তন করেছেন। চক্রফটো নিয়ে ধ্যান করলে মন সহজে নিবিষ্ট হয়। চক্রফটো কাছে না থাকলে এমনিই ধ্যান করা যায়।

স্বত : অনুজ্ঞা শ্রীশ্রীঠাকুর যে স্বত অনুজ্ঞা দিয়ে গেছেন তা সকালে জপ ধ্যানান্তে পাঠ ও মনোগত করে নিতে হয়। শুধু মুখেই বলাই নয়, আমি অমানী ইত্যাদি ভাবে উদ্বুদ্ধ হতে হয় এবং সেই ভাবে চলতে হয়। দিনের মধ্যে যতবার খুশি স্বত অনুজ্ঞা আবৃত্তি করা যেতে পারে, বিশেষ করে ধ্যানের পর তো বটেই।

শবধ্যান : দয়াল ঠাকুর যে শবধ্যান প্রবর্তন করে গেছেন সেটা অবহেলা করতে নেই। শবধ্যানের জন্য একটু শক্ত জায়গা দরকার। মেঝেতে শতরঞ্চি বা মাদুর পেতে তার ওপর টানটান ভাবে চিত হয়ে শুতে হয়। দু-পায়ের গোড়ালি যে এক সঙ্গে থাকে, আর হাত দুখানা শরীরের সঙ্গে লেগে প্রলম্বিত থাকবে। মাথার পিছন দিকে—সেখানে মেডুলা ওবলংগাটা রয়েছে সেইখানে ঠাকুরের মূর্তি কল্পনা করে নামজপ করতে হবে। শবধ্যানের সময় শরীর ঢিলা রাখতে হয়, শ্লথ রাখতে হয়। এই ধ্যান পাঁচ থেকে সাত মিনিট করলেই যথেষ্ট। দিনরে মধ্যে তিন-চারবার করতে হয়।

নাম : মনে রাখতে হবে ভরপেট খাওয়ার পরে কোনও ধ্যানই করতে নেই। তাতে হজমের অসুবিধা হয়। তবে নাম সবসময়েই চলবে। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো। নামে কোনও বিরাম দিতে নেই। নাম করতে করতে কিছুদিনের মধ্যেই চব্বিশ ঘণ্টাই ইষ্টমূর্তি ধ্যান হতে থাকে। ঠাকুর বলেছেন সব কাজের মধ্যেই নামের চাকা ঘুরবে। এমনকী মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময়েও। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন, নাম অবিরল করে গেলে চিন্তাশক্তির লাঘব হবে, কিন্তু কাজের ব্যাঘাত হবে না। এসব কেবল তাঁর কথার কথা নয়, ঠাকুরের দেওয়া জিনিস নিজে হাতেকলমে করে উপলব্ধিতে পৌঁছতে হয়। আর তখনই আসে বিশ্বাস।

আহার : আহার সম্পর্কে ঠাকুর যা বলেছেন তা যেমন জীবনীয় ও আয়ুবর্ধক তেমনই মেধা ও মনঃসংযোগের সহায়ক। ঠাকুর বলেছেন মাছ-মাংস-ডিম-পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি

খেলে দেহে অপ্রয়োজনীয় বিক্ষেপ ঘটে এবং মনও তাতে সংক্রামিত হয়। আমিষ আহার শরীরে টকসিন বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে আদি ব্যাধির উৎপাত বাড়ে।

থানকুনিপাতা : প্রতিদিন সকালে ইষ্টভৃতি ও জপধ্যানের পর প্রতিটি সৎসঙ্গীকেই একটি করে থানকুনি পাতা ডাঁটিসহ ভালো করে চিবিয়ে খেয়ে বেশি করে জল খেতে হবে। থানকুনির সঙ্গে একটুখানি আখিগুড় ও সামান্য দুধ খেলে আরও ভালো। চিবোতে অশক্ত হলে থানকুনি থেঁতো করে রস খাওয়া যেতে পারে। বছরের সবসময়ে থানকুনি পাওয়া যায় না বলে থানকুনি পাতা ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে রাখলে তাও খাওয়া চলবে। নিতান্তই থানকুনি দুর্লভ হয়ে পড়লে তার বদলে তুলসীপাতা খেলেও হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, থানকুনি শরীরের অতিরিক্ত টকসিন কমায় ও ঘামের সঙ্গে বের করে দেয়। ফলে শরীর সুস্থ থাকে। থানকুনির ব্যাপারে প্রতি সৎসঙ্গীকেই সচেতন হতে হবে। আজকাল থানকুনির ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে। অভাবে ওই ট্যাবলেট খাওয়া ভালো। তবে টাটকা থানকুনিই সর্বোত্তম। ঠাকুরের বলা আছে, থানকুনি ও জল খাওয়ার পর একটু প্রাতঃভ্রমণ করা ভালো।

প্রার্থনা : প্রতিদিন সকালে ইষ্টভৃতি ও জপধ্যানের পর এবং সন্ধ্যায় বিনতি প্রার্থনা করা একান্তই প্রয়োজন।

আহ্বানী সহ পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনাই সকলের করা উচিত। পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনার মধ্যে ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। ঠাকুর বারবার পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চি পালনের কথা বলেছেন। পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনার মধ্যে পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চি রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সারা জীবন ধরে নানা প্রসঙ্গে ওই আহ্বানী সহ পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনাই করতে বলেছেন। তা ছাড়া বিনতি ঝড়ের বেগে, আবেগহীন যান্ত্রিকভাবে করলে ফলপ্রসূ হয় না। বরং একটু ধীর লয়ে, অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে, ভক্তির সঙ্গে প্রর্থনা করলে মন শান্ত ও আপ্লুত হয়। বিনতি প্রার্থনার অনেকটা অংশই শ্রীশ্রীঠাকুরের বলে দেওয়া এবং তাঁরই নির্দেশে তাঁর বিশিষ্ট ভক্তের দ্বারা বিরচিত। আহ্বানী সহ পূর্ণাঙ্গ বিনতি প্রার্থনা আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারায় অভিষিক্ত করে। বিনতির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসর গ্রন্থটি থেকে কিছু অংশ পাঠ ও তা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। ঠাকুর সমবেত বিনতি প্রার্থনা পছন্দ করতেন। এ জন্যই বলেছেন, অন্তত একবেলা যেন সমবেতভাবে বিনতি প্রার্থনা করার চেষ্টা আমরা করি। সমবেত ভাবে না পারলে এককভাবে করতে হবে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিনতি করাই চাই। বিনতির জন্য নির্দিষ্ট তিনখানি ভজন সম্ভবত আগ্রা সৎসঙ্গের। সদগুরু বন্দনা শঙ্করাচার্য বিরচিত। বাকি সব ঠাকুরের নির্দেশিত ও রচিত।

মনে রাখতে হবে ঠাকুর যা যা বলেছেন তার সঙ্গে যদি পরবর্তী কারও কথার অমিল বা বিরোধ হয় তাহলে ঠাকুরের নির্দেশেই গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য। কোনওভাবেই কোনও সংশোধন বা পরিবর্তনকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আরও এই জন্য

শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রন্থাবলি নিত্য পাঠ, নিত্য আলোচনা এবং চিন্তা ও অনুশীলন প্রতিটি ভক্ত শিষ্যেরই [illegible] করা উচিত। নইলে ঠাকুরকে অন্তরে জাগ্রত করে রাখা সম্ভব নয়। আরও মনে রাখতে হবে, পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুরের যেসব বাণী তাঁর জীবৎকালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিই প্রামাণ্য। পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থরাজির মধ্যে ঠাকুর আর নতুন কথা কিছু বলেননি। তাঁর সব কথা তাঁর জীবৎকালেই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর তিরোধান-পরবর্তী প্রকাশিত কোনও গ্রন্থে যদি এমন কিছু পাওয়া যায় যা তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত বাণীর পরিপন্থী তবে ওই পরবর্তীকালের কথা পরিত্যাজ্য। ঠাকুরের বাণীর যে সব টীকা-ভাষ্য বেরোচ্ছে বা বেরোবে সেগুলিও ঠাকুরের মূল বাণীর সঙ্গে তাঁর গোটা জীবনদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। যা মিলবে না তা বর্জন করা উচিত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাণীগুলি সম্পর্কে আমাদের খুব সচেতন থাকতে বলেছেন। সযত্নে ও অতি সতর্কতার সঙ্গে এই বাণী সমূহ সংরক্ষণ করা ভাবী মানবসমাজের পরম কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন।

ঠাকুর পরিবার : শ্রীশ্রীঠাকুর পরিবার বলতে বোঝায় তাঁর তিন পুত্র, তিন কন্যা এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের। এঁদের সকলের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল থাকা ভক্তদের একান্ত কর্তব্য। অনেকে ঠাকুরপরিবার বলতে বিশেষ কোনও সন্তান এবং তাঁর সন্ততিদের বোঝেন। এটা কিন্তু একাদশদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব। শ্রীশ্রীঠাকুরের সব সন্তানই তাঁর। কাউকেই খাটো করা চলবে না। সকলেরই ভালো মন্দের দিকে শিষ্যদের নজর রাখা কর্তব্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নানা বয়সের নানা ধরনের ছবি সংগ্রহ করে রাখতে হয়। ধ্যানের সময় যে ছবিটি যখন ভাবতে ইচ্ছে করবে সেইটেই ভাবা যায়। ধ্যানে শুধু তাঁর মুখশ্রী দেখা ধ্যান নয়। তাঁর বাণী তাঁর নির্দেশিত কাজ ইত্যাদির কথাও ধ্যান করতে হয়। এবং তারপর ওই সব চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলে তবেই ধ্যানের ফল আমরা লাভ করব।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি ও ছবির প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দিল্লি থেকে শুরু করে আসাম, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা বিভিন্ন জায়গায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শতাধিক মন্দির তৈরি হয়েছে। বেশির ভাগই মন্দিরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু এই সব মূর্তি দেখলে যে-কোনও ভক্তজনেরই মন খারাপ হয়ে যাবে। কতগুলি মূর্তির সব কটিই অতিশয় নিম্ন মানের ভাস্কর্যের লজ্জাজনক নিদর্শন হয়ে রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহসৌষ্ঠব এবং মুখশ্রীর সঙ্গে কোনও মূর্তির সুদূরতম মিলও নেই। যারা এইসব মূর্তি তৈরি করেছেন তারা মূর্তি গড়তে জানেনই না, ভাস্কর্য রচনায় কোনও প্রশিক্ষণও তাদের আছে কিনা সন্দেহ। যে-কোনও নামি শিল্পী বা ভাস্করকে এই সব মূর্তি দেখিয়ে মতামত নিলেই এসব কথার সত্যতা বোঝা যাবে। উপরন্তু অখণ্ড পাথর থেকে মূর্তি তৈরি করা

হচ্ছে না, হচ্ছে মার্বেলের গুঁড়ো মশলায় মেখে। এই সব ছাঁচে ঢালা মূর্তির ওপরে ল্যাকারিং থাকার দরুন কিছুদিন পরেই তা উঠে যায় এবং ফের ল্যাকারিং করতে হয়। কেন ঠাকুরের মূর্তি নিয়ে এই ছেলে খেলা? পুরুষোত্তমের অবয়ব ও মুখশ্রীই যদি না ফুটে উঠল তবে এই সব মূর্তি কেন মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুরের লক্ষ লক্ষ ভক্তের দেওয়া অর্থের অভাব নেই। তবে কেন শ্রেষ্ঠ ভাস্করকে এই কাজের ভার না দিয়ে হেঁজি পেঁজি, অদক্ষ, শিল্পবোধহীন, ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন লোককে দিয়ে এ কাজ করানো হচ্ছে? ইসকনে ভক্তিবেদান্তস্বামীর যে সব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলি কেমন জীবন্ত, প্রাণবন্ত! জয়রামবাটিতে মা সারদার মর্মরমূতি কী অনবদ্য। যারা সেগুলি রচনা করেছেন তাঁদেরও তো বরাত দেওয়া যেত! তার ওপর ঠাকুরের মূর্তি তৈরি হচ্ছে পাইকারি হারে। অতি অল্প সময়ে এত মূর্তি তৈরি হলে তার মান কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্লারে এর আগে তাঁর একটি তৈলচিত্র ছিল। সেটি এখন মির্জাপুর স্ট্রিটের ঠাকুরঘরে রাখা আছে। শিয়ালদার কাছে কোনও একটি স্টুডিয়োকে দিয়ে ওই তৈলচিত্রটি আঁকানো হয়েছিল। পুরুষোত্তমের তৈলচিত্র আঁকানোর জন্য কি বড় কোনও পোর্ট্রেট শিল্পী পাওয়া গেল না? ছবিটিতে রঙের উৎকট ব্যবহার চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক এবং খুব মোটা দাগের কাজ। সূক্ষ্ম শিল্পবোধের অভাবে ছবিটি আদৌ রসোত্তীর্ণ হয়নি। দেশে এত ভালো ভালো চিত্রকর থাকতে এই স্টুডিয়োকে কেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি করতে দেওয়া হল সেটাও আমাদের বোধের অগম্য।

ঠাকুরের ছবি বা মূর্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখশ্রী ও ভাবকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করবে, ভক্তরা তো এইটেই চায়। যেহেতু তিনি এখন দেহে নেই সেই কারণেই তাঁর ছবি ও মূর্তির গুরুত্ব এখন অপরিসীম। সুতরাং এই কাজটি অতি সতর্কতার সঙ্গে, অতি যত্নে ও প্রখর তদারকিতে হওয়া উচিত। যে সব মূর্তি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি অপসারতি করে সেই জায়গায় নিদেনপক্ষে ঠাকুরের ব্লোআপ করা ফটো রাখা প্রয়োজন। নইলে ঠাকুরের মূর্তি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে বাধ্য। মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা স্থগিত রাখা জরুরি।

দয়াল ঠাকুর আমাদের যা যা বলে গেছেন তার কোনওটাই যাতে উপেক্ষিত, বিকৃত বা সংশোধিত না হয় সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। কোথাও কেউ ঠাকুরের নাম করে কোনও উদ্ধৃতি দিলে বা উদ্ধৃতি সহ কিছু লিখলে সেটি যাচাই না করে গ্রহণ করা কদাচ উচিত নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের যেমন মানুষের পরম উদ্ধাতা, তেমনি আমার কিছু মতলববাজ মানুষের তাঁকে ভাঙানোর সম্ভাবনাও প্রবল। মহাপুরুষদের নিয়ে ব্যবসাও বিরল কিছু নয়। তাই ঠাকুরের জীবৎকালে প্রকাশিত বাণী ও গ্রন্থগুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ঋত্বিকদের দেবতা আখ্যা দিয়ে গেছেন। তাঁর ঋত্বিকরা যদি প্রকৃত ঋত্বিকোচিত চলনায় নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন তাহলে বিনা আয়াসেই তাঁরা মানুষের চোখে দেবোপম হয়ে উঠবেন। কিন্তু এঁদের ওপর অন্যান্য চাপ সৃষ্টি করে অর্থ সংগ্রহ ও পাইকারি দীক্ষার বাধ্যবাধকতা আরোপ করলে যাজন, যজন, যজমান পরিচর্যা সবই নষ্ট হয়ে যাবে। দিশাহারা ঋত্বিকেরা তখন চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়বেন। ঠাকুর ঋত্বিকরা তা পারেন যদি তাঁরা তন্নিষ্ঠ থাকেন। নিষ্ঠা ও ভক্তিতে দ্বিচারিতা ঢুকে পড়লেই কিন্তু সর্বনাশ। ঠাকুরের ঋত্বিকরা যদি ভ্রষ্ট হন তবে তাঁর আন্দোলনটিও যে থমকে যাবে। কাজেই ঋত্বিকদের ওপর এমন কোনও নির্দেশনামা জারি করা উচিত নয় যাতে ঠাকুরের কাজ ব্যাহত হয়।

দীক্ষা দান এক অতি পবিত্র কাজ। দীক্ষা দেওয়ার সময়ে ঋত্বিক অনবরত হৃদয়ে ঠাকুরকে ধরে রাখবেন। দীক্ষা তো ঠাকুরই দেন, ঋত্বিক প্রতিনিধি মাত্র। দীক্ষা দান করতে হয় অতীব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। সব কিছু ভালো করে অল্প সময়ে সহজ ভাষায় যজমানকে বুঝিয়ে দিতে হয়। অনেক সময়ে বারবার বোঝাতে হয়। ধৈর্য হারালে চলে না। দীক্ষা কোনও অঙ্গই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আচমন থেকে শুরু করে ইষ্টভৃতি অবধি কোনওটাই উপেক্ষার বিষয় নয়। ঠিকমতো দীক্ষা হলে ঋত্বিক তা নিজের শরীর ও মন দিয়েই বুঝতে পারবেন।

দয়াল ঠাকুর প্রবর্তিত স্বস্ত্যয়নী ব্রতর কথা আগেও বলেছি। স্বস্ত্যয়নী ব্রত ধারণ করে প্রতিদিন অর্থ রাখার পর মাসান্তে অর্থাৎ তিরিশ দিনের দিন তিনটি টাকা শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে টাকা জমা রাখতে হয়। কখনও ওই টাকা কোনও মন্দির প্রকল্পে বা শ্রীশ্রীঠাকুরেরও অন্য কোনও কাজে দেওয়া যায় না। কারও নির্দেশেই নয়। স্বস্ত্যয়নী সম্পর্কে ঠাকুরের সুস্পষ্ট এবং কঠোর নির্দেশ আছে, সেই নির্দেশ কখনও লঙঘন করার অধিকার কারও নেই। স্বস্ত্যয়নী ব্রতধারীরা যদি এ বিষয়ে সতর্ক না হন তাহলে ভবিষ্যতে তার ফল ভোগ করতে হবে। কারণ, ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রতকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। কতবার কত প্রসঙ্গে যে ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ঠিকমতো পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তার হিসেব নেই। Divine economy বলে কতবার উল্লেখ করেছেন। স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থে কেনা জমিতে যে একদিন সারাদেশ ভরে যাবে এমন আশাও প্রকাশ করেছেন। ঠাকুরের এত কিছু বলা থাকা সত্ত্বেও কেন স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ শ্রীমন্দির বা অন্য কোথাও দেওয়ার প্রথা চলু হয়েছে? এতে যে ঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করে তাঁকে অপমানই করা হয়। আর স্বস্ত্যয়নী করার অভীষ্ট ফল লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শুধু অর্থই নয়, স্বস্ত্যয়নী অন্যান্য নীতিও অবশ্য পালনীয়। এই ব্রত যে মানুষের জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদকে কতখানি ফলিত ও প্রত্যক্ষ করে তোলে তা যথার্থ ব্রতধারী বুঝতে পারবেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বস্ত্যয়নী ব্রত সম্পর্কে যা বলেছেন ঠিক ঠিক তা পালন করার মধ্যেই মানুষের পরম মঙ্গল নিহিত

রয়েছে। এই ব্রতর কোনও অঙ্গই লঙঘনীয় নয়। যাঁরা স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ শ্রীমন্দিরে দিয়ে স্বস্ত্যয়নীর দায় এড়াচ্ছেন তাঁদের এই মহান ব্রতর শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা নেই। এই ব্রত ধারণ করাই তাঁদের বৃথা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কোনও উদ্দেশ্যে কী করতে বলেন তা অনুধাবন করাই ভক্তের কাজ। তাঁর বাণী বা কথার সংশোধন বা পরিবর্তন ভক্তির পরিচায়ক নয়।

কাদের ঠাকুর

ঠাকুরের কথা, ঈশ্বরের কথা, পরম পিতার কথা, ধর্মের কথা বুঝবার জন্য সকলের জীবনেই দুঃখ, সংকট বা সমস্যার একটা পটভূমি বোধ হয় দরকার। বাস্তবপক্ষে মানুষ এমনিতে যেমন বা যতটাই ঈশ্বরবিশ্বাসের ভাবে ভাবিত হোক না কেন সংকট বা সমস্যা এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে যেমনভাবে তাঁকে খোঁজে তেমন সুখের সময়ে নয়। আর দুঃখ হল ঈশ্বরবিশ্বাসের একটা পরীক্ষাও। এর ভিতর দিয়েই তাঁর সকাশে যাওয়া সহজতর হয়। ঋণমুক্ত হওয়া যায় নানা প্রবৃত্তির অভিভূতি থেকে, আর প্রবৃত্তি বা রিপুগুলিকে চেনাও যায় সহজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে যখনই কিছু লেখার জন্য লেখনী ধারণ করার কথা ভাবছি তখনই এক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এসে আমাকে আন্দোলিত করেছে। থেকে গেছি। মনে হয়েছে, আমি বোধ হয় পেরে উঠব না! পেরে উঠব না, কারণ এঁর জীবন আরও আরও পূর্বতন মহাপুরুষদের মতো সহজ ও সরল ভক্তিরসাশ্রয়ী নয়। ইনি সনাতন আর্য হিন্দু ধর্মের শক্ত ভিতের ওপরেই মনুষ্য সমাজকে দাঁড় করাতে চান বটে, কিন্তু ওঁর ধর্মাচরণ এত বেশি আচরণ-সাপেক্ষ এবং এত সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, এঁর দর্শন, সাহিত্য কাব্য এতই গভীর ও নতুন যে সহজ বুদ্ধিতে এঁর পরিমাপ করতে গেলে ঠিক থই পাওয়া যায় না। যা তিনি বলেছেন তা সারাটি জীবন ধরে নিজে কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করেছেন, কোথাও কোনও খেলাপ নেই। কখনও কারও সঙ্গে আপস-রফায় যাননি, একটা জীবন তিনি কখনও নিজের বলা কথার উলটোটি বলেননি, নিজের দেওয়া উপদেশের বিরুদ্ধে চলেননি। আচরণশীলতা, চর্চা, অভ্যাসের ভিতর দিয়ে ধর্মাচরণকে তিনি ফলিত ও জীবনমুখী করে দেখিয়ে গেছেন, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কল্পনাবিলাস, অহেতুক কৃপা বা ঈশ্বরের কৃপণ দানপ্রাপ্তি নয়। ধর্ম মানুষকে উচ্ছল, অনাসক্ত, অনলস, উজ্জ্বল, দক্ষ ও সফল করে যদি তুলতেই না পারে তবে ধর্মের আর কোনও উদ্দেশ্য দিয়ে আমাদের কাজ নেই।

ধর্ম কথার অর্থ যা ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে যা ধারণ করে এবং তার বুদ্ধিকে যা অবাধ করে। মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য কিছু না কিছু থাকবেই। ধর্ম

তার এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই ফুটিয়ে তোলে। দীক্ষা অর্থে দক্ষতা। মানুষ তা স্ববৈশিষ্ট্যে দক্ষ হয়ে উঠে নিজে যখন সার্থক হয় এবং অপরকে সার্থক করে তোলে তখনই প্রকৃত ধর্মাচরণ হল। বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, সাধন, ব্রহ্মচর্য এসব যদি নিজের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে মানুষের প্রকৃতিদত্ত বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলিকে জীবনমুখী করে নিয়োগ করা যায় তাহলে সন্ন্যাস ব্রহ্মচার্য আপনিই আসে।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে ঈশ্বরবিশ্বাস বলে আমার কিছুই তেমন ছিল না। গুরুবাদের তীব্র বিরোধীও ছিলাম আর বিশেষ করে বিরাগ ছিল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতি। নানা গুজব ও রটনা তো ছিলই তাঁর সম্পর্কে।

কিন্তু জীবনের এক দুর্বহ দুঃখের দিনে পাকেচক্রে যখন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম তখন তিনি ঈশ্বর না গুরু না অবতার তা কিছুই বুঝিনি, কিন্তু এক লহমায় তাঁকে আমার আপন বলে মনে হয়েছিল।

এই 'আপনজন' বলে মনে হওয়াটাই এমন এক অলৌকিক বোধ যা সহজে বোঝা যায় বটে, কিন্তু বহু বাক্য দিয়েও কিছুতেই বোঝানো যায় না।

আমরা কয়েক বন্ধু তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। প্রসূন মিত্র, শশাঙ্ক সরকার, চন্দন মজুমদার, মুকুল গুহ এবং আমি। শশাঙ্ক সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিল, একটি ইংলিশ মিডিয়াম মিশনারি স্কুলে চাকরি করে। লম্বা, লকলকে, সুদর্শন এই যুবকটিও জীবনে এক প্রবল ধাক্কা খেয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল একদা। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে সে দীক্ষা নিয়েছিল বটে, কিন্তু স্বভাবত কিছু খেয়ালি হওয়ায় সে দীক্ষার পর করণীয় কিছুই করত না। বড়লোকের আদুরে ছেলে ছিল সে, তাই স্বভাব কিছুটা উগ্র, কিছুটা অগোছাল। নিক্কো বোর্ডিং ছিল হ্যারিসন রোডের ওপর, আমহার্স্ট স্ট্রিট ক্রসিং-এর কাছে। সেখানে সে থাকত। বাথরুমের পাশে, ছোট্ট ডবল সিটেড ঘরে। আমার সঙ্গে যখন তার পরিচয় তখন সে জীবনের সেই বড় ধাক্কাটা সামলে ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরেছে। নিরামিষ খায়, ধ্যান করে।

আমি যখন মানসিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত হয়ে ভিতরে ভিতরে জ্বালা-যন্ত্রণায় জ্বলে খাক ও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি, যখন আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য পথ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধিতে দেখা দিচ্ছে নানা ওলটপালট, তখন একদিন শশাঙ্কর ঘরে গিয়ে হানা দিলাম। তার সাদা চাদরপাতা পরিছন্ন বিছানা, তার পরিষ্কার জামাকাপড়, টেবিলে এবং দেওয়ালে ঠাকুরের ছবি—এসবের মধ্যে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন ভালো লাগতে লাগল। যতক্ষণ শশাঙ্কর ঘরে থাকতাম ততক্ষণ মনটা বেশ ভালো থাকত। আর শশাঙ্কও বুঝতে পেরেছিল, আমার মানসিক সংকট চলছে। তাই সে বলত, আমার মাস্টারির সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাক্ষণ আমি তোমার জন্য এ-ঘরে অপেক্ষা করব। তোমার যখন খুশি এসো, মাঝরাত হলেও দ্বিধা কোরো না।

বাস্তবিকই শশাঙ্ক তখন আমাকে মস্ত এক সহায়তা আর সহচার্য দিয়েছিল। না দিলে কী যে হত তা ভাবতেও আজ আতঙ্ক হয়।

মৃত্যুচিন্তা, নশ্বরতার চিন্তা মানুষকে যখন পেয়ে বসে তখন ভূতের মতোই পায়। আর তীব্র ওই বিষাদরোগ এমনই সাংঘাতিক যে, শত্রুরও যেন ওই রোগ না হয়, এমন প্রার্থনা স্বতই মনে আসে। শশাঙ্কর ঘরে গেলে কিছুক্ষণের জন্য যে ওই পাষাণভার থেকে আমার মন মুক্ত থাকত সেটা আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করতাম। মনে প্রশ্ন হত, তবে কি এ ওর ঠাকুরেরই প্রভাব?

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে অনেক অপপ্রচার ও রটনা আছে। কতকাল আগে থেকে 'শনিবারের চিঠি' ও অন্যান্য ব্যক্তি এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত ঠাকুরের বিপক্ষে গেলেও তাঁরা পরেপ্রকারে স্বীকার করেছেন যে, মানুষটি ক্ষমতাবান। ইনি লোককে সম্মোহিত করে রাখেন! তাঁর চারিত্রিক অপবাদও প্রচুর রটিত হয়। আবার যাঁরা স্বচক্ষে ঠাকুরের কীর্তনযুগের লীলা দেখেছেন তাঁরা তাঁর বিরোধী হয়েও সভয়ে তাঁকে এড়িয়ে চলেছেন। আমরাও এসব বিষয়ে সচেতন ছিলাম।

শশাঙ্ক যখন ঠাকুরের কথা একটুআধটু আমাকে বলার চেষ্টা করত তখন কিন্তু আমি তেমন প্রতিবাদ করতাম না। আমি চুপ করে বসে শুনতাম। এবং ঘরের পরিমণ্ডলে একটি মৃদু নিরাময়কারী শান্ত মণ্ডলকে অনুভব করতাম। আমার তাপিত হৃদয় যেন শান্ত হয়ে তার উদ্যত ফণা নামিয়ে নিত।

তিন-চার দিন বাদে শশাঙ্ক একদিন বলল, চল, খোদ কর্তার কাছে গিয়ে তোমার মানসিক সংকটের কথা বলবে। দ্যাখো না, কী হয়।

প্রস্তাবটা আমার খুব খারাপ লাগল না। মনে হল, উনি হিপনোটাইজ করলে করুন না। আমার এখন সম্মোহিত থাকারই প্রয়োজন। দুঃসহ দুর্বহ এই বিষাদ আমি আর বইতে পারছি না।

প্রসূন, শশাঙ্ক, মুকুল, চন্দন আর আমি। আমাদের সকলেরই বয়স তখন তিরিশের এদিক বা ওদিক। আমার নিজের বয়স তখন উনতিরিশ। ১৯৬৫ সালে জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারির শুরু। সঠিক তারিখ মনে নেই। রাত্রির ট্রেনে আমরা পাঁচজন হইহই করে চেপে বসলাম। গল্পগুজবেই পথটা প্রায় কেটে গেল। যশিডি মোটে ছয় ঘণ্টার রাস্তা। ঢুলতে ঢুলতে যখন ভোর রাত্রে 'যশিডি' 'যশিডি' চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে নামলাম তখন কনকনে শীত।

যশিডি থেকে সৎসঙ্গ আশ্রম মাইল পাঁচেকের পথ। স্টেশনে ভাঁড়ে গরম চা খেয়ে টাঙায় চেপে রওনা দেওয়া গেল। আর সেই সঙ্গেই জুড়িয়ে গেল দুটি চোখ আর বুক। কোন এক রহস্যময় অলৌকিক পুরুষের সন্নিধানে চলেছি আমরা, কিন্তু যাওয়ার পথের প্রাকৃতিক শোভাও যে অনুপম। ছোট ছোট টিলা, আদিগন্ত উচ্চাবচ প্রান্তর আর লালমাটির

এই দেশটির প্রেমে পড়ে যেতে হয় প্রথম দর্শনেই। প্রাকৃতিক শোভা আশৈশব আমি বড় কম দেখিনি কিন্তু দেওঘরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে আজও সম্মোহিত করে তত আর কোনও জায়গা নয়।

পথে যেতে যেতে পাঁচ জনে মিলে নানা রঙ্গ-রসিকতা আর ঠাট্টা-ইয়ার্কি হচ্ছিল। প্রসূন অর্থাৎ আকাশবাণীর প্রসূন মিত্র এক সময়ে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে চাকরি করেছে। কিন্তু তখন সে ঠাকুরের কাছে যায়নি বা তাঁকে কখনও দ্যাখেনি। শশাঙ্ক ছাড়া আমরা আর কেউই দেখিনি তাঁকে। আমার বুকটা মাঝে মাঝে গুড়গুড় করছিল। ধর্মের বকলমে কত ভণ্ডামিই তো আছে, ইনি খাঁটি না ভেজাল তা কী করে বুঝব?

দেওঘর সৎসঙ্গ নগরের প্রবেশপথে যে তোরণ এখন রয়েছে তা তখন ছিল কিনা মনে নেই। যতদূর জানি, ছিল না। লেভেল ক্রসিং পার হয়েই বাঁ ধারে চমৎকার কম্পাউন্ড ঘেরা চৌধুরী ভিলা। কোনও বড়লোক একদা বানিয়েছিলেন, সৎসঙ্গ বাড়িটি কিনে নিয়ে গেস্ট হাউস বানিয়েছে। মাঝখানে হলঘর আর গুটি চারেক শোওয়ার ঘর, সামনে বেশ বড় একটি লন।

এই বাড়িতে থাকতেন পরেশদা, অর্থাৎ পরেশচন্দ্র ভোরা। এখন ইনি সৎসঙ্গের মুখপত্র 'আলোচনা'-র সহকারী সম্পাদক। সেই সাতসকালে তাঁর ঘুম ভাঙানো হল। উনিও কবোষ্ণ লেপের আশ্রয় ছেড়ে উঠে এসে উজ্জ্বল হাসিমুখে আমাদের গ্রহণ করলেন। সেই অমলিন হাসি তাঁর আজও অম্লান আছে।

একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমরা মাইলখানেক দূরে আশ্রমে রওনা হলাম। রাজনারায়ণ বসু রোডটি এতই শান্ত বৃক্ষছায়ায় সমাহিত যে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। চারদিকে ভোরের একটি পরিচ্ছন্ন আবহ।

সবে রোদ ফুটেছে। আমরা গিয়ে আশ্রমের চৌহদ্দিতে ঢুকলাম।

ঠাকুর তখন নিরালা নিবেশে বসতেন। মাঝখানের উঠোনে সামিয়ানা ছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু তাঁর পার্লারে একুট রোদ পড়েছিল, এটা মনে আছে।

একটু দূর থেকেই তাঁকে দেখা যাচ্ছিল। পার্লারের মস্ত মস্ত খোলা জানালা দিয়ে তখন অবারিতই দেখা যেত তাঁকে।

মুক্তকণ্ঠে বলি, এমন রূপ জন্মেও দেখিনি। তাঁর দেহবর্ণ ছিল তাম্রাভ গৌর। তখন তাঁর বয়স সাতাত্তরের মতো। ওই বয়সে সে অমন দেবোপম রূপ কোনও মানুষের থাকতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না। তাঁর পরনে ছিল চিরাচরিত ধুতি, গায়ে একখানা ফতুয়া, কাঁধের ওপর দিয়ে আলগোছে ফেলে রাখা একখানা বালাপোশ। তামাকের গন্ধে ম ম করছে চারপাশ আর ওই পার্লার থেকে ধূপ বা অন্যান্য গন্ধদ্রব্যর এবং কাঠের নিজস্ব গন্ধ এবং সর্বোপরি তাঁর দৈবী উপস্থিতির এক সুঘ্রাণ মিলেমিশে এমন একটা পরিমণ্ডল রচনা করেছিল যে, ভারি মনোরম লাগল লাগল আমাদের।

কিন্তু যে জিনিসটি আমাদের আমূল চমকে দিয়েছিল তা হল তাঁর দুখানি চোখ। সেই দুই চোখের বর্ণনা কী ভাবে দেব? বহুবার চেষ্টা করে দেখেছি, পারিনি। আয়ত দুই বিশাল চক্ষু থেকে কারুণ্যের আলো হীরকদীপ্তির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। চোখ যে অত দ্যুতিময় হতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। অন্তর্ভেদী সেই চোখের দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকাই ছিল অসম্ভব। সুন্দর চোখ তো অনেকেই থাকে, কিন্তু ওরকম যোগীচক্ষু বিরল।

প্রসূনই আমাকে বলল, এঁকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু প্রকৃত যোগীচক্ষুর অধিকারী এই মানুষটির কাছে আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল।

ঠাকুর কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশি। যা শুনতেন তা মন দিয়ে নিবিষ্ট হয়ে শুনতেন। একটি দুটি কথায় জবাব দিতেন। তাঁর পার্লারে ভোর থেকে রাত্রি অবধি অবিরল মানুষের যাওয়া আসা। ওরকম মানুষ-মাতাল আমি তো কখনও দেখিনি। পার্লারটাই ঠাকুরের শোওয়া-বসা, দিনরাত্রি অবস্থানের ঘর। কিন্তু সেই ঘরে অন্দর ও বাইর একাকার হয়ে গেছে। লাগোয়া একটি ঘরে বড়মা থাকেন, সে ঘরখানাও দিনরাত্রি মানুষের সমাগমে মুখরিত।

দেখেশুনে মনে প্রশ্ন হল, ইনি খান বা ঘুমোন কখন? এঁর কি ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই?

ধীরে ধীরে জেনেছি, সেই কৈশোরকাল থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু ছিল না, এখনও নেই। সারাদিন এক জনস্রোত এসে এই মহাসমুদ্রের কাছে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে। আর মানুষও যে কত রকম! উচ্চতম কোটি থেকে নিম্নতম কোটির, বিচিত্র ও বহুবিধ এত মানুষকে সামাল দেওয়া যার-তার কাজ তো নয়।

আমাদের প্রথম মুগ্ধতা ধীরে ধীরে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল। যতবার তাঁর কাছে যাই, ততবারই যেন মনে হয়, এঁর মতো কাউকে তো কখনও দেখিনি! হাজার জন মানুষের মধ্যে থাকলেও এঁকে আলাদা বলে চিনে নিতে এক লহমাও লাগে না।

রে হাউজারম্যান নামে মার্কিন সৎসঙ্গী সেই তিরিশের দশক থেকে ঠাকুরের কাছে আছেন, তিনি একদিন আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন, ঠাকুরের কাছে গেলে তুমি ইলেকট্রিসিটির মতো কিছু কি টের পাও?

বাস্তবিক ঠাকুরের কখনও স্পর্শ না করলেও আমি দু-একবার তাঁর তিন-চার ফুট দূরত্বের মধ্যে গেছি। আর তখন যে এক তড়িৎবাহী পরিমণ্ডলকে খুব স্পষ্ট অনুভব করেছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেমন যেন গা শিউরে উঠত, অদ্ভুত এক অনুভূতি হতে থাকত।

প্রথমবারের কথা বলি। ঠাকুর যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি এই তিন স্তম্ভের ওপর তাঁর জীবনাদর্শকে স্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। যাই হোক, যজন, যাজন ও ইষ্টভৃতি এই তিনটি নীতির মধ্যেই জীবনের যত কিছুর পরিপূরণী শক্তি রয়ে গেছে।

শুনতে ছোট্ট—তিনটি কথা। কিন্তু কার্যত এই তিনটি নীতি যে-কোনও মানুষেরই অমৃত-অভিসারে পরম পাথেয় এবং এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ। যজন কথার মধ্যে নিহিত আছে ব্যক্তিগত নামধ্যান-পরায়ণতা। জপধ্যান নিয়ে অনেক কথা আছে। বীজ নামও আছে অনেক রকম। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎনাম গ্রহণ করার পর এই নাম জপের যে প্রত্যক্ষ শরীরী স্বরূপ অনুভব করেছি তা আমার মতো নাস্তিককে খুবই বিস্মিত করেছিল। শুধু আমার অভিজ্ঞতা বলে কথা নয়, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সৎনাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরাই কয়েকদিন নিয়মমতো এই নাম জপ করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা যে কত বিচিত্র, অনুভূতি যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গকে ধরেছে তার ইয়ত্তা নেই। সহজ স্বাভাবিক ধ্যানেই শঙ্খনাদ ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সত্তাকে অনুভব করা যায়। তবু এসব অনুভূতি বা উপলব্ধিকে ঠাকুর খুব বেশি প্রশ্রয় দিতেন না। এক সময়ে এমন হয়েছিল যে, শিষ্যরা ধ্যানের নেশায় খুব বুঁদ হয়ে থাকতেন, কাজকর্মে গা করতেন না। ঠাকুর তখন এই সব অনুভূতি কিছুটা হ্রাস করে দেন। নামধ্যানে যে আধ্যত্মিক উন্নতি হয় তাতে তো সন্দেহ নেই, কিন্তু কাজকর্মের ভিতর দিয়ে হাতেকলমে যদি জগতের মঙ্গল করার উদ্যোগ না থাকে তবে সেই আধ্যাত্মিকতার মূল্য কী? ঠাকুর যে ধর্ম করার জন্য এসেছেন তা ফলিত ধর্ম, তা সকলকে নিয়ে, গোটা জগৎকে মঙ্গলাভিমুখী করার ধর্ম, তা শুধু ব্যক্তিগত মোক্ষ নয়। ধর্ম মানেই অস্তিত্বকে রক্ষা করে বর্ধনের পথে অগ্রসর হওয়া, সবাইকে নিয়ে। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের যেরকম পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভর করতে হয়, সেরকম পারিপার্শ্বিকও আমাদের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই নিজের যদি ভালো চাই তাহলে পারিপার্শ্বিকরেও ভালো চাইতে হবে, তাকেই পোষণ দিতে হবে, পালন করতে হবে। এই সরল লজিক মানতে বোধ হয় আপত্তি হবে না। ধর্ম অর্থে জীবন ও বৃদ্ধির ধর্ম, অন্য কোনও ধর্ম নেই।

ঠাকুর যখন ধর্মকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিলেন, সহজসাধ্য করে তুললেন, ধর্মের ফলিত রূপ যখন আমরা একটু একটু উপলব্ধি করতে লাগলাম, তখনই ধর্ম সম্পর্কে অনেক ধোঁয়াটে ধারণা, অনাবশ্যক কল্পনা, ধাঁধা কেটে যেতে লাগল, অনেক কঠিন তত্বকথা হয়ে যেতে লাগল সরল সহজ।

কিন্তু এসব উপলব্ধি হয়েছে পরে। ঠাকুরকে নিয়ে আমাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার কথা সবে তো শুরু হয়েছে।

প্রথমবার দেওঘরে আমরা বোধ হয় পাঁচ দিন ছিলাম। আশ্রমের বাইরে দোকানে সুস্বাদু আলুর চপ, কচুরি, বাঁধাকপির বড়া দেদার খাই। ভাঁড়ের পর ভাঁড় চা, আর সেই সঙ্গে আড্ডা-বিতর্ক। সেই বিতর্কের সবটাই ঠাকুরকে নিয়ে। ঠাকুরকে তখনও আমরা গ্রহণ করিনি। ওদিকে শিষ্যরা আমাদের নানাভাবে ঠাকুরের মহত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছেন, যাজন করছেন। আমরাও তর্কে মেতে জাল কেটে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি।

তখন দীক্ষা, গুরুকরণ ইত্যাদি ভাবতেই আমাদের ভেতরটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ওসব মানি না। ঘোরতর নাস্তিক আমি তো ছিলামই তখন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যখনই ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসি তৎক্ষণাৎ মনটা যেন ভালো হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে একটু কেমন যেন গা শিরশির করা ভয় ভয় ভাবও। কারণ তাঁর ওই দুখানা অন্তর্ভেদী চোখ। কিছুতেই ওই চোখে চোখ রাখতে পারতাম না। বুক দুরদুর করত।

ঠাকুরের কাছে আমার জিজ্ঞাসা ছিল অনেক। কিন্তু আমি স্বভাবে লাজুক বলে এবং ঠাকুরের কাছে সর্বদাই বহু লোকের ভিড় বলে কিছুতেই কোনও কথা জিগ্যেস করতে পারতাম না। কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় বেশ কিছুক্ষণ আমি ঠাকুরের কাছে বসে থাকতাম। কেন কে জানে, সেই সান্নিধ্য আমার বড় ভালো লাগত।

ঠাকুরের কাছে দুটো প্রশ্ন নিবেদন করব বলে মনে মনে স্থির করে রেখেছিলাম। তীব্র মানসিক বিষাদ শুরু হওয়ার পর থেকে আমি নানা ধর্মগ্রন্থ খামচাখামচি করে পড়েছি। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলিতে কল্পান্তের কথা পেয়েছিলাম। কল্প যখন শেষ হয় তখন বিশ্বজগতের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিহারা হয়ে পরস্পর এক হয়ে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। সেই পিণ্ড আবার একদিন বিস্ফোরিত হয় এবং নতুন করে সৃষ্টি হয় গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা। কল্পান্ত সত্যিই ঘটে কিনা এ ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, দীক্ষা গ্রহণ না করে যদি আমি ঠাকুরের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী চলি তাহলে কোনও উপকার বা উন্নতি হবে কিনা। দীক্ষা গ্রহণের অর্থ তখন অন্যের কাছে মাথা নোয়ানো, আত্মবিসর্জন এবং আত্মাবমাননা।

যাই হোক, কল্প আর দীক্ষা বিষয়ে আমার দুটি প্রশ্ন কিছুতেই উত্থাপন করে উঠতে পারছিলাম না।

একদিন সন্ধেবেলা নিরালা নিবেশে ঠাকুরের সামনে বেশ লোকের ভিড়। নানা আলোচনা চলছে। ঠাকুরের কাছে যাঁরা বসেছেন তাঁরাই জানেন সর্বদাই সেখানে জ্ঞানের চর্চা হত, শুধু থাকলেই কত বিষয় যে জানা হয়ে যেত তার ইয়ত্তা নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার বন্ধুরা চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে গেছে। আমি বিষণ্ণ মনে নিরালা নিবেশে ঠাকুরের কাছে বসে আছি। সেদিন বেশ ভিড় ছিল পার্লারে। কলকাতা থেকে কোনও এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসেছেন, তিনিই ঠাকুরকে নানা প্রশ্ন করছিলেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনাও করছিলেন।

আমার কানে সেসব আলোচনা খানিকটা ঢুকছিল, খানিকটা ঢুকছিল না। আমি ঠাকুরের দিকে চেয়ে বসেছিলাম আর ভাবছিলাম, ইনি কি সত্যিই ক্ষমতাবান? নাকি সবই ফককিকারি? ইনি কি সত্যিই শান্তি দিতে পারেন? না কি নানা কথার যে প্রচার শুনি

সেগুলোই সত্যি? মনে নানা সংশয়, হাজারো প্রশ্ন, প্রবল অবিশ্বাস, তীব্র আকর্ষণ, সব মিলিয়ে-মিশিয়ে এক সাংঘাতিক দোলাচলের মধ্যে তখন আমার দিন কাটছে।

হঠাৎ এই অন্যমনস্কতার ভিতরেই কানে এল কলকাতার সেই পণ্ডিত ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা ঠাকুর, উপনিষদে যে কল্প এবং কল্পান্তের কথা আছে তা কি সত্যিই হয় নাকি? কল্পের শেষে সব সৃষ্টির লয় হয়ে বিশ্বজগতের সব ম্যাটার পিণ্ডাকার ধারণ করে এবং তার থেকেই আবার সৃষ্টি শুরু হয়।

আমি এই প্রশ্ন শুনে সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসলাম। কিন্তু ঠাকুর এ প্রশ্নের কী যে একটা উত্তর দিলেন তা দূর থেকে ভালো শুনতে পাইনি। তবে ঠাকুর খুবই সংক্ষেপে কিছু একটা বলেছিলেন।

পণ্ডিত এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ঠাকুর, যদি কেউ ভেবে থাকে যে, আপনার কাছে দীক্ষা না নিয়ে যদি সে আপনার নির্দেশিত পথে চলে তাহলে তার কোনও উন্নতি হবে কি?

এ প্রশ্নটি শুনেই আমি এমন স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে গেলাম যে, সে অবস্থার কথা বর্ণনা করতেও পারব না। হঠাৎ দেখি, ঠাকুর স্মিতমুখে প্রসন্ন চোখে আমার দিকেই চেয়ে আছেন।

কী জানি কেন, হঠাৎ ভীষণ ভয় হল। মনে হল, এখানে আর এক মুহূর্তেও থাকা উচিত হবে না। এঁরা নিশ্চয়ই জাদুবিদ্যা জানেন, থটরিডিং জানেন বা ওই ধরনেরই অপ্রাকৃত কিছু। ঠাকুর সম্ভবত আমার মনে অভ্যন্তরটাও দেখতে পান। অনেক গোপন কথা তো উনি জেনে নেবেন!

এক সাংঘাতিক আতঙ্কে আমি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে সবেগে পার্লার থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে যেখানে আমার বন্ধুরা আড্ডা মারছিল সেই চায়ের দোকানে হাজির হলাম।

আমার উদভ্রান্ত চেহারা ও আতঙ্কিত দৃষ্টি দেখে বন্ধুরা সচকিত হয়ে উঠল। প্রসূন বলল, কী রে, কী হয়েছে?

আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, এখানে আমাদের আর থাকা ঠিক হবে না। চল, কলকাতায় চলে যাই।

কেন, কী হল রে হঠাৎ?

দিস ম্যান ইজ ডেনজারাস।

কে, ঠাকুর?

হ্যাঁ, ঠাকুর ছাড়া আর কে?

বন্ধুরা তখন আমাকে ধরে বসাল। সকলেই সাংঘাতিক কৌতূহল। ঘটনার কথা শুনতে চাই সবাই। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ধীরে ধীরে ঘটনাটা বললাম।

আশ্চর্যের বিষয়, কেউই অবিশ্বাস করল না এবং আমি যতটা ভয় পেয়েছিলাম সেরকম ভয়ের অনুভূতিও কারও হল না। প্রসূনের চোখ তো ছলচল করতে লাগল। সে বলল, ঠাকুরকে প্রথম দেখেই আমি বুঝেছি, ইনি সামান্য মানুষ নন। অনেক সাধু দেখেছি বটে কিন্তু এরকম যোগীচক্ষু আমি আর দেখিনি।

প্রসূন দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিল কয়েক বছর আগে। তখনকার সময়ে সে কখনও ঠাকুরের কাছে আসেনি বা আসবার আগ্রহ বোধ করেনি। বরং বিরাগই ছিল। এবার সে আপশোশ করে বারবার বলছিল, না এসে খুব ভুল করেছি। এতগুলো বছরে অনেক এগিয়ে যাওয়া যেত।

সেই দিন, অর্থাৎ এই ঘটনার পর বাকি রাত্রিটা আমার কিছু অস্থিরতার মধ্যে কেটেছিল। ঘটনাটি যে অলৌকিক, ব্যাখ্যার অতীত তা বুঝতে পারছি, কিন্তু মন মানছে না, যুক্তিবোধ বলছে, যদি কাকতলীয় হয়ে থাকে! এরকম তো হতেই পারে।

কিন্তু মন যে একটা ঝাঁকুনি খেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। নানা যুক্তিতর্ক আপন মনেই আউড়ে গেছি। প্রতিদিনই কেউ না কেউ আমাদের যাজন করেছেন, তর্কবিতর্ক বিস্তর হয়েছে, কিন্তু ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ বা দীক্ষা দেওয়ার বিষয়ে কেউই আমাদের সদুত্তর দিতে পারেননি। শুধু ঠাকুরকে দেখেই আমাদের যা কিছু যাজন হচ্ছিল।

এর মধ্যেই একদিন বিকেলে চৌধুরী ভিলায় এলেন ননীগোপাল চক্রবর্তী। সৎসঙ্গের পরবর্তীকালের সম্পাদক ননীদা। তীক্ষ্ণ ও অতিশয় তাঁর চেহারা। ধবধব করছে গায়ের গৌরবর্ণ। তেমনি তাঁর অনুপম বাচনভঙ্গি।

তিনি এসে বললেন, আপনাদের কী সব প্রশ্ন আছে বলে শুনেছি। যদি দয়া করে আমাকে বলেন তবে আমি সাধ্যমতো জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

মানুষটির চেহারা এবং বাচনভঙ্গি আমার বেশ ভালো লাগল। তবু একটু তর্ক বাধানোর জন্য বললাম, আমাদের অনেক প্রশ্ন। সব কিছুর জবাব কি আপনি দিতে পারবেন?

ননীদা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

আমি প্রশ্ন করলাম, মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব কি থাকে? তার কি সত্যিই পুনর্জন্ম হয়?

ননীদা কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, আমি একটু রূঢ়ভাবে বাধা দিয়ে বললাম, দেখুন, এ ব্যাপারে শাস্ত্রে-টাস্ত্রে যা আছে সেগুলো আমরা জানি। ওসব তত্বকথা দয়া করে বলবেন না। আমার প্রশ্ন হল, মৃত্যুর পর যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে তা আপনি বাস্তবভাবে জানেন কিনা, এ ব্যাপারে আপনার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কিনা। যদি না থাকে তবে বাগবিস্তার বৃথা।

ননীদা কিন্তু সামান্য মাত্রও বিচলিত হলেন না। বললেন, ঠিক আছে, তাই বলব। শুধু একটি ছোট কথা বলে নিই। আপনি যে আছেন এটা যদি সত্যি হয় তবে আপনি যে

ছিলেন সেটাও সত্য হতে বাধ্য। আর আপনি যে থাকবেন সেটাও সত্য। আপনি আছেন অথচ আপনি ছিলেন না বা থাকবেন না এটা তো হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক ভাবেই এ কথা বলা যায় তো!

আমি প্রসূন মুকুল চন্দন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমিই বললাম, ঠিক আছে। আপনার কথাটা মেনে নিচ্ছি। এবার বলুন।

ননীদার মেয়ের গল্প বোধ হয় অনেকেই শুনে থাকবেন। দীক্ষাপূর্ব জীবন ওঁর শিশুকন্যা জলে ডুবে যায়। জীবন্ত অবস্থাতেই তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ননীদা স্বয়ং লাইফ সেভিং সোসাইটির সদস্য এবং জলেডোবা মানুষের চিকিৎসাও তিনি জানতেন। মেয়েকে জল থেকে তুলে তাকে উপুড় করে শুইয়ে ম্যাসাজ করার সময় যখন মেয়েটির সাড়া ফিরে আসছে সেই সময় এক গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার এসে উলটো পরামর্শ দেয় এবং ননীদা সেই বিপদে বুদ্ধি স্থির রাখতে না পেরে সেই পরামর্শ মেনে ম্যাসাজ করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। মেয়েটি মারা যায়। ননীদা এই ঘটনা থেকে শোকে এবং ক্ষোভে উন্মাদের মতো হয়ে যান। তাঁর অধীত বিদ্যা তিনি প্রয়োগ করতে পারলেন না। হাতুড়ের পরামর্শে বুদ্ধিভ্রংশের মতো উলটো কাজ করে বসলেন। ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই জীবনে একজন সদগুরু না লাভ করলে যাবতীয় বিদ্যা, কর্ম, প্রয়াস বৃথা যাবে। এই তীব্র আকুলতা ও অনুসন্ধিৎসা থেকেই তিনি একদিন ঠাকুরকে খুঁজে পান। শুধু তাই নয়, দীক্ষাগ্রহণের পর যে মেয়েটি তাঁর ঘরে জন্ম নিল সে হল জাতিস্মর। সে জলে ডুবে যাওয়ার কথা বলত। মেয়েটি জন্মানোর পরই ঠাকুর ননীদার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, তুই কাঁদিস কেন আগের মেয়েটির জন্য? ও-ই তো আবার তোর কোলে এসেছে।

গল্পটি তিনি এমনভাবে বলেছিলেন আমাদের মন ভারি আর্দ্র হয়ে গেল। এর পর ননীদার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা হল। ঠাকুরকে নিয়ে, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, সংঘ নিয়ে।

ননীদা চলে যাওয়ার পর আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবর্তা বললাম অনেকক্ষণ। চন্দন অর্থাৎ চন্দন মজুমদার বয়সে আমাদের সকলের ছোট, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, অশোকনগরে বাড়ি এবং দর্শন শাস্ত্রে এম.এ। চন্দন এমনিতে চমৎকার স্বভাবের ছেলে, বিনয়ী, ভদ্র, ভালোমানুষ। তবে দর্শনচিন্তায় বিভোর থাকত বলে সে ছিল ভীষণ অন্যমনস্ক আর ভুলোমনের মানুষ। হঠাৎ চন্দন আমাকে বলল, দাদা, আমি ভেবে দেখলাম আমাকে দীক্ষা নিতে হবে। আজই।

আমি অবাক হবে বললাম, বলিস কী? সত্যি দীক্ষা নিবি?

মনে আছে চন্দন হাতজোড় করে বলেছিল, আপনি বাধা দেবেন না। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষের ভিড়ে আমি সামান্য একজন চন্দন মজুমদার দীক্ষা নিয়ে যদি বেঁচে

থাকার পথ পাই তবে দোষ কী?

বাধা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং চন্দন দীক্ষা নেবে শুনে আমি মনে মনে কেমন যেন দারুণ খুশিই হয়েছিলাম। বললাম, নে দীক্ষা। আমারও ধারণা, ঠাকুরের বেশ শক্তি আছে। উনি সত্যিকারের পাওয়াফুল মানুষ।

সেই সন্ধেবেলাতেই চন্দন ঠাকুরবাড়ি চলে গেল। ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তাঁরই নির্দেশে শরৎদার (হালদার) কাছে সৎনাম গ্রহণ করল।

প্রসূন চাকরি করত আকাশবাণীতে। সে ভয়েস অফ আমেরিকায় সংবাদ-পাঠকের পদে ইন্টাররভিউ দিয়ে এ করকম চাকরি পেয়ে বসেছিল। ডাক এলেই ওয়াশিংটনে গিয়ে কাজে যোগ দেবে। সেই চাকরির আশায় সে আকাশবাণীর চাকরিতেও ইতিমধ্যে ইস্তফা দিয়ে বসে আছে। সংসারে তখন তার প্রবল টানাটানি। কীসে কার যাজন হয় তা বলা খুবই কঠিন। হাজার কথাতেও একজন হয়তো মাথা নোয়ায় না। কিন্তু একটা কথাতেই তার হয়তো সব কাঠিন্য জল হয়ে যায়। ঠিক মনে নেই কে, তবে কেউ একজন প্রসূনকে খুব আন্তরিকভাবে বলছিল, দাদা সুদূর আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন, সৎনামটা গ্রহণ করে যান। ভালো হবে।

এত দিন তুমুল তর্কবির্তকে যে কাজ হয়নি একজন নাংলা লোকের এই নরম কথায় সেই কাজ হল। প্রসূন দীক্ষা নেবে বলে মনস্থ করে ফেলল। চন্দন যেদিন দীক্ষা নিল তার পরদিনই সকালবেলায় প্রসূন গিয়ে হাজির হল ঠাকুরের কাছে। তার মনোগত ইচ্ছে ছিল ননীদার কাছে নাম নেওয়া। ঠাকুর, কী আশ্চর্য, ননীদাকেই আদেশ দিলেন প্রসূনকে দীক্ষা দিতে।

আমাদের দলের দুজনের এই দীক্ষাগ্রহণ আমার কাছে একট স্বস্তিদায়ক ঘটনা। দীক্ষান্তে এই দুজনের মধ্যে কী পরিবর্তন হত তা পর্যবেক্ষণ করাই ছিল আমার বাসনা। যদি দেখি ওদের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটছে তাহলে দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারেও আমিও অস্তিবাচক চিন্তা করতে পারি।

রে হাউজারম্যানকে আমার প্রথম আলাপেই বড় ভালো লেগে ছিল। এই ছিন্নবাধা মানুষটি তখন ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন। মার্কিন নাগরিক হাউজারম্যান সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন। ব্রহ্মদেশে তাঁর পোস্টিং ছিল। সেখান থেকে বদলি হয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার পথে কলকাতায় কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল। সেই সময় আকস্মিক ভাবে স্পেন্স নামে একজন দেশবাসীর সঙ্গে দেখা।

স্পেন্স বিদগ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক, তদুপরি ধনীর দুলাল। তবু বহুকাল আগে তিনি স্বদেশে, আত্মীয়স্বজন ও সম্পদ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে এসেছেন, আর ফিরে যাননি। নীলচক্ষু, উদাসদৃষ্টি এই মানুষটিকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়।

স্পেন্স হাউজারম্যানকে ঠাকুরের কথা বলতেন। বলতেন, কী অনিত্য বস্তু নিয়ে মেতে আছ! বাঁচতে চাও তো, অমৃতের স্বাদ পেতে চাও তো চলো হিমাইতপুর।

হাউজারম্যানের যুদ্ধক্লান্ত হতাশাগ্রস্ত মন তক্ষুনি সায় দিল। আমেরিকার ওই উন্মত্ত জীবনস্রোত আর সুখের পিছনে নিরন্তন ছোটবার একঘেয়েমি তাঁকে আর টানছিল না। স্পেন্স-এর সঙ্গে তিনি রওনা হয়ে পড়লেন হিমাইতপুর।

তারপর দীর্ঘদিন কেটেছে। তিরিশ বছরের ওপর তিনি রয়ে গেছেন ঠাকুরের কাছে। ঋত্বিকের পাঞ্জা পেয়েছেন। বহু মার্কিন নারী-পুরুষকে তিনি এনেছেন ঠাকুরের কাছে।

আমি যখন তাঁকে আশ্রমে প্রথম দেখি তখন তাঁর বয়স চল্লিশের এধার ওধার। উৎসাহ উদ্দীপনায় টগবগে এক তরুণ। ঠাকুর বলতে পাগল। খুব বিড়ি খেতেন আর সারা আশ্রমের নানা কাজে ছুটে বেড়াতেন। ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন, সদাচঞ্চল এই মানুষটিকে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। তুলানায় স্পেন্স ছিলেন গম্ভীর, স্বল্পবাক, চিন্তাশীল, ধীরস্থির।

(হাউজারম্যান পরবর্তীকাল আমেরিকায় ঠাকুরের মন্দির তৈরি করেছেন এবং এখন সেখানেই ঠাকুরের কাজ নিয়ে আছেন।)

আশ্রমে আরও কয়েকজন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ডেগলাল। ডেগলাল স্থানীয় লোক। এক সময়ে সে ঠাকুরের এবং আশ্রমেরও প্রবল শত্রু ছিল। লাঠিবাজি সে বড় কম করেনি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ঠাকুরের অমেয় এবং অমোঘ আকর্ষণে তাঁর সান্নিধ্যে আসে। নিরক্ষর ডেগলালকে ঠাকুরই লেখাপড়া শেখান, বি.এ পাস করান এবং আমেরিকায় পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ডেগলালকে আমি যখন প্রথম দেখি, সে তখন ঠাকুরের একরোখা ভক্ত। ঠাকুরের বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দ করলে লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়। প্রসূন না জেনে চায়ের দোকানের আড্ডায় কী একটু ঠাট্টা করেছিল, ডেগলাল তাকে এই মারে কি সেই মারে। ঋত্বিকের পাঞ্জাধারী ডেগলাল কার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককেই দীক্ষা দিয়েছে।

আমার সঙ্গে তার একরকম ভাবসাব হয়ে গেল।

দিন পাঁচেক অবস্থান, আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ ঘটল বটে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হওয়ার অবকাশ ছিল না। পাঁচ দিনে অবশ্য যথেষ্ট সৌহার্দ্য ঘটল পরেশদার সঙ্গে। এই মানুষটি আমাদের রেঁধে খাওয়াতেন, যত্নআত্তি করতেন। আর ছিলেন সদাপ্রসন্ন, হাস্যমুখ ও উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী। এত বছর বাদে আজও তাঁকে সেই রকম লাগে। তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

আমাদের প্রথম আশ্রয়স্থলটির নাম চৌধুরী ভিলা। সামনে মস্ত লন, বড় বড় ঘর, বিশাল বাথরুম, সব মিলিয়ে একটি অভিজাত বাড়ি। চারদিকে গাছগাছালি বিস্তর। তেমনই নির্জনতা। পাশেই যশিডি-দেওঘর রেললাইন। রোদ-হাওয়ার ছড়াছড়ি ছিল চৌধুরী ভিলায়।

পরিবেশটি আমার অনেক বাল্যস্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল। আমরা ছেলেবেলায় একরকমই নির্জন ও সুন্দর সব রেল বাংলোয় ছিলাম। চৌধুরী ভিলা থেকে ঠাকুরবাড়ির দূরত্ব এক কিলোমিটারের মতো হবে। ওই রাস্তাটুকুর বড়ই সৌন্দর্য ছিল। আজও আছে। তবে নির্জনতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গাছপালা বেশ কেটে ফেলা হয়েছে। আর রাস্তাটি হয়েছে জরাজীর্ণ। আমরা ওই পথটুকু যখন গল্প করতে করতে হাঁটতাম তখন মনে হত এমন চমৎকার সময় তো কখনও কাটাইনি।

দীক্ষা নেওয়ার আগে থেকেই ঠাকুরের প্রতি আমার একটা প্রচ্ছন্ন ভয়মিশ্রিত আকর্ষণ জন্মায়। ভয় কেন, তা আগেই বলেছি। মনে হত ইনি আমার ভিতরের সব কথা টের পাচ্ছেন। আর আকর্ষণ অনুভব করেছি তাঁর ওই অহংশূন্য ভাবটির জন্য। ঠাকুর এক রহস্যে ভরা মানুষ, দেবতা কিনা জানি না। তাঁর সম্পর্কে নানা অপপ্রচার আছে, সেগুলো নিয়েও ভাবছি। আবার মানুষটিকে অস্বীকারও করতে পারছি না।

প্রসূন তো বলেই ছিল, উনি যদি শত পাপও করে থাকেন তবু এঁর মতো শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক মানুষ আমি আর দেখিনি। বহু সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছি, কিন্তু এরকম যোগীচক্ষু জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

পরবর্তী জীবনে সাধু-সন্ন্যাসী দেখার বিস্তর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আমি সকলের মধ্যে ওই উজ্জ্বলতা, ওই কাচ-স্বচ্ছ গাত্রত্বকের ভিতর দিয়ে বিকিরিত প্রভা, দুই আয়ত চক্ষুর অন্তর্ভেদকারী দৃষ্টি খুঁজেছি, পাইনি। আসলে তাঁর মতো দ্বিতীয়টি আর নেই কিনা।

যাই হোক, প্রথমবার ঠাকুরকে দেখে আমার অনেক দিন ধরে জমে ওঠা ধ্যান-ধারণায় একটা ঘা পড়েছিল। ভিতরে ভিতরে এক ধরনের আগ্রহ ও পিপাসা জেগে উঠেছিল। কিন্তু বাধা দিচ্ছিল অহংবোধ। দীক্ষা গ্রহণ মানেই তো মাথা নোয়ানো, নিজের স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তাকে বিসর্জন দেওয়া এবং খানিকটা ছোট হয়ে যাওয়া। যদি অন্যের হাত ধরেই আমাকে চলতে হয় তবে আর আমার কৃতিত্ব রইল কোথায়? এই সব ছেলেমানুষি দ্বিধাদ্বন্দ্ব তখন প্রবল। দোটানার মধ্যে পড়ে মনটা বারবার বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

এই দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়েই চার-পাঁচদিন দেওঘরে অবস্থানের পর কলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বর্গ থেকে বিদায়। জীবনে ওই তিন-চারটে দিনের মতো সুন্দর সময় খুব কমই কাটিয়েছিল! খুব গভীর জীবনবোধের একটা আভাস, এক রহস্যে ভরা জগৎ যেন চুম্বক পাহাড়ের মতো আকর্ষণ করছিল সর্বক্ষণ। নিজেকে এই পরিবেশে থেকে প্রায় ছিঁড়ে আনতে হল। কিন্তু চোখে মায়াঞ্জনের মতো লেগে রইল ঠাকুরের অপার্থিব মুখশ্রী, দেওঘরের অসামান্য প্রকৃতি আর নানা টুকরো স্মৃতি।

কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভালুকের মতো চেপে ধরল মেলাঙ্কলিয়া। যে বিষাদ-রোগ কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে এখন তা বহু গুণ বেড়ে হালুম বাঘের মতো বিশাল হাঁ করে গোটাগুটি গিলে ফেলতে চাইছিল আমাকে। ওরকম মেলাঙ্কলিয়া রোগ

আমার মহা শত্রুরও যেন না হয়। তার যে কী গভীর যন্ত্রণা, কী নৈরাশ্যের খাদের মধ্যে যে বাস করতে হয় তখন, কী বান্ধবহীন ও একা লাগে নিজেকে তার বোধ হয় সঠিক বর্ণনাও হয় না। 'দুঃখ রোগ' নামে একটা গল্পের মধ্যে তার কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়েছিলাম।

ফিরে আসার পর মেলাঙ্কলিয়া যেমন বাড়ল তেমনি মনটা উন্মুখ হয়ে রইল ঠাকুরের দিকে। উনি কি সত্যিই পারেন আমার বিষাদরোগ সারাতে? না কি সবটাই সাজানো ব্যাপার? ব্যবসা? যত ভাবি তত ছটফট করতে থাকি। ঠাকুর সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারগুলোকে তখন কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। তাঁকে যে অন্যরকম দেখে এসেছি।

ঠাকুর নিজেই বলেছেন, সন্দেহ হল ঘুণপোকার মতো। প্রশ্রয় দিলে ভেতরে ভেতরে সে মানুষকে ফোঁপরা করে দেবেই। সন্দেহের বিষ তখন আমাকেও কুরে কুরে খাচ্ছে।

দীক্ষা-পূর্ব জীবনে আমার অভিজ্ঞতায় দুটি ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা ঘটেছিল। তারই একটি ঘটনা এই সময়ে।

তখন মেলাঙ্কলিয়ার জন্য রাতে ভালো ঘুম হত না। বেঙ্গেল কেমিক্যালস বা ওই ধরনের কোনও কোম্পানির একটা ব্রোমাইড মিকশ্চার তখন বাজারে চালু ছিল। আমি সেই ওষুধ এক শিশি কিনে এনেছিলাম, রাত্রে শোওয়ার সময় সেই ওষুধ খেয়ে শুলে শরীরটা কেমন যেন কাঠের মতো আড়ষ্ট বোধ হত। যাকে ঘুম বলে তা হত না বটে, তবে এক ধরনের ঝিমুনি আসত।

সেই ওষুধ খেয়ে একদিন শুয়েছি। একতলার মেসবাড়ির জানালার ধারেই আমার চৌকি। মাঝরাতে হঠাৎ এক বিকট শব্দে তন্দ্রা কেটে গেল। জানালার ধারে রাস্তার ওপর অন্তত পনেরো-কুড়িটা কুকুর প্রাণান্তকর চিৎকার করে ঝগড়া লাগিয়েছে, সেই শব্দে ঘুম ভেঙেই আমার বুকের মধ্যে এমন ধপাস ধপাস করতে লাগল যে, মনে হচ্ছিল এক্ষুনি এই চেঁচানি বন্ধ না হলে মরে যাব। শরীরের সমস্ত স্নায়ু যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল সেই শব্দে। মাথা ঝিমঝিম করছিল। এমনিতে কুকুরের ঝগড়া কতই তো শুনেছি, এখনও শুনি। কিন্তু তখন দুর্বল স্নায়ু, দুর্বল মাথা, অনিদ্রা-পীড়িত শরীর ও মস্তিষ্কে সেই শব্দ যেন মুহুর্মুহু হাতুড়ির ঘা মারছিল। আমি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম। এবং কে জানে কেন অস্ফুট স্বরে বললাম, তুমি আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না, আমি তোমার কাছেই দীক্ষা নেব।

এই কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পলকে যেন একলব্যের বান কুকুরের মুখ বন্ধ করে দিল। বিবাদমান অতগুলি কুকুর কী করে যে একসঙ্গে একেবারে চুপ করে গেল তা কে বলবে? আর সেই কুকুরেরাই পালিয়ে মাড়োয়ারি হাসপাতালের কাছ বরাবর গিয়ে আবার ঝগড়া শুরু করল। কী আশ্চর্য, দূরাগত সেই কুকুরের চ্যাঁচামেচি ঘুমপাড়ানি গানের মতোই ক্রিয়া করল আমার ওপর। বহুদিন বাদে প্রগাঢ় নিদ্রায় আমি ঢলে পড়লাম।

সকালে উঠে প্রাতকৃত্যাদি সেরেই গেলাম শশাঙ্কর কাছে। বললাম সামনে সরস্বতী পুজোর ছুটি আছে, চলো দেওঘর দিয়ে দীক্ষা নেব।

এই কথায় শশাঙ্কর যে আনন্দ হল তা দেখার মতো। আবেগে সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই সময় পেটের এক নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল সে। সেই যন্ত্রণা প্রায় ভুলে গিয়ে সে যেতে রাজি হল আমার সঙ্গে।

এইখানে বলে রাখি শশাঙ্কর সেই পেটের যন্ত্রণা কিছুদিন পর পেপটিক পারফোরেশন বলে নির্ধারিত হয়। একেবারে শেষ সময়ে ডায়াগোনসিস হয়েছিল। আর চব্বিশ ঘণ্টার মতো দেরি হলে হয়তো সে বাঁচত না। মেডিকেল কলেজে অপারেশনের পর সে বেঁচে যায়।

যাই হোক নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতী পুজোর আগে রাত্রে আমি আর শশাঙ্ক দেওঘর রওনা দিলাম। মনটা নানা আশঙ্কায়, অনিশ্চয়তায়, দ্বিধায় ভরা। দীক্ষা নেওয়াটা ঠিক হবে কিনা তখনও বুঝতে পারছি না। আধো ঘুমের মধ্যে কুকুরের চিৎকারে বিভ্রান্ত হয়ে অনির্দেশ্য একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম, দীক্ষা নেব। শুধু সেই কথা রাখতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চলেছি। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? আর অনির্দেশ্য ব্যক্তিটি যে ঠাকুরই তা জেনেও বারবার মনে হচ্ছে, আর কেউ নয় তো?

এই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মানুষের খুবই স্বাভাবিক। আমরা তো কোন ছার, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দেরই ছিল।

মনে আছে রাতের ট্রেনে আমি আর শশাঙ্ক রওনা হলাম। শশাঙ্ক বেশ অসুস্থ। পেটে অসহ্য ব্যথা। ভিড়ের গাড়িতে শোওয়ার জায়গা পাওয়া গেল না। বসে বসে গল্প করতে করতে চলেছি।

মাঝরাতে যশিডি পৌঁছে স্টেশনের বাইরে চা খেয়ে নিলাম। তারপর টাঙা ধরে সোজা চৌধুরী ভিলা। ভোররাত্রের দেওঘর আমার মনের ওপর এখনও সেই প্রথমবারের মতোই মায়াজাল বিস্তার করে। পরিষ্কার বাতাস, বনজ গন্ধ এবং উচ্চাবচ ভূপ্রকৃতি সব মিলিয়ে একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ।

দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে পরেশদা ঘুমচোখে এসে দরজা খুলে দিলেন এবং আমাকে দেখে সত্যিকারের খুশির হাসি হাসলেন। দীক্ষা নিতে এসেছি, ঠাকুরের আশ্রয় নিতে এসেছি, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় যে-কোনও ভক্তের কাছে আর কী হতে পারে?

স্নান সেরে, পরিচ্ছন্ন হয়ে ঠাকুরবাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। সবে সূর্যোদয় হয়েছে। নিরালা নিবেশে প্রসন্ন মুখে ঠাকুর বসে আছেন। চারিদিক সমাসীন তাঁর প্রিয় মানুষেরা।

প্রণাম করে বললাম, ঠাকুর, আমি দীক্ষা নেব।

ঘাড় কাত করে সম্মতি দিলেন। তারপর কার দিকে যেন চেয়ে বললেন, ওরে, শৈলেনকে ডাক তো।

শৈলেন অর্থাৎ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তখন সদলবলে ইউনিভার্সিটির জন্য কোথায় যেন জমি দেখতে যাচ্ছেন। গাড়ি প্রস্তুত। তাঁর তখন সময় নেই। খবর পেয়ে ছুটে এলেন।

ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়ে শৈলেনদাকে বললেন, একে দীক্ষা দিয়ে দে।

শৈলেনদা সামান্য দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তাঁকে এক্ষুনি রওনা হতে হবে। অথচ দীক্ষা দিতে গেলে যাওয়াই হবে না। হাতজোড় করে বললেন, ঠাকুর আমি যে কাজে বেরোচ্ছি, সময় নেই।

ঠাকুর সামান্য ধমকের সুরে বললেন, যা বলছি কর গা। দীক্ষা দিয়ে দে।

শৈলেনদা ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে আমাকে নিয়ে এলেন দীক্ষাগৃহে।

কোনও পূর্ব পরিচয় ছিল না শৈলেনদার সঙ্গে। সেই প্রথম পরিচয় হল। মানুষটি ভারি বিবেচক, বিনয়ী, মৃদুভাষী। আমাকে সামনে বসিয়ে দীক্ষাদানের উদ্যোগ করছিলেন।

কিন্তু তখন আমি মনের যে জ্বালায় জ্বলছি তাতে মানসিক ভারসাম্য বলতে কিছু নেই। মনে হচ্ছিল এই যে দীক্ষা নিতে যাচ্ছি এর ফলে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা গেল, দাসখৎ লিখে দেওয়া হল এবং বিসর্জন দেওয়া হল আত্মমর্যাদা। কিন্তু এর বিনিময়ে আমি কী পাব? হয়তো কিছুই নয়। হয়তো গোটা ব্যাপারটাই একটা ফককিকারি।

তাই আমি দীক্ষা নেওয়ার প্রাক মুহূর্তে শৈলেনদাকে বললাম, দেখুন আমি দীক্ষা নিচ্ছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমার সেই উদ্দেশ্য যদি সফল না হয় তাহলে ছ-মাস পর কিন্তু আমি দীক্ষা ছেড়ে দেব।

এ কথায় শৈলেনদা থতোমতো খেয়ে গেলেন। তারপর বললেন, কী উদ্দেশ্যে আপনি দীক্ষা নিচ্ছেন তা কি আমাকে বলবেন আপনি? আমি আমার মেলাঙ্কলিয়ার কথা তাঁকে সংক্ষেপে বললাম। তারপর জানালাম এই মেলাঙ্কলিয়া সারে কিনা তা আমি ছ-মাস দেখব, কাজ না হলে দীক্ষা ছেড়ে দেব।

শৈলেনদা একটু হেসে বললেন, দেখুন, ঠাকুরের কাছে ধর্ম করতে কম লোকই আসে। সকলেই আসে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য। বেশির ভাগই আর্ত মানুষ।

আমিও সেইরকমই এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

শৈলেনদা খুব নিরুদ্বেগ গলায় বললেন, আপনার চেয়ে ঢেড় বেশি সংকট নিয়ে লোকে এখানে আসে। সেই তুলনায় আপনার সমস্যা কিছুই নয়। আপনি ছ-মাস সময় চেয়েছেন। আমি বলি ততদিন লাগবে না। ঠাকুরের এই অমৃত মন্ত্র নিয়ে যদি সাত দিনও আপনি ঠিকমতো চলেন তাহলেই হবে। আমার প্রশ্ন হল আমি যা যা বলে দেব তা ঠিকমতো করতে পারবেন তো?

পারব। ডুবন্ত মানুষ তো কুটো আঁকড়ে ধরে।

তাহলে ছ-মাস নয়, সাত দিনে যদি আপনার সমস্যা সমাধান না হয় তাহলেই দীক্ষা ছেড়ে দেবেন।

তাঁর ওই মনের জোর এবং বিশ্বাসের গভীরতায় আমি বেশ প্রভাবিত হলাম। যদিও তাঁকে আমার তখনও এতটা বিশ্বাস হচ্ছে না। সন্দেহ কাজ করছে ভিতরে ভিতরে।

বিনা আড়ম্বরে দীক্ষা হয়ে গেল। বীজমন্ত্রটি পাওয়ার পর থেকেই আমি ভয়ে হোক, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হোক, যান্ত্রিকভাবে জপ করে যেতে লাগলাম।

দুপুরে ঠাকুরের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করতেই তা মঞ্জুর হল। তখন ঘরে বিশেষ কেউ ছিলেনও না। আমি আর পরেশদা নিরালা নিবেশে তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। ঠাকুরের সঙ্গে আমার দূরত্ব মাত্র দু-তিন হাত। অত কাছে আর কখনও যাইনি তাঁর। সেই প্রথম তাঁর নৈকট্যে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর চারদিকে একটি অভ্রান্ত বৈদ্যুতিক বলয় রয়েছে। তাঁর অস্তিত্ব থেকে একটা কোনও শক্তি বা দ্যুতি ব্যাখ্যার অতীত কোনও আমাকে স্পর্শ করেছে।

ঠাকুর মন দিয়ে আমার সমস্যার কথা শুনলেন। আমি অবশ্যই খুবই সংক্ষেপে আমার কথা বলেছিলাম। দু-তিন মিনিটও বোধহয় লাগেনি। আসলে তাঁর অত কাছাকাছি বসে আমার কেমন স্নায়ুদৌর্বল্য ঘটেছিল। বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ওরকম কোনও ভাগবৎ মানুষের দেখা তো কখনও পাইনি। ওই অভ্রভেদী ব্যক্তিত্ব, দুটি হীরকদীপ্ত চোখ, অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি এসবই আমার কাছে এক পরম বিস্ময়।

ঠাকুর আমার সমস্যাকে কিন্তু একেবারেই গুরুত্ব দিলেন না।

মাথা নেড়ে বললেন, তুমি উলটোটা ভাবো। তুমি অজর, অমর, মৃত্যুর কথা ভাববে কেন? ওসব ভাবতে নেই।

আমি বললাম, ভাবতে তো চাই না। কিন্তু ভাবনা আসে যে।

ঠাকুর তেমনি দ্বিধাহীন ভাবে শুধু বললেন, ওসব ভাবতে নেই।

এর মধ্যেই পরেশদাকে তামাক সাজাতে বললেন। তারপর চুপ করে গেলেন। আমি তাঁর দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি, আর তাঁর অসহনীয় দীপ্তি সহ্য করতে মা পেরে মাথা নীচু করছি বারবার।

শেষে বললাম, আপনি আশীর্বাদ করবেন, যেন আমি এই মানসিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারি।

ঠাকুর মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিলেন।

প্রণাম করে চলে এলাম। তাঁর সঙ্গে আমার একমাত্র একান্ত সাক্ষাৎকার এভাবেই শেষ হল।

ডুবন্ত মানুষ যেমন কুটো আঁকড়ে ধরে আমি তেমনি ধরে ছিলাম সদ্যলব্ধ বীজমন্ত্রকে। এটুকু বুঝেছিলাম বীজমন্ত্রটাই আসল। ওই শব্দটাই একমাত্র আমাকে রক্ষা করতে পারে।

আর যদি বীজমন্ত্র জপে কাজ না হয় তাহলে আর কিছুতেই হবে না। তাই দীক্ষা নেওয়ার পরেই আমি পাগলের মতো জপ করে গেছি। যান্ত্রিকভাবে ভক্তি বিশ্বাস ছাড়াই এবং সন্দেহাকুল মনেই পরদিন দেওঘর ছাড়লাম। চলে গেলাম মুরি। সেখানে আমার ছোট পিসিমা তখন থাকতেন। সেখানে দু-দিন অবস্থানের পর কলকাতায় ফিরে এলাম। আর ফিরেই বুঝতে পারলাম, আমার মেলাঙ্কলিয়া বা বিষাদরোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে।

বিষাদের কাঁটাটা ঠাকুর কখন সন্তর্পণে তুলে নিয়েছেন তা আমি অনেক ভেবেও আজ অবধি বুঝে উঠতে পারিনি।

মাঝে মাঝে অলৌকিক নিয়ে আমাকে কেউ কেউ প্রশ্ন করে। আমি তার সদুত্তর দিতে পারি না। অলৌকিককে তো ব্যাখ্যাও করা যায় না। কিন্তু জানি, আমাদের বুদ্ধির যুক্তির অতীত কত কি ঘটে যায়।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমার জীবনে ঠিক এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি।

কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনও ঘটনাই ঘটে মা যার পিছনে পারম্পর্য নেই বা যা অযৌক্তিক বা অলৌকিক। ঠাকুর নিজেও তাই বলতেন, কোনও ঘটনা আমাদের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না বলেই যে তা অলৌকিক তা কিন্তু নয়। কারণ থাকেই, তবে হয়তো তা আমাদের সাধারণ যুক্তি বা বোধের অগম্য।

বীজমন্ত্র বা নাম জপ করলে রোগ সারে, অনেক সংকটের সমাধান হয় তা আমি নিজের বত্রিশ বছরের দীক্ষিত জীবনে অসংখ্যবার দেখেছি। নাম যে কতখানি অঘটনঘটনপটীয়সী তা আমার ঠেকে শেখা।

দুই

যে তিনটি স্তম্ভের ওপর ঠাকুর তাঁর জীবনসত্যকে স্থাপন করেছেন তা হল যজন যাজন ইষ্টভৃতি। এই আপাতসহজ তিনটি আদর্শকে অনুসরণ করলে যে-কোনও মানুষের ভিতরকার সুপ্ত ক্ষমতা জেগে উঠতে থাকে। সে যে কতখানি হয়ে উঠতে পারে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু এই তিনটি করণীয়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আপাতসহজ মনে হলেও মোটেই তা সহজ নয়। ওই তিনের মধ্যেই জীবন-রহস্যের সব সমাধান। আর করতে গেলে দেখা যায় যজন যাজন ইষ্টভৃতি এই তিনটি পরস্পর এতই সম্বন্ধযুক্ত যে একটি না করলে অন্যটি হয়ে ওঠে না। যজন যাজন ইষ্টভৃতি নিয়ে বহু জন বহু কথা বলেছেন, বহু ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবু শেষ হয়নি। আরও বহুকাল ধরে এই নিয়ে আলোচনা গবেষণা হতেই থাকবে।

ঠাকুর স্বয়ং এক অতলান্ত রহস্য। একদিকে চূড়ান্ত বাস্তববাদী অন্যদিকে এক অপার্থিব অলৌকিক প্রেমিক পুরুষোত্তম। কীর্তনের যুগে, ঠাকুর যখন নব্য যুবা, তখন নিজেকে ঘিরে এক ভাবপরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। তখন তিনি সমাধিস্থ হতেন প্রায়ই, আর তাঁর যাঁরা ঘনিষ্ঠ তাঁরাও উন্নীত হতেন ভাবময় এক পর্যায়ে। তখন ধ্যান করতে বসলেই নানা জনের নানা দর্শন ও শ্রবণ হত। ঠিক কতদিন চলেছিল এই অবস্থা তা সঠিক বলা মুশকিল। তবে ক্রমে ক্রমে এই ভাবমুখিনতা হ্রাস করে কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকলেন ঠাকুর। তার কারণ খুবই সহজ। কর্ম ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই, মোচন নেই, সম্পূর্ণতা নেই। কর্মের কথাই বারংবার আমাদের শাস্ত্রাদিতে বলা হয়েছে।

এই কর্মযুগ যখন শুরু হল তখন ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গতিবেগ সঞ্চার করে দিলেন তার মধ্যে। কাজের সেই দ্রুত তালের সঙ্গে কীর্তন যুগের সঙ্গীরা তেমন সঙ্গতি রাখতে পারলেন না। একটু থতোমতো খেয়ে গেলেন। হয়তো একটু ক্ষুব্ধও হলেন কেউ কেউ। বেশ তো ছিল ভাবে মাতোয়ারা হয়ে থাকার ভঙ্গিময় যুগ। তবে এই কর্মকাণ্ড কেন?

আসলে ঠাকুরকে প্রাকৃতজনদের বুঝতে একটু অসুবিধে হয় এই কারণেই। জীবনের অতি দ্রুত তাল তাঁর। এক আয়ুর মধ্যে যেন দশ-বিশ হাজার বছরের কর্মকাণ্ডের ভার দিয়েছিলেন তিনি। এই দ্রুততার সঙ্গে তাল রাখতে পারে কোন মানুষ?

শুনেছি ঠাকুর এত দ্রুতবেগে হাঁটতেন যে তাঁর ভ্রমণসঙ্গীরা দৌড়েও তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে এক ভাসমানতাও ছিল তাঁর। যা কিছু কাজের কথা তাঁর মাথায় আসত তা তৎক্ষণাৎ রূপান্তরিত না করে শান্তি পেতেন না। মাঝে মাঝে ভক্ত শিষ্যদের কাছে এমন সব আব্দার করতেন যেটাকে প্রায় অসম্ভব বা অসাধ্য বলেই মনে হত।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর সেই সব অসম্ভব আব্দার পূরণ করতে নিতান্ত নাংলা সব শিষ্যরাও ঠিক পেরে উঠত। মানুষের যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে ঠাকুরের লক্ষ ছিল সর্বাধিক। অধিকাংশ মানুষই যে নিহিত গুণাবলির সম্যক ব্যবহার করে না, ঠাকুর সেই লুকানো গুণাবলিই টেনে বের করতেন। তাই সামান্য মানুষকে অসামান্য কাজের দায়িত্ব দিতে দ্বিধা বোধ করতেন না। আর এই ভাবে কত অযোগ্যকেই ঠাকুর যোগ্য করে তুলেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

এই অলোকসামান্য দার্শনিক এবং অনন্য চিন্তাবিদ যে বাস্তববোধেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তার দৃষ্টান্ত তাঁর কর্মকাণ্ড। পাবনার হিমাইতপুর গ্রামে তিনি যা গড়ে তুলেছিলেন সেটা বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ব্রিটিশ আমলে অলস বাঙালি যখন মোটামুটি কোনও রকমে বেঁচে থাকাটাই বেঁচে থাকার চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়েছিল, তখন ঠাকুর স্বনির্ভরতার পথ খুলে দিয়েছেন মানুষের কাছে। ইংরেজ বিতাড়নই যে স্বাধীনতা এটা তিনি কখনওই মানতেন না। স্বনির্ভর কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, বাস্তববোধের অধিকারী স্বনির্ভর সমাজ গঠিত না হলে

স্বাধীনতা বা স্বরাজ যে নজরুলের ভাষায় 'পোড়া বার্তাকু'-তে পরিণত হবে তা তিনি বহুবার বলেছেন। মানুষের চরিত্র গঠনের কোনও প্রকৃত প্রয়াস যেমন পরাধীন যুগেও ছিল না, তেমনি এ যুগেও নেই। কিংবা যা আছে তা মনুষ্য চরিত্র অনুধাবন না করেই এক ধরনের ভাসা ভাসা জ্ঞানের ওপর মানুষের চরিত্র গঠনের বিচ্ছিন্ন ও অপ্রতুল প্রয়াস।

ঠাকুরের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই জেনেছেন প্রতিটি মানুষই তাঁর কাছে কেমন পরম সম্পদের মতো ছিল। কোনও মানুষকেই তিনি কখনও তুচ্ছ বা সামান্য ভাবতেন না। প্রত্যেককেই দিতেন তাঁর নিজস্ব মূল্য। আর প্রত্যেকের ভিতরেই দেখতে পেতেন যার যার বৈশিষ্ট্যমাফিক সম্ভাবনার বীজ। মানুষের ওপরেই ঠাকুরের নির্ভর ছিল বলে মানুষকে সম্পদ করে তোলা কত সহজ হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

হিমাইতপুরের মতো গ্রামে তিনি সেই আমলে যে সংগঠন গড়ে তোলেন তা অবিশ্বাস্য। বিশ্ববিজ্ঞান থেকে শুরু করে গেঞ্জিকল, ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ছুতোর কামারের কাজ অবধি সব ব্যাপারেই সৎসঙ্গ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ খুলে বসেছিল। ছিল ওষুধ তৈরির কারখানা, প্রেস ইত্যাদিও। আর এই সব ঠাকুর গড়ে তুলেছিলেন অতি সাধারণ সব মানুষকে নিয়েই।

মানুষের পরিশ্রম করার ক্ষমতা কতখানি তার সম্যক ধারণাই আমাদের নেই। আমরা একটু কাজ করেই বিশ্রাম খুঁজি। ঠাকুরের সঙ্গে যাঁরা করেছেন তাঁরাই জানেন ঠাকুর তাঁর সঙ্গীসাথিদের দিয়ে অতি-মানুষের খাটুনি খাটিয়েছেন। কিন্তু তাতে তাঁদের আয়ুক্ষয় তো হয়ইনি বরং আয়ুবৃদ্ধি ঘটেছে, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য ও কর্মক্ষমতা বেড়েছে বহুগুণ। ডাক্তাররা মানুষকে দিনে আট ঘণ্টা ঘুমোনোর পরামর্শ দেন, কিন্তু ঠাকুর বলতেন, চার ঘণ্টা ঘুমই বহুত। এবং ওই চার ঘণ্টা ঘুমও তিনি বোধ হয় কখনওই ঘুমোননি। দিনের পর দিন ঘুমহীন কেটে যেত তাঁর এবং সঙ্গীদের। নিদ্রাহ্রাসের অভিজ্ঞতা আমারও আছে। দেখেছি, ঠাকুরের কাজকর্ম যজন যাজন নিয়ে থাকলে ঘুম খুব কমে যায় এবং শরীরে আসে বাড়তি উদ্যম।

ঠাকুর ফ্যাটিগ লেয়ার পার হয়ে যাওয়ার কথা বলতেন। অর্থাৎ খুব কঠিন পরিশ্রমের পর যে শ্রান্তি আসে তা সাময়িক এবং মানুষ যদি তার পরও কাজ চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে এক সময় ওই শান্তির ভাবটা কেটে বাড়তি উদ্যম দেখা দেয়। এটা শুধু মুখে বলেই ঠাকুর ক্ষান্ত হননি, করে এবং করিয়ে তবে ছেড়েছেন। ঘুমের ক্ষেত্রেও তাই। মানুষের যখন ঘুম পায় তখন একটু জোর করে জেগে থাকলে ঘুমের ভাবটা কেটে গিয়ে মানুষ আবার চনমনে হয়ে ওঠে।

ঠাকুর অনেক কাজই করতেন প্রচলিত ধ্যানধারণা ও যুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে। যুক্তির পরিধি বড়ই ছোট। বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে পৃথিবীর সব রহস্যের উন্মোচন অসম্ভব।

ঠাকুরের সব ব্যাপারেই ধ্যানধারণা ও বক্তব্য এত স্পষ্ট, দ্বিধাহীন ও পরিষ্কার ছিল, যা এই যুগের দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হব। কখনও কোনও অবস্থাতেই নিজের বক্তব্য থেকে তিনি এক চুল সরে যাননি, আবার কখনও কোনও বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েননি। যে কথা সত্য ও যা মঙ্গলপ্রদ তা অকপটে বলতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না, কিন্তু বলার মধ্যে বিনয় ও হৃদয়গ্রাহিতা ছিল গভীর।

আমার নিজের কাছে ঠাকুরের অনেক কথাই তেমন মনঃপূত হয়নি প্রথম প্রথম। বিশেষ করে বর্ণাশ্রম ও বিবাহ সংক্রান্ত কঠোর মনোভাবে আমার সায় ছিল না। খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার, অন্যের হাতে অন্নগ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারও পছন্দ ছিল না। অত্যধিক ভক্তি ও প্রেমকেও কেমন যেন দাসত্ব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সব ধোঁয়াশা কেটে যেতে লাগল। আপসহীন ঠাকুরের সঙ্গে আপস করে নিতে আমার একটু সময় লেগেছিল এই যা।

তারপর ক্রমে ক্রমে যতই ঠাকুরকে বুঝবার চেষ্টা করেছি ততই সত্যের অনন্ত মুখ খুলে গেছে। তাঁর মধ্যে অবগাহন করতে একবার শুরু করলে আর অন্য কোথাও ডুব দেওয়ার ইচ্ছে হয় না। ঠাকুর কাউকে সর্বত্যাগী সাধু বানাননি, এমনকী যতিদেরও এক ধরনের বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিয়তকর্মীর অনেকেই ছিলেন কঠোর তপস্বীদের চেয়েও অধিক কৃচ্ছ্রসাধনের অভ্যস্ত। সাধুদের জীবন-যাপনে ততটা সংযম এবং কৃচ্ছ্রসাধন নেই। ঠাকুর যেমন চলনায় নিজে চলতেন এবং যেমন চলনা শিষ্যদের মধ্যেও তাঁর অভিপ্রেত ছিল তা বড় সহজ নয়।

ঠাকুরের সাংগঠনিক যুগে এই সন্ন্যাসীপ্রতিম নিয়তকর্মীরাই ঠাকুরের বাণী বহন করে গেছেন ভারতবর্ষের দূর ও দুর্গম প্রত্যন্তে। তাঁরা যে অসাধ্য সাধন করেছেন তার প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয়নি। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দীর্ঘ-প্রবাস, ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা এসবই তাঁদের সয়ে নিতে হয়েছে। আর এর ভেতর দিয়েই ঠাকুর তাঁদের প্রকৃত মানষ হওয়ার পথে ঠেলে নিয়ে গেছেন।

গুরু কে এবং কেমন, গুরুর গুরুত্ব কতখানি তা চোখে আঙুল দিয়ে ঠাকুরই আমাদের প্রথম বুঝিয়ে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন। আজকাল সাধক পুরুষেরা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা দেন বটে, কিন্তু সংকোচবশে কঠোর অনুশাসন তাদের ওপর আরোপ করেন না। খাদ্যাখাদ্য, সদাচার, বর্ণাশ্রম, ব্যক্তিগত সততা, শৃংখলাপরায়ণতা ইত্যাদি ব্যাপারে শিষ্য-শিষ্যাদের তাঁরাও ঢালাও স্বাধীনতা দিয়ে দেন। এর ফলে তাঁরা দীক্ষার ভিতর দিয়ে দক্ষ হয়ে ওঠার সুযোগ কমই পান। দীক্ষার পর তাঁদের চরিত্রে তেমন কোনও পরিবর্তনও আসে না। গুরু একজন মাথার ওপর আছেন, শুধু এই ভরসায় তাঁরা যেমন খুশি চলেন।

ঠাকুরের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি যেমন প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতেন, তেমনি প্রত্যেককে নিত্য পালনীয় অনুশাসনেরও আওতায় আনতেন। শুকনো

উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। যারা তাঁর আশ্রয় নিয়েছে তাদের ভালোমন্দের দায়িত্বও সুতরাং তিনি স্বীকার করে নিতেন। এখনও নেন। তারা কেউ অনিয়ম করলে, বিধিভঙ্গ করলে, উলটোরকম চললে যা ঘটবার তা ঘটত। তার পরেও তিনি ক্ষমা করতেন এবং বিধিমতো আবার তাকে সঠিক পথে চালানোর চেষ্টা করতেন।

আধুনিক যুগে ঠাকুর কিছু কালপ্রাচীন প্রায়শ্চিত্তবিধি পুনঃপ্রচলন করেছেন। এ এক অদ্ভুত দুঃসাহস ও দূরদর্শিতা যুগপৎ তাঁর মধ্যে দেখা গেল। দুঃসাহস এই কারণে যে এই সব ক্লেশদায়ক প্রায়শ্চিত্ত এ যুগের ধৈর্যহীন মানুষের গ্রহণ বা স্বীকার করার কথাই নয়। দ্বিতীয়ত, এই প্রায়শ্চিত্ত কতদূর ফলপ্রসূ তা নিয়েও সন্দেহ থাকাটা স্বাভাবিক। ঠাকুরের দেওয়া এই প্রায়শ্চিত্তবিধি নিয়ে দু-চার কথা বলার প্রয়োজন তো আছেই, তার চেয়েও বড় কথা এই প্রায়শ্চিত্ত জিনিসটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাও দেখা দরকার।

ঠাকুর পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড নয়। শাস্তি নয়। মানুষ যখন সত্তা-বিরোধী কিছু করে তখন সে তার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি থেকে ভ্রষ্টা হয়ে পড়ে। প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে আবার সে চিত্তে অর্থাৎ মঙ্গলে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনও কার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার পর আর ওই কার্যটি কখনও করতে নেই। বারবার অপরাধ করা আর বারবার প্রায়শ্চিত্ত করা কিন্তু মানুষকে ভ্রষ্টই করে।

সামান্য কোনও বিচ্যুতির জন্য সহজ প্রায়শ্চিত্তের বিধান হল, একদিন হবিষ্য করা। বিভিন্ন রকম লঘু বা গুরু বিচ্যুতির জন্য শিশু প্রাজাপত্য, প্রাজাপত্য, পিপীলিকামধ্যস্থ চান্দ্রায়ণ, যবমধ্যস্থ চান্দ্রায়ণ, মহাসান্তপন ইত্যাদির বিধান রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এর মধ্যে এমনই জীবনীয় এক শুদ্ধিকরণ রয়েছে যার কোনও তুলনা হয় না। ঠাকুর লুপ্তপ্রায় এই সব প্রায়শ্চিত্ত বিধিকে আবার প্রচলিত করেছেন মানুষের ক্লিষ্ট, বিচ্যুত চলনাকে আবার গতিবেগসম্পন্ন ও উজ্জ্বল করতে। তার চেয়েও বড় কথা, এই সব প্রায়শ্চিত্ত যে নিতান্তই কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা নয়, এসব যে অতিশয় বাস্তবভাবে ফলপ্রসূ এবং অমৃতবাহী তাও সুপ্রমাণিত হয়েছে। ধর্মীয় বিধিনিষেধের মধ্যে অনেকগুলোই নিছক গোঁড়ামি এবং অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু কিছু বিধিনিষেধ এবং নিদান অতিশয় কার্যকারী। কিন্তু কোনটা গ্রহণীয় কোনটা বর্জনীয় তা বিচার করার মতো সত্যদৃষ্টি তো আমাদের নেই। ঠাকুর সেই অতি প্রয়োজনীয় নির্বাচনটি করে দিয়েছেন দয়া করে।

এই সব প্রায়শ্চিত্ত যাঁরা করবেন তাঁরা প্রভূত উপকার পাবেন ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হবে অপরাধ, পাপ বা বিচ্যুতির জন্য প্রকৃত অনুতাপ আসা চাই এবং পালনের জন্য স্বতসিদ্ধ আগ্রহের সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অনুতাপই হল গোড়ার কথা এবং পাপ বিনিমুক্ত হওয়ার আগ্রহই প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা এনে দেয়।

তবে অদীক্ষিত কারও পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, নামধ্যন-পরায়ণতা এবং ইষ্টনিষ্ঠা ধরে না রাখলে প্রায়শ্চিত্ত উলটো ফলই দিতে পারে। প্রায়শ্চিত্ত করা মানেই

আরও বেশি ইষ্টমুখী হওয়া।

ঠাকুরের দেওয়া এরকম প্রায়শ্চিত্তবিধি অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ আজকাল স্বেচ্ছায় এসব কষ্টকর ব্যাপারে যেতে চায় না বলে অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনে এগুলোর প্রচলন নেই। কাজেই ঠাকুরকে এ ব্যাপারে পথিকৃৎ বলতেই হয়।

আমার নিজের জীবনে এই প্রায়শ্চিত্তের যে কী বিশাল ও গভীর তাৎপর্য আছে তা বোধ হয় ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। তবে প্রায় পাঁচ-ছয় বছরে দারিদ্র্য ব্যাধি একটিমাত্র শিশু প্রাজাপত্যে কেটে গিয়েছিল। অবশ্য অনুতাপও ছিল গভীর।

কতরকমের ভুলচুক যে আমরা সব সময়ে করে চলেছি, নিত্য পাতিত্যের দোষ ঘটে যাচ্ছে তা দেখবার চোখই আমাদের নেই। মানুষ তো নিজের ব্যাপারে ভীষণ রকমের অন্ধ। কিন্তু ভুলচুক ধরতে দ্বিধা করা উচিত নয়। নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিয়মিতভাবে জবাবদিহি আদায় করতে হয়। যত বড় অপরাধই ঘটে থাকুক না কেন ঠাকুর ক্ষমাশীল, ঠিকই আবার পাপ থেকে বিনিমুক্ত করে তুলবেন। আর তাঁর দেওয়া অমৃতবাহী প্রায়শ্চিত্ত করবে শুদ্ধ ও পবিত্র।

এই যুগে বসে ঠাকুর যে সব অমোঘ মুষ্টিযোগ আমাদের দিয়ে গেছেন তা তুলনারহিত। এ যুগের ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ যুগের মানসিকতার সঙ্গে বেখাপ্পা। এই সব মুষ্টিযোগকে আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা ঠকে যাব। এ হাতেকলমে অনুরাগ ও আগ্রহ নিয়ে করে দেখলে তবেই এর গভীরতা ও সার্থকতা বোঝা যায়। তা ছাড়া মানুষের নিহিত গভীর পাপবোধ এবং অনুতাপের দাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথও তো ঠাকুর ছাড়া আর কেউ হাতেকলমে করে দ্যাখাননি।

পাপবোধের যন্ত্রণা যে কী সাংঘাতিক তা আজকালকার মানুষেরা কে-ই বা না জানে? এই পাপবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্বেও উপায় জানা নেই বলে সারা জীবন তাকে এক দুরারোগ্য যন্ত্রণা কুরে কুরে খায়। নানা আধি-ব্যাধি এবং পাগলামিরও সৃষ্টি হয় এই মানাসিক চাপ থেকে। জীবনটা তার কাছে উপভোগ্য, গতিময়, সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হয় না।

অথচ কত সহজেই, সামান্য আয়াসেই যে এগুলোকে কাটিয়ে ওঠা যায় তা ঠাকুরের কাছে না এলে বুঝতে পারতাম না। মানুষের জন্য ঠাকুর যে কত করেছেন তার বুঝি হিসেব হয় না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবিধি তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা বোধকে গভীর করে তোলে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে অদীক্ষিতদের পক্ষে এসব প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব নয়। মনে হয়, ঠাকুরের আশ্রয় ভিন্ন অন্য কোনও ভাবেই এই সব প্রায়শ্চিত্ত তেমন ফলবতী হবে না। কারণ প্রকৃত নামধ্যান-পরায়ণতা ছাড়া কঠোর ব্রতধারণ অর্থহীন। খ্যাপন ও প্রকৃত

অনুতাপই হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তের মূল কথা। আর প্রগাঢ় নাম ধ্যান করলে প্রায়শ্চিত্তের কষ্টটাও তেমন বোধ করা যায় না।

ঠাকুরের বর্ণাশ্রম বিষয়ে মতামত নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

এই একটি বিষয়, যা নিয়ে সারা দেশেই তুমুল আপত্তি উঠেছে বিশেষ করে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল থেকে। বর্ণাশ্রম যে অতিশয় অর্থহীন, যুক্তিহীন কুসংস্কার, এ যে বর্ণহিন্দুদের অপরাপর শ্রেণিকে দাবিয়ে রাখার কৌশলমাত্র সে বিষয়ে অনেকেই সোচ্চার।

কথাটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিকও নয়। ঠাকুরের কাছে আসবার আগে এ ব্যাপারে আমার মতামতও অসুরূপ ছিল। মানুষে মানুষে সমান এই আপ্তবাক্যে আমার গভীর বিশ্বাস ছিল।

ঠাকুরের কাছে আসার পর তাঁর মতামতের যে দু-একটির সঙ্গে আমার দ্বিমত ঘটেছিল তার মধ্যে একটা ওই বর্ণাশ্রম। বর্ণাশ্রম মানেই যে জাতিভেদ এবং বিদ্বেষ এটা আমাদের সমাজেও মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে পড়ে। তার ওপর এই প্রথা খুব একটা কাল প্রচীন নয়। চার বেদের মাত্র একটিতে বর্ণাশ্রমের সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় বলে শিবনাথ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন।

কিন্তু কথা হল, বর্ণাশ্রম নিয়ে হিন্দু সমাজে যতই জল ঘোলা থাকুক এটির মূলে যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ বিষয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। ঠাকুর যখন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে প্রকৃতিতে কোথাও সাম্য নেই, সর্বত্রই এই সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের ভিতরে ওই বর্ণাশ্রমই রয়েছে। আম, জাম, কলা, কমলালেবু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর, গরু, ধান, গম সব কিছুর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রকৃতিতে কোনও একঢালা ব্যবস্থা নেই। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণি ভাগ ঘটেই আছে। মানুষের মধ্যেও যে আছে তা তো অনস্বীকার্য। তবু যে অনেকে আধুনিক বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করতে চায় না তার প্রধান কারণ, বর্ণাশ্রমের চোরা পথ দিয়ে দুর্বলতর শ্রেণির মানুষের ওপর শোষণ ও অত্যাচার চালানো সহজ। আর সে ঘটনা ঘটেছেও অনেক। কিন্তু সেই জন্য ধর্ম জিনিসটাকেই যাঁরা দায়ী করেন তাঁদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রশংসা করা যায় না। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সংঘাত নানা কারণেই ঘটে থাকে, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারও ঘটে থাকে, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারও ঘটে প্রকৃতির নিয়মে। ধর্ম বরং মানুষে মানুষে বিভেদের অবসান ঘটানোর জন্যেই যা কিছু নীতিবিধি দেয়। মনুর অনুশাসন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে সঙ্গত কারণেই। কিন্তু মনুর সংহিতায় যেসব পৈশাচিক ব্যবস্থার বিধান দেওয়া আছে সেগুলোকে প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সে আমলে এরকম তো পুথির লিপিকররা হামেশাই করত।

ধর্মকে নানা ধরনের বিকৃতির পাঁক থেকে ঠাকুর উদ্ধার করেছেন তাঁর অনবদ্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং প্রয়োগের দ্বারা। ঠাকুর কঠোরভাবে বর্ণাশ্রম মানতেন, কিন্তু তার মধ্যে বিভেদের বালাই ছিল না, সৎসঙ্গে চার বর্ণের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সকলেই কি

মিলেমিশে যায়নি? ধর্মের উদ্দেশ্য জীবনমুখী, ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে মঙ্গলে অধিষ্ঠিত করা, ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে যোগ্য সফল ও সার্থক করে তোলা। ঠাকুর যে বর্ণাশ্রম মানতেন তার পিছনে একটা অর্থনৈতিক কারণও ছিল। বর্ণ অনুযায়ী বৃত্তিকে আশ্রয় করলে আজ দেশে যেমন বেকার সমস্যা থাকত না, তেমনি আবার বিচিত্র উৎপাদনে দেখা যেত অতিশয় দক্ষতা।

আজকাল গ্রামীণ সমাজে বেকারের সমস্যা যে এত ভয়াবহ তার কারণ কুটিরশিল্পগুলির অকালমৃত্যু। আমাদের অদূরদর্শিতার ফলে আমরা কুটিরশিল্পের জিনিসগুলি বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন করতে শুরু করেছিলাম। ফলে লাঙলের ফাল, কোদাল, কুড়ুল, দা সবই তৈরি হতে লাগল বৃহৎ ইস্পাত কারখানায়। গাঁয়ের কামার বৃত্তি হারাল। তাঁতিদেরও দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল কলের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। গ্রামের অর্থনীতির বুনিয়াদ এইভাবে ভেঙে পড়ল। ঠাকুর বারবার বর্ণানুযায়ী বৃত্তির কথা বলতেন, যাতে বংশগত দক্ষতা থেকে পরম্পরায় উন্মেষশালীনী বুদ্ধি ও দক্ষতা গজিয়ে ওঠে। বৃত্তি তাহলে অটুট থাকত। গ্রামভিত্তিক ভারতবর্ষকে রাতারাতি শিল্পায়নের মাধ্যমে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে গিয়ে আমরা এই বিপুল অনাবশ্যক বেকার সমস্যা তৈরি করতাম না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঠাকুরকে গ্রহণ করেন শেষ বয়সে। তাঁর অনেক ধাঁধা ও মানসিক দ্বন্দ্ব ঠাকুর মোচন করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও ঠাকুরকে বুঝতে পেরে উঠে পড়ে কাজে লাগবার উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর আয়ুর সময় বিশেষ ছিল না। তার মধ্যে গান্ধীজিকে অনুরোধ করে তিনিই আশ্রম পরিদর্শনে পাঠিয়েছিলেন। এসেছিলেন দেশবরেণ্য অনেক নেতাই। আশ্রমের কর্মকাণ্ড দেখে তাঁরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, এ কথাও সত্যি। কিন্তু ঠাকুরের জীবনমুখী দর্শনের ভিতরে তাঁরা তো গভীরভাবে প্রবেশ করেননি। ফলে ঠাকুর সম্পর্কে তাঁদের বোধটা হল ওপরসা।

বৃহৎ ব্যক্তি বা নেতাদের দিয়ে যে এই আন্দোলন হওয়ার নয় তা বাস্তববাদী এবং প্রবল কাণ্ডজ্ঞান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর ভালোই জানতেন। বিশেষ করে বড় মানুষদের অহং ও নিজস্ব অবসেশন প্রবল হওয়ার তা এই কাজেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ঠাকুর তাই নির্ভর করেছিলেন সাধারণ মানুষদের ওপর। তারা খুবই সাধারণ, অনেকেই শিক্ষা দীক্ষা নামমাত্র, অনেকের নানাবিধ দুঃখ দুর্দশা। ঠাকুর এই সব মানুষকেই তাঁর মতো করে গড়ে পিঠে নিতে লাগলেন। তাঁর কর্মশালা তো মানুষ তৈরির কারখানাই।

সজনীকান্ত দাস ও কতিপয় মানুষ ঠাকুর সম্পর্কে যে প্রতিকূল প্রচার শুরু করেছিলেন তার পিছনে কতকগুলো মোটা কারণ ছিল। সজনীকান্ত মোহিতলালকে লেখা কতিপয় চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, 'নকুড় ঠাকুরের আশ্রম' নিয়ে বাজার গরম করা লেখার জন্য তাঁর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বেড়ে গেছে। এরকম চললে অচিরেই

তিনি নিজস্ব প্রেস কিনে ফেলতে পারবেন। সোজা কথা ঠাকুরের স্ক্যান্ডাল করে সজনীকান্ত দু-পয়সা আয় করতে চেয়েছিলেন এবং যে কাজে তিনি সফলও হন।

ধর্মীয় পুরুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরূপ সমলোচনা ও স্ক্যান্ডালের শিকার হয়ে থাকেন, এটা দেখা গেছে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এরকম ঘটা স্বাভাবিক ছিল। তবে তাঁর ওপর অত্যাচার হয়েছে নানা রকম। এই সব অপবাদ তাঁর উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছিল সেই সব লোক যাদের কায়েমী স্বার্থে এই মানবদরদি বাধা হয়ে উঠেছিলেন।

দীক্ষা-পূর্ব জীবনে ঠাকুর সম্পর্কে এই সব অপবাদ আমিও বিশ্বাস করতাম।

অপবাদের আরও কারণ ঘটেছিল ঠাকুর শ্রেষ্ঠ পুরুষের বহুবিবাহের সপক্ষে মত প্রকাশ করায়। সুপ্রজননের জন্য বরেণ্য পুরুষদের একাধিক বিবাহ প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে। ঠাকুরের নিজেরও একাধিক বিবাহ ছিল। আর এই নিয়ে জল ঘোলা হয়েছিল বড় কম নয়।

ঠাকুরের প্রথম বিবাহ সরসীবালা অর্থাৎ বড়মার সঙ্গে। বলাই বাহুল্য, খুব অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরকে শিষ্য ভক্ত পরিবৃত এক ব্যস্ত জীবন কাটাতে হত। গভীর রাত অবধি শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, ভোর না হতেই নামধ্যান। বেশিরভাগ রাতে আদৌ ঘুমই হত না কারও। নববিবাহিতা বড়মাকে তাই স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে বরাবরই। হাড়ভাঙা পরিশ্রমে তখন গড়ে উঠেছে আশ্রম। ঠাকুরের তখন ব্যক্তিগত জীবনযাপনের সুযোগ কোথায়? ঠাকুরকে বরাবরই ব্যক্তিগত জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। যাঁরা ঠাকুর সম্পর্কে কিছুমাত্র জানেন তাঁরাই এই কথার সত্যতা স্বীকার করেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাঁর যে জীবন তাতে একটি বিয়েও করে ওঠা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। মা-বাবার আদেশে এবং সংসারী সন্ন্যাসীর আদর্শ রক্ষার্থেই তিনি বিবাহ করেন।

দ্বিতীয়া স্ত্রী সর্বমঙ্গলা দেবী সরসীবালারই কনিষ্ঠ ভগ্নী। তিনি ছোটমা হিসেবেই পরিচিত। তিনি যখন ঠাকুরকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন ঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করেন। তাঁর যে জীবন তাতে যে স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবনযাপনের সম্ভাবনা নেই, এমনকী শারীরিক নৈকট্যও যে দুর্লভ সব বুঝেও ছোটমা তাঁকে পতি হিসেবে বরণ করতে চেয়েছিলেন।

ঠাকুরের বিবাহ-নীতি অনুসারে, পুরুষ কখনওই বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। বিবাহে আগ্রহী হবে নারীই। তাঁর ভূমিকাই মুখ্য হবে। বর্ণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বভাব ও মেজাজ-মর্জির সাম্য ঘটলে তবেই বিয়ে। দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে ঠাকুর আরও কঠোর। কোনও মহিলা যদি কোনও বিবাহিত পুরুষের শৌর্যে-বীর্যে-স্বভাব-চরিত্রের আকৃষ্ট হয়ে তাকে বরণ করতে চায় তবে তাকে প্রথমে অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। তারপর সেই পুরুষের অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা সেই পুরুষের প্রথমা

স্ত্রী-র অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। প্রথমা স্ত্রীর সন্তুষ্ট হয়ে সম্মতি দেন তবেই বিবাহ সম্ভব। অন্যথায় নয়।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, বহুবিবাহ পুরুষের কামুক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। আর এই নীতিবিধি সঠিক অনুসরণ করলে পুরুষদের বহুবিবাহ যে আকছার ঘটবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহুবিবাহ প্রচলনের পিছনে ঠাকুরের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, বিহিত অনুলোম অসবর্ণ বিবাহকে পুনঃপ্রচলিত করা। বর্ণ সংমিশ্রণের ফলে তেজবীর্য সম্পন্ন প্রতিভাবান মানুষের আবির্ভাব ঘটে থাকে। উচ্চ বর্ণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রথম বিবাহ শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই স্ববর্ণে করবেন। পরবর্তী বিবাহ অন্য বর্ণে করার অধিকার তাঁর থাকবে। তবে উচচ বর্ণ বা বংশের কন্যাকে বিবাহ করা বিধি নয়। তাতে প্রতিলোম সংমিশ্রন ঘটে এবং বর্ণশংকর জন্মায়।

এই নিয়ে কিছু লেখালেখি করতে গিয়ে আমাকে বিস্তর সমালোচনা, গালমন্দ ও অভিসম্পাতের লক্ষ্যস্থল হতে হয়েছে। কারণটা খুবই স্বাভাবিক। এই তথাকথিত প্রগতির পাগলা স্রোতে সর্বপ্রথাকে ভাসিয়ে দেওয়ার এক অবিমৃশ্যকারি খুনে জেদ মানুষকে পেয়ে বসেছে। গভীর চিন্তা, অনুধ্যান, কোনও বিষয়কে পূর্বাপর পারম্পর্যে বিচার গবেষণা, অনুসন্ধান ইত্যাদির ধার আজকালকার ধৈর্যহীন মানুষেরা ধারেন না। সমাজে একটা লুটমারের চেহারা সর্বত্র প্রকট। এই এলোমেলো মানসিকতার মানুষকে কোনও প্রথা বা মূল্যবোধের যথার্থতা বোঝাতে যাওয়া বেশ ঝকমারি ব্যাপার। বিশেষ করে বর্ণাশ্রম নিয়ে কথা তুললে কিছু মানুষ প্রবল রকম অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

কিন্তু এরকম হওয়া উচিত নয়। স্বজাতিতে ও স্ববর্ণে কোনও মানুষই ছোট নয়। বর্ণাশ্রম যদি গুণ ও কর্ম অনুসারেই সৃষ্টি হয়ে তাকে তবে কোনও গুণ অন্য গুণের চেয়ে খাটো?

মানুষে মানুষে সকলেই সমান এই আপ্তবাক্য যাঁরা আওড়ে বেড়ান তাঁরা নিজেরাই ওই কথাটিকে বিশ্বাস করেন কিনা সন্দেহ। প্রকৃতিতে যখন কোথাও এরকম সাম্যের ব্যবস্থা নেই তখন মানুষের মধ্যেই বা থাকবে কোন যুক্তিতে। পশু পাখি গাছপালা ফল ফসল সব কিছুতেই প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে রয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্য। প্রকৃতি কখনও একঢালা নিয়মে একঘেয়েমি সৃষ্টিকর্মে রত নয়। আর সেই বৈচিত্র্যের পথেই মানুষেরই সৃষ্টি। কট্টর সাম্যবাদীও বাজারে গিয়ে ল্যাংড়া আমটিই খোঁজেন, গঙ্গার ইলিশ খোঁজেন, পাকা রুই খোঁজেন, কাশ্মীরি আপেল বা দার্জিলিঙের কমলালেবুই তাঁর পছন্দ। পোষেন ভালো জাতের অ্যালসেশিয়ান কুকুর বা কাবলি বেড়াল। রেস-এর দিন স্টেটসম্যানে অগে দৌড়বাজ ঘোড়াদের বংশতালিকা ছাপা হত, যাতে ভালো ঘোড়া বাছতে পান্টারদের সুবিধে হত। ফসলের ক্ষেত্রে কতরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে জলদি জাতের সঠিক ফলনশীল শস্যের

বীজ তৈরি করতে। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর এ নিয়েও তো পরীক্ষা ও গবেষণার অন্ত নেই। আর এই সবটাই প্রজনন নির্ভর। সুপ্রজননই এই কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য।

মানুষ শুধু তার নিজের বেলাতেই এই নীতি প্রয়োগ করতে নারাজ। এই অবৈজ্ঞানিক মনোভাব নিন্দার্হ।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন, মানুষের মধ্যে গুণ ও প্রকৃতিগত ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রম সঠিক গুচ্ছিকরণ নয়।

এ কথাও মানা যায় না। ভারতবর্ষেই বর্ণাশ্রম নামক গুচ্ছিকরণ খানিকটা বৈজ্ঞানিক ভাবে হয়েছিল। অন্যত্র হয়নি। এই গুচ্ছিকরণ পরে অবশ্য জাপপাতের লড়াই এবং গুণভেদ সৃষ্টি করেছে কিছু সমাজপতি ও শাস্ত্র-জ্ঞানহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুরু পুরোহিতের হাতে। বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাবও যে দেখা দেয়নি এমন নয়। কিন্তু এর মুখ্য কারণ আমাদের অনুন্নত ও পরাধীন দেশে প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদির অভাব এবং দেশে দীর্ঘকালীন নানা বিশৃঙ্খলা। গ্রাম জীবনের কূপমণ্ডুকতায় আবদ্ধ সমাজে পচন লাগা খুবই স্বাভাবিক। আলস্য, মূঢ়তা, অশিক্ষা, কুসংস্কার আমাদের মানসিকতাকে অসাড় করে রেখেছিল।

আজ যদি বর্ণাশ্রমকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আওতায় আনা হয় তাহলেও না হয় বুঝতে পারতাম বর্ণাশ্রমের যথার্থতা যাচাই করার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাচাই না করে নিতান্তই ভাবালু প্রগতিপরায়ণতার নামে বর্ণাশ্রমকে তাচ্ছিল্য করা যুক্তিসিদ্ধও তো নয়। মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক শ্রেণিবিভাগ হয়েই আছে। চরিত্র, প্রবণতা, দক্ষতা, বর্ণ অনুসারে মানুষ আলাদা রকমের হয়।

আমাদের দেশে জাতপাতের লড়াই বা শ্রেণিবিদ্বেষের মূলে অর্থনৈতিক বৈষম্যও একটা বড় রকমের কারণ। মোটামুটি সকলেরই যদি জীবনধারণের জন্য নূযনতম ভদ্র উপার্জন থাকে এবং সমাজে যদি সে নিজের ভূমিকা ও গুরুত্বটিকে উপলব্ধি করতে পারে তাহলে এই বৈষম্যের বোধ হ্রাস পেয়ে যায়। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যই যে বড় বেশি প্রকট।

ঠাকুরের একটা প্রধান লড়াই ছিল এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। আরও বিশদ করে বলতে গেলে দারিদ্র্য-ব্যাধির বিরুদ্ধে। দারিদ্র্যের মূলে যে মানুষের অকর্মণ্যতা আলস্য মূঢ়তা অনেকটাই কাজ করে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এখানে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একবার ঠাকুরের এক মুসলমান শিষ্য তাঁর কাছে এসে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলছিলেন। ঠাকুর সবই শুনলেন, কিন্তু কোনও সমাধান না দিয়ে শুধু বললেন, তুই আমাকে সীতাশাল চাল খাওয়াতে পারিস?

চাষিটি অসহায় ভাবে বলল, সীতাশাল ধানের চাষ করতে মেলা জল লাগে, অনেক অসুবিধা।

এই বলে সে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মামলা মোকদ্দমা, দুঃখ দুর্দশার কথা ফের বলতে লাগল। কিন্তু ঠাকুর বারবারই তার কাছে আব্দার করতে লাগলেন, ও মণি, আমারে সীতাশালচাল খাওয়াতে পারিস না?

চাষিটি যখন তার অসুবিধের কথা বলল তখন ঠাকুর সকৌতুকে বললেন, তোর খেতের কাছে তো একটা খাল আছে। সেখান থেকে নালা কেটে জল আনতে পারবি না খেতে?

চাষিটি বলল, তা কী করে হয়? অন্যের খেতের ওপর দিয়ে নালা কাটলে ওরা কি ছেড়ে দেবে?

ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন, ওদের বুঝিয়ে বলবি যে, এতে ওদের সুবিধাই হবে। সকলের সঙ্গে ভাবসাব করে দেখিস, পারবি।

এই ঘটনার বছরখানেক বাদে সেই মুসলমান চাষিটি গরুর গাড়ি বোঝাই সীতাশাল চালের বস্তা নিয়ে হাজির হল আশ্রমে। তার পরনে নতুন লুঙ্গি, গায়ে নতুন পিরান, মুখে হাসি। ঠাকুরকে সীতাশাল চাল খাওয়াতে হবে, শুধু এই অনুরাগের টানে সে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব করেছে, খাল কেটে জল এনেছে, আর সদ্ভাব বজায় রাখার ফলে মামলা মোকদ্দমা ঝগড়া কাজিয়া মিটেছে, ফলে দূর হয়েছে তার দারিদ্র্য-ব্যাধি। এর মধ্যে কোনও অলৌকিক নেই বটে, কিন্তু আছে গভীর বাস্তববোধ ও মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা।

ঠাকুরের জীবনে অযোগ্যকে যোগ্য করে তোলার উদাহরণ অসংখ্য। মানুষকে ধর্ম দান করাই শ্রেষ্ঠ দান বলে মনে করতেন ঠাকুর। বিপন্ন বা অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করাই বড় কথা নয়, তাকে যোগ্য ও দক্ষ করে তোলাই হল আসল। আর মানুষের উন্নতি শুধু একমুখী হোক তা নয়, সর্বতোমুখী হোক। এইটেই ঠাকুর চাইতেন। ঠাকুরের জীবন মানুষ অর্জনের জীবন। তাই নির্বোধ, বাচাল, পাগল, দুঃস্থ, মতলববাজ, চতুর কোনও মানুষকেই অবহেলা করেননি। যে এসেছে তাকেই তাঁর পরিমণ্ডলের সস্নেহে গ্রহণ করেছেন। ধৈর্য ধরে শুনেছেন তার কথা, সমাধান দিয়েছেন। ঠাকুরকে এর জন্য গুনোগার দিতে হয়েছে অনেক, কিন্তু শেষ অবধি মানুষের নেশা তাঁকে ছাড়েনি।

ঠাকুরের জীবনের অজস্র ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা আমাকে খুব আকর্ষণ করে। এর মধ্যে কেউ হয়তো অলৌকিকত্বের গন্ধ পাবেন। আমি তা মনে করি না। ঠাকুরের জীবনে অসম্ভব ঘটনাগুলোও এত অনায়াসে ঘটেছে যে, সেগুলোকে তাঁর কাছের মানুষেরা অস্বাভাবিক বলে মনে করেনি। মজার কথা হল ঠাকুরের বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরাও তাঁদের প্রচারে বিশেষ ভাবে ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। এটা তো এক সময়ে বিশালভাবেই প্রচার লাভ করেছিল যে অনুকূলচন্দ্র হিপনোটিজম জানেন এবং তাঁর কাছে যে যায় তাকেই বশীভূত করে ফেলেন। কেউ কেউ বলেছেন, ঠাকুরের কাছে

নাকি একটি অত্যাশ্চর্য পাথর ছিল, যা দিয়ে তিনি নানা রকম ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা ঘটাতেন। তাঁর পোষা ভূতটুত আছে এমন ধারণাও তাঁর গ্রাম হিমাইতপুর ও আশেপাশের অঞ্চলের লোকদের ছিল। অবশ্য এসব ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল কিছু অঘটন থেকেই। ঠাকুরের বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা তাই তাঁর সম্পর্কে একটু ভয়ও পোষণ করেছেন।

আমি যে ঘটনার কথা বলছি তা তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় খানিকটা বোঝানোর জন্য। তাঁর এক শিষ্য এবং নিয়তকর্মী আশ্রমে থাকেন। দেশ থেকে হঠাৎ একদিন চিঠি পেলেন তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্রটির সাংঘাতিক অসুখ। ডাক্তার একরকম জবাব দিয়ে গেছে। ছেলে বাবাকে একবার দেখতে চায়। স্ত্রী-র কাছ থেকে এই মর্মান্তিক চিঠি পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। কম্পিত গলায় শুধু বললেন, ঠাকুর—

ঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে শশব্যস্তে বলে উঠলেন, আরে আমি তো আপনাকেই ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। ভীষণ জরুরি দরকার। আপনাকে এক্ষুনি ওড়িশায় রওনা হতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে। যান, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন!

শিষ্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, আজ্ঞে আমার বিপদ—

ঠাকুর কথাটা একেবারেই কানে তুললেন না। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, কথা কওয়ার সময় নেই। যা বলার ফিরে এসে বলবেন। গাড়ি যে ছাড়ে! যান তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিন।

শিষ্যটি একটু দ্বিধায় পড়লেন। একদিকে গুরুর আদেশ, অন্যদিকে ছেলের আয়ু। কী করেন? শেষ অবধি ভাবলেন, ছেলেকে বাঁচানোর ক্ষমতা তো আমার নেই। যা হওয়ার তা হবে। গুরুর যখন এত ইচ্ছা তখন ওড়িশাতেই যাই।

তিনি কম্পিত হৃদয়ে অশান্ত মনে রওনা হয়ে গেলেন।

ওড়িশার কাজকর্ম মিটতে কুড়ি-পঁচিশ দিন লেগে গেল। তারপর আশ্রমে ফেরার পালা। যত আশ্রমের কাছে আসছেন ততই বুক কাঁপছে। কী সংবাদ অপেক্ষা করছে সেখানে কে জানে!

ঘরে এসে একটি পোস্টকার্ড পেলেন। স্ত্রী-র লেখা। খোকা ভাতপথ্য করেছে। সুস্থ হয়ে উঠেছে।

বুক থেকে জগদ্দল পাথর নেমে গেল। পোস্টকার্ডটি নিয়ে চললেন ঠাকুরের কাছে। এ কথা সে কথার পর ঠাকুর নিজেই হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, আমার কাজে তো খুব খাটছেন, ওদিকে বাড়ির খবরটবর সব ভালো তো?

শিষ্যটি কেঁদে বললেন, আজ্ঞে সেই কথা বলতেই আসা।

চিঠি দুটিই তিনি ঠাকুরের হাতে দিলেন। বললেন, ঠাকুর আমার খোকার যে অসুখ তা আপনি সর্বজ্ঞ নিশ্চয়ই জানতেন। আমি জানতে চাই আপনি কেন খোকার কাছে আমাকে যেতে না দিয়ে ওড়িশায় পাঠালেন?

ঠাকুর প্রথমটায় হেসে-টেসে অন্য কথা বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু নাছোড় শিষ্য কিছুতেই না ছাড়ায় ঠাকুর অবশেষে সখেদে বললেন, মানুষ অনেক সময়ই আমার অনেক আচরণ দেখে আমাকে নিষ্ঠুর বলে মনে করে। কিন্তু ওই নিষ্ঠুরতার মধ্যে বৃহৎ মঙ্গলই লুকিয়ে থাকে। আপনার ছেলে শুনেছি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসে। মুমূর্ষু ছেলে অধীর আগ্রহে বাপের জন্য অপেক্ষা করছে, তার সেই আগ্রহ, আর তীব্র ইচ্ছাশক্তিতে সে মৃত্যুকেও ঠেকিয়ে রেখেছে, লড়াই করছে রোগের সঙ্গে। ঠিক সেই সময় যদি তার বাবা গিয়ে তার সামনে দাঁড়ায় অমনি তার সব লড়াই শেষ হয়ে যাবে, 'বাবা এসে গেছে' এই আনন্দেই সে তৎক্ষণাৎ আবার ঢলে পড়বে রোগের কবলে। মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু বাবা আসছে না বলে ছেলে সারাক্ষণই লড়াই চালিয়ে যেতে থাকবে, আর ক্রমে ক্রমে রোগ হার মানতে থাকবে তার ভালোবাসার কাছে। এখন বুঝলেন তো?

এটা মোটে একটি ঘটনা। এরকম হাজার হাজার ঘটনা ছড়িয়ে আছে ঠাকুরের একাশি বছরের আয়ুষ্কালে। কিন্তু ঘটনাগুলির অলৌকিকত্বের আলোয় ঠাকুরকে আলোকিত করতে গেলে তাঁর জীবনদর্শনকেই অপমান করা হয়। ঠাকুর এই ঘটনাগুলোকে যখন ব্যাখা ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর বাস্তববোধ আমাদের মুগ্ধ করেছে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বাংলা ভাষা নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁর তুলনা গোটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাষাজ্ঞানেও তিনি সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একক। বাক্য গঠন, শব্দ চয়ন ও অনবদ্য সব শব্দকে প্রায় হিমঘর থেকে তুলে এনে প্রয়োগ করেছেন তাঁর গদ্যে। মেকানিজম শব্দটির সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। ঠাকুর 'মরকোচ' শব্দটি যখন ব্যবহার করলেন তখন চোখের ঠুলি সরে গেল। ইন্টারেস্ট শব্দটিরও সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ঠাকুর অন্তরাস শব্দটি আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। এরকম অজস্র ও অসংখ্য শব্দ ও ধাতুর মূল অর্থ ধরে তিনি যে কত কিছুকে ব্যাখ্যা করেছেন তারও ইয়ত্তা নেই। অথচ নিজের হাতে তিনি তো এসব লেখেননি, মুখে বলে গেছেন এবং তা লিখে নেওয়া হয়েছে। আর মুখে বলে যাওয়া ওই নির্ঝরের মতো গদ্য কী করে যে পূর্বাপার সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে সেটাই পরম বিস্ময়ের। এক এক জায়গায় এক পৃষ্ঠা ব্যাপী একটিই বাক্য তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও বাক্যের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁর গদ্য এতই জটিল ও কঠিন যা কমলকুমার মজুমদারকেও ধাঁধায় ফেলে দিতে পারত। আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর আগেকার ওই সব রচনা থেকে আমরা বাংলা গদ্যের প্রকৃত ধ্রুপদী রূপ পাই, যা আজ অবধি অন্য কারও রচনায় পাইনি। ঠাকুরের গদ্য নিয়েও অদূর ভবিষ্যতে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অলোচনা হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঠাকুরকে পরিপূর্ণ দার্শনিক বলে অভিহিত করতে হয় একটি কারণে। তিনি কোনও প্রসঙ্গকেই আলোচনার অযোগ্য মনে করেননি বলে পৃথিবীর দুর্মরতম পাপ থেকে আধ্যাত্মিকতার দুরূহতম কূট প্রসঙ্গ নিয়ে অভিমত দিয়েছেন। আর কী প্রাঞ্জল ও সুগভীর সেই কথা! ঠাকুরের এই সব আলোচনার মধ্যে সকলেই স্বীয় প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়ে যান। এই সম্পূর্ণতা আমি কোনও মহাপুরুষের গ্রন্থের খুঁজে পাইনি। সেই জন্য তাঁকে অধিকতর সম্পূর্ণ বলে অভিহিত করা ছাড়া উপায় নেই।

কারও প্রতি অশ্রদ্ধা ঠাকুর ভীষণ অপছন্দ করতেন। এবং জগতের পূর্ব পূর্ব অবতার পুরুষদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও নতি এতই প্রগাঢ় ছিল যে, প্রার্থনার মন্ত্রে রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মহম্মদ চৈতন্য রামকৃষ্ণ সকলকেই প্রণাম করার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবকে কখনো ভগবান ছাড়া বলতেন না। এই শ্রদ্ধাবনত প্রেমিক মানুষটিকে, দুঃখের বিষয়, তাঁর সমকাল সঠিক ভাবে চিনতে পারেনি। অবশ্য এরকম ব্রাহ্মী পুরুষকে কদাচিৎ তাঁর সমসাময়িকেরা চিনতে পেরে থাকে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা এই সব মানুষকে যদিও বা খানিকটা বুঝতে পারেন, কিন্তু নিজের অহংবোধ আহত হয় বলে কদাচ এঁদের কাছে নতি স্বীকার করেন না।

দেশ ভাগের এক বছর আগে ঠাকুর হিমাইতপুরে তাঁর সযত্নে গড়ে তোলা আশ্রম এবং সেখানকার বিশাল লোকসেবামূলক নানা প্রকল্প অবহেলায় ফেলে দেওঘর চলে এলেন। তখন তাঁর এই স্থানত্যাগের কারণ কেউ বুঝতেই পারছিলেন না। বছর না ঘুরতেই বুঝতে পারলেন। দেওঘরে তাঁর তো প্রায় কিছুই ছিল না। যথেষ্ট ঘর-বাড়ি নেই, তেমন টাকাপয়সা নেই, অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা চরমে। তবু তার মধ্যেই আবার তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠতে লাগল একটি নানা কর্মকাণ্ড মুখরিত লোকপালী আশ্রম। এখানেও তাঁকে স্থানীয় লোকদের নানা বিরোধিতা ও শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, মারদাঙ্গা বড় কম হয়নি। কিন্তু সব প্রতিকূলতাকেই তিনি তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে অনুকূল করে নিতে পারতেন।

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন নানা সন্দেহের দোলায় দুলেও আমি তার সৎনাম গ্রহণ করি তখনও তাঁর সম্পর্কে সম্যক কোনও ধারণা ছিল না। ধারণা যে আজও হয়েছে তাও নয়। আমাদের অবস্থা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। তাঁর জীবনদর্শন এত ব্যাপক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ভরা যে গড়পড়তা মস্তিষ্ক সম্পন্ন কোনও মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন এবং অসম্ভব। তবে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে তাঁর বিশালত্বের আভাস পেতে কোনও অসুবিধে হয় না। স্বাস্থ্য, সদাচার, শিক্ষা, বিবাহ, সন্তান পালন থেকে শুরু করে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কিছুই তার বিষয় বহির্ভূত নয়।

বিংশ শতাব্দীর এই অনন্যসাধারণ মানুষটিকে নানা অপপ্রচারের অন্তরালে নির্বাসিত রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। তবু তাঁর সন্নিধানে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্রের বাবা ও মা, জানকীনাথ বসু ও তাঁর স্ত্রী। বিভূতিভূষণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মোহিত হয়েছিলেন। গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাধারানি ও নরেন্দ্র দেব। দেশনেতাদের মধ্যে অনেকে। তা ছাড়া হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বাঙালি অসমিয়া ওড়িয়া মারাঠি বিহারি শিখ দক্ষিণী অজস্র অগুনতি শিষ্যকে একটি ভাবসূত্রে গ্রথিত করা কত অনায়াসে সিদ্ধ হয়েছিল তা আশ্রমে এলেই বোঝা যায়। জাতীয় সংহতি জিনিসটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যতই কঠিন হয়ে পড়েছে ততই চোখে বেশি করে পড়ছে সৎসঙ্গ সংগঠনে এক আদেশে বাঁধা একটি সংহত গণচরিত্রকে।

ঠাকুর কে বা কি তা এই সামান্য রচনার দ্বারা আর কতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব? এ যেন পিদিম জ্বেলে সূর্যকে চেনানোর অক্ষম চেষ্টা। তবে বিশ্বাস করি, পরিবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা তাঁকে আবছায়া বোধের অন্তরাল থেকে নিজেদের মেধা, বোধ ও বিশ্বাস দিয়ে প্রকটিত করে দেবে জগৎ সমক্ষে। আমারা অপেক্ষা করব।

তিন

ঠাকুর কবে থেকে এবং কী প্রক্রিয়ায় আমার জীবনের অচ্ছেদ্য এক অংশ হয়ে গেলেন তা সঠিক জানি না। এ ঘটনা ঘটেছে অলক্ষে, আমার জ্ঞান ও জগতের নেপথ্যে। যে-কোনও অবস্থাতেই পড়ি না কেন, যতই সংসার সমস্যা জড়িয়ে থাকি না কেন, তার মধ্যে হঠাৎ করে ঠাকুরের কথা মনে পড়লেই যেন অলক্ষে এক দক্ষিণের জানালা খুলে যায়, আর অসীমের বাতাস এসে লাগে।

ঠাকুর এরকমই। তাঁর সংস্পর্শে আসা, তাঁর চার অক্ষরী সৎনামের আশ্রয় নেওয়া মানেই জীবনের আনন্দের একটি অনাবিষ্কৃত উৎসবকে খুঁজে পাওয়া। ঠাকুর যেন দেওয়ার জন্যই বসে আছেন, পাওয়ার জন্য আমাদের হাত বাড়ানোর অপেক্ষা।

কিন্তু কথা একটিই, করে পাওয়া। অহেতুকী কৃপা বলে কিছু নেই। পেতে হলে করতে হবে এবং করলেই পাওয়া যাবে। ঠাকুরের হিসেব এতই সহজ ও বাস্তব। কিন্তু ওই করা বা পাওয়ার ফাঁকেই থেকে যায় আমাদের দুর্মর আলস্য, উদাসীনতার অসতর্কতা, ঢিলেমি এবং নানা অভিভূতি ও সংস্কার। তাই এই পরম ধন হাতে পেয়েও আমরা তার সম্যক ব্যবহার করতে পেরে উঠি না। শুধু ঠাকুরকে নিয়ে থাকলেই দুনিয়ার সব প্রাপ্য বস্তু অধীগত হয়। কিন্তু তাঁকে নিয়ে থাকতে গিয়েই যত গণ্ডগোল, যত হিসেব-নিকেশ।

আমরা নিজের কথাই বলি। এই যে দুবেলা বিনতি প্রার্থনা করি ঠাকুরের সামনে বসে প্রতিদিন, তার মধ্যে ক-বার ওই প্রার্থনা সংগীতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়? দিনের পর দিন অভ্যাসবশে প্রার্থনা করে যাই বটে, কিন্তু নানা চিন্তা ভাবনা অভিভূতিতে মন এমনই সংলগ্ন

থাকে যে প্রার্থনা করাটা একটা নিয়মরক্ষায় দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ এক একদিন প্রার্থনা করতে করতে মনটা ঠাকুরমুখী হয়ে যায় আর তখন প্রার্থনার প্রতিটি কথাই যেন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। তখন দুচোখ ভরে জল আসে। আমাদের দৈনন্দিন ঠাকুর সত্যিকারের দয়াল ঠাকুর হয়ে চোখের সামনে স্মিত হাস্যে এসে উপস্থিত হন। কথাটা হল ভক্তি নিয়ে। ভক্তি জিনিসটা শুনতে সহজ বটে, কিন্তু কাজে কঠিন। এই কলিযুগে মানুষ যে কত রকম মানসিক টানাপোড়েনে শতধা বিভক্ত মন নিয়ে জীবন কাটায় তা ঠাকুরের মতো আর কে জানবে? ঠাকুর তাই ভক্তিকে সহজসাধ্য করে তুলতে নানা মুষ্টিযোগ ও দৈনন্দিন কৃত্য নির্দেশ করে গেছেন।

ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর আমার নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই সব অভিজ্ঞতা অভিনব, অদ্ভুত। অনেক সময়েই ওই রহস্যময় পুরুষের ব্যাখ্যা আমি করতে পারিনি, যেটুকু আবছা তাঁকে বুঝেছি, তাতে মনে হয়, তাঁকে ধরলে আমাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না।

মনে আছে দীক্ষা দেওয়ার আগে আমি ছিলাম অত্যন্ত অহংকারী উগ্র স্বভাবের এবং খানিকটা খেয়ালি। বাস্তববোধেরও বেশ অভাব ছিল। আমার কফি হাউসের বন্ধুরা আমাকে রীতিমতো সমঝে চলত। তা ছাড়া জীবনযাপনটাও ছিল লাগামছাড়া। একটু আধটু মদ্যপানের বদ অভ্যাস রপ্ত হচ্ছিল। সেই সময়ে ঠাকুর আমার জীবনে দেখা না দিলে আজ আমি অবশ্যই এক কুখ্যাত মাতালে পরিণত হতাম। শুধু তাই হয়, হয়তো এতদিন বেঁচেও থাকতাম না। কারণ যে সময়ে আমি দীক্ষা নিই সেই সময়ে মানসিক সংকটে এমনই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আত্মহনন ছাড়া আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। এক জ্যোতিষী বহুকাল আগেই আমার সেই বয়সে যে মানসিক সংকট দেখা দেবে এবং তা পেরোনো যে খুব কঠিন হবে তা বলে রেখেছিলন। জ্যোতিষীতে আমার তেমন আস্থা নেই। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে খুব মিলে গিয়েছিল। ঠাকুর না হলে এই সংকট কী করে যে কাটাতাম তা ভেবে পাই না। ঠাকুর যে আমাকে আশু বিনাশ থেকে রক্ষা করেছেন তা-ই নয়, আমার জীবনের একটি লক্ষ্যও স্থির করে দিয়েছেন। নইলে কোনও আঘাটায় গিয়ে এই অস্থির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটত তা কে জানে; তা বলে এমন কথা বলব না যে, আমি ঠাকুরের পথে ঠিক ঠিক চলেছি। আমার নিজস্ব খামতি অনেক, অভিভূত নানা ধরনের। তবে আমার মস্ত ভরসা এই, ঠাকুর বিপথ থেকে ঠিকই পথে টেনে আনেন। বিপথও অনেক ছিল তখন। হাঁ করে ছিল গিলবার জন্য। এখন সেই সব বিপথের সংখ্যা আরও বেড়েছে। যে সব অশুভ শক্তি কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে আমাদের বারবার জীবনের অস্তির পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করে ঠাকুরের লড়াই সেগুলোরই বিরুদ্ধে। নিরন্তর মানুষকে অস্তিবৃদ্ধির পথে চালনা করার প্রয়াসে তাঁর ক্লান্তি ছিল না।

ঠাকুরকে প্রথম থেকেই যে গভীর ভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলাম তার কারণ, এই মানুষটির ভিতর থেকে অবিরাম বিকীর্ণ হচ্ছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

যত দিন যাচ্ছে ততই ঠাকুরের অপরিহার্যতা নিজের জীবনে গভীরভাবে অনুভব করছি। ঠাকুর ছাড়া কী অসম্ভব ছিল আমার আজ অবধি বেঁচে থাকা! আর এই যে বেঁচে আছি এরও অস্তি জুড়ে ঠাকুরেরই নিরন্তর কৃপা বর্ষিত হচ্ছে। তাই বেঁচে আছি বলেই ঠাকুরের কাছে কৃতজ্ঞতায় বারবার মাথা নুয়ে আসে। স্রেফ এই বেঁচে থাকাটাই মাঝে মাঝে আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। ঠাকুর ছাড়া শুধুমাত্র এই বেঁচে থাকাটাই আমার পক্ষে কত অসম্ভব ছিল।

আগেই বলেছি, তখন পর্যন্ত—অর্থাৎ ঠাকুরের আশ্রয় করার আগে অবধি আমার জীবন ছিল সব দিক দিয়েই বিবর্ণ, অসফল এবং গতিহীন, বৈচিত্র্যহীন। আর্থিক অনটন তো ছিলই, কোনও সামাজিক মর্যাদাও ছিল না। এলেবেলে একটা জীবন হেলাফেলা করে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। ভবিষ্যতের কোনও কল্পনা বা আশাও ছিল না। সামান্য একটা হতদরিদ্র স্কুলে নিতান্তই তুচ্ছ একটা মাস্টারির চাকরি, আর মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় গল্প লেখা। এ ছাড়া আর কোনও সাফল্য নেই। কিন্তু ঠাকুরকে ধরবার পর থেকেই সেই বর্ণহীন অর্থহীন জীবনে যেন অলক্ষে একটা মাত্রা যোগ হল। তারপর ধীরে ধীরে জীবনের নিহিত গভীর অর্থ আর আনন্দ পাপড়ি মেলতে লাগল। আমার মতো আধার তো খুব বেশি ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না। তবু এই সামান্য আধারেই ঠাকুর তাঁর অনির্বচনীয় সুধা ভরে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা কথাটা বললাম, তার কারণ, ঠাকুরের দেওয়ার ক্ষমতা সীমাহীন হলেও আমাদের গ্রহণক্ষমতা কিন্তু সীমাবদ্ধ।

মনে আছে, দীক্ষা নিয়ে আসার পরই নানাজন নানা প্রশ্ন করত। ঠাট্টা ইয়ার্কি, শ্লেষ, বিদ্রুপ ইত্যাদি তো ছিলই। একজন আদ্যন্ত আধুনিক মানসিকতর যুবক কী করে দীক্ষাটিক্ষা নেয় এবং ধ্যান-ট্যান করে এটাই ছিল সকলের জ্বলন্ত প্রশ্ন। ফলে কফি হাউসে প্রায়ই বিভিন্ন বন্ধু বা পরিচিতদের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক বা বিবাদ হত। হাতাহাতিরও উপক্রম হয়েছে। রণবীর নামে আমার এক ফিল্ম ডিরেক্টর বন্ধু ছিল। এমনিতে সে অতিশয় ভদ্র ও সজ্জন। কিন্তু সেও একবার কিছু কটুকাটব্য করে ফেলেছিল ঝোঁকের মাথায়। আমি এত খেপে গেলাম যে তাকে মারতে উঠেছিলাম। রণবীর অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেয়।

এদিকে প্রসূনের আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু তার বাড়িতে হাঁড়ির হাল। কিছুদিন পরেই সব পেয়েছির দেশে চলে যাবে। গাড়ি, বাড়ি হবে, দেদার ডলার ওড়াবে এই আশায় সে মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছিল। তবে সে সময়ে সে বারকয়েক অভাবে পড়ে ইষ্টভৃতির টাকা খরচ করে ফেলেছিল। আমি তাকে খুব বকলাম। সে বললে, ঠাকুরকে ভরণ করব কি আমার মেয়ে-বউ যে না খেয়ে আছে।

এটা কোনও যুক্তি নয়। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি অনেক। কিন্তু প্রসূন বুঝতে চাইত না। অনেক জ্ঞান ও গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রসূনের একটা অবুঝপনা ছিল, ছেলেমানুষী ছিল।

চন্দনেও এই অবুঝপনা ছিল। তার খেসারত তাকে দিতে হয়েছে।

ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গেলে ঠাকুরের মতোই চলতে হয়। নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী ভজনা করতে নেই। এই খেয়ালখুশির ভজনায় যে কত গণ্ডগোল তা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। ঠাকুর এ বিষয়ে আমাদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। ইষ্টস্বার্থের পথে আত্মস্বার্থ এমনভাবে এসে হাজির হয় যে ইষ্ট আবার আত্মতে গণ্ডগোল পাকিয়ে যায়। ঠাকুর বলেছেন, নিজ খেয়ালে ভজলি গুরু, মানুষ হতে হলি গরু।

কিন্তু এই ঘোর কলিকালে, মানসিক জটিলতা ও সংকটের এই মাহেন্দ্রযোগে ইষ্টস্বার্থ আর আত্মস্বার্থের গণ্ডগোল হবেই। আর ঠাকুর তা ভালো করেই জানতেন। তাই নানাভাবে আমাদের বিপথগামিতায় বাঁশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যজন, যাজন ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, সদাচার হচ্ছে সেই বাঁধ। নিত্য পালনীয় এই সব কৃত্য ধীরে ধীরে জীবনে শৃঙ্খলা এনে দেয়। আর আমাদের অজান্তেই নানা আপদ-বিপদ আপতনকে নিরুদ্ধ করতে থাকে। আমাদের অভ্যন্তরেই গড়ে ওঠে অশুভের বিরুদ্ধে, রোগ-ভোগ-মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ঠাকুর কতটা বিজ্ঞানসম্মত ছিলেন তা বুঝতে হলে তত্ত্বগতভাবে বোঝাবার চেয়ে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বোঝা অনেক বেশি ভালো।

ঠাকুরকে নিয়ে আমাদের মধ্যে একট মধুচক্র গড়ে উঠেছিল। কয়েকজন আধুনিক যুবক নানা মুখরোচক বিষয়কে উপেক্ষা করে কেবল ঠাকুরকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিচ্ছে, এ এক অভাবনীয় ঘটনা।

পূর্ণ দাস রোডের আমাদের মেসবাড়িতে কে আসত না? কবি সাহিত্যিক থেকে শুরু করে পলাতক নকশালরা পর্যন্ত অনেকেই। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও এসে আড্ডা মেরে যেতেন। ঠাকুরের যাজন কিন্তু আমরা সকলের কাছেই করতাম। আর বিস্ময়ের কথা হল, অনেক নাস্তিক-অবিশ্বাসী-নিস্পৃহ ব্যক্তিকেও কিন্তু মন দিয়ে ঠাকুরের কথা শুনতে দেখেছি।

আসল কথা হল, ঠাকুরের জীবনদর্শন এমনই চমৎকার যে, একটু বুঝিয়ে বলতে পারলেই যে-কারও মনে ধরে যায়। একবার হলদিয়ার একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের জন্মোৎসব। হলদিয়ায় তখন সিপিএম-এর প্রবল প্রভাব। আমি উৎসবের কর্মকর্তাদের বলেছিলুম, উৎসবে শুধু গুরুভাইরা এলেই চলবে না, বাইরের লোককেও ডাকবেন। নইলে সভা বড্ড ঘরোয়া হয়ে পড়ে। বাইরের মানুষকে অন্তরাসী না করতে পারলে ঠাকুরের উৎসব সম্পূর্ণতা পাবে না।

উদ্যোক্তরা আমার অনুরোধ শুনে বললেন, ওটা তো কমিউনিস্টদের জায়গা। তারা কি আর আসবে। তবু চেষ্টা করব।

উদ্যোক্তারা কথা রেখেছিলেন। তাঁরা সেখানকার নেতৃবৃন্দকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সভায়। শুধু তাই নয়। আমি বলে দিয়েছিলুম, যদি কেউ প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করতে চায় তো বহোৎ আচ্ছা। আমরা সাধ্যমতো সেই সব প্রশ্ন বা প্রতিবাদের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

হলদিয়ার একটা মস্ত হলে সভার আয়োজন হয়েছে। শুরুতে বেশি লোক ছিল না। শুধু গুরুভাই আর বোনেরা। সংখ্যায় বড়জোর গোটা-পঞ্চাশ হবেন তাঁরা। সভা শুরু হয়ে যাওয়ার পর—অর্থাৎ বিনতি প্রার্থনা হয়ে গিয়ে যখন প্রথম বক্তা ভাষণ শুরু করেছেন তখন হঠাৎ বাইরের অন্ধকার মাঠে অজস্র সিগারেটের আগুন দেখা গেল। একসঙ্গে পায় শ-খানেক যুবক এসে ঢুকলেন হলে। তবে বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা হল না, শব্দও হল নয়। হলে যথেষ্ঠ জায়গা ছিল, তাঁরা বসে পড়লেন। বসার ভঙ্গিতে অবশ্য একটু অবহেলার ভাব ছিল, অনেকে সিগারেটও খাচ্ছিলেন। যিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি এই সব যুবকদের দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বক্তৃতা তাড়াতাড়ি শেষ করে বসে পড়েই আমাকে বললেন, এসব কী হচ্ছে বলুন তো! ওরা সব সিগারেট খাচ্ছে।

আমি একটু হেসে বললুম, ঠাকুর তো আমাদের কাছে ঠাকুর, ওদের কাছে তো নয়। কিছু ভাববেন না প্রতিকূলকে অনুকূল করে নেওয়াই তো ঠাকুরের মোদ্দা কথা ছিল।

আমি মোটেই ভালো বক্তা নই। তবে কখনও কখনও ঠাকুরেরই দয়ায় আমার একটু ভাবাবেগ আসে। তখন ঘরোয়াভাবে প্রাণের কথা মনের কথা বলে ফেলতে পারি। সেদিন আমার বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল ওই ক্যাডাররা। ফলে আমি কমিউনিজমের কথাও এনে ফেললুম। প্রসঙ্গক্রমে বললুম, কমিউনিস্ট বিপ্লবের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিপ্লব যারা করে—অর্থাৎ কৃষক মজুর শ্রেণির সাধারণ মানুষেরা মার্কসবাদ বোঝে না। তবে তারা এগিয়ে যায় মহান নেতার দিকে তাকিয়ে। যেমন লেলিন, যেমন হো চি চিন, যেমন মাও! এটাই হল গুরুবাদের রকমফের। যার মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে তিনিই তো গুরু, এরকমভাবে আরও অনেক কথা।

যখন বলছিলুম তখন মনে হচ্ছিল, ওরা একেবারেই আমার কথা শুনছে না। কেউ সিলিং পানে চেয়ে আছে, কেউ হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে, কেউ কথা টথা বলছে না। সবাই ভারি চুপচাপ। ভাবলাম, বোধ হয় ঠাকুরের কথা ধর্মের কথা শুনতে অনিচ্ছে, শুধু দায়সারা ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

ভাষণ-টাসন শেষ হলে আমাদের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল, শ্রোতারা ইচ্ছে করলে প্রশ্ন করতে পারেন।

এই ঘোষণার পর যে কাণ্ডটা হল তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি আগে। সেই সব আপাত অমনোযোগী যুবকেরা একে একে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বক্তৃতার প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে লাগল, এমনকী উদ্ধৃতি সহকারে। অবশ্যই সবকটাই প্রতিবাদী প্রশ্ন। যেমন আমাকে বলা হল, আপনি নেতা আর গুরু এক করে ফেলেছেন। কিন্তু

মার্কসবাদে ব্যক্তিপূজার স্থান নেই। লেনিন নন, বলশেভিক পার্টিই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি ছাড়া ব্যক্তিগত নেতৃত্বের কোনও মূল্য নেই।

এই রকম অজস্র প্রশ্নে আমরা নাজেহাল। কিন্তু আমার সানন্দ বিস্ময় ছিল, এরা এত মন দিয়ে আমাদের কথা শুনেছে। ঠাকুরের কথা শুনেছে?

হলদিয়ার তৎকালীন সিপিএম কর্মীদের মধ্যে তীর্থ ছিল বিখ্যাত। এখনও সে ওখানে আছে কি না জানি না। তবে তাকে আর তার সঙ্গীদের আমার খুব ভালো লেগেছিল।

সভার পরে তীর্থ এবং তার অন্তত দশ-বারোজন সঙ্গী আমাদের সঙ্গ ধরল। অনেক রাত অবধি তাদের সঙ্গে কথা হল শুধু ঠাকুর প্রসঙ্গ। তর্ক-বিতর্ক নয়, হার্দ্য আলোচনা। আর তারা এমনই ভালো এবং বুঝদার ছেলে যে-কোনও ভাবেই ঠাকুরকে নস্যাৎ করার স্পর্ধিত চেষ্টা করল না। ধৈর্য ধরে শুনল এবং নানা প্রশ্ন করল। কিন্তু ঠাকুরের জীবনদর্শন এমনই মোহনীয় এতই জীবনধর্মী ও বাস্তব যে কয়েক ঘণ্টা পর তারা সকলেই মোটামুটি ঠাকুরকে স্বীকার করে নিল, বলল, এই যদি আপনাদের ঠাকুরের ফিলজফি হয়ে থাকে তবে একে সমর্থন করতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।

হলদিয়ার এই তরুণ তাজা ছেলেগুলোর কথা আমি কোনও দিন ভুলব না। দুদিন হলদিয়ায় ছিলাম। দুদিন প্রায় সারাক্ষণ তারা আমাদের সঙ্গে ছিল। সারাক্ষণই তারা ঠাকুর সম্পর্কেই প্রশ্ন করেছে, ঠাকুরকে নিয়েই আলোচনা করেছে।

ঠাকুরকে নিয়ে আমার গর্ব এই কারণেই যে, ঠাকুরকে যারা কণামাত্র বুঝতে পারে তারাই চমকে যায়, অবাক হয়। এত সত্য, এত জীবনীয় আর কোনও জীবনদর্শন আছে বলে জানি না। আর ঠাকুর হচ্ছেন সর্বরোগহ, সর্ব সমস্যার সমাধানের আকর। এক অমোঘ ব্যাখ্যাতা, ঐশী দৃষ্টির অধিকারী, প্রজ্ঞার উৎসস্বরূপ ঠাকুরকে তাই সম্যক বুঝে ওঠাও কঠিন। হলদিয়ার ওই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, ঠাকুরের সব কথাই লোকের কাছে গ্রাহ্য ও গ্রহণীয়, যদি তা তাদের যুক্তি বিচার অনুযায়ী পরিবেশন করা যায়।

আবার অনেক সময়ে দেখেছি, মানুষের অহং বা কোনও গাঁট ঠাকুরকে ঠিকমতো গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ওপর একটি চুল ছাঁটার সেলুন ছিল। সেই দোকানের সামনে কাচের ওপর বড় বড় করে লেখা 'বন্দে পুরুষোত্তমম।' যাতাযাতের পথে বাস থেকে প্রায়ই দেখতাম, আর ওইটি দেখার জন্যই বাসের সেই ধারেই বসতাম যে, ধার থেকে দেখা যায়। সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, এটি কোনও সৎসঙ্গীর দোকান। একদিন হঠাৎ হাঁটাপথে যেতে গিয়ে কৌতূহলবশে দোকানটায় ঢুকলাম। হাফহাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা বয়স্ক মানুষ বলে কাগজ পড়ছিলেন। 'জয়গুরু' বলতেই তিনিও 'জয়গুরু' বলে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন, দোকানে ঠাকুরের ছবিও দেখলাম।

কথায় কথায় জানা গেল ভদ্রলোক ঠাকুরকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করেন বটে, কিন্তু দীক্ষা নেননি। কেন নেননি? ভদ্রলোক সদুত্তর দিতে পরলেন না। দেওঘরে গেছেন, ঠাকুরকে দেখেছেন, সবই হয়েছে, কিন্তু আসল কাজটাই বাকি রয়ে গেছে। কেন দীক্ষা নেননি এই প্রশ্ন করায় ভদ্রলোক মলিন মুখ করে বললেন, হয়ে ওঠেনি, বুঝলেন, আসলে বোধ হয় সময় হয়নি।

ভদ্রলোককে দোষ দিয়ে লাভ নেই, মানুষের কত রকম গাঁট থাকে। মন ও মস্তিষ্কের নানা দুরূহ জটিল বিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা চরিত্র সবসময়ে সহজ পথে চলতে চায় না।

আর একটি ছেলেকে জানি, পেশায় অধ্যাপক। পরেশদা—অর্থাৎ পরেশচন্দ্র ভোরা, সদ্য ঋত্বিকের পাঞ্জা পেয়ে তখন প্রচুর দীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এই ছেলেটিও তাদের মধ্যে ছিল। দীক্ষা নেওয়ার কিছুদিন পর ছেলেটি এসে একদিন কফিহাউসে পরেশদাকে কাঁদো কাঁদো হয়ে ধরল। দাদা, আমার ফ্যামিলি আর বন্ধুমহলে ভীষণ আপত্তি হচ্ছে, হাসাহাসি হচ্ছে, আপনার দীক্ষা ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে রিলিজ করে দিন।

পরেশদা পড়লেন মহা ফাঁপরে, দীক্ষা ফিরিয়ে নেওয়ার তো কোনও পদ্ধতি নেই। অথচ ছেলেটিও নাছোড়বান্দা। পরেশদা তার অবস্থা দেখে অবশেষে বলতে বাধ্য হলেন, ঠিক আছে, আপনি আপনার মতো চলুন।

ঠাকুর যে যাজনচর্চার কথা বলেছেন তা শুধু বকবক করা নয়, মুখের কথায় যাজন হলে সেই যাজনের ক্রিয়া গভীর হয় না, আর সেই যাজনের দীক্ষাও স্থায়ী হতে চায় না। প্রকৃত যাজন হল যাকে যাজন করা হচ্ছে তার চরিত্র রুচি মেজাজ অভ্যাস এসবগুলিকে অনুধাবন করে তাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা, আপন করে নেওয়া এবং তার মধ্যে আগ্রহ ও পিপাসা জাগলে তবেই সময়মতো নামটি দিয়ে দেওয়া। ঠাকুর তো বলেইছেন যে দীক্ষার কথা বলতে নেই, ঠিকমতো যাজন হলে মানুষ নিজের থেকেই দীক্ষা নিতে চাইবে, আর সেই দীক্ষা শত উপহাস সমালোচনা দুর্দৈব কোনও কিছুতেই টলবে না।

ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গিয়ে আমাকে পদে পদে আত্মসংশোধন করতে হয়েছে। আমার উগ্র স্বভাব, অহংকারী মনোভাব, মানুষ সম্পর্কে ধৈর্যহীনতা, উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি—এসব দীক্ষা নেওয়ার বছরতিনকের মধ্যেই অনেক কমে গেল।

তবু বলি ঠাকুরকে নিয়ে চলা বড় সহজ নয়। যখন আমি নিজেকে খুব ভক্ত বলে মনে করছি এবং কোথাও নিজের কোনও ত্রুটি দেখছি পাচ্ছি না, তখনও কিন্তু নানা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে আমার অজান্তেই।

পূর্ণ দাস রোডের মেসে আমরা পাঁচ গুরুভাই মিলে ঠাকুরকে নিয়ে আপাত মশগুল হয়ে আছি তখনও কিন্তু আমাদের নানা প্রতিকূলতায় পড়তে হয়েছে। সে সব প্রতিকূলতা, সংকট বা বিপদের সঠিক কারণও তখন ধরতে পারিনি। ঠাকুর-ঠাকুর করেও যে ওসব ঘটত তার কারণ ঠাকুর সম্পর্কে আমাদের বোধটা ছিল ওপরসা।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের মেসেরই একজন টাকা নয়ছয় করেছিল। ফলে আমাদের মেস অচল হয়ে পড়ল। খাওয়াদাওয়া একরকম বন্ধ। সেই দুর্দিনে এক কাপ চা জোটানোও ছিল মুশকিল। আমার আয় তখন সামান্য, পাঁচ জনের মধ্যে আমার অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। একটা পাঁউরুটি কিনে খাওয়ার পয়সাও নেই। তবে ঠাকুরের ওপর নির্ভর করা আমার অভ্যাস ছিল বলে ঘাবড়াইনি। জানতাম, দিন ঠিক কেটে যাবে।

বোধ হয় সেদিনটা ছিল রবিবার। মেসের আর সবাই যে যার আত্মীয় বাড়ি গেছে খাওয়াদাওয়া করতে। কারণ মেসের রান্না বন্ধ। আমি আর চন্দন মোটামুটি উপোস করে আছি। বিকেলের দিকে হঠাৎ এক ভদ্রলোক এলেন। গুরুভাই। তাঁর নাম প্রশান্ত চ্যাটার্জি। গুরুভাই এলেই আমাদের ভীষণ আনন্দ হত। প্রশান্তদা আসাতে আমরা ভারি খুশি হয়ে বসে গেলাম ঠাকুরের কথা বলতে এবং শুনতে। ঠাকুর-প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে থাকলে আমরা বরাবরই ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে যাই। এ যেন অমৃতবৎ কার্যকর। বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পর হঠাৎ প্রশান্তদা কী করে যেন আঁচ করলেন যে, আমাদের রেস্ত নেই। তাই উনি নিজেই বললেন, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আমি চায়ের দামটা দিই, একটু চা আনানো হোক।

আমরা সঙ্কোচের সঙ্গে আমাদের কাজের লোককে দিয়ে চা আনালাম। প্রশান্তদা একটু বাদে কথার ফাঁকে ফাঁকে জেনে নিলেন যে, আমরা অভুক্ত রয়েছি। তিনি আমাদের আপত্তি না শুনে পাঁউরুটি কলা ইত্যাদি আনালেন। ক্ষুন্নিবৃত্তি হল।

প্রশান্তদার কথাটা উঠল এই কারণে যে, ওই সময়ে তাঁর সঙ্গে বারকয়েক দেখা-সাক্ষাৎ হলেও পরবর্তী দীর্ঘকাল আমাদের যোগাযোগ হয়নি। প্রায় বছরদশেক বাদে যাবদপুর নর্থ রোডে যখন থাকি তখন হঠাৎ একদিন প্রশান্তদা এলেন। সঙ্গে বোধ হয় কল্যাণ চক্রবর্তী ছিল। খুব আড্ডা হল। প্রশান্তদা জন্ম-সৎসঙ্গী ঠাকুর সম্পর্কে অনেক জানেন। তাঁর সঙ্গে ইষ্ট প্রসঙ্গ করেও ভারি সুখ।

কিন্তু লোক পরম্পরায় জানতে পারলাম প্রশান্ত দা মাছ-মাংস খান। শুনে ভারি অবাক হয়েছিলাম। জন্ম-সৎসঙ্গী মানুষের পক্ষে মাছ-মাংস খাওয়াটা ভারি অস্বাভাবিক। অবশ্য এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিগ্যেস করার সুযোগ পাইনি। মনটা কেমন যেন একটু উদ্বিগ্ন রয়ে গেল। এরকম কেন হবে? ঠাকুরকে যারা বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করেছে, একটু খানিও ভালোবেসেছে তাদের মাছ-মাংসের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই বিরাগ এসে যায়। আমি ঘোর মৎসাশী মাংসাশী এবং ডিম্ব-প্রিয় ছিলাম। পেঁয়াজ রসুন ছাড়া আমার চলতই না। পঁয়ষট্টি সালে দীক্ষা নিয়েছি, তার দু-বছরের মধ্যেই আমার আমিষে অরুচি এসে গেল। তার পরও অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের উপরোধে কিছুকাল জোর করে আমিষ খেতে হয়েছে। কিন্তু আটষট্টি সালে যখন পাকাপাকিভাবে মাছ-মাংসাদি ছাড়লাম তখন কিছু ছেড়েছি বলেই

বোধ হত না। ছেড়ে যেন ভারমুক্ত বোধ করেছি। ঠাকুরের মহিমা এখানেই। তাঁর অনভিপ্রেত যা সেটা ছাড়তে কষ্ট হয় না।

তা হলে প্রশান্তদা মাছ-মাংস খান?

এই প্রশ্ন বেশ কিছুদিন আমাকে পীড়া দিয়েছিল। আর বছরদুই বাদে যখন হঠাৎ খবর পেলাম যে, প্রশান্তদার ক্যানসার হয়েছে তখনই চোখের সামনে থেকে পরদা সরে গেল। মনে হল, প্রশান্তদা তাঁর ভুলের খেসারত দিচ্ছেন।

ক্যানসার হওয়ার পর তিনি আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। খবর পেয়েও নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাব-যাচ্ছি করে দু-মাস বা তারও কিছু বেশি কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ আবার খবর এল, প্রশান্তদা মারা গেছেন।

এই অল্প বয়সে এবং এভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটা উচিত ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ভালো মানুষ এবং ইষ্টে আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর রন্ধ্রপথ অনবধানতাবশে খুলে রেখেছিলেন প্রশান্তদা।

তাই ঠাকুরের আশ্রয় করাটাই বড় কথা বলে আমার মনে হয় না। ঠাকুরকেও আশ্রয় দিতে হয় নিজের অভ্যন্তরে। অস্তিত্বকে রক্ষা করার যে অমোঘ মুষ্টিযোগ ঠাকুর দিয়েছেন তাকে উপেক্ষা করলে অস্তিত্বের সংকট কাটবে কী করে?

ঠাকুরের জীবন ও জীবনদর্শন এক অনন্ত ও গভীর চর্চার বিষয়। তাঁকে মাথা দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। ঠাকুরকে বুঝবার জন্য আমি নিজে যতবার মস্তিষ্ক চালনা করেছি, সফল হইনি। কিন্তু নামধ্যান করলে এবং ব্যাকুলতা-আকুলতা নিয়ে বুঝতে গেলে সহজেই তিনি ধরা দেন।

ঠাকুরের বাণী উপদেশাবলি সবচেয়ে ভালো হৃদয়ঙ্গম হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর নিয়ে বা কাজের ভিতর দিয়ে না হলে বুঝটা পাকাও হয় না। ঠাকুরের জীবনদর্শন পুরোটাই বাস্তবভিত্তিক। তিনি ভাবের ঘুঘু ছিলেন না। যা করেছেন তা হাতেকলমে। মানুষের ব্যথা-বেদনা দুঃখদুর্দশা নিবারণই তাঁর লক্ষ্য ছিল বলে তাঁর সব কাজকর্মই ছিল সেবামুখী। মানুষের ভিতরকার সুপ্ত গুণাবলির উদবোধন ও বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়া বাস্তবভাবে অধিগত করানোর জন্য তিনি যে কত তুক দিয়েছেন তার হিসেব নেই। ঠাকুরের অনন্যসাধারণতা আমরা সব ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। মানুষ তিনি একটাই, তবু যেন মনে হয়, পৃথিবীর সব মানুষের বুদ্ধি প্রতিভা কর্ম এক করলেও তা তাঁর সমতুল নয়। এ পর্যন্ত আমরা যত দার্শনিক ও মহাপুরুষদের পেয়েছি তাঁদের উত্তরাধিকার ঠাকুরের মধ্যে পূর্ণ বিকাশিত হয়েছিল তো বটেই, তার সঙ্গে আমরা পেলাম আধুনিক জটিল জগৎ ও জীবনের নানা গভীর সমস্যাবলির সমাধান। যে সব প্রসঙ্গ মহাপুরুষের দ্বারা আলোচিত হয়নি ঠাকুর সে সব প্রসঙ্গেও আলোকিত করলেন। এ যুগের যৌনতা ও তার বিকৃতি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে হাজারও জটিলতা, ব্যক্তিমানসে প্রবৃত্তি নীচয়ের রকমারি প্রতিক্রিয়া, বিছিন্নতাবোধ, প্রেমহীনতা, উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র, পরিবার, সব কিছুই ঠাকুরের আওতায় এল। এই ভয়ঙ্কর জটিল মানসিকতার যুগে যে সব কঠিন প্রশ্ন মানুষকে নিরন্তর তাড়িয়ে বেড়ায় সেগুলো নিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমে ক্রমে উপনীত হল ঠাকুরের কাছে। আর তখনই খুলে গেল অমৃত নির্ঝর।

ঠাকুরের গ্রন্থাদি পাঠ ক্রমশ ব্যাপক হচ্ছে। ঠাকুর-চর্চাও অনতিবিলম্বে গবেষণা ও পর্যালোচনার পর্যায়ে চলে যাবে। তার কারণ এমন সম্পূর্ণতা আর কোনও জীবনদর্শনে

নেই। নেই বিভিন্ন বিষয়ের এমন Co-ordinated knowledge। ঠাকুর একই সঙ্গে এক অধ্যাত্ম পুরুষ এবং একজন সুদূরদর্শী দার্শনিক, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী, ভাষাবিদ ও সাহিত্যকার। তিনি একই সঙ্গে এত কিছু যে, আমরা তাঁর থই পাই না।

ঠাকুর অলৌকিক বলে কিছু মানতেন না। অলৌকিক নেশা যে বড় সাংঘাতিক তাও তিনি বারবার বলেছেন। অলৌকিক আকাঙক্ষার নিকেশ না হলে দীক্ষা দিতে নেই, এমন কথাও তাঁর বলা আছে। অলৌকিকের নেশা যে কী ব্যাপক ও দুষ্টচক্রের মতো দেশ ছেয়ে ফেলেছে তাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই ঠাকুর এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। ধর্ম যে অলৌকিক নয়, ধর্ম যে ত্যাগ ভালোবাসা সেবার মধ্যে নিহিত, তার সারাৎসার যে অস্তিবৃদ্ধির যাজন সেটা আমাদের বোধের প্রবিষ্ট করিয়েছেন।

কিন্তু তবু ঠাকুরের অলৌকিকত্ব নিয়ে প্রচার সবচেয়ে বেশি। আমার ব্যাখ্যা হল, ঠাকুরের স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ এত বেশি যে সাধারণ মানুষের কাছে সেটাই ব্যাখ্যার অতীত, অলৌকিক। ঠাকুরের আবাল্য জীবনের নানা পর্যায়ে নানাভাবে সেই শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কখনও তা মেধা ও উপলব্ধিতে, কখনও বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে, কখনও তাঁর অগাধ অতুলনীয় প্রেমের ভিতর দিয়ে। অলৌকিকের প্রসঙ্গ এলে ঠাকুর যা বলতেন তা সরল ভাষায় হল, তুমি যার ব্যাখা জানো না, তাই তোমার কাছে অলৌকিক। কিন্তু পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না, যা ঘটে তার সব কিছুরই বাস্তব বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে।

আমার জীবনেও এই ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে। যার সরল কার্যকারণ আমার জানা নেই। ঠাকুরকে আশ্রয় করার আগে অবধি এ ধরনের কিছু ঘটত না কখনও। ঠাকুরকে ধরার পর তাহলে কেন ঘটতে শুরু করল? যে বিজ্ঞান দিয়ে এই সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় তা প্রচলিত বিজ্ঞান নয়, অর্থাৎ আমাদের বিজ্ঞান এখনও সেই কার্যকারণ ও পরম্পরার দরজা পুরোপুরি খুলতে পারেনি।

ঠাকুর নিজে বিজ্ঞানের মস্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই পাবনার অজ পাড়াগাঁ হিমাইতপুরে তিনি বিশ্ববিজ্ঞান স্থাপন করেছিলেন সেই কতকাল আগে। তখন বাঙালি তথা ভারতীয়রা তেমন বিজ্ঞান-মনস্ক ছিল না। বিশ্ববিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কাজ কিছু কম তো হয়নি। সেই আমলের পক্ষে এক অজ পাড়াগাঁয়ে বিজ্ঞানের এই নিবিড় চর্চা খুবই বিস্ময় উদ্রেককারী। বিজ্ঞান বিষয়ে ঠাকুরের নির্দেশ যা যা ছিল সব কিছু কাজে রূপায়িত করা গেলে আজ ভারতবর্ষ একটি বিজ্ঞান-বিপ্লব ঘটতে পারত। ঠাকুর চাইতেন ধ্যানে মানুষের যা উপলব্ধি হয় তা যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্ষেপ করা সহজ নয়। কিন্তু সম্ভব। অব্যক্ত যা কিছু আছে তাকে ব্যক্ত করা যাবেই। কিন্তু ঠাকুরের সব চাওয়া আমাদের দ্বারা পূরণ হল কই। ঠাকুর ভাইব্রোমিটারের কথা বলেছিলেন। একজন বিজ্ঞানীকে ভারও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যাপারটাকে অলীক ও অসম্ভব বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুরের নির্দেশ মাথায় নিয়ে একটু এগোলে তিনিই তো অলক্ষে এসে হাত ধরেন আর

ভাইব্রোমিটার অলীক বা অসম্ভবই বা হতে যাবে কেন? শব্দ নিয়ে যে বিশ্বময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে তাতে তো মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শব্দ, তরঙ্গ, কম্পন ইত্যাদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে মস্ত ভূমিকা নেবে। ঠাকুর মুখের কথা বলেছেন বলে বিজ্ঞান গর্বী কেউ যদি সেটাকে উপেক্ষা করেন তো মস্ত ভুল করবেন। ঠাকুর এ যাবৎকাল যা বলেছেন তার কিছুই কিন্তু ফেলনা নয়।

নিরামিষ আহারের কথাই ধরা যাক। সত্তর বছর আগে ঠাকুর এ সম্পর্কে ঠিক যা-যা বলেছেন, আজকের বৈজ্ঞানিক রিসার্চ ঠিক তা তা বলেছে। ঠাকুরের উপলব্ধিতে পৌঁছতে গেলে আমাদের এখনও অনেক অগ্রসর হতে হবে।

ঠাকুরকে বুঝে ওঠা সহজ কাজ নয়। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে খুবই সোজা, যার যুক্তি বুদ্ধি বিজ্ঞান দিয়ে ঠাকুরকে বুঝবার চেষ্টা করে বা তার অধীত বিদ্যা নিয়ে ঠাকুরকে মাপতে চায় সে ঠাকুরকে বুঝে উঠতে পারবে বলে তো মনে হয় না। ওই যে বিজ্ঞানী ভাইব্রোমিটার তৈরি করার পথেই গেলেন না তিনি ঠাকুরকে তাঁর অধীত বিজ্ঞান দিয়ে বিচার করতে গেলেন। ভাবলেন, গেঁয়ো বামুন, মুখ্যু মানুষ, উনি যা বলছেন তাতে গুরুত্ব না দিলেও চলে। এরকম প্রমাদ অনেকেরই ঘটে থাকে। আমিও তো ঠাকুরকে প্রথম প্রথম ওভাবেই মাপতে যেতুম। তাতে আমার কোনও লাভ হয়নি। এভাবে ঠাকুরকে বোঝাও যাবে না। ঠাকুরের অনেক কথাই আমাদের অর্জিত বা অধীত জ্ঞানের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু শেষ অবধি দেখা যায় ঠাকুর যা বলেছেন তা-ই সত্য। ১৯৪১ সালে এক রাতে পাবনার হিমাইপুর গ্রামে বসে লন্ঠনের আলোয় যে আপাতমূর্খ মানুষটি তাঁর শিষ্যদের কোয়ন্টাম থিওরি বুঝিয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে আমাদের হিসেব-নিকেশ সাবধানেই করতে হবে। আলোচনা প্রসঙ্গের মধ্যে সেই আশ্চর্য ঘটনা বিধৃত রয়েছে। কিন্তু এটাও তেমন কিছু নয়। নানা প্রসঙ্গে ঠাকুর এমন সব বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যা আমাদের সব ধ্যানধারণাকে পালটে দেয়।

তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, সর্বজ্ঞত্ব নিয়ে আলোচনা থাক। তাঁর সত্য পরিচয় তো সেখানে নেই। আর এই প্রজ্ঞার পরিমাপ করা বা স্বরূপ নির্দেশ করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু ঠাকুরকে বুঝবার সহজ পন্থা আছে। বিশ্বাস ও ভক্তি, আর নামধ্যান। একমাত্র এই পন্থা ছাড়া তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন।

ঠাকুরের রং যখন লাগল তখন তিরিশ-উত্তীর্ণ বয়সে একবার স্থির করলাম বিয়ে করে সংসার স্থাপন আর করব না। ঠাকুরকে বহন করে তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করে জীবনটা কাটিয়ে দেব। তখন ইষ্টানুভূতি খুব তীব্র হত। ঠাকুরের মধ্যেই জগতের সব প্রাপ্যকে যেন দেখতে পেতাম। আমি দরিদ্র স্কুল-শিক্ষক এবং লেখার বাবদে রোজগার যৎসামান্য ও অনিয়মিত। বাবা টাকা না পাঠালে আমার মেসের খরচ চলে না। ওই অবস্থা সংসার পাতার স্বপ্নও বাতুলতা। পশ্চিমবঙ্গে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বা অভিভাবকের অভাব নেই, তবু

আমার বিয়ের কোনও সম্বন্ধ আসেনি। কপালের ফেরে কোনও নারীও তার হৃদয় উপহার দেয়নি আমাকে। শুধু আমার মা আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, এবার একটা বিয়ে কর। মেসে-বোর্ডিংয়েই কি তোর জীবন কাটবে? কিন্তু মায়ের এই অসহায় ইচ্ছের পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিয়ে করলে বউকে খাওয়াব কী?

তবে মেস-বোডিং-এর জীবন তখন আমার কাছে আর ভালো লাগছিল না। চিন্তা-ভাবনার পক্ষে, মনঃসংযোগের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তো নয়। আমার সব সমস্যার সমাধানের উৎস ঠাকুর। কলকাতার রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে নিজের জীবনের নানা প্রতিকূলতার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ চোখ বুঁজে ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান করে বললুম, আমি জানি না, তুমি যা করার করো।

ওই একবারই বলেছিলাম, আর ঠাকুরও করলেন। তারপর এক চমকপ্রদ ঘটনার ভিতর দিয়ে ঠাকুরও আমার জীবনের ধারা দিলেন পালটে। নিশ্চয়ই মানুষ এর মধ্যেও অলৌকিকের আভাস পাবেন। কিন্তু আমার ব্যাখ্যা হল, ঠাকুর মানুষের মানসিকতার ধাঁচ ধরতে পারতেন। আর পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাবলির নিয়ন্ত্রণ কাঠিটিও তাঁর হাতে। তাই ঠাকুর তাঁর ভক্তজনদের জীবনের ধারা বদলে দিতে পারতেন।

আমাদের অসহায় জীবনে ঠাকুরের চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে? আমার নিজের জীবন, ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর অর্থবহ হয়েছে। যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। তার আগে যে অর্থহীন উদ্দেশ্যশূন্য বিক্ষিপ্ত জীবন আমি যাপন করেছি সেটা ছিল নিরন্তর আয়ুর ভার বহনের মতো। ঠাকুর আমার জন্য কতটা করেছেন তার পরিমাপ হয় না। আজও আমার তুচ্ছ জীবনে একমাত্র আলোকবর্তিকা ঠাকুর। সেই আলোকবর্তিকা অনুসরণ করে চলা হয়তো আমাদের মতো অস্থিরমতির পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু আলোটি ধ্রুব এবং শাশ্বত।

ঠাকুরের কথা শতমুখে বলে শেষ করা যায় না। আজ বিংশ শতকের শেষ ভাগে তিনি ক্রমশই গুরু থেকে গুরুতর আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছেন। বিতর্কও বড় কম নেই। বিতর্ক যিশুখ্রিস্ট হজরত মোহম্মদ কাকে নিয়েই বা নেই? বিতর্ক থাকা বরং ভালো, তাতে লোকের জানবার ও খুঁজবার আগ্রহটা বাড়ে।

চার

ঠাকুর এবং তাঁর সৎসঙ্গ এ দুইয়ের মধ্যে একটা যোজক গড়ে তোলার কাজে সামান্য ভাটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ব্যক্তি আর সংগঠন এক নয়। আরও কথা হল, আমার মুখে 'ঠাকুর ঠাকুর' করলেও কার্যক্ষেত্রে স্বীয় স্বার্থই আমাদের চালনা করে, ইষ্টস্বার্থ নয়। ঠাকুর

আমাদের এই সব মানুষী দুর্বলতার কথা ভালোই জানতেন, তাই যাতে আমরা আত্মস্বার্থের ফাঁদে পড়ে ঠাকুরকে ভুলে না যাই তার জন্য নানা তুক দিয়ে গেছেন। সে গেল একরকম। কিন্তু ঠাকুরকে ভোলার চেয়েও মারাত্মক হল, আত্মস্বার্থের সিদ্ধির জন্য ঠাকুরকে বিকৃত করা। পাপের কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই। মানুষ যে সব সময়ে ইচ্ছে করে বিকৃতি ঘটায় তা নয়, তবে আত্মস্বার্থ বোধের প্রাবল্য, নামধ্যানের খামতি, অজ্ঞানতা, আলস্য, দুর্বলতা, অন্যের প্রভাব, ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ ঠাকুরের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং বিকৃতি ঘটাতে থাকে।

আমি এক ইষ্টভ্রাতাকে জানতুম, তিনি অকৃতদার, বয়স্ক মানুষ। তিনি আমাকে একদিন বললেন, জানেন তো, ঠাকুর সূর্যোদয়ের আগে ইষ্টভৃতি করতে নিষেধ করেছেন।

ঠাকুরের এরকম কোনও কথা আছে বলে জানি না। তাই অবাক হয়ে বললুম, তাই নাকি?

হ্যাঁ, সূর্যোদয়ের আগে তো দিন শুরু হয় না, তাই বারণ।

এর পর তিনি যা বললেন তা ভয়াবহ। তিনি রোজ রাত তিনটের সময় ওঠেন, প্রাতঃকৃত্যাদি করেন, চা এবং চিঁড়েভাজা দিয়ে জলযোগ করেন, কারণ তখনও তো পরের দিনটা শুরু হয়নি, আগের দিনটাই চলছে। জলযোগের পর তিনি নামধ্যান করতে বসেন এবং যেই সূর্যোদয় হয় তখনই ইষ্টভৃতি করেন।

এ কথা শুনে আমি হাসব না কাঁদব তা ভেবে পেলুম না। তবে আর একজন বিখ্যাত এবং প্রজ্ঞাবান ইষ্টভ্রাতাও এরকম একটা কথা আমাকে বলেছিলেন। তিনি নাকি সূর্যোদয়ের আগে ইষ্টভৃতি করে ফেলায় ঠাকুর তাঁকে আবার সূর্যোদয়ের পর ইষ্টভৃতি করিয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলুম, ঠাকুরের কোন বাণীতে এরকম নির্দেশ আছে? তিনি বলতে পরেননি। বুঝতে পারলুম একটা মনগড়া ব্যাপার ঠাকুরের নামে কিছু লোক চালু করে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঠাকুরের ওপর খোদকারি।

জনৈক নামকরা ইষ্টভ্রাতা একবার স্বস্তিযজ্ঞ চালু করেছিলেন। একদিন আমার বাড়িতে একটি তরুণ গুরুভাই এল। তার মাথা ন্যাড়া, আমি ন্যাড়া মাথা দেখে শশব্যস্তে তার মা-বাবা কেমন আছেন জিগ্যেস করলুম, সে একগাল হেসে বলল, সব ভালো। জিগ্যেস করলুম, তুমি ন্যাড়া হয়েছ কেন? মাথায় খুসকি বা উকুন হয়েছে নাকি? সে বলল, না। একটি স্বস্তিযজ্ঞ করলুম তো, তাই। স্বস্তিযজ্ঞ! আমি আকাশপাতাল ভাবতে বসলুম। স্বস্থিযজ্ঞ বলে ঠাকুরের কোনও ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত আছে বলে তো জানি না। তাই জিগ্যেস করলুম ব্যাপারটা কী বলো তো! তখন সে বলল, সকাল থেকে অনাহারে থাকতে হয়। সারাদিনে অন্তত এক হাজার টাকা যতক্ষণ না সংগ্রহ করা যাচ্ছে ততক্ষণ জলগ্রহণ নিষেধ।

জিগ্যেস করলুম, ঠাকুরের কোন বইতে এই যজ্ঞের কথা আছে।

সে বলল, তা আমি জানি না, তবে আছে নিশ্চয়ই। অমুকদা জানেন।

বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর বুঝতে পারলুম এটা ঠাকুরের নিদান নয়, অমুক দাদারই নিদান। তিনিই নিজের মাথা খাটিয়ে এই ফিকিরটি বার করেছেন। এবং তা ঠাকুরের নামে চালাচ্ছেন বোকাসোকা গুরুভাইদের কাছে।

সেই দাদাটি স্বস্তিযজ্ঞের মতো আরও দু-একটি যজ্ঞ চালু করেছিলেন, তবে সেগুলোর নাম আমার আর আজ মনে নেই। ঠাকুরকে সংশোধন করা বা তাঁর নাম ভাঙিয়ে নিজস্ব পথে মানুষকে চালনা করা যে কতখানি বিপজ্জনক তা সকলেই বুঝবেন।

অর্থসংগ্রহ করা তো নিশ্চয়ই প্রয়োজন। ঠাকুরের কত কাজ আছে যা করতে গেলে টাকা অঢেল দরকার। তা ঠাকুর তো নিজেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কপর্দকহীন অবস্থা থেকে এত বড় সংগঠন গড়ে তুললেন কীভাবে? সে কি মানুষের কাছে শুধু হাত পেতে না নানারকম বুজরুকি করে? তাঁর নামে যে আজও মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাখো লাখো টাকা ঢেলে দেয় তা কীভাবে হচ্ছে? আসল কথা হল, টাকা নয়, ঠাকুর অর্জন করতেন মানুষকে। আর মানুষকেই যদি অর্জন করা যায় তাহলে কি আর টাকার অভাব হয়?

আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের নিয়ন্তা হলেন ঠাকুর। ঠাকুরই মানুষ যাচাইয়ের সর্বোত্তম কষ্টিপাথর। কাজেই আমরা যা কিছু করছি তা ঠিক হচ্ছে কি না তার বারংবার ঠাকুরের নীতিবিধির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার। নিরন্তর নিজেকেও যাজন করা দরকার। নইলে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ হবে কী করে? এই আত্মবিশ্লেষণ করা হয় না বলেই আমরা ঠাকুরকে নিয়ে মনগড়া নানা ছেলেখেলা করি।

ঠাকুর যে আন্দোলন শুরু করে গেছেন তা হচ্ছে চেতন হওয়ার, জীবনকে দুহাতে আলিঙ্গন করার আন্দোলন। আমাদের নামধ্যান, সাধনা, যজন, যাজন সব কিছুই কিন্তু আনন্দেরই অভিসারী। ঠাকুর আমাদের জীবন থেকে দুঃখের মূল উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্যই তাঁর দেওয়া নানা বিধান। এ সমস্ত বিধানই জীবনমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং অতিশয় বাস্তব। তাঁর দেওয়া বিধান থেকে এক তিল বিচ্যুতিও কিন্তু আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করে দিতে পারে।

ঠাকুর আমাকে অনেক দিয়েছেন। সেটা প্রত্যেক্ষ দান নয়। কিন্তু জীবনের চারদিক থেকে পাওয়ার পথগুলি খুলে দিয়েছেন। আমার অকিঞ্চন জীবনের ঠাকুরই একমাত্র অবলম্বন। আর ঠাকুর ছাড়া অন্য কোনও পথও আমার সামনে একসময়ে খোলা ছিল না।

ঠাকুর সম্পর্কে অনেক কথা বলার পরেও অনেক বাকি থেকে যায়। তার কারণ ঠাকুরের জীবন ও জীবনদর্শনের মধ্যেও এক রহস্যময় গভীরতা রয়েছে যেখানে পৌঁছোনোর সাধ্য আমাদের নেই বা হবেও না। ঠাকুরকে আমি যে কয়েক বছর ধরে চাক্ষুস দেখেছি সেই কয়েক বছর তাঁকে মানুষ হিসেবে আমার ধী ও বোধ দিয়ে বহুভাবে বিচার করতে চেষ্টা করেছি। ত্রিমাত্রিক তাঁর অস্তিত্ব, তবু আরও একটি মাত্রা যেন আমার

ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। এই যা আমার নাগালের বাইরে রয়ে গেল সেখানেই নিহিত রইল ঠাকুরের স্বরূপ। তিনি আসলে কে, তিনি আসলে কি তা তিনি দয়া করে প্রকাশ না করলে আমাদের সাধ্য কি, তাঁকে উন্মোচন করি?

ঠাকুরকে জানার ও বুঝবার জন্য আমি গুরুভাইদের সঙ্গে প্রথমাবধি মেলামেশা করে আসছি। অন্যের মারফত ঠাকুর সম্পর্কে জানবার চেষ্টা ছাড়া উপায় কী? ঠাকুরের কাছাকাছি যাওয়ার উপায় ছিল না। সব সময়ে লোক তাঁকে ঘিরে থাকে। তা ছাড়া আমিও তখন বেজায় লাজুক আর মুখচোরা ছিলাম। কিন্তু ঠাকুর সম্পর্কে জানবার প্রবল আগ্রহে গোয়েন্দার মতো তথ্য সংগ্রহ করতে ছাড়িনি।

এই অনুসন্ধান আমার পক্ষে মঙ্গলজনকই হয়েছে। জেনেছি অনেক। বুঝেছি, ঠাকুর ওই একটিমাত্র জায়গায় বসে থেকে কত না কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন, কত মানুষকে পরিপূরণ করছেন, কত আর্তকে রক্ষা করছেন! অলৌকিক? ঠাকুরের কোনও ব্যাপারকেই আমার মিরাকল বলে মনে হয় না। মনে হয় বিশ্বনিয়ন্তা তিনি। তাঁর পক্ষে তো সবই সম্ভব। ঠাকুরের জীবনে যা কিছু ঘটেছে সবই এত স্বাভাবিক ও বাস্তবভাবে যে কখনও সেগুলিকে মিরাকেল মনে করতে ইচ্ছেও হয় না।

ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর আমার জীবনেও নানা ঘটনা ঘটতে শুরু করে। এই সব ঘটনা নিজের জীবনে না ঘটলে অবশ্যই আমি বিশ্বাস করতাম না। ভারতবর্ষে ধর্মের নামে ম্যাজিক দেখানো এক প্রচলিত ব্যাপার। অনেক সাধু বা ধর্মগুরু শুধু ওই অলৌকিক কাণ্ডকারখানার ওপরেই খ্যাতি অর্জন করেন। এই সব ম্যাজিক ওয়ালাদের পাল্লায় পড়ে ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই গৌণ হয়ে গেছে। ঠাকুরকে এঁদের সমপর্যায়ে টেনে যদি কেউ নামায় তাহলে সে গর্হিত অন্যায় কাজ করবে। ঠাকুরের যে অঘটন ঘটন পটুত্বের কথা বলছি তার পেছনে রয়েছে প্রগাঢ় বাস্তববোধ আর আচরণ। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেরই অলৌকিক সংঘটনের ক্ষমতা রয়েছে, তার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি। কিন্তু তা ঘটছে নিতান্তই বাস্তব কার্যকারণে নিয়ম মেনে। এর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যেই প্রকৃতিদত্ত অফুরন্ত শক্তি ও ক্ষমতার ভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষমতার সম্যক ব্যবহার খুব কম মানুষই করে। আমাদের মস্তিষ্কের ধূসর কোশের বেশির ভাগই জাগ্রত থাকে না। আর আমাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলির সমন্বয় ঘটানোর সক্রিয় পন্থা বা উদ্যোগ কী হওয়া উচিত তা আমাদের জানা নেই। ঠাকুর মানুষের পদ্ধতি আমাদের শিখিয়েছেন তার তুলনা সমগ্র বিশ্বে আর পাওয়া যাবে না। ঠাকুরের পন্থায় চলতে মানুষকে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছেড়ে বনে-জঙ্গলে গিয়ে কঠোর তপস্যার নামে মানসিক ও শারীরিক কষ্ট পোহানোর প্রয়োজন নেই। তার জীবনযাত্রার ভিতরেই আনতে হবে কিছু শুভ পরির্বন আর মানসিকতায় কিছু দৃঢ়তা।

ঠাকুর বলেছেন, 'বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি।' কথাটা যেমন সুন্দর তেমনই সত্য। বনের সন্ন্যাসী বন্ধনমুক্ত বলেই তার সেই টান হবে না, বন্ধনে থেকে একজন গৃহস্থের যে টানটা ঈশ্বরের প্রতি হয়। তাই গৃহী-সাধুরই সুযোগ আছে তাড়াতাড়ি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে যাওয়ার। ঠাকুরের দেওয়া গৃহসন্ন্যাসটির স্বরূপ অতীব চমৎকার। পুরাকালের ঋষিমুনিরা তপোবনে বাস করতেন বটে, কিন্তু তাঁরা বিবাহাদি করতেন, সন্তান-সন্ততিও হত। কিন্তু তাঁদের সংসারাশ্রমও ছিল ইষ্ট পূরণার্থে। সমস্ত জীবন ও জীবনযাপনই ছিল মঙ্গলমুখী।

ঠাকুর যতি-আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। যতিরা প্রকৃত সন্ন্যাসী। তবে তাঁদের পোশাক স্বাভাবিক, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক, কিন্তু সংসারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক থাকবে না। ভিক্ষান্নই তাঁদের সম্বল হবে। এজীবন যে-কোনও সন্ন্যাসীর জীবনের চেয়ে সহজ তো নয়ই বরং কঠিনতর। ঠাকুর এঁদের জন্য যতি-আশ্রম স্থাপন করেন।

কিন্তু যতিদের কথা থাক। ঠাকুরের যাঁরা সাধারণ শিষ্য তাঁদেরও কিন্তু একরকম সন্ন্যাস জীবনই কাটাতে হয়। তবে তা বিশুদ্ধ জীবন নয়। যপতপ নামধ্যান সদাচার তার জীবনে এমনই সহজে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠবে যে সেগুলিকে আর আলাদা বা অতিরিক্ত কোনও আয়াস বলে মনে হবে না। সে সাগ্রহে এবং সানন্দে ঠাকুরকে গ্রহণ করে সে সহজেই পারে। নিরামিষাশী হওয়া বা সদাচার পালন করার ব্যাপারে আমার নিজেরও কম বাধা ছিল না। নিরামিষের বিরোধী ছিলেন আমার মা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। আর, আর আমিষাসক্ত রসনাও তো কম বিরুদ্ধতা করেনি। কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছাতেই ধীরে ধীরে আমার মাছ-মাংসের আসক্তি চলে যেতে লাগল। দীক্ষার দু-বছর পরে অবধি মাছ-মাংস খেতাম বটে, কিন্তু অনিচ্ছের সঙ্গে। আমার অভ্যন্তর যেন আমিষ গ্রহণ করতেই চাইত না। এর কারণ আর কিছুই নয়, যাকে ভালোবাসা যায়, তার রুচি এবং ইচ্ছা ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। প্রেমাসক্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এটা প্রায়ই দেখা যায়।

ঠাকুরের প্রগাঢ় ও গভীর ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ মানুষকে এমনই প্রভাবিত করে যে, ঠাকুরের ইচ্ছা অনিচ্ছা বুঝে চলতে তার কোনও কষ্ট হওয়ার কথাই নয়। মনে রাখতে হবে, আমাদের মঙ্গলকামনা ছাড়া এই দুনিয়ায় ঠাকুরের আর কোনও চাহিদা ছিল না। ছলে-বলে কৌশলে তিনি আমাদের ভালো করারই চেষ্টা করেন।

প্রথম দিকে, অর্থাৎ আমার দীক্ষার পরই ঠাকুরের পরিমণ্ডলে কয়েকজন এমন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল যাঁরা আধ্যাত্মিকতার পথে অনেকটাই প্রাগ্রসর বলে মনে হয়েছে। এখানে তাঁদের নামোল্লেখ করব না, তবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে এঁদের অতিশয় গভীর প্রভাব আজও রয়েছে। ঠাকুরের পথে চলবার জন্য একটি অব্যাহত প্রচেষ্টা দরকার। সাধারণ পথে এমনিতেই ওঠা-পড়া আছে। ঠাকুরের পথে সেটা আরও বেশি বোঝা যায়। গতি ও একরোখা অনুশীলন না থাকলে পিছিয়ে পড়তেই হবে। দীক্ষার পর সে যত

নামধ্যান ও চারিত্রিক সংশোধন করে তার মুখে-চোখে, চলায় ফেরার ততই ভাগবত ভাব প্রকট হয়। উন্নতিটা হয়ও খুব দ্রুত। কিন্তু গতি বজায় না রাখলে বা ঢিলে দিলেই আমার সেই জ্যোতি ও বিভা উধাও হয়।

সহজ কথায় বলতে গেলে, ঠাকুরের সঙ্গে কোনও লুকোচুরি কোনও চালাকিই সম্ভব নয়। ঠাকুরের পথ যেমন কঠিন তেমনই সহজ। বিশ্বাস ও ভক্তি এবং ভালোবাসা না থাকলে ঠাকুরকে অনুসরণ করা অতীব কঠিন, আর থাকলে খুবই সহজ। তিনি বুদ্ধির প্যাঁচে ধরা দেন না, কিন্তু সহজ ভক্তির কাছে জল হয়ে যান। ঠাকুরকে নিয়ে গত বাইশ-তেইশ বছর চলার অভিজ্ঞতা থেকেই এই শিক্ষা আমার হয়েছে।

গত বাইশ-তেইশ বছর ধরে ঠাকুরের বুঝবার বা জানবার চেষ্টা যতটা করেছি সেটা মুখ্য নয়, তার চেয়ে বেশি ঠাকুরকে ধরে বাঁচতে চেয়েছি। বিপত্তারণ ঠাকুর আমাকে বারংবার রক্ষা করেছেন। কিন্তু পুরোপুরি ধরা তো দেননি। কাউকেই কি তিনি তেমনভাবে ধরা দেন?

আমার এক বন্ধু এক সময়ে প্রবল রকমের ভক্ত ছিল ঠাকুরের। তার সবসময়ের ধ্যানজ্ঞান ছিলেন ঠাকুর। বিয়ের পরই কিন্তু তার ওই রোখ ভীষণ কমে গেল। আর বিয়েটাও সে তেমন ভালো করেনি, আবেগচালিত হয়ে করেছিল।

শুধু বিয়ে কেন, জীবনের যে-কোনও গুরুতর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সে-ব্যাপারে ঠাকুর কী বলেছেন সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। ঠাকুরের সঙ্গে অমিল হলে সেটা বর্জন করা নির্মমভাবেই প্রয়োজন।

ঠাকুরকে জীবনে সর্বতোভাবে গ্রহণ করলে বাস্তবজ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচারবোধ যে বৃদ্ধি পায় তা আমার নিজের জীবনেই দেখেছি। ঠাকুরকে আশ্রয় করার আগে আমি ছিলাম অন্যমনস্কতা ও অবাস্তবতার শিকার। কীভাবে চলছি, কী করছি তার কোনও ঠিক-ঠিকানাই নেই। তেমন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, জীবনটাকে মাঝে মাঝে অর্থহীন মনে হত। ঠাকুরকে আশ্রয় করার পরই মাঝে মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে বুঝতে শুরু করলাম যে, এ জীবনে অনাবিল আনন্দেরও একটা উৎস আছে। সেই উৎসের মুখটি যদি একবার খুলতে পারি তবে এই অর্থহীন জীবনে সঞ্চারিত হবে গভীর অর্থ আর নতুন মাত্রা। সেই চাবিকাঠি একমাত্র ঠাকুরের কাছেই আছে।

পাঁচ

সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ আমি কিছু করেছি। সেই ছেলেবেলা থেকেই। এখন সুযোগ পেলেই সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার মর্ম বুঝতে চেষ্টা করি। আমার মা স্বয়ং গৌরী

মায়ের সাক্ষাৎ শিষ্যা এবং ছেলেবেলা থেকে সারদেশ্বরী আশ্রমে থেকে বড় হয়েছেন। রামকৃষ্ণদেব আমাদের বাড়িতে বিগ্রহের আসনে আসীন। তবু একটা বয়সে এসে আমি ধর্ম ঈশ্বর ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে যাই। অথচ ছেলেবেলা থেকেই মায়ের মুখে ঠাকুর-দেবতার কথাই শুনে শুনে বড় হয়েছি। অমন ধর্মশীলা মায়ের সন্তান হয়ে কেন যে আমার মধ্যে কালাপাহাড় জেগে উঠেছিল কে জানে! যখন ঘোর মানসিক সংকটে আক্রান্ত হয়ে শুধুমাত্র রক্ষা পাওয়ার জন্য ঠাকুরের আশ্রয় নিলাম তখনও আমার ভিতরে নাস্তিকতা জেঁকে বসে আছে। ঠাকুর আমাকে সেই ঘোর সংকটের গহ্বর থেকে টেনে তুললেন; আর যে রামকৃষ্ণদেবকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম তাঁকেই আবার ফিরে পেলাম ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মধ্যে।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে ঠাকুরের অভেদ কল্পনা করেন অনেকেই। অভেদ কল্পনা আমিও করি। তবে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের অমৃতধারা কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। মানুষের অনেক সমস্যা সংকট জটিলতা বিষয়ে সেখানে আলোচনা নেই। ফলে একালের, এই জটিল যুগের আধুনিকতম মানসিক সংকটের প্রতিবিধান সেখানে ততটা মিলবে না। ঠাকুরের জীবনদর্শন কিন্তু সেদিক দিয়ে অনন্য। এমন কোনও বিষয় নেই যা নিয়ে কথা হয়নি এবং যার সহজ সুচারু অসামান্য সমাধান ঠাকুর দেননি। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, বায়ুকোণে আর একবার আমার দেহ হবে। সেই দেহধারণই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্ররূপে তাঁর প্রকাশ কি না তা আমাদের মতো অদূরদর্শী কী করে বলবে? শুধু মনে হয় এমন হওয়াই বুঝি স্বাভাবিক। পুরোনো সংস্করণে রামকৃষ্ণদেবের এই উক্তি অনেকেই দেখেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের অনেক মিল। কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্র বৃহত্তম, পরিপ্রেক্ষিত বিশাল। তার কারণ, ঠাকুর যে সময়ে আর্বিভূত হয়েছিলেন সেই সময়টাই জটিলতা ও মনোবিকারের যুগ। এই যুগেই মানুষের পুরোনো মূল্যবোধগুলির অবক্ষয় ঘটে গেল। ফলে রামকৃষ্ণদেবের আমলে যেমনতরো সামাজিক ও ব্যক্তিগত বাতাবরণ ছিল তার ঘটল বিশাল পরিবর্তন। দেখা দিল কঠিনতর মানবিক ও আত্মিক সমস্যা। ঠাকুর ও রামকৃষ্ণদেব এক ও অভিন্ন হয়েও কিন্তু দুটি সত্তা, দুটি বিকাশ। রামকৃষ্ণদেবকে অবিকৃত ও অটুট রেখেও যুগপ্রয়োজনে ঠাকুর বিস্তার ঘাটলেন তাঁর জীবনদর্শনের। নতুনতর প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতেই এল নতুনতর সংযোজন। আর ঠাকুরের এই নতুন দর্শন এক কথায় অভূতপূর্ব এবং অনন্য সাধারণ। নতুন হয়েও তা আসলে শাশ্বত।

আমাদের শাস্ত্রাদিতে জীবন বিজ্ঞানের অতিশয় কার্যকর গবেষণার যে পরিচয় আছে সেগুলিকে আমরা উপেক্ষা করেছি এবং খতিয়ে দেখিনি। ঠাকুর পুরোনো সেই সব গবেষণাকেই যুগোপযোগী করলেন এবং তার চেয়েও বড় কথা কালো শৈবাল থেকে সেগুলিকে মলমুক্ত করলেন। শব্দ এবং ধাতুর মূল ধরে সেগুলির যে ব্যাখ্যা ঠাকুর করেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে। যেমন ধরা যাক ট্যাক্স কথাটার বাংলা ও সংস্কৃত

হল কর। কর কথাটার অর্থ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন, করা মানে হাত, তাই কর প্রদান ও গ্রহণ হচ্ছে আসলে হাতে হাত মেলানো। জনসাধারণের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠী এই কর প্রদান ও গ্রহণের ভিতর দিয়ে আসলে মৈত্রীর বন্ধনেই আবদ্ধ হয়।

মনকে ত্রাণ করে যা তাই হল মন্ত্র, এই সংজ্ঞা তো অনেকেই জানেন, কিন্তু তার বাস্তব চর্চা কজন করে দেখেছেন? কৃপা শব্দের মধ্যে যে কৃ অর্থে করা এবং পা অর্থে পাওয়া, অর্থাৎ করে পাওয়া অর্থটি নিহিত রয়েছে, তা যে ছপ্পর ফুঁড়ে পাওয়া নয়, এটাই বা কজন খতিয়ে দেখেছেন।

ঠাকুর শব্দ বা ধাতুর মূল অনুসন্ধান করে তার মূল অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করতেন বলেই প্রাচীন শাস্ত্রাদির অনেক অস্পষ্টতা আমাদের কাছে প্রাঞ্জল হয়েছে।

ঠাকুরের ভাষা এতই সমৃদ্ধ ও অলঙ্কারবহুল যে তা গভীর ও ব্যাপক গবেষণার অপেক্ষা রাখে। বাংলা গদ্যে এক মস্ত বিপ্লব তিনি ঘটিয়েছেন, সেটা হয়তো এখনও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। তিনি ধর্মীয় পুরুষ বলেই বোধ হয় সাহিত্যিক অধ্যাপক পণ্ডিত গবেষকরা তাঁকে খানিকটা উপেক্ষা করেছেন। বাংলা ভাষায় যে কত অপ্রচলিত মৃত অব্যবহৃত শব্দকে তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন, তৈরি করেছেন কত নতুন শব্দ এবং দেশজ মৌলিক কত শব্দকে যে স্থান করে দিয়েছেন তাঁর অনবদ্য গদ্যে তার ইয়ত্তা নেই। ফলে ঠাকুরের গদ্য সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। ঠাকুর বলতেন যে বাংলা ভাষাটা বড্ড সীমাবদ্ধ, এই ভাষায় মনের সব ভাব প্রকাশ করা যায় না। আমি নিজে বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে ঠিক এই সমস্যারই মুখোমুখি হয়েছি। ঠাকুর আলাপচারির সময় প্রচুর ইংরাজি শব্দ ও বাক্যবন্ধ করেছেন। বুঝতে পারি বাংলা গদ্যের সীমাবদ্ধতার জন্যই তাঁকে তা করতে হয়েছে। তবে সে সব ইংরিজিও এতই অসাধারণ যে অবাক মানতে হয়। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে তিনি বাণী দিয়েছেন সেখানে ইংরেজি ব্যবহার করেননি।

বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় তাঁর এই দখল কী করে সম্ভব হল সেটাও এক গভীর রহস্য। শুধু ভাষাই বা কেন, ঠাকুর বিজ্ঞান, সমাজ, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, ধর্মীয় কূটপ্রশ্ন দর্শন নিয়ে যা বলেছেন আমাদের বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেয়। ঠাকুরের সর্বজ্ঞতা নিয়ে আমার যে সন্দেহ প্রথমে ছিল তাঁর পুথিপত্র পড়তে পড়তেই উবে যায়। ভাবি শুধু সাহিত্য করলেই ঠাকুর বাংলা ভাষার সর্বোত্তম সাহিত্য রচনা করতে পারতেন। তবে তাঁর মতো মানুষের পক্ষে তো একটা বিষয় নিয়ে থাকা সম্ভব নয়। জীবনে বহু সমস্যা। আর লাখো মানুষ তাঁর শরণাগত। ঠাকুরের কি সাহিত্য নিয়ে থাকলে চলে? তবু ওই অবিশ্বাস্য নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার মধ্যে সমস্যা সংকটে দীর্ণ হতে হতেও তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে যা তারই সম্পদ বাংলা ভাষা আরও বহুকাল ভোগ করবে।

দীক্ষার পর দু-বছর আমি ঠাকুরের বইপত্র পড়িনি এ কথা আগেই বলেছি। এখনও যে গভীরভাবে ঠাকুরের বইপত্র পড়াশুনো করতে পারি এমন নয়। কিন্তু মানসিক সংকটে পড়লে ঠাকুরের বই বা ঠাকুর সম্বন্ধীয় বই পাগলের মতো পড়ি। আর তখনই ওই পড়া আমার মনে গভীরভাগে দাগ কাটতে থাকে। একবার আমার মায়ের গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে শিলিগুড়ি যেতে হয়েছিল। ডাক্তাররা একরকম জবাব দিয়েছিলেন। পাঁচজন বিশেষজ্ঞ মিলিত হয়ে একই কথা বললেন, যদি বাঁচাতে চান তাহলে হয় কলকাতা বা ভেলোরে নিয়ে যান। তবে বাঁচার কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। মায়ের ওই অবস্থায় আমরা দুই ভাই শুধু পাগলের মতো নাম করেছি আর ঠাকুরকে ডেকেছি। সেই সময় একজন হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল। তিনি লক্ষণ দেখে বললেন, এটা যেন টিউমারের কেস মনে হচ্ছে না। ওষুধ দিচ্ছি, দেখা যাক। তিনি ওষুধ দিলেন। তবু সেই সময়ে হোমিয়োপ্যাথির ওপর ভরসা না রেখে আমি কলকাতায় চলে এলাম হাসপাতালে মাকে ভরতি করার অগ্রিম ব্যবস্থা করতে। ওই ফেরার সময় গাড়িতে পড়ার জন্য ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে নানা প্রসঙ্গ এক খণ্ড এনেছিলাম। গাড়িতে বসে মানসিক তীব্র অশান্তি আর অস্থিরতার মধ্যেও যেই বইটি খুলে পড়তে শুরু করলাম অমনি যেন ঠাকুর আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। তাঁর আশ্চর্য ভাষার দর্শন ও মায়াময় আধ্যাত্মিক জগতে চলে গেলাম এক লহমায়। পড়তে পড়তে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়ার জোগাড়। ওই মানসিক অবস্থায় যে-কোনও গ্রন্থ এমন টনিকের কাজ করতে পারে তা জানা ছিল না। এই ঘটনার পর আমার মা আরও দশ বছর বেঁচে ছিলেন।

ঠাকুর এই সম্মোহন এখন কত মানুষকে আকর্ষণ করছে। আরও করবে। ঠাকুরের গ্রন্থরাজি মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠবেই। কেন না তার ছত্রে ছত্রে জীবনের কথা, বাঁচার কথা, বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। মানুষকে তা দুর্যোগের রাতে বাতিঘরের মতো টানছে এবং পথ দেখাচ্ছে।

ঠাকুরের মতো জীবনদার্শনিকের সব কিছু মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। তেমন ধীশক্তি আমাদের নেই। ফলে অপব্যাখ্যা বা ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা এসব ক্ষেত্রে খুব বেশি। এমনকী আমি আমার নিজের ক্ষেত্রেও দেখেছি ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গিয়ে তাঁর অনেক নীতিবিধির গণ্ডগোল হয়েছে। এর জন্যই ঠাকুর তাঁকে অবিকৃতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন। অবিকৃতভাবে কথাটা তিনি ওই জন্যই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, তুমি যদি আমাকে ঠিকমতো বুঝে না থাকো তাহলে আমার বাণীর সংশোধন করতে যেত না, যেমন আছে তেমনই থাকতে দাও। ভবিষ্যতের মানুষ হয়তো ওই সব বাণীর সারসত্য হৃদয়ঙ্গম করবে।

তাই ঠাকুরের বাণীর সামান্যতম সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা পরিবর্তন কখনওই বাঞ্ছনীয় নয়। তবে তাঁর বাণী ও জীবনদর্শন নিয়ে আলাপ-আলোচনা ব্যাখ্যা সবই

হতে পারে তার গ্রন্থগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে। ঠাকুরের বাণী অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর স্বার্থেই।

ঠাকুরের অনেক বাণী অনেক বাক্য এবং শব্দ আমার কাছে অনেক সময়ে প্রাঞ্জল নয়। তার কারণ তাঁর গদ্যে এমন সব বাক্যবিন্যাস বা শব্দ রয়েছে যা আমার পঠন-পাঠন অভিজ্ঞতার বাইরে। বাংলা ভাষায় ঠাকুর যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটতে আমাদের বেশ কিছু সময় লাগবে, তবে শেষ অবধি ঠাকুরের ব্যবহৃত বাংলা ভাষা তার অফুরান শব্দভাণ্ডারসহ বাংলা সাহিত্য এবং গদ্যচর্চায় এক দিগদিশারী হয়ে উঠতে বাধ্য। নিঃশব্দে এবং অলক্ষে ঠাকুর বাংলা ভাষায় এক বিপ্লব সংগঠিত করেছেন, অনেকেই তার খবর রাখেন না। তবে ক্রমে ক্রমে এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হচ্ছে।

ঠাকুরই আমাদের সর্বশেষ আশা ও ভরসা, ঠাকুরই শেষ আশ্রয় এ কথা নিজে যতটা বুঝতে পারি ততটা অন্যদের বোঝাতে পারি না। ঠাকুর যাকে যাজন বলেন তার সাফল্য নির্ভর করে চারিত্রিক বিকাশের ওপর। আমাদের সেই বিকশিত চরিত্র কই? আমার তো এমন হয় দিনের পর দিন ঠাকুরের কথা বলব এমন মানুষ খুঁজে পাই না। যাজন করে দীক্ষা দেওয়া মাঝে মাঝে বেশ কঠিন বলে মনে হয়। আমার নিজের চরিত্রে যে জড়তা রয়েছে তাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাই আমার ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম।

এ জড়তার শিকার শুধু আমি একা তো নই। আমার মতো আরও আছেন কেউ কেউ। এই জড়তার কথা ঠাকুর বারংবার উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে। কী করে তা কাটিয়ে ওঠা যায় ঠাকুর তারও তুক দিয়েছেন। তবু আমরা এই জড়তার প্রেমে বিজড়িত হয়ে এমন ফাঁদে আটকে পড়েছি যে বেরোবার ইচ্ছেটা পর্যন্ত জোরদার হতে চায় না।

ঠাকুর মানুষের সবরকম দুর্বলতাকেই গভীরভাবে চেনেন। জানেন নানা অভিভূতি আমাদের কেমন অবশ বিবশ নিশ্চেষ্ট করে রেখেছে। এই জড়তা শুধু মনকেই আচ্ছন্ন করে না, তার প্রভাব শরীর পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়। আমি এ সত্য নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই উপলব্ধি করেছি। এই জড়তা অল্পবিস্তর গোটা জাতিকেই যে আচ্ছন্ন করে আছে তা ভালোই জানেন।

মানুষকে এই সব জড়তা থেকে মুক্ত করাই ঠাকুরের উদ্দেশ্য। তাই আধ্যাত্মিক পুরুষ, ধর্মগুরু হয়েও তিনি যেন আরও বেশি। তিনি একাধারে ব্যক্তি মানুষের মনোজগতের যোদ্ধা, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কারক এবং প্রবল বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন এক দার্শনিক। ঠাকুরের ব্যাপ্তি ও বিশালতাই আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়।

ঠাকুর নিজে সব রকম অভিভূতি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁর মতে অবয়ববিশিষ্ট হয়েও তাঁর চেয়ে কত বিভিন্ন রকম। আমাদের মধ্যে তবু ঠাকুরত্বেই দেখতে চেয়েছেন তিনি ঠিক তাঁর মতোই। এ তাঁর এক অতৃপ্ত আকাঙক্ষা। মানুষের উন্নতি, মানুষের মঙ্গল দেখতে তিনি ভালোবাসতেন। এত উৎসুক হয়ে থাকতেন যে, মনে

হত এ ছাড়া তাঁর অস্তিত্বই বিপন্ন। আমাদের ভিতরেই যে তাঁর অস্তিত্ব নিহিত তাও তিনি বলেছেন। আমরা এবং ঠাকুর যে আলাদা নই সে সত্য আমরা তত্বগতভাবে জানি। তিনি এক ছিলেন, বহু হয়েছেন। আমাদের সকলের ভিতরেই নিহিত আছেন তিনি। কিন্তু যতক্ষণ সেটা উপলব্ধি ও অনুভবে না আসে ততক্ষণই জীব আর শিবে বিভিন্নতা। আমাদের ভিতরে যাতে আমরা ঠাকুরত্বের উদবোধন করি, আমাদের মধ্যে যাতে তিনিই জাগ্রত হন তার জন্যই ঠাকুরের যা কিছু ব্যাকুলতা।

ঠাকুর চান আমরা সব তাঁর মতো হয়ে উঠি। আমাদের কাছে তাঁর এই প্রত্যাশা এতই তীব্র ও প্রবল যে নানাভাবে তিনি আমাদের ভিতরে ঠাকুরত্ব জাগানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। ঠাকুর হয়ে ওঠা যদি আমাদের না হয় তা হলেও ওই চেষ্টার ফলে আমরা অনেক দূর এগোতে পারব, ক্ষুদ্র মনুষ্য কায়ায় পড়বে তাঁর ছায়া।

আচার চর্যায় (১ম খণ্ড ২৮ নং) ঠাকুর বলেছেন, 'রান্না যেমন নুন-ঝালের উপযুক্ত সংমিশ্রণ ছাড়া স্বাদে ভালো হয় না তেমনি শুধুমাত্র অসাড় ভালোমানুষ হলেই চলেবে না কিন্তু; চতুর হওয়া চাই, তীক্ষ্ণ হওয়া চাই, দক্ষ কর্মকুশল হওয়া চাই, তবেই তো কৃতী হতে পারবে—অন্তরায় অতিক্রম করে সম্বর্ধনার দিকে।' আবার একই গ্রন্থে ২১ নম্বর বাণীতে ঠাকুরের শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছে, 'বোধের আবাস শ্রদ্ধায়, সৌন্দর্য রয় ভাবে, কৃতিত্ব রয় কর্মে প্রাজ্ঞতা রয় ইষ্টনিষ্ঠায়, মহত্ব থাকে ব্যবহারে, সেবায়, আর এই পঞ্চ সম্মেলনেই দেবত্বের উদ্ভব।'

এ থেকেই বোঝা যায় ঠাকুর আমাদের কীরকম দেখতে চান। আমরা কীরকম হলে অনেকটা তাঁর মনের মতো হব।

ঠাকুর ভালোমানুষ পছন্দ করতেন বটে, কিন্তু নিছক ভালোমানুষ হলে তার দুনিয়ায় রাখালগিরি করা যায় না। তাই তিনি পছন্দ করতেন ডাঁটো শক্তপক্ত মানুষ, যার চরিত্রের জোর আছে, সাহস আছে। যে বেপরোয়া হয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং কিছুতেই দমিত হয় না। কিন্তু সাধারণ বাঙালির চরিত্রে এই ধাতই নেই এবং উদ্যম সাহস কর্মমুখরতায় বাঙালি বোধ হয় ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী। তবে এই বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠী যদি জাগ্রত হয়, কর্মমুখর হয়ে ওঠে তবে তার পক্ষে গোটা ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব। তাই ঠাকুর বলেন, বাঙালি জাগলে ভারত জাগবে, আর ভারত জাগলে জগৎ।

ঠাকুরের যে খুব অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন এ কথা তাঁর কাছের মানুষদের অজানা নেই। ঠাকুর বলেছেন, তাঁর ভালো থাকা না থাকা তাঁর আয়ু সবই নির্ভর করে তাঁকে আমরা কতটা ভালোবাসি তার ওপর। আমরা চাইলে তিনি সুস্থ থাকবেন, আমরা যতদিন চাইব ততদিন বেঁচে থাকবেন।

মনে আছে তাঁর দেহাবসানের বছরদুই আগে একবার আমি আর কল্যাণ দেওঘর গেছি। সকালবেলা পৌঁছে কোনওরকমে হাতমুখ ধুয়েই ছুটে গেছি ঠাকুর বাংলায়। গিয়ে তীব্র হতাশার সঙ্গে দেখলাম, পার্লার বন্ধ। ঠাকুরের শরীর ভালো নয় বলে দর্শন হবে না। সে-সময়ে উৎসব ছিল না, কাজেই ভিড়ও নেই। আমার কী মনে হল, পার্লারের সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে প্রণাম করতে করতে বললাম, তোমাকে যদি একটুও ভালোবেসে থাকি, আমার ভালোবাসার যদি সামান্যতম দামও থেকে থাকে, তবে যেন বিকেলে তোমাকে সুস্থ আর উৎফুল্ল দেখতে পাই।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ঠাকুরের রক্ষণাবেক্ষণ যাঁরা করেন তাঁদের মুখে শুনলাম, ঠাকুরের শরীর খুবই খারাপ। এমন দু-চারদিন আর দর্শনের আশা নেই।

মন খারাপ করে ফিরে গেলাম চৌধুরী ভিলায়। সারাদিন উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ নিয়ে কাটিয়ে বিকেলবেলা ফের ঠাকুর-বাংলায় গিয়ে হাজির হলাম। যা দেখলাম তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঠাকুরের পার্লারের সব দরজা জানালা খোলা, ভিতরে ঝলমল করছে আলো আর তার চেয়েও যেন অনেক বেশি ঝলমল করছেন ঠাকুর। ফুর্তিতে যেন ডগমগ। অসুস্থতার চিহ্নমাত্র তাঁর শরীরে বা মুখভাবে নেই।

স্তম্ভিত হয়ে ঠাকুরের সামনে গিয়ে প্রণাম করে বসলাম। ঠাকুর আমার দিকে বিশেষ নেত্রপাত করলেন না বটে, কিন্তু আমার মন নাচতে লাগল আনন্দে। একটি আন্তরিক প্রার্থনার এত দাম যে তিনি দেবেন তা তো জানা ছিল না। কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে এল।

ছয়

ঠাকুর যা বলেন তার সবই সত্য, সবই পরীক্ষিত। আমি নিজে বারবার তাঁকে পরীক্ষা করেছি, নানা ভাবে, নানা কৌশলে। কোনওবারই সেই পরীক্ষা বিফলে যায়নি। যখনই দেখা যাবে ঠাকুরকে স্মরণ মনন নামধ্যান ইত্যাদিতে কাজ হচ্ছে না তখনই বুঝতে হবে ইষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নীতে কোনওরকম ত্রুটি বা অনিয়ম থেকে যচ্ছে। অনিয়ম বা ত্রুটি হয়তো সামান্যই। কিন্তু ওটুকু মেরামত না করলে কাজ এগোতে চাইবে না।

কথাটা বলতে পারছি ভুক্তভোগী বলেই। ঠাকুরের নীতিবিধি ঠিকমতো প্রতিপালন না করলে অভিষ্ট যেমন সিদ্ধ হয় না, তেমনি অনর্থক উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। ঠাকুরকে আশ্রয় করলে সকলেরই কিছু না কিছু শুভ পরিবর্তন ঘটবেই। তবে কোথাও ফাঁক থাকলে এই পরিবর্তন তেমন বিশাল-বিস্তারী হতে পারে না, কোথায় যেন ঠেকে থাকে, আটকে যায়।

কিছুদিন আগে আমি আলোচনায় এক নিবন্ধে লিখেছিলাম যে, ইষ্টভৃতি পাঠানোর দিন যতক্ষণ তা পাঠানো না হচ্ছে ততক্ষণ জলগ্রহণ করতে নেই। কয়েকজন ইষ্টভ্রাতা এবং কর্মীদের মধ্যেও কেউ কেউ এ ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করেন। তাঁদের বক্তব্য, এমন কথা তাঁরা কোথাও পাননি। দেওঘরেও কয়েকজন এ ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চান, এ কথা কোথায় আছে। বনগাঁ থেকে একটি ছেলে একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির, সেখানকার এক ইষ্টভ্রাতা নাকি বলেছেন, এরকম কথা ঠাকুর কোথাও বলেননি।

একটু চিন্তা করে বুঝলাম, অনেকেই যে কথাটা জানে না তার কারণ ঋত্বিক- বইখানা আমরা আদ্যোপান্ত পড়ি না। আমি নিজেও এই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু এক সময়ে বিপন্ন হয়ে আঁতিপাঁতি করে ঋত্বিক-বইখানা পড়তে হয়েছিল। ওটুকু গ্রন্থের মধ্যে কত কী রয়েছে।

ঋত্বিক-বই অন্য কাউকে দেখানো নিষেধ। তবু বনগাঁর গুরু ভাইটির প্রতীতি জন্মানোর জন্য আমি প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠাটি খুলে তাঁকে নির্দেশটি দেখাই এবং বলি, তোমরা সবাই নির্দেশ মেনেই চলবে।

ঠাকুর সম্পর্কে অনেকে জেনেও অনেক সময়ে দেখা যায় আমাদের অনেক রকম ভুলভ্রান্তি হয়। এটার কারণ বোধ হয় ঠাকুরের দেওয়া আবশ্যিক নীতিবিধিগুলির প্রতি ইদানীং মনোযোগী হয়েছি। এই নীতিবিধিগুলি জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সহজভাবে অঙ্গীভূত করে না নিলে অসুবিধে হতেই পারে। ঠাকুর এমন একজন মহাপুরুষ, যাঁর মুখনিঃসৃত কোনও বাণীই বিফল হওয়ার নয়। তাই অন্তত নিত্য পালনীয় কর্তব্যগুলির ক্রুটি রাখতে নেই।

মাসে একটি দিন—অর্থাৎ ইষ্টভৃতি পাঠনোর আগে পর্যন্ত জলগ্রহণ না করলে কোনও কষ্ট হয় না। আর যদি বা হয় তবে সেই কষ্টটাই তো ঠাকুর। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ঠাকুরকেই তো মনে পড়বে। তাঁর দয়াল মুখখানা, তাঁর মিষ্টি হাসিটি এ সবই ভুলিয়ে দেবে কষ্টকে। কষ্টের বিনিময়ে লাভ হবে তাঁর স্মরণ মনন। নিষ্ঠাবানরাই ঠাকুরকে আমান উপলব্ধি করতে পারে। নিষ্ঠার পথেই আসে ভক্তি, আনন্দ, সাফল্য। ঠাকুর মানুষ চাইতেন। মানুষই তাঁর সম্পদ। মানুষ সম্পর্কে তাঁর কোনও ক্লান্তি ছিল না। আমরাই বা তাঁর কাজে কেন নিষ্ঠাবান হব না? তাঁকে আমাদের এটুকু ছাড়া আর কী দিতে পারি?

দেখবেন ইসকন, আনন্দমার্গ ইত্যাদি ধর্মীয় সংস্থা তাঁদের সংগঠন বা মন্দির-আশ্রম দেখানোর জন্য সর্বদা উন্মুখ। কলকাতা থেকে আগ্রহী মানুষকে আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইসকনের নিজস্ব বাস রোজ মায়াপুর যায়। এ বাবদ প্রচুর অর্থব্যয় করে তাঁরা গড়িয়াহাটের মোড়ে চলমান বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। মায়াপুরেরও চমৎকার প্রশস্ত গেস্টহাউস ইত্যাদি আছে। আছে খাওয়াদাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা। আনন্দমার্গও অতি যত্নে মানুষকে

আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় এবং সেবার ব্যবস্থা করে। ভারত সেবাশ্রম সংঘ তো এ ব্যাপারে বহুকাল ধরেই খ্যাতির শীর্ষে আছে। রামকৃষ্ণ মিশনও তাই।

আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, সৎসঙ্গও যদি ওরকম করতে পারত! অনেকে বলেন, আপনাদের আশ্রমে গিয়ে থাকার জায়গা পাওয়া কঠিন। কথাটা মিথ্যেও নয়। দেওঘর ঠাকুরবাড়ি সারা বছরই মানুষের আগমনে এত মুখর যে, সেখানে স্থানাভাব হওয়া স্বাভাবিক। এত মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার মতো জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে?

উৎসবের সময় দেখা যায়, কোটিপতি লক্ষপতি যেমন, তেমনি গরিবগুর্বো সাধারণ মানুষও পড়ে আছে গাছতলায়, খোলা মাঠে, প্যান্ডেলে বারান্দায়। শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টি কিছুরই পরোয়া নেই। শৌচালয়ের অভাব বা জলকষ্ট তারা গ্রাহ্যও করে না। ঠাকুরবাড়ির আকর্ষণ, আশ্রমের এক মায়াবী বাতাবরণ আর মানুষের আনন্দমেলা তাঁদের দেহকষ্ট ভুলিয়ে দেয়। মানুষ তাঁর কাছে এমন কিছু পায়, এমন মহার্ঘ কিছু যার কাছে সব কিছুই তুচ্ছ।

দেওঘরের সৎসঙ্গনগর যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন এটি একটি ছোটখাটো শহর। অনেকটা জায়গা জুড়ে এর বিস্তার। তবু স্থানাভাব থেকেই যায়। কারণ প্রাণের টানে আসা মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, যত দ্রুত বেড়ে ওঠা সম্ভব নয় বাড়ি-ঘর কিংবা অতিথিশালা। যাঁরা ঠাকুরের আস্বাদ পেয়েছেন তাঁদের কাছে আশ্রয় বলতে কিছু প্রয়োজন নেই। গাছতলাও লাগে না তাঁদের। তবে ভ্রমণকারীদের কিছু অসুবিধা মেনে নিতেই হয়। প্রথম দিকে আমরাও খড়ের বিছানায় শুয়েছি। শতরঞ্চির বেশি কিছুই হয়তো জোটেনি, তবু কী যে আনন্দ।

ঠাকুরের শতবার্ষিকীর সময় যে লোক সমাগম হয়েছিল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হওয়া শক্ত। আনন্দবাজারের অত বিশাল বন্দোবস্ত সত্বে অনেকে সেখানে ঢুকতেই পারেননি ভিড়ের চোটে। স্থানাভাবে জনতা ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত শহরে। তবু কী অদম্য আকর্ষণ। কী বিপুল আনন্দের হাট বসে গিয়েছিল।

সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ ঠাকুরের যে পন্থা তাতে মনে হয় বহিরাগতদের আশ্রমিকরা নিজেদের গৃহে স্থান দিলে এবং সেবা-যত্ন-যাজন করলে কাজ অনেক বেশি হয়। কিন্তু সেটা ইদানীং বেশ অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উৎসবের সময় এমনিতেই দরিদ্র আশ্রমিকদের বাড়িতে তাঁদের যজমান বা পরিচিত সৎসঙ্গীদের প্রবল ভিড় হয়। এটাকে আত্মীয় সম্মিলন বললে ভুল হয় না, সৎসঙ্গীরা পরস্পরের আত্মীয় ছাড়া আর কী? সৎসঙ্গী বলে অসুবিধে হলেও মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু বাইরের লোক হলে মানিয়ে নেওয়া কষ্টকর। বিশেষ করে উৎসবাদির সময়।

এ সমস্যার সমাধান বড় সহজ নয়। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই রব ওঠে বটে, ঠাঁই আবার হয়েও কি যায় না? অসুবিধে হবে মনে করেই যদি কেউ আসেন তবে সব কিছুর মধ্যেই

তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতেও পারেন, শুধু মনোভাবটা যদি উন্মুখ, আগ্রহী হয়।

মূল সৎসঙ্গ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি সৎসঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন মেদিনীপুরের গিধনীতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ সেই ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন কতিপয় ঋত্বিক। ঠাকুরের জন্মস্থান হিমায়েতপুরেও রয়েছে তাঁর নামাঙ্কিত সৎসঙ্গ। এগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বলে আমার মনে হয় না। বরং ঠাকুরের নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন যদি সহযোগী হয়ে ওঠে তাহলে তাতে সমাজের মঙ্গলই হবে।

উৎসব বা মন্দির নির্মাণ করা এবং দীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যেমন, তেমনি আবার মানুষকে দক্ষ, যোগ্য, তৎপর করে তোলার চেষ্টাও অব্যাহত রাখা দরকার।

ঠাকুরের মতো মহান মানুষের প্রচার ও প্রসার ক্রমশ ব্যাপ্ত ও বিশাল হয়ে দাঁড়াবেই। পথ খুঁজতে, উদ্ধার পেতে, অনুসন্ধান ও প্রশ্ন করতে একদিন লাখো মানুষ আসবেই তাঁর দরবারে। সেই বিশাল জনস্রোতকে সামাল দেওয়ার মতো উপকরণ আহরণ বা ব্যবস্থা করে ওঠা সময়সাপেক্ষ। ঠাকুরের আকর্ষণে মানুষ আসছে লাখো লাখো, দিন দিন তা গণনা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আশ্রমও বেড়ে চলেছে বটে, কিন্তু অনুপাতের হাত তো সেরকম হয় না।

ঠাকুরের মূল নেশাই হল মানুষ এবং জীবজগৎ। এই মহাপ্রেমীর পথে এক পা-ও আমরা অগ্রসর হতে পারব না। যদি মানুষ সম্পর্কে আমাদের অস্তিবাচক ও দরদি মনোভাব গড়ে না ওঠে। মনে রাখতে হবে ঠাকুরের আশ্রম মানুষের জন্য।

মনে রাখতে হবে ঠাকুরই এ যুগের মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। মানুষ, দুনিয়ার মানুষ তাঁকে খুঁজে বের করবেই। ঠাকুরও সারাজীবন মানুষই খুঁজেছেন। মানুষের জন্য তাঁর যা কিছু। সুতরাং সৎসঙ্গকে সর্বদাই বহির্জগতের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হচ্ছে। মানুষের ওপর বিরক্ত হলে চলে না। তাকে অনাদর করলে চলে না।

'তোমার গৃহস্থীতে বুভুক্ষু বা অতিথির শুভাগমন যদি হয়—নিজেকে কৃতার্থ মনে করো, সাধ্যমতন সেবাযত্নে তাঁর ক্লান্তি অপনোদন করো—সাবধানী অনুসন্ধিৎসায়, সজাগ থেকে তৃপ্তি ও তুষ্টির সেবা সন্দীপনায় অভিনন্দিত করে তুলো তাঁকে, এমনকীপ্রয়োজনমতো নিজেকে ক্ষুধার অন্ন দিয়েও তাঁকে তৃপ্ত করো—পরিবার তোমার দুর্লভ আশীর্বাদের অধিকারী হবে।' আর্যপ্রাতিমোক্ষ (৪র্থ) ২১০৭। দয়াল ঠাকুর আমাদের কাছে এরকমই চাইতেন।

ঠাকুরের জীবনদর্শনের মূল ধারাটিকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে মানুষ সম্পর্কে আমাদের বিরক্তি বা উদাসীনতা কিছুতেই প্রশ্রয়যোগ্য নয়।

সৎসঙ্গের উৎসব এখনও, আজও অনেক সংস্থা বা সংগঠনের কাছে এক বিস্ময়। হাজার হাজার মানুষের সমাগম সত্বেও যে শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়

তা দৃষ্টান্তস্বরূপ। এত মানুষ একসঙ্গে বসে খায়, থাকে, কিন্তু কোথাও কোনও বড় রকমের অব্যবস্থা দেখা যায় না। কিন্ত মনে রাখতে হবে এই শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা ঠাকুর নিজেই করেছেন বলে তার ট্র্যাডিশন চলে আসছে। ঠাকুরের শতবর্ষের ওই বিপুলজন সমাগমে যখন দেওঘর শহরেরই সমস্ত ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ল এবং দেখা দিল অতিসংখ্যক মানুষের ভিড়ে দুর্ঘটনা বা মহামারির আশঙ্কা তখনও সুভদ্র সৎসঙ্গীদের ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাবোধ ও নম্রতা কিছুই ঘটতে দেয়নি। মহামারি অবশ্য সৎসঙ্গের ইতিহাসেই কখনও ঘটেনি। সেই ভয় আমার ছিল না, কিন্তু জনতার চাপে দুর্ঘটনার ভয় ছিল। ঠাকুরের এই ভক্তবৃন্দ তা ঘটতে দেননি। এই সমবেত মানুষের মধ্যে যেন ঠাকুরকেই দেখতে পেয়ে সেদিন শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল। ভাবলুম এই সব ভক্তের পদরেণু মাথায় নিলেও আমার পুণ্য হবে।

ঠাকুরকে যেযার নিজের মতো করেই পায়। যার যেমন কর্ম নামধ্যান-যজন-যাজন এবং যেমন তার বৈশিষ্ট্য। ঠাকুর তো বৈশিষ্ট্যকে পালন ও পূরণ করেন। তাই এক-একজনের কাছে তিনি এক-এক রকম হয়ে ধরা দেন। কিন্তু এটা অতি নিশ্চিত যে, যে তাঁকে অবলম্বন করে, ভালোবাসে, নামধ্যান সদাচার-সুকর্মপরায়ণ থাকে তার কাছে তিনি নিজেকে উন্মোচন করেনই। এর কোনও ব্যাত্যয় নেই। তাই নিত্য পালনীয় কাজগুলোতে ফাঁক রাখতে নেই। ইষ্টভৃতি করা এবং ঠিকমতো পাঠানো, স্বস্ত্যয়নী রক্ষা করে চলা, সদাচার পালন করা ইত্যাদি যান্ত্রিকভাবে হলেও কাঁটায় কাঁটায় পাওয়া যাবেই। যান্ত্রিকতা থাকলেও নিয়মমতো করতে করতে একসময়ে ভক্তিভাব এসে পড়েই, বিশেষ করে নামধ্যানের ক্ষেত্রে এটি আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।

ঠাকুর একবার বলেছিলেন, খুব নামধ্যান করলে আর কিছু হোক বা না হোক শরীরটা ভালো হয়ে পড়ে। এটা যে কত বড় সত্য কথা তা আমার জীবনে আমি বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছি। আরও কথা হল, নামধ্যান করলে ব্যক্তিত্বের আকর্ষণশক্তি বাড়ে। মানুষ চৌম্বক আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। যতবার নামধ্যান-পরায়ণ থেকে কোনও ব্রত প্রায়শ্চিত্ত করেছি ততবারই দেখেছি শরীরের উজ্জ্বলতা বেড়েছে, মানুষকে আকর্ষণ করার শক্তি বেড়েছে। ঠাকুরকে নিয়ে আমি নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। তার কারণ, দীক্ষাগ্রহণের সময়েও আমি ছিলাম ঘোর নাস্তিক। যাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করেছি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বা আসক্তি ছিল না। ফলে পরীক্ষা করতে তাঁকে ছাড়িনি। কিন্তু বারবার আমার সন্দেহের নিরসন তিনি অবলীলায় করেছেন। নামধ্যান করলে যে কান্তি, উজ্জ্বলতা ও আকর্ষণশক্তি বাড়ে এটা যে কেউ পরীক্ষা করতে দেখতে পারেন। নামধ্যান করলে আরও কত কী হয়। নামধ্যান-পরায়ণরা যদি কোনও অকাজ বা কুকর্ম কতে উদ্যাত হন তাহলে ঠিক তাতে বাধা পড়ে যায়। নামে বুঁদ থাকলে বিপদ-আপদ যে কী অলৌকিক ভাবে কাটে

তা শিহরিত বিস্ময়ে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। আর এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই ঠাকুরকে ঠাকুরের আসনে বসাতে দ্বিধা থাকেনি।

একটা সময় এল যখন ইষ্টপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ ভালোই লেগে উঠত। তখন আমাদের যৌবনের উন্মেষকাল, যে সময়ে কত দিকে মানুষের কত আকর্ষণ জন্মায়। কিন্তু আমার সব আকর্ষণ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হল, ঠাকুর। আজও এই রহস্যময় আকর্ষণের যুক্তিসিদ্ধ কারণ খুঁজে পাই না। ঠাকুরের সঙ্গে আমার বয়সের তফাত, আত্মীয়তা নেই, তেমন করে বাক্য বিনিময়ও হয়নি, তাঁকে কখনও স্পর্শ করিনি, সর্বদাই তাঁকে দেখেছি অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে। তবে আকর্ষণটা এল কোথা থেকে? কেন মনে হতে লাগল যে, ইনি পৃথিবীতে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন! এর চেয়ে বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমার কেউ নেই!

ঠাকুর এক আশ্চর্য আবির্ভাব। কীভাবে তিনি মানুষকে টানেন, কীভাবে তিনি লক্ষ মানুষকে পূরণ করেন তা কিছুতেই সহজবোধ্য নয়। অলৌকিক ঘটনা? সেটা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু মিরাকলের চেয়েও অনেক বেশি প্রভাবিত করেছিল আমাকে ঠাকুরের ওই সর্বব্যাপী আগ্রাসী ভালোবাসা। লক্ষ মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছি, তারই মধ্যে হঠাৎ হয়তো এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য তাঁর চোখ আমার দিকে পড়ল, তাতেই আপাদমস্তক যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে যেত। মনে হত, আমার সব পাপ-তাপ জ্বালা-যন্ত্রণা মুছে নিয়ে গেলেন।

অনেকেই এসে আমার কাছে দুঃখ করে বলেন, ঠাকুরের কাজ কিছুই তো করতে পারছি না, কিছুই হচ্ছে না ইত্যাদি। কথাটা মিথ্যেও নয়, ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা প্রায় একতরফা প্রাপ্তির, আমাদের অনন্ত চাহিদা তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করছি আমরা রোজ। বিনিময়ে তাঁকে সিকি আধুলি বা টাকা ইষ্টভৃতি হিসেবে দিচ্ছি। মানুষের জন্য ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের যা করা উচিত সে কাজে আমরা অগ্রসর হই কমই। আমি নিজেও এবাবদে পয়লা নম্বরে অপদার্থ। এক প্রবীণ গুরুভাইয়ের কাছে এবাবদে কিছু দুঃখ করছিলুম একদিন, তিনি আমাকে সস্নেহে বললেন, দাদা, আর কিছু না পারেন চেপে নামধ্যানটা করুন, নামধ্যান যদি দৃঢ়তার সঙ্গে করতে পারেন তবে ঠাকুরই আপনার করার পথ খুলে দেবেন।

ঠাকুরের জন্য কাজ করার ইচ্ছে এবং আগ্রহ থাকলে তার পথও খুলে যায়। কারণ ঠাকুরের কাজ বলতে যে-কোনও ইষ্টমুখী যাজনসমৃদ্ধ কাজকর্মকেই বোঝায়, যা কোনও না কোনও ভাবে ঠাকুরকে পূরণ করে। তবে ঠাকুরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলতে আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝেছি মানুষকে মেরামত করা, তাকে ধর্মদান করা, তাকে ইষ্টপথ দেখিয়ে দেওয়া এবং সেই পথে চালানো।

কিন্তু এ কাজ করতে হলে নিজেকেও মেরামত করে নিতে হয় এবং ঠাকুরের দর্শন সম্পর্কে বুঝসমঝ পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। নইলে ভালো করতে গিয়ে মন্দ করে ফেলা বিচিত্র নয়। ঠাকুরের পথে চলা মানেই সদাসতর্ক হয়ে চলা। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা, খামতিগুলির প্রতি নজর রেখে ধীরে ধীরে সংশোধিত হওয়া। যার সংশোধিত হওয়ার ইচ্ছে থাকে ঠাকুর তাকে সাহায্য করেনই। যে ভালো হতে চায় এবং ভালো করতে চায় দয়াল ঠাকুরের দয়া তার ওপর অজচ্ছল বর্ষিত হয়, এ আমি নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছি। ঠিক ঠিকমতো নামধ্যান করলে অনুভূতির প্রখরতা বাড়ে, দেখার চোখ তীক্ষ্ণ হয়, বিচারবোধ জেগে ওঠে, আলস্য দূরীভূত হয়, কাজে কর্মে ভুলত্রুটি কমে যেতে থাকে। এটা শুধু কথার কথা তো নয়। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অনেক এরকম পাওয়া যাবে, যারা হতাশা ও ব্যর্থতার গভীর গহ্বরে তলিয়ে যেতে যেতে শুধুমাত্র ঠাকুরকে অবলম্বন করে ফের উঠে এসেছেন সাফল্য ও প্রত্যাশার উজ্জ্বল আলোয়। আমার নিজের জীবনে যেমন এর প্রজ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আছে, তেমনিও আরও অনেকেরই আছে। একটু নিষ্ঠা, একটু আকুলতা থাকলেই হয়।

ঠাকুরকে যাঁরা প্রত্যেক্ষ করেছেন, তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁদের ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবেই রক্ষা করতেন। তিনি অপ্রকট হওয়ার পর যে সুযোগ নেই বটে, কিন্তু ঠিক একইভাবে ঠাকুর আজ হুঁশিয়ারি দেন। খারাপ কিছু ঘটবার আগে তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আর ঠাকুরের ওপর পরম নির্ভরতায় নিজের ভালোমন্দ ছেড়ে দিলে তিনি বিপদ-আপদকে মশা মাছির মতো তাড়িয়ে দেন। এসব কথার কথা হয়ে থাকলে চলবে না। প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই ঠাকুরের সত্যস্বরূপকে জানতে হবে। তাঁর স্বাদ, তাঁর সঙ্গ আমাদের পেতেই হবে। নইলে ঠাকুরকে নিয়ে চলব কী করে?

এই ভীষণ জটিল মানসিকতার যুগে ঠাকুরকে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক সবচেয়ে বেশি লজিক্যাল বলে সকলেই মনে হবে। আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে। ঠাকুরের সমসাময়িক অন্যান্য ধর্ম গুরুদেরও অনেকে ঠাকুরকে দর্শন করে গেছেন এবং তাঁর জীবনদর্শনের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নকশালপন্থীদের অনেকেই পুলিশের তাড়ায় আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক কট্টর নাস্তিক ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে দীক্ষা নেন এবং ভক্ত হয়ে পড়েন। একজন প্রাক্তন নকশাল নেতা এখন মস্ত বড় ঠিকাদার। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা তাঁর। তিনি আমাকে বলেছিলেন ঠাকুর! ঠাকুরের কোনও বিকল্পই নেই। অসাধারণ!

ঠাকুর সম্পর্কে এরকম একটা শ্রদ্ধার বোধ বহু মানুষের আছে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে সামান্য সময়ের জন্যও এসেছেন। এঁরা হয়তো নাস্তিক, হয়তো অবিশ্বাসী, গুরুবাদ-বিরোধী, তবু ঠাকুরের অসাধারণত্ব নিয়ে তাঁদের কোনও সন্দেহ নেই। এই বোধ ও মনোভাব আরও বৃদ্ধি পাবে যখন ঠাকুরের গ্রন্থরাজির প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকবে।

যে মেলাঙ্কলিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আমি ঠাকুরের কাছে প্রথম যাই সেটা হয়তো আমার একারই বিশেষ অসুখ। ঠিক ওরকম হয়তো অন্য কারও হয় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যুগটাই মনোরোগের যুগ। বিষাদরোগ এ যুগেরই ধর্ম। মানুষ বাইরে নানা উলটোপালটা ঘাত-প্রতিঘাতে, সম্পর্কের জটিলতায়, এবং ভালোবাসাহীনতায় নিজের মনের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজবে এবং ক্রমশ হতাশার গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া তার সাধ্যতীত। কেবল মনের কোণে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করলেও তার সংকীর্ণ মন তাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা ধরে না। ফলে সে নানাবিধ উপায়ে আশ্রয় খুঁজবে। কখনও মদ খাবে, অতিরিক্ত ফুর্তিতে জড়িয়ে পড়তে চাইবে, মঠ-মন্দিরে ছোটাছুটি করবে, জ্যোতিষীর কাছে যাবে, রাজনীতি করবে বা যাবে ডাক্তারের কাছে। তাতে সমাধান হবে না, আরোগ্য ঘটবে না, সাময়িক ধামাচাপা দেওয়া যাবে। মঠ-মন্দির, গুরুদেবদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। তবে আচরণবিধি না মানলে, সক্রিয়ভাবে নিজের ও পরিবেশের শুদ্ধিকরণের দিকে না এগোলে এবং চরিত্র সংগঠিত না হলে কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়। মঠ-মন্দির মানুষের চরিত্র গঠনে, তাকে শ্রমশীল কর্মমুখর দক্ষ করে তোলার ব্যাপারে, খুব একটা কিছু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয় না। আর গুরুরা শিষ্যদের ওপর এমন অনুশাসন চাপাতে চান না, যাতে তাদের কষ্ট হয় বা তারা ভয় পেয়ে যায়। ফলে মঠ-মন্দির, গুরুদেবের কাছে যাঁরা আশ্রয় নেন তাঁরা শুদ্ধ মুক্ত কর্মপরায়ণ হন কমই। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য হল যা ভালো ও মঙ্গলপ্রদ তা তিনি জোরের সঙ্গেই চাপান। তিনি জানেন, এ যুগে মানুষের ব্যামো যেমন শক্ত, তার দাওয়াইও তেমনই কড়া হওয়া প্রয়োজন। শিষ্য ভেগে পড়বে বা অসন্তুষ্ট হবে ভেবে তিনি কখনও হাত গুটিয়ে নেন না। তার আরোগ্য, তার আয়ু, তার নিরাপত্তার দায়িত্ব ঠাকুর নিজের কাঁধে যেমন নেন, তেমনি তাকে যোগ্য দক্ষ করে তুলবার জন্য তাকে অনুশাসনও মানতে বাধ্য করেন।

তা হলে কি জবরদস্তি? না, তাও নয়। মানুষ যখন অস্তিত্বের সংকটে তাঁর কাছে এসে আশ্রয় নেয় তখন সে বাঁচবার জন্য, রক্ষা পাওয়ার জন্য আকুলভাবেই করে। চিকিৎসকের নির্দেশ না মানলে যে রোগ সারে না এ কথা তো সবাই জানেন। ঠাকুর তেমন চিকিৎসক নন, যিনি নিদান দিয়েই খালাস। তিনি তার অনুশাসনবাদের ভিতর দিয়ে সেই নিদান কার্যকর করে তোলেন। আর তাই তাঁর আশ্রয়ে মানুষের আরোগ্য অমোঘ হয়ে ওঠে।

সাত

কাছের ঠাকুরের কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে এই গ্রন্থে আমি নিজের কথা একটু বেশিই লিখে ফেলেছি। যা ঘটেছে তা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই ছিল নিশ্চিত। আমাদের জীবনে

ঠাকুরের যে ভূমিকা তা ছাড়া আমার সম্বলই বা কী? আমার দুর্বলতা, ব্যর্থতা, দ্বিধা সংকোচ, লজ্জা, ভয় সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়েই আমি তাঁকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি বলে এক অসহায় মানুষের আত্মকথা প্রগলভতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। ভয় হয় নিজের মাপকাঠিতে মাপতে গিয়ে তাঁকে ছোট করে ফেললাম নাকি?

আগে ভাবতাম 'আমার ঠাকুর'। ভাবতে এক ধরনের স্বার্থপর আনন্দ হত। একদিন ঠাকুরের এক গ্রন্থে পড়লাম, ওরকম ভাবতে ঠাকুর নিষেধ করেছেন। 'ঠাকুরের আমি' এই বোধটাই ঠাকুর পছন্দ করতেন। 'আমার ঠাকুর' বললে ঠাকুরকে অন্য সকলের কাছ থেকে যেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বলে মনে হয়। যেন ঠাকুর শুধু আমার, আর কারও নয়। তাতে ঠাকুরকে নিজের স্বার্থের মাপে ছোট করে ফেলা হয়। তাতে নিজেও মাহাত্ম্য বাড়ে না। 'ঠাকুরের আমি' বোধ প্রবল হলে আর তাতে স্বার্থসিদ্ধির ধান্দা থাকে না। তখন ঠাকুর শুধু আমার হন না, আমিই ঠাকুরময় হয়ে যাই। ক্ষুদ্র আমি হয়ে ওঠে বৃহৎ আমি, স্বার্থশূন্য আমি মহান আমি।

ঠাকুর যে বলেছেন 'তোমার ভেতর ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়' এর মতো সত্য আর হয় না, তবে ঠাকুরত্ব জাগানো বড় সহজ কাজও তো নয়। অনেকে দেশের কাজ করেন, অনেকে পরোপকার করেন, অনেকে রাজনীতিতে আত্মোৎসর্গ করেন, অনেকে সৎপথে চলার চেষ্টা করেন তবু সব করেও অনেক ফাঁক থেকে যায়। তার কারণটি অবশ্য সবসময়ে বোঝা যায় না। সারা জীবন ভালো করবার চেষ্টা নানা বিচ্ছিন্নতায় বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অনেক সময়ে ভালোর বকলমে মন্দই হয়ে পড়ে। সুতরাং যাঁরা ভালোই করতে চান, ভালোই হতে চান তাঁদের জীবনের কেন্দ্রে একজন ভালোবাসার মানুষকে দরকার। যদি তাঁরা তেমন কাউকে পান তবে তাঁদের সব ভালো সগর্জনে সাফল্য নিয়ে ঝেঁপে খরস্রোতে দেশ ভাসিয়ে দেবে।

আমি তো জানি, স্বার্থ দিয়েই বাঁধতে চেয়েছি ঠাকুরকে। সামান্য ইষ্টভৃতি দিয়ে চাঁদা দিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে তাঁকে কিনে নিতে চেষ্টা করেছি। তাই সম্পূর্ণ হয়ে উঠল না আমার অন্তঃপুরে তাঁর ছবি। মাঝে মাঝে তাই বড্ড গভীর গ্লানিতে ছেয়ে যায় মন। ভাবি পৃথিবীর ভালো মানুষ যাঁরা, তাঁরা কবে আসবেন ঠাকুরের কাছে? তাঁদের পেলে ঠাকুর কী সাংঘাতিক কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবেন!

অবশ্য একথাও ঠিক, কে ভালো কে মন্দ এ বিচার করার আমি কে? ভালোকে ভালো, মন্দকে মন্দ বলে চেনবার শক্তিই বা আমাদের কতটুকু?

ঠাকুরের কাছে ভালো আর মন্দ বলে তো কিছু ছিল না। তিনি আমাদের মতো বিচার তো কখনও করতেন না। মন্দই হয় তো তাঁর কাছে বেশি এসেছে। কারণ মন্দরাই তো বাঁচবার জন্য তাঁর পায়ে এসে পড়েছে বেশি। তিনি তাদের বুকে তুলে নিয়েছেন, কাজে নামিয়েছেন, শুধরেও গেছে তারা। মূল্যহীনেরে সোনা করিবার পরশপাথর হাতে আছে

বলেই তিনি কখনও কোনও অকিঞ্চন বা সামান্যকে অবহেলা করেননি, উপেক্ষা করেননি পাগল বা বিকারগ্রস্তকেও। তাঁর কাছে সকলেরই অমলিন আশ্রয়। আর সেটাই আজ অকিঞ্চন, দুঃখী, অবসাদ আর হতাশায় ভারাক্রান্ত মানুষের কাছে পরম ভরসার কথা, পরম আশার কথা। ঠাকুর বারংবার বলতেন, অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়ষ্যামি মা শুচঃ।

অনেকেই আমাদের প্রশ্ন করেছেন, দেখুন মশাই, দীক্ষা অনেকের কাছে নেয়। কিন্তু এই আপনারা, সৎসঙ্গীরা বড্ড বেশি ঠাকুর ঠাকুর করেন।

শুনে বিরক্ত হওয়ার বদলে খুশিই হয়েছি। ঠাকুর ঠাকুর করি নাকি? কই, টের পাই না তো! যদি করেই থাকি তবে সেটা তো মস্ত আনন্দের খবর!

সৎসঙ্গী ঠাকুর ঠাকুর করেন ঠিকই তবে তা এমনিতে তো নয়। কিছু পান ঠাকুরের কাছে তাঁরা, কিছু নেশা তাঁদের হয় নিশ্চয়ই।

ঠাকুরের সৎনাম নিলেই সব সমস্যার সমাধান আপনা থেকে অলৌকিক ভাবে ঘটে যাবে তা তো নয়। ঠাকুর নিত্য পালনীয় কৃত্যগুলিকে কাঁটায় কাঁটায় পালন করতে বলেছেন। এটাই হল ভিত। যজন যাজন ইষ্টভৃতিতে যদি খুঁত না থাকে, যদি ইষ্টভৃতি নিয়মিত ঠিকঠাক তিরিশ দিনে পাঠানো হয়, যদি সদাচার এবং সাত্বিক আহার গ্রহণ করা হয় তাহলে সেই ভিতের ওপর নিজের ব্যক্তিত্ব ও ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার পথ খুলে যেতে থাকে। মুলেই যদি গণ্ডগোল থাকে তাহলে শত ভক্তিও তেমন কার্যকর হবে না। আর সক্রিয় ভক্তি ছাড়া কিছু হয় না, ভাবাবেগের ভক্তির কোনও মূল্য নেই।

অনেক সময়ে আমাদের মনে হয়, ঠাকুরের জন্য অনেক কিছু করে ফেলেছি, অনেক ত্যাগ স্বীকার করলুম, ইত্যাদি। এই ধারণার মধ্যে ভ্রান্তি হল, ঠাকুরের জন্য করা মানেই হচ্ছে মানুষের জন্য পৃথিবীর জন্য করা। আর এই করার ভিতর দিয়ে আমরা গণ্ডিবদ্ধ জীবন ছাড়িয়ে বৃহৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হই। আর সেই সংযোগ ঘটে বলেই আমাদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবনও এক ধরনের মাহাত্ম্য লাভ করে। ঠাকুরের জন্য যদি কেউ কিছু সত্যিই করে তাতে তার নিজের লাভও ষোলো আনা। এই হিসেবটা মাথায় রাখতে নেই বটে, কিন্তু এটা যে ঘটে তা নিত্যই প্রত্যক্ষ করছি।

আবার অন্য দিকে দেখি, একসময়ে—যখন ঠাকুরের তেমন পরিচিতি ছিল না, তখন ঋত্বিকেরা কপর্দকহীন অবস্থায় দেশ-দেশান্তরে বেরিয়ে পড়তেন যাজনে। পথকষ্ট, বিপদ-আপদ, বিরোধিতা সব সহ্য করে কোন দূর-দূরান্তে ঠাকুরের সৎনাম প্রচার করেছেন তাঁরা। আর ওই কষ্ট, ওই পরিশ্রম তাঁদের সর্বক্ষণ টইটুম্বুর রেখেছে আনন্দে। ওই কষ্ট না থাকলে ওই আনন্দই বা পাওয়া যাবে কেমন করে?

একবার বয়োজ্যেষ্ঠ এক গুরুভাই যখন ঠাকুরের জন্য তাঁর ত্যাগ স্বীকারের কথা বলে বড়াই করছিলেন। তখন আমার মনে হল, ইনি মাত্র বি.এ পাস। সে আমলে ইনি বড়

জোর একটি কেরানিগিরি জোটাতে পারতেন। দীর্ঘদিন কলম পিষে সামান্য সঞ্চয় দিয়ে ইনি হয়তো একখানা বাড়ি করতেন কষ্টেসৃষ্টে। আর পাঁচটা সংসারের মতোই সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। আর এভাবেই জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আজ ঠাকুরের ঋত্বিক হিসেবে ইনি যেখানেই যান শত সহস্র মানুষ এঁকে প্রণাম করে, প্রণামি দেয়, এঁর যে-কোনও বিপদে-আপদে তাঁরা এসে বুক দিয়ে পড়ে এবং সৎসঙ্গী মহলের হাজার হাজার মানুষ এঁকে একডাকে চেনে। কেরানিগিরির চেয়ে ইনি তো বহুগুণ ভালো আছেন, অনেক সফল হয়েছেন, তবে এঁর দুঃখ কীসের? চাকরি করেই বা অন্যরা তাঁর চেয়ে কোন দিকে দিয়ে ভালো আছে?

নিয়তকর্মীরা স্বতঃস্বেচ্ছ অনুরাগের সঙ্গে এবং উদ্যম নিয়ে ইষ্টকাজে লাগলে তাঁদের যে কোনও অভাবই থাকে না এবং ঘরে যে লক্ষ্মী উপচে পড়েন তার ঢের দৃষ্টান্ত আছে। সাবধান থাকতে হয় একটা ব্যাপারে, গুরুর কাছ থেকে নিতে নেই। তাঁর কাছ থেকে নিলে মানুষ নিষ্প্রভ, হীনবল হয়ে পড়ে। পরোক্ষে তিনি অজস্র জোগান দেয়, প্রত্যক্ষভাবে নেওয়ার তাই প্রয়োজনও হয় না।

আমি নিজে নিয়তকর্মী নই। নিয়তকর্মীদের প্রাথমিক পর্যায়ে জীবন-সংগ্রাম করতে হয় তাও আমাকে করতে হয়নি। নিয়তকর্মীদের সবচেয়ে বড় বাধা আসে নিজস্ব পরিবার থেকেও। স্ত্রী পুত্র কন্যারা নিশ্চিত এই স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা পছন্দ করেন না। অন্যান্য দিক থেকেও নিয়তকর্মীর নানা চাপ আসতে থাকে। আশ্রমে আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় এক নিয়তকর্মী খুবই উচ্চশিক্ষিত। প্রথম শ্রেণির ইঞ্জিনিয়ার এই দাদাটি খুব ভালো চাকরি করতেন। সব ছেড়ে ঠাকুরের কাজে লাগেন। কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এক জায়গায় আমরা আড্ডা মারতুম। সেখানে এক রবিবারে পরেশদা (ভোরা)-কে নিয়ে গেছি। হঠাৎ এক ভদ্রলোক পরেশদা সৎসঙ্গী জেনে তেড়ে এল। তারপর সাংঘাতিক হম্বিতম্বি, আপনারা ঠক, আপনারা জোচ্চোর, আমার জামাইবাবুর সর্বনাশ করেছেন আপনারা, সংসারটা ভেসে গেছে...ইত্যাদি। জানা গেল, তিনি উক্ত নিয়তকর্মীর শ্যালক। পরেশদা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তিনি অবশ্য সে সব কথায় কর্ণপাতও করলেন না, নিজের উষ্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে গেলেন একতরফা। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে নেই ঠাকুরের নিয়তকর্মীদের কেমন সব বাধা টপকাতে হয়। টপকাতে যে সবাই পারেন এমন নয়। কিন্তু যারা শক্ত মনের মানুষ, যাঁরা আপসরফা করেন না, যাঁদের মধ্যে ঠাকুর সম্পর্কে কোনও দ্বিধা নেই, যাঁরা যে-কোনও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে অকুতোভয় তাঁরা কিন্তু রাজা। ঠাকুরের কাজ করতে করতেই ঐশ্বর্য সফলতা আনন্দ ঝেঁপে চলে আসে তাঁদের জীবনে।

ঠাকুরকে অনুধাবন করতে, তাঁকে বুঝে উঠতে আমাদের অনেক সময় লাগবে। তাও তিনি যদি দয়া করে বুঝিয়ে দেন তবেই। কিন্তু ঠাকুরের পন্থায় দাঁতে দাঁত চেপে লেগে

থাকতে পারলে বুঝ-সমঝের পথ খুলে যেতে থাকে।

এখানে সবিনয়ে এবং সন্তর্পণে একটা কথা বলে রাখি, ঠাকুরের নিয়তকর্মীদের অবস্থা আজ কিন্তু অনেক ভালো। এতই ভালো যে, সামান্য চাকুরিজীবির অর্জনের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। ঠাকুরের কাজ যে মানুষের জীবনের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধিরই সুতীব্র অনুপ্রেরণা এটা আজকের মানুষের বুঝতে ভুল হয় না। কাজেই ঠাকুরের মানুষকে তাঁরা হাসিমুখে সাগ্রহে ভরণপোষণ করে কৃতার্থ হন। এই বিংশ শতাব্দীতে স্বার্থপরতার বাতাবরণে এ জিনিস যখন চোখে দেখি তখন অবিশ্বাস্য ঠেকে। আনন্দে চোখ জল আসে। মানুষ যে শুধু ঋত্বিক বা যাজককেই দেয় তা তো নয়, ওই দেওয়া তার ঠাকুরকেই দেওয়া। আজ একজন ঋত্বিক শুধু ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চললেই দারিদ্র্য-অভাব-অনটন এক ঝটকায় কাটিয়ে উঠতে পারেন। তাঁর ঘরে লক্ষ্মী উপচে পড়বে।

মানুষের মধ্যে দয়াল ঠাকুর আছেন এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা যদি মানুষের প্রতি আমাদের আচার-আচরণ-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা বিপুল মানব সম্পদ আমাদের মুঠোয় পাব। মানুষ ছাড়া তো ঠাকুরের দর্শন এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড পণ্ড হবে। সুতরাং মানুষের প্রতি অবহেলা অবজ্ঞা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা ত্যাগ করা আরও প্রয়োজন।

অর্থ সংগ্রহ আমাদের করতেই হবে। ম্যান মানি মেটেরিয়াল ছাড়া ঠাকুরের বিশাল কর্মযজ্ঞের সম্পাদন সম্ভব নয়। কিন্তু ম্যান আগে তারপর মানি ও মেটেরিয়াল। মানুষকে মুখ্য করে নিলে আর দুটো আপনিই আসে। এখনকার দুঃখতাড়িত, মৃত্যু শাসিত, হতমান মানুষ তো তৃষিতের মতো একজন দরদির জন্যই অপেক্ষা করে। তার রোগে, ভোগে, শোকে, একাকিত্বে কোনও সঙ্গী নেই, মনের নিহিত গভীর দুঃখের কথা সে কাউকে বলতে পারে না, স্ত্রী পুত্র পরিবার থাকা সত্ত্বেও তার সত্তার সাথিরা কেউ নেই। এই চিত্র আজ ঘরে ঘরে। এই দুর্গত মানুষের কাছে ঋত্বিক বা যাজক আসেন যেন আলোকবর্তিকা হয়ে। দরদ, সহানুভূতি, জীবনীয় কথার সিঞ্চনে জীবন্মৃত মানুষ যেন ফের সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। ফিরে পায় বাঁচবার মামলোত। সে তখন দেওয়ার জন্য আকুল হয়। দিতে পেরে যেন ধন্য হয়। এ শুধু কল্পনাবিলাস নয়, এ ঘটনা কতবার ঘটতে দেখেছি।

ঠাকুর অনেক সময় অকিঞ্চনের কাছেও চাইতেন, আবার ধনীর দিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। তাঁর চাওয়া বা না চাওয়ার মধ্যে সবসময়েই থাকত গভীরতর তাৎপর্য। যার কিছু নেই তার কাছে ঠাকুর হয়তো অসম্ভব কিছু আব্দার করতেন। বিস্ময়ের কথা, সে ঠাকুরকে এনেও দিত তা। তাতে খানিকটা ছিল ঠাকুরের দয়া। আর খানিকটা ছিল তার পারঙ্গমতাকে উসকে দিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। ঠাকুরের চাওয়ার ভিতরেই থাকত তাঁর দেওয়াও। যে ঠাকুরকে দেয় তাকে ঠাকুর দশহাতে পূরণ করেন। আমরা যদি ওই পূরণ করাটুকু পারতাম তাহলে আমাদের চাওয়ার মুখ থাকত। তবু চাইতে হবেই। কিন্তু

তার আগে চাই দরদ, সহানুভূতি, ভালোবাসা, সঙ্গ-সাহচর্য ও সেবা। মানুষটাকে হাতে পেলে তার সর্বস্বই পাওয়া যায়। যাজন তো একেই বলে। শুধু দীক্ষা দেওয়ালেই যাজন শেষ হয়ে যায় না, দীক্ষার পরেও একজনকে নিয়মিত যাজনের মধ্যে রাখা ভালো। তাতে তার বিশ্বাসে পাকা হয়, আচার-আচরণে আসে নিয়মানুবর্তিতা, ভক্তি ভালোবাসাও জেগে উঠতে থাকে। যে যাজন করে তারও উপকারই হয়। নানা কথার ভিতর দিয়ে তার নিজেরও বোধদৃষ্টি খুলে যেতে থাকে, বাড়ে লোকচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, মশাই আপনি তো ঠাকুর সম্পর্কে খুব বড় বড় কথা বলেছেন, আপনি নিজে কি এসব করেন ঠিক মতো?

জবাবে আমাকে নতমস্তকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আলস্য গেঁতোমি এবং অন্যান্য ব্যাপারে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার ফলে যাকে ইষ্টকাজে বলে তা আমার দ্বারা বিশেষ হয়ে ওঠে না। নিজের সাফাই গাইবার মুখ আমার নেই। কিন্তু বঙ্কিমের সেই যে কথা আছে যে আমি অধম তাই বলিয়া তুমি উত্তম না হইবে কেন? এই সঙ্গে স্বীকার করে নিই, আমি হলাম ভাবের ঘুঘু। ঠাকুর বলেছেন তাঁর জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে না, অথচ খুব ভালোবাসি, এ কথাও যা, সোনার পিতলে ঘুঘুও তাই। বুঝতে পারি, আমার ভক্তি ভালোবাসা সেই সোনার পিতলে ঘুঘুই হয়ে আছে। কিন্তু যাদের মুখ চেয়ে পৃথিবীর শুভ বিনায়নের স্বপ্ন দেখাই তারা, আমার ওই সব অকিঞ্চন গুরুভাইরা, ঠাকুরের জন্য জান কবুল করে যে-কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমার মতো অপদার্থরা স্বপ্নই দেখে, কিছু করে উঠতে পারেন না। কিন্তু যারা ইষ্টকাজ করে তাদের শ্রীচরণ দর্শনেও আমার পূণ্য হয়, পাপ কাটে।

ঠাকুর ভক্তেরই ভগবান। অবিশ্বাসী অভক্তের নয়। আর সেই ভক্তিও হওয়া চাই সকর্মক, অর্থাৎ কর্মযুক্ত। ঠাকুর ভাবের ভক্তিতে আস্থা রাখতেন না। তার কারণ, ভাব নিয়ে মানুষ বেশি দূর এগোতে পারে না। তার চরিত্রের গায়েও হাত পড়ে না।

মানুষের ভিতরে অনন্ত ক্ষমতার আকর আছে। আছে সু এবং কু দুই-ই। ঠাকুর চান আমরা আমাদের এই সব সুপ্ত ক্ষমতা ও গুণাবলি বিকাশ ঘটাই। অহৈতুকি কৃপা নয়, নিজের যোগ্যতা, ক্ষমতা ও গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। আর এই সুপ্ত ক্ষমতা ও গুণাবলিকে জাগিয়ে তুলতেই ঠাকুরের এত চেষ্টা, এত প্রয়াস।

নামধ্যান যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, সদাচার, প্রায়শ্চিত্ত এসবগুলি নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। ঠাকুরের দেওয়া এই সব সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক, বাস্তব নিদান মানুষকে যে কী থেকে কী করে তুলতে পারে তার সম্যক ধারণাই আমাদের নেই। ধর্মের ব্যাপারটা ঠাকুরের কাছে কেবল আচার-অনুষ্ঠান তো ছিল না, ধর্ম একটি বাস্তব অস্তিবাচক জীবনধারা। জীবনের সব কিছুই ধর্মের আওতায় পড়ে। তার আহার নিদ্রা, মৈথুন, লোক-

ব্যবহার অর্থোপার্জন সর্বক্ষেত্রেই ধর্মের অনুশাসন মানলে তবেই মানুষ শুদ্ধবুদ্ধ যোগ্য হতে পারে। তারকেশ্বরের মাথায় জল ঢেলে এলাম, কালীঘাটে গিয়ে হত্যা দিলাম, তীর্থ পরিক্রমা করে এলাম, সাধুদর্শন করলাম আর তাতেই জীবনের কৃত কর্মফল কেটে গিয়ে পুণ্যবান হয়ে উঠলাম, ভাগবত বিধান অত সস্তা নয়। ধর্মকে অত কম মূল্যে ক্রয় করা যায় না। সারা দেশ জুড়ে ধর্মের নামে এসব ছেলেমানুষি আর উন্মাদনাই চলছে। তাই বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, লজিক্যাল মানুষেরা এই সব ধর্ম থেকে তফাতে থাকেন। এই সব যুক্তিহীন অধর্মাচারণই অনেক মানুষকে নাস্তিক করে তুলেছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা ধর্মগুরুরাও আজকাল শিষ্যের ওপর অনুশাসন চাপাতে দ্বিধা করেন। আমি অন্যান্য গুরুর কাছে দীক্ষিত বহু মানুষকে প্রশ্ন করে জেনেছি, তাঁদের খাদ্যখাদ্যের বিচার নেই, বর্ণাশ্রম মানার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই এমনকী জপধ্যানেরও সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। এ এক ভয়ঙ্কর ধর্মীয় অরাজকতা। এজিনিস চলতে থাকলে অচিরেই মানুষ ধর্মকর্মের অসারতা উপলব্ধি করে এপথ আর মাড়াতে চাইবে না। যে ধর্মাচরণ প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে মঙ্গল অধিষ্ঠিত করে না, যা মানুষের চারিত্রিক শুভ পরিবর্তন ঘটায় না, যা মানুষকে যোগ্য ও দক্ষ করে তোলে না, সেই ধর্ম মৃত্যুর পর যতই স্বর্গের বা মুক্তির প্রলোভন দেখাক না কেন, বুঝতে হবে তার মধ্যে বিশাল শূন্যগর্ভ ফাঁকিবাজি আছে।

এই সব ছদ্ম ধর্ম বা ভুয়া ধর্মের হাত থেকে ঠাকুর আমাদের রক্ষা করেছেন। ধর্মাচরণকে এনেছেন মানুষের দৈনন্দিন আচরণ বিধির মধ্যে। এবং তা কত কার্যকর, কত ফলপ্রসূ ও বাস্তব, মানুষ তা নিজেই করে উপলব্ধি করছে। ধর্ম এক অস্তিবাচক জীবনচর্চা, তা পরলোকচর্চা নয়। ধর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য সব কিছু। সারাদিন নিজের স্বার্থ, নিজের ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত রইলাম, আর তার মধ্যে এক ফাঁকে একটু প্রণাম বা মঠ-মন্দিরে পুজো দিয়ে এলাম, এটা ধর্মের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা।

ধর্মই ধারণ করে, ধর্মই রক্ষা করে, ধর্মই মলমুক্ত করে মানুষকে। ঠাকুর মানুষকে যে পথ দেখিয়েছেন তার বিকল্প নেই। তাঁর হিন্দুত্ব, খ্রিস্টানত্ব, ইসলাম—এগুলোর কোনও বিরোধ বা বিভিন্নতা ছিল না। ধর্ম মানেই জীবনধর্ম—যা সকলের পক্ষেই জীবনীয়, যা বাঁচা ও বৃদ্ধির মামলোত। সোজা কথায়, বাঁচতে চাইলেই ঠাকুর, আর ঠাকুরই ধর্ম। কারণ, ধর্মের সারবত্তা, তার স্বরূপ, তার ফলিত বা মূর্ত তাৎপর্য ঠাকুরের ভিতরেই জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। ঠাকুর তো কেবল কথার মানুষ নয়, কাজের মানুষ। ধর্মকে নিজে হাতেকলমে যেমন পাল করেছেন, তেমনি শিষ্যদের হাতেকলমে পালন করিয়েছেন। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য এবং অনন্যতা এখানেই।

ঠাকুরের কাছে আমাদের মতো অহঙ্কারী নাস্তিক যেমন গেছে তেমনি আবার গেছে সুবো অচার্যের মতো তৎকালীন তরুণ তুর্কি। সুবো তখন এম.এ ক্লাসের ছাত্র। কবি এবং হাংরি জেনারেশন নামে একটি বাঁধনছেঁড়া সাহিত্যগোষ্ঠীর সদস্য। হাংরিরা নৈতিক বোধ বর্জিত যৌনতায় ক্লিষ্ট কবিতা বা গদ্য লিখত। এদের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার মামলা পর্যন্ত হয়েছিল। সুবো তাদেরই একজন। কিন্তু কী করে যেন সে হঠাৎ একবার দেওঘরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে হাজির হয়ে গেল। ঠাকুরকে সে জিগ্যেস করেছিল, আমি তো ঘোর পাপী, মদটদ খাই, আনুষঙ্গিক দোষও আছে, আমার ভিতরটা একদম খারাপ, কী করে কী হবে?

ঠাকুর সস্নেহে তাকে জিগ্যেস করেছিলেন, তোমার মধ্যে ভালো কিছু একটুখানিও নাই কি?

সুবো বলেছিল, আছে হয়তো। খুব সামান্য। ঠাকুর বললেন, ওই ভালোটুকুনই বাড়ায়ে তোলো, খারাপ যা কিছু পালিয়ে যাবে।

ভালোর তাড়নায় যে খারাপ পালায় এই ধারণাই আমাদের ছিল না। সুবো দীক্ষা নিয়ে নিল। আজ সে পরম ভক্ত এবং উচ্চপদে আসীন। এখন তার চরিত্রে এক চৌম্বক আকর্ষণও তৈরি হয়েছে, যা বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার সুবোর ছিল না।

চোখের সামনে এরকম কত দেখেছি।

আমার দীক্ষান্ত জীবনে ঠাকুরকে পেয়ে যেমন চোখের সামনে দিগন্ত খুলে গেল তেমনি পেলাম হাজার হাজার মানুষকে, আপন করে। দীক্ষা না নিলে এই এত মানুষের সঙ্গে আমার কোনও দেখাসাক্ষাৎ বা যোগাযোগ হতই না। এটাও এক অসাধারণ লাভ। এই গুরুভাইদের মধ্যে চাষাভুসো থেকে উচ্চকোটির চিন্তাশীল, দার্শনিক, পদাধিকারীরাও আছেন। এঁদের কাছ থেকে সে সাহচর্য, সেবা সাহায্য আমি পাই তার তুলনা কোথায়? আমার তথাকথিত বন্ধু অনেক আছে, কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে বিপদে আপদে সংকটে কে এগিয়ে আসে এঁদের মতো! সরল হাসিভরা গুরুভাইদের মুখ দেখলে আমি যত খুশি হই আর কেউকে দেখলে ততটা নয়। পার্থিব জীবনে এঁরাই আমার পরম আত্মীয়। বিবাহ-পূর্ব জীবনে আমার মেস বাড়ি ছিল গুরুভাইদের আনাগোনা মুখর।

ঠাকুর যা বিধান দিয়েছেন তা স্পষ্টভাবেই দিয়েছেন, কোথাও কোনও অস্পষ্টতা নেই। তাই ঠাকুরের বাণী বা বিধির বিকল্প ব্যাখ্যা করা শক্ত। তবু কিন্তু আমরা সব সময়ে তাঁর উপদেশ বা বিধি মনে রাখতে পারি না। নিজেদের মতো করে চলি। হয়তো ত্রুটিটা আপাতদৃষ্টিতে সামান্যই, তবে ফুটো ছোট হলেও নৌকায় জল তো ঢুকবেই।

নিষ্ঠা জিনিসটার যে কত প্রয়োজন তা আজ চব্বিশ বছর ঠাকুরের সঙ্গে চলবার চেষ্টা করার পর একটু একটু করে বুঝতে পারি। এবং এটাও বুঝতে পারি, অনেক পুরোনো, ঠাকুর-সঙ্গ করা মানুষেরও নিষ্ঠায় ফাঁক থেকে যেতে পারে। হয়তো আলস্য, হয়তো

মনগড়া ধারণা বা অপব্যাখ্যা, হয়তো নিছক উদাসীনতার বশেই সামান্য ব্যাপারে তাঁদের ফাঁক থেকে যায়। শেষ ওই ফাঁক আর সারা জীবনেও ভরাট করে তুলতে পারেন না।

ঠাকুরের পথে চলতে গেলে দরকার হয় সদা সতর্কতা। চার চোখো নজর না থাকলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভুলভ্রান্তি ঘটতেই থাকে। আর এই সব ভুলভ্রান্তি আমাদের আত্মসমীক্ষার অভাবে আর সংশোধিত হয় না। তাই দীক্ষার পরও অনবরত যাজনমুখর যেমন থাকতে হয় তেমনি যাজিতও হওয়া দরকার। সেদিন এক শ্রদ্ধেয় ইষ্টভ্রাতা বলেছিলেন, ঠাকুরের আদেশে নিয়তকর্মী হওয়ার পর যখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন তখনও ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, প্রফুল্লদার সঙ্গে থাকতে এবং আদেশমতো চলতে। সেই ইষ্টভ্রাতা এই ঘটনাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, আমরা সবসময়ে ঠাকুরের মতো ঐশী ব্যক্তিত্বের ভাব বা রকম ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারি না। তাই যিনি ঠাকুরকে খানিকটা বুঝে উঠেছেন বা জেনেছেন তাঁর সঙ্গ করা দরকার। আমি প্রফুল্লদার সঙ্গ করার পর অনেক ধাঁধা ও অস্পষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।

আমার নিজেরও তাই মনে হয়। একসময়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ইষ্টভ্রাতাদের সঙ্গ অনেক পেয়েছি। লাভবানও বড় কম হইনি। আজকাল তাঁদের সঙ্গ বিশেষ পাই না বলে অনেক সময়ে অনেক ব্যাপারে দিশেহারা পথহারা বোধ করি। ছোটখাটো অনেক ব্যাপারে আমাদের নানা শিথিলতা থাকে যা আমাদের নিজেদের চোখে ধরা পড়ে না কিন্তু ঝুনো ভক্তরা ঠিক তা ধরতে পারেন এবং সংশোধন করে দিতে পারেন। আর এই জন্যই ভক্তের সঙ্গ করা শুধু ভালোই নয় প্রয়োজনও বটে।

ভোরবেলা উঠে নামধ্যানের কথাই ধরা যাক। রাত জাগি বলে আমি ভোরবেলা উঠতেই পারি না। বেশির ভাগ দিনেই উঠি সূর্যোদয়ের পরে, ভোরবেলা কোনও দিন ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। শরীর খারাপ লাগে। আবার বিপদে বা সংকটে পড়লে দেখেছি দিব্যি রাত থাকতে তড়াক করে উঠে নামধ্যানে বসে যেতে পারি, কোনও অসুবিধেই হয় না। সোজা কথায় তৈরি হলে, ইচ্ছে জাগ্রত থাকলে শরীর থাকলে শরীর মনেরই দাসানুদাস হয়ে পড়ে। আমাদের মনটা যে কবে ঠাকুর-সই হবে!

দয়াল ঠাকুর আমাদের কুসংস্কার, বদ অভ্যাস, মজ্জাগত আলস্য স্বভাবদোষ দূর করার জন্য কতরকম ভাবে আমাদের শোধনের পথ বলে দিয়েছেন। একটু জড়তা, একটু আলস্য, আয়েস ইত্যাদি আমাদের মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ঠাকুর নিজে অনন্যসাধারণ ছিলেন। কিন্তু তিনি চাইতেন আমরাও তাঁর মতো অন্যন্যসাধারণ হয়ে উঠি। তিনি এত স্বাভাবিক ছিলেন, এত স্থিতধী যে তাঁকে Abnormally normal বলা হয়। এত স্বাভাবিক যে সেটাই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কারণ কোনও মানুষই সব পরিস্থিতিতে অচলাবস্থায় থাকে না, ঠাকুর সব পরিস্থিতিতেই স্বাভাবিক। আমাদের কাছেও ঠাকুর ওরকমটাই চান। অনেক সময় দেখি, একটা উদ্দেশ্য

বা চাহিদা নিয়ে নামধ্যান করে তেমন লাভ হয় না, অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্য বা চাহিদা ঠাকুর পূরণ করেন না। কেন এরকম হয় তা অনেককে জিগ্যেস করেও সদুত্তর পাইনি। তখন এমন কাউকে খুঁজে পাই না যে সমস্যার সহজ সমাধানের পথটি দেখিয়ে দেবেন। আসলে ঠাকুরের বুঝওয়ালা মানুষ আজকাল বোধ হয় হ্রাস পেয়েছে। আমার নিজের কাছে ঠাকুর ছাড়া অন্য কোনও পথই খোলা নেই। কিন্তু ঠাকুরের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে যে সব ভুলত্রুটি আমার অজান্তে বা অজ্ঞানবশে ঘটে সেগুলি দেখিয়ে দেবে কে? ঠাকুর নিজে অবশ্য দয়া করে দেখিয়ে দেন, কিন্তু তার আগে ঠেসে বকেয়া নামধ্যান করিয়ে নেয়। অনেক জ্বালাযন্ত্রণাও সইতে হয়। আমরা, পুরোনো সৎসঙ্গীরাই যখন এরকম বে-দিশা হয়ে যাই নতুন সৎসঙ্গীদের আরও গণ্ডগোল হওয়ার কথা। সুতরাং এখনই কিছু রাখাল মানুষ বড়ই দরকার, যাঁরা যে-কোনও সমস্যার কথা অনুধাবন করে ইষ্টানুকূল সমাধানের ইঙ্গিত দিতে পারেন।

ঠাকুরের মতাদর্শ, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কথিত উপদেশ, নানা জটিল বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা এই সব নিয়ে ব্যাপক গবেষণাও হওয়া দরকার। বিশেষ করে তাঁর ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুধু পঠন-পাঠনে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। কতগুলি বিষয়ে হাতেকলমেও করার দরকার হবে। বিবাহ বিষয়ে ঠাকুর যা বলেছেন সেটা নিয়েও ব্যাপক সামাজিক সমীক্ষা প্রয়োজন। সবর্ণ, অনুলোম এবং প্রতিলোম বিয়ের ফলে কী কী সুফল বা কুফল ঘটছে তার একটা অনুসন্ধান হওয়া দরকার। প্রয়োজন বাস্তব অনুধাবনেরও আমরা শুধু বক্তৃতা বা মুখের কথায় এগুলি প্রচার করি, কিন্তু দৃষ্টান্ত দিতে পারি না। দৃষ্টান্ত এবং প্রমাণ না দাখিল করলে বিষয়টা ধোঁয়াটে এবং কথার কথা হয়েই থেকে যায়। ঠাকুর-চর্চা শুরু হলেই সমাজে তার অবশ্যম্ভাবী শুভ প্রতিক্রিয়া ঘটতে শুরু করবে। ঠাকুর নিজেও চান তাঁর কথাগুলি যেন আমরা মিলিয়ে নিই। সেগুলি যেন আমাদের অলস কল্পনাবিলাস হয়ে না থাকে। ঠাকুরের কাজেরও কিন্তু অন্ত নেই। একবার শুরু হয়ে গেলে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলতে থাকবে।

এক সময়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি এবং মতান্তরের ফলে কয়েকজন ঋত্বিক আলাদা সংগঠন করেন। আমিও সেই সংগঠনে জড়িয়ে পড়ি। ঠাকুর তখনও দেহে আছেন, তাঁর অনুমতি নিয়েই এই আলাদা সংগঠন তৈরি হয়। বোধহয় সেটা উনিশশো সাতষট্টি বা আটষট্টি সাল। গিধনিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। কিন্তু সেই ইতিহাস অন্য সময়ে লেখা যাবে। প্রসঙ্গটা এল এই কারণে যে ওই সংগঠনে জড়িয়ে পড়ার ফলে ঠাকুরের কাছে আমাদের যাতায়াত একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষ বছরটায় আমি তাঁকে দেখতে যাইনি। ফলে মানসিক যন্ত্রণা তুঙ্গে উঠল। মনটা পাগল-পাগল করে ঠাকুরের জন্য। বাঁধনছেঁড়া সেই টান আমাকে আর কল্যাণকে একদিন টেনে নিয়ে হাজির করল তাঁর কাছে।

সেই সব কথা লিখতে বসে আজও রোমাঞ্চ হচ্ছে। সেবার নানাভাবে ঠাকুরের আদর ঝরে পড়তে লাগল আমাদের ওপর। ঠাকুর যেন সহস্র হাতে আদর করতে লাগলেন আমাদের। তাঁর চোখ থেকে যেন মমতার নির্ঝর এসে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কয়েকদিন আগে রেডিয়োতে একটি গল্প পড়েছিলাম। গল্পটি ঠাকুরকে নিয়ে, তাঁরই জীবনের কয়েকটি ঘটনাকে অবলম্বন করে। ইষ্টভ্রাতাদের গল্পটি স্বভাবতই ভালো লেগেছিল। বিশুদা ঠাকুরকে গল্পটির কথা বললেন। ঠাকুর সেকথায় আমল না দিয়ে আমাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

লোকে হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সেইবারই যে ঠাকুরকে শেষ দেখা তা অস্পষ্টভাবে বারবার আমি টের পাচ্ছিলাম। অথচ সেবার তাঁর শরীর দিয়ে যেন সবসময়ে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুখখানা সবসময়ে তাঁর সেই আলোকসামান্য হাসিতে উজ্জ্বল, ভারি স্ফূর্তিযুক্ত, অনেক কথাও কইছেন। এত ভালো তাঁকে বহুকাল দেখিনি। রোজ সকালে মানিকপুরের মাঠে বেড়াতে যান। আমরা তাঁর সঙ্গে দুবার মানিকপুরের মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

মানিকপুরের মাঠে, যেখানে ঠাকুর তাসুর নীচে বসতেন। সেখানে এখন মন্দির করা হয়েছে।

ওই ধূ-ধূ প্রান্তরের মাঝখানে টিলার ওপর চৌকি পেতে ঠাকুর বসতেন। ভোরের নরম আলো এসে তাঁকে স্পর্শ করত, আর কী ভালোই যে লাগত তখন তাঁকে! শরীরের ভিতর থেকে, সত্তার গভীর থেকে যেন এক জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। আমি তো মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থেকে শুধু তাঁর ওই অপরূপ রূপ দেখেছি দুদিন। শিশুর মতো এটা কী ওটা কী জিগ্যেস করছেন। অভ্যন্তরীণ এক আনন্দে মাঝে মাঝে তাঁর মুখে সেই অপার্থিব হাসি ফুটে উঠছে। হাসির দোলায় দুলছে সমস্ত শরীর। এসব যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

রবিবারও সকালে বেড়াতে গেলেন মানিকপুরে। সঙ্গে আমরা। কে জানতে সেইবারই শেষবার তাঁর ভ্রমণ। ফিরে এসে যখন পার্লারে বসেছেন তখন ফাঁক বুঝে শৈলেনদা (ভট্টাচার্য) আমাকে আর কল্যাণকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। সেই সকালে যে করুণাঘন গভীর মমতার চোখে ঠাকুর আমাদের লেহন করে নিলেন তেমনটি যেন আগে আর কখনও দেখিনি! কী আকুলতা কী ভালোবাসা সেই চোখে! মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে দুটি পা জড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদি।

ঠাকুর দু-চারটি কথা জিগ্যেস করলেন। প্রসন্নতায়, পুর্ণতায় তিনি যেন সেই সকালে উপচে পড়ছিলেন। আর তাঁর অত রূপ অত লাবণ্য অত আনন্দ দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, তিনি এবার বোধ হয় আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। দেওঘর অন্ধকার হয়ে যাবে, আঁধার হবে আমার দুনিয়া।

পার্লার ছেড়ে বেরিয়ে সে চারদিকে দিনের আলোর মধ্যেও যে কেন আমি চাপ চাপ অন্ধকার জমাট বাঁধতে স্পষ্ট চাক্ষুষ দেখলাম তার ব্যাখ্যা আমিও দিতে পারব না। লক্ষণগুলি ভালো ঠেকছে না, অথচ সম্পষ্টভাবে এই সব লক্ষণের অর্থ বুঝব তত বোধবুদ্ধিও নেই। সারাটা দিন একটা বিষণ্ণতার বাঁশি বাজতে লাগল মনে। ঠাকুর কি চলে যাবেন? আশির ওপর বয়স হয়েছে, শরীর ভেঙে গেছে অনেক, অনুত্যাগের লগ্ন তো বেশি দূরে নয় প্রাকৃতির কারণেই। তবু ওই মহাপ্রেমী, ওই আমার আত্মার আত্মীয়, আমার ব্যথা-বেদনা একাকিত্বে সাথের সাথিরা যদি চলে যান এই পৃথিবীর পরবাসে আমি কী করে থাকব?

এত অসহায় লাগছিল, এত বিধুর যে, সারাটা দিন যেন বিষাদ-সিন্ধুতে মগ্ন হয়ে রইলাম। বারবার একটু চোখের দেখা দেখতে পার্লারের আশেপাশে ঘুরঘুর করে আসছি। পার্লার বন্ধ। দেখা হচ্ছে না। দেখা হল বিদায়ের আগের মুহূর্তে, রাতে। রাতের গাড়িতে ফিরব অনুমতি নেওয়া আছে। শুধু একবার চোখের দেখা দেখে যাব তাঁকে।

দেখা হল। পার্লারের দরজা দিয়ে যখন গিয়ে ঢুকলাম তখন তাঁর রাতের ভোগ হয়ে গেছে। এবার হয়তো শোবেন। দূর থেকেই প্রণাম করলাম। তিনি একবার বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। চোখে চোখ পড়ল। কেঁপে উঠলাম। শেষবারের মতো বিদায় নিচ্ছি তাঁর সান্নিধ্যে থেকে—সেটা যেন খুব ক্ষীণ অস্পষ্টভাগে আভাস দিচ্ছে। কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারছি না।

প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

ঠাকুরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যতবার দেওঘর থেকে ফিরেছি কোনওবারই ট্রেনে কোনও কষ্ট পাইনি। জায়গাও পেয়েছি বরাবর। কিন্তু এইবার রাতের ট্রেনে জায়গা পেলাম না। কল্যাণ একটা বাঙ্ক জোগাড় করল, আর আমি স্রেফ মেঝের ওপর চাদর পেতে শুয়ে পড়লাম।

সকালে কলকাতার মেসবাড়িতে পৌঁছে ঠাকুরের জন্য এত মন-কেমন করতে লাগল যে, কারও সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতে পারছি না। অথচ অন্যান্য বার ঠাকুরবাড়ি থেকে ফিরে ঠাকুরের কথা আর শেষই হতে চায় না। সবাই শুনবার জন্য উন্মুখ থাকে। এবারও সবাই ছেঁকে ধরেছে, কিন্তু আমি যেন কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছি না।

দুপুরবেলা স্নান করে যখন ঠাকুরকে প্রণাম করতে গেছি, তখনই ঘটল এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা। ঘটনাটির কথা খোলাখুলি বলা যাবে না। বলা উচিতও নয়। কিন্তু ঠাকুর আমাকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিলেন যেন, তিনি আর দেহে নেই। কিন্তু মন কি তা মানে?

দুপুরে খেয়ে উঠে শুয়েছি, চন্দন এসে কেবল ঠাকুরের কথা বলবার জন্য চাপাচাপি করছে, ঠিক এসময়ে মুকুল এসে খবর দিল, এ কী! আপনারা এখনও বসে আছেন! ঠাকুর যে নেই!

যেন নীল আকাশ থেকে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত। বিহ্বল সম্মোহিতের মতো উঠে বসলুম। আপনা থেকেই শরীর ধ্যানের আসনে স্থির হল। আপনা থেকেই নামজপ শুরু হয়ে গেল। আর ঠাকুর শেষ কটি দিনে তাঁর চলে যাওয়ার যেসব আভাস ইঙ্গিত দিয়েছেন সেগুলো হঠাৎ প্রাঞ্জলভাবে আমার মাথায় উদ্ভাসিত হল। অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

না, আমি দেওঘর যাইনি। তাঁর প্রাণবন্ত মুখশ্রীর শেষ স্মৃতির রেশটুকুই আমার থাক, তাঁর মৃতদেহ দেখতে যাব কেন? দুর্বল চিত্ত আমি তাই তাঁর শেষকৃত্যে উপস্থিত হইনি। শুধু এক অন্তর্গত অস্থিরতার নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছি। দিনের বেলা উদভ্রান্তের মতো পথে ঘুরেছি। ঠাকুর নেই। ঠাকুরহীন এই পৃথিবীতে কী করে থাকব? কী করে বেঁচে থাকব তাঁকে ছাড়া?

ঠাকুর চলে যাওয়ার পর তাঁর স্পর্শ, তাঁর দয়া পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে অনেকেই সংশয় দেখা দিয়েছিল। আমারও ঠাকুরকে প্রত্যক্ষভাবে তো সমস্যা সংকটের কথা জানানো যাবে না। এখন তবে কী হবে?

আমার এই প্রশ্নের জবাব অবশ্য পেতে দেরি হয়নি। একটি ঘটনার ভিতর দিয়ে স্পষ্টই বোঝা গেল, তিনি যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। তিনি পূর্ণসত্তা, দেহে থেকে এবং বিদেহী অবস্থাতেও কখনও তিন অনুপস্থিত নন। ঠাকুর পুণ্য পুথিতে এবং অন্যত্র বারংবার আভাস দিয়েছেন, চার অক্ষরী নামের সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গি ভাবে মিশে থাকেন। নামই তিনি।

নামধ্যানের চর্চায় একটা ভাটা ইদানীং লক্ষ করা যায়। এমনকী উৎসবাদিতে, সভায় বক্তারা নামধ্যান প্রসঙ্গে তেমন গুরুত্ব দেন না। ঠাকুর তাঁর উপদেশাবলিতে কিন্তু বারবার নামধ্যানের কথা টেনে এনেছেন। গুরুর দেওয়া জিনিস, একবার দুবার করলে হয় না, চব্বিশ ঘণ্টাই করতে হয়। বলেছেন, হরদম নাম চাই। বলেছেন, পাপ করছিস, তার মধ্যেও নামধ্যান কর। বলেছেন, আটেকাঠে দড় তো ঘোড়ার উপর চড়। কেন বারবার নামধ্যানের কথা বলেছেন! কেন বলেছেন, যে আজ্ঞাচক্রে গুরুকে জাগিয়ে নিতে পারে তার কোনও চিন্তা নেই? বারবার বলেছেন নামধ্যানে সব হয়।

ওই চার অক্ষরের স্পন্দনের মধ্যে তিনি যে আছেন তা আমাদের যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝা যাবে না বটে, কিন্তু বিশ্বাস আর চর্চার ভিতর দিয়ে বুঝতে কোনও কষ্ট হয় না।

নামধ্যানের প্রতি আগ্রহ মানুষের এমনিতে হয় না, কিন্তু সমস্যায় পড়লে হয়। আমি নিজে যে খুব নামধ্যান-পরায়ণ তা মোটেই নয়। দিনের পর দিন চলে যায় নামধ্যান, নামমাত্র নিয়মরক্ষার মতো করে দায় মেটাই। জানি এর ফল ভুগতে হবে, তবু আলস্য জড়তা শয়তানের থানা হয়ে গেড়ে বসে থাকে মাথায়। ঠাকুর-ঠাকুর মুখে যতই করি না কেন, নামধ্যানের ভিতর দিয়ে ঠাকুর-পিপাসা প্রকাশ না পেলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগই ঘটে না। নামধ্যানই তাঁর সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগাযোগের রাস্তা। ঠাকুর যে কত জীয়ন্ত, কত নিকট তা টের পাই যখন তিনি মাঝে মাঝে আমাকে নানরকম সমস্যায়,

জটিলতায়, বিপদে ফেলে দেন। তখন আর আলস্য-জড়তা থাকে না, সব ঝেড়ে ফেলে পাগলের মতো হন্যে হয়ে নাম করি। অস্তিত্বের সঙ্কট, প্রাণের মায়া আর প্রিয়জনের চিন্তায় তখন শতকরা একশো ভাগ ভক্তিপ্রীতি না হলেও জপ আর ধ্যান কিছুটা হয়। আর ওইভাবেই ঠাকুর বকেয়া নামধ্যানের ফাঁক বোধ হয় পূরণ করে দেন।

আমার নিজের নানা ঘাটতি আছে, সে সব লেখার উদ্দেশ্য হল, যাতে এসব ঘাটতির শিকার হয়ে অন্য গুরুভাইরা কষ্ট না পান। দয়াল ঠাকুর এমনই সব নিয়ম বেঁধে দিয়ে গেছেন যা চতুর্দিক থেকে সর্বতোভাবে আমাদের রক্ষাকবচের মতো ঘিরে থাকে। রোগ শোক মৃত্যু—সব কিছুকেই ঠেকিয়ে রাখতে এই সব আচরণবিধি। শুধু তাই নয়, ঠেলে নিয়ে যেতে প্রবল উন্নতি পথে, সব নিদানই তাঁর বাস্তবভাবে, সহজভাবে দেওয়া আছে। ফাঁকটুকু হচ্ছে আমাদের করার মধ্যে। আমি নিজে ফাঁকিবাজ বলে অনেক সময়েই নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাই। লক্ষ করেছি, ঠাকুর তাঁর ব্যাপারে ফাঁকিবাজি বা গাফিলতি খুব বেশি দূর সহ্য করেন না, একসময়ে ঠিকই আবার নানা বিপাকে ফেলে নামধ্যানে তৎপর করে তোলেন।

নয়

একাশি বছর বয়সে সংবরণ করার আগে পর্যন্ত ছেদচিহ্নহীন অক্লান্তকর্মা মানুষটিকে কখনই আমাদের পর্যায়ের প্রাকৃত মানুষ বলে মনে হয়নি কারও। ঠাকুরের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, কখনই কোনও অসতর্ক মুহূর্তেও তাঁকে নিতান্ত সাধারণ বলে প্রতিভাত হয় না। ঠাকুরের মধ্যে এই যে সহজাত অসাধারণত্ব এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। কেন ঠাকুর অন্য সকলের চেয়ে আলাদা? অথচ কী সহজ, সরল, কী দীনতায় মাথা তাঁর ব্যবহার! কী সহজ সুরেই না কথা বলেন! অনেকটাই গেঁয়ো তাঁর চালচলন আর কথাবার্তা। অথচ আদ্যন্ত কী সাংঘাতিক রকমের আধুনিক। ঠাকুরের মধ্যে বৈপরীত্য ছিল না, কিন্তু সংমিশ্রণ ছিল, সমন্বয় ছিল। সনাতন প্রথা প্রকরণকে ভেঙে না ফেলে তিনি সেগুলিকে সংস্কার করে দিয়েছেন। আবার তাঁর প্রবল উৎসাহ ও কৌতূহল আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের নানা গবেষণার প্রতি। এই কৌতূহল নিছক তাত্ত্বিক ছিল না।

এই সব সমস্যা এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্যে যেমন আধুনিক মানুষের বিচিত্র জটিল অন্তর্জগতের উন্মোচন আছে, তেমনি আছে আকাশতত্ত্ব থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের দুর্বোধ্য তথ্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞান থেকে মনোবিকলন পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাও। আমরা তো সর্ববিদ্যা-বিশারদ নই, তাই অতটা ধরতে পারি না। ঠাকুরের প্রজ্ঞার পরিধি অনুমান করার সাধ্য করাই বা আছে? কিন্তু তাঁর মুখ থেকে অকারণেই নিঃসৃত হয়নি তাঁর প্রজ্ঞার

পরিচয়। তিনি তো জ্ঞানের অহঙ্কার প্রদর্শন করতে আসেননি। মানুষেরই নানা প্রশ্ন বিচিত্র সমস্যা, অসংখ্য সুখ-দুঃখ ত্রাস তাঁর ভিতর থেকে টেনে এনেছে ঐশী বাণীনিচয়। যা-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তার সবই প্রয়োজন ভিত্তিক। অকারণ কোনওটাই নয়। দয়াল ঠাকুরের সমুদয় বাণী, তাঁর গোটা জীবনদর্শনের মূলে ছিল তাঁর একটাই আকুতি—মানুষের মঙ্গল। মানুষের মঙ্গলকে ভিত করে গড়ে ওঠা তাঁর ধর্ম এবং অনুশাসন—তা কিন্তু, মুসলমান খ্রিস্টান সকলের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য। এ শুধু তত্বকথা হয়ে থাকলে ঠাকুর আজকে সকলের প্রাণের ঠাকুর হয়ে উঠতেন না। তত্বকথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু ঠাকুরের পৃথকত্ব বা বৈশিষ্ট্য আরও জীবনমুখী এক বাস্তববাদী ভাগবত সত্তার তাই তিনি যা বলেছেন তা হাতেকলমে অক্ষরে অক্ষরে করে দেখিয়েছেন। তাঁর কাছে যে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সমেত পৃথক হয়েও মূলত একই পরম পিতার সন্তান হয়ে সমাদৃষ্টির দুর্লভ আলোকে আলোকিত হয়েছে তা তাঁর কাছের যে-কোনও মানুষই উচ্চকণ্ঠে বলবে।

ঠাকুরের সম্পদ ছিল মানুষ। যেমন ছিল তাঁর মানুষের পিপাসা, তেমনি নিরন্তর ছিল মানুষ ও জীবজগতের জন্য তাঁর মঙ্গলাকাঙক্ষা। এই ঘোর কলিকালে ঠিক এরকম সর্বগ্রাসী মঙ্গলচিন্তা আর কারও মধ্যে এতটা প্রকট হয়ে দেখা যায়নি ওর একঝোঁকা ভালোবাসা। ঠাকুরের এই ভালোবাসাকেই আমরা অলৌকিক বলে মনে হয়। কী করে সবাইকে নির্বিশেষে অত ভালোবাসা সম্ভব তা ভেবেই পাই না। ঠাকুরের যা কিছু প্রজ্ঞা বা জ্ঞান তার সবটুকুকেই তিনি উজাড় করে দিতে চেয়েছেন মানুষ ও জীবজগতের কল্যাণে। তাই তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে বিজ্ঞান, রাজনীতি, স্বাস্থ্য ও সদাচার সবকিছুই ওতপ্রোত হয়ে আছে। তার জীবনদর্শনের সবটুকুই তাই ফলিত ও বাস্তবমুখী। ঠাকুর বলেন, 'সব ভাবেরই রূপ আছে।' এই রূপটিকে একেবারে চোখের সামনে না তুলে ধরা পর্যন্ত তাঁর সোয়াস্তি নেই। এমনকী ধ্যানে মানুষের যেসব অনুভূতি হয়, সেগুলিকেও ঠাকুর বাস্তবায়িত করার কথা বলেন। বিজ্ঞানকে সহায়ক করে নিলে এই সব অনুভূতির রেকর্ড করা যে সম্ভব তারও ইঙ্গিত ঠাকুরের কথায় পাই।

ঠাকুর নিজেই এক উৎসুক বিজ্ঞানী। তাঁর সৎসঙ্গ আন্দোলনের একেবারে প্রথম পর্যায়েই দেখতে পাই তিনি বিজ্ঞানকে সাথীয়া করে নিয়েছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণায় অখ্যাত গ্রাম বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ববিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অভিসার কোন দিকে হওয়া উচিত? অবশ্যই বিজ্ঞানকে হতে হবে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণের আয়ুধ। তার উদ্দেশ্য হবে নিরাময়, স্বস্তি, উপযোগ ও প্রয়োজনের অনুপূরক। এবং অবশ্যই গভীর ও অতন্দ্রভাবে জগৎ ও পারিপার্শ্বিককে বাস্তবভাবে ব্যাখ্যা করা। আজকাল অনেকেই বিজ্ঞানকে ঈশ্বর বা ধর্মের শত্রু বলে ধরে নেন। এ প্রবণতা তরল বুদ্ধির পরিচায়ক। বিজ্ঞানের উদ্ভবই হয়েছিল ধর্মের অঙ্গ হিসেবে। ধর্ম মানে তো জীবন। যে বস্তুবিশ্ব

আমাদের ঘিরে আছে তাকে জানতে গিয়েই বিজ্ঞানের উদ্ভব হল। ঠাকুর নিজে ছিলেন বিজ্ঞানের একজন নিবিড় অন্তরাসী। বিজ্ঞানচর্চাকে তিনি কতখানি গুরুত্ব দিতেন তা তাঁর বিস্তৃত কর্মকাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছে।

ঠাকুর তাঁর জন্মভূমি হিমায়েতপুর গ্রামে তৎকালে বিশ্ববিজ্ঞান নামে একটি বৃহৎ গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন, নানা বিষয়ে বিজ্ঞান চর্চার জন্যই। একজন ধর্মগুরুর পক্ষে এ ধরনের কাজ বিরল। শুধু গবেষণাগার প্রতিষ্ঠাই নয় তাতে নানা ধরনের গবেষণা সাফল্যের সঙ্গে হয়েছেও। এ ব্যাপারে ঠাকুরের মস্ত সহায়ক ছিলেন বিজ্ঞানসাধক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। তিনি বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ছাত্র ও গবেষক ছিলেন। সেদিকে হয়তো তাঁর বিশাল সাফল্য আসতে পারত। কিন্তু সেদিকে যাওয়ার মন হয়নি তাঁর, ঠাকুরকে অবলম্বন করে তাঁর সঙ্গেই জড়িয়ে নিলেন জীবন। বিজ্ঞান অর্থাৎ শুকনো বিজ্ঞান তাঁকে হয়তো অর্থ ও যশ দিতে পারত, ঠাকুরকে জড়িয়ে নিয়ে তিনি পেয়ে গেলেন মহাবিজ্ঞান তথা জীবনবিজ্ঞান। জীবনকেও ধরতে পারলেন, বিজ্ঞানও তাঁর সঙ্গে রইল। ঠাকুর তাঁকে দিয়ে নানা ধরনের গবেষণা করিয়েছেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা কিছুই বাদ দেননি।

বিজ্ঞানের মধ্যেও সেই ধারণ-পালনী সম্বেগময়ী ধর্মকেই দেখতে পাই আমরা। ধর্ম তার নিয়ামক না হলে বিজ্ঞানকে জীবনমুখী যে মারণাস্ত্র অস্তিবৃদ্ধিমুখী করে তুলবে কেন? শাতনপন্থীরা বিজ্ঞানকে যে মারণাস্ত্র তৈরি এবং অন্যান্য বিধ্বস্তির সেবায় লাগাচ্ছে সে প্রবণতাই বা ঠেকানো যাবে কী করে? বিজ্ঞান এক নিরপেক্ষ শক্তি। তাকে জীবনমুখী কাজ যেমন নিয়োজিত করা যায়, তেমনি মারণযজ্ঞেও তাকে ব্যবহার করা যায়। সমস্যা হল ব্যবহারকারীকে নিয়ে। মানুষ তার মস্তিক এবং মেধা দিয়ে বিজ্ঞান ব্যবহার করে। মেধাও কিন্তু এক নিরপেক্ষ শক্তি। শুধু মেধা বা বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে কিন্তু প্রেম-ভালোবাসা-আবেগ বা মঙ্গলমুখী সম্বেগ থাকে না। তাই এই মেধারও প্রহরী দরকার। একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে করতে এমন আবিষ্কারের মুখোমুখি হন যা মারণমুখী, যা ভয়ংকর। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাঁর ওই আবিষ্কারকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। আইনস্টাইন বা তাঁর মতো আরও কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানের এই দিকটির প্রতি অত্যন্ত অনুভূতিশীল ছিলেন। তাঁদের আবেদনে অবশ্য কাজ হয়নি। বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রশক্তি কাজে লাগিয়েছে ধ্বংসাত্মক, মারণমুখী যজ্ঞে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর হয়েছে ব্যবসায়িক দুর্নীতিতে, যুক্তিহীন অপচয়ে। বিজ্ঞানকে তাই ধর্মান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বৃথা আবিষ্কারে তাকে কাজে লাগানোর চেয়ে মানুষের সেবায়, মঙ্গলে কী করে তাকে ব্যবহার করা যাবে সেটাই ভেবে দেখা দরকার। বিজ্ঞানী যদি ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যদি অস্তিবৃদ্ধির অনুশাসনই তাঁর নিয়ন্তা হয় তবে অচিরে বিজ্ঞানের জাদুকারি প্রভাবে পৃথিবী সুন্দরতর হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞান নিয়ে আসতে পারে স্বস্তি, আরোগ্য, জ্ঞান ও সার্বিক মঙ্গল। ঠাকুর বিজ্ঞানকে সেইভাবেই নিয়োজিত করেছেন। সেইভাবেই চলনা

করেছেন তাঁর বিশ্ববিজ্ঞানকে। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বিজ্ঞানের মানুষ বড় কম নেই। কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞ করে তুলতে ঠাকুর পিছপা হননি। তাঁদের নিয়োগ করেছেন লোকসেবামূলক কাজে, পাঠিয়েছেন যাজনে, ভিক্ষায়, করে তুলেছেন ধ্যানি ও প্রেমী। আর ওইভাবেই জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অস্তিবৃদ্ধির অনুগ হয়ে তাঁরা, বিজ্ঞানের সারকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

বিজ্ঞান ধর্ম মানে না, ঈশ্বর মানে না এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। বিজ্ঞান যা প্রমাণ করতে পারে তা-ই বিশ্বাস তা-ই বিজ্ঞানের সত্য। তাই বিজ্ঞান অনুমানভিত্তিক বা বিশ্বাসভিত্তিক নয়, এ কথা তো সবারই জানা। কিন্তু যা বিজ্ঞানের জানা নেই তাকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করাও বিজ্ঞানের ধর্ম নয়। ঈশ্বর আছে কি নেই তা বিজ্ঞানের পরিধির বাইরের ব্যাপার, বিজ্ঞান সেই কারণেই আস্তিকও নয়, নাস্তিকও নয় বিজ্ঞানকে মানুষের মঙ্গলের কাজে নিয়োজিত করা এবং শাতনপন্থী প্রয়োগ প্রতিরোধ করাই মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত। ঠাকুর বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন, বিজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রসঙ্গও বারবার তাঁর আলাপচরিতে এসেছে। সংগঠন করলেন প্রযুক্তিবিদ্যার। কুটিরশিল্পকে উন্নীত করে তুললেন এমনভাবে যাতে সৎসঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। সৎসঙ্গের প্রযুক্তিবিদরা ব্রিজ তৈরি থেকে নানা কাজের ঠিকাদারি নিয়ে যোগ্যতার সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করেছেন। এক সময়ে সৎসঙ্গের গেঞ্জির খুব নাম ছিল। কিন্তু ব্যবসা বা বিজ্ঞান কোনওটাই ঠাকুরের উদ্দেশ্য তো ছিল না, তাই সৎসঙ্গকে তিনি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেননি। কিন্তু মানুষকে যে প্রায় শূন্যতা থেকে কেবলমাত্র যোগ্যতাকে উস্কে দিয়ে অনেকখানি করে তোলা যায় তা তিনি পরীক্ষামূলকভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঠাকুর যখন দেশভাগের এক বছর আগে দেশ ছেড়ে দেওঘর চলে আসেন তখন ইচ্ছে করেই সঙ্গে কিছুই নিয়ে আসেননি। যা কিছু নির্মিত হয়েছিল, যা কিছু সঞ্চিত হয়েছিল সবই হেলাভরে ফেলে রেখে এসেছিলেন। দেওঘরে আবার তাঁকে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছিল। আর সে কী কষ্ট! তার ওপর ছিল স্থানীয় কিছু লোকের হিংস্র বিরোধিতা।

কেন এভাবে সব ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করলেন ঠাকুর? এর কোনও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে দূরদর্শী ঠাকুর অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশ ভাগ হবেই। তাই এক বছর আগেই তিনি দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন। কেন দেওঘরে? তার কারণ বোধ হয় বিহার-বাংলার সীমান্ত অঞ্চলকে ঠাকুর বরাবরই পছন্দ করতেন। এই সীমান্তেই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বঙ্গ-মাগধ পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে। আর সেই উদ্দেশ্যেই বর্ধমানের রামকানালীতে তাঁর ইচ্ছে ছিল হিমাইতপুর গড়ে তুলতে। বিহার-বাংলা সীমান্ত অঞ্চল কেন তাঁর প্রিয়, তা হয়তো

আমাদের বুঝে ওঠা কঠিন। কিন্তু তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার পিছনেই সবসময়ে থাকত যুক্তিসিদ্ধ বিচার।

মানুষকে দক্ষ যোগ্য ও মানসম্পন্ন করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলে তিনি কোনও মানুষকেই উপেক্ষা করেননি। নির্বোধ, অতি চতুর, ঠকবাজ, ধান্দাবাজ, মিথ্যাচার, সন্ত্রাসবাদী, চোর, বাটপাড়, খুনি, গুন্ডা যারাই এসেছে তাঁর কাছে বা তাঁকে যারাই ভাঙাতে চেয়েছে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে তিনি তাদের কাউকেই প্রত্যাখান করেননি। এই যে নানারকম মানুষ, এদের নিয়েই ছিল ঠাকুরের আশ্চর্য সংগঠন। আর এই সংগঠনের ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তেমনি তৈরি হয়েছে একটি আদর্শ সমাজের চেহারাও। সংগঠনকেও আবার ঠাকুর প্রধান করে তোলেননি, কারণ সংগঠন প্রবল হলে ব্যাষ্টি অপ্রধান হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে সমষ্টির চেয়ে ব্যাষ্টিকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ব্যাষ্টিকে সেই প্রয়োজনের উপকরণ জোগাতে এবং তার যোগ্যতাকে উস্কে তুলতেই সংগঠন। ঠাকুর নিজে এই সংগঠনের শীর্ষদেশে থেকেছেন বটে, কিন্তু ব্যক্তি তিনিই সকলের আকর্ষণের মূল লক্ষ্য।

যিনি একটি মানুষের জন্য সাম্রাজ্য হারাতেও প্রস্তুত তাঁর পক্ষেই এটা সম্ভব।

মানুষের প্রতি এই তীব্র আপসহীন নিঃশর্ত ভালোবাসাই তাঁকে এমনতরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে যে নাস্তিকও তাঁর কাছে এসেছে চুম্বকের টানে। এসেছে ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ। এসেছে তাঁর ঘোরতর নিন্দুক এবং বিরোধীরাও।

সত্য বলতে কী, আমি নিজেও তাঁর প্রতি একসময়ে প্রবল বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলাম। দেখার অনেক আগে থেকেই তাঁর সম্পর্কে নানা অপবাদ শুনে আমার মনোভাব বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখনই, অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই যেন এক স্রোতোময়ী পুণ্য জলাধারায় অবগাহন করে উঠলাম, তাঁর প্রতি আমার সমস্ত বিদ্বেষ ধুয়ে গেল। আসলে তাঁর অমল ধবল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ তাঁর সর্বাঙ্গে সর্বদাই প্রোজ্জ্বল থাকত। খাঁটি মানুষ যিনি তাঁকে কখনও চেষ্টা করে ভালো সাজাতে হয় না। তাঁর অস্তিত্বই তাঁর প্রতি গোটা জগৎটাকে আকর্ষণ করতে থাকে। ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করা মানেই এক মহাপুণ্য কর্ম। এক বিরল অভিজ্ঞতাও বটে। তাঁকে দেখবার আগে আমি তাঁর সমতুল আর কাউকেই দেখিনি। দেখামাত্র মনপ্রাণ আশা-ভরসা নির্ভরতায় ভারে উঠতে থাকে।

ঠাকুরের সঙ্গে আমার বাক্য বিনিময় হয়েছে সামান্যই। আমি লাজুক এবং কুণ্ঠিত-স্বভাব বলে এবং তিনি সর্বদাই নানা মানুষের ভিড়ে আবদ্ধ থাকেন বলে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আমি কখনও পাইনি। কিন্তু সর্বদাই মনে হত, তিনি আমাকে যতটা ভালোবাসেন ততটা কেউ আমাকে বাসেনি। কেন এরকম মনে হত তা আমি আজও ব্যাখ্যা করতে পারিনি। আসলে এসব প্রেম-ভালোবাসাহীনতার যুগে আমরা ভালোবাসার স্বরূপটাকে চিনতেই আর পারি না। তাই হঠাৎ অমল ধবল ভালোবাসার আকস্মিক স্পর্শ

পেলে কেমন যেন হয়ে যাই। ঠাকুর যে অত মানুষের মধ্যে আমাকে ভালোবাসছেন তা কেমন করে টের পেলাম অনেক ভেবেও তার কূলকিনারা করতে পারিনি। কিন্তু বারবারই সেই ভালোবাসার চকিত স্পর্শ আমাকে অনেক দুর্গতি থেকে টেনে এনেছে।

নিজের মা-বাবাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। তাঁরাও আমার চার ভাইবোনের মধ্যে আমার প্রতি একটু বেশি স্নেহশীল। তাঁদের চেয়েও আমার প্রতি কারও স্নেহ ভালোবাসা আছে বা থাকতে পারে এটা আমার কাছে কল্পনার অতীত ছিল। ঠাকুরের কাছে গিয়ে আমি এরকম এক অসম্ভব সত্যকে আবিষ্কার করলাম। স্পষ্টই টের পেলাম আমার প্রতি ঠাকুরের ভালোবাসা মানুষী সব সীমারেখাকে ভেঙে দিতে পেরেছে। ইনি আমার মায়ের চেয়েও আমাকে বেশি ভালোবাসেন। ঠাকুর সম্পর্কে এই বোধটা যখন হল তখনই মনটা আত্মধিক্কারে ভরে যেতে লাগল। তিনি বাসেন কিন্তু কই আমি তো তাঁকে ততটা ভালোবেসে উঠতে পারছি না!

এই যে ভালোবাসার প্রতিদান, এইটেই সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঠাকুরের ওপর আমাদের একধরনের টান বা ভালোবাসা হয়তো হয়, কিন্তু ঠিক সেইরকমটা সহজে হতে চায় না যাতে পঙ্গুঁ গিরি লঙঘন করতে পারে, বা দুনিয়া ওলটপালট করে দিতে পারে একজন সাধারণ মানুষও।

ঠাকুর জানতেন সহজে এটা হয় না। তাই তিনি ভালোবাসার একটা সহজ বাস্তব শিক্ষা দেওয়ারই চেষ্টা করেছেন। ঠাকুরের সাধনা এই ভালোবাসা বা প্রেমেরই সাধনা। এই সাধনার ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে ভালোবাসা জন্মায়।

ঠাকুরের অলৌকিকত্ব আমার চোখে এইখানেই। শূন্য মূল্যকে পূর্ণ মূল্যে রূপান্তরের এমন জাদুকাঠি আর কারও হাতে আছে বলে তো আমার জানা নেই।

এই যুগে সব দেশে সব রাষ্ট্রেই ব্যক্তি-মানুষের এক অসহায় অবস্থা। রাষ্ট্রযন্ত্র কাজ করে সমষ্টিগত মানুষের জন্য। আর সমাজ বলে যাও বা একটা কিছু ছিল তা ক্রমে-অবলুপ্তির পথে। সুতরাং ব্যক্তি-মানুষের আশ্রয় এখন নিজস্ব পরিবার এবং নিজস্ব গণ্ডি। তার অস্বচ্ছ দৃষ্টি এবং জ্ঞানের অভাবে তাকে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা ও অসঙ্গতির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তার কথা শোনার কেউ নেই, তাকে তেমনভাবে ভালোবাসার কেউ নেই। এই অসহায় ব্যক্তি-মানুষটি নিজের সঙ্গে গোটা পৃথিবীর সম্পর্কসূত্রটি খুঁজে পায় না। এই ব্যক্তি হল ঠাকুরের লক্ষ্য। ঠাকুর সমষ্টিকে যত না ভেবেছেন তার চেয়ে বৈশিষ্ট্যমাফিক প্রতিটি ব্যক্তিকে নিয়ে ভেবেছেন অনেক বেশি। আর ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ তথা পৃথিবীর এবং গোটা জগৎ-জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের তুকটিও দিয়ে গেছেন আমাদের হাতে। ঠাকুর উপলব্ধি করেছেন মানুষকে তার কূপমণ্ডুক ও স্বার্থপর জীবন থেকে মুক্ত না করলে তাকে বৃহত্বে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

দশ

পিছনে রেখে গেছেন ঘটনাবহুল, বর্ণাঢ্য একাশি বছরের এক প্রবল আয়ুষ্কালের দুরন্ত স্মৃতি। ঠাকুরের এই আয়ুষ্কালকে আরও বহুকাল ধরে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হবে। তাঁর দর্শন নিয়ে হবে বহুল গবেষণা। ভাবী পৃথিবীতে ঠাকুরের দর্শন যখন গৃহিত ও ব্যাখ্যাত হবে তখন মানবসমাজের একটা আমূল পরিবর্তনও আমরা আশা করতে পারি। তার কারণ ঠাকুর যা দিয়েছেন তা ধরার মতো, বোঝার মতো অতিমস্তিষ্ক আমাদের কারোই নেই। এক প্রজন্মে ঠাকুরের গোটা জীবনদর্শনটা অন্বয়সহ বুঝে ওঠা বাস্তবিকই এক অতিশয় কঠিন কাজ।

ঠাকুরের জীবনদর্শনের যে অভিনবত্ব আমাদের হতচকিত করে দেয় তা হল সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে কোনও কিছু দেখা। এই যে অন্বয়বোধ এ প্রায় লোপাট হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। এ হচ্ছে স্পেশালাইজেশনের যুগ। ফলে আমরা যে-কোনও বিষয়কেই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আর এই করতে গিয়ে আমরা কোনও একটা বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের যোগসূত্র কোথায় তা আর ভেবেও দেখি না, জানতেও পারি না। ঠাকুরেরই একমাত্র একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাই তিনি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু দেখতেন না দেখতেন তার পশ্চাৎপট এবং অন্বয়সহ। রসায়ন নিয়ে কথা হচ্ছে কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে পদার্থবিদ্যাকেও আনতে হল। সহায়ক হিসেবে এসে গেল প্রাণীবিদ্যা, নৃতত্ব এবং আরও কত কী। দেখা গেল গোটা জিনিসটাই এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। এই সার্বিক দৃষ্টি ছিল ঠাকুরের মানুষের প্রতিও। কোনও মানুষই নিছক হঠাৎ জন্মায় না, বংশগতির ধারা অনুযায়ী। এক বিশেষ কালসীমায় সে পৃথিবীতে আসে এবং অবস্থান করে। তা ছাড়া আছে বিবিধ কর্ম ও অভিভূতি, যা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যা চালায়। ঠাকুর তাই একটি মানুষকে দেখছেন তার গোটা পশ্চাৎপটসহ।

ঠাকুরের কাছে গিয়ে যে ক-বার বসবার দুর্লভ সুযোগ হয়েছে ততবারই দেখেছি নিরন্তর জ্ঞানচর্চাই হচ্ছে। কত বিষয় নিয়ে যে আলোচনা হত তার হিসেব নেই। আবার আর্ত-আতুর সংকটাপন্ন রোগক্রান্তদেরও নিদান দিতে হত নিরন্তর, বোকা পাগল বায়ুগ্রস্ত মতলবাজদেরও অভাব ছিল না। তাঁর এই ধৈর্যশীল সহানুভূতি এবং প্রতি মানুষের প্রতিই তাঁর অখণ্ড মনোযোগ কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব বলে আমার জানা ছিল না। এটা সম্ভব হয় একমাত্র গভীর ও ব্যাপক ভালোবাসা থেকে।

ত্যাগবাদ, কৃচ্ছ্রসাধন, সন্ন্যাস ইত্যাদি তথাকথিত ধর্মীয় আচার-আচরণকে ঠাকুর তেমন মূল্য দেন না। যোগ মানে কোনও কিছুতে বা কোনও কারও প্রতি সক্রিয় অনুরাগ নিয়ে যুক্ত হওয়া। আর এই অনুরাগটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুরাগ থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জীবন ও চলনায় আসে জোয়ার। আর এই অনুরাগটিকে জাগ্রত করতে

হলে এবং নিরন্তর প্রবহমান রাখতে হলে যা করতে হয় তাই সাধনা। গুরু ভিন্ন যে অন্য কোনও পন্থা নেই, এটা সব শাস্ত্রের, সব ধর্মেরই মত। গুরুর ভিতর দিয়েই ঈশ্বর-সন্ধান করতে হয়। নরদেহে তিনিই নারায়ণ, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আবার সেই গুরু যদি হন সর্বজ্ঞ গুরু পুরুষোত্তম তাহলে তো কথাই নেই। ঠাকুরের কাছে যখনই গিয়ে বসেছি তখনই অভ্রান্ত অনুভব করেছি, আর সকলেই তাঁর কাছে নিষ্প্রভ। যৌবনকালে ঠাকুর কেমন হাঁটতেন তা আমি দেখিনি তবে অনেকে তো দেখেছেন। তাঁরাই বলেন তাঁর হাঁটা ছিল ভেসে ভেসে চলার মতো। আর হাঁটতেন অতি দ্রুত। সর্বদাই তাঁর চোখ থাকত সামান্য ঊর্ধ্বমুখী। তাঁর সাধন ভজন বা সিদ্ধিলাভের আলাদা কোনও প্রক্রিয়া ছিল না, খুব সহজ ভাবেই তিনি ভজমান ছিলেন অর্থাৎ নিরন্ত অচ্ছিন্ন নামময় এবং ভাবময়। ঠাকুরের এই লক্ষণগুলি নির্ভুলভাবে নির্দেশ করে তিনি আসলে কে এবং কী, কোমল কঠোরে সরলে জটিলে রসে বশে তিনি এক অনন্য মানুষ, তেমনি জ্ঞানে সর্বজ্ঞত্বে ক্ষমতায় পুরুষোত্তম।

অনেক চিন্তাভাবনা করেও রহস্যময় ব্যাপারটিকে আজও ঠিক বুঝতে পারি না। ঠাকুরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে সামান্যই। তাঁকে কখনও স্পর্শ করিনি, তাঁর তামাক সাজা বা অন্যান্য সব পরিচর্যার সুযোগও কখনও হয়নি। তিনি আমার লৌকিক অর্থে অনাত্মীয়, বয়সের ব্যবধান অনেক, তবু কী আশ্চর্য এক মোহ আমাদের অবিরল টানে তাঁর দিকে।

কথা বলা যায় তাঁর মূর্তি আর ছবি নিয়ে। ঠাকুরের এই সব মূর্তি বা ছবি পরবর্তী প্রজন্মের প্রধান অবলম্বন হবে, কেন না তারা তাঁকে চোখে দ্যাখেনি, তাঁর কথা শুনতে পায়নি এবং তাঁর ঐশী ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শেও আসেনি। ঠাকুর বহুবার বলেছেন নাম ও নামি অভিন্ন। ঠাকুর এই ভরসা ও আশ্বাস আমাদের দিয়েই রেখেছেন, যে ওই চার অক্ষরী বীজ-নামের মধ্যেই তিনি নিয়ত রয়েছেন। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মের যারা, অর্থাৎ যারা তাঁকে চাক্ষুষ করেনি তাদের কাছেও তিনি অপ্রকট নন। যারা ঠিকমতো নামধ্যান করে তাদের কাছে তিনি অদেখা থাকেন না।

কথাটর মধ্যে হয়তো একটু ইঙ্গিত রয়ে গেল। ঠাকুর তো মিরাকেল পছন্দ করতেন না। কিন্তু এটাও ঠিক যে নামধ্যান করলে এমন একটা তৃতীয় নয়ন খুলে যায় যার ভিতর দিয়ে অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শন ও অনুভূতি হতেই থাকে।

জগতে তিনি একটা রূপ ধরে আসেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর একটা রূপাতীত রূপও তো আছে। যারা তাঁকে চোখে দেখেছে তারা তাঁর লৌকিক রূপটি ধ্যান করতে করতে রূপাতীতের দিকে যেতে পারে। যারা দ্যাখেনি তারাও পারে। আসল হল এই নাম, তাঁর থেকেও কত প্রবলভাবেই না তাঁরা আছেন।

যিশুখ্রিস্ট নেই, হজরত মহম্মদ নেই, বুদ্ধদেব নেই, চৈতন্যদেব নেই, রামকৃষ্ণদেব নেই, অথচ না থেকেও কত প্রবলভাবেই না তাঁরা আছেন।

ঠাকুর তাঁর মানবলীলা সংবরণ করার পরই আমি কিছুদিন খুব অসহায় বোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, আমাকে সঙ্গ দেওয়ার, সাহায্য করার, সান্ত্বনা দেওয়ার আর কেউ রইল না। ভারি নিঃসঙ্গ লাগত, ভয় পেতাম। ঠাকুর চলে যাওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যেই একটি অদ্ভুত ঘটনার ভিতর দিয়ে ঠাকুর জানিয়ে দিলেন আমাকে, তিনি দেহাতীত হয়েছেন বটে, কিন্তু অনুপস্থিত নন। এই ঘটনার ফলে আমি নিশ্চিন্তির শ্বাস ছেড়েছিলাম। ঘটনাটির বিবরণ দেওয়াটা ঠিক হবে না, সব কিছু প্রকাশ করতে নেই বলেই।

ঠাকুর নিজেই পুণ্যপুথিতে বলেছেন, মরলেই তিনি চলে যান না। দেহে থেকেও তো তিনি দেহাতীত ছিলেন। নইলে ধ্যানে ধরা দিতেন কী করে ভক্তের কাছে? কী করে নির্জন বিজনে বিপন্ন ভক্তের কাছে পৌঁছে যেতেন?

ঠাকুরকে নিয়ে এক অলৌকিক কিংবদন্তীর ঘেরাটোপ আছে। তাঁর সম্পর্কে যেটা জনপ্রিয় প্রচার ছিল তা হল তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা। মানুষকে তিনি সম্মোহিত করেন, বশীভূত করেন এবং এমন সব অঘটন ঘটান যা বড় ভীতিজনক।

বোঝা যাচ্ছে, অপপ্রচার হলেও তার মধ্যে ঠাকুর সম্পর্কে ওই অলৌকিক ক্ষমতার কথা পাকে প্রকারে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কয়েকটি পত্র-পত্রিকাতেও ঠাকুর সম্পর্কে এই ধরনের কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

একটা কথা বলে রাখা ভালো, ঠাকুর কখনওই এই সব অলৌকিক ঘটনাবলিকে মূল্য দেননি। এই সব ঘটনার ওপর নির্ভর করে ঠাকুরের প্রচার বা প্রতিষ্ঠা অনুচিত।

এ কথা ঠিক যে প্রেরিত পুরুষেরা অলৌকিক ঘটনাবলিকে মূল্য না দিলে তাঁদের ক্ষমতায় কিছু স্বতঃস্ফূর্তি প্রকাশ ঘটতেই থাকে। যিশুখ্রিস্ট থেকে রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত কেউই সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতাকে গোপন করতে পারেননি। ঠাকুরের বেলাতেও একই কথা। কিন্তু তাঁর যে সব ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে সেটাকেই ধরে বসলে হবে না। ঠাকুরের গভীর জীবনদর্শনের অলৌকিকের স্থান নেই বললেই চলে।

তবে ঠাকুরের দেওয়া জীবনদর্শন এবং জীবনের চলনার নীতিবিধির মধ্যেই অঘটন ঘটনবীজ রয়ে গেছে। 'মূল্যহীনের সোনা করিবার পরশ পাথর হাতে আছে তাঁর'—একথাটা ঠাকুর সম্পর্কে খাটে শতকরা একশো ভাগ।

প্রার্থনা—আহ্বানী

(সমবেত প্রার্থনায় অগ্রণী কর্তৃক আহ্বান)

তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান পুরুষ
ইষ্টপ্রতীকে আবির্ভূত!
যদবিদাচরণে তদুপাসনাতেই ব্রতী হই,
জাগ্রত হও, আগমন কর,
আমরা যেন একেই অভিগমন করি,
একনিরন্তরতায় সেই তাঁকেই যেন জানিতে পারি, শ্রদ্ধানুসৃত আপূর্য্যমাণ ইষ্টৈকপ্রাণনায়,
একই মন্ত্রে, একই মননে সমষ্টি-উৎসারণায়,
বৈশিষ্ট্যপূরণী একচেতনাভিমন্ত্রণে
শিষ্ট হবিঃ ও শ্রেষ্ঠ হবনায়
সমান আকুতি ও সম্যক হৃদয়ে
জীবন-বর্দ্ধনে ঋদ্ধিমান হই।
স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!!

পুরুষোত্তম-প্রণাম

বন্দে লোকতিলকং সাত্বতবার্ত্তা-বিভূষণং
অমরকৃত্যুৎসারণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং
প্রণয়-প্রমত্ত-যাগদীপনং
বন্দে জীবন-জীবনং সৎপুরুষম।

(১) প্রাতঃকালীন বিনতি

রাধাস্বামী নাম। জো গাওয়ে সোঈ তরে।।
কল কলেশ সব নাশ। সুখ পাওয়ে সব দুখ হরে।।১।।
অ্যায়সা না অপার। কোঈ ভেদ না জানঈ।।
জো জানে সো পার। বহুরি ন জগ মে জনমঈ।।২।।
রাধাস্বামী গায় কর। জনম সুফল কর লে।।
ইয়হী নাম নিজ নাম হ্যায়। মন অপনে ধর লে।। ৩।।
ব্যয়ঠক স্বামী অদভুতী। রাধা নিরখ নিহার।।

অউর ন কোঈ লখ সকে। শোভা অগম অপার।। ৪ ।।

গুপ্ত রূপ জঁহ ধারিয়া। রাধাস্বামী নাম।।

বিনা মেহর নহি পাওঈ। জহাঁ কোঈ বিশ্রাম।। ৫।।

করুঁ বন্দগী রাধাস্বামী আগে। জিন পরতাপ জীও

বহু জাগে ।। ৬।।

বারম্বার করুঁ পরনাম। সদাগুরু পদ ধাম সতনাম।। ৭।।

আদি অনাদি জুগাদি অনাম। সন্ত স্বরূপ ছোড়

নিজ ধাম।। ৮।।

আয়ে ভওজল নাও লগাঈ। হম সে জীওন লিয়া চঢ়াঈ।। ৯।।

শব্দ দৃঢ়ায়া সুরত বতাঈ। অরব খরব দণ্ডৌত।। ১০।।

রাধাস্বামী মিল গয়ে। খুলা ভক্তি কা সোত।। ১১।।

ভক্তি সুনাঈ সব সে ন্যারী। বেদ কতেব ন

তাহি বিচারী।। ১২।।

সত্ত-পুরুষ চৌথে পদ বাসা। সন্তন কা ওহাঁ সদা

বিলাসা।। ১৩।।

সো ঘর দরসায়া গুরু পূরে। বীন বজে জহঁ

অচরজ তূরে।। ১৪।।

আগে অলখ পুরুষ দরবারা। দেখা জায় সুরত

সে সারা।। ১৫।।

তিস পর অগম লোক ইক ন্যারা। সন্ত সুরত কোই করত

বিহারা।। ১৬।।

তহাঁ সে দরসে অটল অটারী। অদ্ভুত রাধাস্বামী মহল

সঁওয়ারী।। ১৭।।

সুরত হুঈ অতি কর মগনানী। পুরুষ অনামী

জায় সমানী।। ১৮।।

বাংলা অনুবাদ

রাধাস্বামী নাম যে গান করে সেই তরিয়া যায়। শরীরের ক্লেশ সবই নাশ হয়, সুখ পায়, সমস্ত দুঃখ দূর হয়। এই অপার নামের রহস্য কেহ জানে না— যে জানে সে পার হয়, পুনরায় জগতে জন্মায় না। 'রাধাস্বামী' গান করিয়া জনম সফল করো। এই নাম আদি নাম নিজের ধরিয়া লও।

স্বামীর অদ্ভুত সিংহাসন রাধা পূর্ণভাবে নিরীক্ষণ করেন। অন্য কেহ এই অগম ও অপার শোভা দেখিতে পায় না। যেইখানে রাধাস্বামী নাম গুপ্তরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার দয়া ভিন্ন সেইখানে কেহ বিশ্রাম পায় না।

যাঁহার প্রতাপে বহু জীব জাগরিত হয়, সেই রাধাস্বামীর সামনে বন্দনা করিতেছে। সদগুরুর পাদপদ্মে, সত্যধাম ও সত্যনামে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। আদি, অনাদি ও অনামী সন্তস্বরূপ নিজ ধাম ছাড়িয়া আসিয়া ভবসাগরে নৌকা লাগাইয়াছেন ও আমার মতো জীবসকলকে তাহাতে চড়াইতেছেন এবং শব্দ বিশ্বাস করাইয়া ও সুরতের কথা শুনাইয়া ভ্রম-কর্ম হইতে রক্ষা করিতেছেন। কোটি কোটি বার বন্দনা করিতেছি, অসংখ্য বার দণ্ডবৎ জানাইতেছি—রাধাস্বামীকে পাইয়া ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে—এমন অনন্য ভক্তির কথা শুনাইয়াছেন। সত্যপুরুষের ধাম চতুর্থ পদে—যেইখানে আশ্চর্য শব্দে বীণাধ্বনি হইতেছে—সেইখানেই সন্তগণ সদা বিলাস করেন। পূর্ণগুরু সেই ঘর দেখাইয়াছেন। সম্মুখে অলখ পুরুষের দরবার, সুরত তত্ত্ববস্তু দেখিতে পায়। তারপর অগম পুরুষের দরবার—সেইখানে কোনও কোনও সন্তসুরত বিহার করেন—সেইখানে হইতে অবিনাশী 'রাধাস্বামী' মহল দেখিয়া তথায় প্রবেশ করে এবং সুরত অত্যন্ত মগ্ন হইয়া অনামি পুরুষে বিলীন হইয়া যায়।

(২) সন্ধ্যাকালীন বিনতি

বার বার করূঁ বিনতি। রাধাস্বামী আগে।।

দয়া করো দাতা মেরে। চিত চরন লাগে।। ১।।

জনম জনম রহী ভুল মেঁ। নহিঁ পায়া ভেদা।।

কাল করম কে জাল মেঁ। রহি ভোগত খেদা।। ২।।

জগত জীও ভরমত ফিরেঁ। নিত চারোঁ খানী।।

জ্ঞানী যোগী পিল রহে। সব মন কী ঘানী।। ৩।।

ভাগ জগা মেরা আদি কা। মিলে সদগুরু আঈ।।
রাধাস্বামী ধাম কা। মোহিঁ ভেদ জনাঈ।। ৪।।
উঁচা সে উঁচা দেশ হ্যায়। ওঅহ অধর ঠিকানী।।
বিনা সন্ত পাওয়ে নহী। শ্রুত শব্দ নিশানী।। ৫।।
রাধাস্বামী নাম কী। মোহি মহিমা সুনাঈ।।
বিরহ অনুরাগ জগায় কে। ঘর পঁহুচুঁ ভাঈ।। ৬।।
সাধ সঙ্গে কর সার রস। ম্যাঁয়নে পিয়া অঘাঈ।।
প্রেম লগা গুরু চরণ মেঁ। মন শান্ত ন আঈ।। ৭।।
তড়প উঠে বেকল রহুঁ। কৈসে পিয়া ঘর জাঈ।।
দরশন রস নিত নিত লহুঁ। গহে মন থির তাঈ।। ৮।।
সুরত চঢ়ে আকাশ মেঁ। করে শব্দ বিলাসা।।
ধাম ধাম নিরখত চলে। পাওয়ে নিজ ঘর বাসা।। ৯।।
ইয়হ আশা মেরে মন বসে। রহে চিত উদাসা।।
বিনয় সুনো কিরপা করো। দীজে চরণ নিবাসা।। ১০।।
তুম বিন কোই সমরথ নহী। য্যায়সে সে মাঁগু দানা।।
প্রেম ধার বরখা করো। খোলো অমৃত খানা।। ১১।।
দীন দয়াল দয়া করো। মেরে সমরথ স্বামী।।
শুকর করুঁ গাওত রহুঁ। নিত রাধাস্বামী।। ১২।।

বাংলা অনুবাদ

রাধাস্বামীর সম্মুখে বারবার বিনতি করি। হে দাতা! আমাকে দয়া করো—যেন চরণে চিত্ত লাগিয়া থাকে। জন্ম জন্ম ভুলের মধ্যে থাকিয়া তত্ব পাই নাই—কাল এবং কর্মের জালে পড়িয়া দুঃখ ভোগ করিতেছি। জগতের জীবসকল সদা চতুর্বিধ অবস্থায় (স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ) ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। জ্ঞানী ও যোগী সকলেই মনের ঘানিতে ঘোরে। আমার আদি ভাগ্য জাগরিত হইয়াছে—সদগুরু পাইয়াছি। রাধাস্বামী ধামের মর্ম আমাকে জানাইয়াছেন। সেই দেশ উচ্চ হইতে উচ্চ এবং ইহা সর্বোচ্চ স্থান। সন্ত ব্যতীত অন্য কেহ

সুরত শব্দের সন্ধান পায় না। রাধাস্বামী নামের মহিমা আমাকে শুনাইয়াছেন। বিরহ এবং অনুরাগ জাগাইয়া আমাকে ঘরে পৌঁছাইয়াছেন। সাধুসঙ্গ করিয়া আমি সার রস আকণ্ঠ পান করিয়াছি। গুরুর চরণে আমার প্রেম জাগিয়াছে—কিন্তু মন শান্ত হয় নাই। কী প্রকারে আমি প্রিয়তমের ঘরে যাইব, নিত্য তাঁহাকে দর্শন করিব এবং মন স্থির হইবে—এই চিন্তায় মন ব্যস্ত ও ব্যাকুল। সুরত আকাশে উঠিয়া শব্দের বিলাস ভোগ করে। ধামের পর ধাম দেখিতে দেখিতে নিজ ঘরে বাসা পায়। এই আশা আমার মনে যেন স্থান পায়, চিত্ত উদাস থাকে। আমার বিনতি শোনো, দয়া করিয়া চরণে স্থান দাও। তুমি ভিন্ন সমর্থ পুরুষ আর কেহ নাই—যাঁহারা কাছে থাকিয়া দান ভিক্ষা করিব। প্রেমের ধারা বর্ষণ করো, অমৃত ভাণ্ডার খুলিয়া দাও। হে দীন দয়াল সর্বশক্তিমান প্রভু। দয়া করো, কৃতজ্ঞতার সহিত নিত্য রাধাস্বামী নাম গান করি।

(৩) প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালীন বিনতি

বার বার কর জোড় কর। সবিনয় করুঁ পুকার।।
সাধ সঙ্গ মোহি দেও নিত। পরম গুরু দাতার।। ১।।
কৃপাসিন্ধু সমরথ পুরুষ। আদি অনাদি অপার।।
রাধাস্বামী পরম পিতু। ম্যঁয় তুম সদা অধার।। ২।।
বার বার বল জাউঁ। তনমন ওয়ারুঁ চরণ পর।।
ক্যা মুখ লে ম্যঁয় গাঁউ। মেহর করী জস কৃপা কর।। ৩।।
ধন্য ধন্য গুরু দেব। দয়া সিন্ধু পূরণ ধনী।।
নিত্য করুঁ তুম সেব। অচল ভক্তি মোহিঁ দেও প্রভু।। ৪।।
দীন অধীন অনাথ। হাথ গহা তুম আন কর।।
অব রাখো নিত সাথ। দীন দয়াল কৃপানিধি।। ৫।।
কাম ক্রোধ মদ লোভ। সব বিধি অবগুন হার ম্যঁয়।।
প্রভু রাখো মেরি লাজ। তুম দ্বারে অব ম্যঁয় পড়া।। ৬।।
রাধাস্বামী গুরু পরতকস। তুম দ্বারে এতী বিলম্ব কেঁও।। ৭।।
দয়া করো মেরে সাইয়াঁ। দেও প্রেমী দাত।।
দুখ সুখ কুছ ব্যাপে নহী। ছুটে সব উৎপাত।। ৮।।

বাংলা অনুবাদ

হাত জোড় করিয়া বিনয়ের সহিত বারংবার প্রার্থনা করিতেছি। হে পরম গুরু দাতা। আমাকে নিত্য সাধুসঙ্গ দাও। হে সর্বশক্তিমান কৃপাসিন্ধু পুরুষ। তুমিই আদি, অনাদি ও অপার। হে রাধাস্বামী পরমপিতা। তুমি সদাই আমার অবলম্বন। পুনঃ পুনঃ বলি—তোমার চরণে দেহমন অর্পণ করিতেছি। তুমি অনুগ্রহ করিয়া যে প্রকার আমাকে কৃপা করিতেছ—তাহা মুখে আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব। হে দয়াসিন্ধু পুর্ণধ্বনি গুরুদেব। তুমিই ধন্য প্রভু। আমি নিত্য তোমার সেবা করি, তুমি আমাকে অচলা ভক্তি দাও। আমি দীন, অধীন, অনাথ, তুমি আসিয়া আমার হাত ধরিয়াছ। হে দীনদয়াল কৃপানিধি। এখন তুমি আমাকে নিত্য সাথে রাখো। কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ ইত্যাদি সব রকম অবগুনে আমি বশীভূত। হে প্রভু! আমার লজ্জা রক্ষা করো, আমি তোমার দ্বারে পড়িয়া আছি। হে সর্বশক্তিমান গুরু রাধাস্বামী। তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। এখন প্রত্যক্ষভাবে দয়া করো। তোমার দ্বারে এত বিলম্ব কেন! হে আমার প্রভু! আমাকে দয়া ও প্রেম দান করো। সুখ-দুঃখ কিছুই যেন আমার নাগাল না পায়—সমস্ত উৎপাত ছুটিয়া যায়।

প্রার্থনা

হে পরমকারুণিক! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বানুসূযত ব্যাপ্ত প্রাক প্রথমবাক! সর্ব্বস্বর্গ সর্ব্বহৃদয় প্রানপরিমল অদ্বিতীয় ঈশ্বর! জীব জগৎরূপে প্রতিভাত! রক্ত-মাংস-সঙ্কুল উদ্ভাসিত—তুমিই তোমার তজ্জাত সন্তান! এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ, এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা-কিছু মলিনতা উৎসারিত অমৃত আশিসে জরা-মরণ-দুঃখ-দুরিত-বিপত্তি যা-কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে! এই আমি আমার আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম! আমি পবিত্র। আমি পবিত্র। আমি পবিত্র।

পুরুষোত্তম-বন্দনা

বন্দে পুরুষোত্তমম।

ত্বাং হীষ্টং হৃদয়োৎসবং শ্রীবিগ্রহম

বৈশিষ্ট্যপুরকং সমষ্ট্যৎসারকম

একাচারিণম!

সৃজনোৎসং ত্বামীশ্বরং প্রকটপরায়ণম
নিখিল-জগজ্জীবনবীচিস্পন্দিতম
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপকম পরমদৈবতম
নরং নারায়ণম!
মৎস্য-কূর্ম্ম-কোল-নৃসিংহ-বামন-শরীরম
রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-যীশু-মোহম্মদ-রূপায়িতম
চৈতন্য-রামকৃষ্ণানুকূলং পূর্ব্বতনীপূরণম
শাশ্বতং বর্ত্তমানম!
ব্যক্তি-দম্পতি-গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্রোদ্ধারণে
যাজন-যাজনেষ্টভৃতি-স্বাস্ত্যয়নী-প্রবর্ত্তকম
প্রাচ্যপ্রতীচ্য-নিয়ন্ত্রণে বর্ণাশ্রমানুশাসকম
আর্য্য-চিরায়ণম!
আর্য্যকৃষ্টিতূর্য্যধ্বনিত-পল্লীনিকেতনম
আর্য্যভূমিধূলিপাবনচিদানন্দকম
সকলশিল্পবিজ্ঞানুযুতং পূর্ণং পুরাণং
পরাৎপরকাম
ধর্ম্মগ্লানিত্রস্ত-ভূবনে বৃত্তির্ঘূর্ণনে
সকলবাদব্যামোহর সদ্ধর্ম্মস্থাপকম
আপূরয়ন্তমিষ্টমেকমদ্বিতীয়কম
যুগাদর্শমনুত্তমম!
প্রেমোচ্ছলনরবপুর্ধৃতং মম্মথমম্মথম
নবীনার্য্যতীর্থঙ্করং বিচিত্রলীলকম
বিশ্বমিলনহবন-নবীনবেদদায়িনম
বিনায়কভাস্করম!
রণতাণ্ডাবদ্রোহক্ষুব্ধে ক্লিষ্টে বিশ্লিষ্টে লোকে
অভ্যুত্থিত-ম্লেচ্ছাচারাপূরিত-দিঙমণ্ডলে

জীবনবৃদ্ধ্যসিলকং মিত্রামিত্রবল্লভম

কল্কিরূমুদগ্রম!

নমানি বিপ্লাবিনং প্রিয়ং পরমং কমমপি

করালম

পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তম!

বন্দে পুরুষোত্তমম!

প্রণাম

যিনি সব যাহা কিছুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়ার দেদীপ্যমান, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি! আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাঁহাকে জানিয়েছেন, তাঁহাকে আমার অশেষ নমস্কার। যে আচরণে তাঁহাকে জানা যায় সেই আচরণকে যিনি আচরণ দ্বারা জানাইয়া থাকেন—সেই আচার্য্যকে প্রণিপাত করেতেছি। যাঁহারা দ্রষ্টাপুরুষ, সেই ঋষিদিগকে নমস্কার করি। যিনি মানুষের জীবন ও বুদ্ধিকে সেবা ও সাহচর্য্যে উদ্দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয়ে দীপ্তমান—সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি। যাহা জানা গিয়াছে এবম্প্রকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্বশরীর ও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রণিপাত করিতেছি। আমি পরমকারুণিকপ্রসূত সর্বপ্রাণপোষণপ্রদ বায়ুকে প্রণাম করি। মৃত্যু—যিনি জীবের জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন—আমি তাঁহাকেও নমস্কার করিতেছি, যেন তাঁহা হইতেও অমৃত বহন করিতে পারি! যিনি সর্ব ও প্রত্যেকের ভিতর বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিষ্ণুকে আমি অশেষ প্রণিপাতে প্রণাম করিতেছি। আর যাহা কিছু সবের প্রতীক, আব্রহ্মসর্বদেবময়, আমারই উদ্ধাতা, আমার সদগুরুকে প্রলীন প্রণিপাতে বারবার প্রণাম করি।

যাহা কিছু জাত হইয়াছে—তৎসমুদয়ের জ্ঞানের কারণ যিনি, তাঁহার নিমিত্ত তদৈশ্বর্য্যে স্নাত হইতেছি। তিনি আমাদের অরাতিবুদ্ধিকে দহন করুন! সেই অগ্নি—সর্বপ্রকার দুরিত ও দুর্গতি হইতে নৌকা যেমন সিন্ধু পার করে, তেমনই করিয়া আমাদিগকে উত্তীর্ণ করুন। ঊর্দ্ধগতিশীল, অস্তি ও প্রগতিপন্ন, দেদীপ্যায়িত, বৃদ্ধি-পরম, কৃষ্ণপিঙ্গল, বিরূপাক্ষ, বিশ্বপ্রতীক হে পুরুষ! আমি তোমাকে নমস্কার করি!

সদগুরু-বন্দনা

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যেন কৃৎস্নং চরাচরম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ
চিদ্রুপেণ পরিব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
ন গুরুরধিকং তত্বং ন গুরুরধিকং তপঃ।
তত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
মন্নাথ শ্রীজগন্নাথো মদগুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈতম।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
ব্রহ্মানন্দং পরমসুকদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্বমস্যাদি লক্ষ্যম।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতম
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং ত্বাং নমামি।।

পঞ্চবর্হি

১। একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম।
২। পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধ ঋষয়ঃ শরণম।
৩। তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম।

৪। সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম।

৫। পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম।

এতদেবার্য্যয়ণম, এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ,
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম।

১। এক অদ্বিতীয়দের শরণ লইতেছি। ২। পূর্বাপূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি। ৩। তাঁহাদের পথ অনুসরণকারী পিতৃপুরুষগণের শরণ লইতেছি। ৪। অস্তিত্বের গুণপরিপোষক বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি। ৫। পূর্ব-পূরণকারী বর্তমানে পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি।

ইহাই আর্য্যপথ—ইহাই সদ্ধর্ম্ম,
আর ইহাই চিরন্তর শরণযোগ্য।

সপ্তার্চ্চি

১। নোপাস্যমন্যদ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম।

২। তথাগতাস্তদ্বার্ত্তিকা অভেদাঃ।

৩। তথাগতাগ্র্যো হি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্ট-বিশেষবিগ্রহঃ।

৪। তদনুকূলশাসনং হানুসর্ত্তব্যন্নেতরৎ।

৫। শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবাঃ শ্রদ্ধেয়া নাপোহ্যাঃ।

৬। সদাচারা বর্ণানশ্রমনুগজীববর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ।

৭। বিহিতসবর্ণানুলোমাচারাঃ পরমোৎকর্ষহেতবঃ, স্বভাবপরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারাঃ।

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহে, ব্রহ্ম এক—অদ্বিতীয়। ২। তথাগতগণ—তাঁহারা বার্ত্তা বহনকারী—অভিন্ন। ৩। তথাগকগণের অগ্রণী বর্তমানে পুরুষোত্তম, পূর্ব-পূর্ব-পূর্বগণের আপূরণকারী বিশেষ বিশিষ্ট নরবিগ্রহ। ৪। তাঁহারা অনুকূলশাসনই অনুসরণীয়—সেই ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ৫। শিষ্ট তত্ত্ববিৎ পিতৃপুরুষ ও পরলোকবাসী দেবগণ শ্রদ্ধেয়—অবহেলার যোগ্য নহে। ৬। বর্ণাশ্রম-অনুগামী সদাচার জীবনবর্দ্ধনীয়—নিত্যপালনীয়। ৭। বিহিত সবর্ণ ও অনুলোমক্রমিক আচারসমূহ পরম উৎকর্ষের কারণ—এবং প্রতিলোম-আচার স্বভাব-ধ্বংসকারী।

দণ্ড প্রণাম-মন্ত্র

প্রত্যহ দণ্ড ব্যবহারের পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণপূর্বক দণ্ড মস্তকে স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে—ধর্ম্মানুশাসন-পালকং শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসাদম শান্তি-স্বস্তি-শুভদায়কং জীবনবৃদ্ধিদং।

—শ্রীশ্রীঠাকুর যজন, যাজন ইষ্টভৃতি

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি—সৎসঙ্গী মাত্রেই অবশ্য পালনীয় নিত্য ব্রত। সদাচারসম্পন্ন হইয়া নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত ইষ্টের নামধ্যানপরায়ণ হইয়া চলা, অনুসন্ধিৎসু সেবা ও সাহচার্যের সহিত পারিপার্শ্বিকের ভিতর তাঁহার গুণাকুকীর্তন করা,—আর, ইষ্টভরণের মধ্য-দিয়া নিজের সর্বশক্তি ইষ্টে কেন্দ্রায়িত করিয়া সত্তাকে অটুট করিয়া তোলা—ইহাই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। কিন্তু সব কিছুরই মূলে থাকা চাই ইষ্টানুরাগ। অনুরক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেই মানুষ প্রকৃত মঙ্গলের অধিকারী হয়। প্রতিদিন প্রাতে সর্বকর্মারম্ভে শ্রদ্ধার সহিত 'ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। এই নিবেদিন অর্ঘ প্রতি ৩০ দিনে সদক্ষিণায় ও সংগঠনী ১২ পয়সাসহ ইষ্টসকাশে তাঁহারই নির্দেশমতো স্বহস্তে কিংবা স্বয়ং ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া দুইজন ইষ্টভ্রাতাকে নিজ হইতে দুইটি ভোজ্য প্রদান করতঃ পারিপার্শ্বিকের সেবার জন্য কিছু অর্থ সংরক্ষণ করিবে।

ইষ্টভৃতি-মন্ত্র

সংস্কৃত

জীবনং করুণাসিন্ধো! জগতত্বং জগৎপতে।

ভবতঃ কৃপয়া লব্ধং জীবনং সফলং মম।।

প্রাগেব সর্ব্বকার্য্যেভ্যস্তবৈব ভোগ-তৃপ্তয়ে।

ইষ্টভৃতিঃ কৃতাস্মাভিঃ কৃপয়া গৃহ্যতাং প্রভো।।

বাংলা

জীব-জগৎ-জীবন-কারণ করুণাময় স্বামী।
তোমার দয়ায় লভেছি জনম, সকলি
পেয়েছি আমি।
আজি এ প্রভাতে কর্মারম্ভে তোমারি
ভোগের লাগি'
ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য দিতেছি—শ্রীচরণে কৃপা মাগি।

ইষ্টভৃতি-ব্রতভঙ্গে

অন্তত একদিন হবিষ্যাশী হইয়া সম্পূর্ণ অনিবেদিত অর্ঘ্য অথবা অপারগপক্ষে যথাসম্ভব নিবেদন করিয়া পুনরায় ব্রত নিয়মিতভাবে পালন করিয়া যাইতে হইবে।

ইষ্টভৃতির নিবেদিত অর্ঘ্য অন্য কাজে ব্যয় করিলে বা হারাইয়া ফেলিলে নষ্ট কিংবা অপহৃত হইলে—অনুতাপের সহিত খ্যাপনসহ ভিক্ষা করিয়া নষ্ট বা অপহৃত অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া পরদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া তৎপরদিন ওই সংগৃহীত অর্থ মন্ত্র পাঠ করিয়া নিবেদনানন্তর রাখিয়া দিতে হইবে।

হবিষ্যে গ্রহণীয় দ্রব্য

হবিষ্যান্নে আতপ তণ্ডুল, সৈন্ধব লবণ, মুগ, মটর, তিল, যব, কাঁচকলা, আম, পাকাকলা, দুধ, ঘৃত, হরীতকী ও আমলকী—এইগুলি গ্রহণীয়। দিনে একবার পরিমিতভাবে হবিষ্যান্ন বিধিমতো গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা ছাড়া, নেহাত তৃষ্ণা বোধ করিলে অপারগপক্ষে জল গ্রহণ করিতে পারা যায়।

স্বস্ত্যয়নী-ব্রত

নিজের ও পরিবারের ইষ্টমুখী উন্নত চলনাকে চলৎশীল রাখার জন্য স্বস্ত্যয়নী-ব্রত প্রত্যেকেরই অবশ্য গ্রহণীয়।

স্বস্ত্যয়নী-মন্ত্র

শ্রীবিগ্রহস্ত্বং পুরুষোত্তমো মে বন্দে ত্বাং
সদনুকূলচন্দ্রম।
ত্বং হীষ্টস্ত্বমে পূজ্যঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ তে
নিযুনক্তু বৃত্তিঃ।।
তবানুকূলং যদি সত্য কামং মুহূতঃ কৃপয়া
কুরু কর্ম্মনিষ্ঠম।
সন্ধিৎসয়া সেবয়া যাজনেন
সর্ব্বাংস্তএবানুরঞ্জয়ানি।।
রোগ-শোক-গ্রহদোষ-বুদ্ধিবিপর্য্যয়াচ্চ মে।
দারিদ্র্যাদি-সর্ব্বদৈন্যাৎ মুঞ্চ মে ত্বয়ি নিষ্ঠয়া।
শান্তিং স্বস্তিং শুভং দেহি
দেহি কর্ম্ম সুকৌশলম।
দেহি মে জীবন-বৃদ্ধি নিয়তং স্মৃতিচিদযুতে।।

বাংলা অনুবাদ

শ্রীবিগ্রহ তুমি, তুমিই পুরুষোত্তম, আমার অস্তিবৃদ্ধির অনুকূল দীপ্তি, তোমাকে বন্দনা করি। তুমিই ইষ্ট, তুমিই পূজ্য, আমার সকল বৃত্তি তোমারই প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হউক। সত্যকাম, তবানুকূল আমাকে কৃপা করিয়া ত্বৎকর্ম্মনিষ্ঠ কর। সন্ধিৎসায়, সেবায় ও যাজনে যেন সকলকে ইষ্টে অনুরঞ্জিত করি ও করিতে পারি। তোমার প্রতি নিষ্ঠা যেন আমাকে রোগ-শোক-গ্রহদোষ বুদ্ধিবিপর্যয় ও দারিদ্র্যাদি সর্বদৈন্য হইতে মুক্ত করিয়া তোলে। আমাকে শান্তি দাও, স্বস্তি দাও, শুভ ও সুকর্মের কৌশল দাও—আর দাও আমাকে নিরন্তর চেতনাবাহী স্মৃতিযুক্ত জীবন ও বৃদ্ধি।

স্বস্ত্যয়নী-ব্রতভঙ্গে

তিনদিন অহোরাত্র উপবাস থাকিয়া—অপারগপক্ষে তিনদিন একবেলা পরিমিত হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ অনিবেদিত অর্ঘ্য মন্ত্র পাঠানন্তর একসঙ্গে নিবেদন করিতে হইবে অথবা অপারগপক্ষে উপবাসান্তে নিত্যব্রতার্ঘ্যসহ যথাসাধ্য প্রত্যহ পৃথকভাবে উল্লেখ ও নিবেদন করিয়া ওই অনিবেদিত অর্ঘ্য পূরণ করিয়া রাখিতে হইবে। উপবাসের তিনদিনও নিত্য অর্ঘ্য রাখিতে হইবে।

স্বেচ্ছায় স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের নিবেদিত অর্ঘ্য অন্য কাজে ব্যয় করিলে—শিশু-প্রাজাপত্য ব্রত শেষ করিয়া পঞ্চম দিনে মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্যয়িত অর্ঘ্য পুনঃ নিবেদন করিয়া স্বস্ত্যয়নী-ব্রত আরম্ভ করিতে হইবে।

অজ্ঞাতে স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের নিবেদিত অর্ঘ্য হারাইয়া ফেলিলে, নষ্ট বা অপহৃত হইলে—অনুতাপের সহিত খ্যাপনসহ ভিক্ষা করিয়া নষ্ট বা অপহৃত অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরদিন প্রাতে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া সারাদিন উপবাসী থাকিয়া তৎপরদিন ওই সংগৃহীত অর্থ অর্ঘ্যমন্ত্র পাঠ করিয়া নিবেদনান্তর রাখিয়া দিতে হইবে।

স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের অর্ঘ্য যথাবিধি যথাসময়ে প্রেরণ না করিলে—একদিন পূর্বাহ্নে হবিষ্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তানন্তর ওই অর্ঘ ইষ্টস্থানে প্রেরণ করিতে হইবে।

প্রায়শ্চিত্তের সময় নিত্যকরণীয় স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের অর্ঘ্যাদি নিবেদন ঠিকমতো চলিতে থাকিবে।

অশৌচাবস্থায় ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নীর অর্ঘ্য অপর সৎসঙ্গী দ্বারা নিবেদন করা বিধি—অভাবে অশৌচান্তে প্রতিদিনের অর্ঘ্য একত্রি করিয়া নিবেদন করিবে।

ঋত্বিকী

প্রতিমাসের ইষ্টভৃতির সাঙ্গে নিজের দীক্ষাদাতা ঋত্বিকের পোষণ ও তুষ্টির জন্য অন্তত নিজের একদিনের আহার্য-উপযোগী ঋত্বিকী-অবদান ইষ্টকাশে প্রেরণ করা কর্তব্য। ইহা যেন ইষ্টভৃতি অপেক্ষা বেশি না হয়।

শিশু প্রাজ্যপত্য-ব্রত্য

শিশু প্রাজ্যপত্যের নিয়মে পরপর বারো দিন অথবা প্রথম ৩ দিন পূর্বাহ্নে হবিষ্যান্ন, দ্বিতীয় ৩ দিন অপরাহ্নে হবিষ্যান্ন, তৃতীয় ৩ দিন অযাচিত হবিষ্যান্ন, চতুর্থ ৩ দিন নিরম্বু উপবাস থাকিয়া ত্রয়োদশ দিন প্রাতে যথাসাথ্য ইষ্টপ্রণামী নিবেদন করিয়া ব্রত উদযাপন করিতে হইবে।

ব্রতকালে নিতান্ত অশক্ত হইলে জল, ফলমূলাদিও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সংযামী ও ইষ্টনিষ্ঠ থাকিয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ভূমিতে কম্বলে শয়ন, নগ্নপদে ভ্রমণ, ক্ষৌরকর্ম না করা এবং মাতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোক ও পতিতের সঙ্গে বাক্যলাপ না করাই বিধি।

কৃচ্ছ্র-সান্তপন বা মহাসান্তপন-ব্রত

জাতিভ্রংশকর কর্ম করিলে ইষ্টসকাশে উপস্থিত হইয়া সপ্ত দিবসব্যাপী ব্রত পালন করিয়া আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে।

খ্যাপন অর্থাৎ 'আমি পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া মহাসান্তপন ব্রত করিতেছি'—অনুতপ্ত হৃদয়ে পাপের ব্যাপারগুলিকে স্ত্রী এবং জিজ্ঞাসাকারী শ্রদ্ধান্বিত যাহারা, তাহাদের নিকট বলা, শ্রদ্ধা ও অর্থবোধের সহিত নামজপ অথবা সাবিত্রীজপ ও অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ ও আবৃত্তি করা, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, কম্বল পাতিয়া শয়ন, নগ্নপদে ভ্রমণ, ক্ষৌরকার্য না করা এবং নারী, শূদ্র ও পতিতের (অর্থাৎ ইষ্টনিষ্ঠাহীন ম্লেচ্ছের) সহিত বাক্যলাপ না করা—এই নিয়ম পালন করতঃ শ্রদ্ধাময় সত্যকাম হইয়া অপ্রয়োজনীয় বিক্ষেপী বাক্যলাপ সম্পূর্ণ বর্জন করিবে।

(১) প্রথমদিন ভোরে একবার এবং পরে বারেবারে কয়েকবার ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রয়োজন মাফিক গো-মূত্র পান করিয়া সারাদিন উপবাসী থাকিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয় দিন অল্প-অল্প করিয়া কয়েকবার ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন-মাফিক টাটকা গোময় সেব করিয়া উপবাসী থাকিতে হইবে।

(৩) তৃতীয় দিন গো-দুগ্ধের সহিত সমপরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া এক বলকা হইলে অল্প গরম থাকিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন-মাফিক এক ছটাক আন্দাজ প্রতিবারে সেবন করিতে হইবে।

(৫) পঞ্চম দিনে গো-ঘৃত বারে-বারে ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রয়োজন-মাফিক ঈষৎ উষ্ণ করিয়া চা-চামচের এক চামচ আন্দাজ পান করিবে।

(৬) ষষ্ঠ দিনে সদ্য কুশ পূর্বদিন রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া বারেবারে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন-মাফিক প্রতিবারে এক ছটাক আন্দাজ পান করিতে হইবে।

(৭) সপ্তম দিনে উপবাসী থাকিতে হয়—অশক্তপক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক দিনই শুধু জল অল্প করিয়া পান করা যাইতে পারে।

ব্রত শেষে যথাবিধি গুরু-প্রণামী দিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজ্য প্রদান করতঃ প্রাতে কাঁচা মুগ ভিজান, একটু মাখন ও ইক্ষু-গুড় উত্তম-রূপে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিতে হইবে এবং তাহার ঘণ্টা দুই-তিন পরে পাতলা মিশ্রীর শরবত খাইয়া কিছুকাল পরে মধ্যাহ্নে খুব অল্প

পরিমাণে যাহাতে পেটের কোনওরূপ উপদ্রব সৃষ্টি না করে, এমনতর সহজকাপাচ্য আহার্য গ্রহণ করিতে হইবে। রাত্রে বা বৈকালে সহজে পরিপাক হয় এমনতর কিছু—যেমন দুধ-সাগু আহার করাই শ্রেয়। পরদিনও সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর আহার্য অল্প পরিমাণে যথাসময়ে গ্রহণ করাই উচিত। এইরূপ ক্রমশ স্বাভাবিক আহার্য গ্রহণের উপযোগী হইতে হইবে।

গল্প

বানভাসি

পর. দিন দুপুরে ভাত জুটেছিল। আর আজ এই রাতে। হিসেবে দুদিন দাঁড়ায়। তবে খিদেটিদে উবে গিয়েছিল জলের তোড়ে তল্লাট ভেসে যেতে দেখে। পরশু থেকে আজ অবধি কাশীনাথ তার নৌকোয় কতবার যে কত জায়গায় খেপ মেরে লোক তুলে এনেছে তার লেখাজোখা নেই। রায়চক উঁচু ডাঙা জমি, এইরকম দু-একটা জায়গা ডোবেনি। এখন সেইসব জায়গায় রাসমেলার ভিড়। খোলা মাঠেই বৃষ্টির মধ্যে বসে আছে মানুষ। কেউ কেউ মাথার ওপর কাপড়-টাপড় টাঙিয়ে মাথা বাঁচানোর একটা মিথ্যে চেষ্টা করছে। কেউ বাচ্চাটাচ্চার মাথায় ছাতা ধরে আছে সারাক্ষণ। তাতে লাভ হচ্ছে না। ভিজছে, সব ভিজে সেঁধিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। এরপর মরবে।

রিলিফ এলে অন্য কথা। কিন্তু তাই বা আসবে কোন পথে। রেল বন্ধ, সড়ক বন্ধ, চারদিকে অথই জল।

কুলতলি থেকে একটা পরিবারকে তুলে এনে রায়চকে নামিয়ে ভাঙড়ে যাচ্ছিল আরও কিছু লোককে তুলে আনতে। শরীর নেতিয়ে পড়ছে, হাত চলতে চাইছে না, কেমন যেন অবছা দেখছে সে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম। কাশীনাথ বুঝতে পারছিল আর বেশিক্ষণ নয়। দুদিন পেটে দানাপানি নেই। জুটবেই বা কোথা থেকে। কাল দুপুরে এক বুড়ি তাকে দু-গাল চালভাজা খাইয়েছিল। আর রায়চকের বাজারে টিউবওয়েল থেকে পেট পুরে জল। সেই কয়লাটুকুতেই শরীরে ইঞ্জিন চলছিল এতক্ষণ। আর নয়। কিন্তু নেতিয়ে পড়লেও চলবে না। বড় ড্যামের জল ছেড়েছে, তার স্রোতে নৌকো না সামলালে উলটে যাবে। নয়তো কোন আঘাটায় গিয়ে পাথরে বা গাছে ধাক্কা মেরে নৌকো টুকরো টুকরো যায় যাবে। এই নৌকো এখন মানুষের জীবনতরী। ডুবলে চলে?

ঘুমও আসছিল তার। আর বারবার ঢুলে পড়ছিল। বইঠা বা লগির ওপর হাত থেমে থাকছে বারবার ফের চমকে জেগে উঠছে। নয়াবাঁধের কাছে নৌকোটা একটু ভিড়িয়ে কয়েক মিনিটের জন্য চোখ বুজে ঘুমের আলস্যিটা ছাড়াতে গিয়েছিল সে। যখন চোখ মেলল তখন রাত হয়ে গেছে। গোলাগুলির মতো বৃষ্টির ফোঁটা ছুটে আসছে আকাশ থেকে। ঝলসাচ্ছে মারুনে বিদ্যুৎ।

জামাটা খুলে নিংড়ে নিল কাশীনাথ। ভাঙড়ে এই দুর্যোগে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। নৌকো ডুববে। সে কোমরজলে নেমে নৌকোর বাঁধনটা অন্ধকারেই একটু দেখে নিল। বটগাছের শেকড় শক্ত জিনিস। পাটের মোটা কাছিও মজবুত। নৌকো আর যাবে না।

তবে নৌকোর খোলে জল উঠেছে অনেক। ফের নৌকো ভাসাতে হলে জল ছেঁচতে হবে। আপাতত জলেই ডুবে থাক। ভাসন্ত বানে নৌকোর ওপর মানুষের খুব লোভ। জলে ডুবে থাকলে--আর যাই হোক চুরি যাবে না।

বৃষ্টিকে ভয় খেয়ে লাভ নেই। জলে তার সর্বাঙ্গ ভিজে সাদা হয়ে আছে। সে নেমে পাড়ে উঠল। নয়াবাঁধ চেনা জায়গা। দু-পা এগোলেই হাটের অন্ধকার কয়েকটা চালাঘর। সেখানে অ্যান্ডিগেন্ডি নিয়ে বানভাসি মানুষের ভিড়। তারপর বসতি, চেনাজানা কেউ নেই এখানে। তার দরকারও নেই। সে বটতলা থেকে আর এগোল না। একটা মোটা শিকড়ের ওপর বসে পড়ল। ঘুম নয়, একটু ঝিমুনি কাটানো দরকার।

ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মুখের উপর জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল, কে রে? কে ওখানে?

চমকে সোজা হল কাশীনাথ। সামনে ছাতা মাথায় কয়েকজন লোক। অন্ধকারে ভালো ঠাহর হল না, তবু আন্দাজে বুঝল, এলেবেলে লোক নয়।

কাশীনাথ কী বলবে ভেবে পেল না। সে কাশীনাথ, কিন্তু এর বেশি তো আর কিছু নয়!

তা সেটা তো আর দেওয়ার মতো কোনও পরিচয়ও নয় তার।

কাশীনাথ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম আজ্ঞে। চোর ছ্যাঁচড় নই, নৌকো বাই।

মাছ ধরো?

আগে ধরতুম। এখন হাটেবাজারে মাল নিয়ে যাই।

কে একজন চাপা গলায় বলল, ওলাইচণ্ডীর কাশীনাথ।

সামনের লোকটা বলল, ও, এই কাশীনাথ!

কাশীনাথ খুব অবাক হল। এরা তাকে চেনে! কী করে চেনে? তাকে চেনার কথাই তো নয়।

তোমার নৌকো কোথায়?

বটগাছে বেঁধে রেখেছি। শরীরে আর দিচ্ছিল না বলে একটু ডাঙায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম বাবু। দোষ হয়ে থাকলে মাপ করে দেবেন। না হয় চলেই যাচ্ছি।

আরে না না, দোষের হবে কেন? তবে এটা কি আর জিরোনো জায়গা? তুমি তো মেলা লোকের প্রাণ রক্ষে করেছ হে বাপু।

করেছে নাকি কাশীনাথ? প্রাণরক্ষে করা কি সোজা কথা? প্রাণ বাঁচানোর মালিক ভগবান। সে কিছু লোককে বানভাসি এলাকা থেকে তুলে এনে ডাঙা জমিতে পৌঁছে দিয়েছে মাত্র। তারা যে কিভাবে এরপর বেঁচে থাকবে তা সে জানে না। কাশীনাথ চর্টের আলোর দিকে চেয়ে বলল, ভাঙড়ের দিকে যাচ্ছিলাম বাবু, তা শরীরে বড্ড মাতলা ভাব। তাই--

বুঝেছি। বলি দানাপানি কিছু পেটে পড়েছে?

ওসব তো ভুলেই গেছি। কারই বা দানাপানি জুটছে বলুন। সব দাঁতে কুটো চেপে শুধু ডাঙা খুঁজছে।

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই বটে হে। লোকের দুর্দশা দেখলে আঁত শুকিয়ে যায়। নয়াবাঁধে তবু আমরা কিছু চিঁড়ে-গুড় আর খিচুড়ির ব্যবস্থা করেছি। দিন দুই হয়তো পারা যাবে। রিলিফ না এলে তারপর কী যে হবে কে জানে।

কাশীনাথের পায়ে অন্তত গোটা সাতেক জোঁক লেগেছে। সে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সেগুলিকে উপড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, সে আর ভেবে কী হবে! কিছু তো মরবেই।

তা বাপু, বলি কি, তোমার পরিবার-পরিজন সব কোথায়?

কেউ নেই বাবু। আমি একাবোকা মানুষ।

ঘরদোর?

ওলাইচণ্ডীতে আছে একখানা কুঁড়ে। তা সেটাও বন্যার তোড়ে ফি-বছর ভেসে যায়। এবারেও গেছে। এখন নৌকোই ঘরবাড়ি বাবু।

লোকটা একটু হাসল। বলল, আমাকে চেনো? আমি হলাম নয়াবাঁধের সাধুচরণ মণ্ডল।

কাশীনাথ তটস্থ হয়ে বলল, বাপ রে! আপনি তো মস্ত মানুষ বাবু।

হেঁ হেঁ। নামটা শোনা আছে তা হলে।

খুব খুব। তল্লাটের কে না চেনে বলুন।

আমি একটু মুশকিলে পড়েছি যে কাশীনাথ। তোমাকে যে পেলুম তা যেন ভগবানের আশীর্বাদে। বলছিলুম কি, মংলাবাজার চেনো?

খুব চিনি। নিত্যি যাতায়াত।

সেইখানে। কয়েকজনকে পৌঁছে দিতে হবে। নয়াবাঁধে এসে আটকে পড়েছে।

এই সাংঘাতিক স্রোতে নৌকো ছাড়তে রাজি হচ্ছে না মাল্লারা।

তা স্রোত আছে বটে! তোমার মতো একজন ডাকাবুকো লোকই খুঁজছিলাম আমি। যদি পৌঁছে দিতে পারো তবে ভালো বকশিশ পাবে।

বকশিশের কথায় কাশীনাথ হেসে ফেলল। হাতজোড় করে বলল, এ তো ভগবানের কাজ বাবু। বকশিশ কীসের? ও সব লাগবে না।

বলো কী? পয়সা হল লক্ষ্মী। তাকে ফেরাতে আছে?

অতশত জানি না বাবু। তবে এ সময়টায় পয়সার ধান্ধা করতে মন সরছে না।

মানুষের যা দুর্দশা দেখছি। আমি পৌঁছে দেবখন।

তা হলে এসো, আমার বাড়িতে চাট্টি ডালভাত খেয়ে নাও। শরীরের যা অবস্থা দেখছি, না খেলে পেরে উঠবে না।

ঠিক আছে, চলুন।

সাধুচরণের বাড়িখানা বিশাল। প্রকাণ্ড উঠোনের তিনদিক ঘিরে দোতলা বাড়ি। পাঁচ-সাতখানা হ্যাজাক জ্বলছে। উঠোনে ত্রিপলের নীচে বড় বড় কাঠের উনুনে মস্ত লোহার কড়াইতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। চারদিকে মেলা লোকলস্কর, মেলাই চ্যাঁচামেচি। বৃষ্টির মধ্যেই বাঁশে ঝুলিয়ে খিচুড়ির বালতি নিয়ে লোক যাচ্ছে পিছনের উঠোনে বানভাসিদের খাওয়াতে।

সাধুচরণ তাকে নিয়ে ঘরে বসাল। বলল, গা মুছে নাও। বড্ড ধকল গেছে তোমার হে। শুকনো কাপড় পরবে একখানা?

কাশীনাথ হাসল, তাতে লাভ কী? আমাকে তো ঝড়ে-জলে বেরোতেই হবে।

তাই তো।

দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই শালপাতা আর গরম ভাতের হাঁড়ি চলে এল।

সাধুচরণ বলল, তোমাকে ওই লঙ্গরের খিচুড়ি খাওয়াচ্ছি না বাপু।

কাশীনাথ তার খাতির দেখে একটু অবাকই হচ্ছে।

পেটে রাক্ষুসে খিদে ছিল, কিন্তু ভাতের গ্রাস মুখ পর্যন্ত পৌঁছতেই কেমন গা গুলিয়ে উঠল তার। মনে হল, এই খাওয়ানোটার ভিতরে একটা অহংকার আছে।

খাও খাও, পেট পুরে খাও হে।

ডাল ভাত ঘ্যাঁট এবং পুঁটি মাছের ঝোল--আয়োজন খারাপ নয়। কিন্তু কাশীনাথ পেট পুরে খেতে পারল কই? কত মানুষের উপোসি মুখ মনে পড়ল। কত বাচ্চার খিদের চেঁচানি। ঘটির জলটা খেয়ে সে উঠে পড়ল। পাতে অর্ধভুক্ত ভাত-মাছ পড়ে রইল। পাতাটা মুড়ে নিয়ে সে বেরিয়ে এসে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘটির জলে আঁচিয়ে নিল।

সাধুচরণ কোথায় গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, এই অন্ধকারে তো আর মংলাবাজার যেতে পারো না। বারান্দার কোণে চট পেতে দিতে বলেছি। শুয়ে ঘুমোও। কাল সক্কালবেলা বেরিয়ে পড়ো।

এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর হয় না। সে বলল, যে আজ্ঞে।

তারপর চটের বিছানায় হাতে মাথা রেখে মড়ার মতো ঘুম।

কাকভোরে ঘুম ভাঙল। বাড়ি নিঝুম। এখনও আলো ফোটেনি। সে বসে আড়মোড়া ভাঙল। গা-গতরে ব্যথা হয়ে আছে। তবে কালকের চেয়ে অনেক তাজা লাগছে। অনেক জ্যান্ত। সে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল। কিশোরী মেয়ে, পরনে একখানা হাঁটুঝুল ফ্রক। আবছা আলোয় যতদূর দেখা গেল, মেয়েটি রোগাটে।

তুমিই আমাকে মংলাবাজরে নিয়ে যাবে?

তা তো জানি না। সাধুচরণবাবু বললেন, কাদের যেন পৌঁছে দিতে হবে।

আমাকে আর পিসিকে।

তা হবে।

পিসি পৌঁছোবে। কিন্তু আমি জলে ঝাঁপ দেবো। আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

কাশীনাথ হাঁ করে মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, জলে ঝাঁপ দেবে! কেন?

মরব বলে।

মরারই বা এত তাড়াহুড়ো কীসের?

সব কথা বলার সময় নেই। তবে এটুকু জেনো, আমি জ্যান্ত অবস্থায় মংলাবাজারে যাব না। সারারাত জেগে বসে ওই জানালা দিয়ে তোমাকে লক্ষ করেছি, কখন ঘুম ভাঙে।

তুমি কি সাধুচরণবাবুর কেউ হও?

আমি ওঁর ছোট মেয়ে বিলাসী।

বটে! তাহলে তোমার দুঃখ কীসের? মরতে চাইছ কেন?

সে অনেক কথা। কাল রাতে নয়নের সঙ্গে আমার পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু বন্যা হয়ে সব ভেস্তে গেল। বাবা টের পেয়ে আমাকে মংলাবাজারে মামাবাড়িতে পাচার করতে চাইছে। বিয়েও ঠিক করে ফেলেছে।

এ তো সাঙঘাতিক ঘটনা।

তাই বলে রাখছি তোমাকে, আমি কিন্তু মরব। তুমি কিন্তু দায়ী হবে।

আমাকে কী করতে বলছ?

বললে শুনবে?

বলেই দ্যাখো না।

গোবিন্দপুর চেনো?

কেন চিনব না?

আমাকে সেখানে পৌঁছে দাও।

সেখানে কী আছে?

ওটাই নয়নের গাঁ। কাছেই। বন্যা না হলে আধঘণ্টা হাঁটলেই পৌঁছোনো যেত।

কাশীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, গোবিন্দপুরের অবস্থা কী তা জানি না।

যদি ডুবে গিয়ে থাকে তা হলে তোমার নয়ন কি আর সেখানে বসে আছে?

তবু আমাকে যেতে হবে। এ বাড়ি থেকে না পালালে আমি বাঁচব না।

তারপর আমার কী হবে জানো? সাধুচরণবাবু আমাকে আস্ত রাখবেন কি? মস্ত সার্জেন, চারদিকে নামডাক। লোকলস্কর থানা-পুলিশ সব তাঁর হাতে।

আমার হাতে এই সোনার বালাটা দেখছ। তিন ভরি। আমার দিদিমা দিয়েছিল। এটা তোমাকে দিচ্ছি।

পাগল! ও সব আমার দরকার নেই।

মা শীতলার দিব্যি তোমায় যদি না নিয়ে যাও।

উঃ, কী মুশকিল!

শুনেছি তুমি নাকি খুব সাহসী লোক। অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছ। আমাকে বাঁচাতে পারবে না? এমনকী শক্ত কাজ?

তুমি নয়নের কথা ভেবে দুনিয়া ভুলে বসে আছ। আমার তো তা নয়। আমাকে যে আগুপিছু ভাবতে হয় গো!

হঠাৎ মেয়েটা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করল।

কী মুশকিল!

পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চলো। আমার যে বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।

দেখ বিলাসী, যদি ধরো তোমাকে গোবিন্দপুর নিয়েই যাই, তা না হয় গেলুম। কিন্তু যদি নয়নকে খুঁজে পাওয়া না যায় তখন তোমাকে ঘাড়ে করে আমি কোথায় কোথায় ঘুরবো?

ঘুরতে হবে না। যে-কোনও ঘাটে নামিয়ে দিও। আমি ভিক্ষে করে হোক, দাসীগিরি করে হোক, চালিয়ে নেব। বন্যার জল নামলে ঠিক নয়ন এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

আর ইদিকে আমার হাতে হাতকড়া?

তোমার কিছু হবে না, দেখো। মা শীতলা তোমার ভালো করবেন।

ভগবান তখনই ভালো করে যখন আমরা ভালো করি। বুঝলে!

তোমার পায়ে পড়ি।

বড্ড মুশকিলে ফেললে।

নইলে যে আমি মরব।

কাশীনাথ মৃদু স্বরে বলে, সে তোমার কপালে লেখাই আছে।

চলো না। লোকজন উঠে পড়লে যে আর হবে না।

ঠিক আছে। চলো। রাবণে মারলেও মারবে, রামে মারলেও মারবে।

ভোর-ভোর নৌকো ছাড়ল কাশীনাথ।

মেয়েটা উলটো দিকে বসা। তাকে বইঠা ধরিয়ে লগি দিয়ে অগভীর জলে নৌকো ঠেলে নিচ্ছে। একটু তাড়াহুড়োই করতে হচ্ছে। লোকজন টের পেলে তাড়া করবে। কাশীনাথের ঘাম হচ্ছে খুব।

ডাঙাপথে গোবিন্দপুর যতটা দূর, জলপথে তত নয়। সাঁ করেই চলে এল তারা। সুপারি, নারকেল গাছ, কয়েকটা দালানের উপর দিকটা ছাড়া গোবিন্দপুর গাঁ নিশ্চিহ্ন।

দেখলে তো, কী বলেছিলাম!

মেয়েটা তার পুঁটুলি কোলে নিয়ে হাঁ করে দৃশ্যটা দেখছে। দুচোখে জলের ধারা।

এবার কী করবে বলো!

মেয়েটা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

কিশোরী মুখখানি এখন ভোরের আলোয় পদ্মফুলের মতো সুন্দর দেখাল।

কান্নায় ভরাট গলায় বলল, কোথাও নামিয়ে দাও আমায়, যেখানে খুশি।

কাশীনাথ একটু ভেবে বলল, শোনো মেয়ে, নামিয়ে দিলে তোমার বিপদ হবে।

তার চেয়ে চলো, আমি ভাঙড়ে যাচ্ছি কিছু লোককে তুলে আনতে। তাদের পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা মরে যাবে। তারপর তোমাকে সাঁঝের পর বরং নয়াবাঁধেই নামিয়ে দেব। বাড়ি চলে যেও।

বাবা আমাকে মেরেই ফেলবে।

দু-চার ঘা মারবে হয়তো। কিন্তু আবার ভালোও বাসবে। বাড়ি হল আশ্রয়।

আমাকে দেখ না, আমি এক লক্ষ্মীছাড়া। ভাববার কেউ নেই।

মেয়েটা গুম হয়ে বসে রইল।

কাশীনাথ ভাঙড়ে গেল। বানভাসি লোক তুলল। তাদের পৌঁছে দিল ডাঙাজমিতে। রায়চকে আজ রিলিফের খিচুড়ি দিচ্ছিল। বিলাসীকে নিয়ে নেমে পড়ল কাশীনাথ। বলল, চাট্টি খেয়ে নাও। আর জুটবে কি না কে জানে!

মেয়েটা আপত্তি করল না। খিচুড়িও খেল পেট ভরে। তারপর বলল, জানো, আমি এভাবে লঙ্গরখানায় বসে খাইনি কখনও। আমার বেশ লাগছে। মানুষের কী কষ্ট, তাই না?

খুব কষ্ট?

কাছেপিঠে থেকে আরও দুটো খেপ মেরে কিছু লোক এনে ফেলতে হল কাশীনাথকে। সঙ্গে সারাক্ষণ বিলাসী।

কেমন লাগছে?

খুব ভালো লাগছে, কষ্টও হচ্ছে। একটা কথা বলব?

কী?

আমি নয়নের দেখা পেয়েছি।

অ্যাঁ! কোথায় দেখা পেলে? বলোনি তো!

রায়চকে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

বললে না কেন? ধরে আনতাম।

মাথা নেড়ে বিলাসী বলে, তাকে আমার আর দরকার নেই যে!

সে কী। তার জন্যই না বিপদ ঘাড়ে করে বেরিয়ে এলে!

সে এসেছিলুম। এখন এত মানুষ আর তাদের কষ্ট দেখে মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে নয়নও আমাকে চায় না।

বাঁচালে। তা হলে চলো নয়াবাঁধে তোমাকে রেখে আসি।

বিলাসী ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

নৌকো বাইতে বাইতে কাশীনাথ বলল, বাবার মারের আর ভয় পাচ্ছ না?

বিলাসী আনমনে দূরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, বাবা আর কতটুকু মারবে?

ভগবান যে তার চেয়েও কত বেশি মেরেছে এত মানুষকে!
কাশীনাথ একটু হাসল।

হাতুড়ি

রতন নাকি?
আজ্ঞে।
খবর কী রে!
খবর নাই।
তার মানে? চিঠিটা দিসনি?
কারে দেব? তিনি বাড়িতে থাকলে তো!
কোথায় গেছেন?
কোন চুলোয় গেছেন তা কে জানে! কিম্ভুত জায়গায় পাঠিয়েছিলেন বাপ, এই মারে কি সেই মারে। যেন চোর। তিনটে বাঘাকুত্তার সে কী চিল্লামিল্লি, শেকল ছিঁড়ে ঘাড়ে এসে পড়ে আর কি। বুকের ভিতর তখন থেকে ধড়াস ধড়াস।
দরজা খুলল কে?
কে জানে কে। চাকরবাকরই হবে বোধহয়। তার সে কী পুলিশের মতো জেরা। কোথা থেকে আসা হচ্ছে, নাম কী, নিবাস কোথায়, কী প্রয়োজন। কথা শেষ করার আগেই প্রশ্ন করে। আর সে কী তাড়াং তাড়াং চোখ রে বাবা!
তারপর?
সে কিছু কবুল করল না। 'দাঁড়াও' বলে দরজা দিয়ে ভিতরে গেলে। পাঁচ-সাত মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর দরজা খুলে এক মহিলা দাঁড়ালেন এসে। সে কে কেমন?
দেখতে-শুনতে খারাপ নয়। ফরসা, লম্বা, মুখখানাও ঢলঢলে। হলে কী হয়, ওই চেহারাখানাই যা দেখনসই। মেজাজে, একেবারে দুর্বাসা।
সর্বনাশ! চিঠিটা কি ওর হাতেই দিলি নাকি?
পাগল! আপনার বলা ছিল দুলাল ছাড়া কারও হাতে চিঠি দেওয়া চলবে না। সে আমার খুব মনে ছিল। তবে মেয়েটা এমন চেঁচিয়ে সব কথা বলছিল যে আমার ধাত ছাড়ার উপক্রম। বারবারই জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে আসছি, আর কে পাঠিয়েছে।
কিছু বললি?

না। শুধু একটা কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা, হাটখোলা থেকে আসছি, দুলালবাবুর সঙ্গেই দরকার। সেই কথাই হাজার বার ধরে বলাল। চোখে কুটিল সন্দেহ।

তারপর কী হল?

ভদ্রমহিলা বলল, আপনাকে আমার সন্দেহ হয়েছে, দাঁড়ান, পুলিশে খবর দেব।

ও বাবা। তুই কী বললি?

ভয় খেয়ে বললাম, আমার দোষটা কোথায় হল বলবেন? এসেছি দুলালবাবুর কাছে একটা দরকারে, তা অমন করছেন কেন? পুলিশে খবরই বা দেবেন কেন? চুরি-ডাকাতি তো করিনি। বারবারই জিজ্ঞেস করে দুলালবাবুর সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক।

তুই কী বললি?

বললাম, চেনাজানা আছে। বিষয় কর্মেই আসা। আচ্ছা দাদা, এ মহিলাটি কে?

ওর নাম পলা।

ওর নাম দিয়ে কী হবে? মহিলা আসলে কে?

ও দুলালের বউদি।

অ, তাই বলুন। দু ভায়ে ঝগড়া বুঝি!

না, কোনও ঝগড়া নেই। দুলালের দাদা রামলালকে পলা বছর খানেক আগেই নিজের হাতে মেরে ফেলেছে।

উরেব্বাস! বলেন কী?

রামলাল আর পলার বনিবনা ছিল না।

দশ বছর বিবাহিত জীবনে ওদের এক ঝগড়ার মধ্যে রামলাল কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়ে--সেদিন তার বিস্তর খাটুনি গেছে--চোখ বুঁজে বিছানায় পড়েছিল। সেই সময়ে পলা একটা হাতুড়ি দিয়ে তার কপালে মারে।

উরেব্বাস!

খুন করার ইচ্ছে হয়তো ছিল না। কিন্তু রামলাল ক্ষীণজীবী মানুষ ছিল। ওই এক ঘায়েই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।

থানাপুলিশ হয়নি?

না। তার কারণ ওদের হাতে একজন ডাক্তার ছিল। সে প্রথমে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে চায়নি। তাকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কাকুতি-মিনতি করে রাজি করানো হয়। মাথার ক্ষতটা খুব একটা চোখে পড়ার মতোও ছিল না। ডেথ সার্টিফিকেটের জোরে রামলালকে সৎকারও করা গিয়েছিল।

এ যে পতিঘাতিনী সতী!

বলেছি তো, রামলাকে খুন করার ইচ্ছে পলার হয়তো ছিল না। খুনটা অ্যাকসিডেন্টাল।

আপনি কিছু করলেন না?

কী করব?

উকিল মানুষ, কত কী করতে পারতেন।

পারতাম বটে, কিন্তু তাতে ওদের কচি ছেলেটা ভেসে যেত। সবদিক বিবেচনা করে কেসটা আর করিনি। তবে সন্দেহ হওয়ায় নিজেই খানিকটা তদন্ত করেছিলাম। ডাক্তার পাল আমার কাছে কবুলও করে ফেলেছিল যে, মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না।

আপনাকে আমি ভালো করে বুঝতেই পারি না। কেমন মানুষ আপনি বলুন তো!

কেমন মানুষ বলে তোর মনে হয়?

সময় সময় বেশ ভালো, সময় সময় কেমন যেন!

ঠিক ধরেছিস।

এখন দুলালবাবুকে লেখা চিঠিটা কী করব?

রেখে দে। দুলাল ফিরলে গিয়ে দিয়ে আসবি।

ও বাবা, ও বাড়িতে আবার? হাতুড়িবাজ মহিলার খপ্পরে গিয়ে পড়তে হবে জেনেই যে ভয় লাগছে।

যে চাকরটা প্রথম দরজা খোলে সে কেমন?

বড়সড় চেহারা, মাঝবয়সি।

ও হচ্ছে গেনু।

আপনি চেনেন?

হ্যাঁ।

লোক কিন্তু সুবিধের নয়।

জানি। তবে গেনু পলাকে কোলে করে মানুষ করেছে। পলাকে ও বুক দিয়ে আগলে রাখে। বাবার মতোই।

দুলালবাবুর সঙ্গে আপনার জরুরি দরকারটা কীসের?

দুলালের এখন ও বাড়ি ছাড়া উচিত। ও বোকা বলে বুঝতে পারছে না, ও বাড়িতে ও আর নিরাপদ নয়।

কেন বলুন তো!

গেনুর জন্য।

বুঝলাম না।

গেনু দুলালকে ঘেন্না করে।

বাড়িটা পলা গাপ করতে চায় বুঝি?

না। পলা আর দুলাল দুজন দুজনকে চায়।

বলেন কী দাদা! এ তো রোমাঞ্চকর নাটক!

জীবনটাই নাটক।

এইটুকু বলেই থামলেন কেন? বাকিটা বলুন।

আঁশটে গন্ধ পাচ্ছ বুঝি? মানুষ আঁশটে গন্ধ খুব ভালোবাসে। অবৈধ সম্পর্ক, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, বউ ভাগানো মানুষের কাছে খুব রুচিকর।

লজ্জা দেন কেন দাদা! লোক শুটঁকি মাছ খায়, হিং খায়, পেঁয়াজ-রসুন খায়, বিট লবণ খায়—তা এ সবের গন্ধ তো আসলে নিঘিন্নে নানা দুর্গন্ধেরই এপিঠ-ওপিঠ। তবু কি ভালোবেসে খায় না?

তা বটে।

মনে হচ্ছে রামলালের খুনের পিছনেও এইটেই কারণ, তাই না?

না হে, রামলাল বেঁচে থাকতে দুলাল পিকচারে আসেনি। সে তখন পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বরাবরই ডাকাবুকো, বরাবরই অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। লম্বা সাঁতারে খুব নাম ছিল। ভালো অ্যাথলিট। তারপর কয়েক বছর ধরে তার পেশা হয়েছে পাহাড়ে চড়ার। চড়েছেও অনেক পাহাড়ে। বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে ভালোবাসে। সে ঘরেই থাকেনি কখনও। পলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার মতো সুযোগ ছিল না।

তা হলে?

রামলাল মারা যাওয়ার পর খবর পেয়ে দুলাল ফিরে এল। সে খুব বুদ্ধিমান ছেলে। দাদার মৃত্যু যে হার্ট অ্যাটকে হয়নি তা অনুমান করতে দেরি হল না তার। পলার ভাবগতিক দেখেও সন্দেহটা হয়ে থাকবে। পলা তখন নিজের কৃতকর্মের জ্বালায় পাগলের মতো আচরণ করছিল। শোকের ওই বাড়াবাড়িটাও স্বাভাবিক ছিল না। কারণ পলা এবং রামলালের মধ্যে সম্পর্কটা যে মধুর ছিল না তা সবাই--যারা ওদের চিনত-জানে। দুলাল বউদিকে নানাভাবে লক্ষ করে বুঝতে পারল, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তখন সে একদিন আমার কাছে আসে।

পাহাড়ে কি সে আপনার সঙ্গেও চড়ত?

তা ঠিক। দুজনে আমরা হিমালয়ে অনেক পাহাড়ে চড়েছি। পরে সে অবশ্য অন্য দলের সঙ্গে জুটে যায়। আমিও ওকালতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। দুলালের চেয়ে আমি প্রায় দশ বছরের বড়।

সে আপনাকে এসে কী বলে?

সে বলে যে, পলার আচরণ তাকে সন্দিহান করে তুলেছে। সে অবশ্য গেনুকে সন্দেহ করেছিল। কিন্তু আমি কিছু ভাবনাচিন্তার পর বুঝতে পারি, কাজটা গেনুর নয়।

কী করে? চাকরটাও তো বেশ গুন্ডা গোছের।

গেনুকে আমি চিনি।

গেনু কি ভালো লোক? এই যে বললেন সে দুলালকে খুনও করতে পারে।

ঠিক কথা। গেনু খেপে গেলে ভয়ঙ্কর। কিন্তু একটা কথা কি জানিস? গেনু কিন্তু রামলালকে খুব ভালোবাসত। খুব। রামলাল এমনিতে পলার সঙ্গে ঝগড়া করত বটে, কিন্তু মানুষটা খুব খাঁটি ছিল। আরও একটা কথা, সে প্রাণ থাকতে পলাকে বিধবা করবে না।

আপনি তো জন্মেও ও বাড়িতে যান না, তবে এতসব জানলেন কী করে বলুন তো!

শুনে শুনে জানি।

কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিশ্বাস না হওয়ার কী?

এই যে বললেন গেনুকে আপনি চেনেন। কীভাবে চেনেন?

গেনু আগে আমার কাছে আসত।

কেন আসত?

এমনি। রামলাল পাঠাত কোনও খবর-টবর দিয়ে। তখন গেনু এসে অনেক কথাটথা বলত।

আর পলা?

বন্ধুর বউ হিসেবে ওই একটু যা পরিচয়। দু-একপ্রকার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

সে কি বরাবরই এমন খান্ডারনি ছিল?

একটু রোখাচোখা ছিল বইকি।

লোককে মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলে দিত।

কী করে জানলেন?

ওই নানাভাবে জানা।

রামলাল মরার পর ও বাড়িতের আপনি যাননি?

না। আমি তখন আমেরিকায় ছিলাম। ঘটনার মাসখানেক বাদে ফিরে জানতে পারি।

তখন যাননি।

না। গিয়ে কী লাভ হতো বল!

যেতে তো পারতেন। শত হলেও রামলাল আপনার বন্ধু ছিল।

এমনি যাইনি। গেলে মনটা খারাপ হতো।

পলা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি?

না।

এবার দুলালের কথাটা শেষ করুন।

হ্যাঁ, দুলাল। দুলাল যখন আমাকে সব কথা বলল তখন আমার সন্দেহ হল পলাকে। দুলালের সন্দেহ গেনুকে। আমি আমার সন্দেহের কথা দুলালকে বলিনি। দুলাল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গেনুর ওপর চড়াও হয়েছিল। থানাপুলিশ করারও চেষ্টা করে। কিন্তু প্রমাণ তার হাতে ছিল না। আমি ডাক্তার পালকে ডাকিয়ে অভয় দিয়ে তার পেট থেকে কথা বের

করি। তবে ডাক্তার পালও জানে না খুনটা কে করেছে। তার সন্দেহও গেনুর দিকেই। ব্যাপারটা এ রকম জায়গাতেই ঝুলে আছে।

সত্যটা কেবল আপনি জানেন?

তা বলছি না। সত্য জানা সহজ নয়। তবে জোরালো অনুমান।

তবে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

পাগল! বলেছি তো, পলার জেল হলে ওর ছেলেটা ভেসে যাবে। তা ছাড়া প্রমাণও তো কিছু নেই।

দুলালের সঙ্গে পলার ভাব হল কী করে?

দুলাল যখন এল তখন পলার মানসিক অবস্থা ভয়ঙ্কর। সেই অবস্থায় দুলাল তার বউদিকে খুব আগলে রেখেছিল। সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে চিকিৎসা করানো, বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, মন ভালো রাখার জন্য নানা ব্যবস্থা করা—সব করেছিল। আর পলাও ওর মধ্যে একটা খুব নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজে পায়।

তারপর?

ঘি আর আগুন। বুঝলি?

বুঝেছি।

ও দুজন দুজনকে বেশ আঁকড়ে ধরেছে।

বিয়ে করবে?

এখনও ততটা এগোয়নি। তবে আমার অনুমান, ওরা সেদিকেই এগোচ্ছে।

সেটা গেনুর পছন্দ নয়।

তাও বোঝা যাচ্ছে। গেনুর দুলালকে পছন্দ হওয়ার কথাও নয়।

ঠিক। গেনু চায় না যে, পলা ফের বিয়ে করুক।

আচ্ছা, গেনু কি জানে যে, রামলালকে পলা খুন করেছে?

বোধহয় জানে। সেই সময়ে গেনু বাড়িতে ছিল। হাতুড়িটাও সে-ই সরিয়ে ফেলে।

হাতুড়ি দিয়েই যে খুন করা হয়েছিল তা আপনি জানলেন কী করে?

অনুমান।

আপনার দেখছি সবই অনুমান।

অনুমানও একটা দামি জিনিস। ঠিকমতো লজিক্যালভাবে অনুমান করতে করতে সত্যে পৌঁছানো যায়।

খুনের সময় আপনি এ দেশে ছিলেন না, এক মাস বাদে ফিরে এসে শুধু কানে শুনেই অনুমান করতে লেগে গেলেন, এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?

তোর দেখি খুব সন্দেহই হয়েছে।

আপনার সঙ্গে থেকে-থেকেই হয়েছে। চামচাগিরি তো সেই কত বছর ধরে করছি।

বাজে কথা। আগে তো তুই নানা ধান্ধায় ঘুরতি, আমাকে এসে মাঝে মাঝে একটু সেলাম বাজিয়ে গেছিস। গত ছয় মাস ধরে দেখছি একটু কাজে মন হয়েছে।

ওকালতি আমার ভালো লাগে না দাদা, এ কর্ম আমার হওয়ার নয়। অত আর্টিকেল আর সাব ল মনে রাখতে গেলে প্রাণটা শুকিয়ে যাবে।

আমারও কি তাই হয়েছে বলে তোর ধারণা?

সত্যি কথা বলব?

বলেই ফেল।

আপনি তো পা থেকে মাথা অবধি রসকষহীন লোক। বিয়েটা অবধি করলেন না। দিন-রাত আইনের বই, মক্কেল আর মামলা নিয়ে পড়ে আছেন। আপনার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও না তাই হয়।

ওরে, আইনের মধ্যে যে-রস আছে তার সন্ধান তো পাসনি। পেলে দেখতি বাইরে চেহারা খেজুর গাছের মতো হলে কী হয়, ভিতরটা টইটম্বুর।

সে রস আপনার থাক, আমার দরকার নেই। যা বলছিলেন বলুন।

ওই তো। বলা তো হয়ে গেছে।

না, হাতুড়ি কথাটা শেষ করেননি।

হ্যাঁ, হাতুড়ি। হাতুড়িটা তো আমার অনুমান। শিলনোড়ার নোড়াটাও হতে পারে, আধলা ইটও হতে পারে। মোটা কাঠের রুল হওয়াও বিচিত্র নয়।

কথা ঘোরাচ্ছেন কিন্তু।

মানুষ মারতে যে-কোনও অস্ত্রই যথেষ্ট। তবে আবার বলছি, রামলালের মৃত্যুটা হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয়নি।

সেটা তো কয়েকবারই বললেন।

তুই প্রসঙ্গটা থেকে সরছিস না কেন?

সরতে বলছেন কেন?

খুন জখম কি ভালো প্রসঙ্গ?

আপনি নিজেই তো ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার, খুনজখম নিয়েই তো আপনার কারবার।

সেইজন্যই তো মাঝে-মাঝে হাঁফ ছাড়তে ইচ্ছে যায়।

তবু হাতুড়িটার কথা আমি জানতে পাই। মারণাস্ত্রটা যে একটা হাতুড়িই সেটা আপনি খুব ভালো করেই জানেন। কী করে জানলেন?

না শুনে ছাড়বি না?

কেউ ছাড়ে এই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট?

গেনুই বলেছে।

গেনু পলাকে অত ভালোবাসে, সে কেন বলে দেবে আপনাকে?

না বললে যে তার ঘাড়ে দায় বর্তায়।

তার মানে আপনি তাকে জেরা করে করে জেনেছেন।

তাই বটে।

লোকটা কি বোকা?

না তা নয়। আসলে পলাকে সে মেয়ের মতোই ভালোবাসে। সে একটু প্রাচীনপন্থী লোক। একটা মেয়ে তার স্বামীকে খুন করেছে--এটাই তার কাছে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। পলাকে পাপমুক্ত করার কথাই সে ভেবেছিল। আমার কাছে যখন এসেছিল তখন কথাবাতায় কিছু অসঙ্গতি পেয়ে আমি তাকে ধীরে ধীরে কবুল করতে বাধ্য করি। সে সবই স্বীকার করে। এমনকী পরদিন হাতুড়িটা অবধি আমাকে এনে দেয়।

বলেন কী? সেটা কোথায়?

আমার কাছেই আছে। হাতুড়িতে পলার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, রামলালের রক্তের চিহ্নও। আমি সব ফরেনসিকে পরীক্ষা করিয়ে ডকুমেন্টসহ রেখে দিয়েছি।

তবু কিছু করলেন না?

না। এগুলি দিয়েও খুনটা প্রমাণ হওয়ার নয়। রামলাল মারা গেছে এবং প্রসঙ্গটা খুঁচিয়ে তোলা অর্থহীন।

আপনি অত উদার লোক নন দাদা। আমার মনে হচ্ছে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।

হ্যায় তো হ্যায়, ছেড়ে দে।

এ বার প্রেমের ব্যাপারটা খুলে বলুন।

বলেছি তো। গত কয়েক মাস ধরে পলা আর দুলাল দুজন দুজনকে খুব আঁকড়ে ধরেছে। ওদের প্রেমটা প্রয়োজনভিত্তিক। পলার একজন শক্তসমর্থ অবলম্বন দরকার ছিল এ সময়ে। আর দুলালের ছন্নছাড়া জীবনেরও একটা নোঙরে বাঁধা পড়বার সময় হয়েছে।

আপনি এই দেওর-বউদির সম্পর্ককে পছন্দ করছেন?

করেছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে গেনু সেটা হতে দেবে না। তাই দুলালকে সাবধান করা দরকার।

ওরা আমার সঙ্গে এরকম করল কেন বলুন তো!

মানসিক চাপ থাকল মানুষ অদ্ভুত আচরণ করে।

মানসিক চাপ কেন?

বাঃ, এই তোর বুদ্ধি! বাড়িতে সাড়ে তিনজন মানুষ। বাচ্চা ছেলেটাকে বাদ দিলে তিনজন অ্যাডাল্টই তো মানসিক চাপে ভুগছে।

কী রকম?

পলার কথাই ধর। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে তার হাতে, সেই পাপবোধ, তার ওপর দেওরকে ভালোবেসে ফেলার অপরাধবোধ ছিঁড়ে খাচ্ছে ওকে। গেনু চোখের সামনে

রামলালকে পলার হাতে খুন হতে দেখে অস্থিরতায় ভুগছে, তার ওপর পলা ঢলাচ্ছে দুলালের সঙ্গে--সেইরাগ। দুয়ে মিলে মাথার ঠিক নেই। দুলালের অবস্থাও ভালো নয়। মুক্ত জীবন ছেড়ে বদ্ধ জীবনের দিকে এগোচ্ছে, বউদির সঙ্গে প্রেম—সেও স্বাভাবিক নেই। ওদের সকলেরই আচরণে তাই ওই অস্বাভাবিকতা। সবাইকে সন্দেহ করে। অচেনা লোক এলেই ভয় পায়।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব দাদা?

বল।

হাতুড়িটা আপনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন কেন?

এমনিই। কোনও কারণ নেই।

একেবারেই নেই?

না।

আপনি একজন মস্ত ক্রিমিন্যাল উকিল। অপরাধবিজ্ঞান সম্পর্কেও কম জানেন না। আপনি অযৌক্তিক কোনও কাজ করবেন, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। হাসছেন যে!

তোকেও যে সন্দেহবাতিকে পেল।

আর একটা কথা। পলাকে আপনি কতদিন চেনেন?

রামলালের বিয়ের পর থেকে।

রামলালের বিয়ে কবে হয়েছিল মনে আছে?

বছর দশেক। নবছর কয়েক মাস।

বিয়েতে খুব ঘটা হয়েছিল বোধহয়?

তা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ রামলালের বিয়ে নিয়ে পড়লি কেন?

রামলালের বিয়ে নিয়ে নয়, আমি আপনাকে অ্যাসেস করার চেষ্টা করছি।

আমাকে! আমাকে অ্যাসেস করার কী আছে?

আপনি বিয়ে করেননি কেন দাদা?

ওরে বাবা! এ উলটোপালটা জেরা করে সাক্ষীর মুখ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করছে।

ধরুন তাই। জবাবটা দিন।

এমনি করিনি। ইচ্ছে হয়নি।

হাতুড়িটা আপনি লুকিয়ে রেখেছেন কেন!

এমনি।

পলাকে আপনি কতদিন চেনেন?

বছর দশেক।

দুলালকে পলার কাছে থেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন কেন?

দুলালকে গেনু খুনও করতে পারে।

আর কোনও কারণ নেই?

আর কী কারণ থাকবে?

বলব?

কী বলবি?

আপনি পাকে-প্রকারে আমাকে সবই বলে দিয়েছেন। অন্তত হিন্ট করেছেন। আমি তা থেকে থিওরিটা দাঁড় করাতে পারব।

সত্যি?

হ্যাঁ। বলব?

গো অ্যাহেড।

কিছু মনে করবেন না তো!

ঠিক বলতে পারলে মনে করব কেন?

তা হলে বলি! পলাকে আপনি বিয়ের অনেক আগে থেকেই চিনতেন। খুব সম্ভব, আপনাদের গভীর প্রেম ছিল। কোনও কারণে পলার সঙ্গে রামলালের বিয়ে হয়। আমার অনুমান, পলাকে বিয়েতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই কারণে বেচারা রামলালের সঙ্গে তার নিত্য খিটিমিটি। খুনটা ইচ্ছাকৃত না হলেও সেই রাগেরই পরিণতি। ঠিক আছে দাদা?

বলে যা।

কিন্তু পলার ওপর আপনার পরোক্ষ প্রভুত্ব বরাবরই ছিল।

তার মানে কি ব্যাভিচার?

না। আমি যতদূর জানি আপনার ইগো ভীষণ প্রবল। আপনি অপরের এঁটো জিনিস ভোগ করার মানুষ নন। সেইজন্য পরকীয়া আপনার কাপ অফ টি নয়। কিন্তু প্রভুত্ব অন্য ব্যাপার।

প্রভুত্ব করেছি কী করে বুঝলি?

আপনি প্রভুত্ব ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক মানেন না। ঠিক বলেছি?

বলে যা।

কাজেই পলার লাগাম বরাবরই আপনার হাতে ছিল। তার বিবাহিত জীবনেও পরোক্ষে আপনার হুকুমেই পলা চলত। তাই ওদের সংসারে শান্তি ছিল না। শান্তি থাক তা আপনিও চাননি। পলাকে বিয়ে করতে না পারলেও বরাবর সে আপনারই সম্পত্তি হয়ে থেকেছে। শারীরিকভাবে ভোগ করার চেয়ে এইটেই অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল আপনার। ঠিক আছে?

চালিয়ে যা।

খুনের দায় থেকে পলাকে বাঁচিয়েছেন আপনিই। কিন্তু পুরোপুরি বাঁচাননি। মারাত্মক প্রমাণাদি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। পলার ওপর আপনার আয়রন হ্যান্ড।

মুশিকিল হল, দুলাল এসে পড়ায়। দুলাল রামলালের মতো ভেড়ুয়া নয়। সে ঝকঝকে পুরুষ। সে এবং পলা প্রেমে পড়ায় আপনার বিপদ দেখা দিয়েছে। দুলাল পলাকে বিয়ে করলে তাকে পুরোপুরি দখল করবে। আপনার জারিজুরি খাটবে না। ঠিক আছে?

বলে যা না?

আর সেইজন্যই আপনি গেনুকে খাড়া করেছেন। বলাই বাহুল্য গেনুও আপনার অনুগত এবং আজ্ঞাবহ। দুলালকে সরিয়ে না দিয়ে পলা নামক আপনার প্রিয় ক্রীতদাসীটিকে আপনি চিরকালের জন্য হারাবেন। তাই না?

আর কিছু?

হাতুড়িটা দিন দাদা।

কী করবি?

প্রমাণ নষ্ট করে দেব। কারণ পলা যদি একান্তই দুলালকে বিয়ে করে, তা হলেও তাকে আপনি শান্তিতে থাকতে দেবেন না। হাতুড়িটা তাকে ব্ল্যাকমেল করার কাজে লাগাবেন।

পাগল নাকি?

হাতুড়িটা দিন দাদা।

দিচ্ছি। তোকে একটা কথা বলব?

বলুন।

ওকালতিতে মন দে। খুব ভালো ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার হতে পারবি। আমার চেয়ে অনেক বড়।

সংলাপ

পেটে গ্যাস হয়, বুঝলেন! খুব গ্যাস হয়।

সেটা খুব টের পাচ্ছি। গত পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শ দেড়েক ঢেকুর তুললেন।

দেড়শো! না মশাই, দুশোর বেশি। কী থেকে যে গ্যাস শালা জন্মায় সেটাই ধরতে পারছি না। সেই দুপুরে পাবদা মাছের ঝোল দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েছি সেটাও গিয়ে পেটের মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার হয়ে পড়ে বসে আছে।

আজ পাবদা কিনেছিলেন বুঝি? ভালো পাবদার কাছে কিছু লাগে না।

যা বলেছেন। আমাদের বাজারে সুকুমার বলে যে মাছওয়ালাটি আছে সেই একটু ভালো জিনিস রাখে। আর সবাই তো কাটা পোনা চিতিয়ে বসে আছে।

নয়তো আড়-বোয়াল-তেলাপিয়া।

কত করে নিল?

সেটা আর জিজ্ঞেস করবেন না। দামের কথা মুখে আনাই পাপ। অবিশ্বাস্য মশাই, অবিশ্বাস্য। তবে বাবার বয়স হয়েছে, কদিন ধরেই জিজ্ঞেস করছিলেন, হ্যাঁ রে, বাজারে পাবদা ওঠে না? তাই আনা।

আপনার বাবা তো পুলিশে ছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ, অ্যাডিশ্যনাল ডি এস পি।

বড় পোস্ট।

হ্যাঁ, তা বড়ই।

বাড়িটা তো আপনার বাবারই করা, তাই না? দিব্যি বাড়ি।

হ্যাঁ, তা মন্দ নয়।

এ বাজারে কলকাতায় ও বাড়ি হেসেখেলে বিশ-পঁচিশ লাখ দাঁড়াবে।

হ্যাঁ, পঁচিশ লাখ অফার পেয়েছি।

অফার মানে? বাড়িটা বেচবেন নাকি?

আরে না মশাই, বাড়ি বেচে যাব কোথায়? তবে অনেকে আছে না, ভালো বাড়ি দেখলেই একটা দর হেঁকে বসে, সেরকমই ব্যাপার।

তবু ভালো। আমি ভাবলাম বেচার তোড়জোর চলছে বুঝি। আজকাল প্রোমোটারদের যা দৌরাত্ম্য!

সে তো বটেই। তবে ভাবছি বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তো আর বাড়ি প্রোমোটারদের দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু বাবা মারা গেলেই সেই সাবেক সমস্যা। তিন ভাইয়ে ভাগাভাগি। আর বাড়িটাও এমন প্ল্যানে তৈরি যে ঠিক ভাগজোখ হয় না। তখন প্রোমোটারকে না দিয়ে বোধহয় উপায় থাকবে না।

সে তখন ভাবলেন। আপনার এক ভাই পলিটিক্স করত না?

আমার বড়দা। ইলেকশনেও দাঁড়িয়েছিল।

আর মেজ জন?

ছোড়দা তো? তিনি ইনকাম ট্যাক্সের উকিল।

মেলা পয়সা, না?

দেদার পয়সা। সব মাড়োয়ারি ক্লায়েন্ট।

সব একসঙ্গেই আছেন তো!

পাগল নাকি? বড়দা গড়িয়ায় বাড়ি হাঁকিয়েছে সেই কবে। সেজদা ফ্ল্যাট কিনেছে ভবানীপুরে। আমিই পৈতৃক বাড়িতে পড়ে আছি।

আপনি তো ব্যাচেলার, আলাদা বাড়িতে থাকার দরকারটাই বা কী?

দরকার নেই ঠিকই। কিন্তু দায়দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে কিনা। এই ধরুন, দাদারা লটকে পড়ল, কেউ বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিল না। কিন্তু আমি ব্যাচেলার বলেই সটকাতে পারলুম না।

বয়স কত হল?

প্রায় চল্লিশ।

এমন কিছু বয়স নয় কিন্তু।

বলেন কি? আমার তো সবসময়ে মনে হয় বুড়ো হয়ে গেছি।

বিয়েটা হল না কেন?

কপালে নেই বলে। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমি অগামার্কা। ছাত্র ভালো ছিলুম না। চাকরিও ভালো জোটেনি।

একটা সিন্ধি কোম্পানিতে আছেন না আপনি?

আছি বটে, তবে না থাকার মতোই। অপনামজনক বেতন, হাড়াভাঙা খাটনি। কোনও রকম গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায় আর কী!

তাহলে সংসারটা কি বাবার টাকায় চলে?

চললে তো হতোই। কিন্তু ওটা আমিই চালিয়ে নিচ্ছি। বেতনের টাকা সবটাই খরচ হয়ে যায়। তা যাক। আমার আছেই বা কে, খাবেই বা কে।

দাদারা কিছু দেয় না?

নাঃ। আমিও চাই না, তারাও দেয় না।

আপনি তো তাহলে স্কেপগোট, বলির পাঁঠা।

তা বলতে পারেন। তবে অত হিসেব-টিসেব করে কীইবা হবে? চলে তো যাচ্ছে। অসুখ-বিসুখ বা মোটা খরচের পাল্লায় পড়লে অবশ্য বিপদ ঘটবে।

বাবা কিছু দিতে পারেন তো। আফটার অল পুলিশের চাকরি করেছেন, হাতে ভালো থাকার কথা।

আছেও কিন্তু দেন না। তাঁর সাফ কথা, এতদিন তোমাদের প্রতিপালন করেছি, এখন তোমাদের কর্তব্য মা-বাবার প্রতিপালন করা। এই নিয়েই দাদাদের সঙ্গে খিটিমিটি।

তারা পালিয়ে বাঁচলেন তো!

পালানোরই কথা। আজকাল তো পালানোই রেওয়াজ।

আপনিই পারলেন না তাহলে!

পালানোর কী আছে? ওরা বউ-বাচ্চার ভবিষ্যৎ ভেবে পালিয়েছে, আমার তো সেই বালাই নেই।

বিয়েটা করলেন না কেন মশাই? লাভ অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার ছিল নাকি?

সত্যি কথা শুনতে চান?

আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

লাভ অ্যাফেয়ার বললে বাড়াবাড়ি হবে।

একটা মেয়ের প্রতি একটু সফটনেস ছিল। কিন্তু কথাটা তাকে মুখ ফুটে জানাতে পারিনি।

ওঃ, তাহলে আর লাভ অ্যাফেয়ার কী হল?

দুঃখের কথা হল, পরে আমরা এক খুড়তুতো বোনের কাছে জানতে পারি যে, সেই মেয়েটারও নাকি আমার প্রতি সফটনেস ছিল। সেও কখনও বলতে পারেনি।

এঃ হেঃ, এ যে খুবই দুঃখের ব্যাপার। মেয়েটার কি বিয়ে হয়ে গেছে?

তা হবে না? সে এখন ছেলেপুলের মা, ঘোর সংসারী।

তার তো হিল্লে হয়ে গেল, আপনার তো হল না।

হিল্লে আর কী? জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার তো? সে কেটে যাবে।

মা বিয়ে দিতে চান না?

আগে চাইতেন। তবে দুই বউমার কাছ থেকে যা ব্যবহার পেয়েছেন তাতে বোধহয় আগ্রহ কমে গেছে। আর আমারও তো বয়স হল।

বয়সের চেয়েও বড় কথা হল আপনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা ভালো কথা নয়। ঠিক কত বয়স হল বলুন তো!

আটত্রিশ পূর্ণ হয়ে ঊনচল্লিশ চলছে।

সাহেবরা তো এই বয়সেই বিয়ে করে।

চল্লিশে তাদের জীবন শুরু।

সাহেবরা সব ব্যাপারেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে, তাদের সঙ্গে কী আমাদের তুলনা হয়।

আহা, তারাও তো রক্তমাংসের মানুষ। তাদেরও জরা-ব্যাধি আছে।

তা আছে। তবু তুলনা হয় না। জীবনকে ওরা ভোগ করতে জানে। আর আমরা জীবনটা কাটিয়ে দিইমাত্র।

বেড়াতে-টেড়াতে যান না?

না, বেড়ানোর যা খরচ। শখ-আলহাদ বলতে কিছুই নেই। আগে ময়দানে ফুটবল খেলা দেখতে যেতুম। এখন আর ইচ্ছে হয় না। সময় পেলে একটু আধটু টিভি দেখি। ব্যাস। পাড়ার একটা ক্লাবে একটু যাতায়াত আছে।

সামান্য সোশ্যাল ওয়ার্ক করি।

সোশ্যাল ওয়ার্ক করা তো খুব ভালো।

মন দিয়ে করলে তো ভালোই। আমি করি সময় কাটানোর জন্য।

কীরকম সোশ্যাল ওয়ার্ক? বন্যাত্রাণ, খরাত্রাণ এসব নাকি?

সে সবও আছে। তাছাড়া সাক্ষরতা অভিযান, রক্তদান, অ্যান্টিসোশ্যালদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা--এসব আর কি।

ভালো ভালো। তবে অ্যান্টিসোশ্যালদের সঙ্গে লাগাটা আবার বিপজ্জনক। এটা তো ওদেরই যুগ কিনা। পুলিশ-প্রশাসন সবই ওদের হাতে।

যা বলেছেন। ভালো করে না বুঝেসুঝে আমিও বড্ড বিপদে পড়ে গেছি।

তাই নাকি? কী ব্যাপার?

টাপু বলে একটা ছেলে আছে আমাদের পাড়ায়। ভালো ছেলে। সে একজন অ্যান্টিসোশ্যালের পাল্লায় পড়ে বখে যাচ্ছিল। তার বাবা এসে ক্লাবে কেঁদে পড়ে। আমরাও ভালো করে না ভেবেচিন্তে অ্যাকশনে নেমে পড়ি। কিন্তু তার ফল দাঁড়ায় মারাত্মক। সেই অ্যান্টিসোশ্যালটা--তার নাম টিপু—দলবল নিয়ে এসে ক্লাবে বোমাবাজি করে গেল এই তো দিন পনেরো আগে এক সন্ধেবেলা।

সর্বনাশ! কেউ মার্ডার হয়নি তো!

না। তবে দুজনের সপ্লিন্টার ইনজুরি হয়েছে।

বেঁচে গেছেন তাহলে।

না মশাই, বাঁচা অত সোজা নয়। শাসিয়ে গেছে সবাইকে দেখে নেবে।

ও বাবা, তাহলে তো আপনি বিপদের মধ্যেই আছেন।

তা আছি।

পুলিশ অ্যাকশন নেয়নি?

রুটিন মাফিক নিয়েছে। ওদের কেউ ভয় পায় না আজকাল।

সেই টাপু ছেলেরটার কী অবস্থা?

পালিয়েছে।

তাকে ফেরাতে পারবেন মনে হয়?

বলতে পারি না। সবাইকে তো ফেরানো যায় না। সৎপথে থাকার আকর্ষণ আজকাল কমে যাচ্ছে। ইয়ং জেনারেশন আজকাল একটু গা-গরম করতে চায় বোধহয়।

এ ব্যাপার আপনাদের নেক্সট লাইন অফ অ্যাকশন কী?

সবাই ভয় পেয়ে গেছে। অ্যাকশনে কেউ যেতে চাইছে না।

তাহলে আপনারা রণে ভঙ্গ দিলেন বলুন।

একরকম তাই। বোমা-পিস্তলের সঙ্গে লড়াই করব কী করে?

তাই তো বলছিলুম মশাই, অ্যান্টিসোশ্যালদের সঙ্গে লাগা বিপজ্জনক।

খুবই বিপজ্জনক। সেই ঘটনার পর থেকে টেনশনে আমার গ্যাস আর অম্বল বেড়ে গেছে।

শুনেছি টেনশনে গ্যাস-অম্বল বাড়ে।

আমারও বেড়েছে। রাতে শুয়ে দুশো-আড়াইশো ঢেকুর ওঠে।

আর ওসবের মধ্যে যাবেন না।

ইচ্ছে করে কি যাই? একটা ঘটনা থেকে নানা ঘটনার ফ্যাঁকড়া বেরোয় যে!

কীরকম?

টাপুর মা এসে আমাকে ধরে পড়েছিল সেদিন। বলল, দ্যাখ বাবা, ওই টিপু আর ওর দলবল অমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে। তুই একটা কিছু কর। মহিলাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে, আমার মতো ভিতুকে দিয়ে কিছু হওয়ার নয়। অগত্যা বললাম, আচ্ছা চেষ্টা করব।

চেষ্টা করেননি তো?

ঠিক চেষ্টা করেছি বলা যায় না। তবে টিপুর হদিস করতে শুরু করি।

ও বাবা! আপনি তো সাংঘাতিক লোক!

ও করব বলুন! ভদ্রমহিলা এমন কান্নাকাটি করলেন যে কিছু না করেও থাকা যায় না।

হদিস পেলেন নাকি?

পেলুম। পাশেই পালপাড়ার একটা ছেলে খবর দিল, ওদের বাড়ির কাছে একটা রং ঝালাইয়ের দোকানের পিছনে থাকে। হাইড আউট।

মশাই, শুনে যে আমারই বুক ধড়ফড় করছে।

আমারও করছিল।

যাননি তো?

না যাওয়ারই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঘাড়ে ভূত চাপলে যা হয়।

গেলেন?

একটু রাতের দিকে গেলুম।

বলেন কী?

সেই তো বলছি। গ্রহের ফের। তবে কপাল ভালো যে টিপুকে বেশি খুঁজতে হয়নি। রাত এগারোটা হবে তখন, টিপু মাল খেয়ে ফেরায় পথে পান-সিগারেটের দোকানে সিগারেট ধরাচ্ছিল।

কী করলেন?

গিয়ে বললুম, কাজটা ঠিক করছ না হে টিপু। এসব করা ভালো নয়।

এভাবে বললে কি কাজ হয়?

হল না তো! টিপু একটা খিস্তি করে কোমর থেকে একটা ছোরা বের করল। দোধার ছোরা। প্রকাণ্ড ফলাটা একেবারে ঝকঝক করছিল।

সর্বনাশ! পালালেন তো?

না। পালিয়ে যাব কোথায়? যাওয়ার কি জায়গা আছে?

তাহলে কী করলেন?

সে আর বলবেন না। আপনি কি দইব মানেন?

খুব মানি মশাই, খুব মানি। এই যুগে বেঁচে থাকারই যা সমস্যা, দইব না মেনে উপায় আছে?

ঠিক তাই, দইব ছাড়া আর কী বলি বলুন। নিতান্তই টাপুর মায়ের চোখের জল সইতে না পেরে আহাম্মকের মতো টিপুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সৎপথে ফেরাতে গিয়েছিলুম। কাজটা যে কত বড় ভুল হয়েছিল তা আগে বুঝতে পারিনি।

অতি খাঁটি কথা মশাই। কাজটা করা আপনার ঠিক হয়নি। তারপর হলটা কী সেইটে বলুন।

আজ্ঞে কী যে হল তা কি আমিই জানি। ছোরা দেখে আর টিপুর রক্ত-জলকরা চাউনিতে আমার তখন শরীরে স্তম্ভন। এত ভয় খেয়ে গেছি যে হাত-পা যেন কাঠ। ভগবানকে জীবনে ডাকিনি কখনও। আসলে ডাকার কথা মনেই থাকে না। সেই অবস্থাতেও মনে পড়ল না। টিপু ব্যাধের মতোই এগিয়ে এল। কিন্তু তারপর কী যে হয়ে গেল, কিছু মাথায় ঢুকল না।

কী হল?

সেইটেই তো বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বর্ণনা দেওয়ার ভাষাটাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। টিপু এগিয়ে এসে ছোরাটা বাগিয়ে ধরে পেটে বা বুকে ঢুকিয়ে দেয় আর কি। ওদের তো মায়া-দয়া নেই। কিন্তু কী যে হল, হঠাৎ টিপু যেন পায়ে পা জড়িয়ে, যেন নিজেকেই নিজে ল্যাং মেরে একটা পুঁটলির মতো দলা পাকিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। একেবারে আমার পায়ের গোড়ায়।

বলেন কী?

দইব ছাড়া আর কী বলি বলুন।

অবিশ্বাস্যেরও কিছু নেই। নিজের চোখে দেখা।

তারপর?

পড়ে গিয়ে টিপু কেমন যেন ছটফট করতে লাগল, গলায় গোঙানির আওয়াজ। মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে আমি যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম। নড়তেও পারছি না। পানের দোকানিটা নেমে এসে টিপুর মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে বলছিল, এর শরীরে কি কিছু আছে? দিনরাত চুলু টানছে, পাতা খাচ্ছে, শালা এবার মরবে।

জোর বেঁচে গেছেন তাহলে? দইব ছাড়া এ আর কিছু নয়।

ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা ব্যাপারটা চাউর হল অন্যরকম।

সেটা আবার কী?

আর বলবেন না মশাই। লোকের মুখে মুখে রটে গেল আমিই নাকি টিপুকে মেরে পাট করে দিয়েছি। বুঝুন কাণ্ড। আমরা গায়ে না আছে জোর, না আছে মনে সেই সাহস। কিন্তু লোকে তা বুঝলে তো! সে এমন কাণ্ড যে, টিপুর দলের একটা ছেলেও সাহস করে আমার কাছে এগিয়ে এল না। আমিও আর দাঁড়াইনি। তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই আমাকে নিয়ে পাড়ায় হইহই। এমনকী থানার দারোগা পর্যন্ত এসে আমাকে হিরো বানিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। বললেন, আপনার জন্যই টিপুকে ধরা গেল।

তারপর কী হল মশাই?

টাপু বাড়ি ফিরে এল। আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল, আপনার জন্যই টিপুর খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়েছে, নইলে ওরা আমাকে শেষ করে দিত।

তাহলে আপনি এখন হিরো?

কাকতালীয় ঘটনা আর কাকে বলে!

যেভাবে আমাকে হিরো বানানো শুরু হয়েছিল তাকে আমার ভয় হল, এবার টিপুর দলের ছেলেরা না আমার ওপর চড়াও হয়। মানুষের প্রাণের স্থায়িত্ব কী বলুন। একটা গুলি বা ছুরি ছোরা, নিদেন একখানা আধলা ইটেও কাজ হয়ে যায়।

তা তো ঠিকই। তা সেরকম কিছু হয়েছিল নাকি?

না মশাই। বরং টিপুর এক সাকরেদ এসে দেখা করে মাপটাপ চেয়ে গেলে। বলল, টিপুটা ইদানীং বড় বাড়বাড়ি করছিল। আমরা তো তাকত দেখাতে লাইনে নামিনি দাদা, এসেছি রুজি-রোজগার করতে। আর টিপু হতে চায় রবিন হুড।

বাঃ, তাহলে তো আপনার আর কোনও সমস্যাই রইল না।

সমস্যা! সমস্যার কি শেষ আছে?

একটা যায় তো আর একটা আসে।

সেটা আবার কীরকম?

আছে মশাই, আছে। হিরো হওয়ার হ্যাপাও বড় কম নয়। মিনি মাগনা হিরো বনে গেছি বটে, কিন্তু ফ্যাঁকড়াও আছে।

ঝেড়ে কাশুন না মশাই।

এই ধরুন, আগে কেউ পাড়ায় আমার দিকে ফিরেও চাইত না, আজকাল সবাই তাকায়, পথে বেরোলে জানালায়, বারান্দায় উঁকিঝুঁকি শুরু হয়, নাগরিক কমিটি থেকে আমাকে চেয়ারম্যান করার কথা উঠেছে। এই সব নানা উদ্ভট কাণ্ড।

তারপরও গোদের উপর বিষফোঁড়া আছে।

সেটা কী?

টাপুর মা এসে আমার মাকে ধরেছে, টাপুর দিদি-এই ধরুন বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে—তাকে ছোট বউমা করে নিতে। বর্ণ-গোত্র সব নাকি ঠিকঠাক আছে।

বলেন কী মশাই। একথা বলতে হয়। এ তো দারুণ খবর!

না মশাই, না। মোটেই ভালো খবর নয়। বয়সের তফাতটা লক্ষ করেছেন? তার ওপর আমি তো একরকম বুড়োই। একাবোকা থেকে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন কি আর ঝুটঝামেলা ভালো লাগে?

রিফিউজ করলেন নাকি?

হ্যাঁ, খুব কঠোরভাবেই রিফিউজ করলাম। টাপুর মাকে বললাম, আপানারা মোহের বশে এ প্রস্তাব করেছেন। ভালো করে ভেবে দেখবেন কাজটা ঠিক হবে না।

আপনার চরিত্রটি বেশ দৃঢ়।

না মশাই, একেবারেই না। বরং আমি অতিশয় দুর্বলচিত্ত। ভেবে দেখলাম দুর্বলচিত্ত লোকদের দাম্পত্য জীবনে না যাওয়াই ভালো। তাছাড়া ওরা আমড়াকে আম ভেবে বসে আছে কি না। আমি তো আসলে হিরো নই, জিরো।

তাহলে ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেল নাকি?

মিটলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত।

মেটেনি তাহলে?

না, বললাম না সব ঘটনা থেকেই ফ্যাঁকড়াটা বেরোয়।

তা এখানে আবার ফ্যাঁকড়া কী বেরোল?

টাপুর দিদি নন্দনাই হল ফ্যাঁকড়া। একদিন সে সোজা আমার ঘরে এসে হাজির! দুই চোখ জলে ভরা, ঠোঁট কাঁপছে।

বাস রে! এই যে উত্তম-সুচিত্রা।

বাইরে থেকে এরকম মনে হয়। আমার যে তখন কী অবস্থা তা বোঝাতে পারব না।

মেয়েটা দেখতে কেমন মশাই?

ভালোই। রং তেমন ফরসা নয়, কিন্তু মুখে-চোখে শ্রী আছে। পাড়ায় ভালো মেয়ে বলে নামও আছে।

তাহলে পিছোচ্ছেন কেন?

ওই যে বললাম, বুড়ো হয়ে গেছি। এখন কি কেঁচোগণ্ডুষ করা যায়?

তা মেয়েটা বলল কী?

তেমন যে কিছু বলল তা নয়। গলা কাঁপছিল। শুধু বলল, আমি কি খারাপ?

তবে কেন আপনি--ব্যাস ওই পর্যন্তই। বাক্যটা শেষ অবধি করতে পারেনি।

তা আপনি কী করলেন?

মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা তো বিশেষ বলিনি কখনও। ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।

কিছুই বললেন না?

তেমন কিছু বলতে পেরেছি বলে মনে হয় না। একটু আমতা করে বললুম, তুমি তো ভালো মেয়ে। তবে কেন আমাকে--ব্যাস, বাক্যটা আমিও শেষ করতে পারিনি।

ওঃ, আপনার পেটে পেটে এত? এরকম মাখো-মাখো ব্যাপারখানা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন? আপনি তো খুনি লোক মশাই।

কী যে বলেন। মাখো-মাখো ব্যাপার মোটেই নয়। নন্দনা এসে ও কথা বলে যাওয়ার পর থেকে আমার ঘুম গেছে, খাওয়া গেছে, দুশ্চিন্তায় আধমরা অবস্থা।

আর পেটে যে কী গ্যাস হচ্ছে মশাই, আর বলবেন না। ঢেকুরের পর ঢেকুর, পেটে সবসময়ে যে ফাঁপা ভাব। কী যে অসোয়াস্তি।

গ্যাসের মেলা ওষুধ আছে মশাই। ওর জন্য চিন্তা নেই। আগে বলুন, সিদ্ধান্তটা কী নিলেন?

ওই যে বললুম, গ্যাসে এমন কাহিল হয়ে পড়েছি যে আর ওসব নিয়ে এগোতে ভরসা হচ্ছে না। তবে মা ইদানীং দেখছি আদাজল খেয়ে লেগেছে। বড্ড বিপদ যাচ্ছে মশাই।

কীসের বিপদ?

একটা মিথ্যে জিনিসকে সবাই মিলে সত্যি করে তুলছে, এটা ভালো হচ্ছে না।

মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে কেন?

মিথ্যে নয়? গুন্ডাটা নিজেই কেতরে পড়ল আর হিরো বনলাম আমি!

আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ঘটনাটা তত মিথ্যে নয়। আপনি চেপে যাচ্ছেন।

বলেন কী। আমার কি গুন্ডার সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা আছে?

কিছু বলা যায় না। কখনও কখনও কাপুরুষও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আর আপনি সত্যিকারের কাপুরুষ হলে মাঝরাত্তিরে গিয়ে টিপুর ডেরায় হানা দিতেন না।

ওই যে বললুম কাজটা আহাম্মকি হয়েছিল।

আপনাকে তত আহাম্মক বলে মনে হচ্ছে না। ঘটনাটা বলেই ফেলুম না।

আমি তো আর পুলিশের লোক নই।

কী যে বলেন!

বলুন না মশাই, লজ্জা পাচ্ছেন কেন?

আসলে কী জানেন ঘটনাটার সময়ে আমি এমন বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিলাম যে সত্যিকারের কী ঘটেছিল তা আমি নিজেও জানি না।

এই তো এবার মাল বেরোচ্ছে। টিপুর মতো গুন্ডা আপনাকে ছোরা মারতে এসে হঠাৎ কনভালশন হয়ে ঢলে পড়বে এমন ঘটনা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ওইটেই মুশকিল। আমার যেটুকু মনে পড়ছে তাই বলেছি। বাকিটা আমার স্মৃতিতে নেই।

তাহলে মশাই, বলতেই হবে, আপনি টিপুর চেয়েও অনেক বেশি ডেনজারাস লোক।

ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন। জীবনে আমি মারপিট করিনি।

প্রয়োজন পড়েনি বলে করেননি। কিন্তু এলিমেন্টটা আপনার ভেতরে ছিলই।

আপনি কি বলতে চান আমার ভিতরে একজন অচেনা আমি আছে?

সকলের ভিতরেই থাকে।

কী জানি মশাই। লোকে বলছেও বটে যে, আমার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অনেকেই নাকি দেখেছে আমি টিপুকে পেটাচ্ছি। আর হাসপাতালের ডাক্তাররাও টিপুর ইনজুরির রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তো চিন্তার কথা।

কীসের চিন্তা?

এই যে আমার ভেতরে একজন হিংস্র, নিষ্ঠুর, অ্যাগ্রেসিভ লোক লুকিয়ে রয়েছে।

এ কি চিন্তার কথা নয়। বেশ ভয়েরই ব্যাপার।

তা ভয় পেলে একজন পাহারাদার বসালেই তো হয়।

পাহারাদার? সে আবার কী?

সবচেয়ে ভালো পাহারাদার তো নন্দনাই হতে পারে।

যাঃ, কী যে বলেন। আপনি কি মনে করেন বিয়ে মানুষের কোনও উপকার করে? আমার তো ও কথা ভাবলে পেটে গ্যাস বেড়ে যায়। দেখলেন না কতকগুলি ঢেকুর তুললাম! আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে।

আচ্ছা, টিপুর অবস্থা এখন কী রকম?

যতদূর জানি, পুলিশ-পাহারায় হাসপাতালে রাখা হয়েছে তাকে। খুব সিরিয়াস কিছু নয়।

আচ্ছা মশাই টিপুর কি নন্দনার ওপরেও একটা নজর ছিল?

কী করে বুঝলেন মশাই, জানি না। কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। ছিল।

বুঝতে বেশি মাথা ঘামাতে হয়নি। টিপুকে হাত করার পিছনে হয়তো ওটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

তাই হবে। নন্দনার মাও ঠারেঠোরে কথাটা আমাকে জানিয়েছেন। নন্দনা নাকি টিপুর ভয়ে কিছুদিন মামার বাড়িতে গিয়ে পালিয়েছিল।

তাহলে আপনার কি এখন উচিত নয়, নন্দনাকে এই ভয়ের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া?

আমার কী গরজ?

গরজ আছে বইকি। অসহায় অবলা নারীকে রক্ষা করাই তো পুরুষের ধর্ম, টিপু সেরে উঠলে যে নন্দনার আবার বিপদ!

তা নন্দনা আর কাউকে বিয়ে করলেই তো পারে।

সেটা দ্বিচারণা হবে না। তার যে আপনাকে পছন্দ।

দূর! আমি বুড়ো গ্যাসের রুগি, কম বেতনের অপদার্থ একটা লোক। আমার মধ্যে কী দেখল বলুন তো?

সেটা নন্দনাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?

করে কী লাভ? যা বলবেই তা গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রেম তো একটা ইমোশনাল একসেস। ওর কোনও জোরালো ভিত নেই।

আপনার কপালে কী আছে জানেন?

কী?

বয়স হলে বিড়বিড় করে কথাকওয়া, উদ্ভট উদ্ভট সব কাণ্ড করা, বাতিক আর বায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়া—যা ব্যাচেলারদের হয় আর কি। তাছাড়া দাদারা ভুজুংভাজুং দিয়ে বাড়ি দখল করবে, হাতের-পাতের যা কিছু হাতিয়ে নেবে। আরও বুড়ো হলে আপনাকে গিয়ে উঠতে হবে বৃদ্ধাশ্রমে। বউ যেমন হোক, ঝগড়াঝাঁটি করুক, মুখনাড়া দিক, কিন্তু তবু সে পুরুষকে ঠিক সামলে রাখে।

হুম।

কথাটা ঠিক বলেছি?

খুব বেঠিকও বলেননি। ব্যাচেলারদের ওরকমই হয়ে থাকে।

তাহলে?

একটু ভাবি।

ভাবুন কিন্তু বেশি নয়। ভাবতে সময় নিলে হাউসফুল হয়ে যাবে। নন্দনাই কি পড়ে থাকবে ভেবেছেন। অগেরটির বেলায় যা হয়েছিল এর বেলায়ও তাই হবে।

আপনি বড্ড ভয় দেখান তো!

ভয় দেখাচ্ছি না, সৎ পরামর্শ দিচ্ছি। আজকের দিনটা ভাবুন। ভেবে কাল সকালেই নন্দনাকে জানিয়ে দিন যে আপনি তাকেই বিয়ে করবেন।

কাল সকালেই?

কাল সকালেই। কিংবা আজ রাতেই। কিংবা এক্ষুনি গিয়ে চোখ বুজে বলে ফেলুন গে। যান।

আচ্ছা, তাহলে চলি মশাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু পা চালিয়েই যান।

কৈখালির হাটে

নামখানা জম্পেশ। বজ্রবাহু মণ্ডল। এই নাম শুনে প্রাইমারির মাস্টারমশাই হরিপদ গড়াই বলেছিল, তোর নামখানাই তো ভূমিকম্প রে! কিন্তু নাম ধুয়ে তো জল খাবি না বাবা, একটু লেখাপড়ায় মন দে।

তা দিয়েছিল বেজা। বজ্রবাহু বলে আর কে ডাকছে তাকে। বেজা নামই সকলের মুখে। তা বেজা লেখাপড়ায় তেমন বোবাকালাও ছিল না। প্রাইমারি ডিঙিয়ে হাই, তারপর হাইও ডিঙিয়ে গিয়েছিল। সেকেন্ড ডিভিশন। তা তা-ই বা কম কী? কিন্তু এইখানে তার লেখাপড়ার গাড়ি সেই যে থেমে গেল, আর নড়ল না। বাপ অজাগর মণ্ডল সাপকাটিতে মারা যাওয়ার পর বজ্রবাহুর মাথায় বজ্রাঘাত। সংসারের হাল না ধরলে শুকিয়ে মরতে হবে। বিধবা মা, আরও তিনটে ভাইবোন, বাপের ধারদেনা--সব মিলিয়ে বিশ বছরের বেজা হিমসিম। অজা মণ্ডলের তিন বিঘে জমি ছিল পার্টির দয়ায়। তার পাট্টা ছিল না বটে। অজা মণ্ডল মরার পর জমি নিয়ে বখেরা লেগে গেল। জয়েশ পুততুণ্ড লিডার মানুষ। সে বলল, ও জমি তো আমার, অজা ভাগে চাষ করত। জয়েশের ওপর কথা কইবে কে? সুতরাং জমি একরকম ভোগে চলে গেল।

বেজার যখন পাগল হওয়ার জোগাড় সেই সময়ে স্বর্গ থেকে দেবদূতের মতো নেমে এল নব হালদাল। সেও লিডার মানুষ। জমিজমা, গরুবাজুর, পাকা বাড়ি নিয়ে ফলাও অবস্থা। তাকে ডেকে বলল, শোনো বাপু, তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে, বুদ্ধি-বিবেচনাও আছে মনে হয়। যদি আমার প্রস্তাব মেনে নাও তাহলে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বেজা তখন সবাইকেই খুশি করতে মুখিয়ে রয়েছে, এতগুলি উপোসি মানুষকে রক্ষা না করলেই নয়, বলল, যে আজ্ঞে?

আমার মেয়ে মালতীকে তো দেখেছ বাপু। তাকে যদি বিয়ে কর তাহলে তোমার পাশে আমি আছি।

বেজা পক করে খানিক হাওয়া গিলে ফেলল। হাওয়ার ডেলাটা পেটে নামল না, গলাতেই বেলুনের মতো আটকে রইল। যাকে ঘাঁটাপড়া মেয়েছেলে বলে, মালতী হল তাই। বয়সে না হোক বেজার চেয়ে তিন চার বছরের বড়। একবার বিয়েও হয়েছিল বিষ্টুপুরের নগেনের সঙ্গে। বছর না ঘুরতেই ফেরত এসেছে। তারপর থেকে মালতী আর বিয়েতে বসেনি বটে, কিন্তু পুরুষ-সঙ্গে তার খামতি নেই। সারা গাঁয়ে তাকে নিয়ে ঢিঢি। নব হালদার মেয়েকে সামাল দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে না। মালতী তার বাপকে কুকুর-বেড়াল বলে মনে করে।

সেই মালতী হালদারকে বেজা বিয়ে করবে কি? সে গলায় বাতাসের বেলুনটা গিলে ফেলার চেষ্টা করল অনেকবার। হল না।

নব হালদার বলল, জমি ফেরত পাবে। তিন বিঘের জায়গায় পাঁচ বিঘে। আর একখানা তিন চাকার ম্যাটাডোরও দেব। ভালো করে ভেবে দেখ।

পেটের দায় বড় দায়। তবু রাজি হতে সময় নিচ্ছিল বেজা। কারণ ইদানীং শোনা যাচ্ছে মালতী নরেশ লস্করের সঙ্গে নটখট করে বেড়াচ্ছে। আর নরেশ হল হলদিঘাটের খুনে গুন্ডা। ডাকাতির মামলাতেও তার নাম আছে।

নব হালদারের মুখের দিকে চেয়ে বেজার মনে হল, লোকটা বড় নাচার।

মালতীকে কারও ঘাড়ে না গছালে তার চলছে না।

বেজা বলল, যে আজ্ঞে।

নব একটু হাসল। বলল, তবে বাপু, বুঝতেই পারছ, মালতী আদরে মানুষ, তোমাদের ওই ভাঙা ঘরে তো আর থাকতে পারবে না। তুমিই দিব্যি এসে থাকবে আমার বাড়িতে। আলাদা ঘরটর আছে। খরচাপাতিও ধর আমারই।

বেজা মাথা নীচু করে রইল। ঘর-জামাই হতে তার আর আপত্তি কীসের?

এই ঘটনার দুদিন বাদে কৈখালি হাটে যাচ্ছিল বেজা। কুমোরপাড়ার মোড়ে মালতীর মুখোমুখি পড়ে গেল।

খুব রসের হাসি হেসে মালতী বিষবিছুটি মাখা গলায় বলল, এই যে নাগর, শুনলুম নাকি আমার সঙ্গে মালাবদল করার জন্য হাঁ করে আছ!

বেজা তটস্থ হয়ে বলল, ইয়ে-মানে আপনার আপত্তি থাকলে—

আহা, আমার আবার আপত্তি কী গো! আমি তো বরণডালা সাজিয়ে বসেই আছি। বলি ভালোমানুষের পো, মধু আর হুল দুটোই সইবে তো!

তারপর সে কী গা-জ্বালানো হাসি!

ভাবী বউয়ের রকমসকম দেখে বড্ড দমে গিয়েছিল বজ্রবাহু। তার নামটাই যা শক্তসমর্থ, সে অতি দুর্বল মানুষ।

তা মালতী যে চোখেই দেখুন তাকে, বিয়েটা কিন্তু হয়ে গেল। ঘটাপটা তেমন কিছু নয়, তবে হ্যাজাক জ্বেলে, মন্ত্রপাঠ করে, দু-পাঁচজনকে ভোজ খাইয়ে একরকম হল ব্যাপারটা। কিন্তু যখন একা ঘরে মালতীর মুখোমুখি হতে হল তাকে তখন যে বুকের ধুকপুকুনিটা শুরু হল তার সেটা অদ্যাবধি থামেনি।

বিয়ের রাতে মালাটালা পরে ঘরে ঢুকতেই প্রেতিনীর মতো সে কী খলখল করে হাসি মালতীর! যেন সং দেখাচ্ছে। বলল, বাঃ, বর তো দিব্যি সেজেছে দেখছি! তা এবার কী হবে গো! রসের খেলা নাকি। এস এস নাগর, দেখি তুমি কেমন পুরুষ!

নিজেকে এমন নপুংসক কখনও মনে হয়নি বেজার। তখন তার ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। মালতী সম্বন্ধে শোনা ছিল তার। লোকে তাকে খারাপই বলে। কিন্তু বিয়ের রাতে যে অবস্থা করে তাকে ছাড়ল মালতী তাতে বেজার চোখ ভরে জল এসেছিল। মালতী শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না। আর শরীর দিয়ে তাকে খুশি করার মতো মনের অবস্থাও ছিল না তার সেদিন। অপমানে, লজ্জায়, নিজেকে হীন ভেবে ভেবে ছোট হয়ে গিয়ে সেদিন সে একটা জরদগব। মালতী শেষমেষ একখানা লাথিও মেরেছিল তাকে। সঙ্গে অশ্রাব্য গালাগাল।

সেই রাতে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়েছিল তার।

কেন যে তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল নব হালদার তা সে খুব ভেবে দেখেছে। বেশি ভাবতে হয়নি অবশ্য। পরদিনই মালতীর বউদি মঙ্গলা তাকে আড়ালে ডেকে বলেছে, মেয়ের বদনাম ঘোচাতে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে আমার শ্বশুর। তুমি হলে শিখণ্ডী। সেইরকমই থাক। নইলে কপালে কষ্ট আছে।

মালতীর সঙ্গে এক ঘরে ওই একটা রাতই কেটেছে বজ্রবাহুর। পরদিন থেকেই সে পাশের খুপরিতে চালান হয়ে গেল।

বিয়ে যা-ই হোক, নব হালদার তাকে কথামতো জমি আর তিন চাকার ম্যাটাডোরখানা দিয়েছিল বটে।

সেই ম্যাটাডোরখানা চালিয়েই আজ কৈখালির হাটে এসেছে বেজা। গঙ্গারামের মাল বয়ে এনেছে গঞ্জ থেকে। হাট ভাঙলে ফের ফেরত নিয়ে যাবে। এই করে তার রোজগার কিছু কম হয় না। ছোট ভাই বিশালবাহু চাষবাস দেখে। পরিবারটা বেঁচে গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় মালতী এখনও তার বউ। ঠিক বটে মালতীর সঙ্গে আজকাল তার একরকম দেখাই হয় না। তবু বিয়েটা টিকে আছে। মালতী বিয়ের দু-বছর বাদে এখন নতুন পুরুষ ধরেছে। খয়রাপোতার মহাজন বীরেশ মহান্তকে। বীরেশ ফুর্তিবাজ লোক, টাকা ওড়াতে ভালোবাসে। মালতীকে তার পছন্দও খুব। বেজা এসব দেখেও দেখে না। পাশের ঘরে যা হওয়ার হয়। বেজা তার খুপরিতে শুয়ে ঘুমোয়।

বেজা জানে, তাকে আজকাল কেউ মানুষ বলে মনে করে না। পুরুষ হয়েও বউকে সামলাতে পারেনি বলে তার বিস্তর বদনাম। কিন্তু বেজা ভাবে, লোকে যাই বলুক তার কর্তব্য সে করেছে। পরিবারটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কৈখালির হাট মানে এক বিচিত্র জায়গা। দোকান-পসার, বিকিকিনির এমন রমরমা হাট এ তল্লাটে নেই। অন্তত দশ-বারোখানা গাঁয়ের লোক এসে হাটে ভিড় করে।

বজ্রবাহু ম্যাটাডোর এক চেনা দোকানির হেফাজতে রেখে হাট দেখতে বেরল। কেনাকাটাও কিছু আছে। ছোট বোন সিতির জন্য একটা হাত-আয়না, মায়ের জন্য মালিশের ওষুধ, এককানা ভালো কাটারি এইসব টুকিটাকি।

দুই

জিপগাড়িটা থামিয়ে পেচ্ছাব করতে নেমেছিল বীরেশ মহান্ত। বাঁশবনের ধারে নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক ধর্মটা সারতে সারতে তার মনে হচ্ছিল, পেচ্ছাবের সেই তেজটা যেন আর নেই। আগে যেমন মাটি খুঁড়ে ফেলত, সেরকটা আর হয় না আজকাল। শরীরের সেই তেজবীর্য ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে হয়তো। কমারই কথা।

প্যান্টের জিপারটা টেনে জিপগাড়ির দিকে ফিরে আসছিল সে। জিপে মালতী বসা। ছেনাল মেয়েছেলেটা এই দুপুরে কেমন সেজেছে দেখ। জরির কাজ করা ঝলমলে লাল টকটকে শাড়ি, হাতায় কাজ করা ব্লাউজ, মুখে গুচ্ছের স্নো-পাউডার, কপালে মস্ত টিপ, ঠোঁটে রাঙা লিপস্টিক। একেবারে সং। তার ওপর মুখে একখানা ন্যাকা ন্যাকা খুকি-খুকি ভাব। আজকাল আর কেন যেন মেয়েছেলেটাকে পছন্দ হচ্ছে না তার।

জিপগাড়িটার দিকে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়ায় বীরেশ, পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়, একটু ভাবে।

কী গো! তোমার হল?

বীরেশ জবাব দিল না।

দেরি হচ্ছে কেন? হাটে যেতে সন্ধে হয়ে যাবে যে!

বীরেশ সিগারেট খেতে খেতে ধীরে ধীরে একটা সিদ্ধান্তে আসতে লাগল। নাঃ, এবার এই মেয়েছেলেটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। অনেক হয়েছে, আর নয়। এর একটা নামকোবাস্তো স্বামী আছে। মেনিমুখোটা পাশের ঘরে শুয়ে ঘুমোয়।

মেনিমুখো হলেও লোকটাকে কখনও খারাপ লাগেনি বীরেশের। সরল, সোজা ছেলে। নাটকে একটা পার্ট করতে হবে বলে করে যাচ্ছে। পেটের দায় বলেও তো কথা আছে।

কই গো! জবাব দিচ্ছো না কেন?

মালতী জিপগাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল।

বীরেশ হাসল, বলল আসছি।

দেরি করছ কেন বল তো!

এই একটু হাত পায়ের আড় ভাঙছি।

একা সিগারেট খাচ্ছো? আমাকেও একটা দাও। বড্ড ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে বীরেশ ওকে সিগারেট দিল। মেয়েছেলের সিগারেট খাওয়া কেন যেন পছন্দ হয় না বীরেশের।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল বীরেশ।

তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো! কেমন যেন আলগা আলগা ভাব! কী হয়েছে বলবে তো!

কিছু নয়, রোজ কি আর একরকম থাকা যায়?

বলি, আমি পুরোনো হয়ে যাইনি তো!

তা একা তুমি কেন? আমিও তো পুরোনো হচ্ছি।

জিপের পিছনে কয়েক পেটি মাল আছে। বীরেশের দিশি মদের ব্যবসা। কৈখালির হাটে ব্যাপারিরা তীর্থের কাকের মতো চেয়ে বসে আছে। গিয়ে পড়লে পেটি নামাতেও হবে না, লহমায় বিক্রি হয়ে যাবে জিপগাড়ি থেকেই।

বীরেশ গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক কষল।

মালতী বলল, কী হল থামলে কেন?

মদের গন্ধ পাচ্ছি যেন! বোতল ভাঙল নাকি।

মালতী হাসল, না গো, তোমার ফ্লাস্ক থেকে আমি একটু হুইস্কি ঢেলে খেয়েছি।

কখন?

যখন তুমি নেমে গিয়েছিলে তখন।

কেমন যেন এ ব্যাপারটাও পছন্দ হল না বীরশের । যখন মানুষটার প্রতি অপছন্দের ভাব হয় তখন সেটা ধীরে ধীরে বাড়ে। তখন তার সবকিছুই অপছন্দ হতে থাকে। বীরেশের সিটের ধারের খাঁজে বেঁটে মোটা বডসড় স্টিলের ফ্লাস্কটা রাখা। তাতে বরফ মেশানো দামি হুইস্কি। বীরেশ দিনের বেলা খায় না। সূর্য ডুবলে তবে ওইসব।

গম্ভীর হয়ে আছো কেন বলো তো!

না, গম্ভীর হবো কেন? ঠিকই আছি।

না, তুমি ঠিক নেই। বলো না গো কী হয়েছে?

এই শুরু হল ন্যাকামি। এটাই সবচেয়ে অসহ্য।

হঠাৎ বীরেশ বলল, আচ্ছা, গায়ে অমন বিটকেল গন্ধ মাখো কেন বলো তো! মাথা ধরে যায়।

ও মাগো, বিটকেল গন্ধ কী? এই সেন্ট যে নিউ মার্কেট থেকে কিনে এনেছিলে তুমি।

আমি?

ও মা, মনে নেই?

তা হবে। গন্ধটা ভালো লাগছে না তো!

ঠিক আছে এটা না হয় মাখব না।

কৈখালির রাস্তা জঘন্য। মাঝে-মাঝেই রাস্তার ছাল-ছামড়া উঠে গিয়ে কোপানো খেতের মতো অবস্থা, বড় বড়, গর্ত, তার উপর ধুলো তো আছেই। ঝপাং ঝপাং করে জিপ লাপাচ্ছে। তিন-চারখানা গো-গাড়ি সামনে রাস্তা আটকে চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। জিপ এগোতে পারছে না। ভারি বিরক্তিকর অবস্থা। ঘনঘন হর্ন দিচ্ছে বটে, কিন্তু সরু রাস্তায়

গো-গাড়িই বা সাইড দেবে কী করে? দুটো হাঁচি দিল মালতী। তারপর রুমালে নাক মুখ চাপা দিয়ে বলল, এই রে! আমার আবার নাকে ধুলো গেলেই সর্দি হয়।

বীরেশ গো-গাড়িগুলিকে পাশ কাটানোর ফিতির খুঁজছে, সুবিধেমতো জায়গা পেলে রাস্তা থেকে ওভারটেক করে ফের রাস্তায় উঠবে। কিন্তু সেরকম সুবিধে পাচ্ছে না। ডানধারে ঝোপঝাড়, বাঁশ বন, গভীর নাবাল কিংবা পুকুর বা খেত। ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে বীরেশ।

ওঃ, অত হর্ন দিও না তো! মাথা ধরে গেল।

হর্ন না দিলে হবে কেন? দেখছ না সাইড দিচ্ছে না।

তবু হর্ন বন্ধ করো।

বীরেশ অবশ্য কথাটাকে পাত্তা দিল না। হর্ন বাজাতে লাগল।

মালতী ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে বলল, একটু খাচ্ছি।

বীরেশ বিরক্ত হল, কিছু বলল না।

মালতী ফ্লাস্কের ঢাকানায় হুইস্কি ঢেলে খেতে লাগল।

জিপটার বাঁহাতি স্টিয়ারিং বলে রাস্তাটা ভালো দেখতে পাচ্ছে না। বীরেশ। সামনে একটা তুমুল ধুলোর পাহাড় উঠছে দেখে বুঝে নিল, উলটো দিক থেকে গাড়ি আসছে। গো-গাড়িগুলি জড়োসড়ো হয়ে থেমে পড়েছে। সুতরাং তাকেও থামতে হল।

নেচে নেচে, কেতরে, বহু কসরত করে খানিক রাস্তায় চাকা নামিয়ে একটা ট্রেকার উলটো দিক থেকে এসে পার হয়ে গেল তাদের। ঝান্ডা লাগানো পার্টির গাড়ি।

ওই তো, ওরা তো সাইড পেয়ে গেল।

উলটো দিকের গাড়ি যে সুবিধেটা পায় সেটা যে সে পাবে না তা আর মালতীকে বোঝাবার চেষ্টা করল না বীরেশ। তবে সে একটা হিসেব-নিকেষ করে নিয়ে জিপটা ছাড়ল। ডানদিকে চাকা রাস্তার বাইরে খানিকটা নামানো যাবে। ছোট ছোট ঝোপ আছে বটে, তাতে আটকাবে না।

অ্যাকসেলেটর চেপে হর্ন দিতে দিতে জিপটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং শক্ত হাতেই ধরে ডান বাঁয়ে মোচড় দিচ্ছিল বীরেশ।

কিন্তু কপাল খারাপ। বাঁয়ের সামনের চাকাটা বোধহয় একটা পাথরে লেগে গাড়িটা টাল খেয়ে ডান ধারে একটা লাফ মেরে উঠে ডান কাতে পড়ে গেল।

প্রথম ধাক্কাতেই গাড়ি থেকে ছিটকে গিয়েছিল বীরেশ। পড়ে চোখে অন্ধকার দেখল। আর কিছু মনে নেই।

গো-গাড়ির গাড়োয়ানরাই নেমে এসে ধরে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল তাকে। বাকিরা গিয়ে জিপের তলায় চাপা পড়া মালতীকে যখন বের করে আনল তখন তার শরীর নিথর

হয়ে গেছে। হয়তো বেঁচেও যেত মালতী, যদি না মদের বোতলের ভারী পেটিগুলি তার বুক আর মুখের ওপর আছড়ে পড়ত।

তিন

রাহুটা যে বড্ড প্রবল হে তোমার মেয়ের!

তাতে কী হয়!

ওঃ সে অনেক ফেরে পড়তে হয়।

বেঁচেবর্তে থাকবে তো!

তা থাকবে, শনিটাও যেন কামড়ে আছে।

তাতেই বা কী হয়; ভেঙে বলবে তো!

দাঁড়াও, ভালো করে দেখি। এ মেয়ে তো ভালো করে দেখতেই দিচ্ছে না হাত, বারবার টেনে নিচ্ছে।

শক্তিপদ একটা ধমক দিল মেয়েকে, অমন করছিস কেন?

বকুল খিলখিল করে হেসে বলে, সুড়সুড়ি লাগছে যে!

শক্তিপদ বিরক্ত হয়ে বলে, এ মেয়েকে নিয়েই হয়েছে আমার মুশকিল, বড্ড অশৈরণ। ক্ষণে ক্ষণে হাসি পায়। ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা লাগে, সুড়সুড়ি লাগে, ভয় লাগে।

জ্যোতিষী হরুঠাকুর গম্ভীরভাবে শক্তিপদর দিকে চেয়ে বলে, একটাই নাকি!

মেয়ে এই একটা। ছেলে আছে তিনটে, তা তাদের নিয়ে ভাবি না। এইটে হয়ে অবধি আমিও যেন বাঁধা পড়ে গেছি। মেয়ের বড্ড মায়া তো!

বয়স কত হল মেয়ের!

এই তো ষোলো পোরে আর কি। বিয়ের যোগটা একটু দেখ তো হরুঠাকুর। দেখছি বাপু, দেখছি। দেখি মা হাতটা বেশ চ্যাটালো করে মেলে ধরো তো।

বকুল হেসেই অস্থির।

তা লেগে যাবেখন বিয়ে।

কবে লাগবে?

শিগগিরই।

তোমাদের জ্যোতিষীদের মুশকিল কি জানো। সব আন্দাজে ঢিল। লেগে যাবে সে তো আমিও জানি। কিন্তু কবে লাগবে, পাত্তর কেমন হবে, সুখে ঘরসংসার করবে কিনা সব বিস্তারিত না বললে হয়?

কেতুটা একটু ভেতরে যাচ্ছে বটে, তবে--

বকুল হাতটা এবার সুট করে টেনে নিয়ে বলে, ও বাবা, আমার হাত ব্যথা করে না বুঝি!

শক্তিপদ গলে গেল। মেয়ে হল তার প্রাণ। পাঁচসিকে পয়সা ফেলে বলল, ওতেই হবে। কপালে যা আছে খণ্ডাবে কে?

হরুঠাকুর বলে, আরে বাপু গ্রহবৈগুণ্য যাই থাক না মঙ্গলচণ্ডীর কবচটা নিয়ে গিয়ে ধারণ করাও। দামও বেশি নয়। কাজ হয়ে যাবে।

আচ্ছা, সে হবেখন। মেয়ে এখন নেপাল ঘোষের চপ খাওয়ার জন্য অস্থির। আসি হে ঠাকুর।

কৈখালির হাটে এসে যে নেপাল ঘোষের চপ না খেয়েছে সে আহাম্মক। তিন রকমের চপ করে নেপাল। আলুর চপ, মোচার চপ, আর ভেজিটেবল চপ। তিনটেই ঝুড়ি ঝুড়ি উড়ে যায়। দোকানের সামনে লম্বা লাইন।

জ্যোতিষীর কাছ থেকে উঠে এসে বকুল বলল, উঃ হাতটা একেবারে ব্যথা হয়ে গেছে। তুমি যেন কী বাবা!

শক্তিপদ কাচুমাচু হয়ে বলে, তো নাকি শনির দৃষ্টি আছে। সেই জন্যই আসা। তবে হরুঠাকুর শনির কথাটা কিছু বলল না তো!

আমি তো ভালোই আছি। তুমি অত ভাবো কেন?

মেয়ের বড় মায়া। শক্তিপদ ঘরবাঁধা লোক ছিল না তেমন। কাজ-কারবার নিয়ে ব্যস্ত মানুষ। চৌপর দিন তার মাথায় নানা বিকিকিনির চিন্তা। তিনটে ছেলে হয়েও তার স্বভাব ঘরমুখো হয়নি কখনও। কিন্তু তিন ছেলের পর মেয়েটা হতেই সে কাত। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তার বুকখানা যেন জলে ভরে উঠল না। মা লক্ষ্মীরই কেউ হবে। মেয়ে হয়ে ইস্তক তার কাজ-কারবারও ফেঁপে-ফুলে উঠল। তিনটের জায়গায় সাতখানা ট্রাক হল, দু-খানা বাস, তিনটে ট্রেকার, টাকায় টাকায় ভাসাভাসি কাণ্ড।

চুড়ি কিনি বাবা? ওই তো পিন্টুর দোকান।

একগাল হেসে শক্তিপদ বলে, কিনবি? তা কেন।

কাচের চুড়ি কম্মের জিনিস নয়। কয়েকদিন বেশ ঝলমল করে তারপর পটপট করে ভাঙে। আগের কাচের চুড়ি দুচোখে দেখতে পারত না শক্তিপদ। কিন্তু মেয়ে চাইলে ব্রহ্মাণ্ড দিতেও রাজি।

দুহাত ভরে চুড়ি পরে বাপকে দেখায় বকুল, কেমন দেখাচ্ছে বাপ?

খুব ভালো মা। তবে তুই তো দস্যি মেয়ে, চুড়ি ভেঙে যেন হাত রক্তারক্তি করিস না।

পাঁচটা টাকা পিন্টুর কোলে ফেলে মেয়ে আগলে এগোয় শক্তিপদ। তা এগোয় সাধ্যি কি!

দু-পা এগিয়েই মেয়ের বায়না, পুঁতির মালাগুলি কী সুন্দর না বাবা?

হ্যাঁ, তা ভালোই।

না তেমন দামি জিনিস-টিনিস নয়, এইসব ছোটখাটো জিনিসেরই বায়না বটে মেয়ের।

ও বাবা, ওই দেখ নেপালের দোকানে লাইন।

লাইন দেখে শক্তিপদর চোখ কপালে।

ও বাবা, এ যে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে!

আমার যে খিদে পেয়েছে বাবা!

তাহলে চল বিশ্বনাথের দোকানে একটু মিষ্টি খেয়ে নে।

এ বাবা, মিষ্টি আমি খাই নাকি? চপই খাবো।

দাঁড়া দেখি, লাইনে চেনা মানুষ পাই কি না।

কৈখালির হাটে চেনা মানুষের অভাব নেই তার। সে তালেবর লোক। সবাই চেনে।

লাইনের পাশ দিয়ে এগোতেই একেবারে সামনের দিকে বজ্রবাহুর সঙ্গে দেখা।

বেজা নাকি যে?

শক্তিদা যে! কী খবর?

তা চপ নিচ্ছিস বুঝি?

হ্যাঁ।

আমার জন্যও নিস তো কয়েকখানা। তিন রকমেরই নিবি, এই পয়সা।

দুর। পয়সা রাখো। ক পয়সাই বা দাম!

বাঁচালি বাপ। মেয়েটা তখন থেকে খিদেয় কাতর।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেজা গরম গরম চপ নিয়ে এল শালপাতার ঠোঙায়। এনেছেও মেলা।

মেয়েটা হাঁ করে তাকিয়ে বজ্রবাহুকে দেখছিল।

এই তোমার মেয়ে বুঝি?

হ্যাঁ।

তোমার তো মেয়েঅন্ত প্রাণ!

শক্তিপদ একটু লজ্জার হাসি হাসল। সবাই তাই বলে বটে। মেয়ে নাকি শক্তিপদকে একেবারে বশ করে রেখেছে। তাতে একটু অহংকারই হয় তার। মেয়ে তো নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

ঘাসের ওপর তিনজন বসেছে ত্রিভুজ হয়ে। চপ খেতে খেতে শক্তিপদ বলে, তা সেই ডাইনির খপ্পরেই এখনও পড়ে আছিস।

সবই কপাল শক্তি দাদা। পেটের দায়ে মেনে নিতে হয়েছে।

সবই জানি। তোর জন্য দুঃখও হয়। গেছো মেয়েছেলেটার তো গুণের শেষ নেই। তা এখন তোর সঙ্গে কেমন করে?

মাথা নেড়ে বেজা বলে, না দাদা, সম্পর্ক নেই। আমি হলুম গিয়ে শিখণ্ডী। নব হালদারের প্রেস্টিজ রাখতে আমাকে দরকার ছিল।

মেয়েটা চপ তেমন খাচ্ছে না। খুব হাঁ করে তাকে দেখছে। বজ্রবাহুর চেহারাটা খারাপ নয়। বহু মেয়েই তাকায়। কিন্তু সে নিজে আর মনের দুঃখে মেয়েদের দিকে তাকায় না। তার জীবনটাই অন্ধকার হয়ে গেছে।

তুমি তো খাচ্ছো না খুকি!

মেয়েটা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়। ভারি লক্ষ্মীশ্রী আছে মুখখানায়।

বজ্রবাহু বলল, চপে বড্ড ঝাল দেয় নেপাল। তুমি বোধহয় ঝাল খেতে পারছো না! জিলিপি খাবে? শ্রীধরের জিলিপি ভারি ভালো। সাড়ে আট প্যাঁচের জিলিপি। খাবে?

মেয়েটা চুপ করে আছে। মাথা নীচু। হাসছে।

দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

বজ্রবাহু গিয়ে গরম জিলিপি নিয়ে এল। মেয়েটা লজ্জায় হাত বাড়িয়ে দিল ঠোঙাটা। বাপকে দিল, বজ্রবাহুকে দিল। নিজে একখানা একটু একটু কামড়ে খেতে লাগল! কিন্তু যেন খাওয়ার মন নেই।

শক্তিপদ জিজ্ঞেস করে, তা হ্যাঁ রে বেজা, তোর ভ্যান চলছে কেমন?

ভালোই। নব হালদার ও ব্যাপারে ঠকায়নি।

কেমন হচ্ছে-টচ্ছে?

খারাপ নয় দাদা। একখানা ছোট ট্রাক বায়না করেছি। সামনের মাসেই পাবো। তখন আমি চালাব। ছোট ভাইটাকে একটা দেবো।

ভালো খুব ভালো। ধীরে ধীরে রয়ে-সয়ে হোক। আমারও তো ওইরকম ভাবেই হয়েছে কিনা।

জানি। তুমি একটা দৃষ্টান্তই তো চোখের সামনে।

শক্তিপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর মতো একটা ছেলে যদি পেতাম—কথাটা শেষ করল না শক্তিপদ। শেষ করার দরকারও ছিল না। সবাই বোঝে। আমার কথা ভেবো না দাদা। খারাপ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলাম। এভাবেই জীবন যাবে।

চার

শেফালীর চোখ টকটকে লাল। বিস্তর কেঁদেছে। দিদি মরায় তুমি তো খুশিই হয়েছো জামাইদা, তাই না?

মাথা নেড়ে বেজা বলে, না শেফালি, খুশি হবো কেন? মালতী যেমনই হোক, একটা মানুষ তো। একজন মানুষ মরলে কি খুশি হওয়ার কথা!

আমরা জানি, দিদি কি রকম ছিল। তোমার ওপর অনেক অন্যায়-অত্যাচারও হল। তুমি ভালো লোক। এ বাড়ির সবাই কিন্তু তোমার সুখ্যাতি করে।

উদাস মুখে বেজা বলে, তা হবে হয়তো।

তোমাকে আমার একটা কথা বলার ছিল।

কী কথা শেফালি?

সে তোমাকে বাবা বলবে। যা বলবে ভেবে দেখো। দিদি খারাপ ছিল বলে ভেবো না যে আমরা সবাই খারাপ।

তা ভাবব কেন?

মালতী মারা গেছে এই দিনসাতেক হল। ধীরেশ সামন্ত বেঁচে গেছে। ঘটনাটা নিয়ে সারা গাঁয়ে ফিসফাস গুজগুজ চলছে তো চলছেই।

বজ্রবাহু একটা মুক্তির স্বাদ টের পায় বটে, কিন্তু তার আনন্দ হয় না। বরং একটু দুঃখই হল মালতীর জন্য। জীবনটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মিসমার করে দিয়ে গেল। নিজে মরল, খানিক মেরে রেখেছিল বজ্রবাহুকেও। মেয়েমানুষকে আজকাল একটু একটু ভয় পায় বজ্রবাহু।

নব হালদার সকালে তাকে ডেকে বলল, সব তো শেষ হয়ে গেল, দেখলে তো! মেয়েটাকে নিয়ে শান্তি ছিল না। এখন ভাবি, তোমাকেও কষ্টের মধ্যে ফেলেছিলাম হে।

না না, কষ্ট কীসের?

কষ্ট নয়? খুব কষ্ট। সবই টের পেতাম। কিন্তু একটা কথা বলি।

কী কথা?

সম্পর্কটা ছাড়ান-কাটান হোক আমি তা চাই না।

বজ্রবাহু চুপ করে থাকে।

তোমার দিকটা আমি যেমন দেখছিলাম তেমনই দেখব।

বজ্রবাহু চুপ।

একটা প্রাশ্চিত্তিরও হবে। বলছিলাম যদি শেফালিকে বিয়ে করো তবে সবদিক বজায় থাকে। সে ভারি ভালো মেয়ে। মালতীর একটা রক্তের দোষ ছিল হয়তো। কিন্তু শেফালি তেমন নয়।

শেফালি ভালো মেয়ে, আমি জানি। কিন্তু প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে হবে।

শোকাতাপা নব হালদার দুর্বল গলায় বলে, তুমি ঠকবে না বাবা, কথা দিচ্ছি। বজ্রবাহু বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলেছিল। শাশুড়ি আর শেফালি আড় হয়ে পড়েছিল।

শাশুড়ি মালতীর মতো চটক নেই। কিন্তু সে ভালো মেয়ে, এটা বুঝতে পারা শক্ত নয়। কিন্তু ভালো মেয়ে বলেই যে ঘাড় পাততে হবে এমন কোনও কথা নেই। চার বছর বাদে একটা সম্পর্কের গারদ থেকে মুক্তি পেয়েছে বজ্রবাহু। ফের আবার একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে তার মন চায় না। তাছাড়া এই বাড়ির অনুষঙ্গও তো আছে। শেফালিকে বিয়ে করলে এখানেই বাস করতে হবে। সেটা কি পারবে সে?

তবে নব হালদারকে চটাতেও চাইছে না বেজা, সবে তার ব্যবসা জমে উঠছে। নব চটলে কোন কলকাঠি নেড়ে তাকে পথে বসায় কে জানে। নবর পিছনে পার্টিও আছে।

সুধাপুর থেকে নবগঞ্জ পর্যন্ত টানা একটা ট্রিপ মারল বেজা, নবগঞ্জেই রাতের ঠেক। চেনা জায়গা। হরিরামের দোকানে মালখালাস করে সে পয়সা বুঝে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জোর শীত পড়েছে এবার। সুফল মিত্রের পাইস হোটেলে খেয়ে সে তার ম্যাটাডোরে রাত কাটাবে বলে ফিরছিল। দূর থেকে দেখতে পেল, অন্ধকারে কে একজন তার ম্যাটাডোরের পাশে দাঁড়িয়ে।

বেজা নাকি রে?

শক্তিদাদা যে! এখানে?

একটা ট্রাক ফেঁসেছে। তাই আসা। কে যেন বলল, তুইও এখানে। তাই ভাবলুম দেখাটা হয়ে যাক।

ভালো করেছো।

আজ ফিরবি না?

খামোখা তেল পুড়িয়ে লাভ কি। রাত কাটালে সকালে হয়তো একটা ট্রিপ হয়ে যাবে। মুকুন্দ হালদারের মাল যাবে বলে মনে হচ্ছে।

তা ইয়ে বলছিলাম কি, খুব বরাতজোর তোর।

মালতীর কথা বলছো তো!

খুব বেঁচে গেলি।

বাঁচলুম তো, কিন্তু মনটা ভালো নেই।

কেন বল তো!

নব হালদার ফের বেঁধে ফেলতে চাইছে।

সে কী?

তার ছোট মেয়ে শেফালিকে বিয়ে করার জন্য ধরে পড়েছে খুব। চটাতে ভরসা হয় না। ম্যাটাডোরখানাই তো ভরসা, যদি কেড়েকুড়ে নেই। তবে লোকবলও তো আছে।

একটু চেয়ে থেকে শক্তিপদ একটু হাসল, তা বটে। তবে অত ভয় খাস না।

শক্তিপদ এখনও মরে যায়নি।

তুমি আর কী করবে দাদা! সবই আমার কপাল।

শোন রে বাপু, অত কপালের ওপর বরাত নিয়ে বসে থাকিসনি। এবার একটু পুরুষ হ। লেখপড়া জানিস, বুদ্ধি আছে, শুধু সাহসটারই যা অভাব।

ঠিকই বলেছো। সাহসেরই অভাব। নইলে কি আর--যাকগে।

কথা দিয়ে ফেলিসনি তো?

না। সময় নিয়েছি।

ভালো করেছিস। কাল ফিরে একবার আমার বাড়ি যাস। কথা আছে।

ঠিক আছে দাদা। ব্যাপারটা কী।

বড় অশান্তি যাচ্ছে আমার। চিকিচ্ছের দরকার।

কার চিকিচ্ছে?

বলবখন।

পাঁচ

শক্তিপদর বউ পদ্ম রাগে ঝনঝন করছিল, আসকারা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে মাথায় তুলেছে, এখন যা মনে চায় তাই করে। তিনদিন মেয়ে কুটোটি দাঁতে কাটছে না। বলি এরকম কতদিন চলবে রে হতভাগী?

বিছানায় দক্ষিণের জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে বকুল। মুখখানা শুকনো। বলি রাগটা কার ওপর? কী চাস কী তুই?

বকুল কিছু বলছে না।

পদ্ম বলল, এরপর কি আমি গলায় দড়ি দেবো? তাই চাস?

বকুল চুপ করে চেয়ে আছে। জানালার বাইরে আতাগাছের ডালে ফিঙে পাখি নেচে বেড়াচ্ছে। দুটো প্রজাপতি ঢুকল ঘরে। ফের বেরিয়ে গেল।

মা!

পদ্ম ফিরে চাইল, কী?

আমার শীত করছে। লেপটা টেনে দাও তো গায়ে।

লেপ টেপে পদ্ম তার কপালে হাত রাখল। গলা নেমে এল খাদে, না জ্বর তো নেই। এক গেলাস গরম দুধ দিই মা, খা।

তুমি কেন বললে আমি তিন দিন খাইনি! আমি তো রোজ খাই।

সে তো এতটুকু করে। মুখরক্ষা করার জন্য। ও কি খাওয়া? বলি, উপোস দিচ্ছিস কেন রে মুখপুড়ি?

মনটা ভালো নেই মা।

কেন, সেটা বলবি তো!

পরে বলব। সময় হয়নি। বাবা কোথায় বলো তো!

তার কি আর সময়-অসময় আছে! এ সময়ে লোকজন আসে, ব্যবসাপত্তরের কথাই হচ্ছে হয়তো। ঘরসংসারে কি তার মন আছে? ওই তো আসছে বুঝি! খুব হন্তদন্ত দেখছি যেন!

শক্তিপদই। ঘরে ঢুকেই বলল, ওগো, মেয়ের চিকিচ্ছের ব্যবস্থা হয়েছে।

চিকিচ্ছে! কীসের চিকিচ্ছে?

সে আছে, তুমি বুঝবে না। তবে বজ্রবাহু এক কথাতেই রাজি।

কীসের রাজি গো! এ তো বড় সাঁটের কথা কইছো দেখি।

তা সাঁটই ধরে নাও। মেয়ে পেটে ধরেছো, এখনও ওর মনের কথা বুঝতে পারো না, তেমন মা তুমি? আমি চলি, মেলা লোক বসে আছে।

শশব্যস্তে চলে গেল শক্তিপদ।

ওটা! তুই মুখচাপা দিয়ে হাসছিস যে বড়! কী হল বল তো! এসব কী? আমি যে বুঝতেই পারলুম না।

দুধ দেবে বলেছিলে যে!

সে তো বলেছিলুম?

শিগগির নিয়ে এসো। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

জন্ম

কানাইয়ের খুব বিশ্বাস ছিল যে ভবেন বিশ্বেসই তার বাপ। তা বলে আইন মোতাবেক নয়। ওই যেমন হয় আর কি! তার মা শেফালি ভবেন বিশ্বেসের বাড়িতে দাসী হয়ে আছে কম করেও পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। এখনও খাটে। ভবেনের বিশাল বাড়ি, ময়দানের মতো তিনটে উঠোন, লাগোয়া মস্ত আম আর লিচু বাগান, মেলা নারকোল গাছ, সবজির খেত, পনেরোটা গরু নিয়ে বিরাট পাকা গোয়াল, সার সার মন চালের গোলা, চালকল, আটাচাকি, তেলকল মিলিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে মা লক্ষ্মী। আইন মোতাবেক ভবেনের চার ছেলে, তিন মেয়ে। না, কানাইকে তাদের মধ্যে ধরা হয় না। ধরতে নেই। তবে ভবেনের জনের দরকার, নইলে এতদিক সামাল দেবে কে? সুতরাং, কানাইও মাস মাইনে আর খোরাকি পায়, গতরে খাটে। বিশ বছর বয়সও হল তা। লেখাপড়াও শিখেছিল একটু। টেনেমেনে

মাধ্যমিকে পাস করার পর সে ভবেনের খাজাঞ্চি হরিপদর লাগোয়া হল। ভবেনই তাকে ডেকে বলে দিল, হিসেবের কাজটা শিখে রাখ, পরে কাজে দেবে।

হিসেবের কাজ সব বিকেলবেলায় হয়, সারাদিনের আদায় উসুলের পর। আর দিনমানে ফাইফরমাসের অভাব নেই। তারই ফাঁকে ফাঁকে সে ভবেনের ছড়ানো ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে হল, এ সবের একটা হিস্যে তারও ছিল। না, আইন মোতাবেক নয়।

শেফালি সোজা-সরল মানুষ। তার পেটে কথা থাকে না। তার ওপর ভবেন বিশ্বেসের মতো তালেবর লোকের সঙ্গ করার একটা বড়াইত তো আছে। একদিন বর নয়ন দাসের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটির পর ছেলেকে বলেই ফেলেছিল, তুই কি ওর মতো হেঁজিপেঁজির ছেলে? তোর আসল বাপ হল ভবেন বিশ্বেস। কলঙ্কের ব্যাপার একটা আছে বটে, কিন্তু গৌরবও তো কম নেই। শুনে একরকম খুশিই হয়েছিল কানাই। আর তারপর থেকেই সে রোজ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছে, ভবেন বিশ্বেসের সঙ্গে তার মিল কতটা। তা তার মা শেফালি দাসী মিছে বলেনি। কানাই হল লম্বাই চওড়াই সা জোয়ান ছেলে, আর তার আইন মোতাবেক বাপ নয়ন দাস হল খেঁকুরে চেহারার একরত্তি মানুষ। মেলে না। কিন্তু ভবেন বিশ্বেসের সঙ্গে মেলাও। খাপে খাপে মিলে যায়। ভবেন বিশ্বেস লম্বাই চওড়াই বিরাট মানুষ। রংটাও ফরসার দিকেই। কানাইয়েরও অবিকল তাই। মিল খুঁজে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল কানাই। দুঃখের কথা, বাপকে জ্যাঠা ডাকতে হয়, এই যা। তবে মনে মনে সে ভবেন বিশ্বেসকে বাবা বলেই ডাকে।

মনে মনে বাপ আর মুখে জ্যাঠা বলে ডাকাটা হল দু'নৌকোয় পা রেখে চলার মতো। সামাল দেওয়া মুশকিল। বাপ আর জ্যাঠা এমন গুলিয়ে যায় যে মাঝে-মধ্যে বিপত্তি দেখা দেয়।

মুনশির হাটের রজব আলি এসেছিল সেদিন পাখি নিয়ে। ভবনে বিশ্বেসের ছোট মেয়ে বিনীর খুব পাখি পোষার শখ। দরদালানে বিস্তর পাখির খাঁচা ঝোলানো। সারাদিন কিচিরমিচির, হেগেমুতে একশা করে। দুর্গন্ধে তেষ্টানো যায় না। তার মা শেফালিই সব পায়খানা পরিষ্কার করে। বাবুর মেয়ে পুষেই খালাস, ভোগান্তি অন্যের। তা বিনী একটা কথা-বলা ময়নার কথা বলে রেখেছিল। রজব আলি নিয়ে এসেছে সেদিন। কথায় কথায় রজব তাকে বলল, তুই তো শুনি সব কাজের কাজি। ইলেকট্রিকের কাজ জানিস, পাম্পসেট সারাতে পারিস, কাঠের কাজ জানিস, তা এত গুণ নিয়ে পড়ে আছিস কনে? মুনশির হাটের মহাজন মহাদেব পোড়েল লোক খুঁজছে। কাজের লোক পেলে হাজার দু-হাজার বেতন দেবে। যাবি?

কথাটা মিথ্যে নয়। লেখাপড়ায় তেমন দড় না হলেও কানাই হাতের কাজে খুব পাকা। পাম্পসেট, জেনারেটার থেকে শুরু করে এ বাড়ির যাবতীয় যন্ত্রপাতিই সে টুকুটাক সারিয়ে

দেয়। ভবেন বিশ্বেসের মেজ ছেলে গোবিন্দ ছাদে মস্ত ডিশ অ্যান্টিনা লাগিয়ে, ঘরে ঘরে কেবল কানেকশন দিয়েছে সে কাজও কানাইকেই করতে হয়। এ সবের জন্য বাড়তি পয়সাও পায় না সে। তার জন্য দুঃখও বিশেষ নেই তার। ভাবে, নিজের বাড়িরই তো কাজ।

রজব আলির প্রস্তাব শুনে সে উদাস মুখে বলে ফেলেছিল, বাপ-পিতেমোর ভিটে ছেড়ে কোথায় যাব রজব ভাই!

শুনে রজব হাঁ, বলল, এ আবার কবে থেকে তোর বাপ-পিতেমোর ভিটে হল রে? তোর বাপ তো নয়াগঞ্জের লোক! বাপের ভিটে এখানে দেখলি কোথায়?

বেফাঁস কথা। বুঝতে পেরে কানাই কথা ঘোরাতে লাগল।

রজব বলল, ভালো করে ভেবে দেখিস। মহাদেব বুড়ো হয়েছে। ভবেন বিশ্বেসের চেয়েও তার ভালো অবস্থা। দুগুণ-তিনগুণ হবে, ম্যানেজার গোছের লোক খুঁজছে। চাপাচাপি করলে দুই কেন, তিন হাজারেও রাজি হয়ে যাবে। আর বেতন ছাড়াও রোজগার আছে মেলা। সাত মেয়ের পর তার একটা মাত্র ছেলে। তা সে ছেলেও লায়েক হয়নি।

প্রস্তাব খুবই লোভনীয়। কিন্তু কানাইয়ের হল দু নৌকোয় পা। আইন মোতাবেক সে ভবেন বিশ্বেসের ওয়ারিশান নয় বটে, কিন্তু ধর্মত ন্যায্যত এই যে বিরাট বাড়ি, চাষের জমি, নানা কারবার এ সবের একটা অংশ তারও। এইটে ভেবে একটা সুখ আছে। সেই সুখ কি অন্য কোথাও পাওয়া যাবে?

কুমোরপাড়ার হিমি পিসির জাঁতির খিল খুলে গিয়েছিল। কানাইকে ধরে পড়ল, দে বাবা লাগিয়ে। তিরিশ বছরের পুরনো জিনিস। এমনটি আর পাওয়া যায় না। বকশিশ দেবোখন।

এ কথায় দেমাকে একটু লাগল কানাইয়ের। বলল, বকশিশের কথা কেন বলেন পিসি? ওসব দিতে হবে না। গায়ে ভদ্রলোকের রক্তটা তো আছে।

জাঁতিটায় রিপিট এঁটে যখন পৌঁছে দিল কানাই তখন পিসি তাকে আদর করে বসিয়ে একথা-সেকথার পর হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তুই তো ভদ্রলোকের ছেলে। তা অমন চাকরবাকরের মতো খেটে মরিস কেন?

কথাটার প্যাঁচ ধরতে পারেনি কানাই। ভালোমানুষের মতো বলে ফেলল, নিজের বাড়ির কাজ, লজ্জার কী আছে বলুন!

পিসি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, তাও তো বটে। আমরাও তো বলাবলি করি, কানাইয়ের চেহারাখানা দেখে কে বলবে ভদ্রলোকের ছেলে নয়? তেমনই লম্বা-চওড়া, তেমনই ফরসাটে রং, তেমনই হাত পায়ের গড়ন।

কানাই তবু প্যাঁচ ধরতে না পেরে প্রশংসা মনে করেই মিটিমিটি হাসছিল। হিমি পিসি নাড়ু আর জল খাইয়ে হঠাৎ আলটপকা বলে ফেলল, বুড়ো টসকাবার আগে একটু

বুঝেসুঝে নিস বাবা। তোর ন্যায্য দাবি আছে কিন্তু।

এ কথায় একটু থমকায় কানাই। তবে কি সবাই জানে নাকি? কথাটা তো সেদিকেই ইশারা করছে।

লজ্জারই কথা। কানাইয়ের লজ্জাও করছিল। কিন্তু একটু আনন্দও যে না হচ্ছিল তা নয়। জানাজানি হওয়ায় অন্তত ব্যাপারটা নির্যস সত্যি বলেই প্রমাণ হচ্ছে।

হিমি পিসি ভালোমানুষের মতো বলল, বুড়োকে ভাঙিয়ে কত লোক করেকর্মে খাচ্ছে, আর তুই আঁটি চুষছিস। আমরা তো বলি, অত ভালো ছেলে...

নাড়ু খেয়ে কানাই উঠে পড়ল।

দাবিদাওয়ার কথাটা অবশ্য সে ভাবে না। ওসব করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। মনে মনে এটুকু জেনেই সে খুশি যে, সে এটা তালেবর লোকের ছেলে। জানা বাপটা নয়, ছুপা বাপটাকেই তার পছন্দ।

গায়ে-গতরে আলিসান হয়ে ওঠার পর সে একদিন মেপে দেখেছে, ভবেন বিশ্বেসের চেয়েও সে দু-ইঞ্চি লম্বা। মাপজোখ করার সহজ উপায় তো ছিল না। তবে ভবেন বিশ্বেস যখন বারান্দার থামের পাশে দাঁড়িয়ে উঠোনে মুনিশদের ধান ঝাড়াই দেখে তখন মাথাটা থামের একটা চাপড়া-খসা জায়গায় পৌঁছায়। ওই মাপটা ধরে সে মেপে দেখেছে।

ইদানীং সন্ধের পর খাজাঞ্চির সঙ্গে তারও ডাক পড়ে ভবেনের ঘরে। মেঝের ওপর বিভিন্ন খাতে আসা টাকাপয়সার স্তূপ। গোনাগাঁথা, খাতায় হিসেব তোলা এসব ভবেনের চোখের সামনেই হয়। বুড়ো হরিপদর চেয়ে সে অনেক বেশি চটপটে বলে ভবেনের যেন একটু পক্ষপাত দেখা দিচ্ছে তার প্রতি।

একদিন সন্ধেবেলা খাজাঞ্চি চলে যাওয়ার পর ইশারায় তাকে বসতে বলেছিল ভবেন।

ভবেন গম্ভীর গলায় বলল, কত মাইনে পাস যেন?

তিনশো টাকা। আর খোরাকি।

কম নয় তো! নয়ন কত পায় জানিস?

আজ্ঞে, রোজ কুড়ি টাকা করে। খোরাকি আছে।

ও বাবা, সে তো পাঁচ-সাতশো টাকার ধাক্কা! আর তোর মা?

দেড়শো টাকা আর খোরাকি।

তা হলে একুনে কত হল?

হাজার কানেক হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবেন, বলে কত টাকা বেরিয়ে যাছে রে বাপ! তাই তো তেমন জমছে না আমার তবিলে।

কথাটা ঠিক নয়। তার ভবেন বাবা কত কামায় তার হিসেব কানাই ভালোই জানে। দিনে খরচখরচা বাদ দিয়ে আড়াই থেকে তিন হাজার। ফসলের সময়ে এর পাঁচ থেকে

সাত গুণ বেশি।

ভবেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যা যায় যাক। তবু তো গরিবরা খেয়েপরে বাঁচছে। কী বলিস?

যে আজ্ঞে।

আমার বাঁ হাঁটুতে আজকাল বড্ড ব্যথা হয়। বাতে ধরেছে। গনাকে একটু তামাক সাজতে বলে আয় তো। তারপর হাঁটুটা দাবিয়ে দে একটু।

পা দাবানোর হুকুমে খুশি হল কানাই। বাপ হলে কী হয়, চাকর আর মনিবের দূরত্ব তো আছেই। পা দাবানোর সুবাদে তবু একটু কাছাকাছি হওয়া গেল।

তামাকের সুন্দর গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে ভবেনবাবু বলল, তোর মা এসেছিল কাল, তোর হয়ে দরবার করতে। অনেক ধানাইপানাই করল। তা তুই কিছু খারাপ আছিস বাপু? এর চেয়ে বেশি কেউ দেবে গ্রামদেশে?

কথাটা বলার ইচ্ছে ছিল না, তবু কেমন যেন ফস করে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, একজন তিন হাজার টাকায় সাধছে আমাকে।

অ্যাঁ, বলে বড় করে চোখ মেলল ভবেন। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তিন হাজার! তা কাজটা কীসের?

ম্যানেজারি।

বলিস কী? কে সাধছে।

মুনশির হাটের মহাদেব মহাজন।

কে বটে লোকটা। কীসের কারবার?

তা জানি না। তবে মেলাই নাকি ব্যবসাপত্তর। জমিজিরেত।

সে তোকে ম্যানেজারি দিতে চায় কেন?

তার একজন চৌকস লোক চাই।

তোকে চৌকস ঠাউরেছে বুঝি?

এখনও ঠাওরায়নি। বাজিয়ে নেবে।

তোর কী ইচ্ছে? যাবি?

কথাটা বলার ইচ্ছে ছিল না। তবু কে যেন ভিতর থেকে জোর করে কথাগুলি ঠেলে বের করে দিল, আজ্ঞে বাপ-পিতেমোর ভিটে ছেড়ে কার যেতে ইচ্ছে হয় বলুন। তবে আতান্তরে পড়লে যেতে হবে।

কথাটা বলে ফেলে সে কর্তার দিক থেকে যেমনটা আশা করেছিল তেমনটা ঘটল না দেখে অবাক হল।

কথাটার মধ্যে যে প্যাঁচটা আছে সেটা হয় ধরতে পারল না, নয়তো এড়িয়ে গিয়ে ভবেন কিছুক্ষণ গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক খেয়ে গেল। তারপর হঠাৎ বলল, তোর তো

আর ভাইবোন নেই।

না, আমি একা।

হুঁ

আবার কিছু চুপচাপ।

তারপর ভবেন নলটা সরিয়ে রেখে বলল, তুই তো গোবিন্দর সঙ্গে কাজ-টাজ করিস। সে তোকে কিছু দেয়-টেয়?

না, আমি চাইনি।

চাসনি কেন?

কাজটি শিখে রাখলাম। বড়দার তেমন হয়ও না কিছু। কিন্তু যত বাড়িতে লাইন দিয়েছি তাদের অর্ধেকও ঠিকমতো পয়সা দেয় না। গত মাসেও তিন বাড়ির লাইন কেটে দিতে হয়েছে।

অসন্তুষ্ট ভবেন বলে, এককাঁড়ি টাকা জলে গেল। তখন বলেছিলুম গাঁ-গঞ্জে লোকের ভাতই জোটে না তো টি ভি দেখবে।

ঠিকমতো করতে পারলে হয়। লোকে না খেয়েও ওসব দেখতে চায়।

কিছু হবে বলছিস?

ধীরে ধীরে হবে। কারেন্ট থাকে না বলে লোকে অর্ধেক দিনই দেখতে পায় না কিছু।

সেটাই তো বলছি। ওসব বিলাসিতা কি এখানে মানায়। দেখুন কিছুদিন।

বেশির ভাগ ব্যবসাই তো ধারবাকিতেই ডোবে কিনা।

আজ্ঞে।

তা গোবিন্দ যা হোক কিছু করছে। আর তিনজন তো বসে বসে হেদিয়ে গেল।

বটু কী পড়ছে যেন?

আজ্ঞে ক্লাস এইট হল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবেন বলল, গতবার ফেল মেরেছে। অবিশ্যি পড়েই বা কী হবে? কাজ কারবারে লাগলে কাজ হতো। কিন্তু বাবুদের তো ইদিকে মনই নেই।

কথাটা জানে কানাই। দুঃখেরই কথা ভবেনের পক্ষে।

ভালো চোখে দেখেও না আমাকে।

বড় মানুষ হলেও ভবেন বিশ্বেসেরও দুঃখের দিক আছে। চার-চারটে ছেলের কেউই বাপকে যে বিশেষ গ্রাহ্য করে না এ সবাই জানে। তারা একটু বাবু গোছের, একটু আলগোছ। চাষ-বাস, মুনিশ খাটানো, চালকল, তেলকল এসব নিয়ে এই যৌবন বয়সে মাথা ঘামাতে তারা নারাজ। যতদিন মাথার ওপর বাপ বাবাজীবন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে ততদিন ঘামাবেও না।

ভয় কি জানিস, অন্ধি-সন্ধি চিনল না তো, আমি মরলে সব না উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়। আমার তো শত্তুরের অভাব নেই, আমি মরলে তারা এসে নানা শলা-পরামর্শ দেবে, মাথায় হাত বুলিয়ে সব গাপ করে ফেলবে।

সব বাবারই এক রা। কথা কিছু নতুন নয়। কানাই খুব যত্নের সঙ্গে তার ছুপা বাবা আর প্রকট জ্যাঠার বাঁ পায়ের হাঁটু দাবাতে দাবাতে দার্শনিকের মতো বলল, অত ভাবেন কেন? কপালে যা আছে তা তো হবেই।

এ কথায় ভবেনের হাঁটু চমকে উঠল। ভবেন চোখ কপালে তুলে বলে, বলিস কি? একটা জীবন কম কষ্ট করেছি! বাপ তো রেখে গিয়েছিল লবডংকা। খেয়ে না-খেয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই যে এতসব করলুম সে কি ভূতভুজ্যিতে যাবে নাকি?

এসব কথার জুতসই জবাব কানাইয়ের জানা নেই। সে বুঝল, ভবেন একটু সান্ত্বনা চাইছে, একটু বল-ভরসা। তোয়াজি কথা বললে কাজ হয় এ সময়ে। কিন্তু তার মাথায় আজ বোধহয় ভূতেই ভর করেছে। যা বলার কথা নয়, যেসব কথা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবে না, সেইসব কথাই যেন ভিতর থেকে অনিচ্ছেতেও ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সে নির্বিকারভাবে বলে, তা ছেলেপুলে তো আরও আছে আপনার। তাদের ওপরেই ভরসা করে দেখুন না।

বাপ-পিতেমোর ভিটে কথাটা ভবেন শুনেও শোনেনি। কিন্তু এ কথাটা জায়গা মতোই লাগল বোধহয়। ভবেন সোজা হয়ে বসে বলে, কী বললি কথাটা? অ্যাঁ! কী বললি রে হনুমান?

তটস্থ হয়ে কানাই বলে, কিছু ভুল বলুম নাকি বাবা?

ওই! ফের ওই বাপ-জ্যাঠায় গণ্ডগোল! মুখ ফসকে 'বাবা' ডাকে বেরিয়ে গেছে। ভবেন নীচু হয়ে নিজের একপাটি চটি তুলে নিয়ে কটাস করে কানাইয়ের পিঠে বসিয়ে চাপা গর্জন করে ওঠে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বেরো হারামজাদা, বেরো! আজই তোকে বরখাস্ত করলুম। ফের এ বাড়ির ছায়া মাড়ালে কেটে ফেলব। দূর হ সুমুখ থেকে।

পেট আর মুখের কথার তফাত রাখতে না জানলে মানুষের দুর্গতি হবেই। পেটে বাপ, মুখে জ্যাঠা বরাবর জবায় রাখতে পারলে টিকে থাকতে পারত। তা আর হল না। বাপের জুতো খেলেও আঁতে লাগে। তবে ভরসা এই যে, মনিবের জুতোয় যতটা আঁতে লাগে, বাপের জুতোয় ততটা নয়। মনকে এইটুকু বুঝিয়ে সে বেরিয়ে এল।

মা শেফালি দাসীকে কথাটা বলতে চায়নি সে। কিন্তু ভবেনের বাড়ি হচ্ছে খোলা হাট। ঘটনাটা দু-চারজনের চোখে পড়ে থাকবে। তাই বটে যেতে দেরি হয়নি।

রাতে শেফালি বলল, হ্যাঁ রে, কর্তা নাকি তোকে জুতোপেটা করেছে?

না, তেমন জোরে মারেনি। ওই একবারই--তা লাগেনি তেমন।

তা তুই করেছিলি কী। কর্তার টাকা পয়সা সরাসনি তো!

আরে না না, ওসব নয়। খামোকা ফস করে চটে গেল।

বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। সারাদিন জান চুঁইয়ে খাটছিস, ক পয়সা ঠেকায় তোকে? কাল গিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়ে আসবখন।

আরে না, ওসব করতে যেও না।

তা হলে চটি দিয়ে মারবে?

আহা, বাপ বলেই ধরে নাও না কেন? তাহলে আর তত গায়ে লাগবে না।

বাপ তো সে বটেই, কিন্তু তা বলে অপমান করবে কোন মুখে?

কথাটা চাউর হল খুব। শুধু দেখা নয়, সেদিন বৈঠকখানায় যা কথাবার্তা হয়েছিল তা আড়ি পেতে শুনেছেও কেউ কেউ। কথাটা এমনভাবে রটল যে, কানাই ভবেনের কাছে সম্পত্তির ভাগ চেয়েছে ছেলে হিসেবে।

আড়ালে লোকে গা টেপাটেপি করে হাসছে আর ভবেনের বাড়িতে মেজাজ চড়ছে।

সন্ধেবেলা গিন্নিমা ডেকে পাঠাল।

কানাইয়ের তেমন ভয়ডর হচ্ছিল না। মাথা উঁচু করেই গিয়ে গিন্নিমার ঘরে ঢুকল। ভবেন বিশ্বেসের বউ রোগাভোগা মানুষ। মুখ গম্ভীর, চোখে খর দৃষ্টি। তার দিকে চেয়ে বল, কী সব শুনছি?

কানাই হেঁটমুণ্ডু হয়ে বলল, খারাপ কিছু বলিনি। কথাটা ঘুরিয়ে ধরেছে লোকে।

গিন্নিমা উঠে ঘরের দোর দিয়ে এল। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলল, কতটা কী জানিস বল তো।

আজ্ঞে, আমি আর কী জানব। কিছু জানি না।

ঢং করতে হবে না। কর্তার কীর্তি কিছু কম নেই। কিন্তু বলি, তোর এত সাহস হয় কী করে?

দাবিদাওয়া তুলেছিলি?

আজ্ঞে না।

তোর মা তোকে বুদ্ধি-পরামর্শ দেয়নি তো! ও বোকা মেয়েছেলে, সব করতে পারে।

না, আমরা মা এর মধ্যে নেই।

আগেকার দিনের বড়লোকদের ওরকম কত মেয়েছেলে থাকত। তা বলে তাদের ছেলেপুলেরা দাবিদাওয়া তুলবার মতো বুকের পাটা দেখায়নি।

তোকে কে বুদ্ধি দিচ্ছে বল তো!

আজ্ঞে ওসব ব্যাপার নয়।

ব্যাপার নয় মানে? তুই কোন সুবাদে সেদিন কর্তাকে বাবা বলে ডেকেছিলি?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। অন্নদাতাও তো বাপেরই সমান।

এসবও তোকে কেউ শেখাচ্ছে। এই আমি বলে দিচ্ছি, মুখ থেকে আর কোনও বেফাঁস কথা বেরোলে কিন্তু কালু হাঁসুয়াকে খবর দিয়ে খুন করাব, বুঝেছিস?

কালু হাঁসুয়া ভাড়াটে খুনি, সবাই জানে। অন্য সময় হলে নামটা শুনে ভয় পেত কানাই। আজ যেন তবু ভয় হল না। শুধু বলল, বুঝেছি।

বিষয়-সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ালে রক্ষে থাকবে না, এটা ভালো করে জেনে যা।

কানাই চুপচাপ চলে এল।

দুদিন ধরে কাজকর্ম নেই। ঘরে বসে বসে মাজায় ব্যথা। তিনদিনের দিন সে একটু বেরোল। তালবাগানে কপিখেতের পাশে শীতের রোদে বসে বিড়ি ফুঁকছিল নিতাই। তাকে দেখে ডাকল, ওরে ওদিকে আয়। তোকে নিয়ে তো হুলুস্থূলুস কাণ্ড। বোস এখেনে।

তা বসল কানাই।

নিতাই বলল, নতুন কথা তো কিছু নয় রে। ওসব আমরা সেই কবে থেকেই জানি। বোকার মতো বলে ফেলে অমন চাকরিটা খোয়ালি। মুখ বুঝে থাকলে আখেরে লাভই হতো। তেলকলের ম্যানেজার তপন, ট্রাকটরের ড্রাইবার মদনা কেউ কি মুখ খুলেছে বল?

অবাক হয়ে কানাই বলে, তাদের আবার কী বৃত্তান্ত?

তোর যা ওদেরও তাই।

তার মানে?

তার কি ধারণা তুই একা ভবেন বিশ্বেসের বেআইনি ছেলে?

খুব হাসছিল নিতাই। কানাইয়ের তাতে গা জ্বলে গেল। বলল, প্রমাণ আছে?

সে কি তোরই আছে?

কানাই এই প্রথম ভবেন বিশ্বেসের ছেলে হিসেবে তেমন গৌরব আর বোধ করছিল না। বলল, না, প্রমাণ নেই।

তবে? তপন আর মদনাও জানে তারা কোত্থেকে এসেছে। তবে রা কাড়ে না। তাতে সুবিধে একটাই। কর্তা তার এসব বেআইনি ছেলেদেরে বিলিব্যবস্থা ঠিকই করে দেয়। তুই বাড়াবাড়ি করে ফেললি কিনা। চুপচাপ থাকলে দেখতিস পাকা বাড়ি হয়ে যেত, তলে তলে জমিজমাও করে দিত। কর্তা পাষণ্ড নয়। শত হলেও রক্তের সম্পর্ক তো!

কানাই একটু ভেবে দেখল, দুইয়ে চারই বটে। তপন নামেমাত্র ম্যানেজার হলেও কুল্যে ছশো টাকা বেতন পায়। তা তারও পাকা বাড়ি হয়েছে গত বছর। মদনারও বাড়ি উঠছে গোয়ালপাড়ায়। ট্রাকটর চালিয়ে সে হাজার টাকার বেশি পায় না। দুজনেই কানাইয়ের চেয়ে বড়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানাই উঠে পড়ল। মনটা বড্ড তেতো হয়ে গেল তার। সে ওদের মতো নয়। আদায় উশুলের পথে যায়নি কখনও। তার শুধু এই ভেবেই সুখ ছিল যে, আসলে সে ভবেন বিশ্বেসের ছেলে। সেই সুখটা হঠাৎ চড়াই পাখির মতো ফুরুত করে

উড়ে গেছে কোথায় যেন। তিনদন বাদে মুনশির হাটে মহাদেবের কাজে লেগে পড়ল কানাই। মহাদেব সোজাসাপটা মানুষ। প্রথম হাজার টাকা মাইনে, কাজ পছন্দ হলে তিন মাস পর থেকে দু হাজার আরও কাজ দেখাতে পারলে বেতন যে আরও বাড়ানো হবে সেটাও সাফ জানিয়ে দিল মহাদেব।

কাজের ধরন একই রকম। কানাইয়ের কাছে কাজ একটা নেশার মতো। খাটতে তার ভালোই লাগে। কাজ দেখে মহাদেবও খুশি। পাঁচটা কারবারে তার মেলা টাকা খাটছে। আর এ কথাও সত্যি যে মহাদেব ভবেনের চেয়েও বড়লোক।

দিনরাত কোথা দিয়ে উড়ে যেতে লাগল তা ভালো করে টেরও পেল না কানাই। বছরখানেক বাদে মহাদেব একদিন তাকে ডেকে বলল, তোমার কাজ দেখে খুশি হয়েছি বাবা। এখন থেকে তিন হাজার করেই পাবে। পুজোয় পার্বণী, জামাটা-কাপড়টা--এসব নিয়ে ভেব না।

কানাই ওসব নিয়ে ভাবে না। কাজে ডুবে থাকে। কালেভদ্রে গাঁয়ে গিয়ে চুপি চুপি মাকে দেখে আসে। তার বোকাসোকা মা পেটের দায়েই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক যে ভুলটা করেছিল তার জন্য আজকাল তার দুঃখই হয়। তার মনের মধ্যে এখন আর ভবেনকে নিয়ে বাপ-জ্যাঠার দ্বন্দ্ব নেই। সে ভবেনের কথা আর ভাবে না।

মহাদেবের ঠান্ডা লেগে জ্বর হওয়ায় একদিন সকালে তার গদি সামলাচ্ছিল কানাই। মহাদেবের কর্মচারীরা এখন তারই তদারকিতে থাকে। কাজও মেলা। বেলা দশটা নাগাদ একজন বুড়ো রোগা মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে এসে গদিতে ঢুকল।

কানাই প্রথমে গ্রাহ্য করেনি। লোক তো মেলাই আসে।

লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

কাকে খুঁজছেন? মহাদেববাবুর জ্বর, আজ আসেননি।

তোমাকেই খুঁজছি বাবা। আমি ভবেন বিশ্বেস। তোমার বাবা।

কানাই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন।

ভবেনকে চেনাই যায় না। বছরখানেকের মধ্যেই বুড়িয়ে খুনখুনে হয়ে গেছে। বসে একটু হাঁফ ছেড়ে বলল, নানা ব্যাধিতে শরীরটা শেষ হয়ে গেছে। তার ওপর মনের কষ্ট। বড় ছেলে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেছে বউ নিয়ে। মেজ জন মায়ের গয়না চুরি করে বোম্বাই না কোথায় পালিয়ে গেছে। সেজ ব্যবসা করতে গিয়ে পথে বসেছে। ছোটটাও শুনছি মদটদ খায়। আমার অবস্থা বড় খারাপ।

খুব মন দিয়ে শুনল কানাই। তারপর বলল, তা এখন কী করবেন?

বিষয়সম্পত্তি যে যায় বাবা কানাই। চারদিকে ষড়যন্ত্র। চারদিক থেকে নানা ফন্দিফিকির নিয়ে লোক আসছে। শুনি, তুই মহাদেবের কাজকারবার নাকি ফাঁপিয়ে

ফুলিয়ে তুলেছিস। সবাই তোর সুখ্যাতি করে। তা বাবা, আমাকে রক্ষে কর। এসে বিষয়-সম্পত্তি সামাল দেয়। যা চাস দেব। শত হলেও তুই তো আমারই সন্তান।

কানাই একটু হাসল। বলল, একসময়ে আমারও কথাটা ভেবে খুব অহংকার হতো। কিন্তু আজ আর হচ্ছে না কর্তাবাবু।

ভুলভ্রান্তি যা হয়েছে, মাপ করে দে। সত্যিই বলছি তোকে, ওরা আর আমার কেউ নয়। ফিরেও তাকায় না। আজ ভাবি অবৈধ ছেলে হলেও তোর বরং একটু মায়াদয়া ছিল। বড্ড ভুল করে ফেলেছি বাবা।

কিন্তু আজ যে আর আপনাকে আমার বাবা বলে মনে হয় না কর্তাবাবু। একদিন এমন ছিল, আপনাকে বাবা বলে ডাকার জন্য প্রাণ আনচান করত। আজ যে সেই ইচ্ছেটা মরে গেছে।

না হয় না-ই ডাকবি? তবু ফিরে চল। মহাদেব যা দেয় তা চেয়ে আমি দু-চার হাজার বেশিই দেব।

বিষয়সম্পত্তির ভাগ দেবেন?

আইনে তো তা মানবে না, তবে পুষিয়ে দেব।

কানাই খুব হাসল, আপনার আইনের ছেলেরা যেমনই হোক, বাপকে যতই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক, বিষয় তারাই পাবে। আর এই আমরা যারা আপনাদের মতো লোকের কামকামনার অবৈধ সন্তান, যত ভালোই হই আমাদের কপালে ঢুঢু। দুনিয়াটা ভারি মজার জায়গা মশাই।

দুটো কাঁচা গালাগালও যদি দিস তো দে। বড্ড আতান্তরে পড়ে এসেছি রে বাবা, রক্ষে কর।

আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন জানেন?

জানব না কেন? তোর সাহায্য চাইতেই আসা।

সে তো ঠিকই। পয়সা ছড়ালে ম্যানেজার আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু কানাই দাসের মতো এমন বশংবদ পাবেন না। আপনি ভালোই জানেন, কানাই আপনার অবৈধ সন্তান, সে আপনাকে বাবা বলে ভাবত, আপনার বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করতে দিনরাত বেগার খাটত, নামমাত্র মাইনে পেত, তবু অন্য কোথাও যেতে চাইত না। তাকে তাড়িয়ে ভুল করেছিলেন বটে। সেটা বুঝতে একটু দেরিও করে ফেলেছেন। আজ আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন কেন জানেন?

কেন?

আপনার বিশ্বাস কানাই গিয়ে ফের বুক দিয়ে সব আগলাবে। বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করবে যতদিন না আপনার বৈধ সন্তানেরা এসে ভার নিচ্ছে। ঠিক বলছি তো কর্তাবাবু?

না, না, ওরকম ভাবিসনি।

কর্তাবাবু, একসময়ে কানাইয়ের আপনার মতো একজন বাবার দরকার ছিল।
আজ আর নেই।
ভবেন স্তূপাকার হয়ে বসে রইল?

রাসমণির সোনাদানা

সন্ধেবেলা বেরোবে বলে চুল আঁচড়াচ্ছিল রাঙা। আয়নার সামনে দাঁড়ালে বরাবর তার মন ভালো হয়ে যায়। অনেকে বলে তার মুখশ্রীতে একটা ধ্রুপদী আদল আছে। যেমনটা পটচিত্রে বা ঠাকুরদেবতার ছবিতে দেখা যায়। খুব নিখুঁত গড়নের মুখ। সরু চিবুক, ছোট কপাল, পাতলা ঠোঁট, থুঁতনিতে একটা আবছা খাঁজ, গালে টোল এবং চোখ। হ্যাঁ, তার চোখ নাকি অনেকের সর্বনাশ করে বসে আছে। এতটা নিখুঁত হওয়া কি ভালো? তার নিজের তো বাপু তেমন পছন্দ নয় ব্যাপারটা। বরং একটু লম্বাটে মুখ হলে সে খুশি হত। একটু খুঁতটুত থাকা কিছু খারাপও তো নয়। একটু খুঁত সৌন্দর্যকে বরং কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। তবু আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার খুশি হওয়ার কারণ আছে।

খুব মন দিয়ে একদম কপালের মাঝখানে একটা লাল টিকলি পরছিল সে। ঠিক সেই সময়ে আয়নার তার পিছনে একটা চকিত সাদা রঙের ঝলক যেন উদ্ভাসিত হয়েই সরে গেল। ভারি অবাক হয়ে ঘাড় ঘোরালো রাঙা। ঘর ফাঁকা, দরজা বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। তবে কি ভুল দেখল? না কি এই বয়সেই চোখের দোষ হল তার! স্পষ্ট দেখেছে।

ঘরখানা মস্ত বড়। একখানা সেকেলে বিশাল কারুকাজ করা পালঙ্ক। সাবেক আমলের মেহগনি কাঠের কয়েকটা আলমারি, ব্রিটিশ আমলের নামি দোকানের থ্রি পিস আয়নাওলা ড্রেসিং টেবিল, গরম জামাকাপড় রাখার জন্য বড় চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। এই ঘরে থাকতেন রাসু ঠাকুমা। সম্পর্কে তার বাবার পিসি। বালবিধবা। এখনও পশ্চিমের দেওয়ালে রাসমণির একখানা রঙিন ব্লো আপ করা ফটো বাঁধানো আছে কারুকার্যময় ফ্রেমে। এ ঘরে সেই কোন আদ্যিকালের গন্ধ যেন এখনও বিদ্যমান। আর ফটোর ওই মুখখানা, ও মুখ যেন রাঙার সঙ্গে অদল বদল করা যায়।

দেশ থেকে কিছুদিন আগেই তাদের বিস্মৃত অতীতের এক বুড়োমানুষ এসেছিল দেখা করতে। পূর্ব পাকিস্তানের নানা অসুবিধের কথা বলছিল বসে। হাপরহাটি, খানসেনা, রাজাকার এসব কথা কানে এসেছিল রাঙার। দেশ নিয়ে বাপ-জ্যাঠাদের ভীষণ আবেগ আছে এখনও। রাঙার নেই। তার জন্ম এদেশে। পার্টিশনের অনেক পরে। সেই বুড়ো লোকটার সামনে দিয়েই যখন সে কলেজে যাবে বলে বেরোচ্ছিল, তখন লোকটা হঠাৎ বড়

বড় চোখে চেয়ে আর্তনাদের গলায় বলে উঠেছিল, আরে, এ যে রাসু ঠাইরেন! এক্কেরে রাসু ঠাইরেন!

রাঙা চমকায়নি, তাকে আর রাসমণিকে নিয়ে এ বাড়িতে একটা চাপা ফিসফাস আছে। প্রকাশ্যে কেউ তাকে কিছু বলে না। কিন্তু বাড়ির লোকের ধারণা, রাসমণিরই পুনর্জন্ম ঘটেছে রাঙার মধ্যে।

ওসব অবশ্য রাঙা মানে না। এক বংশে একরকম দেখতে দুটো মানুষ জন্মাতেই পারে। এসব জিন-এর ব্যাপার। পুনর্জন্ম-টন্ম সে বিশ্বাস করে না। তবে সে বুঝতে পারে, তাকে রাসমণির পুনরাবির্ভাব ভেবে এবাড়ির লোকেরা একটু ভয়ও পায় যেন। এটার কোনও স্পষ্ট প্রকাশ নেই। তবে রাঙা টের পায় এবং ব্যাপারটা উপভোগও করে। বাড়ির লোক বলতে অবশ্য তার মা বাবা, ছোট ভাই জয়, আর কাকা কাকিমা। কাকা কাকিমার ছেলেপুলে নেই। আর যারা আছে তারা কিছু জ্ঞাতি, কিছু আশ্রিত, পূর্ববঙ্গে তাদের বাড়িতে এরা থাকত। এখনও আছে।

এই যেমন রাখালকাকা। এক সময়ে এ বাড়ির লোক ছিল। তার তিন কুলে কেউ নেই। এখন বুড়ো হয়েছে। দীর্ঘকালের অধিকারবোধ থেকে সে এখন এ বাড়ির একজন অভিভাবক গোছের। আছে নবদাদু আর ঠাকুমা। নবদাদু হল রাঙার ঠাকুরদার পিসতুতো ভাই। কোন সূত্রে যে এসে পড়েছিল এ বাড়িতে কে জানে! কিন্তু রয়ে গেছে। আছে শ্যামাপদ জেঠু, আত্মীয় নন, একসময়ে তাদের এস্টেটে আদায় উসুলের কাজ করতেন। পরিবারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চলে এসেছেন। তিনি কাজের লোক, এ বাড়ির বাগানখানা তাঁর হাতের গুণেই ভারি দেখনসই হয়েছে। এদের মাঝখানেই বড় হয়েছে রাঙা। এদের কাউকে পর বলে মনে হয়নি কখনও। ঘাড়ে বসে খায় বলে মা বাবা বা কাকা কাকিমা কখনও অনুযোগ করে না। দেশের বাড়িতে এরকম আরও অনেক লোক খেত, থাকত। এ পরিবারের ঐতিহ্যই তাই। তবে পাকিস্তান থেকে চলে আসবার পর ঠাঁটবাট বজায় রাখতে একসময়ে সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল তারা, এ গল্পও শুনেছে রাঙা। আরও একজন আছে এ বাড়িতে। তার নাম বেণু। রাঙার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। তার ঠাকুরদা এ বাড়ির বুড়ো কর্তার খাস চাকর ছিল। সা জোয়ান চেহারা। শোনা যায় তার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। কারও কারও সন্দেহ তাকে মেরেছিল বুড়োকর্তার পাইকরাই। বেণু এ বাড়ির আশ্রিত এবং চাকরের নাতি বলে তার সামান্য হীনম্মন্যতা আছে। তবে এ বাড়ির পরবর্তী প্রজন্ম তাকে দূরছাই করেনি, গতরেও খাটায়নি। বেণু লেখাপড়া শিখেছে। ছাত্র আন্দোলন করে। একটু আধটু পলিটিকসও। তবে মাঝে মাঝে সে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। তার জন্য বকুনিও খায় খুব। মৃদু মৃদু মিষ্টি হাসি। সে বকুনি-টকুনি সব হজম করে নেয়। রাঙা জানে, বেণু দেখতে নরম-সরম লাজুক প্রকৃতির হলেও ভারি জেদি। বেশ সাহসীও। এই মফসসল শহরে সে

ছেলেছোকরাদের পান্ডা গোছের লোক। ক্লাব, পুজো কমিটি, নাগরিক কমিটি সবতাতেই সে অপরিহার্য।

তিনতলা থেকে নামবার সময় আজ সন্ধেবেলা একটু আনমনা লাগছিল রাঙার। তিনতলাটা একদম ফাঁকা। চারটে ঘর, দরদালান, স্টোর রুম, ওপেন টেরাস নিয়ে কম জায়গা নয়। এ-তলাটায় রাঙা ছাড়া কেউ থাকে না। আর একা এই পুরো একটা ফ্লোর নিয়ে থাকাটা রাঙার ভারি পছন্দ। গত চার বছর ধরে সে এখানে আছে। শোওয়ার ঘর ছাড়াও আছে স্টাডিরুম আর লাইব্রেরি, আর একটা ঘর নিজের মনের মতো সাজিয়ে সে ড্রয়িং রুম করেছে, বন্ধুবান্ধব এলে হইহই করে আড্ডা হয়। চতুর্থ ঘরটায় একটা নিজস্ব জিম করার ইচ্ছে আছে। তবে আপাতত তাতে ডাঁই হয়ে আছে সাবেক আমলের বেশ কিছু বাড়তি অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

একতলায় নেমে সে মায়ের ঘরের দরজার সামনে একটু দাঁড়ায়। সরযূবালা এই ভরসন্ধেবেলাতেও চোখে চশমা এঁটে একটা লম্বা ফর্দ দেখছিল। এই মহিলাকে রাঙা কখনও অলস সময় কাটাতে দেখেনি জ্ঞান হয়ে অবধি। সরযূবালা প্রতাপশালী মহিলা নয়। ডাকসাইটে নয়। তার হাঁকডাক, তর্জন-গর্জন কখনও কেউ শোনেনি। বরং মিষ্টি মুখশ্রীর এই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা মহিলাটি শ্বশুর শাশুড়িদের কাছে নতমুখেই থাকত। কিন্তু রাঙা মাকে চেনে। অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে তার মায়ের কোনও তুলনাই হয় না। সরযূবালাই এই পরিবারটিকে নিঃস্ব ভিখিরি হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সকলের অমতে খুলেছিল শাড়ির দোকান। রাসমণির দোকান, এই শহরে আজও এত গুডউইল আর কারও নেই। রাসমণির দোকান হল রিটেল আউটলেট। সরযূবলা সেই সঙ্গে পাইকারি ব্যবসাও চালু করেছে। রাঙা শুনেছে দেশে তাদের জমিদারির আয় ছিল বছরে সাত লক্ষ টাকা। কিন্তু রাসমণির দোকান আর পাইকারি ব্যবসা থেকে এখন তাদের আয় আরও অনেক বেশি। আর সেটা শুধু সরযূবালার জন্যই। একটা পরিবারকে মহাপতনের হাত থেকে ওই স্থিরবুদ্ধির শান্ত মহিলাই টেনে তুলেছে। গোটা পরিবার এই মহিলাকে মেনে চলে।

মা!

সরযূবালা মুখ ফিরিয়ে তাকায়, বেরোচ্ছিল বুঝি?

আজ কাকলির জন্মদিন।

রাত কোরো না। একটা চাদর টাদর নিলে পারতে। সন্ধের পর আজকাল হিম পড়ে।

ভ্যাট। এত সুন্দর করে শাড়িটা পরলাম, এর ওপর চাদর চাপালে বিচ্ছিরি দেখাবে না। মোটেই হিম পড়েনি।

সরযূবালা আর কিছু বলল না।

মা।

সরযূবালা ফের তাকায়, কিছু বলবি?

আমি যখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে সাজছিলাম তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল।

সরযূবালা একদৃষ্টে চেয়ে বলে, কী হল?

মনে হল একটা সাদা কাপড়পরা কেউ আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েই চোখের পলকে সরে গেল।

ঘরের জোরালো টিউবলাইটের আলোয় দৃশ্যতই সরযূবালার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ও ঘরে তোকে আর শুতে হবে না।

ও মা! কেন বলো তো!

সরযূবালা মাথা নেড়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলে, আমি আর তোকে ও ঘরে থাকতে দেব না। সারা বাড়িতে কত ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। নব জ্যাঠাদের পাশের ঘরটাতে আজই বিছানা পাতিয়ে রাখছি। শুবি।

পাগল হলে মা? তিনতলায় তো আমি বেশ আছি। আমার একটুও ভয় করে না তো!

সরযূবালাকে ক্লান্ত চিন্তিত বিষণ্ণ লাগছিল এখন। বলল, তোমার ভয় না করলেও আমার করে।

মা, একটু ভেবে দেখ। এক দিন দু দিন নয়, আমি টানা চার বছর তিনতলায় একা আছি। কখনও তো ভয় পাইনি।

তোমার প্রাণে কি ভয়ডর আছে মা? এই তো জয় সেদিনই বলছিল, মা, দিদি আরশোলা ছাড়া আর কিছুই ভয় পায় না কেন বলো তো?

ওটা তো ভীতুর ডিম। আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই ওকে ওরকম বানিয়েছ।

তোমার আদর বুঝি কম?

আমি তা বলে প্যামপার্ড নই ভাইয়ের মতো।

তর্ক থাক। আমি চাই না, তুমি আর তিনতলায় থাকো।

একটা কথা বলবে মা?

কী কথা?

কথাটা তুমি আমাকে কখনও বলোনি। আমি রাখালকাকার কাছে শুনেছি। তুমি নাকি রাসুঠাকুমার ভূতকে দেখতে পেতে।

সরযূবালা ফর্দটার দিকে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বলল, ওদের ওরকমই সব কথা। রাখালদার ভীমরতি হয়েছে।

আর আমিই নাকি রাসমণি?

সরযূবালা বিরক্ত হয়ে বলে, জানি না। এখন যা তো! মোট কথা আজই কিন্তু আমি ছগন আর বলাইকে পাঠাব তোর বিছানা তুলে নিয়ে আসতে।

না মা, ওটা কোরো না। সাদা কাপড়ের ঝলকটা যদি রাসুঠাকুমারই হয় তা হলে আমাদের একটা ধারণা ভুল বলে প্রতিপন্ন হবে।

কীসের ধারণা?

তোমাদের তো ধারণা আমিই আগের জন্মের রাসমণি? রাসমণির ভূত যদি ফের দেখা দেয় তা হলে বুঝতে হবে রাসমণি আমি হয়ে জন্মায়নি!

সরযূবলা চুপ করে মেয়ের দিকে চেয়ে রইল।

আরও একটা কথা মা। রাসমণি যদি এতদিন পরে হঠাৎ ফের হাজির হয়েই থাকে তা হলে বুঝতে হবে তার কোনও জরুরি প্রয়োজন আছে।

বড্ড বাড়াবাড়ি করছ বাসন্তী।

রাসমণি তো আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি মা। বরং আমাদের অনেক উপকারই হয়েছে। আমি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই যে আজকের ঘটনাটা চোখের ভুল নয়, ওই সাদা কাপড়ের আভাসটা আসলে রাসুঠাকুমারই থানকাপড়, তা হলেই বা ভয়ের কী? বরং আমার কৌতূহল হচ্ছে, ঠাকুমা আমাকে কী বলতে চায়!

ঠিক আছে, তুমি যদি দোতলায় আসতে না চাও তা হলে আমিই আজ তোমার সঙ্গে শোবো। খাটটা তো মাঠের মতো বড়, কোনও অসুবিধে হবে না।

না মা, তাও হবে না। তুমি থাকলে রাসুঠাকুমা যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে না চায়? আমার সঙ্গে তার কোনও গোপন কথা থাকতে পারে! তুমি কাছে থাকলে আসবেই না হয়তো।

সরযূবালা বিরক্ত গলায় বলল, সে বুঝি খুব ভালোমানুষ ছিল! কম জ্বালিয়েছে আমাদের? বেঁচে থাকতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে, মরে গিয়েও কম পিছু লাগেনি বাবা।

তা হলে তুমি তোমার দোকানের নাম রাসমণির দোকান রাখলে কেন মা? মানুষটাকে যদি এতই ঘেন্না তোমার, তা হলে আমিই সেই রাসমণি জেনেও আমাকে এত ভালোবাসছ কি করে?

আমি কি তোমাকে বলেছি যে, আমি তোমাকে রাসমণি বলে মনে করি?

বলতে হয় না মা। এ-বাড়ির কেউ কথাটা আমাকে মুখ ফুটে কখনও বলেনি, কিন্তু গুঞ্জনটা আমার কানে আসে। আমি টের পাই।

তা যদি হয়েও থাকো তা হলেও রাসুপিসি আর তুমি তো এক নও। তার জীবন আলাদা, তোমার জীবন আলাদা। এখন এসো গিয়ে। দেরি করে বেরোলে ফিরতে দেরি হবে।

রাঙা বেরিয়ে পড়ল। মুখে একটু দুষ্টুমির হাসি। তার বুদ্ধিমতী ব্যক্তিত্বময়ী মাকে জব্দ করা বড় সহজ কাজ নয়। আজ একটু জব্দ করতে পেরে তার বেশ খুশি-খুশি লাগছে।

আসলে সে মাকে ভীষণ ভালোও বাসে। কিন্তু মা সবসময়ে এত সিরিয়াস, এত গোমড়ামুখ যে, ওই কঠিন আস্তরণটাতে মাঝে মাঝে একটু আধটু আঘাত করতে ইচ্ছেও করে। ফিরে এসে সে আজ মাকে খুব আদর করবে।

কাকলির বাড়িতে আজ অনেক লোক। বন্ধুরা তো আছেই। তা ছাড়া কয়েকজন অচেনা ছেলে আর মেয়েকেও দেখতে পেল রাঙা। এ শহরের সকলেই তার চেনা বা মুখচেনা কিন্তু এই চার-পাঁচজনকে সে আগে কখনও দেখেনি। কয়েকটা চেয়ারে, ঘরের কোণের দিকে তারা বসেছিল চুপচাপ। রাঙা বড় হলঘরটায় ঢুকতেই একটা হুল্লোড় উঠল, রাঙা এসেছে! রাঙা এসেছে!

কাকলি এসে তার হাত ধরে বলল, বড্ড দেরি করলি মুখপুড়ি। তুই না এলে জমে? শিগগির গান ধর।

রাঙা এ শহরের এক নম্বর গায়িকা। সব ফাংশনে তাকে গাইতে হয়। সুতরাং সে তৈরি হয়েই এসেছে। ব্যাগ থেকে গানের খাতা বের করে সে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেল। তবলায় তার অনেকদিনের সঙ্গতকার সেই তন্ময়।

পরপর খান সাতেক গান গেয়ে যখন দম নিচ্ছে তখন ঘরের কোণ থেকে অচেনা ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে একজন একটু মোটাসোটা চেহারার ছেলে উঠে এসে সামনে দাঁড়াল, আপনে তো বড় ভালো গান করে! গলায় জোয়ারি আছে।

রাঙা একটু হাসল। প্রশংসা পেয়ে সে অভ্যস্ত।

ছেলেটা করুণ মুখ করে বলল, আমিও গান করি। ঢাকা রেডিয়োতে মেলা প্রোগ্রাম করছি।

কথায় সুস্পষ্ট বাঙাল টান লক্ষ করল রাঙা। বলল, কী গান আপনি?

মেইনলি ভাটিয়ালি আর ভাওয়াইয়া, দমের গান করি।

বাঃ, তাহলে শোনান না। আপনি একজন রেডিয়ো আর্টিস্ট আর চুপচাপ বসে আছেন!

ছেলেটা করুণ মুখে মাথা নেড়ে বলে, ইচ্ছা করে না, বুঝলেন? গান গাইতে হইলে মনটায় একটু আনন্দ থাকা লাগে। দ্যাশের যা অবস্থা, আমরা তো পলাইয়া আইছি। গলায় গান ফুটবে না।

কেন, কী হয়েছে আপনার?

শোনেন নাই? ইস্ট পাকিস্তানে শয় শয় মানুষরে মাইরা ফালাইছে!

ও হ্যাঁ, খুব খারাপ অবস্থা নাকি?

কওনের না। আমরা তো পলাইছি। কিন্তু সকলে তো পারে নাই। মরত্যাছে, আমার আব্বাজান মাটি কামড়াইয়া পইড়্যা আছে। তার কোনও খবর নাই।

মনটা খারাপ হয়ে গেল রাঙার। কত বয়স হবে ছেলেটার! বড়জোর সাতাশ আঠাশ। এই বয়সে একজন উদীয়মান গায়কের এ কিরকম দূরবস্থা!

কাকলি এসে বলল, তোর সঙ্গে পরিচয় করানো হয়নি। ওর নাম আবুল কাদের। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে তাড়া খেয়ে। আমাদের কেমিস্ট্রির প্রফেসর রউফ সাহেবের বাড়িতে এসে উঠেছে। মন খারাপ করে থাকে বলে আমি ওদের আজ নেমন্তন্ন করে এনেছি। কী অন্যায় বল তো, বাঙালি হয়ে জন্মানোটা কি অপরাধ?

রাত্রিবেলা খাওয়ার টেবিলে একটা থমথমে ভাব। রাঙা, বাবা কাকা আর নবদাদুর কাছে ঘটনাটা বলছিল। দেখা গেল তারা সবাই পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার কথা জানে।

বাবা বলল, আমাদের গ্রামের বাড়িটা তো আমরা বিক্রি করিনি। এস্টেটের কর্মচারী গফুর মিঞা বাড়িটা আগলে রেখেছিল। পরশুদিন শুনলাম, সেখানে মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছে। বাড়ি দখল করে তারা জিনিসপত্র লুটপাট তো করেছেই, গফুর মিঞা আর তার ছেলেদের দিয়ে নাকি বেগার খাটিয়ে মারছে, মারধোর করছে। শেষে হয়তো মেরেই ফেলবে।

দেশের প্রতি তার বাপ-কাকার যে গভীর টান আছে সেটা রাঙার নেই ঠিকই, তবে কথাটা শুনে আজ তারও একটু কষ্ট হল। দেশের বাড়ি সে দেখেনি, কিন্তু অনুপুঙ্খ বিবরণ বহুবার শুনেছে। উঁচু দেওয়াল আর পাম গাছে ঘেরা দশ বিঘে জমির ওপর ছিল তাদের দোতলা বিরাট বাড়ি। তার দুটো মহল। সামনের দিকে কাছারিঘর, বৈঠকখানা, নাচঘর, চাকরদের থাকার জায়গা, আর ভিতরের দালানে অন্দরমহল। অনেকবার বাড়িটাকে মনশ্চক্ষে কল্পনা করে নিয়েছে সে। তেমন টান না থাকলেও, ওটা যে তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটে সেটা তো অস্বীকার করা যায় না, দেশভাগ না হলে সেও তা আজ এই বাড়িতেই থাকত!

বাবা হঠাৎ বলল, তর বলে আইজ সন্ধ্যাবেলা কী একটা হইছে! তর মায় কইতাছিল!

রাঙা হেসে বলল, চোখের ভুলই হবে। ওটা কিছু নয়।

তর একলা ওই ঘরটার মইধ্যে থাকনের কাম কি?

না না, আমি ভয়টয় পাইনি। ভূত নয় বাবা, ভয়ের কিছু নেই।

বুইঝ্যা দেখিছ, তর মায় তো একসময় রাসুপিসির ভূতরে দেখত।

রাঙা হেসে বলল, তোমাদের তো ধারণা আমিই সেই রাসমণি, রাসমণি যদি আবার জন্মে থাকে তাহলে আর ভূতের তো অস্তিত্ব থাকার কথা নয়।

কাকা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার বলল, কাউরে লগে লইয়া শুইলেই তো হয়। তার কাকিমা গিয়া শুইব তর লগে?

আচ্ছা কাকু, তোমরা কী বলো তো! মানুষ তো কত ভুলটুল দেখে। এত টেনশনের কী আছে? মাকে বলেই বড্ড ভুল হয়ে গেছে দেখছি।

কাকা আর কিছু বলল না, তবে চিন্তিত মুখে বসে রইল।

দুই

রাতে ঘরে শুতে এসে কিছুক্ষণ আয়নার সামনে চুপ করে বসে রইল রাঙা। মনটা খারাপ লাগছে, সবসময়ে মন খারাপের কারণটা ধরা যায় না। হয়তো একটা কারণ নয়, অনেকগুলো ছোট ছোট কারণ মিলিয়ে মনটা মেঘলা হয়ে থাকে। সে একটু সচেতনভাবেই বসেছিল। পিছনে কি সাদা ঝলকটা ফের দেখা দেবে? দিক না। যদি সত্যিই ভূত আসে, রাসমণির ভূত, সে তো ভয় পাবে না, সে কথা বলবে।

বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল রাঙা। ঘষে ঘষে খুব যত্ন করে মুখে ক্রিম মাখল। চুল আঁচড়াল ভালো করে। মুখখানা মন দিয়ে দেখল অনেকক্ষণ।

যখন শুতে যাবে বলে মশারিটা তুলেছে ঠিক সেই সময়ে তার পিছনে একটা স্পষ্ট দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল রাঙা। ঘর ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই, আবার কি মনের ভুল? হয়তো বাইরের ঝটকা বাতাস জানালা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে শব্দটা তুলেছে। হতেই পারে।

আচমকা দেওয়ালে রাসমণির ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই রাঙা প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিল। এ কী! রাসমণির ছবির দুটো চোখ ওরকম জ্বলন্ত আর জীয়ন্ত হয়ে উঠেছে কেন? তীক্ষ্ণ সাঙঘাতিক দুটো চোখ যেন ফুটো করে ফেলছে তাকে! পর মুহূর্তেই আবার ছবির চোখ ছবি হয়ে গেল।

বুকটা ধকধক করছে রাঙার। এসব বোধহয় তার মনের কল্পনা। সন্ধেবেলা ওই থানকাপড়ের ঝলক তার মনের মধ্যে বাসা করে আছে। আর তাই থেকেই এসব জটিল কল্পনা তার চারদিকে দৃশ্য আর শব্দ তৈরি করছে।

জল খেয়ে সে শুকনো গলাটা একটু ভিজিয়ে বিছানায় ঢুকে পাতলা কাঁথাখানা গায়ে টেনে নিয়ে বেডসুইচ টিপে আলো নিবিয়ে দিল। আজ কি ঘুম আসবে তার?

ঘর অন্ধকার আর নিঃশব্দ হয়ে গেল। নিঃসাড়ে শুয়ে রইল বাসন্তীরাঙা। তার কি ভয় করছে? তার কি একা লাগছে? তার কি মা বা কাকিমা কাউকে ডাকা উচিত?

মাথটা কিছুক্ষণ গরম রইল। তারপর কখন নিজের অজান্তে চোখে ঘুমের ভার নেমে এল।

রাত কত হবে কে জানে, বুকে একটা চাপ টের পেতেই ঘুম ভেঙে গেল তার। বুকের ওপর কে একটা ঠান্ডা হাত চেপে ধরে আছে?

কে? বলে রাঙা চিৎকার করে উঠল।

হাতটা সরে গেল আচমকা।

রাঙা এক ঝটকায় উঠে বসে বলল, তুমি কে?

একটা মৃদু ফোঁপানির শব্দ শোনা যাচ্ছে নাকি? কেউ কান্না চাপবার চেষ্টা করছে? হাত বাড়িয়ে সে বেড সুইচটা খুঁজছিল।

কে যেন চাপা গলায় ধমক দিল, বাত্তি জ্বালাইছ না হারামজাদি।

হারামজাদি! তাকে কেউ এসব গালাগাল দেয়নি কখনও। ভারি অবাক হয়ে রাঙা বসে যাওয়া গলায় বলল, কে তুমি?

অখন আমি কেডা না? আমার রাইজ্যপাট, খাট পালঙ্ক দখল কইরা আছছ, আমার সর্বস্ব মুইঠের মইধ্যে পাইছছ, অখন আমি কেডা, না? নিমকহারাম, পোড়ারমুখী, বজ্জাত, লজ্জা করে না জিগাইতে?

সে শুনেছে তার বদমেজাজি দুর্মুখ রাসুঠাকমা এরকমভাবেই গালাগাল করত লোককে। তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার বাবা আর দাদারা অবধি ভয় পেত তাকে। বাড়ির বউরা থাকত শতহস্ত তফাতে।

খুব নরম গলায় রাঙা বলল, তুমি রাসুঠাকুমা?

নির্বইংশার মাইয়া, গর্ভস্রাব, তগো সবগুলিরে যদি চাবাইয়া খাইতে পারতাম তবে জ্বালা জুড়াইত।

আচমকা জ্বর ছাড়ার মতো ভয়ডর উড়ে গেল রাঙার। সে খুব স্বাভাবিক বোধ করতে লাগল। হ্যাঁ, এ রাসমণি। এবং ভূত। ভূত যদি থেকে থাকে তবে তাও একটা এনটিটি, একটা অন্য ধরনের অস্তিত্ব। সুতরাং তাকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। সেই সঙ্গে এত গালাগাল খেয়েও, কেন কে জানে, ওই বালবিধবা রাসুঠাকুমার ওপর তার রাগ হচ্ছে না তো! মায়া হচ্ছে।

সে একটু আদুরে গলায় বলল, তুমি আমার রাসুঠাকুমা। সবাই বলে আমি ঠিক তোমার মতো দেখতে।

আমারে বশ করতে চাস হারামজাদি?

রাগ করেছ। কেন ঠাকুমা? আমি তোমার কোনও ক্ষতি করিনি! তোমার একগাদা গয়না মা আমাকে দিয়েছিল। আমি সব ফিরিয়ে দিয়েছি। তুমি যদি চাও তোমার খাট পালঙ্ক ঘর সব আমি ছেড়ে দেব। বুঝেছ?

এই শয়তান, তর বাপ ঠাকুরদা কোন ঘটির দ্যাশে জন্মাইছিল রে, তুই যে বড় কটর কটর কইরা কইলকাতার বুলি ছাড়তাছ? জিব্বা টাইনা ছিড়া ফালামু। ক্যান, দ্যাশের ভাষা মুখে ফোটে না? ইঃয়ে, কইলকাতার বিবি আইছে!

রাঙা হেসে ফেলে পরিষ্কার বাঙাল ভাষায় বলল, কে কয় দ্যাশের বুলি কইতে পারি না? খুব পারি, শোনবা?

শুনতাছি। ক-হারামজাদি, গয়নাগুলি তর শয়তান মায়টারে ফিরাইয়া দিলি ক্যান! পছদ হয় নাই বুঝি? বাপের জন্মে দ্যাখছছ ওইসব গয়না? আমার নেকলেসটার লকেটে যে

হিরাখান আছে তার দাম জানছ? তগো বাড়ি বেচলেও দাম উঠব না।

তুমি কী গয়না ফিরত চাও ঠাকুমা?

চাইলে দিবি?

দিমু।

তাহইলে দে।

লইয়া তুমি কী করবা ঠাকুমা? তোমার শরীর আছে যে, গয়না পরবা?

তর খুব চোপা, না? কটর কটর কথা কইতে পারছ তো খুব! গয়না আমি পরুম তরে কে কইল? আমি বিধবা না?

মরার পরও কেউ বিধবা থাকে নাকি ঠাকুমা?

অন্ধকারে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। তারপর সেই চাপা, ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর বলল কী জানি, সধবাও বোঝলাম না, বিধবাও বোঝলাম না।

তুমি খুব কষ্ট পাইছ, না ঠাকুমা?

আ লো পটের বিবি, আমার কষ্টের তরা কী বুঝবি? রং চং মাইখ্যা, আচল উড়াইয়া চরতে যাছ, হোটেলে গিয়ে অজ্ঞাত কুজাতের হাতে ছাইভস্ম গিলছ, তুই আমার কষ্টের কী বুঝবি রে পুরষ চাটা মাইয়ালোক?

বুঝি ঠাকুমা। একটু একটু বুঝি। আমিও তো তোমার মতোই এক মাইয়ালোক। মাইয়ালোকই তো মাইয়ালোকের কথা বোঝে।

ঢঙের কথা আর কইছ না রে কুকি। আমার দুইটা ভাইয়ের বউ, দুইটা ভাইয়ের ব্যাটা বউ তারা বুঝছে? তারাও তো মাইয়ালোক, বোবাডাঙর পুরুষ তো না। তারা বুঝল না ক্যান? তগো সব কয়টারে চিনি। সব শয়তান। সব শয়তান।

আইচ্ছা ঠাকুমা, শয়তান জাইন্যাও আমার মায়রে তুমি তা হইলে গয়নাগুলি দিলা ক্যান?

কারে দিমু? তর মায়টা শয়তান হইলেও আমারে ডরাইত খুব।

আর হেই লিগ্যাই তুমি মরার পর মায়রে ভয় দেখাইতা?

না দেখাইলে শয়তানে যে সব বেইচ্যা বুইচ্যা পেটায় নমঃ করত!

একটা কথা কমু ঠাকুমা?

কী কথা?

আমি কিন্তু তোমারে খুব ভালোবাসি।

মিছা কথা কইছ না রে অতি সাইর্যা। তগো মতো মিটমিটা বজ্জাতরে আমি রগে রগে চিনি।

তোমারে ক্যান ভালোবাসি জান? তোমার কষ্টের কথা যখন শুনি তখন আমার চক্ষে জল আহে।

ফের একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। একটু চাপা কান্না। তারপর একটু চুপচাপ। তারপর ফ্যাসফ্যাসে চাপা গলাটা বলল, তখন আমার নয় বছর বয়স, বিয়া হইয়া শ্বশুরবাড়িতে গেছি। শাশুড়ি একদিন কইল, যাও তো বউ, তুমি তো ছোটখাট্টো মানুষ, পাটাতনে উইঠ্যা শুকনা বড়াইয়ের ডালাখানা নামাইয়া আন। জীবনে পাটাতনে উঠি নাই। তবু শাশুড়ির হুকুমে গিয়া উঠলাম। বড়াইয়ের ডালা লইয়া লামুন কেমনে? শাড়ি সামলাইতে পারি না। পাও জড়াইয়া এক্কেবারে উপর থিকা পড়লাম নীচে। পইড়াই অজ্ঞান। বুঝলি? ডাইন হাতের কবজি আর ডাইন পায়ের গুড়মুরা ভাঙছিল। গ্রামদেশে তো আর ডাক্তার বৈদ্য নাই। একটা ঘাটের মড়া হাতুইড়া ডাক্তার আইয়া ত্যানা জড়াই বাইন্ধা ধুইন্ধা দিয়া গেল। ভাঙা হাড় বেকা হইয়া জোড়া লাগল ছয় মাসে। হেই থিক্যা ডাইন হাতে জোর পাইতাম না। ডাইন পা টাইন্যা হাটতে হইত।

আহা রে।

আর ওই যে বেণু, অর ঠাকুরদা কী করছিল জানছ?

কী ঠাকুমা?

শুনলে আমারে ঘিন্না করবি নাকি?

না ঠাকুমা ঘিন্না করুম না। কও।

তখন বিধবা হইয়া বাপের বাড়িতে আইয়া থানা গাড়ছি। বয়সে ডাক দিছে। শরীর গরম। তগো মতো ছাড়া গরু তো আছিলাম না। কিন্তু শরীর মানে কই? বেণুর ঠাকুরদা তখন সা-জোয়ান। রং কালা হইলে কী হয়, তার গতরখান আছিল আলিসান। আমি তার ওপর নজর দিলাম। হ্যায়ও ট্যার পাইল। একদিন রাত্রকালে বলদটা আমার ঘরে ঢুকতে যাইয়া একটা জলের ঘটি ফালাইয়া উলটাইয়া। আর যাইব কই, লহমায় লোক লস্কর জুইট্যা গেল। আমার বাবার রাগ তো দেখছ নাই, তর বাপ-খুড়ার মতো ম্যাদমারা মানুষ না। রাত্রে তারে জুতা দিয়া মাইয়া গোয়ালঘরে আটক রাখা হইল। তিনদিন পরে তার লাশ ভাইস্যা উঠল পুকুরে।

কও কী ঠাকুমা? তারে মারল কে?

এই মাইয়া, তর লগে কী দিল্লাগি গল্প করনের লিগ্যা আইছি নাকি? আমার গয়না ফিরত দে।

আমি ফিরত দিমু কেমনে ঠাকুমা? গয়না তো আমার কাছে নাই, মায়ের কাছে। তুমি মায়ের কাছে গিয়া কও।

ওই কঞ্জুষের বেটি আমারে সোনাদানা ফিরত দিব? ওই শয়তান মাইয়ালোকরে তো খুব চিনছ, কত শাপ-শাপান্ত করছি, গাইল্যাইয়া দম ছুটাইয়া দিছি, তবু ওই নষ্ট মাগির হাভাইত্যা বেটি আমার গয়না বন্ধক রাইখ্যা দোকান দিছে!

ও ঠাকুমা, ওইসব বন্ধকি গয়না তো মায় আবার ছুটাইয়া আনছে। দোকানখানও তোমার নামেই দিচ্ছে।

আহা লো, মইরা যাই। আমার নামে দোকান দিয়া বড় উদ্ধার করছে আমারে। একটা পয়সা আমার ভোগে লাগে? বাৎসরিক শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত করে না নিমকহারামগুলা।

অত রাগ হও ক্যান ঠাকুমা? আগে কও গয়না দিয়া কী করবা?

ফের একটা দীর্ঘশ্বাস। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

ফের সেই চাপা গলা যেন বিষণ্ণ এক সরোবরে ডুব দিয়ে উঠে এসে বলল, আমাগো পুকুরে যখন বড় বড় মাছ ঘুপ্পুস কইরা ঘাই মারে সেই শব্দ শুনছছ? রাইতবিরাইতে মনে হয় য্যান কেউ পুকুরে ফাল দিয়া পড়ল। কত মাছ, রুইত, কাতল, কালাবাউশ! পুকুরপাড়ে ঢেঁকিশাকের জঙ্গল, গন্ধভাদাইল্যা, খারকল, মানকচু। আম, জাম, লিচু গাছে অন্ধকার হইয়া থাকে চাইরধার। সন্ধ্যাকালে জোনাকি জ্বলে, থোকা থোকা জোনাকি, আর প্যাঁচায় ডাকে, আফইরা দুফইরে ঘুঘুর কান্দন শুনছছ? শোনছ নাই। মনটা উড়াল দিয়া কোনখানে যায় গিয়া। বৃষ্টি যখন লামে, তখন মনে হয় মাটি ছিদ্র হইয়া যাইত্যাছে, আর শীত! ওই কাল ঠান্ডা জলের উপর সর পড়ে, অখনও শেফালি ফোটে, করবী ফোটে, আম পাকে, জাম পাকে, বড় বড় জম্বুরা ঝুইলা থাকে। লোক নাই, লস্কর নাই, তবু বাড়িটা য্যান তগো লিগা বইস্যা থাকে, কান্দে। অখনও বাবা বইস্যা থাকে বাইর বাড়ির বারান্দায়। দাদু বইসা থাকে কাছারিঘরে, চাইয়া থাকে চুপ কইরা।

তারা তো মরছে ঠাকুমা!

আমিও তো মরছি। মরলে কী হয় তুই জানছ? মরলে কি সব যায় গিয়া নাকি? কত মানুষরে আৎকা আৎকা দেখতে পাই। কবে মইরা গিয়া আইজও ভিটার মায়া কাটে নাই। আহে, ঘুইরা ফিরা দেখে। পোক আছে, মাকড় আছে, ইন্দুর আছে, চামচিকা আছে, ঝুল কালি আছে, তারা আছে। ঠান্ডা, তবদা-লাগা বাড়িটায় বড় শান্তি। কত মানুষ ছায়ার মতো ঘুইরা বেড়ায়, মুখে কথা নাই, চাইরদিকে হাতায় পিতায়, চাইয়া চাইয়া দ্যাখে। এই হারামজাদি, দ্যাশ দ্যাখছছ? ভিটামাটির গন্ধ কেমন জানছ? কামরাঙা, করমচা, ডেউয়া, ডেফল খাইছছ জন্মে? তুই বুঝবি কেমনে? আমার মায় ঠাকুমায় অখনও দালানে বইয়া থাকে। বড় শান্তি রে!

ফের দীর্ঘশ্বাস, তারপরই গলাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, খেদা! খেদা আপদগুলিরে। বাইরইয়া বাইর কইরা দে!

ভয় পেয়ে রাঙা বলে উঠল, কারে ঠাকুমা? কারে খেদামু?

ওই যে আপদগুলি ঢুকছে। বন্দুকের কান্দা দিয়া গফুররে মারল! রহিম শেখরে নদীতে চুবাইল। বাড়িঘর ভাঙত্যাছে। লোকে ডরায়, কয়, অগো লগে কি আমরা পারি? অরা হইল মিলিটারি, খেদা! খেদা!

বলতে বলতে সেই কান্না, তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল।

ঠাকুমা! ও ঠাকুমা! গেলা গিয়া নাকি?

আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনেকক্ষণ বিছানায় বসে রইল রাঙা। তার সন্দেহ হল ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছে। নাকি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ! উঠে গিয়ে চোখেমুখে জল দিল রাঙা। মাথাটা গরম। কিন্তু মনটা ভারি বিষণ্ণ লাগছে এখন।

উত্তরের জানালা দিয়ে হিম বাতাস আসছিল। তার টনসিলের একটু দোষ আছে। তবু খোলা হাওয়ায় একটু দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথাটা ঠান্ডা হোক।

অনেকক্ষণ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না সে। ঘটনাটা সত্যি, না স্বপ্ন? ভূত-প্রেত আত্মা এসব তো সে মানে না, ভয়ও পায় না। তিনতলায় বিশাল এলাকা জুড়ে সে চার বছর একা বাস করেছে। সে শুনেছে বটে তার মা সরযূবালাকে নাকি মরার পর রাসু ঠাকুমা রোজ ভয় দেখাত। সেসব তো বিশ্বাসও করেনি! তাহলে এটা কী হল?

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হঠাৎ অদেখা, প্রায় অচেনা, দুর্মুখ ওই বালবিধবা রাসমণির জন্য তার দুচোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল।

তিন

এই হল কবি হাফিজুরের বাড়ি। পুরনো ঝুরঝুরে পোড়ো এই বাড়িতে কেউ থাকে না এখন। হাফিজুরের কোনও উত্তরাধিকারী নেই। মারা যাওয়ার পর কেউ দাবি করতে আসেনি এই বাড়ি। বিশ বছর আগে এই এঁদো বাড়িতেই একা থাকত কবি। রাঙা শুনেছে লম্বা, ফরসা, রোগা আর সুপুরুষ সেই মানুষটার চেহারা ছিল কবির মতোই। আধময়লা পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে সারা শহর ঘুরে বেড়াত পায়ে হেঁটে। উদভ্রান্ত উদাসীন, নির্লোভ সেই মানুষটির কোনও শত্রু ছিল না। সকলেই ভালোবাসত তাকে। কেউ কেউ বলে, হাফিজুর যে এ শহরে এসে বাসা বেঁধেছিল তা এমনি নয়, কোনও এক হিন্দু রমণীর প্রেমে পড়েছিল সে। সেই টান ছেড়ে আর নিজস্ব ভুবন রচনা করতে পারেনি হতভাগ্য মানুষটি। হয়তো মুখ ফুটে নিবেদনও করতে পারেনি তার প্রেম। হ্যাঁ, বিশ তিরিশ পঞ্চাশ বছর আগে এরকম সব প্রেম হত। আজকাল আর হয় না।

আজ ছুটির দুপুরে কোন মতিচ্ছন্ন হল তার কে জানে! রাঙা তাদের বাড়ির পিছন দিককার সুঁড়ি পথ ধরে, মাধবতলার পুকুরপাড়ের নির্জন মেটে রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে আজ কেন যে এই জঙ্গলে ঢাকা, শ্যাওলায় ধরা পড়ো-পড়ো বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল কে জানে! স্বেচ্ছায় নয়। সে তার মাথার মধ্যে কুয়াশার মতো ঘনিয়ে থাকা এক ঘোরের ভিতর এসব করছে। এই পরিষ্কার রোদের দুপুরেও কে একজন যেন টর্চের আলোয়

অন্ধকারে পথ দেখিয়ে তাকে এইখানে নিয়ে এল। কিন্তু এখানে কোন কাজ? সাপকোপের বাসা, শিয়াল তক্ষকের আস্তানা, এখানে তাকে আনল কেন?

কিন্তু আচ্ছন্ন মাথায় কিছু না বুঝেই সে আগাছার জঙ্গল ভেদ করে ছায়াচ্ছন্ন ছোট বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই শুনসান দুপুর। শুধু বাতাসের হু-হু হাহাকার। গাছের পাতায় নির্ঝরের শব্দ। পায়ে পায়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে সে অবাক হয়ে দেখতে পেল, সামনের হলঘরটায় দশ-বারোখানা মাদুর আর শতরঞ্চি যেমন তেমন করে বিছানো আছে। কয়েকটা বালিশ আর এক আধটা মাদুর বা শতরঞ্চিতে কোঁচকানো চাদরও পাতা। ঘরের এধারে ওধারে পড়ে আছে কিছু পোড়ো সিগারেটের টুকরো আর দেশলাই। পরের ঘরটা ছোট, সেটাতেও একই দৃশ্য। সারি সারি দুঃখী বিছানা, মাদুর আর শতরঞ্চি। কারা থাকে এখানে? তারা কি ভালো লোক?

না, ভয় হল না রাঙার। সে জানে সে এখানে একটা কাজে এসেছে। কী কাজ তা তাকে তো কেউ বলেনি! মাথার ওই ঘোরই আজ আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে। ওই ঘোর-ঘোর ভাবটাই তাকে এনেছে এখানে।

দুটো ঘর পার হলেই আর একটা কুঠুরি। অন্ধকার, তার কোনও জানালা নেই, ছাদ ফেটে আকাশের চিলতে দেখা যাচ্ছে। মেঝের ওপর ডাঁই হয়ে আছে ভাঙা ইঁট, ছাদের পলেস্তারা।

সে কি কিছু খুঁজছে? হ্যাঁ, কিন্তু কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না সে। ঘরটার মধ্যে ছুঁচোর গায়ের গন্ধ, আরশোলার নাদির গন্ধে বাতাস ভার হয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে কয়েক পা এগোল। একটা কুলুঙ্গি না? হ্যাঁ, অপরিসর, ধুলোটে একটা কুলুঙ্গি। সেখানে জুতোর বাক্সের মতো বহু পুরনো ধুলোয় ধূসর নোংরা একটা ঢাকনা খোলা বাক্স পড়ে আছে। ওপরে জমেছে পাখির বাসা, ভেঙে পড়া পলেস্তারার টুকরো, ঝুল আর কালি। হাত বাড়িয়ে সে বাক্সটা নামাল, মেঝের ওপর উপুড় করে ঢেলে ফেলল।

রাবিশে কয়েকটা পুরনো ময়লা কাগজ। তিন চারটের বেশি নয়। একসময়ে হয়তো দামি প্যাডের কাগজই ছিল। এখন আর তার জাত চেনা যায় না। ব্যগ্র হাতে কাগজগুলো তুলে নিল সে। যত্ন করে ভাঁজ করল। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ ভরে নিয়ে বেরিয়ে এল।

বড় ঘরটায় পা দিতেই চমকে উঠল সে। সামনে নিঃশব্দে দাঁড়ানো কয়েকজন অল্পবয়সি ছেলে। অবাক চোখে দেখছে তাকে। তাদের মধ্যে বেণু।

বইন, তুমি এখানে?

একটু হেসে রাঙা বলে, এখন এখানে আস্তানা গেড়েছ বুঝি? সেইজন্যই কয়েকদিন তোমার টিকির নাগাল পাওয়া যায়নি।

একটু ম্লান হেসে বেণু বলল, কী করব বলো। এরা সব খানসেনা আর রাজাকারদের তাড়া খেয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে। শহরের সব বাড়িতেই ওপার থেকে লোকজন এসে ভরে ফেলছে। তাই কবি হাফিজুরের বাড়িটাই একটু সাফসুতরো করে নিয়ে ওদের সঙ্গেই আছি। চাঁদা তুলতে হচ্ছে। নইলে ওদের চলবে কী করে?

রাঙা জানে। গত কয়েকদিন সে রেডিয়ো শুনছে, খবরের কাগজ পড়ছে। পাকিস্তানের ভিতরে একটা বাঙালির অস্তিত্বের মরণপণ লড়াই সে টের পাচ্ছে।

ছেলেগুলোর দিকে চেয়ে দেখল রাঙা। গুন্ডা বদমাশের চেহারা নয়। বরং খানিকটা সরল, গ্রামের ছেলে বলে মনে হয়। তাকে দেখে খুব অবাক।

সে বলল, তোমরা চলে এসেছো, কিন্তু বাড়ির লোকজন?

সামনের ছেলেটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, জানি না বইনদি, মায়ে বাবায় কইল, ইয়ং ম্যানগুলারেই নাকি আগে ধরে মাইরা ফালায়। তরা পলাইয়া যা। আমরা পলাইতে চাই নাই। কিন্তু লড়ুম কী দিয়া কন? বন্দুক, মেশিনগানের সামনে তো আর লাঠি সড়কি দিয়া লড়া যায় না।

আর একজন একটু এগিয়ে এসে বলল, অস্ত্র পাইলে আমরা কি ছাড়ুম নাকি বইনদি? কিন্তু মেলা দাম চায়। আমাগো টাকা কই?

বেণু বলল, বর্ডার এখন খুলে দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার লোক আসছে রোজ। আর কয়েকদিনের মধ্যে কী অবস্থা হবে তাই ভাবছি। লোকে চাঁদা দিচ্ছে অনেক, কিন্তু তাতেও তো হবে না।

রাঙা ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল। তারপর বলল, বেণুদা, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। আজ সন্ধেবেলায় বাড়ির পিছনদিককার আমগাছটার কাছে থেকো। সাতটা।

আচ্ছা। তুমি কি আমার খোঁজে এসেছিলে?

হ্যাঁ।

বলে আর দাঁড়াল না রাঙা। চলে এল।

ঘরে এসে সে ব্যাগ খুলে কাগজগুলো বের করল। পর পর সাজিয়ে রাখল টেবিলে। মোট চারটি কবিতা। কাগজ ময়লা হয়ে গেলেও পড়া যায়। প্রথম কবিতাটা এরকম :

যদি বলি মেঘের রোদ্দুর,

তা হলে হয়তো বুঝবে না।

যদি বলি দূর, বহু দূর,

শুধু দূর করেছ রচনা!

কবিতার নীচে লেখা, শ্রীমতী সরযূ চৌধুরীকে নিবেদিত দূরের কবিতা। দ্বিতীয় কবিতাটা এরকম :

কেন এত দূর হয়ে থাকো?

মাঝখানে গাঙ ছলো ছলো

খেয়া নেই, মাঝি নেই সাঁকো,

পারাপার কিসে করি বলো!

এটারও নীচে লেখা : নীহারিকার মতো দূরবর্তিনী সরযূ চৌধুরীকে নিবেদিত। তৃতীয়টাও সেই দূরের কবিতা :

মেঘের ভিতরে এই রোদ

যাকে বলি মেঘের রোদ্দুর,

বুঝি আর জন্মের প্রতিশোধ,

রচনা করলে শুধু দূর।

নীচে সেই সরযূ চৌধুরীকে নিবেদিত।

চতুর্থ কবিতা এরকম :

কবিতার দাস ছিলাম না কোনওদিন,

আজও দাসখৎ লেখা ওই শ্রীচরণে,

বাঁধা গাধা এক গবেট অর্বাচীন,

মুক্তি কি পাবো একেবারে শ্রীমরণে?

শ্রীমতী সরযূ চৌধুরীকে হতভাগ্য হাফিজুরের নিবেদন।

চার

আলমারির গায়ে চকচকে স্টিলের চাবিটা দুলছিল টিকটিক করে। সন্ধেবেলা দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠল সরযূবালা, সর্বনাশ! সে কি ভুলে চাবিটা এভাবেই রেখে গেছে! এত ভুল তো তার হয় না কখনও।

তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে সে লকারটা দেখল, বন্ধ। তবু সে লকার খুলে গয়নার বাক্সটা নাড়া দিতেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। গলা শুকিয়ে কাঠ। বাক্সটা হালকা লাগছে না?

দেড়শো ভরিরও বেশি ভারী সাবেক গয়নার নিরেট বাক্স সহজে নাড়ানোই যায় না। সরযূ বাক্সটা সাবধানে নামিয়ে আনল। তালা খুলতেই অবাক হয়ে দেখল, গয়নার চিহ্ন মাত্র নেই, শুধু কয়েকটা কাগজ পড়ে আছে।

ওপরে ছোট্ট একটা চিরকূট, মা আমার জিনিস আমি সব নিয়ে গেলাম। মানুষকে বাঁচাতে। তোমার জন্য রেখে গেলাম তোমার জিনিস। দেখবে ওর দাম গয়নার চেয়ে কম নয়। --বাসন্তীরাঙা।

হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে সরযূ ময়লা কাগজগুলো তুলে নিল হাতে। চোখে চশমা এঁটে আলোয় নীচে পড়তে লাগল।

পড়তে অনেক সময় লাগল সরযূর। দুখানা চোখ ধীরে ধীরে বর্ষার দিঘির মতো কানায় কানায় ভরে উঠল। তারপর উপচে টসটস করে পড়তে লাগল তার কোলে।

এক দুই

আ. া, আপনার কি মনে হয় ভগবান আসলে দু-জন আছেন?

কেন বলুন তো!

আমার ইদানীং কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে ভগবান আসলে দু-জন আছেন। একজন বড়লোকের ভগবান, আর একজন গরিবের ভগবান। আরও কি মনে হয় জানেন, গরিবের ভগবানও বেশ গরিব।

এরকম মনে হওয়ার তো একটা কারণ থাকবে, নাকি?

না, সে রকম লজিক্যাল কারণ কিছু নেই। মনে হল, তাই বললাম। এই গতকালকের কথাই ধরুন। মাসের শেষ বলে পুঁইচচ্চড়ি আর ডাল হয়েছে। তা খেতে বসে মনে হল, একটু লেবু আর লংকা হলে বেশ হত। তাই ভগবানকে খুব কষে ডাকতে লাগলাম। কারণ, ঘরে লেবু বা লংকা কোনওটাই ছিল না। তা ডাকতে ডাকতে যখন আদ্ধেক ভাত সাবাড় করে ফেলেছি ঠিক সেই সময়ে আমাদের পাশের ঘোষবাড়ির বউটি কয়েকটা কাঁচা লংকা এনে বলল, তাদের গাছে সূর্যমুখী লংকা হয়েছে, তার শাশুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। ওই লংকার জোরে বাকি ভাতটা খেয়ে উঠলাম। লক্ষ করবেন ভগবান আদ্ধেকটা দিলেন, কিন্তু বাকি আদ্ধেক দিলেন না।

আপনার কি ধারণা বড়লোকের ভগবান বেশি সার্ভিস দেন?

সেরকমই মনে হয়। নব চাটুজ্যের কথাই ধরুন না। বিশাল কারবার। নিউ আলিপুরে প্যালেসের মতো বাড়ি, গ্যারেজে খানচারেক গাড়ি। টাকায় লুটোপুটি খাচ্ছেন। তা এই তো সেদিন কোন কনজিউমার প্রোডাক্টের শ্লোগান প্রতিযোগিতায় হেলাফেলায় একটা শ্লোগান লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাস দেড়েক বাদে সেই কোম্পানির লোক একখানা ঝকঝকে মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। উনি শ্লোগান কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়ে প্রাইজ পেয়েছেন। শুনলাম সেটার দাম নাকি সতেরো লাখ টাকা। ভগবান যদি একজন হতেন তাহলে এরকমটা হতে পারত কি?

খুবই শক্ত প্রশ্ন। ভগবান সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না।

আরে সে তো আমিও জানি না। আপনার কি ধারণা আমি ভগবান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ? শাস্ত্রটাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-উপনিষদ, গীতাটিতা আমি কিচ্ছু পড়িনি। তবে ভগবান মানি খুব।

আপনি দু-জন ভগবানের কথা বললেন। কিন্তু হিন্দুদের তো শুনি তেত্রিশ কোটি দেবদেবী।

আহা, ওসব হচ্ছে একজনেরই নানা রকম প্রতীক, বুঝলেন না? কখনও ঘেঁটু, কখনও শীতলা, কখনও শিব, কখনও বিষ্ণু। খুব কমপ্লিকেটেড ব্যাপার। তাই আমি ধর্মের মধ্যে বিশেষ মাথা গলাই না। তবে মন্দিরটন্দির দেখলে একটা নমো ঠুকে যাই।

আপনার আন্তরিকতা বেশ সহজ সরল, তাই না?

যা বলেছেন। জটিলতা ব্যাপারটা আমার সহ্য হয় না। আমি শুধু জানি, ওপরে একজন কেউ আছেন। আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়, একজনের জায়গায় দু-জনও হতে পারেন।

ওপর বলতে আপনি ঠিক কোন জায়গাটা মিন করছেন?

কেন, ওপর বলতে ওপরটাই মিন করছি।

যদি আকাশ মিন করে থাকেন তাহলে আপনার জানা উচিত যে আকাশ হল মহাশূন্য। আর মহাশূন্যে ওপর-নীচ, পূর্ব-পশ্চিম কিছু নেই। মহাশূন্য সম্পূর্ণ দিগ্বিদিকশূন্য।

আহা, আবার আপনি জট পাকিয়ে তুললেন। আমি তো অত ভেবেটেবে বলিনি। লোকে যা বলে তাই বললাম। সামওয়ান ইজ আপ দেয়ার।

তাহলে অবশ্য কথা নেই। বেশি জানতে গেলে অনেক সময়ে বিশ্বাসটাই ভেঙে যায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমাদের মহাশূন্য নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার মশাই, আমরা তো আর মহাশূন্যে মর্নিংওয়াক করতে যাচ্ছি না। আমরা যেমন ওপর আর নীচ দেখছি সেরকমটাই তো ভালো।

যার কাছে যেমন। না জানারও নিশ্চয়ই কিছু উপকারিতা আছে।

ঠিক বলেছেন। বেশি জানতে গেলে নানা রকম ভজঘট্ট বাঁধে। এই ধরুন, বউকে নিয়ে দিব্যি সুখে-দুঃখে সংসার করছেন, হঠাৎ যদি জানতে পারেন, বিয়ের আগে বউয়ের একটা কেলেঙ্কারি বা অ্যাফেয়ার ছিল তাহলে কি সংসারটা তেতো হয়ে যাবে না?

খুবই ঠিক। আপনি কি সংসারী মানুষ?

বিয়ের কথা বলছেন? না ও ব্যাপারটা আর হয়ে উঠল না। তার জন্য দায়ী হল অর্থনৈতিক অবস্থা আমি একজন ব্যবসায়ীর কর্মচারী। বুঝতেই পারছেন, এসব কোম্পানি কর্মচারীদের কীভাবে ট্রিট করে। উদয়াস্ত খেতে চার হাজার টাকা হাতে পাই। ঘাড়ে বুড়ো বাবা-মা, একটা বোন, পড়ুয়া ভাই। বাড়িওলা জল বন্ধ করে দিয়েছে, গুন্ডা লাগাবে বলে শাসাচ্ছে। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থায় বত্রিশ বছর বয়সেই যেন বার্ধক্য এসে গেছে। বিয়ের শখও নেই। মেয়েদের দেখলে আজকাল ভারি জড়সড় হয়ে পড়ি, হীনম্মন্যতায় ভুগি।

অর্থনৈতিক অবস্থা কবেই বা ভালো বলুন। দেশজোড়া দারিদ্র্য। তাতেও তো বিয়ে হচ্ছে, সন্তান জন্মাচ্ছে।

ওসব দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। আমি বিয়েপাগল নই। এই বেশ আছি। দারিদ্র্য থাকলেও তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শখ আল্হাদ বলতে কিছু নেই। ভাতের পাতে একটা দুটো ব্যঞ্জন হলেই হল। মা-বাবা, ভাই-বোনেরা সবাই আমার প্রতি সিমপ্যাথেটিক। কিন্তু বউ এলেই যে আমার নানা অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো দেখতে পাবে এবং আমাকে গঞ্জনা দেবে।

বিয়ের ওসব সাইড এফেক্ট তো আছেই। ওসব জেনেশুনেই লোকে বিয়ে করছে তো!

যে করছে সে করুক। আমি ওর মধ্যে নেই।

আচ্ছা, এই যে আপনি বললেন, বউ এলে যে আপনার অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো দেখতে পাবে, তার মানে কী? আপনার ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো কি বউ ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না?

পাচ্ছে বইকি, কিন্তু তার জন্য তারা আমার ওপর চড়াও হচ্ছে না, হামলা করছে না। বউ পরের বাড়ির মেয়ে, তার স্বার্থ আমার ওপর নির্ভরশীল, সে ছাড়বে কেন? আমার এক বন্ধু তো বউয়ের গঞ্জনা শুনতে শুনতে ভ্যাবলা মতো হয়ে গিয়ে শেষে ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছে রেললাইনে গলা দিয়ে...ওঃ, সে কথা মনে করলেই ভয় হয় মশাই। আমার কি মনে হয় জানেন, দুর্বলচিত্ত মানুষদের বিয়ে না করাই উচিত। শরীরের প্রয়োজনে বরং প্রস কোয়ার্টারে যাক, বিয়ে করার রিস্ক না নেওয়াই ভালো।

দুর্বলচিত্ত মানুষের সংখ্যাই তো বেশি। সারা পৃথিবীর অ্যাসেসমেন্ট করলে দেখবেন, দুনিয়ার নাইনটি পারসেন্ট মানুষ দুর্বলচিত্ত।

তা হতে পারে। অন্যের খবরে আমার দরকার কি বলুন। আমি যে দুর্বলচিত্ত সেটাই আমার কাছে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট।

ওঃ হ্যাঁ, আপনি তো আবার বেশি জানতে চান না।

দূর মশাই, জেনে হবেটা কি? জানলে যদি জ্বালা বাড়ে তাহলে লাভটা কি? ওই ভয়ে তো আমি খবরের কাগজও পড়ি না। কাগজ রাখার পয়সা নেই বটে, কিন্তু আমাদের ম্যানেজারের টেবিলে খবরের কাগজ থাকে। আমি কখনও তাকাইও না।

তার মানে কি পৃথিবী সম্পর্কে আপনার কোনও আগ্রহই নেই? রাজনীতি খেলাধুলা, সিনেমা, যুদ্ধবিগ্রহ, আর্ট কালচার?

ছিল, ছিল। বছর দশ পনেরো আগেও ওসবে ইন্টারেস্ট ছিল। তারপর দেখলাম, দুনিয়াটা তার নিজের মতো চলেছে, আমি মাধ্যাকর্ষণের ফলে তার গায়ে ছারপোকার মতো সেঁটে আছি মাত্র। টিকে থাকা ছাড়া আমার কোনও ধর্ম নেই, কর্মও নেই। দুনিয়াকে জানার চেষ্টা করা বৃথা। সায়েন্টিস্টরা চেষ্টা করছে, দার্শনিকরা করছে, জ্ঞানী পণ্ডিতরা করছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে অষ্টরম্ভা। দুনিয়াকে জানা ও বোঝা অত সহজ নয়। তাই আমি

ওসব চেষ্টাই করি না। সকাল নটায় বেরোই, হিসেব বুঝিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত দশটা। হপ্তায় এই একদিন ছুটি।

ছুটির দিনে কী করেন?

সকালে বাজার, তারপর জামাকাপড় কাচা, দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলে এই একটা দিন এসে এই পার্কটায় একটু বসে থাকি।

আর কোনও এন্টারটেনমেন্ট নেই আপনার? সিনেমা থিয়েটার?

দূর দূর, ওসব বানানো কৃত্রিম জিনিস দেখে মনকে বিভ্রান্ত করার মানেই হয় না। গত দশ বছর আমি সিনেমা দেখিনি, বিশ্বাস করবেন?

করলাম, তা পার্কে বসে থাকাটাই এন্টারটেনমেন্ট আপনার?

বসে থাকি, আর ভাবি।

কী ভাবেন?

আমার ভাবনার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। ব্রেন পাওয়ার কম তো, তাই চিন্তার জগতে কোনও শৃঙ্খলাও থাকে না। বসে বসে যা মাথায় আসে তাই ভাবি।

কোনও মহিলার কথা?

ওঃ, আপনি ওই একটা দিকেই আমাকে গোত করতে চান তো? তা মশাই, সত্যি কথা বলতে কি, এক-আধজন মহিলার কথাও যে মনে আসে না তা নয়।

কোনও বিশেষ মহিলার কথা কি?

তাও বলতে পারেন। আমি যতই অপদার্থ হই, আমারও যৌবন ডাকাডাকি করেছে এক সময়ে। তা ওই কাঁচা বয়সে কখনওসখনও এক আধজন মেয়েকে ভারি পছন্দও হয়েছিল।

তাহলে রোমান্স হয়েছিল?

রোমান্স কথাটা ভারি বাবু কথা। অত ভালো ব্যাপার কি আমাদের মতো অপদার্থের কপালে হয়? তখন কসবায় একটা খোলার ঘরে থাকতাম। এ চাকরিটা তখনও পাইনি। বাবা ছিল প্রাইভেট বাসের কন্ডাকটর। অবস্থা অনুমান করে নিন। তা সেই সময়ে আমি কলেজে পড়ি। যাতায়াতের পথে একটা গোলাপি রঙের বাড়ির একতলার জানলায় একটা ফুটফুটে মেয়েকে প্রায়ই দেখতে পেতাম। কোঁকড়া চুল ছিল মাথায়, বেশ ফরসা, মুখখানা যেন নরুনে চেঁছে যত্নে বানানো। মেয়েটা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকত।

তার বয়স কত ছিল?

তেরো চোদ্দো হবে।

তারপর?

যাতায়াতের পথে রোজই চোখে পড়ত। একটু লাজুক ছিলাম বলে ওই একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিতাম। তবে এইভাবে চলল, আর আমার ভিতরে নানা রকম

কেমিক্যাল চেঞ্জ ঘটতে লাগল। প্রেমে পড়লে যা হয় আর কি।

আপনি কি বিজ্ঞানের ছাত্র?

কেন বলুন তো? কি করে বুঝলেন?

কেমিক্যাল চেঞ্জের কথা বললেন কি না।

সায়েন্স পড়েছি বটে, কিন্তু তাতে কোনও সম্ভাবনা তৈরি হয়নি আমার জীবনে। পাসকোর্সে বি এস-সি পাস করেছিলাম। পয়সার অভাবে ফিজিক্সে অনার্স কন্টিনিউ করতে পারিনি।

অনার্স ছিল, তার মানে সম্ভাবনা তো ছিলই!

পয়সার অভাব আমাদের দেশে সব রকম মেধাকেই গলা টিপে মেরে দেয়, বুঝলেন?

হ্যাঁ। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু সেই মেয়েটার কথা শেষ করুন।

শেষ না করলেও হয়। তবে হ্যাঁ, তার প্রতি আমার দুর্বলতা জন্ম নিয়েছিল। আর আমার যাওয়া-আসার সময় সর্বদাই সে জানলায় থাকত, এটাও একটা পয়েন্ট, অর্থাৎ তারও আমার প্রতি আগ্রহ ছিল, তাই না?

তাই তো মনে হচ্ছে! পরিচয় হল কী করে?

পরিচয়ে বাধা ছিল। একে আমি লাজুক, গরিবের ছেলে, টিউশানি করে কলেজে পড়ি। আর ওই মেয়েটি বড়লোক না হলেও আমাদের চেয়ে অন্তত তিন চার ধাপ ওপরের সমাজের লোক। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর মতো ব্যাপার। তবে মেয়েটি যে আমার জন্যই অপেক্ষা করত তাতে সন্দেহ ছিল না আমার। বেশ কিছুদিন চোখাচোখি খেলার পর সে আমাকে দেখে একটু হাসতও।

বটে!

হ্যাঁ মশাই। আমিও মনে মনে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। জীবনে ওটাই আমার প্রথম ও একমাত্র প্রেম কি না।

বুঝেছি। বলুন।

বোধহয় মাস দুয়েক এরকম চলার পর একদিন হঠাৎ দেখলাম, জানালায় মেয়েটির পাশে একজন ফরসা বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। যত দূর মনে হল মেয়েটির মা।

এই রে!

হ্যাঁ, আমি খুব চমকে গিয়েছিলাম, ভয়ও পেয়েছিলাম। মিতুর মাকে দেখে আমি সেদিন প্রায় ছুটে পালাই।

মেয়েটির নাম বুঝি মিতু?

হ্যাঁ।

তারপর?

দিন দুই বাদে একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় দেখি সেই ভদ্রমহিলা তাঁদের গ্রিলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে ডাকলেন, এই ছেলে, শোনো!

ও বাবা!

হ্যাঁ, আমি তো ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। উনি বললেন, ভয় পেও না, ভিতরে এসো। কথা আছে। আমি ভাবলাম, ভিতরে নিয়ে গিয়ে বোধহয় লোক ডেকে ধোলাই দেবেন। তবু ভদ্রতার খাতিরে না গিয়েও পারলাম না। ভদ্রমহিলা আমাকে যত্ন করে বসালেন, পাখা ছেড়ে দিলেন। তারপর আমার বাড়ির খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

বাঃ, এ তো গ্রিন সিগন্যাল।

হ্যাঁ। গ্রিন সিগন্যালই। আমিও অকপটে তাঁকে সব বলে দিলাম। উনিও দেখলাম, আমাদের সব খবরই রাখেন। বেশ কিছুক্ষণ নানা কথা বলার পর হঠাৎ বলে বসলেন, তুমি কি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? আমি তো প্রস্তাব শুনে হাঁ। কী বলব ভেবেই পাচ্ছিলাম না। বুকের মধ্যে উথালপাথাল। উনি তখন খুব করুণ মুখ করে বললেন, বিয়ে করতে চাইলে আমাদের আপত্তি নেই। তোমার অবস্থা জেনেও বিয়ে দেব। তবে আমার মেয়ে কিন্তু পঙ্গু।

পঙ্গু? এঃ হেঃ, কীরকম পঙ্গু?

কোমরের তলা থেকে পা অবধি সমস্ত নীচের অংশটাই ছিল আনডেভেলপড। হাঁটাচলার ক্ষমতাই ছিল না মেয়েটার। তাই ওকে জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হত। বসে বসে মিতু বাইরের জগৎ দেখত--যে জগতে যাওয়ার ক্ষমতাই ছিল না তার। কিন্তু কোমর থেকে মুখ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক--যে-কোনও মেয়েকে টেক্কা দেওয়ার মতো।

আপনি কি করলেন? পিছিয়ে গেলেন?

না। সে বয়সটা তো বিবেচনা বা স্থিরবুদ্ধির বয়স নয়। ভাবলাম পঙ্গু তো কী হয়েছে, ওকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেব। বাড়িতে এসে বললামও সে কথা। মায়ের তো মাথায় হাত। বাবা বাক্যহারা।

আর মিতু? তার মতামত নেননি?

সেখানেই তো গোল বাঁধল।

কীসের গোল?

কথা কইবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম, অমন সুন্দর মেয়েটাকে ভগবান অনেক দিক দিয়ে মেরে রেখেছেন। মিতুর বুদ্ধিটাও তেমন ডেভেলপ করেনি।

জড়বুদ্ধি নাকি?

অনেকটাই। স্পষ্ট কথা বলতে পারত না। ভ্যাবলা।

তবে তো ব্যাপারটা কেঁচে গেল!

হ্যাঁ। ওই যে আপনাকে দু-নম্বর ভগবানের কথা বলছিলাম, কেন বলছিলাম বুঝতে পারছেন তো! গরিবের ভগবান হয় নিজেই গরিব, নইলে হাড়কেপ্পন। লংকা আর লেবু চাইলে লংকাটা হয়তো দেন, লেবুটা টেনে রাখেন।

ভগবানের ওপর যখন আপনার এতই রাগ তখন তাকে ঝেড়ে ফেললেই তো হয়।

ভগবান আমাদের মতো কিছু লোকের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছেন। ঝেড়ে ফেললেই তিনি যাবেন কেন? আচ্ছা, আপনি কি নাস্তিক নাকি?

আস্তিক নাস্তিক কিছুই নই। ও নিয়ে কিছু ভাবিনি কখনও। দরকারও হয়নি।

তার মানে আপনার জীবনটা বেশ স্মুথ। কোনও সমস্যাই নেই। তাই না? হয়তো ভালো চাকরি করেন, মেলা টাকার মালিক, কলকাতায় নিজ বাটী, ঘাড়ে গন্ধমাদন কোনও দায়িত্ব নেই। ঠিক কি না!

তাই যদি হত তাহলে সন্ধেবেলা এসে একা একা এই নেড়া পার্কে বসে থাকতাম নাকি? এটাকে পার্ক বললে পার্ক কথাটারই অপমান হয়। দেখছেন গোটা মাঠটায় কেমন টাক-পড়া ভাব। গাছপালার নামগন্ধ নেই!

হ্যাঁ, পার্কটার কোনও সৌন্দর্য নেই বটে। তাছাড়া উত্তর দিকের ওই ভ্যাটটা থেকে খুব দুর্গন্ধও আসছে।

গত দশ দিনে ময়লা নেয়নি। কালও দেখেছি, মরা বেড়াল পড়ে আছে পাশে। গন্ধ তো হবেই। আর পার্কটার ওই কোণে আজ সকালেই দুটো ডেডবডি পাওয়া গেছে। একটা মেয়ে আর একটা ছেলের। দুজনেরই গলার নালি কাটা।

বলেন কি? কিছু টের পাইনি তো!

এই পার্কটা আজকাল অ্যান্টিসোশ্যালদের আড্ডা, তা জানেন তো! প্রাকাশ্যেই মদ, গাঁজা, সেক্স, জুয়া সবই চলে। আজকাল ওদের ভয়ে কোনও ভদ্রলোক আর এ পার্কে আসে না। আজ দেখুন, পার্ক পুরো ফাঁকা। কেন জানেন? ডেডবডি পাওয়ার পর পুলিশ অ্যাকশন হয়েছে সারাদিন। এখনও পেট্রল চলছে। বদমাশরা ভেগেছে বলেই পার্কটা এত ফাঁকা।

তা বটে, পার্কে তো আসি সপ্তাহে একদিন। দেখি, কিছু ছেলেছোকরা অন্ধকারে কেমন সন্দেহজনক আচরণ করছে। তবে তাতে আমার আর কী বলুন। আমি একটু কোনার দিকে বেছে নিয়ে ঘাসে বসে থাকি চুপ করে। আমাকে কেউ গ্রাহ্য করে না। যারা খুন হল তারা কারা বলুন তো?

কে জানে! ড্রাগ পেডলার হতে পারে। চোরা চালানদার হলেই বা কি। মোট কথা, খুব ক্লিন লোক নয়। কম হলেও আপনার তবু একটা চার হাজার টাকা বেতনের চাকরি আছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় আপনার পজিশন কিন্তু বেশ ভালো। এই যারা খারাপ

কাজটাজ করে বেড়ায় তাদের চার হাজার টাকার চাকরি জুটলে অনেকেই হয়তো খারাপ কাজ করত না। কী বলেন?

কে জানে মশাই, দেশ, সমাজ, বেকার সমস্যা এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। ঘামিয়ে কিছু হয়ও না। আমি শুধু একবগ্গা আমার আয় আর ব্যয়ের ব্যাপারটা প্রাণপণে মেলানোর চেষ্টা করি। আমাদের আয়ের সঙ্গে আমাদের ব্যয়ের কোনওদিন বন্ধুত্ব হয় না, জানেন? সবসময়ে এই ব্যয় ব্যাটা এগিয়ে থাকে। দুটোয় কোনওদিন বনিবনা হল না।

আচ্ছা, সেটা তো দেশের লাখো লোকের সমস্যা। কিন্তু অবস্থাটা পালটে দিতে ইচ্ছে হয় না?

পালটে দেব? আমার কোন দায় বলুন তো! দেশে কোটি কোটি লোক থাকতে আমারই বা হঠাৎ দেশের অবস্থা পালটানোর ইচ্ছে হবে কেন? আপার হয় নাকি?

হয়। খুব হয়। তবে পন্থাটা ভেবে পাই না।

ঝুটমুট ভেবে শরীরপাত করার দরকারটা কী? ওসব আমার আপনার কম্মো নয়। আমি তো ধরেই নিয়েছি যা করার ভগবানই করবেন।

আপনি কিন্তু হতাশবাদী।

না মশাই, না। হতাশাবাদী হল আশাটাশা ছেড়ে দিয়েছে যে, আমার তো ওসব আশাটাশা ছিল না কিছু, আমি তো আপনাকে বলেইছি, আমি হলাম বাস কন্ডাক্টরের ছেলে। বাপ খেয়ে না খেয়ে ছেলেকে মানুষ করার জন্য বি এস-সি অবধি পড়িয়েছিল। মানুষ হওয়া অবশ্য হয়নি। কিন্তু তার জন্য আমারও কোনও হা-হুতাশও নেই। যা আছি, যেটুকু পাচ্ছি তাই নিয়েই আমাকে থাকতে হবে। বিপ্লবটিপ্লব করার কথা কখনও ভাবিনি। আর বিপ্লবও তো আর এক রকমের নয়। নানা পার্টি নানা বিপ্লবের কথা বলে। তাতেই বুঝে গেছি, কারও এখনও মনস্থির হয়নি।

হাল ছেড়ে দিচ্ছেন?

সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও নিজেকে আমি মোটেই বুদ্ধিমান ভাবি না।

আপনার গল্পটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

কোন গল্পটা?

ওই যে মিতুর সঙ্গে আপনার প্রেমের গল্প।

প্রেমের গল্পের দু-রকম পরিণতি থাকে। হয় মিলনান্তক, নয় বিয়োগান্তক, তাই না?

হ্যাঁ, আপনারা কীভাবে শেষ হল?

আমারটা ঠিক মিলন বা বিয়োগ কোনওটাই হল না। কেমন যেন নষ্ট দুধের মতো কেটে গেল, আমি নিজেকে তখন প্রশ্ন করেছিলাম, বাপু, প্রেমেই যদি পড়ে থাকো, তাহলে সেই প্রেমের এমন জোর নেই যে মেয়েটার শরীর আর মনের খামতিগুলো উপেক্ষা করতে

পার? এ আবার কেমন প্রেম? কিন্তু কি জানেন, ভিতর থেকে কোনও সাড়াই এল না। আর সেই যে প্রেম কেঁচে গেল আর কখনও পেকে উঠল না।

মিতুর কোনও খবর রাখেন না?

না, খবর রেখে হবেটাই বা কি বলুন। ও পাড়া ছেড়ে চলে আসার পর আর সম্পর্কও নেই। তবে মাঝে মাঝে একটু-আধটু মনে পড়ে আর কি। আচ্ছা আপনি কি এ পাড়ার বাসিন্দা?

তা বলতে পারেন। কাছেপিঠেই আমার আস্তানা।

এই পার্কে প্রায়ই আসেন বুঝি?

না, তবে যাতায়াতের পথে পার্কটা নজরে পড়ে। আজ পার্কটা ফাঁকা দেখে একটু বসবার লোভ হল।

বেশ করেছেন। আপনার সঙ্গে বেশ আলাপও হয়ে গেল আমার। আজকাল কারও সঙ্গেই যেচে আলাপটালাপ করা হয় না। মনে হয় চেনা-জানা বাড়িয়ে হবেটা কি?

মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকাটা কি ভালো নয়?

আমার কি মনে হয় জানেন? মানুষ জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই কাটিয়ে দেয় নানা রকম অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন কাজে। তার মধ্যে একটা হল এই লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। দেখা হলে দেঁতো হাসি হেসে কুশল প্রশ্ন বা খেজুর করা, ওতে কি লাভ বলুন, কিছুটা সময় ফালতু কাটানো ছাড়া আর কি?

আপনি বুঝি কম কথার মানুষ?

তা নয়। কেউ কথাটথা কইলে আমার বরং বেশ অহংকার হয়। ভাবি, লোকটা পাত্তা দিচ্ছে, আমিও তাকে খুশি করারই চেষ্টা করে থাকি। এসব আমি করি বটে, কিন্তু কাজটা যে অর্থহীন সেটাও ভুলতে পারি না।

চেনাজানা থাকলে দায়ে দফায় মানুষের সাহায্যও তো পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, সেরকম কিছু হয় বটে। কিন্তু চেনাজানাদের কাছ থেকে আমরা কখনও তেমন কোনও উপকার পাইনি। অবশ্য উলটোটাও সত্যি। আমরাও কারও তেমন কোনও উপকার করিনি। মানুষের উপকার করার জন্যও কিছু যোগ্যতার দরকার হয়। আমার সে যোগ্যতা নেই।

আপনি আপনার বাইরের জগৎটাকে নিয়ে ভাবেন না তো!

না। ওই যে বললাম, ভেবে সময় নষ্ট।

বই পড়েন?

পাগল! ওসব বাতিক আমার নেই।

চাকরিটা আপনার কেমন লাগে?

খারাপ কি? মালিকের বিল্ডিং মেটেরিটালের বিরাট ব্যবসা। সিমেন্ট, বালি, স্টোন চিপস, রড, চুন, ইট, সুরকি নিয়ে এলাহি ব্যাপার। রোজ পঞ্চাশ ষাট লরি বোঝাই হয়ে সাপ্লাই যাচ্ছে চারদিকে। যাকে বলে কর্মযজ্ঞ।

আপনার কাজটা কী?

সব কিছু নলেজে রাখা।

শুধু নলেজে রাখা? আর কিছু নয়?

ওটাই তো হাড়ভাঙা খাটুনি। সারাদিন গোটা পাঁচেক গোডাউনে চক্কর মেরে বেড়াতে হয়। কোন অর্ডারে কত মাল যাচ্ছে তার হিসেব রাখতে হয়। একশোটা কৈফিয়ত দিতে হয়।

আপনি কি ম্যানেজার?

অনেকটা সেরকমই শোনায় বটে। ম্যানেজারের ইজ্জত অবশ্য নেই, তবে খাটনি আর ঝুঁকিটা আছে।

মালিকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তাহলে ভালোই?

না, ভালো বললে ভুল হবে। তবে হুকুম তামিল করি বলে মালিকরা আমাকে নিয়ে ঝামেলা পোয়ায় না। আর তাই, আমাকে তারা লক্ষও করে না।

তাদের নজরে পড়ার জন্য চেষ্টা করেন না?

মানুষের ওপর নজর দেওয়ার ফুরসত তাদের কই? তাদের নজর তো আগম নির্গমের ওপর। কত মাল বেরোচ্ছে, কত টাকা ঢুকছে।

এতে আপনার বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয় না?

বিদ্রোহ কীসের? মাসের শেষে যে চার-হাজার টাকা দিচ্ছে! ওটাই তো জোঁকের মুখে নুন। আপনি কি পলিটিকস করেন?

না তো!

তবে কি ইউনিয়ন টিউনিয়ন?

না না, ওসব নয়।

আমাদের কারবারে অবশ্য ইউনিয়ম নেই। কারও চাকরিই পাকা নয়, ইউনিয়ন করবে কোন সাহসে বলুন!

আপনার কি মনে হয় না একটা ইউনিয়ন থাকলে ভালো হত?

না, হয় না। ইউনিয়ন যেখানে আছে সেখানেই বা ভালোটা কী হচ্ছে বলুন। ইউনিয়ন বেশি পেশি প্রদর্শন করলে মালিক লক আউট করে দিচ্ছে, না হয় তো কারখানা বা ব্যবসা তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

তাহলে কি আপনি আত্মবিক্রয় করে দিয়ে বসে আছেন?

যথার্থ বলেছেন। আমরা কে না আত্মবিক্রয় করতে বসে আছি বলুন। মানুষ তো নিজেকে সবসময় আরও বেশি সেলেবল কমোডিটি করে তোলার জন্যই নানা ভাবে নিজেকে ষঘামাজা করছে তাই নয় কি?

অনেকটা তাই বটে।

সবটাই তাই। আমরা কে কতটা কার কাছে বিক্রয়যোগ্য বা ক্রয়যোগ্য সেটাই আসল কথা। দুঃখের বিষয় হল শাহরুখ খান চার কোটিতে বিকোয়, আমি চার হাজারে।

সেই দুঃখেই কি মাঝে মাঝে আপনার ভিতর থেকে একজন ঘাতক বেরিয়ে আসতে চায়?

না মশাই, না। ঘাতকটাতক আমার মধ্যে নেই। আমার মতো লোকেরা বড় জোর নিজেকে মারতে পারে। আত্মঘাতী একটা প্রবণতা আমার মতো এক সময়ে ছিল। কিন্তু সেটাও আজকাল ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, আপনি তো আমার নামটাও জিজ্ঞেস করেননি। অবশ্য নাম জেনে হবেটাই বা কি। রাম বা হরি, রমেশ বা যতীন যা হোক একটা হলেই হল। আমাদের তো আর নামের মহিমা নেই, কী বলেন?

আপনার নামটা আমি জানি!

বলেন কি মশাই? নাম জানেন! কি করে জানলেন?

পুলিশের রেকর্ডে আপনার নাম আছে।

হাঃ হাঃ, কী যে বলেন মশাই। পুলিশের রেকর্ডে আমার নাম। আমি কি জাতে উঠে গেলাম নাকি? হাঃ হাঃ! না মশাই, আপনি একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছেন। অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন আমায়।

সেটাও সম্ভব।

আজ্ঞে সেটাই ঘটনা। কিন্তু পুলিশের রেকর্ডের কথা আপনি জানলেন কি করে? আপনি কি পুলিশের লোক?

পেট চালানোর জন্য কিছু তো করতেই হবে। পুলিশের চাকরিটাই জুটেছিল কপালে।

ও বাবা, আমি তা হলে এতক্ষণ একজন জবরদস্ত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বসে খেজুর-আলাপ করে যাচ্ছিলাম! কী সৌভাগ্য! বলতে কি আপনিই আমার জীবনে প্রথম পুলিশ-বন্ধু। অবশ্য বন্ধু বললে যদি আপনি অপমান বোধ না করেন।

না, অপমান বোধ করব কেন?

আচ্ছা, পুলিশের রেকর্ডে আমার কী নাম আছে তা বলবেন?

মনোরঞ্জন রায়। সঞ্জীব--সবরওয়াল--অর্থাৎ আপনার এমপ্লয়ার আপনাকে মনো বলে ডাকে।

ও বাবা! আপনি সবরওয়ালের নামও জানেন দেখছি! কী আশ্চর্য! আপনার ইনফর্মেশন তো একেবারে ঠিক! আমার নাম মনোরঞ্জন রায়, আমার মালিক সঞ্জীব সবরওয়াল

আমাকে মনো বলে ডাকে। সবই তো মিলে যাচ্ছে! কিন্তু পুলিশের রেকর্ডে আমার নাম উঠল কেন বলুন তো! ক্রিমিন্যাল হিসেবে নাকি?

না। তবে একজন অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং রহস্যময় মানুষ হিসেবে।

মশাই, আপনি আমার মাথা ফের গুলিয়ে দিলেন। আমার মতো একজন ডিসকোয়ালিফায়েড লোকের জীবনে সন্দেহজনক বা রহস্যময় কী থাকতে পারে বলুন তো!

সেটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন।

লাখ টাকার প্রশ্ন! কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। আমি নিজের সম্পর্কে আপনাকে যা বলেছি তা কি সবই মিথ্যে? আষাঢ়ে গল্প?

না। বরং আপনি নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত সত্যি কথাই বলেছেন। আপনি নিজেকে যেমন বর্ণনা করেছেন আপনি ঠিক সেরকমই।

তবে?

আপনি একজন টোটালি ফ্রাস্ট্রেটেড, হতাশাবাদী উচ্চাশাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ। দুর্বলচিত্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, ভীতু সবই ঠিক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওরকমই তো!

অন্তত এক বছর আগে অবধি ওরকমই ছিলেন। আপনার একটা গুণ আছে। আপনি খুব প্রভুভক্ত মানুষ। সবরওয়াল আপনার কাছে ঈশ্বরতুল্য। এটা অন্যদের চোখে গুণ না হয়ে দোষ বলেও গণ্য হতে পারে। কিন্তু আপনার স্থির বিশ্বাস, সবরওয়ালের ওপরেই আপনার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আপনার আরও বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে একমাত্র সবরওয়াল ছাড়া আর কেউ আপনাকে চাকরি দেবে না। আর তার ফলে প্রভুভক্ত হয়ে ওঠাটা আপনার অবশ্যম্ভাবীই ছিল।

হ্যাঁ, কথাটা খুব ভুল নয়। সবরওয়াল আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আর সেই জন্যই সবরওয়ালকে বাঁচিয়ে রাখাটাও আপনার প্রয়োজন। তাই না?

সে তো ঠিকই।

যিশু দাস নামে কাউকে আপনার মনে পড়ে কি?

যিশু দাস! ও বাবা, সে তো বিরাট গুন্ডা ছিল!

হ্যাঁ, তোলাবাজ মস্তান। এলাকার টেরর। সবরওয়াল তাকে নিয়মিত তোলাও দিত। ব্যবসায়ীদের ওসব হিসেবের মধ্যেই ধরা থাকে। কাজেই কোনও গোলমাল ছিল না। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল যিশু দাসের হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল বম্বের একজন বিশেষ নায়িকাকে নিয়ে একটা হিন্দি ফিল্ম প্রোডিউস করবে। ওটাই নাকি ছিল তার জীবনের স্বপ্ন। সেই জন্য তার প্রচুর টাকার দরকার হয়ে পড়ে। আর সেজন্যই সে সবরওয়ালের কাছে পঞ্চাশ লাখ টাকা দাবি করে বসে। না হলে খুনের হুমকি দিতে থাকে। তার ফলে সবরওয়াল ভয়

খেয়ে কারবার গুটিয়ে ফেলার কথা ভাবতে শুরু করে। ঝানু ব্যবসায়ীরা জানে টাকাটা দিলে এরপর দাবি আরও বাড়তে থাকবে। ঘটনাটা আপনার মনে আছে কি?

খুব আছে মশাই, খুব আছে। আমরা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, সবরওয়ালের বিপদ ঘটলে আপনারও অস্তিত্বে সংকট। তবে যাই হোক, একদিন যিশু দাস হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়। তার পরিবার এবং গ্যাং তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজেছে, হিল্লিদিল্লিতেও খোঁজ করা হয়েছে, কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। খুন হয়ে থাকলে লাশটা তো পাওয়া যাবে। তাও পাওয়া যায়নি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই জানি। অনেকে বলে যিশুর হঠাৎ মতির পরিবর্তন হয় এবং সে সাধু হয়ে কোথাও চলে গেছে।

আমাদের ধারণা আর একটু প্র্যাকটিক্যাল। তদন্তে জানা যায় যিশু দাসকে শেষবার দেখা গেছে সবরওয়ালের গোডাউনের কম্পাউন্ডে ঢুকতে। তারপর থেকেই সে বেপাত্তা। সন্ধের পর সে সবরওয়ালের গোডাউনে যায়। তারপর থেকেই তাকে আর দেখা যায়নি। তখন গোডাউনে প্রায় কোনও কর্মচারীই চিল না। শুধু সবরওয়াল আর আপনি। গেটে অবশ্য দুজন দারোয়ান ছিল।

তা হবে হয়তো! আপনি কি বিশেষ কিছু ইঙ্গিত করছেন?

হ্যাঁ। আমার নিজস্ব ধারণা, যিশু দাস সবরওয়ালের গোডাউনেই খুন হয়ে যায়। সবরওয়াল কোনও ভাড়াটে গুন্ডা আনায়নি বা তার কাছে কোনও অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। সবরওয়ালের কাছ থেকে যিশু বিদায় নেয় রাত আটটার কিছু পরে। যিশু সেদিন আলটিমেটাম দেওয়ায় সবরওয়াল খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে পুলিশকেও ফোন করেছিল তার প্রোটেকশনের জন্য। সে নিজের অফিসঘরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে এক নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাটা আমার খুব মনে আছে। ওঃ কী টেনশনই গেছে। কিন্তু খুনের কথা কী যেন বলছিলেন?

বলছিলাম, আমার নিজস্ব রিকনস্ট্রাকশন অফ ইভেন্ট অনুযায়ী, যিশু দাস খুন হয় এবং তা হয় সবরওয়ালের গোডাউনের বিশাল চত্বরেরই কোথাও।

বলেন কী! এ তো সাঙঘাতিক কথা!

না, খুব সাঙঘাতিক কিছু নয়। একজন টোটালি ফ্রাস্ট্রেটেড লোক যখন নিজের অস্তিত্বের সমূহ সংকট দেখতে পায় তখন তার ভিতরে ঘুমন্ত ঘাতক জেগে উঠতেই পারে।

কী যে বলেন স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটা লোককে মেরে ফেলা খুব কঠিন কাজ নয়, যদি হাতে কোনও মারাত্মক অস্ত্র থাকে, যদি ভিকটিম অপ্রস্তুত থাকে এবং যদি খুব স্ট্রং মোটিভেশন থাকে, ঠিক কি না মনোবাবু?

আজ্ঞে, খুবই ঠিক স্যার। আপনি পুলিশ অফিসার, কত জানেন।

তদন্তকারী পুলিশেরা কিন্তু কোনও সূত্রই পায়নি। এমনকী এটা মার্ডার কেস না অ্যাবডাকশন না নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তারা আজও জানে না। কেসটার চার্জে আমি ছিলাম না। তবে শুনেছি। যিশু যেসব ঠেক থেকে তোলা আদায় করত তার সব কটা আমি একে একে গিয়ে দেখেছি। সবচেয়ে লাইকলি স্পট বলে আমার মনে হয়েছে সবরওয়ালের গোডাউনের বিরাট চত্বর। আমি কখনও আপনাকে জেরা করিনি বা মুখোমুখিও হইনি। শুধু আড়াল থেকে দুদিন আপনাকে একটু ওয়াচ করেছি। আপনাকে সবসময়ে শশব্যস্ত, টেনশনে ভোগা নিরীহ লোক বলেই আমার মনে হয়েছে।

হ্যাঁ স্যার, আমিও তো তাই বলতে চাইছি।

কিন্তু আপনার চোখে সেই গ্লিন্টটা আছে।

সেটা কী জিনিস স্যার!

গ্লিন্টকে বাংলায় ঠিক কী বলে তা জানি না। একটা ঝলকানির মতো। একটা ঝিলিক। ঠিক বোঝানো যাবে না। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ দ্যাট গ্লিন্ট ইন ইওর আইজ। খুনি চিনতে আমার ভুল হয় না মনোবাবু।

হাসব না কাঁদব তা বুঝতে পারছি না স্যার।

প্রবলেম হল যিশুর ডেডবডিটা নিয়ে। খুন হয়ে থাকলে তার লাশ যাবে কোথায়। আমি একদিন সকালে, যখন কেউ কাজে আসেনি, জায়গাটা তন্ন তন্ন করে দেখি। উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ন্যাচারাল ডিচ আছে। পাঁচ ছ-ফুট ডায়ামিটারের একটা ডিচ। চারদিকে প্রচুর আগাছা থাকায় গর্তটা চোখেই পড়ে না। চর্ট ফেলে দেখি, বেশ গভীর। অন্তত আট দশ ফুট নীচে ডিচের তলায় কয়েকটা সিমেন্টের চাঙর। জলে ভিজলে সিমেন্ট জমে যায়, আর সময়টা ছিল বর্ষাকাল। আমার অনুমান ডিচের মধ্যে একটা ডেডবডি ফেলে ওপরে কয়েক বস্তা সিমেন্ট ঢেলে দিলে কাজটা এগিয়ে থাকে। সিমেন্টের ওপর অবশ্য যথেষ্ট রাবিশও ফেলা হয়েছে।

হ্যাঁ স্যার, গোডাউনে মাঝে মাঝে এক-আধটা সিমেন্টের বস্তা জমে যায়। সেগুলো ডিচের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।

হ্যাঁ, তা আমি জানি। ওই চাঙরগুলোর মধ্যে যদি যিশুর খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পাওয়া যায় তাহলে আমি অবাক হব না। তবে আমি চাঙড়গুলো ভেঙে দেখিনি। সবই আমার অনুমান।

স্যার কেন যে ওসব ভয়ঙ্কর অনুমান করছেন কে জানে। যিশু মস্ত গুন্ডা, সে যদি খুন হয়েও থাকে তবে সেটা তার সমকক্ষ লোকই করেছে।

আপনি যিশুর সমকক্ষ নন?

পাগল! কী যে বলেন স্যার!

নরম্যালি, যিশু যদি বাঘ তো আপনি ইঁদুর। কিন্তু যখন অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়, প্রভু ভক্ত যখন প্রভুর বিপদের গন্ধ পায় তখন বিশেষ সিচুয়েশন অর্ডার অফ পারসোনালিটিজ উলটে যেতে পারে। তখন বাঘ হয়ে যায় ইঁদুর, ইঁদুর বাঘের জায়গা নেয়।

স্যার, আপনার কথা শুনে বড্ড ভয় পাচ্ছি।

কেন, ভয়টা কীসের?

আপনি যা সব বললেন সেগুলো কি ভয়ের কথা নয়? একটা নেংটি ইঁদুর হঠাৎ হালুম-বাঘা হয়ে উঠলে সে নিজেই যে ভয় খেয়ে যাবে। না মশাই, না, আপনি আমার ভিতরে ভুল জিনিস দেখেছেন। আমি ওরকম নই।

সেটা আমিও জানি। আপনি ওরকম নন।

আজ সকালেই তো বাজারে পাতিলেবু কিনতে গিয়ে একটু দরাদরি করছিলাম, লেবুওয়ালা এমন রক্ত-জল-করা চোখে চাইল যে আমি পালানোর পথ পাই না।

হ্যাঁ, আপনি ওরকমও বটে। খুব ভীতু, ঝঞ্ঝাটবিরোধী, এসকেপিস্ট।

তাহলেই বুঝুন, আপনি আমাকে ভুল অ্যাসেস করছেন কি না।

না, তাও করছি না। খুনের কিনারা করার দায়িত্ব আমাকে কেউ দেয়নি। যিশু দাস মোট বাইশটা খুন করেছে বলে পুলিশের হিসেব আছে। বেঁচে থাকলে সে হয়তো আরও বাইশটা খুন করত। সুতরাং তার লোপাট হওয়া নিয়ে পুলিশের তেমন মাথাব্যথাও নেই। তবে হাঁ, সে বেঁচে থাকলে পুলিশ তার কাছ থেকে কমিশন পেত। সেইটেই যা লস। কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট অন্য জায়গায়। সেটা আপনি।

কী যে বলেন স্যার, এ যে অবিশ্বাস্য! তবে বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। জীবনে আমাকে কেউ এত ইম্পর্ট্যান্স দেয়নি।

তারা ভুল করেছে। আপনার ইম্পর্ট্যান্স এতটাই বেশি যে, আমি অনেক খোঁজখবর নিয়ে, আপনার ডেলি রুটিন চেক করে তবে এই পার্কে ঠিক আপনার পাশে এসে বসে আছি।

আমার ভারি গুমোর হচ্ছে স্যার, বুকটা ফুলে উঠছে অহংকারে।

আপনি যিশুকে মারার জন্য কি লোহার রড ব্যবহার করেছিলেন মনোবাবু?

আপনি যে কেন আমাকে বারবার ঠেলে খুনখারাপির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। তবে আমি স্বীকার করি লোহার রড একটি মারাত্মক জিনিস।

স্বীকার করেন?

হ্যাঁ, আমাদের কারখানায় একজন লেবারের বাঁ চোখের ভিতর দিয়ে একবার একটা রড ঢুকে গিয়েছিল তার মাথার মধ্যে, তক্ষুনি মারা যায়। ঘটনাটা ভাবলে এখনও শিউরে উঠি।

যিশুকে কি ওভাবেই মারা হয়েছিল মনোরঞ্জনবাবু? চোখের ভিতরে রড ঢুকিয়ে?

কি করে জানব স্যার? ওসব যে বীভৎস ব্যাপার।

আর তার ডেডবডিটা? সিমেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে, জল ছিটিয়ে হুইলব্যারোতে নিয়ে গিয়ে ডিচের মধ্যে ফেল দিয়েছিলেন?

মা গো! আপনি যে কীরকম সব ভয়ঙ্কর কথা বলেন! আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

বাঁচার জন্য মানুষ তো সব কিছু করতে পারে। তাই না?

তা অস্বীকার করছি না স্যার। তবে আমি বলতে চাই, আপনি ভুল লোককে সন্দেহ করছেন। আমি সে নই।

আমি তা স্বীকার করি। এই যে মনোরঞ্জন আমার পাশে এখন বসে আছে সে খুনি নয়, মারকুট্টা নয়, ভয়ংকর নয়। কিন্তু এই মনোরঞ্জনের মধ্যে আরও একজন মনোরঞ্জন সেই দিন জেগে উঠেছিল, তাকে আমিও চিনি না, আপনিও চেনেন না। তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই স্যার।

জানি। কিন্তু সে যখন একবার জেগেছে তখন প্রয়োজন দেখা দিলেই সে কিন্তু আবার জাগবে।

সেটা তো ভয়ের ব্যাপার স্যার।

হ্যাঁ, আপনাকে সেই মনোরঞ্জন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতেই আমার আসা। পুলিশ আপনাকে ধরতে পারবে না, আপনার ফাঁসি বা জেলও হবে না, কিন্তু আমি তবু বলছি, আপনি বিপন্ন। ওই ভয়ঙ্কর মনোরঞ্জন কিন্তু আপনাকে সহজে রেহাই দেবে না।

চলে যাচ্ছেন স্যার?

হ্যাঁ।

যাবেন না স্যার, আর একটু বসুন।

কেন?

একা থাকতে আমার বড় ভয় করছে স্যার। দয়া করে অন্তত আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যান।

কাকে ভয় পাচ্ছেন মনোরঞ্জনবাবু?

আজ্ঞে, মনোরঞ্জনকে।

হরণ

হ্যালো! হ্যালো!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না।

আচ্ছা, এটা কি টু ফোর সেভেন থ্রি ফোর জিরো ফোর জিরো?

এই মেরেছে, নম্বরটা তো ঠিক জানা নেই।

আচ্ছা, এটা বিজয় ঘোষের বাড়ি কি?

বিপদে ফেললেন মশাই, এই বাড়ির কর্তার নাম কি বিজয় ঘোষ নাকি?

আপনি কে বলছেন বলুন তো!

আমি এ বাড়ির একজন গেস্ট বলতে পারেন।

গেস্ট! গেস্ট, অথচ হোস্টের নামটা বলতে পারছেন না?

আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

শিকাগো।

শিকাগো? ও বাবা, সে তো অনেক দূরের পাল্লা! তাহলে আপনাকে সত্যি কথাটা বলাই যায়। আপনার দিক থেকে কোনও বিপদের ভয় নেই।

কী যা তা বলছেন! পাগল নাকি?

না, ঠিক পাগল নই। আমি আসলে একজন চোর।

চোর! বলেন কী মশাই! আপনি চোর?

হ্যাঁ, অত অবাক হচ্ছেন কেন? চোর কথাটা নিশ্চয়ই আপনি এই প্রথম শুনছেন না!

ইয়ার্কি মারছেন না তো!

না মশাই, না। অনেক মেহনত করে সবে ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় হঠাৎ ফোনটা বাজতে লাগল। কাজের সময় ফোনটোন বাজলে বড্ড ফ্যাসাদে পড়তে হয় মশাই, তাই ফোনটা তুলে কথা কইছি।

সর্বনাশ! আমি যে ভীষণ নার্ভাস ফিল করছি।

আমিও। আপনার চেয়ে বরং একটু বেশিই।

দেখুন, আপনার কাছে আর্মস নেই তো! পিস্তল টিস্তল বা ছোরাছুরি?

আরে না। ওসব নিয়ে বেরোলে আরও বিপদ। ওসব কাছে থাকলেই মনে জিঘাংসা আসে, আর তা থেকে খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে। তাই আমি ওসব রাখি না।

দেখুন, আমার টেলিফোনের স্ক্রিনে ডায়াল করা যে নম্বরটা দেখতে পাচ্ছি সেটা আমাদের বাড়ির নম্বরই বটে। আচ্ছা, এটা কত নম্বর বাড়ি বলুন তো! সেভেনটি ফোর ডি বাই ওয়ান...?

বিপদে ফেললেন মশাই, বাড়ির নম্বরটা তো দেখিনি!

বাইরের দরজায় আমার বাবা বিজয় ঘোষের নেমপ্লেট আছে।

সদর দিয়ে তো ঢুকিনি মশাই যে নেমপ্লেট দেখতে পাব। আমি ঢুকেছি পিছনের জানালার গ্রিল কেটে। পরিশ্রম বড় কম হয়নি।

দেখুন, আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি?

আহা, কত কিন্তু কিন্তু করার কী আছে? বলে ফেলুন।

আপনি যখন চোর তখন চুরি তো করবেনই, সে তো আর আটকাতে পারব না। কিন্তু প্লিজ, আমার মা বাবার কোনও ক্ষতি করবেন না। আর আমার একটা ছোট বোনও আছে। প্লিজ, প্লিজ, ওদের ওপর চড়াও হবেন না, আপনার যা খুশি নিয়ে যান।

কিন্তু কেউ যদি জেগেটেগে যায় তাহলে তো আমাকে মাথা বাঁচাতে হবে মশাই! চোরের প্রাণ বলে কি প্রাণটার দাম নেই?

অবশ্যই আছে, অবশ্যই আছে।

তাহলে কথা দিই কী করে?

আচ্ছা, এটা কাজ করছি। লাইনটা আমি ধরে থাকছি, আপনিও লাইনটা কাটবেন না। কেউ যদি বাইচান্স জেগে যায়, তাহলে তাকে আগে আমার সঙ্গে কথা বলে নিতে বলবেন।

এ প্রস্তাবটা অবশ্য খারাপ নয়। বাড়িতে আর কেউ নেই তো? ধরুন, গুন্ডা প্রকৃতির কোনও ভাই বা আহাম্মক কোনও চাকর?

না না, আর কেউ নেই। আমরা দুই ভাই-বোন আর বাবা-মা।

বাঃ, আপনাদের বেশ ছিমছাম ফ্যামিলি।

হ্যাঁ। আপনাদের ফ্যামিলি কি বড়?

নাঃ। ফ্যামিলিই নেই।

ও। বিয়ে করেননি বুঝি?

নিজেরই পেট চলে না, তার বিয়ে।

সে তো ঠিকই। আমাদের গরিব দেশ, কত লোক খেতে পায় না।

খিদের কষ্টটা কি টের পান? আপনি তো একটা ঝিনচাক দেশে আছেন। শুনেছি সেখানে নাকি মানুষ বেশি খেয়ে মোটা হয়ে যাচ্ছে!

ঠিকই শুনেছেন। আমেরিকার সবচেয়ে বড় প্রবলেম ওবেসিটি। খুব জাঙ্ক ফুড খায় তো!

ওই হট ডগ, পিৎজা, হ্যামবার্গার এইসব তো!

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি তো বেশ জানেন দেখছি!

ওসব আজকাল সবাই জানে। পড়াশুনো করতে গেছেন, না চাকরি করতে?

দুটোই। আমি আই টি-র ছাত্র। আবার চাকরিও করছি।

বাঃ খুব ভালো। এখন তো আই টি-রই যুগ!

আশ্চর্য! আপনি তো সত্যিই বেশ জানেন!

চোর বলেই কি আর মুখ্যু? সামান্য হলেও বিদ্যে একটু আছে। রোজ খবরের কাগজ পড়ি।

না, না, আমি আপনাকে মূর্খ বলতে চাইনি। আসলে আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে আপনি অন্য সব চোরদের মতো নন।

কী করে বুঝলেন? কটা চোরের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

তা নেই ঠিকই। আন্দাজ থেকে বলছি।

দিনকাল পালটে গেছে মশাই। এখন আর আগেকার মতো বোকা বোকা চোরের যুগ নেই। গেরস্তও মেন চালাক-চতুর হয়েছে, চোরও হয়েছে সেয়ানা। আগে ঘরে ঘরে জানালায় শিক থাকত। সেটা বেঁকিয়ে ঘরে ঢোকা সোজা। আজকাল গ্রিল হয়েছে, সেটা বাঁকানো যায় না বলে আমাদের গ্যাস কাটার ব্যবহার করতে হয়। আর আমেরিকার চোররা তো রীতিমতো ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট।

ঠিক কথা। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে একটা কথা বলব?

বলুন না। আমি কথাটথা কইতে ভালোই বাসি। কথা শুনলে জ্ঞানও বাড়ে।

বলছিলাম কী, আমাদের বাড়িতে ক্যাশ টাকা বেশি থাকে না। গয়নাগাঁটিও সব লকারে।

এই তো মাটি করলেন। গয়নাগাঁটি লকারে রাখতে গেলেন কেন? আজকাল তো ব্যাঙ্কের লকার থেকে দেদার জিনিস হাওয়া হয়ে যাচ্ছে! এটা কাঁচা কাজ হয়েছে মশাই। লকারের জিনিসে ব্যাঙ্ক কোনও গ্যারান্টিও দেয় না। গেলেই গেল।

আপনি হয়তো ঠিক বলছেন। কিন্তু আমার মা-বাবার ব্যাঙ্কের ওপর অগাধ বিশাস। তবে আপনাকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হবে না। ক্যাশ টাকা কোথায় পাওয়া যাবে আমি বলছি। রান্নাঘরে মিটসেফের মধ্যে একটা পুরনো গ্ল্যাকসোর কৌটো আছে। বড় কৌটো। তাতে মুসুরির ডাল রাখা হয়। ওই ডালের মতো হাত চালালেই কিছু টাকা পাওয়া যাবে।

কত হবে? বিশ-তিরিশ নাকি?

কিছু বেশিও হতে পারে। ধরুন শতখানেক।

দূর। ওসব পেটি ক্যাশ ছুঁই না আমি।

আপনার কাছে কি টর্চ আছে?

আছে। তবে চোরেদের আলো জ্বালানো বারণ। টর্চের কথা কেন?

বলছিলাম কি, টর্চ থাকলে আপনার একটু সুবিধে হবে। দক্ষিণ দিকে যে শোওয়ার ঘরটা আছে সেখানে গোদরেজের আলমারির নীচের তাকে চারটে অ্যালবাম পাবেন। সবুজ মলাটওলা অ্যালবামের ভিতরে খুঁজলেই অন্তত হাজারখানেক টাকা পেয়ে যাবেন।

আহা, শুধু ক্যাশ টাকাই তো আমার টার্গেট নয়। দামি জিনিস কিছু নেই? এরকম একটা ঘ্যামা বাড়িতে তো দামি দামি জিনিস থাকার কথা।

হ্যাঁ আছে। গোদরেজ আলমারির পাশেই আরও একটা আলমারি পাবেন। তার মধ্যে একটা ক্যামেরা, একটা হ্যান্ডিক্যাম আর পোর্টেবল ভি সি ডি অডিয়ো ভিডিয়ো প্লেয়ার

পেয়ে যাবেন।

ওসব জিনিসের সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট খুব খারাপ। কারণ হচ্ছে, ওগুলো সারা পৃথিবীতে এত একসেস প্রোডাকশন হয়েছে যে দামও কমে যাচ্ছে হু হু করে।

আপনি সত্যিই খবর রাখেন।

সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটের খবর না রাখলে কি আমাদের চলে? আচ্ছা এখন ওখানে কটা বাজছে বলুন তো!

দুটো পাঁচ। আপনি তা সাড়ে এগোরো ঘণ্টা পিছনে আছেন। ওখানে বোধহয় এখন দুপুর তিনটে পঁয়ত্রিশ! শনিবার।

মাই গড! আপনি শিকাগোর সময় জানলেন কী করে?

জানা শক্ত নাকি?

না, শক্ত নয়। তবে--। যাকগে, আপনার টার্গেটটা কি আমাকে একটু বলবেন?

না মশাই, কোনও টার্গেট ঠিক করে তো আর চুরি করতে ঢোকা যায় না। আর যা জোটে তাই নিয়ে পিছটান দেওয়ার মতো ছিঁচকে চোরও আমি নই। মেহনত করে ঢুকেছি, চারদিকে দেখেটেখে যা পছন্দ হবে নিয়ে যাব। অ্যান্টিক কিছু আছে?

অ্যান্টিক! না, আমাদের বাড়িতে অ্যান্টিক কিছু আছে বলে তো জানি না। তবে ছিল। শুনেছি, আমাদের ঢাকার বাড়িতে ব্রিটিশ আমলের পুতুল, ঘড়ি, খেলনা, অয়েল, পেন্টিং, এনগ্রেভিং, ফরাসি দেশের রুপোর চামচের সেট এই সব ছিল।

আপনাদের দেশ কি ঢাকা?

হ্যাঁ।

আমাদেরও ঢাকা। তবে শহরে নয়। গাঁয়ে বিক্রমপুর।

বাঃ, শুনে খুশি হলাম।

খুশি হওয়ার কিছু নেই মশাই, ঢাকাতেও শুনেছি, আমাদের তেমন সুখের সংসার ছিল না। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনারা বেশ বনেদি বড়লোক।

না, না, বড়লোক নই। তবে ঢাকা শহরে আমাদের বেশ বড় ব্যবসা ছিল। মিষ্টির দোকান আর মনোহারি স্টোর। দেশত্যাগ হওয়ার পর ব্যবসা লাটে উঠল।

ঢাকায় গেছেন কখনও?

না। দেশ ত্যাগের সময় তো আমার বাবারই জন্ম হয়নি।

আপনার বাবার বয়স কত?

সাতান্ন। একথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?

মিলিয়ে দেখলাম। বেঁচে থাকলে আমার বাবার বয়স হত পঞ্চান্ন।

বেঁচে নেই বুঝি?

না, ইস্কুল মাস্টার ছিলেন।

তাই? তাহলে আপনি এই লাইনে এলেন কেন?

কেন, এই লাইন কি খারাপ?

না, মানে চুরিটুরি কি আর ভালো জিনিস?

হাসালেন মশাই, যে দেশের মন্ত্রী চোর, পুলিশ চোর, আমলা চোর, আপামর জনসাধারণের তিনজনের দুজন চোর সেই দেশে চুরি ভালো জিনিস না হবে কেন? আমার বাবা মাস্টারি করতেন, চুরির সুযোগ ছিল না, আর তেমনি কষ্ট পেয়ে অভাবে তাড়নায় ধুঁকতে ধুঁকতে অকালে চলে গেলেন।

আপনি কি বলতে চান যে, আপনার অবস্থা আপনার বাবার চেয়ে ভালো?

খারাপ কি বলুন। আমার মোটরবাইক আছে, মোবাইল ফোন আছে, ঘরে কালার টি-ভি, ফ্রিজ আছে। আর হ্যাঁ, আমি সেলিমপুরে যে ফ্ল্যাটে থাকি সেটা আমার ওনারশিপ ফ্ল্যাট।

বলেন কি? তাহলে তো আপনি রীতিমতো এস্টাব্লিশড!

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। তবে নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম।

আমর কম্বিনেশনে সংস্কৃত ছিল না। ওটার মানে কী?

আমর বাবা সংস্কৃতে মস্ত পণ্ডিত ছিলেন, আমাকে সংস্কৃত শিখতে হয়েছিল। আর যেটা বললাম, সেটার মানে আপনার না জানলেও চলবে।

আচ্ছা, আপনার কথাবার্তার পালিশ দেখে মনে হচ্ছে আপনি লেখাপড়া জানেন।

ওটা বলে লজ্জা দেবেন না। যা জানি তাকে লেখাপড়া জানা বলে না। আমাকে শিক্ষিত ভাবলে ভুল করবেন।

আপনি আমাকে খুব ডাইলেমায় ফেলে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আপনি আমাদের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছেন।

এ যুগটা তো বোলচালেরই যুগ। যে যত বুকনি আওড়াতে পারে সেই তত খাতির পায়। আমার কথা শুনে ইমপ্রেসড হবেন না যেন। ভুল করবেন, আমি সত্যিই চোর।

সেটাই তো ধাঁধায় ফেলেছে আমাকে। চোর হলেও আপনার বেশ স্টাটাস আছে মনে হচ্ছে। আমাদের বাড়িতে কি আর তেমন কিছু পাবেন?

ঠিকই ধরেছেন। চোর হলেও আমি একটু উন্নাসিক।

হ্যাঁ, তাই ভাবছি আপনার মতো একজন হাইফাই বার্গলারের সম্মান রক্ষার মতো কিছুই তো আমাদের বাড়িতে নেই।

আছে মশাই, আছে। একেবারে বিনা খবরে কি আমি সময় নষ্ট করতে এসেছি?

কী আছে বলুন তো!

উনিশশো আঠারো বা উনিশের একটা রোলেক্স ঘড়ি। বেশ বড় সাইজের। পুরোনো আমলের দম দেওয়া ঘড়ি। ঠিক কিনা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে। ওটা আমার দাদুর বাবার ঘড়ি বলে শুনেছি। ওটা বাবা খুব যত্ন করে রোজ দম দেন। আশ্চর্যের বিষয়, ঘড়িটা আজও চলে। কে আপনাকে ঘড়িটার কথা বলল বলুন তো!

আমার একটা নেটওয়ার্ক আছে।

বাব্বাঃ, আপনি তো বেশ অর্গানাইজড ম্যান।

না হলে এ যুগে ব্যবসা চলবে কেন বলুন। আপনার বাবা এই ঘড়িটা সম্পর্কে সব ইনফর্মেশন ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানিয়েও দিয়েছেন। আমি ইন্টারনেটেই সার্চ করে করে খবরটা পাই।

তার মানে আপনি ইন্টারনেটেই আমাদের ঠিকানা পেয়েছেন? তবে যে বললেন আপনি বাড়ির মালিকের নাম জানেন না, বাড়ির নম্বর জানেন না।

সাবধানের মার নেই মশাই, তাই একটু ন্যাকামি করতে হয়েছিল।

ঘড়িটা হলেই কি আপনার চলবে?

আপাতত ঘড়িটাই আমার টার্গেট। ওটার বাজারদর যাচাই করে দেখেছি পাঁচ থেকে সাত লাখ অবধি পাওয়া যেতে পারে।

বলেন কী? ওই ঘড়িটার এত দাম কে দেবে?

কালেকটাররা দেবে, কোম্পানি নিজেও দেবে। ইন্টারনেটে রেগুলার ওদের বিজ্ঞাপন থাকে। কালেকটারদের এজেন্টরা কলকাতাতেও আসে।

তবু আপনি নিজেকে শিক্ষিত বলতে চান না? কেন বলুন তো! আপনি তো রীতিমতো শিক্ষিত মানুষ। ইন্টারনেট সার্ফ করেন মানে আপনি দুনিয়ার সব খবরই রাখেন।

না মশাই, বেশি খবর রেখে লাভ কী? আমার যেটুকু দরকার সেই খবরটুকু রাখি।

তার মানে আপনার কম্পিউটারও আছে?

আছে। চাঁদনি মার্কেট থেকে অ্যাসেম্বল করিয়ে কিনে এনেছি।

ল্যাপটপও আছে নাকি?

না। তবে আপনার বাবার ঘড়িটা গ্যাঁড়াতে পারলে ল্যাপটপও হয়ে যাবে।

ঠিক আছে। বাবা দোতলার দক্ষিণের ঘরে থাকেন। পাশের ঘরে মা আর বোন। বাবার ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে। তার ডানধারে টপ ড্রয়ারে ঘড়িটা পেয়ে যাবেন।

বাঃ, ইউ আর ভেরি কো-অপারেটিভ।

কিন্তু মুশকিল হল, দোতলায় সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া আছে।

আপনি তো আমেরিকায় থাকেন। জানেন কি সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ মাগারদের একটা গাড়ির লাগেজ বুট খুলতে ক-সেকেন্ড সময় লাগে? তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড।

ভগবান! আপনি কি আমেরিকাতেও হানা দিয়েছিলেন নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব আপনার না জানলেও চলবে। আমি কর্ডলেস ফোনটা নিয়েই ওপরে উঠছি। আপনি আমাকে গাইড করতে থাকুন।

আর একটা কথা। আমার বাবার ঘুম খুব সজাগ। সামান্য শব্দ হলেই জেগে যাবেন। যদি জেগে যান তাহলে কী করতে হবে, তা তো আপনাকে বলেই রেখেছি।

হ্যাঁ, মনে আছে। তাঁকে ফোনটা ধরিয়ে দেব এবং আপনি তাঁকে রিঅ্যাক্ট করতে বারণ করবেন।

একজ্যাক্টলি। আর দয়া করে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করবেন না। আমার বাবার পেসমেকার আছে। কেমিক্যাল ওষুধে রিঅ্যাকশন হতে পারে।

আপনি আপনার বাবাকে খুব ভালোবাসেন, না?

খুব।

ভালো। এই ভালোবাসাটা বজায় রাখবেন। পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরমতপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা।

আমি এই শ্লোকটার অর্থ জানি।

তা তো জানেন। কিন্তু বিয়ের পর অর্থটা যেন ভুলে যাবেন না। পিতায় শ্রদ্ধা, মায়ে টান, সেই ছেলেই হয় সাম্যপ্রাণ।

এটা কার কথা বলুন তো!

একজন মহাপুরুষের। তিনি মানুষের ভালো চেয়েছিলেন।

আপনি কি দোতলা পৌঁছে গেছেন?

না। উঠছি। সিঁড়িটা খুবই অন্ধকার।

সাবধানে উঠবেন।

আচ্ছা, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে নাকি?

হ্যাঁ। সত্যিই নেই তো?

না, সত্যিই নেই, কিন্তু আপনার বাবার আবার পিস্তল বা রিভলবার আছে নাকি?

আছে।

এই রে! তাহলে তো বিপদের কথা।

না না। উনি খুব সাবধানী মানুষ। পিস্তল থাকলেও সেটা আলমারিতে তোলা থাকে। লোড করা থাকে না।

তাহলে পিস্তল রাখার মানে কী?

আমার মা পিস্তলটিস্তল একদম পছন্দ করেন না। আগে বাবা পিস্তলটা বালিশের তলায় রেখে শুতেন। মা রাগারাগি করে ওটাকে বিছানা থেকে বিদেয় করেছেন।

খুব ভালো কাজ করেছেন। আপনাদের বাড়িতে কুকুরও নেই দেখছি।

ছিল। একটা রাগী ডোবারম্যান। সেটা আমার খুব প্রিয় কুকুর। সেটা বুড়ো হয়ে মারা যাওয়ায় আমি কী কান্নাটাই না কেঁদেছিলাম! এখন কুকুর পোষার প্রশ্নই ওঠে না। পেডিগ্রি কুকুর রাখার অনেক ঝামেলা। আমার মা-বাবা এখন আর অত পরিশ্রমের মধ্যে যেতে চান না।

ভালোই করেছেন। কুকুর থাকলে আমাকে অন্যরকম লাইন অফ অ্যাকশনের কথা ভাবতে হত।

না, না, ওসব ভাবতে হবে না আপনাকে। আই উইশ ইউ অল সাকসেস। উঠে পড়েছেন নাকি?

হ্যাঁ। ফোনটা একটু ধরে থাকুন। তালাটা খুলে নিই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ধরছি, আপনি খুলুন।...হয়ে গেছে নাকি?

ইজি। তালা ফালা কোনও ব্যাপারই নয়। কিন্তু অন্য একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে।

কী বলুন তো!

বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে। কেউ বোধহয় বাথরুমে গেছে।

সর্বনাশ!

ভয় পাবেন না। আমার অসীম ধৈর্য, এখন কিছুক্ষণ অ্যাকশন বন্ধ করতে হচ্ছে। বুড়ো মানুষরা ঘুম ভাঙলে ফের সহজে ঘুমোতে পারেন না। আমি বরং এই ফাঁকে আপনাদের ছাদ থেকে একটু ঘুরে আসি।

বেশ তো। উঠে পড়ুন। তবে আমার বাবা রোজই ট্র্যাংকুলাইজার খেয়ে ঘুমোন। তাই বোধহয় ঘুমোতে অসুবিধে হবে না।

এটা তো উনি খুবই খারাপ করেন। ওসব খেয়ে শেষে অভ্যেস হয়ে গেলে স্বাভাবিক নিয়মে আর ঘুমোতেই পারবেন না। না খেলে উইথড্রয়াল সিম্পটম দেখা দেবে।

তাহলে কী করা উচিত?

পরিশ্রম। পরিশ্রমই হচ্ছে ঘুমের সবচেয়ে ভালো ওষুধ।

হার্ট প্রবলেম আছে বলে উনি পরিশ্রম করতে পারেন না।

আজকাল সফিসটিকেটেড পেসমেকার লাগালে কোনও প্রবলেম হওয়ার কথাই নয়। পেসমেকার নিয়ে টেনিস খেলা, সুইমিং, জিম সব কিছুই করা যায়।

পেসমেকার সম্বন্ধে এত জানলেন কী করে?

জানা শক্ত কী? আপনার বাবাকে বলবেন, সাতান্ন বছর বয়সে আজকাল কেউ বুড়ো নয়, আর পেসমেকার মানেই জবুথবু হয়ে থাকা নয়।

বলব, নিশ্চয়ই বলব।

আপনাদের ছাদটা তো ভারি সুন্দর! টাইলস বসিয়েছেন নাকি?

হ্যাঁ।

আপনারা বেশ শৌখিন। তাই না!

তা বলতে পারেন। বাবা একটু বাবুগোছের মানুষ।

বুঝেছি।...আপনি বোধহয় কোনও মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিলেন একটু, তাই না?

সরি, আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা ব্যাপার জিজ্ঞেস করছিল।

আপনি তাহলে এখন অফিসে?

হ্যাঁ। পিক আওয়ার। এক হাতে ফোন, অন্য হাতে মাউস।

তাহলে তো মশাই, আপনার কাজের ডিস্টার্ব হচ্ছে!

আরে না না, কাজে ডিস্টার্ব হবে কেন? কাজ তো একটা সিস্টেমে চলে, তার জন্য অখণ্ড মনোযোগের দরকার হয় না।

আচ্ছা মেয়েটা আপনাকে কি হ্যালো সুইট হার্ট বলে ডাকল? ও তো পুরুষরা মেয়েদের বলে!

না মশাই, আজকাল সব উলটেপালটে গেছে। যে কেউ যে কাউকে ডাকে।

মেয়েটা সত্যিই আপনার গার্লফ্রেন্ড নয় তো!

পাগল নাকি? মেয়েটা ব্ল্যাক, মোটা আর বোকা।

আমেরিকায় প্রেম ট্রেম হয়নি আপনার?

খেপেছেন? মেমসাহেবদের খপ্পরে পড়লে উপায় আছে? দুদিন পর যখন ছেড়ে যাবে তখন অ্যালিমনি দিতে দিতে ফতুর হতে হবে। আজকাল বাঙালি ছেলেরা সেয়ানা হয়েছে।

লক্ষ্মী ছেলের মতো একদিন দেশে এসে টোপর পরে বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে যাবেন, তাই না?

উপায় কি বলুন? নইলে আলুপোস্ত, বেগুনপোড়া, ইলিশ ভাপে, ধোঁকার ডালনা ভুলতে হবে যে! বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত, কি ভীষ্মদেব বা শচীনকর্তার গান শোনা বা সত্যজিৎ-তপন সিংহের ছবি দেখাও বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার গার্ল ফ্রেন্ড নেই?

না। তবে একজনকে টার্গেট করে কিছুদূর এগিয়েছিলাম, হল না।

কেন মশাই? সে কি ডিচ করল নাকি?

ডিচ তো অ্যাকসেপ্ট করার পর করে। সে আমাকে অ্যাকসেপ্টই করল না কখনও।

স্যাড ব্যাপার বোধহয়?

হ্যাঁ, আমার পক্ষে তো স্যাড বটেই।

বলতে আপত্তি আছে?

আরে না। আমার লুকোছাপার কিছু নেই। দাঁড়ান, বাথরুমে আলো এখনও জ্বলছে কিনা দেখে নিই।

জ্বলছে?

হ্যাঁ। বোধহয় বড় বাইরে গেলেন। মুশকিল হল।

আপনার তাড়াহুড়ো নেই তো?

না। তবে কাজটা মিটে গেলে স্বস্তি পাওয়া যেত।

বাবা একটু পেটরোগা আছেন। তবে বাথরুমে বেশি সময় নেন না। ততক্ষণে আপনি গার্ল ফ্রেন্ডের কথাটা বলে নিন না। ততক্ষণে বাবার হয়ে যাবে।

কী আর শুনবেন! দুনিয়ার সব প্রেমের গল্পই এক রকম।

না, না তা কেন, প্রেম তো নানারকম আছে। ঝগড়া থেকে প্রেম, আক্রোশ থেকে প্রেম, মুগ্ধতা থেকে প্রেম, অনেক কম্বিনেশন আছে মশাই।

আমাদের ঠিক প্রেম হয়নি। ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক। আপনাকে বলে রাখা দরকার, পুরুষ হিসেবে আমি মোটেই অ্যাট্রাকটিভ নই।

কী করে বুঝলেন।

আমার চেহারাটা একটু রুক্ষ টাইপের। রাগেড বলতে পারেন। মুখশ্রী মোটামুটি কুচ্ছিত। তবে আমার হাইটটা বেশ ভালো। ছয় ফুট এক ইঞ্চি।

বাঃ দারুণ হাইট তো!

হ্যাঁ, ওটাই আমার একমাত্র প্লাস পয়েন্ট, এ তো গেল চেহারা। গুণের কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলতে হবে, আমি মোটামুটি খারাপ ছাত্র, কোনও বাড়তি গুণ যেন গানের গলা, ছবি আঁকার হাত, একস্ট্রা স্মার্টনেস এসব আমার নেই। মেয়েরা আমাকে অপছন্দ করে বলেই আমি যৌবনের একেবারে শুরু থেকে টের পেয়ে আসছি।

ওগুলো কোনও বাধা নয়।

না, বাধা নয়। তবে চেহারা বা ব্যক্তিত্বে রিপালসিভ কিছু থাকলে অনেক সময়ে নিজে টের পাওয়া যায় না। আমাদের এক বন্ধু ছিল অশোক, তার চেহারা খারাপ ছিল না, মানুষও খারাপ নয়। পয়সাকড়িরও অভাব ছিল না, কিন্তু আমরা প্রায় সবাই ইউনিভার্সালি তাকে অপছন্দ করতাম। এই অপছন্দের কোনও লজিক্যাল ব্যাখ্যা কখনও খুঁজে পাইনি।

আচ্ছা আপনি আত্মগ্লানি বন্ধ করে ঘটনাটা বলুন।

ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানিয়ে রাখলাম। তাতে আপনার বুঝতে সুবিধে হবে। কয়েক বছর আগে আমি দিল্লি থেকে পূর্বা এক্সপ্রেসে ফিরছিলাম। সেকেন্ড ক্লাস থ্রি টায়ারে। এই মেয়েটিও তার মা বাবা আর মামা-মামির সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরছিল। মিষ্টি চেহারা, ছোটখাটো এবং রোগা। বেশ লাজুক ধরনের সভ্য মেয়ে।

ঠিক যে ধরনের মেয়ে আমরা সবাই পছন্দ করি?

হ্যাঁ, অনেকটা তাই। সুন্দরী আর মিষ্টির মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। এবং এই পার্থক্যটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। সব সুন্দরীই কিন্তু মিষ্টি নন।

বটেই তো। অপানার চোখ আছে। আলাপ হল বুঝি?

না। প্রথমেই নয়। বললাম না, সে বেশ লাজুক ধরনের! তবে তার বাবা, মামা এবং মামি, এরা বেশ আলাপি মানুষ। কিউবিকলে মোট ছটা বার্থের মধ্যে পাঁচটাই ওঁদের। আমি একটা আপার বার্থে। ক্লোজ প্রকসিমিটিতে কিছুক্ষণ থাকলে আলাপ হয়েই যায়। আমি গোমুখ, গঙ্গোত্রী হয়ে একটা অতি দুর্গম পথে কেদারবদ্রী পর্যন্ত ট্রেক করে ফিরছি শুনে মামাটি খুব ইমপ্রেসড। উনিও পাহাড় ভালোবাসেন। কাজেই আলাপ জমে গিয়েছিল। যতদূর মনে আছে, পাহাড়-পর্বতের কথাই হচ্ছিল। আশ্চর্যের বিষয় মেয়েটি আমাকে অ্যাভয়েড করার জন্যই বোধহয় প্রায় লাগাতার বাইরের দিকে চেয়ে বসছিল। সুন্দর হোক, কুচ্ছিত হোক, একটা পুরুষ তো! মেয়েরা এক আধবার তাকাবে না?

সেটাই তো স্বাভাবিক।

সেই স্বাভাবিক ব্যাপারটাই ঘটছিল না। মেয়ের মাও দেখলাম বেশ গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁদের কিউবিকলে আমার উপস্থিতিটা তিনি বিশেষ পছন্দ আর করছিলেন বলে মনে হল না। তবে যাই হোক, ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে তো আর বাছাবাছি চলে না। মানুষ আপনাকে অপছন্দ করলে বেশ বোঝা যায় তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

মেয়েটির মামি তাঁদের স্টক থেকে আমাকে লুচি অফার করায় মেয়েটির মা এমনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন যে আমি লুচি রিফিউজ করতে বাধ্য হই। হাসছেন? এখন অবশ্য ব্যাপারটা আমারও হাস্যকরই লাগে। তবে তখন ভারি খারাপ লেগেছিল, লুচি আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস, আমার বেশ ইচ্ছেও হচ্ছিল মশাই কিন্তু...

যা বলেছেন। কতকাল যে লুচি খাইনি। টোস্ট আর দুধ সিরিয়াল খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেল।

বিদেশে থাকার ওইটেই তো অসুবিধে।

হ্যাঁ, লুচির কথা কী যেন বলছিলেন?

হ্যাঁ, লুচির কথাটাই বলি। পাহাড়ে ট্রেক করতে গিয়ে খাবার দাবার বেশি জোটেনি। পয়সাও ফুরিয়ে এসেছিল। প্রায় পঁচিশ দিনের ট্যুরে ভরপেট খাবার কদিন জুটেছে তা হাতে গুনে বলা যায়। কাজেই লুচি দেখে লোভ হওয়ারই কথা।

তা তো বটেই। লুচি শুনে আমার তো এত দূরে বসেও কেমন যেন খিদে-খিদে পাচ্ছে। এবার মেয়েটির কথায় আসুন।

হ্যাঁ। মেয়েটির নাম ইতু। বয়স বেশ কম, সতেরো আঠারোর বেশি নয়। আমার তখন সাতাশ আটাশ।

গুড কম্বিনেশন।

কম্বিনেশন আর হল কই, আমার ইন-বিল্ট রিপালসিভনেসটা মেয়েটাকে সিঁটিয়ে রেখেছিল। এভাবেই হয়তো বাকি পথটা কেটে যেত। কিন্তু মাঝপথে একটা ঘটনা

ঘটেছিল।

ঘটনা! সুইট সামথিং?

সুইট হওয়ারই তো কথা, কিন্তু যার কপাল খারাপ তার সকলই গরল ভেল।

আগে শুনিই না।

ব্যাপারটা হয়েছিল, ওদের পাঁচজনের টিকিটটা ছিল ইতুর কাছে। একটু আগে যখন পাটনার টিকিট দেখতে এসেছিল তখন মেয়েটাই টিকিট বের করে দেখায়। এটুকু আমি দেখেছিলাম। তারপর মেয়েটা নাকি আনমনে টিকিটটা হাতে পাকিয়ে বেখেয়ালে একটা খালি খাবারের বাক্সের গার্ডারে গুঁজে রেখে দেয়। সেটা মনে ছিল না, তারপর হঠাৎ বাক্সটা নেড়ে সেটা খালি টের পেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। তখন ভাগ্যিস সকালবেলা আর ট্রেনটা সবে পাটনা স্টেশন ছেড়ে ধীরে চলছে। মেয়েটা হঠাৎ চমকে উঠে বলল, এ মাঃ, আমি টিকিটটা ফেলে দিলাম যে! শুনে সবাই তো চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল। হঠাৎ বিপদ ঘটলে অনেক সময়েই বুদ্ধি স্থির থাকে না। আমি তাড়াতাড়ি উঠে চেন টেনে বললাম, ব্যস্ত হবেন না, আমি দেখছি। বলে ট্রেন ভালো করে থামবার আগেই আমি নেমে পিছন দিকে ছুটতে লাগলাম। সবে পাহাড় পর্বতে চড়ে এসেছি, বডি খুব ফিট ছিল। কাজেই বেশ খানিকটা এবড়ো খেবড়ো জমি পেরিয়ে গিয়ে সাদা রঙের বাক্সটা পেয়ে গেলাম। গার্ডার থেকে টিকিটটা খুলে নিয়ে ফের দৌড়ে এসে কামরায় উঠে পড়লাম। গার্ড আর অ্যাটেনড্যান্ট এসে ব্যাপার স্যাপার জেনে একটু সতর্ক করে দিয়ে চলে গেল।

তখন তো আপনি হিরো!

অতটা না হলেও বরফ একটু গলল। ধন্যবাদ-টন্যবাদ হল, বাবা, তুমি বাঁচালে, গোছের সাধুবাদও পাওয়া গেল, এমনকী এতক্ষণ আমাকে দর্শনযোগ্য মনে না হলেও ইতুও ভারি কৃতজ্ঞতার চোখে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার মতো কিছু একটা বলেছিল। আর ইতুর মা খুব উদ্যমের সঙ্গে প্রচুর লুচি খাওয়ালেন। সঙ্গে তরকারি, আচার, মিষ্টি।

যাক, মশাই লুচিটা শেষ অবধি জুটেছিল?

হ্যাঁ। আমি রিফিউজ করার চেষ্টা করেছিলুম, তবে উনি ছাড়লেন না।

তারপর?

অবশেষে পাঁচজনের সঙ্গেই আমার বেশ সহজ সম্পর্ক হয়ে গেল। এমনকী ওঁরা ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যও আন্তরিকভাবে নেমন্তন্ন করলেন।

গেলেন নাকি?

কী করব বলুন, মেয়েটাকে এতই ভালো লেগে গিয়েছিল যে মুখখানা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। সাধারণত ট্রেনের আলাপ ট্রেনেই শেষ হয়, কিন্তু আমার ভিতরে কী যে একটা গণ্ডগোল করে দিল মেয়েটা! তবে হ্যাংলার মতো পরদিনই ছুটে যাইনি। কয়েকদিন পর এক বিকেলে ঠিকানা খুঁজে গিয়ে হাজির হলাম। তাঁরা বেশ খাতিরও করলেন।

এমনকী ইতুও এসে সামনে বসল। চা-টা খেয়ে চলে এলাম। প্রথমদিন খুব বেশিক্ষণ বসলে খারাপও তো দেখায়। কিছুদিন পর আবার গেলাম। ইতুদের বাড়ি আর ওর মামার বাড়ি হরিশ মুখার্জি রোডের একটা মালটিস্টোরিডের পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটে। দুই পরিবারে খুব ভাব। মামার ছেলেপুলে নেই। আর ইতু তার মা-বাবার একটিই সন্তান। খুব আদরের পাত্রী।

তখন আপনি কী করতেন?

না, তখনও আমি চোর হইনি। চাকরিবাকরির চেষ্টা না করে আমি একটা ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিলাম। তার আগে টু হুইলার সারানোর একটা দোকান দিয়েছিলাম পার্টনারশিপে। আমার লেবার, পার্টনারের ক্যাপিটাল। কিন্তু পার্টনার পার্টনারশিপ ভেঙে দিল। এরপর গুঁড়ো মশলা।

গুঁড়ো মশলা? অফ অল থিংস গুঁড়ো মশলা? কেন মশাই, টু-হুইলার ছেড়ে গুঁড়ো মশলা কেন?

আমাদের কি কোনও চয়েস আছে মশাই? এক চাক্কিওলার সঙ্গে একটু ভাব ছিল। সেই আমাকে পরামর্শ দিল, সস্তার হোটেলগুলোতে প্রচুর গুঁড়ো মশলার চাহিদা। সে আমাকে সাপ্লাইয়ের লাইন ধরিয়ে দেবে। সস্তায় মশলা কিনে এনে যদি তার চাকতিতে পেষাই করে নিই তাহলে সে আমার ব্যবসায়ে টাকা খাটাতেও রাজি।

ব্যবসাটা কি চলেছিল?

হ্যাঁ। আর আশ্চর্যের বিষয় চাক্কিওয়ালা বিহারি লোকটা আমাকে সত্যিই সাহায্য করেছিল। বছর দুয়েকের মধ্যে আমার অবস্থা বেশ ভদ্রস্থ হয়ে উঠল। যে সময়ে ইতুর সঙ্গে আলাপ সেই সময়ে আমার মান্থলি ইনকাম প্রায় হাজার পনেরো টাকা নিট। ব্যবসা ভালো চলছে, এমনকী আমি কয়েকজন এজেন্টকেও কমিশন বেসিসে কাজ দিয়েছি। আমার সংসারের হালও ফিরেছে।

আপনার ফ্যামিলি কি বড়?

না। সেইটেই বাঁচোয়া। বাবা মারা গেছে, ছোট বোন আর মাকে নিয়ে আমার ফ্যামিলি ছোটই, তবে বোনের বিয়েতে কিছু ধার কর্জ হয়ে গিয়েছিল। লাভ ম্যারেজ বলে বাঁচোয়া। নেগোশিয়েট করে বিয়ে দিতে গেলে আরও ধসে যেতাম।

এবার ইতুর কথায় ফিরুন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। দাঁড়ান, বাথরুমের আলোটা দেখে নিই।

নিভে গেছে?

হ্যাঁ। এবার ওঁকে ঘুমনোর সময়টুকু ছাড় দিতে হবে। তবে খুব বেশি দেরি করা চলবে না, রাত প্রায় তিনটে বাজে।

অন্তত মিনিট দশেক ছাড় দিন। অবশ্য সেফগার্ড হিসেবে আমি তো আছিই। তবু হঠাৎ মধ্যরাতে একটা চ্যাঁচামেচি হওয়াটা ভালো নয়। আমাদের পাড়ায় আমার নাইট গার্ড ঘোরে।

জানি। ওসব না জেনে কি আর কাজে নামতে হয়?

এবার বলুন।

ইতুর মামি একদিন তাঁদের ফ্ল্যাটে আমাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমি ইতুর প্রতি ইন্টারেস্টেড কিনা। আমি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করলাম যে, ইতুকে আমার ভীষণ পছন্দ। উনি এখন আমার বাড়ি ঘর রোজগার এ সবের খোঁজ খবর নিলেন। আমি সব বলে দিলাম। উনি বিরস মুখে বললেন, দ্যাখো, বাপু, ইতুর বাপের এক মেয়ে। মামারও বড্ড আদরের ভাগ্নি। তোমার যা অবস্থা তাতে স্বাভাবিক নিয়মে ইতুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমাদের মধ্যে যদি ভাব-ভালোবাসা হয়ে থাকে তবে গার্জিয়ানরা কেউ আপত্তি করবে না। বরং তোমারও একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

ইতুর মনোভাব কী বুঝলেন?

সেইটেই তো গল্প। আমি একদিন ওদের বাড়ির বাইরে ইস্কুলের পথে ওর সঙ্গে দেখা করলাম। যেমনটা নিয়ম আর কি। ইতু আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়াল না। এমনকী রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসতেও রাজি হল। যেন এসব তার কাছে কিছু নতুন ব্যাপার নয়।

অত তাড়াহুড়োর দরকার নেই। এ জায়গাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। একটু আস্তে ধীরে বলুন।

আপনি ভাবছেন একটা রোমান্টিক অ্যাফেয়ার? তা নয় মশাই, একেবারেই তা নয়। আমি প্রস্তাবটা উত্থাপন করতেই ইতু হঠাৎ হেসে ফেলল। তারপর একেবারে সোজা চোখে চোখ রেখে বলল, দেখুন, আপনি যে কেন ঘুরঘুর করেন তা আমি অনেক আগেই জানি। আরও কয়েকজন আমার সম্পর্কে আপনার মতোই দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমি ইন্টারেস্টেড নই। আমার জীবনে কিছু অ্যাম্বিশন আছে। মাত্র সাড়ে সতেরো বছর বয়সে আমি আমার অ্যাম্বিশন বিসর্জন দিতে পারব না। আপনি প্লিজ, এসব নিয়ে আর ভাববেন না। মেয়েদের নিয়ে চিন্তা করা ছাড়া কি বাঙালি ছেলেদের আর কোনও কাজ নেই?

ইস, বড্ড কড়া মেয়ে তো! আপনি কী করলেন?

মনের দুঃখে ব্যবসা বন্ধ রেখে ফের হিমালয়ে চলে গেলাম।

হিমালয়ে?

হ্যাঁ। দেখলাম কিছু বিপজ্জনক মেহনত না করলে দুর্বল মনকে জব্দ করা যাবে না। প্রায়, দেড় মাস ধরে আমি বিপজ্জনক সব পাহাড়ে ট্রেকিং করে বেড়ালাম। আর তখনই সিদ্ধান্ত নিই যে, মূল্যবোধ-টোধ সব বিসর্জন দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর কিছু করতে হবে। বিগ মানি, বিগ সাকসেস, বিগ ব্যাং। নারী চিন্তাকে আর প্রশ্রয় দেব না। ফিরে এসে কয়েকদিন

গুম হয়ে বসে নিজের মনের ট্রানজিটারি স্টেটটাকে মোটিভেট করলাম। তারপর কাজে নামলাম।

কী কাজ?

অ্যান্টিক। হিরাভাই নামে এক গুজরাটি অ্যান্টিক মার্চেন্ট আছে। তার সঙ্গে জুটলাম। হিরাভাই লোক চেনে। আমাকে তাড়াল না। বরং তামিল দিল কিছু। আমি তার হয়ে অ্যান্টিক জোগাড় করতে শুরু করি। এ ব্যবসায়ে জালি বা দু নম্বরি জিনিসের হাত বদলও খুব হয়। কলকাতার অ্যান্টিকের দোকানগুলোয় জানি জিনিসেরই কারবার। হিরাভাই আসল নকল ভালো বোঝে। তার ক্লায়েন্ট বা কালেক্টররা বোকা বা শৌখিন কাস্টমার নয়। কাজেই আমাকে জিনিসের সন্ধানে নানা জায়গায় হানা দিতে হতে লাগল, নানা অদ্ভুত লোকের সঙ্গে ভাব করতে হল, বিপদেও পড়তে হয়েছে বেশ কয়েকবার। এক বুড়ো পারসি তো তার একশো বছরের পুরনো একটা চার নলা বন্দুক দিয়ে আমাকে গুলিও করেছিল।

মাই গড!

না, আমি তার জিনিস চুরি করতে যাইনি। গিয়েছিলাম দর করতে। তাই থেকে সামান্য অল্টারকেশন। বুড়োটা খ্যাপাটে গোছের। এই ব্যবসায়ে একটু-আধটু বিপদ আছেই।

ভেরি ইন্টারেস্টিং। আপনার কি এখনও অ্যান্টিকেরই ব্যবসা?

হ্যাঁ। আমার ব্যবসাটা কিন্তু চোরাই জিনিসের নয়। বেশিরভাগ জিনিসই আমি কিনে নিই। তবে সব সময়ে কিনতে চাইলেই কেনা যায় না। যার জিনিস সে হয়তো অত্যন্ত বেশি দাম চায়, কিংবা কোনও দামেই বেচতে রাজি হয় না। তখন আমাকে একটু পরিশ্রম করতে হয়।

চুরি?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি তো সাধারণ চোর নন?

কে বলল আমি সাধারণ চোর নই? আমি অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত নীতিবোধহীন চোর। একজন কনফার্মড চোর। তবে আমি চুজি। কারও বাড়িতে তাদের সোনাদানা বা টাকাপয়সা চুরি করতে যাই না। আমার টার্গেট শুধু অ্যান্টিক এবং তাও প্রপার নেগোসিয়েশন ফেল করলে, দর কষাকষিতে রফা না হলে, তবেই। কিন্তু তা বলে আমাকে মহৎ চোর বলে ভাববার কোনও কারণ নেই।

ঘড়িটা নিয়ে কি আমার বাবার সঙ্গে আপনার নেগোসিয়েশন হয়েছিল?

হ্যাঁ, ফোনে। উনি সাত লাখ টাকার এক পয়সা কমে ওটা ছাড়বেন না। অথচ আমার কাস্টমার পাঁচের বেশি দিতে চাইছেন না। মুশকিল কী জানেন, অ্যান্টিকের কোনও

ধরাবাঁধা প্রাইস ট্যাগ নেই। মনে করুন একটা গুপ্ত যুগের কয়েনের দাম আমরা মোটামুটি এক লাখ টাকা ঠিক করে রাখলাম। হট হেডেড কালেক্টর বা কাস্টমার হলে এবং সে যদি জিনিসটার জন্য খেপে ওঠে তাহলে দশগুণ দাম দিয়ে নিয়ে যাবে। আর যদি কুল কাস্টমার হয়, তাহলে অনেক নীচে দর দেবে। এই অ্যান্টিকের বাজারটা কিন্তু অদ্ভুত।

তাই দেখছি, কিন্তু এসব কথার মধ্যে যে ইতু হারিয়ে গেল!

না, হারায়নি, সে আমার মনের মধ্যে আজও আছে। প্রত্যেক দিন, রাতে শোওয়ার সময় তার মুখ আমার মনে পড়বেই। ঠিক কথা, তার সঙ্গে আর আমার কোনও যোগাযোগ নেই, খবরও রাখি না। সম্ভবত তার বিয়েও হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না।

কিচ্ছু না?

না।

আপনি তার খবর রাখেন না কেন? এক আধবার ফোনও তো করতে পারেন!

কেন? তাকে তো আমার রক্ত মাংসের শরীরে আর দরকারও নেই। ওয়ান ওয়ে প্রেমের তো ওইটেই সুবিধে, প্রত্যাশা থাকে না, প্রত্যাঘাত থাকে না, দখল থাকে না, কিন্তু অন্যভাবে শি বিকামস দি ক্যাপটিভ লেডি। যখন মনের মধ্যে তার আর আমার খেলা শুরু হয়, তখন সে আমি যেমন বলাই তেমনই বলে, যেমন তাকে দেখতে চাই সে তেমনই সেজে আসে। সত্যিকারের ইতু হয়তো সেরকম নয়।

একটা কথা বলব?

বলুন না। তবে আমার হাতে কিন্তু আর সময় নেই। এবার অ্যাকশন।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, বাবার ঘড়িটার জন্য আপনি কত দাম দিতে চান?

আমি চার লাখ বলেছিলাম।

আচ্ছা, যদি আমি ওঁকে ওই দরেই রাজি করাই?

আপনি! কেন বলুন তো! ওঁর কোনও ক্ষতি করব বলে ভয় পাচ্ছেন নাকি?

ভয় পাচ্ছি না, এমন কথা বলতে পারি না। চুরি করলে আপনি বিনা পয়সাতেই পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনার দরে কিনতে চান, তাহলে বাবাকে আমি রাজি করানোর ভার নিতে পারি। দি চয়েস ইজ ইওরস।

চুরি করতে আমি আগ্রহী নই। কিন্তু হাতে সময় কম এবং কাস্টমার ডেটলাইন দিয়ে রেখেছে বলেই কাজটা করতে হচ্ছে।

প্লিজ! ভেবে বলুন।

ঠিক আছে। কিন্তু গ্যারান্টি কী?

আপনি কাল সকাল দশটা নাগাদ বাবাকে ফোন করলেই বুঝতে পারবেন এভরিথিং হ্যাজ বিন টেকেন কেয়ার অফ।

বলছেন?

বলছি। ইটস আ প্রমিস।

ঠিক আছে, আপনার প্রস্তাব আমি মেনে নিলাম। আপনি সত্যিই আপনার বাবাকে ভীষণ ভালোবাসেন। কিপ ইট আপ, কিপ ইট আপ। তাহলে আমি পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছি।

দাঁড়ান। আরও একটু কথা আছে।

কী কথা?

ইতু সম্পর্কে।

ইতু সম্পর্কে আপনাকে তো সবই বলেছি।

আপনি বলেছেন, কিন্তু আমারও যে কিছু বলার আছে।

আপনি ইতু সম্পর্কে বলবেন? কী আশ্চর্য!

কিছু কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা আজও ঘটে বলেই জীবনটা আনইন্টারেস্টিং হয়ে যায় না।

তাহলে বলুন।

ইতু হরিশ মুখার্জি রোডে থাকে, তাই তো?

হ্যাঁ।

বয়স এখন উনিশ প্লাস বা কুড়ির কাছাকাছি?

হিসেব মতো তাই।

আমার ছকটা মিলে যায় যদি সে নিমচাঁদ বসুর মেয়ে হয়ে থাকে।

আপনি আমাকে খুব চমকে দিয়েছেন। হ্যাঁ, ইতু নিমচাঁদ বসুরই মেয়ে। চেনেন বুঝি?

চিনি। আর আপনি যেমন বলেছেন ইতু হচ্ছে সেরকমই, নরম সরম শান্ত, স্নিগ্ধ চেহারা। স্বভাবে বা মুখশ্রীতে কোনও উগ্রতা নেই। চোখ দুটিও ভীষণ মায়াবি।

সর্বনাশ। আপনিও যে তার প্রেমে পড়েছেন মশাই!

তাতে কি দোষ হয়েছে?

আরে না, না। দোষের কথা হচ্ছে না। পছন্দ হলে আপনি তাকে বিয়ে করে ফেলুন না। আমি আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি।

এত সহজে অধিকার ছেড়ে দেবেন?

অধিকার। হাসালেন মশাই, অধিকার কীসের যে ছেড়ে দেব? তার জীবনে আমি বরাবর একজন নন-এন্টিটি। এবং তাতে আমার আর কিছু যায় আসে না। আপনাকে তো বললাম, ইতু নয়, ইতুর ইমেজটাই আমাকে চমৎকার সঙ্গ দেয়। আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি নাউ। অনেকক্ষণ কথা বলে আপনাকে আমার খুব ভালো লাগল মশাই। আপনি একজন

লাভিং কেয়ারিং, কনসিডারেট এবং ভদ্র মানুষ। আপনার মনটাও বেশ নরম। আমার মতো রাফ অ্যান্ড টাফ নন। আপনার সঙ্গে ইতুকে চমৎকার মানাবে।

জেনেটিক্স কিন্তু অন্য কথা বলে। জেনেটিক্স বলে, সমধর্মীর মিলন ভালো হয় না।

সায়েন্স-এর নিয়মে কি আর জীবন চলে মশাই? সেসব না ভেবে ইতুকে বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে জমিয়ে সংসার করুন। আপনার মতো সজ্জনের সঙ্গে বিয়ে হলে ইতু সুখী হবে।

তাতে কি আপনি খুশি হবেন?

ভীষণ। ওরকম ভালো একটা মেয়ে কোনও গোলমেলে লোকের পাল্লায় পড়লে খুব কষ্ট পাবে। আমি সত্যিই খুশি হব আপনি বিয়ে করলে।

কিন্তু ইতু খুশি হবে না।

কী করে জানলেন?

অভিজ্ঞতা থেকে।

কথাটার মানে বুঝলাম না।

বলছি। ইতুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। মোটামুটি কথা একরকম পাকাও হয়ে গিয়েছিল। গত জুলাই মাসে আমি কয়েক দিনের জন্য দেশে যাই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করার জন্য। পরস্পরকে গ্রহণযোগ্য মনে হলে সামনের ডিসেম্বরে বিয়ে হওয়ার কথা।

কার কাকে পছন্দ হল না বলুন তো!

বলছি। ইতুর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ামাত্রই আমার ওকে ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল।

হওয়ারই কথা।

তারপর আমরা কলকাতাতেই একটা রেস্তরাঁয় দেখা করে নিজেদের সব সুবিধে আর অসুবিধের কথা পরস্পরকে জানাব বলে ঠিক হল। ফ্রি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক কথাবার্তা। গণ্ডগোলটা ঘটল সেখানেই।

কী গণ্ডগোল?

গণ্ডগোলটার নাম অনিরুদ্ধ মিত্র। নামটা কি চেনা-চেনা লাগছে? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি?

না, না, অনিরুদ্ধ মিত্রকে আমি চিনি না।

আপনার কি ধারণা আমি আপনার নাম পুলিশকে জানিয়ে দেব?

এটা আমার নাম তা আপনাকে কে বলল?

কেউ বলেনি। আমার অনুমান ইতু আমার কাছে খুব করুণভাবে কনফেস করেছে যে, সে একজনকে ভালোবাসে। যাকে ভালোবাসে সে নাকি অভিমান বশে সম্পর্ক রাখছে না।

হতেই পারে মশাই, হতেই পারে। ইতুর পাণিপ্রার্থী ও প্রেমিক তো আরও ছিল। অনিরুদ্ধ মিত্র তাদেরই কেউ হবে।

ইতুর বর্ণনা অনুযায়ী অনিরুদ্ধ বেশ লম্বা, টাফ লুকিং এবং দুঃসাহসী মানুষ। পাহাড়ে চড়ে এবং পরোপকার করে বেড়ায়। বোধহয় খুব একটা বলিয়ে কইয়ে ছেলে নয়। ইতু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বটে, কিন্তু সেটা একটা মেয়েলি অহংকার থেকে। সে প্রত্যাশা করেছিল, নিরস্ত না হয়ে অনিরুদ্ধ ফের আসবে। কিন্তু অনিরুদ্ধ যে অন্য ধাতুর মানুষ সে তা বুঝতে পারেনি। ইতু কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছে না।

কে একজন অজ্ঞাতকুলশীল অনিরুদ্ধ মিত্রকে নিয়ে কি আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার আছে মশাই?

ও হ্যাঁ, ভালো কথা। এই অনিরুদ্ধ মিত্রের সঙ্গেও ইতুর আলাপ হয়েছিল দিল্লি থেকে ফেরার পথে, পূর্বা এক্সপ্রেসে। এবং কী আশ্চর্য মিল যে, এই অনিরুদ্ধও ইতুর ফেলে-দেওয়া টিকিট কুড়িয়ে এনেছিল। চেনেন নাকি অনিরুদ্ধকে?

মেয়েটা একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের আহাম্মক।

কার কথা বলছেন? ইতু?

আপনার মতো ছেলে, কোয়ালিফায়েড, আমেরিকায় সেটেলড, তাকে ছেড়ে কোন ঢ্যাঙা রংবাজের পেছনে ঘুরছে! ছিঃ ছিঃ! আপনি ওকে বোঝাতে পারলেন না? এক কাজ করুন, এসব মেয়েদের মনের জোর কম হয়, আপনি ওকে জোর করে বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে যান তো। ভালোবাসা পেয়ে গেলে অনিরুদ্ধর ঘা শুকোতে দেরি হবে না।

জোর তো করাই যেত। ওর বাড়ির লোকরাও চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু আমার বড় মায়া হল। চোখ দুটো টস টস করছিল জলে।

কেলো। চোখের জল দেখেই ভুলে গেলেন? আপনি না পুরুষমানুষ!

পুরুষমানুষ তো আপনিও। ওই একরত্তি মেয়ের সামান্য কড়কানিতে ভড়কে গিয়ে তফাত হননি আপনি! জোর তো আপনিও করতে পারতেন।

না পারতাম না। গায়ের জোর ছাড়াও পুরুষমানুষের আরও কিছু জোরের দরকার হয়। যেমন লেখাপড়ার জোর, ক্যারিয়ারের জোর, টাকার জোর, ব্যক্তিত্বের জোর। এসব না থাকলে কিসের জোর ফলাব বলুন তো! যাই হোক, ওসব নিয়ে আর ভাববেন না। ওই অনিরুদ্ধ রংবাজের হাত থেকে যদি ইতুকে বাঁচাতে চান তাহলে টক করে চলে আসুন। বেচারি নিশ্চয়ই এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

তাই কি? কালই তো ওর-ই মেল পেলাম। তাতে অন্যান্য কথার পর লিখেছে, আই ডোন্ট নো হাউ লং আই হ্যাভ টু ওয়েট ফর হিম। বাট আই অ্যাম লাভিং টু ওয়েট।

মশাই, আমি একজন চোর। কনফার্মড চোর। আমাকে আর প্রেমের প্রলাপ শুনিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। ভোর হয়ে আসছে। এবার আমাকে সরে পড়তেই হবে। শুধু বলে

যাচ্ছি, ইতুর এইসব ছেলেমানুষিকে একদম প্রশ্রয় দেবেন না। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।

এর মানে কী?

মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে তেড়েফুঁড়ে উঠুন। মেয়েটাকে দয়া করে বাঁচান।

ওকে বাঁচানোর লোক আছে। আমার কী গরজ, বলুন?

দাঁড়ান, এই অনিরুদ্ধ রংবাজকে একটু কড়কে দিতে হবে।

হ্যাঁ এটা ভালো প্রস্তাব। খুব ভালো করে কড়কে দিন তো ছোকরাকে। তাকে বুঝিয়ে দিন যে, সে একটি মেয়ের প্রতি চূড়ান্ত অবিচার করছে।

গাড্ডায় ফেলে দিলেন মশাই।

কথা দিলেন তো!

কীসের কথা?

অনিরুদ্ধকে রাজি করাবেন।

আচ্ছা জ্বালা তো! একটা ঘড়ি চুরি করতে এসে যে বড্ড চক্করে পড়ে গেলাম।

কথা দিন মশাই, কথা দিন।

ঠিক আছে। ঘড়িটার কথা যেন মনে থাকে। চার লাখ। ক্যাশ ডাউন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর শুনুন। বাবাকে আমি একটা ল্যাপটপ কিনে দিয়ে এসেছি। সেটা বাবার কোনও কাজে লাগে না, পড়ে আছে। ওটাও বাবা আপনাকে ঘড়ির সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

ওটা আবার কেন?

আপনাদের বিয়ের যৌতুক। আগাম।

কর্তার ভূত

ছাগল নিয়ে ফেরার সময় লাটু একটু বিপদে পড়ে গেল। বাড়ির পিছন দিকটায় আঁদার-পাঁদার ঝোপজঙ্গল। টানা বাঁশের আগরে ভর দিয়ে সেই নিঝুম জায়গাটিতে ভর সন্ধেবেলা বুড়োকর্তার ভূত দাঁড়িয়ে।

গরুর লেজ ধরে থাকলে ভূতের সাধ্যি নেই কিছু করে। কিন্তু কপালদোষে লাটুর সঙ্গে তিনটে ছাগল। লাটু করে কি! আগের থেকে বিশ হাত দূরে সে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন দুটো ছাগল বুড়ো কর্তাকে গ্রাহ্য না করে মুট মুট করে ঘাস ছিঁড়তে লাগল দাঁতে। কেবল বুড়ো ছাগল সীমন্তনী একটু চনমনে। বার বার লাটুর পায়ে গা ঘষছে আর খুব মিহি মিষ্টি সুরে ডাকছে—ম্যা-হ্যা-হ্যা।

বুড়ো কর্তার পরনে সেই সাদা ফতুয়া আর ধপধপে ধুতি। নাদুস-নুদুস চেহারা। এই ঘোর ঘোর আঁধারেও গায়ের ফটফটে রং জ্যোতি ধরে আছে। কোনও দিকে তেমন দেখছেন না। উদাসভাবে তাকিয়ে আছেন সুমুখ পানে। শেষ দিকটায় অমনিভাবেই তাকিয়ে থাকতেন। কিছু তেমন মন দিয়ে দেখতেন না।

লাটু নিজের মনকে জিজ্ঞেস করল, কি রে লাটুচরণ ভয় পেয়েছিস?

মন নিশ্চিন্দির গলায় বলল, না তো! বুড়ো কর্তাকে ভয়টা কীসের?

কথাটা সত্যি। বুড়ো কর্তা বাঘা চোখে না তাকাল ভয়ের কিছু ছিল না। তা সেই বাঘা চোখও দেখা গেছে কালেভদ্রে কেউ তেমন অন্যায় অধর্ম করলে। বুড়ো কর্তার বাকিটুকু একেবারে মাখনের মতো নরম।

প্রথমটায় যে আড়ষ্ট ভাব ছিল তা কেটে গেল লাটুর। মন বলছে, সে ভয় খায়নি। আর ভয়ই যদি না খেল তবে আর ভয়টা কীসের? ভয়েরই তো যত ভয়।

শীতের আঁধারটা আর একটু যেন পাকিয়ে উঠল। আশে-পাশে সাদাটে ধোঁয়াটে মেঘ-মেঘ কুয়াশা ভেসে আছে। শীতটা এবার পড়েছেও বেজায়। বুড়োকর্তা যে কম্বুলে কোমটা দিয়েছিলেন সেটাই এখন লাটুর গায়ে। বোতামগুলো ছিঁড়ে পড়ে হারিয়ে গেছে কবে। লাটু কোটটাকে দু হাতে সাপটে একটু চেপে ধরল গায়ে। তারপর গলা খাঁকারি দিল।

বুড়োকর্তা যেন ঘোর ঘোর আঁধারে হালকা হয়ে ওপর দিকে উঠে গেলেন। চারদিককার কুয়াশার সঙ্গে মিলেমিশে বুড়োকর্তা একাবার। হাঁ হয়ে দৃশ্যটা দেখল লাটু। তারপর আরও খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ছাগলগুলোকে তাড়া দিয়ে বলল, চল বাবারা, চল।

ছাগলগুলোকে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে লাটু গেল গোয়াল ঘরে সাঁজাল দিতে। এ বাড়ির যত পোষা জীবজন্তু আছে সকলেরই দেখাশোনার ভার একা লাটুর ওপর। কাজটা ভালোওবাসে লাটু। সাঁজাল দিতে দিতে ধোঁয়ায় চোখ ভালো করে সে দুনিয়ার সব কাণ্ডকারখানা ভেবে দেখছিল। কেন কী হয় কোনটা থেকে কোনটা তা অতশত বোঝে না লাটু। তবে এই যে বুড়োকর্তার ভূত এসে আগর ধরে দাঁড়িয়ে ছিল—এর পিছনে কি আর কোনও কারণ নেই?

একটা পাপ কথা মনে আসায় লাটু আপন মনেই বড় করে জিব কাটল। তার মনে হয়েছিল বুড়োকর্তা শেষ দিকটায় এ বাড়ির পোষা জীবজন্তুগুলোর মতোই হয়ে গিয়েছিল। লাটুই দেখাশোনা করত। গরু ছাগল হাঁস মুরগি ময়না আর বুড়োকর্তা। তবে অন্যায় অধর্মের ভাবনাটা হঠাৎ মাথায় চিড়িক দিয়ে গেল লাটুর। ছাগলের দুধ হয় সাত পো। সে হিসেব দেয় সেরের। তিন পো দুধের দাম রোজ ট্যাঁকে গুঁজছে। গরুর দুধেও একটু এদিক ওদিক হয়। হাঁস মুরগির ডিমের হিসেব গুনতিও তার হাতে। বুড়োকর্তা যাওয়ার পর থেকেই একটু সুবিধে হয়ে গেছে। নজর দেওয়ার লোক নেই। কথাটা মনে হওয়াতে জিব কেটে নিজের কান মলে দিল লাটু।

দুই

যখন সন্ধেবেলা টিহি টিহি পাকির ডাকে জানালার পাশে জাম গাছটা ঝমঝম করে, আর জোনাকিরা ভূতের চোখের মতো ঘুরতে থাকে কচু বনে আর পুকুরের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া আসে, তখন এই বিশাল বাড়িটা পাথরের মতো চেপে বসে সবিতার বুকের ওপর। তার শ্বাসকষ্ট হয়, কান্না পায়, মাথাটা পাগল পাগল লাগে। লণ্ঠনের আলোয় ঘরে দীর্ঘ জমাট সব ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। পুরোনো বাড়িতে একশো বছর ধরে জমে ওঠা বয়সের গন্ধ থম ধরে থাকে বাতাসে। মেঝেতে ফাটল দেওয়ালে গত বর্ষার জল-চোঁয়ানো দাগ, ইঁদুরের দৌড়, পায়ের আওয়াজ। একটা বেড়াল ফুঁসে উঠল আস্তাকুঁড়ে। আমবাগানে শেয়াল হেসে উঠল হঠাৎ। বুড়ো কুকুরটা ভুক ভুক করে খানিক তেড়ে গিয়েই ফিরে এসে বসল বারান্দায়। লম্ভ হতে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে দাসী হারানের মা। দিন গিয়ে রাত আসে। সবিতা অন্ধকার সইতে পারে না। বদ্ধ বাতাস সইতে পারে না। সইতে পারে না এই নিরন্তর একা থাকা।

কানা খোঁড়াদের সইতে পারে না বউমণি। মুখে না বললেও কি বোঝে না সবিতা? বোঝে। এ সবই টের পাওয়া যায় গো। সবিতার চোখ মোটে একটা। তা বলে তোমরা যা দেখ তার চেয়ে কিছু কম দেখি নাকি আমি? নাকি আমি একচোখো? তোমার ছেলেপুলেদের কোলে কাঁখে টানি না উদয়াস্ত?

কুয়োয় কে ঝপ করে বালতি ফেলল। ওই শব্দটা খুব বড় হয়ে কানে আসে সবিতার। ভাইঝি মুকুরের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল মাঘে। সবিতার বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। এখনও কি তার সময় আছে? চল্লিশে কি বিয়ে হয় না?

বিয়ে মানেই এক আলোয় ভরা জীবন। বিয়ে মানেই এক মুক্ত প্রান্তরে হালকা হাওয়ায় মুক্তি। বিয়ে মানেই শরীর জুড়ে সবুজ পাতা, ফুল, ডালে ডালে ফল।

দরজা বন্ধ করে সবিতা তার বাক্স খুলে শাড়ি বের করল। রূপটানের ট্রে নিয়ে বসল পুরোনো বিশাল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। এরকম প্রায়ই সাজে সে। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। তাকে আজ পর্যন্ত কেউ সুন্দর বলেনি। কিন্তু সে নিজেকে ভীষণ সুন্দর দেখে। ভীষণ সুন্দর। একটা গলিত চোখ সত্ত্বেও।

কে? বলে হঠাৎ মুখ ফেরাল সবিতা।

দিদিমণি! আমি লাটু।

কি চাও লাটু?

দরজাটা খোলো দিকি এট্টু। কথা ছেল।

তোমার তো সারাদিন কথা। এখন দরজা খুলতে পারব না।

লাটুর কিছুক্ষণ সাড়া নেই।

এমনই পোড়া কপাল সবিতার যে, এই সাজে একটু বাইরে বেরোনোরও উপায় নেই। লোকের চোখ টাটাবে। ঘর বন্ধ করে সাজতে হয়, ফের সাজ খুলে বেরোয়। তাও কি খবর রাখে না বাড়ির লোক? রাখে। বউমণি অনেকদিন বলেছে, যারা লুকিয়ে সাজে তাদের চরিত্র ভালো হয় না কখনও।

না হয় তো তোর কি? তোর কি?

সবিতা নিজের দিকে চেয়ে বলে গোপন প্রেমও তো হতে পারত? পারত না? এখনও কি হয় না? জীবনে যখন আর কোনও আলো নেই, তখন অন্ধকারকে জড়িয়ে ধরলে কি হয় একবার দেখিই না।

বড় বাড়ির মেয়ে বলে তাকেও খাতির করেনি রঘু মিত্তির। সারা যৌবন কালটাই ইশারা দিয়েছে। অর্থাৎ সবিতা রাজি থাকলে রঘু মিত্তিরের কানাতেও আপত্তি নেই। রঘুর কিছুতেই আপত্তি নেই, মেয়ে হলেই হল। শোনা যায় এ তল্লাটের কোনও সুন্দর কুচ্ছিত মেয়েকেও সে এঁটো করতে বাকি রাখেনি। সে একটা ধুন্ধুমার ফুর্তির দিন গেছে রঘুর। এখন গরিব হয়ে গেছে বয়স হয়েছে কিছু। কানে আতরের তুলো চুলে কলপ গলায় গুনগুন গান নিয়ে বসে থাকে নিজের বাড়ির দুর্গামণ্ডপের চাতালে। বুড়ো বাঘের মতো অবস্থা। তবু সেই রঘুই একমাত্র পুরুষ যে সবিতাকে বাছবিচার না করেই চেয়েছিল। অন্তত ডজনখানেক চিঠি আজও সবিতার বাক্সে লুকোনো আছে। রঘুর আজকাল আর মেয়েমানুষ জোটে না। জাল পেতে তবু বসে থাকে। সেই জানে একবার ঝাঁপ দিলেই হয়।

সবিতা উঠল। দুটো ঘর পেরিয়ে দরদালান। ঘোমটাটা টেনে সবিতা দরদালান পেরিয়ে, পিছনের দরজাটা খুলে ফেলল। বাইরে গহীন অন্ধকার। অন্ধকারই তো সে চাইছে। পিছন থেকে পুরোনো বাড়ির একশো বছরের থম ধরা গন্ধটা পেছনে টানছে। ভীষণ টানছে।

চৌকাঠে একবার দাঁড়ালও সবিতা। বিশাল অন্ধকার, ভুতুড়ে বাড়িটা হাঁ করে আছে। এই গুহা থেকে যে বেরোনোও দরকার।

সবিতা বেরিয়ে দরজাটা সাবধানে ভেজিয়ে দিল। ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে শুঁড়ি পথ চলে গেছে। সাদা ধোঁয়ার মতো কুয়াশার মাখামাখি চারদিক।

তিনটে বাঁশের আগরটা সামনেই। পেরোলেই মুক্তি।

কিন্তু মুক্তি যে মূর্তিমান সামনেই দাঁড়িয়ে। সবিতা থমকে দাঁড়ায়। কেঁপে ওঠে বুক। এ কে? রঘু? রঘুই তো! টর্চ আর লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে আগর জুড়ে। এধারে সেধারে টর্চ মেরে মেরে খুঁজছে কিছু। টর্চ মেরে সবিতাকে দেখেই বলে উঠল, সাপগুলো কোথায়? অ্যাঁ সাপগুলো?

সবিতা কি জবাব দেবে? দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল।

রঘু একটা হুংকার দিল চাপা গলায়। ধোঁকা দিয়েছিস? চিরকাল ধোঁকা দিয়েছিস লোককে? আর বুড়ো বয়সে সেজেগুজে--

বলে রঘু লাফ দিয়ে এগিয়ে সে লাঠিটা তোলে। তারপর প্রচণ্ড জোরে লাঠি নেমে আসে।

তিন

মুকুর! খুব চাপা গলায় ডাক এল বন্ধ জানালার ওপাশ থেকে।

কী সাহস! জানালার ওপাশে একবুক জঙ্গল গজিয়েছে। সাপখোপ কত কী আছে!

নিজের মসৃণ রোমহীন ঊরুর ওপর ছেঁড়া ন্যাকড়ায় সলতে পাকাচ্ছিল মুকুর। আসলে তার এখন কোনও কাজ নেই। হাত পায়ের শ্রী যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য তাকে আর ঘরের কাজ করতে দেয় না মা। মাঘ মাসে বিয়ে। কিন্তু তার জন্য কি আনন্দ আছে মুকুরের! একটুও না। হবু বর কেমন সে জানে না, তবে ওবাড়ি নাকি সাংঘাতিক পর্দানশীল। ভারি রক্ষণশীল গোঁড়া। মেয়েদের হাতে পায়ে বেড়ি। জানার পর থেকে মুকুরের মনে সুখ নেই। তাছাড়া আছে আর একটা বাধাও। তা হচ্ছে ওই পাগলা পল্লব। মুকুর যদি বলে এই শীতের রাতে পুকুরে ঝাঁপ দাও তো এক্ষুনি দেবে। বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর থেকে চোরের মতো কতবার যে হানা দিচ্ছে!

লণ্ঠনের আলোয় এতক্ষণ মুকুর নিজের ঊরুর মসৃণতা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিল। মহেন্দ্রর ঘানিতে ভাঙা ঝাঁজালো খাঁটি সরষের তেল আর অল্প একটু হলুদ রোজ ঘষে ঘষে সর্বাঙ্গে মাখতে হয়। মেখে মেখে গায়ের রং ফিরেছে। সর বাটা মেখে মেখে ফিরছে মুখের শ্রী। কিন্তু মনের শ্রী কি করে ফিরে আসে কে বলে দেবে?

মুকুর ছেঁড়া ন্যাকড়া সরিয়ে রেখে আগে গিয়ে দরজার বাটাম তুলে দিয়ে এল। তারপর খুব সাবধানে জানালাটা একটু ফাঁক করে বলল--কি?

এখনও সময় আছে মুকুর।

তুমি একটা পাগল পল্লব। কোনদিন ধরা পড়ে একটা বদনাম ফেলে দেবে আমার।

তোমার বিয়ের আগেই যে আমাকে মরতে হবে।

মরতে তো আমারও ইচ্ছে করে।

চলো তাহলে একসঙ্গে মরি।

মুকুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এই বিয়েটাও তো মরাই। দগ্ধে দগ্ধে মরব।

ওকথা বোলো না মুকুর। বিয়ে করে সব মেয়েই অতীতকে ভুলে যায়।

তোমাকে বলেছে। কোথা থেকে যে এসব কথা পাও তুমি!

অন্ধকারের আবছায়াতেও পল্লবের ফ্যাকাশে হাসিটা দেখতে পায় মুকুর। পল্লব বলল, দেখছো না মেয়েরা বিয়ের পর কেমন পরের বাড়িকে নিজের বাড়ি করে নেয়! তাই যদি

পারে তবে আমাকে কেনই বা তুমি মনে রাখবে?

আমার কাছে ওবাড়ি কখনও আপন হবে না।

বিয়ের আগে সবাই তাই ভাবে। কিন্তু সে কথা বলতে তো আসিনি মুকুর। আমি তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকতে পারব না।

তুমি বেঁচেই থাকবে। ওরকম কথা সব ছেলেই বলে।

কখনও নয়। ছেলেরা কখনও বিশ্বাসঘাতক হয় না। পল্লবের গলা ভারি শোনায়। তুমি কি আমাকে ভালোবাস না মুকুর? আমরা দুজনে কত সুখী হতে পারি বলো তো! যে পরিবারে তোমার বিয়ে হওয়ার কথা তাদের মতো আমাদের পরিবার রক্ষণশীল নয়। আমরা কত ঘুরব বেড়াব সিনেমা থিয়েটার দেখব।

মুকুর একটু কেমনধারা হয়ে গেল। পল্লবের বাড়ির সবাই ভালো লোক। পল্লবকেও তো কত গভীর ভাবে ভালোবাসে সে। অবশ্য পল্লবের ভালোবাসা আরও গভীর তাও সে জানে। মুকুর ফিস-ফিস করে বলল, আমাকে কী করতে বলো তুমি?

চলো পালাই। না হয় তো একসঙ্গে মরি।

পালিয়ে কোথায় যাবে?

কন্যাকুমারিকা। হরিদ্বার।

যাঃ, পাগল।

তাহলে কলকাতা? অ্যাঁ! কলকাতায় চলো মুকুর।

কোথায় উঠবে গিয়ে?

জায়গা আছে মুকুর। কাল তোমার আশীর্বাদ, যদি পালাতে হয় তো আজই। এক্ষুনি। চলো মুকুর।

শোনো, অত অধৈর্য হয়ো না। যা করবে ভেবেচিন্তে করো।

তুমি এত হিসেবি কেন মুকুর? আঠারো বছর বয়সটা কি অত হিসেব নিকেশের বয়স?

আমি যে ভয় পাই। একবার পালালে আর তো এ বাড়িতে ঢুকতে পারব ন।

ঢুকতে হবে না। এ বাড়ির বাইরেও একটা মস্ত জগৎ আছে। সেখানেও মানুষ ছাদের নীচে থাকে।

আমাকে একটু ভাবতে দাও পল্লব।

তুমি যে একটা কী না!

শোনো রাগ কোরো না। তুমি তো জান, এই বিয়ে আমি চাই না।

চাও কিনা তা কি মুখের কথা থেকে বোঝা যায় মুকুর? চাও না তবে মেনে নিচ্ছো কেন? তোমার বিদ্রোহ নেই?

মুকুর থমকায়। চোখ ছলছল করে। কান্না কেঁপে কেঁপে বুক বেয়ে উঠে আসতে থাকে, ঠোঁটে, অস্ফুট গলায় সে বলে, আমি মরব। দেখো।

মরবে? বলে এক গাল হাসে পল্লব। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে, এসো তাহলে এক সঙ্গে মরি। চলো মুকুর। আজ একটু বাদেই চাঁদ উঠবে। মরার আগে আমরা খানিক বেড়াব, গল্প করব, ভালোবাসার কথা বলব। রাত সাড়ে আটটায় ডাউন ট্রেন যাবে। তখন...

মৃত্যুর অমোঘ সম্মোহন বড় টানে মুকুরকে। এই ভরা যৌবনে মৃত্যুর মতো রোমান্টিক রহস্যময় আর কী অছে? সে অস্ফুট গলায় বলল, দাঁড়াও।

একটা ছোট্ট শাল গায়ে জড়িয়ে, চটি পরে মুকুর দালান হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

অন্ধকারেই একটা হাত এগিয়ে এসে তার হাত ধরল, চলো মুকুর।

কেউ দেখেনি তোমাকে?

না। আমি তো শেয়ালের মতো আসি যাই।

অন্ধকার ভেদ করে তারা এগোয়। থরো থরো বুক। অনিশ্চয়তার ভয়। দুজনের হাতের মুঠিতে দুজনে হাত আর ও শক্ত করে ধরে পরস্পরকে।

আরে দেখ! পল্লব হঠাৎ চাপা গলায় বলে।

কী?

কে শুয়ে আছে ওখানে!

ও বাবা! আমার ভয় করছে।

দাঁড়াও। দেখে আসি। পল্লব এগোয়, মুকুর দাঁড়িয়ে থাকে কুঁকড়ে। তার চোখে এখনও অন্ধকার সয়নি। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

মুহূর্তে ফিরে আসে পল্লব। তোমার ছোটো পিসি। মনে হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। কী করবে?

ছোটো পিসি? পিসি ওখানে শোবে কেন? কী হয়েছে? মা গো!

চেঁচিও না। বরং চলো ধরাধরি করে ওকে ঘরে নিয়ে যাই।

চার

বড় বাড়ির সদর ফটকের গায়ে বহু দিন একটা কাঠের ফলকে লেখা ছিল, 'বড় বড় বাস্তু সাপ আছে। সাবধানে পা ফেলিবেন।'

সেইটে দেখে বহুকাল এ বাড়িতে বাইরের লোক সহসা ঢুকতে চাইত না। হরিশও ঢোকেনি। বহুকাল পরে আজ ঢুকল। বাস্তু সাপ হয়তো বা এখনও আছে কিন্তু এখন আর বড় বাড়ির সেই রবরবা নেই। দেউড়ি থেকে অন্দরমহল পর্যন্ত ফোঁপরা, খা খা ভাব। দেওয়াল ভেঙে পড়ছে, লোহার ফটকে মরচে ধরছে, গম্বুজ আর একটাও অবশিষ্ট নেই।

তাতে হরিশের দুঃখ হওয়ার কথা নয়, কারণ হরিশ এ বাড়ির কে? কিন্তু তবু বড় একটা কিছুকে এভাব ভেঙে পড়তে দেখলে তার দুঃখ হয়। মন কেমন করে। সে যদি শুনতে পায়, কোনও লাখোপতির বউয়ের গলা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের হিরের হার চুরি গেছে তাহলেও তার মন বলে ওঠে, আহা রে!

টর্চ মেরে মেরে হরিশ চারদিকটা দেখে নিচ্ছিল। বড় বড় ঘাসজঙ্গল। পাথরের স্তব্ধ ফোয়ারা হেলে আছে। বাগানে জল দেওয়ার ইঁদারার মাথায় ফাঁসিকাঠের মতো কাঠামোর ভাঙা কপিকল এখনও ঝুলছে।

বুড়োকর্তা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বাড়িটার সিজিল মিছিল ছিল। ঐশ্বর্য গেলেও শ্রীটুকু লেগে থাকত। বুড়োকর্তা নিজের হাতে বাগান করতেন, আগাছা সাফ রাখতেন ভাঙচুরগুলো তখনও ঠিক বোঝা যেত না। একশো দেড়শো বছরের গম্ভীর অহংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বাড়িটা। এখন বাড়িটা কাঁদে, গোঙায়, যার তার সামনে মাথা নুইয়ে দেয়।

সামনেই সানবাঁধানো চাতাল। বিকেলবেলায় এইখানে রোজ ছায়া পড়ত। আজকাল পড়ে না। পশ্চিমের মহলটা ভেঙে বেচে দিল বুড়োকর্তার ছেলে। বিস্তর বার্মা সেগুন ভালো ইঁট, দরজা জানালা সিন্দুক আলমারি সস্তায় কিনে নিয়ে গেল মহাজনরা । বুড়োকর্তার ছেলে রামজয় মহলটা ভেঙেছিল কাকের মুখের বৃত্তান্ত শুনে। কে যেন বলেছিল তাকে, পশ্চিমের মহলের দেওয়ালে সোনা আছে। মহলটা যতদিন ছিল ততদিন বিকালে ছায়া হত চাতালটায়। সেই ছায়ায় বসে তামাক খেতেন বুড়োকর্তা। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কতদিন হরিশ দাঁড়িয়ে পড়েছে। অমন গায়ের রং-ও কি দেখা যায়! যেন সূর্যাস্তের পরও সূর্যোদয়।

চাতালের উত্তরদিকে কাছারিঘর। রামজয় এইখানেই বসে আজকাল। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। রামজয় এখন টাকার জন্য হন্যে। যা পারছে বেচে দিচ্ছে। শুভানুধ্যায়ীর এসে সৎপরামর্শ দেয়, সব বেচে দিচ্ছো এর পর থাকবে কি? চলবে কীসে? রামজয়ের এক উত্তর, সব হবে, সব আবার গড়ে তুলব দেখো।

কিন্তু বাড়িটার অবস্থা দেখেই হরিশ বোঝে কিছুই আর গড়ে উঠবে না। এদের কপাল ঢালুর মুখে পড়ে গেছে। এখন কেমন নেমে যাওয়া।

সেজ জ্বেলে নীচু চৌকির ওপর বসে কাগজপত্র দেখছিল রামজয়। একধারে বুড়ো নায়েব মশাই বিরস বদনে বসে আছেন। এখন অবশ্য এস্টেটও নেই, নায়েবও নেই। তবু নায়েবমশাই অভ্যাসবশে আসেন রোজ একবার করে। খানিক বসে থেকে কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যান। আজও এসেছেন। উঠি উঠি ভাব।

রামজয় বলে, আসুন হরিশবাবু। আপনার জন্যই বসে আছি। কাগজপত্র সব নিজের চোখে দেখে নিন।

হরিশ কথা বলল না। গম্ভীর মুখে চৌকির একধারে বসল। টর্চটা সাবধানে রেখে গলার কম্ফর্টারটা একটু আলগা দিল।

রামজয় বলল, উত্তরদিকটায় তিন বিঘে জমি। কুড়িটা নারকোল গাছ একটা পুকুর আমবাগানের সিকি অংশ নাটমন্দির মিলিয়ে কম নয়।

বুড়ো নায়েব কালিচরণ হাঁ করে চেয়ে আছেন হরিশের দিকে। কিছু বুঝতে চেষ্টা করছেন। ঠিক মাথায় ঢুকছে না।

হরিশ বসে একটু দম নিল। তারপর পাকা বিষয়ীর মতো হাত বাড়িয়ে বলল, দেখি।

রামজয় দলিল দস্তাবেজ সব এগিয়ে দেয়। বলে, সব হিসেব করে দেখলাম।

কি দেখলেন?

রামজয় একটু কমজোরি গলায় বলে, আপনি আর হাজার পাঁচেক উঠলে আমার পুষিয়ে যায়।

কালিচরণ উঠলেন। বেশ কষ্ট হয় দাঁড়াতে। বললেন, চলি গো রামজয়। বুড়ো মানুষ, অনেকটা রাস্তা।

রামজয় সংক্ষেপে বলল, আসুন জ্যাঠা।

কালিচরণ বেরিয়ে গেল। হরিশ অনেকক্ষণ কাগজপত্রগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। পাকা বিষয়ী লোক হয়েও তার মাথায় আজ কিছু ঢুকছে না। বড় আনমনা। বড় বাড়ির একটা অংশ কিনে নেওয়া কতই সহজ! রামজয় পাঁচ হাজার বেশি চাইছে, সেটা না দিলেও আগের দামেই দিয়ে দেবে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। সস্তায় সে চাইছেও না।

সে ভাবছে একদিন ওই তিন বিঘে ছাড়িয়ে সে গোটা বড় বাড়িই গ্রাস করে নেবে। ফোয়ারার জল আসবে আবার। গম্বুজ মাথা তুলে দাঁড়াবে। পশ্চিমের মহল সে আবার বাঁধিয়ে নেবে। বাগান ভরে ফুল ফোটাবে। সবই হবে।

কিন্তু আবার একদিন কলি প্রবেশ করবে নলের শরীরে। গম্বুজ ভেঙে পড়বে। আগাছায় ছেয়ে যাবে বাগান। ভাঙা কপিকল মজা ইঁদারায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখবে। ভেঙে পড়বে মহল। আর এইরকম কাছারি ঘরে বসে তারই এক উত্তরপুরুষ বাড়ি বেচার গ্রাহক খুঁজবে।

ছবিটা নিখুঁত স্পষ্ট।

কাগজপত্র সরিয়ে রেখে আচমকাই হরিশ উঠে পড়ল। বলল, ভেবে দেখি।

ভাবাভাবির কিছু নেই। না হয় দু হাজার ছেড়ে দিচ্ছি...

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বেরিয়ে আস হরিশ। বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে। কুয়াশার মাখা ম্লান জোৎস্না, ভাঙা দালানের খাঁজে খাঁজে জ্যোৎস্নার অপার বিস্ময়। ঝোপ জঙ্গলে এক মায়াবী পরির রাজ্য।

হরিশ বড় ফটকের দিকে হাঁটতে থাকে। না সে কিনবে না।

সবুজ বেড়াল

সবুজ বেড়ালটা যখন লাফিয়ে জানালার তাকে নেমে এসে দুই জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকাল, ঠিক তখনই মিলি দরজা খুলে ঘরে আসে।

কোনটা আমার নিয়তি তা আমি সঠিক জানি না। কিন্তু আমার সারা শরীরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগল।

মিলি দরজার চৌকাঠে থমকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল জানালার দিকে। সবুজ বেড়াল। হ্যাঁ, সবুজ বেড়ালের কথা সে জানে।

বেড়ালটা অবশ্য মিলিকে লক্ষও করছিল না। তার তো মিলির সঙ্গে প্রয়োজন নেই। সে চেয়ে আছে আমার দিকে। বিশাল এক শূন্যতার পরপার থেকে তার যাত্রা কেবলই আমাকে লক্ষ করে। কেবলই আমাকে, অনন্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে সে আজ পৌঁছে গেছে আমার জানালায়।

এরকমই কথা ছিল। তবু খুব ধীরে ধীরে মিলি তার মুখ ফেরাল আমার দিকে। তার দুই চোখের দৃষ্টি যেন মাঝ-দরিয়ার স্রোতের ভিতরে মাল্লাহীন টালমাটাল নৌকো।

মিলি পৃথিবীর মেয়ে। তাকে আমার কিছু বলার নেই। নিজের লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে আমি আমার ফাইবার অ্যানটেনা ক্রিয়াশীল করে তুলি। তারপর সবুজ বেড়ালের চোখের দিকে তাকাই।

একরাশ ঝোড়ো শব্দ এসে ধাক্কা দেয় আমার অ্যানটেনায়। এক অদ্ভুত গমগমে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করতে তাকে, তুমি ভালো আছো? কোনও জীবাণু তোমাকে আক্রমণ করেনি তো। খাদ্যে কোনও বিষক্রিয়া? তেজস্ক্রিয়তা? জলের বিষ? যুদ্ধ? প্রেম?

আমি আমার আঙটিশুদ্ধ আঙুলটা মুখের কাছে তুলে আনি। মৃদুস্বরে বলি, আমি ভালো আছি, সুস্থ ও সবল দ্বিধাহীন।

চমৎকার। আমরা জানতাম তুমি যথেষ্ট সহনশীল। কোনও কাজ বাকি রয়ে যায়নি তো।

না।

চারশো মাইল ওপরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে মহাকাশযান। সঙ্কেত পাঠানো মাত্র আমাদের আবরণরশ্মি তোমাকে ঢেকে ফেলবে। চৌম্বক রশ্মি টেনে আনবে মহাকাশযানে। তার আগে তোমার স্পেসস্যুট পরে নিতে ভুলো না।

ভুলব না।

আমি আঙটিটা সরিয়ে নিই। মিলির দিকে তাকাই। মিলি রোগা, কালো। মোটেই সুন্দর নয়। শুধু তার চোখ দুখানা বড় গভীর। আমি গভীর চোখের কোনও মর্ম জানি না।

নীহারিকা পুঞ্জের ভিন্ন এক পরিমণ্ডলে যে গ্রহে আমার বাস সেখানে এরকম কোনও চোখ নেই। তবে দেবীর মতো সুন্দরীরা আছে।

আমি হাসিমুখে মিলির দিকে দুহাত বাড়িয়ে ডাকলাম, মিলি।

রোজকার মতো মিলি এগিয়ে এল না। দুই অস্থির চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ রেখে বলল, তোমার সেই সবুজ বেড়াল?

আমি মাথা নাড়লাম।

মিলির হাতে একটা সেলাই। কিছু দিন যাবৎ সে আমার জন্য একটা সোয়েটার বুনছে। নীল রং। মাঝে মাঝে কিছুটা বোনা হয়ে গেলে সে সেটা আমার শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে মাপ নিয়ে যায়। অসমাপ্ত সেই সোয়েটার কাঁটা সমেত খসে পড়ে গেল মেঝেয়।

দৃশ্যটা তথ্য হিসেবে চমৎকার। এই গ্রহের মানুষদের প্রতিক্রিয়া কত দ্রুত কত সহজ ও নাটকীয়। আমাদের গ্রহে এরকম কখনও দেখা যায় না। দৃশ্যটা দেখে আমি বিদ্যুৎ বেগে আমার মাছের আঁশের মতো পাতলা রেকর্ডারটা আমার রগের পাশে চেপে ধরি। আমার চোখে দেখা, কানে শোনা, আমার প্রতি ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া এই ছোট্ট রেকর্ডারের পরতে পরতে নথিভুক্ত হতে থাকে। আমাকে কোনও নোট নিতে হয় না, কিছু মনে রাখতে হয় না। সরাসরি আমার মস্তিষ্কের স্পন্দন থেকে রেকর্ডার তার যাবতীয় তথ্য নিয়ে নেয়।

মিলি দু হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল। আমি নানান ঘটনায় মিলিকে কয়েকবারই কাঁদতে দেখেছি। তার যখ মন খারাপ হয়, যখন কেউ অপমান করে বা তার অভিমান হয় তখন সে কাঁদে। পৃথিবীর অভিধানে কান্না, অভিমান ও অপমান শব্দগুলির অর্থ আমি খুঁজে দেখেছি। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হয়নি। গত এক বছর ধরে আমি মিলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছি। সে যখন ঘুমিয়েছে তখন তার শরীরে ইনফরমেশন পিন লাগিয়ে আমি সরাসরি তার অভ্যন্তর থেকে সব কথা টেনে বের করেছি। রাতের পর রাত জেগে বিশ্লেষণ করেছি। অনেক কিছুই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। মিলি ভালোবাসা নামক অদ্ভুত এক শব্দ ব্যবহার করে। শব্দটা সম্পর্কে আমার গ্রহের বৈজ্ঞানিকরাও আমাকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা কীরকম তা আমি এখনও স্পষ্ট বুঝিনি। একজন মানুষকে ছাড়া একজন মহিলার জীবন বৃথা বলে মনে হবে এ কেমন কথা। কিংবা এই মহিলাকে দেখলে সেই পুরুষটির হৃৎপিণ্ড দ্রুততর চলবে, রক্তস্রোত উদ্দাম হবে, এটাই বা কোন নিয়ম? আমাদের এরকম কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

আমি আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করি, মিলি কাঁদছো কেন?

মিলি তার সজল তীব্র দুখানা চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে কেন জানো না?

আমার তো একদিন চলে যাওয়ার কথা মিলি।

কেন চলে যাবে? কেন আমরা একসঙ্গে থাকতে পারব না আর? তুমি আমার স্বামী নও? আমি নয় তোমার বউ?

এ সবই সত্য। মিলির মতানুসারে বাস্তবিকই আমি ওর স্বামী। পৃথিবীর এক মানবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার নির্দেশ ছিল আমার ওপর।

আমি সেই নির্দেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছি। পরিচয় হওয়ার কিছুদিন পরই মিলি আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি কি বিয়ে করবে না আমাকে?

বিয়ে জিনিসটা কী তা আমি তাকে জিগ্যেস করি। সে খুব হাসতে থাকে এবং অবশেষে যা বলে তা শুনে আমি অবাক। নারী ও পুরুষেণ অবাধ সম্পর্ক এরা জানে না। এরা তাতে নানা গ্রন্থি সংস্কার ও মন্ত্র আরোপ করতে ভালোবাসে। ভারি ছেলেমানুষি সব প্রক্রিয়া। কিন্তু মিলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করার জন্য আমি সেই প্রক্রিয়া স্বীকার করে নিই। হ্যাঁ, পৃথিবীর নিয়ম অনুসারে ও আমার স্ত্রী আমি ওর স্বামী কিন্তু মহাকাশে তো এ নিয়ম নেই, আমি স্বস্তির শ্বাস ফেলি।

মিলি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে আমার কাছে। আমার অ্যানটেনায় মৃদু নানা শব্দ এসে আঘাত করতে থাকে চারশো মাইল ও ওপরে মহাকাশে আমাদের আকাশি খেয়ায় চলছে নানা আয়োজন। একটু পরেই শুরু হবে কাউন্ট-ডাউন। তার আগে আমাকে পরে নিতে হবে মাধ্যাকর্ষণ নিরোধ জুতো স্পেস-স্যুট। খুব বেশি সময় হাতে নেই।

মিলিকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে আমি এই গ্রহে শেখা কিছু কথা বলে যেতে থাকি। সবই ভালোবাসার কথা। যদিও আমি এসব কথার অর্থ জানি না তবু আউড়ে যেতে আমার অসুবিধে হয় না। রেকর্ডার সবই নথিভুক্ত করে নিচ্ছে। মিলির চোখের জলে কী ধরনের কতটা রাসায়নিক মিশে আছে, কান্নার সময় ওর হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তচাপ, মস্তিষ্ক কোশের প্রসারণ ও শরীরের অন্যান্য প্রক্রিয়া।

সবুজ বেড়ালটা জানালার তাকে একটু সরে বসে। আমার চোখের দিকে জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে থাকে। তার শরীরে একটা যান্ত্রিক ঢেউ।

মিলি আমার বুকে দু হাতের ছোট মুঠিতে কিল মারতে মারতে রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করে, কতদূরে চলে যাবে তুমি, কত দূরে।

খুব বেশি দূরে নয় মিলি।

তবু তো কয়েক হাজার আলোকবর্ষ।

আমি হাসলাম। আলোকবর্ষ দিয়ে দূরত্ব মাপবার প্রাচীন রীতি এখনও এই গ্রহে প্রচলিত। এরা জানে না বিপুল প্রসারণশীল এই মহকাশে আলোকবর্ষ অত্যন্ত ছোট মাপকাঠি।

ওর পিঠে হাত বুলিয়ে আমি বলি, দূরত্বটা কোনও সমস্যা নয় মিলি?

আর ফিরবে না? কোনওদিন না?

ফিরতেও পারি। হয়তো তখন পৃথিবীর কয়েক হাজার বছর কেটে যাবে।

কয়েক হাজার। আমি তো তখন থাকব না।

মানুষ থাকবে মিলি।

কিন্তু আমি! আমি তো তোমাকে দেখতে পাবো না আর।

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বলি, কয়েক হাজার বছর বেঁচে থাকা কিছু শক্ত নয় মিলি। তোমরা যে কেন পারো না।

মিলি অসহায় মুখ তুলে বলে, আমরা যে বুড়ো হই, মরে যাই।

কথাটা সত্য। এই গ্রহে মানুষের আয়ু বড় ক্ষণস্থায়ী। আমাদের গ্রহে যেমন মানুষের প্রায় অফুরন্ত আয়ু ও যৌবন, এখানে তেমন নয়। আমাদের গ্রহে একটি ফুল ফুটলে একশো বছর ফুটে থাকে, এখানে ভোর না হতেই ঝরে যায়।

মিলি তার মুখখানা আকুল ভাবে তুলে থাকে আমার মুখের দিকে। ফিসফিস করে বলে, দেবদূত, স্বামী, প্রিয়তম, আমাকে কয়েক হাজার বছরের আয়ু দাও। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। পৃথিবীর এই মানবী শুধুমাত্র তার নির্দিষ্ট পুরুষটিকে ফিরে পাওয়ার জন্য কয়েক হাজার--মাত্র কয়েক হাজার বছরের আয় চায়।

আমি পৃথিবীর নিয়ম অনুসারে মিলির মুখ চুম্বন করি। ভয় নেই। আমার ঠোঁটে লাগানো আছে অতি মসৃণ জীবাণুনাশক। আমি যথাসম্ভব গদ গদ স্বরে বলি তোমাদের গ্রহটি কিছু কম সুন্দর নয় মিলি। চমৎকার পুরুষেরা আছেন। তুমি একা বোধ করবে না বেশিদিন।

মিলি আকুল হাতে আমাকে এত জোরে চেপে ধরে যে, আমার যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড টুং করে একটা বিপদ সংকেত জানায়।

সবুজ বেড়ালটা তার থাবার দিকে চেয়ে আছে। আমি জানি ওই থাবায় একটি ছোট্ট ডিজিটাল যন্ত্রে মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ধরা পড়ছে। ধরা পড়ছে আকাশি খেয়ার গতি ও প্রকৃতি।

সময় নেই। আর সময় নেই।

মিলি মুখ তুলে বলে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি তোমাকে ছাড়া কী আর বাঁচব?

আমাদের এরকম কোনও সমস্যা নেই। আমরা একে আর একজনকে ছাড়া দিব্যি বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু সে কথা বলা যায় না। বললে মিলি দুঃখ পাবে।

দুঃখ, এই পার্থিব শব্দটাও আমার নতুন শেখা। কিন্তু লক্ষ করেছি পৃথিবীর মানুষ খুব বোকার মতো দুঃখ পায় এবং কখনও-সখনও গাড়লের মতো সুখও বোধ করে।

আম গাঢ় স্বরে মিলিকে বলি, মিলি পৃথিবী থেকে কাউকে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। আমাদের গ্রহের পরিবেশ অন্য রকম।

কীরকম, যেখানে তুমি থাকতে পারো সেখানে আমি পারবে না?

না মিলি, তোমাদের তুলনায় সে অনেক নিষ্ঠুর জায়গা।

সবুজ বেড়ালের চোখে নীল সংকেত এল। কাউন্ট-ডাউন শুরু হতে আর কয়েক সেকেন্ড মাত্র বাকি।

মিলিকে ছেড়ে আমি দ্রুত আমার জুতো আর স্পেসস্যুট পরতে থাকি। মিলি মেঝেয় পড়ে কাঁদে। বীজাণুতে ভরা, নোংরা, গন্ধময় যুদ্ধ ও ভয়ে ভারাক্রান্ত এই ছোট গ্রহটিতে আমার প্রবাস শেষ হয়ে এল। স্বর্গের মতো পবিত্র ও সুন্দর আমার জননী গ্রহে আমি ফিরে যাচ্ছি।

সবুজ বেড়ালটা আমার দিকে তাকাল। ডান পা তুলে নিজের গলা আঁটা বকলশে একটা সুইচ টিপে দিল সে। তার চোর থেকে অদৃশ্য এক রশ্মি এসে আমাকে ঘিরে ধরল।

আমি ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে জানালার বাইরে আমার শরীর ভাসিয়ে দিই। বহু দূর থেকে এক চৌম্বক রশ্মি আমাকে বিদ্ধ করে তারপর টেনে নিতে থাকে।

দুঃখ বা বিষাদ, প্রসন্নতা বা ক্ষোভ কিছুই আমি বোধ করি না।

মহাকাশযানে। এক তদন্তকারী অভিসার আমাকে নানা প্রশ্ন করছিলেন।

পৃথিবীর কিছুই তোমাকে স্পর্শ করেনি তাহলে?

না।

ধুলো বা জীবাণু?

না।

তেজস্ক্রিয়তা?

না।

অফিসার মৃদু একটু হাসলেন। বললেন, প্রেম নামে একটা ছোঁয়াচে মানসিকতা আছে এইসব প্রাচীন গ্রহে। জানো?

শুনেছি।

তোমাকে স্পর্শ করে না?

আমি চুপ করে থাকি। তারপর মাথা নাড়ি।

না, আমাকে তেমন কিছু স্পর্শ করে না। তবে আমার আবার ফিরে যাওয়ার একটা ইচ্ছে হচ্ছে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে, গিয়ে দেখে আসি, একজন মানবী আমার জন্য, শুধু আমার জন্য, শুধু আমার বিরহে কাঁদছে আর কাঁদছে।

অফিসার উচ্চকণ্ঠে হাসলেন।

আমার কিন্তু হাসি পেল না।

আলি

লিওঁর মা পর্যন্ত ছেলেকে আলির সঙ্গে লড়তে বারণ করেছিলেন, তুমি কি পাগল হয়েছো লিওঁ যে আলির সঙ্গে লড়তে চাও। আলির তুলনায় তুমি কতটুকু? ও তোমাকে শেষ করে দেবে।

লিওঁর ওজন মাত্র একশো সাড়ে সাতানব্বই পাউন্ড, আলির দুশো সাড়ে চব্বিশ। আলি লম্বায় বড়, চওড়ায় বড়, কিন্তু তার চেয়েও ঢের ঢের বড় খ্যাতিতে। আলি শুধু বিখ্যাতই নয়, আলি কিংবদন্তী, আলি প্রবাদ, আলি শিহরণ, আলি স্বপ্নের মানুষ। লিওঁ যখন সেন্ট লুইয়ের দরিদ্র হাউসিং প্রজেক্টের সামনের রাস্তায় ধুলোখেলা করত, তখন তরুণ উদীয়মান মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে একের পর এক মুষ্টিযুদ্ধের শিরোনামকে ভূলুণ্ঠিত করে হতবাক করে দিচ্ছে পৃথিবীকে। বালক লিওঁ হয়তো তখন ক্যাসিয়াস হওয়ার স্বপ্ন দেখত। কেনই বা দেখবে না? মুষ্টিযুদ্ধের যাবতীয় পুরোনো ঐতিহ্যকে মুখে ফেলে ক্যাসিয়াস এক নতুন বিপ্লব এনেছিল। সোনি লিসটনের মতো মহিষাসুর মুষ্টিককে প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন-শিপের লড়াইতে সে শিখিয়ে দিয়েছিল শুধু গায়ের জোরের লড়াই বক্সিং নয়। শুধু কৌশল থাকলেও হয় না। বক্সিংকে আলি দেখেছিল অন্যভাবে। তার প্রিয় ছড়া ছিল--ফ্লোট লাইক এ বাটারফ্লাই, স্টিং লাইফ এ বি। ইউ ক্যানট হিট হোয়াট ইউ ক্যানট সি। রিং-র মধ্যে ক্লে সত্যিই পারতপক্ষের নাগাল এড়িয়ে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াত, আর উড়তে উড়তে কখনও-সখনও সেই প্রজাপতি ভীমরুল হয়ে তেড়ে এসে ফুটিয়ে দিত তীব্র হুলের জ্বালাভরা মুষ্ঠ্যাঘাত। ছফুট তিন ইঞ্চি সুঠাম শরীর নিয়ে ক্লে যে দ্রুত ছন্দে নড়াচড়া করত তা ছিল নৃত্যের সুষমামণ্ডিত। লিসটনের মতো অতিকায় মহাবল দানব ছয় রাউন্ড ধরে চেষ্টা করেও ভালো করে ক্লে-কে ছুঁতেই পারল না। বরং উলটে মার খেল অনেক। বিষভরা দুই বৈদ্যুতিক হাতে ক্লে কেমন করে ঘুষি চালাচ্ছে তা ভালো করে ঠাহরও পায়নি সে। সাত রাউন্ডে বসে গেল লিসটন, দান ছেড়ে দিয়ে। ক্লে কথা দিয়েছিল সাত রাউন্ডেই সে লিসটনকে হারাবে। তার পরের লড়াই আরও চমকপ্রদ। লিসটন যেমন হাস্যকর রকমের সহজভাবে তৎকালীন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন প্যাটারসনকে দু দুবার প্রথম রাউন্ডের প্রথম মিনিটে নক আউট করে, তার চেয়েও আরও হাস্যকর রকমের সহজে ক্লে দ্বিতীয় লড়াইতে প্রথম রাউন্ডের প্রথম মিনিটে একটিমাত্র ভুতুড়ে ঘুষিতে নক আউট করেছিল লিসটনকে। সেই লিসটন, যাকে এক সময়ে মনে করা হয়েছিল অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বকবকানি আর আত্মপ্রশংসার জন্য ক্লে বিখ্যাত। লোকে তার নাম দিয়েছে লুইসভিল লিপ। তার ওপর সে কবিতা লেখে। সেগুলো ছাইভস্ম যাই হোক আর কোনও বিশ্ব

হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন পদ্য লেখে বলে শোনা যায়নি। প্রথম জীবনে আলি কবিতা করে বলেছিল—দ অল মাস্ট ফল, ইন দা রাউন্ড আই কল। আর প্রথম দিকের লড়াইগুলিতে হামেশা আলি যে রাউন্ড বলত সেই রাউন্ডেই প্রতিপক্ষকে নক আউট করত। কিন্তু সব সময়ে তার লড়াইতে ছিল সেই ভেসে বেড়ানো দ্রুতছন্দের নর্তকের চেহারা, মুষ্টিযুদ্ধের কদর্য হিংস্রতার মধ্যে সে-ই প্রথম এনেছিল অতুলনীয় শিল্পের স্পর্শ। শুধু গায়ের জোর, শুধু হিংস্রতা, শুধু নিষ্ঠুর বেধড়ক ঠ্যাঙানো নয়, মুষ্টিযুদ্ধ তার কাছে এক দার্শনিকতা। আর শুধু মুষ্টিযুদ্ধই নয়, ক্যাসিয়াস একই সঙ্গে আবার ধার্মিক, কালো মানুষদের বিপ্লবের শরিক, সমাজ বিষয়ে চিন্তাশীল। এলিজা মহম্মদের প্রভাবে সে ধর্মান্তরিত মুসলমান হয়। তখনই সে পুরোনো নাম ত্যাগ করে মহম্মদ আলি নাম গ্রহণ করে। আলি—দু অক্ষরের এই নামটি এখন বিদ্যুৎ তরঙ্গে ভরা। উচ্চারণ করলেই যেন শরীরের রক্ত গতি পেয়ে যায়।

আলির জীবন নানা নিয়মভঙ্গে ভরা। মুষ্টিযুদ্ধে সে পুরোনো প্রথাপ্রকরণ ভেঙে তার নিজস্ব ছন্দের ধারা বইয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন নাগরিক হিসেবে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আবশ্যিক নিয়মটি মানেনি। বলেছে ভিয়েতকংরা আমার কোনও ক্ষতি করেনি, আমি ওদের বিরুদ্ধে লড়তে যাবো কেন? এ সময়ে আলি মার্কিন দেশে মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। বিশেষত শ্বেতকায়রা তার ওপর অসহায় রাগে জ্বলে মরছিল। সেই ব্যাপক আক্রোশের শিকার হয়ে আলিকে হারাতে হল খেতাব। মুষ্টিযুদ্ধের জগৎ থেকে যেতে হল নির্বাসনে। সাত সাতটি বছর। কিন্তু তবু মুষ্টিযুদ্ধের দর্শকরা তাকে ভোলেনি। ফ্রেজিয়ার, নরটন, এলিস প্রভৃতি বিখ্যাত মুষ্টিকরা যখন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য লড়ছে, তখন দর্শকরা একযোগে সুর করে তালে তালে চেঁচাতো--আঃ লিঃ। আঃ লিঃ। আঃ লিঃ। অর্থাৎ আলি থাকলে তোমাদের দেখিয়ে দিত বক্সিং কাকে বলে।

যৌবনকালের সাত সাতটি বছরের মহামূল্যবান সময় নির্বাসনে কাটিয়ে আলি ফিরে এল আবার। তা ওপর দিয়ে নানা অনিশ্চয়তার ঝড় বয়ে গেছে, বয়স বেড়েছে কিছুটা অর্থের অভাব। তার ওপর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইতে সে হারল ফ্রেজিয়ারের কাছে। হেরেছিল নরটনের কাছেও, তবে তাতে চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন ছিল না। তখন কারও কারও মনে হয়ে থাকবে যে, আলির দিন শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু হয়নি। লিসটনের চেয়েও হিংস্রতর আর এক দানব এল মুষ্টিযুদ্ধের মহলে। জর্জ ফোরম্যান। অবহেলায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নের খেতাব কেড়ে নিল ফ্রেজিয়ারকে বেধড়ক ঠেঙিয়ে। অত্যন্ত নীচু মানসিকতার লোক ফোরম্যান। যখন তার প্রতিপক্ষ ঘুষি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে তখনও সেই পড়ন্ত মানুষটাকে সে মারে। আশালীন ঘুষি চালানোর অখ্যাতিও তার কিন্তু তবু ফোরম্যান তখন অপ্রতিরোধ্য। তার ঘুষির জোর দেখে মুষ্টিযুদ্ধের বিশেষজ্ঞ এবং প্রাক্তন মুষ্টিযোদ্ধারা পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছেন। আফ্রিকার রাষ্ট্র জায়রে-র রাজধানী কিনশাশাতে আলি-ফোরম্যানের লড়াইয়ের ব্যবস্থা হল। কিন্তু সবাই জানে ফোরম্যান

জিতবেই। আলির বয়স হয়েছে, তেমন দ্রুতগতিও সে আর নয় আর ফোরম্যানের তুলনায় তার ঘুষির জোর অনেক, অনেক কম।

আত্মবিশ্বাস টইটম্বুর ফোরম্যান নামল খুব তাড়াতাড়ি আলিকে নক আউট করার কাজটি সারতে। আলি ইদানীং নতুন এক বিপজ্জনক পন্থা নিয়েছে। সে রিং-এর দড়িতে পিঠ দিয়ে ঝুল খায় আর মুখ এবং পেট হাতে আড়াল করে প্রতিপক্ষের অজস্র ঘুষি হজম করে। এইভাবেই সে অপেক্ষা করে কখন ঘুষি মেরে মেরে প্রতিদ্বন্দ্বীর দম ফুরাবে। খুবই বিপজ্জনক পদ্ধতি। কোনও মুষ্টিযোদ্ধাই এরকম পদ্ধতির কতা ভাবতে পারে না। দড়িতে পিঠ দেওয়া মানেই আত্মরক্ষার করুণ চেষ্টা, হীনমন্যতা। কিন্তু যা অন্যের কাছে বুদ্ধির অগম্য আলি তা থেকেই বের করে আনল ফোরম্যানের মারণাস্ত্র। আট রাউন্ড ধরে ফোরম্যান তাকে মারার চেষ্টা করেছে আর আলিই প্রকৃতপক্ষে তাকে মেরেছে। ঘুষিতে ঘুষিতে মাতাল হয়ে অষ্টম রাউন্ডে গুলিখাওয়া অতিকায় সিংহের মতো ঢলে পড়ল ফোরম্যান। অভাবনীয় জয়। পৃথিবীর ক্রীড়াজগতে মহত্তম আপসেট।

লিওঁ স্পিংকসের মায়ের দুর্ভাবনা অমূলক। কিংবদন্তীর আলিকে লিওঁ হারিয়েছে। তার জীবনে এ ঘটনা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর কিন্তু ইদানীং আলি মুষ্টিযুদ্ধের জন্য তেমন করে তৈরি হচ্ছিল না। গা ছাড়া দিয়ে লড়ছিল। মুষ্টিযুদ্দের চেয়ে অন্যান্য ব্যাপারেই মাথা ঘামাচ্ছিল বেশি। পচা শামুকে তার পা কেটেছে। কারণ স্পিংকস এমনকী ত্রুটিহীন মুষ্টিকও নয়। বিশ্বখেতাবের পক্ষে তার যোগ্যতাও নয় প্রশ্নাতীত। কিন্তু আলিকে হারানো যায়--এ বিশ্বাস আর লোকের নেই। মুষ্টিযুদ্ধই নয় আলি তার ক্রীড়াজগতকে ছাড়িয়ে আজ সারা বিশ্বে এক অবিশ্বাস্য নাম। একজন প্রবীণ মুষ্টিযোদ্ধা বলেছিলেন--হি ডাজ এভরিথিং রং অ্যান্ড গেটস অ্যাওয়ে উইথ ইট।

আলি কি আবার বিশ্বখেতাব পাবে? আলির ভাষায় : পেতেই হবে। আমি অবসর নেবো চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই।

আর একথা কে না জানে যে আলি কথা দিলে কথা রাখে!

শিবুচরণের সমস্যা

ট্রামরাস্তা পার হওয়ার জন্য শিবুচরণ ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়েছি। আকাশে শরৎকালের হালকা মেঘের দিকে এক পলক তাকাল, ডানধারের ল্যাম্পপোস্টের গায়ে চৌকো বাক্সে সিনেমার পোস্টার, উলটোদিকে একটা পানের দোকানে আঁকাবাঁকা আয়না--এ সবকিছুর ওপর তার চোখ ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল। বিকেল। চারিদিকে অফিস ফেরত রাগী আর বিরক্ত

মানুষের ভিড়। চলন্ত ট্রাম-বাসের ফাঁকে একটা সময়ের ফোকর পেয়ে রাস্তা পেরোতে পা বাড়াতে যায় শিবুচরণ আর ঠিক সেই সময়ে তার নাকের ডগা ভয়ঙ্কর চুলকে ওঠে। বেখেয়ালে রাস্তা পার হতে হতেই সে নাক চুলকোবার জন্য হাত তোলে, তারপরই তার খেয়াল হয়--আরে! দুপাশ থেকে দুটো ট্রাম আসছে তবু শিবুচরণ সেইখানেই থমকে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিজেকে ধমক মারে খবরদার শিবুচরণ! খবরদার! ট্রামের ঘন্টি পাগলা ঘন্টির মতো বেজে ওঠে, নাকের দু-ইঞ্চি দূর থেকে হাত সরিয়ে নেয় শিবুচরণ, তারপর হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা পার হয়ে বাসস্টপে এসে দাঁড়ায়। হাঁপাতে থাকে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে সে, খুব অল্পের জন্য। দুখানা হাত সে পাশাপাশি চোখের সামনে ধরে--স্বাভাবিক দুখানা হাত। কালো চামড়া হাতের তেলোর রং কালচে, মোটা আর বাঁকা আঙুল খেয়ে যাওয়া নখ। যেমন ছিল তেমনই এখনও হুবহু আছে তার হাত দুখানা, তবু শিবুচরণ জানে দেখতে একরকম হলেও তার হাত দুখানা আর সেরকম নেই। আজ সকালেও সে গা চুলেকেছে, তার বাচ্চা ছেলেটার মুখের লাল আঙুল দিয়ে মুছেছে, ভাত মেখে খেয়েছে, চোখ কচলেছে। তবু সে হাতে আর এ হাতে এখন অনেক তফাত।

বাস আসছে, ঝুলন্ত লোকজন। স্টপের লোকেরা চনমনে, উচাটন। শিবুচরণ সন্তর্পণে তার বাঁ হাতখানা জামার পকেটে রেখে দিল। ডান হাতখানা বাড়াল বাস-এর হ্যান্ডেলের জন্য।

প্রবল ভিড়। শিবুচরণ বাইরে ঝুলছিল, একটা পা মাত্র পা-দানিতে এক হাতে হ্যান্ডেল ধরা। হাওয়া বাতাস গায়ে লাগে শিবুচরণের, ঝুলতে ঝুলতেও ঘুম পেয়ে যায় তার। থুতনিতে একটা মাছি এসে বার বার বসছে কি? না, এত হাওয়ায় মাছি কোথায়! তবু সুড়সুড়ির মতো কি একটা যেন টের পায় শিবুচরণ, বাঁ হাত তুলে এনে বাঁকা নখে চুলকোতে যায় আবার বেখেয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার বিবেকের মতো মন ধমক মারে খবরদার শিবুচরণ! খবরদার! চমকে হাত সরায় শিবুচরণ, পকেটে না রেখে হাতখানাকে যথাসম্ভব দূরে রাখবার জন্য মেলে দেয় বাইরের দিকে। একটুর জন্য সেই হাতখানার চড় খেতে খেতে বেঁচে যায় একটা কনস্টেবল। বেকুবের মতো আবার হাতখানা পকেটেই রাখে সে।

বাস এগোয়। দুটো একটা করে লোক নামে। ঠেলে ঠুলে ঢুকে যায় শিবুচরণ, ভিড়ের মধ্যে ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে এগোয়। গরম। লোকজনের শ্বাস গায়ে লাগে। শিবুচরণ উঁকি মেরে লোকের টিকিটওয়ালা অল্প পাল্লার যাত্রী নেই কেউ। সেই জগুবাজার, ভবানীপুর, কালীঘাটের আগে নড়বে না কেউ।

রড ধরে দাঁড়াতে একটু কষ্ট হয় তার। সে বেঁটে। ঠিকমতো রড ধরে দাঁড়ালে তার পা বাসের মেঝেয় পৌঁছায় না, তাই সে কাত হয়ে একটা সিট-এর পিছনের দিকটায় হাত রাখল। পায়ের পাতা প্রসারিত করে কোনওক্রমে মেঝেয় রাখল পা। সামনে বসে থাকা

লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে শিবুচরণের এই কসরত দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে, আরে! শিবুদা না!

গরমে, ঘামে, লোকের শ্বাস প্রশ্বাসে শিবুচরণের কেমন সব ধোঁয়াটে লাগছিল, সে ফ্যাল ফ্যাল করে লোকটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চিনতে পারে বল্টু!

লোকটা এক গাল হাসে অ্যাই, ঠিক! বছর চারেক দেখা নাই, কোথায় থাক তুমি!

বাস ঝাঁকুনি খেলে শিবুচরণের শরীর রড ধরে অল্প দুলে ওঠে। তাই দেখে বল্টু বলে, রড ছেড়ে দাও না, তুমি বেঁটে-সেঁটে মানুষ, অতদূর হাত যায় কি! ছেড়ে দাও, পড়বে না, পড়ার জায়গা নেই।

বল্টু বড় জোরে কথা বলে, শিবুচরণ লজ্জা পেয়ে রড ছেড়ে দেয়। দু-চারজন লোক তাকে ভিড়ের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখছে।

বল্টু উঠি উঠি ভাব দেখায়, তুমি বরং বোসো শিবুদা, আমি দাঁড়িয়ে যাই একটু।

শিবুচরণ সঙ্গে সঙ্গে বল্টুর কাঁধ চেপে ধরে তাকে আবার বসিয়ে দেয়, দূর দূর, এ তো রোজকার ব্যাপার। বল্টুর কাঁধে হাত রাখতেই হঠাৎ শিবুচরণের আবার নিজের হাতের কথা খেয়াল হয়। চট করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে।

বল্টু জিজ্ঞেস করে, কোথায় কাজ করছ তুমি! শুনেছিলাম বইয়ের দোকানের কাজ ছেড়ে দিয়েছো।

শিবুচরণ গম্ভীর হয়ে বলে, বইয়ের দোকানের পর আরও কত কি করলুম তিনবছরে। দুমাস অ্যাপ্রেন্টিস থাকলুম এক কারখানায় ভালো লাগল না। সিনেমা হলে কিছুদিন ছিলুম, গেটকিপারে, তারপর নিজের একটা ব্যবসাও খুলেছিলুম, মার খেয়ে গেল।

বল্টু চোখ বড় করে বলে, বটে! তা এখন?

আবার ভীষণ নাক চুলকে ওঠে তার, শিবুচরণ গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়, মাস দেড়েক হল এক ওষুধের দোকানে ঢুকেছি। ডাক্তারবাবু বড় ভালোবাসেন আমায়, বলেছেন কম্পাউন্ডারি শিখিয়ে দেবেন। কিন্তু...বলে সে থেমে যায়। ভিড়ের ধাক্কায় বল্টুর-সিট-এর কাছ থেকে একটু সরে যায় শিবুচরণ, আবার ঠেলেঠুলে ফিরে আসে। শিবুচরণ গলা নামিয়ে বলে, আমার ডাক্তারবাবু একটা পাগলা আছে, বুঝলি বল্টু। নিজেই নানা রকম ওষুধ-বিষুধ তৈরি করে, ল্যাবরেটরি আছে নিজের। খুব নাম ডাক। আমার কাজ সেই ল্যাবরেটরিতে।

বল্টু শিবুচরণের কথায় মাথা নাড়ে, গুণী লোকের সঙ্গে আছো।

নাক চুলকে ওঠে আবার, চনমন করে শিবুচরণ বেখেয়ালে পাশে দাঁড়ানো আধবুড়ো লোকটার পিঠের ওপর একবার নাকটা ঘষবার চেষ্টা দেখে। সুবিধে হয় না, এক ধাক্কায় মুখটা ভদ্রলোকের পিঠে ধেবড়ে পড়ে।

বল্টু দেখে শুনে বলে, দাঁড়িয়ে তোমার সুবিধে হচ্ছে না শিবুদা, ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছো। বরং বোসো আমার জায়গায়, আমি একটু দাঁড়িয়ে যাই।

শিবুচরণ বাধা দেয় আবার, ও কিছু না, তুই যাবি কদ্দুর? পশ্চিম পুঁটিয়ারিতেই আছিস তো এখনও।

বল্টু হাসে, যাবো আর কোথায়।

বল্টুর পাশের ছিমছাম চেহারা ভদ্রলোক উঠি উঠি করলেন, শিবুচরণ, জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে রইল। হ্যাঁ উঠলেনও, বাস বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম ছাড়াতেই উঠলেন ভদ্রলোক, শিবুচরণ মহা সোরগোল তুলে জনা দুয়েককে ধাক্কা মেরে বসে পড়ে হাসল। ভ্রূর ওপরটা চুলকে নিতে গিয়ে থেমে যায় শিবুচরণ মনের সেই ধমক শুনতে পায়, অ্যাই শিবুচরণ। হাসি নিস্তেজ হয়ে আসে। বলে, বুঝলি বল্টু, এমন এককানা কাণ্ড হল আজ।

বল্টু জানালার দিকে সরে বসেছে, পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে কি দেখছিল, শিবুচরণের কথা না শুনে বলল, শিবুদা, বাড়িখানা দেখেছো। পনেরো তলা হয়ে এল। আমি রোজ গুনে যাচ্ছি। আঠারো তলা হয়ে গেলে যা কাণ্ড হবে একখানা।

শিবুচরণ সকলের চোখ এড়িয়ে একবার চট করে নিজের হাত দুখানা দেখে নেয়। বল্টু চোখ ফেরাতেই বলে, আজ যা কাণ্ড হল না রে বল্টু।

বল্টু ভ্রূ একটু তুলে বলে, তুমি কিন্তু একটু বুড়োটে মেরে গেছো শিবুদা।

শিবুচরণ হাসে, তা বয়সও...বলতে বলতে শিবুচরণ টের পায় গোটা চারেক মশার হুল যেন ফুটেছে নাকের ডগায়। চুলবুল করে ওঠে নাক, অস্থির হয়ে শিবুচরণ জামার হাতায় নাক ঘসে। বল্টু চেয়ে দেখে, হল কি!

শিবুচরণ করুণ চোখে চায়--বলবে নাকি একবার নাকটা একটু চুলকে দিতে! শিবুচরণ আড়চোখে নিজের শক্ত হাত দুখানার দিকে চায়। বিপজ্জনক দুখানা হাত এত কাছাকাছি দেখতেও তার ভয় করে।

বল্টু বলে, ছটফট করছ কেন? নামবে তো সেই আনোয়ার শার মোড়ে—তার ঢের দেরি। তমি কি আগেই নামবে কোথাও কাছেপিঠে?

মাথা নাড়ে আর বলে--না, সে নামবে না। বাস জগুবাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে, একটা স্টপে ধরল না, বাইরে ভিতরে কিছু লোক হইহই করে ওঠে। বল্টুর মন সেই দিকে।

শিবুচরণ হঠাৎ গলা নামিয়ে বল্টুর কানের কাছে বলে, বল্টু, একবার চুপি চুপি আমার নাকের ডগাটা চুলকে দিবি?

বল্টু আঁতকে ওঠে প্রায়, অ্যাঁ!

শিবুচরণ কাতর চোখে চেয়ে বলে, অনেকক্ষণ চুলকোচ্ছে রে শালা, হাত নোয়াতে পারছি না।

বল্টু অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে বসে, ব্যাপার কি শিবুদা, এতকাল পরে দেখা, দুচারটে ভালোমন্দ কথা হবে, তুমি কিনা বলছ নাক চুলকে দিতে!

বড় লজ্জা পায় শিবুচরণ, বল্টুটার দোষ ওই চেঁচিয়ে কথা বলা। বল্টু থামে না, তোমার দুখানা দিব্যি হাত রয়েছে, বাসের হ্যান্ডেল ধরে উঠেছো, রড ধরে ঝুল খেলে একটু আগেও, নুলো নও, প্যারালাইজ নও...,

কনুই দিয়ে বল্টুকে ছোট একটা গুঁতো মারে শিবুচরণ চুপ মার বল্টু! কিন্তু বল্টুর চোখের দিকে চেয়ে শিবুচরণ স্পষ্টই বুঝতে পারে যে বল্টু খুবই সন্দেহের চোখে তাকে দেখছে। ম্লান হাসে শিবুচরণ, বুঝলি বল্টু, আমার পাগলা ডাক্তার আজ একটা শিশি ভেঙে ফেলেছিল, আমাকে ডেকে বলল, শিবুচরণ মেঝেটা পরিষ্কার কর। শিশির মধ্যে কি ছিল জানি না, দেখলাম সাদা পাউডারের মতো গুঁড়ো। পরিষ্কার করার সময় ডাক্তারবাবু ভ্রূ কুঁচকে বলল, শিবুচরণ, খুব সাবধান! হাত ভালো করে ধুয়ে ফেল, এ মারাত্মক বিষ, এক আউন্সে লাখ দুয়েক লোক মারা যায়, সমুদ্রের জলে মিশিয়ে দিলে দু মাসে সমস্ত সমুদ্র...বুঝলি কিনা এরকম আরও অনেক কিছু বলে গেল ডাক্তারবাবু, ভাঙা কাচ আর গুঁড়াগুলো লোহার একটা বাক্সে তালাচাবি দিয়ে রেখে দিল। আমার হাতে সেই গুঁড়া লেগেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু তখন থেকেই কেন বড় অস্বস্তি হচ্ছে তাই। কে জানে নখের ফাঁকে, কি চামড়ার সঙ্গে কোথায় একটু লেগে আছে। গা চুলকোতে পারি না, বিড়ি খেতে পারি না।

বল্টু এত বড় বড় চোখ করে শুনল, তারপর একটু ভেবে বলে, তা হলে হাত দুটো সাবধানেই রাখো শিবুদা। বলতে বলতে বল্টু জানালার আরও ধার ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে যায়। তার মুখে কেমন একটা ফ্যাকাসে ভাব। তাদের ওপর ঝুঁকে রড ধরে যে আধবুড়ো লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল তার কাঁচা পাকা গোঁফ নড়ে ওঠে, ভিড়ের মধ্যেই লোকটা একটু ঠেলাঠেলি করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে।

শিবুচরণ বোঝে যে সে গলা নামিয়ে কথা বললেও লোকটা তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে সব শুনে নিয়েছে।

বল্টু গলা পরিষ্কার করে বলে, তৈরি হও শিবুদা, সামনেই তোমার স্টপ।

শিবুচরণ অবাক হয়, এই তো সবে রেলব্রিজ পেরোলুম, স্টপের এখনও দেরি আছে।

বল্টু বিজ্ঞের মতো হাসে, দেরি আর কি, যা ভিড়, ঠেলেঠুলে দরজায় পৌঁছুতেই তিনটে স্টপ বেরিয়ে যাবে।

শিবুচরণ তার চুলবুলে নাক জামার হাতায় ঘষে, শালার নাকটা...।

বল্টু লাজুক মুখে বলে, তোমার নাক চুলকে দিতুম শিবুদা, কিন্তু মাইরি, ভিড়ে এত লোকজনের সামনে বড় লজ্জা লাগছে।

শিবুচরণ মাথা নাড়ে--ঠিক। সে জানে ঠিক। ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ে শিবুচরণ, চলি রে বল্টু, একদিন আসিস বাসায়, বাঁচি কি মরি দেখে যাস।

বল্টুর গলা শোনা যায়, আচ্ছা।

আনোয়ার শা রোডের মোড়ে নামে শিবুচরণ। তার বাসা হরিপদ দত্ত লেন-এ, মিনিট দশেকের হাঁটাপথ। রাস্তাটুকু প্রতিদিন হেঁটে যেতে দুটো বিড়ি লাগে শিবুচরণের। অভ্যাসবশত আক্রামের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। ঢেউ খেলানো আয়নায় নিজের থ্যাবড়া মুখ দেখে। আক্রামও রোজকার মতো শিবুচরণকে দেখে বিড়ির বান্ডিলের দিতে হাত বাড়ায়। শিবুচরণ মাথা নামিয়ে আক্রামের প্রায় কানে কানে বলে, ভাই রে, আজ বিড়ি লাগবে না। আজ আর একটা কাজ করতে হবে তোকে। আক্রাম বাঁকা চোখে চেয়ে সাবধানী গলায় বলে, তুমি শালা বাকি বকেয়ার কথা ছাড়া আর কি বলবে! ঝামেলায় জড়িও না ভাই—তাকে কথা শেষ করতে না নিয়ে শিবুচরণ তার নাকখানা এগিয়ে দিয়ে করুণ গলায় বলে, ভাই নাকটা একটু চুলকে দিবি?

আক্রাম ঝট করে মুখ সরিয়ে নেয়। মাল খাসনি তো! গভীর সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলে, তোর হল কি শিবু। তোর নাক আমি চুলকোবো! শালা, আক্রাম পরের নাক চুলকে বেড়ায় নাকি! সাহস বটে তোর।

শিবুচরণ কাতরে বলে, রাগ করিসনি ভাই, দুহাতে বিষ মাখা, কিচ্ছুটি করবার জো নেই। বিড়ি খেতে পারছি না, মাথা ধোঁয়াটে লাগছে। আর জুটেছে এক নাকের চুলকোনি আজ, মরে যাচ্ছি। শরীরের কত জায়গা যে চুলকোতে ইচ্ছে করছে এক সঙ্গে!

আক্রাম বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে বলল, বাড়ি যা, বাড়ি যা। বউকে গিয়ে বল চুলকে দেবে গা গতর। যার যা কাজ।

ধুতির খুঁট তুলে শিবুচরণ সাবধানে নাক চেপে ধরে ডলা দেয়। নাকের নরম হাড় ককিয়ে ওঠে, চোখে জল এসে যায়। তার জ্যাঠামশায়ের হাতে ছিল ওই চুলকোনি। হাতে চুলকে পারা যেত না, তাই জ্যাঠামশাই প্রায়ই আঙুলে নারকোলের দড়ি জড়িয়ে হাত মুঠো করত। তাতে না কি ভারি আরাম। হাঁটতে হাঁটতে শিবুচরণ হাত দুখানা আবার চোখের সামনে ধরে। লাইজলে কার্বলিক সাবানে ভালো করে ধুয়েছে হাত। তবু বলা যায় না। এ হাত আর কখনও কি কোনও কাজে লাগাতে পারবে শিবুচরণ!

ডাক্তারবাবু মুখে কিছু বলেন কি বটে, কিন্তু শিবুচরণ তো ওঁর মুখের ভাবখানা দেখেছে। বড় গম্ভীর, বড় চিন্তিত মুখে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বিড় বিড় করছিলেন, বড় মারাত্মক বিষ শিবুচরণ বড় মারাত্মক বিষ। মানবসমাজ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ওটুকুতে। আমি নিজে তৈরি করেছি এ বিষ, এখন কোথায় লুকোই। পাগলা ডাক্তার ঘরের চারদিকে পায়চারি করে বলেছিল, মেঝে ধুয়ো না জলের সঙ্গে গড়িয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে। আমি মোটা চট কি কার্পেট দিয়ে মেঝেটা ঢেকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছি, নীচে থাকবে

লিনোলিয়াম। বুঝলে শিবুচরণ, এ বিষের অ্যান্টিডোট বের না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

অতশত বোঝেনি শিবুচরণ, সে শুধু বুঝেছে না জেনে শুনে সে এক মহা বিপদের কাজ করে ফেলেছে আজকে। বুঝে শরীর হিম হয়ে গেছে তার। এখনও তার হাত দুখানা বেশ জোরালো। কালচে এই হাত দুকানায় কত কাজই করেছে শিবুচরণ, এখনও কত কাজ করা বাকি। তবু সে বুঝতে পারে বিপজ্জনক এ হাত দুখানা এত কাছাকাছি থাকায় সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না এখন।

বাড়িব কাছাকাছি আসতে শিবুচরণের গায়ে হাওয়া লাগে। জল মাটির আঁশটে গন্ধওলা হাওয়া। তার মাটির উঠোন, গাছগাছালির ছায়ায় ঢাকা, পুকুরপাড় পুকুরপাড় একটা ভাব আছে তার ঘরদোরে। সদর বলতে একটা আগর দেওয়া, উঠোন ঘেরা পুরোনো বাঁশের বেড়া। শিবুচরণ আগর ঠেলে উঠোনে ঢোকে, দরজার শেকল নাড়া দেয়। ভিতরে আক্রোশে লেজ আছড়ায় একটা বাঘিনী। বাঘিনী তার বউ বিভাবতী। বিভার গলা শোনা যায়, ওই এল।

দরজা খুলতে কিন্তু বিভার হাসিমুখই দেখতে পায় শিবু, কোলে তাদের আড়াই বছরের ছেলে পান্তু। ভারি আদুরে ছেলে, ল্যাপাপোঁচা মুখ। হাসলে বড় আল্হাদে দেখায়, বাপকে দেখে ছেলে হামলে পড়ে বিভার কোল থেকে। পান্তু সোনা, পান্তু সোনা বলে শিবুচরণ ছেলেকে জাপটে ধরতে চায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীরে ঝিলিক নিয়ে একটা গলার স্বর ধমকে ওঠে, অ্যাই। শিবুচরণ চট করে হাত সরিয়ে নেয়, বিভার কোল থেকে টাল খেয়ে পান্তু ঝুঁকে পড়তেই যাচ্ছিল, কোনওক্রমে সামলে নিল বিভা। দু হাত দু বগলে চেপে কাতরকণ্ঠে নিজেকেই বলে শিবুচরণ খবরদার যদি ছুঁয়েছো! খবরদার! হ্যাঁ, এখন তো আর হেলায় ফেলায় তাসপাশা খেলছে না শিবুচরণ, কিংবা বাসের হ্যান্ডেলও ধরছে না। ছেলেকে আদর করার হাত আলাদা, যেমন আলাদা বিড়ি খাওয়ার কি গা চুলকোনোর হাত। হাতেরও যে কি বিচিত্র চরিত্র আছে শিবুচরণ এই প্রথম টের পায়। বলতে কি জীবনে আলাদা করে নিজের হাত দুখানাকে এই প্রথম লক্ষ করে শিবুচরণ।

বিভা শিবুচরণের কাণ্ড দেখে দু-পা পিছিয়ে গিয়েছিল, প্রায় চেঁচিয়ে বলল, ও কি হচ্ছে? আর একটু হলে ছেলেটিকে যে ফেলে দিতে!

শিবুচরণ বিভার গলা শুনে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়, ধীরে ধীরে বিভার পাশ দিয়ে ঘরে ঢোকে, বলে, দাও দেখি সাবানখানা, হাতটা ধুই।

বিভার তবু চোখ ছোট হয় না, বড় বড় চোখে সে শিবুচরণকে দেখে, হল কি তোমার! খুনটুন করে আসোনি তো! যদিও বিভা জানে রাস্তায় চ্যাঁচামেচি শুনলে ঘরে শিবুচরণ ঘেমে ওঠে। শিবুচরণ কথার উত্তর না দিয়ে বলে, হাতটা আগে দুই, তারপর বলছি।

শিবুচরণ সন্তর্পণে জামাকাপড় ছাড়ে, ঘরের জিনিসপত্রের ছোঁয়া থেকে হাতকে বাঁচিয়ে রাখে, ছাড়া জামাকাপড় পুঁটলি করে বাইরের দাওয়ায় রাখে।

বিভা সারাক্ষণ শিবুচরণকে দেখছিল ঘরের দরজায় ছেলে কোলে দাঁড়িয়ে। বলল, বারান্দায় জামাকাপড় রাখছ যে! শিবুচরণ উত্তর দেয় না। দড়ি থেকে গামছা টেনে নেয়, তুলে নেয় বারান্দায় রাখা প্ল্যাস্টিকের সোপ-কেসটা। পুকুর পাড়ে যাবে, হঠাৎ আবার নাকের ডগা চুলবুলিয়ে ওঠে। সইতে পারে না শিবুচরণ, এক ঝটকায় দাওয়ায় উঠে বিভার দিকে নাকটা বাড়িয়ে দেয়, বিভা পিছু হাঁটতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট কায়, ও মাগো! শিবুচরণ বিভাকে ধরবার জন্য হাত দুটো বাড়িয়েও আবার টেনে নেয়। বিভা টাল সামলে নিলে শিবুচরণ ম্লান মুখে বলল, খারাপ মতলব ছিল না। বিশ্বাস কর, নাকটা বড় চুলকোচ্ছে। একটু চুলকে দেবে?

কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারে না বিভা, তার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে, পান্তু বাপকে কাছাকাছি দেখে আবার হামলে পড়ার চেষ্টা করে। নাকের যন্ত্রণায় অস্থির শিবুচরণ ঘরের বেড়ায় নাকটা একবার চেপে ধরে, চড়াক করে একটা কঞ্চির ডগা বসে যায়। দু হাত মুঠো করে শিবুচরণ ফিসফিস করে বলে, দু হাতে আজ আমার মারাত্মক বিষ, বিভা, কিছু করবার জো নেই। শালার কি গেরোতে যে পড়লুম আজকে। বলতে বলতে পুকুরপাড়ে রওনা দেয় শিবুচরণ।

কিন্তু হাত ধোওয়া হল না। টলটলে কালো জলের কাছাকাছি হাত নিয়েও আবার টেনে আনে শিবুচরণ। শ তিনেক লোকের কথা বাচ্চা আর বউ-ঝির কথা মনে পড়ে। নিজের সন্দেহজনক হাতটি তাই জলে দেয় না শিবুচরণ, আবার ঘরে ফিরে আসে। বিভাকে বলে হাতে জল ঢেলে দাও। এখানেই হাত ধুই। পুকুরের জল বিষিয়ে দিয়েছিলুম আর একটু হলে।

বিভা এবার ধাতস্থ হয়েছে অনেকটা, কথা বলে না সে, শিবুচরণের হাতে জল ঢেলে দেয়। শিবুচরণ দেখে হাত-ধোয়া সাবানজল গড়িয়ে গেল শিউলি গাছটার গোড়ায়, জিভ কাটে সে, ওই যা! গেল গাছটা।

চমকে উঠেছিল বিভা, বলল কি? শিবুচরণ মাথা নাড়ে তিন বচ্ছর ঠাকুর পুজোর ফুল দিয়েছে। এবার বেটি মরবে। এ যা বিষ না বিভা, এক আউন্সে পৃথিবী সাবাড় হয়ে যেতে পারে। সমুদ্রে ঢেলে দাও তো দুমাসে সমস্ত সমুদ্র...

পান্তু দাওয়ায় বসে কেঁদে ওঠে, বিভা ঘটি রেখে ছোটে। শিবুচরণ চেঁচিয়ে বলল, আমার জামাকাপড়ে হাত দিও না। গামছা আর সাবান ছুঁয়ো না। খুব সাবধান!

*

হাত পা ধুয়ে এসে ঘরে বসেছে শিবুচরণ। সামনে বসে বিভা রুটিতে তরকারি ভরে পার্টিসাপটার মতো পাকিয়ে শিবুচরণের মুখে তুলে দিচ্ছিল। মহা আনন্দেই আজ খাচ্ছিল শিবুচরণ দুহাত সাবধানে কোলের ওপর জড়ো করে রেখে। থালার পাশে হাত পেতে বসে আছে পান্তু, অবাক চোখে বাবার খাওয়া দেখছে।

বিভা বলল, তা অমন বিষ যখন, তখন হাত দিতে যাওয়া কেন?

শিবুচরণ মাথা নাড়ে, আগে কি জানতুম! ডাক্তারবাবু ভুলো ভোলা পাগল মানুষ তাঁরও অতটা খেয়াল হয়নি।

বিভা জলের গ্লাস শিবুচরণের মুখে তুলে ধরে বলে, কি জানি বাপু, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! চালাকি করছ না তো! ওরকম বিষ থাকতে পারে বুঝি, এই টুকুতে সব মানুষ মরে যাবে!

শিবুচরণ ঢেকুর তুলে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে, পারেই ত। অ্যাটম বোমার সাইজ জানো? এইটুকু বলে হাতে হাঁসের ডিমের সাইজ দেখায় শিবুচরণ। গোঁফে জল লেগে আছে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছতে যেতেই বিভা তার হাত চেপে ধরে, দাঁড়াও, তারপর নিজের আঁচলে তার মুখ মুছে দেয়। হাসে শিবুচরণ, সেই ছেলেবেলায় মা ভাতের দলা খাওয়াতো, আর এই খেলুম তোমার হাতে। বেশ ছেলেমানুষ লাগছে আজ নিজেকে। নাকটা আবার একটু চুলকে দাও তো!

বিভা লাজুক হেসে তার নাক চুলকে দেয়। আরামে চোখ বোজে শিবুচরণ।

.ফাটন

ফোটনকে পাবলিক খুব পেঁদিয়েছে আজ। এখন ওই যে লাইনের ধারে মরকুটে কদম গাছটার তলায় পড়ে আছে ফেলে দেওয়া জিনিসের মতো। লুঙ্গিখানা গিঁট মেরে পরেছিল, তাই এখনও লেগে আছে কোমরে। গেঞ্জি ফরদাফাঁই হয়ে উঠে গেছে, হাওয়াই শার্ট বেপাত্তা। গোছা গোছা চুল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে মাথা থেকে। মুখ যেন একশো বোলতার হুলে ফুলে ফেঁপে বেলুন। চোখ বোজা, নাক কাটা, ঠোঁট থ্যাঁতলানো। রক্ত জমে গেছে, এখন আর হড়হড় করে নাক-মুখ দিয়ে পড়ছে না। দু-চারটে মাছি উড়ছে ধুলো আর রক্তমাখা মুখের কাছে। হাড়গোড় ভেঙে থাকলেও এখন তা বোঝবার উপায় নেই। তবে না ভাঙাই সম্ভব। ফোটনের হাড় তো পাকা।

ফোটনের আশপাশ দিয়েই লোকজন যাতায়াত করছে বাজারে, স্টেশনে। তাকাচ্ছে। ফের দেখি না দেখি না ভাব করে চলে যাচ্ছে।

জগদীশ ঘোষ মান্য খদ্দের। তাঁর কোঁকড়া চুলে শ্রদ্ধার সঙ্গে কাঁচি চালাতে চালাতে পপুলার সেলুনের শ্বেতিওয়ালা জগন কণ্ঠহরিকে উদ্দেশ্য করে বলল, এইবেলা একটা রিকশা ডেকে তুলে নিয়ে যাও। পুলিশ এলে আর পারবে না।

কণ্ঠহরি সেলুনের এক বর্গফুট ঘুলঘুলিটার ভিতর দিয়ে ফোটনের দিকে চেয়ে ছিল। শুকনো ঠোঁটটা জিব দিয়ে ভিজানোর বৃথা চেষ্টা করে বলল, যাই। কিন্তু পাহারা আছে যে।

কে পাহারা!

চারটে ছেলে ঝোপড়ার ওদিকটায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে অনেকক্ষণ ধরে।

কিছু বলবে না। লাশটা নিয়ে আর করবে কী বলো!

লাশ কথাটায় কলজেটা ব্যাঙের মতো একটা লাফ মারে কণ্ঠহরির। পাবলিকের কাছে ফোটন যাই হোক, তার তো ছেলে। সারাদিন খবর ছিল না, অনেক খুঁজে খুঁজে খবর নিয়ে তবে এখানে এসে সন্ধান পাওয়া গেছে।

কণ্ঠহরি কষ্টেসৃষ্টে উঠে পড়ল। কোমরটায় বাতের ব্যথা বহুকাল ধরে বাঘের থাবা মেরে বসে আছে। নড়েও না চড়েও না। চরণগঙ্গার গোঁসাই বলেছিল, চিনে বিছে লাগালে সেরে যাবে। তা চিনে বিছের এখন জোগাড় নেই। ডাক্তার বদ্যি সব ফেল মেরে গেল। উবু হয়ে কাজ করতে পারে না, ভার তুলতে পারে না। বড় কষ্ট। বসার পর উঠলে কিছুক্ষণ কুঁজো মেরে থাকতে হয়। বড্ড টাটায় তখন। একটু হাঁটাহাঁটি করলে তারপর কোমর সরল হয়।

চারপাশটা দেখে নিয়ে কণ্ঠহরি গিয়ে কাছটিতে দাঁড়ায়। না, শ্বাস আছে এখনও। বুক ওঠানামা করছে। ঝোপড়ার ওদিকটায় চার ছোকরা একটু তফাত হয়েছে। কণ্ঠহরি একটা চলন্ত রিকশাকে হাত তুলে থামাল। রিকশাওয়ালা সন্দিহান চোখে তার চেহারাটা দেখে নিয়ে থেমে গেল।

কণ্ঠহরি ফের চোর চোখে চারপাশটা দেখে নিল। বেশি সোরগোল না করে মালটা তুলে ফেলতে হবে। নীচু হয়ে ফোটনের দুবগলের তলায় হাত দিয়ে খানিক তুলে করুণ চোখে রিকশাওয়ালার দিকে চেয়ে কণ্ঠহরি বলে, একটু হাত লাগাবি বাবা? বুড়ো মানুষ আমি, একা পেরে উঠব না।

পকেটমার আছে নাকি ছোকরাটা?

কণ্ঠহরি মাথা নেড়ে বলে, ওসব নয়। আর হলেই বা তোর কী? তোকে ঠিক পয়সা দেবো। ধর বাবা একটু।

রিকশাওয়ালা নেমে এগিয়ে এল। কিন্তু সে ফোটনকে ধরবার আগেই ঝোপড়ার ওপাশ থেকে চারটে ছোকরা ভূতের মতো বাতাস ফুঁড়ে সামনে দাঁড়াল, এই যে দাদু, বডি তুলছেন যে বড়। কার পারমিশান নিয়েছেন?

কণ্ঠহরি ঢোঁক গিলে বলল, আমার ছেলে।

ওসব জানি। আপনি ফোটনের বাপ না পিসে তা জেনে আমাদের লাভ নেই। বডি তুলবে পুলিশ। থানায় খবর গেছে।

কণ্ঠহরির হাত কাঁপছে। ফোটনকে ছাড়তে পারছে না। কোমরটা টাটাচ্ছে বেদম। বলল, পুলিশ আর কী করবে বাবারা, নিয়ে আরও মারবে।

তা সে ফালতু মস্তানি করতে গেলে ঝাড় তো খেতেই হয় দাদু। বডিটা ছেড়ে দিন। ও মাল এখন আমাদের।

ছেড়ে দিতেই ফোটন আবার গদাম করে মাটিতে পড়ে গেল। কণ্ঠহরি মাজাটা ডলতে ডলতে ককিয়ে উঠল, অরে বাবাঃ...ওঃ...

একটা চাকর একটু মোলায়েম গলায় বলল, আইন ইজ আইন। বুঝলেন দাদু? পেঁদিয়েছে পাবলিক, আর পাবলিক মানেই হচ্ছে ভোটার, মানে সরকার। বডি তুলতে হলে তুলবে পুলিশ, মানে পাবলিক সারভেন্ট। আপনার আমার কিছু করার নেই। কে হন যেন আপনি?

কণ্ঠহরি বিকৃত মুখ করে বলল, বাবা। অনেক পাপ করেছি তো, তাই।

ছোকরাটা আকাশের দিকে চেয়ে গলা চুলকোতে চুলকোতে বলল, সেন্টিমেন্টে খোঁচা মেরে দিলেন দাদু? বাপ-ছেলে রিলেশন বলছেন, ঠিক তো!

ফোটনের বাপ হওয়া এমন কিছু গৌরবের নয় যে, লোক মিথ্যে করে বাপ সাজবে। কণ্ঠহরি সে কথায় না গিয়ে বলল, বাপই বটে।

কিন্তু আমাদেরও তো রেসপনসিবিলিটি আছে দাদু। বলাইদা--আমাদের লিডার বলে গেছে খবরদার বডি কাউকে ছুঁতে দিবি না, পুলিশের লোক এলে রিলিজ করবি।

বুঝেছি বাবা। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, তাই বলছিলাম—

আমরা বলি কি কিছু মাল খসান, বডি তুলে নিয়ে যান, কেউ কিছু বলবে না।

বুঝেছি। কত?

পঁচিশ।

আমার কাছে অত নেই।

কত আছে?

পাঁচ।

সার্চ করলে যদি বেশি বেরোয়?

কণ্ঠহরি ককিয়ে উঠে বলল, দশ।

খুব চিপ হয়ে যাচ্ছে না?

আর নেই বাবা।

ছোকরাটা রিকশাওয়ালাকে একটা ধমক দিল, তোল না শালা গিদধড়, তুলে লে। উঠে পড়ুন দাদু, গিয়ে একটু ডেটল ফেটল লাগিয়ে দেবেন, মাল ঠিক ফিট হয়ে যাবে।

রিকশায় তুলতে ছোকরাগুলোও একটু হাত লাগাল।

পকেট থেকে দশটা টাকা বেরিয়ে গেল ফালতু। কোমরটা টাটাচ্ছে। ফোটনের আলিসান শরীরের চাপে কণ্ঠহরির শুটকো চেহারা ফোঁক ফোঁক করছে, হাঁসফাঁস করছে। দিশি মদের গন্ধে গুলিয়ে উঠছে গা। রিকশাটা হপ্তা বাজারের ভাঙা রাস্তায় ঝকাং ঝকাং করে যত লাফায় তত প্রাণবায়ু বেরোতে থাকে কণ্ঠহরির। উপায় থাকলে ফোটনকে এখন জুতোপেটা করত কণ্ঠহরি। কিন্তু ভগবান কি আর সেই দিন দেবেন?

গোটা পাঁচ-সাত রাম ঝাঁকুনির পর আচমকাই কণ্ঠহরির গায়ে হড়াক করে দিশি মদ আর খানিক কিমাকারির গরম বমি ফেলল ফোটন। তারপরই সটান বসে বলল, কোন শালা বে হুটোপাটা করতে লেগেছিস? কোন শুয়োরের—

কণ্ঠহরি চিঁচিঁ করে বলে ওঠে, আমি রে আমি।

লাল টকটকে দুখানা চোখে ফোটন তাকে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করে, শালা বাবা নাকি বে?

চুপ করে বোস তো, গাটা একটু এলিয়ে দে।

শুয়োরের বাচ্চারা সব গেল কোথায় বলো তো! অ্যাঁ! একটা একটা করে ধরে জমি নেওয়াবো শালাদের, সবকটার মাগকে বিধবা করে ছাড়ব। খানকির...

চুপ করে বোস বাবা। ধরে থাক শক্ত করে।

সব বিলা করে দেবো, বুঝলে! জ্বালিয়ে দেবো শালা!

হবে হবে। এখন একটু—

ফোটনের কনুইয়ের একটা রামগুঁতোয় কণ্ঠহরি বেঁকে যায়। বাপ, জোর লেগেছে।

বলাই শালার গলা যদি না নামাই তবে আমি বাপের ছেলে নই, বুঝলে?

কণ্ঠহরির বুঝবার মতো অবস্থা নয়। ফোটন বড্ড হাত চালাচ্ছে। কণ্ঠহরি মুখখানা হাতচাপা দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে বলে, হবে হবে সব হবে। এখন একটু চুপ করে বোস তো।

লাইনের ওধার ওর, ঠিক আছে। এধারে আমি তোলা নেই তাতে ওর বাবার কী, তুমিই বলো!

তা বটে।

তবে শালা আমাকে টেনে নিয়ে গেল কেন?

ভালো লোক কি আর আছে রে ফোটন? তুই চুপ করে বোস।

জানো তুমি? লাইনের এধার থেকে বাইশটা ছেলে আমাকে ওধারে টেনে নিয়ে গেল। আর শালা বলাই গলায় নল ঠেকিয়ে বলে কিনা, এ এলাকায় পা দিয়েছিস কেন? কত বড় মিথ্যে কথা?

দুনিয়াটাই পাপে ভরে গেছে। তুই একটু চুপ করে বোস তো বাবা, অত ছটফট করিসনি!

বলাইয়ের সঙ্গে হচ্ছিল তো হচ্ছিল। কথা নেই বার্তা নেই, দুটো হুমদো মতো লোক কোত্থেকে এসে বলল, এটাকে ধরেছিস খুব ভালো করেছিস। শালা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে, সেদিন আমার বউদি একটু দরাদরি করায় বলেছিল ফোট মাগি, এত বড় সাহস। বলেই দুমদাম লাগাতে শুরু করল। পাবলিকও জুটে গেল সেই সঙ্গে। বলো, এই কি বিচার?

কণ্ঠহরি ফোটনের বড় শরীরটাকে রিকশার মধ্যে ঠিক আঁটিয়ে রাখতে পারছে না। বলল, ধর্ম কি আর আছে রে বাপ? কনুইটা ফের লাগবে, দেখিস?

ওঃ, শালারা খুব রগড়েছে। আমিও দেখব শালা বলাইকে, লাইনের ওদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে মস্তানি! বাপের ব্যাটা হলে লাগতি এদিকে এসে, জল ভরে দিতাম।

ন্যায্য কথা শুনে কণ্ঠহরি সায় দিল, বটেই তো।

আমিও বাগে পাবো একদিন। তিনটে লাশ ফেলে দিয়েছি আমাকে তো চেনে না এখনও।

চিনবে রে চিনবে। সবই রয়ে সয়ে হয়।

ফোটন একটু কমজোরি হয়ে পড়েছে। ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল। ফাটা ঠোঁট দিয়ে ফের রক্ত বেরোচ্ছে বগবগ করে। ফোঁটা ফোঁটা বেয়ে পড়ছে কালো বুকে। হপ্তা বাজারের খোয়া ওঠা রাস্তায় টাল্লা খেয়ে নেচে নেচে রিকশা এগোচ্ছে। রিকশা, ঠেলা,

পাঁউরুটির গাড়ি, ভ্যান, সাইকেল আর মানুষে ঠাসে ঠাস ভিড় ঠেলে ফোঁকর করে করে এগোনো ভারি শক্ত।

আস্তে চালাস বাপ, কণ্ঠহরি বলে।

রিকশাওয়ালা তেজে জবাব দিল, আস্তেই চলছে।

বিড়বিড় করে কী যেন বলছে ফোটন। মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে। চোখ বোজা। শরীরটা দুলছে এদিক সেদিক। কণ্ঠহরি কানটা একটু এগিয়ে দেয়, কী বলছিস ও ফোটন?

বলাইকে সাফ করলে গোটা এলাকাটা একদিন আমার হয়ে যাবে, বুঝলে বাবা? সবাই বলবে ফোটন মালিক। ব্ল্যাকাররা তোলা দেবে, সবজিওয়ালা, চালওয়ালা, সাট্টাওয়ালা সব শালা দেবে। চারটে লরি করব, দুটো মিনিবাস, একটা কালীমন্দির দেবো। বুঝলে বাবা?

দিস। খুব ভালো হবে।

মারল তো শালা, জানে খতম করতে পারল? মরদ হলে পারত। আমি যেদিন ধরব বুঝলে বাবা, জানে খতম করে দেবো। লেজ মাড়িয়ে ছেড়ে দেবো না। ঠিক হবে না বাবা?

কণ্ঠহরি খুব ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলে, তাই তো রে। ঠিক কথা।

ফোটন একটু হেলান দেয় কণ্ঠহরির শরীরে। মাজাটা কোঁক করে ওঠে কণ্ঠহরির। মদের ঝাঁঝালো গন্ধ আসে নাকে। বমিটা জামায় শুঁকোচ্ছে। তবু কণ্ঠহরি ছেলের বিশাল শরীরের ঠেস সহ্য করতে করতে মনশ্চক্ষে দেখতে পায়, ফোটন লাইনের দুধারে দুটো স্তম্ভের মতো বিশাল পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বলাইয়ের কাটা মুণ্ডু। সেই বিশাল ঠ্যাঙের তলা দিয়ে নতমস্তকে যাতায়াত করছে বেয়াদব পাবলিক আর ঠনাঠন পয়সা প্রণামী ফেলে যাচ্ছে।

কণ্ঠহরি ফোটনের মাথাটা কাঁধে চেপে ধরে আদরের গলায় বলে, হবে রে হবে, সব হবে। সবার কি আর চিরকাল দুর্দিন থাকে?

মাধুর জন্য

মাধু যখন ছোট ছিল, তিন কি চার বছর যখন তার বয়স, তখন কলকাতার প্রকৃতিহীন ফ্ল্যাটে বাক্সবন্দি জীবনযাপন থেকে মাঝে মাঝে তাকে মুক্ত করতে আমি, অর্থাৎ তার বাবা, তাকে রবিবার রবিবার প্রকৃতি দেখাতে নিয়ে গেছি ময়দান, সোনারপুর, উলুবেড়ে বা ওরকম সব জায়গায়। স্ত্রী নারাজ ছিল বলে আমাদের ওই একটির বেশি দুটি হয়নি। মাধু

আমাদের একমাত্র। আমাদের সব আদর ভালোবাসার প্রচণ্ড ও একমুখী লক্ষ্যস্থল। সেই প্রবল আদরের ধাক্কা সামলে আজ সে—

আজকের কথা পরে। কথা হল, মাধুকে আমি আমার মতো মানুষ করতে চেয়েছি, আমার স্ত্রী চেয়েছে তার মতো করে। মাধু কাউকেই নিরাশ করেনি। মনে হয় এক মাধু দুরকমভাবে বেড়ে উঠেছে। এক মাধু দুরকম মানুষ হয়েছে। হতেই হয়েছে তাকে। না হয়ে উপায় ছিল না। আমি তাকে প্রকৃতি দেখাতে চেয়েছি, শিখিয়েছি ভিখিরিকে ভিক্ষে দিতে। ছবি আঁকা শেখাতে চেয়েছি, ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে সে ডাক্তার হোক, যা আমি হতে চেয়েও পারিনি। আমি একসময়ে কিছু ব্যায়াম করেছিলাম এবং হাওড়াশ্রী হয়েছি দুবার। ফলে মাধুকে ব্যায়াম শেখানোর প্রতিও আমার আগ্রহ ছিল। আমার স্ত্রী তাকে ইংলিশ মিডিয়ামে চোলাই করে, নৃত্যগীতে পারদর্শিনী ও তেজস্বিনী করতে চেয়েছে। সেটাও কিছু খারাপ নয়।

মাধু এই বৈশাখে সতেরো পূর্ণ করল। পার হয়ে গেল আমাদের বিংশতিতম বিবাহবার্ষিকী। আমি বিস্তর ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করে এবং আমার স্ত্রীর অক্লান্ত প্রয়াসে অবশেষে আমরা একটা ওনারশিপ ফ্ল্যাট কিনতে পেরেছি লেক গার্ডেনসে। স্বামী ও স্ত্রী প্রতি মাসেই নিজ নিজ বেতন থেকে ফ্ল্যাটের বকেয়া টাকা শোধ করে যাই। আমার ও আমার স্ত্রী চমকের মধ্যে বোঝাপড়া বা সমঝোতা চমৎকার। সেই কারণেই আমাদের দাম্পত্য জীবনের প্রেমহীনতা বাইরে থেকে একেবারেই বোঝা যায় না।

প্রেমহীনতা কথাটা বেশ মোলায়েম। ঘৃণা, বিদ্বেষ ইত্যাদি শব্দের চেয়ে প্রেমহীনতা অনেক গভীর ও নরম শব্দ। বাস্তবিকই আমি ও আমার স্ত্রী পরস্পরকে ঘৃণা করি না, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষও নেই। সাত বছর প্রেম করার পর আমরা বিয়ে করি এবং বিয়ের দু বছরের মধ্যেই বুঝতে পারি যে, বিয়ের আগে সাত সাতটা বছরের পণ্ডশ্রম আসলে একটা 'সোনার হরিণ চাই' গোছেরই কিছু ছিল। ওই সাতটা বছর কেন যে আমরা পরস্পরকে চেয়ে গেছি লাগাতার সেইটেই একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। তা বলে আমরা ঝগড়াঝাঁটি এবং অন্যান্য ফ্যাঁকড়া তুলিনি। তবে পরস্পরের প্রতি নিস্পৃহতা আসতেও সময় লাগেনি। সৌভাগ্যবশত আমার স্ত্রী দুর্দান্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থায় চাকরি করে। আমার চাকরি পুলিশে। দুজনের রোজগার যোগ করলে এ বাজারেও মোটামুটি ভদ্রভাবে বেঁচে থাকা যায়। এই অর্থনৈতিক কারণটাই আমাদের বিয়ের পর জুড়ে রাখল।

পুলিশের চাকরিতে উপরি রোজগারের প্রলোভন অঢেল। তাই বলেই সব পুলিশই চোর একথা ভাবতে নেই। অন্তত আমি নই। তার কারণ এমন নয় যে, আমি সৎ এবং চরিত্রবান। আসলে ঘুষ খাওয়াটার আমি কোনও মানেই খুঁজে পাই না। আর কেমন যেন ফালতু টাকা হাত পেতে নিতে একটু ভিখিরি-ভিখিরি লাগে নিজেকে। লজ্জা হয়। এটা

অবশ্য একটু অভ্যাস করলেই কেটে যেত। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই অভ্যাস করিনি। তুলনামূলকভাবে আমার স্ত্রীর রোজগার অনেক ভালো।

বিয়ের পর তিন বছর বাদে আমরা খুব হিসেব-নিকেশ করেই মাধুকে পৃথিবীতে আনি। মাধু আমাদের বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় আঠা। অর্থনীতি ও সন্তান এই দুই না থাকলে দাম্পত্য জীবনটা আমাদের আরও খাপছাড়া হয়ে যেত।

জন্মের কিছু পরেই মাধু আমাদের দুজনকে পেয়ে বসল। মাধু ছাড়া আমরা আর কিছুই যেন চোখে দেখি না।

সেই মাধু এখন সতেরোয়।

সুন্দরী কিনা? সেটা বলা মুশকিল। তবে বোধহয় খারাপ নয়। বেশ লম্বাটে, স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী মেয়ে। গান, নাচ, কথ্য ইংরিজি, ছবি আঁকা ইত্যাদি সব বিষয়েই চলেবল। প্রি-মেডিকেলে অ্যাডমিশন নিয়েছে এবং বোধহয় ডাক্তার হয়ে বেরিয়েও আসবে।

আমার একটু মদ্যপানের অভ্যাস আছে। একটু মেয়েমানুষের দোষও। তবু এ দুটোই আমার স্ত্রী চমকের অনুমোদনপ্রাপ্ত। চমকের সঙ্গে তার এক সহকর্মী দীপ্তসুন্দরের একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমি সেটা অনুমোদন করেছি, কারণ আমরা দুজনেই এক বাক্সঘরে বসবাস করে বুঝেছিলাম পরস্পরকে পাওয়ার পর আর পরস্পরকে দেওয়ার মতো নতুন কিছু আমার বা চমকের নেই। দীপ্তসুন্দর সেই নতুন কিছু হয়তো বা দিতে পারে চমককে। তবে তারা ছেলেমানুষ নয়। সংসার ভাঙবে না, সন্তানেরও জন্ম দেবে না, এসব গ্যারান্টি আছে। সমঝোতা আছে। আমিও কোনওদিন মাতাল হয়ে ফিরব না বা খারাপ পাড়ায় পুরো রাত কাটাব না। দুজনেরই এইসব ক্ষমার যোগ্য দোষ থাকায় পরস্পরকে মুখ দেখাতে আমাদের তেমন লজ্জা হয় না। আমাদের লুকোনোরও বেশি কিছু নেই পরস্পরের কাছে। লুকিয়ে কী হবে? দীপ্তসুন্দর চমকের বস। অফিসের বিভিন্ন টেকনিক্যাল কাজের ভিতর দিয়ে ওদের মধ্যে চমৎকার একটা পেশাদারি আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। দীপ্তসুন্দর চমকের জন্য জান-কবুল করে অফিসে লড়ে যায়। লিফট, স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি পেতে চমকের কোনও অসুবিধে হয় না। পরস্পরকে ওদের প্রয়োজন হয় অনেক বেশি। সে ব্যাপারে আমার নাক গলানোটা নিতান্তই সিঁদ কাটা। আমার চেয়ে বরং দীপ্তসুন্দরই চমককে বোঝে এবং জানে বেশি। তুলনায় আমি অবশ্য ততটা ভাগ্যবান নই। চমকের একজন খাঁটি প্রেমিক আছে। আমার তা নেই। আমার মেয়েমানুষেরা ভাড়াটে, হৃদয়হীন, শরীর-সর্বস্ব। তা হোক। হৃদয়ের জন্য আমার আঁকুপাঁকু নেই। পুলিশের লোক বলে আমার কাছ থেকে তারা পয়সা নিতে চায় না। তবু পাছে শরীর নেওয়াটাও ঘুষের পর্যায়ে পড়ে যায় সেইজন্য আমি দু পাঁচ টাকা তাদের দিই। তারা খুশি হয় এবং আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় পর্যন্ত করে।

লোকে এসব শুনে হয়তো বলবে, নোংরামি। তা একরকমের বিচারের হয়তো তাই। বিচারবোধ এবং বিচারের মাপকাঠি নানা ধরনের। কারটা ঠিক, কারটা বেঠিক তা বলা শক্ত। কিন্তু আমার অকটভাবে আমাদের মতোই। কিন্তু এসব অভ্যাস আমরা বাড়ির বাইরেই রেখেছি। মাধু তার কুফল কখনও ভোগ করেনি। আমাদের বাক্সঘর মোটামুটি শান্ত, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক। মাধুর প্রতি আমাদের ভালোবাসা খাদহীন। আমি ও চমক মাধুর জন্য একটি স্বর্গ রচনা করার চেষ্টা করেছি। তার ভবিষ্যৎ কুসুমাস্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্য আমরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। মাধুকে নিয়ে আমরা বছরে একবার বা দুবার কাছে বা দূরে বেড়াতে যাই। মাধুর জন্য প্রতি বছর বেশ কয়েকবার নানা উপলক্ষ্যে দারুণ সব মড পোশাক ও গয়না কেনা হয়। মাধুর প্রিয় মাছ ও মুরগি, মাধুর প্রিয় রাবড়ি বা আইসক্রিম রোজই বাড়িতে আসে। মাধুর অপ্রিয় রং, মাধুর অপ্রিয় কোনও সেন্ট এ বাড়িতে ঢোকে না। মাধুকে খুশি রাখার জন্য আমি ও চমক চমৎকার, ঝগড়াহীন একটা দাম্পত্য আবহাওয়া বজায় রেখে চলি।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে। থানায় একটা মারডার কেস জমা পড়লে আমাকে প্রাথমিক তদন্তের ভার দেওয়া হয়। স্পটে গিয়ে দেখি, একজন কুড়ি বাইশ বছরের ছোকরা উপুড় হয়ে নালার ধারে পড়ে আছে। পরনে ফুলপ্যান্ট আর একটা ব্যানলনের গেঞ্জি। বেশ ভালো চেহারা। বুকে আর মাথায় দু দুটো ৩৮ বোরের রিভলভারের ফুটো। ফটোগ্রাফাররা কাজ সেরে চলে যাওয়ার পর ডেডবডি সরানোর আগে আমি ছোকরাটাকে সার্চ করতে গিয়ে তার বুক পকেটে মাধুকে লেখা আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা সমেত একটা চিঠি পেয়ে যাই। নিয়মমতো চিঠিটা অন্যান্য প্রাপ্ত জিনিসের সঙ্গে থানায় জমা দেওয়ার কথা। বলা বাহুল্য আমি তা করিনি।

খুনের কেস-এ প্রাথমিক তদন্ত যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ক্লান্তিকর। আইডেনটিফিকেশন হয়ে যাওয়ার পর মৃতের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে হাঁটাহাঁটি, খোঁজখবর ইত্যাদি খুবই একঘেয়ে এবং রুটিনমাফিক ব্যাপার। রহস্য বা রোমাঞ্চ তেমন কিছু থাকেও না। এইসব করতে দিন তিনেক যথেষ্ট হিমশিম খেতে হল। জানা গেল, ছোখরা বেহালার সুকল্যাণ দত্ত, মেডিকেল ছাত্র, ফোর্থ ইয়ার।

এই তিন দিন আমি মাধুকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, করা উচিতও হত না। তবে খবরের কাগজে খুনের খবর ছিল। আমি জানি, মাধু ওটা পড়েছে। যদি নাও পড়ে থাকে তবে কলেজে অন্তত আলোচনা শুনেছে। না শুনে বা না জেনে তার উপায় নেই। কিন্তু তার মুখে বা চোখে সেরকম কোনও বিভ্রান্তি, শোক বা বিস্ময়ের ছাপ দেখা গেল না।

মজা হল, আমিও চিঠিটা খুলে পড়েনি। সুকল্যাণ দত্তের চিঠিটা আমি আমার নিজস্ব টেবিলের লকারে চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ খুনই কাঁচা হাতের কাজ। তা বলে খুনি যে সবসময়েই ধরা পড়বে তার কোনও মানে নেই। এক কথা, সাক্ষীসাবুদ পাওয়া শক্ত, দ্বিতীয় কথা, রাজনৈতিক খুন হলে কিছু করার থাকে না। তিন নম্বর কথা হল, খুনিদের মোটিভ সবসময় বোঝা মুশকিল। এ ছাড়াও হাজারও অসুবিধে আছে। সব বলা সম্ভব নয়। তবু সুকল্যাণ দত্তের ব্যাপারে আমি পুলিশ বলে নয়, একজন শঙ্কিত-হৃদয় বাবা হিসেবেও একটু বেশি উদবিগ্ন হয়ে পড়লাম। মাধু মাত্রই ডাক্তারি পড়তে শুরু করেছে, সুতরাং ফোর্থ ইয়ারের কোনও ছাত্রের সঙ্গে ওর তেমন গাঢ় প্রেম হওয়ার কথাই নয়। ওর নিরুদ্বেগ ভাবও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তবু সুকল্যাণের পকেটে পাওয়া চিঠিটা আমাকে অস্বস্তি দিচ্ছিল।

চমক মেয়েমানুষ হলেও খুব আধুনিক মেয়েমানুষ। শক্ত ধাঁচের। তাকে কথাটা বলা যায়। একা আমি সমস্যাটা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম। সুকল্যাণ দত্তর শোকগ্রস্ত বাবা মা ভাই বোন ও বন্ধুদের আমি জেরায় জেরায় জর্জরিত করে দিয়েছি। খুনের ক্লুও পাওয়া গেছে। কিন্তু মোটিভ বোঝা যাচ্ছে না, খুন করেছে কয়েকজন পেশাদার গুন্ডা। আমি তাদের ভালোই চিনি। তারাও আমাকে চেনে। গা ঢাকা দিয়ে আছে। তবে একজনকে আমি কলাবাগানের বস্তি থেকে ধরে আনলাম। সে কবুল করল, কালো একজনের কাছে টাকা খেয়ে খুনটা অ্যারেনজ করেছে, কিন্তু পারটিকে সে চেনে না। কালো হরিদ্বার পালিয়েছে।

সুতরাং অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু অপেক্ষা করাটা যে দারুণ শক্ত ব্যাপার তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। উত্তরপ্রদেশের পুলিশকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে। তারা এখনও কালোর হদিশ দিতে পারেনি। আর কালো যে হরিদ্বারেই আছে এমন নয়। এদের আমি খুব ভালো চিনি। মারডার করলে এরা গ্রেফতার এড়াতে হাজারও সাবধানতা নেয়।

কেস আদালতে উঠলে সুকল্যাণের প্রসঙ্গে মাধুর নামও এসে পড়ে কিনা তাই নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা। যে পার্টি সুকল্যাণকে খুন করিয়েছে সে আবার মাধুর প্রেমিক নয়তো! এ কি প্রেমের ত্রিভুজ?

একদিন মাঝরাতে শোয়ার ঘরের কবাট শক্ত করে এঁটে কথাটা চমককে বললাম।

কঠোর মুখ করে সবটা শুনে চমক বলল, চিঠিটা দেখি।

চিঠি রেডি ছিল। বের করে দিলাম।

চমক অবাক হয়ে বলল, এখনও খোলোনি?

সাহস পাচ্ছিলাম না। তুমি খোলো।

চমক খুলল এবং পড়তে লাগল। বেশ বড় চিঠি। একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের দু পৃষ্ঠা। অনেক সময় নিয়ে চমক পড়ল।

কী লিখেছে?

তুমি পড়ে দেখ। বলে চিঠিটা ফের আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চমক ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুখে ক্লিনজিং ক্রিম মাখতে লাগল।

চিঠিটা খুলে আমি একটু থমকে যাই। আগাগোড়া ইংরিজি এবং অত্যন্ত জড়ানো অক্ষরে লেখা। ডাক্তারের হাতের লেখা সাধারণত খারাপ হয় জানি, কিন্তু হবু ডাক্তারের হাতের লেখাও যে এত বিদঘুটে হতে পারে তা জানা ছিল না।

আমি কিছুক্ষণ চেষ্টা করে 'সুইট মাধবী ডারলিং...' পড়তে পারলাম। একটু হতভম্ব হয়ে চমকের দিকে চেয়ে বললাম, আমি তো পড়তেই পারছি না। তুমি কিছু বুঝলে?

চমক মুখটা আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, রোজ আমাকে হরেকরকম হাতের লেখা দেখতে হয়।

তা মানে তুমি বুঝতে পেরেছো?

হ্যাঁ। তোমার বুঝে কাজ নেই।

তার মানে?

ওতে যা লেখা আছে তা জানলে তোমার রাতে ঘুম হবে না।

আমি একটু রেগে গিয়ে বলি, ওসব কী বলছ? আমি পুলিশ, রহস্যটা আমাকে সমাধান করতেই হবে। চিঠিতে কোনও ক্লু থাকলে সেটা আমার জানা দরকার।

চমক মৃদু স্বরে বলল, চেঁচিও না; তবে প্রথমেই বলি, চিঠিটার সঙ্গে খুনের এমনিতে কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু চিঠিটা সরিয়ে ফেলে তুমি বুদ্ধিমানের কাজ করেছো। ভয়ংকর অশ্লীল চিঠি।

কতটা।

যতটা হতে পারে।

ওরা কি সেকসুয়ালি...?

বহুবার। চিঠিতে তার একটা বিবরণ আছে।

আর কিছু?

হ্যাঁ। তোমার মেয়ের এটা প্রথম ঘটনা নয়।

বলো কী? এসব মাধু শিখল কোত্থেকে?

কী করে বলব?

আরও ছেলের সঙ্গে?

দুজনের তো নাম পাচ্ছি। দেবাশিস আর সমুদ্র।

দুজনকে অ্যারেস্ট করা যায়?

নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু মাধুরীর নাম গোপন রেখে নিশ্চয়ই নয়।

চিঠিটার দিকে আমি ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকি। একটা আশঙ্কা আমার ছিল যে, চিঠিটা খুব নিরাপদ নয়। কিন্তু এটা যে এরকম পত্রবোমা তাও আমি আশা করিনি। আমার

শরীরের ভিতরটা এমন অস্থির করতে লাগল যে ভয় হল আমার এক্ষুনি একটা স্ট্রোক হবে।

চমক ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিম মাখতে মাখতে খুব নির্বিকার গলায় বলল, মেনে নাও।

কী মেনে নেবো?

ব্যাপারটা।

কোন ব্যাপারটা?

তোমার মেয়ের ব্যাপারটা। তুমি খুব শকড হয়েছো বুঝতে পারছি।

আমার মাথাটা কেমন করছে। টলমল টলমল। চমক কী বলছে আমি তা সঠিক বুঝতে পারছি না। শুধু ওর প্রতিধ্বনি করে যাচ্ছি। আমার কোনও প্রশ্ন নেই। একটা ধাঁধা আছে। আমি আবার ওর প্রতিধ্বনি করে বলি, শকড:?

চমক আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। পাতলা নাইলনের অতিস্বচ্ছ নাইটি পরা, সুগন্ধী, সুদৃশ্য অভিজাত ও যৌন আবেদনে সমৃদ্ধা মহিলা। খুবই কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর আমার মাথাটা নরম বুকের মাঝখানটায় চেপে ধরে বলল, ওরকম করছ কেন? একটু স্থির হও।

আমি কি অস্থির?

তোমাকে ভীষণ অ্যাজিটেটেড দেখাচ্ছে। চল্লিশ পার হয়েছো, এখন খুব মাথা ঠান্ডা রাখবে। অত ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে?

কী বলছো বুঝতে পারছি না।

চলো শোবো চলো। একটা ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে নাও।

আমি মাথা নাড়লাম, না। মাথার ভিতরটা গোলমাল লাগছে; আমাকে একটু ভাবতে দাও।

আমিও তো ওর মা। দেখ, আমি খুব ঘাবড়ে গেছি?

না। তবে আমার সব ওলটপালট হয়ে গেছে।

কীরকম ওলটপালট?

আমি যে মাধুকে ভীষণ ভালোবাসি। ভীষণ।

ও মা! বাসবে না কেন? তুমি তো ওর বাবা।

কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ চমক। আমি যে ওর বাবা সেটা আজ ভালো করে ভাবতে দাও। আমি একটু ছাদে যাবো।

ছাদে! সর্বনাশ! কক্ষনো নয়! এসো, আমার সঙ্গে শোও। আমি তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি।

চমকের দিকে চেয়ে আমার কেমন একটা ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠল; ওই শরীর দেখানো নাইটি এবং তার স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠা কাম্য শরীর আমার অস্পৃশ্য মনে হচ্ছিল। আমি একটা 'ওয়াক' তুলতে গিয়ে সামাল দিই। মাথা নেড়ে বলি, না, ছাদে যাবো। খোলা হাওয়ায়।

চমক অবশ্য যেতে দিল না। তার হয়তো ভয় হল, মানসিক ভারসাম্যের অভাবে এই পরিস্থিতিতে আমি আটতলার ছাদ থেকে নীচে লাফিয়েও পড়তে পারি। তার বদলে নিরাপদ গ্রিল দেওয়া দক্ষিণমুখো বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসা অনেক ভালো বলে সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

আমি তাই বসলাম। ভিতরের ঘরে মাধু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চমক হাই তুলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে স্ত্রীর কর্তব্য হিসেবে আমার পাশে আর একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে রইল। তার এই নৈকট্য আমার কাছে খুব অভিপ্রেত নয়, কিন্তু আমি কিছু বললামও না।

চমক ছেলেভুলোনোর কায়দায় বলল, এ যুগটা তো অন্যরকম। ঠিক আমাদের মতো নয়। এসব মেনে নিতে হবে।

আমার মাথা ঠান্ডা হয়নি। আমি চমকের তত্ব বুঝতেও পারছি না। শুধু বললাম, তাই নাকি?

একটু চুপ করে থেকে চমক আচমকা বলল, আমরাও তো ভালো নই।

কথাটা স্বীকারোক্তি হিসেবে খুবই চমৎকার হত যদি তার সঙ্গে গভীর অনুশোচনা মিশে থাকত। কিন্তু তা তো নয়। চমকের এই বিবৃতি নিতান্তই একটি স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাকট। অর্থাৎ, আমরা খারাপ তাই আমাদের মেয়ে ওরকম হয়েছে। আমরা খারাপই থেকে যাবো। সুতরাং মেয়ের ব্যাপারটাও মেনে নাও।

আমি খারাপ না ভালো তার বিচার করার মতো যুক্তিবোধ আমার ভিতরে কাজ করছিল না। মাধু ফুলের মতো পবিত্র মাধু--যে হাঁ করলে এখনও তার মুখ থেকে আমি শৈশবের গন্ধ পাই—সে...।

চিঠিটার কথা তোমাকে বলে বোধহয় ভুল করলাম। হাতের লেখা পড়তে পারছিলে না সেটাই ভালো ছিল।

তাতে আমার কাছে ব্যাপারটা অজানা থাকত মাত্র। কিন্তু সত্য তো আর পালটাত না।

চমক একটু ঝুঁকে আমার দিকে নিবিড়ভাবে চেয়ে বলল, তার মানে কি তুমি এখন সত্যটাকে উলটে দিতে চাও?

চাইলে? আমি প্রশ্ন তুলি।

সর্বনাশ! ও কাজ করতে যেও না। যদি শাসন করতে যাও মেয়ে একদম বিগড়ে যাবে।

বিগড়ে যাবে?

এখন তবু তোমার সঙ্গে এক ছাদের তলায় বাস করছে। কিছু বললে সটান বেরিয়ে গিয়ে কোনও ছেলেবন্ধুর রুমমেট হয়ে থাকবে। দরকার কী? আমরা না জানার ভান করলেই হয়।

তুমি ওটা সমর্থন করছ?

ঠিক করছি না। আমার মতো একজন বা দুজন লাভার থাকা খারাপ কিছু নয়। ও একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে।

একটু নয় সাঙঘাতিক।

ঠিক আছে। তুমি কিছু বলতে যেও না। আমি বুঝিয়ে বলবখন।

বুঝিয়ে বলবে! বুঝিয়ে বলবে! আমি বিড়বিড় করতে থাকি।

লক্ষ্মীটি নিজে কিছু করতে যেও না। তুমি মাধুকে একটুও বোঝো না। যদি বুঝতে—

আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠি, কিন্তু আমি বুঝতে চাই—

চমকের সুগন্ধী নরম হাত আমার মুখ চেপে ধরল।

কী জানি কেন চমকের দেহ আজ গরম, রক্ত টগবগ করছে; হাত সরিয়ে সে তার ঈষৎ ভেজা ঠোঁট চেপে ধরল আমার ঠোঁটে। আমার মনে হল একটা বিকট জোঁক আমাকে শুষে নিচ্ছে।

আমি উঠে পড়লাম। আবার বসলাম। বললাম, তুমি শুতে যাও।

চমক আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আজ তুমি আমাকে নাও।

না।

না কেন?

আমি রাগের স্বরে বললাম, তোমার এই পরিস্থিতিতে সেক্স জাগছে কী করে? আশ্চর্য।

জাগে। তুমি বুঝবে না। চলো।

না। তুমি যাও।

চমক একটা তীব্র শ্বাস ফেলল। তারপর উঠে গেল।

আমি একা। চুপচাপ নিজের মাথাটা চেপে ধরে বসে আছি। আমি কী করব? চওড়া চামড়ার বেল্ট দিয়ে আমি মাধুকে আগাপাশতলা পেটাতে পারি। গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি। সব পারি, কিন্তু সে যেন নিজেকেই নিজের নিষ্পেষণ। আমার মাধু--আমার ফুলের মতো মাধু--তার ভিতরে এই কীট এল কোথা থেকে? এল কেন?

অনেকক্ষণ বাদে যখন নিশ্চিত বুঝলাম চমক ঘুমিয়েছে তখন আমি নিঃশব্দে মাধুর ঘরে গিয়ে ঢুকি।

ঘরে একটা নীল আলো জ্বলে রোজ। আজ সেটা নেভানো। আমি ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। অন্ধকার? না, খুব একটা অন্ধকার নয়;

বাইরে আলো আসছে আবছা।

ডাকতে হল না। মাধু খুব নীচু স্বরে বলল, বাবা!

আমি শব্দ করলাম না।

মাধু বাতাসের মতো মৃদু শব্দে বলল, আমি কাঁদছি বাবা।

কেন কাঁদছো?

তোমার জন্য।

আমার জন্য?

শুধু তোমার জন্য। তুমি যে কত দূরে! কত দূরে। মনে হয় যেন বৈতরণীর ওপাশে।

তার মানে কী মাধু?

আমার মনে হয় তুমি বা মা--তোমারা যদি মরে যাও তাহলে আমার কান্না পাবে না। ভাবলে ভারি অস্বস্তি হয়।

আমি শিউরে উঠি।

আমার ভিতরটা বড় ঠান্ডা। ভীষণ কোল্ড ব্লাডেড। সুকল্যাণের জন্য আমার একটুও কষ্ট হয়নি। কারও জন্যই হয় না।

মাধু, তুমি কি জেনারেশন গ্যাপের কথা বলছ?

না, না। আমি বলতে চাই, নতুন এক প্রজন্মের কথা। তুমি বুঝবে না!

বুঝব না?

না, কিছুতেই না। আমরা মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা মানুষের মতো। রোবটের মতো।

তুমি কে মাধু?

আমি কারও মেয়ে নই, কারও বউ নই, আমি কারও মা হবো না। আমি মাধু, শুধু মাধু। তুমি যাও। আমি সহজে কাঁদি না, কত কষ্টে আজ চোখে একটু জল এনেছি; মুডটা নষ্ট করে দিও না। যাও।

আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসি। আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ছাদের দিকে উঠতে থাকি। আমি জানি ছাদ থেকে আমি সিঁড়ি দিয়ে বা লিফটে করে নামব না।

ট্রিলজি

১. তোমার চোখ

‘I am Lazarous,

come from the dead.

Come to tell you all,

I shall tell you all.'

তোমার চোখের মধ্যে কবে ডুবে মরলাম, ঠিক বলতে পারি না।

কিন্তু মরার পর রোজ আমি নাড়ি দেখি। চলছে না। শ্বাস দেখি। বন্ধ। বুকে হাত রাখি। ধুকধুকুনি নেই। রোজ এই কাণ্ড।

চোখের রহস্য কোনওদিন ভেদ হওয়ার নয়।

তোমার নামটি কী ছিল বলো তো! জানি না। জিগ্যেস করা হয়নি। আলাপও তো হল না এ জীবনে। একবার দেখা হয়েছিল মাত্র। আর নয়।

তবু আমি তোমার একটা নাম দিয়ে রেখেছি সেই কবে থেকে। মনোরমা। সেই সময়ে, যখন তোমার সঙ্গে দেখা, আমার হাতে ছিল বঙ্কিমের মৃণালিনী। পড়েছো? পড়ে দেখো, মনোরমা ঠিক মর্তের মানবী নয়, দেবীও নয়। ওই একরকম। যাকে চেনা যায়, আবার যায়ও না।

তখন আমার কৈশোরকাল, তুমিও কিশোরী। আমিনগাঁও ফেরিঘাট থেকে স্টিমার ছেড়ে গেছে, আমরা কিছু বিলম্বিত যাত্রী একটা নৌকোয় ব্রহ্মপুত্রের বিক্ষুব্ধ স্রোত পাড়ি দিচ্ছিলাম, মনে পড়ে? পড়বে না জানি। কত বছর কেটে গেছে! আরও কতবার কত খেয়া পেরিয়েছো তুমি। আমিও। সব পারাপার মনে কি থাকে? শুধু সেই নৌকোয় তুমি ছিলে বলে আমার আজও চোখ বুজলেই সেই স্রোত মনে পড়ে। আমিনগাঁও আর পাণ্ডু--দুই দিকেই পাহাড় ও পাথুরে তীরভূমি, গৌহাটির কাছে মোড় ফিরে ব্রহ্মপুত্র সেই সংকীর্ণ খাতে আর একটা মোচড় দিয়েছে শরীরে। তাই বাঁকা স্রোত সেইখানে আবর্ত ও ফেনায় ভয়ংকর।

আকাশ ছিল মাথার ওপর। বর্ষণ শেষ মেঘমুক্ত ধোয়াকাচা নীলবর্ণ। ছিল সুস্পষ্ট কালচে সবুজ রঙের পাহাড়ের শ্রেণি। দুদিকেই। যাত্রীর ভারে মন্থর নৌকো একটু উজানে গিয়ে কোনাকুনি গা ছেড়ে দেবে শুধুমাত্র হালের জেরে ভাটিয়ে গিয়ে ঠেকবে পাণ্ডুর ঘাটে। এই ছিল নিয়ম। বাঁদিকে আমিনগাঁওয়ের সেই টিলাটা দেখেছিলে তুমি? তার ওপর দুটো মস্ত মস্ত খোড়ো বাংলো-বাড়ি! মনে নেই? ওর একটাতে থাকতাম আমরা।

তোমাকে দেখলাম ঊর্ধ্বমুখ। ভারি অবাক চাউনি চোখে, মুখখানা অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। টুলটুল করছে মুখখানা। তুমি সুন্দর ছিলে কিনা তা ওই বয়সের অনভিজ্ঞ চোখে তো বুঝতে পারিনি। আজও সেই ধন্দ রয়ে গেছে। সুন্দর ছিলে কি? আমি তোমার সবটুকু তো দেখিওনি ভালো করে। শুধু দুখানা অবাক চোখ।

ওই উঁচু টিলার ওপরকার আকাশ দেখতে-দেখতে চোখ দুখানা নামল ধীরে-ধীরে তখনও আবিলতা আসেনি আমাদের কারও চোখেই। নৌকোর দুই ধারে বসেছিলাম আমরা দুজন। কানার ওপর। বাঁশের ঠেকানো ছিল পিছনে। দুজনের মাঝখানে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি মানুষও ছিল অনেক। তাদের আমি লক্ষই করিনি। তোমার দুখানা চোখ নেমে এসে খঞ্জনার মতো চারদিকে নেচে নেচে সব কিছু দেখছিল।

চঞ্চল সেই খঞ্জনা স্থির হল আমার চোখের ওপর এসে।

অনন্ত মুহূর্ত কাকে বলে সেইদিন, সেইক্ষণে জেনেছিলাম। বুক ব্যথিয়ে উঠল কয়েক শতাব্দীর পুঞ্জীভূত বিরহ-বেদনার শেষে। এক গুহামানুষের জন্মে শুরু হয়েছিল যে অন্বেষণ তা হাজার হাজার বছরের জন্মও মৃত্যু, সভ্যতার অনেক উত্থান ও পতন, অনেক শ্রম ও অধ্যবসায়ের পর শেষ হল বুঝি! কিশোর বয়সের বোধ তো তেমন গভীর নয়। মনে কেবল অস্পষ্ট সব শব্দের আনাগোনা, তবু আমি ঠিকই শুনতে পেলাম এক দূরাগত দামামার ধ্বনি। কোথায় যেন যুদ্ধ চলছে। পতন হচ্ছে রাজ্যের। এক বিজয়ী ঘোড়সওয়ার শত্রুর রক্তে রাঙা বল্লম উঁচিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে দিগ্বিজয়ে।

মনোরমা, তুমি চোখ ফেরাওনি। আজ আবদ্ধ এক চোখে সেই ধূসর অতীতের দিকে চেয়ে আছি। তুমি চোখ ফেরাওনি বলে ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে। এক কাঙাল কিশোরকে অপমান করোনি, আহত করোনি তার অভিমান। তোমাকে ধন্যবাদ।

মানুষ কিছুতেই দেখতে পায় না নিজের মুখ। আমি সারাজীবন ধরে চেষ্টা করেছি সেই কয়েক মুহূর্তে আমার মুখশ্রীর অপার্থিবতা লক্ষ করতে। বয়ঃসন্ধির সেটা বড় দুঃসময় জীবনে। হঠাৎ লম্বা হয়ে ওঠা শরীরে তেমন মাংস লাগেনি, হনুর হাড় আর কণ্ঠা দেখা যায়। বড়রা সন্দেহের চোখে তাকায়, ছোটরাও দলে নিতে চায় না। নিজেকে কেমন যেন ঘেন্না হয়। সেই সময়টাতেই মানুষের সবচেয়ে বেশি আদর ভালোবাসার প্রয়োজন। কিন্তু হায় বয়ঃসন্ধিই তার সবচেয়ে খরার সময়।

কিন্তু ওই কয়েক মুহূর্তে আমার খরার আকাশ তুমি ভরে দিয়েছিলে বাদল-মেঘে। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! আমার কোশে কোশে সঞ্চারিত হয়ে গেল প্রাণবান জল। মনে হল, আমার মুখ এক অলৌকিক দীপ্তি বিকীরণ করছে।

সেই আমার মরে যাওয়ার আগে শেষ জ্বলে ওঠা।

পাণ্ডুর ঘাটে নৌকো কখন ভিড়ল তা জানি না। কখন এক ভিড় লোক যে যার গন্তব্যে চলে গেল টেরও পাইনি। শুধু ঢালু জমি বেয়ে চলে যেতে দেখেছিলাম তোমাকে। একদম সমভূমির সীমানায় উঠে তুমি আর একবার ফিরে দেখেছিলে আমাকে।

কী দেখেছিলে জানি। ব্রহ্মপুত্রের রুপোলি জলে শূন্য এক নৌকোর খোলে পড়ে আছে প্রাণহীন কিশোরের দেহ।

অন্ধকার ঘরে আমার স্ত্রী হারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল। চারদিকে মশার ডাক। আমি এখন রুটি আর তরকারি খাবো একটু। তারপর আমার ছেলেমেয়েদের পড়তে বসাবো। সকাল হবে। রাত হবে। কাজে যাওয়া। কাজ থেকে ফেরা। এইমতো দিন যায়। একদিন সময়ের চাকা তার খাঁজকাটা দাঁতে তুলে নিয়ে যাবে আমাকে।

ভেবো না, দুঃখ করছি। তা তো নয়। আমি তো এই মানুষটা নই। সেই যে তোমার চোখ ক্ষণকালের জন্য আমাকে বাঁচিয়ে তুলে মেরে ফেলে গেল, সেই থেকে বন্য এক প্রাগৈতিহাসিক গুহামানব বেরিয়ে পড়েছে তার মেয়েমানুষকে খুঁজতে। জন্ম জন্ম পার হবে সে, নগর ধ্বংস করবে, তছনছ করে দেবে ইতিহাস।

এখানে হারিকেনের আলোয় যে রুটি-তরকারি খায় রোজ সন্ধ্যাবেলা সে মরে গেছে কবে।

২. ভূতের গল্প

মল্লিকা সেন! মল্লিকা সেন!

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর মজা খালের পাশে অত্যন্ত ঘন কাঁটাঝোপের ভিতরে অবস্থিত শ্যাওড়া গাছটি সামান্য দুলে উঠল। একটা বিদঘুটে হাওয়া দিল উত্তর দিক থেকে। সন্ধ্যার আবহাওয়া আরও গাঢ় হল। কুয়াশা জমাট বাঁধতে লাগল চারপাশে। আমি একা!

হাওয়ার শব্দের ভিতর থেকে একটা ফিসফিস শুনতে পাই, আপনি আমাকে ডাকছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার গল্প কি সবাই শুনতে চাইছে?

চাইছে।

আমাকে খুন করেছিল আমার স্বামী। এ খবর তো সব কাগজে বেরিয়েছে। আপনি নতুন কী জানতে চাইছেন?

আজকাল স্বামীরা প্রায়ই স্ত্রীদের খুন করে থাকেন মল্লিকা সেন। গল্পটা বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে। আমি একটু নতুন অ্যাংগেল চাইচি।

এ গল্পের নতুন অ্যাংগেল কিছু নেই। পুরুষশাসিত সমাজে এরকমই বারবার ঘটবে। আপনাদের কাগজে আমার খবরটার হেডিং কী ছিল বলুন তো!

মল্লিকা ঝরে গেল।

বাঃ। বেশ হেডিং। এরকম কত জুঁই, মল্লিকা, বেলি ঝরে যাবে তার কি হিসেব আছে!

অর্জুন সেন লোকটা সম্পর্কে আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তেমন খারাপ লোক নয়। কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। অ্যাজ এ ইয়ংম্যান লোকটা ছিল দারুণ ব্রাইট, অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এবং আড্ডাবাজ। লোকের উপকার-টুপকারও করত! এসব কি সত্যি?

বাজে কথা। ও ছিল হৃদয়হীন নিষ্ঠুর, কতর্ব্য-উদাসীন।

পাড়া-প্রতিবেশীরা অনেকেই বলেছে, আপনাদের সংসারে শান্তি ছিল না ঠিকই কিন্তু সেইজন্য দায়ী অর্জুন সেন নন।

আপনারা কি পাড়া-প্রতিবেশীদের বিশ্বাস করছেন?

কাকে বিশ্বাস করব তা বুঝতে পারছি না।

আমি, যখন ভিকটিম তখন আমার চেয়ে সত্যি কথা আপনাকে কে বলবে?

তা অবশ্য ঠিক। তবে সেনবাবু যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে সে বলেছে, আমি বিয়ের পর থেকেই সব স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলতে থাকি। প্রথমে আমার স্ত্রী বন্ধুদের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করেন, আড্ডা বন্ধ করে দেন, বাইরে বেরোনোর ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে আমার যৌথ পরিবার থেকেও নানা প্ররোচনা দিয়ে উনি বের করে আনেন। যোধপুর পার্কের পৈতৃক বাড়ি থেকে আমি চলে যাই টালিগঞ্জের ভাড়াটে বাসায়। আমার একটি মেয়ে হয়। আমি তাকে আকণ্ঠ ভালোবেসে ফেলি। আমার সেই দুর্বলতা লক্ষ করে আমার স্ত্রী তার সব দায়-দায়িত্ব আমার ঘাড়ে গছাতে শুরু করেন অত্যন্ত সুকৌশলে। এমনকী রাত্রিবেলা আমার বাচ্চা বিছানায় পেচ্ছাপ করলেও কাঁথা বদলানোর জন্য উনি উঠতেন না। মেয়ে কাঁদত। সুতরাং আমাকেই সে কাজের ভার নিতে হয়। ক্রমে আমি মেয়েকে ঝিনুক বাটিতে দুধ খাওয়ানো পর্যন্ত শিখে যাই।

বাপেরা কি কিছুই করবে না ছেলেমেয়ের জন্য? শুধু মেয়েরাই করবে? বাচ্চা কি তার একার?

তা অবশ্য নয়।

শুনুন, আমি সদ্য খুন হয়েছি। আমাকে খুন করেছে ওই বদমাশ, লম্পট হৃদয়হীন লোকটা। বাংলার নারীসমাজ ওর ওপর ভীষণ খেপে আছে। আমার ভাবমূর্তি এখন খুবই উজ্জ্বল। এসময়ে ওই লোকটার উলটো-পালটা বিবৃতিকে বেশি কভারেজ দিয়ে আপনারা আমার ভাবমূর্তিটা দয়া করে নষ্ট করবেন না।

ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে নতুন একটা অ্যাংগেল দিন।

বললাম তো, নতুন অ্যাংগেল বলে কিছু নেই। তবে আমি স্বীকার করছি, অর্জুন সেন নামক ওই খুনি লোকটা তার মেয়েকে খুবই ভালোবাসত।

এবং মেয়েটিও তাকে?

হ্যাঁ। আমার মেয়েও বাপের খুব ন্যাওটা ছিল। কিন্তু সে আমাকেও ভালোবাসত।

আপনাদের ছোট পরিবারে একটা লাভ ট্র্যাংগল ছিল, একথা কি বলা যায়?

নাঃ নাঃ। তা ঠিক নয়। আমি হিংসে করতাম না।

কিন্তু অর্জুন সেন বলছে, মেয়ে একটু বড় হওয়ার পর আপনি নানা সময়ে তার কাছে স্বামী সম্পর্কে এমন সব কথা বলতেন যাতে ওই শিশুর মন তার বাপের ওপর বিষিয়ে যায়।

মিথ্যে কথা! এসব খবরদার লিখবেন না। আমি মেয়েকে যা বলতাম তা একটুও বানিয়ে বলতাম না। ওর বাপ সম্পর্কে ওর একটা ভুল ধরনের উঁচু ধারণা তৈরি হচ্ছিল। সত্যের খাতিরে আমি সেই ভুলটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করতাম মাত্র।

আপনি কি সে কাজে সফল হয়েছিলেন?

খানিকটা।

আমি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে সংকোচের সঙ্গে বললাম, আপনাদের সেক্স লাইফ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

মল্লিকা সেনের প্রেতাত্মা খিলখিল করে হেসে ওঠে, সেক্স বলে ওর কিছু ছিল নাকি?

ছিল না?

নপুংসক বলা যায়। সেইটেই আমাদের অশান্তির আর একটা কারণ। এ ব্যাপারটার জন্যও আপনি অর্জুন সেনকেই দায়ী করছেন তো?

পুরোপুরি।

আপনার কোনও রকম শীতলতা ছিল না তো!

মোটেই নয়।

অর্জুন সেন বলেছে, সেক্সের সঙ্গে সাইকোলজির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কোনও পুরুষের পক্ষেই স্ত্রীর কাছে অপমানিত হওয়ার পর তার সঙ্গে উপগমন সম্ভব নয়। আপনি কি ওকে প্রায়ই অপমান করতেন?

মোটেই নয়। অক্ষমরাই ওসব অজুহাত দেয়।

কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা বলছে, রোজ রাতে আপনাদের তুমুল ঝগড়া হত।

তাতে ওদের কী?

না, বলছিলাম ঝগড়ার ফলে অর্জুন সেন অপমানিত বোধ করত এবং তার ফিজিক্যাল আর্জ নষ্ট হয়ে যেত, এটা পাঠকরা কেমন খাবে?

প্লিজ ওসব পয়েন্ট তুলবেন না। অশ্লীল।

অশ্লীলতায় একটু আঁশটে গন্ধ থাকলে অ্যাংগেলটা পালটে যাবে।

যাবে। কিন্তু তাতে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। প্লিজ

খুনটা তাহলে অর্জুন সেনই করে?

তবে আর কে?

না, মানে এ ব্যাপারটা অর্জুন স্বীকার করেনি। সে বলেছে, আপনি নিজের গায়ে নিজেই আগুন লাগিয়েছিলেন।

তাতে কি? ও তো ছুটে এসে আগুন নেভাতে পারত!

বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অর্জুন সেন দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করে প্রথমটায় পারেনি। যখন ভাঙে তখন আপনি পুড়ে গেছেন।

সে না হয় হল, কিন্তু প্ররোচনা? নিষ্ঠুরতা? খুন কি শুধু নিজের হাতেই করতে হয়? মনস্তাত্ত্বিক চাপ নেই?

অর্জুন সেনও অনেকটা এইরকমই একটা কথা বলছে।

কী কথা?

বলছে, ফিজিক্যাল ডেথটা তেমন কিছু নয়। আপনি নিজের মরার অনেক আগেই নাকি অর্জুন সেনকে ওই যে কী বললেন, মনস্তাত্ত্বিক চাপে মেরে ফেলেছিলেন।

বলেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনিও তাই লিখবেন?

ভাবছি। অ্যাংগেলটা বেশ নতুন।

মোটেই তা নয়। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। আগুনটা ও নিজের হাতে লাগায়নি ঠিকই, কিন্তু সারাজীবন আমি ওর জন্যই জ্বলে পুড়ে মরেছি। বিশ্বাস করুন। আমাকে ওই খুন করেছে। আমি চাই ওর ফাঁসি হোক।

হলে?

ওকে আমি কাছে পেতে চাই।

কেন?

মল্লিকা লাজুক গলায় বললেন, আহা, বোঝেন না যেন!

৩. আমি ও সে

আমি আর সে পাশাপাশি হাঁটছিলাম, ডানদিকে কালো সমুদ্র। মেঘে ঢাকা আকাশ। প্রলয়ের আগের মতো থমথমে চারধার। উত্তাল ঢেউ এসে বেলাভূমিতে আমাদের পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে।

সে জিজ্ঞেস করে, জীবনে তোমার সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত কোনটি?

আমি বললাম, কত! কোনটার কথা বলব?

একটার কথা বলো। একটা মুহূর্তের কথা।

সে কেমন সুখ?

যে সুখের সঙ্গে কামনা নেই, লোভ নেই, অকারণ যে আনন্দ। আমি শিশুবেলায় একটা পিঁপড়েকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলি। আমার বাবা ছিলেন দয়ালু মানুষ। দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন, ছোট ছোট প্রাণীরা নিজেদের রক্ষা করতে জানে না। ওদের মারতে নেই। তখন সেই মরা পিঁপড়ের জন্য আমি কাঁদতে লাগলাম। বাবা সেই পিঁপড়েটার গায়ে মুখের ভাপ দিলেন। পিঁপড়েটা--আশ্চর্য—বেঁচে উঠল। সেই আনন্দটার কথা আমার খুব মনে পড়ে।

না। ওটা সেই আনন্দ নয়। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও তা থেকে মুক্তি—এ তো স্বচ্ছ কারণ। এরকম সুখের কথা বলিনি।

প্রথম চুম্বনের কথা বলি? একটি যুবতির চোখ কেমন মায়াবী হয়ে গেল! ঠোঁটে ঠোঁট—সে এক আশ্চর্য স্বাদ। আমাদের ঘিরে বেজে যাচ্ছিল স্বর্গের বাজনা। এক অলৌকিক লিফট মর্তের ধুলো থেকে আমাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছিল মেঘের রাজ্যে।

স্বাভাবিক, নারী ও পুরুষ তো এর জন্যই সৃষ্টি। এ নয়।

শোনো। এক সুখের গল্প বলি তবে। আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিল আমার মা। তার সাঙঘাতিক অসুখ হয়। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেল। সে সময় হঠাৎ কোথা থেকে খবর পেয়ে এল এক হোমিয়োপ্যাথ। এক ডোজ ওষুধ। পরদিন মা যখন চোখ মেলে তাকাল আমার মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে আমি আর কিছু চাই না। সে আনন্দের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কিছু আর ঘটেনি আমার জীবনে।

বুঝলাম। রোগ এবং রোগমুক্তি, প্রিয়জন বিরহ না ঘটা, এসব কারণ থাকলে চলবে না। শুদ্ধ সুখের কথা বলো।

আমার কিছু মনে পড়ছে না।

সমুদ্রের দিকে তাকাও। আদিগন্ত নিজেকে প্রসারিত কর। ভাবো, নিজেকে ভাবো। মনে পড়বে।

[illegible] কণ্ঠে আমি বললাম, আদিগন্ত প্রসারিত করতে পারি তত বড় নয় আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব।

তবু ভাবো সমুদ্রের ঢেউ ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমার পা। আকাশকে দেখ। কী বিশাল ব্যাপ্তি দিয়ে ঢেকে আছে তোমাকে। কিছু মনে পড়ছে না তোমার!

পড়ছে।

কী?

সে অনেকদিন আগেকার কথা। আমি একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম। আসলে ঠিক হারিয়ে যাওয়া নয়। আমার বাবা এক জঙ্গলে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যান। বাবা গাছতলায় বসে ছবি আঁকছিলেন। আমি এক পা দু পা করে চলতে চলতে হঠাৎ একসময়ে টের

পেলাম চারদিকে এক দুর্ভেদ্য অরণ্য ঘিরে ধরেছে আমাকে। বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার পথ আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সেই বয়সে হারিয়ে হাওয়ার মতো মর্মান্তিক আর কিছু নেই। চেনা পৃথিবীর গণ্ডী ছেড়ে সে যেন অকূল দরিয়ায় পড়ে যাওয়া। সেখানে আছে ভূত প্রেত, ছেলেধরা, দত্যি, দানো, ডাইনি, বুড়ি, সাপ, বাঘ কত কী? আমি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে 'বাবা বাবা' বলে ডাকতে ডাকতে অন্ধের মতো ছুটতে লাগলাম। কতবার পড়লাম, উঠলাম, কেটে ছড়ে গেল হাত পা, সেই সময় আচমকা পাখি ডাকল। ঠিক উলুধ্বনির মতো শব্দ। আমি কান্না ভুলে শুনতে লাগলাম। পাখি ডাকছে। গাছপালায় বাতাসের একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে রঙিন প্রজাপতি। কত ফুল ফুটে আছে চারদিকে। আকাশ কী গভীর নীল! মনে হয়েছিল কই হারাইনি তো!

আজ ব্যথা নেই, বৃষ্টি নেই, বিষণ্ণতা নেই

আমি বেশ ভালো আছি। পায়ের দিককার জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে সকালে। আধশোয়া হয়ে আমি বাইরেটা খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পায়ের কাছে খাটের রেলিং তার ওপাশে জানালা, জানালার ওপাশে বৃষ্টিতে ধোয়া বাগানের গাছপালা। কাল রাতে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ রোদ উঠেছে শান দেওয়া ইস্পাতের মতো ঝকঝকে, আকাশে উপচে পড়ছে নীল। বাগানের রঙে লেগেছে বন্য সবুজের গভীর সমাহার। দিকটা পশ্চিম বলে রোদ আমার মুখে পড়েনি। ভারি ভালো লাগছে, আজ গরম না শীত তা আমি বলতে পারব না। শরীরের ওইসব বোধ আমার হারিয়ে গেছে কবে। যখন তখন পেটের মধ্যে গুমরে ওঠে ব্যথা, যখন মনে পড়ে দুরারোগ্য এবং দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়া এক দুষ্ট ক্ষতে নষ্ট হয়ে গেছে আমার অন্ত্র ও যকৃৎ, পচে যাচ্ছে পাকস্থলী ও মূত্রাশয় তখন আমার আর শীত-গ্রীষ্মের কথা মনে পড়ে না, এমনকী অনেক সুখ-দুঃখের কথাও ভুলে যাই।

আজ আমি ভালো আছি। বাইরের বৃষ্টিতে ধোয়া বাগানটি দেখে মনে হয়, আমি বেশ আছি।

আমার বউ রুমকিকে আপনারা অনেকেই চিনবেন। সে আকাশবাণী থেকে রবীন্দ্র সংগীত গায়। একসময়ে সে চমৎকার কত্থক নাচত, সংস্কৃতি সচেতন যে-কোনও লোকই রুমকিকে চেনে। প্রথম যৌবনে তার বহু পাণিপ্রার্থী ছিল। আর সেই সব প্রার্থীরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণির যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক। লাখপতি, কোটিপতির ছেলে বা প্রথম শ্রেণির ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার, বিশিষ্ট অফিসার, খেলোয়াড়, কে নয়? সুন্দরী এই

নায়িকাটির জন্য ছিল মাথায় মাথায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শেষ অবধি রুমকিকে আমিই পেয়ে যাই।

জীবনে এরকম জয় আমার অনেক। সায়ন মতে আমার রাশি বৃশ্চিক, এই রাশির জাতকেরা জয় করার জন্যই জন্মায়, তারা হারতে ভালোবাসে না। নিজের জীবনটিকে আমি নানারকম ছোটবড় জয়লাভের যোগফল হিসেবে দেখি। ছোটখাটো পরাজয়ও যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু জয়ের সংখ্যাধিক্যে পরাজয় হার মেনেছে।

গত তিনদিন আমার কেটেছে এক ঘোরতর আচ্ছন্নতায়। তিনদিন আগে সন্ধ্যাবেলায় যখন ব্যথাটা শুরু হল তখন আমি পাগলের মতো মাথার চুল ছিঁড়েছি, চিৎকার করেছি। ডাক্তার এসে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে আমি তেমন কিছু টের পেতাম না দিন ও রাত্রি, বাইর ও ঘর। তিন দিন পর আজ বৃষ্টিভেজা সকালে এই জাগ্রত অবস্থাটা আমি খুব উপভোগ করছি।

সকালে রুমকিকে আমি একবার দেখেছি। সে ঘরে এসে গম্ভীরমুখে আমাকে দেখে কুশল প্রশ্ন করে গেল। তার চোখে গভীর বিষাদ ও ঘুমহীনতার ক্লান্তি। শরীর ধীরে ধীরে লাবণ্যহীন হয়ে যাচ্ছে নিরন্তর দুশ্চিন্তায়, বেশ রোগা হয়ে গেছে। তার ওপর সে আজকাল নানা অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম নিতে পারছে না। তার গানের স্কুল প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

রুমকি আজ বলল, এখন তো বেশ ভালো লাগছে? তোমার?

খুব ভালো, অনেকদিন এমন ভালো লাগেনি।

তাহলে আজ আমি গিয়ে গোটা কয়েক ক্লাস নিয়ে আসি। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকদিন ফিরে যাচ্ছে।

যাও।

নয়না রইল, দেখবে।

নয়না কে?

ওমা! নয়না নতুন নাম। কাল থেকে...তাই তো, কাল তোমার জ্ঞান ছিল না। 'জ্ঞান ছিল না' কথাটা আমার কানে খট করে লাগল। একটা অসুখের কাছে আমি হেরে যাচ্ছি ঠিকই। কিন্তু তা বলে সেটা ভাবতে আমার ভালো লাগে না।

বললাম, ভেবো না। আমি ভালো থাকব। কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই ভালো থাকব।

রুমকি আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে চলে গেল।

আগের নার্সদের আমি চিনতাম। বলতে নেই রুমকির চেয়ে তারাই এখন আমার বেশি আপন। পেটের বাঁদিকে লাগানো একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে আমার যাবতীয় মল জমা হয়, তাছাড়া ক্যাথেডার লাগানো রয়েছে তলপেটে, পেচ্ছাপের জন্য। চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, চটপট, দ্রুত উন্নতিশীল, সুদর্শন সেই যুবকটি আজ নানা নল ও থলির জালে জড়িয়ে পড়েছে। রুমকি তো এই লোকটিকে ভালো চেনে না। নার্সরা চেনে। তারা আমার

সব নোংরা পরিষ্কার করে, আমাকে স্নান করায়, খাওয়ায়, ওষুধ দেয়, কখনও-কখনও সান্ত্বনাও দেয়। সেই সব নার্সদের মধ্যে একজন সুরমা। গর্ভবতী মেয়েটি ছেলে বিয়োতে ছুটি চেয়েছিল। বোধহয় আমার আচ্ছন্ন সময়ে সে বেচারি গেছে সন্তান প্রসব করতে। বদলে নতুন একজন বহাল হয়েছে। সুরমার জন্য আমার একটু শূন্যতাবোধ কাজ করছিল। ভারি ভালো ছিল মেয়েটি। কিন্তু এ আমার অকারণ, যুক্তিহীন প্রবণতা। আমি জীবনের যে পর্যায়ে পৌঁছেছি তাতে এ ধরনের প্রবণতা হাস্যকর।

আজ আমার ব্যথাটা নেই। এর চেয়ে বেশি আনন্দের খবর আমার কাছে আর কিছু নয়। আমার দুটি ছেলে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে স্কুলে পড়ে। দুজনেই সাঙঘাতিক ব্রিলিয়ান্ট। দুই ছেলের চিন্তা একসময়ে আমাকে আনন্দ দিত। আজকাল তারাও গৌণ হয়ে গেছে। গৌণ হয়ে গেছে আমার যৌবনকালের অন্যান্য সফলতার আনন্দ। রূপ, রং, রেখা কিছুই আমাকে টানে না, আমার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী এক দুঃশীল অসহনীয় ব্যথা। আমি তার কাছে হেরে যাচ্ছি ক্রমে ক্রমে। দম বন্ধ করা এক রিং-এর মধ্যে আমাদের মরণ-পণ লড়াই চলছে।

ইনজেকশন হাতে যে মেয়েটি ঘরে ঢুকল তার চোখ মুখ কেজো মানুষের মতো নয়। আমার যৌবনকাল ভরে আছে নারী-কুসুমের বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধে। এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা গভীর ও ব্যাপক, তাই স্বপ্নাতুর চোখের এই মেয়েটিকে দেখেই আমার মনে হল, যে-কোনও সময়েই এ আমাকে ভুল ইনজেকশন দিতে পারে, খাইয়ে দিতে পারে উলটোপালটা ওষুধ। সময় মতো পথ্য দিতে বোধহয় ভুল করছে কখনও-কখনও। কিন্তু একটু উৎসাহ দিলেও আমাকে এমন সব রোমান্টিক কথা বলবে যা গুরুতর রুগির মনকেও হালকা করে দিতে পারে।

আমি তাকিয়ে আছি দেখে মেয়েটা চমৎকার সাদা দাঁতে হাসল। বলল, ভয় পাচ্ছেন? একটুও লাগবে না।

আমি ম্লান একটু হাসলাম, ইনজেকশন--তা যন্ত্রণাদায়কই হোক আমি আর ব্যথা বলে কিছু টেরই পাই না। আমার ভিতরকার সেই ব্যথার কথা মেয়েটা জানে না। সেই ব্যথার চেয়ে নিরন্ত ইনজেকশনের ছুঁচ শরীরে ফুটে থাকলেও ভালো।

আমি বললাম, ইনজেকশনকে আমি ভীষণ ভয় পাই যে।

আমিও পাই। কিন্তু দেখবেন আমি এমন নরম হাতে দেবো, টেরই পাবেন না।

আমি শরীরটাকে বালিশের ওপর আর একটু ছেড়ে দিয়ে বললাম, তোমার হাত বুঝি খুব নরম! দেখি।

আমি হাতটা বাড়াতেই মেয়েটা অপ্রস্তুত হল একটু। রুগি হলেও আমার যৌবনকাও তো এখনও যায়নি। এই যুবতি কী করে হাতে হাত দেবে?

তবে সুখের কথা ও নার্স। তাই অস্বস্তিটা কয়েক সেকেন্ডে কাটিযে আবার সাদা রঙের হাসি হেসে বলল, হাত নরমের কথা বলিনি, বলছিলাম, আমি ইনজেকশন খুব নরম করে দিতে পারি।

আমি সামান্য একটু দাপটের গলায় বললাম, হাতটা দাও। আমি দেখব।

ও হাতটা ভয়ে ভয়ে বাড়িয়ে বলল, কী দেখবেন?

দেখব, তোমার নখের নীচে ময়লা আছে কিনা। তুমি ভালো করে হাত ধুয়েছো কিনা। তোমার ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল। এবং তোমার বিয়ে কবে হবে।

মেয়েটা খুব হাসল, তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার বিছানার পাশে একটা টুলে ঝুপ করে বসে পড়ে বলল, কোন হাত?

ডানটাই দাও।

সিরিঞ্জটা হাতবদল করে সে ডান হাতটা আমার হাতে দেয়। খুব চাপা গলায় বলে, উঃ, আপনি যা মজার লোক না।

সুরমা বা অন্যান্য নার্সদের সঙ্গে আমি কখনওই এরকম লঘু ব্যবহার করিনি। গাড়ি, বাড়ি এবং শক্ত রোগওলা সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত মানুষের মতোই যথোচিত ব্যবহার করেছি। কিন্তু আজকের এই রোদের বানে ভেসে যাওয়া সকাল বেলাটায় কোথা থেকে এই স্বপ্নাতুর মেয়েটা এল! ভারি হালকা হালকা লাগছে মন। আমার ভিতরটা আজ যন্ত্রণায় নয় ইয়ার্কিতে ভরে আছে।

হাতটা নিবিষ্ট হাতে ধরে আমি ওর কররেখার দিকে চেয়ে থাকি। হেড লাইন ধনুকের মতো বেঁকে সোজা ঢুকে গেছে চন্দ্রের এলাকায়। তাছাড়াও আছে সুস্পষ্ট কল্পনাপ্রবণতার রেখা। এ মেয়েকে স্বপ্ন ও পল্লবগ্রাহী কল্পনার হাত থেকে কে বাঁচাবে? আমি কেইরো ঘেঁটেছি অনেক। হস্তরেখা তেমন না মানলেও খানিকটা জেনে রেখেছিলাম। মেয়ে পটানোর সবচেয়ে পন্থা হল হাত দেখা, এ পৃথিবীর যে-কোনও মেয়েবাজই জানে।

তোমার নাম নয়না।

বেশি ইয়ার্কি করবেন না। কারও নাম তার হাতে লেখা থাকে না। বউদি আপনাকে বলে গেছেন।

আমি তো বলিনি হাত দেখে তোমার নামটা ধরেছি।

আচ্ছা, আর কী বলবেন বলুন।

তোমার নখে ময়লা আছে।

মোটেই না মশাই।

আছে। তোমার প্রেমিকটি খুব গোঁয়ারে লোক।

যাঃ! কী যে বলেন, না!

তোমার ইনজেকশন দেওয়ার হাত মোটেই নরম নয়। যাকে দাও সে আঁতকে ওঠে।

এটাও কি হাতে আছে?

হ্যাঁ। তোমার হাতটা রিজিড। কেন কারও হাতে হাত একেবারে সঁপে দিতে পার না! জীবনে অনেক দুঃখ পাবে এর জন্য।

সত্যি? ওমা, কী হবে তাহলে?

হাত সমর্পণ করতে হয়। সেটা শেখো।

কী ভাবে দেওয়া যাবে?

বললাম তো, হাতটা শক্ত রেখো না।

আপনি কিন্তু ভীষণ অসভ্য?

মজার লোক বলছিলে না?

মজার লোকও।

মজার লোকেরা একটু অসভ্যই হয়।

এবার দেখুন। ইনজেকশনটা দিয়ে দিই।

আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। আগে দেখি তোমার হাতে ইনজেকশন নেওয়াটা নিরাপদ হবে কিনা।

ওমা, আমার কী হবে গো। আমি যে পাস করা নার্স।

না, তোমার হাত বলছে তুমি নার্সিং পাস করোনি।

সে কী? আমার যে সার্টিফিকেট আছে।

নকল সার্টিফিকেট, তুমি নার্সিং কিছুই জানো না।

কী করলে প্রমাণ হবে যে জানি।

চুপ করে বসে থাকো। আমার চোখে চোখ রাখো। আমি তোমাকে হিপানোটাইজ করে জেনে নেবো।

ওবাবা! সে আমি পারব না। ভয় করে।

আমার কী অসুখ হয়েছে জানো?

নয়নাকে একটু বিবর্ণ দেখাল হঠাৎ। মাথাটা ওপর নীচে ঝাঁকিয়ে বলল, জানব না কেন?

কী বলো তো!

গ্রাসট্রিক আলসার।

নার্স বা ডাক্তাররা রুগির কাছে খুব মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু যখন বলে তখন রুগির কাছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়। কিন্তু তোমার মুখচোখ এই সামান্য মিথ্যে কথাটা বলতে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মিথ্যে হবে কেন! আমি জানি।

তাহলে বলব, তুমি সত্যিই নার্সিংই জানো না। মিথ্যে কথা তো ভালোভাবে বলতে পারোই না। তার ওপর আবার চিকিৎসার ধরন, ওষুধ রিপোর্টটা দেখে রোগ নির্ণয় করার যোগ্যতাও তোমার নেই।

আচ্ছা ঘাট হয়েছে। এবার ইনজেকশনটা দিতে দিন।

বলছি তো, আমি আনাড়ির হাতে ইনজেকশন নিই না।

বিশ্বাস করুন, আমি আনাড়ি নই।

ভীষণ আনাড়ি। শোনো নয়না, আজ সকালে আমি খুব ভালো আছি। একটুও ব্যথা নেই। আমাকে ইনজেকশন দিও না। বসে থাকো, চুপ করে বসে থাকো শুধু।

ডাক্তার মিত্র এসে যখন শুনবেন ইনজেকশন দেওয়া হয়নি, তখন?

সাধে কি আনাড়ি বলি তোমাকে? ইনজেকশনের ওষুধটা বেসিনে ফেলে দিয়ে এসো। আমি কিছু বলব না ডাক্তারকে। কেউ জানবে না, যাও।

সত্যি বলছেন?

সত্যি, আজ সকালটায় আমার নিজেকে রুগি ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

দেখবেন কথাটা ফাঁস হয়ে গেলে কিন্তু আমার ভীষণ বিপদ হবে।

আঃ, যাও যা বলছি করো।

নয়না উঠে গেল। ভয়ে ভয়ে। আমি এত লঘু স্বভাবের মানুষ নই। নয়নার চেয়ে আমি বয়স, মর্যাদা, শ্রেণি সব দিক দিয়েই অনেকটা দূরের মানুষ। কিন্তু তবু এই স্বপ্নাক্রান্ত কম বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন এবং ছেলেমানুষ স্বভাবের মেয়েটির কাছে আজ আমার প্রগলভ হতে ইচ্ছে করছে।

না, মেয়েটি একাই কোনও কারণ নয়। এই যে উজ্জ্বল সকাল, কয়েকদিন বৃষ্টির পর এই রোদ, তিনদিন আচ্ছন্নতার পর আমার এই আমূল জেগে ওঠা—এই সব কিছুর মধ্যে ওই মেয়েটিকে মানিয়ে গেছে। সুরমা হলে মানাতো না।

নয়না ওষুধ ফেলে, সিরিঞ্জ ধুয়ে হাসিমুখে ফিরে এল। কৃতকর্মের জন্য কোনও দুঃখের ভাব নেই মুখে। হাসছে। হাত তুলে খোঁপা ঠিক করছে। এই ভঙ্গিটা লঘু স্বভাবের মেয়েদের ভারি প্রিয়। খোঁপা ঠিক করার ছলে দুহাত ওপরে তুলে তারা তাদের বক্ষপট দেখাতে ভালোবাসে। মেয়েদের আমি গভীরভাবে জানি। এই বুক-দেখানোর ভিতর দিয়ে তারা পুরুষের সপ্রশংস যৌনকাতর মুগ্ধ দৃষ্টিকে কামনা করে। কিন্তু হায়, নয়না জেনেও জানেন, ওর বুকের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি আমার কাছে ওর দুটি চোখ। দুশ্চিন্তাহীন, উদবেগশূন্য, নির্লিপ্ত ও মজার ওই দুই চোখের দৃষ্টি সকালটার সঙ্গে মিলে যায়! ব্যথা নেই, বৃষ্টি নেই, বিষণ্ণতা নেই।

নয়না একটু ফস্টিনস্টি ভালোবাসে। ফের ঝুপ করে কাছ ঘেঁষে বসে পড়ে বলল, দেখুন না ভালো করে হাতটা। আর কী আছে।

আমি নিবিষ্ট চোখে ওকে একটুক্ষণ দেখে অনুচ্চ কর্তৃত্বের স্বরে বললাম, যাও চা করে আনো।

চা! বলে বিস্ময়ে সে তাকায়। এ রুগির চা খাওয়ার হুকুম আছে কিনা তা বোধ হয় সে ভালো করে জানে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ আমার গম্ভীর মুখ ও কঠিন চোখ দেখে ভয় খাওয়া একটু হাসি হেসে উঠে পড়ল। বলল, যাচ্ছি যাচ্ছি, অত রাগ করবেন না।

চায়ের স্বাদ আমি বহুকাল ভুলে গেছি। পচন শুরু হওয়ার পর আমার সিগারেটের আসক্তি চলে গেল। চা বা অন্য কোনও নেশারও আকর্ষণ রইল না আর। কিন্তু নয়নার করে আনা চাটুকু আমি আজ উপভোগ করছিলাম। বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া চায়ের গন্ধ এবং স্বাদের একটু রেশ পাওয়া যাচ্ছিল।

নয়না আমার দিকে মিটমিটে আলো-জ্বলা চোখে চেয়েছিল। বলল, আমি কি ভালো চা করেছি?

ভালো। বহুকাল চা খাইনি।

চা দেওয়া বোধহয় খারাপ হল!

না, আমাকে যদি একটু এগিয়েই দিয়ে থাকো তাহলেও ক্ষতি নেই নয়না। এখন আমার সামনের পথটুকু গড়ানো, ঢালু, বিকল একটা গাড়ি গড়িয়ে যাচ্ছে, তার থামার উপায় নেই। একটা সিগারেট এনে দিতে পারো?

ওবাবা, কি বলে রে লোকটা!

যাও নয়না এনে দাও।

নয়না অনিচ্ছার সঙ্গে গেল এবং জোগাড় করে আনলও।

নয়না।

উঃ।

হাতটা দাও।

আবার কী দেখবেন?

তুমি যথার্থ নার্সিং জানো কিনা।

জানি না তো। বলেই দিয়েছেন একবার।

আমি আজ নার্স বা ডাক্তার চাই না নয়না! আমার জন্য উদবেগ বোধ করে এমন কাউকেই আজ আমার ঘরে আসতে দিও না। আমার প্রিয়জনদের মুখ আমি দেখব না।

কী যে বলেন!

হাতটা দাও।

এই তো দিয়েছি।

বসে থাকো, চুপ করে বসে থাকো। আজ আমার ব্যথা নেই, আজ বৃষ্টি নেই, আজ বিষণ্ণতা নেই।

ও আবার কেমনধারা কথা? কিছু বুঝছি না যে।

তোমাকে বুঝতে কে বলেছে?

ও বাবা, বুঝতেও দেবেন না?

কথা বোলো না নয়না। মেয়েরা বেশি কথা বললেই বড্ড বোকার মতো কথা বলে ফেলে। আজকের সকালটা নষ্ট কেরো না।

নয়না খুব হাসল। তারপর বলল, আপনি ভারি কিম্ভূত।

সেটা আমি জানি।

হাতটা শুধু ধরে থাকবেন?

তাতে কিছু মনে করবে নাকি?

না! আপনি ধরলে কিছু মনে করার নেই।

কেন, আমি পুরুষ নই? প্রায়-যুবক নই?

নয়নার ছলবলে ভাবটা হঠাৎ কেটে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, কে বলল নন?

যে কেউ বলুক, তুমি না বললেই হল।

নয়না আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আপনার মতো পুরুষ খুব বেশি দেখা যায় না।

বটে?

ঠাট্টা করবেন না কিন্তু। একটা কথা বলব?

বলো নয়না, কিন্তু বোঝার মতো কিছু নয় তো!

না বোধহয়, বলছিলাম সেই কী যেন হাত সমর্পণের কথা বলছিলেন না!

বলছিলাম!

আমার মনে হয় আপনার মতো কাউকে পেলে হাত সমর্পণ করতে মেয়েদের কষ্ট হয় না। হাত এগিয়ে যায় আপনা থেকেই।

এ কথার পর একটু উজ্জ্বলতর হল আজকের সকাল, আমার অভ্যন্তরে ব্যথা ছিল না, শুধু ব্যথার স্মৃতি ছিল, কিন্তু সেটাও মুছে গেল হঠাৎ। বিষণ্ণতার রেশটুকুও কেটে গেল। নয়নার হাতটা ধরে আমি সময়টা খুব উপভোগ করতে থাকি।

দরজা খোলা। রুমকি এসে পড়তে পারে। বা অন্য কেউ। কিন্তু অমার ভয় করল না, এরকম সুন্দরক্ষণ তো সকলের জীবনে আসে না। বড় ক্ষণস্থায়ী। তা হোক। ক্ষণস্থায়ী কী বা নয়।

আমি আর নয়না বসে রইলাম। আজ ব্যথা নেই, বৃষ্টি নেই, বিষণ্ণতা নেই।

খেলার ছল

মিঠুর গোল গোল মোটামোটা দুটো পায়ের একটা জীবনের বুকের ওপর আর একটা তার শোয়ানো হাতে। তার বুকের ওপর কাত হয়ে শুয়েছে মিঠু, ঘাড়ের কাছে মাথা আর ল্যাভেন্ডারের গন্ধময় চুল। জীবন কানের ওপর মিঠুর দুরন্ত শ্বাসপ্রশ্বাস আর কবিতা আবৃত্তি শুনতে পাচ্ছিল : ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা, তাহারি মাঝারে দেখে আপনার সূর্য-তারা। তারি একধারে আমার ছায়ারে আনি মাঝে মাঝে দুলায়ো তাহারে, তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো কলধ্বনি...একটা ছোট নরম হাতে মিঠু তার বাবার গালধরে মুখটা ফিরিয়ে রেখেছে তার দিক! জীবন অন্যমনস্ক ভাব দেখালেই মুখ টেনে নিয়ে বলছে 'শোনো না বাবা!'

মিঠুর ভারী শরীর, নরম তুলতুলে। বুকের ওপর যেখানে মিঠুর পা সে জায়গাটা অল্প ধরে আসছিল জীবনের। পা-টা একবার সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে মিঠু দাপিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই উঠে এল জীবনের বুকের ওপর, দুই কনুইয়ের ভর রেখে জীবনের মুখের দিকে হেসে হঠাৎ অকারণে ডাকল 'বাবা!'

'উঁ।'

'তুমি শুনছ না।'

'শুনছি মা-মণি।' জীবন চোখ খুলে তার ছয় বছরের শ্যামবর্ণ মেয়েটির দিকে তাকাল, হঠাৎ তার বুক কানায় কানায় ভরে ওঠে। চুলে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ, চোখে কাজল, মুখে অল্প পাউডারের ছোপ--এত সকালেই মেয়ে সাজিয়েছে অপর্ণা। না সাজেলও মিঠুকে দেখতে খারাপ লাগে না। কী বড় বড় চোখ, আর কী পাতলা ঠোঁট মিঠুর। জীবন মিঠুকে আবার দুহাতে আঁকড়ে ধরে বলে, 'তোমার কবিতাটা আবার বলো।' মিঠু সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠে, 'ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' শুনতে শুনতে সকালের গড়িমসির ঘুম ঘুম ভাবটা আবার ধীরে ধীরে জীবনকে পেয়ে বসতে থাকে। বলতে কি সারাদিনের মধ্যে মিঠু আর তার বাবাকে নাগালে পায় না, সকালের এটুকু সময় ছাড়া। তাই এটুকুর মধ্যেই সে পুষিয়ে নেয়। ধামসে, কামড়ে, কবিতা বলে, গান গেয়ে বাবার আদর কেড়ে খায়, জীবনের মাঝে মাঝে বিশ্বাস হতে চায় না যে এই সুন্দর সুগন্ধী মেয়েটা তার!

মাঝখানের ঘর থেকে অপর্ণার গলা পাওয়া যাচ্ছিল। চাপা গলা, কিন্তু রাগের ভাব। মিঠু মাথা উঁচু করে মায়ের গলা শুনবার চেষ্টা করে বাবাকে চোখের ইঙ্গিত করে বলল 'মা!' নিঃশব্দে হাসল--'মা আতরদিকে বকছে। রোজ বকে'। জীবন নিঃস্পৃহভাবে বলে, 'কেন'! মিঠু মাতা নামিয়ে আনল জীবনের গলার ওপর, তার থোকা থোকা চুলে জীবনের মুখ আচ্ছন্ন করে দিয়ে বলল, 'আতরদি রোজ কাপডিশ ভাঙে। সকালে দেরি করে আসে।

মা বলে ওকে ছাড়িয়ে দেবে। মা বলতে বলতে টপ করে জীবনের বুক থেকে পিছলে নেমে যায় মিঠু, মশারি তুলে মেঝেয় লাফিয়ে পড়ে। জীবন ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে বলে, 'কোথায় যাচ্ছো মা-মণি!' দরজার কাছে এক ছুটে পৌঁছে গিয়ে মিঠু ঘাড় ঘুরিয়ে বলে 'দাঁড়াও দেখে আসি।'

গোয়েন্দা! এই মেয়েটা তার পুরোপুরি গোয়েন্দা। বাড়ির সমস্ত খবর রাখে, আর সকালে বাবাকে একা পেয়ে চুপি চুপি বলে দেয়। বিশেষত অপর্ণার খবর। মিঠু তার সহজ বুদ্ধিতে বুঝে গেছে যে বাবা মায়ের খবরটাই বেশি মনোযোগ দিয়ে শোনে। গতকাল তাদের মোটর গাড়িটার জ্বর হয়েছিল কিনা, কিংবা তিনশো ছিয়ানব্বই নম্বর বাড়িতে কুকুরটার কটা বাচ্চা হল এসব খবরে বেশি কান দেয় না। মিঠুর উলটো হচ্ছে মধু-- জীবনের তিন বছর বয়সের ছোট মেয়ে। সে মায়ের আঁচল ধরা, জীবনকে চেনে বটে, কখনও-সখনও কোলেও আসে কিন্তু থাকতে চায় না। দুই মেয়ের কথা ভাবতে-ভাবতে জীবন উঠে সিগারেট ধরাল। মাথা ধরে আছে—কাল রাতের হুইস্কির গন্ধ এখনও যেন ঢেকুরের সঙ্গে অল্প পাওয়া যাচ্ছে। কেমন ঘুম জড়িয়ে আছে চোখের পাতা। কিছুতেই মনে পড়ে না কাল রাতে 'বার' থেকে কি করে সে ঘরের বিছানা পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছিল। কোনওদিনই মনে পড়ে না। কাল বিকালে কারখানা থেকে তার ড্রাইভার তাকে 'বার' পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছিল। বার-এ দেখা হয়েছিল দুজন চেনা মানুষের সঙ্গে। আচার্য আর মাধবন। তারপর।

মিঠু ছোট পায়ে দৌড়ে এসে মশারি তুলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের কোলে। হাঁফাচ্ছে। এত বড় বড় চোখ গোল করে বলল, 'আমাদের বিড়ালটা না বাবা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকেছিল! মরে কাঠ হয়ে আছে।' একটু অবাক হয়ে জীবন বলল, 'সেকি!' তার হাত ধরে টানতে টানতে মিঠু বলল, 'চলো দেখবে। নইলে এক্ষুনি আতরদি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবে। কৌতূহল ছিল না তবু মিঠুকে এড়াতে পারে না জীবন, তাই হাই তুলে বিছানা ছাড়ল।

ঘরের চারদিকেই লক্ষ্মীর শ্রী। মেঝেতে পাতা চকচকে লিনোলিয়ম। ওপাশে অপর্ণা আর মিঠু মধুর আলাদা বিছানা। নীচু সুন্দর খাটের ওপর শ্যাওলা রঙের সাদা ফুলতোলা চমৎকার বেডকভার টান টান করে পাতা। মশারি খুলে নেওয়া হয়েছে। ডানদিকে প্রকাণ্ড বুককেস যার সামনেটা কাচের, বুককেসের ওপর বড় একটা হাইফাই রেডিয়ো, তার ঢাকনার অর্গান্ডিতে অপর্ণার নিজের হাতের অ্যামব্রয়ডারি, পাশে মানিপ্ল্যান্ট রাখা, লেবু রঙের চিনেমাটির ফুলদানি সাদা ক্যাবিনেটের ভিতরে রেকর্ড চেঞ্জার মেশিন--কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা নেই। পুবের জানালা খোলা নীল, পাতলা পরদার ভিতর দিয়ে শরৎকালের হালকা রোদ আর অল্প হিম হাওয়া আসছে। অপর্ণা ঘর বড় ভালোবাসে, তা ছাড়া তার রুচি আছে। এর জন্য জীবন কখনও মনে মনে, কখনও প্রকাশ্যে অপর্ণাকে

বাহবা দেয়। কোন জায়গায় কোন জিনিসটা রাখলে সুন্দর দেখায় জীবন তা ভেবেও পায় না, যদিও এসবই জীবনের রোজগারে অর্জিত জিনিস, তবু তার মাঝে মাঝে মনে হয় এই ঘরদোর এই ফ্ল্যাট বাড়িটা আসল মালিক অপর্ণাই। সারাদিন ঘুরে ঘুরে অপর্ণা বড় ভালোবাসা, যত্নে, বড় মায়ায় এই সব কিছু সাজিয়ে রাখে। জীবনের সন্দেহ হয় যে যখন থাকে না, তখন--পোষা গৃহপালিতের গায়ে লোকে যেমন হাত রেখে আদর করে তেমনি অপর্ণা রেডিয়ো, বুককেস,সোফায় বা টেবিলে তার স্নেহশীল সতর্ক হাত রেখে আদর জানায়। তাই জীবন যখনই ঘরে ঢোকে তখনই মনে হয় এ সব জিনিস অপর্ণারই পোষমানা, এ সব তার নয়। তাই যখন যে ঘরে চলাফেরা করে বসে বা শুতে যায়, যখন ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খোলে তখন সে তার নিজের ভিতরে এক ধরনের কুণ্ঠা ও সতর্কতা লক্ষ করে মনে মনে হাসে। বাস্তবিক অপর্ণা হয়তো তার এ স্বভাব লক্ষ করে না, কিন্তু জীবন জানে লোকে যেমন তাদের ঘরে ফিরে সহজ খোলামেলা, আরামদায়ক অবস্থা ভোগ করে সে ঠিক তেমন করে না।

'শিগগির বাবা' বলতে বলতে মিঠু তাকে টেনে আনল মাঝখানের ঘরে। আসলে ঘর নয়, প্যাসেজ। তিন দিকে তিনটে দরজা—একটা রান্নাঘর, অন্যটা বসবার, তৃতীয়টা তাদের শোয়ার ঘরের। তিন কোনা প্যাসেজের একধারে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়ানো ক্রিম রঙের ফ্রিজটা। রাতে যখন প্রায়ই ভীষণ ঘোর অবস্থায় খানিকটা এলোমেলো পায়ে অন্ধকার প্যাসেজটা পার হয় জীবন তখন সে মাঝে মাঝে ফ্রিজটার কাছে একবার দাঁড়ায়, কোনওদিন ঠান্ডা সাদা ফ্রিজটার গায়ে হাত রাখে। মনে হয় ঘুমন্ত সেই ফ্রিজটা তার হাত টের পেয়ে আস্তে জেগে ওঠে, সাড়া দেয়, জীবনের মনে হয় ফ্রিজটা এতক্ষণ যেন এই আদরটুকুর জন্য অপেক্ষা করেছিল। এখন দিনের বেলা সব কিছু অন্যরকম। ফ্রিজটার দুটো দরজা দু হাট করে খোলা, ...সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে গম্ভীরমুখে অপর্ণা, তার পিঠে ঝুঁকে মধু, আতর নীচু হয়ে তলায় থাকে অন্ধকারে কিছু দেখবার চেষ্টা করছে। জীবন লক্ষ করে, সে এসে দাঁড়াতেই অপর্ণার শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। জীবন অল্প হেসে জিজ্ঞাসা করে 'কি হল!' অপর্ণা ফ্রিজটার দিকে চেয়ে থেকেই জবাব দিল 'দেখো না, বেড়ালটা ভেতরে ঢুকে মরে আছে।' জীবন অপর্ণার মুখের খুব সুন্দর কিন্তু একটু নিষ্ঠুর পাথুরে প্রোফাইলের দিকে চেয়ে সহজ গলায় বলে--'কি করে গেল ভেতরে!' অপর্ণা সামান্য হাসে 'কি জানি'। জীবন সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ওরকম ভুল হয়। ওটাকে বের করে ফ্রিজটা ভালো করে ধুয়ে দিও, মরা বেড়াল ভালো নয়। আচ্ছা।' জীবন চলে যাচ্ছিল বাথরুমের দিকে হঠাৎ মনে পড়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আর আজ বাজারে যাবে বলেছিলে। ছুটির দিন। যাবে না!' এক ঝলক মুখ ফিরিয়ে জীবনের চোখে চোখ রাখল অপর্ণা, হাসল যাবো না কেন। একটা বেড়াল মরেছে বলে! তুমি তৈরি হও না। কথাটা ঠিক বুঝল না জীবন শুধু অপর্ণার ওই এক ঝলক তাকানোর দিকে চেয়ে ওর সুন্দর ছোট

কপালে সিঁদূরের চারপাশে কোঁকড়ানো চুল, ঈষৎ ফুলে থাকা অভিমানী সুন্দর ঠোঁট, নিখুঁত আর্চ-এর মতো ভ্রূ আর থুতনির চিক্কণতা দেখে হঠাৎ নিজেকে তার বড় ভাগ্যবান মনে হল। বড় সুন্দর বউ তার। বড় সুন্দর অপর্ণা। ছেলেবেলা থেকে অনেকে এরকম বউ পাওয়ার আশায় বড় হয়ে ওঠে। ভেবে দেখতে গেলে জীবনের ছেলেবেলা ছিল বড় দুরন্ত, বড় ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির বড় দামাল দিন ছিল তখন। আজ একটা বেড়াল তার ফ্রিজ-এর ভিতরে মরে পড়ে আছে, আর তখন সেই ছেলেবেলায় যখন ছিল চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, তখন উনানের পাশে ছোট নোংরা যে চৌখুপি জায়গায় সে চট আর শতরঞ্চির বিছানায় শুতো তখন আর একটা বেড়াল তার মাথার কাছে শুয়ে থাকতো সারা রাত। মিনি নামে সেই বেড়াল উনিশশো পঞ্চাশে চক্রবর্তীদের তিনতলা থেকে দিয়েছিল লাফ। জীবন আজও জানে না বেড়ালটা আত্মহত্যা করেছিল কিনা। সেই সব ছেলেবেলার দিনে জীবন কখনও অপর্ণা বা অপর্ণার মতো সুন্দর অভিজাত বউ-এর কথা ভাবেইনি।

বাথরুমের বড় আয়নার কোমর পর্যন্ত নিজের আকৃতির দিকে চেয়ে মৃদু হাসল জীবন। দুর্ধর্ষ কাঁধের ওপর শক্ত ঘাড়, বুকে দু-ধারে চৌকো পেশি, দাঁতে ব্রাশ ঘষলে হাতের শক্ত রগ, শিরা আর মাংসপেশিতে ঢেউ ওঠে। ছোট করে ছাঁটা চুল, টানা, মেয়েলি এবং দুঃখী এক ধরনের অদ্ভুত চোখ তার। তার গায়ের রং শ্যামবর্ণ, যেমনটা মিঠুর। মধু তার মায়ের মতোই ফরসা। জীবনের নাক চাপা, ঠোঁট একটু পুরু কিন্তু সুন্দর। তার সঙ্গে মিঠুরই মিল বেশি, মধুর সঙ্গে অপর্ণার। জীবনের চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ আছে বোঝা যায় আলস্য বা আরামে সে খুব অল্প সময়ই ব্যয় করেছে। তৃপ্তিতে আয়নার দিকে চেয়ে হাসে জীবন। বাস্তবিক প্রায় ফুটপাথের রাস্তার জীবন থেকে এতদূর উঠে আসতে পারার পরিশ্রম ও সার্থকতার কথা ভাবলে তার মাঝে মাঝে নিজেকে বড় ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। সে তার বউ মেয়ে এবং পরিবারের জন্য কি সমস্ত কর্তব্যই করেনি! এই ভেবেই সে তৃপ্তি পায় যে এরা কেউ দুঃখে নেই, জীবনের ওপর পরম নির্ভরতায় এরা নিশ্চিন্তে বেঁচে থেকে বেঁচে থাকাকে ভালোবাসছে। সে নিজেও কি বেঁচে থাকাকেই ভালোবাসেনি বরাবর। যখন সেই অনিশ্চিত ছেলেবেলায় সে কখনও চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, কখনও বা মোটর-সারাই কারখানার ছোকরা কারিগর তখনও সে রাস্তা পার হতে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল দেখে আনন্দে গান গেয়েছে, খাদ্য অনিশ্চিত ছিল তবু প্রতিটি খাদ্যকণার কত স্বাদ ছিল তখন। তখন দেশভাগের পর কলকাতায় এসে রহস্যময় এই শহরকে কত সহজে চিনে নিয়েছিল জীবন। আজ সে যখন তার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে, গাড়ির জানালা থেকে বা বার এর দরজার কাচের পালার ভিতর দিয়ে দেখে তখন এখানকার রাস্তাঘাট ভিড়, আলো কত দূরের বলে মনে হয়। কিংবা রাতে ঘোর মাতাল অবস্থায় ফিরে এসে যখন খাবার ঘরে ঢাকা খাবার খুলে সে সুন্দর সমস্ত খাবারের রঙের দিকে চেয়ে দেখে তখনও তার মনে হয় এ সব খাবারে কি সেই সব স্বাদ আর পাওয়া যাবে!

জীবন ঘরে ঢুকে দেখল ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অপর্ণা মধুকে সাজাচ্ছে। জীবন বলল 'ও যাবে নাকি!'

অপর্ণা মধুর মাথায় রিবন জড়াতে জড়াতে বলল, 'যাবে না! থাকবে কার কাছে! যা বায়না মেয়ের।'

জীবন বিরক্ত ভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখল মিঠু মেঝের লিনোলিয়মে খোলা 'হাসি-খুশি'-র সামনে বসে হাঁ করে মা আর মধুর দিকে চেয়ে আছে। জীবন বলল, 'দোকানে দোকানে ঘুরতে হবে, ওকে নিলে অসুবিধে। কখন জলতেষ্টা পায়, কখন হিসি পায় তার ঠিক কি!'

শুনে মিঠু মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে। অপর্ণা তার ধীর হাতে মধুর মাথার রিবন সরিয়ে নেয়। তেমনি গম্ভীর মুখে একবার মিঠুর দিয়ে চেয়ে বলল 'ঠিক আছে।'

জীবন সঙ্গে সঙ্গে সহজ হওয়ার ভাব করে বলে অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছে হয়—'

'না, থাক। আতর ত রইলই, ও দেখতে পারবে।'

'কাঁদবে বোধহয়।'

'তা কাঁদবে।'

'কাঁদুক।' জীবন হাসে, 'কাঁদা খারাপ নয়, তাতে অভ্যেস ভালো হয়? জেদ-টেদ কমে স্বাভাবিকতা আসে।'

অপর্ণা উত্তর দিল না।

জীবনের খয়েরি রঙের ছোট সুন্দর গাড়িটা দরজার সামনে দাঁড় করানো। ড্রাইভার গাড়ির দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের এক পা পিছনে অপর্ণা—ছাইরঙা সিল্কের শাড়ি, ছাইরঙা ব্লাউজ, হাতে ছাইরঙা বটুয়া, মাথায় এলো খোঁপা, পায়ে শান্তিনিকেতনি চটি--বড় সুন্দর দেখায় অপর্ণাকে। পাশাপাশি যেতে কেমন অস্বস্তি হয় জীবনের। সে নিজে পড়েছে সাদা টেরিলিনের শার্ট আর জিন-এর প্যান্ট-নিঃসন্দেহে তাকে দেখাচ্ছে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো, তবু অপর্ণার পাশে কি কারণে যেন কিছুতেই তাকে মানায় না। ড্রাইভারকে ইঙ্গিতে সরে যেতে বলে জীবন একবার পিছু ফিরে চাইল। ব্যালকনিতে আতরের কোলে মধু সে ভীষণ কাঁদছে, চোখের জলে মুখ ভাসছে তার রেলিঙের ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছে মিঠু--বিষণ্ণ মুখ--জীবনের চোখে চোখ পড়তেই হাসল, হাত তুলে বলল 'টা-টা বাবা! দুর্গা দুর্গা বাবা!' অপর্ণা খুব তাড়াতাড়ি ব্যালকনির দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে গাড়িতে ঢুকে গেল। জীবন হাসিমুখে হাত তুলে ব্যালকনিতে মিঠু আর মধুর উদ্দেশ্য বলল, 'শিগগিরই আসছি ছোটো-মা! টা-টা, দুর্গা দুর্গা বড়ো-মা।'

'টা-টা দুর্গা দুর্গা বাবা। টা-টা দুর্গা দুর্গা।'

জীবন গাড়ি এনে দাঁড় করাল মোড়ের পেট্রল পাম্পে। অর্পণা নামল না। জীবন নেমে ধরাল একটা সিগারেট। আকাশে শরৎকালের ছেঁড়া মেঘ, রোদ উড়ছে। পেট্রল পাম্পের একদিকে বিরাট সাইন বোর্ড 'হ্যাপি মোটোরিং!' সেই দিকে চেয়ে রইল জীবন, হঠাৎ

আলগা একটা খুশিতে তার মন গুনগুন করে উঠল 'হ্যাপি মোটোরিং। হ্যাপি হ্যাপি হ্যাপি মোটোরিং!' যে বাচ্চা ছেলেটা মোটরে পেট্রল ভরল, হাত বাড়িয়ে তাকে একটা টফি দিল অপর্ণা। খুব খুশি হল জীবন। অপর্ণার মুখ এখন পরিষ্কারও সহজ। হায়! কতকাল অপর্ণার সঙ্গে জীবনের ঝগড়া বা খুনসুটি হয় না। জীবন যা বলে অপর্ণা একটু গম্ভীর মুখে তাই মেনে নেয়। সত্যিই মেনে নেয় কিনা জীবন তা জানে না। অন্তত বিয়ের আগে অপর্ণা যে বাড়ির মেয়ে ছিল সে বাড়ির লোকেরা সহজে অন্য কারও কথা মেনে নিত না, বশও মানতো না। অপর্ণাই মানছে কি! ঠিক জানে না জীবন। আসলে সারাদিনে তাকে অপর্ণার বা অপর্ণাকে তার কতটুকু দরকার পড়ে! ভালো করে দেখাও হয় না। শুধু রাতে যখন সে ঘোরলাগা অবস্থায় ঘরের দরজায় পৌঁছোয়, আর দরজা খুলে দিয়ে অপর্ণা সরে যায় তখন প্যাসেজের আলো আঁধারিতে সে একঝলক অপর্ণার সুন্দর কিন্তু নিষ্ঠুর মুখে একটু বিরাগ লক্ষ করে মাত্র। সেটুকুও ভুল হওয়া সম্ভব। তবু অপর্ণাকে ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে ভালোবাসার কথা মনেও হয় না জীবনের।

সামনেই ট্র্যাফিকের হলুদ বাতি লাল হয়ে যাচ্ছিল। আগে একটা সাদা বড় প্লিমাউথ শ্লথ হয়ে থেমে যাচ্ছিল, জীবন স্টিয়ারিং ডাইনে ঘুরিয়ে তাকে পাশ কাটাল, গতি কমাল না, জ্বলজ্বলে লাল আলোর নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল তার ছোট গাড়ি, আড়াআড়ি ক্রসিং এর গাড়িগুলো সদ্য চলতে শুরু করেছে, জীবন অনায়াসে ধাক্কা বাঁচিয়ে বেরিয়ে গেল। অপর্ণা চমকে উঠে বলল, 'এই! কি হচ্ছে!' জীবন বাঁ হাতটা তুলে অপর্ণাকে শান্ত থাকতে ইঙ্গিত করল শুধু। অপর্ণা ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের রাস্তা দেখে নিয়ে বলে, 'পুলিশ তোমার নাম্বার কল করছে, হাত তুলে থামতে বলছে।' জীবন গম্ভীর মুখে বলল, 'যেতে দাও।' অপর্ণা চুপ করে যায়। চওড়া সুন্দর গড়িয়াহাটা রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে পার্ক সার্কাসের দিকে। সকাল। ট্র্যাফিক খুব বেশি নয়। তবু সামনেই বাস স্টপে একটা দশ নম্বর বাস আড় হয়ে থেমেছে, ফলে পাশ কাটানোর রাস্তা প্রায় বন্ধ। জীবন নিশ্বাসের সঙ্গে একটা গালাগাল দেয়, গাড়ির গতি একটুও কমায় না, তার ছোট গাড়ি বাসটাকে প্রায় বুরুশ করে বেরিয়ে গেল। অপর্ণা কিছু বলে না। শুধু তার বড় বড় চোখ কৌতূহলে জীবনের মুখের ওপর বারবার ঘুরে যায়। জীবনের মুখ বড় গম্ভীর, কপালে অল্প ঘাম। যেতে যেতে জীবন, ভীষণ বেগে হঠাৎ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার সোজা করে নিল, গাড়ি এত জোরে টাল খেল যে ড্যাশবোর্ডে মাথা ঠুকে গেল অপর্ণার। 'উঃ!' গাড়ির সামনের রাস্তায় চমৎকার সাজগোজ করা একটি যুবতি মেয়ে তিড়িং করে লাফ দিয়ে ট্রামলাইনের দিকে গিয়ে পড়ল। ওই বয়সের মেয়েকে এরকম লাফ দিতে আর দেখেনি জীবন। সে ঘাড় ঘুরিয়ে আর একবার মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করে, অপর্ণা হঠাৎ তীব্র গলায় বলে, 'তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো! এটা কি বাহাদুরি নাকি!' জীবন তার গম্ভীর অকপট মুখ ফেরায়, 'অপর্ণা আমরা একটু মুশকিলে পড়ে গেছি।' অপর্ণা বড়ো চোখে তাকায়

'মুশকিল!' জীবন রাস্তার দিকে তার পুরো মনোযোগ রেখে বলে 'গাড়ির ব্রেকটা বোধ হয় কেটে গেছে। ধরছে না।' অপর্ণা নিঃশব্দে শিউরে ওঠে, চুপ করে জীবনের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে 'স্টার্ট বন্ধ করে দাও।' জীবন একটা টেম্পোকে পাশ কাটিয়ে নিল, অদূরে একটা ক্রসিং, আড়া-আড়িভাবে একটা লরি পাশের রাস্তা থেকে প্রকাণ্ড কুমিরের মতো মুখ বার করেছে--এক্ষুনি রাস্তা জুড়ে যাবে। জীবন এই বিপদের মধ্যেও ছোট আয়নার একপলকের জন্য নিজের ভয়ঙ্কর উদবিগ্ন ও রেখাবহুল মুখ দেখতে পেল, অপর্ণার চোখ বুজে হাতে হাত মুঠো করে ধরে আছে। জীবন হাত বার করে লরির ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে নাড়ল, তারপর হাত নাড়তে নাড়তে একহাতে স্টিয়ারিঙে জীবন গাড়িটাকে এক ঝটকায় মোড় পার করে দিল। অল্প ফাঁকায় জীবন। 'স্টার্ট' বন্ধ হচ্ছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। একটু আগেও সব ঠিক ঠাক ছিল। অথচ অপর্ণা বক্তব্যহীন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকায় 'কি হবে তাহলে!' ড্যাশবোর্ডে ঝুলছে স্টিলের চকচকে চাবির রিং, দোল খাচ্ছে। জীবন আর একবার স্টার্ট বন্ধ করার চেষ্টা করল। অপর্ণা শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলে, 'ঠেলা গাড়ি, ওঃ একটা ঠেলাগাড়ি...' জীবন তার হাতের ওপর অপর্ণার নরম হাত টের পায়, বলে 'ভয় পেও না, চেঁচিও না, মাথা ঠিক রাখো, সামনে যতদূর দেখা যায় দেখে দেখে আমাকে বলো। ফাঁকা রাস্তা পাচ্ছি এখনও। বোধ হয় বেরিয়ে যাবো।' অপর্ণা হাতের দলাপাকানো রুমালে চোখ মোছে। '--গাড়ির এত গণ্ডগোল, আগে টের পাওনি কেন?' খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস আছে, তবু জীবনের কপালের ঘাম নেমে আসছে চোখে মুখে, জিভে সে ঘামের নোনতা স্বাদ পায়, বলে দিন পনেরো আগেই তো গ্যারেজ থেকে আনলুম, গিয়ারটা একটু...' অপর্ণা হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে 'বাঁ দিকে মোড় নাও, সামনে জ্যাম,' তিনটে রিকশা একে অন্যকে কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল, পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ির বনেট লাগল একটা রিকশার হাতলে, ছোট একটা ধাক্কায় রিকশাটাকে সরিয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরল জীবন, রিকশাওয়ালা হাতল শূন্যে তুলে প্রাণপণে রিকশাটাকে দাঁড় করবার চেষ্টা করছে...এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হাজরা রোডে ঢুকে উলটোদিক থেকে আসা একটা ষোলো নম্বর বাস-এর দেখা পায় জীবন। বাসটা একটা ধীরগতি কালো অস্টিন অফ ইংল্যান্ডকে ছাড়িয়ে যাবে বলে রাস্তা জুড়ে আসছে। দাঁতে ঠোঁট চাপে জীবন, টের পায় ঠোঁটের চামড়া কেটে দাঁত বসে যাচ্ছে, ফুটপাথ ঘেঁসে স্টিয়ারিং ঘোরায় সে তবু বুঝতে পারে অত অল্প জায়গা দিয়ে গাড়ি যাবে না। চোখ বুজে ফেলার ভয়ঙ্কর একটা ইচ্ছে দমন করে সে দেখে ষোলো নম্বর বাসটা তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, বাস-এর ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে তার কান মলে দিয়ে বলতে পারে, 'শিখতে অনেক বাকি হে।' কিন্তু জীবন খুব অবাক হয়ে দেখল তার ছোট গাড়িটা যেন ভয় পেয়ে জড়োসড়ো এবং আরও ছোট হয়ে রাস্তার সেই খুব অল্প ফাঁক দিয়ে ফুরুত করে বেরিয়ে গেল। নেশাগ্রস্তের মতো হাতে জীবন, 'অপর্ণা...।' তাকিয়ে দেখে অপর্ণা দু হাতে মুখ

ঢেকে কাঁদছে। জীবনের ডাক শুনে শুধু বলল 'আমার মেয়ে দুটো? মেয়ে দুটোর কি হবে?' মুহূর্তের জন্য স্টিয়ারিঙের ওপর হাত ঢিলে হয়ে যায় জীবনের। গাড়ি টাল খায়। দুর্বল সময়টুকু আবার সামলে নেয় জীবন, বলে, 'কেঁদো না, কাঁদলে আমার মাথা ঠিক থাকবে না। একটু ভুল হয়েছে তোমার, এই রাস্তায় মোড় নিতে বললে, কিন্তু রাস্তায় বড় ভিড়।' গাড়ি খুব জোরে চলছে না, জীবন চারিদিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিল। অপর্ণা চোখের জল মুছে শক্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে 'যেমন করে হোক বাসায় দিকে গাড়ি ঘোরাও।' জীবন স্থির গলায় বলে, 'তাতে লাভ কি; বাসার সামনে গেলেই কি গাড়ি থামবে!' অপর্ণা জোরে মাথা নাড়ে না থামুক। মধু আর মিঠু হয়তো এখনও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।' জীবনের ঘাড় টন টন করছিল ব্যথায়, সহজ ভঙ্গিতে না বসে অনেকক্ষণ তীব্র উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে আছে। বাঁ দিকে পর পর কয়েকটা সরু নোংরা গলি, মোড় ফেরা গেল না। সামনেই চৌরাস্তা, দূর থেকেই দেখল জীবন ট্র্যাফিক পুলিশ অবহেলার ভঙ্গিতে হাত তুলে তার সোজা রাস্তা আটকে দিল। অপর্ণা হঠাৎ জোরালো গলায় বলল 'ডান দিকে মোড় নাও, ওদিকে ফাঁকা রাস্তা তারপর রেইনি পার্ক...' কিন্তু জীবন মোড় নিতে পারল না, গাড়িটা অল্পের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর সহজ নিশ্চিতভাবে ট্র্যাফিক পুলিশটাকে লক্ষ করেই ছুটছিল। লোহার হাতে স্টিয়ারিং সোজা রাখে জীবন, পুলিশটার হাতের তলা দিয়ে তার গাড়ি ছোট। বাঁকের মুখে নীল রঙের একটা ফিয়াট তার গাড়ির বাফারের ধাক্কায় নড়ে উঠে থেমে কাঁপতে থাকে। ফিরেও তাকায় না জীবন, দুটো লরিকে পরপর কাটিয়ে নেয়। পিছনের পুলিশটা চেঁচিয়ে গাল দিচ্ছে। সামনেই হাজরার মোড়, লাল বাতি জ্বলছে, অনেক গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে। কিছুই ভাবতে হয় না জীবনকে। সে থেমে থাকা গাড়িগুলোকে বাঁয়ে রেখে অবহেলায় এগিয়ে যায়, আবার একটা ডবলডেকার, পিছনে লম্বা ট্রাম আড়াআড়ি রাস্তা জুড়ে যাচ্ছে, জীবন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে 'আজ কেবল লাল বাতি, রোজ এমন হয় না তো।' অপর্ণা বাঁ হাত বাইরে বের করে মোড় নেবার ইঙ্গিত দেখায়, ডবলডেকারটার মুখ কোনওক্রমে এড়িয়ে জীবন গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল। রাস্তা ফাঁকা নয়, কিন্তু অনেকটা সহজ। বাঁয়ে মনোহরপুকুরের মুখ, একটু দ্বিধাগ্রস্ত হাতে গাড়ি ঘোরাবে কিনা ভাবতে ভাবতে জীবন সোজাই চলতে থাকে। কালীঘাটের স্টপে গোটা চার পাঁচ স্টেট বাস একসঙ্গে থেমে আছে। দূর থেকেই জীবন দেখে প্রথম বাসটা ধীর স্থিরভাবে স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে, সে পৌঁছবার আগে আর বাসগুলো যে ছাড়বে না তা নিশ্চিত। ওখানে বাস স্টপের পাশেই একটা পাবলিক ইউরিন্যাল। আগে থেকেই জীবন তাই ট্রামের ট্র্যাকে তুলে দিল তার গাড়ি। অপর্ণা কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে, তাদের গাড়িটাকে এবার অনেকের নজরে পড়েছে। জীবন কালীঘাট পেরিয়ে ট্রামের ট্র্যাকে ঘাস-মাটির জমির ওপর দিয়েই চলতে থাকে। লোকজন দূর থেকে চেঁচিয়ে কি বলছে। জীবন

একটু ঘোলাটে চোখে অপর্ণার দিকে চায়; 'অপর্ণা...' অপর্ণা অর্থহীন চোখে তার মুখের দিকে তাকায়। জীবন বলে 'আমার কেমন ঘুম পাচ্ছে।' অপর্ণা বুঝতে না পেরে বলে 'কি বলছ?' জীবন মাথা নাড়ে 'চোখের সামনে আঁশ আঁশ জড়ানো একটা ভাব। অনেকক্ষণ সিগারেট না খেলে আমার এরকম হয়। আমি অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি। অপর্ণার চোখে জল টলমল করছে, রুমালের ঘষায় চোখের আশেপাশের জায়গা লাল, বড় সুন্দর দেখায় তাকে। কপালের সিঁদুর অল্প মুছে গেছে। তৎপর গলায় বলে 'কোথায় তোমার সিগারেট'? জীবন তার দিকে চেয়ে বলে 'পকেটে।' অপর্ণা বলে 'বের করে দাও।' এবার সামনের মোড়ে সবুজ বাতি জ্বলছে, বালিগঞ্জের ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা হয়ে, ট্রাম ট্র্যাকের পাশে পাশে কয়েকটা গাছ হয়েছে, স্টপে লোকের ভিড়। তাঁদের গাড়িটা কাছে আসতেই লোকে চেঁচাচ্ছে। 'এটা কি হচ্ছে!' জীবন ক্রমান্বয়ে হর্ন দিয়ে ট্রামের ট্র্যাক থেকে রাস্তায় নামে। সামনে একটা নয় নম্বর। এটা ট্রলি বাস—প্রকাণ্ড বড়, আস্তে আস্তে রাস্তা জুড়ে চলে। জীবন হর্ন দেয়, বাসটাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করা বৃথা—জায়গা নেই। ট্রাম ট্র্যাকের দিকে আবার মুখ ঘোরাতে গিয়ে জীবন দেখে তিন চারজন লোক রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁয়ে স্টিয়ারিং চেপে ধরে জীবন। কংক্রিটে প্রবল ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা সোজা ফুটপাথে উঠে যায়। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের গাড়িবারান্দার তলা থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কয়েকজন লোক সরে যায় জীবনের গাড়ির মুখ থেকে। জীবন গালাগাল শুনতে পায়--'এই শুয়োরের বাচ্চা, হারামি...ছোট আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখে কয়েক জন তার গাড়ির পিছু নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে পিছিয়ে পড়তে থাক। তারা দূর থেকে হাত নেড়ে শাসায়। মুক্ত-অঙ্গনের সামনে জীবন ফুটপাথ ছেড়ে আবার রাস্তায় নামে। একটা ঢিল এসে পিছনের কাঁচে চিড় ধরিয়ে দিল। এতক্ষণ উত্তেজনায় অপর্ণাকে দেখেনি জীবন, এখন দেখে অপর্ণা গাড়ির দরজায় ঢলে চোখ বুজে আছে। কপালে একটু জায়গা কাটা, একটা রক্তের ধারা থুতনি পর্যন্ত নেমে এসেছে। জীবন চেঁচিয়ে ডাকে—'অপর্ণা।' আস্তে চোখ খোলে অপর্ণা, কেমন বোধ ও যন্ত্রণাহীন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ জীবনের মুখের দিকে তাকায়, হঠাৎ তীব্র আক্রোশে বলে 'তুমি ছোটলোক। তুমি বরাবর ছোটলোক, ভিখিরি ছিলে। তুমি কখনও আমার উপযুক্ত ছিলে না।' ঠিক। সে কথা ঠিক। জীবন জানে। ফাঁকা সুন্দর রাস্তার দিকে চেয়ে সে বলে, 'আমার ঘুম পাচ্ছে অপর্ণা। আমি রাস্তা ভালো দেখছি না।' অপর্ণা তেমনি আক্রোশের গলায় বলে 'ভেবো না, তুমি মরলেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি দরজা খুলে এক্ষুনি লাফিয়ে পড়ব।' বলতে বলতেই দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দেয় অপর্ণা, আধখোলা দরজার দিকে ঝুঁকে পড়ে, দ্রুত হাত বাড়িয়ে অপর্ণার কনুইয়ের ওপর বাহুর নরম অংশ চেপে ধরে তাকে টেনে আনে জীবন। বলে 'কপালটা কি করে কাটল! দরজায় ঠুকে গিয়েছিল না! রুমালে ওটা মুছে ফেল, বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।' বলতে বলতে লেকের দিকে

গাড়ির মুখ ফেরায় জীবন, বলে 'গাড়ির স্পিড, পঁচিশের মতো। এখন লাফিয়ে পড়লেও তুমি বাঁচবে না। যা নরম শরীর তোমার! কোনওকালে তো শক্ত কোনও কাজ করোনি!' বলতে বলতে হাসে জীবন। অপর্ণা রুমালে মুখ চেপে ফোঁপায়, 'কেমন অসম্ভব...অসম্ভব লাগছে...এমন সুন্দর সকালটা ছিল...মিঠু মধু আর এখন! দুজনেই হয়তো মরে যাবো।' জীবন প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে গাড়ির সিট-এর ওপরে রাখে, বলে 'একটা সিগারেট আমার মুখে লাগিয়ে দাও তো! আর ধরিয়ে দাও।' অপর্ণা কাঁপা হাতে জীবনের ঠোঁটে সিগারেট লাগায়। লেকের হাওয়া দিচ্ছে, অপর্ণা অনভ্যাসের হাতে দেশলাই ধরাতে গিয়ে পরপর কাঠি নষ্ট করে। জীবন মাথা নাড়ে 'হবে না, ওভাবে হবে না।' বলতে বলতে ঠোঁটের সিগারেট নিয়ে অপর্ণার দিকে বাড়িয়ে দেয় 'তুমি নিজে ধরিয়ে দাও। গাড়ির মধ্যে নীচু হয়ে বসে ধরাও।' অপর্ণা প্রায় আর্তনাদ করে বলে 'তার মানে? আমাকে মুখে নিতে হবে?' জীবন একবার তার দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়, 'তাড়াতাড়ি করো। আমার বিশ্রী ঘুম পাচ্ছে।' অপর্ণা একটু দ্বিধা করে, তারপর গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে মুখে লাগিয়ে সিগারেটটা ধরানোর চেষ্টা করে। ধরায়, তারপর সিগারেট জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ছোটলোক, তুমি ছোটলোক ছিলে। কোনওদিন তুমি সুন্দর কোনও কিছু ভালোবাসোনি। ভেবো না আমি টের পাইনি। কাল রাতে যখন তুমি প্যাসেজ দিয়ে আসছিলে তখন আমি ফ্রিজ-এর দরজা খোলার আর বন্ধ করার শব্দ পেয়েছিলুম।' স্টিয়ারিং হুইলের ওপর জীবনের হাতের পেশি ফুলে ওঠে 'তার মানে?' অপর্ণা হিসহিসে গলায় বলে 'ওই বেড়ালটা ওই সুন্দর কাবলি বেড়ালটা...তুমি কোনওদিন ওটাকে সহ্য করতে পারোনি।' লেক-এর চারধারে ফাঁকা রাস্তায় জীবন গাড়ি ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। হাওয়া দিচ্ছে, প্রবল হাওয়ায় তার কপালে ঘাম শুকিয়ে যেতে থাকে, আর তার আবছা মনে পড়ে...হ্যাঁ মনে পড়ে...সে ফ্রিজ-এর দরজা খুলে ছিল কাল রাতে। অপর্ণা ঠিক বলছে। অপর্ণাই ঠিক বলছে। তার গাড়ি টাল খায়, ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে একটা একটা ছেলে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, আকাশের দিকে চোখ। জীবন তার দিকে সোজা এগিয়ে যেতে থাকে, অপর্ণা চিৎকার করে ওঠে 'এই-ই-ই...' ছেলেটা চমকে উঠে তাকায়, তারপর দৌড়ে রাস্তা পার হয়। ঘুড়ির সুতো গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে লেগে দু-ভাগ হয়ে যায়। ভো-কাট্টা! জীবন হাসে। অপর্ণা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে 'আমাদের পিছনে একটা পুলিশের গাড়ি...' জীবন আয়নার তাকিয়ে একটা কালো গাড়ি দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের প্রথম রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় সে, অল্পক্ষণ পরেই তার গাড়ি লেক পার হয়ে ঢাকুরিয়া ওভারব্রিজ-এর ওপর উঠে আসে। ব্রিজ-এর নীচে একটা পুলিশ দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে তার গাড়িকে থামবার ইঙ্গিত করে। গ্রাহ্য না করে জীবন বেরিয়ে যেতে থাকে। অপর্ণা পিছু ফিরে দেখে বলে 'তোমার নম্বর টুকে নিল।' বলতে বলতেই আবার কেঁদে ফেলে অপর্ণা, 'তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তোমার অনেক বছর

জেল হওয়া উচিত।' জীবন কথা বলে না। সামনেই যাদবপুরের ঘিঞ্জি বাস-টার্মিনাস, বাজার দোকানপাট। একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে, পিছনের চাকার কাছে একটা লোক বসে ঠুকঠাক করে কি যেন ঠিক করছে, একটা সাইকেল রিকশা মুখ ফেরাল। জীবন সোজা রাখে তার গাড়ি, রিকশার সামনের চাকা আর লরির পিছনের চাকায় সেই লোকটার মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় সে স্পষ্ট টের পায় কিছু একটায় তার গাড়ির ধাক্কা লাগল, একটা চিৎকার শোনা যায়। সে মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দেখ তো লোকটা মরে গেছে কিনা! কিন্তু অপর্ণা কি বলল শুনতে পেল না জীবন। তার কান মাথা চোখ জুড়ে দপ দপ করে চমকে উঠল একটা রগ। সে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছ?' অপর্ণা অস্ফুট উত্তর দিল। শোনা গেল না। সামনে লোক, অজস্র লোক, সরু রাস্তা, রিকশা লাইন, নীচু দোকান ঘর...এইসব হিজিবিজি ছবির মতো তার চোখে দুলে দুলে উঠছিল। একটা বেড়াল, কাল রাতে একটা বেড়াল ফ্রিজ-এর মধ্যে সমস্ত রাত...না মনে পড়ে না, মনে পড়ে না...জীবন দেখল ব্যালকনিতে মধু আর মিঠু দাঁড়িয়ে, মিঠু তার বাবার মতো, মধুর তার মায়ের মতো--তারা হাত নাড়ছে, টা-টা দুর্গা দুর্গা বাবা। অপর্ণা কিছু বলছে? কি বলছো তুমি? সে জিজ্ঞেস করে, অপর্ণা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে স্টিয়ারিং সোজা রাখবার চেষ্টা করে। জীবন ঝাঁকুনি খেয়ে আবার ধোঁয়াটে ভাবটুকু কাটিয়ে নেয়। অপর্ণা কাঁদে—'কি হচ্ছে...এবার তুমি মাথা খারাপ করছ। চারজনকে ধাক্কা দিলে পর পর। ওরা ঢিল ছুঁড়ছে গালাগাল দিচ্ছে।' বাস্তবিক ঢিল এসে পড়ছিল, পিছনে লোক দৌড়ে আসছে, সামনের দিকে একটা লোক বাঁশ তুলে চিৎকার করছে 'মাইরা ফালমু...।' জীবন ক্লান্ত গলায় বলল, 'এত লোক কেন বলতো! কেন এত অসংখ্য লোক! ইচ্ছে করে খুন করে ফেলি।' জীবন বাঁশ হাতে লোকটাকে পুরোপুরি এড়াতে পারল না, গাড়ির জানালা দিয়ে লোকটা বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে সরে গেল। বাঁশের নোংরা ধারালো মুখটা তার গাল আর থুতনি কেটে গলায় ধাক্কা দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল। জীবন সিটের ওপর পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে বসে। মাথা ঠিক রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। তার চোখের সামনে হিজিবিজি, হিজিবিজি দোকানপাট, টেলিগ্রাফের পোস্ট, সিনেমার বিজ্ঞাপন, আর অজস্র মানুষের মুখ একটা ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতার ভিতরে সরে যেতে থাকে। তার মাথা টলতে থাকে, ঘুড়ির মতো লাট খায়, সে সব ভুলে একবার সিগারেটের জন্য স্টিয়ারিং ছেড়ে হাত বাড়ায়, আবার স্টিয়ারিং চেপে ধরে। অপর্ণা কেবলই কি যেন বলছে, সে বুঝতে পারছে না। এখনও তার ট্যাঙ্ক ভরতি পেট্রল। সে কল কল শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ক্রমে বাঘা যতীন বৈষ্ণবঘাটা পেরিয়ে যায় জীবন। গড়িয়ার পর হু হু করা রাস্তা। কিন্তু জীবনের কাছে ক্রমে সবকিছুই আবছা হয়ে আসছিল। হঠাৎ জীবন যেন শেষ চেষ্টায় ব্রেকে পা দেয়, তারপর স্টিয়ারিং ছেড়ে দু হাত শূন্যে তুলে বলে 'অপর্ণা আমি আর পারছি না,

পারছি না...' গাড়ি বেঁকে গেল রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে এল মাঠের ওপর। উঁচুনীচু খোয়াইয়ের মতো জমির ওপর দিয়ে কয়েক গজ এগিয়ে কাত হয়ে থেমে পড়ল।

আস্তে আস্তে চোখ খোলে জীবন। অপর্ণা গাড়ির ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেছে। ছোট্ট ছাইরঙা একটা পুঁটুলির মতো দেখাচ্ছে তাকে। জীবন আপন মনে হাসে, দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এখনও সকালের মতো নরম রোদ, ধান কেটে নিয়ে যাওয়া খেত। জীবন হাত পা ছড়িয়ে একটু দাঁড়ায়, তারপর এসে দরজা খুলে অপর্ণাকে বের করে, মাঠের ওপর শুইয়ে দেয়। আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দেয় তাকে 'অপর্ণা, এই অপর্ণা...গালে থুতনিতে তীব্র জ্বালা টের পায় সে। গলায় ডেলা পাকানো ব্যথা। এখনও অল্প ধোঁয়াটে। অপর্ণা চোখ খোলে, অনেকক্ষণ জীবনের দিকে অর্থহীন চেয়ে থাকে। জীবন হাসে--'ওঠো। উঠে বোসো। আমরা বেঁচে আছি।'

অপর্ণার চোখ জীবনের মুখ থেকে সরে আকাশের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্য উড়ে যায়। তারপর আঁচল সামলে সে উঠে বসে। তার মুখের কঠিন একটু নিষ্ঠুর অথচ সুন্দর পাথরের মতো প্রোফাইল ঘাসের সবুজ পশ্চাৎভূমিতে জেগে ওঠে। জীবনের মন গুনগুন করে ওঠে, 'ঝরনা, তোমরা স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' অপর্ণা দাঁড়িয়ে বলে, 'এবার, তাহলে?' জীবনের দিকে চায়, 'তোমার মুখের ডানদিক কী ভীষণ লাল হয়ে আছে, কেটে গেছে অনেকটা!' জীবন হাতে অবহেলার ভাব ফুটিয়ে বলে 'ও কিছু না।' রাস্তা থেকে জমি পর্যন্ত এমন কিছু ঢালু নয়। জীবন ভেবে দেখে সে একাই গাড়িটা ঠেলে তুলতে পারবে। কয়েকজন পথ চলতি লোক দাঁড়িয়ে গেছে, মাঠের ওপর দিয়ে দূর থেকে দৌড়ে আসছে কয়েকটা কালো কালো ছেলেমেয়ে। জীবন অপর্ণাকে বলে, 'তুমি গাড়িতে উঠে বোসো, আমি এটাকে ঠেলে তুলছি।' অপর্ণা ভ্রূ কোঁচকায়, 'তুমি একা পারবে কেন?'—পারব।' অপর্ণা মাথা নাড়ে 'তা হয় না।' পরমুহূর্তেই একটু অদ্ভুত নিষ্ঠুর হাসি হাসে সে 'এক সঙ্গেই মরতে যাচ্ছিলুম দুজনে। তা ছাড়া আমি তো তোমার সহধর্মিণীও, অনেক কিছুই ভাগ করে নেওয়ার কথা আমাদের। বলতে বলতে সে কোমরে আঁচল জড়ায়, গাড়িতে হেঁইয়ো' বলে ঠেলা দেয়, রাস্তার লোকেরাও কয়েকজন নেমে আসে। কোথায় যাবে এটাকে নিয়ে!' জীবন চিন্তিত মুখে বলে 'কিছু দূরেই বোধ হয় একটা পেট্রল পাম্প আছে।' যারা ঠেলছিল তাদের একজন সায় দেয় 'হ্যাঁ, আছে।'

বুড়ো মেকানিক খোলা বনেটের ভিতর থেকে তুলে জীবনের দিকে তাকায় 'কই! কিছু পাচ্ছি না তো! কোনও গোলমাল নেই ইঞ্জিনে। জীবন চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে, 'আমি জানি যে-কোনও গোলমাল নেই।' মেকানিক ঝাড়নে হাত মোছে--'চালিয়ে দেখব?' জীবন মাথা নাড়ল না। বলল, 'বোধ হয় হর্নটায় একটু...' মেকানিক বলল, 'কানেকশনের গোলমাল? আচ্ছা দেখছি।' কয়েক মিনিটেই কাজ সারা হয়ে গেল। অপর্ণা পেট্রল পাম্পের অফিস ঘরে বসে ছিল। জীবন ডাকতেই উঠে এসে গাড়ির কাছে একটু

থমকে দাঁড়াল। জীবন তাকিয়ে ছিল। একটুও দ্বিধা না করে গাড়িতে উঠে বসল। জীবন গাড়ি স্টার্ট দেয়।

সারা রাস্তায় আর কথা হয় না দুজনে।

*

সন্ধ্যাবেলায় জীবন বসবার ঘরে সোফায় জানালার দিকে মুখ রেখে এলিয়ে পড়েছিল। মধু আর মিঠু আতরের সঙ্গে বেড়াতে গেছে পার্কে। জীবন মনে মনে ওদের জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। অপর্ণা এসে সামনেই দাঁড়াল! জীবন একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

অপর্ণা জানালার থাকের ওপর বসে বলে, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

জীবন দু আঙুলে কপাল টিপে রেখে বলে, 'বলো।'

অপর্ণার মুখ খুবই গম্ভীর--'যখন পেট্রল পাম্পে বসেছিলুম, তখন ওখানকার লোকটার সঙ্গে কথা হল আমার। আমি গাড়ির কিছুই বুঝি না, কিন্তু লোকটাকে যখন আমাদের গাড়ির গোলমালের কথা বললুম, তখন সে খুব অবাক হয়ে বলল অত গোলমাল এক সঙ্গে একটা গাড়ির হতে পারে না। গাড়ি থামাবার অনেক উপায় নাকি ছিল।'

জীবন হাসে--'ঠিক। সে কথা ঠিক।'

'তবে গাড়ি থামেনি কেন?'

জীবন মাথা নাড়ে, 'গাড়ি থামেনি গাড়ি থামানো হয়নি বলে।'

'কেন? তুমি কি ঠিক করেছিলে আমাকে নিয়ে সহমরণে যাবে! নাকি এ তোমার খেলা?'

জীবন অস্থির চোখে অপর্ণাকে দেখে, 'খেলা!' পরমুহূর্তেই মুখ নীচু করে মাথা নাড়ে আবার, 'কি জানি কেন আমি গাড়ি থামাতে পারিনি। থামানো সম্ভব ছিল না--এইমাত্র।'

'কেন?'

'কেন!' জীবন শূন্য চোখে চারপাশে চায়, ভেবে দেখবার চেষ্টা করে, তারপর অসহায়ভাবে বলে, 'কেন, তা তুমি বুঝবে না।'

ভ্রূ কোঁচকায় অপর্ণা, 'বুঝবো না কেন? বোঝাও। আমি বুঝবার জন্য তৈরি।'

জীবন অপর্ণার চোখ এড়িয়ে যায়, কি একটা কথা যেন বলবার ছিল কিন্তু তা খুঁজে পাচ্ছে না সে, তবু সে ম্লান হেসে হালকা গলায় বলে 'তুমি কোনওদিন আমাকে সুন্দর দেখোনি, তাই না! কিন্তু আজ যখন ওই ভিড়ের রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে অ্যাকসিডেন্টের ওই ভয়ের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম--আমার মনে হয়--তখন আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তুমি দেখোনি।'

জীবন মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে অপর্ণার মুখে রাগে ঝলমল করে উঠল, 'সুন্দর। কিসের সুন্দর। তুমি জানতে না তোমার সংসার আছে? দুটো বাচ্চা শিশু মেয়ে তোমার? তোমার নিজের হাতে তৈরি কারখানা যা অনেক কষ্টে তৈরি করতে হয়েছে? কতগুলো মানুষ তোমার ওপর নির্ভর করে আছে সে কথা তুমি কি করে ভুলে যাও?'

জীবন বুঝতে পারে সে অপর্ণার সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে, বস্তুত তার কোনও যুক্তিই নেই, তবু হাসিঠাট্টা বজায় রাখবার চেষ্টায় সে বলে 'বোধহয় তোমার কাছে একটু বাহবাও পেতে চেয়েছিলুম। তুমি তা দাওনি। কিন্তু মনে রেখো রাস্তার ওই ভিড়, পর পর অত বিপদের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে গেছি, একবারও থামেনি। মনে রেখো, একবারও থামিনি।'

রাস্তার একটা ন্যাংটো পাগলের দিকে লোকে যেভাবে তাকায় সেভাবেই অপর্ণা জীবনের দিকে এক পলক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর এই প্রথম সে জীবনকে নাম ধরে ডাকে, 'জীবন তুমি ছিলে রাস্তার ছেলে প্রায় ভিখিরি। তোমার সঙ্গে কোনও ব্যাপারেই আমার মিল নেই। ভাগ্য তোমাকে এতদূর এনেছে। তবু আজ ওই কাণ্ড করে তুমি সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে চেয়েছিল। ডোবাতে চেয়েছিলে নিজেকে, আমাদেরও। এর জন্যই কি তুমি বাহবা চাও?'

জীবনের মাথার জল টলমল করে উঠে। অপর্ণার কথার ভিতর কোথায় যেন একটা সত্য ছিল, কিন্তু জীবন তা ধরতে পারে না। তার প্রাণপণ ইচ্ছে হয় অপর্ণার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে--তুমি ঠিক বলেছো অপর্ণা। ঠিক বলছো। এই ঘর বাড়ি সংসার আমার নিজের বলে মনে হয় না। এখানকার খাবারে আমি এক কণা স্বাদ পাই না। আমার কেবলই ইচ্ছে এই সব কিছুর বুকের ওপর দিয়ে একবার জোরে চালিয়ে দিই আমার গাড়ি। কিন্তু সে সব কিছুই বলে না জীবন, মুখে মৃদু হাসি টেনে আনে, তেমনি ঠাট্টার সুরে বলে, 'জীবনে সে কয়টি মুহূর্তই দামি যে সব মুহূর্তে মানুষ মানুষকে সুন্দর দেখে। জন্ম থেকে তুমি কি কেবলই শিখেছো কি করে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়?'

মাথার ভিতরে, বুকের ভিতরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা বোধ করে জীবন। অপর্ণা নিষ্ঠুর ধারালো চোখে কিছুক্ষণ চুপ করে তার দিকে চেয়ে তাকে, তারপর সামান্য বিদ্রুপের মতো করে বলে, 'হায়, আমাদের কাবলি বেড়ালটারও সেই দামি মুহূর্ত, বোধ হয় কাল রাতে এসেছিল যখন তাকে তুমি সুন্দর দেখেছিলে। আমি, আর তোমার দুই মেয়ে তো সুন্দর জীবন, তাদের জন্য এবার একটা বড় দেখে ফ্রিজ কেনো। দোহাই, জোরে গাড়ি চালিয়ে নাটক কোরো না।'

হঠাৎ তীব্র এক অসহায়তা সঙ্গীহীন জীবনকে পেয়ে বসে। তার মাথার ভিতরে কল চলবার শব্দ, বুকের ভিতরে কেবলই একটা রবারের বল লাফিয়ে ওঠে। তবু তার এই কথা বলবার ইচ্ছে হয়--ঠিক, তুমি ঠিকই বলছ অপর্ণা; আমার ওই রকমই মনে হয়। এই

সব ভেঙেচুরে শেষ করে দিয়ে আমার আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে ছেলেবেলার সেই চায়ের দোকানের উনুনের পাশে, চট আর ছেঁড়া শতরঞ্চির বিছানায়, যেখানে দুঃখী রোগা এক মায়াবী বেড়াল আমার শিয়রের কাছে শুয়ে থাকবে সারারাত। কিংবা ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই মোটর সারাই কারখানায়, যেখানে লোহার জোড় মেলাতে মেলাতে আমি কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুল দেখে গান গাইবো আবার। হ্যাঁ, অপর্ণা, আমি এখনও ছোটলোক, ভিখিরি। মুখে মৃদু হাসল জীবন তার মুখ সাদা দেখাচ্ছিল, কোনওক্রমে সে গলায় স্বরে এখনও সেই ঠাট্টার সুর বজায় রাখছিল, 'কে জানে তোমার কাবলি বেড়ালটাও আত্মহত্যা করেছিল কিনা!'

অপর্ণা কি বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে জীবন বলে, 'চুপ, অপর্ণা!' তারপর [illegible] গলায় জীবন বলে, 'তুমি সহমরণের কথা বলছিলে না। ধরে নাও আজ আমি তোমাকে সহমরণেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম। তুমি বুঝবে কি এসব অপর্ণা?'

অপর্ণা মাথা নাড়ে--না। তার চোখে জল, আর মুখের প্রতিটি রেখায় রাগ আর আক্রোশ। সে জীবনের দিক থেকে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে চলে যায়। জীবন বাধা দেয় না। শুধু এতক্ষণ অপর্ণা যে জায়গায় বসেছিল সেইখানে গম্ভীর চোখে চেয়ে থাকে, যেন এখনও অপর্ণা বসে আছে।

ঘরে কেউ ছিল না, তবু হঠাৎ জীবন চমকে উঠে বলে 'কে? তারপর শূন্য চোখে চারদিকে চায়। সিগারেট আর দেশলাইয়ের জন্য চারদিকে হাতড়ে দেখে। বড় ক্লান্তি লাগে জীবনের, এলোমেলো অনেক কথা তার ভিতর থেকে ঠেলে আসতে চায়। মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করতে থাকে। সে ভীষণ অন্যমনস্কের মতো বলে, 'আঃ, অপর্ণা...!' পরমুহূর্তে চমকে ওঠে 'কেউ কি আছো?' কেউ ছিল না, তবু জীবন একবার পরম বিশ্বাসে দুটো হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে শূন্যে তুলে ধরে, যেন ভিক্ষুকের মতো বলতে চায়- আমাকে নাও।

দরজার কাছে থেকে মিঠু ডাকে, 'বাবা!'

অলীক আত্মসমর্পণের এক শূন্যতা থেকে জীবন আবার শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের বাস্তবতার ভিতরে দ্রুত ফিরে আসে।

তিন টুকরো গল্প

১। ঘুষ

গোবিন্দর পিছনে যে গোয়েন্দা লেগেছে তা বুঝতে তার কয়েকদিন সময় লাগল। আসলে লোকটাকে বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে প্রথমে তাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহই হয়নি। লোকটির চেহারা বেশ শক্তপোক্ত, রুক্ষ, রাগী-রাগী, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাড়ি প্রায়ই কামানো থাকে না, পরনে সাধারণ জামা আর প্যান্ট। সে আড়ে আড়ে বাড়ির ওপর নজর রাখে, চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নেয়, তবে পালায় না।

প্রথমে গোবিন্দর সন্দেহ হল, লোকটা তার বউয়ের গুপ্ত প্রণয়ী বা জার। তাই সে একদিন খুব সাহস সঞ্চয় করে বউ শাশ্বতীকে ডেকে বলল, লোকটা কে?

শাশ্বতী মেদ কমানোর জন্য ব্যায়াম করছে, নাচ শিখছে। সুফলও ফলেছে। আজকাল তাকে বেশ ছুকরি-ছুকরি লাগে। প্লাক করা ভ্রূ ওপরে তুলে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, কোন লোকটা গো?

ওই যে, ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই ওকে আনাচে কানাচে দেখি ও তোমার ইয়ে টিয়ে নয় তো!

শাশ্বতী জানালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফটকের পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে তার স্টেপ কাট করা চুল ঝামরে বলল, কখনও নয়। ও মা, এসব আবার কী কথা তোমার মুখে! লোকটাকে তো আমি চিনিই না।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শুরু হল। সেই ঝগড়া চলল তিন দিন। তার পর মান অভিমান, কান্নাকাটি। শাশ্বতী অবশেষে বলল সে একমাত্র তার ব্যায়ামশিক্ষক জগুদা ছাড়া আর কোনও লোককেই তার যোগ্য প্রণয়ী বলে মনে করে না।

একথা শুনে গোবিন্দ একটু নিশ্চিন্ত হল বটে, কিন্তু সন্দেহ গিয়ে পড়ল বড় মেয়ে পিয়ালীর ওপর। লোকটা পিয়ালীর প্রেমিক নয় তো!

কথাটা একদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলতেই পিয়ালী গম্ভীর মুখ করে বলল, হাবুলদা ছাড়া আমার জীবনে আর কোনও--

গোবিন্দ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল বটে, কিন্তু লোকটা তাহলে কে এই প্রশ্নটা কেরোসিনের গন্ধের মতো চারপাশের বাতাসে লেগেই রইল।

তবে কি গোয়েন্দা? বলতে কি গোবিন্দের ওপর গোয়েন্দাদের নজর পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। গোবিন্দ যে ইদানীং শাঁসালো হয়ে উঠছে তা বহু চেষ্টা করেও গোপন রাখা যাচ্ছে না।

গোবিন্দ শুরু করেছিল একেবারে শুরু থেকে অর্থাৎ 'কিছু না' থেকে। তারপর ধীরে ধীরে তার উন্নতি ঘটেছে এবং এখনও ঘটেই চলেছে। একবার উন্নতি শুরু হলে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য। কিন্তু গোবিন্দ বোকা নয়। সেতার উন্নতিকে যথেষ্ট সাবধানে এবং বিস্তর চেষ্টায় গোপন রাখে। সেতার নতুন জামায় তালি লাগিয়ে নেয়। ছেঁড়া জুতো পরে, পুরোনো ছাতা ব্যবহার করে, দুদিন পর পর দাড়ি কামায় ইত্যাদি। সে তার বাড়িটাকে

ইচ্ছে করেই সম্পূর্ণ করেনি, একটু শ্রীছাতহীন করে রেখেছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তার আট দশটা লকার আছে, বাড়িতে মাটির নীচে আছে গুপ্ত কুঠুরি। কিন্তু সেগুলিতে সামান্যই সোনাদানা আছে তার। তার যত টাকা সবই নানা কারবারে উৎপাদনে, ঋণপত্রে লগ্নি করা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, গোবিন্দ যখন খুব গরিব ছিল তখন সে দেখেছে যে দারিদ্র্য জিনিসটাকে কিছুতেই ঢাকাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়েই এবং পাঁচজনকে জানান দেয় যে, এই লোকটা আসলে গরিব। মাছ দিয়ে শাক ঢাকছে। আবার সম্পদ জিনিসটাও ঠিক তাই, যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক না কেন, নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে সম্পদ উঁকি মারবেই এবং পাঁচজনকে জানান দেবে যে, এই লোকটা আসলে শাঁসালো। শাক দিয়ে মাছ ঢাকছে।

গোবিন্দের বউ লোক-দেখানো গয়না পরেন বটে, কিন্তু তাঁর বাঁ হাতের অনামিকায় যে হিরের আংটিটা আছে তার দাম ত্রিশ হাজার টাকা। আর ব্যায়ামের শিক্ষক আর নাচের গুরু মাসে পাঁচশো টাকা করে নেয়। বিউটি পারলারেও নিশ্চয়ই মোটা খরচ হয়, তার রেট গোবিন্দও অবশ্য জানে না। সে নিজে তালি দেওয়া জামা আর তালি দেওয়া জুতো পরলেও তার ছেলেমেয়ে বাজারের সেরা জামা জুতো পরে, সেরা স্কুলে পড়তে যায় এবং প্রত্যেকের আবার প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা গৃহশিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা কেউ পাঁচশো টাকার কম নেন না। ষাট সত্তর টাকা থেকে দেড়শো টাকা কিলোগ্রামের মাছ তারা ফেলে ছড়িয়ে প্রতিদিন খায়। এসব কি আর গোপন থাকে?

সম্পদ হল নতুন প্রেমে পড়া কিশোরীর মতো, সারাক্ষণ ফাঁক-ফোকর দিয়ে উঁকি ঝুঁকি দেয়। আর তখন ওই গোয়েন্দাটার সঙ্গে কি আর চোখাচোখি হয় না তার?

লোকটা যে গোবিন্দের ওপর নজর রাখছে তা সে গোপনও করছে না তেমন। এবং লোকই তার সম্বন্ধে কী ভাবছে তা আন্দাজ করতেই গোবিন্দ ভীষণ লজ্জা হয়। ভয় তো আছেই।

গোবিন্দ যতই গরিব সেজে থাকুক তার হাতঘড়িটার দাম চার হাজার টাকা। সেদিন বেরোবার সময় গোবিন্দ লক্ষ করল, লোকটা ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আড়চোখে তার ঘড়িটাকে নজর করছে। গোবিন্দর বুকটা কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ঘড়িটা কানের কাছে তুলে একটু ঝাঁকিয়ে শোনার ভান করে স্বগতোক্তি করল, এ বন্ধ হয়ে গেছে। হবে না। আশি টাকার সস্তা ঘড়ি আর কদিন চলবে।

শাশ্বতী যথেষ্টই সুন্দরী। ইদানীং ব্যায়াম করে আর নেচে আরও সুন্দরী হয়েছে। খঞ্জনা পাখির মতো শরীর। রাস্তায় বেরোলো পাঁচজনে তাকায় এবং তারিয়ে তারিয়ে দেখে। কিন্তু নির্লজ্জ গোয়েন্দাটা শাশ্বতীকে না দেখে বাঁ হাতের হিরের আংটিটার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে।

বাজারে গিয়ে মাছ বা অসময়ের দামি ফুলকপি কিনতে গিয়ে গোবিন্দ প্রায়ই টের পায় গোয়েন্দা তার ঘাড়ে শ্বাসফেলার মতো দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা সি বি আই না ইনকাম ট্যাক্স না অ্যান্টি করাপশান না আর কিছু তা বুঝতে পারছে না গোবিন্দ। কিন্তু অবস্থাটা যে চলতে দেওয়া যায় না তা সে বেশ বুঝতে পারছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

গোবিন্দ তক্কে তক্কে রইল। আর একদিন শীতের রাতে গলির মধ্যে লোকটাকে একা পেয়ে গেল। লোকটা একটু আনমনা ছিল সেদিন। আকাশের চাঁদ দেখছিল।

গোবিন্দ খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে বিগলিত গলায় ডাকল, স্যার?

অ্যাঁ?

আপনি কি ঘুষ খান?

লোকটা একেবারে আঁতকে উঠে গোবিন্দর দিকে বাক্যহারা হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল।

কী বললেন?

গোবিন্দ হাসিটাকে বিগলিত করে করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল আজ্ঞে জিগ্যেস করছিলুম আপনি কি ঘুষ খান?

লোকটা কথা শুনে নববধূর মতো মাথা নত করে ফেলল লজ্জায়। তারপর অতিশয় লাজুক হাসি হাসতে হাসতে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে প্রায় ফুলশয্যার রাতের নববধূর মতোই ফিসফিস করে বলল, খাই।

আজ্ঞে এখন কি খাবেন?

লোকটা লজ্জায় চোখ পর্যন্ত তুলতে পারল না। তবে খুবই অনুরাগে ভরা গলায় বলল, পেলেই খাই। কেউ তো দেয় না স্যার।

গোবিন্দ তৈরিই ছিল। পকেটে হাত ভরে দশ টাকার একখানা নোট বের করে লোকটার লাজুক হাতে ধরিয়ে একেবারে আদর করে মুঠি পাকিয়ে দিল।

লোকটা নববধূর মতোই প্রথম পুরুষস্পর্শের লজ্জাতেই যেন চট করে হাতটা টেনে নিয়ে প্যান্টের পকেটে পুরল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, এর অবশ্য তেমন দরকার ছিল না স্যার।

গোবিন্দ গাঢ় স্বরে বলল, দুনিয়াটা টিঁকে আছে তো এই পরস্পরকে দেখার মধ্যেই। আপনি অমাকে দেখবেন, আমি আপনাকে।

বড় ভালো কথা স্যার, বাড়ি গিয়ে খাতায় টুকে রাখব। মহাপুরুষদের বাণী নোট করে রাখা আমার একটা হবি স্যার।

ঠাট্টা করছেন স্যার? মহাপুরুষ আর হতে পারলুম কই? আমি তো কাপুরুষ। রেটটা বোধ হয় একটু কম হয়ে গেল স্যার। গরিব মানুষ আমি, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার

ওপর আপনিই তো শুধু নন, আপনার ওপরওলা সাহেবরা আছেন, তার ওপর কর্তারা আছেন, তার ওপর খোদ কর্তারা আছেন, তাঁদেরও খুশি করতে হবে। তা কটা বাজে বলতে পারেন স্যার? ঘড়িটা কখন থেকে বন্ধ হয়ে আছে।

আজ্ঞে এই দশটা। আপনার সব কথাই আমি খাতায় টুকে রাখব স্যার। একসঙ্গে এত ভালো ভালো কথা বহুকাল শুনিনি।

আর ঠান্ডা লাগাবেন না। রাতও হয়েছে শীতের রাতে খাবার বড় তাড়াতাড়ি জুড়োয়।

লোকটা বিরহের দৃষ্টিতে একবার গোবিন্দর দিকে চেয়ে চলে গেল।

দুদিন পর ফের দেখা। রাতের গলিতে। এবার লোকটাই ডাকল, স্যার।

গোবিন্দ একটু থমকে বিগলিত হাস্যে মুখ ভরিয়ে ফেলে বলল, ভালো আছেন তো স্যার?

আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। বলছিলুম কি, আমি কিন্তু ঘুষ খাই স্যার। এখনও পেলেও খাই—

গোবিন্দ খুব বিজ্ঞের মতো হাসল। প্রথম দিন থেকে সে রেটটা কম রেখে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছে, মাঝে মাঝে দশটা টাকা দিতে এমন কিছু গায়ে লাগে না। একশো টাকা হলে লাগত। ফের দশটা টাকা লোকটার লাজুক মুঠির মধ্যে ভরে দিয়ে সে বলল, আরে তাতে কি, খাওয়াই তো দুনিয়ার সব। এই যে বাড়ি ফিরে গিয়ে মোটা চালের ঠান্ডা ভাত আর জলের মতো একটু ডাল, কালো মতো একটা ছেঁচকি কয়েক ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে গিলব স্যার, তার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম আনন্দ আছে।

একথাটা যা বলেছেন, আর কোনও শালার মহাপুরুষ বলতে পারেননি। ডট পেনটার রিফিল ফুরিয়ে না গেলে আজই গিয়ে লিখে ফেলতাম!

লোকটাকে নিজের পকেটের দামি ডট পেনটা উদারভাবে দিয়ে গোবিন্দ একটু হাসল, বলল, কিসব ছাতামাথা বলি, তবু যদি লিখে রাখবার ইচ্ছে হয় স্যার তো লিখবেন। তবে রিপোর্টটা একটু গরিবের দিকে টেনে লিখবেন স্যার। আপনার ডট পেনের রিফিল আমি কখনও ফুরোতে দেবো না।

লোকটা চলে গেল দু-চার দিন পর আবার এল।

স্যার।

স্যার।

কী যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন স্যার, আর ছাড়তে পারছি না। কীসের নেশা স্যার?

আজ্ঞে ঘুষের, ঘুষ না খেলে কেমন যেন শরীটা ঘুষঘুষ করে। আইঢাই করে, হাই ওঠে, ঘুম পায়, দুঃস্বপ্ন দেখা দেয়, কী নেই কী নেই মনে হয়। ওফ, জবর নেশা বটে। তিন দিন হল ঘুষ খাইনি স্যার, দেখুন কেমন দড়ি পাকিয়ে গেছি।

আহা! আগে বলতে হয়। এই যে—বলে ফের দশটা টাকা তার কুণ্ঠিত মুঠিতে ভরে তার গোবিন্দ। তারপর বলে, আচ্ছা আপনি কি সি বি আই?

আজ্ঞে না।

তবে কি ইনকাম ট্যাক্স?

আজ্ঞে না।

অ্যান্টি করাপশানই তাহলে?

আজ্ঞে না।

তাহলে আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের?

তোফাজ্জেলের কারখানায় বিড়ি বাঁধার কাজ করি স্যার। বড় ছেলেটা লায়েক হয়েছে। তা একটা চাকরির জন্যই ঘোরাঘুরি করছিলুম স্যার আপনার কাছেপিঠে। কিন্তু ওফ, ছেলের চাকরির চেয়েও বড় জিনিস আপনি দিয়েছেন স্যার আমাকে। কী নেশা; কী নেশা! একদিন ঘুঘ না খেলেই হাত নিশপিশ করে, নাক সুড়সুড় করে, মাথা ভোঁ ভোঁ করে। ঘুষের মতো জিনিস হয় না।

অ্যাঁ। বলে গোবিন্দ হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর রাগ করে বলল, আরে মশাই, আপনি তো মহা ইয়ে দেখছি, এঃ, আমি আপনাকে ইয়ে মনে করে এতগুলো টাকা গচ্চা দিলুম।

লোকটা সবেগে মাথা নেড়ে বলল, গচ্চা নয় স্যার, লোকশিক্ষা। ঘুষ কাকে বলে কখনও জানতুম না স্যার, আপনা দয়ায় জানলুম। এও জানলুম, ঘুষ ছাড়া মানুষের জীবনটাই আলুনি বিস্বাদ। কি করে যে এত কাল ঘুষ না খেয়ে বেঁচে ছিলুম তাই ভাবি আর অবাক হই। ঘুষটা বন্ধ করবেন না স্যার, মরে যাবো।

গোবিন্দ রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, তা বলে-রাগ করবেন না স্যার। আপনার ভুল হয়নি। ঘুষ জিনিসটায় আমাদের সকলেরই জন্মগত অধিকার। কিন্তু পায় কয়জন? আপনার দয়ায় এই আমি পেয়েছি।

তা বলে তোমাকে ঘুষ দিতে যাবো কেন অ্যাঁ!

লোকটা চোখ নামিয়ে নববধূর মতো লাজুক গলায় বলল, সব খবরই নিয়েছি স্যার। হিরের আংটি, চার হাজার টাকা দামের ঘড়ি, পাঁচশো টাকার মাস্টার—

গোবিন্দ লোকটার কাঁধে হাত রেখে হাসল। বলল, ঠাট্টা করছিলুম, কিছু মনে করবেন না। মাঝে মাঝে আসবেন। পরস্পরকে আমরা না দেখলে কে আর দেখবে!

আজই খাতায় টুকে ফেলব স্যার।

২। ক্ষুধা ও জাতীয় সংহতি

ক্ষুধা কথাটার মানে ব্যাকরণ বইতে আছে 'খাইবার ইচ্ছা'। চারুবাক মানেটা জানে। আর এও জানে এত বড় ভুল মানে আর হয় না! অন্তত তার ক্ষেত্রে তো বটেই। চারুবাকের খিদে পায়, গনগনে খিদে পায়, কিন্তু কখনও ওই 'খাইবার, ইচ্ছা' হয় না। পৃথিবীতে এত রকমের খাবার, তার কোনওটাই তার কখনও মুখে তুলতে ইচ্ছে করে না। খাওয়ার কথা ভাবলেই সে ভয়ে শিউরে ওঠে। খাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলেই তার মন খারাপ হয়ে যেতে থাকে। খাবার মুখে তোলা, চিবোনো এবং তা গিলে ফেলা পৃথিবীতে তার কাছে সবচেয়ে অনভিপ্রেত এবং শ্রমসাধ্য কাজ। পেটে খিদে নিয়েই দিব্যি দিন কাটিয়ে দিতে পারে সে। দিনের পর দিন।

শিশুকালে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে তার মাকে হিমশিম খেতে হয়েছে। বুকের দুধ বা ফিডিং বটলের চুষি মুখে নিত না বলে তাকে থাপ্পড় মেরে বা চিমটি কেটে কাঁদিয়ে নিয়ে ঝিনুক দিয়ে গেলানো হত। প্রায়ই সেই দুধ উগড়ে দিত সে।

বড় হয়ে চারুবাক যে বেঁচে আছে এটাই অনেকের কাছে বিস্ময়। তার বউ শীলার কাছেও। শীলা চাররুবাকের এই অরুচি দেখে দেখে পাগল হওয়ার উপক্রম। তাকে খাওয়াবেই এই জেদবশে সে হাজার রকমের রান্না শিখেছে, রেঁধেছে, কিন্তু চারুবাক এমনভাবে নাক কুঁচকে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে যে অনেকবার আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে শীলার।

কেন খাবে না, কেন খাও না তুমি। কীভাবে বেঁচে থাকবে তবে?

শীলার এই আর্ত প্রশ্নের সামনে খুবই সংকুচিত হয়ে চারুবাক বলে, বেঁচে তো আছি। রোগা হলেও দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছি তো।

কিন্তু আমি যে এত যত্ন করে রাঁধি, এত আদর করে বেড়ে দিই?

তা বটে, কিন্তু পৃথিবীর কোনও খাবারই আমার রোচে না।

শীলা রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে। চারুবাক নির্বাক হয়ে বিষণ্ণ বদনে বসে থাকে।

চারুবাক ফ্রিজ পছন্দ করে না। বাড়ির মধ্যে দুটি ঘরে সে পারতপক্ষে ঢোকে না-- রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘর। সে সবজি বা মাছের বাজারে যেতে খুবই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সে মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

একদিন দুদিন পর নিতান্তই বেঁচে থাকার জন্য কিছু না কিছু খেতেই হয় চারুবাককে। সেই সময়টা তাঁর মুখে ফুটে ওঠে ভয়, ক্রোধ, অসহায়তা। ডাক্তাররা তার এই অরুচির কারণ খুঁজতে গিয়ে হার মেনেছেন। স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়া বা হাওয়া বদল গেছে বৃথা! চারুবাকের খিদে পায় শুধু 'খাইবার ইচ্ছা' কখনওই হয় না।

একটা সেমিনারে দিল্লি যাচ্ছিল চারুবাক। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। গিন্নি, ছেলে, মেয়ে শালাশালির বাহিনী নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেশ ধমক চমক করে কথা

বলেন, আত্মবিশ্বাস প্রবল। লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক চারুবাককে পেটে আঙুলের খোঁচা মেরে তিনি অম্লানবদনে বললেন, আমি এদের নিয়ে বেরিয়েছি জাতীয় সংহতি জিনিসটা বোঝানোর জন্য। ঘুরবে ফিরবে, মিশবে, দেখবে, শিখবে, তবে না সংহতির বোধটা আসবে।

চারুবাক বলল, তা বটে।

চারুবাকের পেটে দ্বিতীয় খোঁচাটা মেরে ভদ্রলোক বললেন, জাতীয় সংহতি জিনিসটা অত সহজ নয় মশাই। এই যে খালিস্তান নিয়ে লড়ালড়ি, গোর্খাল্যান্ড নিয়ে ধানাইপানাই কেন জানেন?

আজ্ঞে না।

খুব সোজা মশাই, খুব সোজা, ভারতীয় হিসেবে তারা নিজেদের আইডেনটিফাই করতে পারছে না যে। এত বড় একটা দেশ, এতগুলো ভাষা, এত ধর্ম, আইডেনটিফাই করা কি সোজা? মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় না? এই যে আমরা এক পরিবারের এতগুলো লোক একসঙ্গে চলেছি এই আমরাই মাঝে মাঝে আইডেনটিটি হারিয়ে ফেলি। তাই আমি--

এই সময়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী একটা কাঁসার রেকাবিতে এক গোছা লুচি আর আলুর ছেঁচকি ভদ্রলোককে এগিয়ে দেওয়াতে কথায় বাধা পড়ল। খাবার দেখে চারুবাকও তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ঘুমের ভান করতে লাগল।

তবে লোকটা খাওয়া সেরে আরও কিছুক্ষণ জাতীয় সংহতির কথা বলে আপার বাংকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালেবেলায় বাংক থেকে নেমে লুঙ্গির কষি আঁটতে আঁটতে চারুবাকের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ যে কথাটা হচ্ছিল। ভারতীয় হিসেবে আমাদের আইডেনটিটি কী মশাই? অ্যাঁ! আইডেনটিটিটা কী? আমি যে ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ানরা যে এক পরিবারের লোক তা আমি ফিল করব কীভাবে?

চারুবাকের ট্রেনে ভালো ঘুম হয় না। মেজাজ শরীর দুই-ই বিগড়ে আছে কোনওরকমে দেঁতো হাসি হেসে বলল, প্রবলেম, দারুণ প্রবলেম।

নো প্রবলেম। জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে হলে কী করা উচিত জানেন? করা উচিত—

বলতে বলতে ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালেন। তাঁর স্ত্রী তাড়াতাড়ি একটা লাল রঙের টুথব্রাশ বের করে পেস্ট লাগিয়ে স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিলেন, ভদ্রলোক সবেগে দাঁতে ব্রাশ চালাতে চালাতে বললেন, একটা ফ্যামিলি গড়ে তোলা উচিত। আর ফ্যামিলি গড়ে তুলতে হলে—

বাকি কথাটা পেস্টের পিচ্ছল ফেনায় চাপা পড়ে গেল। ভদ্রলোক বেসিন থেকে মুখ ধুয়ে এসে ব্রাশটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে বললেন, হ্যাঁ ফ্যামিলি গড়ে তুলতে হলে—

কথাটা ভালো শুনতে পেল না চারুবাক। কারণ সে সবিস্ময়ে দেখল ভদ্রলোকের স্ত্রী লাল টুথ ব্রাশটা হাতে নিয়ে তাতে ফের পেস্ট লাগিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

চারুবাক একটা শব্দ করল, ওয়াক—

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, ওয়ার্ক দিয়ে কিছু হবে না মশাই। জাতীয় সংহতি গড়ে না উঠলে ওয়ার্ক এগোবে কী করে? দেশপ্রেম বলে কিছু আছে এখন ভারতবর্ষে? কেউ কারও জন্য ফিল করছে?

চারুবাক ফের একটা ওয়াক তুলতে গিয়েও চেপে রইল জোর করে। তার কপালে ঘাম জমে উঠছিল।

ভদ্রমহিলা ফিরে এসে সেই ব্রাশটায় ফের আর এক দফা টুথপেস্ট লাগিয়ে বড় মেয়েকে বললেন তাড়াতাড়ি যা, বেসিনের জল ফুরিয়ে যাবে।

মেয়েটা অম্লানবদনে ব্রাশটা মুখে পুরে উঠে গেল। চারুবাক শব্দ করল--ওয়াক ওয়াক--

ভদ্রলোক তার পেটে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, আপনার দুঃখটা আমি বুঝি মশাই, দেশে কাজকর্ম কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু কথা হল কাজটা কার জন্য? দেশ? কোনটা আমার দেশ? বর্ধমান না পশ্চিমবঙ্গ না পূর্বাঞ্চল না ভারতবর্ষ? সাধারণ মানুষরা যে ভারতবর্ষ কাকে বলে তাই জানে না। এমনকী অনেকেই জানে না যে দেশে এখন ব্রিটিশ রুল নেই, অনেকেই জানে না যে...

বড় মেয়ে ফিরে এসে ব্রাশটা তার মায়ের হাতে ফেরত দিল।

চারুবাক সম্মোহিতের মতো চেয়ে দেখল, ভদ্রমহিলা ফের সেই ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে ছেলের হাতে দিলেন। ছেলে ব্রাশ মুখে দিয়ে উঠে গেল।

চারুবাক একটা দুর্বোধ্য গর-র-র-র শব্দ করল।

সরকার! ভদ্রলোক তার পেটে আর একটা খোঁচা দিয়ে ধমকে উঠলেন। তারপর হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, সরকার হল এক বোবা কালা অন্ধ প্রতিষ্ঠান। কে কোথায় ধুঁকছে, কে কোথায় খাবি খাচ্ছে, কে দুধে ভাতে আছে, কে মরল কে পড়ল কোনও খবরই সে রাখে না, বুঝলেন মশাই? এই যে আমি আপনি এই যে আমরা --এই আমরা সবাই বেঁচে আছি যে যে-যার নিজের দায়িত্বে। সরকার পারবে না মশাই, সরকারের বাপও পারবে না জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে। আসলে—

ছেলেটা ফিরে এল। লাল টকটকে সেই ব্রাশে আবার পেস্ট লাগানো হল। এবার গেল ছোট মেয়ে।

চারুবাক খকখক করে কাশতে লাগল। পেটের মধ্যে কী যেন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে, গোঁতলান দিচ্ছে।

চারুবাকের পেটে আর একটা খোঁচা মেরে ভদ্রলোক বললেন, আমরা প্রত্যেকেই যে যার নিজের দায়িত্বে বেঁচে আছি। জানি আমাদের দেখবার কেউ নেই। আর সেই জন্যই আমরা যে যার নিজের ঘর গোছাতে লেগে যাই। আপনি বাঁচলে চাচার নাম। তবে কিনা--

চারুবাক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখল, সেই লাল ব্রাশে ফের পেস্ট লাগানো হয়েছে এবং ভদ্রলোকের বড় শালা ব্রাশটা নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল।

চারুবাক ঠান্ডা হয়ে গেল। বাক্যহারা, বোধহীন হয়ে যেতে লাগল, তার মাতা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল।

ভদ্রলোক তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলে উঠলেন, আর সেই জন্যই এখন ভারতবর্ষে গড়ে উঠছে ক্ল্যান, লোকাল পার্টি, ধর্মগোষ্ঠী। যেন ছোট ছোট সব ফ্যামিলি, হ্যাঁ, ফ্যামিলি, আর সেই সব ফ্যামিলিতে ফ্যামিলিতে গড়ে উঠছে—

বড় শালা ফিরে এল। সেই লাল টকটকে ব্রাশটা নিয়ে এবার গেল ছোট শালা।

চারুবাক অজ্ঞান হয়ে যাবে কিনা বুঝতে পারছিল না। সে অবশ হাতে নিজের নাড়ি দেখতে লাগল। নাড়ি চলছে, তবে অতি ক্ষীণ।

ফ্যামিলি! বুঝলেন? ফ্যামিলি! এই ফ্যামিলি ফিলিংটাকে যদি আরও বড় করে দেন যদি ফ্যামিলির মধ্যে গোটা ভারতবর্ষকে টেনে আনতে পারেন যদি--

ছোট শালা ফিরে এল। চারুবাক আর পারল না। অস্ফুট গলায় সে বলার চেষ্টা করল, ব্রাশ...ব্রাশ...

ভদ্রলোক থমকে গেলেন, ব্রাশ? আরে আরে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, টুথ ব্রাশ আনেননি তো? তাতে কী হয়েছে? আমাদেরটাই নিন না। নিজেকে আমাদের ফ্যামিলির একজন বলে ভাবুন। আরে এইভাবেই তো ফামিলি ফিলিং বাড়ে, এই ভাবেই তো,...ওগো ও খেঁদির মা, দাও দাও ব্রাশে একটু পেস্ট লাগিয়ে দাও--

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে চারুবাকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন এখনও বেসিনে জল আছে। তাড়াতাড়ি চলে যান, এর পর আর...

সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়াল চারুবাক। নিজের নয়, যেন অন্য কারও ইচ্ছাশক্তিতে চালিত হচ্ছে সে। কী হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না। তার গা ঘিন ঘিন করছে, পেটের মধ্যে উথালপাথাল, গলায় আটকে রয়েছে বমি।

টলতে টলতে চারুবাক বেসিনের কাছে এল। আয়নায় ওটা তো তারই মুখ! হ্যাঁ, তারই। তবু মুখটা যেন প্রাত্যহিক নয়। অন্যরকম।

লাল ব্রাশটা সমেত হাত উঠে এল মুখের কাছে। চারুবাক সভয়ে চোখ বন্ধ করল।

তারপর অবধারিত টের পেল, দাঁতের সঙ্গে ব্রাশের সংঘর্ষের সেই চির পরিচিত শব্দ। কুড়কুড় কুড়কুড়, ঘুসঘুস, ঘ্যাসঘ্যাস...

মুখ ধুয়ে ফিরে এল চারুবাক। আশ্চর্য, তার ঘেন্নাপিত্তি গেল কোথায়? কেননা যেন ফুরফুরে লাগছে নিজেকে! জ্বর সেরে গেলে যেমনটা হয় তেমনই যেন! লালব্রাশটা সহর্ষে ওপরের দিকে তুলে ধরলেন ভদ্রলোক। তারপর চেঁচিয়ে বললেন, আর কারও লাগবে দাদা! দয়া করে বলবেন। বি ওয়ান অফ আওয়ার ফ্যামিলি, বি এ গুড সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, লজ্জা করবেন না...

একটার পর একটা কুণ্ঠিত হাত এগিয়ে আসতে লাগল একে একে।

একটা স্টেশন এসে গেছে। প্ল্যাটফর্মে পুরি তরকারি, সিঙাড়া কচুরি বিক্রি হচ্ছে।

চারুবাক হাঘরের মতো খাবার কিনে গোগ্রাসে খেতে লাগল। তার অরুচি সেরে গেছে।

৩। বাজি ও কুকুর

বাজির শব্দে কুকুরটা ভয় পেয়ে খাটের তলায় ঢুকেছে। আর সেখান থেকেই পরিত্রাহি, আর্তনাদ করে যাচ্ছে। একটানা একঘরে, স্নায়ুবিদারক। ডিউক খুবই ভালো জাতের, অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কখনও কাঁদে না বা ডাক ছেড়ে চেঁচায় না। ধমক শোনে, আদর সোহাগ বোঝে। কিন্তু কালীপুজোর দিন তার সব শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে সে রাস্তার কুকুরের মতোই চেঁচায়।

রণেন অনেকবার চেষ্টা করেছেন ডিউককে ঠান্ডা করতে অন্তত চুপ করিয়ে রাখতে। পারেননি। এখন কুকুরের চিৎকারে তাঁর স্নায়ু বিকল হওয়ার জোগাড়।

ডিউকের সঙ্গে রণেনের তেমন মাখামাখি নেই। গৃহপালিত পশুপাখি তাঁর পছন্দ নয়। ছেলেবেলায় আদরের কুকুর, বেড়াল ও পাখির মৃত্যু কয়েকবার দেখেছেন, পোষা খরগোশ তাঁর কোলেই মরে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি আর পশুপাখি পোষেননি।

ডিউককে কোনও এক কুকুর ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এনেছিল তাঁর ছেলে লুকু। এনেছিল তাঁর জন্যই। বছর দেড়েক আগে রণেনের স্ত্রী রত্নাবতী আকস্মিকভাবে মারা যান। রণেন যে খুব ভেঙে পড়েছিলেন তা নয়। তবে একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। লুকু ধরে নিয়েছিল তিনি পত্নীশোকে ভেঙে পড়েছেন। নানাভাবে রত্নাবতীর শূন্যস্থান পূরণের একটা অক্ষম চেষ্টা লুকু করেছে। কাজটা সে ছেলে বলেই করেছে। কিন্তু ফলটা ভালো হয়নি। রত্নাবতী মারা যাওয়ার পর তাঁকে পুরী এবং ভুবনেশ্বর ঘুরিয়ে এনেছিল লুকু এবং তার জন্য নিজের বউ সুমিতার কাছে যথেষ্ট কটু কথা শুনেছে। আদিখ্যেতা আজকালকার মেয়েরা পছন্দ করে না। তার ওপর এই কুকুর। লুকুর ধারণা, কুকুরটা সঙ্গী হিসেবে থাকলে রণেনের মনটা একটু ভালো থাকবে, বিদেহী পত্নীপ্রেম হয়তো বা

কুকুরকে কেন্দ্র করে একটা আশ্রয় পেয়ে যাবে। পায়নি, বলাই বাহুল্য, কারণ রণেনের পত্নীপ্রেম ছিল না। সারমেয়-প্রেমও তাঁর দরকার নেই। তবু লুকু পাছে দুঃখ পায় সেই ভেবে তিনি প্রথম প্রথম জোর করে কুকুরটাকে একটু একটু লাই দিতেন। তারপর সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। আসলে বুড়ো বয়সে একটাই অভাব থাকে। কথা বলার লোক থাকে না। আর বুকে এক গাদা কথা জমে থাকে কাউকে বলবার জন্য। যেমন ছিল তাঁর নাতি জয়। কিছু বুঝত না, কিন্তু শুনত। বলতও অজস্র। ঠিক যেমন বন্ধুরা হয় আর কি।

একদিন লুকুকে তিনি বলে ফেলেছিলেন, জয়টা যদি কাছে থাকত তবে বেশ হত।

লুকু অবাক হয়ে বলল, সেটা কী করে সম্ভব?

রণেন জানেন, সম্ভব নয়। তাঁর একমাত্র নাতি জয়কে বছরখানেক হল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে ভরতি করা হয়েছে। ওরকম নামি স্কুলে যে ভরতি করা গেছে সেইটাই লোকে সৌভাগ্য বলে মানবে। সুতরাং তাকে আর কাছে পাওয়ার আশা করা বৃথা। তবে স্কুল বন্ধ থাকলে আসে। এখন যেমন এসেছে। তবে সেই আগের জয় আর নেই। এক বছরের মধ্যেই কেমন একটু সাবালক এবং ভারিক্কি হয়েছে। দাদু-দাদু এখনও করে বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু কেজো মানুষ হয়ে গেছে, সেই নেই-আঁকড়ে আবদারে ভাবটা আর নেই।

ঘাড়ে দীর্ঘদিনের স্পন্ডেলাইটিসের ব্যথা। তবু নীচু হয়ে চৌকির তলায় কুকুরটাকে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন রণেন। গলা তুলে কেঁ-উ কেঁ-উ করে ডাকছে। সন্ধে থেকে ডাকছে বলে গলাটা কি একটু ভাঙা ভাঙা?

বাড়িতে রণেন আর রান্নাবান্নার লোকটি ছাড়া কেউ নেই। শমিতাদের বাড়ি বাগবাজারে বিরাট করে কালীপুজো হয়। অনেক টাকার বাজি পোড়ে, গোটাকয়েক পাঁঠা বলি হয়। ওরা আজ ওখানেই থাকবে। তবে লুকু ফিরে আসতে পারে। সেরকমই বলে গেছে।

শিবু। শিবু। আবার ডাকলেন রণেন। এ পর্যন্ত বহুবার ডেকেছেন। শিবু ফ্ল্যাটে বা আশেপাশে নেই। রান্নাঘর খোলা পড়ে আছে, বাতি জ্বলছে! পনেরো ষোলো বছরের ছেলেকে আজকের রাতের অন্যমনস্কতার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। দশতলার ছাদে বাজি পোড়ানো হচ্ছে, একতলায় পুজো। তারই কোথাও গিয়ে সেঁটে আছে। ডাল ভাত তরকারি ঝোল সব ওবেলাই রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। রাতে শুধু গরম করে দেবে। রণেন দশটা সাড়ে দশটার আগে খান না। সুতরাং শিবু নিশ্চিন্ত।

রণেনের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ই। দেড়হাজার স্কোয়ার ফুট। সস্তাগণ্ডার সময়েও সোয়ালাখ দাম পড়েছিল। এখনও হেসে খেলে ছ-সাত লাখ টাকা। বত্নাবতীর নামেই করেছিলেন। এখনও তাঁর নামেই আছে। এই ফ্ল্যাটে রণেনের নিজস্ব একখানা ঘর আছে। সবচেয়ে ছোট ঘরখানাই তিনি বেছে নিয়েছেন। সেই ঘরে জিনিসপত্র বলতে গেলে কিছুই নেই। খরচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনকেও সঙ্কুচিত করে ফেলেছেন তিনি। জামাকাপড়ের

ওয়ার্ডরোব একসময়ে উপচে পড়ত। আজকাল একজোড়া হাওয়াই আর একজোড়া বেরোনোর চপ্পল। বারোটা লাইটার ছিল। সিগারেট ছেড়েছেন তিন বছর আগে। এখন একটাও লাইটার নেই। বক্স খাটটা ছেলেকে দিয়ে একখানা সাধারণ চৌকি পেতে নিয়েছেন ঘরে। আর একখানা ইজিচেয়ার। ছোট্ট একটা টেবিল। রণেনের বিষয় সম্পত্তি বলতে এইটুকুই। তবে বইপত্র কিছু আছে, কিছু সাময়িক পত্রিকা। এগুলোই অবসরের সঙ্গী।

কাচের শার্শি সবই বন্ধ। তবু বিভৎস লাগাতার বাজির শব্দ ঠেকানো যাচ্ছে না। এরকম ছেদহীনভাবে বাজি পোড়াতে হলে কত টাকা খরচ হতে পারে তা রণেন ভেবে পান না। তার ওপর এই শব্দ সহ্য করার জন্য শক্ত নার্ভও চাই। বাজির শব্দের সঙ্গে ডিউকের চিৎকার রণেনকে যেন খান খান করে ভেঙে ফেলছে।

অন্য সব ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখে যায়। কেন কে জানে, ওরা কোথাও বেরোলে ঘরগুলো সব বন্ধ করে রেখে যায়। শুধু বসার ঘর আর রান্নাঘর খোলা থাকে। রণেনের অন্য কোনও ঘরে গিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় নেই, বসার ঘর ছাড়া। কিন্তু বসার ঘরটা গিয়ে শেষ হয়েছে গ্রিল দেওয়া বারান্দায়। সেখানে কোনও কাচের শার্শি নেই। এই সাঙঘাতিক, প্রাণঘাতী বাজির শব্দ সেখানে আটকানো যাবে না। আর তিনি গেলে ডিউকও তাঁকে অনুসরণ করবেই।

অসহায়ভাবে রণেন ইজিচেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিন খুলে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভিতরটা এমন কাঁপছে, এত অস্থির লাগছে যে, উঠে পড়তে হল।

ঘাড়ের ব্যথা নিয়েই আবার নীচু হলেন, ডিউক! ডিউক!

ডিউক ফিরে তাকাল এবং বলল, কী বলছ?

রণেন ছিটকে পড়লেন মেঝেয়। মাথাটা ঝিমঝিম করল। আজকাল বুড়ো বয়সে কি ভীমরতি ধরল! না কি স্বপ্ন দেখছেন?

বাঁ কনুইতে একটু চোট পেলেন। তবে তেমন কিছু নয়। ফের উঠলেন রণেন। সভয়ে নীচু হয়ে ডিউকের দিকে চাইলেন। ডিউক দু থাবার মধ্যে মাথা কেঁ-উ কেঁ-উ করে কাঁদছে।

ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ডাকছো! আমি বেরোবো না। যাও।

বুকটা ধক করে উঠেই যেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেল। তবে ফের চলল। ধড়াস ধড়াস করে। একটু শ্বাসকষ্টও হতে লাগল রণেনের

সাবধানে আবার ডাকলেন, ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ফ্যাচ ফ্যাচ করছ! কী চাও বলো তো!

অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ ভৌতিক! অলৌকি! তবু রণেন এবার নিজেকে শক্ত রাখলেন। কাঁপা গলায় বললেন, তুই কি কথা বলতে পারিস?

পারি, তবে এখন কাঁদছি। কাঁদতে দাও।

কাঁদছিস কেন?

আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ছে।

পূর্বজন্ম? ওরকম কিছু সত্যিই আছে নাকি?

আছে। না থাকলে মনে পড়বে কেন?

পূর্বজন্মে তুই কী ছিলি? কুকুরই তো!

না। তবে কুকুরের অধম। বারোটা ছেলেপুলে ছিল। না খেয়ে খেয়ে, রোগে ভুগে চোখের সামনে মরেছে। দুটোকে চোর বলে পিটিয়ে মারে। একজন জেল খাটত। সে বেঁচে আছে কিনা জানি না। রাস্তার কুকুরের মতো এঁটো-কাঁটা খুঁটে খেতুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম, কুকুরের মতোই যদি বেঁচে আছি তবে কুকুরই করলে না কেন? সেই প্রার্থনা ভগবান বোধহয় শুনেছেন। বাজির শব্দে মাথাটা কেমন টলমল করছিল, হঠাৎ সব মনে পড়ল।

এ জন্মে তোর কেমন লাগছে?

সুখে আছি, বেশ সুখে। আগের জন্মের চেয়ে ঢের ভালো মাংসের সুরুয়া খাই, গমের খিচুড়ি, সাত তলায় বাস, সুখের বাকি কী? শুনলুম তোমার ছেলে আমাকে সাতশো টাকায় কিনেছে! শুনে ভারি আনন্দ হল। আমার এত দাম হবে ভাবিনি কখনও।

চুপ, চুপ, অত টাকায় তোকে কেনা হয়েছে তা খবর্দার বলিসনি। তাহলে লুকুকে তার বউ বকবে।

জানি। লুকু কমিয়ে বলেছে। সত্তর টাকা। তাইতেও বাপান্ত হচ্ছে। কিন্তু যার জন্য কেনা হল সে তো পাত্তা দিচ্ছে না।

রাগ করিস না ডিউক। আমি কি জানতুম যে--

তোমার বউয়ের অভাব আমি মাদি কুকুর হয়েও পূরণ করতে পারব না বাপু, তা ঠিক।

তুই মাদি নাকি?

তাও জানো না! আচ্ছা লোক বাপু!

তোর নাম যে ডিউক।

সে যদি তোমরা নাম দাও তাতে আমার কী করার আছে?

আগের জন্মে মদ্দা ছিলি?

না, মাদিই। বললুম না রাস্তায় কুকুরের মতো জীবন ছিল। বারোটা বাচ্চা হল বারোটা পুরুষের দোষে। তারা কেউ আমার স্বামী ছিল না। আমি তো বেওয়ারিশ, বেশ্যার অধম।

খুব কষ্ট ছিল তোর!

এখনও আছে। বড় কষ্ট। এখন যাও ইজিচেয়ারে বসে থাকো গে। আমি একটু কাঁদি।

কাঁদ ডিউক।

রণেন ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। একাই একটু হাসলেন তিনি। খুশিই, লাগছে মনটা। কথা বলার মতো একজনকে পাওয়া গেল এত দিনে। সময়টা কেটে যাবে।

সংসার

'বিয়ে .তা জীবনে একবারই হয়!' এই বলে বড় অভিমান করে থাকে নতুন বউ। বেশির ভাগ বাঙালি ছেলেই বিয়ের পর প্রথম নারীসঙ্গ পায়। বউ-এর বরটিও তাদের একজন। জীবনে এই প্রথম নারীর নিবিড় সান্নিধ্য এমনিতেই তার মাথার সবটুকু ঘোলাটে করে রেখেছে। এই নিজস্ব মেয়েমানুষটির কাছে কতভাবে নিজেকে বড় করে দেখানো যায় তার নানা ফন্দি-ফিকির মাথায় খেলছে সব সময়। কি বললে খুশি হবে মেয়েটি, কি করলে মুগ্ধ হবে একেবারে? একবার ইমপ্রেস কররে জন্য বলে ফেলেছিল--জানো, সামনের বছর আমি একটা স্কুটার কিনব! নতুন বউ শিউরে বলেছিল--খবরদার না। ভীষণ অ্যাকসিডেন্ট হয় ওতে।

ছেলেটি ভীষণ খুশি হয় তাতে! আসলে স্কুটার তার কস্টিং-এ আসে না, নিকট ভবিষ্যতে আসবেও না। কিন্তু বিয়ের সাতদিনের মাথাতেই মেয়েটি বলে দেয়—সবাই হানিমুনে যায়। আমরা যাবো না?

শুনে ছেলেটা মনে মনে গুম হয়ে যায়। বিয়েতে সবসময়ে বাজেট ছাড়িয়ে খরচ হয়। তারও হয়েছে। তাছাড়া ছুটি পাওনা নেই তেমন। ছেলেটা আবার একটু ঘরকুনোও। জবাব দিল--এসব ইংরিজিয়ানার কুফল। বিদেশি প্রথা। আমরা এসব মানবো না। বউ খুশি হয় না। অভিমান করে বলে--বিয়ে তো জীবনে একবারই হয়? সবাই যায়। বিদেশি প্রথা আবার কি? তুমি তো বাপু দিব্যি প্যান্ট শার্ট পরে অফিসে যাও, সেটা ইংরিজিয়ানা নয় বুঝি?

ছেলেটা সিগারেট ধরায়, খুব সিরিয়াসভাবে বউয়ের মুখ দেখে। তারপর বলে—দেখি।

বউ আশান্বিত হয়ে বলে--খুব দূর নয়, নির্জন জায়গায় যাবো কিন্তু। শুধু তুমি আর আমি।

—পুরী?

--আমার পাহাড় ভালো লাগে।

--দার্জিলিং?

--হ্যাঁ-অ্যা। বউ হেসে গাল কাত করে দেয়। বিয়ের পর থেকে মা একটু গম্ভীর। ছেলের সঙ্গে খুব ভালো করে কথা কন না। তাকানোর মধ্যে কেমন যেন একটু উদাস উদাস অভিমান ভাব। খেতে বসেছে ছেলেটি, মা ভাত দিয়ে বলল—সীমা বলছিল, দাদা-বউদি হানিমুনে যাচ্ছে। তা কোথায় যাওয়া ঠিক করলি?

--কোথায় আর যাবো? এখনও কিছু ঠিক নেই। ছেলেটি হঠাৎ লজ্জা পেলো যেন, সেটা ঢাকতে গোগ্রাসে খায়।

—আস্তে খা। মা একটু চুপ করে থেকে বলেন--উনিই নতুন বউয়ের মাথা খাচ্ছেন। কেবল শুনি বলেন, যাও ঘুরে টুরে এসো। একটু নিরিবিলিতে ঘুরে এলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হয়।

উনি হলেন ছেলেটির বাবা। প্রশ্রয় কিছুটা বেশিই দেন নতুন বউকে। বলেন—সংসারে চার্জ এবার থেকে তোমার বউমা। বুঝেসুঝে নাও।

মা তাতে খুশি হন না। আড়ালে বলেন--কেন, আমায় কি গতরে শুঁয়োপোকা ধরেছে। সংসারের টানাপোড়েনগুলো ছেলেটা বিয়ের আগে বুঝতে পারতো না। এখন কিছু কিছু পারছে।

নতুন বউ একদিন রাতে বললো--সীমা আজ কি বলেছে জানো! বলেছে দাদা বিয়ের আগে একটু স্টাইল করতো না। আজকাল খুব পোশাকের দিকে নজর। আমায় বলেছে, বিয়েতে দাদার অনেক খরচ হয়েছে। হানিমুন-টুন করতে গেলে সংসার ভেসে যাবে। কি হিংসুক দেখো।

ছেলেটা উদাস মন খারাপ গলায়, বলে--ওর মনটা ভালো।

--ছাই ভালো! তোমার আমার বেশি ভাব পছন্দ করে না। আমি দেখবো বিয়ের পরও নিজে হানিমুনে যায় কি না!

ছেলেটার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আছে না। পুজোর আর দেরি নেই। দার্জিলিং-এ মরসুম পড়ে গেল। রিজার্ভেশনের কাউন্টারে মারকাট হচ্ছে। কত লোক যে দার্জিলিং-এ যাবে।

অনেক ধস্তাধস্তির পর দার্জিলি-এর দুটো রিজার্ভেশন পায়। বারোদিনের ছুটি নেয়। বাবার হাতে সেই মাস বরাদ্দের পঞ্চাশ টাকা কম দেয়। মার মুখ গম্ভীর। বোন মুখ ফসকা, বলেই দেয়—মধুচন্দ্রিমা-টন্দ্রিমা ওসব বড়লোকেরা করে।

ছেলেটার মন খারাপ হয়। কিন্তু বউ খুশি, বাড়ির সবাই হিংসে করুক তাকে। হিংসে করে জ্বলুক।

পথের কষ্ট যা হওয়ার হল। অনর্গল পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে। কুলি, খাবার, চা। দার্জিলিং-এ যত সস্তায় থাকবে ভেবেছিল, হল না। কুড়ি টাকা রোজের হোটেল ভরতি। বহু কষ্টে একটা বাড়িতে বত্রিশ টাকায় পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে হল। কুড়ি টাকা পার হেড রোজের বাজেট ছিল। তার ওপর বারো টাকা বাড়তি; সুতরাং বউকে চুপিচুপি বলল —চার দিনের বেশি থাকা যাবে না, টাকা নেই। বড় মেঘলা দার্জিলিং। বৃষ্টি পড়ছে প্রায়ই। চাঁদ-টাদ দেখা যায় না, পাহাড় মুখ লুকিয়ে আছে। ছেলেটা কম্বল চাপা দিয়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলে--টাকাটাই লস।

বউ ঝামটা মেরে বলে—লস আবার কি? আসা তো হল। লোকে বলতে পারবে না যে ওরা হানিমুনে যায়নি।

পুজোর দিন কটা কলকাতায় কাটাতে হল না, ছেলেটার এইটুকুই লাভ।

বউ পাথরের মালা কিনতে চায়, বরের জন্য সস্তায় ভুটিয়া সোয়েটার, ননদের জন্য আর কিছু। ছেলেটা সবরকম কেনাকাটার বাধা দিতে থাকে। কেবল বলে—উঁহু, বাজেট আসবে না।

দুদিন পর রোদ উঠল। খুব বেড়াল দুজনে সেদিন। পরদিন জিপ ভাড়া করে টাইগার হিল, ঘুম, মনস্ট্রি, সিঞ্চুল লেক দেখালো। এক স্বর্গীয় আনন্দের জলে যেন মুখ ধুয়েছে বউ, এমন উজ্জ্বল দেখাল তার মুখ, ছেলেটা নিসর্গ থেকে কোন আনন্দ পায় না, কেবল টাকার চিন্তা। তবু বউ-এর মুখ দেখে তারও কেমন একটু খুশির ভাব এল। আহা, ওতো খুশি হয়েছে!

ফেরার সময় শিয়ালদা স্টেশনেই টাকা শেষ। ট্যাক্সি করে বাড়ি এসে ভাড়া মেটালো।

বাড়িঘর কেমন জীর্ণ লাগছে ছেলেটির। মা বাবাকে কি আর একটু বুড়ো দেখাচ্ছে? সীমারও কণ্ঠার হার বেরিয়েছে বুঝি। কিন্তু একটা বড় পরিবর্তন দেখল ছেলেটি। সে ফিরে আসায় সবাই খুশিতে ছুটে এসে ধরল তাদের।

--অ বউমা, কেমন দেখলে ভালো ছিলে তো সব? কীরকম বাজার দর ওখানে? বাঃ বউদি, এ মালাটা আমার জন্য এনেছো। ভীষণ সুন্দর তো! বউ নিজের নাম করে অনেকগুলো জিনিস কিনেছিল, কিন্তু ছেলেটি অবাক হয়ে দেখল, সে সব জিনিস অকৃপণভাবে বাড়ির সবাইকে বিলিয়ে দিচ্ছে বউ। সে রাতে যখন চাঁদ উঠল তখন ছেলেটি ছাদে শুয়ে শুয়ে ভাবল, বাঃ বড় মিষ্টি চাঁদ উঠেছে তো আজ!

নসিরাম

রামতারণ লোকটা অভদ্র বটে, কিন্তু ত্যাঁদড় নয়, বুঝলি সতু?

সতুর কথা বলা মতো অবস্থা নয়। চকবেড়ের হাটে নফরের তামাকপাতার দোকানের পিছন দিকটার নিরিবিলিতে রোদের দিকে হাঁ করে চোখ বুজে আধশোয়া হয়ে বড় বড় শ্বাস টানছে। একবার শুধু মাথাটা নেড়ে জানাল, কথাটা ন্যায্য।

মরা কুল গাছটায় থিক থিক করছে শুঁয়োপোকা। কাঁচা নর্দমায় পাঁক পচে ফেঁপে উঠেছে। দুপুরের রোদে ঘাটা-পড়া নর্দমার কটু একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে কখন থেকে। আর কিছু দেখার নেই লক্ষ্মীছাড়া জায়গাটায়। দুদিকে দু সারি দোকানের পিছন। লোকজনের

যাতায়াত নেই, শুধু দোকানিরা মাঝে-মাঝে পেচ্ছাপ করতে আসে। মতি সিং-এর শিকলে বাঁধা সাইকেলটার একটা চাকা দেখা যাচ্ছে বেড়ার আড়াল থেকে। যুধিষ্ঠির পালের দোকানের পিছন দিকটায় মস্ত একটা মানকচুর গাছ। লালু মিঞার টেলারিং-এর চালে একটা নধর বেড়াল বসে আছে কখন থেকে, নড়ছেও না নড়ছেও না। গদার চায়ের দোকানের পিছন দিকটায় কানা লক্ষ্মীকান্ত এক নাগাড়ে কয়লা ভেঙে যাচ্ছে। এসব আলগা চোখে লক্ষ করতে করতে বাঁ গালে একবার হাত বোলায় নসিরাম। গালে রুক্ষ দাড়ি খড়খড় করছে। আর দাড়ির নীচে এখনও চিনচিনে ব্যথা। রামতারণের থাবড়াটা তার চোয়াল যে খসিয়ে দেয়নি এই যথেষ্ট।

বুঝলি সতু! নসিরাম গালে হাতখানা চেপে রেখেই বলে, রামতারণ থানাপুলিশও করতে পারত। একেবারে জলের মতো কেস।

রামতারণের থাবড়াগুলো খুব অল্পের ওপর দিয়ে যায়নি। সতু এমনিতেও কিছু রোগাভোগা লোক। ক-দিন আগেও ন্যাবা হয়ে চোখ মুখ সব হলুদচোবা হয়ে গিয়েছিল। শেষে বৈরাগী মণ্ডল কাঠির মালা করে দেয়। সে ভারি মজার ব্যাপার। একশো আটখানা কড় প্রমাণ কাঠি সুতোয় বেঁধে চুড়ির মাপের ছোট্ট একখানা মালা ব্রহ্মতালুতে রেখে বলল, হাত দিয়ে চেপে থাকো! সতু তাই থেকেছিল। দেখ না দেখ সেই মালা আপনা থেকেই বড় হতে হতে মাথা গলিয়ে গলায় চলে এল। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সেই মালা বেঢপ বেড়ে নাই কুণ্ডুলি ছুঁই ছুঁই। সকালে বাসিমুখে চুনের জলে সতুর হাত ধুয়ে দিয়েছিল মণ্ডল। একেবারে হলুদগোলা হয়ে গেল ফটফটে সাদা জলটা। দুপুরের দিকে মালা বেড়ে যখন শরীর গলিয়ে যাওয়ার মতো হল তখন মালা ছাড়ল সতু, দাঁত মাজল, খেল। ন্যাবা সেই বিদেয় হল বটে, কিন্তু শরীরটা এখনও যুতের নেই। রামতারণ ভালো খায়দায়। হোঁতকাটার এক একটা হাতের ওজনই গোটা সতুর সমান। তার ওপর থাবড়া মারার সময় রামতারণ আবার বাঁহাতে সতুর চুলটাও ধরেছিল মুঠ করে। লেগেছে খুব। সতু এখনও দম ফিরে পায়নি মাথা ঝিমঝিম করছে। তবু নসিরামের কথাটার একটা জবাব দিল সে। বলল, পুলিশ আর এর বেশি কীই বা করত! যা ঝেড়েছে! ওফ!

এ কথায় নসিরাম একটু লজ্জা পায়। রামতারণ দুজনকেই ঝেড়েছে বটে কিন্তু তার তেমন লাগেনি। চোয়ালের ব্যথাটা দিন দুই থাকবে হয়তো। তবে তেমন কিছু নয়। চোয়ালের হাড় সরে যায়নি, দাঁত ভাঙেনি! গালের মাংসের দাঁত বসে যাওয়ায় ক-ফোঁটা রক্ত পড়েছিল শুধু। সে কথা বলল না, রোঁয়াহীন একটা শালিকের বাচ্চা কোথা থেকে পড়েছে নর্দমার ধারে। কয়েকটা কাক সেটাকে ঠুকরে ঠুকরে শেষ করল এইমাত্র। মা-শালিকটা ধারে কাছে নেই, থাকলে কাককে মজা দেখাত। নসিরাম বুঝতে পারছে রামতারণের পক্ষ নিয়ে কথা বলা তার উচিত নয়। বললে হয়তো সতু ভাববে, মার খেয়ে নসিরামের মাথাটাই গুলিয়ে গেছে।

কিন্তু ঘটনাটা ঠিক ঠিক বিচার করলে রামতারণকে কি দোষ দেওয়া যায়? গাজিপুর থেকে তারা রামতারণের কিছু নিয়েছিল। নেওয়ারই কথা। রামতারণ আদায়-উসুল করে ফিরছে। গাজিপুরের গোটা বাজারটাই ওর কিনা। মেলা টাকা। একজন পাইকও সঙ্গে ছিল! লহরার ইসমাইল। তার কোমরে চাকু, হাতে লাঠি।

সতু আর নসিরাম সব খবরই নিয়েছিল। বনবিবিতলায় ইসমাইলকে ছেড়ে দেবে রামতারণ। কারণ ওখানেই ইসমাইলের দু নম্বর বিবি ওলন থাকে, ওলন ভারি আল্হাদী মেয়েমানুষ। বুকে দয়ামায়া আছে, ধর্মভয় আছে। বড় একটা এদিক সেদিন করে না। তবে ইসমাইল বা রামতোরণ কেউই লোক ভালো নয়। শোনা যায় ইসমাইল ওলনকে রামতারণের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার তক্কে আছে। ওলনবিবি দেখতে খারাপ নয়। বালবাচ্চা নেই, শরীরটাও তাই ভাঙেনি।

ইসমাইলকে ছেড়ে রামতারণ বনবিবিতলার বড় মাঠে পড়ল। পথও আর বেশি ছিল না। মাইলটাক গেলেই পিরগঞ্জের পাকা সড়ক। ফটফট করছে দুপুরের রোদ। ছাতা মাথায় রামতারণ দুলকি চালে হাঁটছিল। আচমকাই সতু আর নসিরাম চড়াও হল তার ওপর। সতুর হাতে ভোজালি, নসিরামের হাতে দেড়ফুট লম্বা গুপ্তি ছোরা।

রামতারণ ভয় খেয়েছিল কিনা বলা শক্ত। তবে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিল ঠিকই। সতু ভোজালিটা আপসাতে আপসাতে বিকট গলায় বলল, জয়কালী, করালবদনি! একদম চ্যাঁচামেচি করবে না বলে দিচ্ছি। লাশ ফেলে দেবো। এইখানেই লাশ পড়ে থাকবে, কুকুরে শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে। মালটা দিয়ে দাও ভালোয় ভালোয়। পাশ থেকে গুপ্তির চোখা ডগাটা রামতারণের ভুঁড়িতে ঠেকিয়ে রেখেছিল নসিরাম। কেমন বেগতিক দেখলে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা। তবে সেটা কথাই। সতুও কোনওদিন কারও লাশ ফেলেনি, নসিরাম গুপ্তি ভুঁকিয়ে দেয়নি। তেমন জোরালো কলজে তাদের নেই। কিন্তু রামতারণের তো ভয় খাওয়ার কথা, দু দুটো ঝকঝকে অস্ত্র চোখের সামনে দেখেও শালা ঘাবড়াল না! অ্যাঁ! নসিরাম ঘটনাটা আবার ছবির মতো দেখছিল চোখের সামনে।

সতু চোখ পিটপিট করে দেখছিল নসিরামকে। হঠাৎ অন্তর্যামীর মতো বলে উঠল, শালা ভয় খেল না কেন বলো তো!

নসিরাম বিরক্ত হয়ে বলল, কাজের সময় বেশি কথা কইতে নেই। যারা বেশি কথা কয় তাদের কেউ ভয় খায় না।

সতু ফিসফিস করে বলল, মালটা ছাড়ছিল না যে!

ওর বাপ ছাড়ত। দুটো খোঁচা খেলেই বাপ বাপ বলে ছাড়ত। ভোজালিটা তোমার হাতে ছিল কী জানো!

সতু মিইয়ে গেল। ফের হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল চোখ বুজে। দোষটা সতুর ঘাড়ে চাপাল বটে নসিরাম, কিন্তু পুরো দোষটা ওরও নয়। বোধ হয় ওর চেহারাটারই দোষ।

ল্যাঙপ্যাঙে একটা লোক যদি ভোজালি নিয়ে কেরদানি দেখায় তবে কার না ইচ্ছে করে তাকে একটা থাবড়া বসাতে? তার ওপর সতু হঠাৎ রামতারণের কুচ্ছো গাইতে শুরু করল, তেঘরেতে তোমার বাপের একজন রাখা মেয়েমানুষ আছে। সব ফাঁস করে দেবো। ইসমাইল মিঞায় দু নম্বর বিবি ওলনের সঙ্গে তোমার আশনাইয়ের কথাও জানি। হপ্তায় দুদিন ওলনের ঘরে তুমি যাও। ট্যাঁফোঁ করছো কি এসব কথা ঢোল-সহরত হয়ে যাবে। বুঝেছো?

রামতারণ অচমকাই থাবড়াটা কষাল। আর সে কি থাবড়া বাপ! সতুর মুণ্ডুটা তখনই ধড় ছেড়ে উড়ে গিয়ে আলের ধারে পড়ার কথা শব্দটাও হল বোমার মতো। সেই শব্দে কেমন অবশ হয়ে গিয়েছিল নসিরাম। হাতের গুপ্তিটার কথা তখন বেবাক ভুল। সেই অবশ অবস্থাতে রামতারণ হঠাৎ ঘুরে তাকেও একটা ওরকম থাবড়া কষাল। মাঠের মধ্যে দিনের আলোয় অন্ধকার দেখতে দেখতে মাটিতে বসে পড়ল নসিরাম। আর রামতারণ তখন একহাতে সতুর চুল ধরে তুলে পটাপট কয়েকটা থাবড়া দিয়ে গেল নাগাড়ে। সতু চ্যাঁচাচ্ছিল, আর মেরো না। ন্যাবা থেকে উঠেছি, শরীর যুতের নয় হে, মরে যাবো।

হোঁতকাটা এ কথায় থামল। তারপর ফ্যাঁসফাঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, তোরা কারা?

সতু মাটিতে পড়ে চষা খেতের এক চাঙর মাটি আঁকড়ে ধরে দম নেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কথা বলার অবস্থা নয়। লুঙ্গি খুলে গিয়ে দিগম্বর অবস্থা তার।

নসিরাম টলতে টলতে দাঁড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আমরা হচ্ছি--বলে একটু ভাবতে হল। নাম দুটো স্মরণ হচ্ছিল না ঠিক।

রামতারণ ধমক দিল, কারা তোরা?

আমি নসিরাম।

আর ও?

ও তো সতু!

কোন গাঁ?

আমি লোহারগঞ্জ, আর ও কালীতলা।

ঠিকঠাক বলছিস?

বানানোর মতো কথা মাথাতেই, আসছে না। ঠিকঠাক না বলে উপায় কি? নসিরাম জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শুধু।

রামতারণের বোধহয় তাড়া ছিল, দুজনের জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে ভেবে চোখ পাকিয়ে বলল, এই দণ্ডে এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাবি। ফের দেখতে পেলে পুঁতে ফেলব। যাঃ যাঃ যাঃ...

গরু তাড়ানোর মতো তাড়া খেয়ে তারা দুজনে সেই দণ্ডেই মাইলটাক পথ হেঁটে চকবেড়ের খাল পেরিয়ে হাটে এসে সেঁদিয়েছে। ভয়ের চোটে এতক্ষণ গা-গতরের ব্যথা

তেমন টের পায়নি। এখন পাচ্ছে তবে গায়ের ব্যথাটা বড় কথা নয়। রামতারণ ইচ্ছে করলে পিরগঞ্জের থানায় তাদের জমা করতে পারত। আরও বিপদের কথা, ইসমাইলকে লাগাতে পারত পিছনে, ইসমাইলের জমার ঘরে অন্তত পঁচিশটা খুন লেখা আছে। আরও দুটো বাড়লে ক্ষতি ছিল না।

নফর চেনা লোক। কিন্তু তাদের দেখে খুশি হয়নি মোটেই। দুজনের চেহারা দেখেই বিরস মুখে বলল, কোত্থেকে চোরের ঠেঙানি খেয়ে এসেছো। ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো। আমি ঝামেলা পছন্দ করি না।

তা চোরের ঠেঙানিও তারা খেয়েছে বইকি। নফরের দোষ নেই। এই তো মোটে সেদিন শীতলাদহের বাজারে রামহরির দোকানে মাঝরাতে ঢুকেছিল দুজন। সতু আগে, পিছনে নসিরাম। ঢুকেই সতুটা হেঁচে ফেলল। রামহরির ছেলে দোকানে শোয়। তার হাতের কাছেই টর্চ আর লাঠি। 'কে রে?' বলে লাফিয়ে উঠতেই ভাঙা জানলা গলে পালাল দুজন। কিন্তু বাজার বলে কথা। চোখের পলকে চৌকিদার দোকানি আর ব্যাপারি মিলে বিশ পঁচিশ জন জুটে তাড়া করে খালধারে প্রায় ধরে ফেলল, দুজনকে, তবে ভাগ্য ভালো সবাই অত জোরে ছুটতে পারে না। আর তারাও প্রাণের ভয়ে দৌড়োচ্ছিল। ধরল এসে জনা চারেক। কিল চড় চাপড় গোটা কয়েক পড়ল বটে, কিন্তু দুজনেই বুদ্ধি করে শীতের রাতে খালের বরফগলা জলে লাফিয়ে পড়ায় অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যায়। কাজেই নফরের দোষ নেই। তারা যে লোক ভালো নয় এ কথা সবাই জানে। তবে সুবিধেটা এই যে আজকাল লোক কেউই ভালো নয়। এই যে নফর দিব্যি তামাকপাতার পাইকারি কারবার খুলে বসে আছে, আলটপকা দেখলে মনে হয় ভারি সিধে কারবার। কিন্তু তামাকপাতার আড়াল দিয়ে গুলি, গাঁজা, চরস, ভাঙ আফিং-এর যে ফলাও কারবার চলছে তার খোঁজ রাখে কজন? নসিরাম আর সতু সবই জানে। তাই চলে যেতে বললেও তারা যায় না। নফরও আর বেশি গাঁইগুই করেনি।

বেলাটা পড়ে এল, দোকানের পিছনকার ঘাঁটাপড়া জায়গায় আলোটা বিলিতি বেগুনের রং ধরল। নসিরামের মনে হল, যথেষ্ট জিরেন হয়েছে।

ও সতু! উঠবি?

সতু আধশোয়া হয়ে ছিল এতক্ষণ। এখন দেখা গেল, ন্যাড়া মাটির ওপর হাতে মাথা পেতে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। তা ঘুমোবেই। শরীরটা যুতের নেই। ন্যাবার আলিস্যি আছে। রামতারণের ওই অসুরের মারেও তো কম ধকল যায়নি।

নসিরামের কাছে বিড়ি নেই। থাকলে একটা ধরাত। শরীরটা উশখুশ করছে। সতুর কাছেও নেই, সে জানে। বিড়ি নেই, ম্যাচিন নেই পয়সা নেই। নসিরাম উঠল। কারণ, বসে থাকার কোনও মানে হয় না। যুধিষ্ঠির পানের দোকানের পিছনে মস্ত মানকচু গাছটা অনেকক্ষণ ধরে তার চোখ টানছে। মাটির ওপরেই কচুর যে মোথাটা উঠে আছে সেটা

দেখে মনে হয়, দশ সেরের কম ওজন হবে না। যুধিষ্ঠির কচুকাছের গোড়ায় রোজ এঁটো ভাত, ছাই, গোবর আর কী কী সব ফেলে ফেলে দিব্যি পুরুষ্টু করে তুলেছে জিনিসটিকে।

শীতের শেষ টান। নসিরাম জানে এই হাটে এখনও মানকচু খুব একটা ওঠেনি। অনায়াসে দু তিন টাকায় বিকিয়ে যাবে। টেনে তুলতেও কষ্ট নেই। জল পড়ে পড়ে জায়গাটা এমনিতেই ভুসভুসে হয়ে আছে।

নসিরাম সাবধানে নর্দমাটা পার হয়ে এগিয়ে গেল। চাল থেকে সেই নট নড়ন চড়ন বেড়ালটা হঠাৎ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে।

যুধিষ্ঠিরের দোকানের পিছন দিককার দরজাটা আবজানো। কে খোলা রাখবে বাপ! যা দুর্গন্ধ। কচুটা টেনে তোলার সময় নসিরামের একবার মনে হল, ছিঃ ছিঃ কাজটা ঠিক হচ্ছে না, একটু আগেই বনবিবিতলার মাঠে যার হাতে গুপ্তি ছোরা ছিল এখন সেই কিনা কচু--তুচ্ছ কচু চুরি করছে! লোকে দেখলে বলবে কী?

অবশ্য দেখছে না কেউ। কানা লক্ষ্মীকান্ত কয়লা ভেঙে উঠে গেছে। দেখছে শুধু বেড়ালটা। লালু মিঞার টেলারিং-এর চাল থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে খুব লক্ষ করছে তাকে, আর মিহিন মিয়াঁও মিয়াঁও আওয়াজ ছাড়ছে। তবে বেড়াল বলে রক্ষে। কুকুর হলে এতক্ষণে খাউ খাউ করে দুনিয়াকে জানান দিত।

যত সহজে কচুটাকে তোলা যাবে ভেবেছিল নসিরাম, কার্যকালে ততটা সহজ মনে হচ্ছে না। মাটিটা ভুসভুসে পচা মাটি ঠিকই, কচুটাও নড়বড় করছে বটে। কিন্তু গোলমাল অন্য জায়গায়। সেই সকালে দু গাল পান্তা মেরে বেরিয়েছিল নসিরাম। সেই পান্তা কবে তল হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরেই পেটটা একেবারে বোমভোলা ফাঁকা। মেহনতও বড় কম যায়নি। এখন মাথাটা ঝিমঝিম করছে, শরীরটা কাহিল লাগছে। ভারী কচুটা খানিক নাড়িয়ে মাটিটা আরও আলগা করে টান দিতে গিয়েই পাঁজরে খিঁচ ধরে দম বন্ধ হয়ে এল। দু হাতে বুকটা চেপে ধরে উবু হয়ে বসে পড়ল সে। হাতখানেক বেরিয়ে আসা কচুটা আবার নিজের গর্তে বসে গেল। লালু মিঞার চাল থেকে বেড়ালটা পায়ে পায়ে হেঁটে চলে আসছে যুধিষ্ঠিরের দোকানের চালে। খুব চেল্লাচেল্লি করতে লেগেছে হঠাৎ! নসিরাম একটা ঢেলা কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল। তারপরই বুঝল ভুল হয়েছে। ঢেলাটা বেড়ালের গায়ে লাগল কিনা কে জানে, তবে যুধিষ্ঠিরের টিনের চালে খটাং করে একটা শব্দ হল।

নসিরাম ফেরত যাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিল। কপাল খারাপ। বাঁ পায়ে জোর ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে। একেবারে অবশ। উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়তে হল। দোকানঘরের পিছনের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল যুধিষ্ঠি।

এমনিতে দেখলে যুধিষ্ঠিরকে ভয়ের কিছু নেই। রোগা ভোগা চেহারা। কণ্ঠি, কপালে তিলক, গায়ে হাফহাতা গেঞ্জি। কিন্তু চেহারা দেখে বিচার করলে খুবই ভুল হবে। যুধিষ্ঠির দেখা দিয়েই মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, কোন শুয়োরের বাচ্চা রে?

আশ্চর্য নসিরামের রাগ হল না। আজকাল রাগটাগ কমে যাচ্ছে। সে একটু তেজি গলায় বলার চেষ্টা করল, গালমন্দ করছ কেন?

গলায় তেজ তো ফুটলই না, বরং খোলা স্বর বেরোল। উপোসি পেট থেকে আর কত বড় আওয়াজ বেরোবে?

যুধিষ্ঠির তার সাধের কচুটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ছিল। মাটি আলগা, কাদায় চোরের পায়ের ছাপ, চোরও বেকায়দায় পড়ে বসে রয়েছে সামনে।

যুধিষ্ঠির কোমরে হাত দিয়ে তেজের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, গালমন্দ করব না তো কি জামাই আদর করতে হবে নাকি রে ছ্যাঁচড়া হারামজাদা? ওরে ও পতু, ইদিকে আয়--

পতুর আসা মানে সাড়ে সর্বনাশ। যুধিষ্ঠির রোগা ভোগা হলেও তার মেজো ছেলে পতিতপাবন রোগা নয়। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। নসিরামের যা অবস্থা এখন ইঁদুরের লাথি খেলেও সইতে পারবে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, তা আমি কী করে জানব যে কচুটা তোমার!

আমার নয় তো কি তোর বাবার?

নসিরাম উকিল মোক্তারের মতোই বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, জমিটা তো আর তোমার নয়। সরকারবাবুদের হাট, তাদের জমি!

তাই নাকি রে শুয়োরের পো? তোর এত আইনের জ্ঞান? ওরে পতু--

ঝিঁঝিঁ ছাড়াতে পায়ে থাবড়া মারতে মারতে উঠে দাঁড়াল নসিরাম। বলল, চেঁচাচ্ছো কেন খামোখা? যেতে বলছ যাচ্ছি।

কখন তোকে যেতে বললাম রে খানকির ছেলে? ওরে পতু! শুনছিস! শিগগির আয়—

পতু প্রথমটায় শুনতে পায়নি। এপার পেল। বেরিয়ে এসে বলল, কী হয়েছেটা কী?

এই দ্যাখ। চোর নসে আমার কচু নিয়ে পালাচ্ছিল। ধর হারামজাদাকে।

নসিরামের ঝিঁঝিঁ ছেড়েছে। সে আচমকাই লাফ দিয়ে নর্দমাটা পেরিয়ে গেল। নফরের দোকানের দিকে জোর কদমে হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এঃ! ভারি তো কচু। পতু যে রেলের মাল নামায়, তার বেলা? চোর আমি একা, না?

একেবারে বেঁচে যাবে এতটা আশা করেনি নসিরাম। পতুও সমান তেজে নর্দমাটা পেরিয়ে তেড়ে এল। দৌড়তে দৌড়তেই নসিরাম গুনে গুনে তিনটে গাঁট্টা খেল মাথায়। যেন তিনটে ঝুনো নারকেল ডগা থেকে খসে মাথায় এসে পড়ল। আর কিছু অকথ্য গালাগাল। তবে দোকানে খদ্দেরের ভিড় আছে বলেই বোধহয় পতু ঝামেলা আর বাড়াল না। তিনটে রামগাঁটায় মাথায় তিনটে আলু ফুটিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

ফের চোখ অন্ধকার দেখল নসিরাম। মরা কুলগাছটায় হাতের ভর রেখে অন্ধকারটা ছাড়িয়ে নিল চোখ থেকে। এক রাজ্যের শুঁয়ো লেগে হাতটা চুলকোতে থাকে। তবু অল্পের ওপর দিয়েই গেছে বলতে হবে।

কিন্তু কথাটা সে অন্যায্য বলেনি। যুধিষ্ঠিরের চায়ের দোকান যত ভালোই চলুক, তাদের আসল আয় দোকান থেকে নয়। পতু স্টেশনে রেল থেকে মাল খালাস করার দু নমবরি ব্যবসায় বহুদিন হল ভিড়ে গেছে। রেলের পুলিশ নিজেরাই ব্যবসাটা ফেঁদেছে। পতুরা কম দামে মাল নামিয়ে আনে। বেশি দামে বেচে দেয়। ধরা পড়ার ভয়টা নেই।

সতু এতক্ষণে উঠে বসেছে। কাণ্ডটা বোধ হয় দেখেছেও। হাই তুলে বলল, বেশি কথা বলা তোরও দোষ। অত কথা বলতে যাস কেন?

নসিরাম রাগ করে বলে, খামোখা গালমন্দ করছিল দেখলে না?

খামোখা করে রে পাগল! তোরও দোষ ছিল। চল রওনা দিই। আজ আর কিছু হওয়ার নয়। দিনটাই খারাপ।

বয়সে সতু নসিরামের চেয়ে বছর কয়েকের বড়। তার বউ আছে, গোটা চারেক বাচ্চা আছে। নসিরামের ওসব নেই। দুজনেই ভুঁইঞাদের জমিতে চাষ করত। বর্গা রেজিস্ট্রির সময় মাতব্বররা তাদের বাদ দিয়ে অন্য দুজনের নাম বসাল। কিছুতেই টলল না। নতুন বর্গাদার ভুঁইঞাদের নিজস্ব লোক। মাতব্বরদের টাকা খাইয়ে ওরাই ওই কাজ করে। সেই থেকে সতু কষ্টে আছে। দুজনেই বুদ্ধি পরামর্শ করে চুরি ছ্যাঁচড়ামির লাইন ধরল বটে। কিন্তু আজ অবধি তেমন সুবিধে হল না।

নসিরাম গোঁ ধরে বসে বলল, তুমি যাও। আমি যাব না।

তবে কি এখেনে বসে বসে মশা তাড়াবি?

তাই তাড়াবো।

তোর বড় তেজ। অত তেজ ভালো নয়। আজ আর লোহারগঞ্জ গিয়ে কাজ নেই, কালীতলাতেই চল। একটা চট পেতে দাওয়ায় পড়ে থাকবি।

অভিমান ভরে নসিরাম বলে, তোমার বউ তোমার জন্য রেঁধে রেখেছে, আমার জন্য তো আর রাখেনি।

এককথায় সতু হাসল, বলল, রেঁধে রেখেছে তো মেলা। উনুনে নিজের হাত পা গুঁজে দিয়ে নিজের মুণ্ডুটা সেদ্ধ করে রেখেছে। চল, নুন দিয়ে মেখে তাই খাবি। তাও নুন যদি মুদিরপো ধারে দেয়।

নসিরামের অভিমান যায়নি। বলল, তোমার বউয়ের মুণ্ডু তুমি খাওগে।

তোর বড্ড মেজাজ। ঠান্ডা হ তো বাপু। ঠান্ডা মাথায় বসে ভাব। ভাবতে ভাবতে একটা কিছু বেরিয়ে পড়বে।

বিড়ির কী ব্যবস্থা করা যায় বলো তো?

নফরাকে বল না।

নফরা দিতে বসেছে আর কি!

তবে যা, একটু তামাক পাতা নিয়ে আয়। দুজনে বসে চিবোই।

কিন্তু নসিরাম নড়ল না। গোঁ ধরে বসে রইল। চারদিক ঝেঁপে অন্ধকার নামছে। চকবেড়ের হাটে আলো জ্বলে উঠছে একে একে। কুপি, হ্যাজাক, হ্যারিকেন, কারবাইড। আনমনে, দৃশ্যটা দেখছিল নসিরাম। ভারি সুন্দর এই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর লড়াই। আরও ভালো লাগত যদি পেটের খোঁদলটা এমন হাঁ হাঁ না করত।

সতু একটা কোঁক দিয়ে ধীরে ধীরে উঠল। কোমরের গামছাটা খুলে মাথায় জড়াতে জড়াতে বলল, এখন সাঁঝের পর খুব হিম পড়ে। কালীতলায় যদি না যাস তো লোহারগঞ্জেই যা, ঘরে গিয়ে আজকের রাতটা জিরো।

নসিরাম তবু নড়ল না, তার কেমন একটা ভাব এসেছে। রামতারণ তাকে একটা মোটে থাবড়া দিয়েছিল। সতুর ভাগটা ছিল অনেকটাই বেশি। এখন আবার পতুর গাঁট্টা তিনটে খাওয়ার পর নসিরাম আর সতু প্রায় সমান সমান। তার চেয়ে বড় কথা, তিনটে গাঁট্টা তার মাথার ভিতরটা কেমন গুলিয়ে দিয়েছে। চারদিককার এই হাট বাজার, পচা নর্দমার গন্ধ রই-রই শব্দ কিছুই যেন তাকে তেমন ছুচ্ছে না।

সতু আবার জিগ্যেস করল, কী রে যাবি?

না, তুমি যাও।

সতু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে আবার বসে পড়ল। বলল, তোর হয়েছেটা কী বল তো!

নসিরাম হঠাৎ মুখ তুলে বলল, হবে আবার কী? এতক্ষণে রামতারণের লাল মাঠের ধারে পড়ে থাকার কথা, তার ওপর মাছি ভন ভন করার কথা। আমাদের দুজনের হাতে দু দুটো অস্ত্র ছিল, তবু তা হল না। লোকটা ভয় পেল না। কেন বলো তো সতু গোঁসাই? এক গোছা টাকা ট্যাঁকে নিয়ে সে দিব্যি ফিরে গিয়ে এতক্ষণে বউয়ের হাত পাখার নীচে বসে বাতাস খাচ্ছে।

হাতপাখার বাতাস খাওয়ার মতো গরম এখনও পড়েনি, কিন্তু সে কথাটা আর সাহস করে বলতে পারল না সতু। গলাটা উদাস রেখে বলল, প্রথম প্রথম ওরকম হয়। ওকে যে মারতে হয়নি সেটা ভালোই হয়েছে। মানুষ মারার অনেক হ্যাপা রে। আমরা তো মারতে চাইনি। টাকাটা চেয়েছিলুম।

আর উলটে যে ও আমাদের মারল!

তা কী করবি বল। রামতারণ শালা খায়দায় ভালো। বোধ হয় ডন বৈঠকও করে। তোর আমার মতো উপোসি পেট তো আর নয়। আমরাও দু দিন ভরপেট খেয়ে নিলে অত সহজে পারত নাকি! তার ওপর আমার ন্যাবাটা হয়ে...

রাখো তোমার ন্যাবা। নসিরাম খেঁকিয়ে উঠে বলে, আসলে আমরা মরদই নই।

কথাটা অন্যায্য মনে হয় না সতুর। সে চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে ভয়ে ভয়ে বলে, চল, হাটে একটু ঘুরে দর-দস্তুর দেখি।

দেখে কী হবে

চল না। জিনিসপত্তর দেখলে মনটা অন্যদিকে থাকবে। দরটাও জেনে রাখা ভালো। আমার মুখে থুথু আসছে। একটু তামাক পাতা মুখে না দিলেই নয়।

নসিরাম চোখ পাকিয়ে বলল, কচুটা কি যুধিষ্ঠির শালার বাপের?

সতু উদাস গলায় বলল, তারই বা কী করবি? জোর যার মুলুক তার।

এঃ জোর! আমরা যে আসলে মরদই নই সেকথাটা স্বীকার যাচ্ছো না কেন?

যাচ্ছি বাপ, স্বীকার যাচ্ছি।

নসিরাম হঠাৎ একটা ঝাঁকি মেরে উঠে সতুকে দুহাতে নাড়া দিয়ে বলল, তাহলে চলো মরদের মতো একটা কিছু করি।

ভয় খেয়ে সতু বলে, কী করবি?

একটা কিছু করি, নইলে কোন লজ্জায় বাড়ি ফিরবো।

নসিরামের মাথায় যে সতুর তিনটে গাঁট্টা তাড়ির মতো কাজ করছে তা জানে না সতু।

তবে তার চোখেমুখে হন্যে ভাবটা দেখে সে বুঝল, নসিরাম নিজের বশে নেই। পাগলার বায়ু চড়েছে। সে নসিরামের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, চলতো আগে বেরোই। তারপর দেখা যাবে।

দুজনে বেরোবার মুখে একটা আস্ত তামাক পাতা নফরের চোখের সামনেই তুলে নিল নসিরাম। আস্তটা না নিলেও হত। কুঁড়োকাঁড়া মেলা পড়ে থাকে। তাই দিয়েই চলে যেত। তবু আস্ত পাতাটাই একটা থাক থেকে তুলে নিল নসিরাম। নফর কিছু বলতে যাচ্ছিল। হয়তো মা-বাপ তুলে একটা খিস্তিই দিত। কিন্তু নসিরাম তার চোখের দিকে চেয়েছিল। কী জানি কেন, কিছু বলল না নফর।

বাইরে এসে একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে বলা নেই কওয়া নেই চুনের বাটি থেকে এক খাবলা চুন তুলে নিল নসিরাম। পানের দোকানি হাঁ-হাঁ করে উঠেও শেষ অবধি আর কিছু বলল না।

চুন দিয়ে ডলা খানিকটা তামাক পাতা ঠোঁটের নীচে গুঁজবার পর একটু ধাতস্থ হল দুজন।

নসিরাম খানিক থুথু ফেলে বলল, আমাদের কী নেই বলো তো? কেন আমাদের দিয়ে কাজ হচ্ছে না?

সতু মিইয়ে গিয়ে বলে, আমরা যে লোক ভালো। ভালো লোকদের দেখলেই চেনা যায় কিনা।

তোমার মাথা। ভালো লোককে ধরে তাহলে ঠেঙায়?

ভালো লোক বলতে ঠিক ভালো লোক নয় বটে। আসলে আহাম্মক ঠাওরায়।

তাই বলো। আহাম্মক আর ভালো কি এক হল?

অত কথা জানলে তো এতদিনে কালীতলা প্রাইমারিতে মাস্টারি করতুম রে। অত কথা কি জানি?

ভুঁইঞেরা যখন জমিতে নতুন বর্গা লাগালে তখন আমরা যেমন আহাম্মক ছিলুম আজও তেমনি আহাম্মক আছি বলছো?

সতু মাথা নেড়ে বলে, আছিই তো।

তাহলে মরদও নই?

তাও খানিকটা ঠিক। কারও সঙ্গেই আমরা তেমন এঁটে উঠছি না। তবে রোজ একটু একটু করে অভ্যেস করলে দেখিস হয়ে উঠব একদিন।

তোমার বয়স কত?

সতু অবাক হয়ে বলে, কত আর। তোর চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড় হবো।

তোর কত?

তা জানি না। তবে বেশি নয় খুব একটা, কমও নয়। ভাবছি হয়ে উঠতে আর কদিন লাগবে। ততদিনে বুড়ো ধুড়ো হয়ে যাবো না তো দুজনে?

সতু খুব হাসে। গামছার ল্যাজে মুখ মুছে বলে, বুড়ো হওয়া তো ভালো কথা রে। বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয় তাহলে। গতিক যা দেখছি, ততদিন বেঁচে থাকাটাই তো দায়।

নসিরাম আর একবার থুথু ফেলে বলে, তাই তো বলছিলাম, এসব রয়ে সয়ে হয় না। এসো মরদের মতো একটা কিছু করে ফেলি।

মেটে আলুর দর জিজ্ঞেস করতে একটু দাঁড়িয়েছিল সতু। দোকানি তেরছা একটু চেয়ে দেখল। জবাব দিল না। মাল চেনে। সতুও আর চাপাচাপি করল না। হাঁটতে হাঁটতে বলল, কী বলছিলে?

বলছিলাম অত ভয় খাও কেন? একটা ধুন্ধুমার কিছু লাগিয়ে দিই এসো। যা হোক, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড।

অত উতলা হোস না। রোজ ক-দিন।

সেটা আর ক-দিন। ভালো পথ তো আর নেই। খারাপ পথেও ভিড় বাড়ছে। শেষে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন?

কেন, এই তো সেদিন রতন সিং-এর গরুটা চুরি করলুম দুজনে।

সে আর ক-টা টাকাই বা দিয়েছে! গো-হাটার লোকটা চোরাই গরু বলে ধরে ফেলল। দিল মাত্র একশোটা টাকা। ভাগাভাগি হয়ে তোমার পঞ্চাশ, আমার পঞ্চাশ। ও তো পিচেশপানা। বড় কিছু না করলে বড় দাঁও মারা যায় না, বুঝলে!

বুঝছি রে বাপ, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। তুই বড় ছটফট করছিস আজ। এমন তো ছিলি না।

আজ রক্তটা কিছু গরম লাগছে।

আয় তেলেভাজা খাই। পেটে কিছু পড়লেই রক্ত ঠান্ডা হবে। আমার কাছে একটা টাকা আছে।

আছে? বলোনি তো এতক্ষণ।

বলার ফাঁক দিলি কই? যা গেল হুজুত। পরশু ব্রজবিলাসের বাড়ি থেকে দুটো কাঁসার থালা সরিয়েছিলাম। তারই তলানি একটা টাকা পড়ে আছে।

তাহলে তেলেভাজা খেতে চাইছো কেন? অত বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়? বরং একটু কুস্মি কলাই আর নুন কিনে বাড়ি যাও। সেদ্ধ করে ছেলেপুলে বউ নিয়ে খাবে।

বলছিস?

বলছি। খিদেটা আছে থাক। শরীরটা গরম লাগছে। চনমনে লাগছে। পেটটা ঠান্ডা হলে এই ভাবটা মরে যাবে।

সতু আমতা আমতা করে বলল, তোকে আমার এখন একটু একটু ভয় করছে কেন রে নসু?

নসিরাম হাঃ হাঃ করে খানিক হাসল। মাথায় একটু হাত বোলাল সে। তিনটে আলু ফুটিয়ে দিয়েছে পতু শালা। কেন? না একটা কচু নিয়ে বৃত্তান্ত। দুনিয়াটা যে কী ছোটলোকই হয়ে গেছে বাপ!

চকবেড়ের সরকারদের এই হাট ভারি রমরমে জায়গা। নামে হাট হলেও আসলে পাকা এবং স্থায়ী বাজার। হপ্তায় দুদিন বাজারের গায়েই হাট বসে। আজ সেই হাটবার। মেলা লোকের আনাগোনা। দুজনে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বিশেষ লক্ষ করছে না তাদের।

সতু বলল, কথাটার জবাব দিলি না?

কোন কথাটার?

তোকে দেখে এখন আমার একটু গা ছমছম করছে কেন?

ওঃ, কী যে ছাতামাথা বলো না! আমি কি ভূত যে গা ছমছম করবে?

ভূত নোস। তবে তোর হাবভাব। ভালো লাগছে না রে নসু। কী যে একটা মতলব আঁটছিস মনে মনে।

সে তো আঁটছিই। হাবভাব ভালো করার জন্য এ লাইনে নেমেছি নাকি।

তা বটে। তবে মাথাটা ঠান্ডা রাখিস।

রাখা যাচ্ছে না। মাথা ঠান্ডা থাকে কখনও? হাতে অস্ত্র নিয়ে হামলা করলুম, তাও রামতারণ শালা পুলিশ দিল না। এমনকী ইসমাইলকে পর্যন্ত পিছুতে লাগল না। তার মানেটা বুঝছো? তার মানে, রামতারণ আমাদের মনিষ্যি বলেই জ্ঞান করেনি। ছিঁচকে চোরকেও লোকে এর বেশি খাতির দেয়। তা জানতে চাইছিলুম, আমাদের কী নেই!

কিসের অভাব আছে। লোকে ভয় খাচ্ছে না। পাত্তা দিচ্ছে না। রামতারণ এমন কিছু ডাকাবুকো লোকও নয়। গেরস্ত মানুষ, পাইক নিয়ে চলে, মেয়েমানুষ করে, তার ভয়-ভীতি থাকার কথা। তারপর ধরো, যুধিষ্ঠিরের পো পতু চোর বলে তিনটে গাঁট্টা আর গালাগাল দিয়ে ছেড়ে দিল। লোক জড়ো করল না, তেমন চ্যাঁচামেচি করল না। তার মানেও কিন্তু ওই। মানুষ বলেই ধরছে না।

তোর মাথাটাই বিগড়ে গেছে আজ।

তা বলতে পারো। নাও তামাকটা একটু ডলো। আর একটু চড়াই।

খিদেটা মরেছে?

মরেছে। আর একবার চড়ালে একদম মরে যাবে।

মাসুদের জর্দার দোকানের সামনে একটা আয়না ঝোলানো ম-ম করছে গন্ধ। খইনি ডলতে ডলতে আঁচমকাই সতু আয়নাটার দিকে চেয়ে চমকে গেল। চেক লুঙ্গি, শার্ট আর সোয়েটার পরা একটা ছিপছিপে লোক পিছু ফিরে আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বোধহয় মুখের ব্রণ টিপছিল। হ্যাজাকের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল মুখখানা। ইসমাইল। হাতে টর্চ ছাড়া আপাতত কোনও অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর লুঙ্গি বেল্ট দিয়ে বাঁধা থাকে। সেই বেল্টে ঝোলে চাকুর খাপ। কিন্তু কথা হল, ইসমাইল তাদের খবর রাখে কিনা।

খইনি, ডলতে ডলতে থেমে গিয়ে সতু বলল, নসু, ইসমাইল।

প্রথমটায় নসিরাম বুঝতে পারেনি। হাত বাড়িয়ে খানিকটা খইনি সতুর হাত থেকে তুলে নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। তারপর আচমকা সেও ইসমাইলকে দেখতে পেল।

দেখতে হয়তো পেত না। কিন্তু ইসমাইল আয়নার ভিতর দিয়ে নিজের মুখ দেখার ছল করে আসলে হাটের লোকজনকে চোখে চোখে রাখছিল। তাদের দুজনকে দেখতে পেয়েই ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। লোকটার সেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোটা চোখে পড়াতেই ইসমাইলকে দেখতে পায় নসিরাম। দেখেই একটা চমক লাগে তার। বুকে একটা চড়াই পাখি ককিয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইসমাইলের ধরনটাও ভালো ঠেকে না তার চোখে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, চোয়াল শক্ত, ভ্রূ কোঁচকানো, ফরসা মুখটা একটু রাঙা দেখাচ্ছে।

ইসমাইল তাদের নড়বার সময় দিল না। মাসুদের দোকান থেকে একটা লাফ মেরে রাস্তার মাঝখানে পড়ল।

কি বে শশালা! খুব মস্তান হয়েছিস?

রামতারণ তাহলে খবর দিয়েছে? অ্যাঁ! রামতারণ শালা শেষ অবধি খবর দিয়েছে তাহলে?

সতু ককিয়ে উঠে বলল, নসু! দৌড়ে! পালা!

নসিরামেরও বুকের মধ্যে তোলপাড়। তবু সে একটু সত্যিকারের হাসি হেসে বলল, আঃ দাঁড়াও না! রামতারণ শেষ অবধি তো মনিষ্যির মানটা দিয়েছে, নাকি?

কী যে বলিস বিপদের সময়ে! দৌড়ো!

তুমি পালাও।

তুই?

জবাবটা দেওয়ার সময় পায় না সতু। ইসমাইল চট করে এসে বাঁ হাতে একটা রদ্দা মারল সতুর ঘাড়ে। সতু পড়ে গেল।

নসিরাম দেখল, ইসমাইল তার ছুরি বের করেনি। খুব রাগ হল তা। দু দুটো লোককে শুধু হাতেই মেরে ক্ষান্ত হবে নাকি গুন্ডাটা? সে-হাত ছড়িয়ে ইসমাইলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ঢ্যামনার মতো হাত চালাচ্ছো কেন?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! ইসমাইল দ্বিতীয়বার হাত তুলতে গিয়েও একটু থমকে গেল। গনগনে গলায় বলল, কত বড় খুনিয়া হয়েছিস রে শালা রেন্ডির ব্যাটা? জানিস এটা আমার এলাকা!

জানি। কিন্তু আগে অস্ত্র বের করো, তারপর কথা। অত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কিসের হে! বের কর শালা তোর অস্ত্র।

নিজের গলার স্বরে নসিরাম নিজেই অবাক হয়ে গেল। যেন এক বাঘ এসে কখন সে দিয়েছে গলার মধ্যে। খোনা স্বরটা আর পাওয়া যাচ্ছে না তো!

ইসমাইল এটু দ্বিধায় পড়ে গেছে! চারদিকে লোকজনও জড়ো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কোমরে জামার তলায় হাত রেখে সে স্থির চেয়ে বলল ফের এই তল্লাটে পা দিয়েছিস তো--

কিন্তু কথাটা শেষ হল না তা। নসিরাম হঠাৎ খ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে গেল তার দিকে, রেন্ডির পুত আমি না তুই রে? অ্যাঁ! কাঁচা খেয়ে নেবো তোকে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো শালা! আয় আয় শালা...

কী যে হল তার হদিশ পাওয়া মুশকিল। তবে কেমন যেন ভড়কানো মুখে ইসমাইল পিছু হটতে লাগল।

আয় শালা! আয় শালা! বলে এগোতে লাগল নসিরাম। হাতে অস্ত্র নেই। পেটে খোঁদল। গালে রামতারণের থাবড়া এখনও চিন চিন করছে। মাথায় পতুর তোলা তিনটে আলু। তবু শুধু হাতেই সে হঠাৎ বেড়ালের মতো একটা লাফ মেরে গিয়ে পড়ল ইসমাইলের এক হাতের মধ্যে।

আর পারল না ইসমাইল। বোধহয় জীবনে এই প্রথম সে মুখ ঘুরিয়ে ছুট লাগাল। এক হাট লোকের চোখের সামনে।

নসিরাম নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে। সে লক্ষ করল চারপাশে জড়ো হওয়া শয়ে শয়ে লোক তাকে নীরবে দেখছে। তাদের চোখে ভয়।

একটু বেশি রাত করেই ফিরছিল দুজন। সতু আর নসিরাম।

সতু বলল, তোর সঙ্গে এই যে রাত বিরেতে রোজ ফিরি, কোনওদিন ভয় লাগে না। আজ লাগছে। তোকে আজ ভয় খাচ্ছি কেন রে?

নসিরাম নিজের মাথার তিনটে আলুতে হাত বুলিয়ে বলল, কি জানি কেন, আজ আমার নিজেরই নিজেকে এখন কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

আত্ম-কথা

একটুখানি বেঁচে থাকা

নদীর ধারে আমার জন্ম।

একটা উপন্যাস লিখেছিলাম, 'আশ্চর্য ভ্রমণ'। তাতে ছিল ইন্দ্রজিৎ নদীকে জিগ্যেস করছে--কোথা হইতে আসিতেছ নদী?

নদী উত্তর দেয়--তোমার শৈশব হইতে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রও গঙ্গাকে অনুরূপ প্রশ্ন করতেন, নদী অন্য রকম উত্তর দিত। অনেকের তা মনে থাকতে পারে।

যে নদীর ধারে আমার জন্ম সেই ব্রহ্মপুত্র আমার ছেলেবেলাকে তার খুঁটে বেঁধে রেখেছে আজও। গৈরিক পলিমাটির স্তর দিয়ে যে মেখে রেখেছে আমার শৈশব। তাই পৃথিবীর ওপর বা জীবনের প্রতি আজও তেমন রাগ বা অভিমান অনুভব করতে পারি না, কখনও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয় না, কখনও বলিনি—এ জীবনটা কিছুই নয়।

একটা নদী ওই অতখানি করেছিল।

বাসার সামনে ছিল একটু মাঠ, দাদুর কাছারিঘর, তারপর গরিব বোষ্টম, গয়লা, ঘানিওলা, ধোপাদের কাঁচা ঘর, লাল সুরকির রাস্তার ধার কদম গাছ, একটা ইস্কুলবাড়ি। এসব স্থাবরতা পেরিয়ে গেলেই দেখা যেত বহু দূর ভাঙা পাড় নেমে গেছে, কাঁটা ঝোপ, মানুষের মল, আঘাটায় পচা মুলিবাঁশের কটু গন্ধ কিন্তু চোখ তুলে চাইলেই দেখা যায় সব বন্ধন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় তার অনন্ত বয়ে-যাওয়া নিয়ে নদী। বড় হয়ে এই নদীর কথা যখন লিখছি 'উজান' উপন্যাস তখন বাহ্য চৈতন্য থাকত না প্রায়ই। বালি স্টেশনের দক্ষিণ ধারে ছোট্ট জনপদ দুর্গাপুর। সেখানে এক ঘরের বাসায় থাকি তখন। ধারে কাছে নদীর চিহ্ন নেই। একশো গজ দূর দিয়ে অনবরত লোকাল ট্রেনের যাওয়া-আসা, ভাড়াটে বাড়ির গোলমাল, আর তখন সকাল থেকেই ছিল রাত অবধি অন্নচিন্তা চমৎকার পাশের বারান্দায় ব্রিজ খেলার ঝগড়া চরমে ওঠে, আমার আট মাসের মেয়ে এসে বার বার হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে নানা শব্দ করে আমার মনোযোগ চায়। কিন্তু তখন আমি কোথায়, কোন গহীন স্মৃতির ডুবজলে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের ধারে ধারে আমার বিচূর্ণ শৈশবের টুকরো কুড়িয়ে জড়ো করছি। কখনও সেই নদী হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুনদী, তার পরপারের অন্ধকারে ঘোরলাগা রহস্যের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে আলেয়ার আলো। সেই নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকতেন আমার দাদু বড় ঘরের বারান্দায় একটা মস্ত ডেক চেয়ারে। শেষ বয়সে তিনি চেয়ে

দেখতেন, ওই নদীতে বৈতরিণীর ছায়া পড়েছে। তখন কাছে গেলে তিনি আমাকে চুপ করে ধরে বসে থাকতেন। অনুভব করতেন আমার ভিতরে তাঁর পরোক্ষ বেঁচে থাকা।

মৃত্যু নয়, আয়ুর শেষে এক নদীই বুঝি এসে মানুষকে নিয়ে যায়।

ময়মনসিংহের সেই ব্রহ্মপুত্র ছেড়ে এসেছি কতকাল হয়ে গেল। তবু বারবার সেই নদী ভূগোলের সীমানা ভেঙে বয়ে আসে আমার কাছে। কত নরম পলির স্তর ফেলে যায়। পৃথিবীর ওপর রেগে উঠতে পারি না, জীবনকে মনে হয় না অর্থহীন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের দেশ থেকে আমার মোক্তার দাদু আইনব্যবসার প্রসার জমাতে ময়মনসিংহে এসেছিলেন। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হয়, এখানে ওই নদীর ধারে আমার জন্ম হবে বলেই যেন তার ওই আসা।

বাবার চাকরি ছিল রেলে। শৈশব ভালো করে পরিস্ফুট হয়নি তখনও, তার আগেই শুরু হল এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতায়, আর যুদ্ধ থামবার আগেই বাবার সঙ্গে বদলি হয়ে ঘুরে ঘুরে আমরা সাতঘাটের জল খেয়েছি। বিহার, উত্তর বাংলা, পূর্ব বাংলা, আসাম। এক জায়গা ছেড়ে গেছি অন্য জায়গায়। পিছনে ফেলে এসেছি পুরোনো আসবাব, ছেঁড়া বই, প্রিয় বন্ধু, পোষা কুকুর। কত কেঁদেছি। মনে মনে বলেছি-- আমি এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যাব না। পরে দেখেছি জীবন যা কেড়ে নেয় তাই ফিরিয়ে দেয় আবার। একটা সরে গিয়ে আর একটার কেমন জায়গা করে দেয়। পুরোনো জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গায় গিয়ে নির্লজ্জের মতো বন্ধু পাতিয়েছি কতজনার সঙ্গে।

একটা গল্প লিখেছিলাম, 'আমি সুমন'। তাতে একটা কোকিলের ডাকের কথা ছিল। কাটিহারে এক শীতের ভোরে আমাদের রেলের বাংলোবাড়ির বাগানে মাদার গাছে একটা কোকিল ডেকেছিল। সে কি ডাক। চরাচর শূন্য করে দিয়ে আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে, কাঁদিয়ে ভাসিয়ে ভীতত্রস্ত করে ডেকেছিল সেই কোকিল। লিখেছিলাম, পৃথিবীতে হাজার বছরে মাত্র একবারই সে কোকিল ডাকে, জীবনে আর দ্বিতীয়বার তার ডাক শোনা যায় না।

ভাষা দিয়ে মানুষের ধ্বনি দিয়ে সব অনুভূতি বোঝানো যায় না। কি করে বোঝাব সেই কবে কাটিহারের শীতভোরে সেই কোকিলের হু-হু বিষাদেভরা আর্তনাদ আমাকে কেমন জাদু করেছিল, কয়েক মুহূর্তের জন্য এই ঐহিক মর্ত্যভূমি থেকে সে আমাকে তুলে নিল এক অবাস্তব অনুভূতির লোকে। বাগানের মধ্যে আমি অনেকক্ষণ ছোটাছুটি করেছিলাম অস্থিরতায়।

এই রকম অস্থিরতা বার বার এসেছে জীবনে। এক ভূতুড়ে অবাস্তবতার অনুভূতি কোথায় লুকিয়ে থাকত। বুঝি কপাটের আবডালে দেওয়ালের ওপাশে, কিংবা বাতাসে জীবাণুর মতো ভেসে বেড়াত। খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, খেলছি, কোথাও কিছু না হঠাৎ মাথাটা ঝিম করে উঠল, বুক উঠল ঢিপঢিপ করে তখন চারদিকে চেয়ে কিছুই যেন চিনতে পারতাম

না। মনে হত এ জগৎ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি এখানে কেন? এরা সব কারা? এসব গাছপালা বাড়ি ঘর এগুলি কি? কেন? এরকম যখন হত তখন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করত ভয়ে। আমার এরকম মনে হচ্ছে কেন? আমি কেন স্বাভাবিক নই? এই অবস্থায় কতবার দেয়ালে মাথা ঠুকেছি, রাস্তার পাথর তুলে হাত থেঁতলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, নিজেকে ব্যথা দিয়ে ফিরে আসবার চেষ্টা করেছি স্বাভাবিকতায়। সেই বয়সে যাকে সব কথা বলা যায় সেই মাকে আমার এই অসুখের কথা বলেছিলাম। মা জ্যোতিষ পেলেই ডেকে আনত, সাধু দেখলেই আমাকে হাজির করত নিয়ে তার কাছে। কিছু হয়নি তাতে। আশৈশব ওই আশ্চর্য অনুভূতি আমাকে তাড়া করে ফিরেছে।

'দুঃখরোগ' গল্পে, 'যাও পাখি' উপন্যাসে এবং আরও কয়েকটি লেখায় এই অনুভূতির কথা আছে। একটা সৃষ্টিছাড়া গল্প লিখেছিলাম, 'ক্রীড়াভূমি', তার মধ্যে এই অভিজ্ঞতা খুব কাজে লেগেছিল।

আমরা কোথাও স্থিতু হতে পারতাম না। বিহার ছেড়ে উত্তর বাংলা, পূর্ব বাংলা, আসাম কত ঘুরে বেড়িয়েছি। পাহাড়, জঙ্গল, নদী আমার সে বয়সটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নির্জন সব জায়গা, নিঝুম বন পাহাড়, আদিগন্ত চা-বাগান, এ সবই ছিল আমাদের পরিবেশ। মাল জংশন, দোমোহানি, আমিনগাঁও, পাণ্ডু, লামডিং, বদরপুর, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, কুচবিহার সর্বত্রই জড়িয়ে আছে শৈশবের অস্তিত্ব।

আমার তুচ্ছ লেখালেখির মধ্যে বার বার এই শৈশবের কথা এসে পড়ে। মুষ্টিমেয় যে কজন আমার লেখা পড়েন তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, কেন ছেলেবেলার কথা এত লেখো তুমি?

এ প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে যাই। একবার 'আত্মপ্রকৃতি' নামে একটি গল্পে লিখেছিলাম--ছেলেবেলার পর আমি কি আর বেড়ে উঠিনি? আমার যা কিছু সবই কি সেই শৈশবেই প্রোথিত? এ কি প্রত্নতাত্ত্বিক?

উলটো করে বলা যায় সেই শৈশবই যেন তার সময়সীমা অতিক্রম করে চলে আসছে কাছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও চলেছে। জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়লে যখন রহস্য অসিত হয়, রুক্ষ জীবনের ধুলো আর রোদ ক্লান্ত করে, তখন মাঝে মাঝে ওই স্মৃতির আশ্চর্য শৈশব থেকেই আসে কুসুম গন্ধ, কোকিলের অপার্থিব ডাক, নদীর জলের নরম শব্দ। শৈশবের দিকের জানালাটা খুলে মাঝে মাঝে ঝুম হয়ে বসে থাকি। বেঁচে থাকার অনন্ত পিপাসা জেগে ওঠে, বার বার পৃথিবীতে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে।

অপুকেও ছাড়েনি তার নিশ্চিন্দিপুরের গ্রাম। বহু দেশ ঘুরেও সেই প্রকৃতিমুগ্ধ শৈশবপ্রেমিক অপুর কাছে নিশ্চিন্দিপুরই হয়ে রইল মায়ের কোল। কতবার মনে হয়েছে, আমিই অপু। যারা গাঁয়ে গঞ্জে গাছগাছালি, মাঠ নদীর কাছে বড় হয়েছে তাদের অনেকেরই এরকম মনে হয়।

কিন্তু অনেক ভেবে দেখেছি, শেষ পর্যন্ত আমি অপু নই। যদিও আশ্চর্য শৈশবের নানা বিস্ময়, বর্ণ আর শব্দ আমার চারধারে এক স্বপ্নের ঘেরাটোপ সৃষ্টি করে রেখেছিল, তবু আমি তো ছিলাম না নরম আর ভিতু আর ভাবালুতায় ভরা শিশু। ইস্কুলের একদম নীচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই দামালপনার জন্য মাস্টারমশাইদের হাতের বেত সপাটে আছড়ে পড়ত হাতের তেলোয়, সর্বাঙ্গে দাগড়া দাগ ফুলে উঠত দড়ির মতো। বাসায় ফিরে মার-খাওয়া রক্তাভ হাত মায়ের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখতাম। প্রায় প্রত্যেক দিন মার খেয়ে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেল। হাতের তেলো দুটো আজও বড় শক্ত। মারপিটে বেশ আগ্রহ ছিল। আমার অত্যাচারে কতবার বাড়ির চাকর পালিয়েছে। দিদির চুলের মুঠি ধরে ঝুলে পড়তাম রাগ হলে, একবার রড নিয়ে মাকে মারতে গিয়েছিলাম খ্যাপামির মাথায়। একবার আমার গুলতি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল একটা ছেলে। বন্ধুবান্ধবদের মেরেছি, মার খেয়েছি তাদের হাতে। ছিলাম অসম্ভব রকমের পেটুক ভীষণ দুষ্টু, দামাল। সবাই আমাকে চিনত দুষ্টু ছেলে বলে। দুষ্টু ছেলেদের তাই আমি বেশ ভালো চিনি। নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করার ওই হচ্ছে তাদের এক উপায়।

বাড়িতে আমাদের ছিল চূড়ান্ত স্বাধীনতা, নিষেধের বাধা ছিল খুবই কম। বাড়িতে আসত 'শনিবারের চিঠি' আনন্দবাজার আর নানা পত্রপত্রিকা বই ছিল অনেক। যখন পড়তে শিখিনি তখন মা দুপুরে নিজের পাশটিতে আমাকে শুইয়ে রেখে পড়ে শোনাত মহুয়া পূরবী বা গীতাঞ্জলির কবিতা। আজও মনে পড়ে 'ঝর্না তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' শুনতে শুনতে কল্পনায় চলে গেছি গহীন পাহাড়ের নিবিড় অভ্যন্তরে একাকী ঝরনার পাশে। ওইভাবে বই পড়ার নেশা জেগেছিল। পড়তে শিখবার কিছুকাল পরে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' উপন্যাসটি ধারাবাহিক পড়তে থাকি শনিবারের চিঠিতে। সে কি আশ্চর্য রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা! স্থবির শর্মা নামে ছেলেটির সঙ্গে নিজের আশ্চর্য মিল পেয়ে যাচ্ছি প্রতি মাসে। কত কেঁদেছি সেই উপন্যাস পড়ে। এক মহাপৃথিবীর ডাকে স্থবির বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। ওরকম পালানোর ইচ্ছে জেগেছিল আমারও। কিন্তু স্থবিরের বাবা মহাদেব শর্মার মতো আমার বাবা তো আর নিষ্ঠুর নয় যে, শাসনের অত্যাচারে অহস্য হবে পালাব! কিন্তু মহাপৃথিবীর মুক্তি আমাকেও ডাকত। সবাইকেই ডাকে। কেউ কেউ চলে যেতে পারে। বাকিরা যায় না। আমি বরাবরই এই পড়ে থাকাদের দলে।

বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমাদের ভাইবোনদের পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছিল। বার বার ইস্কুল বদল, ঠাইনাড়া। অবশেষে আমাদের ময়মনসিংহে ফিরে আসতে হল। মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে এক বছর পড়তে না পড়তেই স্বাধীনতা এল দেশ ভাগ হয়ে গেল। চলে আসতে হল ব্রহ্মপুত্রের প্রিয় সঙ্গ ছেড়ে চিরকালের মতো। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে আমাকে পাঠানো হল কুচবিহারে মিশনারি স্কুলের বোর্ডিংয়ে। সেই থেকে দীর্ঘ আঠারো উনিশ বছর

আমার কেটেছে বোর্ডিং, হোস্টেল আর মেস-এ। খারাপ লাগত না, অভিভাবকহীন নিজস্ব জীবনযাপন করার মধ্যে একটু বুঝি নিজেকে বহন করার আনন্দ আছে। আর এই জীবনই আমাকে ঠেলে দিল এক একাকিত্ববোধের মধ্যে। এই একাকিত্বকে বড় ভয় পেয়েছি বরাবর। একা বসে ভূতুড়ে চিন্তা করতে করতে কখন সেই অবাস্তব অনুভূতি এসে বিদ্যুৎস্পর্শে চমকে দিয়ে অস্তিত্বে বিপদের আর্তনাদ তুলে যায়।

সেই একাভাব কাটানোর জন্য সারাদিন ক্রিকেট খেলতাম, বিকেলে মোষের মতো ফুটবল মাঠে লড়ালড়ি করতাম, তীব্র পিপাসায় বন্ধুদের সঙ্গ চাইতাম সব সময়ে। আবার কখনও বসে একটা মোটা বাঁধানো খাতায় আঁকতাম ছবি, কবিতার লাইন মিলিয়েছি, লিখেছি সব ছেলেমানুষি গল্প। এই সব লেখালেখির মধ্যে অমোঘভাবে থাকত বঙ্কিম রবি-শরৎ-এর ছায়া, কিংবা অন্য কারও। সে বয়সের পক্ষে যথেষ্ট গল্পের বই পড়া ছিল তখন। পড়ার বই ভালো লাগত না, অঙ্ক ছিল বিষ।

স্কুলের পত্রিকার সম্পাদক সনৎ চট্টোপাধ্যায় আমার সেই গোপন খাতা থেকে একটা গল্প ছিঁড়ে নিয়ে ছেপে দিলেন। ছাপা গল্প আর ছাপা নাম দেখে আমার বিস্ময়াবিষ্ট শিহরণ আর ফুরোয় না। গোপনে কতবার যে স্কুল ম্যাগাজিনে নিজের নামটা দেখি আর গল্পটা পড়ি তার হিসেব নেই। স্বদেশি আমল নিয়ে লেখা দেশপ্রেমের গল্প, ছেলেমানুষির চূড়ান্ত, তবু ছাপার অক্ষরে সেই গল্পই আমার ভিতরে নানা উচ্চাশা সঞ্চার করেছিল। তখন জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত, বুদ্ধদেব পড়ি, তারাশঙ্কর, বিভূতি, মানিক পড়া চলছে, নানা পত্রপত্রিকা জোগাড় করে আনি, পড়ার বইয়ের মধ্যে লুকোনো গল্পের বই খুলে ক্লাসে বসে গোপনে পড়ে নিই। সেই স্কুলের বোর্ডিংয়ে দু-তিনজন সাহিত্যপাগল জুটেছিলাম আমরা।

পাস করে কুচবিহার ভিকটোরিয়া কলেজে আই. এস-সি ক্লাসে ভরতি হই। বোধ হয় তখন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক গোছের কিছু হওয়ার ইচ্ছে ছিল। সায়েন্স পড়ার খুব একটা ধুম পড়ে গেছে চারধারে। সেই হাওয়া আমারও লাগল। ঘনিয়ে এল অস্তিত্বের আর এক বিপদ। অণুপরমাণুময় এই জগৎকে ধারণা করতে চেষ্টা করছিলাম, ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম সীমাবদ্ধ মাথায় অসীমের আকার, সময়ের শুরু ও শেষহীন অনন্ত গতিকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম। ঘুলিয়ে তুললাম নিজেকে। চেপে রাখা অবাস্তব অনুভূতি জো পেয়ে এসে ভালুকের মতো চেপে ধরল আমাকে। ছেলেবেলা থেকেই ওই রোগ। এখন তা আমার চারধারটাকে কেবলই অণুময় মিথ্যে, ধারণাতীত কালসমুদ্রে এক অলীক বাস্তবতায় পরিণত করে দিল। আমি যত আঁকড়ে ধরি আমার চারধারের বাস্তবতাকে, যত স্বাভাবিক হতে চাই তত সে আমাকে বিজ্ঞানের মূল প্রশ্নগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এই সেদিন 'যাও পাখি' উপন্যাসে অজিতের জীবনে এই ঘটনাটির কথা লিখেছি। সেটা পড়ে একটি ছেলে চিঠি লিখে জানিয়েছে, তারও এরকম হয়। হুবহু ওই অনুভূতি। যখন আমার

ওরকম হত তখন কিন্তু অনুরূপ অনুভূতিতে আক্রান্ত কাউকে খুঁজে পাইনি। বিজ্ঞান ছেড়ে একটা বছর সময় নষ্ট করে ভরতি হলাম আই-এ ক্লাসে। প্রখ্যাত কবি হরপ্রসাদ মিত্র তখন ভিকটোরিয়া কলেজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। কাছ থেকে একজন কবিকে সেই প্রথম দেখে ঘোর লেগে যেত। মফসসলের ছেলে, কত কি দেখিনি।

কি নেশা ছিল টেবিল টেনিসে। হোস্টেলে আর কলেজে দুটো বোর্ড ছিল। ক্লাসের ফাঁকে বা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অবিরল খেলে যেতাম। হোস্টেলে সকাল দুপুর রাত যখন হোক, সময় আর সঙ্গী পেলেই ব্যাট বল নিয়ে মেতে যেতাম খেলায়। খেলে খেলে হাত পেকে গেল, ফার্স্ট ইয়ারেই কলেজের সিংগলস চ্যাম্পিয়ন হই। আসলে কিন্তু টেবিল টেনিস খেলায় কিছু একটা করব সেরকম কোনও উচ্চাশা আমার ছিল না। বোধ হয় শারীরিক ব্যস্ততা নিয়ে মেতে থাকার জন্যই ছিল আমার খেলার নেশা। একাকিত্বের অনুভূতি, ভূতুড়ে চিন্তার ভয়, অবাস্তবতার বিদ্যুৎস্পর্শ এসব ভুলে থাকার জন্যই আমার ছিল ওইসব বহির্মুখীনতা, তাই পড়ার টেবিলের চেয়ে আমাকে অনেক বেশি দেখা যেত ফুটবল, ক্রিকেট বা ভলিবলের মাঠে, কমনরুমে। আমার অকিঞ্চিৎকর লেখাগুলি কেউ কখনও যদি পড়েন তো দেখা যাবে তাতে বারবার খেলার মাঠের কথা আসে, খেলার অনুষঙ্গ আসে। 'ক্রীড়াভূমি' গল্পে যেমন এসেছিল, তেমনি এসেছে ঘুণপোকা, পারাপার, বৃষ্টির ঘ্রাণ, উজানে। 'দিন যায়' উপন্যাসে টেবিল টেনিসের শব্দ দিয়ে একটি আবহ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম।

চেষ্টা--এই শব্দটাই আমার সম্পর্কে যথার্থ শব্দ।

বি.এ পড়ার জন্য কলকাতায় আসা গেল। এ শহরটা সম্পর্কে কার টান নেই? চুম্বক পাহাড়ের মতো এই শহর অবিরল তার দিকে টেনে আনছে নানা সফলতা-ভিক্ষু মানুষকে। বুঝতে পারতাম, জীবনে কিছু করতে হলে কলকাতায় যাওয়া দরকার। যদিও জীবনের 'কিছুটা' কি। তবু মন বলত--কলকাতা! কলকাতা!

ঠিক এই কলকাতার প্রতি টান নিয়ে 'ফেরিঘাট' উপন্যাসের হাসি চরিত্রটি তৈরি করেছিলাম। সুদূর কাছাড় জেলার শিলচর থেকে হাসিকে বঁড়শিতে বিঁধে টেনে এনেছিল কলকাতা। নিষ্ঠুর হাসি কলকাতা ছাড়া আর কিছুই ভালোবাসতে পারল না। কলকাতায় থাকার জন্য সে প্রায় অপ্রেমে বিয়ে করেছিল অমিয়কে। এই রকমভাবে চেষ্টা করেছিলাম আমার নিজের কথা হাসির ভিতর দিয়ে বলতে।

কিন্তু আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত শহরে এসে কলেজে হোস্টেলে দিন কেটে যেত। জীবনের কোনও সম্ভাবনার সিঁড়ি এক ধাপও ওঠা গেল না। বাংলা অনার্স ক্লাসে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পড়াতেন। তখন তাঁর লেখা জনপ্রিয়তার শিখরে উঠে আছে। কিন্তু নিজের মুখচোরা স্বভাবের দরুন কখনও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারতাম না, লজ্জা সঙ্কোচ ভয় এসে বাধা হত। আমার সহপাঠী ছিল কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, গল্পকার

অমলেন্দু চক্রবর্তী আর ছিল বিভূতি রায় যে এখন অভ্র রায় নামে লেখে। কিন্তু এদের সঙ্গ পেয়েও সাহিত্য করার জন্য কেন যেন আর আকুলতা বোধ করি না, শুধু একটু হতাশা একবিন্দু ব্যথা হয়ে পুরোনো কাঁটার মতো মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিত। আমি যে একটু আধটু লিখি তা কাউকে বলতেও লজ্জা করত। একদিন বিভূতিকে পুরোনো লেখার একটা পাতা শুনিয়েছিলাম, ও বলল--কিছু হয়নি, ছেলেমানুষি।

কলকাতা শহরের বিপুল বিস্তার, তার ভিড়, তার কেজো মানুষের তাড়া দেখে মনে হত, এ শহরে টিকে থাকতে হলে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ক্ষমতা দরকার তা আমার নেই। খুবই অসহায় লেগেছিল প্রথম কিছুদিন। বন্ধু কেউ জোটেনি তখনও, হোস্টেলের ছেলেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। কে কাকে পাত্তা দেয়? অসম্ভব একা লাগত। কেবলই মনে হত, আমার কিছু একটা হওয়ার কথা ছিল, হল না।

যেন এই সুযোগটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল আমার পুরোনো বিষাদরোগ। একদিন হঠাৎ আমার চারদিকে থমথম করে ঘনিয়ে এল ঘোর বিষণ্ণতা, এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার পর। কাউকে সে যন্ত্রণার কথা বলতে পারি না, কারই বা শোনার সময় আছে! একা সহ্য করি সেই আমার এক পৃথিবীভরা হতাশা। পারি না। পারি না। অস্তিত্বে বিপদের সঙ্কেত বাজতে থাকে। মনে হয়--আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা! আমার পথেই শুধু বাধা? আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?'

এই এক অনুভূতি ছিল, ডানামেলা বাদুড়ের মতো উড়ে আসত ভয়াবহ বিষণ্ণতা। হোস্টেলের অর্ধেক দেওয়ালওলা ঘরে বসে শুনি, পাশের ঘরে তাস খেলার হুল্লোড়, কারা যেন ইভনিং শোয়ে হিট বাংলা ছবি দেখে জুতোর শব্দ তুলে ফিরল এইমাত্র, খুশির গলায় বলল--উঃ দারুণ! গুডবয়রা সন্ধেবেলা হাত মুখ ধুয়ে নিষ্ঠাভরে বই খুলে বসে আছে টেবিলে, হোস্টেল কম্পাউন্ডের এক কোণের জিমনাসিয়ামে বিজলী বাতিতে কিছু স্বাস্থ্যপাগল ছেলে মন দিয়ে ব্যায়াম করছে। আমি কেন নই সকলের মতো? আমি কেন হতেছি আলাদা?'

শীতের এক দুপুরে পশ্চিমের দরজা দিয়ে এক চৌকো রাঙা রোদ ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছিল, বিছানায় শুয়ে নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখে সেদিকে চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ এক দিন বিষণ্ণতা কেটে গেল। কিন্তু রয়ে গেল তার স্মৃতি। সেই স্মৃতি ছিল ভয় ও উদবেগের, সেই স্মৃতি আমাকে চকিত করেছে বারে বারে। তবু সেই সব মনের অভিজ্ঞতাই ছিল আমার পুঁজিপাটা। আমার লেখালেখির চেষ্টার মধ্যে বার বার তার ছায়া এসে পড়ে।

দেশভাগের আগে ও পরে সারা বাংলাদেশ জুড়ে আমার ঘোরাঘুরি বড় কম হয়নি। শৈশব কৈশোর যৌবনকাল জুড়ে বার বার ঠাঁইনাড়া। ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুরের মতো বড় শহরে, আবার জয়দেবপুর, মেহের কালীবাড়ি, মুক্তাগাছা শহরে গঞ্জে গ্রমে বারবার চলে গেছি এর ওর তার সঙ্গে। উত্তর বাংলার ঘাটে ও আঘাটায় থেকে বা ঘুরে আমার

অভিজ্ঞতায় শহর, গ্রাম, জঙ্গল, নদী পাহাড় সবই ঢুকে একাকার হয়ে গেছে। ফুলছড়ি ঘাট ছেড়ে স্টিমার চলেছে বাহাদুরাবাদ ঘাটে, জলের শব্দে স্টিমারের আলোয় রান্নার গন্ধে বিহ্বল হয়ে এক অন্য জগতের রূপাভাষে ভরে যেত মন। কত রূপ ছিল পৃথিবীর। গঞ্জের বাজারে এক ছোট্ট দোকানঘরে ধীর নিস্পৃহ লোকেরা বসে কথা বলছে--এ দৃশ্য ভেবে কেন যে রোমাঞ্চিত হই আজও! 'ফেরিঘাট' উপন্যাসে যেমন হঠাৎ চলে এল এক আজব স্টিমারঘাটের অলীক মায়া, তেমনি 'গঞ্জের মানুষ' গল্পে গাঁয়ের মানুষদের কথা জুড়ে বসল আবার কখনও 'ঘূণপোকা' 'বাসস্টপে কেউ নেই' কিংবা 'শূন্যের উদ্যান' এই সব উপন্যাসে বলতে চেষ্টা করেছিলাম শহুরে মানুষদের শহুরে জটিলতার কথা। যাও পাখি, নয়নশ্যাম, ফেরা বৃষ্টির ঘ্রাণ উপন্যসে শহর গ্রাম পাশাপাশি এসেছে।

এই সব লেখালেখি কি রকম হল তা কিছুই বুঝতে পারি না।

কলেজে পড়ার সময়েই লেখার সঙ্গে সম্পর্ক গেল চুকে। বুঝলাম, লেখাটেখা আমার হওয়ার নয়। বি.এ পড়ার দু বছর তাই মোটামুটি অন্য ছেলেরা যেমন করে তেমনি সিনেমা দেখে বেড়াই, ফাংশন শুনি, আড্ডা মারি, শুধু তারই মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনে পড়ে--আমি তো একটু লিখতাম টিখতাম!

ইউনিভার্সিটিতে বাংলায় এম.এ ক্লাসে ভরতি হওয়ার পর হঠাৎ পরিচয় ঘটে গেল নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সে তখন ইউনিভার্সিটিতে কেরানি, 'দেশ' পত্রিকায় গল্প লেখে।

আমাদের আমলে 'প্রবাসী' কিংবা 'মাসিক বসুমতী' কিংবা পুরোনো দিনের অন্য সব রমরমা কাগজের দিন আর নেই। সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুতর কাগজ তখন 'দেশ'। আজও দেখি 'দেশ' পত্রিকায় লেখার জন্য কত মুখ চাতকের মতো চেয়ে থাকে। নির্মল সেই 'দেশ' পত্রিকায় লেখে শুনে ভিতরে ছ্যাঁকা লাগল। নির্মল ভরসা দিয়ে বলল--'দেশ'-এ নতুনদের গল্প ছাপা হয়। দিয়ে দেখুন না একটা।

এক যশের ভিক্ষুক তো সব সময়েই বাস করে আমাদের ভিতরে। গুরুত্ব পাওয়ার লোভ নেই কার? সেই লাভ আবার ডাক দিল কোত্থেকে। রাতারাতি গল্প লিখে ফেললাম। লিখেই মনে হল, এটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প।

গল্পটা শুনে নির্মল খুশি হল না, বিভূতিও অনুকূল মন্তব্য করেনি। কিন্তু আমার ধারণা তবু বলবৎ রইল, আমি দারুণ লিখেছি। 'দেশ' পত্রিকার দফতরে সেটা জমা দিতে গেলাম যাঁর হাতে তিনি তখন আমাদের কাছে এক দুরন্ত আকর্ষণ। তাঁকে চোখে দেখার লোভটাও কম ছিল না। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অসামান্য নতুন বাঁধভাঙা গদ্য একটা ভিন্ন খাত রচনা করার চেষ্টা করছে। তিনি বিমল কর। মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে খুব নার্ভাস লাগছিল। তবু চেষ্টাকৃত সাহসের সঙ্গে দিয়ে আসতে পেরেছিলাম। কিছুকাল পরে গল্পটা অমনোনীত হয়ে ফেরত এল হাতে। উৎসাহটা মিইয়ে গেল। তবু আর একটা লিখে ফের দিয়ে এলাম।

সেটাও ফেরত এল। বলতে কি তখন আমাকে ঘিরে ফেরত-এর প্রেত নৃত্য। 'পরিচয়' থেকেও সেই দুটো গল্প ফেরত পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা 'একতা'য় নতুন লেখা একটা গল্প দিয়ে এলাম ছাত্রসম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে, সেটাও মনোনীত হল না। অর্থাৎ লেখালেখি আমার হওয়ার নয়। বুঝতে পেরে পরাজয়ের বিস্বাদে ভরে গেল ভিতরটা। শুনতে পেলাম 'একতা' পত্রিকায় সেবার রেকর্ডসংখ্যক গল্প ছাপা হচ্ছে, চারটে। চারটেই বাংলা ক্লাসের ছেলেদের। সেই চারজনের মধ্যেই ঠাঁই না পেয়ে পিছিয়ে আসা ছাড়া কি করার আছে? সাহিত্য শিল্প তো গায়ের জোরে হয় না।

তবু শেষ একটা চেষ্টা করব বলে জেদবশত একটা গল্প লিখে দীপেন্দ্রনাথকে দিয়ে নির্লজ্জের মতো বললাম--যদি এখনও ছাপার আশা থাকে তো পড়বেন। উনি বললেন--আশা কম। তবু যদি গল্পটা দারুণ কিছু হয়ে থাকে তো যেমন করে হোক ছাপব।

তিনি ছেপেছিলেন।

বার বার তিনবার। তৃতীয় গল্পটা লিখে দুবার অমনোনীত হওয়ার লজ্জা আর সঙ্কোচ নিয়ে আবার 'দেশ' পত্রিকায় দিয়ে এলাম। রুমালে মুখ ঢেকে রেখেছিলাম কিনা মনে নেই। তবে এই গল্পটা 'দেশে' বেরিয়েছিল।

এইভাবে শুরু।

শ্রীগোপাল মল্লিক লেন-এর ইউনিভার্সিটি হস্টেলের এঁদো অন্ধকার ঘরে বসে তখন কেবলই সাহিত্যের স্বপ্ন দেখা। পড়াশুনো গোল্লায় দিয়ে ভূতের মতো লেখার পিছনে খাটতাম। আর সেই সাহিত্যজ্বরের বিকারে এম.এ পরীক্ষা আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেল। কোনওদিনই সেটা আর দেওয়া হল না, পিতৃদেবের অনেক আকাঙক্ষা থাকে সত্বেও।

হোস্টেল ছেড়ে একটা প্রাইভেট মেস-এ চলে আসি। রোজগার নেই। উদারতা ও পুত্রস্নেহবশে বাবা টাকা পাঠিয়ে যান ছেলে যদি সুবুদ্ধিবশত কোনওদিন পরীক্ষায় বসে, এই আশায়। তাঁর খুব ইচ্ছে আমি পাস করে অধ্যাপক হই। এটা খুব উচ্চাশা নয়। কিন্তু আমি কারই বা মনোমতো হতে পেরেছি জীবনে? আমার নানা ব্যর্থতার সমষ্টিই বুঝি আমি।

অনেক কষ্টে কালীঘাট ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমিতে মাসে পঁচাত্তর টাকা বেতন প্লাস পঁচিশ টাকা স্কুল ডি-এ আর, সাড়ে সতেরো টাকা সরকারি ডি.এ, এই মোট একশো সাড়ে সতেরো টাকার একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পেরেছিলাম। আমার জাগতিক সাথর্কতা তার বেশি এগোয়নি। সেই অকিঞ্চন জীবনে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপও হয়নি, প্রেম-ভালোবাসা দূরের কথা। মেস-এর খাবার ছিল কুকুরেরও অস্পৃশ্য অখাদ্য, পরিবেশ ছিল ধূলিধূসর বিবর্ণতায় ভরা। ভবিষ্যৎ ভাবতে ভয় করত। আমার তখনকার জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্রয় ছিল কয়েকজন নিবিড় সুহৃদ আর সাহিত্যের পরিমণ্ডল। ওইটুকুই অমৃতবিন্দুর মতো আমাকে জীইয়ে রেখেছিল। আমার সেই মেস-এর ঘরে আসতেন বিমল কর, তাঁর

খড়কুটো আর সোপান, জননী ইত্যাদি গল্প পাণ্ডুলিপি থেকে সেইখানেই আমরা শুনেছিলাম। সেই নিরানন্দ ঘরটিকে প্রাণপ্রচুর উপস্থিতিতে ভরে দিতে আসতেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি রায়, তুলসী সেনগুপ্ত, রতন ভট্টাচার্য, যশোদাদুলাল ভট্টাচার্য, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন মিত্র, দেবদুলাল ভট্টাচার্য, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় আরও অনেকে। আর ছিল কফি হাউসের নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা। দেখা হত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই সব নিয়মভাঙা তরুণ কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে। সাহিত্য ছাড়া কথা ছিল না, চিন্তা ছিল না, বোধ ছিল না। এক সাহিত্যনেশার ঘোর সব সময়ে উদ্দীপ্ত রাখত। অভাবের কথা খেয়াল থাকত না, ভবিষ্যৎ চিন্তা পীড়া দিত না, নারীপ্রেমের কথাও খুব ভেবেছি বলে মনে পড়ে না তো!

কি কষ্টে আর যত্নে যে গল্প লিখতাম! 'ঘরের পথ' গল্পটা লিখতে এক কি দেড় মাস সময় লেগেছিল। তখন গড়ে গল্পপিছু ওরকমই সময় ব্যয় করতে হত। কিন্তু 'ঘরের পথ' বেরোনোর পরই হঠাৎ একটা মন্দা সময় পড়ল। নতুন একটা গল্পের খসড়া করছিলাম, সেটার নাম দিয়েছিলাম 'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু'। একটা লোক কাজ সেরে কিছু দেরিতে অফিস থেকে বেরোলো। তার শরীর ভালো লাগছিল না। সে একটা সিনেমা হলের লবিতে ওয়েটিং মেশিনে ওজন নিল। ওজনের টিকিটে লেখা ছিল--আপনি শিগগিরই বিপদে পড়বেন। তারপর সে একটা রেস্টুরেন্ট ঢুকতে গিয়ে দরজার পাল্লা খুলেই চমকে উঠে অনুভব করল, ভিতর থেকে কে যেন এক পলকের আগুন দৃষ্টিতে তাকে দেখে নিল। সে চলে এল দরজা থেকে। রাস্তায় নামল বৃষ্টি। বাড়ি ফিরে গভীর রাতে লোকটা টের পেল, সে মরে যাচ্ছে। এই গল্প। মনে আছে এই লেখাটায় বৃষ্টির উপমা দিতে গিয়ে লিখেছিলাম--হাজারটা থার্মোমিটার ফুটপাথে আছড়ে পড়ে ভাঙছে। বৃষ্টির শব্দের তুলনা দিয়েছিলাম--বৃষ্টির ফোঁটা দূরগামী হরিণের পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। যতবার গল্পটা লিখতে যাই ততবার পৃষ্ঠা বাতিল করি, কিছুতেই মনোমতো লেখা হয়ে ওঠে না। এক মাস গেল। দু মাস গেল। এক বছর চলে গেল আয়ু থেকে। শতখানেক বাতিল পৃষ্ঠা জমে গেল টেবিলে। আরও শতখানেক পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেললাম বুঝি। লিখতে না পারার অস্থিরতায় তখন কেবল ছটফট করি। অনবরত সিনেমা দেখি, অবিরল আড্ডা মেরে ভুলে থাকবার চেষ্টা করি যন্ত্রণাকে, পাগলের মতো ডস্টয়েভস্কি টলস্টয় পড়ি।

'দেশ' পত্রিকায় গল্প ছাপা হতে থাকার কিছুদিনের মধ্যেই সাগরময় ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সাহিত্যের তিন পুরুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়তম। কত অখ্যাত অজ্ঞাত প্রতিভাকে তিনি টেনে এনেছেন সাহিত্যের রাজ্যে, বসিয়ে দিয়েছেন খ্যাতির দুর্লভ সিংহাসনে। মিতভাষী ও গম্ভীর সাগরদাকে দূর থেকেই সমীহ করতাম, স্বভাব-সঙ্কোচবশত কখনও কাছে যাইনি বা কথা বলিনি। উপরন্তু তাঁকে ঘিরে থাকত এক কিংবদন্তীর

রহস্যময়তা। যখন পরিচয় হল তখন তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয়টি কিছু বিস্মিত করেছিল আমাকে। আমি অনাদরেই অভ্যস্ত, আদর, প্রশ্রয় বা স্নেহ পেলে নিতে জানি না, সঙ্কোচ হয়, ভিত বা অতিরিক্ত কৃতজ্ঞ বোধ করতে থাকি। দীর্ঘকাল মা বাবা পরিবার ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে আমি ওরকমই হয়ে গেছি। আজও কেউ সমাদর দেখালে তটস্থ হয়ে পড়ি। উপরন্তু সাগরদার মতো খ্যাত ব্যাক্তিত্ব যখন কুশল প্রশ্ন করে লেখা চান তখন আমার অপ্রতিভ আনন্দ কিছুটা বুঝি অস্থির করত আমাকে।

সাগরদা শুনেছিলেন আমি একটা গল্প লিখছি। তিনি গল্পটা 'দেশ'-এর জন্য চেয়ে পাঠালেন। সেই আমন্ত্রণ পেয়ে আমি আরও অস্থির তাড়ায় স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু' লিখতে চেষ্টা করি। যত চেষ্টা করি তত সেটা আমার হাতের বাইরে চলে যায়। কিছুতেই সেই লাগামছেঁড়া অবাধ্য গল্প বশে আসে না, কাগজের চৌহদ্দিতে তাকে বাঁধতে পারি না। সাগরদা খবর পাঠান--গল্পের কি হল? আমি 'দেশ' পত্রিকার সিকি মাইলের মধ্যে যাই না আর। পালিয়ে বেড়াই। খবর পাঠাই--লিখছি। শিগগিরই দেব।

'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু' গল্পটি লিখতে গিয়ে আমার নিজের লেখালেখির জীবনের মৃত্যুলক্ষণ ফুটে উঠছিল। বার বার মনে হয়েছে--আর কোনওদিন লিখতে পারব না। ঠিক এই রকম আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকেই সে আমলের প্রচণ্ড ক্ষমতাবান, গল্পকার রতন ভট্টাচার্য লেখা ছেড়ে দিয়েছিল। অথচ কত বড় লেখক হওয়ার কথা ছিল রতনের! হয়তো এরকমই কোনও দুর্বোধ্য কারণে লেখা থেকে সরে গিয়েছিল সোমনাথ ভট্টাচার্য, যশোদাজীবন বা স্মরজিৎও শ্লথ করে দিল গতি।

আগেই বলেছি 'চেষ্টা' কথাটা আমার বড় মনোমতো। আমি লেখা ছাড়িনি কিছুতেই। রোজ লিখেছি, পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, আবার লিখেছি, একটা গল্পই লেখা চলছে। বার বার। অবশেষে সেই অবিশ্বাস্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে পৌনে দু বছর পর 'স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু' লেখা শেষ হল। সাগরদা বিশ্বাস করলেন যে, আমি লেখা ছেড়ে দিইনি। আমি নিজেও সে কথা বিশ্বাস করতে পারলাম।

১৯৬৪-র শেষদিকে শীতকালে আমার এক প্রিয় দূর সম্পর্কের ঠাকুমা মারা গেলেন। ওই একই বছরে আমার প্রতি স্নেহশীলা আমার মেজো পিসিমা হৃদরোগে মৃত্যুর দ্বারদেশ থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে দেখতে গেলে পরে তিনি আমার হাত জড়িয়ে কেঁদে বলে উঠলেন--কাল রাতে বাড়াবাড়ির সময় যদি আমি মরে যেতাম তবে তোকে আজ তো দেখতে পেতাম না।

শীত-বিকেলে কুয়াশা আর ঝুম অন্ধকার দিয়ে ফিরে আসতে আসতে আমি ভাবছিলাম--মৃত্যু! সব কিছুই মৃত্যুশীল। এই পৃথিবীটা একদিন তার সব উষ্ণতা হারিয়ে মৃত্যুহিম নিথরতায় ঘুমিয়ে পড়বে। সূর্য নিভে অঙ্গার হয়ে যাবে একদিন। মহাজগতের সব জ্যোতি

হারিয়ে যাবে। এক মহান্ধকার, এক মহাকাল এগিয়ে আসছে। তবে কেন মানুষ বেঁচে আছে? কেন আমি লিখছি?

অল্প কিছুদিন আগে শোপেনহাওয়ার পড়েছি। সে প্রভাবও করেছিল হয়তো। হঠাৎ টের পেলাম, বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া সেই বিষাদ রোগ, সেই অবাস্তব অনুভূতি প্রথম সর্দিলাগার মতো সুরসুর করে ওঠে শরীরে, মনে। কণ্টকিত হয়ে শুনি, আমার অস্তিত্ব জুড়ে অবিরল বেজে যায় বিপদ-সঙ্কেত। একা হয়ে যাই। বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করি-- এই মহাজগত কেন অসীম? কেন মৃত্যু? কেন জীবন? কেন সব কিছু? এই প্রশ্নগুলি ছোবলে ছোবলে বিষ ঢেলে দিতে লাগল মনে। আমার নিস্তব্ধ আর্তস্বর তার 'রক্ষা করো, রক্ষা করো' ধ্বনি পাঠাতে লাগল চারপাশে, চেতনার তরঙ্গে তরঙ্গে সে খুঁজে বেড়াতে থাকে আশ্রয়। পাগলের মতো ধর্মগ্রন্থ খুলে বসি, রাতে ঘুম আসে না বলে সঙ্গীসাথি জুটিয়ে নানা তর্ক জুড়ে সময় কাটানোর চেষ্টা করি। খুঁজে পাই না কিছু। এক অতল বিষাদের পাতাল-কিনারায় কে আমাকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে। একদিন যায়। দুদিন যায় আয়ু ফুরোয় বুঝি!

এই যন্ত্রণায় তাড়িত হয়ে হয়ে ১৯৬৫ সালের গোড়ায় আমি দেওঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মনে অবিশ্বাস সন্দেহ, দ্বিধা। তবু আমার বুকের ভিতরটা শূন্যআশা ভিখারি কাঙালের হাতের মতো অঞ্জলি পেতে আছে--কিছু দেবে? কিছু দিতে পারো আমাকে?

তিনি আমাকে শিখিয়ে দিলেন, কি করে বেঁচে থাকতে হয়। আমি ঠিক সময়ে তাঁর কাছে যেতে পেরেছিলাম, আমার সারা জীবনের সফলতা এইটুকুই। আর সেই সফলতাটুকুই শৈশবের নদীর মতো সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। তরঙ্গে তরঙ্গে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মহাসমুদ্রের দিকে, যেখানে তমসার পারে আনন্দ থেকে জন্ম নিচ্ছে জগৎ ও জীবন।

আমার জীবন সম্পর্কে কারও কোনও আগ্রহ না থাকারই কথা। তাই এই সাতকাহন করে বলতে লজ্জা করে। বরাবরই আমি একটু চোখের আড়ালে থাকতে ভালোবাসি। সেটা বিনয় নয়, সেটা নিরহঙ্কারতার দরুনও নয়। যথার্থই এক সঙ্কোচ, এক ভয় আর স্নায়ুদৌর্বল্য এসে চেপে ধরে আমাকে। প্রায় সতেরো বছর যে নিরবচ্ছিন্ন লেখালেখির চেষ্টায় ব্যাপৃত রেখেছি নিজেকে তার মধ্যে হয়তো রয়েছে যশোলিপ্সা, অর্থলোভ, নিজেকে মাপের চেয়ে বড় করে দেখানোর চেষ্টা। এই সব আশা আকাঙ্ক্ষার বৃষ্টি এসে ধুইয়ে নিয়ে যায় শিল্প-সাহিত্যের প্রতিমা। তাই মনে হয়, এত দিনের এই সাহিত্যচর্চার প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছে আসলে আমার লেখক হতে না পারার কাহিনি। তবু এই চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমার একটুখানি বেঁচে থাকা।

মায়ের গায়ের গন্ধ

সাহেবদের শীতের দেশ। সেখানে অটাম খুব স্বাগত ঋতু নয়। অটাম মানেই শীতের পদধ্বনি। আর, শীত মানেই খানিকটা গতিমন্থরতা, জবুথবু ভাব, গায়ে একগাদা বাড়তি পোশাক, বরফ পরিষ্কার করার বাড়তি খাটুনি। কিন্তু, আমাদের দেশে শরৎ এক ঐশ্বর্যময়ী ঋতু। মাটি থেকে আকাশ কার অলক্ষ্য সংকেতে সেজে ওঠে। সোনালি রোদ বর্ষায় স্নাত চরাচরে যেন অপার্থিব রূপের উদ্ভাসে এক অলৌকিক মাত্রা যোগ করে দেয়। শীতের মতো প্রকৃতির এত সুসময় আর নেই। এই ঋতুটির জন্যই যেন একটি যোগ্য উৎসবেরও দরকার ছিল। আমাদের সব পুজোর সঙ্গেই অলক্ষ্য যোগ রয়েছে আর্থ-সামাজিক অবস্থার। আমাদের সম্পন্নতা, বিপন্নতারও। লজিক্যাল মানুষেরা, বুদ্ধিজীবীরা এসব পুজোটুজোকে ভারী অপছন্দ করেন। কুসংস্কার, অপব্যয়, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি ধিক্কার-ধ্বনির অভাবও নেই। তাঁরা কিছু অযৌক্তিক কথাও হয়তো বলেন না। কিন্তু, উৎসব চিরকালই একটি উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করেই সংঘটিত হয়। আমাদের কৃষিজাত ফসল, প্রকৃতির আনুকূল্য, সাময়িক সম্পন্নতা এসব আমাদের সংবৎসরের কায়ক্লেশকে একটুখানি সরিয়ে দিয়ে, ভুলিয়ে দিয়ে দশভূজাকে আসনে বসায়। আমাদের আনন্দের সঙ্গে এই দেবীর যোগ আছে। ভগবান, দেবদেবীর অস্তিত্বের প্রশ্ন ওঠে না। ভগবানের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের বিতর্কটিও বড়ই মেঠো। দুর্গা বাঙালির জীবনে এমন ভাবেই জড়িয়ে গেছেন যে, তাঁকে বোধন ও বির্সজনের কপট মায়ায় ফিরে ফিরে আসতেই হবে।

দেবী দুর্গার নিত্য পূজা কোথাও হয় কিনা আমার জানা নেই। দুর্গার স্থায়ী মন্দিরও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। থাকলেও তার সংখ্যা খুবই কম, ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অথচ, বাঙালি অধ্যুষিত সব জায়গাতেই কালী, শিব, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, এমনকী শীতলা মন্দিরেরও অভাব নেই। দুর্গার পুজো মাত্র চার দিন। এত তাঁর বাৎসরিক জনপ্রিয়তা, তবু তাঁর নিত্য পুজা নেই, মন্দির নেই--এ কেমন?

আমাদের পারিবারিক দেবী ছিলেন জগদ্ধাত্রী। কেন, তা কখনও জানবার চেষ্টা করিনি। ছোটবেলা থেকেই দেশের বাড়িতে ঠাকুরের আসনে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে জগদ্ধাত্রীর পট ছিল। আমাদের কাপড়ের দোকানটির নাম ছিল জগদ্ধাত্রী ভাণ্ডার। দাদু কাছারিতে যাওয়ার আগে রোজ ভক্তি ভরে জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করে যেতেন। ছেলেবেলা থেকেই মানুষ যা দেখে তাই শেখে, ভালোমন্দ, যুক্তি-বুদ্ধি কাজ করে না। কিন্তু, বড় হওয়ার পর নানা বিচারবোধ আসে, মতবাদ এসে মাথা দখল করে। কোনটা গ্রহণযোগ্য, কোনটা বর্জন করা দরকার, সেই বোধ গজায়। আমার বাবাকে দেখেছি, মা কালীর খুব ভক্ত। কালীকে প্রণাম করে বেরোতে কখনও ভুল হত না। রাশভারী বাবাকে অবশ্য প্রশ্নটা করার মতো

সহস কখনও হয়নি। আজকাল বাবারা যেমন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অতীব সহজ এবং খোলামেলা, কাছে যাওয়ার যে আনন্দ, তার বুঝি কোনও তুলনাই নেই। আমার ভুবনজোড়া ছিল মা।

রেল কোয়ার্টাসের বাড়িতে এসে পৌঁছলে মনে হত এমনটি আর কোথাও নেই। ভালোবাসায় সে এক আশ্চর্য অবগাহন। বড় পরিবার ভেঙে গেছে, দেশের বাড়ি বলে কিছু নেই, দাদু প্রয়াত, ঠাকুমা পিসিমার বাড়িতে--তবু আমাদের চার ভাইবোন আর মা-বাবা আর বাবার পিসি বালবিধবা এক ঠাকুমাকে নিয়ে সেই পরিবারটির মধ্যে কী অপার্থিব মায়ার বন্ধন। সেই সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে আমার মা। তাঁর দুটি মাত্র হাত, তবু কেন যে তাঁকেই দশভূজা বলে মনে হত।

এখনও মায়ের গায়ের গন্ধ স্মৃতির সরণি বেয়ে চলে আসে। আমাকে নিয়ে যায় আশ্চর্য শৈশবে। দুর্গামূর্তির মুখে বারবার তাঁরই মুখের আদল দেখতে পাই। পৃথিবীর নোঙর তুলে মা কবেই যাত্রা করেছেন। কিন্তু, মানুষ তো দেহেই বাঁচে না, বেঁচে থাকে আত্মদানের স্মৃতিতে, স্মরণে, মননে। আজও নিত্য আমি সকালে মা আর বাবার তর্পণ করি। প্রয়াত বলে মনে হয় না। মনে হয়, একটু আড়ালে আছে মাত্র। বড় মায়ায়, ভালোবাসায় চেয়ে আছেন আমার দিকে। আমার পূজা বুঝি নিত্যই গ্রহণ করেন তাঁরা।

মা দুর্গার প্রতিমাতেও ওই সঙঘবদ্ধ পরিবারেরই রূপ। চালচিত্রে শিব, ছেলেমেয়ে নিয়ে তার ভরভরন্ত সংসার। নিত্যই নানা প্রতিকূল অসুরকে নিধন করে তিনি তাঁর আত্মজনদের রক্ষা করেন। আমাদের ঘরে ঘরে, বেরোতে কখনও ভুল হত না। রাশভারী বাবাকে অবশ্য প্রশ্নটা করার মতো সাহস কখনও হয়নি। আজকাল বাবারা যেমন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অতীত সহজ এবং খোলামেলা, আমাদের প্রজন্মে তা ছিল না। তবে, আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্য রকমই ছিল। বাবাকে আমরা চার ভাইবোনই বরাবর সমীহ করেছি।

জেনেটিক উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার কোন গুণ বা অভ্যাসটা আমি পেয়েছি, তা ভাবতে গেলে অনেক ভাবতে হবে। কারণ, বাবাকে ভয় ও ভক্তি করেও তাঁর গুণাবলি তেমন কিছু অর্জিত হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। ওই যে পুজোর সময়ে বাবাকে প্রতি সন্ধ্যায় সোৎসাহে পুজো দেখতে বেরোতে দেখতাম, সেটাও তো পাইনি। আমি ভিড়-ভীত, শব্দ-বিমুখ, উন্মাদনা--কুণ্ঠ মানুষ। মাইলের পর মাইল হেঁটে রাত বারোটা একটায় ফিরে বাবা যখন আরও রাত জেগে পুজো দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন, তখন ঘুমচোখে দাঁড়িয়ে আমাদের সেটা শুনতে হত। আমাদের রাশভারী ব্যক্তিত্ববান বাবাকে ওই কটা দিন ভারী প্রগলভ আর ছেলেমানুষ বলে মনে হত। চোখে-মুখে সে কী দীপ্ত ভাব! সে কী ডগোমগো আনন্দের উচ্ছ্বাস! পুজো দেখার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, তা আমি আজ অবধি টের পাইনি।

ময়মনসিংহের বাড়িতে বেশ কয়েক বছর দুর্গা পূজা হয়েছিল। ছোট্ট দশভূজা মূর্তি--বড়জোর হাত দেড়েক উঁচু। তার মধ্যেই কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। ছোট্ট চালচিত্র। কামলারা এসে বাঁশ দিয়ে বারবাড়ির মাঠে একটা চালা বানিয়ে দিত। ওপরে ত্রিপলের ছাউনি। আমরা ছেলেরা গাছের ডালপালা কেটে আনতাম। বাড়ির মেয়েরা রঙিন কাগজের ফালি কেটে বাঁশের গায়ে জড়াত। কাগজের শিকলি আর শোলার চাঁদমালা--এই সব দিয়েই ছিল আমাদের মণ্ডপসজ্জা। যারা বড় করে পুজো করত, তারা ডাকের সাজটাজ দিয়ে সাজাত। আমাদের উপকরণ সামান্য, উৎসাহ ছিল প্রচুর। ওই একরত্তি পুজোর আয়োজন করতেই আমাদের সে কী পরিশ্রম, ছোটাছুটি, উত্তেজনা আর উৎসাহ।

পৃথিবী খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে ঠিক। কিন্তু, খুব অল্প সময়ে পরিবর্তনটা ঘটেছে বড় সাংঘাতিক। এই যেমন পূজার বাজার। চল্লিশ দশকের গোড়ায়, আমরা যখন খুবই ছোট, তখনও মেয়েরা বড় একটা দোকানপাটে যেত না। কাপড়ের গাঁট নিয়ে ফেরিওলাই আসত বাড়িতে, আর তাকে ঘিরে ভিড় করত বাড়ি আর পাড়া-প্রতিবেশী যতেক মেয়ে-বউ। শাড়ি পছন্দ করা, তার পর তীব্র দরাদরি এবং অবশেষে কেনাকাটা। সে সব শাড়ি তখনকার হিসেবে আড়াই তিন থেকে পাঁচ-সাত টাকা দামের হত। মায়ের কাছে শুনেছি, তাঁর বিয়ের বেনারসিটি কেনা হয়েছিল আঠারো টাকায়। না, মোটেই সস্তা গণ্ডা মনে করার কারণ নেই। কেননা, টাকার মূল্যমান ছিল অনেক উঁচুতে। কয়েক বছর আগেও পাঁচ দশ কুড়ি পয়সার কয়েনের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আজকাল সিকির নীচে কোনও কয়েনই বাজারে চলে না। অথচ, সেগুলো অচল বলে সরকার ঘোষণাও করেনি। আমার মতো অসাবধানী লোকের ঘরে অমন খুচরো পয়সা বোধ করি কয়েক কেজি করে জমে আছে। যখন মাংসের সের ছিল আট আনা, তখন এক জন কেরানির বেতন ছিল ত্রিশ টাকার আশেপাশে। কাজেই, সেটাকে সস্তার যুগ বলি কী করে?

পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে দ্বিখণ্ডিত করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তার আগের ও পরের পৃথিবীর মধ্যে অনেক তফাত। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এক মহাযুদ্ধের আঁচ টের পাই। উড়ন্ত বোমারু বিমানের ছায়া আমাদের ঘর-গেরস্থালির ওপর ভয় ও আতঙ্কের হলচিহ্ন এঁকে যায়। সাইরেনের শব্দে হাহাকার বাজতে থাকে। বড়দের মুখশ্রীতে একটু উদবেগের ভাব লক্ষ করি। এখন যুদ্ধ, দুর্ঘটনা বন্যা, ভূমিকম্পের ছবি টিভিতে এন্টারটেনমেন্টের উপাদান হিসেবেই মানুষ দেখে। একটু আহা-উহু করে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা কালক্ষেপের রগরগে অবলম্বন হয়েই দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা আমরা কিছু বিদেশি বইতে পড়েছি, কিছু আলোকচিত্রে দেখেছি। সেই ছেলেবেলাতেই আমরা নানা জায়গায় যুদ্ধের নানা পরোক্ষ পটভূমি প্রত্যক্ষ করেছি এ দেশেই। সাঁজোয়া গাড়ি, মিলিটারি, স্পেশ্যাল ট্রেন ভরতি গোরা সৈন্য।

কাটিহারে আমাদের বাংলোর পাশের বাংলোটাই ছিল মার্কিন সেনা অফিসারদের আবাসস্থল। দেখতাম সেখানে সারাদিন একটা মস্ত পিপে ভরতি গরম জল ফুটছে তো ফুটছেই। তাতেই ঘপাত ঘপাত করে এঁটো থালা-বাসন চুবিয়ে পরিষ্কার করে নিত লম্বা লম্বা, বিশালদেহী সাহেবরা। সেটা বোধহয় ছিল ট্রানজিট ক্যাম্প। কোন রণাঙ্গনে রওনা হয়ে যেত তারা কে জানে! এক দল যেত, আর এক দল চলে আসত। বন্ড সই করে মিলিটারিতে যোগ দিয়ে বাবা হয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট। ডাক আসা মাত্র ফ্রন্টে যেতে হবে--এমন বন্ড ছিল। তাই বাবাকে মিলিটারি ইউনিফর্ম পরেই রেলের চাকরি করতে হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই মানুষের পুরোনো মূল্যবোধকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছিল। মায়ের একমাত্র ছেলে বুক পকেটে বাইবেল আর গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল। ফিরল না। তার পর লোকক্ষয়, যুক্তিহীন মারকাট, সামান্য জয় ও বিপুল পরাজয়ের সেই বোঝা আজও পৃথিবীকে বহন করতে হচ্ছে। বরাবর নিরানন্দ এই দেশে সেই যুদ্ধকালীন ব্ল্যাক আউটেও পুজো হয়েছে, যেমন হত। সাহেবদের দেখতাম সকৌতুকে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পুজো দেখতে এসেছে। অবশ্য তখন এত প্যান্ডেল, এত পুজো ছিলও না। এক পুজোর ঢাকের বাদ্যি অন্য প্যান্ডেলে পৌঁছত না, এতটাই ছিল দূরত্ব। আর, ছিল না লাউডস্পিকারের অস্তিত্বও।

সাতচল্লিশে স্বাধীনতা আর দেশভাগের পর আমরা দেশ ছেড়েছিলাম। সেই সঙ্গে সাঙ্গ হল আমাদের বাড়ি দুর্গোৎসবও। সামান্য আয়োজনেরই পুজো ছিল আমাদের। সেটা বন্ধ হয়ে গেল বলে নয়, ওই পুজোটিকে ঘিরে যে উদ্দীপনা ছিল, যে জেগে-ওঠা ছিল, যে কাছে-আসা ছিল, তাও উধাও হল। পরিবারগুলো এমন ভাবে ছিটকে গেল নানা জায়গায় যে, এখন অনেক কাছের আত্মীয়কেও চেনা নেই। কোনও দিন হয়তো বা কোনও একটি ছেলে বা মেয়ে সাহস করে এসে পরিচয় দেয়, তখন চমকে উঠি--কী আশ্চর্য! তুমি অমুকের ছেলে বা মেয়ে? এই যে মানুষগুলো হারিয়ে গেল, তারা আর জড়ো হবে না কখনও, রক্তের সম্পর্কও উপেক্ষিত হবে। দেশভাগ না হলে এমনটা ঘটতেই পারত না।

একটা মানুষের জীবনে পরিবার যে কতখানি, তা এখনকার মানুষ হয়তো বুঝতেই পারে না। অরণ্যচারী বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মানুষেরা বুঝেছিল যূথবদ্ধ না হলে তারা হেরে যাবে বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও বৈরী জীবজন্তুর কাছে। শুধু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনেই নয়, তারা বুঝেছিল অস্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনেই গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া দরকার। দীর্ঘ বিবর্তনের ভিতর দিয়ে পরিবার গড়ে উঠেছিল। আমরা যারা বৃহৎ যৌথ পরিবারে জন্মেছি, তারাই জানি, ব্যক্তিত্ববান এক জন পুরুষ ও ব্যক্তিত্বময়ীকে নারীর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে কেমন আবর্তিত হয় আত্মীয় পরিজন। ওই পরিবারই তাকে দেয় আনুগত্য, দায়িত্বজ্ঞান, ভালোবাসা আর পারস্পরিকতার পাঠ। যার প্রতিক্রিয়া বৃহত্তর সমাজজীবনেও এক ঐক্যবদ্ধতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। পরিবারকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে মানুষের নিঃসঙ্গতা

আর বিক্ষিপ্ততা আর ঘুচতে চায় না। আর তার জন্যই কিনা জানি না, জনসংখ্যা যত বাড়ছে, ততই নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে মানুষ।

দেশভাগ হল বলেই আবার ভেসে পড়তে হল আমাদের। বাবা বদলি হলেন অসমে। তার পর উত্তরবঙ্গ, ফের অসম। কিন্তু, সেসব জায়গায় তখন তেমন স্কুলটুস্কুল ছিল না। আমার আর দিদির লেখাপড়ার বারোটা বাজছিল। আর, তাই আমরা প্রেরিত হলাম অন্যত্র, আত্মীয়ের আশ্রয়ে। তার পর শুরু হয়েছিল আমার বোর্ডিং আর হস্টেলের জীবন। মায়ের কাছছাড়া হয়ে থাকার যে কী গভীর মনোবেদনা, তা তখন হাড়ে হাড়ে বুঝি। মা ছাড়া আমার জগৎ অন্ধকার। আনমনা, ভুলো স্বভাবের ছিলাম বলে আমাকে নিয়ে মায়ের উৎকণ্ঠা আর উদবেগ ছিল সবচেয়ে বেশি। গ্রীষ্ম বা পুজোর ছুটি হলে মায়ের পরিবারেই রূপ। চালচিত্রে শিব, ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর ভরভরন্ত সংসার। নিত্যই নানা প্রতিকূল অসুরকে নিধন করে তিনি তাঁর আত্মজনদের রক্ষা করেন। আমাদের ঘরে ঘরে, গৃহস্থালিতে আমরা কি সেই দুর্গারই প্রতিরূপ দেখতে চাই না?

আমাদের সেই দুর্গাপুজো

আমাদের দেশ ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। আমার দাদু মোক্তারি করতে যখন মৈমনসিংহে আসেন তখন সেখানে আমাদের ঘর-বাড়ি হয়। এই শহরেই আমার জন্ম। শহর হলেও মৈমনসিংহ ছিল এক প্রকৃতিসমৃদ্ধ বৃহৎ গ্রামেরই সামান্য হেরফের। আমরা থাকতুম ব্রহ্মপুত্রের ধারে। বিশাল নদ। তার চরে শরৎকালে কাশফুলের বন্যা দেখা যেত। নদের ওপারে ছিল লোকালয়হীন আলেয়া অধ্যুষিত জলাভূমি। আমরা যে বাড়িতে থাকতুম সেটিও ছিল গাছ-গাছালিতে ভরা। সুতরাং শহরে থাকলেও গ্রামের গন্ধ আমাদের ঘিরে থাকত।

আমার দাদু ভালোই রোজগার করতেন। আমাদের বাড়িতে বেশ কিছু আশ্রিত মানুষও থাকতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন একজন পুরোহিত। আমাদের যাবতীয় গার্হস্থ্য পুজো-পার্বণ তিনিই সম্পন্ন করতেন। নিরীহ মানুষ। কিন্তু তাঁর পুত্রেরা এত নিরীহ ছিলেন না। কনিষ্ঠটি তুখোড় দুষ্টু। ওই একটা ব্যাপারে, অর্থাৎ দুষ্টুমিতে আমার কুখ্যাতিও ছিল ব্যাপক। সে আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিল এবং দুজনের ঝগড়া কাজিয়া মারপিটও বিস্তর হয়েছে। তবু অকাজের বেলায় দু-জনে মিলে যেতেও দেরি হত না।

সেই ছেলেবেলায় দুর্গাপুজোর আনন্দ ছিল বটে, কিন্তু বারোয়ারির এত বাড়াবাড়ি ছিল না। বেশির ভাগ পুজোই ছিল পারিবারিক। জাঁকজমকের চেয়ে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, ভক্তি

ইত্যাদির পাল্লা বোধ হয় কিছু ভারী ছিল। আমরা পুজো দেখতে যেতুম কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক। এক পুজোর ঢাকের বাদ্যি আর এক পুজোমণ্ডপে বড় একটা পৌঁছত না। আর রাস্তায় ঘাটে পুজো দেখার এমন বেসামাল ভিড়ও চোখে পড়েনি। আমার যখন বারো-তেরো বছর বয়স, তখন এক মহাষষ্ঠীর সন্ধেবেলা সেই পুরোহিত তনয় কোথা থেকে একটা হাতদেড়েক উঁচু দুর্গামূর্তি ঘাড়ে করে এনে আমাদের বার-বাড়ির উঠানে রাখল। আর সঙ্গে সঙ্গে তা দরিদ্র বাবা-মা খানিকটা ভয়ে, খানিকটা দুশ্চিন্তায় এবং রাগে তাকে প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করতে লাগল। পুজোকাটালি দিনে দুর্গামূর্তি বাড়িতে আনা মানেই বাধ্যতামূলক পুজো। কিন্তু সে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোথা থেকে পুজোর খরচ জোগাড় করবেন। সুতরাং, পুরোহিত-জ্যাঠা পায়ের খড়ম তুলে ছেলেকে মারতে গেলেন। আমার দাদুর তখন অঢেল রোজগার। কাছারি থেকে যখন ফিরতেন তখন তাঁর সাহেবি হ্যাট ভরতি থাকত কাঁচা টাকায়। ঠাকুরমা আঁচল পেতে সেই টাকা নিয়ে লোহার সিন্দুকে রাখতেন। দুর্গামূর্তি নিয়ে যখন বার বাড়িতে তুলকালাম চলছে, তখন ঠাকুরমাই মুশকিল আসান হয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'ছেলেমানুষ, মূর্তিটা যখন এনেই ফেলেছে, তখন পুজো করতে হবেই বইকী। এ যেন মায়ের ইচ্ছে।' সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকে খবর পাঠানো হল। চলে এল বাঁশ, দড়িদড়া, চাঁদোয়া এবং কামলা। সন্ধেবেলা বাঁশ-কাটা, মেরাপ বাঁধা, হ্যাজাক জ্বালা ইত্যাদি গুরুতর ঘটনা ঘটতে লাগল, যা আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজোয় কখনও ঘটেনি। আমরা গুড়ের ওপর মাছির মতো সেইখানে সব জমে গেলুম, আর চারদিকে থেকেও রাজ্যের বাচ্চাকাচ্চা এসে জড়ো হল। মণ্ডপ তৈরি হল, দুর্গামূর্তি সেখানে স্থাপিত হলেন। চার-পাঁচখানা সাইকেলে চেপে জ্যাঠতুতো দাদারা ছুটলেন বাজারে। সেই উত্তেজনা, আর সেই শিহরণ আজও স্মৃতির সরণি বেয়ে এসে স্পর্শ করে যায়। চলে এল বাদ্যকর। দাদু একটু রাগারাগি করবার চেষ্টা করেছিলেন বটে এবং রাশভারী সেই পুরুষ সিংহের আধিপত্যও ছিল নিরঙ্কুশ। কিন্তু তবু এক বিপুল গণভোটে তিনি ভেসে গেলেন। বাড়িসুদ্ধু সবাই তখন পুজোর পক্ষে।

সন্ধেবেলায় বোধন হয়ে গেল। সারারাত বাড়ির সবাই পুজোমণ্ডপের সাজসজ্জায় ব্যস্ত রইলেন। আমরা ছোটরা যথাসাধ্য জেগে রইলুম, এবং খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গিয়েই। অনেক রাতে জেঠিমা এসে নড়া ধরে ধরে সবাইকে টেনে নিয়ে গিয়ে একপাতে বসিয়ে খাইয়ে না দিলে খাবার কথা হয়তো মনেই পড়ত না। তারপর 'আমাদের বাড়িতে পুজো হচ্ছে' এই আনন্দে প্রবল উত্তেজনা বুকে নিয়েই একে-একে যে যেখানে পারি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে লাগলাম। সকালে ঘুম ভাঙল ঢাকের বাদ্যিতে। দুর্গার অধিবাস। ধূপ-ধুনো, চন্দন, ফুলের গন্ধ বাড়ি মাত করছে। সকালেই স্নান করে বাড়ির মেয়েরা পুজোর সাজে সেজেছে। সকলকেই মনে হচ্ছে দশভুজা। সকলের মুখেই যেন প্রতিমার আদল।

চারটে দিন এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটে গেল। আমাদের দেড়হাত দুর্গাপ্রতিমা দেখতে পথচারীরা ভিড় করেনি বটে, কিন্তু আমরা মণ্ডপ ছেড়ে বড় একটা নড়িনি। সেই আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রচলন হল।

মাত্র কয়েক বছর পরেই দেশ ভাগ। ভিটেমাটি ছেড়ে লাখো লোক রওনা হল পশ্চিমে। একটু দেরিতে আমরাও। অনেক কিছুই যেমন ফেলে আসতে হল, তেমনই ফেলে এলুম পারিবারিক দুর্গাপুজোকেও। কিন্তু সেই কয়েকটি বছরের দুর্গাপুজোর স্মৃতি, নদীর চর, কাশফুল, আর নীল আকাশের পটভূমি নিয়ে আজও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে।

কবিতা কেন লিখি না

রাঢ় বঙ্গ কবিদের পুণ্যভূমি। এই স্নিগ্ধ ও নম্রপ্রাণ দেশের যেদিকেই যাই সেদিকেই কবিতা ফসলের জন্য উর্বরতা লক্ষ করি। নবদ্বীপের বাতাস এখনও বুঝি বৈষ্ণব কবিদের শ্বাসের বায়ু বহন করছে। ভাগ্যতাড়িত মুকুন্দরামের পরিক্রমার পথ এখনও কি স্মরণ করে না তাঁকে? বুকে অলৌকিক একটি কবিতা উৎকীর্ণ পাথর নিয়ে অনন্ত শয়ানে মাইকেন আজও পুরোনো হলেন না। আমাদের দৈনন্দিন বাক্যবন্ধে অবচেতনেও বারবার হানা দেন ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ। গোটা একটা জাতের ব্যক্তিত্বকে আজও কথঞ্চিৎ নিরুপণ করে দেন চারণ রবিঠাকুর। কবিতার নিস্তব্ধতা নিয়ে মৃত্যুর পরপার থেকে আজও আমাদের নির্জন জানালায় উটের মতো গ্রীবা বাড়িয়ে দেন জীবনানন্দ। কবিতার সাঁতার শেখান সুধীন্দ্রনাথ, দ্রাক্ষাপুঞ্জ থেকে সুরা--অর্থাৎ সমগ্র সত্তা নিঙড়ে কবিতার বিন্দু সৃষ্টির কৌশল শেখানো অব্যাহত রেখেছেন বুদ্ধদেব। ক্ষুরধার বিষ্ণু দেও তো বিস্মৃত নন।

কবিতার কাছে আমি কতদূর ঋণী তার হিসেব আজও করিনি তো! আমার শৈশব চেতনাকে প্রথম প্রস্ফুট করেছিল মায়ের মুখ থেকে শোনা রবি ঠাকুরের কবিতা। মহুয়া, চয়নিকা। আলোকের সেই ঝরনাধারায় ধুয়ে গেছি বারবার। কবিতার হাত ধরে বড় হয়েছি। হতে হতেই পথে একদিন ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেখা। অবিকল ভবানী পাঠক, অর্থাৎ ডাকাত বঙ্কিম। ব্যর্থ কবি কিন্তু সফলতম গদ্যকার। আমার গা থেকে কিছু কবিতার খড়ি উড়িয়ে দিলেন কুলোর বাতাসে। ঘাড় ধরে বসিয়ে দিলেন গদ্যের সাড়ম্বর ভোজে। কিছু খারাপ লাগেনি। তারপর থেকে দুই ঘোড়াই আমার গাড়ি টেনেছে।

প্রেমাংকুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যাঁরা পড়েছেন তাঁরা আমার মতোই ভুক্তভোগী। তাঁরা জানেন, সাদামাটা গদ্য কেমন কবিতার জাদু বিকিরণ করে। জাতকের ভূত আজও আমার ঘাড়ে বসে ঠ্যাঙ দোলায়। বলে রাখা ভালো, এ সবই ছিল

আমার বাল্য ও কৈশোরে পঠিত। তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ পড়তে শুরু করি সাত আট বছর বয়সে। আর পড়তে পড়তে ভিতরে ভিতরে এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতে থাকে। কিংবা বলা যায় সেটা ছিল এক স্বপ্নেরই শুরু।

সত্য বটে আমি কবিতা লিখি না। কিন্তু গদ্যও কি লিখি? একটু আধটু লেখালেখির চর্চা করলেই লেখকের দাবি জন্মায়? ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমি সাহিত্যের এক বিমুগ্ধ পাঠক। কিছুটা অপরিণত, কিছুটা অপ্রখর বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ভাবাবেগতাড়িত। বছর দশেক আগে একদিন মেসবাড়ির নিজস্ব নোংরা তেলচিটে বিছানায় শুয়ে এক শীতের বিকেলে পথের পাঁচালী পড়ছিলাম। ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর বিবরণ পড়তে গিয়ে বুকে মেঘ করে এল, চোখ ভেসে গেল জলে। পড়তে পড়তে দুর্গা বই ছেড়ে বেরিয়ে এসে চিকন স্বরে ডাক দিল--অপু! এই অপু! হাঁদা কোথাকার! সাড়া দিলাম কী রে দিদি!

কয়েক পৃষ্ঠার পর সেই দুর্গা দুর্যোগের রাতে যখন পৃথিবীর মায়া কাটাচ্ছে তখন তীব্র বিষাদ, অপ্রতিরোধ্য কান্নায় আমি মেসবাড়ির ঘর ছেড়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

এ পাঠককে কি কখনও পরিণতমনস্ক বলা যায়? মধুসূদনের এপিটাফ পড়লে এখনও গলায় আবেগের দলা ঠেলা মেরে ওঠে যে! কি করি! সুতরাং নিজেকে এক দুর্বলচিত্ত বাঙালি পাঠক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। আট দশ বছর বয়সেই একটা মোটা বাঁধানো খাতায় বঙ্কিম আর রবি ঠাকুরের অনুসরণে গদ্য-পদ্য লেখা শুরু হয়। সেটা কোনও বিচিত্র ঘটনা নয়। প্রায় সকল ভাবপ্রবণ বাঙালি বালকই তা করে থাকে। তাতে কোনও উচ্চাশার বীজ উপ্ত ছিল না বোধ হয়, না ছিল তাতে একমুখী কোনও টান। ফুটবল, ক্রিকেট, ডাংগুলি ছবি আঁকা বা লেখা তখন সেই শৈশব বয়সের বিচিত্রমুখী আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকই প্রশ্রয় দিত মাত্র।

অসহায় কিশোরের বিহ্বল মাথাটিকে দখল করার জন্য অনেকেই ছোঁ মারত তখন। সাহিত্যে শিকারি বাজপাখির তো অভাব নেই। বঙ্কিম, রবিঠাকুর, বিভূতিভূষণ এবং কে নয়?

কিছুকাল আগেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমকে এক হাত নিয়েছেন। মনে হয় সুনীল সবটাই অন্যায্য কথা বলেননি। কিছু কটুকাটব্য কি বঙ্কিমের পাওনা নয়? যেমনটা বুদ্ধদেব বসুও করেছিলেন মাইকেলকে। বুদ্ধদেবকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়নি। আর এই তো প্রথম নয়, বঙ্কিম, মধুসূদন প্রমুখকে কতবার না কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে রায় শুনতে হয়েছে। সুজিত সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের চারদিকে কালো মেঘের দলের কথা লিখেছিলেন, যা পড়ে দুর্ভাগা রবি ঠাকুরের ওপর মায়া হয়। তবু কী করে যেন বঙ্কিম, মধুসূদন, রবিঠাকুর থেকেও যান। সমস্ত গলাধাক্কা, নিন্দেমন্দ উপেক্ষা করে। কাঁঠালের আঠার মতো, দোলের বদ রঙের মতো, অভ্যাস বা সংস্কারের মতো লেগে

থাকেন। যতই গাল দিই, ফের বিরলে বসে বিষবৃক্ষ পড়তে পড়তে সময়ের প্রবহমানতা উজানের দিকে ছুটতে থাকে।

যতদূর মনে পড়ে সেই বাজপাখিদের মধ্যে বঙ্কিমই সবচেয়ে সফল ছোঁ মেরেছিলেন। গদ্য আর বঙ্কিম তখন প্রায় এক ও অভিন্ন। নিপুণ চাষার মতো তিনি গদ্যচর্চার বীজ বুনে দিলেন মনের মধ্যে। তা বলে আগাছা ভ্রমে কবিতার তৃণাংকুরগুলিও উৎপাটিত করলেন না। চাষা জানে, শস্যক্ষেত্রের তৃণগুল্মই তার প্রাথমিক সার। তাই কবিতাও থেকে গেল সার ও জলসেচের জন্য।

বাঁধানো খাতায় তাই ক্রমে ক্রমে জমে ওঠে গদ্য আর গদ্য। কিছু নয়, ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যহীন। তবু গদ্যই।

তবু বলি সে বয়সে লেখক হওয়ার তেমন কোনও সাধ ছিল না, কবিত্বের আকাঙ্ক্ষাও ছিল না গুরুভার। লঘুপক্ষ প্রজাপতির মতো মাঝে মাঝে দু-একটা রঙিন আকাঙ্ক্ষা উড়ে আসত ঘরে। চলেও যেত। কিন্তু উৎকর্ণ ছিলাম বরাবর। বহু অন্যমনস্কতার মধ্যেও নেপথ্যে সাহিত্যের স্রোতশব্দ শুনতে পেতাম। নিরাকার এক অঙ্গুলি নির্দেশ সেই দিকের হদিস দিত। কেন কবিতা লিখি না কিংবা গদ্য লেখার জন্যই বা মাথার দিব্যি দিয়েছিল কে, তা কী করে বলি! তবে এটা জানি আমার লেখালেখি গৌণ, বরং পড়াটাই অনেক বেশি গুরুতর ছিল এবং আছে।

দোতলা বাসের পাশাপাশি বসে বহুদিন আগে একদিন কবি উৎপলকুমার বসুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি গল্পটল্প আর লেখেন না কেন? ভারী ভালো ছিল আপনার গদ্য লেখার হাত। জবাবে উৎপল বলেছিলেন, 'আসলে কবিতার ব্যাপারটা বুজে যাওয়ার পর গদ্য লিখতে ইচ্ছে করে না।' কবি সুনীলও মাঝে মাঝে যেন বলেছেন যে তিনি মূলত কবি। গদ্যে তাঁর মনোযোগ অখণ্ড নয়। হয়তো গদ্যে তাঁর বিপুল খ্যাতিকেও তিনি ততটা আমল দেন না। শক্তি যদি লিখতেন তবে মনে হয় বাংলা সাহিত্যের গদ্যচর্চায় এক বিপুল আলোড়ন ঘটতে পারত। তাঁর উপন্যাস কুয়োতলা ও বেশ কয়েকটি ছোটগল্প পড়লে পাকাপোক্ত কথাশিল্পীরও কলম পড়ে যাওয়ার কথা। তাহলে শক্তি বা উৎপল গদ্য লেখেন না কেন এ কে সঠিক বলবে? সুনীলই বা গদ্যকে কেন বিমাতার আসনে বসান? আমি এঁদের সমান আসনে বসবার যোগ্য নই। তবু কুণ্ঠার সঙ্গে এঁদের উল্লেখ করছি এ কথাটাই বোঝানোর জন্য যে, আমার কবিতা না লেখার কারণটা অনেকটা তাঁদের গদ্য লেখা না লেখার মতোই।

নিজের কথা বলতে কিছু কুণ্ঠা আমার বরাবর। আসলে, কেনই বা নিজের কথা বলা? কে শুনবে? কেনই বা শুনবে? যা কিছু লিখি তার জোরে নিজেকে লেখক বলে দাবি করা যায় বলে মনে হয় না। আর এ সামান্য চর্চাটুকু বাদ দিলে আমি নিতান্তই সাদামাটা

নিজের কাছেও। সাতকাহন করে তবে এই আত্মকথন কেন? বলতে হল নিতান্তই সম্পাদকের উপরোধে।

কিন্তু বলাও হল না ঠিক। কত কি অকথিত রয়ে গেল। কবিতা কেন লিখি না এ প্রশ্নের সত্যিকারের জবাব হওয়া উচিত--লিখতে পারি না। লিখতে জানি না। তবে ভালোবাসি। বড় ভালোবাসি।

নানা বিষয়ক রম্য রচনা

বাঙালির মাতৃপূজা

কয়েক বছর আগে আমি দক্ষিণ ভারতের মহীশূরের কাছে চামুণ্ডা পাহাড়ে হাজির হয়েছিলাম। আমার সেই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি উত্তর ভারত থেকে রামচন্দ্রের বনবাসের পথ খুঁজতে-খুঁজতে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত চষে ফেলছিলাম তখন। কিংবদন্তী শুনলাম মা চণ্ডিকার সঙ্গে মহিষাসুরের সহস্রাধিক বছরের সেই পুরাণ-প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়েছিল এখানেই। চামুণ্ডা পাহাড়টি টিলার নামান্তর মাত্র। নন্দী ষণ্ডের পাহাড়টি টিলার নামান্তর মাত্র। নন্দী ষণ্ডের বিখ্যাত প্রস্তর ভাস্কর্য এবং অন্যান্য বিগ্রহাদির সঙ্গে চামুণ্ডা মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত মন্দির ভাস্কর্যের স্বাক্ষর বহন করছে। কিন্তু কথা হল, চণ্ডিকার সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ হল দক্ষিণ ভারতে, কিন্তু চণ্ডীর বন্দনা এবং পূজা হয় পশ্চিমবঙ্গে, দক্ষিণেরও ভারতখণ্ডে নয়।

চণ্ডীই কি দুর্গা? আমরা সেই বাল্যকাল থেকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কম্বু কণ্ঠে মহালয়ার প্রাতঃকালে চণ্ডীপাঠ শুনে এসেছি। গ্রন্থখানি যে মা দুর্গারই বন্দনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কি?

কিন্তু মুশকিল হল দেবতাদের সম্মিলিত অবদানে চণ্ডিকার সৃষ্টি হয়েছিল দুরন্ত মহিষাসুরকে বধ করার জন্যই, কথিত আছে অসুর দলনের পর তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবী পদে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু কোন গোলমালে তিনি হয়ে গেলেন শিবের ঘরনি? আবার তিনি এবং শিবের ঘরনি উমা কি একই নারী? না হলেও বাঙালির কল্পনা যে আগমনী আর বিজয়ার গানে তাঁকে সেই ভূমিকাতেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। কোথা থেকে এলেন লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ তাও ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত নয়।

তবে দেব-দেবী সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসব অসঙ্গতি আমরা মেনেই নিয়েছি। এরকমই তো হয়ে থাকে। আর দেবী দুর্গা যতটা না পৌরণিক তার চেয়েও বেশি বাঙালি জীবনের নানা প্রভাবে প্রভাবিত এক দেবীমূর্তি। দেবী দুর্গাকে বাঙালি ছাড়া আর কিছু ভাবাই যায় না।

বাঙালি মাতৃপূজক জাতি। তার কারণ মায়ের আঁচল ধরা বাঙালি বরাবরই মায়ের ছেলে। স্নিগ্ধ শ্যামল এই দেশটির আবহেই যেন মা-মা গন্ধ। তাই বাঙালির আরাধ্য যাঁরা তাঁরা অধিকাংশই দেবী। দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, শীতলা, ষষ্ঠী ছাড়াও অপ্রধান দেবী আরও আছেন। শিব, কৃষ্ণ, নারায়ণরা সংখ্যায় দেবীদের কাছে পিছিয়ে রয়েছেন। বাঙালি দেবী-পূজাই বেশি করে থাকে, এতে আর সন্দেহ কি?

দুর্গা পূজার নানা বিবর্তন ও পরিবর্তন এ জীবনে এতটাই দেখেছি যে, বিস্ময়ভয়ে ভাবতে হয়, এত অল্প সময়ে এত পরিবর্তন সাধিত হল কি করে?

আমার ছেলেবেলা এমন কিছু দূরবর্তীও তো নয়। তবে এই যুগে পরিবর্তনটা ঘটে জীবনধারার তীব্র গতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই বোধ হয়। আর একটা কারণ হল দেশভাগ।

দেশ বিভক্ত হওয়ায় আমাদের অন্যান্য ক্ষতি যা হয়েছে তা তো হয়েছেই। মস্ত একটা ক্ষতি হল, আমাদের প্রকৃতিই কেড়ে নেওয়া হল। যাঁরা পূর্ববঙ্গে গেছেন বা থেকেছেন তাঁরাই জানেন, নদীমাতৃক, উর্বর এবং অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীতে সমৃদ্ধ ওই ভূখণ্ডটি কি বিপুল মায়া সঞ্চার করতে পারে।

আজ, এত বছর পরেও ওই দেশটির জন্য বুক টন টন করে। অথচ পূর্ব বাংলার চেয়ে আমি অনেক বেশি বছর থেকেছি দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে। তবু করে।

দেশ-টেশ আজকাল অনেক মানুষই মানতে চায় না। এ যুগটা দেশ নিয়ে ভাবাবেগের যুগ নয় বোধহয়। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভারতবাসীর যে আবেগ ছিল, স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে তা লোপাট হয়েছে। এখন ভারতীয়ত্বের বোধটাই কাজ করে না। কাজ করে খানিকটা প্রাদেশিকতা এবং অংশত জেলা-ভিত্তিক হামবড়াই মাত্র। মানুষের বোধ বুদ্ধি ভাবাবেগ খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। অনেকের আবার সেটুকুও নেই। তাদের কাছে দেশ আবার কী!

আমাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করে যে তারা পূর্ববঙ্গের লোক। কিন্তু সেটা মানে না, কারণ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাদের কোনও যোগ রচিত হয়নি। তারা পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলে না বা আচরণও করে না বাঙালদের মতো। তাদের দেশ এখন দক্ষিণ বা উত্তরবঙ্গই। আমরা কিছু মানুষ এখনও চোখ থেকে মায়াচ্ছন্ন আর মন থেকে কিছু স্মৃতির রেশ মুছে ফেলতে পারিনি আজও।

কেন পূর্ববঙ্গের কথা এই সাতকাহন করে বলা? তার কারণ, ওই দেশের পটভূমিটাই এক পরম স্নিগ্ধতায় ভরা। প্রকৃতিই ছিল তার সম্পদ। নদী-খাল-বিল-জল-জঙ্গল মিলেমিশে বাংলার গভীর গহন অভ্যন্তর যেন। দক্ষিণ বঙ্গ প্রকৃতিহীনা তো নয়। তারও সৌন্দর্য বড় কম নয়। কিন্তু তুলনায় পূর্ববঙ্গ স্নিগ্ধতর, সবুজতর, উর্ব্বরতর তো বটেই। আর এই প্রকৃতির প্রেক্ষাপটেই আসত বর্ষাশেষের শরৎ।

শরৎ ঋতু যেন এক আশ্চর্য জাদুকর। চিত্রকরও। সে এল আর চারদিকে পালটে যেতে লাগল রং, আলো গন্ধ, শব্দ। ন্যাড়া নদীর চর ভরে গেল শঙ্খসাদা কাশ ফুলে। তার ওপর বাতাসের ঢেউ যে না দেখেছে সে দুর্ভাগা। মরকতের মতো নীল আকাশে হালকা সাদা মেঘ ভেলার মতো ভেসে বেড়ায় উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীন। মাঝে মাঝে মল-পরা পায়ের শব্দ তুলে বালিকার মতো নৃত্যপর পায়ে নেচে যায় ক্ষণস্থায়ী বৃষ্টি। বাতাসে চোরা

একটু শীতলতা। মাঠে মাঠে পাকা ধান। খাল-বিল-পুকুর টইটম্বুর হয়ে আছে জলে। সম্পন্নতা আর পরিপূর্ণতার এক লক্ষ্মীশ্রী যেন ফুটে ওঠে চারধারে।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এত পুজো ছিল না। এই একটা পুজো তো ওই বহু দূরে আর একটা। এক পুজোর ঢাকের বাদ্য পৌঁছত না আর একটায়। আলো ঝলমল প্যান্ডেল নয়, জ্বলত হ্যাজাক আর ডে-লাইট, আর ছিল সনাতন তেলের প্রদীপ। রঙিন কাগজের শিকলি ছিল ডেকোরেশনের মস্ত সম্বল। নিকোনো মাটির বেদি। চাঁদোয়ার চট বা বড়জোর ত্রিপল। আজকালকার মতো প্যান্ডেল-বিপ্লব তো তখন হয়নি!

বারোয়ারি পুজো ছিল খুবই কম। বেশির ভাগ পুজোই ছিল বাড়ির ঘরোয়া পুজো। তখন কাছাকাছি জমিদারবাড়িতেই ছিল আমাদের পুজোর মস্ত আকর্ষণ। কারণ বেশির ভাগ জমিদারবাড়িতেই দুর্গাপুজোর চলন ছিল। মণ্ডপ নয়, পুজো হত ঠাকুর-দালানেই বেশির ভাগ।

ময়মনসিংহে আমার জন্ম। সেই শহর ছিল আধা পল্লি, আধা শহর। তখন সব মফসসলের শহরই ছিল এরকম। প্রকৃতিকে এমনভাবে নির্মূল করা হয়নি তখনও। জনসংখ্যার ভয়াবহ চাপও ছিল না। রাস্তায় মোটরগাড়ির দেখাই পাওয়া যেত না।

কলকাতায় আজকাল আর আগমনী বিজয়ার গান শোনা যায় না। কেন যায় না কে জানে। ছেলেবেলায় পুজোর অনেক আগে থেকেই শুনতাম ওই গান গেয়ে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু মানুষ। তারা অর্থী প্রার্থীই হবে, হয়তো ভিখিরিও। কিন্তু আকাশ বাতাসকে মথিত করত ওইসব গান।

ছেলেবেলা। ছেলেবেলা ছাড়া মানুষের আর আছেই বা কী! তার গোটা জীবনের ভিত ওই ছেলেবেলা। স্মৃতিভ্রষ্ট না হলে মানুষ ছেলেবেলাকে ছাড়াতে পারে না কিছুতেই। তাই সে বুড়ো বয়সেও খানিকটা অংশত ছেলেমানুষ থেকে যায়।

ভাগ্য ভালোই ছিল। আমি জন্মেছিলাম এক মায়াময় নদের ধারে। ব্রহ্মপুত্র। সেই নদের সঙ্গে কার তুলনা করি? শহরের দিকে কয়েকটা ঘাট ছিল, আর বেশির ভাগই আঘাটা। নদীর জলে বাঁশ পচানো হত। তার কটু গন্ধ বাতাসকে দূষিত করত বড় কম নয়। ওপারে ছিল বসতিহীন প্রান্তর, শেষে গ্রাম। সন্ধের পর নদীর ওপারে আলেয়ার নীল আলো প্রেতলোকের আবহ রচনা করত। ওই নদ আমার সত্তায় আজও কী গভীরভাবে মিশে আছে!

দুর্গার চালচিত্রটি ছিল বুঝি ওই প্রকৃতিই।

দুর্গা কখনও মাটির তৈরি প্রতিমা ছিল না আমাদের কাছে। আমার মা, পিসি, মাসিদেরই যেন আদল ছিল তাঁর মুখে। ঘামতেলে, মৃদু আলোয়, ঝলমলে রাংতার পোশাকে দেবী যেন প্রাণই পেয়ে যেতেন। কিছুতেই বিশ্বাস হত না দুর্গা জিয়ন্ত নন।

একটা ঘটনার সূত্রে আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছিল। তর্পণাদি সম্পন্ন হয়েছে, মহালয়া বিগত, পুজো আসছে। প্যান্ডেল নয়, ডেকোরেশন নয়, পুজোর আগমন আমরা টের পাচ্ছি প্রকৃতির রূপে। পাশেই জমিদারবাড়িতে উদ্যোগ আয়োজন চলছে। আমাদের পুজো বলতে সেইটেই।

সেই পঞ্চমীই হবে, আমার এক জ্ঞাতি ভাই কোথা থেকে একটা দেড়-দু ফুট দুর্গামূর্তি ঘাড়ে করে নিয়ে এল।

আমার সেই ভাইয়ের বাবা জ্ঞাতি জ্যাঠামশাই পেশায় পুরুত। মূর্তি দেখে তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত। পুজোকাটালি দিতে বিগ্রহ এনে ফেললে তার পুজো না করলে যে সর্বনাশ হবে। তিনি ছেলেকে এই মারেন কি সেই মারেন। গরিব ব্রাহ্মণের দুর্গাপূজার সামর্থ্যই নেই। মূর্তি ফেরত যায়-যায়।

সেই সময়ে আসরে নামলেন আমার ঠাকুমা। বললেন, পুজো হবে। খরচ আমি দেব।

তাঁর বিশ্বাস দুর্গামূর্তির ওই আগমনটা আকস্মিক নয়, বরং দৈবী ইচ্ছাই।

সঙ্গে সঙ্গে কাসলাদের ডাকা হল। তারা বারবাড়িতে বাঁশের খুঁটি পুঁততে লাগল। সারারাত জেগে তৈরি হল মণ্ডপ, প্রতিমার বেদি। তখন আমরা ছেলেমানুষ, বেশি রাত অবধি জাগতে পারিনি। ষষ্ঠীর সকালে উঠে দেখি আমাদের বারবাড়ির মাঠে যেন ময়দানের কাণ্ড। মণ্ডপের কাজ শেষ। দুর্গার সাজ আর রঙিন কাগজের শিকলি তৈরি করতে মা, ঠাকুমা, জেঠিমা, পিসি আর পাড়ার মহিলারা বসে গেছেন। সে এক অদ্ভুত আনন্দ। সে এক আশ্চর্য অনুভব। আমাদের পুজো!

চলে এল ঢাকি। এসে পড়ল পূজার সম্ভার, ভোগের সামগ্রী। এসে পড়ল রাজ্যের ছেলেপুলে। সে কী আনন্দ!

আজ যদি সেদিনের সেই পুজোর মণ্ডপটিকে এ যুগের সবচেয়ে ওঁচা মণ্ডপের পাশে এনে দাঁড় করাই তাহলে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাবে। কী দীনহীন সেই আয়োজন এ যুগের তুলনায়। তবু আজকের হাজার পুজোও সেই আনন্দটা ফিরিয়ে দিতে পারে না।

বাড়ির পুজোর মজাই হচ্ছে যা-কিছু সব বাড়ির লোকই করে। সে আমলের মেয়েরা খাটতে ভয় পেতেন না। আর পুজোর জন্য খাটবেন তাতে যে ডবল উৎসাহ।

ব্রহ্মপুত্রের মাদক পরিপ্রেক্ষিতে বেজে উঠল রণদামামার মতো ঢাক। বাজল কাঁসি। তার সঙ্গে মিশল এসে খিচুড়ি আর লাবড়ার গন্ধ। মিশল এসে নীল আকাশের সাদা মেঘখণ্ড। মিশল কাশফুলের ধবল অঙ্গজ্যোতি। মিশল শঙ্খ আর উলুধ্বনি। আরও কত কি মিশল কে জানে! আমাদের ছোট, দীনদুঃখী, অনুজ্জ্বল মণ্ডপে মাত্র দেড়-দু ফুট দুর্গামূর্তির মুখে কিন্তু ফুটে উঠল অপার্থিব হাসি।

আমার গম্ভীর রাশভারী দাদু অবধি সেই পুজোমণ্ডপে ঘোরাঘুরি এবং অভিভাবকত্ব করতে লাগলেন।

জুটল এসে কাঙাল, ফকির, ভিখিরি।

সপ্তমীর সকালে পুজোর পর অঞ্জলি। মাইক ব্যাপারটাই অজ্ঞাত ছিল তখন। যেমন অজ্ঞাত ছিল টেপ রেকর্ডার বা ক্যাসেট। সেটা কলের গানের যুগ। রেডিয়ো অবধি অমিল ছিল মধ্যবিত্তের ঘরে। বিদ্যুতের বালাই বড় সামান্যই ছিল মফসসলের শহরে।

সপ্তমীর সারাদিন কী উত্তেজনায় যে ভেসে গেল কে তা বুঝিয়ে বলতে পারে? সন্ধের পর দর্শনার্থীরা কিছু কিছু এলেন বটে, কিন্তু আমরাই তো মাতিয়ে রেখেছি পুজো।

মহিলারা কদাচ দোকানে গিয়ে শাড়িটাড়ি কিনতেন না। ওসব চল হয়নি তখনও। পুজোর আগে শাড়িওলা কুলির মাথায় কাপড়ের গাঁটরি চাপিয়ে নিজেও একটা বোঁচকা কাঁধে ঝুলিয়ে চলে আসত বাড়িতে। বাড়ির মেয়েরা কিনত। সেসব কাপড়ের বিশেষ বাহার ছিল বলে মনে হয় না। সহজ সরল তাঁতের শাড়ি। নকশা, বুটি, পাড়ের বাহার ছিল সামান্যই।

বরাবর আমরা একখানা করে ছিটের জামা আর প্যান্ট পেতাম। কী যত্নে যে চারদিন ধরে পরতাম তা। ওই সব সস্তা বাহারহীন জামাপ্যান্ট থেকে যে আনন্দ আহরণ করা গেছে আজ তার শতভাগও পায় না এ যুগের অতি-পাওয়া শিশুরা।

পুজোর পর বিসর্জন। ঠিক দিনে এবং ঠিক ভাবে। কোথাও ব্যত্যয় হওয়ার উপায় নেই।

যেন বাড়ির মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে এমনই ছিল বিদায়ের অনুষঙ্গ। আমাদের মন খারাপ, মহিলাদের চোখে জল। প্রতিমাকে মিষ্টি খাওয়ানো, সিঁদুর পরানো এসব আজও হয়। কিন্তু কাঁদে কি কেউ? দেখি না তো!

বুড়ো হলাম নাকি? এখনও জিনস পরি, রঙিন টি শার্ট গায়ে চড়াই। তবু মনটা কি বড্ড বেশি অতীতমুখী? তবে তো বার্ধক্যেরই লক্ষণ!

বৃদ্ধ বয়সের একটা লক্ষণ, অতীতের সবকিছুকে সাম্প্রতিক সব কিছুর চেয়ে ভালো বলা। আমার বড় পিসেমশাই একবার দেশের বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার মধুর স্মৃতিচারণ করছিলেন, তখন হঠাৎ আমার বাবা বললেন, দেশের বাড়িতে কী খেয়েছেন সত্যিকারের একটু ভেবে বলুন তো। খেয়েছেন তো বেশির ভাগই কচুঘেঁচু। গাঁয়ে তো পাওয়াও যেত না তেমন কিছু। তবে খেয়েছেনটা কী? পিসেমশাই একটু অপ্রস্তুত। তারপর এক গাল হেসে বললেন, ঠিকই বলেছিস। সত্যিই তো! তেমন কিছু তো খাইনি ঠিকই। তবু কেন যে মনে হয়...

এই মনে-হওয়াটা নিয়েই বিপদ।

আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি খুবই বন্ধু ভাবাপন্ন। অনেক বিষয়েই তাদের সঙ্গে আমার মতের বেশ মিল। কিন্তু কয়েকটা বিষয়ে বেশ গরমিলও। যেমন দুজনেরই পছন্দ কলকাতার পুজো। বেশি আলো, বেশি ভিড়, বেশি ডেকোরেশন, বেশি শব্দ। পুজোর

তিনদিন যখন আমার আত্মগোপন করে থাকতে ইচ্ছে হয় তখন তারা দিব্যি পুজো দেখে বেড়ায়। তাদের ভালো লাগে, আমার লাগে না কেন--এটা নিয়ে কিছু ভেবে মনে হয়েছে এটা হয়তো জেনারেশন গ্যাপ নয়। মেজাজের পার্থক্য মাত্র।

তবে এটা ঠিক শৈশব-কৈশোরে বারোয়ারি পুজোর আধিক্য দেখিনি, চাঁদার খাতা হাতে জুলুমবাজ যুবকেরা হানা দিত না বাড়িতে বাড়িতে, লাউড স্পিকার জিনিসটাই ছিল আজানা। এগুলো ঢুকল এবং অবসিত হয়ে গেল প্রকৃতি, শরৎ ঋতু মার খেয়ে গেল শান-বাঁধানো কলকাতায়।

ধর্ম? না, ছেলেবেলা থেকেই জানি ধর্মের সঙ্গে এইসব পুজোর কোনও সম্পর্কই নেই। আজকের দুর্গাপুজো যেন ডিজনিল্যান্ডে ঘুরে বেড়ানোর মতোই এক প্রমোদ অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলায় যা দেখেছি সেই পুজোয় হয়তো আন্তরিকতা, স্নিগ্ধতা, আটপৌরে ভাব অনেক বেশি ছিল। কিন্তু সেই পুজোর সঙ্গেই বা ধর্মের সম্পর্ক কী?

চরণ পূজা মানে চলন পূজা। যার পূজা করি তার চলনকে অনুসরণ করাই তো ধর্ম। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের রোমাঞ্চকর চণ্ডীপাঠ ছেলেবেলা থেকে মহালয়ার ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে মন দিয়ে শুনেছি, আপ্লুতও বড় কম হয়নি। কিন্তু চণ্ডীর বন্দনার মধ্যে প্রধান কথাই হল দেহি-দেহি। এটা দাও, ওটা দাও, শত্রু খতম করো।

মানুষের চাহিদা ও অভাববোধের সঙ্গে ধর্মের যেন এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। লোকে প্রশ্ন তুলতে পারে, তাহলে ধর্ম কি কেবল আমাদের চাইতেই শেখায়? মানুষ নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না তখনই কি যে দেবদেবীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে?

না, ধর্ম আমাদের এই শিক্ষা দেয় না। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে জীবনকে বোঝা ও জানা, জীবনকে নানা অনুশীলন, বোধ ও অনুভূতির প্রস্ফুটনের ভিতর দিয়ে অব্যাহত করে তোলা। ধর্ম আমাদের শেখায় ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোদিষ্ট পরন্তপ। ঠাকুর বলেছেন, অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে। শুধু নিজের বাঁচা নয়, অন্যের বাঁচাও নিজের বাঁচার অন্যতম অবলম্বন।

বিহিত যা তা না করে অলৌকিক দয়ার ওপর নির্ভর করে যা ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে চায় তারা নিতান্ত বেকুব। ওর মধ্যে ধর্মের কিছু নেই। অনেকে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ভাগ্যও তো ভজন অর্থাৎ সেবার ফল। কিছু পেতে গেলে যেমন করে তা পেতে হয়, তেমন করেই তা পেতে হবে। আর পাওয়ার উৎসবকে নিরন্তর পূরণ করে চলাই পাওয়ার পথ। এটাই সম্ভবত বৈজ্ঞানিক ও ভাগবত বিধি। এই বিধির পথে জ্ঞানময় চেতন-চলনই কৃতকার্যতার কৌশল। সংসারী মানুষকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সাংসারিক জীবনে যে অকৃতকার্য তার আধ্যাত্মিক চক্ষুও তমসাচ্ছন্ন। আর এই অকৃতকার্যতার জন্য প্রধানত দায়ী মানুষের অবিন্যস্ত ও অব্যবস্থা চলন। ধর্মের মধ্যে মিথ্যে, মেকি, ফাঁকির

কারবার নেই। আছে অস্তিত্বকে অটুট করার সাধনা। আর অস্তিত্বকে অটুট করতে গেলে পরিবেশের অস্তিত্বও অটুট করে তুলতে হয়। পারত্রিক জীবনের জন্য ঐহিক জীবনকেও বিসর্জন দিলে চলবে না। ধর্মকে আশ্রয় করে উভয় দিকই বজায় রাখতে হয়।

তপস্যা মানে সেইসব করণীয় করা যাতে আমাদের অন্তরে হিমশীতল জড় নিশ্চেষ্টতা, তামসিকতা, নিথরভাব, আলস্য, অবসাদ কেটে গিয়ে সারস্বত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টাশীলতার উষ্ণ আবেগ তরতরে ও গনগনে হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রচলিত পূজা, তীর্থভ্রমণ বা ধর্মীয় আচরণের মধ্যে জীবনের অনুশীলন এত কম যে, সেটাকে প্রকৃত ধর্ম না বলে ধর্ম-ধর্ম খেলা বলাই বোধ হয় ভালো। ধর্ম যদি বাঁচতে না শেখায়, অন্যকে বাঁচাতে না শেখায়, অভ্যন্তরের সুপ্ত গুণাবলির বিকাশই যদি না ঘটে তাহলে আস্তিক আর নাস্তিকে কোনও তফাতই নেই বলে ধরে নিতে হবে।

দশপ্রহরণ ধারিণী, অসুরদলনী দুর্গাকে নিয়ে বাঙালির যে বিপুল উদ্দীপনা তাকে তাই কখনও ধর্মীয় আচরণ বলে আমার মনে হয়নি। তা বলে কি নিশ্চেষ্ট হবে মানুষ? দুর্গাপূজা বন্ধ করে দেব? না তাও নয়। দুর্গা র্দুগতিনাশিনীকে নিয়ে বাঙালির সামাজিক উৎসবের অন্য নানা উপযোগ আছে। আছে আর্থ-সামাজিক সুদূরপ্রসারী প্রভাব। আছে বাঙালির সংস্কৃতিচেতনার বিকাশও।

কয়েক বছর আগে এক বাণিজ্যিক সংস্থার শারদ সম্মানের অন্যতম বিচারক হয়ে সারারাত ধরে তাঁদের ব্যবস্থাপনায় কলকাতার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণের বিস্তর পুজো দেখতে হয়েছিল। জীবনে এক সঙ্গে এত পুজো দেখিনি। দেখতে দেখতে অবাক হয়েছিলাম, বাঙালির রুচিবোধের পরিশীলন দেখে। কুড়ি পঁচিশ বছর আগে পূজামণ্ডপগুলিতে কুৎসিত নাচানাচি, মেয়েদের বিড়ম্বনা, ব্যাপক অসভ্যতা ও ডেকোরেশনের রুচিহীন আড়ম্বর পীড়া দিত। এখন তো তা নয়। অনেক প্যান্ডেলে গেলে শোলার কাজ, স্নিগ্ধ আলো, মন্ডপের শান্ত বৈভব মনটাকে ভালো করে দেয়।

বৈভবটা কিছু বেড়েছে। অনেকটাই বেড়েছে। আরও বাড়বে। আমার ছেলেবেলার শরতের চালচিত্র নিয়ে দীনহীন দুর্গামূর্তিকে আর দেখা যাবে না কখনই।

সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। ঠিক আছে, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে বদলাক সবকিছু।

সেই রাতে কলকাতার বিচিত্র সব পুজো দেখতে দেখতে একসময়ে চোখ আর মন দুটোই গেল ধাঁধিয়ে। কোন পুজোকে শিরোপা দেব? অন্য যাঁরা বিচারক ছিলেন তাঁদের অবস্থাও আমার চেয়ে ভালো নয়। সকলেই খানিকটা বিভ্রান্ত।

ভোরের দিকে একটা ফাঁকা ঘুমন্ত মণ্ডপে পৌঁছলাম। লোকজন নেই। দুটো ছেলে বেঞ্চে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সাদা সোলার সাজে আদ্যন্ত সাজানো প্রতিমাটি একা স্থির চোখে চেয়ে আছেন। যেন অপেক্ষা করছেন কারও। ছোট মণ্ডপ। নাতিবৃহৎ মূর্তি। সেই ভোরে

ভারী ভালো দেখাল। কোন কৈশোরের প্রতিমার মুখ যেন কালের দূরত্ব অতিক্রম করে চলে এল সামনে। পুরস্কার দিতে দ্বিধা হয়নি আমাদের।

দেওঘরের দেবসংঘের প্রধান সোমেন সন্ন্যাসীই। তবে সন্ন্যাসীর মতো সাজেন না, এই যা। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁদের প্রতিমার চোখের পাতা ওঠে, পড়ে। জীবনের নানা সূক্ষ্ম লক্ষণ ফুটে ওঠে প্রতিমার মধ্যে। তাঁকে আমার বিশ্বাস হয়। ভক্তের ওপরেই নির্ভর করে দেবতার বিগ্রহে প্রাণের সঞ্চার। তিনি যা দেখেছেন ভুল দেখেননি।

কথা হল, এটা গভীর বিশ্বাসের যুগ নয়। মানুষের বিশ্বাসের সেই দৃঢ়তা কোথায়? খানিক ভুল বিজ্ঞান জেনে, খানিক নানা মতবাদের দ্বারা চালিত হয়ে, খানিক আস্তিক্য আর নাস্তিক্যের দোলাচলে থেকে মানুষের মনটাই হয়ে গেছে সন্দেহ-পিশাচ। সে এখন না ঘরকা, না ঘাটকা। অফিসের নাস্তিক বাড়িতে আস্তিক বিস্তর মানুষকে দেখবেন।

সাম্প্রতিক মানুষের পক্ষে তাই সম্ভব নয় মৃন্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ীকে দেখা। সেই প্রবল ভক্তির অনুশীলনই নেই তার জীবনে।

তবু প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে সে প্রতিমা দেখে, আলো দেখে, সাজ দেখে। মাইলের পর মাইল হাঁটে, হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাঁফায়, ফাস্ট ফুডের দোকানে মাঝরাত্তিরে রোল বা চাউমিন খায়, ভোরবেলা বাড়ি ফেরে।

তামাশা? না পুরোপুরি তাও নয়। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও মানুষের মন কিছু কিন্তু খোঁজেই। খুঁজেই চলে। সন্ধান হয়তো পায় না। সাজের আড়ালে দুর্গা থেকে যান দুর্জ্ঞেয় হয়েই। তবু শুধু ডিজনিল্যান্ড দেখার আনন্দই তার পাওনা নয়।

বাঙালি মাতৃপূজক জাত। গর্ভধারিণী মাকে আজকাল সে আর ভাতকাপড় দিতে চায় না। মায়ের চেয়ে বরং স্ত্রীর প্রতিই তার আনুগত্য বাড়ছে ধীরে ধীরে। কলকাতার আশেপাশে গজিয়ে উঠছে আবশ্যিক বৃদ্ধাশ্রম। তবু দুর্গাপূজার জাকজমক তো তাতে মলিন হচ্ছে না।

কলকাতার পুজো

যুদ্ধটা হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে, মহীশূরের চামুণ্ডে পাহাড়ে, এইরকমই কিংবদন্তী। সেই চামুণ্ডে পাহাড়ে দেবী চণ্ডিকার অসাধারণ মন্দিরটিতে আজও প্রতিদিন হাজারো মানুষের ভিড়। কী কারণে কে জানে সেই চণ্ডিকা বা দুগগা ঠাকরুণ কালক্রমে বাঙালির পূজিতা হয়ে উঠলেন। সারা ভারতবর্ষে দুর্গাপুজোকে মোটামুটি বাঙালির পুজো বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। বিজয়া দশমীর দিন অবশ্য উত্তর ভারতে দশেরা উৎসব হয়, কিন্তু সে আর এক

অসুরবধের বৈজয়ন্তী। রাবণ। কথা হল দশপ্রহরণধারিণী অসুরবধকারিণী এই বীরাঙ্গনাকে তাঁর ভয়ঙ্কর বাহনটি সমেত ভেতো বাঙালি পুজো করে কেন? কেনইবা এই নিরীহ জাত কালীর মতো ভয়ঙ্করীর উপাসক? বারো মাসে বাঙালির যে তেরো পার্বণ তারও সিংহভাগ জুড়ে আছেন দেবীরাই, দেবরা নন। এবং তাঁদের মধ্যে যে যত ভয়ঙ্করী তাঁর তত কদর।

গবেষকরা নিশ্চয়ই এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। হয়তো তত্ত্ব এবং তথ্য তাঁরাই জানেন। কিন্তু বাঙালি মায়ের আঁচল ধরা জাত বলেই এই মাতৃপূজা, আমার এরকম মনে হয়। তার মানে নয় যে বাঙালি মাতৃভক্ত। মাতৃভক্ত হলে সে কৃতী হত, তার সাফল্য আসত বগল বাজিয়ে। তা নয়। ছেলেবেলায় বাঙালি যেমন মায়ের আঁচল-ধরা তেমনি বড় হয়ে সে আবার হয় বউয়ের আঁচল-ধরা। গড়পড়তা ভেতো বাঙালির আঁচল ছাড়া গতি নেই।

আমার দুর্গাপূজা এখন কলকাতা-কেন্দ্রিক। কিন্তু যাঁরা পূর্ব বা উত্তরবঙ্গে থেকেছেন বা পশ্চিমবঙ্গের গাঁ, গঞ্জে তাঁরাই জানেন দুর্গাপূজার সঙ্গে প্রকৃতির পটভূমিকার যোগসাজস কত গভীর। সকালবেলায় ঘাস মাড়ালেই শিশির, শিউলি গাছের তলায় সাদা হলুদের মায়াবী বিছানা, স্ফটিকের মতো, পরিষ্কার আকাশ দুধসাদা মেঘ, নদীর ধারে কাশফুলের এক আদিগন্ত সমারোহ। দুর্গা যখন আসেন তখন বাংলার প্রকৃতির মধ্যে এমন এক গভীরতা সঞ্চারিত হয় যা ব্যাখ্যার অতীত। এসময়ে যাঁরা কোনও নদীর ধারে গাছপালার মধ্যে বসবাস করেন এবং একটু নির্জনতায় তাঁরাই নিজেদের চারদিকে এই গভীরতাকে অনুভব করতে পারেন। বোধহয় এই একমাত্র ঋতু যা সমস্ত অসুরকে আড়াল করে দাঁড়ায়।

দুর্ভাগ্য আমাদের যাদের বাস প্রকৃতিহীন কলকাতায়। খুব ছোটবেলায় কিছুকাল কলকাতায় ছিলাম। তখনও এমনভাবে কলকাতাকে মুড়িয়ে বৃক্ষহীন করা হয়নি। গাছ ছিল, ঘাস মাটি ছিল। চৌরঙ্গিতে পথ হাঁটতে ফুলের গন্ধ পাওয়া যেত আচমকা। শীতকালে মাসখানেক একটু শীতলতা ছাড়া প্রায় সারা বছরই এখানে গ্রীষ্মকাল। একটু তারমত্য ঘটে, কখনও-সখনও বৃষ্টিপাত হয়, নইলে গ্রীষ্মই কলকাতার প্রধান ঋতু। টানা পঁচিশ ছাব্বিশ বছর কলকাতায় বাস করে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। পুব বাংলায় শৈশব কেটেছে, কৈশোর উত্তরবঙ্গে, আসামে, বিহারে। দুর্গার প্রকৃত চালচিত্র-যে প্রকৃতি তা গভীরভাবে গেঁথে গেছে মনের মধ্যে।

ঘটনাক্রমে যখন কলকাতায় মাথা গাড়তে হল তখন আমাদের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল অশ্বত্থ গাছের মতো, যা পাথর থেকেও রস আহরণ করে নেয়। কলকাতায় পুজো আছে, বেশ বেশি মাত্রাতেই আছে, কিন্তু এর পিঙ্গল আকাশে, ঘাসহীন পথে, বৃক্ষহীন পরিবেশে, পক্ষিহীন সকালে শরতের আভাসমাত্র নেই। একটি শহরের প্রতি মানুষ কত নির্মমভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে কলকাতা তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে ধুঁকতে ধুঁকতে। সেল-এর

বিজ্ঞাপন, দোকানে দোকানে দম-আটকানো ভিড়, ফুটপাথে মানুষের দুর্ভেদ্য গা ঘেঁষাঘেঁষি এবং দরজায় চাঁদার বিলবই হাতে যুবকদের আবির্ভাব—কলকাতায় পুজোর আগমনী গান আজকাল এই।

তবু অশ্বত্থ গাছের মতোই যতখানি পারা যায় নিজেদের শিকড় তো ছড়িয়ে নিতেই হয়। 'ডেকোরেশন' কথাটা আজকাল খুব গুরুত্ব পায়। কী অফিসে, কী বাড়িতে, কী পুজোমণ্ডপে। কলকাতার পুজোয় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বোধহয় ওই ডেকোরেশন বা সাজসজ্জা, আলোর খেলা ইত্যাদি। আজকাল এই সাজসজ্জার চলন প্রায় সর্বত্র। তবু কলকাতার মতো আর কোথাও তা এত উচ্চমানের নয়।

পুজোর একটি দিন—সপ্তমী বা অষ্টমীতে আমি আমার নাবালক নাবালিকা পুত্রকন্যা দুটিকে নিয়ে কাছেপিঠে একটু বেরোই। আজকাল সর্বোত্তম পুজোর জন্য প্রাইজ দেওয়ার চলন হয়েছে। সেসব প্রাইজ দক্ষিণ কলকাতার যে কয়েকটি সংস্থা পেয়েছে তাদের একটি ভারী অভিনব। মণ্ডপের চেহারা খুব ধনী মানুষের বৈঠকখানার মতো। সাজানো গোছানো, ছিমছাম। এতই সুন্দর তার গঠন যে পাকা দালান বলে মনে হয়। তেমনি সুন্দর সেই মণ্ডপের প্রতিমা। লাউডস্পিকারের ব্যবহার খুবই সীমিত, মৃদু সানাইয়ের শব্দ আর সুন্দর একটি গন্ধ চারদিক মাতিয়ে রেখেছে। সময়মতো ঢাক নিশ্চয়ই বাজে, আরতি হয়, ভিড় জমে, তবু সেই অতি অভিজাত মণ্ডপে গিয়ে একটু যেন তটস্থ থাকতে হয়।

গড়িয়াহাটার কাছাকাছি আর একটি জমজমাট পুজো আছে। কিন্তু ভিড় ঠেলে মণ্ডপের কাছে পৌঁছানো এক কঠিন কাজ। চারদিকে মোটর সাইকেল আরোহী, কুয়ো থেকে জল তোলায় রত রমণী বা এইরকম নানা আলোর ম্যাজিক। প্রতি বছরই এই মণ্ডপটির সাজসজ্জায় ব্যয়বাহুল্যের ছাপ থাকে। গোলপার্কের কাছে একটি পুজো প্রতি বছরই কিছু অভিনবত্বের চেষ্টা করে। সাজসজ্জায়, প্রতিমা গঠনেও। এদের আলোর কাজও চমৎকার। যেমন চমৎকার যোধপুর পার্কের বড় পুজোটির আলোকসজ্জা। বড় রাস্তা থেকে মণ্ডপ অবধি রাস্তার দুধারে এরা প্রতি বছরই চলিষ্ণু কিছু আলোর মূর্তি লাগিয়ে দেন। লাইন না দিয়ে এই মণ্ডপের প্রতিমা দেখা দুঃসাধ্য।

ফায়ার ব্রিগেডের পুজো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মূর্তির বিশালত্ব নিয়ে আর প্রতিযোগিতা নেই। কিন্তু সাজসজ্জা নিয়ে আছে। কালীঘাটে এক বিখ্যাত মণ্ডপে একবার প্রতিমা দেখতে গিয়ে ভিড়ের চাপে গলদঘর্ম দিশেহারা হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল।

মুশকিল হচ্ছে, কলকাতায় সর্বত্র বড্ড ভিড়। এত ভিড় যে আমাদের মতো ভিড় ভীত মানুষের পক্ষে পুজো অবশেষে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মজাও হচ্ছে, ওইটাই। ভিড় ছাড়া কলকাতাকে মানায়ও না। কলকাতা তো আদ্যন্ত ভিড়েরই শহর।

পুজোর লেখালেখির ঝকমারি

আজ থেকে বিশ বাইশ বছর আগে পুজোর লেখা মানেই ছিল লেখক বনাম মা সরস্বতীর এক প্রাণান্তকর দ্বৈরথ। আটদশটা বাজারচলতি পুজো-সংখ্যায় উপন্যাস লেখার বরাত, ছোট-বড় অন্তত ডজনখানেক পত্রিকায় ছোট গল্প। লেখকের দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, তা তিনি টের পেতেন না। দাড়ি কামাচ্ছেন না, ডালের পাতে ভুল করে দুধ ঢেলে ফেলছেন, বউকে পরস্ত্রী বলে ভুল করছেন, ভুলে যাচ্ছেন ছেলের নাম। একসঙ্গে আটটা-দশটা উপন্যাস লেখার মতো আট-দশটা হাত নেই বলে দুঃখ পাচ্ছেন খুব। তবু ওই অসম্ভব সম্ভবও করে ফেলতেন এক সময়ে। মাঝখানে অবশ্য চূড়ান্ত টেনশন যেত সম্পাদক, প্রকাশক, প্রিন্টারদের।

কাগজগুলো যে কোথায় উবে গেল, কে জানে! সেই বিখ্যাত সিনেমা পত্রিকাটির হস্তান্তর ঘটেছে, উঠে গেছে কয়েকটা কাগজ। নতুন কিছু শারদসংখ্যা এল বটে, কিন্তু ঠিক আগের মতো আসরটা আর জমজমাট নয়।

একটি বিখ্যাত পত্রিকাগোষ্ঠী লেখকদের এই মুক্তকচ্ছ উপন্যাস উৎপাদন সুনজরে দেখেননি। লেখকদের নজর যদি মা সরস্বতীর থেকে পিছলে মা লক্ষ্মীর ওপর গিয়ে থিতু হয় তাহলে বঙ্গসাহিত্যের ভাঁড়ারে মা ভবানী জাঁকিয়ে বসবেন। সুতরাং লক্ষ্মীমন্ত লেখকদের আবার সারস্বত করে তুলতে তাঁরা দক্ষিণা বৃদ্ধি করলেন এবং আরোপ করলেন নিয়ন্ত্রণ। সঙ্গে সঙ্গে লেখককুলে একটা ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল বটে, কিন্তু পরে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখা গেল, ব্যাপারটা খারাপ নয়। লেখা কমবে, লেখার প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাবে, ঝামেলা টেনশন ইত্যাদিও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। তখন যদিও অন্যান্য পত্রিকা একটু বিপাকে পড়বে, কিন্তু অত ভাবতে গেলে এবং বিশ্ববন্ধুত্ব বজায় রাখতে গেলে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে।'

সত্তরের দশকের প্রায় গোড়া থেকেই কিছু লেখক অঞ্জলিবদ্ধ হলেন এবং আদায়বদ্ধ লেখকেরা পেয়ে গেলেন খোলা মাঠ।

তাহলে বাপু পুজোর লেখার আর ঝঞ্ঝাট রইলটা কী? এখন তো আর সাত-আটখানা করে নামাতে হচ্ছে না। একখানা, দুখানা, বড়জোর তিনখানা—এ তো হাসতে হাসতে হয়ে যাবে।

নিজেকে আমি সেকথাই বলি—এটুকুও পারো না, তাহলে আর পারোটা কী হে?

প্রতিবছর পুজোর লেখা যখন শেষ করি তখন সম্পাদকীয় তর্জনগর্জনের কথা ভেবে প্রতিজ্ঞা করি, পরের বার আর টেনশন নয়। জানুয়ারি থেকে লেখা ধরব, মে-জুন মাস লেখা নামিয়ে দিয়ে গঙ্গাস্নান করে ফেলব। জানুয়ারি আসে, হাসতে হাসতে চোখ টিপে

চলে যায়। জুন মাসে যখন পুজোর লেখার কথা ওঠে, তখন ভারী অবাক লাগে--এখনই কি? যথেষ্ট সময় আছে, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেব। শেষে যখন চৈতন্যোদয় হয়, তখন 'নাই নাই নাই যে সময়'।

'গতিবিজ্ঞানে লেখা নাই, তবু খোঁড়া পা-ই পড়ে খাদে' লক্ষ করেছেন কি? ফি-বছর পুজোর লেখার যখন তুঙ্গিয়ান অবস্থা, যখন বুঁদ হয়ে ভোঁ হয়ে যাওয়ার কথা, ঠিক সেই সময়ে দেঁতো হাসি হাসতে হাসতে একটা না একটা উটকো ঝামেলা বা প্রবল বাধা এসে দাঁড়ায়। বেশ নিরিবিলি রাস্তা ধরে একাবোকা মৃদুমন্দ গতিতে হেঁটে যাচ্ছি, আচমকা মোড় ফিরে যেন এক চেঙ্গিস তার অস্ত্রশস্ত্র সমেত অশ্ববাহনে এসে লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ে, তবে রে ব্যাটা, এত সহজে পার পাবি ভেবেছিস?

কানে আসছে, অমুকে শেষ স্লিপ জমা দিয়েছে, তমুকে কাল শেষ করবে। সম্পাদক সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাস্টবিনে মড়া ইঁদুর যেমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখে লোক, তেমনি তাকিয়ে থেকে বলেন--ছিঃ!

মসীজীবী হতে হয়েছে বলে তখন গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।

গড়পড়তা বাঙালি হিসেবে, বলতে নেই, গায়ে-গতরে আমি বেশ স্বাস্থ্যবান। দুহাতে ঝুলিয়ে বিশ-তিরিশ কেজি মাল টানতে বলুন, টেনে দিচ্ছি। দশ মাইল পথ একনাগাড়ে হাঁটতে বলুন, এক চোপাটে হেঁটে দেব। রাতের পর রাত জেগে আড্ডায় বসান, সেঁটে যাব। কিন্তু কলমটা যে কেন কিছুতেই চলতে চায় না। লিখতে বসলেই যে কেন রাত দশটাতেও হাইয়ের পর হাই উঠতে থাকে। কেন যে মালটানা কবজি আর আঙুল কলমের স্পর্শে এমন বিবশ হয়ে পড়ে। অলস মাথায় কত চিন্তা ভুড়ভুড়ি কেটে যায়, কলম ধরলেই মাথাটা যে কেন এমন ইঁটের মতো নিরেট হয়ে ওঠে।

লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে হয়, ফিল্টারে জল ফুরিয়েছে, যাই তো একটু জল ভরে দিয়ে আসি! সামনের ঘরে টিভিতে অমিতাভ বচ্চনের মারপিট হচ্ছে নাকি, একটু দেখে আসা যাক তো!

স্কুল-কলেজে পরীক্ষার সময় ঠিক এরকমই হত আমার। সেই বয়ঃসন্ধি, সেই কৈশোর ফিরে এল নাকি?

পরীক্ষাই। পরীক্ষা ছাড়া একে আর কী বলা যায়! সেই টেনশন, সেই ফল বেরুনোর জন্য অধীর অপেক্ষা, মাস্টারমশাই তথা সম্পাদকের প্রতি সেই ভীতির ভাব।

সবচেয়ে বড় কথা, লেখালেখির ব্যাপারে লেখকের কোনও অজুহাতই কেউ বিশ্বাস করে না। এই তো আমাদের জ্যোতিষদার কথাই ধরা যাক। 'দেশ' পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার জ্যোতিষ দাশগুপ্ত এমনিতে আমাকে দারুণ স্নেহ করেন। সারাবছর তাঁর সঙ্গে রোজই আমার কিছুক্ষণ সুখদুঃখের কথা বিনিময় হয়। এবার পুজোর লেখালেখির সময়টায় খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়ে বেশ কয়েকদিন লেখার ফাঁক গেল। অফিসে এলুম

মেডিক্যাল সার্টিফিকেট নিয়ে, কাঁচুমাচু মুখ। বিষক্রিয়ার কথা শুনে জ্যোতিষদা মুখ গম্ভীর করে বললেন, লেখকদের ওরকম অনেক অসুখ হয়, সময়মতো লেখাটা কিন্তু দিতে হবে। আমি হতাশ হয়ে বললুম, আপনি কি ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া খুশি হবেন না? জ্যোতিষদা বিন্দুমাত্র না হেসে গম্ভীরতর মুখ করে বললেন, সেটাও আগে বিশ্বাসযোগ্য হোক।

বঙ্গসাহিত্য ছাড়া আর বিশ্বের কোথাও পুজোসংখ্যাই নেই। মনে হয়, অন্যান্য দেশের লেখকেরা কতই না সুখে আছে। এই যে বর্ষাশেষের বিধৌত প্রকৃতি, ওই যে মলমুক্ত ফিরোজা আকাশ, এই যে আকাশে বাতাসে একটা ছুটির নিমন্ত্রণ অবিরত ঘরের বাইরে যাওয়ার উসকানি দিচ্ছে, তা সবলে ঠেকিয়ে হুমড়ি খেয়ে সাদা কাগজে ছারপোকা ছেড়ে যেতে হচ্ছে--এর কোনও মানে হয়?

যদি কোনও লেখকের স্ত্রী কখনও আক্ষেপ করে বলেন, পরজন্মে যেন লেখকের বউ হতে না হয়, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে কি? অন্য কারও বউ বলে কিনা জানি না, তবে আমাকে ঘরে প্রায়ই কথাটা শুনতে হয়। তাঁর মতে, এই চব্বিশ ঘণ্টার কেরানিটি ঘরে থাকলেও যা, না থাকলেও তাই।

গদ্য লেখা বড় ফিনফিনে কাজও নয়। তার পরিশ্রম আছে, ল্যাঠা আছে। আজকাল অফসেট চালু হওয়ার পর পাতায় অক্ষরসংখ্যা বেড়েছে এবং মাপজোখের খুব কদর হয়েছে। প্রায়ই সম্পাদকীয় হুকুম হয়, এবার কিন্তু পঁয়ষট্টি হাজার শব্দ চাই। তার মানে আপনি একখানা 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি' বা 'মেটামরফসিস' নামিয়ে দিয়ে রেহাই পাবেন না।

উপন্যাস বা ছোটগল্পের ওপর দিয়ে পুজোর ঝড়টা গেলে একরকম রক্ষে হত। আজকাল সুগ্রীব দোসর। মাঝে মাঝেই পুজোর পুল-আউট বেরোয় এবং তাতে ফরমাসি লেখা ভারী লক্ষ্মী ছেলের মতো মুখ বুজে লিখতে হয়। যেমন এই প্রতিবেদনটি। উপন্যাসের তাগাদা ঠেকিয়ে, অনেক কাজ পণ্ড করে তবে এই যে লেখা--এটাও হয়তো কত পাঠক--পাঠিকার চোখই এড়িয়ে যাবে। বা পড়লেও কারও তেমন গাল উঠবে না।

লেখকের নাম, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তিও মধ্যবিত্ত টাইপের। একজন যশস্বী লেখক মানে অমিতাভ বচ্চন বা মিঠুন চক্রবর্তী তো নয়। এমনকী সুনীল গাওস্কর বা কপিলদেবও নয়। আর টাকা? ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা তার পায়ের ওপরে এসে পড়ে না বা তার ঘরে এখানে সেকানে খোঁচা মেরে কালো টাকাও বিশেষ বেরোবার সম্ভাবনা নেই। আর প্রতিপত্তি বা প্রতাপও তার এমন নয় যে, তার অনুরোধে কারও চাকরি হবে, বা পুলিশ কাউকে ছেড়ে দেবে, বা সরকার তার পরামর্শ নেবে।

রোগাভোগা, দুবলা, নিরীহ বাঙালি লেখককে যখনই সমালোচকরা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করতে বসেন, তখন সাক্ষী ডাকেন কামু কাফকা, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয় এবং কাকে নয়? নিক্তির একদিকে জবুথুবু বঙ্গীয় মসীজীবী, অন্যধারে ওইসব রথী-

মহারথী। পাল্লা কোনদিকে ঝুঁকবে, সে তো জানা কথাই। সুতরাং এত্তসব লেখালেখি, নিশিজাগরণ, টেনশনের পর নস্যাৎ হয়ে যেতে তার লাগে তিন সেকেন্ড।

নাঃ, লেখকদের দুঃখের কথা আর বলে লাভ নেই! তার দুঃখে পাথরও না কেঁদে ফেলে!

মায়ের পুজো .মাবাইলে!

ফ্রম হাচ কার, হাচ এক্সক্লুসিভ! এবার কালীঘাটে পুজো দিন ওনলি ফ্রম ইওর হাচ। যাদের মোবাইল ফোন আছে তারা এই বার্তা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন আশা করি। হাই টেক এই পুজোয় শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না, শুধু মোবাইলে আপনার ইচ্ছা প্রেরণ করলেই হবে। রিমোটে মা কালীর পাদপীঠে আপনার পুজোটি নিবেদিত হয়ে যাবে। মোবাইল বাহিত এই পূজোয় জগন্মাতা তুষ্ট হলে সেই সন্তোষের কথা তিনি মোবাইলেই আপনাকে জানাবেন কি না সেটাই প্রশ্ন।

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এবং পাতালেও মোবাইলের অপ্রতিহত আধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন নেই। দুর্বৃত্তের পরম সহায়, ব্যবসায়ীর বন্ধু, করপোরেট কর্তার করপুটের শোভা, প্রেমিকের পিওন, ডাক্তারের ডাক, মোবাইল এখন সর্বভূতেন সংস্থিতা। মিতবাগ ব্যক্তির হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিন, দেখবেন দুদিনেই কেমন বাচাল হয়ে উঠেছেন তিনি। বোবা যে মোবাইল পেলে কথা কয়ে উঠবে। না এমন গ্যারান্টি দেওয়া শক্ত। একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী আমাকে বলেছিল, কলকাতায় তার কোনও বাসস্থান নেই, অফিস নেই, আছে শুধু একটি মোবাইল ফোন, আর একটি মারুতি গাড়ি। এই ক্যাপিটাল নিয়ে তার লাখো লাখো টাকার কারবার। মোবাইলে যেসব অসাধ্য সাধন করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে জগন্মাতার চরণে পুজো পৌঁছে দেওয়া আর এমন কী?

কোনও কোনও ভক্তের মনে হতে পারে, মোবাইলের পুজো মানে নিষ্ঠায় নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ। এ হল বিশ্বাসের নাভিশ্বাস। ভক্তিকে তক্তি বানানো। এ যেন শাস্ত্রকে অপমান করতে ফিদেল কাস্ত্রোকে ডেকে আনা। কিন্তু মুশকিল হল, পুজো মানেই তো রিমোট। কটা লোক আর পূজাপদ্ধতি জানে, অধিকারীই বা কজন? সুতরাং সেই পুরুতমশাই পুজো করেন আর আমরা দক্ষিণা নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়ে বুরবক হয়ে বসে থেকে দেখে যাই, কী একটা কাণ্ডই না হচ্ছে।

কী হচ্ছে সেটা ঠিক বোঝা যায় না বটে, পূজারি বামুন নিজেও যে বোঝেন তা নয়। যদি পুজোর ফল ভালোই হত তাহলে তাবৎ সংসারে পুরুত সম্প্রদায়ের হাল এত খারাপ হত না। যাঁরা আমাদের হয়ে নিত্য দেবতার কাছে দরবার করছেন, যাঁদের মন্ত্রের চোটে শিব-কালী-দুর্গা সব চাল-কলা খেতে হামলে এসে পড়ছেন, যাঁরা দেবতাদের লাইসেন্সধারী এজেন্ট, পূজা-পাঠে তাঁদেরই একচেটিয়া অধিকার। সুতরাং ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সরাসরি যোগাযোগের উপায় দেখা যাচ্ছে না।

আমার এক আত্মীয়া দিদি গ্রহদোষ খণ্ডন করার মানসে একবার কালীঘাটে একটা যজ্ঞ করার নিদান পেয়েছিলেন। বছর বিশেক আগে সেই যজ্ঞের ব্যয় ধার্য হয়েছিল সাত হাজার টাকা। শুনে আমার চোখ চড়ক গাছে। বিশ বছর আগে সাত হাজার টাকার ক্রয়ক্ষমতা ছিল এখনকার অনুমান তিনগুণ বা তারও বেশি। গ্রহদোষ খণ্ডানোর জন্য মরিয়া আমার সেই দিদি তাতে পিছপা হননি। কিন্তু যজ্ঞের দিন আমি তাঁকে যাদবপুর বাজারে ঘোরাঘুরি করতে দেখে একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম, কি গো দিদি, তোমার না আইজ যজ্ঞ হইতাছে। তাহইলে তুমি এইখানে ক্যান?

আমার সেই দিদি চোখ পাকিয়ে বললেন, যজ্ঞ তো করতাছে পুরোইতমশয়, আমার হেইখানে থাকনের কি দরকার? পুরোইত কইছে আপনে টাকাটা ফালাইয়া নিশ্চিন্তে যানগা, যজ্ঞ হইয়া যাইব।

আমি বললাম, যজ্ঞ ঠিকমতো হইতাছে কিনা দেখবা না?

আরে দূর! যজ্ঞের আমি বুঝুম কি ক' দেখি! অংবং মন্ত্র শুনতে শুনতে আমার আবার মাথা ধরে। তার ওপর যজ্ঞের যা ধুয়া, মড়াপোড়া গন্ধ! যজ্ঞ হইতাছে হউক গা, কাম হইলেই হইল।

কাজ হয়েছিল কি না তা অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি। সেই দিদিকে যজ্ঞের আগে যা দেখেছিলাম, যজ্ঞের পরেও তাই দেখছি। যজ্ঞের কুণ্ডের সামনে বসে কাঠের ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে হয়ে বসে থাকলেই যে কাজ হত তাও বলা শক্ত। যত দূর জানি, পূজাস্থলে বহু মানুষের সমাবেশ হত বলেই মুনি-ঋষিরা যজ্ঞের প্রবর্তন করেন। তাতে বহু লোকের সমাবেশজনিত বায়ুদূষণ ঘৃতাহুতির ফল পরিস্রুত হয়ে যেত, বা আয়নায়িত। বিজ্ঞাগেঁড়েরা শুনে নাসিকা কুঞ্চন করবেন হয়তো। তাঁদের তো আবার ধর্মের অ্যালার্জি আছে। ধর্মের বাতাসে তাঁদের বায়ুমোরগ উলটোবাগে ঘুরে যায়।

এখন দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের যেমন বাড়বাড়ন্ত, তেমনি জ্যোতিষীদেরও মচ্ছব পড়ে গেছে। টিভির বিভিন্ন চ্যানেলে তাঁদের আধিপত্য কম নয়। টিভি এখন ধর্ম, বিজ্ঞান, আস্তিক, নাস্তিক, যুক্তিবাদ ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে টেনেহিঁচড়ে এক দেহে লীন করার তালে আছে। ফেংশুই, বাস্তুশাস্ত্র, জ্যোতিষী, যুক্তিবাদ, হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।

বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদীর হিপনোটিক চিকিৎসায় নেমে পড়ছেন বা বিজ্ঞানসম্মত কোষ্ঠীবিচারও করছেন, দেখতে পাই। আবার ফেংশুই, জ্যোতিষী, ধর্মীয় প্রবক্তারা তাঁদের ক্রিয়াকর্মে কম্পিউটার ইত্যাদি ঢুকিয়ে ফেলছেন। বিজ্ঞানে ধর্মে এখন একটা মাখামাখি চলছে। লড়াইও অব্যাহত আছে। হরিদ্বারে এক নগ্ন নাগা সাধুকে প্রবল বিক্রমে মোটরবাইক চালাতে দেখে আমার একটু চমক লেগেছিল বটে, পরে ভেবে দেখেছি মোটরবাইকে চাপলে সাধু ধর্মভ্রষ্ট হবেন এমন কথা তো শাস্ত্রে নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের নানাবিধ অবদান ধর্মের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়ছে।

এক বিখ্যাত দৈনিক কাগজে একজন ঠেলাওয়ালার ফটো ছাপা হয়েছিল। তার চোখে রোদ চশমা, বাঁ কানে মোবাইল, সে দিব্যি ঠেলা টানছে। একজন ঠেলাওয়ালার মাসিক রোজগার কত তার আন্দাজ আমার ছিল না। ছবি দেখে হল।

মোবাইল আগে সমাজের পিরামিডের চুড়োয় ছিল। এখন তা ধাপে ধাপে নামছে। নামতে নামতে অনেকটাই নেমে পড়েছে। বেকার যুবক, মোড়ের পানওয়ালা, স্কুলের ছাত্রছাত্রী ছেড়ে সে এখন আরও নিম্নগামী। দামও কমছে। মার্কিন দেশে নাকি গাড়ির ট্যাঙ্ক ভরতি করে তেল নিলে একখানা মোবাইল উপহার পাওয়া যাচ্ছে। এবার পুজোর বাজারে এই কলকাতাতেই অনেক দোকান নির্দিষ্ট কেনাকাটার সঙ্গে মোবাইল বিতরণ করেছে অকাতরে।

প্রায় সর্বভূতে বিরাজমান, ওমনিপ্রেজেন্ট এই বস্তুটি এখন কালীঘাটে ভিড়-ভীত, ঝঞ্ঝাট-কুণ্ঠ, আয়েস-পিয়াসি, ধর্মমুখী মানুষের পূজা বহন করে নিয়ে যাবে। ভিড়, পকেটমার, জুতাচোর, বলবানের কনুই, কালক্ষেপ, ঘাম, ক্লান্তি, পান্ডাদের দরাদরির হাত থেকে চমৎকার রেহাই। স্বাগত হাইটেক পুজো।

চাহিতে গেলে মরি লাজে

ভক্তরাও বাঁচে, মরে। জরা, ব্যাধি কি তাদের হয় না? হয়, কেন হবে না? তবু তাদের জীবনধারণার সঙ্গে, তাদের বেঁচে থাকার সঙ্গে আমাদের জীবনধারণা বা বেঁচে থাকার ঠিক মিল হয় না। কিন্তু কাছে গেলে ঠিকই টের পাওয়া যায়, ইনি একটু অন্য রকম মানুষ।

কেউ যদি বলেন এটা আঁকাড়া নাস্তিকতার যুগ তা হলে ভুল করবেন, বরং উলটোটাই। মঠে, মন্দিরে, তীর্থে যেখানেই যাবেন দেখবেন ভিড় বাড়ছে। এ দেশে আর্ত আতুরের অভাব নেই। নিরাপত্তার ছত্রচ্ছায়া তাদের জন্য নয়। নূ্যনতমটুকুও তাদের জোটে না। যার কেউ নেই, সে ভগবানকে কোনও না কোনও ভাবে তো খুঁজবেই। ভগবান তাদের কাছে এক বিপত্তারণ সুপারম্যান। ভগবানের নামে লাখো লাখো টাকা কি অকৃপণ হস্তে ঢেলে দিচ্ছে না বিত্তবানেরাও? মধ্যবিত্তরা দ্বিধাগ্রস্ত গোষ্ঠী। তবু তারাও কি ভিড় করে না তিরুপতি, হরিদ্বার, কেদার, বদ্রী, কাশীতে? হরিদ্বার আর ইলাহাবাদের কুম্ভমেলায় সাধুসঙ্গ কিছু কম করিনি। বিশেষ করে ইলাহাবাদের গঙ্গাদ্বীপে সাধুদের সঙ্গেই কাটত সকাল থেকে সন্ধে অবধি। ভক্ত নামে কোনও সহজ ব্রান্ড পাওয়া মুশকিল, ভক্তির সঙ্গে অহংবুদ্ধির চিরকাল আড়াআড়ি। আরও একটা ব্যাপার হল, মুক্তিবাঞ্ছা, গুরু, কাঙাল জানিয়ে পার করো--এই পার্থক্য প্রকৃত ভক্তের নয়। বরং 'মুক্তিবাঞ্ছা কৈবতপ্রধান, যাহা

হইতে হরিভক্তি করে অন্তর্ধান।' সাধুসন্তদের এই মুক্তিবাঞ্ছা বড় তীব্র, বড় একমুখী। কঠোর তপশ্চর্যা, ক্লেশকর নানা পরিক্রমা, কৃচ্ছ্রসাধনের পর কোনও এক অলৌকিক মুক্তির অপেক্ষা কেন ভক্তের হবে? তার নিজের জন্য কিছুই চাওয়ার নেই, এমনকী মুক্তিও না। যেখানে যখন যে কাজে নিযুক্ত করবেন প্রভু, ভক্ত তা-ই করবে। অহংরোগে শয্যাগত মানুষ অবশ্য এ সব বুঝতে চায় না।

মনে আছে কয়েক বছর আগে আশ্রমে যাওয়ার সময় যশিডি স্টেশনে নেমেছি। দু-হাতে দুটো সুটকেস, সঙ্গে পরিবার। ওভারব্রিজে উঠব বলে এগোতে গিয়ে দেখি, পাশে এক বুড়িও চলেছে। কাঁকালে এক মস্ত পোঁটলা। বয়সের ভারেই হোক বা পোঁটলার জন্যই হোক বুড়ি কুঁজে হয়ে হাঁটছে, বাঁ হাতে লাঠির ভর। বললাম, ও বুড়ি মা, কোথায় যাবে?

ঠাকুরবাড়ি যাব বাবা।

দেওঘরে অনেক আশ্রম, অনেক মঠ। তাই জিগ্যেস করলাম, কোন ঠাকুরবাড়ি?

ঠাকুর অনুকূলবাবার বাড়ি যাব বাবা।

বললাম, সে তো ভালো কথা, কিন্তু সঙ্গে কেউ নেই কেন?

আছে বাবা, আছে বইকি। তিনি আছেন। ছেলেরা বর্ধমানের রেল স্টেশনে এসে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গেছে। বরাবর নিজেই আসি।

বয়স কত হল বুড়ি মা?

পঁচাশি পার করেছি বাবা।

ওই মস্ত পোঁটলাটি নিয়ে বুড়ি ঠিক হেঁচড়েমেচড়ে ওভারব্রিজে উঠল। কাজটা সোজা নয়, শুধু হাতে উঠতেই হাঁফ ধরে যাওয়ার কথা। বুড়ির সাহস দেখে ভারী অবাক লাগছে, ভালোও লাগছে। জিগ্যেস করলাম, তা আশ্রম তো অনেক দূর, যাবে কী করে?

বরাবর গিয়ে আসছি বাবা। ঠিক চলে যাব।

আমার জন্য আশ্রম থেকে গাড়ি এসেছে। একটু চাপাচাপি হল বটে তবু বুড়িকে গাড়িতে তুলে নিলাম। সামনের সিটে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল বুড়ি, যেন তেমন কোনও ঘটনাই নয় এটা।

নামবার সময় শুধু বলে গেল, দেখলে তো বাবা, ব্যবস্থা তিনিই করে রাখেন। আজ তুমি, কাল হয়তো অন্য কেউ।

'ভগবান পাপও দেখেন না, পুণ্যও দেখেন না, তিনি দেখেন কে তাঁকে চায়।' কথাটি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের। এ হল টান ভালোবাসার গল্প। আর ভালোবাসার জন্য নিরাকার পরব্রহ্মকে অবলম্বন করতে গেলে মানুষের মন হারিয়ে যাবে। তাই সব ধর্মেই এক কথা : কাম থ্রু মি। ঈশ্বরপুত্র বা খোদার দোস্ত--কাউকে চাই। যিনি ইষ্ট, গুরু, ঈশ্বরপুত্র বা খোদার দোস্ত--কাউকে চাই। যিনি ইষ্ট, গুরু, ঈশ্বরের প্রতীক। ভগবান রামকৃষ্ণদেব

বলেন, গুরুকে মানুষযুগ্যি করতে নেই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরু বাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য অবলম্বন। তাঁর বাক্যরূপ খুঁটি ধরে ঘোরো আর সংসারের কাজ করো।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভিক্ষার ছলে ঘরে ঘরে যেত। আসল লক্ষ ছিল প্রভুর কথা বলা। ভিক্ষুদের ভিক্ষাপাত্র থেকে সংঘটিত হয়েছিল অত বড়, দেশ জোড়া ধর্মবিপ্লব। নালন্দায় তারা পাথরের বালিশে মাথা রেখে পাথরের বিছানায় শয়ন করত। বৃদ্ধ বয়সে অতীশ দীপঙ্কর তুষাররাজ্য পার হয়ে দুর্গম তিব্বতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। টান ভালোবাসা হলে শরীর-বোধ লুপ্ত হয়। আর তখনই 'ভারতী গৌরাঙ্গ লইয়া যায়।'

নিরাকার ব্রহ্মই তাঁর উপাস্য ছিল বটে, কিন্তু হয়তো বা তাঁর এক শরীরী রূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন মহর্ষি। মনে হয় মহর্ষিই ছিলেন তাঁর গুরু। পূজা পর্যায়ের যতেক গান ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়েছে তার পিছনে মহর্ষির আধ্যাত্মিক অবদান বোধহয় কম ছিল না। তাঁর আশ্চর্য মনোভূমি, তাঁর নিজস্ব রূপারোপিত জগৎ গড়ে দিয়েছিল যে সব উপাদান তার মধ্যে ভক্তিই ছিল বলবতী।

'আমি অকৃতী অধম জেনেও তো মোরে কম করে কিছু দাওনি।' এই সাধুবাদ তাঁরই অন্তর থেকে উৎসারিত হতে পারে যিনি শতেক দুর্দশার মধ্যেও জীবনের অন্তর্নিহিত সম্পদরাশির সন্ধান ঠিকই পেয়ে যান। রজনীকান্তর সঙ্গে কি হেলেন কেলারেরও একটু সুদূর মিল? অন্ধ ও বধির যিনি বলতে পারেন, এ জীবন বড় সুন্দর ছিল।

ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা বা প্রেম, সে কি অন্য রকম কিছু? আমাদের গার্হস্থ্যে যেমন আছে তেমন নয়? হ্যাঁ, তেমনই তো। মানুষের ভালোবাসার সঙ্গে এ যুগে মধুপর্কের বাটিতেই এঁটে যায়। আর সেটুকু কৃপণের মতো আত্মজনদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করতেই যায় ফুরিয়ে। তাই আমাদের ভালোবাসার সীমা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে সংসারটুকুর মধ্যে। একটুও উপচে পড়ে না। সেই রাখাল-বালকটি এসে দুটি করতল বাড়িয়ে ধরলে যে বড় মুশকিলে পড়ে যাব আমরা! কিন্তু আত্মজনদের প্রতি ওই ভালোবাসাটুকু যদি ছড়িয়ে এবং সীমানা ছাড়িয়ে যেতে দিই, তা হলে ধীরে ধীরে, ক্রমে সেই ভালোবাসাই সর্বগ্রাসী হয়ে যায়। নইলে মা টেরিজা কি বলতে পারতেন, না, ফুটপাথে পড়ে থাকা কুষ্ঠরোগীকে আমার একটুও ঘেন্না হয় না। ওর মধ্যে যে আমি খ্রিস্টকে দেখতে পাই।

ভেসে যাননি স্বয়ং মহাপ্রভু? যথা যথা দৃষ্টি পড়ে, তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে!

কিন্তু এই দুঃসময়ে ভক্তির কথা কি অরণ্যে রোদন হবে? বোধহয় না। কিছু মানুষ ধর্ম, গুরুবাদ, ঈশ্বরের ওপর খড়্গহস্ত বটে, এবং তারা ছোটখাটো মানুষও তো নয়। কিন্তু ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যেমন বলেছেন, অভাবে পরিশ্রান্ত মনই ধর্ম বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না। আরও বলেছেন, বিশ্বাস সন্দেহ দ্বারা অভিভূত হলে মন যখন তা-ই সমর্থন করে তখনই অবসাদ আসে।

মনঃক্ষয়ের এই যুগে ভক্তি বিশ্বাস দাঁড়ায় কোথায়? আর মানুষের চারদিকে দিগন্তবিস্তারী নিঃসঙ্গতা, পদ্মপত্রে টলটলায়মান তরলের মতো নিরাপত্তা, ভয়, অনুভূতি, মস্তিষ্কে নানা মতবাদের নিরন্তর আক্রমণ, আকুপাঁকু মানুষ প্রাণপণে ভেসে থাকার ভেলাটাকে খোঁজে, এই খোঁজই তাকে এই তরঙ্গাভিঘাতে ভেলাটির কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। একটা সিনেমা দেখেছিলাম। সন্তানহারা এক জননী প্রতিবেশীর সদ্যোজাত ছেলেটি তারই সন্তানের পুনরাগমন--এ রকম স্বপ্ন দেখে সেই ছেলেটাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল। তার বাস্তববাদী স্বামী-স্ত্রীর এই ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে তাকে কঠোর সত্যটি গ্রহণ করতে শেখাল--এই ছিল ছবিটির প্রতিপাদ্য। কিন্তু কোনটি সত্য আর কোনটি সত্য নয় তা-ই বা মীমাংসিত হল কী করে? আর শোক ভুলে বাৎসল্য যদি অন্য অবলম্বন পায় তা কি মিথ্যে? নাকি সত্যের হিরণ্ময়তা তার মধ্যেও নিহিত আছে?

কলকবজায় গ্রিজ বা তেল না দিলে যে ধাতুক্ষয় ঘটবে, কর্কশ না শব্দে কানে লাগবে তালা। তাই কঠোর বস্তুবাদ দিয়ে দুনিয়াটা আজও চলে না। চলে না নাস্তিক্য দিয়েও। নাস্তিক আর আস্তিক একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে। যে বলে নেই, সে-ও জানে না আছে কি না, যে বলে আছে সে-ও জানে না আছে কি নেই।

আর দু-জনেই যদি হয় মহাজ্ঞানী তা হলে দু-জনেই মিলে যাবে এক বিন্দুতে। কারণ, একমাত্র ঈশ্বরের অধিকার আছে নাস্তিক হওয়ার।

এক আদ্যন্ত ভারতীয় লেখক

মেয়েটি রাস্তার কল থেকে জল নিতে আসত। চমৎকার ছিপছিপে লম্বা পঞ্চাদশী কিশোরী। যুবাটি দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ে গেল। তখন, ১৯৩৩-এর সমাজে প্রেম এত জলভাত ছিল না, মেয়েদের সঙ্গে চট করে কথা কওয়া বা মেশাও ছিল না সহজ কাজ। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে। যুবকটি লাজুক, মুখচোরা। হৃদয় উদবেলিত হওয়ার সংবাদ মেয়েটির কাছে কবুল করার উপায় ছিল না তা হাতে। কিন্তু প্রেমে সে তখন সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। সুবিধে ছিল, মেয়েটির বাবা এক স্কুল শিক্ষক এবং বই-পাগল। যুবকটিও পড়ুয়া। সুতরাং মেয়েটির নাগাল পেতে সে তার বাবার সঙ্গেই ভাব করল। একদিন বলেও ফেলল, স্যার আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু চাইলেই তো হবে না। মেয়েটির বাবা রাজি হলেও বাধাও ছিল। দু পক্ষই কট্টর ব্রাহ্মণ, কিন্তু কোষ্ঠীর মিলমিশ হচ্ছিল না। দক্ষিণ ভারতে সেই তিরিশের দশকে বিয়ে কি সহজ ব্যাপার ছিল? কিন্তু ছেলেটির দুর্বার প্রেম সব বাধা টপকে গেল। সুতরাং নাগেশ্বর আয়ারের মেয়ে রাজমের সঙ্গে রসিপুরম কৃষ্ণস্বামী

নারায়ণস্বামীর বিয়ে হয়েও গেল, কোয়েম্বাটুরে, ১৯৩৪ সালের পয়লা জুলাই। পাত্রের বয়স আঠাশ, পাত্রীর ষোলো। রাজম--অর্থাৎ পাত্রী ইঞ্চি দুয়েক লম্বা ছিল নারায়ণস্বামীর চেয়ে। কিন্তু তাতে তাদের প্রেমের জোয়ারে ভেসে যেতে বাধা হয়নি। দাম্পত্য সুখ শতগুণে বাড়িয়ে ১৯৩৬-এ তাঁদের মেয়ে হেমবতীর জন্ম। সব ভালো যার শেষ ভালো। শেষটা ভালো গেল না অবশ্য। ১৯৩৯-এ নারায়ণস্বামীকে এক দুর্ভেদ্য একাকিত্বের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে টাইফয়েড রোগে দেহ ছাড়লেন রাজম। আর সেই শোকে পাগলপারা নারায়ণস্বামী প্রয়াতা স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হন্যে হয়ে উঠলেন। আশ্রয় নিলেন প্রেতচর্চারও। লেখালেখি চুলোয় গেল, মনের সেই বিপর্যস্ত অবস্থায় বেঁচে থাকাই তখন অর্থহীন। তবু ছোট্ট হেমবতীর প্রতি আকর্ষণ আর বোধহয় আত্মশক্তির ওপর আস্থাই ওই ভয়ঙ্কর শোকের অন্ধকার সময়টি পার হতে সাহায্য করেছিল তাঁকে। আর ওই শোকের ও উত্তরণের বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ হয়ে জন্ম দিয়েছিল এক অসামান্য উপন্যাসের, দি ইংলিশ টিচার (১৯৪৫)। গ্রাহাম গ্রিন তাঁর বিশাল নামটি পছন্দ করেননি। বলেছিলেন, সাহেব-মেমরা অত বড় নাম মনে রাখতে পারবে না। একটু কেটেছেঁটে নামটা দাঁড়াল আর কে নারায়ণ। বিদেশের পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থেই নারায়ণস্বামীর নারায়ণ হওয়া। গ্রাহাম গ্রিনের সস্নেহ অভিভাবকত্ব মেনেই নিয়েছিলেন। আর গ্রিন তাঁর জন্য কম করেননি। কারণ গ্রিন মনে করতেন, তাঁর যুগে আর কে নারায়ণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম। তাই ছাপবার আগে আর কে নারায়ণ তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি সটান পাঠিয়ে দিতেন গ্রিনের কাছে, আর গ্রিন তা সযত্নে সংশোধন করে দিতেন, প্রকাশক ঠিক করে দিতেন। প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটবার আগেই তাঁদের মধ্যে এক অদ্ভুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আর দুজনের এই সেতুবন্ধ রচনায় সাহায্য করেছিল নারায়ণের ইংল্যান্ডবাসী বন্ধু কিট্টু পূর্ণ। নারায়ণের পাণ্ডুলিপি নিয়ে সে-ই গ্রাহাম গ্রিনের কাছে যায় এবং পাণ্ডুলিপি পড়েই লেখকের জাত চিনতে পারেন গ্রিন। অথচ রসিপুরম কৃষ্ণস্বামী নারায়ণস্বামীর ইংরিজিকে লেখার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়ার কথাই নয়। পড়াশুনোয় তেমন ভালো ছিলেন না, মনোযোগও ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও কৃতকার্য হননি। চরিত্রে, ব্যবহারে, আচরণে প্রাচীন গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের উত্তরাধিকার বহন করেছেন বরাবর। সকালে গায়ত্রী জপ না করে জলগ্রহণ করেননি কখনও। আর তাঁর লেখার বিষয়ও একান্তই ভারতীয়। মর্মে মর্মে হিন্দু, ধর্মপ্রাণ, রক্ষণশীল এই মানুষটির প্রাচীন মূল্যবোধ কখনও কোনও মতবাদের দ্বারাই টাল খায়নি।

সম্ভবত তাঁর লেখায় হিন্দু ধর্মের প্রবল উপস্থিতি টের পেয়েই একদা তাঁর নিউইয়র্কে অবস্থানকালে প্রখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো তাঁর কাছে এসেছিলেন ধ্যান শিখতে। অপ্রস্তুত নারায়ণ তাঁকে নিরাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখার প্রভাব কতদূর গড়িয়েছে তা টের পেতে তাঁর দেরি হয়নি।

লেখার মাধ্যম ইংরিজি হলেও আর কে নারায়ণের লেখায় ভারতের আত্মাই জাগ্রত ছিল। এ যুগে নানা ভাবধারায় ঘাতপ্রতিঘাত তাঁর ভারতীয়ত্বে, তাঁর ধর্মে, তাঁর বিশ্বাসে আঁচড়াও দিতে পারেনি। এই ব্যক্তিত্বের নিরিখেই তার লেখাগুলির বিচার হয়েছে এবং সেই বিচারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তিনি পেয়েছেন সম্মান ও সমাদর। নোবেল প্রাইজের জন্যও তাঁর নাম বিবেচিত হয়েছিল। তৎকালীন মাদ্রাজে তাঁর জন্ম আজ থেকে চুরানব্বই বছর আগে। ১০ অক্টোবর। ১৯০৬। বাবার শিক্ষকতার সূত্রে তাঁর পুরো পরিবারই চলে গিয়েছিল মহীশূরে। তিনি মানুষ হচ্ছিলেন মাদ্রাজে তাঁর দিদিমার কাছে। লেখাপড়ার আগ্রহ কম ছিল, পড়াশুনোয় তাই কৃতী ছিলেন না। ১৯২২-এ বাবার কর্মস্থল মহীশূরে চলে আসেন আর এইখানেই অঙ্কুরিত হয় তাঁর লেখকসত্তা। আর কে নারায়ণ ঠিক নাগরিক লেখক ছিলেন না। তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসেরই পটভূমি মালগুড়ি নামের একটি কল্পিত আধা-শহর আধা গঞ্জ। এই কল্পনার সূত্রটিও ছিল ভারী অদ্ভুত। তিনি কল্পচক্ষে একদিন, নিতান্ত কিশোর বয়সে, একটি রেল স্টেশনকে দেখতে পান আর তার নামটিও। ওইভাবেই মালগুড়ি নামক স্থান জন্ম নেয়, যার কাছেপিঠেই ছিল অরণ্য এবং মাঠঘাট। মালগুড়ির বিচিত্র সব মানুষ আর ঘটনাই তাঁর বিবিধ রচনার উপজীব্য। সবটাই যে কাল্পনিক, এমন নয়। কল্পনার মালগুড়ি ও মানুষজনকে বাস্তবের চেয়েও বাস্তব ও সত্য করে তোলার জাদুস্পর্শ তাঁর কলমে ছিল। মাত্র পনেরোটি উপন্যাস লিখেছেন তিনি, এবং অনেক ছোট গল্প। প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিও কম লেখেননি।

খানিকটা গ্রাহাম গ্রিনের সহায়তাতেই তাঁর উপন্যাসে 'স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' বিলিতি প্রকাশক পেয়ে যায়। পরে একে একে প্রকাশিত হয় 'দি ব্যাচেলর অফ আর্টস' এবং 'দি ডার্ক রুম'। উপন্যাসগুলি বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল। গ্রাহাম গ্রিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। তাঁর লেখার অনুরাগীদের মধ্যে সমারসেট মম, ই এম ফস্টার, এইচ ই বেটস, প্রমুখ অনেকেই ছিলেন।

তাঁর মহীশূরের জীবনযাত্রা ছিল সাদামাটা এবং সহজ সরল। নারায়ণ আর বিয়ে করেননি, যৌথ পরিবারের সহায়তায় মেয়েকে নিজেই মানুষ করেন। জীবনের শেষ পর্বে মেয়েও মারা যাওয়ায় নারায়ণ আবার শোকাভিভূত হন। আর কে নারায়ণের মনোভূমি তৈরি হয়েছিল নানা উপকরণের মাধ্যমে। ছেলেবেলায় দিদিমার কাছে শোনা নানা গল্প কাহিনি এবং পরে তামিল সাহিত্য, শেকসপিয়রের রচনা এসবই তাঁর ভবিষ্যতের জীবন নির্ধারিত করে দেয়। চাকরি করার চেষ্টা করেও পেরে ওঠেননি। একবার শিক্ষকতা করতে গিয়ে রণে ভঙ্গ দেন, কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন। ১৯৮৫-তে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন। ১৯৬৪-তে পান পদ্মভূষণ। 'গাইড' উপন্যাসের জন্য পান সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। আর পেয়েছেন রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেচারের আর্থার ক্রিস্টোফার বেনসন পুরস্কার। তাঁর লেখায় দার্শনিকতা ছিল, গভীর আত্মনুসন্ধান ছিল, ছিল

মানুষে মানুষে সম্পর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ, আবার প্রবল রসবোধ, হিউমার, মজাও বড় কম ছিল না। সব মিলিয়ে নারায়ণ এক অসামান্য লেখক।

'গাইড' উপন্যাসটি হিন্দিতে সিনেমা হয়েছিল। সেটি প্রভূত জনপ্রিয়তাও লাভ করে। কিন্তু কাহিনির সংবেদনশীলতা ছিল অন্য জায়গায়। সামান্য একজন গাইড—যাকে অবিমিশ্র ভালো লোক বলা যায় না, সেও একটি অসামান্য আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে এক আধ্যাত্মিক উত্তরণের পথ পেয়ে গেল। তার মৃত্যু এক মহান অমৃতেরই বার্তা বহন করে আনে। নারায়ণ এই সামান্যের ভিতর দিয়েই অসামান্যকে ধরার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় জীবনদর্শনের ভিতর যে-মহান জীবনবোধ নিহিত রয়েছে নারায়ণ তা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। 'মালগুড়ি ডেজ' নামক গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে টি ভি সিরিয়ালও। বিচিত্র মানুষ, অদ্ভুত বাতাবরণ এবং মজাদার বা করুণ ঘটনার ভিতর দিয়ে সেই রাজ্যের দরজা খুলে দিলেন নারায়ণ, সেখানে সবাই যে আমাদের চেনা মানুষ তা নয়।

কিন্তু সেই বিচিত্র মানুষের মধ্যে আমরা যেন নিজেদেরও খুঁজে পাই। জীবনের শেষ দিকে মহীশূরের বাস উঠিয়ে নিজের মেয়ে, নাতিনাতনিদের কাছাকাছি থাকবেন বলে তিনি চেন্নাইতে ফিরে আসেন। নাতি-নাতনিরও ছেলেপুলে হয়েছে, এদের সঙ্গ নারায়ণের কাছে অতীব প্রয়োজন ছিল।

হিন্দু-পুরাণাদি নিয়ে তাঁর দুটি রচনা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। একটি 'গডস, ডেমনস অ্যান্ড আদারস' এবং 'মহাভারত'।

আর কে নারায়ণ চমৎকার বীণা বাজাতেন। স্ত্রী রাজমের মৃত্যুর পর যখন তিনি শোকে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন তখন দুটি জিনিস তাঁকে ওই অন্ধকার সময়ে আলো দেখিয়েছিল। এক হচ্ছে সংগীত এবং দুই হচ্ছে তাঁর মেয়ে হেমবতী। লেখালেখি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন তখন। কিন্তু প্রবল আত্মশক্তি এবং জীবনের প্রতি দায়বোধ থেকেই তিনি সেই ভয়ঙ্কর সময় কাটিয়ে উঠেছিলেন।

৯৪ বছর বয়সে রসিপুরম কৃষ্ণস্বামী নারায়ণস্বামী প্রয়াত হলেন। ভারতীয় সাহিত্যে ঠিক তাঁর মতো আর কেউ রইলেন না। ভারতকে এবং ভারতের আত্মাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার যে-প্রয়াস তিনি করেছিলেন তার উত্তরাধিকারও কেউ বহন করবেন কি না কে জানে। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

সৌরভের অবসর নেওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষায় ছিল। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, সৌরভ এখনও হয়তো ২-৩ বছর খেলতে পারেন, কিন্তু নতুন কোনও কৃতিত্বের বা রেকর্ডের অধিকারী হওয়ার মতো সেই ক্ষমতা আর এই বয়সে কারও থাকতে পারে না। সুতরাং আর এই অসম্মানজনক, অনাদরে হতমান একটি খেলোয়াড়-জীবনের অন্তিম লগ্নকে বেশিদূর টেনে নিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। সৌরভ ঠিক কাজই করেছেন। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিকতা অনেকের থাকে না। সৌরভের আছে। কেবল নাম ভাসিয়ে রাখার জন্য পিচ কামড়ে পড়ে থাকার মধ্যে কোনও গৌরব নেই। বেঙ্গালুরুর মাঠে একটি পোস্টার লক্ষ করছি, তাতে লেখা 'Dada never retire from our heart' এই অসাধারণ পোস্টারটির ভেতর দিয়ে যেন আমাদেরও মনোভাব প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

সৌরভ ভারতীয় ক্রিকেটকে যা দিয়েছেন তা তুলনারহিত। ওই গ্ল্যামার, ওই চারিত্রিক দৃঢ়তা, ওই আক্রমণাত্মক মনোভাব আর ক্রিকেটীয় বুদ্ধি তাঁর সমসাময়িক আর কারও নেই। সৌরভের উজ্জ্বল, বিতর্কিত, টগবগে এবং প্রশ্নচিহ্নবহুল কেরিয়ার এতটাই বর্ণময় যে, তাতে অনেকেই ম্লান হয়ে যায়। যখন তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তখন বাঙালির সঙ্গে সমস্ত দেশবাসী ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই দৃঢ়চেতা ক্রিকেটার কিছুতেই হার মানেননি। অন্য কোনও ক্রিকেটার হলে সেই অপমান ও লাঞ্ছনায় পীড়িত হয়ে তখনই বিদায় গ্রহণ করতেন। সেইসময় সৌরভ একেবারেই নৈরাশ্যে আক্রান্ত হননি তা বলব না, কিন্তু তঁবেদারি না, কিন্তু ভালো খেলে, রীতিমতো লড়াই করে নিজের সম্মানের জায়গাটা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এ যেন বনবাস থেকে ফিরে এসে পুনরায় রাজসিংহাসনে বসার মতো চমকপ্রদ কাহিনি।

বস্তুত ক্যাসিয়াস ক্লে-র মতো সে বারবার আবার খেলার মাঠে ফিরেছে। শুধু ফিরে আসা নয়, নতুন করে আবার সবাইকে টেক্কা দেওয়ার মনোভাবও দেখাতে পেরেছে। সৌরভের স্বেচ্ছাবিদায় আমাদের সকলের কাছেই বেদনাদায়ক হবে, কিন্তু ক্রিকেটের মাঠে প্রস্ফুটিত এই কুসুমটির সৌরভ আরও বহুবছর আমাদের স্মরণে, মননে ভেসে আসবে।

রাজাবাবুর প্রত্যাবর্তন

অনেকে বলছেন, প্রত্যাবর্তন কিংবা পুনরাবির্ভাব। আমার 'নবোদয়'ও কি বলা চলে না! হ্যাঁ বটে, এ সেই পুরোনো সৌরভই, তবে নতুন বোতলে। সেই বোতলের গায়ে জ্বলজ্বল করছে নতুন ব্র্যান্ডনেম, শরদ পাওয়ার। এ এক বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের কাহিনি।

আনুগত্য বদলের পুরোনো-নতুন বৃত্তান্ত। বেচারা জগমোহন ডালমিয়া, আইসিসি-র এক কালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ কর্তার কী নিদারুণ দুর্দশা! তিন তিনটে হেডিওয়েট তাঁকে প্রায় মশা-মাছির পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। শরদ পাওয়ার তাকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চেয়েছিলেন 'তফাত যাও', সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় একটু ঘুরিয়ে বললেন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি', তা সৌরভ বাঁচলেন, ভস্ম-অপমান-শয্যায় তাঁর প্রাণ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, আর একটু শারদীয় করুণার বর্ষণে নিশ্চিত গা ঝাড়া দিয়ে উঠেও দাঁড়াবেন। আর তাঁর উত্থান ঘটলে আপামর মনমরা বাঙালিও উঠে দাঁড়াবে।

তাঁর ভাগ্য-বিপর্যয়ে সৌরভ এক বিশ্বাসঘাতককে চিহ্নিত করতে পেরেছেন, যে বা যারা চ্যাপেলের ই-মেল ফাঁস করেছিল। আর সেইটেই নাকি সৌরভের সব দুর্ভাগ্যের মূলে। অবশ্য প্রিয় স্যার গ্রেগ চ্যাপেলও তাঁর পিঠ চাপড়ানোর বদলে হাতটা ঘাড়ে তুলে 'একজিট ডোর' নির্দেশ করেছিলেন বটে, এবং গলাগলি বন্ধু রাহুল দ্রাবিড়ও আর 'দোস্ত দোস্ত না রাহা'। কিন্তু সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে সৌরভ ধরলেন বেঁড়ে ব্যাটাকে ডালমিয়া। ডালমিয়াকে অ্যাটি ক্লকওয়াইজ মোচড় দিতেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সম্ভাব্য দল বাইশ বা পঁচিশ থেকে বেড়ে জাদুমন্ত্রে হয়ে গেল তিরিশ। এবং কে বলতে পারে, সৌরভের জন্য শরদ পাওয়ার তিরিশকে পঞ্চাশ করতেও রাজি ছিলেন কিনা। কারণ ডালমিয়া নামক মশাটা এখনও মরেনি। একটি জম্পেশ থাপ্পড়ে যার কবেই লোপাট হওয়ার কথা সেই চালাক মশাটা এখনও বনবন করে ঘুরছে, মাঝে মাঝেই এসে বসছে নাকের ডগায়, কানের লতিতে। ওই আবার জেঁকে বসেছে সি এবি-র মসনদে। তবে হ্যাঁ, বেশিদিন নয়, বাংলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী অশুভ শক্তির বিনাশ ঘোষণা করেছেন। অতএব--

অতএব সৌরভের প্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন। গ্রেগ চ্যাপেলের ই-মেলকে কেটে দিয়েছে দাদা স্নেহাশিসকে বিলেত থেকে পাঠানো তাঁর ই-মেল, সুতরাং, ফিরে এসো চাকা।

কিন্তু চ্যাপেল, দ্রাবিড় বা ডালমিয়া নয়, সৌরভের সঙ্গে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে বিশ্বস্ত আর সবচেয়ে পুরোনো এক বন্ধু। এই বন্ধুটি তাঁর বিপদের দিনে নিজের চওড়া বুক দিয়ে আটকেছে শতেক আক্রমণ লাঞ্ছনা আর বিপর্যয়, এই বন্ধু সমালোচকদের বিরুদ্ধে সময়মতো মুখর হয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়েছে। একটা সময় নিঃসঙ্গ সৌরভকে সে-ই দিয়েছে হিরণ্ময় সাহচর্য, ব্যর্থতায় সান্ত্বনা, বিপদের মুখে সাহস। এই বন্ধুটি হল তার ব্যাট। আজ কার অভিশাপে অধীত বিদ্যা ভুলে যাচ্ছে তার ব্যাট, পেলব কবজির মোচড়ে মসৃণ রেশমের মতো কভার ড্রাইভ কেন হয়ে গেল 'তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা?' আজ সেই ব্যাট কি লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার?

ব্যাটকে নিয়ে একটাই মুশকিল। ব্যাট ব্যাটা না বোঝে রাজনীতি, না বোঝে ডালমিয়া-শরদ পাওয়ার-বুদ্ধদেব, না বোঝে চ্যাপেল-দ্রাবিড়। সে শুধু চায়, আমাকে তোমার সবটুকু দাও। নিংড়ে দাও নিজেকে। তোমার মনঃসংযোগ, তোমার ধ্যান, তোমার সবটুকু দম।

ওস্তাদ গায়কেরা যে ভোররাতে উঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেওয়াজ করেন, সে কি এমনি? নিজের সবটুকু, সত্তার সবটুকু সুরে ঢেলে দিতেই তো!

এবার ধান ভানতে একটু শিবের গীত। অপছন্দের লোককে দল থেকে ছেঁটে ফেলতে চ্যাপেল সাহেবের কিছু চেনা ছক আছে। কখনও উনি বেনুগোপাল রাওয়ের মধ্যে ব্র্যাডম্যানের ছায়া দেখতে পান, নাদুসনুদুস ভুঁড়িয়াল রমেশ পাওয়ারের মধ্যে মুরলীধরন বা শেন ওয়ার্নের সম্ভাবনা, কখনও বা ইরফান পাঠানকে অল রাউন্ডার বানাতে গিয়ে শেষ করে দেন তাঁর বোলিংকে। এই নড়বড়ে টিমকে তিনি অম্লান বদনে সম্ভাব্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের ছাপ্পা মেরে এবং রাহুল দ্রাবিড়কে যোগ্যতম ক্যাপটেনের শিরোপা দিয়ে ইতিমধ্যে একটি অন্তর-কোঁদলের ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। তিনি মস্ত ক্রিকেটার ছিলেন, অগাধ ক্রিকেটিয় পাণ্ডিত্য, তবু কোচ হিসেবে অস্ট্রেলিয়াতে কল্কে পাননি। তারা একটু আগে বুঝেছে, আমরা একটু দেরিতে বুঝব। তবে এই চ্যাপেলের জমানায় দলে ফিরেও সৌরভের শয্যা কন্টকী অপরিহার্য। তাই বলি, বাইরের আপসকাজিয়া যা চলছে চলুক, সৌরভ বরং একদিন বসুক তার ব্যাটের সঙ্গে, নিরালায় নিভৃতে, পুরোনো বন্ধুত্ব আবার ঝালিয়ে নিক, দুজনের মধ্যে হোক একটা সুদৃঢ় সমঝোতা।

সৌরভ ব্যাট হাতে মাঠে নামলে, কমেন্ট্রি বক্সে রবি শাস্ত্রী 'রসগুল্লে' বলে টিটকিরি দিতেন, কিছু টীকাটিপ্পনি অতিশয় ভদ্রলোক গাওস্করও করতে ছাড়েননি, আজাহার ছিলেন বিরূপ, বিষেণ সিংহ বেদি খড়গহস্ত। এসবের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল সৌরভের ব্যাটের কানে। আর তখনও সৌরভের ব্যাট বোলারদের ঝাঁঝ উড়িয়ে দিয়ে বল গগনপথে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দিত। রবি শাস্ত্রী কথা গিলেছিলেন, গাওস্কর অস্ট্রেলিয় সফরে বলেছিলেন একমাত্র সৌরভই যা ধারাবাহিক ভালো খেলেছে, আর কেউ নয়। বিষেণ সিংহ বেদি হার না মানলেও সতর্ক হয়ে গেলেন। আজাহার তাঁর একটি মূল্যবান হাতঘড়ি পরিয়ে দিয়েছিল সৌরভের হাতে।

তাঁর হয়ে এখনও লড়তে রাজি ওই একজন। তাঁর ব্যাট। সৌরভের আর কোনও বন্ধু নেই, দাদা নেই, গডফাদার নেই, এটা এই ৩৫-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি যদি সত্যিই হৃদয়ঙ্গম করেন তাহলে ২০০৭-এর বিশ্বকাপে খেলার যে-স্বপ্ন তিনি দীর্ঘকাল লালন করছেন তা অধরা নাও থাকতে পারে।

ক্রিকেটের কুড়ি কুড়ি

বেশ তো এই কুড়ি-কুড়ি ম্যাচ! কিছুমাত্র ব্রাত্য নয় এই ক্রিকেট-বটিকা। কুড়কুড়ে, মুচমুচে এই কু-কুড়িকে আমার তো বেশ পছন্দই হল। ছিপছিপে, তন্বী, মেদহীন এই তরুণীর আবির্ভাব ক্রিকেটের গর্ভগৃহে কোনও বিপদ-সংকেত পাঠাল কিনা তা এখনও ভালো বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে এই নবযৌবনা তার গমনপথে যথেষ্ট হিল্লোল তুলেছে, কৌতহূলী ও সাগ্রহ দৃষ্টিক্ষেপ লেহন করছে তাকে এবং তার দর ও কদর দুইই বাড়ছে চড়চড় করে। ঊন-উনিশ থেকে মধ্য-তিরিশ কোনও খেলুড়েই তাকে উপেক্ষা করছে না, ছোঁড়া-বুড়ো সবাই তার মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণপাত করছে। নাক সিঁটকোনোর কোনও ব্যাপার চোখে পড়ছে না।

হ্যাঁ বটে, টেস্ট ক্রিকেটের জাত আলাদা। তা সেই গেরামভারী কুলীন বুড়ো বামুনও থাক না, তাকে না চটালেই হল। তার চটবার অবশ্য তেমন জুতসই কারণও নেই, কেননা পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটও তারই সাহসিনী আত্মজা, আর এই তন্বী কুড়ি-কুড়ি তার আধুনিকা নাতনি বই তো নয়! চেহারার মিল তো আছেই, ডি এনএ-ও অভিন্ন। তবে এরা দু-জন একটু উচ্ছল--এই যা। তা যুগের হাওয়ায় জেনারেশন গ্যাপ তো ঘটেই। তবে বুড়ো টেস্ট ক্রিকেটের কতিপয় জাতপাত সচেতন মোসাহেব আর গাঁওবুড়ো আছে। তারা চোখ চেপে, কান বন্ধ করে ছিছিক্কার তুলছে, ছ্যাঃ ছ্যাঃ, এ কী ক্রিকেট! এ যে ক্রিকেটকে বাজারি মেয়েছেলে করে তুলল গা!

তা ওরকম কেউ কেউ বলছে বটে, আবার লুকিয়ে দেখছেও। কিছুদিন চেপে বসে থাকুন, দেখবেন এরাও কু-কুড়ি নিয়ে দিব্যি মেতে উঠেছে। এরকমই হয়। যখন প্রথম টেরিলিন বেরোল, চারদিকে কী ছিছিক্কার! ক-দিনের মধ্যেই সকলের গায়ে টেরিলিন সেঁটে গেল। এই যে নাইটি জিনিসটা ধরুন, বছর পনেরো আগে নাইটিকারও পরনে দেখলে মা মাসিদের চোখ কপালে উঠত। এখন তাদেরই নাইটি ছাড়া চলে না।

সারাদিনের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে সাজগোজ করে, দরকার হলে একটু আগে-ভাগে ডিনার সেরে দিব্যি বন্ধু বা বান্ধবী বা বউ-বাচ্চা নিয়ে মাঠে হাজির হওয়া যায়। কাজ বা ছুটি নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। রাত আটটা থেকে বড়জোর এগারোটা-সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ফুরফুরে মেজাজে খেলা দেখে সুখী বা দুঃখিত হৃদয়ে বাড়ি ফিরতে কোনও তেমন ঝামেলা নেই। তবে হ্যাঁ দর্শকদের নিরাপত্তার জন্য হেলমেট থাকা ভালো। আই পি এল-এর মাত্র আটটা ম্যাচেই শতাধিক ছক্কা হয়ে গেছে। দু-চার জনের মাথা ফেটেছেও। কুড়ি-কুড়ি মানেই মুষল পর্ব, সেটা না ভোলাই ভালো।

অনেকের ধারণা কুড়ি-কুড়ি মানেই আনতাবড়ি মার, তাড়ু হাঁকড়ানো। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আস্কিং রেট যেখানে চোদ্দো-পনেরো বা তারও বেশি সেখানে তাড়ু হাঁকড়াতে গিয়ে আত্মবিসর্জন দিলে কেউ শহিদের সম্মান দেবে না। সুতরাং নূতনতর প্রকরণ আনো, ভাবো, মাথা খাটাও। আর সেই ইমপ্রোভাইজেশনেই এমন সব মার দেখা যাচ্ছে যা

ক্রিকেটশাস্ত্রে অজ্ঞাত ছিল। একটু লাফানো বল উইকেটকিপারের মাথার ওপর দিয়ে চামচে করে তুলে দেওয়া বা অফ স্টাম্পের বাইরের বল স্টেপ আউট করে ব্যাট মাটিতে প্রায় পেতে দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে সেটি টেরছা টানে ফাইন লেগ দিয়ে গলিয়ে দেওয়া এসব তো আছেই। তার সঙ্গে যুত হয়েছে তড়িদায়িত ফিল্ডিং। প্রায় সব কটা খেলুড়ে কী সাংঘাতিক শরীরী সক্ষমতায় যে চোখা চোখা শট আটকাচ্ছে তা, না দেখলে বিশ্বাস্য মনে হত না। এমনকী হেডেন, ওয়ার্ন বা গিলির মতো তথাকথিত বুড়োরাও। এই কুড়ি-কুড়ি যেন বুড়ো-বাচ্চা সব খেলুড়েকেই কুড়ি বছর বয়সে বেঁধে ফেলেছে। ছোট-বড় বোঝাই যাচ্ছে না।

বছরটাক আগেও কুড়ি-কুড়ি খেলাটার প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না কারও। কিন্তু যখন দেখা গেল, কুড়ি ওভারে দুশো-আড়াইশো রান টপকে যাচ্ছে এক একটা দল তখনই বিস্ময় এল। ব্যাপারখানা কী? ওভারে দশ-পনেরো রান। আর গোটা দেশে আরও বিস্ময়ের ঢেউ তুলে প্রথম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কুড়ি-কুড়ি বিশ্বকাপ যখন তুলে আনল ভারত তখন সবাই নড়েচড়ে বসল। ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে তো!

বেচারা আই সি এল! তারাই কিন্তু মাথা থেকে ব্যাপারটা বের করেছিল প্রথম। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগে তারা দেশ-বিদেশের খেলুড়েদের বিস্তর টাকায় কিনে এনে লিগের খেলা শুরু করেছিল। উদ্দীপনাও কম ছিল না। কিন্তু বি সি সি আই যে তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে অধিকতর ব্যবসায়িক বুদ্ধি খাটিয়ে অবিশ্বাস্য টাকা ছড়িয়ে এবং প্রায় নিখুঁত মার্কেটিং কৌশলে আই পি এল-এর প্যাকেজ হাজির করবে তা কে জানত! ফলে বেচারা আই সি এল হয়ে গেল ম্যাড়ম্যাড়ে গুরুত্বহীন। তবু ভারতে যে তারাই এই ব্যাপারে পথিকৃৎ তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কুড়ি-কুড়ি এসে ক্রিকেটের জাত বা ভাত কোনওটাই মারবে বলে মনে হয় না। বরং ক্রিকেট যে আসলে বিনোদন সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। যেমন বিনোদন ফুটবল কিংবা টেনিস, যেমন বিনোদন অলিম্পিকস। ক্রীড়া এবং বিনোদনকে এখন আলাদা করা মুশকিল। ক্রমেই দুটো বড় কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। মানুষের হাতে সময় এখন বড় অল্প। ছাত্র থেকে রোজগেড়ে সবাই এখন সময়াভাবে ভুগছে। ক্রিকেট যে এত অল্প সময়ে এতটা বিনোদনে ভরিয়ে দিতে পারে, সেটা আবিষ্কার করে সবাই বেজায় খুশি। আবার কুড়ি-কুড়িতে টাকার ওড়াউড়ি দেখে আল্হাদও হয়, দুঃখও হয়। দুঃখ হয়, এদেশে ফুটবল, হকি, শুটিং বা তিরন্দাজি এখনও বড্ড গরিব। কাবাডি প্রায় অপাঙক্তেয়। মানুষ হামলে পড়ছে ক্রিকেটে। কী আর করা! ডালা-কুলো নিয়ে কুড়ি-কুড়িকে বরণ করে নেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

ক্রিকেট অক্রিকেট

ঘোড়া সম্পর্কে আপনাদের কীরকম অভিজ্ঞতা তা জানি না। আমার অভিজ্ঞতা কিছু বিচিত্র। ময়মনসিংহে আমাদের বারবাড়িতে ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া চরে বেড়াত। আমরা কয়েকজন ডানপিটে বদমাশ সেইসব ঘোড়ার মুখে দড়ি পরিয়ে চড়তাম। সেসব ঘোড়া অবশ্য দৌড়ঝাঁপ করতে পছন্দ করত না, আমরা পিঠে বসে থাকলেও তারা নিরুপদ্রবে ঘাসই খেত, কখনও-সখনও নিতান্ত প্রহার ও তাড়নায় ছুটত। ঘোড়া সম্পর্কে আমার সেই অভিজ্ঞতার পুনর্নবীকরণ হয়েছিল দার্জিলিঙে। পাহাড়ি রাস্তায় একবার ঘোড়াওয়ালার হাত ছাড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে উঠেছিলাম অনেক ওপরে।

ঘোড়া সম্পর্কে আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতাটি ঘটেছিল ইডেনে এক শীতের কুয়াশামাখা ভোরবেলায়। ভারত অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের সস্তা টিকিটের লাইনে। লাইনে গোটা দুই বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে একটি মাউন্টেড পুলিশ লাইন সংযত রাখতে ঘোড়া চালিয়ে এসে ঠিক আমার গা ঘেঁষে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে দিল। ওই বিশাল ঘোড়া গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর এমন অস্বস্তি হচ্ছিল যে বলার নয়। সামান্য ঠেলা দিলেই চাপাচাপি ভিড়ের লাইন থেকে আমি ছিটকে পড়ে যাব। তা ছাড়া ঘোড়ারা চাঁট মেরে থাকে। কামড়ে দেয়। আশ্চর্য এই, সেই উচ্চশিক্ষিত ঘোড়াটি ঠিক পাথরের মূর্তির মতো আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, একটুও নড়ল না। প্রায় কুড়ি মিনিট আমি তার আশ্চর্য সৌজন্যবোধ অবলোকন করে আজ অবধি কৃতজ্ঞতা বোধ করি। সেই ঘোড়া লাইন সামাল দিয়েছিল, অনধিকারীদের লাইনে ঢুকতে দেয়নি এবং আমরা টিকিট পেয়ে ইডেনে ঢুকতে পেরেছিলাম।

ক্রিকেট মানেই হচ্ছে খানিকটা আবেগ, খানিক বাড়াবাড়ি, কিছু কাব্য, কিছু অতিশয়োক্তি। সব ঠিক, তবু ক্রিকেটে নীচতার স্থান খুব কম। এই খেলার রীতি-নীতি এবং বুনটের মধ্যেই এমন একটা ব্যাপার আছে যা যেন কোনও নীচতাকে প্রশ্রয় দিতে চায় না। ইংরেজদের উন্নাসিকতা ক্রিকেটকে এটুকু অন্তত দিয়েছে। ক্রিকেট যে তথাকথিত ছোটলোকদের খেলা নয় এটা অভিজাত ইংরেজ বহুকাল ধরেই জগৎবাসীকে বুঝিয়ে এসেছে।

তবু নিতান্তই গা-গতরের সামর্থ্যের জন্য অন্ত্যজ খনিশ্রমিক বা অভিজাত পরিবারে কেউ কেউ সুযোগ পেয়েছে বটে, কিন্তু দলের মধ্যে তারা বরাবরই থেকে গেছে 'অচ্ছুত'। প্রখ্যাত ক্রিকেট-লেখক নেভিল কার্ডাসের আবেগাতিশয্যে সিক্ত লেখাগুলিতে ক্রিকেট খেলাটাই প্রায় মহাকাব্যের স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে। কত ছোটখাটো তুচ্ছ ক্রিকেটিয় ঘটনাকে তিনি কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাখ্যায় কত বড় করে তুলেছেন।

যাই হোক, আমরা ক্রিকেটের এই আভিজাত্য বা আতিশয্যকে ততটা টের পাই না, আমাদের বোধ ও কল্পনার ততদূর পরিশীলন নেই। ক্রিকেট আমাদের কাছে একটা খেলাই। এবং ইডেনের সেই সমতলে ক্রিকেটের লাইনে দাঁড়িয়ে একটা কথা অবশ্যই মনে হয়েছে যে, ফুটবলের মাঠে ঢুকতে তত পয়সা লাগে না যত লাগে টেস্ট ক্রিকেটের মাঠে ঢুকতে।

তখন ইডেনের স্টেডিয়াম হয়নি, শুধু রঞ্জি স্টেডিয়ামের একটা ব্লক তৈরি হয়েছিল। বাদবাকি কাঠের গ্যালারি। ওই অসম্পূর্ণতার কুদর্শন দৃষ্টান্ত দীর্ঘকাল আমাদের আর্থিক অসামর্থ্য ও অযোগ্যতার প্রতীক ছিল।

ভারত অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া দলে ইয়ান মেফিক বল করেন তখন। দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার হিসেবে খুব নামডাক। যখনকার কথা বলছি তখন 'চাকার' শব্দটা আমার জানাই ছিল না। আর রঞ্জি স্টেডিয়ামের দূরত্ব থেকে বোলিং অ্যাকশন বিচার করাও ছিল দুরূহ। আমরা সূক্ষ্ম বোধের ক্রিকেট দেখতে তো যাইনি, বিশেষজ্ঞের যোগ্যতাও নেই। বিদেশ থেকে সাহেবরা খেলতে এসেছে, নামকরা সব খেলোয়াড়, সেই বাবদে দেখতে যাওয়া। ঝালমুড়ি, বাদাম, পাঁউরুটি কলার সঙ্গে ক্রিকেট। ঢাকনাহীন রঞ্জি স্টেডিয়ামে দুপুরের রোদে গনগনে গরম। সোয়েটার খুলে ফেলেও ঘামছি। মাঠে ঢিমে-তালে খেলা চলছে, টেস্ট ক্রিকেট যেরকম হয় আর কি!

ঠিক দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়েই ঘটনাটা ঘটল। একটা মোটা-সোটা থলথলে চেহারার চশমা-চোখে যুবক হঠাৎ কোথা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করতে লাগল, ইয়ান মেফিক ইজ এ চাকার। এ চাকার। অ্যাবসোলিউট চাকার। ইন নেক্সট ইয়ারস ইংল্যান্ড ট্যুর ইয়ান মেফিক উইল নো হোয়াট হি বোলস।

ছেলেটি কত বড় ক্রিকেট-বোদ্ধা তা তখন বুঝিনি। বরং তার ওই নাটুকে চ্যাঁচামেচিতে বিরক্তিই বোধ করেছিলাম। কিন্তু পরের ইংলিশ ট্যুরে যখন ইংরেজ আম্পায়াররা মেফিকের বল একের পর এক নো ডেকে তাকে বসিয়ে দিল, পত্রপত্রিকায় যখন মেফিকের বল করা নিয়ে ঝড় উঠল এবং নিজের দেশ অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাও যখন নির্দ্বিধায় বলতে লাগলেন! ও একটা চাকার। তখন ইডেনের সেই ছোকরার ক্রিকেট জ্ঞান সম্পর্কে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হল। তার কারণ ইয়ান মেফিক যে ছুঁড়ে বল দেয় সে সম্পর্কে আমাদের পত্রপত্রিকায় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা কিছুই বলেননি তখন। বরং মেফিকের প্রশংসায় তাঁরা পঞ্চমুখই ছিলেন। শুধু ওই ছোকরাটি ব্যতিক্রম, সে নির্ভুলভাবে বলে দিয়েছিল কবে মেফিক বুঝতে পারবে সে কেমনধারা বল দেয়।

ক্রিকেটে হরেক রকমের রেকর্ড হয়, জয়সিমাও একটা রেকর্ড করেছিলেন পাঁচ দিনের টেস্টে প্রতিদিনই কিছু না-কিছু সময় ব্যাট করে। এ রকম অদ্ভুত রেকর্ড বোধ হয় আর কারও নেই। তবে সে যাই হোক, ধৈর্যশীল জয়সীমা সেই টেস্টে ভরাডুবির হাত থেকে

ভারতকে বাঁচিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই টেস্টে আমি প্রথম দেখি রামনাথ কেনিকে, কেনি অত্যন্ত রোগা মানুষ ছিলেন, ক্রিকেটের ব্যাটখানা বহন করতেও যেন তার কষ্ট হত, তার ওপর প্যাড, গ্লাভস, অ্যাবডোমেন গার্ড। ভাগ্য ভালো যে, তখন হেলমেট চালু হয়নি। রামনাথ কেনির দুর্বল শরীরের জন্য ব্যাটে তেমন তলোয়ার খেলা ছিল না। কিন্তু কেনি ব্যাট করতেন নির্ভুল ক্যালকুলেশনে। ইডেনে তাঁর করা পঞ্চাশটি রান আজও আমার চোখে ছবি হয়ে সেঁটে আছে। ফ্লিক, কাট, গ্লান্স এই ছিল তাঁর সম্বল। বিশাল ড্রাইভ বা হুক মারার তেমন ক্ষমতাই হয়তো ছিল না। তাঁকে বলা হত ক্রিকেটের অধ্যাপক। দলের কেউ ব্যাটিং নিয়ে সমস্যায় পড়লে রামনাথ কেনির শরণাপন্ন হত। কেনির মতো ক্রিকেটের কার্যকরী জ্ঞান নাকি বিরল।

ভারত পাকিস্তান টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে। সম্ভবত কানপুরে। জয়সীমা দারুণ ব্যাট করছিলেন। বেতার ভাষ্যকার ভিজির ভূয়সী প্রশংসা শুনতে পাচ্ছি, জয় মিনস ভিকটরি, সীমা মিনস লায়ন। জয়সীমা দি লায়ন হার্টেড জাস্ট এ রান বিহাইন্ড হিজ সেভেন টেস্ট সেঞ্চুরি...

ঠিক এই সময়ে নিরানব্বইয়ের নার্ভাসনেসে জয়সীমা অফ বা অন-এর দিকে বল ঠেলেই একটা রান নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রানটা ছিল না। ফলে রান আউট।

বিরক্ত ভিজি রেডিয়োতেই বলে ফেললেন, জয়সীমা দি গোট। অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, ভারতবর্ষের আছেটা কী বলুন তো! একটা রবীন্দ্রনাথ, একটা সত্যজিৎ রায়, আর দুটো স্পিনার।

দুটো স্পিনার ছাড়া একটা সময়ে বাস্তবিক ভারতীয় টিমে কহতব্য কিছুই ছিল না। মার্চেন্ট, হাজারে, অমরনাথ এইসব নাম ইতিহাসে ঢুকে হয়তো বিশাল মর্যাদা অর্জন করেছে, কিন্তু তৎকালে ভারতের টেস্ট খেলার রেকর্ড যা বলে তা এক কথায় যাচ্ছেতাই।

গোলাম আমেদের অধিনায়কত্বে যে ভারতীয় টিম অ্যালেকজান্ডারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের মুখোমুখি হল তা যেন ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার। হান্ট, সোবার্স, কানহাই, বুচার এবং সর্বোপরি দুই আগুনে ফার্স্ট বোলার হল আর গিলক্রিস্টের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর মতো খেলোয়াড়ই ছিল না ভারতীয় টিমে। ফাস্ট বোলারের অভাবে উমরিগড় আর কে যেন নামকোবাস্তে নতুন বলে বল শুরু করতেন। চার-পাঁচ ওভার পরেই ডাকাতে হত স্পিনারদের। সুভাষ গুপ্তে আর গোলাম আমেদ। তারপর সারাদিন শুধুই স্পিন বোলিং--যা বেশির ভাগ সময়েই কার্যকর হত না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই টিমের সঙ্গে কলকাতা টেস্টে ভারত টসে হারে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাট নেয়। হোল্ট আর হান্ট আউট হয়েছিলেন কম রানেই। কিন্তু তার পর মাঠে নামলেন রোহন কানহাই আর বেসিল বুচার। ভারতীয় বোলিং এবং ফিল্ডিংকে যে কতখানি অবমাননা করা যায় তাই দেখালেন দুজন। সারাদিন ধরে যে পিটুনি চলল তা একতরফা

এবং প্রায় ছেলেখেলা। দুটো সেঞ্চুরি হল প্রথম দিনেই। পরদিন সোবার্স নেমে আরও একটা করলেন। রান ছয় শো ছাড়িয়ে গেল।

ভারতীয় নড়বড়ে ব্যাটিং যখন হল গিলক্রিস্টের সামনে পড়ল তখন যেন বাঘের মুখে ছাগলছানা, দুদিক থেকে ঝড়ের গতিতে আসা বল ভারতীয় দলে সামাল-সামাল রব তুলে দিল। ইনিংসে হারটা বড় কথা নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের আজন্ম দৈন্যদশা আরও একবার প্রকট হল মাত্র। দুঃখের কিছু ছিল না, তার কারণ টেস্ট ক্রিকেটে একমাত্র ড্র করা ছাড়া ভারত আর বিশেষ কিছু তখন অবধি করে উঠতে পারেনি। ড্রটাকেই আমরা জয়ের কাছাকাছি ভাবতাম।

শেষ টেস্ট ছিল দিল্লিতে, সেই পঞ্চম টেস্টে ভারতীয় নির্বাচকরা দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন রামকান্ত দেশাইকে দলে নিয়ে।

দেশাই আজও আমার কাছে বিস্ময়, ছোটখাটো এবং শীর্ণকায় দেশাই ফাস্ট বোলারের আকৃতিটুকুরও অধিকারী নন। ওইটুকু চেহারা একটা লোক জোরে বল করে এটা ভাবাই কঠিন। কিন্তু হল আর গিলক্রিস্টের তীব্র গতির বল এবং বাম্পার যখন চারটি টেস্ট এবং বিভিন্ন জোনাল খেলায় আমাদের ক্রিকেট-দৈন্যকে ভয়ঙ্করভাবে প্রকট করে দিচ্ছে ঠিক সেই সময়ে শেষ টেস্টে দেশাই প্রথম ভারতীয়—অনেককালের খরা কাটিয়ে--প্রকৃত ফাস্ট না হলেও মোটামুটি সম্মানজনক গতিতে বলই শুধু করলেন না, বেশ কয়েকটা বাম্পারও দিলেন। সেই বাম্পার হুক করতে গিয়ে কে যেন আউটও হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই হল—গিলক্রিস্টের যোগ্য জবাব দেশাই নন। কিন্তু দেশাই ভারতীয় ক্রিকেটে তৎকালীন নতুন মাত্রা। সেই টেস্টেই বোরদে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করে দ্বিতীয়টাতেও প্রায় করে ফেলেছিলেন। অল্পের জন্য পারেননি। টেস্ট ড্র। তবু আনন্দের সীমা নেই আমাদের। কারণ তখন যে আমাদের কাছে ড্র-ই জয়ের মতো। ড্র-এর বেশি তখন আমরা কিছুই প্রত্যাশা করি না।

গত তিন দশকে ভারতীয় দলে একজনও প্রকৃত দ্রুত বোলার নেই। কপিল বা প্রভাকর, শ্রীনাথ বা প্রসাদ, অনতিপূর্বের চেতন শর্মা বা আর কেউ প্রকৃত অর্থে ওয়াসিম আক্রম বা ইমরানের মতো নন। অথচ প্রায় একই মাটিতে এঁদের জন্ম। শুধু ভারতেই যে কেন ফাস্ট বোলার জন্মায় না এটা আজও বুঝে উঠতে পারা গেল না। সত্য বটে, ফাস্টের চেয়েও অনেক সময়ে মিডিয়াম ফাস্টই বেশি কার্যকর হয়, তবু কেন ফাস্ট বোলার ভারতে দেখাই গেল না সেই প্রশ্ন মুলতুবি রাখতে আমি নারাজ। ভারত ছাড়া আর সব দেশেই কিন্তু প্রকৃত ফাস্ট বোলার সবসময়েই এক-দুজন আছেই।

শোনা যায় বিশ্বে আবার স্পিনারদের দিন ফিরে আসছে। আসতে পারে। কিন্তু স্পিনারদের জন্য পিচ একটু সহায়ক থাকলে ভালো। ভারতীয়রা আঙুল দিয়ে স্পিন করায় কবজি দিয়ে ততটা নয়। মরা উইকেটে তাদের অসুবিধে হয়। সহায়ক পিচে স্পিন যে

কত বড় সংহারক তার প্রমাণ ছিল কানপুর টেস্টে ভারতের হাতে অস্ট্রেলিয়ার হার। সেই টেস্টের নায়ক জেসু প্যাটেল কী কাণ্ড করেছিল তা আমরা আজ জানি। বিদেশি একটি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ভারতের সেই প্রথম জয় এমনই আত্মহারা করেছিল আমাদের যে ভারত সরকার জাতীয় ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা করেন এবং প্যাটেলকে দেওয়া হয় পদ্মশ্রী। আমাদের আবেগের বাড়াবাড়ি চিরকালের তবে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সেই তো প্রথম জয়।

কিন্তু কানপুরের জেসু প্যাটেল আর কোনওদিনই তেমন কিছু করতে পারলেন না কেন? এমনকী এর পর আর বিশেষ সুযোগও বেশি দিন পাননি। সহায়ক উইকেট পেয়েছিলেন বলেই না মাত্র একটা টেস্ট খেলেই তিনি পদ্মশ্রী।

স্পিনারদের ওই এক বিপদ। মরা পিচে তাদের প্রভৃত ঠ্যাঙানি খেতে হয়, বিশেষ করে যদি ভিভ রিচার্ডস বা সোবার্সের মতো ব্যাটসম্যান থাকে উলটো দিকে।

কথাটা হল, ভারতীয় ক্রিকেট দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা কাটিয়ে উঠল কানপুর, টেস্টে, ঘুর্ণি পিচে। অস্ট্রেলিয়া হারল বটে কিন্তু হারটা সহজভাবে নিল না। পিচ ট্যাম্পার করা হয়েছে গোছের সন্দেহ প্রকাশ করল। সন্দেহটা হয়তো তেমন অমূলকও ছিল না। তবু দীনহীন ভারতবাসীর সেটা ছিল অবিশ্বাস্য আনন্দের দিন। বোমা-পটকা বিস্তর ফেটেছিল কলকাতায়।

তবু ভারতীয় ক্রিকেট সাবালক হয়ে ওঠেনি। সাবালক আদৌ কখনও হবে কি না যখন সংশয় দেখা দিয়েছিল তখনই মহারাষ্ট্রের একটি বেঁটেখাটো চেহারার নিরীহদর্শন কিশোর অলক্ষ্যে ঢুকল ভারতীয় দলে। তেমন কোনও হইহই ছিল না তাকে নিয়ে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে সেই কিশোরটি গোটা দুনিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেটকে নাবালকত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে এসেছিলেন সানি গাভাসকার।

দেখা যায়, বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের অধিকাংশই বেঁটে। ব্রাডম্যান, হ্যামন্ড, নীল হার্ভে, হানিফমহম্মদ, মুস্তাক, বিশ্বনাথ। আরও আছে, সবসময়ে মনে পড়ে না সকলের কথা, কিন্তু কেন সেরা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এই সামান্য লক্ষণ দেখা যায় সেটা গবেষণার বিষয়। মনে হয় ছোটখাটো চেহারা হওয়ার ফলে তাদের ছোট জায়গায় নড়তে-চড়তে বা শরীরে মোচড় দিতে সুবিধে হয় আর সুবিধে হয় উঁচু বল খেলতে বা ছাড়তে। যা হোক কিছু একটা হবে।

পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে যে ভারতীয় টিম ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিল তাদের দুরবস্থার কথা অনেকের হয়তো স্মরণে আছে। স্ট্যাথাম এবং ট্রুম্যানের বলের সামনে পড়ে কেউ কেউ ক্রিজ ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন। ভয়াবহ ছিলেন ট্রুম্যান, আর নিখুঁত ছিলেন স্ট্যাথাম। স্ট্যাথাম কতটা নিখুঁত তার প্রমাণ তিনি পর পর চারজনকে স্ট্যাম্পড আউট করেছিলেন। ফাস্ট বলের সামনে জুজু দেখে ভয় পাওয়া ব্যাটসম্যানদের আমরা চিনি।

আবহমানকাল তাদেরই আমরা দেখে আসছি। তবু ব্যাটিং-এর দৈন্য হয়তো ততটা ছিল না, বোলিং ছিল পাতে দেওয়ার অযোগ্য।

সানি গাভাসকারই বলতে গেলে প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের সহায়ক পিচেও ফাস্ট বোলারদের খেলতে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন। সোবার্সের মতো খেলোয়াড়ও যাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন লহমায়। ভারতীয় ক্রিকেটকে ভস্ম-অপমান-শয্যা থেকে টেনে তুলেছিলেন সানি। বোলিং-এর দৈন্যদশা ঘোচাতে হরিয়ানা থেকে উঠে এসেছিলেন কঠোর যুবক কপিলদেব। ভারতীয় ক্রিকেট হয়তো বা সে-ই জাতে উঠল।

আজহারের অভিষেক দেখেছিলেন ইডেনে, আকাশবাণীর হয়ে খেলা দেখতে গিয়ে। সেই অসহনীয় ডিফেনসিভ খেলা দেখে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, ইডেনে হেলান দিয়ে ক্রিকেট ঘুমায় ওই। গাভাসকারের অধিনায়কত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল কলকাতা। কলকাতাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সেবার ভারতের অধিনায়ক ক্রিকেটকে অসহনীয় বিরক্তির পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন। অত সতর্কতার দরকার ছিল না। ইংল্যান্ডের টিম তেমন শক্তিশালী ছিল না সেবারে।

বাল্যকালবিধি আমরা ডিউজ বলে এবং আসল ব্যাটে ক্রিকেট খেলেছি মফসসলে। সূক্ষ্ম টেকনিক শেখানোর মতো লোক ছিল না, ছিল শুধু প্রাণের তাড়না। প্যাড ছাড়াই খেলতে হত, চোট ছিল নিত্যসঙ্গী। হাঁটু, কনুই, মাথায় অজস্র আঘাত সত্বেও ক্রিকেটের স্বাদ ছড়িয়ে থাকত খোলা মাঠে, শীতের রোদ্দুরে, নীল আকাশে। আমাদের সঙ্গেই যেন খেলতে নামত উত্তরের হাওয়া, মথিত ঘাসের গন্ধ, অবারিত দিগন্ত।

যখন কুচবিহারে পড়তে গেলাম তখন ক্রিকেটের কিছু কোচিং জুটেছিল বরাতে। জেনকিনস স্কুলের ছেলেদের খেলা শেখাতেন ক্যাবলা দত্ত। ক্যাবলা দত্ত রঞ্জি ট্রফিতে বাংলা দলে খেলেছেন একসময়ে, বিখ্যাত লোক চমৎকার কোচ। সম্ভবত কুচবিহারের ক্রিকেটপ্রেমী রাজা জগদ্দীপেন্দ্রই তাকে কুচবিহারে নিয়ে গিয়ে চাকরিতে বহাল করেন। ক্যাবলা দত্তের কোচিং পেয়ে কুচবিহারে বেশ কয়েকজন ভালো ক্রিকেটার তৈরি হয়েছিল, আমি পড়তাম মিশনারি স্কুলে। ক্রিকেটের তালিম নিতুম অরুণ সান্যালের কাছে। ক্যাবলা দত্তর মতো না হলেও অরুণদাও ভালো কোচ। ক্রিকেটের ব্যাকরণ তাঁর কম জানা ছিল না। বলতে গেলে সেই প্রথম কিছু টেকনিক শেখায়। কিন্তু মফসসল এমনই এক জায়গা যেখানে শেখার একটা সীমা আছে। কিছুদূর পর্যন্ত ওঠা যায়, তারপর আর কিছু হতে চায় না। ক্যাবলা দত্ত একজন অতিশয় ঝানু খেলোয়াড় হওয়া সত্বেও রাজ্য বা রাষ্ট্রস্তরের ক্রিকেটার তৈরি করার সাধ্য তাঁর ছিল না। তার কারণ সাজসরঞ্জাম, ভালো বোলার, ভালো পিচ এবং প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের অভাবে সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। জেনকিনস স্কুলের মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে শীতের দুপুরে দেখতাম ক্যাবলা দত্ত কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ছেলেদের ক্যাচ প্র্যাকটিস করাচ্ছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, নিজে বল করে ব্যাট করাচ্ছেন। বল

করার কায়দা শেখাচ্ছেন। কিন্তু মনে হত, ক্যাবলা দত্ত এক অভ্যাসের শিকার মাত্র। তিনিও জানেন এই দূর মফসসলে কিছুই তেমন হওয়ার নয়। প্রতিভা হয়তো আছে, কিন্তু অনুশীলন ও বৃহত্তর ক্ষেত্রের অভাবে কিছুই শেষ অবধি ফলন্ত হয়ে ওঠে না।

মফসসল থেকে তৈরি হয়ে কেউ আসে না। তবে অনেকে এসে কলকাতার ক্লাবে তৈরি হয় বটে, সংখ্যায় তারা খুব কম। কিন্তু ওই মফসসলের মাঠে প্রান্তরে যে আনন্দ ছড়িয়ে আছে ক্রিকেটকে নিয়ে তারই বা তুলনা কোথায়? খেলার যে আনন্দ তা কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে হারিয়ে যায়। খেলার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই নিয়ে আসে উদবিগ, দুশ্চিন্তা, ভয়। মফসসলে বড় খেলোয়াড় তৈরি না হোক, সেখানে মাঠে ময়দানে সত্যিকারের আনন্দময় ক্রিকেট খেলা হয়। সেঞ্চুরি হয় না, রেকর্ড হয় না, ক্যাচ পড়ে, ফিল্ডিং-এ গলতি হয়, সব ঠিক। কিন্তু সেই ক্রিকেট জীবনকে ভালোবাসতেই তো শেখায়।

আমার বাবার বয়স এখন অষ্টআশি। পঞ্চাশ ছাড়িয়েও তিনি ক্রিকেট খেলেছেন, মধ্য চল্লিশেও খেলেছেন টেনিস। টি ভিতে খেলা দেখেন বসে বসে। কিংবা কলেজের মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে দেখেন এখনকার তরুণ ছেলেদের ক্রিকেট। খেলা তাঁকে দিয়েছে একটি শৃঙ্খলার বোধ এবং সৌজন্য। খেলোয়াড়োচিত মনোভাব মানেই হচ্ছে সৌজন্য ও উদারতার মেলবন্ধন।

ডেনিস কম্পটন মার্চেন্টের আত্মরক্ষামূলক একটা স্ট্রোকে গড়ানো বলকে লাথি মেরে স্ট্যাম্প ভেঙে দিয়েছিলেন এবং ফলে ক্রিজে ফিরবার আগেই মার্চেন্ট রান আউট হয়ে যান। ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করেছিল ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র। ভদ্রলোক ইংরেজরা ছি ছি করেছিল। অনুরূপ সম্প্রতি কপিল এরকমভাবে একজনকে আউট করায় তাঁরও কম নিন্দে হয়নি। খেলার জগতে এখন যে পুরোপুরি পেশাদারিত্ব চালু হয়ে গেছে তাতে এসব সৌজন্যবোধ কতদিন মর্যাদা পাবে সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। ক্রিকেট এখন টাকা দেয় এবং টাকার পরিমাণটা বড় কমও নয়। দেখা যাচ্ছে আগেকার মতো বাবু চেহারার খেলোয়াড়রা আর নেই। আদ্যন্ত অ্যাথলেটিক, ছমছমে চেহারা, চোস্ত রিফ্লেক্স এবং গতি ও সক্ষমতায় চূড়ান্ত দক্ষ সব মানুষদেরই দেখা যাচ্ছে ক্রিকেট মাঠে। শ্রীলঙ্কার আবহাওয়ার দোষে মেদবাহুল্য এড়াতে না-পারা খেলোয়াড়রাও যে গতিতে ছুটছে এবং যে তৎপরাতায় বল ধরছে তা অবিশ্বাস্য।

ক্রিকেটের বিপুল পরিবর্তন এসেছে ওয়ান-ডের প্রভাবে। ওয়ান ডে-ই আগামী দিনের ক্রিকেট। সে যতই অপছন্দ করুক, ক্রিকেট প্রেমীরা যতই নাক সিঁটকোক, ওয়ান ডে-কে কিছুতে গৌণ রাখা যাবে না। আর এই ওয়ান ডে ম্যাচই খেলোয়াড়দের মধ্যে এনেছে পেশাদার মনোভাব, এসেছে আবেগহীন ক্যালকুলেশন, এনেছে শরীর ও মনের চমৎকার সমন্বয়। খেলাই পেশা, খেলাই জীবন, খেলা থেকে ভাত-কাপড়-গাড়ি-বাড়ি, খেলা থেকেই

খ্যাতি। শরীর-মন-রত-রস নিংড়ে না দিয়ে উপায় কি! সর্বদাই থাকতে হয় কর্মের তুঙ্গে নইলে কে এসে সরিয়ে দিয়ে দলে ঢুকে যাবে তার ঠিক কি?

এই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতাই নেভিল কার্ডাসের আমলের আবেগ ও বাড়াবাড়িকে তাড়িয়ে দিয়েছে কুলোর বাতাসে। ক্রিকেট এখন শক্ত জমির ওপর দাঁড়ানো কমার্শিয়াল, হয়তো ক্রিকেট নিয়ে আর কাব্য লেখা হবে না, গল্পও নয়, ক্রিকেট-সাহিত্যেরও দিন গেল।

ভূতের ভিসা

এঁরা কেউই বোধহয় ভূতে বিশ্বাস করতেন না। এখন করেন। আর ভূত দেখতে যেতে হল নিউজিল্যান্ড অবধি। সে ভূত এমনই সাংঘাতিক যে এইসব বাঘা বাঘা খেলুড়েকে কখনও ব্যাট টেনে ধরে, কখনও বল টেনে রাখে। পা নড়ে তো ব্যাট নড়তে চায় না, ব্যাট নড়ে তো পা থাকে আটকে। কখনও বা সোজা বল ভূতের কারসাজিতে ফাঁক পেয়ে যায় বা তেরছা লাফায়। সে এক অশৈলী কাণ্ড। আমাদের ক্রিকেটের ভালো ছেলেদের সে কী নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা!

নিউজিল্যান্ডের সেই সভ্যভব্য নিরীহ পাটা পিচগুলো গেল কোথায় বলুন তো? সেই জায়গায় কোন বেয়াদব এইসব অসভ্য, বর্বর, গোঁত-খাওয়া ছিটেগুলির মতো তেড়ে আসা, ব্যাঙের মতো লাফ মারা পিচ ভেঙে দিয়ে গেছে। আর গাল টিপলে যাঁদের দুধ বেরোত সেইসব টাফি, বন্ড, অ্যাডামস বা হিচককেরই বা রাতারাতি দাঁত-নখ বেরোয় কি করে? বেড়ালের গলায় বাঘের গর্জন!

মুশকিল হল, ভূতের কোনও পাসপোর্ট ভিসার বালাই নেই। প্লেনের টিকিটও লাগে না। সুতরাং তারা যদি নিউজিল্যান্ডেই আটকে না থেকে একটু দক্ষিণ আফ্রিকাতেও রগড় করে আসতে চায় তাহলে সাদাভূতের পালা তো এখনই শেষ হচ্ছে না। তাদের হাড়-হিম-করা হাসির হিঃ হিঃ শব্দ যে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও শোনা যাবে!

আমাদের কানুদাদা শ্মশানের ধারের বটতলা পেরোনোর সময় তারস্বরে চেঁচাতেন 'ভয় পাই নাই রে! ভয় পাই নাই রে!' চরম ভয়ের সময় ওই ছিল তাঁর মন্ত্র। আমাদের কাপ্তেন তাই কি বুক চিতিয়ে বলেছেন, আমাদের এই দলই দেখবেন বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে যাবে। বাঃ বেশ কথা, খুবই আল্হাদের কথা। কিন্তু কাপ্তেন সাহেব, স্বপ্নেই যদি পোলাও খাবেন তাহলে ঘি ঢালতে এত কার্পণ্য কেন? এক ধাপ উঠে ফাইনাল বললেই তো হত! না কি ভূতের ভয়ে বলছেন না?

যে-ভারতীয় দল বিশ্বকাপ জিতেছিল তাতে কুল্লে ক্রিকেটার ছিল তিনজন। সুনীল গাওসকর, কপিলদেব আর মহিন্দর অমরনাথ। ফাইনালে প্রায় ল্যাজেগোবরে হয়েও জিতেছিল। মানছি কাপ্তেন সাহেব, আপনার দলে ম্যাচ-জেতানো খেলুড়ের সংখ্যা কম করেও ছ-জন। হাঁটুর কাঁপুনি থামিয়ে আড়েহাতে লাগলে 'এক কপ অওর' যে বরাতে নেই, এমন কথা বলছি না। কিন্তু কাপ্তেন সাহেব, সচিন, শেওবাগ, জাহিরকে নিয়ে আপনার আল্হাদ বন্ধ করুন।

দয়া করে মনে রাখুন, আপনার ব্যাটটি ফের প্রহার-প্রবণ না-হয়ে উঠলে ভূতের হাসি মজুত আছে। ক্রিকেট মোটেই এগারোজনের খেলা নয়, কাপ্তেন সাহেব। এ দু-চারজনের খেলা, বাকিরা দোহার। আর ওই দু-চারজনের একজন কিন্তু আপনি।

দৃষ্টিকোণ

হাতি : একটা হাতি আর আমি পাশাপাশি ছিলাম। ফাঁকা পিচের রাস্তা বহুদূর পর্যন্ত ধূ ধূ করছে। দুপুরের মেঘহীন নীল আকাশ থেকে সুস্পষ্ট রোদ এসে পড়েছে চারদিকে। রাস্তার পাশে শস্যহীন শস্যক্ষেত্র। ধুলো উড়ছে উত্তুরে বাতাসে। আমি হাঁটছি, পাশে পাশে হাতিটাও।

হাতির পিঠে অশ্বত্থের পাহাড়প্রমাণ ডালপালা খড় দিয়ে বাঁধা। চলার ভারে ডালপালায় সাপুস সুপুস শব্দ হচ্ছে। হাতির পায়ের নীচে মাংসের যদি পিচরাস্তায় দুজোড়া পায়ের ঘষটানির শব্দ উঠছে সাপ-সুপ সাপ-সুপ। হাতির ঘাড়ের কাছে রগচটা চেহারার মাহুত বসা, তার মুখে রসকষ নেই।

চারটি চলমান স্তম্ভের ওপর দোতলা প্রাণীটি চলে যাচ্ছে, আমার মনুষ্যোচিত দুটি পায়ে শত জোরে হেঁটেও তাল রাখতে পারছি না। হাঁটায় হাতিকে হারানো খুব শক্ত ব্যাপার। কিন্তু আমার বেগ চেপেছিল, দেখি কত জোরে মানুষ হাঁটতে পারে আর হাতিরই বা বেগ কত।

কিন্তু হাতির সঙ্গে কবে আমি এঁটে উঠতে পেরেছি? চিরকালই হাতির কাছে আর হাতিদের কাছে আমার পরাজয় নিরঙ্কুশ।

ছেলেবেলা থেকেই খুব ইচ্ছে হাতি পুষব। পোষা হাতি আর আমি পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বেড়াতে বেরোব বিকেলে। কোনও নদীর ধারে বা ফাঁকা মাঠে বসে দার্শনিক চিন্তা করব দুজনে। আমার লেখাপড়ার ঘরে যখন তখন হাতিটা চলে আসবে। বসে থাকবে আমার পাশে চুপটি করে। নিঃশব্দ ও গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে দুজনের মধ্যে। কখনও সে

তার অজগরের মতো শুঁড় বাড়িয়ে টেবিল থেকে পেন বা পেনসিল তুলে নিয়ে দেখবে একটু কৌতূহলভরে, দু-একবার বইয়ের পাতাও ওলটাবে। না, এসব তার প্রয়োজনীয় জিনিস নয়। সে রেখে দেবে সেসব যথাস্থানে আবার।

কিন্তু হাতি পোষার সেই সাধ আমার কোনওদিনই পূর্ণ হল না। হাতি বড় কাজের লোক। তার অবসর বিনোদনের বা বন্ধুত্বের সময় নেই। সে বোঝা টানে, সার্কাসে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, নইলে চিড়িয়াখানায় সওয়ারি বয়। বরাবরই দেখেছি ওই অত বড় প্রাণীটার নিজস্ব কোনও গন্তব্য নেই, সাধ আহ্লাদ নেই, নিজের বলতে কোনও সময়ও নেই হাতে। জনগণ যা চায় তাকে তাই করে যেতে হয় অবিরল। তার বড় কাজ। মরে গেলেও তার দাম লাখ টাকা।

একবার এক বায়ুগ্রস্ত সাহেব আমাকে বলেছিল—আহাম্মক মানুষেরা গাড়ি কেনে কেন বলো তো। কিনতে হলে কিনবে হাতি। হাতির মতো সুন্দর আর কি আছে?

শুনে আমি গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম—হাতিকে যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী আমি নই।

সাহেব বলেছিল—ওঃ তাহলে তুমি পশু ক্লেশ নিবারণী সভার সদস্য।

—না আমি ঠিক তাও নই। তবে কিনা আমি চাই মানুষ হাতির সঙ্গে ঠিক তেমন ব্যবহার করুক যেমন ব্যবহার হাতির প্রাপ্য।

সে যাই হোক আমি যে হাতিটার কথা বলছিলাম তার প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। এলাহাবাদের মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে আমরা দুজন পাশাপাশি হাঁটছি। আমি আর হাতি। ডালপালায় শব্দ হচ্ছে ঝাপুস ঝুপুস, পায়ের তলায় শব্দ হচ্ছে সাপ-সুপ।

আমি হাঁটছি আর ঈর্ষাকাতর চোখে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছি হাতির দিকে। দোতলার মতো বিশাল চারটি চলমান স্তম্ভের ওপর হেঁটে যাচ্ছে। আমার শত চেষ্টাকে নস্যাৎ করে অনায়াসে অবহেলায় আমাকে চলার বেগে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

কোনও হাতিকেই আমি কাছাকাছি পাইনি, কোনও হাতিই হয়নি আমার বন্ধু। বরাবর হাতিরা আমার আওতার বাইরে। অথচ হাতি যে আমি কী ভীষণ ভালোবাসি।

হাতিটা এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থামল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল। দেখি তার শুঁড়ে ভর দিয়ে মাহুত নেমে পাশের নাবালে নেমে গেল। বোধহয় প্রাকৃতিক ডাকে।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাতির কাছে দাঁড়াই। একা একটা হাতিকে এই বলতে গেলে প্রথম পেলাম আমি। কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। বলি—তোমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু হাতি সে কথা শুনলই না। কান লটর পটর করল, শুঁড় দোলাল, শরীর দোলাল। বড় হওয়ার আনন্দে সে মশগুল। আমার ছোট মুখের ছোট কথা তার কানে যাবে কেন?

তবু আমি তার গায়ে হাত বোলাতে থাকি আমার নিজস্ব ভালোবাসা বশে। হাতির ভালোবাসা না-ই বা পেলাম।

দুর্ঘটনাটা খুবই আকস্মিকভাবে ঘটল। আমি কিছুই জানতাম না। হাতিটার পিছনের ডান পায়ের নখের ঠিক ওপরে একটা মস্ত ডাঁশকে বসে থাকতে দেখে আমি হাতিটার প্রতি মায়াবশে সেটাকে খুঁটে ফেলে দিতে গেলাম। খুঁটতেই হঠাৎ একটা আলগা আঁচিলের মতো সেটা আমার হাতে উঠে এল। হাতের তেলোয় নিয়ে দেখি সেটা একটা ছিপি-বাচ্চাদের ফুঁ দিয়ে ফোলানো যে খেলনা পাওয়া যায় তার হাওয়া আটকানোর জন্য এরকম ছিপি দেওয়া থাকে।

ওদিকে প্রবল শব্দে হাতিটার হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। চেয়ে দেখি, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওই বিশাল হাতি রোগা হয়ে দুলদুল করছে চামড়া, মোটা মোটা স্তম্ভের মতো পা শুকিয়ে বাঁশের মতো হয়ে আসছে। বোঝার ভারে হাতি চ্যাপটা হয়ে আসছে।

বিস্ময়ে আমি হতভম্ব।

আস্তে আস্তে হাতিটার সব হাওয়া বেরিয়ে গেল আমার চোখের সামনে। সেটা একটা মস্ত বড় রবারের চ্যাপটা বেলুনের মতো পড়ে রইল রাস্তায়। অশ্বত্থের ডালপালায় বাতাস এসে লাগছে। আর আমি তখন বুঝতে পেরে গেছি, হাতি বলে আসলে কিছু নেই। মানুষই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তৈরি করেছে হাতি নামে এক বিশাল বস্তু। কিন্তু ক-জন তা জানে?

এটা পড়ে কারও এটাকে রূপক বলে মনে হতে পারে। আসলে তা নয়, হাতি নিয়ে একটা লেখা লিখবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। মনে হচ্ছে সে ইচ্ছেটা এতদিনে পূর্ণ হল।

লাথি : ক-দিন আগে একটা বই পড়ছিলাম—ইন বিটউইন দ্য কিকস।

বাংলা করলে দাঁড়ায় লাথিসমূহের মধ্যবর্তী মুহূর্তগুলিতে। কিংবা লাথির মাঝে মাঝে। কিংবা অন্য কিছুও হতে পারে। পাঠকরা একটু ভেবে দেখবেন।

সকলেই জানেন লাথির নানা প্রকার আছে। যেমন ফুটবলে, কুকুরের পেটে বা মানুষের পৃষ্ঠদেশে—এই তিন জায়গায় লাথি মারার ধরন ও প্রকৃতি আলাদা। বইটির প্রথম পরিচ্ছেদে লাথির এইসব প্রকারভেদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। খালি পায়ে লাথি বুট পরে লাথি, ছুঁচোলো জুতোয় লাথি। প্রায় বিশ রকম লাথির সংজ্ঞা।

পরের পরিচ্ছেদে লাথি থেকে আত্মরক্ষা করার উপায়। এতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে লাথি খাওয়ার সময়ে সর্বদা মুখমণ্ডল, বক্ষদেশ পেট, তলপেট ও অন্যান্য অতি অনুভূতিশীল অঙ্গগুলিকে আবৃত রাখতে হবে। বলা আছে লাথি যখন আসবে তখন শরীরের সম্মুখবর্তী অংশের মাথা থেকে তলপেটের তলা অবধি কোথাও যেন আঘাত না লাগে। এর জন্য নিয়ম হল দুই হাতের তেলোয় মুখ ঢেকে হাঁটু মুড়ে তার মধ্যে মুখ গুঁজে

বসা যাতে ওইসব অতি অনুভূতিশীল জায়গাগুলি ঢাকা পড়ে যায়। শরীরের অন্যান্য জায়গায় লাথি লাগলেও তা তেমন মারাত্মক প্রাণহানিকর হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি বিতর্ক তোলা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন লাথি থেকে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে লাথি চালানো। ইংরিজিতে যাকে বলে কিক ব্যাক। কিন্তু এই কিক ব্যাক নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন উলটে লাথি মারলে লাভ হয় না, বরং লাথির মাত্রা বেড়ে যায়। অনেকের মতে, লাথিই লাথির মহৌষধ। তবে একটা ব্যাপারে পণ্ডিতেরা একমত, লাথি জিনিসটা এখনও পৃথিবীতে কয়েকটি দেশে বহুল প্রচলিত। সহজে এটা বন্ধ হওয়ার নয়।

পরের পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, লাথি খেতে খেতে মানুষের যেসব অনুভূতি হয় তার কথা। বলা হয়েছে, লাথি যতই জোরালো হোক প্রথম কয়েকটা লাথিই মাত্র মারাত্মক। পরের দিকে ডিমিনিশিং ইউটিলিটির বা ক্রমহ্রাসমান উপযোগবিধি অনুসারে আঘাতের অনুভূতি কমে যেতে থাকে। এমনকী তখন লাথিগুলিকে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হতে থাকে। সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার হল, ক্রমান্বয়ে লাথি চললেও লাথিগুলির মধ্যবর্তী যে সামান্য মুহূর্তগুলি থাকে সেইসব মুহূর্তে মানুষ কিছু কিছু নিজস্ব চিন্তা করে নিতে পারে। অনেকে তখন ঘুমিয়েও পড়ে এবং এমনকী কেউ কেউ সেসময়ে খুব তাড়াতাড়িতে দু-একটা স্বপ্নও চটপট দেখে ফেলে।

সুতরাং লাথিকে ভয় পাওয়ার মানেই হয় না। একটু কৌশল এবং একটু সহ্যশক্তি থাকলে লাথি খেতে খেতেও সংসারের নানা কাজ সেরে নেওয়া যায়। ইচ্ছে করলে জ্ঞানলাভ করা যায়, জীবনকে উপভোগ করাও সম্ভব।

গত কয়েক বছর ধরে এই গ্রন্থখানি আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও দূরপ্রাচ্যে প্রচণ্ড বিক্রি হচ্ছে। সাধারণ মানুষরা খেয়ে না খেয়ে কিনছে বইটা। যাকে বেস্ট সেলার বলা যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এরকম গ্রন্থ আদৌ লেখা হয়েছে কিনা। এর উত্তরে বলা যায়--লেখা হলে বড় ভালো হত।

একালের পরিবারে সেকালের বাবা-মা

আমার এক প্রবীণ বন্ধু একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতেন। এক ছুটির দিনে সকালের দিকে পাশের ফ্ল্যাটের ছোট্ট পরিবারটি বেড়াতে বেরোচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী, দুটি ছোট ছেলেমেয়ে। খুব

সাজগোজ করেছে তারা, বাচ্চাদুটোর শরীরে আর মুখে সাগ্রহ এক আনন্দ। সেই ভদ্রলোক বাচ্চা ছেলেটিকে ডেকে জিগ্যেস করলেন--কোথায় যাচ্ছ বাবু। ছেলেটি সোৎসাহে বলল--ঠাকুমার বাড়িতে যাচ্ছি, মানিকতলায়। কথাটা শুনে ভদ্রলোক বড় থমকে গিয়েছিলেন। ঠাকুমার বাড়ি! বাচ্চারা আজকাল ঠাকুমার বাড়ি যায় নাকি ঠাকুমা বা দাদুর বাড়ি যে একটা ভিন্ন বাড়ি, তাঁদের বাড়িতে যে ছুটির দিনে সকালে বেড়াতে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসতে হয়। এ তো জানা ছিল না তাঁদের আমলে!

তিরিশ বছর আগেও ঠাকুমা-দাদুর বাড়িই ছিল নাতির নিজস্ব বাড়ি। আজকাল অত নিশ্চিত করে তা বলা যায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনবরত যে মৃদু থেকে মৃদু কম্পন হচ্ছে তারই প্রভাবে হাজার হাজার বছর ধরে অল্পে অল্পে পৃথিবীর উপরিভাগের ভূগোল যাচ্ছে পালটে, অস্ট্রেলিয়া সরে গেছে দূরে, আফ্রিকা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তেমনি সমাজের গভীরে জাত এক কম্পন মানুষের সমাজেও আনছে পরিবর্তন, পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করছে, দূরে সরিয়ে নিচ্ছে মানুষকে। এখন আর খটকা লাগে না যদি শুনি, মা বাবা যদি থাকেন যাদবপুরে তো ছেলে আর ছেলের বউ থাকে তারাতলার হাউসিংয়ে। এবং সে ক্ষেত্রে নাতিনাতনিরা ছুটির দিনে দাদু-ঠাকুমার কাছে বেড়াতে যাবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির এক তরুণ অধ্যাপক গিয়েছিলেন আমেরিকায়, বাহাত্তর সালে ফিরে আসেন। তিন-চার দিন আগে তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমেরিকায় মিশিগানে থাকতেন, আর তখন শখ করে আমেরিকার জীবন দেখতে ঘুরে বেড়াতেন। এক প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সি অবিবাহিত মার্কিন বন্ধু ছিল তাঁর। সেই বন্ধুর সঙ্গে এক হোমে বন্ধুর বৃদ্ধা মার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যেতেন। বুড়ি একে দেখে ভীষণ খুশি, হাসিটা আর সারাক্ষণ মুখ থেকে তাড়াতে পারেন না। তিনি প্রায়ই জিগ্যেস করতেন--তোমাদের করতে কি হয়? আমি শুনেছি, সেখানে তোমরা বুড়ো মা বাবাকে ভীষণ সম্মানের সঙ্গে নিজেদের কাছে রাখো! তোমার পরিবারের কথা বলো আমাকে। তরুণ অধ্যাপকটি যথাসাধ্য নিজের বাড়ির বর্ণনা দিতেন, কীভাবে সকাল থেকে মা তাঁর নাতি-নাতনিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, বাবা যদিও অবসরপ্রাপ্ত তবু সকাল থেকে পছন্দমতো বাজার, রান্নার পরামর্শ, ছেলেদের প্রতি উপদেশ ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটিয়ে দেন। মিশিগানের সেই মার্কিন বৃদ্ধার চোখ এই গল্প শুনে চকচক করত, এক স্বপ্নের দেশ-এর জন্য লোভাতুর হয়ে উঠত চোখ দুখানি। মেমরা সহজে কাঁদে না, কিন্তু এই বৃদ্ধাটি কেঁদে ফেলতেন, সামলে উঠে দুঃখ প্রকাশ করে বলতেন, তোমাদের দেশ বড় মহান, গৌরবময়। আমিও ভারতের কথা শুনেছি, দরিদ্র কিন্তু মহানুভব। দেখো, আমার তিন ছেলের মধ্যে একজন বিয়ে করেনি, আর দুজনের পাঁচটি বাচ্চা। তারা যদি একজন বাচ্চাকেও আমার কাছে থাকতে দিত, তবে মনে হয় সেই বাচ্চার গায়ে হাত বুলিয়ে আর শরীরের গন্ধ শুঁকে

আমি স্বর্গের সুখ পেতাম। তোমার মা-বাবা কত সুখী, তোমরা কত সহানুভূতিশীল। তোমার দেশ পবিত্র।

নিজের জীবনের শূন্যতা এবং হাহাকার দিয়ে ক্রীত হয়েছে মার্কিন বৃদ্ধার এই উপলব্ধি। মার্কিনি বা ইউরোপ বা অন্য পশ্চিমি দেশে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের এই সমস্যার কথা আজকাল আমরা জেনে গেছি। জেনেছে ওরাও তাই পশ্চিমি দেশে আমেরিকায় সর্বত্র আজকাল এই সমস্যা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে। সমাধানের সূত্র খোঁজা হচ্ছে। তবু ভরসা হয় না যে দীর্ঘকাল ধরে পারিবারিক কাঠামো থেকে, আত্মীয়তার বন্ধন থেকে তাড়িত বুড়ো-বুড়িরা ফের তাদের সন্তান সন্ততির পরিবারে সসম্মানে ফিরে আসার সুযোগ পাবে। স্বার্থপরতার সমগোত্রীয় এক আত্মনির্ভরতায় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতায় সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা বড় বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মা-বাবা বা শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে ছেলে বা ছেলের বউয়ের রেষারেষি বা সমঝোতার প্রশ্নটাই তারা জীবন থেকে উৎপাটন করে ফেলেছে। বয়স হলে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ও কঠিন অনুশাসনে বুড়ো-বুড়িকে সরে যেতে হয়। স্নেহ সেখানে বাধা নয়। নৈকট্য নয় আত্মীয়তার মানে।

মিশিগানের বৃদ্ধার কথা শুনে ভারী একটা কষ্ট হচ্ছিল বুকে। কি আজব নিষ্ঠুরতা! আমরা এখনও তো ততদূর নিষ্ঠুর নই! এ কথা ভাবতে হঠাৎ নিজেকে বড় ভণ্ড বলে মনে হল। বলতে কি সেই আমেরিকান বৃদ্ধার স্বজন বিরহকাতরতা ছাড়া আর কোনও ঐহিক কষ্ট আছে! ওই অতি-সুখের দেশে বৃদ্ধার নিশ্চয়ই চারবেলা ভালো খাবার জোটে, পোশাক জোটে, ঘরে সময় কাটানোর টিভি আছে, অন্যমনস্কতার জন্য অঢেল বই বা ম্যাগাজিন, মানসিক স্ফুর্তির জন্য কখনও বা গাইডেড টুর! আর এদিকে রোজই প্রায় আমার এক বন্ধু কমলের সঙ্গে আমার দেখা হয়, গত দু মাসে তার প্রায় দু কেজি ওজন কমে গেছে, বাড়িতে বউ আর মায়ের ঝগড়ার অশান্তিতে। কমলের ধর্মপ্রাণ বাবা থাকেন কাছাড় জেলায়, সেখানে তাঁরা গুরুবংশীয়, ঘরে বিগ্রহপূজা, বাইরে যজমানদের প্রতি কর্তব্য। নিজের জেলাটুকুর বাইরে বড় একটা কখনও যাননি। কমল যখন কলকাতায় চাকরি করতে এল তখন অবোধ ছেলেটিকে মা ছেড়ে দিলেন বটে কিন্তু শান্তি পেলেন না। অহরহ পুত্রচিন্তা। ছেলেরও যেন হোস্টেলের খাবার সহ্য হয় না, মা বাবা ছাড়া মন হু-হু করে। তাই দু বছর বাদে মা চলে এলেন ছেলের কাছে, বাসা করে মায়েপোয়ে রয়ে গেলেন। অন্য ভাড়াটের সুন্দর মেয়েটির প্রেমে পড়ল।

স্বঘর দেখেই পড়ল। মা বিয়ের সম্মতি দিলেন চিঠিতে বাবার আশীর্বাদ এল। বিয়ের পর দশ দশ বছর পার হয়ে গেছে। কমলের মায়ের এখন একটি নাতনি, একটি নাতি। দুজনকে দু পাঁজরে লাগিয়ে রেখে গ্রীষ্মের সারারাত হাতপাখার হাওয়া করেন, শীতে বার বার ঘুম ভেঙে উঠে গায়ে খসে পড়া লেপ ফের তুলে দেন। ছেলের বউ সুনীতি এতকাল নিশ্চিন্তে সংসার করেছে। হঠাৎ দশ বছর বাদে, যখন তার ছেলেমেয়েরা আর কোলের

শিশু নয়, সংসারে যখন হঠাৎ দ্রব্যমূল্য ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতির বৃদ্ধিতে কিছু টানাটানি এবং তার দেওরের বিয়ের পর যখন তার সংবিৎ হয়েছে যে নতুন জাটি দিব্যি আলাদা বাসা করে স্বামীর সঙ্গে একলা একলি থেকে নানা ফুর্তি করবে, তখনই তার মাথা বিগড়ে গেল। প্রতিবেশীদের মধ্যেও অনেকেরই স্বামী-স্ত্রী অর্থাৎ টোনা-টুনির সংসার। তারাও কেউ পরামর্শ দিয়ে থাকবে। দশ বছর বাদে নারীবর্ষের শেষ দিকটায় সুনীতি অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীজাতির পুরো প্রতিক্রিয়া নিয়ে উঠে দাঁড়াল একদিন। তার শাশুড়িকে আমি চিনি, কমলের মা ভেজালহীন মানুষ। ধর্মকথা ভালোবাসেন, গুরুর আশ্রমে যান, কথাটথা ভারী মিষ্টি। তবু নিশ্চিত তাঁরও কিছু দোষ আছে। যেমন ছেলের টানে স্বামীকে ফেলে দূরে থাকা, নাতিনাতনিকে তাদের মায়ের শাসন থেকে বাঁচানো এবং উলটে মাকেই কিছু বকাঝকা এবং সর্বোপরি ছেলের অভাবের সংসার থেকে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ। ঝগড়াটা কতদূর কীভাবে হয়েছে জানি না। তবে কমল এসে প্রায়ই আমাকে বলে--তুমি ভাই একবার আমার বাড়িতে চলো। সুনীতিকে বুঝিয়ে একটু বলবে। ও তো আমাকে মানেই না। মাকে বলেছে--আপনি কেন এ বাড়ির ভাত খান, আপনাকে তো আমি বেরিয়েই যেত বলেছি। যান চলে যান।

এসব শুনে কমলের মা রাগ করে নবদ্বীপে গুরুর আশ্রমে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বুড়ো বয়েসে রাগ বা জেদের জোর থাকে না, বুড়ো বয়সেই মানুষকে ভূতের মতো পেয়ে বসে ভবিষ্যৎ-চিন্তা, আর এই বয়সেই বীজাণুর মতো আক্রমণ করে মায়া। পনেরো দিন বাদে নাতিনাতনিকে দুঃস্বপ্নে দেখে তিনি লজ্জার মাথা খেয়ে ফিরে এসেছেন। সংসারের পুরোনো জায়গাটি তো হারিয়েছেনই, ফিরে আসার ফলে তাঁর বউয়ের কাছে মুখ আরও ম্লান হয়েছে। সুনীতি এখন তাঁকে যাচ্ছেতাই বলে, তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করে পাড়াপড়শির সঙ্গে।

কমল প্রায়ই আসে। বড় রোগ হয়ে গেছে। সুনীতিকে সে বড় ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, আর মাকে ভালোবাসে জন্মাবধি। কাকে ত্যাগ করবে সে?

সমাজের অন্তঃস্থলে অহরহই সেই কম্পন উঠছে, এক দেশকে যেমন দূরের দেশ করে সরিয়ে নিয়ে যায় পৃথিবীর অভ্যন্তরের সংঘাত, তেমনি সেই কম্পন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে। কমল না জানলেও আমি জানি কমল শেষ পর্যন্ত কাকে ত্যাগ করবে। এখন কে-ই বা না জানে মা-বাবাকে ত্যাগ করা কত সোজা!

আজকাল মা-বাবারাও বুঝে গেছে, ছেলের ওপর তাদের সত্যিকারের আইনসঙ্গত কোনও দাবি নেই। যদি আমি আজ মারা যাই, আমার উইল থাক বা না থাক, আমার যা কিছু আছে সে সবের উত্তরাধিকার বর্তাবে আমার স্ত্রীর ওপর। নেমন্তন্নের চিঠিতে নাম লেখা থাকে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস, শ্রী ও শ্রীমতী। শুভানুধ্যায়ীরা প্রশ্ন করেন--কেমন আছ। হে! স্ত্রী পুত্র কন্যা সব ভালো আছে। কিংবা বলে--একদিন সস্ত্রীক আসুন না আমাদের

বাড়ি। স্ত্রীরও অনুরূপ স্বামীকেন্দ্রিক জীবন। সেখানে মা বা বাবা এক সারি পিছনের লোক, একটু অস্পষ্ট তারা, একটু আবছা। স্পটলাইটের আলোটা তাদের ওপর পড়ে না তেমন করে। সব মা-বাবাই জানে, স্নেহ নিম্নগামী। মা, বাবার যতটা পুত্রস্নেহ বা কন্যাস্নেহ, তার একশো ভাগের একভাগ পুত্রের বা কন্যার পিতৃস্নেহ মাতৃস্নেহ হতে নেই। হয় না। প্রকৃতির নিয়ম। প্রায় একবছর হতে চলল আমার পিসতুতো দাদা শিল্পী মণিময় মারা গেছেন, আজও কালীঘাটের এক ফাঁকা বাড়িতে পঁচাত্তর বছর বয়সের বুড়ি পিসি ককিয়ে ককিয়ে কাঁদেন। আমাকে প্রায়ই বলেন--দ্যাখ, এত কাঁদি তবু কেন আমার চোখ বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে না রে! আমার চোখের জল কোথায় গেল! শুনে ভাবি, এই বুড়ি পিসি যদি মণিময়ের মতো চলে যেতেন আর মণিময় যদি বেঁচে থাকত তবে কি এত কাঁদতে পারত তার মায়ের জন্য?

সুতরাং স্নেহ নিম্নগামীই। আজ যদি যমরাজার কোনও দূত এসে কোনও বাপকে বলে--তোমাকে দুটোর মধ্যে একটা বেছে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছি। একদিকে তোমার পিতা, অন্যদিকে তোমার পুত্র, এ দুজনের একজনকে আমি নিয়ে যাব। এখন বলো, তুমি কাকে নিয়ে যেতে বলবে? প্রশ্ন শুনে বাবা দু মিনিট ভাববে। তারপর খুব অপরাধবোধের সঙ্গে বলবে--দেখো, বাবা বুড়ো হয়েছেন, কোনও সময়ে তো মরবেনই, আজ হোক কাল হোক। তুমি তাঁকেই নিয়ে যাও। ছেলেটার সামনে এখনও ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। চেতনে বা অবচেতনে এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত সকলেরই প্রায় নেওয়া আছে। কি আমেরিকায়, কি ভারতবর্ষে। স্নেহ নিম্নগামী নদীর স্রোত কখনও উৎসের দিকে বিপরীত বয়ে যায় না।

দুই

খুব ছেলেবেলায় ঠাকুমা আমাকে একটা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে মৃদু চাপড় মেরে ঘুম পাড়াতেন, সেই পূর্ব বাংলার গানটা ছিল এরকম--মায়রে দিলাম ডবল শাঁখা, ভাই করাইলাম বিয়া, বাপরে দিলাম সোনার মুটুক, তীর্থ কর গিয়া। গানের একটা লাইনের মধ্যেই একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকের সব স্বপ্ন সাধ যেন লুকিয়ে আছে সে আমলের। তখন মধ্যবিত্ত সমাজে মা-বাবার প্রতি কর্তব্য, ভাইকে সংসারী করা, এসব ছিল জীবনের সার্থকতার প্রধান উপাদান, মাকে ডবল শাঁখা দেব, বাবাকে তীর্থ করতে পাঠাব, ভাইয়ের বিয়ে দেব। এই গান শুনতে শুনতে আমরা ছেলেবেলায় ঘুমিয়েছি, আর আমাদের আধো চেতনায় সেই যে গানটা রোজ ধুয়া তুলে ঘুরত সেই থেকে পেয়ে বসে আছে। আজও বুকের মধ্যে মাকে ডবল শাঁখা দেওয়ার সাধ, বাবাকে সোনার মুকুট বা তীর্থ ভ্রমণের রাহাখরচ দেওয়ার ইচ্ছা, ভাইকে সুলক্ষণা বংশের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার আশা, এসব

রক্তে কান্নার কলরোল তোলে, উতলা করে। চল্লিশের সীমানায় আমার বয়স, আমাদের পরের জেনারেশনের কাছে ওই গানটি কি আর পরিচিত মনে হবে? কিংবা ওইসব সনাতন সাধ-আল্হাদের কোনও মূল্য থাকবে?

ভাবি। ভাবতে ভাবতে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। গোলপার্কের কাছে, দোতলায় বন্ধুর দু—কামরাওলা ছিমছাম ফ্ল্যাট। বন্ধু অধ্যাপক, স্ত্রী শিক্ষিকা। ঘরদোর খুব সাজানো, রেডিয়োগ্রাম ফ্রিজ-গোদরেজের আলমারি। জানালায় দরজায় দামি পর্দা। স্কুল-কলেজের বন্ধের সময়ে ওরা প্রতিবারই কাশ্মীর বা কন্যাকুমারিকা ঘুরে আসে। ঘরদোর খুব নিঃঝুম। বড় পরিবার নয় তো। স্বামী-স্ত্রী আর একটা বাচ্চা। বন্ধুপত্নী কফি খাওয়ালেন, কাশ্মীরে কেনা কার্পেট আর শাল জয়পুরে কেনা ঝুটো গয়না আর ফুলদানি, এ বছর পুজোয় কেনা সোনার বাউটি দেখালেন।

কফি খেয়ে উঠে আরেক বন্ধুর বাসায় যাই। এক বন্ধু রাইটার্সের আপার কেরানি। বন্ধু পত্নী লেডি ডাক্তার। সামনের ঘরে ফোন, বেডরুমে দুটো সিংগল খাট, দুর্দান্ত একটা বুক কেস। এ বাড়িতেও মিনি ফ্রিজ। লোহার আলমারি, অ্যালসেশিয়ান কুকুর। সল্টলেক-এর জমিতে বাড়ি উঠছে। বন্ধুর বাচ্চার বয়স চার মাস, একজন মাইনে করা আয়া বা ঝি বা বেবিসিটার আছে যার কাছে বাচ্চা মানুষ হচ্ছে। সুখী পরিবার। স্বামী-স্ত্রী, একটা বাচ্চা।

নোনতা বিস্কুট দিয়ে চা খেয়ে উঠে পড়লাম। তৃতীয় এক বন্ধুর বাড়ি গেলাম। শ্যামবাজারে। শিবদাস ভাদুড়ি স্ট্রিটে তিন তলায় ফ্ল্যাট। বন্ধু ব্যাঙ্কের অফিসার, বন্ধুপত্নী চাকরি করেন না তবে পেলে করবেন। বন্ধুর বিধবা মা আছেন। ঘরে ফ্রিজ নেই, একটা মাত্র ট্র্যানজিস্টার রেডিয়োতে স্থানীয় সংবাদ হচ্ছে। কেউ শুনছে না। বড় মেয়েটি আপার নার্সারিতে পড়ে, বয়স ছয়। ছেলের বয়স এক। ছেলে হয়েছে আমি জানতাম না। অনেক দিন বাদে এলাম। বন্ধু কানে কানে বলল--ছেলেটা আমাদের ইচ্ছেয় হয়নি, মা বংশরক্ষা বংশরক্ষা বলে পাগল করে তুলেছিল, তাই হইয়ে ফেললাম। বন্ধুপত্নী সামনেই বসে গল্প করছিলেন, রান্নাঘর থেকে চা করার শব্দ আসছে। কে চা করছে বুঝতে পারছিলাম না। হয়তো ঝি, হয়তো বন্ধুর মা। তবে বন্ধুর মা-ই চায়ের কাপ হাতে দরজার পরদার আড়াল থেকে বললেন, বউমা, চা নিয়ে যাও। বন্ধুপত্নী চা নিয়ে নানা কথার মধ্যে বললেন--ছেলেমেয়ের জন্য আমাকে বেশি পোয়াতে হয় না, মা দেখেন।

আরও কয়েকজন বন্ধু ও আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরি। দেখি, আমার চেনাজানার মধ্যে অধিকাংশই ছোট পরিবারে বিশ্বাসী। শতকরা হিসেব বলা সম্ভব নয়। তবে আজকাল টোনাটুনি ও একটি দুটি বাচ্চার পরিবার খুব বেড়ে গেছে। এবং অধিকাংশ তরুণ স্বামী-স্ত্রী বেশ পছন্দ করছে এই রকম ছোট ইউনিট। মাথার ওপর খবরদারি করার কেউ থাকবে না, অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে মাথা গরম করতে হবে না, বেড়াতে বেরিয়ে হোটেলে খেয়ে ফিরলেও কোনও অসুবিধে নেই। বেশ স্বাধীন সুখী জীবন। মা-বাবাকে নিয়ে কেন থাকেন

না এ প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন উত্তর দেয়। মা-বাবা দূরে থাকেন, যা রোজগার তাতে কুলোয় না। ছোট বাসায় জায়গা হয় না। সেকুলেসনের জন্য মা-বাবা থাকতে চান না এবং সর্বোপরি অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না।

নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত কোনও সমাজের এমন মানুষ আমি খুঁজে পাইনি যে অর্থকরী দিক থেকে ছেলের ওপর নির্ভরশীল হতে চায় বা ছেলের সংসারে অনাহূত বাস করতে চায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সেই আত্মনির্ভরতা ও আত্মসম্মানবোধ জন্মগত সংস্কারের মতো থাকে। ষোলো টাকা বেতনে জীবন শুরু করেছিলেন পণ্ডিতমশাই দক্ষিণাবাবু। প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সে কলকাতার এক ইস্কুল থেকে যখন রিটায়ার করেন তখন তার সর্বশেষ বেতন বোধহয় সবে দুশো ছাড়িয়েছে। সত্তর সালে যখন অবসর নিলেন তখন অতি কষ্টে একটি ভদ্রাসন করেছেন, ছেলেরা মানুষ হয়েছে, মেয়েদেরও বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন। এখন সত্তর বছর বয়স পার হয়েও তাঁর একমাত্র গর্ব—কখনও ছেলের পয়সায় খাননি, এখনও খান না। ছেলেরা সংসারে সাহায্য করে, বাড়ির ওপর দোতলাও তুলেছে, বাপকে সম্মান করে। কিন্তু এখনও তাঁর এবং ব্রাহ্মণীর গ্রাসাচ্ছাদনের মতো টাকা তিনি উদয়াস্ত টিউশনি করে রোজগার করেন। ছেলেরা তাঁকে দেখে, ভালোই। না দেখলেও ক্ষতি নেই। এই রকম ভাবটা যে-কোনও মানুষের মধ্যেই থাকে। পারতপক্ষে ছেলের সংসারে পরভূত হতে কে চায়? কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের মতো মনের জোর শতকরা দুজন মানুষেরও আছে কিনা সন্দেহ। বয়স যখন ধীরে ধীরে বার্ধক্যের দুয়ারে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের মনের শক্তির প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে থাকে, বড় বেশি মায়া-মোহে নিমজ্জিত হয়ে যায় পৌরুষ, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও একাকীত্বের ভয় এসে আক্রমণ করে রক্তশোষা বাদুড়ের মতো। সর্বোপরি এই নিরন্ন দেশে নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজের সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল সংসার প্রতিপালন করে নিঃশেষিত হয়ে যায়, সঞ্চয় প্রায় কিছুই থাকে না। এই অনাত্মীয় জগতে এখনই আত্মজেরাই অভিভাবক, অন্নদাতা। শিশুকালে মা বাবার ওপর জোর খাটিয়েছেন, রাগ দেখিয়েছেন, যৌবনকালে স্ত্রীর ওপর অধিকারবোধবশত নানা আবদার-অভিমান রাগও যেমন করেছেন সেই মানুষই বার্ধক্যে বা প্রৌঢ়ত্বে ছেলের সংসারে বউমার অধীনে নিজের কোনও অধিকার আর খুঁজে পান না। ভয়ে ভয়ে অস্বস্তিতে প্রায় মাথা নীচু করে আশ্রিত জনের মতো থাকেন। এ দৃশ্য কত দেখেছি। মানুষের যখন রাগ, অভিমান, জোর বা আবদার খাটানোর মতো কেউ থাকে না তখন তার ভিতরকার উত্তাপগুলি তাকেই দহন করতে থাকে। পায়ের তলায় মাটির বদলে প্রতিবোধহীন শূন্যতাকে সে টের পায়। তখন কারও কারও মৃত্যুর বিষপাত্রকে অমৃতের তুল্য বলে বোধ হয়।

মিশিগানের আমেরিকান বৃদ্ধ যদি জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন তাহলে বোধ হয় পরজন্মে ভারতবর্ষেই জন্মাতে চাইতেন। যদিও সমৃদ্ধির দেশ আমেরিকায় তিনি এক অন্নচিন্তা শূন্য

স্বাধীন ব্যক্তিত্বের উচ্ছ্বল রঙিন কৈশোর যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তবু সব ভালো যার শেষ ভালো। যৌবনের উপবন ছেড়ে তিনি তো বার্ধক্যের বারাণসীতে উপনীত হতে পারেননি। তাঁর বার্ধক্য এক শূন্য শুষ্ক প্রান্তরের মতো যেখানে তুষারের বাতাস বয়ে যাচ্ছে হু হু করে। স্বপ্ন নেই, সাধ অবসিত। তিনি জানেন ভারতবর্ষে এরকম হয় না, সে বড় সুন্দর দেশ। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সেখানে আদরের সামগ্রী, মানুষ সেখানে মানুষকে পরিত্যাগ করে না। তাঁর ধারণাটা হয়তো বা তেমন ভুল নয়, কিন্তু খানিকটা স্ব-আরোপিত। তিনি যেমন অন্তরের সঙ্গে ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে চাইছেন তখন এদিকে আমরা গ্রহণ করতে চাইছি পশ্চিমি দেশের পরিবার ব্যবস্থাকে। সে লক্ষণ কিছু কিছু আমাদের আধুনিক পরিবার চিত্রে ফুটে উঠছে।

দেবী চৌধুরানি উপন্যাসে বঙ্কিম ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির যে কাহিনি লিখেছেন তা পড়ে আমরা আজকাল বিরক্ত হই কেউ কেউ। ও কীরকম বিরক্তিকর কাপুরুষোচিত পিতৃভক্তি। যখন ব্রজেশ্বরের বাপ অর্থগৃধু ও সংকীর্ণমনা হরবল্লভ তাঁর পুত্রকেই আদেশ করেন পুত্রবধূকে বাড়ি থেকে অপমান করে বহিষ্কার করতে তখনও ব্রজেশ্বর অনুগত স্বরে বলে, যে আজ্ঞা। আবার দেবীরানীকে ধরিয়ে দেওয়ার পেছনে যে হরবল্লভেরই গোয়েন্দাগিরি আছে তা জেনেও সে তৎক্ষণাৎ পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ আবৃত্তি করে অবসিত পিতৃভক্তিকে আবার নিজের ভিতরে ফিরিয়ে আনে। বঙ্কিম স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ব্রজেশ্বর জ্ঞানী বলেই বাপের মুখের ওপর কথা বলে না, আজকাল যত মূর্খ ছেলে তত বেশি লেকচার। বুঝতে পারি বঙ্কিমের আমলেই পিতৃভক্তির কিছু অঘটন দেখা দিতে শুরু করেছিল। তাই আদর্শবাদী বঙ্কিম ব্রজেশ্বরের চরিত্রের ভিতর দিয়ে তারই একটা উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পিতামাতার প্রতি ভক্তি বা আনুগত্যের অনটন বঙ্কিমের যুগের তুলনায় আজ নিশ্চিত অনেক বেড়েছে।

দীর্ঘ আঠারো বছর আমি মেসে হোস্টেলে থেকেছি, মা বাবাকে ছেড়ে। আজও মা বাবার কাছ ছাড়া, প্রবাসী। ছাত্র জীবনে কতবার মা লিখে পাঠিয়েছে বাবা গো হোস্টেলের চৌকিতে বড় ছারপোকা। না জানি তোমার কত রক্ত খেয়ে ফেলছে। এই ভেবে রাতে ঘুমোতে পারি না। আজও আমার এই চল্লিশ বছর বয়সে মা চিঠিতে লিখে অনুনয় করে-- বউমা তোমার খাটুনি যত্ন করে জানি, কিন্তু তবু আমি তো মা। তোমার বড় মাথার খাটুনি, বেশি করে দুধ খেও, বউমা যেন রোজ একটু করে ছানা কেটে দেয়। একটু ফল খেও। এবং আজ কোনও জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে গেলে, কোনও সমস্যা দেখা দিলে আমি বাবাকে চিঠি লিখে সমাধান চেয়ে পাঠাই। আমার ভিতরকার জন্মগত এবং আবহমান কালের ভারতীয় রক্ত তার কাজ করে যাচ্ছে। নিজেকে দিয়েই টের পাই। আমাদের জন্ম ও জীবনের সঙ্গে মা বাবা সহস্র গ্রন্থিতে বাঁধা।

তবু কখনও কখনও এদেশে বড় বিদেশের হাওয়া আসে। আমাদের গরিবের ঘরের স্নেহ ভালোবাসার ধনরত্নটুকু লুট করে নিয়ে চলে যায়। আমরা কি এইভাবে নিঃস্ব হয়ে যাবো। মিশিগানের বুড়ি যে আমাদের দিকেই চেয়ে আছে মমতা বরে। সে যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখে!

দেবলবাবুর বয়স পঁয়ষট্টি হবে। চার বছর রিটায়ার করে বাড়িতে বসা। ছেলেরা বড় হয়েছে, বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মানুষটি কথা বলতে বড় ভালোবাসেন। বাইরের লোক কেউ গেলে অজস্র কথা বলেন। স্মৃতিকথা, রাজনীতি, সংসারের দুঃখ সবই তাঁর প্রিয় বিষয়। ধর্মকথাও বলেন, যদিও সে বিষয়ে কিছু জানেন না তেমন। এই বকাবাজ লোকটি গত পনেরো বছর ধরে তার স্ত্রীর সঙ্গে একটিও কথা বলেননি। স্ত্রীও বলেননি তাঁর সঙ্গে। দুজনের মধ্যে তীব্র তিক্ত সম্পর্ক। তবু একই বাড়িতে থাকেন, পাঁচ ছেলের ভাগের সংসারে। ছেলেরা বেশির ভাগই মায়ের পক্ষে, দেবলবাবু তাই একা। কথা বলতে ভালোবাসেন, কিন্তু কে শোনে! ছেলেরা মুখোমুখি হলেই এড়িয়ে যায়। পাড়ার বৃদ্ধদের সঙ্গে মিশতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে বাঙাল লোক খুঁজে পান না বলে। বাঙাল ছাড়া তাঁর জমে না। ছেলেদের সঙ্গে কদাচিৎ তাঁর কথাবার্তা হয়। তবু ছেলেরা অফিসে গেলে এক আধ দিন গিয়ে তাদের ঘরে ঢোকেন। টেবিল চেয়ার ঠিক করে রাখেন, বিছানা টান করে পাতেন, সিগারেটের খালি প্যাকেট বাইরে ফেলে দিয়ে আসেন, ছড়ানো তাস গুছিয়ে রাখেন। ছেলেরা কেউ এখনও বিয়ে করেনি। শীগগিরই করবে একে একে। মেয়ে দেখা হচ্ছে। আমাকে পেলে মাঝে মাঝে দেবলবাবু বলেন--বুঝেছ আমার মাকে এরা না খাইয়ে মেরেছে। আমার সংসারে মায়ের জায়গা হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমার ব্যাচেলার ভাই সুবলের কাছে থাকত। এই তো কাছেই থাকত, মানিকতলায়। কেউ মাকে দেখতে যেত না। খুব কাঁদত মা। তোমার কি মনে হয় না যে, আমার মায়ের অভিশাপ আমাদের সংসারে ফলবে। মায়ের মর্ম তো তোমার মাসিমা বুঝল না, ছেলেদের বিয়ে দিক, তখন বুঝবে। যখন ছেলের বউ নোড়া দিয়ে তাঁর দাঁতের গোড়া ভাঙবে তখন আমার বুক ঠান্ডা হবে। বুঝেছ?

বুঝি। একটু একটু বুঝি আজকাল।

দাদুস্থানীয় এক অধ্যাপক ও সাহিত্যিক বন্ধু কদিন আগে আমাকে এক লঘু মুহূর্তে বলছিলেন, জানো শীর্ষেন্দু, আমার মেয়েটা কদিন আগেও বাবা বলতে অজ্ঞান হত। যেন বাপ ছাড়া ওর অস্তিত্ব নেই। উঁচু ক্লাসে পড়ছে, অনেক বন্ধু, এখন যদি মেয়েকে যখন তখন ডাকি তো বিরক্ত হয়। বলে--আঃ বাপি, বড্ড ডিস্টার্ব করো তুমি।

বলে বন্ধু ম্লান হাসলেন।

বিষণ্ণতা বুঝি ছুঁয়ে গেল আমারও বুক। আমারও মেয়ের বয়স মাত্র ছ বছর। বাবা ছাড়া সে আর কাউকে যেন চেনেই না। দিনের মধ্যে একশো বার আমাকে তার খেলনা

ছেলে সাজিয়ে কত শাসন সোহাগ করে। কিন্তু মেয়ে তো বড় হচ্ছে। উঁচু ক্লাসে উঠে যাচ্ছে, বন্ধুও বাড়ছে। তারপর একদিনও সেও বলবে--আঃ, বাপি, বড্ড ডিস্টার্ব করো তুমি।

বলো আমি কে

রাজা সুবোধ মল্লিক রোডের ওপর লোকটি পড়েছিল। চিৎপাত। পরনে নীল ফুল প্যান্ট, টেরিকটনই হবে, তবে বড্ড পুরোনো আর ময়লা। গায়ে একটা হাতা গোটানো চৌখুপি করা রঙিন জামা। ফুটপাথে বেশ অনেক লোক দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছে। পুলিশের গাড়ি এসে থামল অদূরে। একটু আগে লোকটা এক বোঝাই বাসের হাতল ছেড়ে পড়ে যায় এবং গাড়ির পিছনের ভারী চাকা অত্যন্ত নিরাসক্ত তাচ্ছিল্যে তার মাথার খুলি পিষে দিয়ে চলে গেছে। মৃৎপাত্রের মতো ভাঙা খুলির অভ্যন্তর থেকে তার হিরণ্ময় মস্তিষ্কের ঈষৎ হরিদ্রাভ ঘন তরল, কোশ ও ঝিল্লি তুচ্ছ জিনিসের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল কালো পিচে। কে এক দয়ালু এক খণ্ড ময়লা কাপড়ে মাথাটা ঢেকে দিয়েছে। পাছে কাপড়টা বাতাসে উড়ে যায় তাই চার কোণায় চারটে ইঁট চাপা দেওয়া। এ দৃশ্য ঢাকা দেওয়াই ভালো। নইলে যাতায়াতের পথে কত লোক দেখতে পেত মানুষের মহামূল্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মস্তিষ্কের ধূলাবলুণ্ঠিত অপচয়। দেখে হয়তো একটা দুটো দিন তাড়িত হত জাগর দুঃস্বপ্নে, মনোগত বিষাদ ও আতঙ্কে। খাওয়া কমে যেত, স্ত্রীকে আদর করত না কয়েক দিন।

আমার ছোট্ট মেয়েটাকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবার পথে দৃশ্যটা দেখতে পাই চলন্ত বাস থেকে। রাস্তায় ভিড় বলে বাসটা আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, তাই অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পাই তাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে মাথা বের করে যতক্ষণ দেখা যায়।

বাসের ভিতরে অবশেষে মাথা টেনে আনি। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। তখন মনে হয় আমাদের সকলেরই মৃত্যু হবে। ১৯৭৬-র নভেম্বরে যাঁরা এই বেঁচেবর্তে আছি দুনিয়ামায়, ২০৭৬ সালে তার একজনও থাকব না। একজনও না, দেহ ভারাক্রান্ত জড়ায়ু শতায়ু যদি কেউ কেউ থাকে তো তারা হিসেবের বাইরের লোক।

আমাদের সকলেরই মৃত্যু হবে। ভাবতে ভাবতে পকেটের সিগারেটের হাত দিই, সামনে তাকিয়ে দেখি নো স্মোকিং-এর সতর্কবাণী কিন্তু তখন সিগারেট খাওয়ার এক তীব্র ইচ্ছেয় জল তেষ্টার মতো বুক কাঠ। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল নেমে ফিরতি বাসে উঠে মেয়ের ইস্কুলে চলে যাই। ক্লাস থেকে ডেকে এনে সামনের মাঠটায় সকালের সুস্পষ্ট রোদে তাকে বুকে চেপে ধরে খুব আদর করি অনেকক্ষণ। সে আদরে আমার চোখ ভেসে যাবে অশ্রুর

বন্যায়। মেয়েকে তখন বলব--মা আজ যদি অফিস থেকে না ফিরে আসি আর, তুমি কিন্তু সাবধানে বড় হোয়ো। খুব সাবধানে। তোমার ভিতরেই যে আমার বেঁচে থাকা।

রাজা সুবোধ মল্লিক রোডের ওপর সেই যে তাকে পড়ে থাকতে দেখলাম তারপরই সে যেন গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে এল তার মৃত্যুর শয়ান ছেড়ে। এসে সারাক্ষণ আমার পাশে বসে রইল। সে কি একটা সিগারেট চায়? এক কাপ চা? তার বাসের টিকিটটা করে দিতে হবে কি?

না। সে-সব নয়। সে যেন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে আমাকে--বলো আমি কে?

বাস থেকে নামি, বাসার দিকে হাঁটতে থাকি। পিছনে পিছনে ছায়ার মতো সে আসতে থাকে। ঘ্যান ঘ্যান করে বলে--বলো আমি কে?

বাজারে, রাস্তায় বিভিন্ন জটলার কাছে দাঁড়াই। একে ওকে তাকে জিগ্যেস করে ফিরি। সবাই বলছে একটা লোক এই মাত্র অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে, কিন্তু কেউ জানে না, বলতে পারছে না সে কে।

সারাটা দিন চলে গেল জানতে। সন্ধের দিকে আধচেনা একজন বলল--চিনতাম, তবে নাম জানি না। গরফায় বাড়ি। একটা কলমের দোকান করত ফুটপাতে।

এইরকম আরও দু-একজন ভাসা-ভাসা চেনার কথা বলল। খুব ভালো করে তাকে কেউই চিনত না। দেখেছে হয়তো দু-একবার, পাড়াতেই থাকত বলে জানে কিংবা কলমের পসরা নিয়ে স্টেশন রোডে বসে থাকতে দেখেছে বলে কারও কারও মনে পড়ছে। একজন বলল, তার নাম ছিল কবীর সেন।

খুবই তুচ্ছ সাধারণ একজন ছিল সে। ওইভাবে মারা না গেলে তার কথা কেউ ভাবতই না।

তবু একটা প্রশ্ন কেবলই আমার চারদিকের বাতাসে ফিসফিস করে--বলো আমি কে। বলো আমি কে। বলো আমি কে।

ক্রমে প্রশ্নটা আমার নিজস্ব হয়ে যায়। সংসারের শতকর্মে রত এই যে আমি এ আমি কে? ভারতীয়? বাঙালি? কলকাতার যাদবপুরের বাসিন্দা? একটা সংস্থায় চাকরি করি? বয়স—? না—?

তবু প্রশ্নটার সমাধান হয় না। খুঁজতে থাকি। রাজা সুবোধ মল্লিক রোডের ওপর দুর্ঘটনায় নিহত লোকটার অভাবে কতখানি গেল পৃথিবীর? কতখানি ক্ষতি হল রাষ্ট্রের বা রাজ্যের? কতদূর শোকের তরঙ্গ ভাঙল মানুষের বৃহৎ সমাজে। আমিও যদি ওরকমভাবে একদিন ঘরে ফিরে না আসি তাহলে এই পৃথিবীর কতখানি ক্ষতি?

ছেলেবেলায় পড়ন্ত বেলার শান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে তরঙ্গবলয় ছড়িয়ে যেতে দেখতাম। সারা পুকুর জুড়ে বলয়ের রেশ বড় হয়ে যেত। সমুদ্রে ঢিল ছুঁড়ে দেখেছি। সারা পুকুর

জুড়ে বলয়ের রেশ বড় হয়ে যেত। সমুদ্রে ঢিল ছুড়ে দেখেছি, শব্দ হয় না।, তরঙ্গে অভিঘাত জেগে ওঠে না।

মানুষ কি এমনি? লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে একদিন জন্ম নেয়। কাঁদে হাসে। বেঁচে বেড়ে ওঠে। মরে যায় গাড়লের মতো। আর জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে জীবনোত্তর এই বৃহৎ সমাজে করে যায় অজ্ঞাতবাস। সে যে জন্মেছিল তা অনেকেই জানত না, সে যে বেঁচে ছিল তাও জানা ছিল না অনেকের, সে যে মরে গেল তাও কেউ টের পেল না। আমরা লক্ষ লক্ষ জন কি এমনি?

আমার বুকের বাঁ দিকে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। নিশুত রাতে অস্ফুট শব্দ করে জেগে উঠি ব্যথায়। চারদিকে ঝিম-ধরা ঘুমের নিস্তব্ধতা। আমার হার্ট খুব ভালো নয়। সংসারে মাঝে মাঝে বড় অনাদর টের পাই। অপমান অবহেলা বড় কম জমা হয়নি। বড় ভুল বোঝে লোকে। যারা আমার প্রিয় তাদের অনেকের কাছে আজও প্রিয় হওয়া হল না আমার। তাই একটা নিঝুম রাতে বুকে হাত রেখে হৃৎপিণ্ডকে বলি--যদি তুমি থেমে যেতে চাও, থামো। আমার জন্য শোক করবার মতো মানুষ তো আমিই মাত্র।

আমার ঘরের সামনে একটা বারান্দা। বারান্দার ওপারে একটা নোনা-ধরা দেওয়াল। দুপুরের দিকে দেওয়ালে যখন খাড়া রোদ পড়ে তখন তার খাঁজে খাঁজে গভীর সবুজ সব শ্যাওলার রঙে বান ডাকে। চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ বোধ করি—পৃথিবীর যত উদ্ভিদ তাদেরও তো ব্যক্তি-পরিচয় বলে কিছু নেই। ওই যে হাজারটা চড়াই পাখি এসে আমাদের লোহার বিমের খাঁজে বসে রাত কাটিয়ে যায় তাদের কেউ কারও নাম ধরে ডাকে না তো। রাস্তার কুকুর, পথের বেড়াল গড় ঠিকানায় ঘুরে বেড়ায়। জন্মায়। মরে যায়।

কবীর সেন মৃত্যুর ওপার থেকে মাঝে মাঝে চলে আসে আমার ঘরে। দেখি অন্ধকারে একটা জোনাকি পোকার মতো সে তার মৃদুস্মৃতির আলো জ্বেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর অবসিত জীবনে তার সেই প্রশ্নের উত্তর--বলো আমি কে?

ওই প্রশ্ন বার বার হিম করে দেয় জীবনের সব তাপ। ডেকে আনে জড়ের বাতাস।

বিষ-যন্ত্রণায় ছটফট করি জবাইয়ের নলিকাটা মুরগির মতো। নিঝুম পৃথিবীর চারদিকে আমার অস্তিত্বের গভীর সংকট তার এস ও এস পাঠাতে থাকে। হে মহান রাষ্ট্রপতি, ওগো জনগণ, হে ঈশ্বর, বলো আমি কে?

মাঝরাতে পৃথিবীর সব টেলিফোন বেজে ওঠে। বলো আমি কে। হঠাৎ ঝড়ের গতিতে চলতে থাকে টেলিপ্রিন্টার। বলো আমি কে। সরব হয়ে ওঠে বেতার। বলো আমি কে। আমি কি পৃথিবীর, না গ্রহান্তরের? আমি কি শ্যাওলা? চড়াই পাখি? পিঁপড়ে? বলো আমি কে।

একা বিছানায় প্রলম্বিত আমাকে ঘিরে জোনাকি তার মৃদু আলো জ্বেলে জ্বেলে উড়ে বেড়ায়। এস ও এস ফিরে আসে। আমার হৃৎপিণ্ডে হিম-স্পর্শ দিয়ে ফিস ফিস করে বলে

যায়--কেউ নও, তুমি কেউ নও।

আমি শেষ হয়ে গেলে এ পৃথিবীও শেষ হল আমার কাছে। আমি যখন নেই, তখন এ পৃথিবীও নেই। একজন মানুষের বোধে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব মুছে গেল। মানুষ কি এমনি?

এই প্রশ্ন শুনে চারদিক মূক হয়ে থাকে। গোটা পৃথিবীই যেন লজ্জিত। অবনত মস্তক।

তখন সেই নিস্তব্ধতাই যেন কথা হয়ে যায়। আমার বুকের শব্দে রক্তের স্রোত, শরীরের প্রতিটি কোশে ছড়িয়ে পড়ে তার প্রগাঢ় স্তর--তোমার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল এই সুন্দর ভুবন। তোমার জন্যই সবকিছু। খুঁজে দেখো, তুমিই ঈশ্বর।

এই পঁচাত্তরের ভয়-ভাবনা

উনিশ শো পঁচাত্তর সালটা ভালো যাবে না, শুনছি। জ্যোতিষীরা বলছেন, রাজনীতির ধুরন্ধর ভাষ্যকাররা বলছেন, অর্থনীতিবিদরাও সেইরকম আভাস দিচ্ছেন। চমকে চমকে উঠি, পৃথিবীতে মোট আর দু মাসের খাবার আছে, কিংবা সারা পৃথিবীতে আসছে লোকক্ষয় যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ--এই ধরনের সব ভবিষ্যদ্বাণী দেখছি সর্বত্র। ভয় করে। মৃত্যুর হিম মাঝে-মাঝে দূর থেকে, কাজ থেকে স্পর্শ করে যাচ্ছে আমাকে। খেলাচ্ছলে হাত বাড়াচ্ছে, আবার সরিয়ে নিচ্ছে হাত। ইডেনে ক্রিকেটিয় উল্লাস, টেলিভিশন, আসন্ন বিশ্ব টেবিল-টেনিস সোনার কেল্লা, বাটার জুতো--নতুন চাল সবজি বা কাপড়ের ক্রমহ্রাসমান দাম কিংবা এবারের শীতে পশমি জামার বাহার, জয়প্রকাশের আন্দোলন, কিংবা এমনকী ওয়াঁচু কমিশনের কাণ্ডমাণ্ড থেকে উত্থিত উত্তাপ কোনওটাই তেমন গায়ে লাগছে না, বুকে হৃৎপিণ্ডের কাছে একটা মৃত্যুভয় পেরেকের মতো বিঁধছে। প্রোথিত হয়ে যাচ্ছে গভীরে। উনিশ শো পঁচাত্তর কেমন যাবে? যেমন গেছে উনিশ শো চুয়াত্তর! ভালোমন্দে উনিশ শো চুয়াত্তর তবু গেছে পঁচাত্তর আমাদের তেমনও কাটবে তো! ডিসেম্বরের সাত তারিখে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ আত্মীয়গ্রন্থি আমার, দিদিমাকে দাহ করতে নিয়ে গেলাম কাঁধে করে কেওড়াতলায়। সেখানে দেখি, গাদার মড়া পড়ে আছে, পুঁটুলিবদ্ধ একটি ভিখিরি-শিশুর মৃতদেহ এখানে সেখানে চোরাই চালানের চালের পুঁটুলির মতো সরিয়ে সরিয়ে রাখছে ডোমেরা।

জানুয়ারির আট তারিখে গেলেন আমার এক শিল্পী দাদা মণিময়। অকালে শ্মশানে যাইনি। ভয় করে। বড় ভয় করে। পশ্চিমে ভূমিকম্প গেল। সেদিন কারা যেন লোকাল ট্রেনে ভয় দেখানোর জন্য আগুন, আগুন বলে চেঁচিয়েছেন, তাতে ভয় পেয়ে যারা লাফিয়ে

পড়েছিল ট্রেন থেকে দমদম আর উলটোডাঙার মাঝবরাবর তাদের ওপর দিয়ে চলে গেল একটা ডাউন ট্রেন। ছয়জন মারা গেছে।

মৃত্যুর হিম মাঝে মাঝে স্পর্শ করে যাচ্ছে আমাকে। দূর থেকে, কাছ থেকে। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে আকালের কথা। উনিশ শো পঁচাত্তর কেমন যাবে। পৃথিবী জুড়ে মানুষের জোয়ার নেমে এসেছে। ম্যালথাসির তত্ত্বের ভারসাম্য রাখতে অনেক মানুষ চলে যাবে নাকি! যায় যাক। কিন্তু তারা কারা? আমি কি? আমরা কয়েকজন? আমরা অনেকে? নাকি, আমরা সবাই? জনসংখ্যায় অগ্রণী চিন অবশ্য ধমক দিয়ে বলেছে--ও হচ্ছে অক্ষমের কথা। খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে জনসংখ্যার কোনও সম্পর্ক নেই। ষেটের কোলে তারা সবাই তো খেয়ে পরে আছে। মিছে কথা নয়।

ভয়টা এমনই, একবার পেয়ে বসলে সহজে যায় না। রাতের দিকে যতবার অন্ধকার উঠোনের দিকের দরজা খুলি, ততবার দেখি, ঘর থেকে প্রতিফলিত আলোর চৌকোণ থেকে লাজুক পায়ে চলে যাচ্ছে একটা বেড়াল। যতবার দরজা খুলি ততবার দেখি। অর্থাৎ সারাক্ষণ বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে এই শীতরাতে বসে থাকে, ছেলেবেলায় দেখতাম, দুধ আর মাছ ছাড়া বেড়াল কিছু নেয় না। সেদিন সেদ্ধ-করা বাঁধাকপি মুখে করে নিয়ে গেল, উঠানে বসে খেল হাস-হাস করে। মা আর বউকে ডেকে দেখালাম। তারাও খারাপ দিনকালের কথা বলে দুঃখ করল।

যখন তেলের সের ছ আনা কি আট আনা ছিল তখন মাসকাবারি তেল ফুরিয়ে গেলে বাবা রাগারাগি করেছে, তখন মা কুঁদো সম্ভার দিয়ে আমাদের ডাল খাইয়েছে, আর তেল-নাহা-চচ্চড়ি। কুঁদো সম্ভার মানে কাঠখোলায় ফোড়ন ভেজে ডালে দেওয়া। ভাত টান হলে মা আদর করে বলেছে--বাবা, আজ একটু ঊন খাও। ঊনো ভাতে দুনো বল। তখনও মানুষ হা-ভাত জো-ভাত করে মরেছে, কিন্তু আমাদের কাছে অভাবের ছবি ছিল ওইটুকুন —এক আধদিন ঊন খাওয়া, কিংবা ডালে কুঁদো সম্ভার।

আমার পাঁচ বছরের মেয়ে মুন্নি এবার যোধপুর গার্লস-এ ভরতি হল। ভরতি হওয়াটা এতই কঠিন ছিল যে, মেয়ের মাকে পাঁচ টাকার ভোগ মানসিক করতে হয়। ভরতির পর এ পর্যন্ত শতখানেক টাকা নেমে গেছে, আরও ওরকম যাবে। ইউনিফর্ম সোয়েটার, জুতো-মোজা, বই-খাতা। অফিস টাইমের ভিড়ে মেয়ে ইস্কুলে যাবে কি করে? তাই এক পিঠের মিনি বাসের ভাড়া কবুল করতে হয়েছে। আকালের দিনে জন্ম বলেই বোধহয় মেয়েটা কিছু খেতে চায় না। মেয়ের মা মেয়েকে আপেল সাধে, মুসুম্বির রস, দুধ, ছানা। মেয়ে অধিকাংশই থুতিয়ে ফেলে দেয়। আমার সঙ্গে তফাত এই যে, আমরা দু-মাইল ঠেঙিয়ে ইস্কুলে যেতাম, ইউনিফর্ম কথাটা তখন মিলিটারিদের ব্যাপারে লাগে শুনেছি। ইস্কুলে বেতন দিতাম আট আনা। যা পেতাম খেয়ে ফেলতাম, আজানুলম্বিত পাকস্থলী ছিল

আমাদের। অধিকাংশই কুপথ্য। মেয়েকে কুপথ্য দেওয়া হয় না। আকালের দিনে বুক বুক করে বেঁধে রেখেছি তাকে।

এই আমরা। আমরা কজন। আমরা অনেকে। আমরা সবাই উনিশ শো পঁচাত্তর আমাদের কেমন যাবে। আকীর্ণ ধূলি-ঝঞ্ঝার মতো নক্ষত্রেরা আকাশ জুড়ে। বৃদ্ধ তারা, আবহমান কালের। অফুরান আকাশ পড়ে আছে শীতার্ত, তমসাময়ী। সেখানে উনিশ শো পঁচাত্তর বলে কিছু নেই। সময় সেখানে স্থির ও স্থবির। কেবল মানুষেরই আসে পঁচাত্তর, আকাল মৃত্যুভয়, বুকের মধ্যে তিনটে স্ট্যাম্প খাঁড়া দাঁড়িয়ে আছে, তীরের মতো ছুটে আসছে উনিশ শো পঁচাত্তর। কি হবে! বোল্ড! ভয় করে। বড় ভয় করে।

সারা কলকাতা জুড়েই দেখি ইস্কুলের সময়ে আমার মেয়ের মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ইস্কুলে যায়, ফেরে কাঁধে জলের বোতল, বইয়ের স্যুটকেস, টিফিনের বাক্স। মা-বাপের বুক জুড়ে, দাদু-ঠানুর নয়নের মণি হয়ে তারা রয়েছে পৃথিবীতে। আমাদের কাছে যেমনই লাগুক পুরোনো পৃথিবী, তাদের কাছে কিন্তু বিস্ময়ে ভরা এই নতুন ব্যক্ত জগৎ। কোন আলোক থেকে তারা নেমে এসেছে পৃথিবীতে, তাদের চোখে এখনও কী গভীর বিস্ময়, কী কৌতূহল, কী নিবিড় রহস্যবোধ। আমাদের অবিনাশী মঙ্গলবোধ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কেবলই প্রার্থনা করে, এরা পৃথিবীর গাঢ়তম দুর্দিন পার হোক।

জানুয়ারির এগারো তারিখে শিয়ালদার আট নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসেছিলাম দার্জিলিং মেল-এর জন্য। বোন আসবে। আড়াই ঘণ্টা লেট ছিল ট্রেন। শিয়ালদায় রোজ জীবন-মৃত্যুর যেসব নাটকীয়তা ঘটে তারই ছোট একটা দৃশ্য দেখা হয়ে গেল। ভারতবর্ষের নামহীন পরিচয়হীন ঠিকানাহীন জনসাধারণ মাঠে ঘাটে পড়ে আছে। প্ল্যাটফর্মে তাদেরই একজন, এক আধবুড়ি দুটো বাচ্চা নিয়ে বসে কাঁদছে। কত কান্না খেয়াল করি না। এটাও করছিলাম না। কিন্তু বারংবার পিছনের দিক থেকে বিলাপটা কানে আসছিল বলে ইচ্ছে না থাকলেও শোনা হয়ে গেল। আধঘণ্টা আগে তার পাঁচ বছরের মেয়েটাকে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। বুড়ি বুঝি পোঁটলা খুলছিল, সেই ফাঁকে চোখের পলকে ঘটনা। চমকে উঠলাম, যখন কানে এল, বুড়ি মুন্নির নাম ধরে চেঁচিয়ে কাঁদছে। আমার সমস্ত অস্তিত্ব ধরে নাড়া দেয় ওই নাম। আমার মেয়ের নামও মুন্নি, তারও পাঁচ বছর বয়স। শিয়ালদার মুন্নিকে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে, তাই মনের মধ্যে আবার সেই তীক্ষ্ণ পেরেকের যন্ত্রণা। আমরা...আমরা কেমন থাকব...আমাদের কিছু হবে না তো?

জলপাইগুড়ির সেই ভয়াবহ বাঁধভাঙা বন্যার সময়ে একটি পরিবার--স্বামী-স্ত্রী আর দুই মেয়ে উঠে বসেছিল টিনের চালায়। মেয়ে দুটি ছোট। জল বাড়ছে। স্রোতের অসম্ভব টানে কাত হয়ে যাচ্ছে টিনের চালা, মেয়ে দুটি ভারসাম্য রাখতে পারছে না। মা তাদের দুহাতে টেনে রেখেছে। কিন্তু পারছে না। ক্রমে কাত হয়ে ঢালু বেড়ে যাচ্ছে। মা চিৎকার করে জিগ্যেস করল--কী করব, ওদের রাখতে পারছি না। মেয়েদের বাপ বলল--ছেড়ে দাও।

সে কথা শুনতে পেল মৃত্যুভয়াক্রান্ত মেয়ে দুটি, চিৎকার করে বলতে লাগল--ছেড়ো না মা, আমাদের ছেড়ো না! সেই মুহূর্তটাকে কল্পনা করি। মা আর বাপের সঙ্গে সন্তানের কী ঘোর অবিশ্বাস আর নিষ্ঠুরতার সম্পর্ক। এ ঘটনার পরিণতি কী হয়েছিল তা থাক গে। কী হবে জেনে! এখনও তো বেঁচে আছি আমরা। শীতের রোদ বেশ জমকালো, মাঝে মাঝে একটু কুয়াশামাখা সুন্দর জ্যোৎস্না হয়। জিনিসপত্রের দাম কিছু কিছু কমেছে।

কয়েকবছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে। বালি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। ঝড়ের বেগে একটা থ্রু ট্রেন প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়িটা চলে যেতেই দেখি বহুলোক ছোটাছুটি করে লাইনের ধারে জড়ো হয়েছে, কয়েকজন লাইনের ওপর লাফিয়ে নামল। গিয়ে দেখি একটা ছাগলছানা, লাইনের পাথরের ওপর বোধহয় কলার বা কমলার খোসা খেতে গিয়েছিল, তার চারটে ঠ্যাং কেটে দিয়ে গেছে থ্রু গাড়ি। ধরাধরি করে লোকেরা তাকে তুলল প্ল্যাটফর্মে। দৌড়ে গিয়ে কেউ কেউ জল আনল কল থেকে। ছাগলটা তখনও বেঁচে আছে, জিব বার করে জলটুকু কষে ধরবার চেষ্টা করছে। ছাগলের কাটা দেহ থেকে চোখ তুলে সেই ভিড়ের মানুষের মুখ দেখেছিলাম, অনেকের চোখে জল, সকলেরই মুখে ব্যথা ও বেদনার চিহ্ন। একটা বাচ্চা মেয়ে শব্দ করে কাঁদছিল। আজও কষাইখানার পাশ দিয়ে যখন যাই, লম্বমান পাঁঠাখাসির ছাল-ছাড়ানো দেহগুলি হেঁটমুণ্ডে ঝোলে দেখি, তখন মানুষের ভিতরকার স্ববিরোধের কথা আমার মনে হয় না। না, আমি মানুষের ভণ্ডামির জন্য হাসি না। মনে হয়, ট্রেনে কাটা পড়া ওই ছাগশিশুর জন্য যে কজন মানুষের মুখে উৎসারিত ব্যথা ও বেদনার চিহ্ন দেখেছিলাম তা ঠিক মুখোশ নয়। থ্রু ট্রেনের সেই ভয়ঙ্কর চলে যাওয়া এবং কচি একটি ছাগশিশুর ভাঙা দেহের রক্ত-মাংস-হাড় মাংসাশী মানুষের ভিতরে জাগিয়ে তুলেছিল ভয়। নিরাপত্তার অভাব। আর এই থেকেই তার নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে আলোড়ন ওঠে। করুণা আসে।

আমরা এই রকম। মৃত্যুভয়ে আক্রান্ত। মৃত্যুশীল। আমরা বড় অবোধ ও অজ্ঞান। জানি না কী হবে। জানি না, তাই ভয় ভয়। উনিশ শো পঁচাত্তর আমরা কি পেরিয়ে যাব! নাকি যাব না?

ভয় করে। বড় ভয় করে।

তবু উনিশ শো পঁচাত্তরেও কিছু কম সুন্দর নয় সকালের রোদ। উদ্ভিদের সজীবতা। চাঁদ ওঠে, সূর্য ওঠে। শিশুরা ইস্কুলে যায়। কেবল আমাদের বয়স এক বছর করে বাড়ছে এবার। অনেকে আউট হয়ে গেছেন, অনেকেই আউটের অপেক্ষায়, ক্রিজে। তবু অনেকেই খেলছি এখনও। একটু ভয়ে ভয়ে যদিও। চারদিকে ফাঁদ। ক্যাপটেন, কী করি?

মাঠের চারধারে একটু অন্ধকারের ঘেরজাল। সেই তমসার ওপারে থেকে ক্যাপটেন হাত তুলে আছেন। তাঁর হাতে এখনও সেই পেরেকের চিহ্ন, পায়ে ব্যাধের তীর বিঁধে আছে, গলায় বিষের নীল, দেহে অস্ত্রাঘাত, হাতে পায়ে বন্ধনের চিহ্ন, কণ্ঠে দুরারোগ্য

কর্কট ব্যাধি। বারংবার মানুষের হাতে নিহত তিনি তমসার পার থেকে বলেন--ধৈর্য ধরো, বিপদ কেটে যাবে। মনে রেখো, তুমি তোমার নিজের, নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। মোরো না, মোরো না, পারো তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো।

বিবাহে বিবিধ বাধা

কবে গুটি গুটি বালিকা মেয়েটি বেড়ে উঠল, চোখে এল ব্রীড়া, কবে সে বুঝতে শিখল সে মেয়ে। তার রূপান্তরের সঠিক বয়সটা নিরুপণ করা একটু শক্ত। বয়ঃসন্ধি সকলের তো এক বয়সে আসে না। ছেলেদেরও একটা বয়সের পর শরীরের কিছু ভাঙচুর হয়, কণ্ঠস্বর ভেঙে বদলে যায়, দাড়িগোঁফ গজাতে থাকে। কিন্তু তারও কোনও নির্দিষ্ট বয়স নেই। একেকজনের এক একরকম।

প্রকৃতিতে এই এক বৈশিষ্ট্য আছে, তার কোনওটাই ঠিক আর একটির মতো হুবহু একরকম হয় না। এর গাছে ফল আগে এল, অন্য গাছ একটু পরে। আবার তার রকমফেরই বা কত। এই আমের মরশুমে বাজারে গেলে দেখা যায়, কত না নাম, কত না রস আর রং আর আঁশের বিভিন্নতা নিয়ে নানা দর আর কদরের ফল বিকোচ্ছে। জানতে ইচ্ছে করে, তবে কি প্রকৃতির সমাজে সাম্য নেই; বর্ণাশ্রম আছে? ল্যাংড়া আমকে অমন গন্ধ আর স্বাদ দিয়ে পাঠানো হল দুনিয়ায়, বেচারা কিছু আম তার পাশে কেন অত আদরের নয়? ল্যাংড়া, বোম্বাই হিমসাগর নিয়ে লোকের যত নাচানাচি, তা বলে কি দিশি আমও ফেলা যায় না। তা দিয়ে দিব্যি আমচুর হয়, আমসত্ব হয়, চাটনি বা ডালেও ফেলনা নয়। অর্থাৎ সকলেরই উপযোগিতা রয়েছে, বৈশিষ্ট্যমাফিক তাকে কাজে লাগানোটাই আসল।

শিবের গীত গেয়ে ধান ভানলে ক্ষতি নেই। কথাটা হচ্ছিল বয়ঃসন্ধির বয়স নিয়ে। বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে কিশোরীরা যৌবনে পা দেয়। মেয়েদের যৌবন কিছু তাড়াতাড়ি আসে। ছেলেরাও বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যুবক হয় বটে কিন্তু মেয়েদের তুলনায় তাদের এই রূপান্তর ঘটে কিছু দেরিতে। প্রকৃতির এই নিয়মের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে আজও মানুষের সমাজে বয়সে স্বামী বড় এবং স্ত্রী ছোট হওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। যদিও বর বড় এবং কনে ছোট হতেই হবে এমনতর কোনও আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই তবু সারা পৃথিবী জুড়ে সাধারণভাবেই এই রীতিটি গ্রাহ্য হচ্ছে আজও। স্বামী এবং স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য কতটা হবে তার অবশ্য স্থিরতা নেই, যেমন স্থিরতা নেই বিয়ের বয়সেরও। প্রথম ও দ্বিতীয় এই

দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানুষের আধুনিক কালের ইতিহাসে দুই ধ্রুব ঘটনা যাকে সূচক হিসেবে ধরলে মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত রুচি বা আচরণের কতটা ওঠানামা ঘটেছে তা বিচার করা সহজ হয়। বিশ্বযুদ্ধগুলি যখন ঘটেনি তখন আমাদের দেশে বিবাহ বলতেই ছিল বাল্য বিবাহ। শহরে গঞ্জে দুটি একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিয়েতে বড় একটা বিলম্ব ঘটত না, এবং প্রায় সময়েই দেখা যেত বর স্কুল বা কলেজের ছাত্র, কনে বয়ঃসন্ধিতেও পৌঁছোয়নি। এর ফল খুব খারাপ বা খুব ভালো কি হয়েছিল তা বিচার করা মুশকিল। দেশে সুসন্তান সে যুগে কিছু কম জন্মায়নি, যোগ্য মানুষের আকাল এতটা ছিল না। তবে কিশোরী বয়স থেকে সন্তান ধারণের ফলে মায়েদের শরীর নানাভাবে ভেঙে যেত এবং মেয়েদের এই শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্যই রায়বাহাদুর হরবিলাস সারদা ১৯২৯ সালে বর-কনের নিম্নতম বিয়ের বয়স বেঁধে দেওয়ার জন্য যে আইন করেন তা সারদা আইন নামে বিখ্যাত। এই আইনে কনের বিয়ের বয়স নির্দিষ্ট ছিল ১৫, বরের ১৮। দেশের বিরাট অংশে এই আইনের ফলে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। অনেকেই বাল্য বিবাহ রদকে তখন ভালো চোখে দেখেননি, আজও ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের লোক দেখেন না।

মেয়েদের স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণেই সারদা আইন হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শাহরাঞ্চলে এ আইনের খুব বেশি তাৎপর্য নেই। কারণ, ইতিমধ্যে, বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সচেতন মানুষেরা, শিক্ষিত ব্যক্তিরা এবং শহুরে হাওয়া লাগা লোকও অর্থনৈতিক মানসিকতা অর্জন করেছে। অর্জনপটু হওয়ার আগে তারা মরতে বিয়ের কথা ভাবে না। কিন্তু এখনও গাঁয়ে গঞ্জে দেশের প্রত্যন্ত গভীরে বালিকাবয়সি মেয়েরা এক্কাদোক্কার কোট ছেড়ে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে, পুরুত মন্ত্র পড়ায় আর সে ঘুমে ঢলে ঢলে পড়ে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যখন বিপজ্জনকভাবে ৬০ কোটি, যখন নানাভাবে জনবন্যা রোধে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা চলছে তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কর্ণ সিং বিয়ের বয়স সংশোধন করে একটি প্রস্তাব এনেছেন, যাতে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে কনের ১৮ বরের ২১। বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স বেড়ে যাওয়ার ফলে সন্তানের জন্মও বিলম্বিত হবে এবং তাতে জনসংখ্যা সীমিত রাখতে কিছুটা সুবিধাও হবে সন্দেহ নেই।

আইন প্রণয়ন সহজ কিন্তু তার প্রয়োগই একশো গুণ বা হাজার গুণ কঠিন। প্রথমত, প্রত্যন্ত গ্রামের সমাজে কি ঘটছে না ঘটছে তার খবর আনে কে? দ্বিতীয়ত, কার বয়স কত তা প্রমাণই বা হবে কি করে? জনগণের অধিকাংশেরই কোনও বার্থ সার্টিফিকেট নেই যে। এই এক সপ্তাহ আগেও সন্দরবনের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বয়সের প্রসঙ্গে মানুষকে বোকা হয়ে যেতে দেখেছি। অথচ জনসংখ্যার বৃদ্ধি আসল ঘটে ওই সব গাঁ গঞ্জেই যেখানে পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন গিয়ে পৌঁছোয় না। যেখানকার মানুষ এখনও নিজের সঙ্গে দেশের বৃহৎ সমাজের যোগ বা পারস্পরিক দায়িত্বের কথা শেখার সুযোগ পায়নি।

জনসংখ্যা রোধের উপায় হিসেবে এই আইনটি বাহিত হলে দেশের পক্ষে হয়তো মঙ্গল, কিন্তু আইন যাদের জন্য সেই শিক্ষাহীন, দেশকাল উদাসীন গ্রামীণ মানুষদের কাছে এই আইনের কথা পৌঁছোবে কি? শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার ব্যাপকভাবে না ঘটলে আইন এদের কাছে কাগজের দুর্বোধ্য লিপি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শিবের গীত আও একটু গাওয়া যাক। সম্প্রতি দেশে বিবাহ-ভাবনার কিছু প্রকাশ দেখছি। এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। মানুষের এটা বুঝবার বোধ করি সময় হয়েছে যে, বিয়েটা একটি সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্য, ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা মোচনমাত্র নয়। বিয়ের ফলে সমাজে প্রজা বৃদ্ধি ঘটে, তাই প্রজাপতি বিবাহের দেবতা। তাই বিয়ের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে দেশেরও ভালো মন্দের প্রশ্ন। স্বামী-স্ত্রী যে সন্তানকে পৃথিবীতে আনছেন সে কি সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হবে, নাকি হবে ভীরু কাপুরুষ সমাজবিরোধী, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক বা অকৃতজ্ঞ? বিয়ের প্রশ্নটি তাই খুবই গুরুতর, এতে ব্যক্তিগত রুচি, ভালো লাগা বা তথাকথিত প্রেমের ভূমিকাটিকে এখন একটু খাটো করে দেখাই বোধহয় ভালো।

পৃথিবী জুড়ে আজ শস্য-ফল, জীবজন্তু প্রভৃতির সুপ্রজন নিয়ে জীববিজ্ঞানীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন। কেবল মানুষের সমাজেই সুপ্রজননের বিষয়টি বিস্ময়করভাবে উপেক্ষিত থাকছে। জনসংখ্যা রোধই তো একমাত্র সমস্যা নয়, দেশের সর্বাত্মক যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কিছু যোগ্য জনও যে আমাদের একান্ত দরকার। সমাজে আজ বাঁধাভাঙা উলটোপালটা বিয়ের যে প্লাবন চলছে তা থেকে সুসন্তান আশা করা কি আহাম্মকের স্বপ্ন নয়?

এই গ্রীষ্মে আমের বাজারে গিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষেই ভালো জাতের আম খুঁজি। মানুষের সমাজেও এই খোঁজ প্রকারান্তরে চলছে। ভালো জাতের মানুষ ভালো প্রাণের মানুষ চরিত্রবান মানুষ। একটা তেমন মানুষকে পৃথিবীতে আনতে মানুষের কত কত শতকের সাধনা লেগে যায় তা বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন।

সম্প্রতি অসবর্ণ বিবাহকে উৎসাহ দিতে সরকার পুরস্কার দিচ্ছেন, প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। আমাদের বিনীত প্রশ্ন, বর্ণাশ্রম ভেঙে মানুষ মানুষে সাম্য আনার এটাই কি চরম প্রচেষ্টা? বর্ণাশ্রমের অপব্যবহারের ফলে উদ্ভূত জাতিভেদ যেমন সর্বথা নিন্দনীয় তেমনি আবার বর্ণাশ্রমের মূল বনিয়াদকে ভেঙে ফলাও বোধ হয় বিপজ্জনক। কেন না এখনও আমরা বর্ণাশ্রমের বিপক্ষে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সত্যকে পাইনি। জন্মরহস্য নিয়ে এখনও যখন গবেষণার শেষ নেই, জেনিমালার গঠন, বংশক্রম, মানুষের শরীর ও মনের নানা রহস্যের কিনারায় যখন বিজ্ঞান নিযুক্ত রয়েছে, তখন আমরা কেন তাড়াহুড়ো করে বর্ণাশ্রম ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেব? আমরা কি সঠিক জানি যে এতে ভালো হবে?

শাস্ত্রে অসবর্ণ বিয়ে পরিত্যজ্য হয়নি, তবে তার যে শর্ত রয়েছে তা না মেনে এই বয়ে শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ। শাস্ত্র যদি না-ই মানি তবে অন্তত এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের কাজে লাগানো দরকার। কারণ সুপ্রজন আজ মানুষের সমাজের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়ার নামে এ ব্যাপারে বোধহয় যথেচ্ছাচার করতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ যে-কোনও বিবাহের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আর বিবাহের স্বাধীনতার ফলে সমাজে দাম্পত্যজীবনের যে চিত্রগুলি দেখতে পাই তাও বোধহয় মানুষের কাছে খুব একটা অভয়প্রদ নয়। শুধু বিবাহের বয়স নয়, শিক্ষা-দীক্ষা বর্ণ স্বাস্থ্য চিত্তবৃত্তি এই সব দিক দিয়ে বিবাহকে সমাজ সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করা আজ বড় জরুরি দরকার। এ বিষয়ে বর্তমান লেখকও মতামত ও জ্ঞান লাভে আগ্রহী।

অলৌকিক ঘেরাটোপ

শীতের রোদে, প্রায় দিনই সকালে শীতলাবাড়ির মাঠে গিয়ে বসি। পশ্চিমে বহু পুরোনো, অন্ধকার শীতলা মন্দির, তার চত্বরে হাড়িকাঠ। দক্ষিণে মজা গভীর গর্তের মতো সবুজ জলের পুকুর, তার ভাঙা পাড়ে একশো-দুশো বছরের পুরোনো বাড়ির দুটো দেওয়াল নোনায় ঝুরঝুরে হয়ে দাঁড়িয়ে। অশ্বত্থের শিকড় ছেয়ে ফেলেছে তাদের। ওই দেওয়ালের পাশ দিয়ে পায়ে হাঁটা বুনো পথ চলে গেছে দক্ষিণে, আগাছা বাঁশবনের ভিতরে দুঃখী কয়েকটা ছন্নছাড়া বাড়ির উঠোনে গিয়ে শেষ হয়েছে। উত্তর ধারে রাস্তা, পশ্চিমমুখো সমবায় পল্লী বেলানগর, সাহেব বাগান, নাকালপাড়া অবধি চলে গেছে বড় ঝিলের ধার ঘেঁষে। রাস্তা পেরোলে উত্তরে আবার বাঁশবন—তার মাঝখানে আবার সবুজ জলের একটা প্রাচীন পুকুর। আমার চারধারে এমনই সব দৃশ্য—প্রাচীনতার ছাপ যার গায়ে। মাঝে মাঝে গ্রিল দেওয়া নতুন বাড়ি, দোকান, রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেল দৌড়ে যায়, পুবে, ইলেকট্রিক ট্রেনের লাইন। কলকাতা খুব দূরে নয়, ছাদে উঠলে দক্ষিণ—পুবে হাওড়া ব্রিজের মাথা দেখা যায় কুয়াশার মতো আবছা। মাত্র আট কিলোমিটার।

শীতলা থানের মাঠে শীতের কবোষ্ণ রোদে আমার দু-বছরের মেয়ে গরবিনী হয়ে হাঁটে। ভারী উলের পোশাকে তাকে এস্কিমোর মতো দেখায়। মাঠের ধারে কাছে ছাগল চরে। বেওয়ারিশ কুকুরেরা ল্যাড ল্যাড করে বেড়ায়। আমার মেয়ে তার নরম হাতে ঢিল কুড়িয়ে ছুড়বার চেষ্টা করে। ঢিলকুড়োতে একটু দূরে চলে যায়, আবার দৌড়ে চলে আসে কাছে, আমার হাঁটু ছুঁয়ে দাঁড়ায়। আবার আস্তে আস্তে হেঁটে দূরে যায়। আবার ফিরে আসে। বাবাকে ঘিরে ওই তার খেলা। অন্যমনে চেয়ে দেখি। বাঁশবনে গভীর মর্মর তুলে আসে

উত্তরের হাওয়া, শীতের কবোষ্ণ রোদ নেশাড়ু ওম দেয়। সামনেই পুরোনো দেওয়ালটা, পশ্চিমে শীতলার থানা, গঞ্জের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী মানুষ—এ সবই আমাকে আলগাভাবে স্পর্শ করে। চোখের সামনে কিছু এই বাস্তবতা, আর কিছু আমার মনের প্রক্ষিপ্ত স্মৃতি ও কল্পনা—সব মিলে মিশে এক অদ্ভুত ঘেরাটোপ রচনা করে আমার চারদিকে। আমি গভীর চোখে দক্ষিণের পুকুরের গভীর সবুজ রং দেখি, আর অমনি উড়োজাহাজের মতো দিগন্তে হাজারটা স্মৃতি উড়ে আসে। পুকুরপাড়ে বড় কচুপাতার আড়ালে সুপুরী গাছের ঘাটলায় কে যেন ঘোমটায় মুখ ঢেকে বাসন মাজতে বসেছে। সে কে বলো তো! জেঠিমা, না ঠাকুমা? নীলাম্বরী খুড়ি, নাকি মাখনি পিসি? ওই যে প্রকাণ্ড বগীথালাখানা—ওটাতে ভাত খায় আমার ঠাকুদার না? অবিকল দেখতে পাই, বালি-দুর্গাপুরের পুকুরটার ওই পাশে স্বপ্নের ঢালু ছায়ায় আচ্ছন্ন এক ঘাটলায় ময়মনসিংহের সেই পগারপাড় নেমে এসেছে। বুনো পথটি আলো থেকে বেঁকে ছায়ার আচ্ছন্নতায় হঠাৎ কয়েকশো মাইল পেরিয়ে গিয়ে শৈশবস্মৃতিতে চলে গেল। একটু গেলেই দেখা যাবে নরম মাটিতে গোড়ালি চেপে তৈরি পিল-এ জেত্তাল খেলছে রাখালভাই আর বিশা। আমার চারিদিকে বাস্তবতার মধ্যে এইভাবেই স্বপ্ন ও স্মৃতির ভেজাল মিশে যায়। কিছু সত্য কিছু বা মনের নির্মাণ—আমরা কি সকলেই এরকম ঘেরাটোপে বাস করি না?

গরম লাগে বলে আমার দু-বছরের মেয়ে তার মাথায় টুপি টেনে খুলে ফেলেছে, হাঁটু ছুঁয়ে ডাকছে—বাবা। চমকে উঠে তাকাই। মনে পড়ে, এই উনিশশো একাত্তরে আমি ছত্রিশ পূর্ণ করে যাচ্ছি। ছত্রিশে আমার জীবন পরিষ্কারভাবে দ্বিখণ্ডিত নস্টালজিয়ার স্রোতে ছটফট করে ধুলোয় গড়ায় আমার মন, অন্যদিকে স্থির বহিরঙ্গে পড়ে আছে আমার শান্ত কাটামুণ্ডের মতো অস্তিত্ব—শীতের কবোষ্ণ রোদের আরামে অর্ধনিমীলিত চোখ। সেই চোখে সবিস্ময়ে আত্মজার দিকে চেয়ে থাকি। তুমি কে? আমার মেয়ে আমার হাঁটু ছুঁয়ে টুপিটা বাড়িয়ে দেয়। বলে, নে বাবা নে।

আমি নিই। তাকে দিই আমার শৈশবস্মৃতির উত্তরাধিকার।

বেলতলায় যেখানে ঘটপুজো হয়েছিল এইখানে দাঁড়িয়ে পেছু বাড়িয়েছে একটা ছাগল, ভ্রমরের দোকানের সামনে বসে কুকুর পা চুলকোয়, ন্যাড়া শিমুলগাছে এসে বসে ময়ূরকণ্ঠী রঙের কবুতর, খড় বোঝাই মন্থর গরুর গাড়ি চলে যায়। আমার মেয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিতে থাকে, মাঝে মাঝে দাঁড়ায়, বিস্ময়ে চারধারের তুচ্ছ দৃশ্য সব দেখে। এইসব দৃশ্য শব্দ, শীতের এই নরম রোদের সকাল সে সঞ্চয় করে নেয়। একদিন দূর ভবিষ্যতে তারও চারদিকের বাস্তবতায় মিশে যাবে তার এইসব শৈশবস্মৃতি। অবেলায় দুপুরের ঘুম ভেঙে উঠে সেও একদিন অবাক বিস্ময়ে দেখবে তার দক্ষিণের জানালার পাশে সজনের ডালে তার শৈশব থেকে উড়ে এসে চুপ করে বসে আছে ময়ূরকণ্ঠী এক কবুতর।

আমাদের হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নায় অবিকল এইসব স্মৃতিদের ওড়াউড়ি। নিজের বুকের ওম-এ যেমন পাখিরা মুখ ডুবিয়ে রাখে, তেমনি মাঝে মাঝে স্মৃতিতে আমাদের মুখ ডোবানো। আমাদের প্রিয় কেন স্মৃতি? বোধহয় এ কারণে যে, স্মৃতি আমাদের মৃত্যুর বিপরীত দিকে নিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে মনে হয় মৃত্যুই সবকিছুর নিয়ামক।

তার চৈতন্যময় অস্তিত্বকে মানুষ বড় ভালোবাসে। অস্তিত্ব মানুষের বড় প্রিয়। এই প্রিয়ত্বের মূল হচ্ছে দুর্লভতা। তার চেতনা, তার অস্তিত্ব—একে ছেড়ে সে কোনও জড়বস্তু হয়ে যেতে চায় না। ফলে, অস্তিত্বের নিয়মই হচ্ছে মৃত্যুর বিপরীত দিকে চলা। মানুষ চায় অনন্ত অস্তিত্ব। এই ইচ্ছা উদ্ভিদে, পশুতে, কীটেও রয়েছে Instinct হিসেবে। মানুষের ইচ্ছা আরও তীব্র আবেগপূর্ণ অথচ অস্তিত্ব অনন্ত নয় তা সে জানে। নিয়মানুসারে মৃত্যু আসে। ওই মৃত্যুই জীবনকে দুর্লভতার মুকুট পরায়, মহার্ঘতা আরোপ করে।

কিছুকাল আগে আমার এক বর্ষিয়সী আত্মীয়ের হৃদরোগের খবর পেয়ে যাদবপুরের উদ্বাস্তু কলোনিতে তাঁকে দেখতে যাই। তখন শীতের ম্লান বিবর্ণ অপরাহ্ন। বোধ হয় শীতের অপরাহ্নের মতো বিষণ্ণ সময় আর হয় না। কেমন যেন মৃত্যু আকীর্ণ চরাচর। টিনের ঘরে দরিদ্র বিছানায়, দক্ষিণের খোলা জানলার দিকে শিয়র করে আমার সেই আত্মীয়া শুয়েছিলেন। সেই অপরাহ্নের মলিন আলোয় আমি তাঁর নির্বাণোন্মুখ মুখখানায় কী যে দেখেছিলাম তা এখনও আমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। মানুষ আর একটা মানুষকে কখনওই সম্পূর্ণরূপে দেখতে পায় না। খানিকটা দেখে খানিকটা কল্পনা করে নেয়। সম্ভবত আমিও আমার সেই বর্ষিয়সী স্নেহপ্রবণা আত্মীয়ার রোগক্লিষ্ট মুখখানার খানিকটা দেখেছিলাম, আর খানিকটা কল্পনা করে নিয়েছিল মৃত্যু চিন্তায় আকীর্ণ আমার ব্যাকুল মন। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে আমি তক্ষুনি আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করেছিলাম, মৃত্যুকে অনুভব করেছিলাম আমার সেই আত্মীয়ার প্রবীণ মুখশ্রীর অক্ষিপল্লবে, ভ্রূতে রূক্ষ চুল ও বিবর্ণ গাত্রচর্মে। তিনি আকুলভাবে আমার হাত ধরে বললেন আমি যে কাল মরে যাচ্ছিলাম রে! আজ যে আমি তোকে দেখতেও পেতাম না। এই কথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। সেই কান্নায় অসম্ভব ব্যাকুলতা ছিল। সেই কান্না কেবল আমার উদ্দেশ্যেই নয়। সম্ভবত এই জীবন এই সংসার এই আলো-অন্ধকার এবং পাপপূণ্যময় ব্যক্ত যে জীবন তার উদ্দেশ্যেই ছিল সেই নৈর্ব্যক্তিক ক্রন্দন। সত্তরের কোঠায় তখন তাঁর বয়স দীর্ঘস্মৃতিবিজড়িত জীবন—প্রিয় এবং অপ্রিয় সুখ এবং দুঃখজড়িত, অনুযোগ এবং ক্ষমায় গঠিত এই জীবন তাঁকে খুব শিগগিরই একদিন ছেড়ে যেতে হবে। একটা ঢেউ এসে হয়তো তাঁকে নিয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তী ঢেউ আসবেই তাঁকে নিয়ে যেতে। যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ এই জীবন কী ভীষণ মূল্যবান! হয়তো এত সব তিনি এত স্পষ্ট করে ভাবেননি! তিনি হয়তো তাঁর প্রবাসী সন্তানদের কথা ভাবছিলেন—হায় ভগবান, ওদের সঙ্গে একবার দেখা হবে

না? তিনি তাঁর ঘরের দিকে চেয়ে ভাবছিলেন—এই ঘরসংসার কে দেখবে? কিছুক্ষণ কেঁদে তিনি চুপ করে ছিলেন। কিন্তু তাঁর নীরব কান্নার রেশ হৃৎপিণ্ডের অস্পষ্ট শব্দের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। আমি তা অনুভব করছিলাম, মাঝে মাঝে তাঁর স্খলিত বিলাপ, এই পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের একটা শেষ চিহ্ন রেখে যেতে চাইছিল। দেওয়ালে টাঙানোর তাঁর স্বর্গত স্বামীর ছবি, তার পাশে গুরুদেবের ছবি। প্রতিদিন জীবনের নানাঘাত-প্রতিঘাতে তিনি হয়তো কতবার স্বামীর ছবির দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করেছেন আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও, বড় একা আছি। হয়তো তিনি গুরুদেবের ছবির দিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন—এবার শ্রীচরণে স্থান দাও, সংসার আর কেন? তবু প্রকৃত মৃত্যু স্তব্ধতা নিকটবর্তী হলে তিনি পরপারের কোনও গতিকেই শান্তভাবে কল্পনা করতে পারছিলেন না। যে জীবন ফেলে যেতে হবে, সেই রক্তমাংসপিণ্ডের ওপর নির্ভরশীল নশ্বর ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্মৃতিই তাকে বিপরীত দিকে আকর্ষণ করছিল। মৃত্যুর উপশম চাইছিল তাঁর স্মৃতিতাড়িত মন।

আমি তাঁর সেই আকুলতাকে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম। আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে মৃত্যুর ডাক বেজে গেল। তখন অপরাহ্নের বিষণ্নশীত বেলা, চারদিকে ঝুম হয়ে নামছে শীতের কুয়াশা জড়ানো রহস্যময় অতিলৌকিক সন্ধ্যাকাল। কালবেলা। বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করে আছড়ে পড়ছে আমার হৃদযন্ত্র, আমার অস্তিত্ব, আমার আমি। কল্পনার চোখে প্রত্যক্ষ করলাম আমারই এক প্রবীণ বয়সের শেষ দৃশ্য—দক্ষিণ শিয়রে মাথা, কাল-অপরাহ্ন, শীতের বেলায় আমার মৃত্যুর ঘোরালাগা চোখের দিকে চেয়ে আছে পৃথিবীর প্রিয়জন, যাদের কাছ থেকে আমার বিদায় বিদায়।

কিন্তু কোথায় যাব আমি? পাঠশালায় হঠাৎ পাঠ ভুলে যাওয়া ভীত বালকের মতো অস্থিরভাবে চারদিকে চেয়ে এই অদ্ভুত সংকটের সমাধান খুঁজি আমি আজও।

এ সেই পুরোনো ঘটনা যা বুদ্ধদেবের জীবনেও ঘটেছিল। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর উপশম খুঁজতে যিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন। নাকি, ভুল বললাম! এরকম কোনও ঘটনা ভগবান বুদ্ধের জীবনে ঘটেনি। ঘটেছিল গৌতম নামে একজন মানুষের জীবনে। সেই মানুষ গৌতম পরবর্তীকালে হয়েছিলেন, ভগবান বুদ্ধ। কিন্তু গৌতম যদি বুদ্ধ না হতেন? ঠিক সেই রকমই বুদ্ধের পরও কোটি কোটি মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, জরা-ব্যাধি মৃত্যুর কবলিত হয়েছে। তারা গৌতমের সেই মানুষি দুর্বলতাকে অনুভব করে, ভয় পায়, অস্থিরতা বোধ করে। কিন্তু তারা সংসার ছাড়তে পারে না, তারা ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো দেখে সব মর্মন্তুদ দৃশ্য—যৌবনের জরা লাগছে, কীটদষ্ট হয়ে যাচ্ছে সুন্দর ফল, দেখে প্রিয়-বিয়োগ। গৌতমের যন্ত্রণা আমরা পেয়েছি, বুদ্ধের প্রশান্তি নয়।

যে বোধির দ্বারা বুদ্ধ মৃত্যুকে জয় করেছিলেন তার প্রকৃত পরিচয় আমার অজানা। শোনা যায়, বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব মানতেন না, তাঁর জন্মান্তরবাদকে কর্মতত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা

করা হয়ে থাকে। আমার তাতে তেমন আগ্রহ নেই। আমার প্রিয় তাঁর জাতকের গল্প। গল্প নয়, স্মৃতিচারণ। শৈশব কৈশোরের স্মৃতি নয় এ স্মৃতি হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু ভেদ করে নিজের অনন্ত প্রবাহকে লক্ষ করা। নিজেকে অনন্ত বলে জানলে মৃত্যু তুচ্ছ হয়ে যায়। মৃত্যুর উপশম কি বুদ্ধ এইভাবেই অলৌকিক স্মৃতিচারণের ভিতর দিয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন? অনেকটা এরকম আভাস দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যখন তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমিও অনেকবার জন্মগ্রহণ করেছ, আমিও অনেকবার। কিন্তু তোমার আর আমার মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে এই যে, তোমার সেই সব জন্মের কথা মনে নেই, আমার আছে। এই জন্যই কি আমাদের প্রার্থনার মন্ত্রের বলা হয়—দেহি মে জীবনবুদ্ধি নিয়তং স্মৃতিচিদযুতে?

অস্তিত্বের আর একটি গুণ—তার বুদ্ধি। বিস্তার বা সম্প্রসারণ তার প্রকৃতিগত। জীবন এক জায়গায় স্থির নেই। তার গতি নানামুখী। বুদ্ধিও তার এক রকমের গতি। এই গতির কোনও বিরাম নেই। পৃথিবী হচ্ছে উপলখণ্ডময় একটি পথ। তার ওপর দিয়ে আহত-ব্যাহত হয়েও এই গতি বয়ে যায়। এই যে আমার আমি তা প্রতিনিয়তই পালটে যাচ্ছে। বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় অস্তিত্ব। এই বহুধা বিভক্ত সত্তাকে গ্রথিত রাখে তার স্মৃতিবাহী চেতনা। স্মৃতি হচ্ছে সেই ধনুক যা জীবনের ছিলাকে রাখে টান টান।

আমরা চলেছি আমাদের স্মৃতির সুতো ধরে ধরে। শীতের কবোষ্ণ রোদে আমার মেয়ে আমাকে হাত ধরে শীতলাবাড়ির মাঠ থেকে যখন ঘরে নিয়ে যায়, তখন আমার চারপাশে যে সুন্দর প্রকৃতির ঘেরাটোপ, যে আলোছায়াময় মায়াবী নির্মাণ, তার ভিতর দিয়ে চলেছে আমাদের অজ্ঞাতে এক স্মৃতি মন্থনের কাল। আমার স্মৃতিই বলে দিচ্ছে—যে মেয়েটি আমার হাত ধরে টেনে নিচ্ছে সে আমারই মেয়ে। আমার স্মৃতি তাকে বলে দিচ্ছে যে, আমি ওর বাবা। নইলে, আমরা পরস্পরের কাছ থেকে হারিয়ে যেতাম। কালকের আমির কাছ থেকে হারিয়ে যেতাম আজকের আমি। তবু আমরা সকলেই কিছু বুদ্ধ বা কৃষ্ণ নই। আমাদের সীমাবদ্ধ স্মৃতিশক্তি জন্ম-মৃত্যু ভেদ করতে পারে না। এমনকী এই জন্মেরই কত কথা ভুলে গেছি, কত দিনকার কথা মনেও পড়ে না। তবু ওই সুতো ধরে ধরেই আমাদের আন্দাজি চলা।

আত্মা অত ধাতু থেকে এসেছে, তার অর্থ গমন। আর এই গমন বা গতির মধ্যে জীবাত্মার আদিম আকাঙ্ক্ষা হল আত্মরক্ষা, আত্মপোষণ, আত্মবিস্তার এবং যা কিছু এর পরিপন্থী তার নিরসন করা। তাই তার কাঙ্ক্ষিত প্রার্থনা হচ্ছে—মা মৃয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যু মবলোপয়। মেরো না, মেরো না, পারো তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। নিজেকে মানুষ জানুক বা না জানুক আমি আছি এই বোধটা সে ছাড়তে চায় না। সে চায়—তার খাকাটা হোক চিরন্তন। মৃত্যু নিশ্চিত তবু মানুষের চাওয়া তার বিপরীতগামী। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ মৃত্যু দেখেছে অনেক, জীবনের যোগফল মানুষ অসহায়ভাবেই সমর্পণ করে

যায় মৃত্যুর পায়ে। তবে তার এই অন্তহীন জীবনের আকাঙক্ষা কোথা থেকে আসে? কেন আসে?

আবার শীতের এই সুন্দর সকালটিতে ফিরে আসি। সাদা উজ্জ্বল দিন। পৃথিবীর আধখানা জুড়ে দুধ-সাদা এক কবুতর বসে আছে যেন। তার বুকের স্নিগ্ধ ওম ওই রোদে, আর আমাদের শরীরের তাপে মেয়ের হাত ধরে আমি হেঁটে যাচ্ছি। অদূরে উঁচু রেললাইনের বাঁধ, চারদিকে বাড়িঘর, গাছপালা, রোদ। কিছু মানুষের নির্মাণ, কিছু প্রকৃতির আর কিছু বা আমার স্মৃতির প্রক্ষেপ কিছু কল্পনা। সাদা কবুতরের মতো এই সকালে পৃথিবীতে নশ্বরতা নেই যেন! আমাদের জানালায় তাদের অন্তহীন খেলায় মেতে আছে আলো আর বুলবুলি। ঘাসের ওপর দিয়ে চঞ্চল গতিবেগে দৌড়ে চলেছে আমার শৈশবের ছায়া। উড়োজাহাজের মতো দিগন্তে দেখা যায় স্মৃতি। চারদিক থেকে ছুটে আসে আমার হারানো অংশগুলি। কিছুই হারায় না—এই বিশ্বাসে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য অনন্ত অবিনশ্বর হয়ে যাই।

মাকালতলার মাঠে একবার চারদিন অবিরাম সাইকেল চালিয়েছিল আসলম! মাইক বেজেছিল, লোকে ভিড় করেছিল খুব। লোকের মুখে মুখে তখন কেবল সেই সাইকেল চালানোর কথা। তিনদিনের দিন দুপুরবেলা কৌতূহলবশত দেখতে যাই। গিয়ে দেখি এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। মাঠের মাঝখানে একটা ছোট্ট ছেঁড়া তাঁবু, তাঁবুর বাইরে একটা টেবিলে পা তুলে গুটি দুই ছেলে ক্লান্ত হয়ে বসে আছে, তাদের সামনে গ্রামোফোনে ঘুরছে হিন্দি গানের রেকর্ড, তারা নিস্পৃহভাবে শূন্যে চেয়ে আছে, তাঁবুর চার ধারে চক্কর দিচ্ছে রোগা চেহারার আসলম। তার মাথায় কান-ছোঁয়া টুপি, গায়ে ছিটের শার্ট, পরনে পাজামা। সাইকেল ধরে ধরে চলেছে একটি ছেলে। সাইকেলের কোনও গতি নেই, অতি কষ্টে ঘুরে যাচ্ছে তাঁর চাকা, প্রতিবার প্যাডল করতে আসলমের মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে। তার গালের হাড় উঁচু হয়ে আছে, থুতনিতে জমেছে দাড়ি, চোখ ঘোলা লাল। আসলম ঘুরছে, আর ঘুরছে। কোনও দর্শক নেই, অবিরাম সাইকেলের ঘোরা দেখতে দেখতে তারা ক্লান্ত হয়ে চলে গেছে বিষয়কর্মে। তাঁবুতে, সাইকেলে চোখে ফুটে উঠেছে সুগভীর একঘেয়ে নিরর্থক শ্রমের কাতরতা, গতিহীন চলার ক্লান্তি। তবু ঘুরে যেতে হবে বলে ঘুরছে আসলম —ঘুরে যাচ্ছে। মাইক্রোফোনে গায়িকার গলাতেও—আশ্চর্য—সেই ক্লান্তি, শ্রমকাতরতা। তাঁবুর পিছন ডোবার ধারে এক ন্যাড়া বজ্রাহত তালগাছ। তাঁবু থেকে চোখ তুলে উটের গ্রীবার মতো দীর্ঘ সেই তালগাছের দিকে তাকাতেই হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতার কথা মনে পড়ে যা মানুষকে মাঝে মাঝে লাশকাটা ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। আসলম কি বারংবার তার প্রদক্ষিণে সেই তালগাছটা দেখে এক ক্লান্তিহীন ঘুমের কথা ভেবেছিল? কে জানে? তবে এইটুকু জানি যে, আসলমের ওই সাইকেল চালানোর মতোই এক নিরর্থক দুর্বহ জীবনযাপন করতে করতে মাঝে মাঝে ওই তালগাছের মতো দীর্ঘ এক নিস্তব্ধতা আমাদের

ডাক দেয়। চোখ তুললেই আকাশ চোখে পড়ে, জানালার ধারে সজনের ডালে শৈশবের কবুতর এসে চুপ করে বসে থাকে, দিগন্তে উড়োজাহাজের মতো স্মৃতি দেখা দেয়—তখন এই জীবনের ক্লান্তি আর থাকে না। স্মৃতিকে বহন করে চেতনা এক অনন্ত প্রবাহকে খোঁজে। তখন কেবলই মনে হয়, আমাদের এই নশ্বর জীবনের পিছনে চিরন্তন বস্তু এক রয়ে গেছে।